CENTRAL LIBRARY

সুবর্ণলেখা

CENTRAL LIBRARY

SUBARNALEKHA

Golden Jubilee Commemoration Volume

of

The Department of Modern Indian Languages

University of Calcutta

Edited by

Asutosh Bhattacharya

Asit K. Banerjee

Calcutta

1974

CENTRAL LIBRARY

সুবর্ণলেখা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য
বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী

স্মারক-গ্রন্থ

সম্পাদনা
আশুতোষ ভট্টাচার্য
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৪

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশক :
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভারতীয়
ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী সমিতি
আশুতোষ ভবন, কলিকাতা-১২

© স্বর্ণজয়ন্তী সমিতি
বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

BCU. 2577

গ্রন্থনা :
গ্রন্থনালয়
১৯বি, নরেন সেন স্কোয়ার,
কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অমলেন্দু শিকদার
১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯
৩৫-৪৬৯১

GS 2890

মূল্য : সাধারণের জন্য : চল্লিশ টাকা
সভ্যদের জন্য : ত্রিশ টাকা

CENTRAL LIBRARY

আমাদের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৯৭২ সনে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৪ সনের পূর্বে প্রস্তাবিত স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই বিলম্বের নানা কারণের মধ্যে বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য প্রেসের নিয়মিত মুদ্রণ কার্যে বাধার সৃষ্টি অন্যতম। তাহার উপর এতবড় একখানি গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য কাগজ সংগ্রহ করিতেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। বর্তমানে গ্রন্থ মুদ্রণে যে কী সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন, সে জন্য এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলাও বাহুল্য।

তথাপি এই গ্রন্থ মুদ্রণে অনেকের নিকট হইতেই আনুকূল্য লাভ করা গিয়াছিল, নতুবা ইহার মুদ্রণ আরও বিলম্বিত হইত। এই সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র জানার নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি কঠিন পরিশ্রম করিয়া সর্বদা প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন, প্রুফ সংশোধন এবং অন্যান্য নানা কার্যেও সহায়তা করিয়াছেন। এইজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদিগের মধ্যে যাঁহারা এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ দিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলের প্রবন্ধেরই এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। অনেকেই গভীর পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু নথিপত্র ঘাঁটিয়া অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাহারও প্রবন্ধ স্থানাভাবের যুক্তি দেখাইয়া পরিত্যাগ করা হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ বিভাগ কতকগুলি ছবির ব্লক দিয়াও আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

স্বর্ণ জয়ন্তী সমিতি
আশুতোষ ভবন, কলিকাতা ১২
১৩৮১ ॥ ১৯৭৪

আশুতোষ ভট্টাচার্য
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন
উপাচার্য

পৃষ্ঠপোষক

ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু
হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার
সহকারী উপাচার্য

সভাপতি

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদকগণ

গোপাল ভৌমিক
শাশ্বতী সেন
মৃণালকান্তি ঘোষ

কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ
ডঃ আশুতোষ দাস
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক
ডঃ সতী ঘোষ
ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র
জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া
ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল
ডঃ অমিয়কুমার চক্রবর্তী
ডঃ জাফর উগান্বী
আবদুর রউফ
শাহ্ মকবুল আহ্মদ
রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য
রণজিৎকুমার চক্রবর্তী
সুকুমার ঘোষ
সাধনা ভট্টাচার্য
সলিল তরফদার
প্রলয় চৌধুরী
স্বপ্না ঘোষ
সুনীতিকুমার মালাকার
পাঁচকড়ি ভট্ট
তপন হালদার

CENTRAL LIBRARY

বিষয়-সূচী

শুভেচ্ছা ১

ভি. ভি গিরি, রাষ্ট্রপতি ৩

ভি. ফাদে, উপরাষ্ট্রপতির সচিব ৪

এন্. কে. শেষন্, প্রধানমন্ত্রীর সচিব ৫

এইচ. ওয়াই. সারদাপ্রসাদ, ঐ ৬

এ. এল্. ডায়াস, রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ ৭

এল্. বুলায়া, উপাচার্য, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ৮

আব্দুল আলিম, উপাচার্য, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ৯

টি কে. তোপে, উপাচার্য, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১০

ডঃ সি. এম. ভাটিয়া, উপাচার্য, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১১

এস্. সি. রাজখাওয়া, উপাচার্য, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ১২

গোপাল ত্রিপাঠী, উপাচার্য, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩

ডঃ ভেরা নোভিকেভা, অধ্যক্ষ, ভারতীয় বিদ্যাবিভাগ,
লেলিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, লেলিনগ্রাদ ১৫

মোঃ ইয়াস আলি, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৭

ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী, উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৮

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক ১৯

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০

ডঃ রমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২১

ডঃ সুকুমার সেন, ভূতপূর্ব খয়রা অধ্যাপক,
ভাষাতত্ত্ববিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২২

কবিশেখর কালিদাস রায় ২৩

অন্নদাশঙ্কর রায় ২৩

নিবেদন

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, সভাপতি, উৎসব সমিতি ও বিভাগীয় প্রধান ২৪

CENTRAL LIBRARY

ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা

আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রথম পঁচিশ বৎসর (১৯১৯-৪৪)	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	২৭
আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসর (১৯৪৫-৬৯)	উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	১২৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোক-সাহিত্য সংগ্রহ (১৯১৯-৭১)	সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৪
লোক-সংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবদান	তুষার চট্টোপাধ্যায়	১৯৫
লোক-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	নির্মলেন্দু ভৌমিক	২০৩
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	২০৯
আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান	নন্দদুলাল রায়	২৩৮
বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গবেষণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান : রবীন্দ্রনাথ	বেলা সেনগুপ্ত	২৪১
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান	কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	২৪৬
বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যবিচারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান	শুকদেব সিংহ	২৫০
বাংলা ভাষাবিষয়ক গবেষণা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	২৫৫
বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ছন্দচর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	২৫৯
গল্প-উপন্যাস রচনা ও চর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	২৬৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মঙ্গলকাব্য চর্চার ধারা	আশুতোষ দাস	২৬৯
শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য	২৭৭
পঞ্চাশ বছরের নাট্যচর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	অরূপকুমার ভট্টাচার্য	২৯৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন বাংলা পুঁথি	প্রফুল্লচন্দ্র পাল	৩০৩
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩২৫
কাছের মানুষ দীনেশচন্দ্র	বিশ্বপতি চৌধুরী	৩২৯
সুবর্ণজয়ন্তীর উৎস সন্ধানে	জনার্দন চক্রবর্তী	৩৩১
অভিভাষণ	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন	৩৪৪
স্মৃতিচারণ	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	৩৫১
স্মৃতিকণা	ফুলরেণু গুহ	৩৫৯
চল্লিশ বছর আগে	কল্যাণী কার্লেকার	৩৬১
জীবনের পরমতম অধ্যায়	জীবনকৃষ্ণ শেঠ	৩৬৫

CENTRAL LIBRARY

শুভেচ্ছা

CENTRAL LIBRARY

শুভেচ্ছা

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-4.
RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI-4.
January 15, 1972.

I am glad to know that the Department of Modern Indian Languages of the University of Calcutta has completed 50 years of its unique service towards the advancement and progress of Modern Indian Languages. As the pioneer Department it has proved a guiding star for the development of learning at other universities also. On the occasion of the Golden Jubilee of the Department I send my congratulations to all its members and my best wishes for a still glorious future.

V. V. Giri

CENTRAL LIBRARY

भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव
नई दिल्ली
Secretary
To the Vice-President of India
New Delhi.
January 17, 1972.

Dear Sir,

The Vice-President is glad to know that you are celebrating the Golden Jubilee of the Calcutta University Modern Indian Languages Department from 19th to 25th February, 1972. He sends his best wishes for the success of the celebrations.

Yours faithfully,
V. Phadhe.

Prof. Asutosh Bhattacharya,
President,
Calcutta University Modern
Indian Languages Department,
Asutosh Buildings,
Calcutta-12.

CENTRAL LIBRARY

प्रधान मन्त्री सचिवालय
नई दिल्ली-११
Prime Minister's Secretariat
New Delhi-11
January 12, 1972.

N. K. Seshan
Private Secretary
No. fms—1360

Dear Dr. Sen,

The Prime Minister has asked me to thank you for your letter of the 7th January, 1972. She would have liked to participate in the Golden Jubilee Celebrations of the Department of Modern Indian Languages of the University of Calcutta, but she regrets that it will not be possible for her to do so. As you know, election to State Assemblies will be taking place and the Prime Minister will have to tour a great deal. It will, therefore, be difficult to make a firm commitment. She hopes that you will excuse her.

Yours sincerely,
N. K. Seshan.

Dr. S. N. Sen,
Vice-Chancellor,
University of Calcutta,
Senate House,
Calcutta—12.

CENTRAL LIBRARY

Director (Information)
No. F. 11 (11) 72—PMP

प्रधान मन्त्री सचिवालय
नई दिल्ली ११
Prime Minister's Secretariat
New Delhi—11.
January 25, 1972.

Dear Sir,

The Prime Minister thanks you for your letter. She sends her good wishes for the success of the Golden Jubilee of the Department of Modern Indian Languages of University of Calcutta which is being celebrated from February 19 to 25 this year.

Yours faithfully,
H. Y. Sharada Prasad

Prof. Asutosh Bhattacharyya,
President,
Calcutta University Modern Indian Languages
Department Golden Jubilee Celebration,
Asutosh Buildings,
Calcutta—12.

CENTRAL LIBRARY

GOVERNOR OF WEST BENGAL

MESSAGE

India is a land of many languages and culture. This is what gives a distinctive quality to our country and our people. It is true that this diversity of language has in recent years led to some conflicts. It is a tribute to our genius as a people that we have been able to resolve such conflicts and move steadily towards integration and the evolution of a national identity.

On the occasion of the Golden Jubilee of the Modern Indian Language Department of Calcutta University we must pay our homage to that great Bengali, Sir Ashutosh Mukherjee who had the vision to establish a department of Modern Indian Languages at Calcutta University. It is only through a study of all our languages and literatures in relation to each other can we realise our aim of national integration. I wish the Modern Indian Languages Department of Calcutta University all success.

(A. L. Dias)
Governor of West Bengal.

Calcutta
February 14,1972.

CENTRAL LIBRARY

L. Bullayya
Vice-Chancellor

Andhra University,
Waltair.
Visakhapatanam-3
25th January, 1972.

It is a matter of supreme satisfaction that the University of Calcutta is celebrating the Golden Jubilee of the Department of Modern Indian Languages from the 19th February to the 25th February 1972. It is in a way commemorating the dynamic lead given by the late Sir Asutosh Mookerjee during the eight years (1906-1914) of his Vice-Chancellorship of the University. In the midst of difficult circumstances that existed then, he re-organized the various departments into 'Teaching and Research' units thus converting the University from a mere 'Examining and Degree-Conferring' agency to a real seat of advanced learning.

Among the many reforms of fundamental character constitution of the department of Indian languages in the year 1917 marks an important land-mark in the history of the Indian University Education. Four Languages (Bengali, Hindi, Gujarati and Oriya) were provided as main subjects of study with nine languages (Bengali, Hindi, Gujarati, Marathi, Telugu Tamil, Kannada, Malayalam and Sanskrit) as subsidiary subjects, for the scholars to choose from. By 1962 the number of languages increased to seventeen (Under Certificate and Diploma courses) which include some Modern European languages. Since the inception of Department of Indian Languages, the University has produced many polyhistors. I may here mention only one, Dr. Suniti Kumar Chatterjee the author of a scholarly compendium of various Indian languages and literatures.

I find the seven-day Programme of the Golden Jubilee quite elaborate and befitting the occasion. Participation of creative writers and eminent scholars of the major Indian languages in the celebrations is commendable. It is the best way of giving the Jubilee an All-India character, the very idea conceived by Sir Asutosh Mookerjee while re-organising the University in the early decades of this century.

I have the great pleasure in sending my hearty greetings for the occasion. I wish the function all success.

L. Bullayya.

CENTRAL LIBRARY

Professor Abdul Aleem
Vice-Chancellor

Aligarh Muslim University
Aligarh
18 January, 1972.

The Head,
Department of Modern Indian Languages,
University of Calcutta,
Asutosh Buildings,
Calcutta-12.

Dear Sir,

With reference to your letter dated 7 January 1972, I am glad to learn that you are celebrating the Golden Jubilee of your Department and that you have drawn for this purpose a seven-day programme of Lectures, Seminars, exhibition, publicaton of Souvenir and Memorial Volume, demonstrations and entertainments from 19th February 1972 to 25th February 1972. I have pleasure in sending you my good wishes for success of the celebration.

Yours faithfully,
Abdul Aleem
Vice-Chancellor

CENTRAL LIBRARY

The Head of the Department
of Modern Indian Languages,
University of Calcutta
Asutosh Buildings, Calcutta-12.

21st January, 1972.
Bombay-32.

Sir,

Please refer to your letter dated 7th January, 1972.

I am happy to know that the Department of Modern Indian Languages of the University of Calcutta is celebrating its Golden Jubilee celebrations and that a seven-day programme has been drawn for the purpose. It would be a fitting tribute to Shri Ravindranath Tagore if the creative artists and scholars of major Indian languages participate in the celebrations. I am sure, the celebrations will be a success and will lead to greater understanding of the point of view of various languages of India. It is indeed a matter of regret that many people try to study foreign languages but very few of them attempt to study the languages of other States in India. The celebrations will give impetus to such a study.

I wish the celebrations a grand success.

Yours faithfully,
T. K. Tope
Vice-Chancellor, University of
Bombay.

CENTRAL LIBRARY

Dr. C. M. Bhatia
Vice-Chancellor

Phone : 4171
2383
Senate House
Allahabad
7th February, 1972

I am extremely happy to learn that the Calcutta University is celebrating the Golden Jubilee of its Modern Indian Languages Department for a week in February 1972, on a large scale with varied programme. I am glad to know that during the last 50 years the Department has rendered valuable services in bringing the major regional languages and literatures of India on a common platform on the highest academic level and in realising unity in diversity—linguistic, cultural and literary.

I send my warm felicitations to the Calcutta University on the happy occasion and wish the celebration all success.

C. M. Bhatia
Vice-Chancellor

CENTRAL LIBRARY

S. C. Rajkhowa, M. A. (CAL.), M. A. (LOND.),
Vice-Chancellor,
Gauhati University

Gauhati-14
18. 1. 72

I am extermely-happy to know that the Department of Modern Indian Languages of Calcutta University is presently celebrating its Golden Jubilee. Assam, too, has her share of joy on this occasion. It is remembered with much gratitude how the great Sir Ashutosh had seven volumes of *Typical Selections from Assamese Literature* ('Asamiya Sahityar Chaneki') compiled through Pandit Hemchandra Goswami and published with the help of a munificent donation from the Assamese merchant at Calcutta, Bholanath Barooah. We also look back with happiness to the occasion when the Assamese Language was opened for study by Calcutta University graduates first as a Subsidiary Language and then as a full-fledged major one. The Department of Modern Indian Languages may very well be proud of the great number of M. A.'s it has passed out and particularly of those who have adorned the Literatures of India, whether that be Bengali or Assamese, Marathi or Gujarati. The Department has built an immensely rich tradition of its own by the production of a great number of scholars in literature, language and culture as well as creative writers, who have made Bharati of Bharata so happy and contented.

I congratulate the Department on its past success and wish many more glorious Jubilees.

S. C. Rajkhowa

CENTRAL LIBRARY

Vice-Chancellor

February 15, 1972.
Lucknow

I feel happy to learn that the Department of Modern Indian Languages of the University of Calcutta has completed more than half a century of meritorious service to all the major Languages and Literatures of the country, and through them to the vital cause of forging a cultural and idealistic unity in the midst of seeming diversity. The far-sighted vision of Sir Asutosh Mukherji, under whose "inspiring guidance" the Department came into existence as far back as 1919 must have seen that it is in Literature that the eternally abiding spirit of a nation, despite the differences occasioned by the accidents of race, place and creed, discovers and expresses the ideals cherished by the whole nation. There is no better medium of intra-national understanding than the study of various Languages and Literatures of the country.

It is not in the cultural sphere alone that Language has its vital role to play. Its contribution to sciences is no less vital. More than three hundred years ago Bacon laid the foundation of modern scientific thinking by reminding the western world that progress in sciences since the ancient times had been so slow because "Experience had not yet learnt her letters." Any lack in the development of proper language to be the medium of co-ordination and coherence of facts collected for inductive use by experience, would be detrimental to the progress of sciences. If Indian Science has to lay aside its secondary role of dependence upon the west, Indian Languages have to grow so as to enable the Indian Scientist to think in a medium that is more natural to him than a foreign language, no matter how developed and how advanced.

CENTRAL LIBRARY

For these and for many other things, the Department of Modern Indian Languages of Calcutta University has been pioneering institution, and of course nothing less could be expected from one of the prime builders of the nation. The vision of Sir Asutosh has been worthily carried forward by those who held the chair from time to time, and by their colleagues and students. Prof. Asutosh Bhattacharya and his colleagues deserve congratulations on the occasion of the Golden Jubilee of the Department. I wish the organisers all success in their auspicious celebration, which I feel sure, will become a milestone in the progress of the nation in this direction.

Gopal Tripathi

CENTRAL LIBRARY

Prof. Asutosh Bhattacharyya,
President,
Golden Jubilee Celebration,
Calcutta University Modern
Indian Languages Department.

Dr. Vera Novikova,
Head of the Department of Indian
Studies, University of Leningrad,
Leningrad, U.S.S.R

Dear Sir,

On the occasion of celebration of Golden Jubilee Calcutta University Modern Indian Languages Department I send my heartiest good wishes and warmest greetings to all my friends of this Department, its professors and students who destined to serve the Republic of India in various ways, who have extended the horizon of human thought and will be the discoverers of knowledge in future.

It is very great privilege to me to say a few words on this remarkable occasion. I want to remember with admiration the activity of the late Vice-Chancellor of Calcutta University Sir Asutosh Mookerjee who immensely supported the idea of teaching of Indian vernaculars and particulary Bengali. The encouragement of Indian vernaculars, he thought was the means whereby national unity and national regeneration of India could be achieved. The realisation of this idea he began shortly after his appointment as a Fellow of the Calcutta University in 1890. But in those days it was not an easy task. For more than thirty years he placed his outstanding intellectual powers and his unrivalled energy for the development of Calcutta University as a home of advanced learning. Among his many achievements were Indian Vernaculars included in the curriculam of the post graduate department. I am proud to say that these very important steps had been undertaken for the first time in India in her senior University. It is no wonder that after the death of Asutosh Mookerjee Rabindranath Tagore wrote: "Asutosh heroically fought against heavy odds for winning freedom for our education."

The Department of Modern Indian Languages has on the first steps such remarkable professors as Suniti Kumar Chatterjee and Dines Chandra Sen, whose endeavours, philological experience and knowledges helped to create good

CENTRAL LIBRARY

traditions which carry on with great success their colleagues and pupils.

It was a great pleasure for me to be the student of this Department in 1956-1957. With great interest I attended the lectures of professors Asutosh Bhattacharyya on Bengal Folklore (Manasamangal and Meimensingha Gitika) and Bengali Literature (poetry of Michael Madhusudan Dutt, Hemchandra Banerji, Navin Chandra Sen, dramaturgy of Girishchandra Ghose and R. Tagore), Pramathanath Bisi (Poetry of R. Tagore and Michael Madhusudan Dutt), Bijan Bhattacharya (Lipika of R. Tagore and History of Bengali Literature), Sasibhusan Das Gupta (Vaisnava Literature and the Critical Literature), Narayan Ganguli (Short Stories) and Sukumar Sen (the History of Bengali Language). I highly appreciated these lectures which were always delivered in the distinguished way with a very keen philological analysis. They helped me immensely in my following pedagogical and research work.

My colleagues from the Department of Indian studies, University of Leningrad and personally I, are very happy that the contacts with the Department of Modern Indian Languages, University of Calcutta become closer during the last years. The head of this Department, Tagore professor Asutosh Bhattacharyya and National professor of Humanity Suniti Kumar Chatterji visited our University and delivered a series of lectures on Indian Languages, Folklore and Literature of Bengal.

Sending once more my deepest greetings on the occasion of celebration of the Golden Jubilee of Modern Indian Languages Department, I wish you still greater contribution to the advancement of Learning Modern Indian Languages and Literatures. May the next years be years of progress and happiness and may your country be an influence of goodwill and peace among the nations.

Leningrad, 14-1-1972

Sincerely Yours,
Vera Novikova

CENTRAL LIBRARY

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেনে আমি গভীর আনন্দবোধ করছি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে সুমহান প্রত্যাশা নিয়ে এই বিভাগের সূচনা করেছিলেন, তা সফল হয়েছে বিশিষ্ট পণ্ডিতজনের সাধনায়। এই উপমহাদেশের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য সমূহের সঙ্গে বিশ্বের বিদ্বৎ-সমাজের পরিচয় সাধনায় এই বিভাগের কীর্তি অবিস্মরণীয়। আমরা একথাও বিশেষভাবে স্মরণ করি যে, এই বিভাগেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর মানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিভাগের গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সুপরিজ্ঞাত কারণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির যোগ ক্ষীণতর হতে হতে ছিন্ন হয়ে যায়। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে সেই সম্পর্ক আজ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে। আমরা আশা করি, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে।

স্বর্ণজয়ন্তী শুভ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের যথার্থ মিলন অক্ষয় হোক, এই প্রার্থনা করি।

চট্টগ্রাম
বাংলা দেশ
ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৭২

মোঃ ইন্নাস আলী
ভাইস-চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

S. B. Chaudhuri
Vice-Chancellor

NO. V/M-4/IV/220
University of Burdwan
Rajbati ; Burdwan, West Bengal
Phone : BDN 298

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় সমাসীন। বহুকাল ধরে প্রচলিত ও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সংবিধানে স্বীকৃত প্রাদেশিক ভাষাগুলির স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই আরম্ভ হয়। সেই শুভারম্ভের দিন প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষানায়ক স্যার আশুতোষ যে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন, তা আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তা ছাড়া গত পঞ্চাশ বছর ধরে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ তথা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন মানবিকী শাখায় যে দান রেখেছেন, তা আমাদের চিরকালের গৌরবের বস্তু।

আমি আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্ধমান
৩।২।৭২

শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী
উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

Residence :
"Sudharmā"
16, Hindusthan Park
Calcutta-29
Phone : 46-1121

āvir āvir ma ēdhi
mānavikīṣu bhāratasya
Jātīya ācāryaḥ
Suniti Kumar Chatterji
National Professor of
India in Humanities

Office :
National Library Campus
Belvedere
Calcutta-27
Phone : 45-5319

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আধুনিক ভারতীয় ভাষা" (এবং পরে "বাঙ্গালাভাষা") বিভাগের পত্তন হইতেই, ১৯১৮-১৯১৯ সালে যখন আমি ইংরাজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক, তখন হইতেই ইহার সহিত আমি সংশ্লিষ্ট। এই আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রবর্তন, ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে পুণ্যশ্লোক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবিনশ্বর কীর্তি, এবং এই বিভাগের স্থাপনের সময় তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সেবা ও সাহচর্য গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য ও সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কলিকাতার দেখাদেখি অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় একের পর এক নিজ নিজ পাঠক্রমে স্থানীয় ও কচিৎ অন্যান্য আধুনিক ভাষাকে একটি প্রধান মর্যাদা দিতে আরম্ভ করিলেন, সকলেই নূতন করিয়া মাতৃভাষা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন—ভারতের বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে ইহা হইল একটি অভাবনীয়, ক্রান্তিকর ব্যাপার। এই হেতু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অর্ধশতাব্দী (এবং তাহারও দশবৎসর) পূর্বে যে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে—সমগ্র ভারতের জনগণ তজ্জন্য তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ দিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণের সঙ্গে ও বঙ্গদেশের মাতৃভাষানুরাগী তাবৎ জনগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই ঐতিহাসিক ঘটনার পঞ্চাশদ্বর্ষীয় উৎসব পালন করিতেছেন। এই বিভাগের সহিত সংযুক্ত অন্যতম কর্মী ও শিক্ষকরূপে আমিও এই উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করিতেছি—ইহার উদ্বোধনের সময়ে কার্যান্তরে আমি কলিকাতার বাহিরে যাইতেছি বলিয়া, "কায়েন", না হইলেও, "মনসা, বাচা, হৃদা, আত্মনা" আমি এই অর্ধশতাব্দিক সমারোহে অংশ গ্রহণ করিতেছি। এবং আন্তরিক কামনা করিতেছি যেন এই জয়ন্তী-উৎসব সার্থক হয়, বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির, এবং নিখিল ভারতের তাবৎ ভাষার ও প্রান্তীয় সংস্কৃতি সমূহের পক্ষে মঙ্গলাবহ হয়। ইহাদিগের পরিবর্ধক ও পরিপূরক হয়।

ইতি ৬ ফাল্গুন সন ১৩৭৮ সাল, ১৯ ফেব্রুয়ারী খ্রীস্টাব্দ ১৯৭২ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

উপাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগ শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মহতী কল্পনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শুধু কেবল মাতৃভাষার পূজাবেদী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সহোদরাস্থানীয় অন্যান্য ভারতীয় ভাষা-চর্চারও আয়োজন করেন। আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র—এই তিনজনের প্রতিভার সম্মেলনে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র-রূপে এই বিভাগটির বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের প্রভাব বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। সেই সঙ্গে হিন্দী ও উর্দু, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও সমাদর বৃদ্ধিতে এই বিভাগের দানও উল্লেখযোগ্য।

বাঙালীর সাহিত্যচেতনা তাহার জীবনের প্রধান আশ্রয়। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে ইহার ব্যাপক ভূমিকা দেখা গিয়াছে, অতি সাম্প্রতিককালে পূর্ববঙ্গের জনজীবনে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তির উদ্বোধনের মূলেও রহিয়াছে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি। অপরপক্ষে এই বাংলাদেশে সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যোপলব্ধির ভিত্তিতে যে ভারত-চেতনা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে আমরা সংকীর্ণ প্রাদেশিক উন্নতির মোহ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্তরতম আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম। স্বভাবতই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেই জাগরণকে শুধু বাংলার সীমায় আবদ্ধ না করিয়া মনীষী আশুতোষ সর্বভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্ত পটভূমিকায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা এ বিষয়ে কতদূর সফলতা অর্জন করিয়াছি সেকথা আলোচনা করার সময় যেমন আসিয়াছে, তেমনি আশুতোষের এই উদার পরিকল্পনা আরো ব্যাপকভাবে পরিস্ফুট করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বাঙালী ও ভারতীয় হিসাবে বিশেষ গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর অর্পিত পরম দায়িত্বের কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি। বস্তুতঃ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতিগঠনের কাজের সূচনা হইয়াছে মাত্র, সে কাজের পূর্ণতা নির্ভর করিতেছে সাহিত্যানুরাগী পাঠক, লেখক, ছাত্র, অধ্যাপক সকলের সমবেত প্রচেষ্টার উপর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ জাতীয় মহাসম্মেলনের সাধনা ও আদর্শের রূপায়ণে সিদ্ধি অর্জন করুক—ইহাই ভগবৎচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

১০।১।৭২

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

BCU 2577

CENTRAL LIBRARY

উপাচার্য

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,
কলিকাতা-৭

নং-১৮০২

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭২

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনাদের অশেষ শুভ সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে জানাই আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতি, শুভেচ্ছা-অভিনন্দন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যরূপে আজ বিশ্ববন্দ্য। কিন্তু বহুদিন পূর্বে যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন-গবেষণাদির যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই ছিল না, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ শ্রদ্ধা-প্রীতি-সাহস-বিচক্ষণতা দূরদর্শিতা সহকারে এই সম্বন্ধে সুষ্ঠু সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই বিশেষ উপকার সাধিত হয়েছে। সেজন্য, আপনাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই।

আপনাদের সুযোগ্য পরিচালনায় আপনাদের বিভাগের যে উত্তরোত্তর উন্নতি হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আজ আমাদের পরম আদরের প্রতিবেশী-রাষ্ট্র বাংলা দেশের অশেষ শুভ অভ্যুদয় হয়েছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহিমা গরিমা, মর্যাদা, সমাদরও শতগুণে বর্ধিত হয়েছে। এই শুভলগ্নে, জননী বঙ্গভাষার পূজাবেদীতলে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তারই আজীবন নিঃস্বার্থ সেবক আপনারাও যে দ্বিগুণ উৎসাহে আপনাদের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হবেন স্থির ধীর দৃঢ়দৃপ্ত পদে—তা' সুনিশ্চিত।

তুই বাংলার এই শুভ জয়যাত্রায় আমরাও যদি আপনাদের সামান্যমাত্রও সহায়তা করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করব।

পরমানন্দময়ী পরমা জননীর শুভাশীর্বাদে আপনাদের পুণ্য ধন্য জীবন চিরমধুময়, চিরমঙ্গল-মণ্ডিত, চিরসৌভাগ্য-সমৃদ্ধ হোক। ইতি—

নিত্য-শুভার্থিনী
রমা চৌধুরী
উপাচার্য

GS 2890

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে জানপদভাষানুশীলনশুভারম্ভস্মারণিকী

বন্দনা

বিদ্যা বেদা হরিণহরণঃ সম্মিতে শাকবর্ষে
ভদ্রারম্ভং যমিমকরোদ্ বিশ্ববিদ্যালয়েঽস্মিন্ ।
বীণাতন্ত্রীর্জনপদমিতা ভারতীর্ধ্বগমানাঃ
প্রাক্ স্মর্তব্যস্ত্রিবিদি-সহিতং মুখ্যত শ্চাশুতোষঃ ॥ ১ ॥

স্বাধিকারে নিরলসধিয়ো যেঽভবন্ শিক্ষকাস্তে
চন্দ্রশ্চারুর্বিজয় ইতি বা কিঞ্চ রায়ো বসন্তঃ ।
শ্রীদীনেশো মহিতকবিনা শ্রীশশাঙ্কেন সার্ধং
স্মারং তেষাং নময়তি শিরঃ শ্রীসুকুমার সেনঃ ॥ ২ ॥

॥ ইতি ত্রিনবত্যুত্তরাষ্টদশশকাব্দে মকরসংক্রান্তিদিবসে ॥

অনুবাদ

১৮৪১ সংখ্যক শকবৎসরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শুভকর্মারম্ভ হইয়াছিল—জনপদ-অনুযায়ী ভারতীর যে বীণাতন্ত্রগুলি ধ্বনিত হওয়া—(সে ব্যাপারে) প্রথমেই প্রধানতঃ (রামেন্দ্রসুন্দর) ত্রিবেদীর সহিত আশুতোষকে স্মরণ করিতে হইবে ॥ ১ ॥

নিজের কর্তব্যে নিরলসভাবে নিষ্ঠাবান্ যে শিক্ষকেরা ছিলেন (এই বিভাগে)—চারুচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়), বিজয়চন্দ্র (মজুমদার), বসন্ত (রঞ্জন) রায়, দীনেশ (চন্দ্র সেন) এবং মান্য কবি শশাঙ্ক (মোহন সেন)—তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সুকুমার সেন মাথা নোয়াইতেছে ॥ ২ ॥

টীকা

ছন্দের অনুরোধে 'ত্রিবেদী'র দীর্ঘ এ-কার হ্রস্ব ই-কার (বাংলায় হ্রস্ব এ-কার অক্ষর নাই বলিয়া) এবং 'সুকুমার'-এর হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ করা হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র অনুসারে শ্লোকরচয়িতাদের এ স্বাধীনতা আছে।

CENTRAL LIBRARY

মহানুভব কর্মবীর পুণ্যশ্লোক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অর্ধশতাব্দী পূর্বে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের যে মহীয়সী পরিকল্পনার সূচনা করিয়াছিলেন, সেই শাখাটি আজ নানা ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই বিভাগের সঙ্গে মনপ্রাণের সংযোগ অনুভব করিয়া আমি গৌরবান্বিত বোধ করি। প্রার্থনা করি, বিধাতার আশীর্বাদে বর্ষে বর্ষে ইহার ক্রমবিতান জয়যুক্ত হউক।

শ্রীকালিদাস রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ এখন অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছে। আমি যতদূর জানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলি স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করে। কলকাতা যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তা পরবর্তীকালে দিল্লীতে অনুসৃত হয়েছে বলে শুনি, আর কোথাও হয়েছে কি না জানিনে। কলকাতা এদিক থেকে প্রাদেশিকতামুক্ত। এটা কলকাতার মেট্রো-পলিটান ঐতিহ্যেরই উপযুক্ত। কলকাতা কেবল বাংলার বা বাঙালীর জ্ঞানপীঠ নয়, নিখিল ভারতের ও ভারতীয়দের। অবশ্য বাংলার ও বাঙালীরই সেখানে মুখ্য স্থান। সেটা অগৌরবের বিষয় নয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের বাংলা উপবিভাগই সমগ্র বিভাগের গৌরব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। এখন যাঁরা সেই ভাষার অধ্যাপক তাঁরা যেন ভুলে না যান যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সগোত্র। অধ্যাপনার জন্যে নয়, অন্য কাজে আমাকেও মাঝে মাঝে ডাক পড়েছে। আমি এর জন্যে গর্বিত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

CENTRAL LIBRARY

নিবেদন

১৯১৯ সনে সর্বপ্রথম যখন বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হলো, তখন এ দেশের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা যে কি ছিল, তা' আজ পঞ্চাশ বছর পর তার পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুই অনুমান করতে পারব না। সুতরাং সেদিন যাঁরা এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান যদি এ কাজে অগ্রসর না হতো, তা' হলে জাতির ভাষা এবং সাহিত্যিক অগ্রগতি এত ত্বরান্বিত হ'তে পারত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গোড়ার দিককার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সেদিন নির্বিবাদে এ কাজ সম্পন্ন হ'তে পারেনি। যাঁরা এই বিষয়ে বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাও এ দেশেরই সুসন্তান ছিলেন; কিন্তু তাঁদের মনের মধ্যে বিদেশী ভাষা সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্মেছিল, জাতীয় ভাষা সম্পর্কে নানা কারণেই সেই বিশ্বাস সৃষ্টি হ'তে পারেনি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিন যিনি কর্ণধার ছিলেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জাতীয় ভাষা সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কেবল তাঁরই প্রচেষ্টায় সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিল। আজ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সেই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন উদারচেতা মনীষীর কথা সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হ'বার বহুকাল পর ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে আঞ্চলিক ভাষা স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হ'তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ই এই বিষয়ে যে সঙ্কোচের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই তার ভাব কাটিয়ে উঠে কেবলমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়েছে। সেইজন্য পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই বিভাগ অসাধ্যসাধন করতে সক্ষম হয়েছে। আজকের উৎসবের দিনে আমাদের এই গৌরবময় অতীত দিনগুলোর কথাই আমরা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে চাই।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
সভাপতি, উৎসব সমিতি
ও
বিভাগীয় প্রধান

CENTRAL LIBRARY

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৮৬৪—১৯২৪

CENTRAL LIBRARY

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৭—১৯৩৯

CENTRAL LIBRARY

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৮৮০—১৯৬১

CENTRAL LIBRARY

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩—১৯৬৯

CENTRAL LIBRARY

৺মোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

১৮৯২ – ১৯৭০

CENTRAL LIBRARY

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১৯১১—১৯৬৪

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
১৯৩৩

দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে) :

ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক ললিতাপ্রসাদ শুকুল, অধ্যাপক বাবুয়া মিশ্র, অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, অধ্যাপক মহেশ্বরদাস।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
(বাংলা ও উর্দু)
১৯৭৩

বাম দিক হইতে দণ্ডায়মান : মুহম্মদ আবদুর রৌফ (উর্দু), ডঃ অমিয়কুমার চক্রবর্তী (সংস্কৃত), ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (বাংলা), ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ (বাংলা), ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব), ডঃ জাফর উগানবি (উর্দু), ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (বাংলা), ডঃ আশুতোষ দাস (বাংলা), ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক (বাংলা), ডঃ এম. এন. হাশ্‌মি (উর্দু), শ্রীসুকুমার মিত্র (পুথিশালার করণিক), মুনীশ্বর (পিওন)

বাম দিক হইতে উপবিষ্ট : ডঃ উমা রায়, ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (বিভাগীয় প্রধান), ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ, ডঃ সতী ঘোষ, ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল

CENTRAL LIBRARY

ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রথম পঁচিশ বৎসর

১৯১৯—১৯৪৪

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

১৯১৯ ইং ১লা জুলাই হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের সূত্রপাত। ঐ দিন হইতেই বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ ইং ৩০শে জুন তারিখে এই বিভাগের ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় আধুনিক ভাষাবিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে (৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে) এই বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনার জন্য বিভাগীয় প্রধান প্রীতিভাজন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে নির্দেশ দেন। তাঁহার নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে দীর্ঘ ৫০ বৎসরের বিবরণ সঙ্কলন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না তাহা প্রথমেই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। ১৯২৯ হইতে ১৯৩১ ইং পর্যন্ত আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। প্রথম দুই বৎসর ছাত্র হিসাবে, পরে রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক হিসাবে, শেষ দুই বৎসর এসিস্ট্যাণ্ট লেকচারার হিসাবে। এখন হইতে ৩১ বৎসর পূর্বে এই বিভাগের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া আসামে চাকুরী লইয়া শ্রীহট্টে চলিয়া যাই। আমার পক্ষে এই বিভাগের প্রথম ২৫ বৎসরের বিবরণ সঙ্কলন করা খানিকটা সহজ হইবে মনে করিয়াই এই কার্যে ব্রতী হই। কিন্তু এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যত সহজে এই কাজ সম্পূর্ণ করিব ভাবিয়াছিলাম তত সহজে ইহা হইবার নহে। তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দিতে গেলে বিভাগীয় কাগজপত্র যত্নসহকারে দেখিতে হইবে। তখন বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হইলাম। প্রায় মাসাধিক কাল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত মুদ্রিত কার্যবিবরণী এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাদি দেখিতে হইয়াছে। আমার এই কার্যবিবরণী অনুসন্ধান কার্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তরুণকর্মী শ্রীমান্ সুদেব চট্টোপাধ্যায় আমায় সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যের কথা সানন্দে এস্থলে স্মরণ করিলাম।

বর্তমান নিবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির গোড়ার কথাসহ প্রথম ২৫ বৎসরের অর্থাৎ ১৯১৯ ইং ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৪ ইং ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই নিবন্ধে এই বিভাগের রৌপ্যজয়ন্তী বর্ষের পরবর্তীকালের অর্থাৎ ১লা জুলাই ১৯৪৪ ইং ও তৎপরবর্তীকালের কোন বিবরণ থাকিবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাক্-কাহিনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা আধুনিক ভারতের নব-নালন্দা। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার বহু মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা অধ্যাপকরূপে ভারতবিখ্যাত হইয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্নক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও অধ্যাপকের খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল মিঃ অ্যাডাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণের আদেশ অনুসারে ১৮২৩ ইং 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' নামক সংস্থা সংস্থাপন করেন। এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দান। প্রায় ১৯ বৎসর পরে ১৮৪২ ইং লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়ে—'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়। এই কাউন্সিলের উপর এদেশের যাবতীয় স্কুল ও কলেজের ভার ন্যস্ত হয় এবং ইহা সরকারের একটি বিভাগরূপে পরিগণিত হয়। ১৮৪৫ ইং ২৫শে অক্টোবর তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনের তদানীন্তন সেক্রেটারি ফ্রেড. জে. মোয়াট, এম. ডি. স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র কোর্ট অব ডাইরেক্টারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদনপত্রেও একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের একটি আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করাইয়া সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে স্থাপন করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতেছি। কোর্ট অব ডাইরেক্টারস্—কাউন্সিল অব এডুকেশনের এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। কোর্টের বিশ্বাস কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে এদেশে কয়েকটি কলেজ ছিল। এই সকল কলেজে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫৩ ইং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় পুনরায় সনদ দিবার প্রশ্ন বিবেচিত হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের লর্ডস কমিটি এ সময় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ কমিটির সমক্ষে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ ১৮৫৪ ইং ১৯শে জুলাই তারিখে যে 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে ভারতের তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল। এই ডেসপ্যাচ কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্পাদক মোয়েটের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার প্রায় ১০ বৎসর পরে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশ সম্বলিত এই ডেসপ্যাচ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশে ১৮৫৫ ইং ২৬শে জানুয়ারী এক ইউনিভার্সিটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কার্যের সূত্রপাত করেন। এই কমিটি কিরূপে পরীক্ষাদি গৃহীত হইবে তৎসম্বন্ধে রীতিনীতি ও আইন কানুন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ ইং ১২ই ডিসেম্বর তারিখে এক ঘোষণায় কাউন্সিল অব এডুকেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও তদানীন্তন কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস উইলিয়ম কলভিলকে প্রস্তাবিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদে নিয়োগ করা হয়। এই ঘোষণাপত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'ফেলো'দের নামও ঘোষিত হইয়াছিল।* এইসকল 'ফেলো'দের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ, ভারতের রাজপ্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। এদেশবাসী সদস্যের সংখ্যা অতি

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবস্থাপিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন 'ফেলোর' মধ্যে ২০ জনই ছিলেন এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্য। এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি জেমস উইলিয়াম কলভিলই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

অল্প ছিল। মাত্র নিম্নলিখিত ছয় জন এদেশবাসী প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১। প্রিন্স গোলাম মোহম্মদ, ২। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৩। রমাপ্রসাদ রায়, ৪। মৌলবী মোহম্মদ ওয়াজি, ৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ৬। রামগোপাল ঘোষ। এই ঘোষণাপত্র প্রচারের ফলে ঐ দিন হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যের সূত্রপাত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৫৬ইং ১২ই ডিসেম্বর তারিখেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

১৮৫৭ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে ফ্যাকাল্টির নির্বাচন হইবার পর সিণ্ডিকেট (Syndicate) সভা বিধিসম্মত ভাবে গঠিত হয়। সিণ্ডিকেটের প্রথম অধিবেশন ১৮৫৮ ইং ৩০শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ভাবে ঐ তারিখ হইতে সিনেটের প্রথম অধিবেশনে গঠিত অস্থায়ী সমিতির পরিসমাপ্তি ঘটে। নব স্থাপিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পরীক্ষা লইবার, পরীক্ষোত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা দিবার এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। সে যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন প্রফেসার বা লেকচারার ছিল না। ছাত্রদিগকে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ কলেজে এম. এ. খুলিবার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না, উপযুক্ত গবেষণার কোন সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। ১৯০৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে এই নূতন আইনের ৩নং ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এক গভীর ও অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়। এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা দিবার অধিকার অর্পিত হয়। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষমতা ও গবেষণা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হয়। ১৯০৬ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইন কার্যকরী করা হয় এবং নূতন নিয়মাবলীও বিধিবদ্ধ হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এণ্ট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষা

১৮৫৭ ইং ৩রা জানুয়ারী প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে এদেশীয় ফেলোদের মধ্যে প্রিন্স গোলাম মোহম্মদ, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় উপাচার্য কলভিল সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ঐ অধিবেশনে সাহিত্য, আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সাহিত্য ফ্যাকাল্টির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে গোলাম মোহম্মদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামগোপাল ঘোষ এই তিন জন এদেশীয় সদস্য মনোনীত হন। এই সভায় একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ইহার উপর আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই অস্থায়ী সমিতি প্রথম অবস্থায় বর্তমান সিণ্ডিকেটের ন্যায় কাজ করিয়াছিলেন। এই অস্থায়ী সমিতির প্রথম অধিবেশন ১০ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য কলভিল। এই সভায় প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পর্কে সভাপতি যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেন তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ দিন পরীক্ষার কার্যসূচী, পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম, যে যে ভাষায় পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহার তালিকা গৃহীত হইয়াছিল। পরীক্ষার্থীদের বয়স অন্ততঃ ১৬ বৎসর না হইলে পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইবে না, এই নিয়ম গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী ১৭ই জানুয়ারী তারিখের দ্বিতীয় অধিবেশনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পরীক্ষককে কোম্পানীর মুদ্রায় ৩০০

CENTRAL LIBRARY

টাকা এবং দেশীয় ভাষার পরীক্ষককে ১৫০ টাকা করিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। শুধু ১৮৫৭ ইং পরীক্ষার জন্য প্রত্যেককে ৩০০ টাকা করিয়া দেওয়া স্থির হয়।

১৮৫৭ ইং ২৪শে জানুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভারতীয় বিধানসভায় গৃহীত হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে এই তারিখটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দিন রূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। যাহার ফলে ১৯৫৭ ইং ২৪শে জানুয়ারী তারিখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বৎসরই এই আইনের বলে বোম্বে ও মাদ্রাজে আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার ৩০ বৎসর পরে ১৮৮৭ ইং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজশাসিত ভারতে যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রাচীনতম।

প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা

[Entrance Examination]

১৮৫৭ ইং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৮৫৭ ইং ৬ই এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত গৃহীত প্রথম এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইল।

১। পরীক্ষণীয় ভাষা—প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দুইটি ভাষার পরীক্ষা দিতে হইত। তন্মধ্যে একটি ইংরাজী, অপর ভাষা—গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু এই ৯টি ভাষার মধ্যে যে কোন একটি। পরে ক্রমশঃ এই ৯টি ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া, বর্মী প্রভৃতি আরও কতিপয় ভাষার পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২। পরীক্ষার কেন্দ্র—প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা নিম্নলিখিত কেন্দ্রে লওয়া হইয়াছিল :—কলিকাতা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কটক, পাটনা, ভাগলপুর, বারাণসী, আগ্রা, দিল্লী, আজমীর ও লাহোর।

৩। পরীক্ষার ফি—এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফি—৫ টাকা ধার্য হইয়াছিল।

৪। পরীক্ষার পাঠ্য (বাংলা)—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, রামায়ণ।

৫। পরীক্ষার কার্যসূচী—

৬ই এপ্রিল সোমবার—ইংরাজী
৭ই " মঙ্গলবার—অন্যান্য ভাষা
৮ই " বুধবার—ভাষা সম্বন্ধে মৌখিক পরীক্ষা
৯ই " বৃহস্পতিবার—ইতিহাস ও ভূগোল
১০ই " শুক্রবার—অঙ্ক ও বিজ্ঞান

CENTRAL LIBRARY

এই কার্যসূচী গৃহীত হইবার পর দেখা গেল যে ১০ই এপ্রিল গুড্‌ফ্রাইডে এবং ১১ই এপ্রিল হিন্দু পর্ব, ফলে ১০ই এপ্রিলের পরীক্ষা ১৩ই এপ্রিল সোমবার লওয়া হইয়াছিল।

৬। পরীক্ষার সময়—পূর্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে ১১০ ঘটিকা।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৪১০ ঘটিকা।

৭। পরীক্ষক (বাংলা পরীক্ষার)—বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। পরীক্ষার ফল—প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মোট ২৪৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১১৫ জন প্রথম বিভাগে, ৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন, ১৫ জন পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দেন নাই, ৬৭ জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। এই পরীক্ষার ফল ১৮৫৭ ইং ২রা মে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় ৫০% এর উপর যাঁহারা নম্বর পাইয়াছিলেন তাঁহারা প্রথম বিভাগে, এবং ৫০% এর নিম্নে অথচ ২৫% মধ্যে যাঁহারা নম্বর পাইয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১৮৬০ ইং বাংলা পাঠ্য গ্রন্থ নির্দেশ করিয়া যথাসম্ভব সত্বর বাংলা পাঠ্য সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে ১৮৫৮ ইং ৫ই জুন তারিখে ফ্যাকাল্‌টি অব আর্টস বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থ মুদ্রণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যন্ত বহু সঙ্কলন গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে উপরি-উল্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণের কথা স্মরণীয়।

প্রথম বি. এ. পরীক্ষা

১৮৫৮ ইং

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের জন্য গঠিত অস্থায়ী কমিটির ১৮৫৭ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পঞ্চম অধিবেশনে ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ ইং বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা নির্ধারিত হয়। ১৮৫৮ ইং বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর ৪ বৎসরের মধ্যে কেহ বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারিবেন না এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এই আইন অনুসারে বি. এ. পরীক্ষা লইতে হইলে ১৮৬১ ইং পূর্বে পরীক্ষা লওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু সর্বপ্রথম পরীক্ষা বলিয়া ইহা স্থির হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ৩ বৎসর পর্যন্ত এই আইন বলবৎ হইবে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এমন সার্টিফিকেট দেখাইতে পারিলে যে-কেহ এই বি.এ. পরীক্ষা দিবার অধিকারী হইবেন। এফ. এ. [F.A. First Arts] পরীক্ষা ১৮৬০ ইং পূর্বে প্রচলিত হয় নাই।

১। পরীক্ষণীয় ভাষা—বি. এ. পরীক্ষার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দুইটি ভাষার পরীক্ষা দিতে হইত। তন্মধ্যে একটি ইংরাজী, অপরটি—গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া ও বর্মী ভাষার মধ্যে যে কোন একটি।

২। পরীক্ষাকেন্দ্র—একমাত্র কলিকাতা।

৩। পরীক্ষার ফি—২৫ টাকা ধার্য হইয়াছিল।

CENTRAL LIBRARY

৪। পরীক্ষার পাঠ্য (বাংলা)—বত্রিশসিংহাসন, পুরুষপরীক্ষা, মহাভারত ১ম হইতে ৩য় পর্ব।

৫। পরীক্ষার কার্যসূচী—বি. এ. পরীক্ষা ৫ই এপ্রিল ১৮৫৮ ইং সোমবার আরম্ভ হইয়াছিল। বাংলা পরীক্ষা ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে গৃহীত হয়।

৬। পরীক্ষার সময়—পূর্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে ১১০ ঘটিকা।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৪।০ ঘটিকা।

৭। পরীক্ষক—(বাংলা পরীক্ষার)—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৮। পরীক্ষার ফল—১৮৫৮ ইং গৃহীত প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় মোট ১৩ জন ছাত্র পরীক্ষার ফি জমা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৩জন পরীক্ষা দেন নাই। যে ১০ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে মাত্র দুইজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু*। পরীক্ষোত্তীর্ণ এই দুই জন ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু ষষ্ঠ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইঁহারা মাত্র ৭ নম্বরের জন্য এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় পরীক্ষকবৃন্দ ইঁহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ ঘোষণা করেন। এই জাতীয় অনুগ্রহ পরবর্তীকালে আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষার ফল ১৮৫৮ ইং ১৯শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যেক পরীক্ষককে ৬০০ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

স্নাতকোত্তর-পর্যায়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির গোড়ার কথা

১৮৯১ ইং ২৬শে জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষাসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এই বৎসরের ১লা মার্চ তারিখে লিখিত স্যার আশুতোষের পত্রে এফ. এ (First Arts) বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষাকে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। পরবর্তী জুলাই মাসে Arts Faculty তে এই প্রস্তাব বিবেচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা গৃহীত হয় নাই। চারি বৎসর পরে ১৮৯৬ ইং ২৮শে মার্চ তারিখে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে এই প্রস্তাব এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সমিতির বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই বৎসর দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০২ ইং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মন্তব্য করেন যে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাশিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত অবহেলিত হইয়াছে। ফলে বহু স্নাতকের মাতৃভাষা জ্ঞান অতি স্বল্প ও অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল। ভারতীয় ভাষাশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিবার জন্য কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় ছিল—(১) স্নাতক পরীক্ষা (বি. এ.) পর্যন্ত ভারতীয় ভাষায় রচনাপরীক্ষা আবশ্যিক করিতে হইবে। তবে ইহা পড়াইবার কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে ১৮৫৭ ইং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

(২) ইংরাজীর সঙ্গে ভারতীয় ভাষাসমূহকে এম. এ. পরীক্ষার বিষয় করিতে হইবে। (৩) ভারতীয় ভাষা বিষয়ে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় যথোপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা করিবেন। (৪) ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য পুরস্কার দিতে হইবে। ১৯০৬ ইং বিধিবদ্ধ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সর্বপ্রথম প্রবেশিকা হইতে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের স্ব স্ব মাতৃভাষা জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এই পরীক্ষায় ছাত্রদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান কতটুকু তাহা যাচাই করা হইত না। তাঁহারা মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য গুছাইয়া লিখিতে পারেন কি না তাহাই মাত্র পরীক্ষা করা হইত। ফলে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা পঠন-পাঠনের কোন অদূর সম্ভাবনা সেদিন লক্ষ্য করা যায় নাই। ১৯০৯ ইং দীনেশচন্দ্র সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বক্তৃতা (Special University Readership) দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। এই বৎসরের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য স্যার আশুতোষ প্রসঙ্গতঃ দীনেশচন্দ্রের এই বক্তৃতামালার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৯১২ ইং স্যার আশুতোষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতামালা সৃষ্টি করেন।* এই বৎসরের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লর্ড হার্ডিঞ্জ দীনেশচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তৃতামালার প্রশংসা করেন এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের প্রদর্শিত আদর্শ অনুসৃত হইবে এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ ইং রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতা দিবার জন্য দীনেশচন্দ্র আহূত হইয়াছিলেন।† তিনি এই সময় হইতেই বাংলায় এম. এ. প্রবর্তনের জন্য স্যার আশুতোষকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। স্যার আশুতোষ ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ ইং পর্যন্ত ১০ বৎসরের মধ্যে দীনেশচন্দ্রের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনামূলক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করাইয়া লইয়াছিলেন। যথা: (১) ইংরাজী ভাষায়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (*History of Bengali Language and Literature*) রচনাকাল ১৯০৯, মুদ্রণ কাল ১৯১১ (২) বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (*Typical Selections from old Bengali Literature*) মুদ্রণকাল ১৯১৬ ইং (৩) চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ (*Chaitanya and His Companions*) রচনাকাল ১৯১৩-১৬, মুদ্রণকাল ১৯১৭ ইং (৪) *Glimpses of Bengali Life* রচনাকাল ১৯১৫, মুদ্রণকাল ১৯২৫ ইং। (৫) বাংলা রামায়ণ (*The Bengali Ramayanas*) রচনাকাল ১৯১৬, মুদ্রণকাল ১৯২০ (৬) বাংলার লোকসাহিত্য (*The Folk Literature of Bengal*) রচনাকাল ১৯১৭, মুদ্রণকাল ১৯২০ প্রভৃতি ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি গ্রন্থ ১৯১৮ ইং মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ফলে স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা পঠন-পাঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল।

এদিকে ১৯১৬ ইং তদানীন্তন উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার্ষিক সমাবর্তন ভাষণে প্রসঙ্গত বলেন যে বাংলা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা স্নাতক স্তর পর্যন্ত হইয়াছে বটে কিন্তু অনেকে অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে স্নাতকোত্তর স্তরে উন্নীত করার কথা চিন্তা করিতেছেন। ১৯১৭ ইং ২৬ জুন ভারত সরকার স্নাতকোত্তর সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুমোদন করেন।

* দীনেশচন্দ্রের এই বক্তৃতামালা *History of Bengali Language and Literature* নামে সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এক গ্রন্থরূপে ১৯১১ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

† এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ প্রথম এশিয়াবাসী হিসাবে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও চর্চার ইতিহাসে এই বৎসরটি বিশেষ চিহ্নিত হইয়া আছে।

CENTRAL LIBRARY

১৯১৭ ইং ১লা সেপ্টেম্বর স্নাতকোত্তর শিক্ষা পরিচালনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন ক্রমে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯১৯ ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বিধান অনুমোদন করেন। ১৯১৯ ইং ১০ই এপ্রিল তারিখের স্নাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষা বিভাগের পরিচালন সমিতির অধিবেশনে প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হইয়াছিল। ১৯১৯ ইং ১লা জুন হইতে নবগঠিত ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ.র পাঠ্যক্রম অনুসারে পঠন-পাঠনের সূত্রপাত হয়। প্রথম বৎসর বাংলা বিভাগের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩২ জন। ১৯১৯ ইং ভারতীয় ভাষা বিভাগের জন্য যে পাঠ্যক্রম গৃহীত হইয়াছিল তাহা ১৯৩৯ ইং পর্যন্ত মোটামুটি অনুসৃত হইয়াছিল। ১৯৪০ ইং সর্বপ্রথম নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রধান ভাষা অসমীয়া এম. এ. পরীক্ষায় গৃহীত হইয়াছিল। পর বৎসর ১৯৪১ ইং হইতে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া ও উর্দু ভাষার পরীক্ষা নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে গৃহীত হয়। ১৯৫৮ ইং ২৮শে এপ্রিল স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের পরিচালন সমিতি 'ভারতীয় ভাষাবিভাগ' (Indian Vernacular Department) নাম পরিবর্তন করিয়া 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ' (Modern Indian Languages Department) নামকরণ করেন। ঐ সময় ভারতীয় ভাষাবিভাগের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করিয়া 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগে'র পাঠ্যক্রম গৃহীত হয়।

১৯১৯ ইং ১০ই এপ্রিল তারিখের ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির অধিবেশনে ১৯২০ এবং ১৯২১ ইং জন্য প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা অনুমোদিত হইয়াছিল।

প্রধান ভাষা বাংলার পাঠ্যক্রম

১৯২০—১৯২১

প্রথম পত্র—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ হইতে ১৮৫০ ইং পর্যন্ত। বিশেষ যুগ—ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য। পঠনীয় গ্রন্থ—

(১) বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস—দীনেশচন্দ্র সেন

(২) মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য— ঐ

(৩) চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ— ঐ

দ্বিতীয় পত্র—(১) বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭—১০১

(২) ময়নামতীর গান—নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত)

তৃতীয় পত্র—(১) চণ্ডীমঙ্গল—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ

(২) মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চতুর্থ পত্র—(১) বাংলাসাহিত্যের বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তন, ১৮০০-১৮৫৭

(২) বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ১৮৫৭-১৮৮০

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাঠ্যগ্রন্থের উপর ৭৫ নম্বর এবং পাঠ্যবহির্ভূত অংশের উপর ২৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকিবে। পাঠ্যগ্রন্থের উপর নিম্নলিখিত বিষয়ক প্রশ্ন থাকিবে—(ক) পাঠ্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভাষা, ঐতিহাসিক,

CENTRAL LIBRARY

ভৌগোলিক, সমালোচনামূলক ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে। (খ) পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ ও ছন্দ সংক্রান্ত, (গ) পাঠ্যগ্রন্থের গ্রন্থকারের জীবনী ও তাঁহার সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র—বিকল্প ভাষা

সপ্তম পত্র—মৌলিক ভাষা

অষ্টম পত্র—ভাষাতত্ত্ব

বাংলা বিভাগে কে কি পড়াইতেন

১৯২০ ইং ২৯শে মার্চ তারিখের ভারতীয় ভাষাবিভাগের পরিচালন সমিতির অধিবেশনে উক্ত বিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলীর কে কি পড়াইবেন তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যথা—

প্রথম পত্র—দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.

দ্বিতীয় পত্র—দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট., ও বসন্তরঞ্জন রায়

তৃতীয় পত্র—যোগেন্দ্রনাথ বসু, বি. এ. (মেঘনাদবধ), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. (চণ্ডীমঙ্গল)

চতুর্থ পত্র—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. (বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রভাব)

সুশীলকুমার দে, এম. এ. (বাংলা গদ্যরীতি)

পঞ্চম পত্র ও ষষ্ঠ পত্র—বিকল্প ভাষা

সপ্তম পত্র—মৌলিক ভাষা

অষ্টম পত্র—মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল. এবং

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.

পরীক্ষা

১৯২০ ইং 'ভারতীয় ভাষা বিভাগের' প্রধানভাষা বাংলার প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল।

১৯২০ হইতে ১৯২৩ ইং পর্যন্ত এই চার বৎসরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে গিয়া কোন ছাত্র কোন বিকল্প ভাষা লইয়াছিলেন তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৯২৪ ইং পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে গিয়া এই রীতি পরিত্যক্ত হয়।

১৯২০ এবং ১৯২১ ইং এম. এ. পরীক্ষার প্রত্যেক প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষকের নাম ছাপা হইত। ১৯২২ ইং হইতে এই রীতি পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২ ইং কেলেণ্ডারে **Indian Vernacular**-এর প্রশ্নপত্রসমূহ ছাপিতে গিয়া এক দীর্ঘ দক্ষিণাবর্ত দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে সকল পরীক্ষকের নাম পর পর এক সঙ্গে ছাপা হইয়াছিল। প্রথম হইতে 'ভারতীয় ভাষা' বিভাগের বাংলা প্রধান ভাষা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরাজীতেই করা হইত। ১৯২২ ইং অর্থাৎ পরীক্ষার তৃতীয় বৎসরে তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশ্ন বাংলা ভাষায় করা হইয়াছিল। শুধু **Try any two of the following Groups A.B.C.**—এইমাত্র ইংরাজীতে লেখা ছিল। প্রশ্নপত্র পাঠে মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ রচনা করিয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

প্রথম বৎসরের (১৯২০ ইং) সকল পরীক্ষার্থী প্রাইভেট (ন. ক.) Non-Collegiate পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর হইতে নিয়মিত কলেজিয়েট (Collegiate) ছাত্রের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তবে প্রতিবৎসরই 'কলেজিয়েট' ও 'নন-কলেজিয়েট' ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

পরীক্ষক

১৯২০ ইং ভারতীয় ভাষা বিভাগে প্রধান ভাষা বাংলার প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি স্যার আশুতোষ উক্ত সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯২০ ইং ১২ই জুন তারিখে পরীক্ষক মনোনীত করিয়াছিলেন। পরীক্ষকের নামের তালিকা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পরীক্ষক নির্বাচন করিতে গিয়া Internal (আভ্যন্তরীণ) ও External (বহিরঙ্গ) উভয়বিধ পরীক্ষকই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরীক্ষকদের নামের তালিকায় প্রথম নাম ছিল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে. টি., সি. আই. ই. র। নিম্নে ১৯২০ এবং ১৯২১ এই দুই বৎসর কে কোন্ বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন তাহা প্রশ্নপত্রে মুদ্রিত নাম অবলম্বনে প্রদর্শিত হইল।

১৯২০	১৯২১
প্রথম পত্র, প্রথমার্ধ—দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.	দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.
ঐ দ্বিতীয়ার্ধ—অভয়কুমার গুহ, এম. এ., পি. এইচ. ডি.	শশাঙ্কমোহন সেন, এম. এ., পি. এইচ. ডি.
দ্বিতীয়পত্র, প্রথমার্ধ—দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.	দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.
ঐ দ্বিতীয়ার্ধ—বসন্তরঞ্জন রায়	বসন্তরঞ্জন রায়
তৃতীয়পত্র, প্রথমার্ধ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ.	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ.
ঐ দ্বিতীয়ার্ধ—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
চতুর্থ পত্র, প্রথমার্ধ—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.	দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.
ঐ দ্বিতীয়ার্ধ—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.	প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র—বিকল্পভাষা	
অসমীয়া, পঞ্চম পত্র—সত্যনাথ বরা, বি. এল.	অম্বিকানাথ বরা, এম. এ.
ঐ ষষ্ঠ পত্র—অম্বিকানাথ বরা, এম. এ.	
ওড়িয়া, পঞ্চম পত্র—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল	বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল.
ঐ ষষ্ঠ পত্র—মধুসূদন দাস, সি. আই. ই., এম. এ., বি. এল.	ঐ
হিন্দী, পঞ্চম পত্র—ব্রজমোহন ঠাকুর, এম. এ.	গঙ্গাপতি সিং, বি. এ.
ঐ ষষ্ঠ পত্র—গঙ্গাপতি সিং, বি. এ.	ঐ

CENTRAL LIBRARY

১৯২০		১৯২১
গুজরাটী	×	আই. জে. এস. তারাপরওয়ালা, বি. এ., পি. এইচ. ডি.
তামিল	×	পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেদান্ত বিশারদ
তেলুগু	×	কে. ব্রহ্মচারী, বি. এ.
মৈথিলী	×	গঙ্গাপতি সিং, বি. এ.
সপ্তম পত্র, মৌলিকভাষা		
পালি—	বেণীমাধব বড়ুয়া, এম. এ., ডি. লিট. শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.	শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.
প্রাকৃত—	মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.	মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
ফার্সী—	আগা মোঃ কাজিম সিরাজী	আগা মোঃ কাজিম সিরাজী
অষ্টম পত্র, বাংলা ভাষাতত্ত্ব		
	প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল.	বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল. দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.

উপরে উদ্ধৃত ১৯২০ ইং পরীক্ষকদের তালিকায় স্যার আশুতোষের নাম নাই। কোন প্রশ্নপত্রের শীর্ষেও তাঁহার নাম নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় তিনি কোন প্রশ্নপত্র রচনা না করিলেও পরীক্ষক বা মডারেটার হিসাবে এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম বৎসরের পরীক্ষার পরীক্ষক হিসাবে কে কত টাকা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন তাহার এক তালিকা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন,		১১৫'০০
অভয়কুমার গুহ		৫৭'৫০
বসন্তরঞ্জন রায়	—	৫৭'৫০
* রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	—	৫৭'৫০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	—	৫৭'৫০
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	—	১৩৫'০০
* স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	—	৩৭'৫০
গঙ্গাপতি সিং	—	১১৫'০০
* সত্যনাথ বরা	—	৯০'০০
অম্বিকানাথ বরা	—	৯০'০০
বিজয়চন্দ্র মজুমদার	—	২১৭'০০
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র	—	৫৬'০০
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	—	৫৭'৫০
* বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	৫৭'৫০

CENTRAL LIBRARY

আগা মোঃ কাজিম সিরাজী	—	৭৭'৫০
ব্রজমোহন ঠাকুর	—	৭৫'০০
* বেণীমাধব বড়ুয়া	—	৫৬'২৫
* রমাপ্রসাদ চন্দ	—	

১৯১৯ ইং স্থাপিত ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রধান ভাষা বাংলার প্রথম এম. এ. পরীক্ষা ১৯২০ ইং গৃহীত হইয়াছিল। ফলে পঞ্চবিংশতিতম পরীক্ষা ১৯৪৪ ইং গৃহীত হয়। ১৯২০ হইতে ১৯৪৪ ইং মধ্যে মোট ৮৭৮ জন ছাত্র বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৫৭ জন প্রথম বিভাগে, ৫৪৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৭২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই ২৫ বৎসরের শতকরা গড় হিসাবে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ১৭'৮৮, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৬২'৫২, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ১৯'৫৯। নিম্নে এই ২৫ বৎসরের মধ্যে কোন্ বৎসর কত জন ছাত্র কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল—

প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা

বৎসর	মোট উত্তীর্ণ সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯২০	১৬	৭	৯	
১৯২১	২০	১৬	৪	
১৯২২	২০	৮	১১	১
১৯২৩	১৮	১২	৬	
১৯২৪	১২	৭	৫	
১৯২৫	১২	৭	৪	১
১৯২৬	১৩	৭	৬	
১৯২৭	২৭	৭	১৬	৪
১৯২৮	১৯	৫	১০	৪
১৯২৯	১৩	৪	৮	১
১৯৩০	১৮	৪	১১	৩
১৯৩১	২০	৪	১২	৪
১৯৩২	১৬	১	১১	৪
১৯৩৩	১৮	৪	১০	৪
১৯৩৪	৩১	৯	১৮	৪
১৯৩৫	১৭	৩	১০	৪

* উপরের তালিকায় তারকা চিহ্নিত নামগুলি External পরীক্ষকের বুত্তি হইবে। এই তালিকায় শেষ নাম রমাপ্রসাদ চন্দের। কিন্তু তিনি কত টাকা পাইয়াছিলেন তাহার নির্দেশ নাই। কোন প্রকরণের শীর্ষেও তাঁহার নাম নাই।

CENTRAL LIBRARY

বৎসর	মোট উত্তীর্ণ সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	
১৯৩৬	৩৭	৫	২৩	৯	
১৯৩৭	৩৪	৫	২২	৭	
১৯৩৮	৩৫	৬	২৫	৫	
১৯৩৯	৫৮	১৮	৩৪	৬	
১৯৪০	১০০	৭	৭৪	১৯	
১৯৪১	৬৬	১	৪৬	১৯	নূতন পাঠ্যক্রম
ঐ	১৯	১	১৫	৩	পুরাতন পাঠ্যক্রম
১৯৪২	৬৮	৩	৪৭	১৮	
১৯৪৩	৬৮	২	৪৭	১৯	
১৯৪৪	১০৩	৪	৬৫	৩৪	
	৮৭৮	১৫৭	৫৪৯	১৭২	

নিম্নে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ মোট ১৫৭ জন ছাত্রের নাম পর পর নির্দেশ করা হইল। সম সংখ্যক নম্বর প্রাপক ছাত্রদের নামের বামপাশে দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ছাত্রের নামের পাশে "ন. ক."—লেখা আছে তাঁহারা 'নন্ কলেজিয়েট' ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথম ৩ বৎসরের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের পাশে কে কোন 'বিকল্প ভাষা' সহ পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। বিকল্প ভাষা সমূহের নামসংকেত: অ—অসমীয়া, উ—উর্দু, ও—ওড়িয়া, কা—কানাড়ী, গু—গুজরাটী, তা—তামিল, তে—তেলুগু, মা—মারাঠী, মাল—মালয়ালম, মৈ—মৈথিলী, সিং—সিংহলী, হি—হিন্দী। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা না দিয়া কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র হিসাবে বাংলা এম.এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের পাশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সেই সেই কলেজের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং আশুতোষ কলেজে স্নাতকোত্তর বাংলা পড়াইবার বিশেষ ব্যবস্থা কয় বৎসর ছিল।

প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামসূচী।

১৯২০ ইং

প্রিয়রঞ্জন সেন, ও (ন. ক.)
বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক, ও ঐ
রমেশচন্দ্র বসু, হি ঐ
মণীন্দ্রমোহন বসু, অ ঐ
রাখালরাজ রায়, হি ঐ
ব্রজগোপাল দত্তরায়, অ (ন. ক.)
রামরেণু আচার্য, হি ঐ

১৯২১ ইং

সুধালতা দোয়ারা, অ (ন. ক.)
বিভূতিভূষণ কাঁঠাল, তে

CENTRAL LIBRARY

মনোরঞ্জন চৌধুরী, হি
শচীনন্দন পাল, মৈ
বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, ও
যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, অ
যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, মৈ (ন. ক.)
শচীন্দ্রলাল রায়, মৈ
বিশ্বপতি চৌধুরী, মৈ (ন. ক.)
দেবেন্দ্রকুমার চন্দ, মৈ (ন. ক.)
দীনবন্ধু মজুমদার, মৈ (ন. ক.)
প্রবোধচন্দ্র সেন, হি
সুখলতা দোয়ারা, অ (ন. ক.)
নৃপেন্দ্রলাল দত্ত, অ
প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, হি (ন. ক.)
সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মৈ (ন. ক.)

১৯২২ ইং

শচীন্দ্রনাথ রুদ্র, হি
অনাথবন্ধু সেন, কা
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মৈ (ন. ক.)
মোক্ষদাচরণ চক্রবর্তী, মৈ
নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, মাল
বঙ্কিমচন্দ্র সরকার, মৈ (ন. ক.)

১৯২৩ ইং

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সিং *
[প্রেসিডেন্সী কলেজ]
অতুলচন্দ্র ঘটক, অ (ন. ক.)
নরেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র, ও
পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মৈ (ন. ক.)
দয়ানন্দ চৌধুরী, অ
শৌরীন্দ্রকুমার চৌধুরী, অ (ন. ক.)
নৃপতিকান্ত রায়, সিং
আশাতরু চৌধুরী, মাল
[প্রেসিডেন্সী কলেজ]
আশুতোষ ঘোষাল, তা
কুমুদনাথ গুপ্ত, মৈ
পরিমল গোস্বামী, মৈ (ন. ক.)
সুহৃদকুমার দেব, মৈ (ন. ক.)

১৯২৪ ইং

রাধারমণ চক্রবর্তী (ন. ক.)
লক্ষ্মীধর শর্মা (ন. ক.)
সুনীতিবালা চন্দ (ন. ক.)
তারাপদ রাহা
শশাঙ্কমোহন চৌধুরী
মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (ন. ক.)
বিধুভূষণ দত্ত

১৯২৫ ইং

জনার্দন চক্রবর্তী
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (ন. ক.)
বিনায়ক সান্যাল (ন. ক.)
কুমুদকান্ত বিশ্বাস
হলিরাম ডেকা (ন. ক.)
সুরেশচন্দ্র মজুমদার
শ্যামাপদ চক্রবর্তী (ন. ক.)

১৯২৬ ইং

জে. হেলেন রাওলাণ্ডস্ (ন. ক.)
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ন. ক.)
ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
সত্যনারায়ণ সেন (ন. ক.)
সুশীলকুমার বসু
কুঞ্জলাল দত্ত (ন. ক.)
খগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (ন. ক.)

* তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে "গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক" প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

১৯২৭ ইং

কালীপদ সেনগুপ্ত
পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস (ন. ক.)
{ শশাঙ্কশেখর বাগচী (ন. ক.)
{ সোণামণি সিংহ (ন. ক.)
ননীগোপাল চৌধুরী
অরুণকান্তি রায়
শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

১৯২৮ ইং

{ হেমন্তকুমার চক্রবর্তী *
{ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মাখনলাল সাউ
মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (ন. ক.)

১৯২৯ ইং

{ মহাদেব রায়
{ এনামুল হক মোহাম্মদ
তারাপদ মুখোপাধ্যায় (ন. ক.)
অজয়কুমার ভট্টাচার্য

১৯৩০ ইং

আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (ন. ক.)
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[স্কটিশচার্চ কলেজ]

১৯৩১ ইং

বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ (ন. ক.)
হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী
সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় (ন. ক.)
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

১৯৩২ ইং

প্রমথনাথ বিশী (ন. ক.)

১৯৩৩ ইং

মহেশ্বর দাস (ন. ক.)
মনোমোহন ঘোষ (ন. ক.)
জীবনকৃষ্ণ শেঠ
রমেন্দ্রনাথ রায়

১৯৩৪ ইং

কল্যাণী চক্রবর্তী
সত্যেন্দ্রচন্দ্র দেবমজুমদার
ইলাকণা গুপ্ত
[স্কটিশচার্চ কলেজ]
উপেন্দ্রকুমার দাস (ন. ক.)
ভূপেন্দ্রনাথ দাস (ন. ক.)
সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (ন. ক.)
উমাপদ ভট্টাচার্য
মাখনলাল রায়চৌধুরী
তারাপদ ভট্টাচার্য (ন. ক.)

১৯৩৫ ইং

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
সুখময় চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৬ ইং

বিভূতিভূষণ চৌধুরী
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
কল্যাণী মল্লিক (ন. ক.)
ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩৭ ইং

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য (ন. ক.)
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (ন. ক.)

* তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে 'মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে প্রবন্ধ দাখিল করেন।

CENTRAL LIBRARY

সুধীরচন্দ্র গুপ্ত
আশালতা দত্ত
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
(আশুতোষ কলেজ)

১৯৩৮ ইং

বিন্দুবাসিনী দেব (ন. ক.)
{ বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য
{ মুরারিমোহন সেনগুপ্ত (ন. ক.)
ভবানীগোপাল সান্যাল (ন. ক.)
হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য
সতী গুপ্ত

১৯৩৯ ইং

ক্ষুদিরাম লাই
সুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী
{ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
{ রাধারমণ দাস
শিশিররঞ্জন কর (ন. ক.)
সুধাংশুভূষণ দে
কমলা দেবী
মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য
মোঃ ইদ্রিস্ আলী
{ প্রতিভাময়ী গুপ্ত (ন. ক.)
{ নারায়ণচন্দ্র রায়
হরিপদ চক্রবর্তী (ন. ক.)
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল (ন. ক.)
{ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (ন. ক.)
{ ধীরানন্দনাথ ঠাকুর
বিমলশঙ্কর ধর
সুবোধরঞ্জন রায়
অমিয়নাথ চক্রবর্তী (ন. ক.)

১৯৪০ ইং

হরপ্রসাদ মিত্র
সুকুমার দে (আশুতোষ কলেজ)
শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (ন. ক.)
তারকপদ চট্টোপাধ্যায় (ন. ক.)
বিজয়া সেনগুপ্ত (ন. ক.)
{ নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
{ শান্তিপ্রভা দাশগুপ্ত (ন. ক.)

১৯৪১ ইং

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ন. ক.)
(নূতন পাঠ্যক্রম)
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (ন. ক.)
(পুরাতন পাঠ্যক্রম)

১৯৪২ ইং

মদনমোহন কুমার
অমিয়কুমার সেন (স্কটিশচার্চ কলেজ) *
হেমেন্দ্রনাথ মিত্র (ন. ক.)

১৯৪৩ ইং

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলিমা রায়চৌধুরী (ন. ক.)

১৯৪৪ ইং

অসিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় †
দেবীপদ ভট্টাচার্য
মনোজিৎ বসু
দীনেশচন্দ্র ঘটক (ন. ক.)

* পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রের পরিবর্তে 'বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিসর্গ' বিষয়ে প্রবন্ধ দাখিল করেন।

† পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রের পরিবর্তে 'রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' বিষয়ে প্রবন্ধ দাখিল করেন।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী

১৯১৯ ইং ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখের স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের পরিচালন সমিতির অধিবেশনে প্রস্তাবিত ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ১১ জনকে ১৯২০ ইং ৩১ মে পর্যন্ত লেকচারার রূপে নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম.এ ২। যোগেন্দ্রনাথ বসু, এম.এ. ৩। রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ. ৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ. ৫। সুশীলকুমার দে, এম.এ. ৬। মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম.এ., পি. এইচ. ডি. ৭। ডি আর. ভাণ্ডারকর, এম. এ. ৮। আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা বি. এ., পি-এইচ. ডি. ৯। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল. ১০। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ১১। ডঃ আবদুল্লা আলমামুন সারওয়ার্দি, এম. এ., পি-এইচ. ডি.। কিন্তু যাঁহারা ১৯২০ ইং ৩১ মে পর্যন্ত এই নবস্থাপিত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া বেতন লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনজনের নাম নাই। ১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ২। সুশীলকুমার দে, ৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুশীলকুমার দে ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই সময় উচ্চশিক্ষার জন্য লণ্ডনে ছিলেন। ১৯১৯ ইং প্রধান ভাষা বাংলা পড়াইয়াছিলেন মাত্র ৬ জন—১। দীনেশচন্দ্র সেন, ২। বসন্তরঞ্জন রায়, ৩। যোগেন্দ্রনাথ বসু, ৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। অভয়কুমার গুহ, ও ৬। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। দ্বিতীয় বর্ষে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং হেমন্তকুমার সরকারের এবং তৃতীয় বর্ষে শশাঙ্কমোহন সেন ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম পাইতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক

১৯২৫ ইং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-সমিতির অনুমোদন ক্রমে সিনেট রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ, ডি. লিট. কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পদে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করেন। ১৯২৬ ইং ১লা জানুয়ারী হইতে এই অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর ১৯৩২ ইং ৩১ মে পর্যন্ত তাঁহার কার্যকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ১৯৩২ ইং ১লা জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পদে (University Professorship of Bengali) অবসর গ্রহণ করিলে ১লা আগষ্ট হইতে দুই বৎসরের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকে সাময়িক *(Part time) অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়; এই নিযুক্তিই পরে বিশেষ †(Special) অধ্যাপকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

১৯৩১ ইং ১২ জুন তারিখের সিণ্ডিকেট 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ'কে—'রামতনু লাহিড়ী প্রফেসারশিপে' উন্নীত করিয়া ঐ পদের শর্তাবলী স্থির করিয়া দেন। রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে প্রথম নিযুক্ত হন রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ। তিনি ১৯৩২ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

* Calendar 1956. P. 133.
† Hundred Years of the University of Calcutta 1957. p. 433

CENTRAL LIBRARY

নিম্নে ১৯১৯ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত যাহারা প্রধান ভাষা বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের এক বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। প্রত্যেক নামের পাশে কে কত বৎসর এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাহাও মোটামুটি দেখান হইয়াছে—

প্রধান ভাষা বাংলার বর্ণানুক্রমিক অধ্যাপক সূচী (১৯১৯—১৯৪৪)

অভয়কুমার গুহ (গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা) ১৯১৯—১৯২০
খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ. রায়বাহাদুর (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) ১৯৩২—১৯৪৪
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. (লেকচারার) ১৯১৯—১৯২৪
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (লেকচারার) ১৯৩১—১৯৪৪
দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট., রায়বাহাদুর (রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো) ১৯১৯—১৯২৫
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক) ১৯২৬—১৯৩২
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম. এ. (সহকারী লেকচারার) ১৯৪১—১৯৪২
প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ., পি. আর. এস. (লেকচারার) ১৯২৬—১৯৪৪
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. (লেকচারার) ১৯১৯—১৯২৩
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ (লেকচারার) ১৯২৪—১৯২৫
বসন্তরঞ্জন রায়, বিদ্বদ্বল্লভ (লেকচারার) ১৯১৯—১৯৩১
বিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ. (লেকচারার) ১৯৩২—১৯৪৪
মণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ. (লেকচারার) ১৯৩১—১৯৪৪
মনোমোহন ঘোষ, এম. এ. (সহকারী লেকচারার) ১৯৪২—১৯৪৩
মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী, এম. এ. (সহকারী লেকচারার) ১৯৪১—১৯৪২
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এম. এ. (লেকচারার) ১৯২০
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ. (সহকারী লেকচারার) ১৯৪১—১৯৪২
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. (সহকারী লেকচারার) ১৯৩৯—১৯৪১
যোগেন্দ্রনাথ বসু, বি. এ. (লেকচারার) ১৯১৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এন. এল. (বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অধ্যাপক) ১৯৩২—১৯৩৪
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (পণ্ডিত) (লেকচারার) ১৯২২—১৯২৭
শশাঙ্কমোহন সেন, বি. এল. (গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা) ১৯২০—১৯২৭
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম.এ., পি.এইচ. ডি. (সহকারী লেকচারার) ১৯৩৯—১৯৪০ (লেকচারার) ১৯৪১—১৯৪৪
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল. (লেকচারার) ১৯২৪—১৯২৭, ১৯৩১
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট. (লেকচারার) ১৯২৩—১৯৪৪
সুশীলকুমার দে, এম. এ. (লেকচারার) ১৯১৯
হেমন্তকুমার সরকার, এম. এ. (লেকচারার) ১৯২০

CENTRAL LIBRARY

অধ্যাপকমণ্ডলীর বেতন-হার

বর্তমানে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের সঙ্গে অর্ধশতাব্দী পূর্বের উক্ত বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীর বেতনের হারের পার্থক্য অনেকখানি। ১৯১৯ ইং ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মোট ২১ জনকে বিভিন্ন ভাষা অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই ২১ জনের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন মোট ৩০০ টাকা করিয়া নির্দিষ্ট ছিল। এই ৩০০ টাকা আবার ৭৫ টাকা করিয়া সমান ৪ কিস্তিতে দেওয়া হইয়াছিল। ১লা জুন ১৯১৯ হইতে ৩১ মে ১৯২০ পর্যন্ত এই প্রথম বর্ষ। এই প্রথম বর্ষে যে ২১ জনকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে বাংলা ভাষার জন্য ৪ জন—(১) দীনেশচন্দ্র সেন, (২) বসন্তরঞ্জন রায়, (৩) যোগেন্দ্রনাথ বসু, (৪) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত অসমীয়ার জন্য (৫) অম্বিকানাথ বরা, উর্দুর জন্য (৬) ডক্টর এ. সারওয়ার্দি, ওড়িয়ার জন্য (৭) বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কানাড়ীর জন্য (৮) পুন আপ্পাজি রাও, গুজরাটীর জন্য (৯) আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা এবং (১০) পণ্ডিত হরগোবিন্দ শেঠ, তামিলের জন্য (১১) মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, তেলুগুর জন্য (১২) কে. রঙ্গাচারী, পালির জন্য (১৩) শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ফার্সীর জন্য (১৪) আগা মোহাম্মদ কাজিম সিরাজী, প্রাকৃতের জন্য (১৫) মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ভাষাতত্ত্বের জন্য (১৬) মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, মারাঠীর জন্য (১৭) ডি. আর ভাণ্ডারকর (১৮) ও পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, মালয়ালমের জন্য (১৯) পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সিংহলীর জন্য (২০) রেভারেণ্ড আর সিদ্ধার্থ এবং হিন্দীর জন্য (২১) ব্রজমোহন ঠাকুরকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১৯২০ ইং ১লা জুন হইতে সকলের বেতন বার্ষিক ৬০০ টাকা স্থির হইয়াছিল। এই সময় হইতে সকলকে মাসিক ৫০ টাকা হারে বেতন দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ছিল। ১৯২০ ইং ১লা জুন হইতে যে কয়জন মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতন পাইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

দীনেশচন্দ্র সেন—রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সদস্য হিসাবে—৩৫০টাকা + ভারতীয় ভাষা বিভাগের জন্য ৫০টাকা
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ—শরৎকুমার লাহিড়ী সহকারী গবেষক—২০০ টাকা
নীলকান্ত দাস—মহারাজ সোনপুর বক্তৃতা—১৫০ টাকা
অভয়কুমার গুহ—গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা—১০০ টাকা
গঙ্গাপতি সিং—টঙ্কনাথ চৌধুরী বক্তৃতা—১০০ টাকা
পণ্ডিত খুদিদ ঝা—বনেলী শ্রীনগর বক্তৃতা—১০০ টাকা
বসন্তরঞ্জন রায়—১০০ টাকা
শশাঙ্কমোহন সেন—১০০ টাকা
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৭৫ টাকা

১০ বৎসর পরে ১৯৩১ ইং ভারতীয় ভাষাবিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে বসন্তরঞ্জন রায় ২০০ টাকা, নলিনীমোহন সান্যাল ১০০ টাকা, ১৯৩২ ইং মৌলবী নাসির আলিখান ২০০ টাকা, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত ২০০ টাকা, মণীন্দ্রমোহন বসু ২০০ টাকা, বিশ্বপতি চৌধুরী ১২৫ টাকা, মহেশ্বর দাস ১০০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করার ফলে বাংলা বিভাগে তাঁহাকে ২০০-২০-৫০০ টাকা বেতনের 'স্কেল' দেওয়া হইয়াছিল।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে বাংলা এম. এ. পড়াইবার ব্যবস্থা

কলিকাতার একাধিক কলেজে সেই সময় বিভিন্ন বিষয়ে এম. এ. পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। এই রীতি কলিকাতার বাহিরেও কোন কোন কলেজে প্রসারিত ছিল। এক সময় গৌহাটী কটন কলেজে ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে এম. এ. পড়ান হইত। বিভিন্ন বৎসরের এম. এ. বাংলা পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া জানিতে পারিতেছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ এবং আশুতোষ কলেজে স্নাতকোত্তর বাংলা অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল কলেজের ছাত্রেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা শ্রেণীতে পড়িবার সুযোগ পাইতেন। এই সকল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত যথা—১৯২২ ইং প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় এবং ১৯২৩ ইং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩০ ইং স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র হিসাবে মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯৩৭ ইং আশুতোষ কলেজের ছাত্র হিসাবে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. (বাংলা) পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এম. এ. বাংলা পরীক্ষায় তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিলের নিয়ম

স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত প্রধান ভাষা বাংলার নির্বাচিত পাঠ্যক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত কোন অধ্যাপকের অধীনে এই প্রবন্ধ রচনা করিতে হইত। কোন নন্‌কলেজিয়েট ছাত্রকে এই সুযোগ দেওয়া হইত না। সর্বপ্রথম ১৯২২ ইং এই বিকল্প ব্যবস্থা সহ বাংলা এম. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন আবদুল মজিদ। ইনি দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আবদুল মজিদের গবেষণার বিষয় কি ছিল তাহা জানিতে পারি নাই। পরবৎসর ১৯২৩ ইং এই বিকল্প ব্যবস্থা সহ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল—'গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক'। ১৯২৮ ইং 'মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে হেমন্তকুমার চক্রবর্তী, ১৯৪২ ইং 'বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিসর্গ' বিষয়ে স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র অমিয়কুমার সেন এবং ১৯৪৪ ইং 'রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সম্পর্কে অসিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। ইঁহারা যথাক্রমে প্রথম বিভাগে প্রথম, চতুর্থ ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বাংলা বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষা-ভ্রমণ

১৯২৯ ইং ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, দীনেশচন্দ্র সেন বৈষ্ণব সাহিত্যে গবেষণার উদ্দেশ্যে এক দল ছাত্র সহ নদীয়া যাইবার জন্য এককালীন ৫০ টাকা সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে শিক্ষা-ভ্রমণে যাওয়ার ইহাই

CENTRAL LIBRARY

সম্ভবতঃ প্রথম নিদর্শন। শিক্ষাভ্রমণের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই নিবন্ধলেখকেরও হইয়াছিল, তাহা ১৯৪০ সালের কথা। 'ঐ সালের পূজার ছুটীতে বাংলা বিভাগের যে দল শিক্ষা ভ্রমণে যাইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা কোথায় যাইবেন এবং বিভাগীয় শিক্ষক কে সঙ্গে যাইবেন জানিবার জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগের সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রেরা জানাইলেন যে এই নিবন্ধলেখক যাইতে রাজী এবং ছাত্রেরা এইবার বৃন্দাবন যাইতে চান। মিত্র মহাশয় বলিলেন—'তোমরা কোলকাতার নিকটে কোথাও যাও না কেন? তোমাদের বিভাগের ছাত্রেরা সাধারণতঃ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থান এবং শান্তিনিকেতনে যান। তোমরা এতদূরে কেন?' ছাত্রেরা জবাবে বলিল—ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবনে রচিত হইয়াছিল। তাই বাংলাবিভাগের ছাত্রেরা এই পবিত্র তীর্থ দর্শনে আগ্রহী। মিত্র মহাশয় এবার হাসিয়া বলিলেন—'যতিনবাবু তোমাদের দূরে নিয়ে যেতে চান—তাই যেও।' এই দল আগ্রা, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন ও দিল্লী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। আগ্রার তাজমহল দর্শনরত এই দলের ছাত্রদের মনে পড়িল যে ঐ দিনটি 'বিজয়া দশমী'। তাজমহল সংলগ্ন উদ্যানে ছাত্রেরা একে অন্যের সঙ্গে যথাযোগ্য প্রণাম ও প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া কোলাকুলি করিয়াছিলেন। ঐ সময় ঐ উদ্যানে তোলা একখানি ফটো এখনও সেই দিনের স্মৃতি মনে আনন্দ জাগায়। বাংলার বাহিরের কোন কোন হোটেলে ছাত্রদিগকে রুটি খাইতে হইয়াছিল, তাই তাঁহারা ভাত খাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। বৃন্দাবনের নিম্বার্ক আশ্রম দর্শনের জন্য গেলে মহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীধনঞ্জয় দাসজীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি এই নিবন্ধলেখকের পূর্ব পরিচিত। তিনি তখন এক পরিক্রমা শেষ করিয়া বহু সন্ন্যাসী সহ আশ্রমে ফিরিয়াছেন। নিবন্ধলেখককে তাহার ছাত্রদলসহ আশ্রমে প্রসাদগ্রহণের জন্য বলিলে ছাত্রেরা অন্নপ্রসাদ চায় এই কথা মহন্তজীকে জানান হইয়াছিল। সেদিন মধ্যাহ্নে আশ্রমের বিরাট চত্বরে গাছের ছায়ায় সারিবদ্ধভাবে সন্ন্যাসী ও ছাত্রদল প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসিয়া পড়িলেন। ছাত্রদের জন্য অন্নপ্রসাদের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ছাত্রেরা গভীর তৃপ্তির সঙ্গে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া মন্দিরে সাধ্যমত প্রণামী দিয়া প্রসন্ন মনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রধান ভাষা হিন্দী

১৯১৯ ইং সেপ্টেম্বর মাসে জি. ডি. বিরলা স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষাবিভাগে হিন্দীকে অন্যতম প্রধান ভাষারূপে গ্রহণের জন্য ১৫,০০০ টাকা দান করেন। এই দান ১৯১৯ ইং ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের সিনেটে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয়। এক বৎসর পরে ১৯২০ ইং ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির অধিবেশনে হিন্দীকে উক্ত বিভাগের এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম প্রধান ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর তারিখের পরবর্তী অধিবেশনে প্রধান ভাষা হিন্দী এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা অনুমোদিত হইয়াছিল।

এদিকে হিন্দী সাহিত্য সঙ্কলন মুদ্রণের প্রস্তাব ইতঃপূর্বেই গৃহীত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর লালা সীতারাম বি. এ. সাহিত্যরত্ন হিন্দীস্বাকর সম্পাদিত হিন্দী সাহিত্য সঙ্কলন প্রথম খণ্ড ১৯২১ ইং, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২২ ইং, তৃতীয় খণ্ড ১৯২৩ ইং, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৯২৪ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী রচিত—'হিন্দীর উপর ফার্সী প্রভাব' গ্রন্থ ১৯১৩ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নে হিন্দী এম. এ. পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রথম পাঠ্যক্রম যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

প্রধান ভাষা হিন্দীর পাঠ্যক্রম (১৯২১—১৯২২)

প্রথম পত্র (সাহিত্যের ইতিহাস)—হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীনকাল হইতে অর্থাৎ চন্দ বরদাই (১২শ শতক) হইতে বাবু হরিশ্চন্দ্র পর্যন্ত। নির্দিষ্ট বিষয় হিন্দী বৈষ্ণব কবিদের ধর্মীয় সাহিত্য—১৫শ ও ১৬শ শতাব্দী। পঠনীয় গ্রন্থ—

(১) হিন্দী সাহিত্যকা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—মিশ্রবন্ধু
(২) হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যকী উৎপত্তি—পণ্ডিত মহাবীর দ্বিবেদী
(৩) হিন্দী ভাষা—পণ্ডিত বালমুকুন্দ গুপ্ত
(৪) 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার অব হিন্দুস্থান'—স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন
(৫) হিন্দী লিটারেচার—হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া সিরিজ
(৬) তুলসীদাস—গ্রীয়ারসন
(৭) কবীর—উয়েস্‌কট

দ্বিতীয়পত্র (প্রাচীন যুগের নির্দিষ্ট পাঠ্য)—

(১) চন্দ বরদাই—পৃথ্বীরাজ রাসো রামনরেশ ত্রিপাঠী সঙ্কলিত 'কবিতা কৌমুদী'র নির্বাচিত অংশ
(২) সুরদাস—সুরসাগর ১০ম অধ্যায়, বিনয় পত্রিকা
(৩) তুলসীদাস—রামচরিতমানস, রামসুন্দর সঙ্কলিত অংশ
(৪) জয়সী—পদুমাবত্, ১ম খণ্ড
(৫) কেশবদাস—রামচন্দ্রিকা
(৬) রাঠোর পৃথ্বীরাজ—কৃষ্ণরুক্মিনী, সম্পাদক টেসিটোরী, ১ম ভাগ

তৃতীয় পত্র (মধ্য ও বর্তমান যুগের নির্দিষ্ট পাঠ্য)—

(১) ভূষণ গ্রন্থাবলী—সম্মেলন সংস্করণ, নির্বাচিত অংশ
(২) বিহারী সতসই
(৩) মনোবিনোদ—পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক সঙ্কলন
(৪) সুকবি সতসই—পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস
(৫) হরিশ্চন্দ্র—চন্দ্রাবলী

চতুর্থ পত্র (প্রবন্ধ গদ্য)—

(ক) হিন্দী সাহিত্যের বিকাশ (১৮৫০-১৯০০)
(খ) হিন্দী সাহিত্যের উপর ফার্সী প্রভাব

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র—বিকল্প ভাষা, বাংলার অনুরূপ, শুধু হিন্দীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা বাংলা

সপ্তম পত্র—মৌলিক ভাষা বাংলার অনুরূপ

অষ্টম পত্র (ভাষাতত্ত্ব)—

(১) কেলোগ—গ্রামার অব দি হিন্দী লেঙ্গুয়েজ

(২) গ্রেবইস্—গ্রামার অব তুলসীদাস

(৩) হিন্দী ব্যাকরণ-নাগরী প্রচারিণী সভা

এই পাঠ্যক্রম অনুসারে হিন্দী এম. এ. পরীক্ষা সর্বপ্রথম ১৯২১ ইং গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২১ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং মধ্যে মাত্র দুই বৎসর—১৯৩৮ এবং ১৯৪২ ইং প্রধান ভাষা হিন্দীর এম. এ. পরীক্ষার্থী ছিল না। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বৎসরই হিন্দী বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯২৩ ইং একমাত্র নন্-কলেজিয়েট ছাত্ররাই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কলেজিয়েট ছাত্ররূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রকে ১৯২৪ ইং পাইতেছি। ১৯২১ ইং গৃহীত প্রথম হিন্দী এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষকবৃন্দের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম পত্র, প্রথমার্ধ—ব্রজমোহন ঠাকুর, এম. এ.

" দ্বিতীয়ার্ধ—গঙ্গাপতি সিংহ, বি. এ.

দ্বিতীয় পত্র, প্রথমার্ধ—লালা সীতারাম

" দ্বিতীয়ার্ধ—গঙ্গাপতি সিংহ, বি. এ.

তৃতীয় পত্র, প্রথমার্ধ—গঙ্গাপতি সিংহ, বি. এ.

" দ্বিতীয়ার্ধ—ব্রজমোহন ঠাকুর, এম. এ.

চতুর্থ পত্র, প্রথমার্ধ—ডঃ গঙ্গানাথ ঝা, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

" দ্বিতীয়ার্ধ—গঙ্গাপতি সিংহ, বি. এ.

পঞ্চম পত্র ও ষষ্ঠ পত্র (বিকল্প ভাষা) বাংলা এম. এ.র অনুরূপ। শুধু হিন্দীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা—বাংলা

পঞ্চম পত্র (বাংলা)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ.

ষষ্ঠ পত্র (বাংলা)—দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি. লিট.।

সপ্তম পত্র (মৌলিক ভাষা) পালি, প্রাকৃত ও ফার্সীর মধ্যে যে কোন দুইটি ভাষা। বাংলা এম. এ.-র অনুরূপ

অষ্টম পত্র, প্রথমার্ধ—গঙ্গাপতি সিংহ, বি. এ.

" দ্বিতীয়ার্ধ—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল.

১৯২১ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত প্রধান ভাষা হিন্দী এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ৭২ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই কয় বৎসরের শতকরা গড় হিসাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৩৭·৫৫, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫৫·৫৫, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৬·৯৪। নিম্নে কোন্ বৎসর কত জন ছাত্র কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল। এই সঙ্গে পৃথকভাবে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নামও উল্লেখ করা হইল—

CENTRAL LIBRARY

বৎসর	মোট উত্তীর্ণ সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯২১	১	১	—	—
১৯২২	১	—	১	—
১৯২৩	২	১	—	১
১৯২৪	২	২	—	—
১৯২৫	২	১	১	—
১৯২৬	৩	৩	—	—
১৯২৭	৩	২	১	—
১৯২৮	৬	১	৫	—
১৯২৯	১	১	—	—
১৯৩০	৩	—	৩	—
১৯৩১	৩	১	২	—
১৯৩২	১	১		—
১৯৩৩	৪	১	৩	—
১৯৩৪	৩	১	২	—
১৯৩৫	৫	২	২	১
১৯৩৬	৪	১	২	১
১৯৩৭	৬	২	৪	—
১৯৩৮	—	—	—	—
১৯৩৯	৮	৩	৫	—
১৯৪০	৪	১	২	১
১৯৪১ (নূতন পাঠ্যক্রম)	৬	১	৫	—
১৯৪১ (পুরাতন পাঠ্যক্রম)	১	১	—	—
১৯৪২	—	—	—	—
১৯৪৩	১	—	—	১
১৯৪৪	২	—	২	—
	৭২	২৭	৪০	৫

CENTRAL LIBRARY

প্রধান ভাষা হিন্দী এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম

১৯২১ ইং

প্রথম বিভাগ—নলিনীমোহন সান্যাল, বিকল্প—বাংলা (ন. ক.)

১৯২২ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—মহাদেব সিং শর্মা, বিকল্প—উর্দু (ন. ক.)

১৯২৩ ইং

প্রথম বিভাগ—মহাবীর চৌধুরী, বিকল্প -বাংলা (ন.ক.)

তৃতীয় বিভাগ—সুরজপ্রসাদ আওয়াস্থি, বিকল্প—গুজরাটী (ন. ক.)

১৯২৪ ইং

প্রথম বিভাগ—গুরুপ্রসাদ পাণ্ডে (ন. ক.)

শ্যামসুন্দর মল্লিক

১৯২৫ ইং

প্রথম বিভাগ—রামপালত সিং (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ—অনন্ত মিশ্র (ন. ক.)

১৯২৬ ইং

প্রথম বিভাগ—হরিগোবিন্দ চৌধুরী

শিবস্বরূপ বর্মা (ন. ক.)

রামকুমার চৌবে (ন. ক.)

১৯২৭ ইং

প্রথম বিভাগ—যদুনন্দনপ্রসাদ পাণ্ডে (ন. ক.)

জনার্দন মিশ্র (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ—কালীকুমার মুখোপাধ্যায় (ন. ক.)

১৯২৮ ইং

প্রথম বিভাগ—অলখধারী লাল

দ্বিতীয় বিভাগ—জং বাহাদুর লাল (ন. ক.)

অমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (ন. ক.)

দেবীদয়াল উপাধ্যায় (ন. ক.)

রামাবতার শর্মা পাণ্ডে (ন. ক.)

দুখন সিং (ন. ক.)

১৯২৯ ইং

প্রথম বিভাগ—কেশরীকান্ত শর্মা

১৯৩০ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—মুকুন্দমোহন সান্যাল (ন. ক.)

যদুলাল

দেবেন্দ্রনাথ শুকুল (ন. ক.)

১৯৩১ ইং

প্রথম বিভাগ—পদ্মদত্ত ত্রিপাঠী (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ—শ্যামাচরণ তেওয়ারী

মতিলাল মিশ্র

১৯৩২ ইং

প্রথম বিভাগ—জগন্নাথপ্রসাদ মিশ্র (ন. ক.)

১৯৩৩ ইং

প্রথম বিভাগ—উমাবল্লভ চতুর্বেদী

দ্বিতীয় বিভাগ—রাজমঙ্গলনাথ ত্রিপাঠী (ন. ক.)

যামিনীকান্ত সর্বজ্ঞ (ন. ক.),

দেবীকিশোর শুক্ল (ন. ক.)

১৯৩৪ ইং

প্রথম বিভাগ—ব্রহ্মদেও পাণ্ডে

দ্বিতীয় বিভাগ—শিবনন্দন ঠাকুর (ন. ক.)

ভৃগুনাথ সিং

১৯৩৫ ইং

প্রথম বিভাগ—যদুনন্দন মিশ্র

কমলাকান্ত পাঠক

দ্বিতীয় বিভাগ—সুভদ্র ঝা (ন. ক.)

পুরুষোত্তম ধারাল (ন. ক.)

তৃতীয় বিভাগ—ভুবনেশ্বর মিশ্র (ন. ক.)

CENTRAL LIBRARY

১৯৩৬ ইং

প্রথম বিভাগ—মহেশ্বরী সিং

দ্বিতীয় বিভাগ—সুরেশচন্দ্র মৈত্র (ন. ক.)

এ. চন্দ্রহাসন মেনন (ন. ক.)

তৃতীয় বিভাগ—বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় (ন. ক.)

১৯৩৭ ইং

প্রথম বিভাগ—বৈদ্যনাথ দাস

মুরলিধর শুক্ল (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ—পুরুষোত্তম ভট্ট (ন. ক.)

হীরালাল বৈশ্য (ন. ক.)

ব্যোমকেশ মজুমদার (ন. ক.)

নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ন. ক.)

১৯৩৯ ইং

প্রথম বিভাগ—বিপিনবিহারী ত্রিবেদী

রামধন শর্মা (ন. ক.)

তারকনাথ আগরওয়ালা

দ্বিতীয় বিভাগ—রূপনারায়ণ উপাধ্যায়

দেবদত্ত শর্মা (ন. ক.)

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

উমাপতি ত্রিবেদী (ন. ক.)

সুধাকণা বসু

১৯৪০ ইং

প্রথম বিভাগ—ভুবনেশ্বর দ্বিবেদী

দ্বিতীয় বিভাগ—রঘুনন্দন মিশ্র

জগদীশচন্দ্র শাস্ত্রী (ন. ক.)

তৃতীয় বিভাগ—রাজেশ্বর মিশ্র (ন. ক.)

১৯৪১ ইং

প্রথম বিভাগ (নূতন পাঠ্যক্রম) ধর্মেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ (ঐ) জয়কৃষ্ণ টেণ্ডন,

সুরেন্দ্রনাথ দুবে (ন. ক.)

ভগবতীপ্রসাদ চন্দোলা (ন. ক.)

ব্রজনাথ লাল

পরমহংস মিশ্র (ন. ক.)

প্রথম বিভাগ (পুরাতন পাঠ্যক্রম) সরনাম সিং শর্মা (ন. ক.)

১৯৪৩ ইং

তৃতীয় বিভাগ—শিবদত্ত দুবে (ন. ক.)

১৯৪৪ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—ভানওয়ারমল সিংঘি (ন. ক.)

রামাবতার সিং

হিন্দী ভাষার অধ্যাপকমণ্ডলী

১৯১৯ ইং ১লা জুন হইতে হিন্দী ভাষা অধ্যাপনার জন্য ব্রজমোহন ঠাকুর, এম. এ. বি. এল., কে মনোনীত করা হইয়াছিল। ইনি ১লা ডিসেম্বর ১৯১৯ ইং এই চাকুরী ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মূলচাঁদ আগরওয়ালা, বি. এ. কে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৪ পর্যন্ত এই বিভাগে নিম্নলিখিত অধ্যাপকমণ্ডলী অধ্যাপনা করিয়াছিলেন —

ব্রজমোহন ঠাকুর, এম. এ. বি. এল. ১৯১৯

মূলচাঁদ আগরওয়ালা, বি. এ. ১৯১৯

গঙ্গাপতি সিং, বি. এ. ১৯১৯

নলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ. ১৯২২-১৯৩১

সকলনারায়ণ শর্মা ১৯২৪-১৯৪৪

ললিতাপ্রসাদ শুকুল ১৯৩৩-১৯৪৪

CENTRAL LIBRARY

প্রধান ভাষা ওড়িয়া

১৯২০ ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির অধিবেশনে ওড়িয়াকে উক্ত বিভাগের এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম প্রধান ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের পরবর্তী অধিবেশনে প্রধান ভাষা ওড়িয়ার এম. এ. পরীক্ষার ১৯২১ ও ১৯২২ ইং জন্য পাঠ্যতালিকা অনুমোদিত হয়। নিম্নে ওড়িয়া এম. এ. পরীক্ষার অনুমোদিত প্রথম পাঠ্যক্রম যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

প্রধান ভাষা ওড়িয়ার পাঠ্যক্রম (১৯২১ ও ১৯২২)

প্রথম পত্র—ওড়িয়া সাহিত্যের সাধারণ ইতিহাস, প্রাচীন যুগ হইতে ১৮০৩ ইং পর্যন্ত। নির্দিষ্ট যুগ ১৪৩০-১৫৬৮ ইং। পঠনীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ—

(১) শ্যামসুন্দর রাজগুরু—প্রবন্ধাবলী

(২) তারিণীচরণ রথ—উৎকল সাহিত্যের ইতিহাস

(৩) এম. এম. চক্রবর্তী—জার্নেল অব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮৯৮ ইং ৮র্থ প্রবন্ধ

(৪) মৃত্যুঞ্জয় রথ—উৎকল সাহিত্য ও মুকুরে প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ক প্রবন্ধ

(৫) গোপীনাথ নন্দ—সারল মহাভারতের সমালোচনা, উৎকল সাহিত্যে প্রকাশিত এবং জগন্নাথ দাসের ভাগবতের সমালোচনা—সত্যবাদীতে প্রকাশিত

দ্বিতীয় পত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ওড়িয়া সাহিত্য পরিচয় ১ম ভাগের নিম্নলিখিত অংশ—

(১) কেশবকয়লী, কান্তকয়লী, গোপীভাষা, কমললোচন চৌতিশা

(২) বলরাম দাসের রামায়ণ—আদি ২ এবং অযোধ্যা ৪ ও ৬ ভিন্ন সম্পূর্ণ

(৩) জগন্নাথ দাসের ভাগবত—নির্বাচিত অংশ ১-৭, ১৪, ২০ এবং ২১

(৪) সারল দাসের মহাভারতের নির্বাচিত অংশ

তৃতীয় পত্র—(ক) মধ্যযুগ—(১) রসকল্লোল—দীনকৃষ্ণ দাস (২) কিশোরচন্দ্রানন্দ চম্পূ—বলদেব কবিসূর্য।

(খ) আধুনিক (১) মহাযাত্রা—রাধানাথ রায় (২) বসন্তগাথা—মধুসূদন রাও

(৩) ভীমভোজন—গোপালবল্লভ দাস

চতুর্থ পত্র—(১) উপেন্দ্র ভঞ্জোত্তর ওড়িয়া সাহিত্যের উপর উপেন্দ্র ভঞ্জের প্রভাব

(২) আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র (বিকল্প ভাষা)—বাংলার অনুরূপ, শুধু ওড়িয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা—বাংলা

সপ্তম পত্র (মৌলিক ভাষা)—পালি, প্রাকৃত ও ফার্সীর মধ্যে যে কোন দুইটি ভাষা। বাংলা এম. এ.র অনুরূপ

অষ্টম পত্র—(ভাষাতত্ত্ব), পঠনীয় গ্রন্থ—

(১) বীম্‌স সাহেবের সাতটি আর্য ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণের সেই সকল অধ্যায় যাহাতে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ও হিন্দী ভাষার তুলনা করা হইয়াছে।

(২) বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাভাষার ইতিহাস' গ্রন্থের নিম্নলিখিত অধ্যায় সমূহ—১০, ১১, ১২ এবং ১৪।

CENTRAL LIBRARY

(৩) ওড়িয়া ভাষাতত্ত্ব—পণ্ডিত গোপীনাথ নন্দ রচিত, উৎকল সাহিত্য, মুকুর ও সত্যবাদীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ

(৪) শ্যামসুন্দর রাজগুরুর প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত 'ওড়িয়া সর্বনাম', 'অব্যয়' এবং 'বিভক্তি'

এই পাঠ্যক্রম অনুসারেই ১৯২২ ইং সর্বপ্রথম ওড়িয়া প্রধান ভাষা হিসাবে এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ওড়িয়া ভাষা পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থার জন্য ২টি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ওড়িষ্যার সোণপুর স্টেটের সামন্ত রাজ শ্রীশ্রীবীরমিত্রোদয় সিংদেও কে. সি. আই. ই. ১৯২০ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের সভাপতি স্যার আশুতোষের নামীয় পত্রে স্যার আশুতোষ এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দকে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ওড়িয়া ভাষাকে অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ ওড়িয়া প্রধান ভাষা রূপে অধ্যাপনার ব্যবস্থা আপাততঃ সম্ভব হইতেছে না অবগত হইয়া তিনি মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে ১৯২০ ইং ১লা জুন হইতে তিন বৎসরের জন্য তাঁহার নামে একটি 'ওড়িয়া চেয়ার' স্থাপনের প্রস্তাব করেন। পরে আরও ৭ বৎসরের জন্য অর্থাৎ মোট ১০ বৎসরের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯২০ ইং ২০এ এপ্রিল তারিখের সিনেটে এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২০ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি. এল. এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রধান ভাষা হিসাবে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার সুব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'ওড়িয়া সাহিত্যের আদর্শ সঙ্কলন' প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি. এল. সম্পাদিত এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ড ১৯২১ ইং, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৩ ইং এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯২৫ ইং প্রকাশিত হইয়াছিল। 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস' হইতে প্রকাশিত এই সঙ্কলনের প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ব্যয় হইয়াছিল ৪.৫০ চারি টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

(২) ওড়িষ্যার সোণপুর স্টেটের সামন্ত রাজ শ্রীশ্রীবীরমিত্রোদয় সিংদেও কে. সি. আই.ই. স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ৩৩০০০ টাকার জি. পি. নোট দান করেন। এই টাকার বার্ষিক সুদ হইতে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে ওড়িয়া অধ্যাপনার জন্য একজন বক্তা নিয়োগের প্রস্তাব করেন। দাতার নামানুসারে এই ওড়িয়া বিষয়ে বক্তৃতায় নামকরণ করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাব ১৯২৫ ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হয়। পরে সিনেট এই অর্থের সুদ হইতে একজন বক্তা এবং একজন সহকারী বক্তার পদ সৃষ্টি করেন—

প্রথম বক্তা, ১৯৩২ ইং মহেশ্বরদাস শর্মা, এম. এ.। প্রথম সহকারী বক্তা, ১৯৩২ ইং বিনায়ক মিশ্র।

১৯২০ ইং ২৮এ আগস্ট তারিখের স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষা বিভাগের পরিচালন সমিতি মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে নীলকণ্ঠ দাস, এম. এ.কে দুই বৎসরের জন্য ওড়িয়া ভাষার বক্তা নিযুক্ত করেন। নীলকণ্ঠ দাস, এম. এ. এই পদ ত্যাগ করায় ওড়িয়া গবেষক বিনায়ক মিশ্রকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সহকারী বক্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯২১ ইং ১৫ই মার্চ হইতে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯২২ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত প্রধান ভাষা ওড়িয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ১৬ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই কয় বৎসরের শতকরা গড় হিসাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৪৩.৭৫ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫৬.২৫। নিম্নে কোন্ বৎসর

CENTRAL LIBRARY

কত জন ছাত্র কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল। এই সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নামও উল্লেখ করা হইল—

বৎসর	মোট উত্তীর্ণ সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ
১৯২২	২	১	১
১৯২৩	২	—	২
১৯২৪	২	১	১
১৯২৫	২	১	১
১৯২৬	১	—	১
১৯২৭-১৯৩০	—	—	—
১৯৩১	১	—	১
১৯৩২	—	—	—
১৯৩৩	১	—	১
১৯৩৪-১৯৩৮	—	—	—
১৯৩৯	১	১	—
১৯৪০	—	—	—
১৯৪১	১	১	—
১৯৪২	—	—	—
১৯৪৩	১	১	—
১৯৪৪	২	১	১
	১৬	৭	৯

প্রধান ভাষা উড়িয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম

১৯২২ ইং

প্রথম বিভাগ—লোকনাথ মহাপাত্র, বিকল্প—বাংলা

দ্বিতীয় বিভাগ—লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, বিকল্প—বাংলা (ন. ক.)

১৯২৩ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—প্রমথনাথ কুণ্ডু, বিকল্প—বাংলা (ন. ক.)

ব্রজবন্ধু দাস বিকল্প—বাংলা (ন. ক.)

১৯২৪ ইং

প্রথম বিভাগ—রামচন্দ্র মহাপাত্র

দ্বিতীয় বিভাগ—ভাস্কর রাও (ন. ক.)

১৯২৫ ইং

প্রথম বিভাগ—চিন্তামণি আচার্য (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ—কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি (ন. ক.)

১৯২৬ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত (ন. ক.)

CENTRAL LIBRARY

১৯৩১ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক (ন. ক.)

১৯৩৩ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—ভাবগ্রাহী মহান্তী (ন. ক.)

১৯৩৯ ইং

প্রথম বিভাগ—অসিতরঞ্জন দাস

৯৪১ ইং

প্রথম বিভাগ—কুঞ্জবিহারী দাস

১৯৪৩ ইং

প্রথম বিভাগ—কাহ্নচরণ মিশ্র

১৯৪৪ ইং

প্রথম বিভাগ—আশালতা বেহেরা

দ্বিতীয় বিভাগ—জয়কৃষ্ণ মিশ্র (ন. ক.)

১৯১৯ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই বিভাগে নিম্নলিখিত অধ্যাপকমণ্ডলী অধ্যাপনা করিয়াছিলেন—

(১) বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল. (১৯১৯—১৯৩১)
(২) নীলকণ্ঠ দাস, এম. এ. (১৯২০—)
(৩) বিনায়ক মিশ্র (১৯২১—১৯৪৪)
(৪) মহেশ্বর দাসশর্মা, এম. এ. (১৯৩২—১৯৪৪)

প্রধান ভাষা গুজরাটী

স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের কার্যনির্বাহক সমিতির ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১ ইং তারিখের অধিবেশনে গুজরাটী এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হইয়াছিল। ১৯১৯ হইতে ১৯৪৩ ইং মধ্যে মাত্র একবার ১৯২৩ ইং গুজরাটী ভাষাকে প্রধান ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল।

প্রধান ভাষা গুজরাটীর পাঠ্যক্রম

প্রথম পত্র—গুজরাটী সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন যুগ হইতে ১৯০০ ইং পর্যন্ত, বিশেষ বিষয়—উনবিংশ শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্যের ফার্সী লেখক।

পঠনীয় গ্রন্থ—কে. এম. জাভেরি মাইল ষ্টোন্‌স ইন গুজরাটী লিটারেচার

ডি.সি. দেরসির—সাতীনা সাহিত্যানুদিগদর্শন

কে. এম. জাভেরি—ফার্সী গুজরাটী সাহিত্য ইন দি বিঞ্চুসাদি

এ.বি. ক্রুক এবং আই. জে.এস্. তারাপুরওয়ালা—সিলেক্সনস্ ফ্রম গুজরাটী লিটারেচার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রত্যেক গ্রন্থকার সম্পর্কীয় ভূমিকা অংশ

দ্বিতীয় পত্র—প্রাচীন গুজরাটী ও রাজস্থানী—

পদ্মনাভ—কুহাদ্দে প্রবন্ধ (দেরসরি সংস্করণ)

ভালন—কাদম্বরী (কান্তাওয়ালা সংস্করণ)

রাঠোর পৃথ্বিরাজ—ভেলি কৃষ্ণরুক্মিণী (টেসি-টোরিজ সংস্করণ) এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। প্রাচীন গুজরাটী সঙ্কলন বরোদা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় পত্র—মধ্য ও আধুনিক যুগের পাঠ্যগ্রন্থ

প্রেমানন্দ, দয়ারাম } কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "গুজরাটী" সঙ্কলন।

নর্মদাশঙ্কর—নর্ম কবিতা

দলপতরাম—ফরবেস বীর হ এবং দলপত কাব্য

কলাপী—কেকারব

গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী—সরস্বতীচন্দ্র

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ পত্র—বিশেষ বিষয়

(ক) গুজরাটী সাহিত্যে মহিলা লেখিকা

(খ) আখো এবং শ্যামল

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্র—বাংলা এম. এ. পাঠ্যতালিকার অনুরূপ, অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা বাংলা

অষ্টম পত্র—(ভাষাতত্ত্ব) আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা—এলিমেন্টস্ অফ্ দি সাইনস অফ্ লেঙ্গুয়েজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) পরিশিষ্ট অংশ ব্যতীত।

এন. ভি. দিভাতিয়া—গুজরাটী সাহিত্যের ইতিহাস

স্যার জি. এ. গ্রিয়ারসন—লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ৯ম খণ্ড, গুজরাটী ও রাজস্থানী ভূমিকা অংশ

ডক্টর আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা, বি. এ., পি. এইচ. ডি. সম্পাদিত 'প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্য সঙ্কলন' (Selections from the Classical Gujarati Literature) প্রথম খণ্ড ১৯২৫ ইং, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২১ ইং এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৭ ইং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

গুজরাটী প্রধান ভাষা হিসাবে এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ-ছাত্র—

১৯২৩ ইং—কান্তিলাল এম. ঢোলকীয়া, দ্বিতীয় বিভাগ, ইহার বিকল্প ভাষা ছিল—বাংলা।

গুজরাটী ভাষার অধ্যাপকমণ্ডলী—

ডক্টর আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা, বি. এ., পি-এইচ. ডি. (১৯১৯—১৯২৮)

হরগোবিন্দ দাস শেঠ (১৯২৬—১৯৩৬)

প্রধান ভাষা মৈথিলী

১৯১৯ ইং বনেলীরাজ কৃত্যানন্দ সিং, বি. এ. এবং শ্রীনগর রাজকুমার কালিকা সিং যুক্তভাবে মৈথিলী ভাষা অধ্যয়ন ও গবেষণার সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ৬ বৎসরের জন্য বার্ষিক ১২০০ টাকা করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। এই বিষয়ে মনোনীত অধ্যাপককে তাঁহারা 'বনেলী শ্রীনগর' অধ্যাপক নামকরণের অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সর্বপ্রথম পণ্ডিত বুদ্ধি ঝাকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১০০ টাকা বেতনে 'বনেলী শ্রীনগর' বক্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

১৯১৯ ইং দিনাজপুর মালদোয়ার স্টেটের জমিদার টঙ্কনাথ চৌধুরী, বি. এ. তাঁহার নামে মৈথিলী ভাষা চর্চার জন্য এক জন বক্তা নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বক্তার এক বৎসরের বেতন বাবত ১২০০ টাকা দান করেন। মাসিক ১০০ টাকা বেতনে গঙ্গাপতি সিং, বি. এ.-কে প্রথম দুই বৎসরের জন্য টঙ্কনাথ চৌধুরী বক্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্নাতকোত্তর ভাষাবিভাগের কার্যনির্বাহক সমিতি ১৯২০ ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে মৈথিলীকে এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম প্রধান ভাষারূপে স্বীকৃতি দেন। ৪ঠা মার্চ১৯২১ইং তারিখের পরবর্তী অধিবেশনে ১৯২৩ ইং জন্য এম. এ. মৈথিলীর পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

প্রধান ভাষা মৈথিলীর পাঠ্যক্রম [১৯২৬]

প্রথম পত্র—আদি যুগের মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস—১৩শ শতক হইতে চন্দা ঝা পর্যন্ত। বিশেষ যুগ—বিদ্যাপতির যুগ

দ্বিতীয় পত্র—জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর—বর্ণরত্নাকর

বিদ্যাপতি—কীর্তিলতা

গোবিন্দদাস—পদসংগ্রহ

রামদাস ঝা—আনন্দবিজয়

হর্ষনাথ—উষাহরণ

উমাপতি—পারিজাতহরণ

তৃতীয় পত্র—

হর্ষনাথ—মাধবানন্দ

জীবন ঝা—সুন্দর সংযোগ

লাল দাস—গণেশখণ্ড

জীবন ঝা—সামবতী পুনর্জন্ম নাটক

চতুর্থ পত্র—মৈথিলী সাহিত্যের উপর ফার্সী প্রভাব, মৈথিলী সাহিত্যের বিকাশ ১৮৫০—১৯০০

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্র—বাংলা এম. এ. পাঠ্যতালিকার অনুরূপ, অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা বাংলা

অষ্টম পত্র—ভবনাথ মিশ্র, মিথিলা শব্দপ্রকাশ

১৯২৬ ইং প্রথম মৈথিলী ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। সকল পরীক্ষার্থীই 'নন্ কলেজিয়েট' ছাত্র ছিলেন। শুধু ১৯২৮ ইং সর্বপ্রথম কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯১৯ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং মধ্যে মাত্র ৬ বার মৈথিলী এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। পরীক্ষোত্তীর্ণ মোট ছাত্রের সংখ্যা ৬, প্রথম বিভাগে ১ এবং দ্বিতীয় বিভাগে ৫ জন। শতকরা গড় হিসাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ১৬·৬৬ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৮৩·৩৩। নিম্নে কোন বৎসর কতজন ছাত্র কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল—

বৎসর	উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ
১৯২৬	১	—	১
১৯২৭	—	—	—
১৯২৮	১	—	১
১৯২৯	১	—	১
১৯৩০—১৯৩৪	—	—	—
১৯৩৫	১	—	১
১৯৩৬	—	—	—
১৯৩৭	১	১	—
১৯৩৮—১৯৩৯	—	—	—
১৯৪০	১	—	১
১৯৪১—১৯৪৪	—	—	—
	৬	১	৫

CENTRAL LIBRARY

প্রধান ভাষা মৈথিলী এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম

১৯২৬ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—মাধব মিশ্র (ন. ক.)

১৯২৮ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী

১৯২৯ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—কেদারনাথ চৌধুরী (ন. ক.)

১৯৩৫ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—গোকুললাল চক্রবর্তী (ন. ক.)

১৯৩৭ ইং

প্রথম বিভাগ—জয়দেব মিশ্র (ন. ক.)

১৯৪০ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—মহেশ্বরী সিংহ (ন. ক.)

মৈথিলী ভাষার অধ্যাপকমণ্ডলী—

পণ্ডিত খুদ্দি ঝা (বনেলী শ্রীনগর বক্তা) (১৯২০—১৯২৬)

গঙ্গাপতি সিং, বি. এ. (টঙ্কনাথ চৌধুরী বক্তা) (১৯২০—১৯২৫)

বরুয়া মিশ্র, জ্যোতিষাচার্য (১৯২৭—১৯৪১)

প্রধান ভাষা উর্দু

১৯২৯ ইং সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। এম. এ. উর্দু পরীক্ষার পাঠ্যক্রম যথা—প্রথম পত্র—উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ হইতে 'আরিস'-এর কাল পর্যন্ত। বিশেষ যুগ—দিল্লীর কাব্যধারার কবি 'মীর' পর্যন্ত অথবা লক্ষ্ণৌর কবি আতাস ও নাসিকের কাব্যধারা।

পাঠ্যগ্রন্থ—সাকসেনা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস

মোহাম্মদ হুসৈন আজাদ—আব-এ-হয়াত

শমসুল্লা কাদরী—উর্দু-এ-কাদিম

হাসিমি—দকন-মে-উর্দু

আবদুস্ সলাম—শিকল হিন্দ, ১ম ও ২য় খণ্ড

সিরনী মোহাম্মদ খান—পাঞ্জাব মে-উর্দু

পঠনীয় গ্রন্থ—শ্রীরাম—খুম খান এ-জাবিদ

লায়ল—হিন্দুস্থানী লেঙ্গুয়েজ (এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, ৯ম সংস্করণ)

আবদুল হাই—গুল-এ-রাণা

গার্শেঁ-দ-তাসি—ইস্তবার দ লালিতেরাত্যুর এন্দুস্ট-এ-হিন্দুস্তানী ৩ খণ্ড

ব্লুমহার্ড জে. এফ.—কেটেলগ অফ হিন্দুস্থানী মেনাস্ক্রিপ্টস্ ইন দি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী

মোহাম্মদ উমর এবং নূর ইলাহি—নাটক সাগর (অর্থাৎ উর্দু নাটকের ইতিহাস)

দ্বিতীয় পত্র—প্রাচীন সাহিত্য

(ক) পদ্য—দীওয়ান-এ-ওয়ালী—আঞ্জুমান তরক্কি-এ-উর্দু সংস্করণ, আহছান মরহরউস্ত-সম্পাদিত

মীর হাসান—মথনউস্ত

ইন্তিখাব-এ-কালাম-এ-মীর-আঞ্জুমান তরক্কি-এ-উর্দু সংস্করণ, আবদুল হক সম্পাদিত

CENTRAL LIBRARY

(খ) গদ্য—রিসালা-এ-গিস্থ-দরাজ, সম্পাদক—সামসুল্লা কাদরী হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য

ফেসানা-এ-আজাএব—রজব আলি বেব সুরুর রচিত,

আরাইস মহফিল—মীর শের আলি আফসোস রচিত

তৃতীয় পত্র—মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ—পাঠ্যগ্রন্থ

(ক) গদ্য এবং নাটক

মুকাদ্দমা-এ-শের-ও-সাইরি—হালি রচিত, লায়লা-ও-মজনু—মীর্জা মোহাম্মদ হাদি রচিত

মজামিন-এ-শের—সৈয়দ আহমদ

খুবসুরত বালা—আগা হাশার, মালিকুল আজিজ—ভাজিনা সারার রচিত

(খ) পদ্য—দেওয়ান-এ-গালিব (নিজামি সংস্করণ)

মুসদ্দস্-এ-হালি

মারসিয়া অব আলি (প্রথম খণ্ডের প্রথমার্ধ)

চতুর্থ পত্র—(ক) উর্দু গদ্য রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশ ১৮০০-১৯০০

পঠিতব্য গ্রন্থ—মোহাম্মদ ইয়াহিয়া রচিত-সিয়ারউল মুচান্নিফিন (১ম এবং ২য় খণ্ড) এবং গোলাম মহীউদ্দীন কাদরী রচিত—উর্দুকে আসল-ই-রেবয়ান

(খ) উর্দু সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ১৮৬০-১৯০০, বিশেষভাবে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান, আবদুল হালিম, সারার এবং হালির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পঠিতব্য গ্রন্থ—ডঃ এ. লতিফ রচিত—ইনফ্লুএন্স অফ ইংলিশ লিটারেচার অন উর্দু

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র—বিকল্পভাষা, বাংলা পাঠ্যক্রমের অনুরূপ।

সপ্তম পত্র—মৌলিকভাষা, বাংলা পাঠ্যক্রমের অনুরূপ, অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা বাংলা

অষ্টম পত্র—পঠিতব্য গ্রন্থ—প্লাটস—হিন্দুস্থানী গ্রামার

গ্রিয়ার্সন—লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ৯ম খণ্ড (ওয়েষ্টার্ণ হিন্দী)

লায়াল—আর্টিকেল অন হিন্দুস্থানী (এনসাইক্লপিডিয়া বৃটানিকা, ৯ম সংস্করণ)

কেলগ—হিন্দী গ্রামার (ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত অংশমাত্র)

মহীউদ্দিন কাদরী—উর্দু ফনেটিকস (উর্দু ধ্বনিতত্ত্ব) প্যারিস ১৯৩০ ইং ;

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার কথা ভাবিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'উর্দু সিলেকসন' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯২৯ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত প্রধান ভাষা উর্দু এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ৩০ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৬ জন, তৃতীয় বিভাগে ২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই কয় বৎসরের শতকরা গড় হিসাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৪০'০০, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৫৩·৩৩,

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৬৬৬। নিম্নে কোন বৎসর কত জন ছাত্র কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল—

বৎসর	উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯২৯	১	—	১	—
১৯৩০	—	—	—	—
১৯৩১	১	—	১	—
১৯৩২	—	—	—	—
১৯৩৩	২	—	২	—
১৯৩৪	—	—	—	—
১৯৩৫	৩	১	২	—
১৯৩৬	৩	৩	—	—
১৯৩৭	১	১	—	—
১৯৩৮	২	—	২	—
১৯৩৯	২	১	১	—
১৯৪০	৫	৩	—	২
১৯৪১	৪	১	৩	—
১৯৪২	২	—	২	—
১৯৪৩	২	১	১	—
১৯৪৪	২	১	১	—
	৩০	১২	১৬	২

প্রধান ভাষা উর্দু এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম

১৯২৯ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—কালীকুমার মুখোপাধ্যায় (ন. ক.)

১৯৩১ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—সৈয়দ আবদুস্ সত্তার (ন. ক.)

১৯৩৩ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—ত্রিভগন নাথ ভান (ন. ক.)
আবু সৈয়দ মো: খালিকুর রহমান

১৯৩৫ ইং

প্রথম বিভাগ আহম্মদ সিদ্দিক (ন. ক.)

দ্বিতীয় বিভাগ মোহাম্মদ ওবেইদুর রহমান ওয়াহিদি (ন. ক.)
সৈয়দ শা আবদুস সুভান আবু হামেদ (ন. ক.)

CENTRAL LIBRARY

১৯৩৬ ইং

প্রথম বিভাগ—মজহরুল আলিম
আব্বাস আলী খান (ন. ক.)
লক্ষ্মীনারায়ণ টণ্ডণ (ন. ক.)

১৯৩৭ ইং

প্রথম বিভাগ—এস. এম. এ. কুইয়াম নোমানী (ন. ক.)

১৯৩৮ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—মোহাম্মদ আবদুস সামাদ সিদ্দিকি (ন. ক.)
রামকুমার চৌবে (ন. ক.)

১৯৩৯ ইং

প্রথম বিভাগ—এস. তাহির হোসেন নাকভী (ন.ক.)
দ্বিতীয় বিভাগ—শা মকবুল আহামদ

১৯৪০ ইং

প্রথম বিভাগ—মোহাম্মদ সফিক (ন. ক.)
সৈয়দ জিলি পঞ্জাতন জৈয়িদি (ন.ক.)
মোহাম্মদ জয়িনুল আবেদিন
তৃতীয় বিভাগ—মুরারিলাল মাথুর (ন. ক.)
সৈয়দ আনিছুর রহমান (ন. ক.)

১৯৪১ ইং

প্রথম বিভাগ—আসান আহমদ (ন. ক.)
দ্বিতীয় বিভাগ—বিষাণ সরূপ ভাটনগর (ন. ক.)
সৈয়িদা খানম (ন. ক.)
দুর্গাপ্রসাদ আভস্থিম (ন. ক.)

১৯৪২ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—গোলাম সারওয়ার (ন. ক.)
রামমোহন সহায় (ন. ক.)

১৯৪৩ ইং

প্রথম বিভাগ—সৈয়িদা ফতিনা বেগম (ন. ক.)
দ্বিতীয় বিভাগ—এ. এম. আবদুর রৌফ ফত্‌মি (ন. ক)

১৯৪৪ ইং

প্রথম বিভাগ—সাআদ মুনিরুদ্দিন (ন. ক)
দ্বিতীয় বিভাগ—মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (ন.ক.)

উর্দু ভাষার অধ্যাপকমণ্ডলী (১৯১৯-১৯৪৪)—

এস্. সারওয়ার্দি, এম. এ., পি-এইচ. ডি., এম. এল. এ. (১৯১৯-১৯২৫)
মৌলবী শা কলিমুর রহমান, এম. এ. (১৯৩০-)

প্রধান ভাষা অসমীয়া

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের পরিচালন সমিতির ১৯শে আগষ্ট ১৯৩৮ ইং তারিখের অধিবেশনে অসমীয়া ভাষার এম. এ. পরীক্ষার প্রথম পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হইয়াছিল—

CENTRAL LIBRARY

প্রধান ভাষা অসমীয়ার পাঠ্যক্রম

প্রথম পত্র—অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত [নম্বর ১০০]

পঠনীয় গ্রন্থ—

ডি. এন. বেজবড়ুয়া—অসমীয়া ভাষা আরু সাহিত্যর বুরঞ্জী

গ্রিয়ার্সন—লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া

কারকুহার—রিলিজিয়াস লিটারেচার ইন ইণ্ডিয়া

কে. এল. বড়ুয়া—আর্লি হিস্ট্রি অব কামরূপ

ই. জে. টি. ডেন্টন—মহাপুরুষিয়া এ সেক্ট অব বৈষ্ণবিজম ইন আসাম। জে. এ. এস্. বি. নং ৬ (১৮৫১)

ডঃ এইচ. সি. রায়চৌধুরী—আর্লি হিস্ট্রি অব বৈষ্ণব সেক্ট, অধ্যায় ১, ২, ৫

রিলিজিয়াস হিস্ট্রি অব আসাম

এল. এন. বেজবড়ুয়া—অসম সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণ।

পি. এন. গোঁহাই বড়ুয়া—ঐ

এ. বি. কীথ—হিস্ট্রি অব স্যান্স্ক্রিট ড্রামা

আর .কে. যাজ্ঞিক—ইণ্ডিয়ান থিয়েটার

এস্. কে. সেন—হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার

কে. মেধী—অসমীয়া নাটক (অসম বান্ধবে প্রকাশিত)

বি. কে. বড়ুয়া—অঙ্কিয়া নাট

দ্বিতীয় পত্র—কবিতা ও অজ্ঞাত অংশ (নম্বর ৭০ + ৩০ = ১০০)

শঙ্করদেব—কীর্তন অধ্যায়—প্রহ্লাদচরিত, কংসবধ এবং বৈকুণ্ঠপ্রয়াণ।

মাধবদেব—নামঘোষা

রামচরণ ঠাকুর—শঙ্করচরিত (অসমীয়া সাহিত্যর চানেকী)

এন. সি. ভূঞা—বহাগী

জে. এন. দোয়ারা—আপোনার স্বর

পঠনীয় গ্রন্থ—

ডঃ বি. কে. কাকতি—অসমীয়া পুরণী সাহিত্য 'চেতনা'য় প্রকাশিত।

তৃতীয় পত্র—গদ্য এবং সাহিত্য সমালোচনা (নম্বর ৭০ + ৩০ = ১০০)

ভট্টদেব—কথাগীতা

রঘুনাথ—কথারামায়ণ (অসমীয়া সাহিত্যর চানেকী)

ডঃ এস্. কে. ভূঞা—দেওধাই অসম বুরঞ্জী

এল. এন. বেজবড়ুয়া—সাধুকথার কুকি

আর. কে. বড়দলৈ—রঙ্গিলী

পঠনীয় গ্রন্থ—

ডঃ এস্. কে. ভূঞা—অসমর ঐতিহাসিক সাহিত্য—ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টালি ১৯২৯

বি. কে. বড়ুয়া—অসমীয়া পুরণী কথাসাহিত্য (চিন্তাকোষ)

চতুর্থ পত্র—নাটক এবং প্রবন্ধ (নম্বর ৭০ + ৩০ = ১০০)

শঙ্করদেব—পারিজাত হরণ

গোপালদেব—জন্মযাত্রা

গুণাভিরাম বড়ুয়া—রামনবমী নাটক

এল. এন্. বেজবড়ুয়া—লিতিকৈ

পি. এন্ গোঁহাই বড়ুয়া—গাও বুঢ়া

পঞ্চম পত্র—১৮০০ ইং পূর্ববর্তী বিশেষ যুগ (নম্বর ১০০)

বৈষ্ণব সাহিত্য ১৫৮০-১৬৫০

শঙ্করদেব—দশম স্কন্ধ (পদ্য ১-৫১৪)

রাম সরস্বতী—কুলাচলবধ কাব্য

ভট্টদেব—কথাভাগবত (১ম খণ্ড)

রঘুনাথ দ্বিজ—সাত্বত তন্ত্র (অসমীয়া সাহিত্যর চানেকী)

CENTRAL LIBRARY

মাধব দেব—রত্নাবলী, প্রথম ৪০০ পদ

ষষ্ঠ পত্র—১৮০০ ইং পরবর্তী বিশেষ যুগ (নম্বর ১০০)

অসমীয়া সাহিত্য ১৮৬০-১৯২০

গুণাভিরাম বড়ুয়া—আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবনচরিত

হেমচন্দ্র বড়ুয়া—বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়াভাতুরি

আর. কে. বড়দলৈ—বহদৈ লিগিরি

এল. এন্. বেজবড়ুয়া—কৃপাবর বড়ুয়ার ওভতনি

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—চিন্তানল

সি. কে. আগরওয়ালা—বীন বৈরাগী

ভোলানাথ দাস—সীতাহরণ কাব্য

পি. এন্. গোঁহাই বড়ুয়া—লীলাকাব্য

সি ডি. বড়ুয়া—ভাগ্যপরীক্ষা

ডি. পি. মজুমদার বড়ুয়া—মহারি

সপ্তম পত্র—বিকল্প ভাষা (নম্বর ১০০)—এম. এ. বাংলা পাঠ্যক্রমের অনুরূপ, অতিরিক্ত বিকল্প ভাষা—বাংলা।

বিকল্প বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ (নম্বর ৭০)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মাধ্যমিক বাংলা চয়ন, আই এ. ও আই এস্. সি. পরীক্ষার জন্য সেই সেই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রম।

ব্যাকরণ (নম্বর ৩০) কোন গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

অষ্টম পত্র—(ক) মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষা (নম্বর ৫০) বাংলার অনুরূপ

(খ) ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক অসমীয়া ব্যাকরণ (নম্বর ৫০)

পঠনীয় গ্রন্থ—কালীরাম মেধী—অসমীয়া ব্যাকরণ এবং অসমীয়া ভাষার গোড়ার কথা

দেবানন্দ ভরালি—অসমীয়া ভাষার মৌলিক বিচার

এস. কে. চাটার্জী—ওরিজিন এণ্ড ডেভলাপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলী লেঙ্গুএজ

আসাম সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী, হেমকোষ সম্পাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'অসমীয়া সাহিত্যর চানেকী'র প্রথম খণ্ড—১৯৩০ ইং, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ ১৯২৪ ইং, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ—১৯২৪ ইং, দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় ভাগ—১৯২৪ ইং দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ ভাগ—১৯২৫ ইং, তৃতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ ১৯২৩ ইং, তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ ১৯২৪ ইং প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৩ ইং অম্বিকানাথ বরা সম্পাদিত 'রুক্মিণীহরণ নাট' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

অসমীয়া ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা ১৯৪০ ইং প্রথম গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম তিন বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ ইং কয়েকজন কলেজিয়েট ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ ইং কোন কলেজিয়েট ছাত্র পরীক্ষা দেন নাই। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসরেই কয়েকজন নন্‌কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই ৫ বৎসরে মোট ২৪ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই কয় বৎসরের শতকরা গড় হিসাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৪·১৬, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৭৯·১৬, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের

CENTRAL LIBRARY

সংখ্যা ১৬'৬৬ জন। নিম্নে কোন বৎসর কত জন ছাত্র কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইল।

বৎসর	উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৪০	৭	—	৭	—
১৯৪১	৯	১	৬	২
১৯৪২	৪	—	৩	১
১৯৪৩	৩	—	২	১
১৯৪৪	১	—	১	—
	২৪	১	১৯	৪

প্রধান ভাষা অসমীয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম

১৯৪০ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—ডিম্বেশ্বর নেওগ (ন. ক.)
যাদবনারায়ণ দাস
দুর্গাবতী সইকিয়া
উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু (ন. ক.)
দ্বিজেন্দ্রমোহন গোস্বামী
নলিনীকুমার মিশ্র (ন. ক.)
হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য (ন. ক.)

১৯৪১ ইং

প্রথম বিভাগ—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা
দ্বিতীয় বিভাগ—রজনীকান্ত চৌধুরী (ন. ক.)
গোবিন্দরাম দাস (ন. ক.)
কৃষ্ণনাথ ভূঞা (ন. ক.)
দুলেশ্বর কোঙার
সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্মা (ন. ক.)
রাজবালা দাস (ন. ক.)
তৃতীয় বিভাগ—হরেশ্বর শর্মা (ন. ক.)
দুলালচন্দ্র বড়ঠাকুর (ন. ক.)

১৯৪২ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ বিনয়ভূষণ চৌধুরী
ভোলানাথ শর্মা (ন. ক.)
শশিকান্ত শর্মা (ন. ক.)
তৃতীয় বিভাগ—ঈশ্বরচন্দ্র বড়ুয়া (ন. ক.)

১৯৪৩ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—অতুলচন্দ্র হাজারিকা (ন. ক.)
তুলসীনারায়ণ শর্মা (ন. ক.)
তৃতীয় বিভাগ—আইমেনা বেগম (ন. ক.)

১৯৪৪ ইং

দ্বিতীয় বিভাগ—অতুলচন্দ্র বড়ুয়া (ন. ক.)

অসমীয়া ভাষার অধ্যাপক মণ্ডলী (১৯১৯-১৯৪৪)

অম্বিকানাথ বরা, এম. এ. (১৯১৯-১৯৫১), তীর্থনাথ শর্মা, এম. এ. (১৯২৮-১৯৪৫), হস্তীরুদ্রপ্রসাদ দোয়ারা (১৯৩৮-১৯৪৩)

CENTRAL LIBRARY

বিকল্প ভাষা (Subsidiary Language)

১৯১৯ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় ভাষাবিভাগের সৃষ্টি করিয়া প্রধান ভাষা বাংলার সঙ্গে ১২টি বিকল্প ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারত রাষ্ট্রের বর্তমানে স্বীকৃত ১৪টি প্রধান ভাষার মধ্যে বাংলা ব্যতীত অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়ী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু, মারাঠী, মালয়ালম, মৈথিলী ও হিন্দী এই ১১টি ভাষা এবং সিংহলী ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বাংলা চর্চার পক্ষে পরিপূরক এবং তুলনামূলক আলোচনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে মনে করিয়াই মনীষী আশুতোষ এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহা যে কতখানি দূরদৃষ্টির পরিচায়ক এবং ভারতীয় ভাষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে সহায়ক তাহা অনুভব করিয়া এই মনীষীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানত হইতেছি।

১৯১৯ ইং ১৭ই মে তারিখের স্নাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষণ-বিভাগের পরিচালন সমিতির অধিবেশনে প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষার আনুষঙ্গিক ১২টি বিকল্প ভাষার মধ্যে ছয়টি ভাষার যথা—অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠী ও হিন্দী এবং ইহার প্রায় ৪ মাস পরে ১৯১৯ ইং ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে অবশিষ্ট ছয়টি বিকল্প ভাষা যথা—কানাড়ী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, মৈথিলী ও সিংহলীর পাঠ্যক্রম গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে এই ১২টি বিকল্প ভাষার মধ্যে যে কোন একটি ভাষা লওয়া আবশ্যিক। হিন্দী ও ওড়িয়া প্রভৃতি এম. এ. পরীক্ষার প্রধান ভাষা রূপে স্বীকৃতি লাভের ফলে বাংলাকে অন্যতম বিকল্পভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। এম. এ. পরীক্ষার ৫ম ও ৬ষ্ঠ পত্র বিকল্প ভাষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নিম্নে বর্ণানুক্রমিক বাংলা সহ ১৩টি বিকল্প ভাষার পাঠ্যক্রম উদ্ধৃত হইল—

(১) অসমীয়া

পাঠ্য গ্রন্থ—

শঙ্করদেব—রুক্মিণীহরণ

ভট্টদেব—কথাগীতা (প্রথম ৩ সর্গ)

গুণাভিরাম বড়ুয়া—আসাম বুরঞ্জি (প্রথম ৪ অধ্যায়)

লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া—কৃপাবর বরবড়ুয়ার কাকতর টোপোলা

মফিজউদ্দীন আহমদ—জ্ঞানমালিনী

ব্যাকরণ—

হেমচন্দ্র বড়ুয়া—অসমীয়া ব্যাকরণ

দেবানন্দ ভরালী—অসমীয়া ভাষার মৌলিক বিচার

সত্যনাথ বরা সাহিত্য বিচার

দেবানন্দ ভরালী—এ মো আসামিজ গ্রামার

জি. এফ. নিচোল—আসামিজ গ্রামার ইন বেঙ্গলী মেথড্‌স

সাহিত্যের ইতিহাস—

দেবেন্দ্রনাথ বেজবড়ুয়া—অসমীয়া ভাষা আরু সাহিত্যর বুরঞ্জি।

(২) উর্দু

পাঠ্যগ্রন্থ -

কালাম-এ-উর্দু—বোর্ড অব একজামিনার্স

হায়ত-এ-সাদি—হালি

তুবাতুন্ন-সুহ—নজির আহমদ

নজম-এ-মুস্তগাব

মুসদ্দস্-এ-হালি

ব্যাকরণ—

পামার—সিমপ্লিফাইড গ্রামার অব হিন্দুস্থানী পার্শিয়ান এণ্ড এরাবিক

গ্রীন এ প্রেক্‌টিক্যাল হিন্দুস্থানী গ্রামার

ফরবেস—হিন্দুস্থানী গ্রামার

গ্লেটস্—হিন্দুস্থানী গ্রামার

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যের ইতিহাস—

গার্সেঁ-দ-তাসি—ইস্তবার দা লালিতেরাত্যুর এন্দুস্ত-এ-হিন্দুস্তানী

আজাদ—আব-এ-হায়াত।

(৩) ওড়িয়া

পাঠ্যগ্রন্থ—

জগন্নাথ দাস—ভাগবত ১১শ স্কন্ধ

উপেন্দ্র ভঞ্জ—বৈদেহীস বিলাস ৪র্থ খণ্ড

মধুসূদন রাও—প্রবন্ধমালা

মধুসূদন রাও—কুসুমাঞ্জলি

ফকিরমোহন সেনাপতি—ছামনআট গুণ্ঠা

ব্যাকরণ—

রাধানাথ রায়—ব্যাকরণ প্রবেশ

ই. সি. এইচ. হল্লম—ওড়িয়া গ্রামার

সাহিত্যের ইতিহাস—

মনোমোহন চক্রবর্তীর ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কীয় প্রবন্ধাবলী, জার্নেল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল-এ মুদ্রিত (১৮৯৮-৯৯)

(৪) কানাড়ী

কিট্টেল—

গ্রামার অব ওল্ড এণ্ড মডার্ণ কান্নাড় (মাঙ্গালোর ১৯০৩)

স্পেনসার—

কেনারিজ গ্রামার (মাইসোর ১৯১৪)

কল্ডউএল—

কম্পারেটিব গ্রামার অব ড্রাবিডিয়ান লেঙ্গুএজেস্

বাইস—

হিস্ট্রি অব কেনারিজ লিটারেচার

পম্প সংগ্রহ

পম্পসার ১ম ভাগ, পৃ ৩-৪, ১২-১৩, ২৭-৩০, ৭৭-৮৬, ১০২-১০৬

কথাসংগ্রহ—১ম ভাগ, পৃ. ১-৯৬

কথাসংগ্রহ—২য় ভাগ, পৃ. ২১০-২৮০

নির্মালি—

(অথবা সি স্টুপস্ টু কম্বার) ইন কেনারিজ

শব্দাদর্শ—

কানাড়ী ভাষার

মেট্রিকুলেশন সিলেকশনস্—

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

(৫) গুজরাটী

পাঠ্যগ্রন্থ—

ঘনশ্যাম—পটননিপ্রহত (গুজরাটী প্রেস, বোম্বে)

আই. পি. খানসাহেব এবং নরহরিলাল ত্রিকমলাল—সাহিত্যরত্ন

ব্যাকরণ—

টেইলর—গুজরাটী ভাষাস্থম ব্যাকরণ

কে. পি. ত্রিবেদী—মধ্য ব্যাকরণ

সেট ক্লেয়ার টিসডল—সিমপ্লিফাইড গ্রামার অব দি গুজরাটী লেঙ্গুএজ

খান সাহেব এবং শেঠ—হিন্টস্ অন দি স্টাডি অব গুজরাটী

সাহিত্যের ইতিহাস—

কে. এম. ঝাভেরি—মাইলস্টোনস্ ইন গুজরাটী লিটারেচার

(৬) তামিল

উইক্‌রেম সিংঘে—

তামিল গ্রামার সেল্ফ টট

পোপ—

তামিল হ্যাণ্ডবুক

ক্যাটেকিজমস্ অব তামিল গ্রামার, ১—২

CENTRAL LIBRARY

আরডেন—

প্রগ্রেসিভ গ্রামার

কল্ডউএল—

কম্পারেটিভ গ্রামার অব ড্রাবিডিয়ান লেঙ্গুএজেস্

পূর্ণলিঙ্গম পিল্লাই—

প্রাইমার অব তামিল লিটারেচার

বিবেক বিলক্কম

সেউল কোরাই

ভসক তিরত্তু

মেট্রিকুলেশন সিলেকসন্স—

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়

(৭) তেলুগু

ব্রাউন—

তেলুগু গ্রামার

মরিস—

সিন্‌ক্রিকাইড তেলুগু গ্রামার

আর্ডেন—

তেলুগু গ্রামার ১৯০৫, তেলুগু কম্পেনিয়ন রিডার ১৮৭৯

কল্ডউএল—

কম্পারেটিভ গ্রামার অব ড্রাবিডিয়ান লেঙ্গুএজেস্

নরসিংহম এবং নরসিংহরাও—

আনন্দ রিডার্স, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ

মেট্রিকুলেশন সিলেকসন্স—

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

(৮) বাংলা

পাঠ্যগ্রন্থ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা গদ্য ও পদ্য সঙ্কলন

ব্যাকরণ—

জি.এফ. নিকোল্—মেনুএল অব বেঙ্গলী লেঙ্গুএজেস্

এস্. কে. চাটার্জী—বেঙ্গলী সেল্ফ টট্ (মার্লবোরজ সেল্ফ টট্ সিরিজ)

সাহিত্যের ইতিহাস—

দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ এবং 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকা

এস্. এন্. সেন—মডার্ণ বেঙ্গলী লিটারেচার (ক্যালকাটা রিভিউ, জানুয়ারী ১৯২৪ ইং)

(৯) মারাঠী

পাঠ্যগ্রন্থ—

গদ্যরত্ন সমুচ্চয়, ১ম ভাগ

নবনীত, পৃ. ২-২২,৪৭-৮৮,১৫৯-১৭১,৩৮১-৪১০

ব্যাকরণ—

রামচন্দ্র ভিকাজু যোশি—প্রোধবোধ ব্যাকরণ

জি. আর. নওলকার—মারাঠী ব্যাকরণ

সাহিত্যের ইতিহাস—

ভাবে—মহারাষ্ট্র সারস্বত

(১০) মালয়ালম

গুণ্ডার্ট—

ক্যাটেকিজমস্ অব মালয়ালম গ্রামার (মাদ্রাজ ১৮৮১)

ফনমেয়ার—

প্রগ্রেসিভ গ্রামার অব মালয়ালম (মাঙ্গালোর ১৮৮৯)

পীট্—

মালয়ালম গ্রামার (কোট্টায়াম ১৮৪১)

CENTRAL LIBRARY

কল্ডউএল—

কম্পারেটিভ গ্রামার অব ড্রাবিডিয়ান লেঙ্গুএজেস্

ফোর্থ রিডার
টুএলফথ্ রিডার
গদ্যমালিকা ২য় ভাগ
হিস্ট্রি অব মালয়ালম লিটারেচার } বেসেল মিশন, মাঙ্গালোর

মেট্রিকুলেশন সিলেক্সন্স্—
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়

(১১) মৈথিলী

গ্রিয়ারসন—

গ্রামার এণ্ড ক্রেষ্টমেথি, ২ খণ্ড

বিদ্যাপতি পদাবলী—

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ, কুমারস্বামী এবং অরুণ সেন)

উমাপতি—পারিজাত হরণ—

গ্রিয়ারসন সম্পাদিত (বিহার এণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ৩য় খণ্ড, ১৯১৭)

গ্রিয়ারসন—

ভার্ণাকুলার লিটারেচার অব হিন্দুস্থান।

(১২) সিংহলী

উইকরেম সিংহে—

সিংহলিজ গ্রামার (লণ্ডন ১৯১৬)

গুণশেখর—

কম্প্রিহেন্সিভ সিংহলী গ্রামার (কলম্বো ১৮৯২)

কুশজাতক কাব্য

গুণবর্ধন—

সুভাসিতয়

সমর শেখর—

দীঘ্‌নিকায়ের সিংহলি অনুবাদ, ১ম খণ্ড
ব্রহ্মজাল সুত্ত, অম্বথ সুত্ত

গুরুলুগোরু—

ওমণ্ডত্তুর, ১ম চারি অধ্যায়, জয়তিলক সম্পাদিত

(১৩) হিন্দী

পাঠ্যগ্রন্থ—

কাশীরাম এবং দ্বারকাপ্রসাদ—তুলসী সংগ্রহ
রামনরেশ ত্রিপাঠী—কবিতা কৌমুদী, ১ম ভাগ
হরিশ্চন্দ্র—সত্য হরিশ্চন্দ্র
অযোধ্যা সিং উপাধ্যায়—ঠেট হিন্দী কাঠ্‌টা
মিশ্র বন্ধু—হিন্দী নবরত্নমালা

ব্যাকরণ—

কেল্লগ্‌গ—হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ
পিনকট্ট—হিন্দী মেন্যুএল
এথরিংটন—ভাষা ভাস্কর
গার্শে-দা-তাসি-ক্রেষ্টমেথিক হিন্দী ও হিন্দুই

সাহিত্যের ইতিহাস—

গ্রিয়ারসন—ভার্ণাকুলার লিটারেচার অব হিন্দুস্থান

বাংলা ব্যতীত এই ১২টি বিকল্পভাষা অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ১৯২০ ইং সর্বপ্রথম বাংলা এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থী নন্‌কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৯২০ ইং মোট ১৬ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ৬ জন অসমীয়া, ২ জন ওড়িয়া এবং ৮ জন হিন্দী বিকল্প ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৯২১ ইং পরীক্ষোত্তীর্ণ ২০ জনের মধ্যে ৬ জন অসমীয়া, ১ জন ওড়িয়া, ১ জন গুজরাটী, ১ জন তামিল, ১ জন তেলুগু, ৮ জন মৈথিলী এবং ৪ জন হিন্দী বিকল্পভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৯২২

CENTRAL LIBRARY

ইং পরীক্ষায় উপরোক্ত ভাষা কয়টি ব্যতীত উর্দু, কানাড়ী, মালয়ালম ও সিংহলী এই ৪টি বিকল্পভাষায় প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২৩ ইং পরীক্ষায় বিকল্পভাষা হিসাবে প্রথম মারাঠী ভাষায় পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। নিম্নে প্রথম ৪ বৎসরের পরীক্ষায় বিকল্পভাষা হিসাবে কোন্ ভাষার পরীক্ষা প্রথম কবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইল –

১৯২০ ইং (প্রথম বৎসর)—অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী

১৯২১ ইং (দ্বিতীয় বৎসর)—গুজরাটী, তামিল, তেলুগু ও মৈথিলী

১৯২২ ইং (তৃতীয় বৎসর)—উর্দু, কানাড়ী, মালয়ালম ও সিংহলী

১৯২৩ ইং (চতুর্থ বৎসর)—মারাঠী

এই বিকল্প ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক ভাষা শিক্ষার্থী একজন করিয়া উপযুক্ত ছাত্রকে মাসিক ১৫ টাকা হারে বৃত্তি এবং বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয় ভাষাবিভাগের পরিচালন সমিতির সভাপতি স্যার আশুতোষ বিকল্পভাষা হিসাবে ১২টি ভাষা অধ্যয়নের জন্য ১২ জন পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি দিয়াছিলেন। পর পর প্রথম দুই বৎসর যাঁহারা বিভিন্ন বিকল্পভাষা অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি পাইয়াছিলেন নিম্নে তাঁহাদের পঠনীয় ভাষা সহ তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল—

অসমীয়া ১৯১৯ ইং যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, বি.এ. (অনার্স)
১৯২০ ইং নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি. এ.

উর্দু ১৯১৯ ইং বিনয়রঞ্জন সেনগুপ্ত, বি. এ.
১৯২০ ইং আবদুল মজিদ, বি.এ (অনার্স সংস্কৃত)

উড়িয়া ১৯১৯ ইং বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, বি. এ. (অনার্স)
১৯২০ ইং উষানাথ সেনগুপ্ত, বি.এ. (অনার্স দর্শন)

কানাড়ী ১৯১৯ ইং নরসিংহকুমার মুস্তোফী, বি. এ.
১৯২০ ইং ধীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, বি. এ.

গুজরাটী ১৯১৯ ইং ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
১৯২০ ইং সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি.এ.

তামিল ১৯১৯ ইং রামচরণ মৈত্র, বি. এ.
১৯২০ ইং প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ

তেলুগু ১৯১৯ ইং বিভূতি কাঁঠাল, বি. এ. (ডিষ্টিংশন)
১৯২০ ইং সত্যরঞ্জন বসু, বি. এ.

মারাঠী ১৯১৯ ইং অম্বিকাচন্দ্র দাস, বি. এ.
১৯২০ ইং মনোমোহন সাহা, বি. এ.

মালয়ালম ১৯১৯ ইং নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি. এ. (ডিষ্টিংশন)
১৯২০ ইং জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বি. এ.

মৈথিলী ১৯১৯ ইং শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, বি.এ. (অনার্স)
১৯২০ ইং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি. এ.

সিংহলী ১৯১৯ ইং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ.(অনার্স)
১৯২০ ইং মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বি. এ.

হিন্দী ১৯১৯ ইং প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, বি. এ. (অনার্স)
১৯২০ ইং শচীন্দ্রনাথ রুদ্র, বি.এ.(অনার্স ইংরাজী)

এই ২৪ জন বৃত্তি প্রাপকের মধ্যে ৮ জন অনার্স ও দুইজন ডিষ্টিংশন প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। প্রথম দলের বৃত্তি ১৯১৯ ইং জুন মাস হইতে এবং দ্বিতীয় দলের বৃত্তি ১৯২০ ইং জুন মাস হইতে দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দলের বৃত্তিপ্রাপকেরা ১৯২১ ইং গৃহীত পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় দলের বৃত্তিপ্রাপকেরা ১৯২২ ইং গৃহীত পরীক্ষা দিয়াছিলেন। হিন্দী, ওড়িয়া ও মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা পরীক্ষণীয় প্রধান ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভের ফলে বিকল্প ভাষারূপে বাংলাভাষা অধ্যাপনারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ফলে বিকল্পভাষার সংখ্যা ১৩ হইয়া পড়ে।

CENTRAL LIBRARY

১৯১৯ হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত যাঁহারা বাংলা ব্যতীত অন্যান্য বিকল্পভাষা পড়াইয়াছিলেন সেইসকল অধ্যাপকদের বর্ণানুক্রমিক ভাষাগত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

অসমীয়া—অম্বিকানাথ বরা, এম. এ. (১৯১৯—১৯৪৪)
তীর্থনাথ শর্মা, এম. এ. (১৯৩৮—১৯৪৪)
যতীন্দ্রপ্রসাদ দোয়ারা (১৯৩৮—১৯৪৩)

উর্দু— এ. সারওয়ার্দি, এম. এ., পি-এইচ. ডি., এম. এল. সি. (১৯১৯—১৯২৫)
মৌলবী শা কলিমুর রহমান, এম. এ. (১৯৩০—)

ওড়িয়া— বিজয়চন্দ্র মজুমদার, এম. এ. (১৯১৯—১৯৩১)
নীলকণ্ঠ দাস, এম. এ. (১৯২০—)
বিনায়ক মিশ্র (১৯২১—১৯৪৪)
মহেশ্বর দাস শর্মা, এম. এ. (১৯৩২—১৯৪৪)

কানাড়ী— পুন আন্নাজি রাও, বি. এস-সি. (১৯১৯—১৯৩১)

গুজরাটী—ডঃ আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা, বি. এ, পি-এইচ. ডি. (১৯১৯—১৯২৮)
হরগোবিন্দ দাস শেঠ (১৯২৬—১৯৩৬)

তামিল— অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, বেদান্ত বিশারদ (১৯১৯—১৯৪২)
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (১৯১৯)

তেলুগু— কে. রঙ্গচারী, বি. এ. (১৯১৯—১৯২১)

মারাঠী— অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকর, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (১৯১৯—১৯২৫, ১৯২৭—১৯২৮)
এস. এন. সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি., (১৯২০—১৯২৫)
পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী (১৯১৯, ১৯২৬—১৯৩৩, ১৯৩৯—১৯৪২)

মালয়ালম—অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার, বি. এ., এল. টি., রাওবাহাদুর (১৯১৯—১৯৩১)

মৈথিলী— পণ্ডিত খুদ্দি ঝা (বনেলী শ্রীনগর বক্তা) (১৯২০—১৯২৬)
গঙ্গাপতি সিং, বি. এ. (টঙ্কনাথ চৌধুরী বক্তা) (১৯২০—১৯২৫)
বদুয়া মিশ্র, জ্যোতিষাচার্য (১৯২৭—১৯৪৪)

সিংহলী— রেভাঃ আর. সিদ্ধার্থ, বি. এ. (১৯১৯—১৯২৭)

হিন্দী— ব্রজমোহন ঠাকুর, এম. এ., বি. এল. (১৯১৯—)
মূলচাঁদ আগরওয়ালা, বি. এ. (১৯১৯—)
গঙ্গাপতি সিং, বি. এ. (১৯১৯—১৯২৫)
নলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ. (১৯২২—১৯৩১)
সকলনারায়ণ শর্মা (১৯২৪—১৯৪৪)
ললিতাপ্রসাদ শুকুল (১৯৩৩—১৯৪৪)

CENTRAL LIBRARY

মৌলিক ভাষা (Basic Language)

১৯১৯ ইং ১৭ই মে তারিখের স্নাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষণবিভাগের পরিচালন সমিতির অধিবেশনে প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষার আনুষঙ্গিক তিনটি মৌলিক ভাষার, যথা—পালি, প্রাকৃত ও ফার্সীর পাঠ্যক্রম গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে এই তিনটি মৌলিক ভাষার মধ্যে যে কোন দুইটি ভাষা লওয়া আবশ্যিক। এম. এ. পরীক্ষার সপ্তম পত্র মৌলিক ভাষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নিম্নে এই তিনটি মৌলিক ভাষার পাঠ্যক্রম উদ্ধৃত হইল।

(১) পালি

এণ্ডারসন—পালি রিডার
ফ্রেণ্ড ফোর্টার—পালি হ্যাণ্ড বুক
মুলার—সিমপ্লিফাইড পালি গ্রামার
ভিক্টর হেনরি—প্রেসি দা গ্রামার পালি
বিধুশেখর শাস্ত্রী—পালিপ্রকাশ

(২) প্রাকৃত

বররুচি—প্রাকৃতপ্রকাশ
রাজশেখর—কর্পূরমঞ্জরী
কাউএল—ইন্ট্রডাকশন টু প্রাকৃত।

(৩) ফার্সী

নিউ পার্শিয়ান সিলেকসন্স (বোর্ড অব এক্জামিনার্স)
কন্ন—সিলেকসন্স ফ্রম পার্শিয়ান প্রোজ এণ্ড পোয়েট্রি
প্লেটস্ এণ্ড রেঙ্কিং—পার্শিয়ান গ্রামার
কন্ন—হিন্টস্ অন দি স্টাডি অব পার্শিয়ান।

এই মৌলিক তিন ভাষা অধ্যাপনার জন্য যাঁহারা অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামসূচী—

পালি—

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ. (১৯১৯—১৯৩৬)
গোকুলদাস দে, এম. এ. (১৯৩৬—১৯৪৩)

প্রাকৃত—

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (১৯১৯)
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. (১৯১৯—১৯৩১)
হরগোবিন্দ শেঠ (১৯৩২—১৯৩৬)
মহেশ্বর দাশশর্মা, এম. এ. (১৯৩৭—৪৪)

ফার্সী—

আগা মোঃ কাজিম সিরাজী (১৯২২—১৯৩৩)
মৌলবী মোঃ ইশাখ, এম. এ., বি. এস-সি., পি-এইচ. ডি. (১৯২৯—৩১)
মৌলবী নাসির আলী খান, এম. এ. (১৯৩২—১৯৪৪)

CENTRAL LIBRARY

নূতন পাঠ্যক্রম ১৯৪১ ইং

১৯১৯ ইং বাংলা এম. এ র জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ১৯৪০ ইং পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই পাঠ্যক্রমের প্রথম চারি পত্র (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পত্র)—বাংলা, পরবর্তী দুই পত্র (৫ম ও ৬ষ্ঠ পত্র)—বিকল্প ভাষা, পরবর্তী পত্র (৭ম পত্র)—মৌলিক ভাষা, শেষ পত্র (৮ম পত্র) বাংলা ভাষাতত্ত্ব। ১৯১৯ হইতে ১৯৪০ ইং পর্যন্ত এই ২১ বৎসর একই পাঠ্যক্রম অনুসৃত হইয়াছিল, যদিও এই ২১ বৎসরের মধ্যে পাঠ্যগ্রন্থ ও পঠনীয় গ্রন্থ সময় সময় পরিবর্তন করা হইয়াছিল। বাংলা এম. এ পরীক্ষার মোট ৮০০ নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বর বিকল্প ভাষার জন্য এবং ১০০ নম্বর মৌলিক ভাষার জন্য নির্দিষ্ট থাকায় বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনে সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুপাতে অল্প ছিল। এই বিষয়ের প্রতি বাংলা সাহিত্যরসিক অনেকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে বাংলা তথা অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের প্রস্তাব আসিতে থাকে। স্যার আশুতোষের উপাচার্য থাকাকালে যে বিভাগের সূত্রপাত, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্য থাকাকালে সেই বিভাগের অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ১৯৪১ ইং হইতে নূতন পাঠ্যক্রম সহ ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই বৎসর পুরাতন পাঠ্যক্রম অনুসারেও পরীক্ষা দিবার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪২ ইং হইতে একমাত্র নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারেই পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। অসমীয়া প্রধান ভাষার প্রথম এম. এ. পরীক্ষা এই নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে ১৯৪০ ইং গৃহীত হয়। পরবৎসর ১৯৪১ ইং বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া ও উর্দু ভাষার নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। বাংলার নূতন পাঠ্যক্রম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আধুনিক ভারতীয় ভাষা বাংলার নূতন পাঠ্যক্রম

প্রথম পত্র—

সাহিত্যের ইতিহাস—নম্বর ১০০

পঠনীয় গ্রন্থ—

রামগতি ন্যায়রত্ন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব

দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেন—মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য (ইং)* (ক. বি.)†

সুশীলকুমার দে—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮০০—১৮১৫) (ইং) (ক. বি.)

দ্বিতীয় পত্র (ক) কবিতা—পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (জন্ম ও বিরহখণ্ড)

বিদ্যাপতি—প্রার্থনা

চণ্ডীদাস—পূর্বরাগ (পদকল্পতরু)

মধুসূদন দত্ত—বীরাঙ্গনা

বিহারীলাল চক্রবর্তী—সারদামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বলাকা

পঠনীয় গ্রন্থ—

সুকুমার সেন—ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস (ইং) (ক. বি.)

মণীন্দ্রমোহন বসু—দীন চণ্ডীদাস (ক. বি.)

* ইং—ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ।

† ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থ।

CENTRAL LIBRARY

শশাঙ্কমোহন সেন—বঙ্গবাণী (ক. বি.)
অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্যজিজ্ঞাসা

(খ) পাঠ্য বহির্ভূত—নম্বর ৩০

তৃতীয় পত্র (ক) গদ্য—পাঠ্য গ্রন্থ—নম্বর ৭০

রামরাম বসু—প্রতাপাদিত্যচরিত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ
ঐ কপালকুণ্ডলা
রমেশচন্দ্র দত্ত—মাধবীকঙ্কণ
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব

পঠনীয় গ্রন্থ—

দীনেশচন্দ্র সেন—বাংলা গদ্যরীতি (ইং) (ক. বি)
সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ্য

(খ) সাহিত্য সমালোচনা—নম্বর ৩০

পঠনীয় গ্রন্থ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য
অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্যজিজ্ঞাসা
অমরেন্দ্রনাথ রায়—সমালোচনাসংগ্রহ (ক. বি.)

চতুর্থ পত্র (ক) নাটক—নম্বর ৭০

মধুসূদন দত্ত—কৃষ্ণকুমারী
দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রফুল্ল
অমৃতলাল বসু—বিবাহবিভ্রাট
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ডাকঘর
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—চন্দ্রগুপ্ত

পঠনীয় গ্রন্থ—

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস, ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা, ১৯২৪ ইং জানুয়ারী সংখ্যা
কুমুদবন্ধু সেন—গিরিশচন্দ্র (ক. বি.)
অমরেন্দ্রনাথ রায়—গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য (ক. বি.)

(খ) প্রবন্ধ—নম্বর ৩০

পঞ্চম পত্র—

বিশেষ যুগ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য [১৪৫০—১৬৫০] নম্বর—১০০

কাশীরাম দাস—মহাভারত (আদিপর্ব)
বিজয় গুপ্ত—পদ্মাপুরাণ
মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গল (ক. বি.)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১ম—৮ম অধ্যায়
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী—পদামৃত-মাধুরী (জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদ মাত্র)

পঠনীয় গ্রন্থ—

শশাঙ্কমোহন সেন—বঙ্গবাণী (ক. বি.)
দীনেশচন্দ্র সেন—চৈতন্য ও তাঁহার যুগ (ইং) (ক. বি.)

ষষ্ঠ পত্র—

বিশেষ যুগ—অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী বাংলা সাহিত্য (১৮৬০—১৯০০) নম্বর—১০০

মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দশমহাবিদ্যা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গল্পগুচ্ছ, ১ম ভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিত্রা

পঠনীয় গ্রন্থ—

প্রিয়রঞ্জন সেন—বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব (ইং) (ক. বি)
হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত—বাংলা কবিতায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের আলোচনা (ইং)
অজিত চক্রবর্তী—কাব্যপরিক্রমা
বিশ্বপতি চৌধুরী—কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম পত্র—

বিকল্প ভাষা—নম্বর ১০০

(ক) সংস্কৃত/ফার্সী [যাহাদের বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত/ফার্সী একটি ভাষা ছিল তাহারা সংস্কৃত/ফার্সী লইতে পারিবেন না।]

অথবা—নিম্নলিখিত যে কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা—(খ) অসমীয়া, (গ) উর্দু, (ঘ) ওড়িয়া, (ঙ) মৈথিলী, (চ) হিন্দী।

(ক) (i) সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ নম্বর ৭০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মাধ্যমিক সংস্কৃতচয়ন শেষ সংস্করণ। ব্যাকরণ—নম্বর ৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

(ক) (ii) ফার্সী পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

জে. বি. কঙ্গ এবং পি. কে. কঙ্গ—জেমস্ অব পার্শীয়ান প্রোজএণ্ড পোয়েট্রি (পৃ.১—৫২); ব্যাকরণ—নম্বর ৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

(খ) অসমীয়া পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

মনোমতী—রজনীকান্ত বড়দলৈ, কবিতাকুঞ্জ—লক্ষীশ্বর শর্মা; ব্যাকরণ—নম্বর ৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

(গ) উর্দু পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

আজিজ মির্জা—ওইক্রম আকসি, ইকবাল—তারানা, ব্যাকরণ—নম্বর ৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

(ঘ) ওড়িয়া পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

ফকিরমোহন সেনাপতি—আত্মচরিত

নন্দকিশোর বল—নির্ঝরিণী

ব্যাকরণ—নম্বর ৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

(ঙ) মৈথিলী পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

বিদ্যাপতি—পদাবলী (গ্রিয়ার্সনের মৈথিলী ক্রেষ্টমেথি), মনোবোধ—কৃষ্ণজন্ম, ঈশনাথ ঝা—মৈথিলী শকুন্তলা নাটক, রামনাথ ঝা—উদয়নকথা; ব্যাকরণ—৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

(চ) হিন্দী পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৭০

মেঘনাদবধ—মধুপ অনূদিত, ১ম সর্গ

ব্যাকরণ—নম্বর ৩০, কোন গ্রন্থ নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

অষ্টম পত্র—

[ক] প্রারম্ভিক মধ্য-ভারতীয়-আর্যভাষা পাঠ্যগ্রন্থ—নম্বর ৫০

(Elementary Middle Indo-Aryan Texts.)

(i) পালি—নম্বর ২৫

ইন্টারমিডিয়েট পালি সিলেক্সনস্ (ক. বি., শেষসংস্করণ), নিম্নলিখিত অধ্যায় মাত্র—চারিটি শুভনিমিত্ত, বুদ্ধের বিরুদ্ধে দেবদত্তের ষড়যন্ত্র

গাথা—পুন্নিকা ও মহাপজ্জাপতী গোতমী

ব্যাকরণ—পঠনীয় গ্রন্থ

ই. মুলার—সিম্প্লিফাইড পালি গ্রামার

ঘোষ এবং চক্রবর্তী—পালি গ্রামার

বিধুশেখর শাস্ত্রী—পালিপ্রকাশ

(ii) প্রাকৃত—নম্বর ২৫

রাজশেখর—কর্পূরমঞ্জরী, ১ম অঙ্ক

ব্যাকরণ—পঠনীয় গ্রন্থ

বররুচি—প্রাকৃতপ্রকাশ

উলনার—ইন্ট্রোডাকশন টু প্রাকৃত (প্রাকৃতের উপক্রমণিকা)

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ ১৯০৯ ইং জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাস দীনেশচন্দ্র সেন 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন যুগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্য যুগ পর্যন্ত' (History of the Bengali Language and Literature from the earliest times down to the middle of the 19th Century) বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাসমূহই পরে 'History of Bengali Language and Literature' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯১১ ইং প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯১৩ ইং দীনেশচন্দ্র 'মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য' (Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal) সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯২৩ ইং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

২ রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ (Ramtanu Lahiri Research Fellowship) (১৯১২ ইং)

১৯০৮ ইং ২৭শে আগষ্ট তারিখে শরৎ কুমার লাহিড়ী তাঁহার পিতা রামতনু লাহিড়ীর স্মৃতিরক্ষা কল্পে তাঁহার প্রকাশিত লাহিড়ীজ সিলেক্ট পোয়েমস্ (Lahiri's Select Poems.) গ্রন্থের সর্বস্বত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এই গ্রন্থ বিক্রয় হইতে যে আয় হইবে তাহা দ্বারা প্রতি বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় দর্শন বিষয়ে (Mental and Moral Philosophy) প্রথম স্থান অধিকারকারী ছাত্রকে একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। 'সিলেক্ট পোয়েমস্'-এর স্বত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত হইয়াছিল। ১৯১১ ইং হিসাব লইয়া দেখা গেল যে এই গ্রন্থ বিক্রয়ের ফলে আশাতীত অর্থাগম হইয়াছে। ১৯১১ ইং ২৭শে মে তারিখের সিণ্ডিকেট স্বর্ণপদকের সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, স্থির হয় দুইটি পদক দেওয়া হইবে। একটি দাতার পিতা স্বর্গত রামতনু লাহিড়ীর নামে, অপরটি তাঁহার মাতা শ্রীমতী গঙ্গামণির নামে। পরে দেখা গেল দুইটি স্বর্ণপদক দিয়াও এই 'কাণ্ডে' (তহবিলে) অনেক টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ১৯১২ ইং দাতার পরামর্শানুসারে এবং সিনেটের অনুমোদন ক্রমে A Research Fellowship in the History of the Bengali Language and Literature নামক গবেষণা বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' পাইয়াছিলেন। তিনি ১৯১৩—১৯৩২ ইং পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম এই ফেলোশিপের জন্য মাসিক বৃত্তি ২৫০ টাকা নির্দিষ্ট ছিল।

ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ও পরে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি বক্তৃতামালার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল বক্তৃতামালাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমভাগে শুধু বাংলা চর্চার জন্য সৃষ্ট বক্তৃতামালা, দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা চর্চার জন্য সৃষ্ট বক্তৃতামালা।

শুধু বাংলা চর্চার জন্য সৃষ্ট বক্তৃতামালা—

১ গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা (১৯২০ ইং)

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২০ ইং তারিখের স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের পরিচালন সমিতির কার্যবিবরণী ত গোপালদাস চৌধুরী, এম.এ., বি. এল. তাঁহার নামে তিন বৎসরের জন্য বাংলা বিভাগে একটি বক্তার পদ (লেকচারের

CENTRAL LIBRARY

পদ) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১২০০ টাকা করিয়া দানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। পরবর্তী ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির অধিবেশনে সম্পাদক জানান যে গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতার জন্য প্রথম বর্ষের ব্যয় বাবত ১২০০ টাকার একটি চেক ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ঐ সভায় দাতাকে পরিচালন সমিতির ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম অভয় কুমার গুহকে (১৯২০ ইং) মাসিক ১০০ টাকা বেতনে গোপালদাস চৌধুরী বক্তা নিয়োগ করা হইয়াছিল। ১৯২২ ইং অভয় কুমার গুহর স্থলে শশাঙ্কমোহন সেনকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়।

২ গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা (১৯৩০ ইং)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতিরক্ষা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মন্মথমোহন বসু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি বক্তৃতামালা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৩০০০ টাকা মূল্যের জি. পি. নোট দান করেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি এক বৎসর অন্তর বাংলা ভাষায় অন্ততঃ দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য সিন্ডিকেট একজন বক্তা নিয়োগ করিবেন। বক্তৃতার বিষয় হইবে—'বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন একটি বিষয়।' অবশ্য প্রথম ৫টি বক্তৃতা গিরিশচন্দ্র রচিত নাটক ও নাটকের প্রভাব সম্পর্কে দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) উপাচার্য, (২) কলাবিভাগের, (৩) সংস্কৃত-ভাষা-বিভাগের, (৪) ভারতীয় ভাষাবিভাগের এবং (৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মনোনীত এক এক জন সদস্য অর্থাৎ মোট ৫ জন সদস্য লইয়া এক সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতি বক্তৃতা দিবার জন্য উপযুক্ত বক্তা নির্বাচন করিবেন। বক্তাকে এককালীন ২০০ টাকা দক্ষিণা দিতে হইবে। এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থস্বত্ব বক্তার থাকিবে। এই বক্তৃতা একবার যিনি দিয়াছেন, তিনি পরবর্তী ৮ বৎসর কালের মধ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব ১৯৩০ ইং ১৩ই জুন তারিখের সিন্ডিকেটে গৃহীত হয়। এই বক্তৃতা দিবার জন্য ১৯৩১ ইং বিপিনচন্দ্র পালকে বক্তা মনোনীত করা হয়। বিপিনচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., বি. এল. মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বক্তা নির্বাচিত হন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—'আধুনিক বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের স্থান।'

৩ লীলা বক্তৃতা (১৯৪৩ইং)—লীলা পুরস্কার দ্রষ্টব্য

বিশেষ বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিকে কয়েকটি নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিম্নে কালানুক্রমিক কয়েকজন বক্তার নাম ও প্রস্তাবিত বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করা হইল—

CENTRAL LIBRARY

বৎসর	বক্তা	বক্তৃতার বিষয়
১) ১৯১৯ইং	স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি. লিট, এন. এল	বাংলা ছন্দ
২) ঐ	জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.	সমসাময়িক বাংলা এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা
৩) ঐ	অভয়কুমার গুহ, এম. এ., বি. এল.	চৈতন্যচরিতামৃতের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণব দর্শনের আধ্যাত্মিক বিচার
৪) ঐ	শশাঙ্কমোহন সেন, বি. এল.	বাংলা সাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ
৫) ঐ	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এম. এ.	বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস
৬) ১৯২০ইং	দীননাথ সান্যাল, বি. এ., এম. বি.	মেঘনাদবধ কাব্য
৭) ১৯২৯ইং	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ ঐস্লামিক বিষয়ে আলোচনায় উৎসাহ-দানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালার প্রবর্তন করেন এবং ঐ বক্তৃতা দিবার মাধ্যমত্রয়ের মধ্যে বাংলা ভাষাকেই প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। যথা—

স্যর আবদুল্লা সারওয়ার্দি বক্তৃতা (১৯৩৮ ইং)

স্যর হাসান সারওয়ার্দি তাঁহার ভ্রাতা মৃত আবদুল্লা সারওয়ার্দির স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০ টাকা দান করেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর ঐস্লামিক চিন্তাধারা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে অন্ততঃ তিনটি বক্তৃতা দিবার প্রস্তাব করা হয়। এই বক্তৃতা বাংলা, উর্দু, অথবা ইংরাজী ভাষায় দিতে হইবে। একবার যিনি বক্তৃতা দিয়াছেন তিনি পরবর্তী ৯ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইবেন না। এই প্রস্তাব ১৯৩৮ ইং ২৫ মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হইয়াছিল।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষা চর্চার জন্য সৃষ্ট বক্তৃতামালা

(ক) মৈথিলী ভাষার জন্য

(১) টঙ্কনাথ চৌধুরী বক্তৃতা, মাসিক ১০০ টাকা, ১৯১৯ ইং

(২) বনেলী শ্রীনগর বক্তৃতা, মাসিক ১০০ টাকা, ১৯১৯ ইং *

(খ) ওড়িয়া ভাষার জন্য

(১) মহারাজ শোনপুর বক্তৃতা, মাসিক ১৫০ টাকা (প্রথম)

(২) মহারাজ শোনপুর বক্তৃতা, মাসিক ১৫০ টাকা (দ্বিতীয়) †

* প্রধান ভাষা মৈথিলী দ্রষ্টব্য

† প্রধান ভাষা ওড়িয়া দ্রষ্টব্য

CENTRAL LIBRARY

সহকারী গবেষক

[ক] শরৎকুমার লাহিড়ী সহকারী গবেষক

১৯১৯ ইং ১লা জুন হইতে 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে' শরৎকুমার লাহিড়ী সহকারী গবেষক পদে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এম. এ.কে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইঁহার গবেষণার বিষয় ছিল 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব'।

[খ] রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক

১৯১৯ ইং ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির পর ১৯২০ ইং সর্বপ্রথম উক্ত বিভাগের প্রধান ভাষা বাংলা বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২১ ইং ১৩ই এপ্রিল তারিখের স্নাতকোত্তর সাহিত্য বিভাগের পরিচালন সমিতি ৪ জন গবেষক নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রত্যেক গবেষককে মাসিক ১০০ টাকা হারে বৃত্তি দিবার এবং ১লা জুন ১৯২১ ইং হইতে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। প্রথম দলের এম. এ. বাংলা পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ৪ জন গবেষক নির্বাচন করা হইয়াছিল এবং কে কোন্ বিষয়ে গবেষণা করিবেন তাহাও নির্দেশ করা ছিল। রামতনু লাহিড়ী তহবিল হইতে ইঁহাদের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হয়।

১৯২১ ইং

(১) বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে প্রথম, ১৯২০ ইং ; এম. এ. ইংরাজী, দ্বিতীয় বিভাগে অষ্টম, ১৯১৮ ইং) গবেষণার বিষয়—বাংলা ভাষাতত্ত্ব।

(২) মণীন্দ্রমোহন বসু (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে তৃতীয়, ১৯২০ ইং) গবেষণার বিষয়—সহজিয়া মতবাদের বিস্তৃতি।

(৩) রাখালরাজ রায় (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে চতুর্থ, ১৯২০ ইং) গবেষণার বিষয়—বৈষ্ণব পদাবলী।

(৪) তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত (এম. এ.—বাংলা, দ্বিতীয় বিভাগে পঞ্চম, ১৯২০ইং ; এম. এ—ইতিহাস, তৃতীয় বিভাগে দশম, ১৯১৮ ইং) গবেষণার বিষয়—প্রাক্ উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সমাজ-জীবন।

বরদাপ্রসাদ প্রামাণিকের অকালমৃত্যুতে ১৯২১ ইং ৯ই জুলাই তারিখের ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির সভায় রমেশচন্দ্র বসুকে (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়, ১৯২০ ইং) রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক নিযুক্ত করা হয়। ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের জন্য ইনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯২৫ ইং

(১) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম. এ. সংস্কৃত, তৃতীয় বিভাগ Group H. ১৯১৩ ইং) রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক নিযুক্ত হন। গবেষণার বিষয়—'বীরভূম জেলার ভাষা'। ইনি ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৬ ইং ঐ পদে ইস্তফা দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার রূপে যোগ দেন। ঢাকার কাজে যোগ দিয়া, তিন বৎসর পরে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হয় নাই।

CENTRAL LIBRARY

১৯২৬ ইং

(১) বিশ্বপতি চৌধুরী (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে সপ্তম, ১৯২১ ইং) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৬ ইং হইতে ঐ পদে নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত বিবরণী হইতে জানিতে পারিতেছি যে ঐ পদের জন্য সুকুমার সেন অন্যতম প্রার্থী ছিলেন।

১৯৩৩ ইং

এই বৎসর নিম্নলিখিত ৫ জনকে রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেককে মাসিক ৭৫ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল।

(১) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে চতুর্থ, ১৯৩১ ইং) ৩রা এপ্রিল ১৯৩৩ ইং যোগ দেন এবং ৩০শে জুন ১৯৪১ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(২) মোহাম্মদ এনামুল হক (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে প্রথম, ১৯২৯ ইং) ১লা জুলাই ১৯৩৩ ইং যোগ দেন এবং ২১শে জুলাই ১৯৩৫ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(৩) প্রমথনাথ বিশী (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে প্রথম, ১৯৩২ ইং) ৩রা এপ্রিল ১৯৩৩ ইং যোগ দেন এবং ১৩ই জুলাই ১৯৩৫ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(৪) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়, ১৯৩০ ইং) ইঁহাকে রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক (Special) হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইনি ১৯৩৪ ইং ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(৫) মুন্সী জসিমুদ্দিন (এম.এ.—বাংলা, দ্বিতীয় বিভাগে অষ্টম, ১৯৩১ ইং) ইনি ১৯৩৭ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬ই আগস্ট হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ ইং পর্যন্ত ইঁহাকে বিনা বেতনে ছুটী মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

১৯৩৫ ইং

মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী (এম. এ.—বাংলা, তৃতীয় বিভাগে প্রথম, ১৯৩২ ইং) ইনি ১লা অক্টোবর ১৯৩৫ ইং যোগ দেন এবং ৩১শে মে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৩৬ ইং

(১) নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (এম.এ.—বাংলা, দ্বিতীয় বিভাগে তৃতীয়, ১৯২৩ ইং) ইনি ১৬ই জুলাই ১৯৩৬ ইং যোগ দেন এবং ৩১শে মে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাকে পরিভাষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছিল।

(২) শশিভূষণ দাশগুপ্ত (এম. এ.—বাংলা প্রথম বিভাগে প্রথম, ১৯৩৫ ইং) ইনি ১৪ জুলাই ১৯৩৬ ইং প্রমথনাথ বিশীর স্থলে যোগ দেন এবং ৩০শে জুন ১৯৩৯ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৪০ ইং

যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়, ১৯৩৫ ইং) ইনি ২রা জানুয়ারী ১৯৪০ ইং এই পদে নিযুক্ত হন।

CENTRAL LIBRARY

১৯৪১ ইং

হরপ্রসাদ মিত্র (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে প্রথম, ১৯৪০ ইং) ইনি ১লা জুন ১৯৪১ ইং যোগ দেন এবং ৩১ মে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৪৩ ইং

মদনমোহন কুমার (এম. এ.—বাংলা, প্রথম বিভাগে প্রথম, ১৯৪২ ইং) ইনি ১লা জানুয়ারী ১৯৪৩ ইং যোগ দেন এবং ৩১ মে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

পদক ও পুরস্কার

বাঙ্গালীর গৌরব তাহার প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে বিশেষ মর্যাদাদানের উদ্দেশ্যে ও বাংলা গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় এবং বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বপ্রদর্শনের জন্য পদক, পুরস্কার প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল পদক ও পুরস্কার সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। [ক] মহিলাদের জন্য, [খ] পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে জনসাধারণের জন্য এবং [গ] এম. এ. বাংলা পরীক্ষায় কৃতিত্বপ্রদর্শনকারী ছাত্রদের জন্য। নিম্নে কালানুক্রমিক এই সকল পদক পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রথম পদক পুরস্কার প্রাপকের নাম দেওয়া গেল—

ক) শুধু মহিলাদের জন্য—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী মহিলাদিগকে উৎসাহিত করার আগ্রহে নিম্নলিখিত চারিটি পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, যথা—

মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদক এবং নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক (১৯১২ ইং)

অনাথনাথ দেব ৫০০০ টাকা মূল্যের 'পোর্ট ট্রাষ্ট ডিভেঞ্চার' বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদক এবং নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক দানের প্রস্তাব করেন। মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদক—বাংলাভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মহিলা স্নাতককে দিতে হইবে। প্রবন্ধের বিষয় ঐতিহাসিক বা জীবনীমূলক হইবে এবং ইহা একবৎসর পূর্বে সিণ্ডিকেট ঘোষণা করিবেন।

নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক—বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মহিলা স্নাতক পাইবেন। বিষয় সিণ্ডিকেট এক বৎসর পূর্বে নির্ধারণ করিবেন। ১৯১২ ইং ৯ই মার্চ তারিখের সিনেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদক প্রাপক—১৯১২ ইং, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বিষয়—চৈতন্যজীবনী।

প্রথম নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক প্রাপক—১৯১২ ইং, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বিষয়—ভারতে সম্রাটাগমন।

নগেন্দ্রনন্দিনী স্বর্ণপদক (১৯১৯ ইং)

অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস., বি. দে এবং তাঁহার বিবাহিতা কন্যা, বি. দে-র মৃতা পত্নী নগেন্দ্রনন্দিনী দে-র স্মৃতিরক্ষাকল্পে যথাক্রমে ৮০০ টাকা ও ৪০০ টাকা মূল্যের জি. পি. নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং এই

CENTRAL LIBRARY

অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন 'প্রাক্-স্নাতক বা স্নাতক মহিলা গৃহিণীর কর্ত্তব্য' বা এতৎ জাতীয় কোন বিষয় সম্পর্কে ইংরাজী অথবা বাংলাভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য এই পদক পাইবেন। ১৯১৯ ইং ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই স্বর্ণপদকের প্রথম প্রাপক—১৯৩৮ ইং নীহার দাশগুপ্তা, বিষয়—গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৩২ ইং)

সুখেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনীর নামে একটি স্বর্ণপদক দিবার উদ্দেশ্যে ১০০০ টাকা মূল্যের জি. পি. নোট দান করেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর, বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একজন মহিলাকে এই স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) সাহিত্য বিভাগের, (২) বিজ্ঞান বিভাগের, (৩) ভারতীয় ভাষা বিভাগের ও (৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন করিয়া মনোনীত সদস্য এবং সিণ্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কলেজের বাংলার অধ্যাপককে লইয়া ৫ ব্যক্তির এক বিশেষ সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতি উক্ত পদকের জন্য উপযুক্ত মহিলা নির্বাচন করিবেন। এই পদক একই মহিলাকে একাধিকবার দেওয়া চলিবেনা। এই প্রস্তাব ১৯৩২ ইং জুলাই তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হয়। এই পদকের প্রথম প্রাপক—১৯৩৫ইং —মানকুমারী বসু।

লীলা বক্তৃতা ও পুরস্কার (১৯৪৩ ইং)

রমেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার কন্যা, বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চারতা লীলাদেবীর (চৌধুরীর) অকালমৃত্যুতে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ৭৫০০ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এই টাকার সুদ হইতে পর পর প্রতি দুই বৎসরের মধ্যে প্রথম বৎসর লীলা পুরস্কার, দ্বিতীয় বৎসর লীলা বক্তৃতার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্যে (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, (২) সংস্কৃত ভাষাবিভাগের, (৩) ভারতীয় ভাষাবিভাগের, (৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (৫) এবং দাতার মনোনীত একজন করিয়া সদস্য অর্থাৎ মোট ৫ জন সদস্যের এক বিশেষ সমিতি লীলা পুরস্কার প্রাপক এবং লীলা বক্তৃতা দানের জন্য বক্তা নির্বাচন করিবেন। বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য একজন বাঙ্গালী মহিলাকে এই পুরস্কার দিতে হইবে। নির্বাচিত বক্তাকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর অন্ততঃ তিনটি বক্তৃতা দিতে হইবে। উপরোক্ত বিশেষ সমিতি বক্তৃতার বিষয় স্থির করিয়া দিবেন। বক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মহিলা গবেষককে প্রাধান্য দিতে হইবে। এই বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিবেন। প্রকাশিত গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে গ্রন্থমুদ্রণ ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ বক্তা পাইবেন। গ্রন্থস্বত্ব বক্তারই থাকিবে। এই পুরস্কারের নগদ মূল্য ১০০ টাকা। বক্তৃতার নগদ মূল্য অন্যূন ৪০০ টাকা। এই পুরস্কার একবার যিনি পাইয়াছেন, অথবা এই বক্তৃতা একবার যিনি দিয়াছেন তিনি পরবর্তী ৯ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার পুরস্কার পাইবার বা বক্তৃতা দিবার অধিকারী হইবেন না। এই প্রস্তাব ১৯৪৩ ইং ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হয়।

এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক—১৯৪৪ ইং শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর।

CENTRAL LIBRARY

এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তা—১৯৪৫ ইং শ্রীমতী অনুরূপা দেবী—বিষয় 'সাহিত্যে নারী—স্রষ্টা ও সৃষ্টি'।

খ) পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে জনসাধারণের জন্য—

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২১ ইং)

মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতার নামানুসারে প্রতি এক বৎসর অন্তর ২০০ টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণপদক দিবার জন্য ৩০০০ টাকা মূল্যের 'গভর্ণমেন্ট সিকিওরিটি' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এই স্বর্ণপদক বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) সাহিত্য বিভাগের, (২) বিজ্ঞান বিভাগের, (৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নির্বাচিত একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং (৪-৫) ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির দুইজন প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট ৫ জন সদস্যের এক বিশেষ সমিতি এই পদক দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করিবেন। যিনি একবার এই পদক পাইয়াছেন তিনি পরবর্তী ১০ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় পদক পাইবার অধিকারী হইবেন না। এই প্রস্তাব ১৯২১ ইং ২২শে এপ্রিল তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হয়। প্রথম পদক প্রাপক—১৯২১ইং—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি. লিট., এম. এল.।

সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (১৯৩৯ ইং)

ময়ূরভঞ্জ স্টেটের অন্তর্গত বারিপদা নিবাসী সরকারী পেনসনার রমেশচন্দ্র বসু তাঁহার স্বর্গতা পত্নী সরোজিনী বসুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ২৬০০ টাকা মূল্যের জি. পি. নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষককে স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্যের এক বিশেষ সমিতি এই পদকের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করিবেন (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—সভাপতি, (২) সাহিত্য বিভাগের, (৩) ভারতীয় ভাষাবিভাগের, (৪) এশিয়াটিক সোসাইটির এবং (৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে। ১৯৩৯ ইং ১১ই নবেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পদকের প্রথম প্রাপক—১৯৪০ ইং যোগেশচন্দ্র রায়, এম. এ., বিদ্যানিধি।

বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বপ্রদর্শনের জন্য

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির অব্যবহিতপূর্বে এবং পরে উক্ত বিভাগের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে আটটি পদক ও পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। নিম্নে কালানুক্রমিক এইসকল পদক ও পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রথম প্রাপকের নামসহ দেওয়া গেল—

১ ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক (১৯১৮ ইং)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য স্কটিশচার্চ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক অবরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম.এ., বি.এল. স্নাতকোত্তর ভারতীয় ভাষাবিভাগের ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য তাঁহার মাতা ব্রহ্মময়ী

CENTRAL LIBRARY

দেবীর নামে এক স্বর্ণপদক দানের প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্যে স্নাতকোত্তর-বিভাগ পরিচালন সমিতির সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ২৫০০ টাকা মূল্যের জি. পি. নোট দান করেন। এই পদক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রধান ভাষা বাংলার যে ছাত্র পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন তাহাকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাব ১৯১৮ ইং ২৩শে নবেম্বর তারিখের সিনেটে গৃহীত হয়।* পরবর্তীকালে ১৯৩০ ইং ১৩ই মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেটে এই পদক দানের নিয়ম নিম্নলিখিত মর্মে সংশোধন করা হইয়াছিল—এই পদকের প্রাপক নির্বাচনে শুধু বাংলা পরীক্ষার নম্বর বিবেচিত হইবে, মৌলিক এবং বিকল্প ভাষা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচিত হইবে না। এই পদকের প্রথম যুগ্ম প্রাপক—১৯২০ ইং—প্রিয়রঞ্জন সেন ও রমেশচন্দ্র বসু।

২ ক্ষেত্রমণি পুরস্কার (১৯১৯ ইং)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য বি. সি. বসু, এম. এ. তাঁহার মাতা স্বর্গতা ক্ষেত্রমণি দাসীর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে, মাতার নামানুসারে এই পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫০০ টাকার জি. পি. নোট দান করেন এবং এই অর্থের সুদ হইতে এম. এ. বাংলা পরীক্ষায় কৃতিত্বপ্রদর্শনকারী ছাত্রকে প্রতি বৎসর গ্রন্থ পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ১৯১৯ ইং ২৩শে আগষ্ট তারিখের সিনেটে গৃহীত হয়। এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক—১৯২১ ইং—বিভূতিভূষণ কাঁঠাল।

৩ দুর্গামণি দেবী স্বর্ণপদক (১৯১৯ ইং)

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০০ টাকার জি. পি. নোট দান করেন এবং এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি এক বৎসর অন্তর ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। ১৯১৯ ইং ২৩শে আগষ্ট তারিখের সিনেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই স্বর্ণপদক ১৯২০ ইং প্রথম দেওয়া হইয়াছিল। যুগ্ম প্রাপক—১৯২০ ইং বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক ও প্রিয়রঞ্জন সেন।

৪ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রৌপ্যপদক (১৯২০ ইং)

স্যার আশুতোষের সম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, কণ্ট্রোলার ও প্রেসের কর্মচারীবৃন্দ ৫০০ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং এই টাকার সুদের দ্বারা ভারতীয় ভাষাবিভাগের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে প্রতি বৎসর একটি রৌপ্যপদক দিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ১৯২০ ইং ৭ই মে তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩০ ইং ১৩ই মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেটে স্থির হয় যে এই পদক 'মৌলিক' এবং 'বিকল্প ভাষা'র নম্বর বাদ দিয়া শুধু বাংলায় যিনি সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছেন এমন ছাত্রকে দেওয়া হইবে। এই পদকের প্রথম যুগ্ম প্রাপক—১৯২০ ইং—প্রিয়রঞ্জন সেন ও রমেশচন্দ্র বসু।

* বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যালেণ্ডারে ভুলবশতঃ ১৯৩৮ ইং ছাপা হইয়াছে। তুলনীয়—The Calendar, 1956, p. 508.

CENTRAL LIBRARY

৫ রামাইচন্দ্র মিত্র পুরস্কার (১৯২০ ইং)

ললিতচন্দ্র মিত্র তাহার মৃত পুত্র রামাইচন্দ্র মিত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ১০০০টাকা মূল্যের জি.পি. নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর নগদ ৩৫ টাকা মূল্যের বাংলা বই এম. এ. বাংলা পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্বাধিক নম্বর পাইবে তাহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। প্রাপকের নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই পুরস্কার প্রদাতার পিতামহ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের কোন গ্রন্থ থাকা আবশ্যিক। ১৯২০ ইং ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পুরস্কারের প্রথম যুগ্ম প্রাপক—১৯২০ ইং—প্রিয়রঞ্জন সেন ও রমেশচন্দ্র বসু।

৬ যদুনাথ-মহালক্ষ্মী রৌপ্যপদক (১৯২১ ইং)

ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল. উকিল তাঁহার পিতা স্বর্গত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরকারী উকিল, কৃষ্ণনগর) এবং স্বর্গতা মাতা মহালক্ষ্মীদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ১০০০ টাকার জি. পি. নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং এম. এ. বাংলা পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর প্রাপক অথচ অন্য কোন পদক পান নাই তেমন ছাত্রকে ঐ পদক প্রতি বৎসর দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ১৯২১ ইং ২৯শে জানুয়ারী তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩০ ইং ১৩ই মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেটে স্থির হয় যে এই পদক বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারীকে দেওয়া হইবে। ১৯৩৬ ইং ২৪শে সেপ্টেম্বরের সিণ্ডিকেটে রৌপ্যপদকের পরিবর্তে স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পদকের প্রথম প্রাপক—১৯২১ ইং—বিভূতিভূষণ কাঁঠাল।

৭ অন্নপূর্ণা দেবী স্বর্ণপদক (১৯২১ ইং)

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, তাঁহার নামে প্রতি বৎসর একটি স্বর্ণপদক দিবার উদ্দেশ্যে ২০০০ টাকা মূল্যের জি. পি. নোট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন এবং এই অর্থের সুদ হইতে বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারীকে প্রতি বৎসর একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ১৯২১ ইং ১১ই মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেটে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী ১৯৩০ ইং ১৩ই মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেট স্থির করেন যে এই পদক বাংলা এম.এ. পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর প্রাপককে দিতে হইবে। এই স্বর্ণপদকের প্রথম প্রাপক—১৯২১ ইং—সুধালতা দুয়ারা।

৮ চন্দ্রনাথ শ্রীনাথ কুণ্ডু স্বর্ণপদক (১৯২৩ ইং)

কলিকাতা বাগবাজার ৫ নং নন্দলাল বসু লেনের চন্দ্রনাথ কুণ্ডু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ টাকা দান করেন এবং এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর 'ভারতীয় ভাষা' বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর প্রাপককে 'চন্দ্রনাথ শ্রীনাথ কুণ্ডু' স্বর্ণপদক দিবার প্রস্তাব করেন। ১৯২৩ ইং ৩ মার্চ তারিখের সিনেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পদকের প্রথম প্রাপক—১৯২৩ ইং—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

CENTRAL LIBRARY

স্যার আশুতোষ পুরস্কার

উপরে উল্লিখিত পদক ও পুরস্কার ব্যতীত ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির পর প্রধান ভাষা বাংলার পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হইত। এই প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হইতেন তাহাকে বই ক্রয়ের জন্য 'স্যার আশুতোষ পুরস্কার' বাবত নগদ টাকা দেওয়া হইত।*

ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির অব্যবহিতপূর্বে ১৯১৮ ইং ২৩শে নবেম্বর তারিখে প্রস্তাবিত বিভাগের ছাত্রদের জন্য একটি স্বর্ণপদক ঘোষিত হইয়াছিল। ১৯১৯ ইং হইতে ১৯২৩ ইং পর্যন্ত এই ৫ বৎসরের মধ্যে এই নবস্থাপিত বিভাগের ছাত্রদের উৎসাহবর্ধনের জন্য আরও পাঁচটি পদক ও দুইটি পুরস্কার ঘোষিত হয়। ১৯২৪ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আর কোন পদক বা পুরস্কার ঘোষিত হয় নাই। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির প্রথম ৫।৬ বৎসরের মধ্যে লক্ষ্য করি তাহা পরবর্তী যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে স্তিমিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করার কারণ আছে।

ভারতীয় ভাষাবিভাগের প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষার কয়েক বৎসরের ফল পর্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান ভাষা বাংলায় সর্বাধিক নম্বর না পাইয়াও কেহ কেহ মৌলিক এবং বিকল্প ভাষায় অধিক নম্বর পাইয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এইসকল বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া ১৯৩০ ইং ১৩ই মার্চ তারিখের সিণ্ডিকেটে পদক ও পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে মৌলিক ও বিকল্প ভাষার নম্বর ব্যতীত শুধু প্রধান ভাষা বাংলার সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপককে পদক ও পুরস্কার দানের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কয়েকটি প্রধান ভাষার সাহিত্য-সঙ্কলন প্রকাশ

ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির পূর্বে ও পরে এই বিভাগে প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃত বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, গুজরাটী, মৈথিলী, উর্দু ও অসমীয়া প্রভৃতি সাতটি ভাষার মধ্যে একমাত্র মৈথিলী ব্যতীত অপর ছয়টি ভাষার সাহিত্য-সঙ্কলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে এই সকল সঙ্কলন গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল—

ভাষা	প্রকাশকাল	গ্রন্থের নাম	সম্পাদক	খণ্ড/সংখ্যা
বাংলা	১৯১৪ ইং	বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (Typical Selections from Bengali Literature Part I & II)	দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ., ডি. লিট.	১ম ও ২য় ভাগ
হিন্দী	১৯২৯ ইং	হিন্দী সাহিত্য-সঙ্কলন (Selections from Hindi Literature)	রায়বাহাদুর লালা সীতারাম বি. এ., সাহিত্যরত্ন, হিন্দী সুধাকর	১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড, ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১ম ভাগ, ঐ ২য় ভাগ (১৯২১-১৯২৫)
ওড়িয়া	১৯২১ ইং	ওড়িয়া সাহিত্যের আদর্শ সঙ্কলন (Typical Selections from Oriya Literature)	বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল.	১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড (১৯২১-১৯২৫)

* ১৯১৮ ইং এই নগদ পুরস্কার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শোভা সেনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

CENTRAL LIBRARY

ভাষা	প্রকাশকাল	গ্রন্থের নাম	সম্পাদক	খণ্ড/সংখ্যা
অসমীয়া	১৯২৩ ইং	অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী (Typical Selections from Assamese Literature)	পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী এম. আর. এ. এস., এফ. আর. এ. এস., হেমকোষ সম্পাদক	১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড-১ম ভাগ, ২য় খণ্ড-২য় ভাগ, ২য় খণ্ড-৩য় ভাগ, ২য় খণ্ড-৪র্থ ভাগ ; ৩য় খণ্ড ১ম ভাগ ও ৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ (১৯২৩-১৯৩০)
গুজরাটী	১৯২৫ ইং	প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্য-সঙ্কলন (Selections from Classical Gujrati Literature)	ডক্টর আই. জে. এস. তারাপুরওয়ালা, বি.এ. পি. এইচ. ডি.	১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড (১৯২৫-১৯৩৭)
উর্দু		উর্দু সঙ্কলন (University Urdu Selections.)		

এস্থলে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে ইন্দোরের মহারাজা হোলকার জি. সি. আই. ই. মারাঠা সাহিত্যের একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৯২০ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বাংলা সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। যথা—

সম্মানিত ডি. লিট. উপাধি

১৯৪৪ ইং পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের বাংলা সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানিত ডি. লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল—

বৎসর	প্রাপক
১৯১৩ ইং	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এন. এল.
১৯২১ ইং	দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ.

১৯৪৪ ইং পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে মাত্র একজন বাংলার এম. এ. সম্মানিত ডি. লিট. উপাধি লাভ করিয়াছেন—

বৎসর	প্রাপক
১৯৩৮ ইং	শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. (বাংলা) বি. এল., বার-এ্যাট-ল., এম. এল. এ.

১৯৪৪ ইং পর্যন্ত যে কয়জন বাংলার এম. এ., পি. এইচ. ডি. উপাধি পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম—

CENTRAL LIBRARY

পি. এইচ. ডি. উপাধি

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯৩২ ইং	তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ. (বাংলা ও ইতিহাস)	Aspects of Bengali Society from old Bengali Literature. (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাংলার সমাজ-চিত্র)
১৯৩৪ ইং	এনামুল হক, এম. এ. (বাংলা)	A History of Sufisum in Bengal. (বাংলায় সুফী মতবাদের ইতিহাস)
১৯৪১ ইং	শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ. (বাংলা)	Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature. (বাংলা সাহিত্যের গোড়ায় অল্পজ্ঞাত ধর্মীয় মতবাদ)

এই সময়ের মধ্যে যে কয়জন বাংলার এম. এ. গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া পি. আর. এস. বৃত্তি মাউট স্বর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার, জুবিলী গবেষণা পুরস্কার এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম—

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ গবেষণা বৃত্তি (১৮৬৬ ইং)
(Premchand Roychand Research Studentships) P. R. S.

১৮৬৬ ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়া ভারত সরকারের নিকট উক্ত টাকা প্রেরণ করেন। পরবর্তী ২১শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে উক্ত দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয় এবং ইহা শতকরা ৫ টাকা সুদে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি রূপে রক্ষিত হয়। দুই বৎসর পরে ১৮৬৮ ইং প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৫, ১৮৮৩, ১৮৮৭, ১৮৮৯, ১৯০৯ ইং এই পাঁচ বৎসর এই বৃত্তি কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। এই বৃত্তিসংক্রান্ত নিয়মাবলী বিশ্ববিদ্যালয় একাধিকবার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ১৯৩০ ইং ২রা আগষ্ট তারিখের সিনেটের অধিবেশনে স্থির হয় যে বার্ষিক ২৪০০ টাকা মূল্যের চারিটি বৃত্তি—প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি তহবিল হইতে প্রতি বৎসর দেওয়া হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন ছাত্র উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের ১৬ বৎসরের মধ্যে এই বৃত্তির জন্য নিবন্ধ দাখিল করিতে পারিবেন। মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এই বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই বৃত্তিপ্রাপকেরা দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি পাইবেন এবং এই সময়ের মধ্যে গবেষণা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ এই বৃত্তি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্য প্রতি বৎসর দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মাউট স্বর্ণপদক (Mouat Gold Medal) (১৮৭২ ইং)

'মাউট টেষ্টিমনিএল ফাণ্ড'-এর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭৪০ টাকা মূল্যের বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা সুদের 'মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার' দান করা হয়। এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর ২টি স্বর্ণপদক

CENTRAL LIBRARY

দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপকদের মধ্যে যাঁহারা প্রস্তাবিত গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ করিবেন তাঁহাদিগকে এই স্বর্ণপদক দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৮৭২ ইং সিনেটের বার্ষিক সভায় এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। তারকাচিহ্নিত পি. আর. এস বৃত্তিপ্রাপকেরা 'মাউট স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছিলেন।

পি. আর. এস.

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
*১৯২৬ ইং	প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ. (বাংলা ও ইংরাজী)	Western Influence in Bengali Literature. (বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব)
*১৯৩৭ ইং	শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ (বাংলা, ১ম বিভাগে প্রথম, ১৯৩৫ ইং)	Tantric Buddhism in relation to the Buddhist Sahajia Cult. (তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের সম্পর্ক)
*১৯৪১ ইং	কৃষ্ণপদ গোস্বামী, এম. এ. (বাংলা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব)	(১) A Study of the Dialect of North-East Bengal. (উত্তর-পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার আলোচনা) (২) The Eastern Mymensing Dialect, its History and Phonetics. (পূর্ব-ময়মনসিংহের উপভাষা; ইহার ইতিহাস ও ধ্বনি-বিজ্ঞান)
১৯৪৩ ইং	তারাপদ ভট্টাচার্য, এম. এ. (বাংলা, ১ম বিভাগে নবম, ১৯৩৪ ইং)	বঙ্গীয় ছন্দ মীমাংসা

গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার (Griffith Memorial Prize) (১৯০১ ইং)

মিঃ উইলিয়াম গ্রিফিথ তাঁহার সম্পত্তির $\frac{১}{১০}$ অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯০১ ইং আগষ্ট মাসে লণ্ডনের সলিসিটার উইন্টার বটমলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে এই $\frac{১}{১০}$ অংশ সম্পত্তির মূল্য বাবত ২৫৯৩৫ টাকা ৯ পাই এবং পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে আরও ৬০ টাকা মোট ২৫৯৯৫ টাকা ৯ পাই পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তদানীন্তন উপাচার্য এবং ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সহ মোট ৪ জন সদস্যের এক উপসমিতির উপর এই অর্থের দ্বারা দাতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার ভার অর্পণ করেন। স্থির হয় যে এই অর্থের বার্ষিক সুদ হইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য প্রতি বৎসর নগদ ৯০০ টাকার একটি পুরস্কার 'গ্রিফিথ পুরস্কার' নামে প্রদত্ত হইবে। এই পুরস্কার এক বৎসর সাহিত্য অপর বৎসর বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার জন্য দিতে হইবে। এই বিধান ১৯০১ ইং ১৪ই ডিসেম্বরের সিণ্ডিকেটে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

CENTRAL LIBRARY

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯৩৭ ইং	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. (বাংলা, ১ম বিভাগে চতুর্থ, ১৯৩১ ইং)	বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়।
১৯৩৯ ইং	কৃষ্ণপদ গোস্বামী, এম. এ. (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ২য় বিভাগে প্রথম, ১৯৩৫ ইং, বাংলা, ২য় বিভাগে ২য়, ১৯৩৯ ইং)	A Study of the Bengali Toponomy. বাংলার স্থান নাম বিষয়ক আলোচনা
১৯৪৩ ইং	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ. (বাংলা, ১ম বিভাগে তৃতীয়, ১৯৩০ ইং)	রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের আদিপর্ব

জুবিলী গবেষণা পুরস্কার (Jubilee Research Prize) (১৯০৮ ইং)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গবেষণা বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ৩০,০০০ টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হইয়াছিল। এই অর্থের সুদ হইতে বার্ষিক সমমূল্যের দুইটি পুরস্কার দিবার প্রস্তাব হয়। প্রত্যেক পুরস্কার বাবদ নগদ ৩৫০ টাকা এবং ১৫০ টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণপদক দিবার নিয়ম করা হয়। একটি পুরস্কার সাহিত্য, অপরটি বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৯০৮ ইং ১১ই এপ্রিল তারিখের সিনেটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম পুরস্কার ১৯১২ ইং দেওয়া হইয়াছিল।

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯২৬ ইং	প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ.	The Influence of Western Literature on the development of Bengali Novels. (বাংলা উপন্যাসের উন্নতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব)
১৯২৭ ইং	প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ.	Developement of Bengali Literature under the Influence of Western Culture. (বাংলা সাহিত্যে প্রগতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব)
১৯৪২ ইং	শ্রীমতী কমলা দেবী, এম. এ. (বাংলা, ১ম বিভাগে ষষ্ঠ, ১৯৩৯)	The Village in Bengali Literature. (বাংলা সাহিত্যে পল্লী)

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক (Sir Ashutosh Mookherjee Medal) (১৯২০ ইং)

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা উচ্চ আদালতের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইলে মাড়োয়ারী এসোসিয়েশনের সভাপতি কেশোরাম পোদ্দার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। এই অর্থের সুদ হইতে 'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক' নামে প্রতি বৎসর ৩০০ তিনশত টাকা মূল্যের

CENTRAL LIBRARY

একটি স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এই পদক এক বৎসর সাহিত্য, অপর বৎসর বিজ্ঞানের জন্য দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৯২০ ইং ২৩শে এপ্রিল সিণ্ডিকেটে এই দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয় এবং স্যার আশুতোষ প্রস্তাবিত নিয়মাবলীও বিধিবদ্ধ হয়।

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯৪৪ ইং	কৃষ্ণপদ গোস্বামী, এম. এ. (বাংলা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব)	The Speech of South East Bengal. (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষা)

বাংলার এম. এ. নহেন অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার জন্য সম্মান প্রাপকদের কালানুক্রমিক নামসূচী

পি. এইচ. ডি.

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯২৮ ইং	গঙ্গাচরণ কর, এম. এ. (ইংরাজী, ২য় বিভাগে ১৯শ, ১৯২০ ইং)	মধ্যযুগের প্রেম সঙ্গীত—বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে প্রভেন্সেল ট্রুব্যাডুর্য্যার কবিতার তুলনামূলক আলোচনা।
১৯৩৭ ইং	বিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ. (ইতিহাস, ১ম বিভাগে ২য়, ১৯২৩ ইং)	চৈতন্যচরিতের উপাদান

পি. আর. এস.

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
*১৯১৬ ইং	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. (ইংরাজী)	An Essay towards on Historical and Comparative Grammar of the Bengali Language Part I. Phonology the Persian elements. (বাংলা ব্যাকরণের ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা—১ম ভাগ ধ্বনিতত্ত্বে ফার্সী প্রভাব) ১৯১৯ ইং ২৪শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় ভাষাবিভাগের ছাত্রদের প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ৭৪৫ টাকা মঞ্জুর করা হয়।
১৯১৭ ইং	সুশীলকুমার দে, এম. এ. (ইংরাজী ১ম বিভাগে ২য়, ১৯১১ ইং)	History of the Bengali Literature from 1760 to 1825. (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৭৬০-১৮২৫ ইং) ১৯১৯ ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ৭২০ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

CENTRAL LIBRARY

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
*১৯৩০ ইং	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম. এ. (ইংরাজী, ১ম বিভাগে ২য়, ১৯২৬ ইং)	Studies in Bengali Prosody, Part I, Principles (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র)

গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯১৫ ইং	সুশীলকুমার দে, এম. এ. (ইংরাজী, ১ম বিভাগে ২য়, ১৯১১ ইং)	The Early European Writers in Bengali (বাংলার প্রাচীন ইউরোপীয় লেখক)
১৯৩১ ইং	নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, এম. এ. ইংরাজী, ২য় বিভাগে ৫১শ, ১৯২২ ইং) (বাংলা ২য় বিভাগে ৫ম, ১৯২৮ ইং)	Learning and Literature in Early Mediaeval Bengal (আদি-মধ্যযুগের বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্য)
১৯৩১ ইং	সুকুমার সেন, এম. এ. (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ১ম বিভাগে ১ম, ১৯২৩ ইং)	Syntax of Early Bengali (প্রাচীন বাংলার বাক্যবিন্যাস রীতি)
১৯৩৫ ইং	বিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ. (ইতিহাস)	চৈতন্যলীলার ঐতিহাসিক বিচার।

জুবিলী গবেষণা পুরস্কার

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯১২ ইং	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. (ইতিহাস, ২য় বিভাগে ১ম, ১৯১০ ইং)	An Essay on the Origin and History of the Bengali Alphabet (বাংলা লিপির উৎপত্তি ও ইতিহাস বিষয়ক নিবন্ধ)
১৯১৭ ইং	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. (ইংরাজী, গ্রুপ বি, ১ম বিভাগে ১ম, ১৯১৩ ইং)	Comparative Philology with Special reference to Bengali Dialects (বাংলা কথ্য ভাষা সমূহের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব)
১৯২৪ ইং	বঙ্কিমচন্দ্র মল্লিক, এম. এ.	Influence of Western Literature upon the writings of Michael Madhusudan Dutta. (মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনার উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব)

* তাৎকালিক পি. আর. এস. প্রাপকেরা 'মাইট স্বর্ণপদক' পাইয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক

বৎসর	প্রাপক	গবেষণার বিষয়
১৯৩২ ইং	নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, এম. এ	History of Vaishnavism in Bengal. (বাংলার বৈষ্ণবতার ইতিহাস)

উর্দু, অসমীয়া ও হিন্দী বিষয়ে পি. এইচ. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারতীয় ভাষাবিভাগে' প্রধান ভাষা রূপে স্বীকৃত সাতটি ভাষার মধ্যে উর্দু, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৯৪৪ ইং মধ্যে যাঁহারা পি.এইচ.ডি. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভাষা	বৎসর	উপাধি প্রাপক	গবেষণার বিষয়
উর্দু	১৯৩১ ইং	মোহন সিং	Characteristics and Tendencies of Modern Urdu Poetry (আধুনিক উর্দু কবিতার গতি ও প্রকৃতি)
অসমীয়া	১৯৩৫ ইং	বাণীকান্ত কাকতি, এম. এ. (ইংরাজী 'এ' গ্রুপ, ২য় বিভাগে ৮ম, ১৯১৮ ইং, 'বি' গ্রুপ, ১ম বিভাগে ১ম, ১৯২৩ ইং)	Assamese its Formation and Development (অসমীয়া ভাষার গঠন ও প্রকৃতি)
হিন্দী	১৯৪৩ ইং	নলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ. (হিন্দী, ১ম বিভাগে ১ম, ১৯২১ ইং)	বিহারী ভাষণ কি উৎপত্তি আউর বিকাশ (বিহারী ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ)

পল্লীগীতি-সংগ্রহ

মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

১৯১৩ ইং মৈমনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার যে প্রাচীন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠে মুগ্ধ দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমারের সংবাদ জানার জন্য সৌরভ সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়কে পত্র দেন। কেদারনাথ জানাইলেন—চন্দ্রকুমার একজন দরিদ্র যুবক, ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বাংলা লিখিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ এবং কর্মক্ষমতা-রহিত। তাঁহার আরও চিকিৎসা প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পরে কেদারনাথ জানাইলেন যে চন্দ্রকুমার খানিকটা সুস্থ হইয়াছেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়া দীনেশচন্দ্রের সহিত দেখা করিবেন। ১৯১৯ ইং পূজার কিছু পূর্বে চন্দ্রকুমার দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁহার বেহালার বাসায় দেখা করেন। যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনা-মূল্যে চন্দ্রকুমারের চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন এবং গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কতকদিনের জন্য তাঁহাকে নিজ

CENTRAL LIBRARY

বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র স্যার আশুতোষকে চন্দ্রকুমারের কথা বলেন। ফলে চন্দ্রকুমারকে নবগঠিত ভারতীয় ভাষাবিভাগের পুথিশালার কর্মীরূপে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পল্লীগীতিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র প্রদত্ত রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ বক্তৃতা-মালার (১৯২২-১৯২৬ ইং) বিষয়বস্তু ছিল **Eastern Bengal Ballads** বা মৈমনসিংহ-গীতিকা। এই বক্তৃতা-মালার ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা ১৯২৩ ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী, বাংলা সংস্করণের ভূমিকা ১৯২৩ ইং ২৪শে নভেম্বর লিখিত হইয়াছিল। এই উভয় সংস্করণই ১৯২৩ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ ইং ১১ই মে তারিখের সিণ্ডিকেটে মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জবাসী সুরেশচন্দ্র ধর বি. এ.-কে মৈমনসিংহ-গীতিকা সম্পাদনে দীনেশচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য মাসিক ৩০ টাকা বেতনে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

১৯২৪ ইং ১২ই ডিসেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে পল্লীগীতি-সংগ্রহ ও প্রকাশ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। এই দুই মনীষী যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ পল্লীগীতি-সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ পল্লীগীতি-প্রকাশ। পল্লী-গীতি-সংগ্রহ বিভাগের জন্য নিম্নোক্তরূপ ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল—

(১) বাংলা পুথি বিভাগের কর্মী চন্দ্রকুমার দেকে পল্লীগীতি-সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক মাসিক ২৫ টাকা হারে ১২ মাসের জন্য—(২৫ × ১২) ৩০০ টাকা অর্থাৎ চন্দ্রকুমার দে পুথি বিভাগের জন্য ৬০ টাকা, পল্লীগীতি বিভাগের জন্য ২৫ টাকা মোট মাসিক ৮৫ টাকা করিয়া পাইতেন।

(২) তিনজন পল্লীগীতি-সংগ্রাহকের জন্য মাসিক বেতন ৫০ টাকা এবং মাসিক ভ্রমণ ভাতা ২০ টাকা মোট ৭০ টাকা হিসাবে ১২ মাসের জন্য ৭০ × ১২ × ৩ = ২৫২০ টাকা

(৩) অন্যান্য পল্লীগীতি সংগ্রাহকদের নিকট হইতে পল্লীগীতি ক্রয়ের জন্য ২৫০ টাকা মোট ৩০৭০ টাকা

পল্লীগীতি মুদ্রণবিভাগের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়—

(১)	৫০০ পৃষ্ঠার একখণ্ড গ্রন্থ মুদ্রণ ব্যয়	২০০০ টাকা
(২)	আনুষঙ্গিক ব্যয়	১০০ টাকা
(৩)	এই উদ্দেশ্যে একজন কর্মচারীর মাসিক বেতন ৬০ টাকা হিসাবে ১২ মাসের (৬০ × ১২)	৭২০ টাকা
(৪)	একটি টাইপ রাইটার ক্রয়ের জন্য	২৫০ টাকা
	মোট—	৩০৭০ টাকা

পল্লীগীতি-সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এক নূতন পরিষদ্ গঠন করেন। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। ইঁহারা নিম্নলিখিত তিন ব্যক্তিকে পল্লীগীতি-সংগ্রাহক মনোনীত করেন। (১) আশুতোষ চৌধুরী, (২) বিহারীলাল রায় এবং (৩) মুন্সী জসিমুদ্দিন। এই তিন সংগ্রাহক ১৯২৫ ইং ১লা জুন হইতে তাঁহাদের কার্যভার গ্রহণ করেন। শচীন্দ্রনাথ রুদ্র এম. এ. (১৯২২ ইং বাংলা এম. এ., প্রথম বিভাগে ১ম)-কে রামতনু লাহিড়ী ফেলোর অধীনে পল্লীগীতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য ডি. পি. আই. বৃত্তিও দিয়াছিলেন। এ সময় জনার্দন চক্রবর্তী বি. এ. কে রামতনু লাহিড়ী ফেলোর অধীনে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে এক বৎসরের জন্য সহকারী গবেষক নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৫ ইং ২৫শে সেপ্টেম্বর পল্লীগীতি সংগ্রাহক বিহারীলাল রায়ের মৃত্যু হইলে দীনেশচন্দ্রের পরামর্শানুসারে মনোরঞ্জন চৌধুরী এম. এ কে পল্লীগীতি সংগ্রাহক মনোনীত করা হয়। তিনি ১৯২৬ ইং

CENTRAL LIBRARY

১লা জানুয়ারী হইতে এই কাজে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯২৬ ইং ২৬শে জুন তারিখ পর্যন্ত জনার্দন চক্রবর্তী কাজ করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে তাহার স্থলে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তকে ২৭শে জুন কাজে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৭ ইং ১৫ই মার্চ তারিখে পল্লীগীতি-সংগ্রাহক মনোরঞ্জন চৌধুরী এই কাজ ত্যাগ করিলে তাহার স্থলে নগেন্দ্রচন্দ্র দেকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৭ ইং ৩১শে অক্টোবর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই কাজ ত্যাগ করিলে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে, উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে দীনেশচন্দ্র-নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে সিণ্ডিকেট এই পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিবার নির্দেশ দেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ফলে রামেন্দু দত্তকে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে এই কাজে নিয়োগ করা হয়। পল্লীগীতি বিভাগের কর্মচারী রামেন্দু দত্ত চাকুরী ত্যাগ করিলে ১৯২৯ ইং ২০শে ডিসেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে তাহার স্থলে আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিযুক্ত করা হয়।

১৯২৯ ইং ২৬শে জুলাই তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে পল্লীগীতি-সংগ্রাহক মুন্সী জসিমুদ্দীনকে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে পড়িবার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯২৯ ইং ১২ই জুলাই তারিখের সিণ্ডিকেটে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে ৮টি পল্লীগান সংগ্রহের জন্য এককালীন ৬০ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২২ ইং হইতে ১৯৩১ ইং পর্যন্ত এই দশ বৎসর দীনেশচন্দ্র অন্যান্য গবেষণামূলক কাজে নিযুক্ত থাকিলেও প্রধানতঃ পল্লীগীতি সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত দীর্ঘ ভূমিকাযুক্ত পল্লীগীতিসমূহ 'রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতা' রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই সকল বক্তৃতা ৪ খণ্ডে ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডের প্রথম সংখ্যা ইংরাজী ভাষায়, দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতা—

১৯২২-১৯২৪ ইং (১) **Eastern Bengal Ballads, Vol. I, Part I** ভূমিকা ১৯২৩ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী, প্রকাশকাল—১৯২৩ ইং

(২) মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভূমিকা ১৯২৩ইং ২৬শে নভেম্বর, প্রকাশকাল —১৯২৩ ইং

১৯২৪-১৯২৬ ইং (৩) **Eastern Bengal Ballads, Vol. II., Part I.** ভূমিকা ১৯২৬ ইং ১লা জুলাই, প্রকাশকাল ১৯২৬ ইং

(৪) পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভূমিকা ১৯২৬ ইং ২রা জুলাই, প্রকাশকাল—১৯২৬ ইং।

১৯২৬-১৯২৮ ইং (৫) **Eastern Bengal Ballads, Vol. III, Part I** ভূমিকা ১৯২৬ ইং মে। প্রকাশকাল—১৯২৮ ইং

১৯২৮-১৯২৯ ইং (৬) পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, প্রকাশকাল—১৯৩০ ইং

১৯২৯-১৯৩১ ইং (৭) **Eastern Bengal Ballads, Vol. IV. Part I.** ভূমিকা ১৯৩১ ইং ২০শে অক্টোবর প্রকাশকাল—১৯৩২ ইং।

১৯৩০-১৯৩২ ইং (৮) পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভূমিকা ১৯৩১ ইং (পরি ভাস্কর হাছলা প্রকাশকাল—১৯৩২ ইং ২রা সেপ্টেম্বর)

মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ভূমিকায় কোন্ পালা কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত তাহার উল্লেখ আছে। এই সকল গীতিকার টীকা টিপ্পনী সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি দীনেশচন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রচিত

CENTRAL LIBRARY

ভূমিকায় পত্রলেখকদের উল্লেখসহ তাঁহাদের প্রদত্ত অভিমত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রদত্ত অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পালা সংগ্রাহক ব্যতীত যাঁহাদের নিকট হইতে পালা সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের নামও যথাস্থলে করা হইয়াছে। এই সকল পালাবর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে বহু চিত্র অঙ্কন করেন বিশ্বপতি চৌধুরী এম. এ.। প্রত্যেক খণ্ডেই কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড, ১ম ভাগের সঙ্গে মৈমনসিংহ জেলার একখানি মানচিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। এই মানচিত্র অঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করেন—আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীনেশচন্দ্রের অনুরোধে বাংলাদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল—আর্ল অব রোনাল্ডস এই খণ্ডের এক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। বাংলা পল্লীসাহিত্যের এই অল্পজ্ঞাত, এবং সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক অবহেলিত দিকের প্রতি সাহিত্যরসিক এদেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও মনীষীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দীনেশচন্দ্র এক অনন্যসাধারণ কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্য-কর্মের জন্য ইঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্রের অবসরগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টাও স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া পড়ে।

আচার্য দীনেশচন্দ্রের অবসর গ্রহণের পরেও কয়েক বৎসর মুন্সী জসিমুদ্দীন পল্লীগীতি-সংগ্রাহক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০-১৯৩৭ ইং মধ্যে তাঁহার সংগৃহীত পল্লীগীতি ও পল্লীগীতি সম্পর্কীয় আলোচনাসমূহ এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ-গীতিকাসমূহ প্রকাশের ফলে অনেকের মনে পল্লী-গীতি সংগ্রহে প্রেরণা দিয়াছিল সন্দেহ নাই। এস্থলে একজন পল্লীগীতি-সংগ্রাহকের কথা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছি। ইনি গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয় দত্ত তাঁহার জন্মভূমি শ্রীহট্টের পল্লীগীতিসমূহ সংগ্রহ করিয়া ইহা মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ ইংরাজী পত্রসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট ১৯৩৯ ইং ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে গানগুলির পাণ্ডুলিপি জমা দিয়াছিলেন। ১৯১৯ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত আমার আলোচনার কালসীমা হেতু এই সংগ্রহের উল্লেখ এস্থলে করিলাম। এই সংগ্রহ অনেক পরে ১৯৬৬ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, ফলে মুদ্রিত এই গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থের 'নিবেদন', 'মুখবন্ধ' ও 'ভূমিকা' পাঠের ফলে আমার মনে যে সংশয় ও প্রশ্ন জাগিয়াছে তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া পল্লীসাহিত্যরসিক তথা সমালোচকবৃন্দের দৃষ্টি সবিনয়ে আকর্ষণ করিলাম—

(১) গুরুসদয় দত্ত তাঁহার সংগ্রহের নাম রাখিয়াছিলেন 'শ্রীহট্টের গণগীতি'। এই নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নামকরণ করা হইয়াছে—'শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত'। মূল সংগ্রাহকের প্রদত্ত নাম তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থে সম্পাদকের পরিবর্তন করার অধিকার আছে কি? বা এরূপ অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় কি?

(২) মুখবন্ধ পাঠে জানা যাইতেছে গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত মোট ৪২৩টি গানের মধ্যে ৪৩টি গান 'অনাবশ্যক মনে হওয়ায়' পরিত্যক্ত হইয়াছে। কি কারণে এই ৪৩টি গান অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়া পরিত্যক্ত হইল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ—নিবেদন, মুখবন্ধ ও ভূমিকা কোথাও নাই। ভবিষ্যতে পল্লী গান লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিবেন তাঁহাদের নিকট এই সকল পরিত্যক্ত গানেরও হয়ত প্রয়োজন থাকিতে পারে। উপযুক্ত মন্তব্য সহ এই গান কয়টি পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। সঙ্কলয়িতার অনুমোদনক্রমে ইহা পরিত্যক্ত হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্পাদক বিশেষ কোন যুক্তি প্রদর্শন না করিয়াই ৪৩টি গান বর্জন করিয়াছেন, ইহা পরিতাপের বিষয়।

CENTRAL LIBRARY

(৩) গুরুসদয় দত্তের সংগৃহীত ৪৩টি গান পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু বিশেষ কোন যুক্তিপ্রদর্শন না করিয়াই, গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহে নাই তেমন মাত্র ১৩টি গান পরিশিষ্ট 'ক' রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই ১৩টি গানের পরিশিষ্ট মুদ্রণের যুক্তি ভাবিয়া পাইতেছি না। চেষ্টা করিলে ইহার বহুগুণ গান সংগ্রহ করা হয়ত খুব শক্ত কাজ হইবে না। মূল কথা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কলিত গ্রন্থকে পরবর্তীকালে সম্পাদকের যদৃচ্ছা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন উচিত কি না ইহা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল সঙ্কলনে নাই তেমন কয়েকটি জিনিষ সংযুক্ত হইয়াছে। যেমন পরিশিষ্ট 'খ' শ্রীহট্টের অন্যান্য লোকসঙ্গীত, শ্রীহট্টের মাঘ ব্রত, নিমাইর বারমাসী, শাশ্বির বারমাসী, ভট্ট কবি, ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান, লাচাড়ী গান ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ৩৮১-৪১৩)। মাঘ ব্রতের মন্ত্র গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত ইহা সঙ্গীত পর্যায়ে পড়ে কি? মুখবন্ধ পাঠে জানিয়াছি 'বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্ট্রারের নিকট পাণ্ডুলিপি জমা দিবার সঙ্গে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একটি দীর্ঘ চিঠিও দিয়াছিলেন। উহাতে যে পদ্ধতিতে শ্রীহট্ট হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল এবং লোকসঙ্গীত কি ভাবে সংগ্রহ করা উচিত, সে বিষয়ে তিনি তাঁহার মতামত জানাইয়াছিলেন।' এই গ্রন্থে সম্পাদক রচিত ২২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকা আছে। কিন্তু কোথাও গুরুসদয় দত্ত লিখিত সেই পত্র উদ্ধৃত হয় নাই (মুখবন্ধে মাত্র ছয় পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে)। সম্পাদকের দীর্ঘ অভিমতের সঙ্গে সঙ্কলয়িতার অভিমত জানার আগ্রহ পাঠকবর্গের হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, গুরুসদয় দত্তের মূল পত্র যথাযথ ছাপিবার ব্যবস্থা করুন। ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য মূল পত্রের সঙ্গে তাহার বঙ্গানুবাদ থাকিলে ভাল হয়।

প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে সম্পাদক হিসাবে গুরুসদয় দত্তের নাম ও তরুণ সম্পাদকের নাম পর পর মুদ্রিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস সঙ্কলিত বলিলেই যথেষ্ট হইবে। গ্রন্থখানি যে ভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে গুরুসদয় দত্তের বিশেষ কোন যোগ নাই। তাঁহার সংগৃহীত ৪২৩টি গানের মধ্যে ৩৮০টি গান আলোচ্য গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। গুরুসদয় দত্তকে আমরা সঙ্কলয়িতা বলিব, সম্পাদকের গৌরবের অধিকারী তিনি নহেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সম্পাদকের মন্তব্যবিশেষের বা ভুলত্রুটির জন্য গুরুসদয় দত্ত দায়ী হইতে পারেন না নিশ্চয়ই।

বাংলা পুথি বিভাগ

১৯১৯ ইং ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগের জন্য পুথিসংগ্রহের সূত্রপাত হয়। দীনেশচন্দ্রের বাসায় বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামনিবাসী রামকুমার দত্ত নামে এক চাকর ছিলেন। দীনেশবাবু তাহাকে পুথিসংগ্রহের কলা-কৌশল শিখাইয়া দেন। ইনি বহু মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র ইহাকে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। রামকুমার সংগৃহীত সকল পুথি নগেন্দ্রনাথ বসু ক্রয় করিয়া লইতেন। ক্রীত পুথি সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্রের নিকট থাকিত, তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় অংশ নকল করার পর পুথি নগেন্দ্রনাথ বসুকে সমঝাইয়া দিতেন। রামকুমার দত্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অবিনাশ দত্তও বহু পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি একসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্য পুথিসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির পরে দীনেশচন্দ্রের পরামর্শে নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সংগৃহীত প্রায় তিন হাজার

CENTRAL LIBRARY

পুথি নগদ ৩০০০ টাকা মূল্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রয় করেন। যতদূর সংবাদ পাইতেছি, বাংলা পুথিশালার সূত্রপাত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হইতে ক্রীত এই পুথি লইয়াই। ১৯২০ ইং বসন্তরঞ্জন রায় মেদিনীপুরের তদানীন্তন সেটেলমেন্ট অফিসার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত বাংলা পুথির কথা স্যার আশুতোষকে জানান। আশুতোষ এই সংগ্রহের পুথি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণ করিতে আগ্রহী হওয়ায় সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার সংগৃহীত প্রায় ১৯ মণ পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করার প্রস্তাব করিয়া ২৭শে এপ্রিল ১৯২০ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের নামে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রখানি ১৫ই জুলাই ১৯২১ ইং সিণ্ডিকেটে বিবেচিত হইয়াছিল এবং ধন্যবাদের সহিত এই দান গৃহীত হইয়াছিল। এই দানগ্রহণের অন্যতম সর্ত ছিল এই পুথি-সমূহ দাতার নামানুসারে পৃথক সংগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত থাকিবে (the manuscripts be kept as a separate collection to be named after the donor.) এই সর্ত এযাবত পালিত হয় নাই। ভারতীয় ভাষাবিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ১৫ই জুলাই ১৯২১ ইং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বসন্তরঞ্জন রায় নিজে মেদিনীপুরে গিয়া এই সকল পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া আসেন। এই সকল নূতন সংগৃহীত পুথি রাখার উদ্দেশ্যে স্যার আশুতোষ কয়েকটি বড় আলমারি তৈয়ার করাইয়া লইয়াছিলেন। এই সকল আলমারিতেই বাংলা পুথি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বাংলা পুথিশালায় প্রায় সাত হাজার পুথি সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক দানস্বরূপ প্রাপ্ত, অবশিষ্ট ক্রীত।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রীত পুথি লইয়াই এই বিভাগের সূত্রপাত। এই সকল পুথি তালিকাবদ্ধ করার কাজে বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি একজন সহকারীকে পুথি তালিকাবদ্ধ করার কাজে অভিজ্ঞ করিয়া তুলেন। পরে ১৯২৪ ইং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পুথিতালিকা করার কাজে নিযুক্ত হন। পুথি বিভাগের প্রথম কর্মচারী ছিলেন নিশিরঞ্জন দাশগুপ্ত। ইনি ছুটি লইলে ৯ মাস নীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত কাজ করিয়াছিলেন। বাংলা পুথির তালিকার প্রথম খণ্ড ১৯২৬ইং প্রকাশিত হয়। ইহা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.-র যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই তালিকার ইংরাজী ভাষায় ভূমিকা রচনা করেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.। এই তালিকায় মোট ৪১৯ খানি রামায়ণের পুথির (২৮৬+১৩৩) পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে রোমান বর্ণমালানুক্রমে রোমান অক্ষরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত তালিকার দ্বিতীয় খণ্ড দুই বৎসর পরে ১৯২৮ ইং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মণীন্দ্রমোহন বসু এম.এ. এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.র সম্পাদনায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। ইহার সঙ্গে মণীন্দ্র-মোহন বসু এম. এ. রচিত সম্পাদকের নিবেদন মুদ্রিত হইয়াছিল। এই খণ্ডে নিম্নোক্ত সংখ্যক পুথির পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছিল। পদাবলীর পুথি ২৮৭—৩৪৩, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের পুথি ৩৫১—১৬৯, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত পুথি ৪৭০—৫০১, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল পুথি ৫০২—৫১৩, ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল পুথি ৫২৪—৫৫৬ পর্যন্ত। এই গ্রন্থের শেষ দুই পৃষ্ঠায় Appendix অংশে অনুল্লিখিত পদাবলী ও চৈতন্য-জীবনী পুথির ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করা আছে। এই তালিকা মুদ্রণের দুই বৎসর পরে ১৯৩০ ইং মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ.র সম্পাদনায় তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৫৩৯ খানি মহাভারত পুথির পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। এই তৃতীয় খণ্ড মুদ্রণের ১০ বৎসর পরে ১৯৪০ ইং মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদনায় পাশাপাশি নিম্নোক্ত ছয় কলামে যথা ক্রমিক নম্বর, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা, লিপিকাল ও মন্তব্যসহ মোট ২১১১ খানি বাংলা পুথির তালিকা

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশিত হয়। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির সাধারণ তালিকা, প্রথমখণ্ড রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত যে সকল বাংলা পুথি সম্পাদিত হইয়া এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১৯২০ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত বাংলা পুথিশালা অধ্যক্ষ যথাক্রমে—

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ., মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ.

পুথিশালার কর্মচারী—

নিশিরঞ্জন দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত, জিতেন নাগ, হরিদাস পালিত, রবীন্দ্র মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ

১৮৯৩ ইং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ছয়জন মনীষী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন উচিত কিনা এই বিষয়ে অভিমত আহ্বান করিয়া তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষাব্রতী জনগণের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই পত্রের উত্তর ইংরাজী ভাষাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। মূল পত্র ও তাহার উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার প্রথম বর্ষের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষার বাহন করা সেই সময় সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে ১৯১৩ ইং রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত ডি. লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯১৯ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগ সৃষ্টির পর প্রধান ভাষা বাংলার ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকজন সাহিত্যিককে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম নাম রবীন্দ্রনাথের। তাঁহাকে বাংলা ছন্দসম্পর্কে বক্তৃতাদানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২২ ইং রবীন্দ্রনাথ এম. এ. বাংলা পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৩ ইং 'সাহিত্য' বিষয়ে Special University Readership বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৯৩০ ইং 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে বাংলা ভাষায় 'কমলা বক্তৃতা' দান করেন। ১৯৩২-১৯৩৪ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর বাংলার ছাত্রদের কয়েকটি ক্লাস লইতে হইয়াছিল। সেই 'ক্লাসে' ছাত্রদের বসিবার প্রথম সারি কয়টিতে ছাত্রেরা বসিবার সুযোগ পাইতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তি বসিতেন। অধিকাংশ ছাত্রেরা (অন্যান্য বিভাগেরও) ক্লাসের ভিতরে ও বাহিরে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেন। যতদূর মনে হইতেছে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সেই ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রদের 'রোলকল' করিয়া রেজিষ্টারী খাতায় কে উপস্থিত তাহা চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্লাস লওয়া সে এক বিচিত্র ব্যাপার। ছাত্রদের অনুরোধে (উপস্থিত ব্যক্তিদেরও) তাঁহার কবিতাবিশেষের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। কবিতাবিশেষ আবৃত্তি করিতে

CENTRAL LIBRARY

হইয়াছে, সাহিত্যসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তীর এই শুভ লগ্নে বাংলা বিভাগের গৌরবোজ্জ্বল অতীত দিনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে সেই যুগের যে দুই ভারতীয় সমগ্র এশিয়ায় নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়েই একই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপকের পদে বৃত ছিলেন। স্যার সি. ভি. রমণ সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়—এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়াবাসী নোবেল পুরস্কার প্রাপক দুই পণ্ডিত ব্যক্তি একই সময়ে অধ্যাপক। ইহা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বড় শ্লাঘার কথা। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (ডিসেম্বর ১৯৩২ ইং) এবং শিক্ষার বিকিরণ (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ ইং) সম্পর্কে পর পর যে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৩ ইং প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাষণ দান করেন। এই বৎসরই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় রচিত পি. এইচ. ডি. থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে মহিলাদের ভূমিকা

প্রধান ভাষা বাংলার স্নাতকোত্তর প্রথম পরীক্ষা ১৯২০ ইং গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২০ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং মধ্যে ১৫৭ জন ছাত্র বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা। এই ১৫ জনের মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ ইং পূর্বে যে ৪ জন মহিলা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই নন্-কলেজিয়েট। ১৯৩৪ ইং প্রথম কলেজিয়েট মহিলাকে পাইতেছি। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ১৫ জন মহিলার মধ্যে কলেজিয়েট ৬ জন এবং নন্-কলেজিয়েট ৯ জন। প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারকারী ৪ জন মহিলার মধ্যে দুইজন মহিলাই অবাঙ্গালী। একজন অসমীয়া (১৯২১), অপরজন ইংরেজ (১৯২৬)। বাঙ্গালী মহিলাদের বাংলা সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টি পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য যে সকল পদক ও পুরস্কার ছিল তন্মধ্যে ১৯৪২ ইং একজন মহিলা 'জুবিলী গবেষণা পুরস্কার' লাভ করিয়াছিলেন।

বর্তমান ১৯৭২ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মোট ছাত্রসংখ্যা ২৯৫ জন। তন্মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ১০৪ জন এবং ছাত্রীসংখ্যা ১৯১ জন। অর্থাৎ অনুপাত ছাত্র ৩৫·২৫ এবং ছাত্রী ৬৪·৭৫ জন। এখন হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে ইহার অনুপাত সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বহুক্ষেত্রে আরও কম ছিল।

বাংলা বিভাগে ছাত্রীরা অধিক সংখ্যক আসুক এই আগ্রহ আচার্য দীনেশচন্দ্রের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ১৯২১ ইং যে অসমীয়া মহিলা বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন তাঁহার অকালমৃত্যুতে দীনেশচন্দ্র এত ব্যথিত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। নিম্নে ১৯২০ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং মধ্যে যে সকল মহিলা বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল—

CENTRAL LIBRARY

১৯২১ ইং সুধালতা দোয়ারা (ন. ক.) ১ম
সুখলতা দোয়ারা (ন. ক.) ১১শ
১৯২৪ ইং সুনীতিবালা চন্দ (ন. ক.) ২য়
১৯২৬ ইং জে. হেলেন রাওলাণ্ডস্ (ন. ক.) ১ম
১৯৩৪ ইং কল্যাণী চক্রবর্তী ১ম
ইলাকণা গুপ্ত (স্কটিশচার্চ কলেজ) ৩য়
১৯৩৬ ইং কল্যাণী মল্লিক (ন. ক) ৩য়
১৯৩৭ ইং আশালতা দত্ত ৪র্থ
১৯৩৮ ইং বিন্দুবাসিনী দেব (ন. ক) ১ম
সতী গুপ্ত ৪ম
১৯৩৯ ইং কমলা দেবী ৬ষ্ঠ
প্রতিভাময়ী গুপ্তা ৯ম
১৯৪০ ইং বিজয়া সেনগুপ্ত (ন. ক.) ৪ম
শান্তিপ্রভা দাশগুপ্তা (ন. ক.) ৭ম
১৯৪৩ ইং নীলিমা রায়চৌধুরী (ন. ক.) ২য়

ভারতীয় ভাষাবিভাগ পরিচালন সমিতির সভাপতি

১৯১৯ ইং ভারতীয় ভাষাবিভাগ স্থাপিত হইলে পর উক্ত বিভাগ পরিচালনের জন্য ১৯১৯ ইং ১০ই এপ্রিল তারিখে মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯১৯ ইং হইতে ১৯৭৪ ইং পর্যন্ত ভারতীয় ভাষাবিভাগের পরিচালন সমিতির সভাপতি কে কখন ছিলেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

১৯১৯—১৯২৩ ইং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২৪—১৯২৫ ইং দীনেশচন্দ্র সেন।

১৯২৫—১৯২৯ ইং—এই বৎসর সভাপতি হিসাবে কাহারও নাম নাই। এই বৎসরের পরিচালন সমিতির সদস্যতালিকায় প্রথম নাম প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯২৬—১৯৩১ ইং—দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯৩১—১৯৪৪ ইং—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষা ব্যতীত অন্য সকল বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ রচনার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যের সহায়ক হিসাবে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনের জন্য ১৯৩১ ইং ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি পরবর্তী ৩১শে নবেম্বরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিবেন এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সমূহ ৩১শে মার্চ ১৯৩৫ ইং মধ্যে প্রকাশ করিবেন এরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত কার্য দ্রুত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার দায়িত্ব একজন রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষকের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য এবং এই সম্পর্কে সিণ্ডিকেটকে পরামর্শ দানের জন্য একটি ক্ষুদ্র সমিতিও গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরিভাষা সমিতির সভ্যবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার জন্য কয়েকটি বিভাগীয় সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতি পরিভাষা সঙ্কলনের কাজে তাঁহাদিগকে সাহায্য করার জন্য এক একজন সহকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। সহকারী প্রত্যেককে মাসিক ৬০ টাকা হারে বেতন রামতনু লাহিড়ী তহবিল হইতে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক

CENTRAL LIBRARY

পরিভাষা রচনার জন্য ১০ জন সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ৮ মাস পরে যখন প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তখন কেন্দ্রীয় সমিতিতে ১০ জন সদস্যের পরিবর্তে ৯ জন সদস্যের নাম পাইতেছি। নিম্নে প্রস্তাবিত পরিভাষা রচনা কার্যের জন্য যে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহাদের এবং সভ্যবৃন্দের নাম প্রদত্ত হইল—

পরিভাষা পুস্তকাগার সমিতি*

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল.,
ব্যারিষ্টার-এট-ল, এম. এল. সি, ভাইস-চান্সেলার
রায় বাহাদুর শ্রীযগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ.
শ্রীরাজশেখর বসু, এম. এ.
পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

পরিভাষা কেন্দ্রীয় সমিতি

শ্রীরাজশেখর বসু, এম. এ.,—সভাপতি
ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট.
রায় বাহাদুর শ্রীযগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.
পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য, এম. এ.
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম. এ.
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ.
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ,—সম্পাদক
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম. এ,—সহকারী

বিভিন্ন বিভাগীয় সমিতি

পদার্থবিদ্যা

ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি.,
এস. সি. ডি., এফ. ইন্‌স্ট. পি.
ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, ডি. এস-সি.
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম. এস-সি.,—সহকারী

রসায়ন

ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, এম. এ., পি-এইচ. ডি
ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন, এম. এ., ডি. এস-সি.
ডক্টর শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডি. এস-সি.,—সহকারী

গণিত

ডক্টর শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, ডি. এস-সি.
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এস-সি.,—সহকারী

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম. এস-সি.
শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, এম. এস-সি.
শ্রীরবীন্দ্রমোহন দত্ত, এম. এস-সি.,—সহকারী

প্রাণিবিদ্যা

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.
ডক্টর শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি. এস-সি.,
ডি. আই-সি.
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, এম. এস-সি.,—সহকারী

শারীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিদ্যা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেন, এম. এ., এল. এম. এস.
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ.
ডক্টর শ্রীবিজলীবিহারী সরকার, এম. এ., ডি. এস-সি.
ডক্টর শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. বি.,
এফ. আর. এস. ই., বি. এস.
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এল. এম. এস.
শ্রীমন্মথচন্দ্র মিত্র, বি. এস-সি.,—সহকারী

* ১৯০৫ ইং প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গণিত' পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

CENTRAL LIBRARY

ভূবিদ্যা

শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস, এম. এস-সি.
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম. এস-সি.
শ্রীনন্দীপ্রসাদ কটকী, এম. এস-সি.,—সহকারী

ভূগোল

শ্রীকুমুদবন্ধু রায়চৌধুরী, এম. এ.
শ্রীগঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

দর্শন ও মনোবিদ্যা

ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, এম. বি., ডি. এস-সি.
ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এইচ-ডি.
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এস-সি.,—সহকারী

চিত্রাঙ্কন ও কান্তিবিদ্যা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ.

অর্থবিদ্যা ও ব্যবসায়

ডক্টর শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক হিসাবে প্রমথনাথ বিশী এই কেন্দ্রীয় সমিতির সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। ইনি এই পদ ত্যাগ করিলে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম. এ. রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষকরূপে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতি ৩১শে মার্চ ১৯৩৫ ইং মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসমূহ প্রকাশের যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৯৩৫ ইং জুন মাসে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—'গণিত' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত এই সমিতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ১০ খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল—

১৯৩৫ ইং—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিত
পরবর্তী সংস্করণ গণিত পরিভাষা ১৯৩৭ ইং
১৯৩৭ ইং—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—পদার্থবিদ্যা
ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—ভূগোল
১৯৩৮ ইং—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা
—রসায়ন (এই পুস্তিকার সঙ্গে আখ্যাপত্র নাই, মুদ্রণকালেরও উল্লেখ নাই। C. U. পুস্তক-তালিকা হইতে মুদ্রণকাল গৃহীত হইয়াছে)
ঐ —অর্থবিদ্যা (এই সংস্করণ দেখিতে পারি নাই)
১৯৪১ ইং—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—প্রাণিবিদ্যা
ঐ —বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—মনোবিদ্যা
১৯৪৪ ইং—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—ভূবিদ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'Alphabetical Catalogue of University Publications, 1971' পুস্তিকায় 'গণিতের পরিভাষা' মুদ্রণ কাল ১৯৩৬ ইং নির্দেশ করা হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯৩৫ ইং [No. 676 R.—June, 1935—E.) জুনমাসে প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিত' পুস্তিকা পাইয়াছি। এই তালিকায় বহুক্ষেত্রে গ্রন্থপ্রকাশ কালের উল্লেখ নাই। ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশিত গ্রন্থের নামও নাই। রবীন্দ্রনাথ রচিত ও ১৯৩৮ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থখানির এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাইয়াছি (নম্বর ৭৩২৮)। এই গ্রন্থ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত আরও বহু গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে খুঁজিয়া পাই নাই। ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রত্যেক গ্রন্থের অন্ততঃ একখানি কাপ পৃথক্ করিয়া রাখা শ্রেয় মনে করি।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা বানানের নিয়ম

১৯৩৪ ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। প্রায় বৎসর খানেক পরে ১৯৩৫ ইং ২৯শে নবেম্বর তারিখে উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত অনুসারে, এই সমিতি বাংলায় প্রচলিত একই শব্দের একাধিক বানান লক্ষ্য করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণক্রমে বানান প্রচলনের কাজে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি নিম্নলিখিত ৪ জন ব্যক্তিসহ সম্প্রসারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) প্রমথনাথ চৌধুরী এম. এ., বার-এ্যাট্-ল., (২) অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী,
(৩) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা) (৪) বিজয়চন্দ্র মজুমদার

সম্প্রসারিত এই পরিভাষা সমিতি বাংলা বানানের জন্য যে নিয়মাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় ৫ মাস পরে 'বাংলা বানানের নিয়ম' শীর্ষক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৮।৫।১৯৩৬ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ক্ষুদ্র ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ২।১০।১৯৩৬ ইং তারিখে এই নিয়মাবলীর ২য় সংস্করণ এবং ১৯৩৭ ইং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাবিত এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত 'বাংলা বানানের নিয়ম'—বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা আনয়নে অনেকখানি সার্থক হইয়াছিল। নিম্নে 'বাংলা বানানের নিয়ম' শীর্ষক পুস্তিকার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত ভূমিকা হইতে আংশিক উদ্ধৃত হইল—

ভূমিকা

'বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিতভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু-কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্‌টি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়—যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। প্রায় দুইশত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, যাঁহাদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে, সেইরূপ মতভেদ সমিতির সদস্যগণের মধ্যেও আছে। বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি-বিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে নিয়মাবলী সংকলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিবেন—বানানের যথেষ্ট সংস্কার হয় নাই, কেহ বা ভাবিবেন—প্রচলিত রীতিতে

CENTRAL LIBRARY

অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বানান-নির্ধারণের প্রথম চেষ্টায় এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'···শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৮ই মে ১৯৩৬

২য় সংস্করণ—'এই পুস্তিকার প্রথম প্রচারের পর বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট হইতে যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে তাহা বিচার করিয়া—বানান-সংস্কার-সমিতি কয়েকটি নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন' শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২রা অক্টোবর ১৯৩৬

৩য় সংস্করণ—'এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের পর আরও কয়েকটি অভিমত পাওয়া গিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বাংলা বানান-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানাইয়াছেন। এইসকল অভিমত বিচার করিয়া নিয়মাবলীর সংশোধন করা হইল।···শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২০শে মে ১৯৩৬

'গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় দুই শত উত্তর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহুপ্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি সমস্ত অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।' . পৃ ১, ১৯৩৭ ইং তৃতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

বাংলা পুস্তক-প্রকাশন সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের এক প্রস্তাব তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ইং তারিখে লিখিত এক পত্রে করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনুমানিক একশত পৃষ্ঠার এক একখানি গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত পুস্তকসমূহ জনসাধারণের জন্য সহজভাষায় যথাসম্ভব সরল ভঙ্গিতে রচিত হইবে। ইংরাজী ভাষায় এ জাতীয় বহু গ্রন্থ আছে। এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হইলে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে অধিকন্তু জনসাধারণও উপকৃত হইবেন। গত ৩০ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণকল্পে যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহারই পরিণতিস্বরূপ বাংলাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম করিলেই সকল কাজ সম্পূর্ণ হইল না। কেবলমাত্র পাঠ্যগ্রন্থ রচনার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় বিগত বহুবৎসর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রস্তাবিত সিরিজ এক্ষেত্রে নূতনত্ব আনয়ন করিবে। সুনির্বাচিত একদল পণ্ডিতের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজভাষায় গ্রন্থ রচনা করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জাতীয় গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান প্রসার লাভ করিবে এবং অনেকের পক্ষে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ সহজতর হইবে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন গ্রন্থকারের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ আলাপ করিয়াছিলেন এবং অনেকেই উৎসাহের সঙ্গে তাঁহার এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাবিত গ্রন্থ রচনার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব হইবে না। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থের

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থকার হইতে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি এই প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাবিত এই সিরিজের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আপাততঃ রামতনু লাহিড়ী তহবিল হইতে এক-কালীন ৬০০০ ছয়হাজার টাকা পৃথক করার প্রস্তাব করেন। সিনেট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সিণ্ডিকেট এক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং যথাসময়ে গ্রন্থরচনা কাজের সূত্রপাত হইবে। ১৯৩৬ ইং রামতনু লাহিড়ী তহবিলে যে পনেরো হাজার টাকা জমা ছিল তাহা হইতে এই ছয় হাজার টাকার ব্যবস্থা হইতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ লিখিত এই পত্র ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সিণ্ডিকেটে আলোচিত হইয়াছিল। পরবর্তী ২রা অক্টোবর তারিখের সিণ্ডিকেটে এই উদ্দেশ্যে ৯ জন সদস্যের এক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যরা যথাক্রমে—

(১) উপাচার্য, (২) প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., বার-অ্যাট-ল, (৩) রায়বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ., (৪) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি এইচ. ডি., বি. লিট., (৫) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট., (৬) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ., (৭) প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ., (৮) অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহ, ডি. এস. সি., (৯) স্নাতকোত্তর সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক —শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম.এ.। প্রস্তাবিত বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন সমিতির সম্পাদক হিসাবে অমরেন্দ্র নাথ রায় ৭ই এপ্রিল ১৯৩৮ ইং যোগ দিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাবিত অল্পপৃষ্ঠার তথা অল্পমূল্যের কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৩৮ ইং রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৮ হইতে ১৯৪১ ইং মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ অল্প পৃষ্ঠার তথা অল্প মূল্যের গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের প্রকাশকাল ও গ্রন্থমূল্য নির্দেশ করা হইল—১৯৩৮ইং—বঙ্কিম পরিচয় (·৫০), বাংলাভাষা পরিচয় (·৭৫), উপনিষদের আলো (১·০০), ১৯৩৯ ইং—বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম (·৭৫), ভারতের কারুশিল্প (১·০০), মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ (১·০০), ইমানুএল কাণ্ট (১·০০), ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ (·৭৫), ১৯৪০ ইং—ইউরোপের শিল্পকলা (১·০০), অশোক (১·০০), গীতার বাণী (১.০০), বুদ্ধি ও বোধি (·৫০), ১৯৪১ ইং—ধর্ম-সাধনা (১·০০), হেগেলের দার্শনিক মতবাদ (১·০০), দাক্ষিণাত্যে (·৭৫)। এস্থলে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি যে শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহে অল্পমূল্যের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই জাতীয় অল্পসংখ্যক গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে শ্যামাপ্রসাদকে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট কর্মযজ্ঞে যেক্ষেত্রে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্ট সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠে নাই সেস্থলে বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, অল্পমূল্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-প্রকাশ প্রচেষ্টা অনেকখানি সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' সিরিজে এ পর্যন্ত শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ—রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সাহিত্যের স্বরূপ' ১লা বৈশাখ ১৩৫০ বাং, দ্বিতীয় গ্রন্থ রাজশেখর বসু রচিত—'কুটীর শিল্প' ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ বাং অর্থাৎ ১৯৪৩ ইং প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৭ ইং, গৃহীত প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী ও রামায়ণ এবং ১৮৫৮ ইং, গৃহীত দ্বিতীয় পরীক্ষায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, রামায়ণ, তোতা ইতিহাস ও আরবারজনী

CENTRAL LIBRARY

বাংলা পাঠ্য ছিল। ১৮৬৮ ইং বাংলা পাঠ্য নির্দেশ করিয়া যথাসম্ভব সত্বর বাংলা পাঠ্য সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। আমরা ১৮৬৭ ইং মুদ্রিত 'Subjects of Examination in the Bengali Language, appointed by the Senate of Calcutta University for the Entrance Examination of 1869.' গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১৮৬১ ইং হইতে ১৮৬৬ ইং মধ্যে প্রথম কোন্ বৎসর এই জাতীয় সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা জানা বাঞ্ছনীয়। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সন্ধান লইতে পারি নাই। ১৮৬৭ ইং প্রকাশিত (১৮৬৯ ইং পরীক্ষার জন্য) সঙ্কলন ব্যতীত ১৮৭৪ ইং প্রকাশিত (১৮৭৫ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৪ ইং প্রকাশিত (১৮৭৬ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৫ ইং প্রকাশিত (১৮৭৭ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৬ ইং প্রকাশিত (১৮৭৮ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৭ ইং প্রকাশিত (১৮৭৯ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৭৯ ইং প্রকাশিত (১৮৮১ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৮৪ ইং প্রকাশিত (১৮৮৫ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৮৫ ইং প্রকাশিত (১৮৮৬ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৮৯ ইং প্রকাশিত (১৮৯১ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৯১ ইং প্রকাশিত, ১৮৯২ ইং প্রকাশিত (১৮৯৫ ইং পরীক্ষার জন্য), ১৮৯৩ ইং প্রকাশিত বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। একাধিক সঙ্কলন দেখিবারও সুযোগ হইয়াছে। এই একল সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থসমূহ 'appointed by the Senate of the Calcutta University'—এরূপ লিখা আছে। ১৮৯১ ইং ও তৎপরে প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থসমূহ 'appointed by the Syndicate of the Calcutta University' —এরূপ উল্লেখ আছে। যে ১৩ খানি সঙ্কলন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি তন্মধ্যে মাত্র একখানি সঙ্কলন গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার নাম আছে। সঙ্কলয়িতার নামযুক্ত সঙ্কলন গ্রন্থখানি ১৮৯৫ ইং এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ১৮৯২ ইং মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। এই সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ১½ পৃষ্ঠাব্যাপী এক ইংরাজী ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা, সূচীপত্র ও আখ্যাপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

Preface

One of the objects kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as in possible is a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigor and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the *Mahābhārata*, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kālidāsa. Babu Bhudeb Mukerjee's masterly studies of modern Bengali life, and Babu RajKrishna Mukerjee's lucid expositions of the most advanced European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him, he cannot expect to obtain from his English text-books. There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular

CENTRAL LIBRARY

groove of thought. Among the results of education, scarcely anything is more valuable than the capacity to consider questions that arise from different and even opposite points of view. I have not therefore thought it proper to confine the extracts to what will meet with universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar, Bengali Grammar is still in some respects in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writings with some reluctance. They had a place in all previous selections ; their exculsion now for the first time would have required some explanation, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their own vernacular, more time and attention than they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

Bankim Chandra Chatterjee

সূচীপত্র

গদ্য

	পৃষ্ঠা
মহাভারত—কৃষ্ণ-পার্থ নকুল	১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—তপোবন, শকুন্তলার বিদায়	৭, ১২
অক্ষয়কুমার দত্ত—স্বপ্ন দর্শন—বিদ্যা-বিষয়ক	১৬
প্যারীচাঁদ মিত্র—প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান	২৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—অর্থসঞ্চয়, অতিথিসেবা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যব্রত	২৫, ৩০, ৩৪, ৩৭
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সভ্যতা, মনুষ্য ও বাহ্যজগত	৪১, ৫৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মনুষ্যে ভক্তি, ভালবাসার অত্যাচার, একা	৬৮, ৭৬, ৮২

পদ্য

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—প্রকৃতি	৮৯
ভারতচন্দ্র—শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি, মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপ-আদিত্যের যুদ্ধ	৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

CENTRAL LIBRARY

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ঋতু ৯৮
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—সীতা ও সরমা ১০১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চাতক-পক্ষীর প্রতি, অশোক তরু, দেবনিদ্রা ১০৮, ১১২, ১১৪
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উষা ১২২

এই গ্রন্থের আখ্যা-পত্র—

Bengali Selections/Appointed by the/Syndicate of the Calcutta University/For the/Entrance Examination/1895/Compiled by/Bankim Chandra Chatterjee/Calcutta/Thacker, Spink & Co.,/Publishers to the University/1892/পৃষ্ঠা ৫+১২৭, আকার ২১½ × ১৪ সেন্টিমিটার।

এণ্ট্রান্স, বি. এ. ও এম. এ. বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

১৮৫৭ ইং ৬ই এপ্রিল সোমবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা পরীক্ষাও গৃহীত হয়। এই বাংলা পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন বিশপ কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষার কোন প্রশ্নপত্রের সন্ধান পাই নাই। ১৮৫৮ ইং এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দ্বিতীয় বৎসর, ১লা মার্চ সোমবার ইংরাজী, ২রা মার্চ মঙ্গলবার বাংলা পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। এই বৎসর ৫ই এপ্রিল সোমবার প্রথম বি. এ পরীক্ষা আরম্ভ হয়, ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলা পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৫৮ ইং এণ্ট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষার বাংলার পরীক্ষক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৯২০ ইং প্রথম বাংলা এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রশ্ন-কর্তার নামও মুদ্রিত হইত। নিম্নে বিদ্যাসাগর রচিত ১৮৫৮ ইং এণ্ট্রান্স ও প্রথম বি. এ. পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র এবং ১৯২০ ইং প্রথম বাংলা এম এ পরীক্ষার—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টম পত্রের প্রশ্নপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হইল। বিকল্প ভাষা ও মৌলিক ভাষার প্রশ্নপত্র অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্রের প্রশ্নপত্র উদ্ধৃত হইল না।

Entrance Examination

1858

Tuesday, March 2nd Morning 10 to 1½

Bengali

Examiner Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur.

রাজ্যথও ছাড়ি রাম যান বনবাসে। শিরে হাত দিয়া কান্দে সভে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর। তিনজন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী। জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ। হেন সীতা বনে যান দেখ সর্ব্বজন॥
যেই রাম ভ্রমেন সোণার চতুর্দ্দোলে। হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি। হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে। বিদায় হইতে যান পিতার চরণে॥
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান। রাম বনে গেলে তাঁর কিসে রবে প্রাণ॥

CENTRAL LIBRARY

রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী। রাম হেন পুত্র যার হৈল বনবাসী॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥
জানকী সহিত রাম যান তপোবন। রাজ্য সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ।

Answer the following questions—

a. রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।—রাম কি জন্যে রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া বনবাসে চলিলেন তাহার সবিশেষ লিখ। b. যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য কি? c. রাম পথ বহেন ভূতলে।—ইহার অর্থ কি? d বন ও তপোবন এই উভয়ের বিশেষ কি বল? e. বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।—এস্থলে হরিয়াছে ক্রিয়ার কর্তা কে? f. রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী—তাহাকে রাক্ষসী বলিল কেন, সেই বা রাজাকে কিরূপে পাগল করিল; এস্থলে পাগল শব্দের অর্থ কি? আর পাগল শব্দের প্রকৃত অর্থের সহিত ঐ অর্থের ভেদ কি? g মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ।—ইহার অর্থ কি? h. রাজ্য সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ।—লক্ষ্মণ কি জন্যে রাজ্য সুখভোগ ছাড়িয়া চলিলেন এবং কোথাই বা চলিলেন বল?

2. **Turn the following lines into prose—**

পিতৃশোক-ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ। ভরত করেন দেখ রজনী দিবস॥
আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী। এতেক জানিলে কেন দেশে আমি আসি॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত। তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস। তাহার কারণে কান্দ হয় পুণ্য নাশ॥
রাম হেন পুত্র যার গুণের নিধান। কে বলে মরিল রাজা আছে বিদ্যমান॥
এই রূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি। ভরত না শুনে কিছু কহে খেদ বাণী॥
কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে। কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে॥
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি। দুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি॥
শশধর যেমন হইলে মেঘাচ্ছন্ন। বিবর্ণ ভরত আমি তেমনি বিষণ্ণ॥

3. পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত নির্জনস্থানে বসিয়া পাত্রকে আহ্বানপূর্বক সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমরা বিবেচনা কর ইহার কি কর্তব্য।

প্রধান প্রধান সকল মন্ত্রিরা নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আমাকে আজ্ঞালিপি লিখিয়াছেন।

ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ! দেশাধিকারীর বিষয়ে অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবেক। ইহা স্থির হইলে কিঞ্চিৎকালের পর পাত্র প্রেরিত হইলেন। হঠাৎ মহারাজের যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ হয় না।

Answer the following questions—

1. নির্জন, পত্রার্থ, আজ্ঞালিপি, পরামর্শ সিদ্ধ—ইহার মধ্যে কোন পদে কোন সমাস হইয়াছে বল। 2. অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া—এস্থলে অত্যাচারে কোন কারক? 3. অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে হইবে ক্রিয়ার কর্তা কে? আর সাবধানপূর্বক এই প্রয়োগ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ; যদি অশুদ্ধ বোধ কর তাহার কারণ বল। 4. পাত্র প্রেরিত হইলেন—ইহা কোন বাচ্যের প্রয়োগ, এই বাচ্যের কর্তা কর্ম ক্রিয়া দেখাইয়া দাও।

CENTRAL LIBRARY

Tuesday, March 2nd Afternoon 2 to 5½. Bengali.

Examiner,—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur.

1. Translate the following lines into English—

রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রাজনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ এবং মীরজাফর আলিখাঁ, ইহাদিগের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও। ক্রমে ক্রমে রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। জগৎশেঠ কহিলেন, এ দেশে অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছে, দেশাধিকারী অতি দুরন্ত, কাহারো বাক্য শুনে না, দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে; অতএব সকলে ঐক্যমত অবলম্বনপূর্বক উপায় চিন্তা না করিলে, কাহারো নিষ্কৃতি নাই, দেশ অচিরাৎ উচ্ছন্ন দশায় নিপতিত হইবেক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এতাবদ্বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া কহিলেন, আপনারা রাজদ্বারের কর্তা, আমি আপনাদিগের মতাবলম্বী; যেরূপ কহিবেন সেইরূপ কার্য করিব। ইহা শুনিয়া জগৎশেঠ কহিলেন, আপনি বাসায় যাউন; আমি মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব। ইহা স্থির হইলে, রাজা বিদায় হইয়া বাসায় গেলেন॥

2. Translate the following sentences in Bengali—

1. The air is really a heavy substance, although it seems to be so light.
2. Every day the sun rises in the sky until noon, and then descends again until evening, when it sets entirely out of sight.
3. At night, after the sun has set, the surface of the earth sends back into the air a great deal of the heat it had received during the day, and consequently then beocmes much colder than the air.
4. When solid substances are made intensely hot, they are changed into liquids. If they are subjected to still higher degrees of heat, the liquid becomes vapour.
5. Man has within his throat a little instrument or organ, by means of which he can produce sound whenever he pleases. This is called the organ of voice.

Examination Papers. 1858. Bechelor of Arts

Tuesday. April 6th Morning 10 to 1½. Bengali

Examiner,—Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.

Mohabharat

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়, হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত, সর্বত্র গমন মনোজব॥
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগ যুক্তা অমর অসুর পূজ্য, চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম, ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা, শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত॥

CENTRAL LIBRARY

মুখে হরি নাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে, গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন, উপনীত পাণ্ডব সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তেব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত, প্রণাম করেন সে চরণে॥
সুগন্ধ উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া, বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর, ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে, কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম, ধন উপার্জন ধর্ম, নির্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, এসবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার কি না করহ, কার্য্যে না কি রাখ মুখ্যগণ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূলে কিন কত, না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত, দুঃখত না পায় কোন জনা॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা, সবে অনুগতত তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত, পূর্ণ করিয়াছত ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস, আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম কর্মে ধন ব্যয়, কর নিত্য উপচয়, পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ॥

Answer the fol owlng questions—

1. সর্বত্র গমন মনোজব—এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদে সমাস আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি? যে দুই শব্দে সমাস হইয়াছে উহাদিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।
2. বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম—ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।
3. পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?
4. বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ—বারিজ নয়ন যুগে এই স্থলে বারিজ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দে ঐ অর্থ বুঝায় কেন? আর এই শব্দের সহিত নয়ন শব্দের কি রূপে অন্বয় হইবেক? নারদের নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে? পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?
5. শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমাস আছে বল? এবং যে কয়েকটী শব্দ আছে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকের অর্থ লিখ।
6. পরিধান কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণাজিন পদের অর্থ কি? এক শব্দ কি দুই শব্দ? যদি দুই শব্দ হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই দুই শব্দে কি সমাস আছে, এবং সমাস হইয়া দুই শব্দের কি অবয়ব পরিবর্ত্ত হইয়াছে বল?

CENTRAL LIBRARY

7. দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে—এই স্থলে ঋষি পদে কোন কারক আছে বল? উঠিল ক্রিয়ার কর্তা কে? ততক্ষণে এই পদের অর্থ কি?
8. আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত—ধর্মসুত শব্দে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে? এই শব্দে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় কেন?
9. সুগন্ধি উদক দিয়া—এ স্থলে 'দিয়া' ক্রিয়াপদ কি না?
10. যথা শিষ্ট ব্যবহার—এই অংশের অর্থ কি?
11. কার্যে না কি রাখ মুখ্যগণ—ইহার অর্থ লিখ।
12. তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত—ইহার অর্থ কি? আর শরণাগত পদে কি সমাস হইয়াছে বল? এবং এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।
13. বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক—দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।
14. অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?
15. প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ—ইত্যাদি এই শ্লোকের অর্থ লিখ।

Pooroosh Parikhya.

গোদাবরী নদী তীরে বিশালা নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন নামা তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয়। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক্ রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয়, এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্য পক্ষিগণ শাঁচান পক্ষির ভক্ষ্য হয়; সেই প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়। অতএব বণিক্ বিবেচনা করিল যে এই রাজকুমার অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে, সেই কারণ ইহার উপাসনা করি। পরে বণিক্ সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়। বণিক্ সেই প্রকৃতি দ্বারা সেবা করত নানোপসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল।

Answer the following questions --

1. সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়,—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?
2. ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে—এ স্থলে সুখগ্রাহ্য শব্দের অর্থ কি বল?
3. তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য লিখ।

Tuesday. April 6th Afternoon 2 to 5½. Bengali

Examiner,—Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.

Translate the following passage into English—

এক দিবস মাধবা, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, বৎসরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই

CENTRAL LIBRARY

শার্দ্দূল, এই করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও নদ নদী সকল শুষ্ক প্রায় হইয়া আইসে; যে অল্প প্রমাণ জল থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ, তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক করা হয় না। আর প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে, যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রি শেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যূষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা নাম্নী এক তাপস কন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, একবারও চক্ষু মুদি নাই।

Translate the following passage into Bengali—

"Having resided at Agra till there was no more to be learned, I travelled into Persia, where I saw many remains of ancient magnificence, and observed many new accommodations of life. The Persians are a nation eminently social, and their assemblies afforded me daily opportunities of remarking characters and manners, and of tracing human nature through all its variations. From Persia, I travelled through Syria, and for three years resided in Palestine, where I conversed with great numbers of the Northern and Western nations of Europe; the nations which are now in possession of all power and all knowledge, whose armies are irresistible, and whose fleets command the remotest parts of the globe. When I compared these men with the natives of our own kingdom, and those that surround us, they appeared almost another order of beings. In their countries it is difficult to wish for any thing that may not be obtained; a thousand arts, of which we never heard, are continually labouring for their convenience and pleasure; and whatever their own climate has denied them, is supplied by their commerce."

প্রধান ভাষা বাংলা এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (১৯২০ ইং)

History of the Bengali Language and Literature. First Paper—First Half

Examiner—Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen, BA., D Litt. Unless otherwise specified, candidates may write their answers either in English or in their own Vernaculars.

Only Three Questions to be attempted. The questions carry equal marks.

1. Show how far our language and literature have been influenced by the Islamite conquest.
2. Trace the gradual growth of the Bengali metres from the earliest times down to the 18th Century.
3. Give a brief account of the Yatras of the old school, with a critical review of the works of some of the prominent Yatrawalas.

CENTRAL LIBRARY

4. What are the striking literary features of the period dominated by the influence of the court of Krishnachandra ? Comment on their peculiar merits and defects.
5. Clearly indicate the literary and religious evolution in Bengal brought about by the Pouranik Renaissance.
6. Give a critical estimate of the poems of Ramprasad, Alwaal, and Nidhu Babu.

Second Half

Examiner—Dr. Abhay Kumar Guha, M.A., Ph.D. Unless otherwise specified, candidates may write their answers either in English or in their own Vernaculars.

Only Three Questions to be attempted
The questions carry equal marks.

1. Give an estimate of the Vaishnava Theology propounded by Rama Ray to Chaitanya as narrated in the Chaitanya Charitamrita.
2. Show the influence of Chaitanya's life on the songs of some of the Vaishnava Pada-Kartas, particularly on Krishna Kamal Goswami, illustrating your remarks by reference to his Divyonmada.
3. Give a critical estimate of any one of the following works—
   (a) Chaitanya Charitamrita.
   (b) Govinda Dasa's Karcha.
   (c) Prema-Vilasa.
4. Give a full account of the post-Chaitanyic Vaishnava movement in Bengal, with special reference to Sreenivasa, Narottama and Syamananda.
5. Give a comparative review of the lyrical song's of Vidyapati and Chandidasa, illustrating your answer with quotations from each.
6. Mention some of the noteworthy incidents of Chaitanya's tour in the Deccan, with special reference to the Muraris, Naroji, Barmukhi and Bhilpantha.

Old Texts Second Paper—First Half

Unless otherwise specified, candidates may write their answers either in English or in their own Vernacular. The answers to the two halves are to be written in separate books.

Examiner—RaiBahadur Dr. Dineschandra Sen B.A., D.Litt.

Only three to be attempted. The questions are of equal value.

1. Explain with reference to the context and unfolding all allusions—
   (a) হিরা মন মাণিক্য লোকে তলিতে শুধাইত। কাহার পুষ্করীর জল কেহ না খাইত॥
   কাহার বাটীতে কেহ উদার না চাইত। সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত॥
   হাড়াইলে ঢেপুয়া পুনি না চাহিত যার। এমতে গোআইল লোকে হরিষ অপার॥
   মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলি বাশের বেড়া। গৃহস্তের পরিদান সোনার পাছুয়া॥

CENTRAL LIBRARY

গরীবে চড়িবে কিরে খাসা তাজী ঘোড়া। ফকিরের গাহে দিত কাপড় জোড়া।
তোমার বাপের কালেরা সব ছিল ধনী। সোনার কলসি ভরি লোকে খাইত পানী।

(b) শেত বান্দা এড়ি যামু হারিয়া ছোহর। অদুনা পদুনা এড়ি যাইমু কার ঘর।
দাফারে এড়িয়া যাবে সত্তের কায়ন বেত। গোঞ্জালে এড়িয়া যাবে গাই বার শত।
এইসব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া। নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বানিয়া।
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৈরব সহর। দাদার মিরাশ যাবেক কমলাক নগড়।
তুহ্মি মাএর যত বাড়ী কনিকা নগড়। আহ্মি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর।
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আহ্মার গোচর। আহ্মা হৈতে কোনজন আছয়ে ডাঙ্গর।

2. Translate into English—

(a) ভুড় ভুড় করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল। বেয়াল্লিশ ভইস হৈল মুরত বদলাইয়া।
ঐ দরিয়া ভইস পড়িল ঝম্প দিয়া। খার খাইতে খাইতে যমক নি যায় পিট্টিয়া।
মধ্য দরিয়াত যমক ধরিল ঠাসিয়া। ঐ ত গোদা যম আটিয়া বজ্জর।
ডাইন পিড়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দিল লড়। ঐটে হইতে গোদা যম দিশাহারা হইল।
ছেকলা মৎস্য হইয়া জলত ভাঙ্গিবার লাগিল। ওরূপ ধুইল ময়না একতর করিয়া।
পান কাউড়ি জানোয়ার হইল মুরত বদলাইয়া।

(b) মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্ম্মী বড় রাজা। ময়নাক বিভা করিল তার নাও বুড়ি ভারয়া।
ময়নাক বিভা করিল রাজার না পুরিল মনের আশ। তারপরে ছাবপুরের পাঁচ কন্যা বিভাকরে
পুরি নেল মনের হাবিলাষ।
আজি আজি কালি কালি বার বছর হল। ছাবপুরের পাঁচকন্যা ডাহিনী ময়না কন্দল লাগিল।
দেখিবারে না পারি মহারাজ বাগল করি দিল।

3. (a) Derive the words underlined in the above extracts and give geographical notes in regard to the places mentioned therein.

(b) Prove and account for the extensive popularity of the Mainamati Songs outside Bengal.

4. What historical glimpses of Bengal do yon find in the Mainamati Songs in respect of her social, religious and political conditions ?

5. (a) Give all up-to-date information regarding Raja Govinda Chandra as a historical character.

(b) Discuss the various allegations made against Mainamati by her son, and account for the great respect for her breathed in the poem inspite of them.

CENTRAL LIBRARY

Old Texts and Unseens. Second Half

Examiner—Mr. Basanta Ranjan Ray.

The figures in the margin indicate full marks.

1. Explain any six with reference to the context – 12

(a) আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়।
(b) কাক মাঙ্গলি দিয়া কেহ নাহি যায়।
(c) মোর বৈন অছুনারে পাইলা বেভার।
(d) সাত কাইতের বুদ্ধি আম্মার ধরের ভিতর।
(e) ঘিঞ্জিরের হাতে প্রভু সমর্পিলা গেজা।
(f) গোর্খনাথ থুইল নাম সোন্দর মৈনাই।
(g) বাদশাই যাচক নহে মোহর মারিমু।
(h) আবের কাঞ্জলি নহে দুই তন ঢাকিমু।
(i) সুতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু।
(j) আমার বসের নদী কন্দে যাবে শুকাইয়া।

2. (a) Give the meanings of any ten of the following— 10

পোতা, বরাহ্মণ জ্ঞান, হলদির ফুল, রজু, বেগনা, সুকাএ, ঢেপুয়া, পাথার, কাণীভুক্তি, পাইঘর, আধারি, সাহেমানিক, শেতবান্দা, গাবুরালী, আবের কাঞ্জই, মেঘনাল শাড়ী, হাওয়াত and সিতাব।

(b) What is 'লাচাড়িছন্দ'? Are you aware of any analogous metre in Bengali? If so, note points of agreement and disagreement.

Unseens

3. Explain (a) and either (b) or (c) 25

(a) জখনে হইল রাজা মীন অধিকারী। ভাল মতে নাহি দেখি জোগি দেসান্তরি॥
পরদেসী জোগি পাইলে লইয়া জাএ ধরি। দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে পালাএ মারি॥
লাখে লাখে জোগি সব পালাইল মারি। মৃত জোগির গন্ধে পথ বহিতে না পারি॥
বুড়া জোগি পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল। গাভুর জোগি পাইলে তুলিয়া দেন সাল॥
অধ বস জোগি পাইলে মৈধা দেসে কাটে। পোলা জোগি পাইলে পাটাত তুলি বাটে॥

(b) কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে। কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা। দাসী হঞা তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে। তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আম্মার মন। বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥

(c) টাকা নয়রে কড়ি নয়রে কোটরে রাখিব। পরের লগ্যা হৈছে গৌরা পরেরে সে দিব॥
অর্দ্ধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অর্দ্ধেক গাঙ্গে কুয়া। মধ্য গাঙ্গে বাদ্য বাজে গৌরা লবার লইঞা॥
আড়শী কাঁদে পড়শী কাঁদে কাঁদে রইয়া রইয়া। গৌরীর জনকে কাঁদে গামছা মুড়ি দিয়া॥
গৌরীর যে ভাই কাঁদে খেলার সাজি লইয়া। গৌরীর যে মায়ে কাঁদে শানে পাছার খাইয়া॥
মাও ধন বাপ ধন তোমরা নি রাখ্‌বা মোরে। সভার মধ্যে লইছি টাকা কেমনে রাখ্‌ব তোরে॥
উত্তর আটের রামকলা কাট্যা আন পাত। তাহাতে খাইবে গৌরী নাইওরেরি ভাত॥

CENTRAL LIBRARY

Third Paper

Examiner—Mr. Charuchandra Banerjee, B.A., Pandit Rajendranath Vidyabhushan.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

The figures in the margin indicate full marks.

Unless otherwise specified, the candidates may answer the questions either in English or in the candidate's own Vernacular.

1. What do you know of the poet Mukundaram Kavikankan from the internal evidences regarding the following points — 16
   (1) His parentage, ancestral home and family members. (2) the vicissitudes he suffered in life, (3) his learning and erudition and his knowledge of social conditions and customs, (4) the then political situation of the country. (5) the probable date of the composition of his work and his indebtedness to several other previous writers on the subject. (6) his religious faith; (7) the influence of the Buddhistic Dharma cult on his poem.
2. Give a critical estimate of the character of the Goddess Chandi as depicted by Kavikankan Mukundaram in his work. 10
3. What is the value as poetry of Meghnadbadh ? Discuss Michæl Madhusudan's position in modern Bengali literature. 12
4. Compare and contrast the characters of Rama and Laxman on one hand and Ravana Meghnada on the other. On which side leans the poet Michæl Madusudan's sympathy, and why ? 14
5. Explain fully with reference to their contexts, elucidating all the figures of speech and allusions whenever they occur, any two of the following four groups — 20

Group A

(a) বদন শারদ ইন্দু, তথি-স্বেদ বিন্দু বিন্দু— সুধাংশু মণ্ডলে যেন তারা।
রাহু তোর কেশ পাশ আইসে করিতে গ্রাস, পুণ্যের সময় হৈল পারা॥
জিনিয়া প্রভাত-রবি সিন্দুর-ফোঁটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা।
ও রূপ-মাধুরী তোর আমার লোচন চোর, ভুলায়ে মানস লিলি বান্দা॥

(b) বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা/বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না 'হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন বীর্য হীন রাবণ দুর্মতি,/যাদঃ পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।'

Group B

(a) সরসে নিশান্তে যথা ফুটি সরোজিনী/নমে দ্বিরাম্পতি-দূতী উষার চরণে,/
নমিলা মদন-প্রিয়া হর-প্রিয়া পদে।

(b) মণিহরণ-কীর্ত্তে প্রবেশি পাতাল-পথে, নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি।
রুক্মিণী দেবকী মিলি দিয়া জয় হুলাহুলী, তোমার করিল স্তবস্থিতি॥
তুমি দিলে বরদান জয়ী হৈলা ভগবান, সমরে জিনিল জাম্ববানে।
জাম্ববতী করি বিয়া আইলা সামন্তক লৈয়া, শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে॥

CENTRAL LIBRARY

Group C

(a) এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী। গলায়ে কুঠার বান্ধি করয়ে গোহারি।

(b) হায়রে! কোথা সে জ্যোতিঃ ভাবিত যে সদা/মুখচন্দ্রে? কোথা মরি সে সুচারু হাসি।
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা/দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে।
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী,/পতির উদ্দেশ্যে প্রাণ ও-বরাঙ্গ ছাড়ি।
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে।

Group D

(a) বরিষা বাদলে রামা আনলে দেহ ফু। কর্পূর তাম্বুল বিনা শুকাইল মু॥
ধুমযুত আনলে সদাই চক্ষে লো। দর্পণে নিহারি দেখ পড়িয়াছে গো॥

(b) নাহি বিষ মহেশ্বাস, এ বিপুল ভবে/না দমে ঔষধ যারে! তবে যদি কেহ।
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাচায় তারে?/কর্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি।
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা,—অভেদ্য কবচে ধর্ম আবরেন তারে।

6. Comment on the peculiarity of the blank verse introduced by Michæl Madhusudan, and on the metre in the following passages quoted from the Chandimangal by Mukundaram Kavikankan— 20

সভে বলে বলে গৌরীর বর মিলাছে ভাল। মদনমোহন বরের রূপে ঘর করাছে আলো॥
এক যুবতী বলে সই মোর করম মন্দ। অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥

7. Explain fully the following extracts with reference to their contexts, and elucidating all allusions— 20

(a) সনকার বোলে রোষে চাঁদ সদাগর। হেতালের বাড়ীতে কানীর ভাঙ্গিব পাঁজর॥

(b) সেনের সাহস কর্ম দেখিয়ে বিস্ময় ধর্ম, মনে চিন্তি কহেন ঠাকুর।
নবখণ্ড হয়ে কেবা করেছে কঠোর সেবা, এ তিন ভুবনে সুরাসুর॥

(c) রে সতি, রে সতি, কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর তাপস যত দিন, তত দিন না ছিল ক্লেশ॥

(d) কে তুমি গো একাকিনী আনন্দ-শিবিরে/ কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে?
চিনেছি,—হানিয়া খড়্গ প্রাণপতি শিরে,/ তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে।

(e) কৃপণ কোন কোন স্থলে লজ্জার শাসনে দাতা; স্বার্থপর লজ্জার শাসনে উদার; এবং পরদ্রোহী পাপিষ্ঠ লজ্জারই প্রভাবে পরোপকারী। লজ্জাজনিত লোকরঞ্জনের এ-সকল অনুষ্ঠান লোকসমাজের কিরূপ মঙ্গল-জনক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

Bengali Fourth Paper

Examiner—Mr. P. C. Ghosh, M.A.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
The figures in the margin indicate full marks.

CENTRAL LIBRARY

Attempt only Two Questions.
One answer at least must be in Bengali.

1. Give a brief survey, down to 1880, of the departments of literary activity into which the Vernacular literature of Bengal expanded under the inflence of Western models. 50
2. Indicate the extent of Western influence on the poetry of Michæl Madhusudan Dutt, and add a special note on his মেঘনাদ বধ showing how far it conforms to the Epic canon as laid down by European writers on Poetics. 50
3. Write on one of the following Topics— 50
   (i) নলিনী-বসন্ত as an adaptation of the Tempest.
   (ii) A comparative review of দুর্গেশনন্দিনী and Ivanhoe.
   (iii) A Shakespearean parallel to the visions of Serajuddaula in 'পলাশীর যুদ্ধ'
4. Give a brief history of literary criticism in Bengali during 1858—1880.

Fifth Paper Assamese Examiner Mr. S.N. Borah.
" Hindi Examiner Mr. Gangapati Sing.
" Oriya Examiner B.C. Majumdar.

Sixth Paper Assamese Examiner Ambica Nath Borah.
" Hindi. Examiner Mr. Gangapati Sing.
" Oriya. Examiner B.C. Majumdar.

Seventh Paper Pali Examiners Dr. B. Baruah, M.A., D Litt., S. N. Mitra, Esq. M.A.
" " Prakrit " Pandit Muralidhar Banerji, M.A., Mr. Basanta Kumar Chatterji, M A,
" " Persian " Aga Md. Kazim Shirazi.

Philology—Eighth Paper

Examiners Mr. P. C. Ghosh, M.A., Mr. B.C. Majumdar, B.L.

Answer any six of the following questions, which are all of equal value

1. Either note the phonetic pecularities of the Bengali Vowel অ in its different situations in a word, or note the conditions under which the initial এ is pronounced differently in Bengali.
2. Explain the characteristics of *eight* of the compound words occuring in either (a) or (b) below—

(a) ওরে হতভাগা! তুই কি রাতা-রাতি বড়মানুষ হবি? এই যা-তা কাপড় টাকা-টাকা গজে কিনেছিস্? একে এখানা তে-হাতি, আর তাতে বস্তা-পচা, পোকা কাটা, আর দাগ-লাগা; তেল ধুতি করা চলে না, ঘর-মোছার নেকড়া করা যাবে।

(b) চৈত্র মাসের মাঝা-মাঝি, অনেক হাটা-হাটি করিয়াছিলাম বলিয়া বাড়ী যাইতে পারি নাই, এখন মনটা বাড়ী-বাড়ী করিতেছে, তবে গা জ্বর জ্বর করিতেছে বলিয়া আজ যাইব না। চাকর-বাকর কাজ-কর্ম

CENTRAL LIBRARY

না, কেবল হাতা-হাতি করে। আজ রাঁধা-বাড়া বন্ধ, কাজেই ভাত-টাত কপালে নাই, বাজারের লুচি-সুচি কিনিয়াই কাজ চালাইতে হইবে।

3. (a) Formulate the rules regarding the use of the genitive—indicating suffix র and its variant এর, and illustrate your answer by giving examples.

(b) Trace the history of the plural-forming genitival suffix দিগের।

4. Which provincial Vernacular is allied to or has genetic affinity with the language of either of the following extracts ? Give adequate reasons for your answer.

(a) কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল ; চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

(b) নবমঞ্জরি সজ্জিঅ চুঅহ গাছে ; পরিফুল্লিঅ কেসু নআবন আছে।

5. Show how the suffix এ as occuring in the following passage indicates different cases.

গ্রামে লোকে এক মনে পূজা করি দেবগণে খড়্গে পশু কাটে লোক হিতে

6. Discuss in what manner Bengali is allied or related *either* to Oriya or to Assamese or to Eastern Behari dialects.

7. Give the history of the ablative-forming suffixes হ'তে and থেকে।

8. Note on *four* of the following obsolete Bengali words, stating whether they are in use either in any part of Bengal or in any language allied to Bengali. Give also their derivation.

আচাভুয়া, উছুর, ওদা, খরা, বানা (flag)

9. State the sources from which any *eight* of the following words have come into Bengali—কোমর, খোকা, গির্জা, কুলুপ, বালা (bangle), মালা (garland), বিদায়, ঘোড়া, তাজা, মার্তুল, নাবালক, বিন্তি (of the game of cards), বালিস, চাবি, টাকা, পাঁওরুটী, বাগান, পালান, মিস্ত্রী।

10. (a) Parse the word হেঁটে as occuring in the following two sentences—

(1) আমার গাড়ী নাই, কাজেই হেঁটে যাব। (2) হেঁটে চল বেলা গেল।

(b) State how the words বেটা, বোনাই, and মেসো, have been formed.

11. Give the derivation of *eight* of the following words আইবুড়া, কাণ্ডারী, খাপরা, তোলো, ঘড়া, কানা (edge), ঝোড়া and ভাগাড়, নর্দ্দমা, ছেলে, বস্তা।

সংবাদপ্রভাকরে এবং সোমপ্রকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

১৮৫৭ ইং ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এদেশবাসী শিক্ষিত জনগণ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বাংলা চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইবে। কিন্তু তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষানুযায়ী বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ায় ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তিন বৎসর পরে ১৮৬০ ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী (শনিবার ৩০শে মাঘ, ১২৬৬ বাং) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত

CENTRAL LIBRARY

হইল। এই প্রবন্ধে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে যেমন উপাধি দিয়া সম্মানিত করার ব্যবস্থা ছিল অনুরূপ ব্যবস্থা বাংলা-ভাষা-অভিজ্ঞদের জন্যও প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসর কালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে প্রায় ২১০০ জন ইঙ্গরেজী ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি. এ. উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোন উপকার দর্শিয়াছে কিনা? বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের অধ্যক্ষ ও সভ্যেরা ইহার কি উত্তর করিবেন? অবশ্যই বলিবেন, বাঙ্গলা দেশের সৌভাগ্য দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেশীয় ছাত্রবর্গের ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রাচীনমত পরিবর্ত্তিত হইয়া সুসংস্কৃত মত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই মনে বিদ্যাভ্যাসের বাসনা বলবতী হইতেছে। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান ফল। হে পাঠকবর্গ! আপনারা ইহার কি বিবেচনা করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও সভ্যদের এ সিদ্ধান্ত সত্য কিনা? বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে আমরা যে সকল আশা ভরসা করিয়াছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি, সে সকল কোন কার্য্যেরই হইল না। আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইঙ্গলণ্ডীয়রীতি মতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ওগৌরববৃদ্ধি হইবে, সকলেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদরপূর্ব্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে, এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত ও সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। কৈ এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, বরং দিন দিন দেশীয় ভাষার শ্রীহ্রাস সহকারে তাহার সঞ্চিত গৌরবের হানি হইতেছে ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দেশের মঙ্গল সাধনের এক প্রধান উপায়। ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। তবে কেন দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়বৃক্ষে এরূপ কুফল ফলিতেছে? হে পাঠকবর্গ! কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিয়ম করিয়াছেন, ছাত্রদিগকে দুইটী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ইঙ্গরেজী ভাষাই পরীক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইহা না হইলে চলিবে না। তাহার সঙ্গে অন্য কোন একটী ভাষার আবশ্যক। তাঁহাদের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রেরাই অগ্রে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অগ্রসর হয় দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের আর তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। অতএব যাহাতে দেশীয় ভাষার কোন প্রকারে অবনতি না হইয়া উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সে বিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করা গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গলা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি প্রচারিত করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার স্বতন্ত্র রূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়। বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের দেশীয় দশ বার বৎসরের বালকেরা অনায়াসে প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই সকল মাতৃভাষা নিপুণ বালকেরা যদি পরে ইঙ্গরেজী ভাষা নিপুণ হইয়া ইঙ্গরেজী উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে কি এক পরমাহ্লাদেরই বিষয় হইবে! অতএব

CENTRAL LIBRARY

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষার উপাধি পরীক্ষার নিয়ম প্রচার করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইয়া উঠিবে।'

১৮৬৩ ইং ২৩শে মার্চ তারিখের সোমপ্রকাশে উক্ত বৎসরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবের এক বিবরণ প্রদত্ত হয়। ইহাতে প্রসঙ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং উপাধিপ্রাপ্ত ভারতীয় ও বৃটিশদের মধ্যে যে পার্থক্য থাকা উচিত বলিয়া আচার্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছিল।

উপাধি দানার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা

'উপাধি প্রদান উপলক্ষে গত সোমবার টাউন হালে একটী সভা হইয়াছিল। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং এদেশীয় রাজা প্রভৃতি অনেকে সভাস্থ হইয়াছিলেন। সমাজগৃহ উত্তমরূপে সুসজ্জিত এবং উক্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যক্তিরা একবিধ পরিচ্ছদ ধারণ করাতে টাউন হালের অপূর্ব্ব শোভা হয়। বেলা ৪॥ টার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের বাইস্ চান্সেলর (সহকারী সভাপতি) অনরেবল আরস্কিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ সভার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া একাদিক্রমে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি এবং প্রশংসাপত্র প্রদান আরম্ভ করিলেন। এম. ডি., এম. এ., বি. এল., বি. এ. উপাধিধারীরা পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কালেজের অধ্যক্ষেরা আপন আপন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরিচয় দিয়া দিলেন। সভাপতি উপাধি প্রদানকালে প্রতি ব্যক্তিকে বলিলেন 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্-চান্সেলর, সেই ক্ষমতানুসারে আমি তোমাকে উপাধি প্রদান করিলাম এবং তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে তুমি এই উপাধির যোগ্যরূপে জীবনের সকল কার্য্য সম্পাদন কর'। উপাধি প্রদান সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। 'আজি আমাদিগের কি আনন্দের দিন, অন্য অন্য বৎসরে যাহা হয় নাই, এ বৎসর তাহা হইল। এ বৎসর আমরা প্রথম এম. ডি, এবং এম.এ., উপাধি প্রদান করিলাম। এতদ্দেশীয় যিনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রথমে এম. ডি. উপাধি লাভ করেন, তিনিও আমাদিগের সহিত অদ্য উপবেশন করিয়াছেন। কিন্তু এই আনন্দের সময়েও কয়েক ব্যক্তির কথা স্মরণ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে শোকের উদয় হইতেছে। যে মহাত্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি গত বৎসর পর্যন্ত চান্সেলরের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, সেই উদারস্বভাব লার্ড কানিঙ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গমনকালে বলিয়া গিয়াছিলেন নানা দুর্ঘটনাবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাদৃক মনোযোগী হইতে পারেন নাই কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভুলিবেন না। বাবু রমাপ্রসাদ রায় এবং কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথও গত বৎসর লোকান্তর গমন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইহাদিগকে হারাইয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহ না থাকাতে সময়ে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বোধ হইতেছে অধিক দিন আর আমাদিগকে এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট রোদন করিতে হইবেনা, শীঘ্রই আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কেবল গৃহ হইলেই হইবে না, মনোহর স্থানে গৃহটী সংস্থাপিত করিতে হইবে এবং রমনীয় ভূষণে গৃহকে ভূষিত করিতে হইবে। পুস্তকালয়ে নানাপ্রকার পুস্তক ও হস্তলিখিত রচনা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে উপাধিধারীদিগের নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই সকল হইলে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ দর্শন করিয়াই লোকের মন বিদ্যার প্রতি ধাবমান হইবে।

CENTRAL LIBRARY

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে নিয়ম আছে তাহার অনেকগুলির সংশোধন আবশ্যক। বিদ্যালয় সে বিষয়ে উদাসীন নহেন। প্রথমতঃ যাঁহারা মেডিকাল কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের প্রধানতম উপাধি লাভের বাসনা করেন, বি. এ. উপাধি না লইয়া ঐ সকল উপাধি লইতে পারেন না কিন্তু বি.এ. উপাধি পাইয়া অতি অল্প লোকেই মেডিকেল কালেজ প্রভৃতিতে অধ্যয়ন করেন। যাহাতে বি. এ. না পাইয়া তাঁহারা ঐ সকল উপাধির অধিকারী হইতে পারেন, তাদৃশ চেষ্টা করা যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভাষাতে যাঁহারা এম. এ. পরীক্ষা দিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এক্ষণে অত্যন্ত কঠিন নিয়ম আছে, সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষাতে সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন সাধারণ ব্যাপার নয়, এইজন্য এই নিয়ম করিবার প্রস্তাব হইতেছে যে দেশীয় ভাষা শিক্ষা স্কুল হইতেই শেষ করিয়া আসিয়া কালেজে সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রকার উন্নতি দেখিতেছি, তাহাতে আমাদিগের এরূপ ভরসা জন্মিয়াছে যে অত্যল্পকাল মধ্যে ইহা প্রধান পদ লাভ করিবে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেন্টিক মেটকাফ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের প্রথম সূত্রপাত করেন, তখনকার সঙ্গে এক্ষণকার অবস্থার তুলনা করিলে মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। ১৮৫৭ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই দুই হাজারেরও অধিক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, প্রায় ৮৭ জন বি. এ উপাধি পাইয়াছেন, ৫৭ জন বি. এল. হইয়াছেন ৬ জন এম. এ. এবং একজন এম. ডি. উপাধি পাইয়াছেন। ক্রমশই পরীক্ষোত্তীর্ণছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে হিন্দুই অধিক এবং বঙ্গদেশবাসীই অনেক। মুসলমানেরা এ সকল উপাধি লাভে যত্নবান নহেন এবং অন্য অন্য দেশবাসী অধিক লোকও ইহার জন্য অগ্রসর হন নাই। কিন্তু অন্যত্র হিন্দুরা যেন এরূপ মনে করেন না যে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমান উপাধি লাভ করিয়াই তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইলেন। ইউরোপে কতকাল হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, কত কাল হইল ইউরোপীয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলভোগ করিতেছেন, এদেশের লোকের তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। অতএব এক্ষণে এদেশের লোকের তাহাদিগের তুল্য ক্ষমতা লাভ করিবার বাসনা যুক্তি ও ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না।

প্রথমাবধিই জমিদারদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় যত্নবান আছেন, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, জমিদারেরা অদ্যাপিও বিদ্যার রসাস্বাদনে সমর্থ হইলেন না। একজন জমিদার বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে পরিমাণে উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, সহস্র অপর লোকের শিক্ষায় তাদৃশ ফলোদয় হয় না। যে উপায় অবলম্বন করিলে ইহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান যাইতে পারিবে, তাহাও স্থির করা যাইতেছে না। সে দিবস লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই কথা বলিলেন শিক্ষিত না হইলে লোকের নিকটে অতিশয় ঘৃণিত হইতে হয়, যে পর্য্যন্ত জমিদারদিগের এইরূপ সংস্কার না জন্মিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহারা শিক্ষার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করিবেন না। বাস্তবিকও তাঁহারা যে পর্য্যন্ত শিক্ষা না করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত বিষম ঘৃণার পাত্র রহিবেন সন্দেহ নাই। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যত্বের যে একটি প্রধান অঙ্গ বিদ্যাশিক্ষা, তাহা হইতে যিনি বঞ্চিত রহিবেন তিনি কি প্রকারে মনুষ্য বলিয়া গৌরব করিতে পারেন? বিদ্বান লোকদিগের তাঁহার সহিত একত্র উপবেশন ও ঘৃণার বিষয় সন্দেহ নাই। পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারী ছাত্রগণ! সত্য বটে জমিদারদিগের ন্যায় তোমরা ক্ষমতাশালী নহ, কিন্তু তোমাদিগের মন কর্ষিত ও আত্মা উন্নত হইয়াছে, তোমরা ইহার সাহায্য লইয়া সমুদায় কার্য্যে হস্তার্পণ কর। তোমরা কার্য্য করিবার উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমাদিগের দেশে সহস্র সহস্র বিষয়ের অভাব বিরাজ করিতেছে, তোমরা সেই সকল দূর করিবার চেষ্টা দেখ, স্মরণ করিয়া দেখ তোমাদিগের দেশ কেমন অজ্ঞান অন্ধ তমসে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মনে কর কি দুর্জ্জয় দুর্নীতি সকল তোমাদিগের দেশে রাজত্ব করিতেছে। সেই সকলের মূল উৎপাটন করা তোমাদিগেরই কর্তব্য। অতএব তোমরা

CENTRAL LIBRARY

তদনুষ্ঠানে যত্নবান হও। বোধ হয় লার্ড কেনিং মহোদয়ের কথা তোমাদিগের স্মরণ আছে। তিনি বলিয়াছিলেন তোমরা এক্ষণে সেই স্থানে অবস্থিত, যে স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার সমধিক সম্ভাবনা। যদি চেষ্টা না কর তাহা হইলে অধঃ পতিত হইবে আর যদি চেষ্টা কর, উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইবে। চরিত্র আর একটি বিষয়। যাহাতে তোমাদিগের চরিত্রটি উত্তম হয়, সদা তাদৃশ যত্ন করিবে, সচ্চরিত্রতা অমূল্য ধন, চরিত্র সৎ হইলে সকলের সম্মান ও ভক্তির আস্পদ হওয়া যায়।"

তাঁহার বক্তৃতা এইরূপে সমাপন হইলে সমাজ ভঙ্গ হইল। এই বক্তৃতার বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই, ইহা আপনিই ইহার উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে। তবে আমাদিগের বক্তব্য এই আরস্কিন সাহেব ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশের লোকের সমকক্ষতা লাভ বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন আমরা কোন ক্রমেই তদ্বিষয়ের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না! এদেশীয়েরা যদি ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, সমকক্ষতা লাভে সমর্থ না হইবেন কেন? না হইবার পক্ষে কি বিশুদ্ধ যুক্তি আছে, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পরিশেষে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশের জমিদারগণ কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া এই বক্তৃতা পাঠ করুন।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণ-যন্ত্র

সর্বপ্রথম ১৯০৮ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-মুদ্রণ-যন্ত্র কলুটোলা স্ট্রীটের এক ভাড়াকরা বাড়ীতে ৫৩,০০০ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এই মুদ্রণ-যন্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হইলে, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ও সিনেট হাউসের মধ্যবর্তী স্থানে টালির ছাদ-যুক্ত গৃহে স্থানান্তরিত হয়। প্রেসের কর্মবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানাভাব হওয়ায় ৪৮ নং হাজরা রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে ১,৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত গৃহে ১৯৪০ ইং জুলাই মাসে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপনের ফলে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত বহু বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এ দেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণযন্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক সর্বাধিক গ্রন্থ যে কয়টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট ১৫৩ খানি গ্রন্থ বিভিন্ন খণ্ড ও সংস্করণ সহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২২ খানি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৪ ইং পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের মূলে এক ব্যক্তির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সর্বাধিক কার্যকর হইয়াছিল। তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৪ ইং হইতে ১৯৪৪ ইং মধ্যে যে ১৭৬ খানি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, তন্মধ্যে ১৯ খানি গ্রন্থ স্যার আশুতোষের নামে উৎসর্গীকৃত। আশুতোষের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৪ খানি গ্রন্থ তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় রচিত যাবতীয় পুস্তকের এক কালানুক্রমিক তালিকা 'সুবর্ণলেখা'র পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত **Journal of the Department of Letters** এর ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন খণ্ডে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও এক কালানুক্রমিক তালিকা কলিকাতা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ তালিকার সঙ্গে প্রকাশিত হইবে। 'জার্নাল অব দি

CENTRAL LIBRARY

ভাষা ও সাহিত্যচর্চা যদি মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার সহায়ক না হয় তাহলে যে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য-জ্ঞানটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এই বোধও তিনি পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের মনে সঞ্চার করে দিয়ে গেছেন। যাই হোক তিনি বিভাগীয় প্রধান হবার আগে থেকেই তাঁর সমালোচনার বই 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যসূচীর তৃতীয় পত্রে পঠনীয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং তাঁর আগমনে বাংলাবিভাগে পঠন-পাঠনের মান ও মর্যাদা যে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাঙলাসাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার উন্নত মানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। সাহিত্য-ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের একটা আদর্শ মান তাদের সামনে ফুটে উঠেছিল। তাঁর অধ্যাপনার পদ্ধতি পরোক্ষভাবে অধ্যাপকদেরও প্রভাবিত করেছিল। প্রশ্নপত্রের মানকেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নত করেছিলেন। পাঠ্যসূচীতেও যথাসম্ভব সমসাময়িকযুগের উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন (পাঠ্যসূচী প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তুলনামূলক সাহিত্য-ধারণা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্যবিচারের দিকেও তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। বাঙলা পুথিশালার সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। পুথিশালার সংশ্লিষ্ট যে বিভাগীয় ছোট গ্রন্থাগারটি আছে তার সমৃদ্ধির জন্যও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তক সংগ্রহ ক্রয় ক'রে (যেমন প্রমথনাথ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সংগ্রহ) তিনি পুথিশালার সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতেও কিছুটা সক্ষম হন। ইতিপূর্বে অধ্যাপকদের বেতনের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল। বাড়বার বিশেষ সম্ভাবনাও ছিল না। তাতে আর্থিক সাচ্ছল্যের অভাব অধ্যাপকদের কাজে কর্মে নিরুৎসাহ এনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এই আশঙ্কায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বেতনক্রম চালু করার চেষ্টা করেন এবং তাতে সফলও হন। বিভাগীয় অধ্যাপকদের পক্ষে বিশেষত তাঁদের কাজ-কর্মের ও গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহ সঞ্চারের ব্যাপারে এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার ক্ষেত্রেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ দান আছে। প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক বাঙলাসাহিত্যের এই তিনযুগের সম্পর্কে অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার উৎসাহ তিনি সমানভাবেই দিয়েছিলেন। নিজেও ইংরেজী-সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়ে কেবল যে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের চর্চা করে গেছেন তাই নয়। বৈষ্ণব-কবিতা ও মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যিক বিশ্লেষণ ও সম্পাদনাকার্য আজও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। অধ্যাপনার মানদণ্ডকেও তিনি উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁর সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাবিভাগে যোগদান করেন। বাঙলাবিভাগের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগী নেতৃত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মানমর্যাদা যে বাড়িয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৫৫ সালের ৩রা আগষ্ট ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাবিভাগ থেকে অবসর নেওয়ার পর ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বিভাগের অস্থায়ী প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিভাগীয় দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ছিল। জানুয়ারি মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করলে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আপাততঃ অস্থায়ীভাবে প্রধান অধ্যাপকের ভারগ্রহণ করেন। ওই সালেরই ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি অস্থায়ী প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং ১১ই এপ্রিল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইসময়ে বিভাগে অধ্যাপকের অনটন চলছিল। কারণ আংশিক সময়ের অধ্যাপক ডঃ সুধীর দাশগুপ্ত পরলোকগমন করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এবং ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত অতি অল্পসময়ের ব্যবধানে অবসর নিয়েছেন। সেই অবস্থায়

CENTRAL LIBRARY

ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট পাঠ্যসূচীর দায়িত্ব ডঃ দাশগুপ্ত অনেকখানিই একা বহন করেছেন। অক্লান্তকর্মী ডঃ দাশগুপ্ত চর্যাপদ থেকে শুরু ক'রে সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব এবং রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পর্যন্ত অনেক কিছুই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়িয়ে গেছেন এবং রসগ্রহণ-ক্ষমতার নমনীয়তা ও ব্যাপকতার যে নিদর্শন তিনি দিয়ে গেছেন তা সত্যই দুর্লভ।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা ও ভারতীয় সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা চর্চার খ্যাতি বিদেশে ছড়িয়েছিল। বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ও শাক্তগীতি-সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থরচনা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। ১৯৬২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ফ্রান্সে সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ভারততত্ত্ববিদ্ বিদেশী পণ্ডিতদের যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলেন। বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতীয় ও বাংলাসাহিত্যের ঐশ্বর্যকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতসমাজের কাছে দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন ক'রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

আর একটি ব্যাপারে তিনি ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে গেছেন। তাঁর ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার কিছুকাল পূর্বে ১৯৫৫ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড অ্যাফ্রিকান ষ্টাডিজের রীডার বিশিষ্ট ভারতীয় সংগীতবিদ্ ডঃ আর্নল্ড বাকে (Arnold Bake) ভারতভ্রমণে আসেন। সে সময়ে নেপালে বজ্রাচার্য সম্প্রদায়ের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গান তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যান্য ভারতীয় লোকসংগীতের সঙ্গে অধ্যাপক বাকে সেই গানগুলি রেকর্ড করে নিয়ে যান। লণ্ডনে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সেই গানগুলি শুনে তার কাব্যরূপ ও ভাষার সঙ্গে চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। চর্যাগীতির যুগ থেকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কাল পর্যন্ত বাংলাকাব্য-ভাষার তেমন কোনো সাহিত্যিক প্রমাণ ছিল না। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন গানগুলি চর্যাগীতির কাল থেকে বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের কালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এবং এই দুই যুগের মধ্যে এই গানগুলি যোগসূত্র রক্ষা করে রয়েছে। চর্যাগীতির ধারাপদ্ধতিও যে এতকাল পর্যন্ত নেপাল-অঞ্চলে বহমান তারও প্রমাণ হিসাবে এই বাইশটি নেপালী গানকে দেখানো যেতে পারে। পরে দেশে ফিরে এসে ডঃ দাশগুপ্ত নেপাল অঞ্চলে গিয়ে ওই ধরণের শতাধিক গান সংগ্রহ করেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অকালমৃত্যুতে এই গানগুলির গভীরতর গবেষণায় ছেদ পড়ে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গানগুলি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশের চেষ্টা চলছে।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়ে আমাদের বাঙলাবিভাগেরই সম্মান বৃদ্ধি করে গেছেন। তাছাড়া অনেক সুযোগ্য অধ্যাপককেও তিনি বিভাগে এনেছেন অধ্যাপনার সমৃদ্ধির জন্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, স্বর্গত ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ সকলেই ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের আন্তরিক চেষ্টায় এই বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ডঃ দাশগুপ্তের আমন্ত্রণেই সাহিত্যতত্ত্ব পড়াবার ভার গ্রহণ করেন।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অকালমৃত্যুতে বাঙলাবিভাগ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠাবান অধ্যাপক ও পরিশ্রমী গবেষক ছিলেন তেমনি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার ব্যাপারেও প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলাসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সময়ে গবেষণা শুরু হয় ও পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ আসে কিন্তু সমস্ত কিছুই তাঁর আকস্মিক তিরোধানে (২১. ৭. ১৯৬৪) স্তব্ধ হয়ে যায়।

CENTRAL LIBRARY

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে ডঃ দাশগুপ্তের আমলেই বাংলাবিভাগে রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি থেকে এই পদের সূচনা। ওই বছর ১১ই ফেব্রুয়ারি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই অধ্যাপক পদটিতে যোগ দেন। ইতিপূর্বে তিনি রীডার রূপে এই বিভাগের রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম করেছিলেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি একাধারে রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানরূপে কাজ চালাতে লাগলেন। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র-সমালোচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের অগণিত ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক-গবেষকের প্রেরণাস্থল ছিল। তাঁর অধ্যাপনা, প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যবোধ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে 'নীরস অধ্যাপনা'র প্রচলিত সংস্কারকে মুছে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের রবীন্দ্র-গবেষণার প্রেরণা মূলতঃ তিনিই এনে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক অসংখ্য মূল্যবান রচনা ছাড়াও তাঁর বাংলা কাব্য, প্রবন্ধ ও গদ্য ভাষা-বিবর্তনের সুসম্পাদিত মূল্যবান সঙ্কলনগুলি বিশেষভাবে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেছে। প্রধানতঃ তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় ইংরেজী সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর প্রভাব বিষয়ক বিশেষ পত্র পড়াবার ভার নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক বিশীর আমলেই ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৬৪ সালের ১৫ই জুলাই রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি এই বিভাগেই কিছুকাল আংশিক সময়ের জন্য এবং পরে স্থায়ী অধ্যাপক ও রীডার রূপে কাজ করেছিলেন। মাঝে কিছুকালের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান হয়ে চলে যান। সেখান থেকেই তিনি এই বিভাগে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রূপে ফিরে এলেন। ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী অবসর গ্রহণ করার পর ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১লা জুলাই বিভাগীয় প্রধানের কার্যভার গ্রহণ করেন। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডঃ ভট্টাচার্যের সজাগ কৌতূহল পণ্ডিত মহলের সুখ্যাতি পেয়েছে। বাংলা ভাষায় টেলিগ্রাফিক সংবাদ প্রেরণের উদ্ভাবক তিনিই। তাছাড়া বাংলা ভাষার ইতিহাস, ইডিয়ম, শব্দের নানা প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিক-ভাষা-বৈশিষ্ট্য ব্যাপারে তাঁর গবেষণা মূল্যবান। তিরিশের দশকে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনাবলী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র রচনাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশে তাঁর সুপরামর্শ বিশেষ কাজে লেগেছে। বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ডঃ ভট্টাচার্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকার প্রকাশ। তাঁর প্রবর্তনায় যে 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল তারই তৃতীয় সংখ্যাটি বিশেষ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যারূপে প্রকাশিত হতে চলেছে বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে।

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন ১৯৭১ সালের ৩১শে আগস্ট। ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদে ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। ১৯৬৭ সালের ৬ঠা অক্টোবর রীডার পদ থেকে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই পদে উন্নীত হন। ১৯৭১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিভাগীয় প্রধানের কার্যভার নিয়েছেন। লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ ডঃ ভেরিয়ের এলুইন-এর সহযোগী হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-রচনা মঙ্গলকাব্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রামাণিক কাজ হিসাবে পণ্ডিত মহলের প্রশংসা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাও তিনি পেয়েছিলেন। পরে নাট্য-সাহিত্য ও লোক

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী সঙ্গীত নাটক আকাদেমির রত্নসদস্য (Fellow) নির্বাচিত হন। এর পূর্বে তিনি লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৬১ সালে সোভিয়েত দেশে যান। বিশেষতঃ লোকসাহিত্য-বিষয়ক গবেষণাই তাঁর সোভিয়েত দেশভ্রমণের মূল কারণ। সোভিয়েত দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এখনো অটুট রয়েছে। ১৯৭১ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে আন্তর্জাতিক রামায়ণ আলোচনাচক্রে যোগদান ক'রে শ্রেষ্ঠ আলোচনাকারীর সম্মান লাভ করেন। সেখান হতে ফিরে আসার পর হাওড়া পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'রামায়ণ-বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭২ সালে লণ্ডনে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ডঃ ভট্টাচার্য পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের একটি দলকে নিয়ে যান এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে বিদেশে এই লোকপ্রদীপ্ত ভারতীয় লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। তিনি মার্কিন দেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান আছে, তার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হ'য়েছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরলোকগত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের যে সুনাম ছড়িয়েছিলেন ডঃ ভট্টাচার্যের ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠা বিদেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সুনামকে আরও অনেকখানি বিস্তৃত করেছে। মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্যকে উচ্চতর শিক্ষার বিষয়ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। তাঁরই চেষ্টায় পশ্চিম বাংলার ছৌ-নৃত্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যবিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ্য এবং অনুশীলনের বিষয় হয়।

১৯৬৯ সালে এই আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালের ৬ই মে থেকে হিন্দী বিভাগ পৃথক হয়ে গেছে। আলাদা হওয়ার আগে এই বিভাগে পূর্বে উল্লিখিত ব্যক্তি ছাড়া যাঁরা পড়িয়েছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক কল্যাণমল লোধা, ডঃ সত্যেন্দ্র, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ডঃ শ্রীপ্রবোধনারায়ণ সিংহ, দয়ানন্দ শ্রীবাস্তব ও ডঃ তারকনাথ অগ্রবাল। অপর যে ভাষাগুলি পড়াবার ব্যবস্থা এই বিভাগে আছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র উর্দু ই এখন সক্রিয়ভাবে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী নেই বলে সেই বিভাগগুলি নিষ্ক্রিয় রয়েছে।

১৯৪৫ সালের পর থেকে এই বিভাগে নানা বিষয়ে যাঁরা পড়িয়েছেন এবং পড়াচ্ছেন তাঁদের মধ্যে যশস্বী অধ্যাপক ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এখনও রয়েছেন যাঁদের অধ্যাপনায় এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত। প্রবন্ধের সূচনায় ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের বোর্ড অব হায়ার স্টাডিজ-এর অন্তর্ভুক্ত অধ্যাপকদের নাম আগেই করেছি। এছাড়া যাঁরা বাংলা বিভাগে পড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা উচিত ডঃ সুকুমার সেন-এর। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সেন, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অবসর গ্রহণের আগে থেকেই এই বিভাগে ভাষাতত্ত্ব পড়িয়ে এসেছেন। তুলনামূলক ভাষা-সাহিত্য বিভাগে থেকেও ডঃ সেন প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগের বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বই সম্পাদন করে ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণ পাঠকের বহু উপকার করেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিচিত্র কৌতূহলী মানুষটি তাঁর গুরু সুনীতিকুমারের যোগ্য শিষ্য। তাঁর অবসর গ্রহণের পরে শ্রীপ্রণবেশ সিংহ রায় কিছুকাল ভাষাতত্ত্ব পড়িয়েছেন। বর্তমানে ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ভাষাতত্ত্ব পড়াচ্ছেন। সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক যে বিশেষ পত্র আছে সে পত্রটি অতীতে পড়িয়েছেন ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীমহেশ্বর দাস, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী। এখন এই বিষয়টি পড়াচ্ছেন ডঃ অনিরুদ্ধকুমার চক্রবর্তী এবং ডঃ উমা রায়। ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্য বিষয়ক যে বিশেষ পত্র রয়েছে সেই পত্রটি ইংরেজী বিভাগের প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও

CENTRAL LIBRARY

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রথম থেকেই পড়িয়ে আসছেন। প্রাকৃত পড়িয়ে এসেছেন শ্রীমহেশ্বর দাস। মাঝে কিছুকাল ডঃ শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল পড়িয়েছিলেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক স্বর্গত গোকুলদাস দে-র কথা আগে বলেছি। তাঁর পরে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া পালি পড়িয়েছেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পর পালি ভাষা-সাহিত্য পড়াচ্ছেন পালি বিভাগের ডঃ আশা দাশ। অন্যান্য যাঁরা এই বিভাগে স্থায়ী লেকচারার হয়ে এসেছেন তাঁরা হলেন ডঃ আশুতোষ দাস, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, বর্তমান লেখক ও ডঃ সতী ঘোষ। আংশিক সময়ের জন্য যাঁরা অধ্যাপনা করছেন তাঁরা হলেন বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র (প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সী কলেজ), শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (রামমোহন কলেজ), ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল (চন্দননগর কলেজ), ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী (বেথুন কলেজ) এবং ডঃ উমা রায় (লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ)।

১৯৪৫ হতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলা বিভাগে যাঁরা অধ্যাপনা করেছিলেন এবং এখনো পর্যন্ত অধ্যাপনারত আছেন তাঁদের নামের এক বর্ণানুক্রমিক তালিকা নীচে দেওয়া হলো। প্রত্যেক নামের পাশে কে কত বছর কিভাবে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনো যুক্ত আছেন, তাও দেখানো হয়েছে। এই সঙ্গে চলতি বর্ষে কে কি বিষয় এবং কোন্ পত্র পড়াচ্ছেন, তাও উল্লেখ করা হলো—

আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাংলা) বিভাগের বর্ণানুক্রমিক অধ্যাপক নাম-সূচী (১৯৪৫—১৯৭৩)

অমিয় চক্রবর্তী, এম. এ., ডি. লিট., সংস্কৃত বিভাগের রীডার। তুলনামূলক সাহিত্য (সংস্কৃত ও বাংলা)—এই বিশেষ পত্রের অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত আছেন।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল., লেকচারার ১৯৬৯—

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল., লেকচারার ১৯৫৬-১৯৬৭, রীডার ১৯৬৭—

আশা দাশ, এম. এ., ডি. ফিল., পালি বিভাগের অনারারী পার্ট-টাইম লেকচারার। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (পালি) অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত আছেন।

আশুতোষ দাস, এম. এ., ডি. ফিল., ডি. লিট., লেকচারার ১৯৬৯—

আশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি., লেকচারার ১৯৫৫-১৯৬১, রীডার ১৯৬১-১৯৬৭, রবীন্দ্র অধ্যাপক ১৯৬৭—, বিভাগীয় প্রধান ১৯৭১—

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, এম. এ., ডি. ফিল., লেকচারার ১৯৬৯—

উমা রায়, এম. এ., ডি. ফিল., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৭২—

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ., রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ১৯৩৫-১৯৪৬

গোকুলদাস দে, এম. এ., পালি বিভাগের লেকচারার। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (পালি) অধ্যাপনাসূত্রে ১৯৩৫—১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., ডি. লিট., অনারারী পার্ট-টাইম লেকচারার। তুলনামূলক সাহিত্য (সংস্কৃত ও বাংলা)—এই বিশেষ পত্রের অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন।

জনার্দন চক্রবর্তী, এম. এ., অনারারী পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৩৫—১৯৬৩

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, এম. এ., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৬৭—

জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, এম. এ., পার্ট-টাইম লেকচারার। তুলনামূলক সাহিত্য (ইংরেজী ও বাংলা)—এই বিশেষ পত্রের অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি, লেকচারার ১৯৪৫—১৯৫৫ অস্থায়ী বিভাগীয় প্রধান ১৯৫৫

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), এম. এ, ডি. ফিল., পার্ট-টাইম অনারারী লেকচারার ১৯৫৬, লেকচারার ১৯৫৬-১৯৬৭, রীডার ১৯৬৭-১৯৭০

দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, এম. এ., পালি বিভাগের রীডার। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (পালি) অধ্যাপনাসূত্রে ১৯৫৬-১৯৭১ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ., ডি. ফিল., তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রীডার। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত আছেন।

দীপ্তি ত্রিপাঠী, এম. এ., ডি. ফিল., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৭২—

নির্মলেন্দু ভৌমিক, এম. এ., ডি. ফিল., লেকচারার ১৯৬৯—

প্রণবরঞ্জন ঘোষ, এম. এ., লেকচারার ১৯৬২-১৯৭১, রীডার ১৯৭১—

প্রণবেশ সিংহরায়, এম. এ., ডি. ফিল., তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রীডার। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ইংরেজী বিভাগের রীডার। তুলনামূলক সাহিত্য (ইংরেজী ও বাংলা)—এই বিশেষ পত্রের অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত আছেন।

প্রমথনাথ বিশী, এম. এ., লেকচারার ১৯৫০-১৯৫৬, স্পেশ্যাল রীডার ১৯৫৬-১৯৬৩, রবীন্দ্র অধ্যাপক ১৯৬৩—১৯৬৬, বিভাগীয় প্রধান ১৯৬৪—১৯৬৬

প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ., পি. আর. এস., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৪৫-১৯৫৫

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল., অনারারী পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৪৯-১৯৫৫, লেকচারার ১৯৫৫-১৯৬১, রীডার ১৯৬১-১৯৬৪, (১৯৬৪-১৯৬৫ সালের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন), রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ১৯৬৫—১৯৭১, বিভাগীয় প্রধান ১৯৬৬-১৯৭১

বিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ., লেকচারার ১৯৪৫-১৯৫৫

ভবানীগোপাল সান্যাল, এম. এ., ডি. ফিল., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৭১—

মণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ., লেকচারার ১৯৪৫-১৯৫০

মহেশ্বর দাস, এম. এ., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৫৫-১৯৫২, লেকচারার ১৯৫২-১৯৬৮, রীডার ১৯৬৮-১৯৭০

রথীন্দ্রনাথ রায়, এম. এ., ডি. ফিল., লেকচারার ১৯৬৩-১৯৬৮

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, এম. এ., লেকচারার ১৯৬২-১৯৭১, রীডার ১৯৭১—

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি., লেকচারার ১৯৪৫-১৯৫৫, স্পেশ্যাল রীডার ১৯৫৫—১৯৫৬, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ১৯৫৬-১৯৬৪

শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম. এ., ডি. ফিল., সংস্কৃত বিভাগের রীডার। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত) অধ্যাপনাসূত্রে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এইচ. ডি., রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ১৯৪৬-১৯৫৫

সতী ঘোষ, এম. এ., ডি. ফিল., লেকচারার ১৯৭১—

CENTRAL LIBRARY

সুকুমার সেন, এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি., তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—অধ্যাপনাসূত্রে ১৯৪৭-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি., পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৫০-১৯৫৫

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট., তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—অধ্যাপনাসূত্রে ১৯৪৫-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি., অনারারী পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৫১—১৯৫৮

হরপ্রসাদ মিত্র, এম. এ., ডি. ফিল., অনারারী পার্ট-টাইম লেকচারার ১৯৫৫—

বর্তমান বর্ষে (১৯৭২—৭৩) কে কি পড়াচ্ছেন

প্রথম পত্র (প্রথমার্ধ)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

দ্বিতীয় পত্র (প্রথমার্ধ)—আশা দাশ

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—বিজেন্দ্রনাথ বসু

তৃতীয় পত্র (প্রথমার্ধ)—সতী ঘোষ, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—আশুতোষ ভট্টাচার্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আশুতোষ দাস

চতুর্থ পত্র (প্রথমার্ধ)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানীগোপাল সান্যাল

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র, দীপ্তি ত্রিপাঠী

পঞ্চম পত্র (প্রথমার্ধ)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, সতী ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশুতোষ দাস

ষষ্ঠ পত্র (প্রথমার্ধ)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু ভৌমিক, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ভবানী গোপাল সান্যাল

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু ভৌমিক, সতী ঘোষ

সপ্তম পত্র—বিশেষ পত্র—

লোকসাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু ভৌমিক

মঙ্গলকাব্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশুতোষ দাস, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

নাটক—আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীগোপাল সান্যাল

উপন্যাস ও ছোট গল্প—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সংস্কৃত ও বাংলা (তুলনামূলক)—অমিয় চক্রবর্তী, উমা রায়

ইংরেজী ও বাংলা (তুলনামূলক)—প্রবোধকুমার ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণব সাহিত্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, উমা রায়

অষ্টমপত্র (প্রথমার্ধ)—ভবানীগোপাল সান্যাল

ঐ (দ্বিতীয়ার্ধ)—রচনা

১৯৬৯ সালে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়ে গেলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে (২০শে থেকে ২৩শে) মহাজাতি সদনে এই উৎসবের উদ্বোধন হয় প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলন এই অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। উর্দু বিভাগের অধ্যাপক জাফর উগানবি-র উদ্যোগে একদিন মুশায়েরা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে উর্দু কবিতা ও তার মূলানুগত অনুবাদও পাঠ করা হয়। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ও জাফর উগানবি-র উদ্যোগে এই উপলক্ষ্যে একটি সুমুদ্রিত পুস্তিকা (উর্দু কবিতা ও বাংলা অনুবাদের সঙ্কলন) প্রকাশিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় একদিন পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

ওই বছরেই ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর তারিখে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ ইনিস্টিটিউট অব কালচারে একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণ এবং ক্রমবিকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা'। এই আলোচনায় রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা দেশ), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকগণ যোগদান করেছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ওই অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে বাঙলা পুথি এবং প্রাচীন ও সাম্প্রতিককালে রচিত বাঙলা সাহিত্য ও সমালোচনামূলক বইয়ের একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধন করেছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠান এবং ইনিস্টিটিউট অব কালচারে অনুষ্ঠিত আলোচনা-চক্র ও আশুতোষ মিউজিয়ামে প্রদর্শনী—সমস্ত কিছুই বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই বছর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গস্বরূপ বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবার্ষিকী বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, প্রথম বক্তৃতা দেন নাট্যকার মন্মথ রায়।

ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা

আলোচ্য সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪৫ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষে পঁচাত্তর জন করে মোট দেড়শত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতো। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ পর্যন্ত ওই সংখ্যা বজায় ছিল। ১৯৫০ সালে প্রতি বর্ষে একশো জন করে মোট দুশো জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা শুরু করে। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ষে পঁচিশটি করে আসন বাড়ানো হয়। ১৯৫৫ সালে পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে দুটি সেক্শন হয়। প্রত্যেক সেক্শনে পঁচাত্তর জন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে থাকে। অর্থাৎ পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে দেড়শো জন ছাত্রছাত্রী হয়। ১৯৬১ সালে পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীকে তিনটি সেক্শনে ভাগ করা হয়। প্রতি সেক্শনে একশো জন করে পড়তে থাকে। অর্থাৎ

CENTRAL LIBRARY

মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় তিন-শো। পরে আরও কিছু সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টের হিসাবে দেখা যায় প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা তিনশো বত্রিশ। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা তিনশো। এবং বিভাগের অধীনে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় দেড়শো। ১৯৭০ সালের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় দুশো পঁচানব্বই। ১৯৭১ সালের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুশো সাঁইত্রিশ।

পাঠ্যসূচীর ক্রমবিবর্তন

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন খুব বেশি হয় নি। প্রথম পত্রে ছিল সাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয় পত্রে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য। তৃতীয় পত্রে ছিল গদ্যসাহিত্য (প্রবন্ধ ও গল্প উপন্যাস—৭০) এবং সমালোচনা (৩০)। চতুর্থ পত্রে ছিল নাটক (৭০) ও রচনা (৩০)। পঞ্চম পত্রে ছিল সাহিত্যের বিশেষ পর্ব (১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। ষষ্ঠ পত্রে ছিল সাহিত্যের বিশেষ পত্র (১৮০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল)। সপ্তম পত্রে ছিল সহযোগী ভাষা—সংস্কৃত (যাদের বি. এ-তে সংস্কৃত ছিল তাদের জন্য নয়) অথবা ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, উর্দু, মৈথেলীর মধ্যে যে-কোনো একটি ভাষা ও সাহিত্য। অষ্টম পত্রে ছিল পালি-প্রকৃত (২৫+২৫) এবং ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বাংলা ব্যাকরণ (৫০)। লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পত্রের প্রথমার্ধে ছিল কাব্য—প্রাচীন ও আধুনিক (৭০) এবং দ্বিতীয়ার্ধে পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়ের উপরে (unseen) তিরিশ নম্বর রাখা ছিল।

১৯৪৯ সালের পাঠ্যসূচীতে একটু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমার্ধে কাব্যবিষয়ে ৭০ নম্বরের বদলে রাখা হয়েছে ৫০ নম্বর। দ্বিতীয়ার্ধের বাকি কুড়ি নম্বর নিয়ে বহির্ভূত বিষয়ের ৩০ নম্বর যোগ করে মোট ৫০ নম্বরের একটি অর্ধ-পত্র করা হয়েছে। ওই কুড়ি নম্বরের জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ জুড়ে দেওয়া হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'। তৃতীয় পত্রেও একটু পরিবর্তন হলো। প্রথমার্ধে গদ্যসাহিত্যের জন্য রাখা হলো ৫০। দ্বিতীয়ার্ধে সমালোচনা সাহিত্যে ৩০ নম্বরের সঙ্গে ২০ নম্বর রইল আর একটি প্রবন্ধের বইয়ের জন্য—রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'। চতুর্থ পত্রেও নাটকের জন্য রইল—প্রথমার্ধে ৫০। দ্বিতীয়ার্ধে ৩০ নম্বরের রচনার সঙ্গে ২০ নম্বর দেওয়া রইল আর একটি নাটকের জন্য—রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'। বোঝা গেল পাঠ্যসূচীতে রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বিভাগীয় পাঠসমিতি স্মরণ করেছেন। মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তন হতে শুরু করেছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভাগীয় প্রধান হবার পর থেকে। পঞ্চম পত্রে সাহিত্যের বিশেষ পর্ব পাঠে (১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তীকাল) কোনো অর্ধপত্র ছিল না। ওটি একটি সম্পূর্ণ পত্র ছিল। এখন থেকে ওই পত্রটিকে দুটি অর্ধে ভাগ করা হলো। আগে ভাগবত, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ পত্র ছিল। এখন ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) ও মঙ্গলকাব্য মিলিয়ে একটি অর্ধ হলো। দ্বিতীয় অর্ধে রইল বৈষ্ণবসাহিত্য। নম্বরও ৫০+৫০ ভাগাভাগি হয়ে গেল। প্রথমার্ধে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নতুন পাঠ্যসূচীতে এলো। দ্বিতীয়ার্ধে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত সম্পূর্ণ দেওয়া হলো। পূর্বে শুধু আদি খণ্ড ছিল। ফলে পাঠ্যসূচীর ভার একটু বাড়লো বটে কিন্তু আগের চেয়ে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ও পরিচ্ছন্ন হলো। ভাগবত ও মঙ্গলকাব্য রইল এক অর্ধে। অন্য অর্ধে রইল বৈষ্ণবসাহিত্য। ষষ্ঠ পত্রে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালের পাঠক্রমও দুটি অর্ধে ভাগ করে আর একটু বিজ্ঞানসম্মত করা হলো। বইএর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আধুনিক যুগের বেশ কিছু সাহিত্যরচনার ধারাবাহিক জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রতি পাঠসমিতি নজর দিলেন। এই পত্রের পাঠ্যসূচীর প্রারম্ভে একটু নির্দেশিকা জুড়ে দেওয়া হলো : To be read in connection

CENTRAL LIBRARY

with the history and literary characteristics of the different literary types prescribed. A general critical and comparative estimate of the authors prescribed will be required, but no detailed knowledge of passages from the texts. কাজেই পাঠ্যসূচীর ভার যতটা পাঠ্য বইয়ের বিষয়-বিশ্লেষণে তার চেয়ে বেশি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তুলনামূলক ঐতিহাসিক জ্ঞান ও বিশেষ বই-এর ঐতিহাসিক মূল্যবিচারে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের রূপ ও শ্রেণীবিভাগ, সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও সেই প্রবাহে বিশেষ রচনার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণের দিকেই বাঙলাবিভাগের ছাত্রদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। এই পত্রটির মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল বলেই আজও পাঠ্যসূচীতে এটি অক্ষুণ্ণ আছে। এই পত্রে প্রথমার্ধে রইল রবীন্দ্রসাহিত্য ছাড়া উনিশ ও বিশ শতকের কাব্য ও উপন্যাস। দ্বিতীয়ার্ধে রইল রবীন্দ্র সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্পরচনা ও সমালোচনা এবং উপন্যাস। সপ্তম পত্র পূর্বের মতোই রইল। অর্থাৎ সংস্কৃত অথবা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির যে কোনো একটি। অষ্টম পত্রও আগের মতোই রইল। পালি-প্রাকৃত এবং তুলনামূলক বাঙলা ব্যাকরণ। ১৯৫০ সালের পাঠ্যসূচীতে অন্য সব পত্র ঠিকই আছে। কেবল অষ্টম পত্রের প্রথমার্ধে এসেছে তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয়ার্ধে এসেছে পালি-প্রাকৃত। অর্থাৎ দুটি অর্ধ পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে নিয়েছে। মূলতঃ, কোনো পরিবর্তন হয় নি। ১৯৫১ সালের পাঠ্যসূচীতে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। ১৯৫২ সালের পাঠ্যসূচীতে দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের তিনটি কাব্য দেওয়া হলো। অন্যদিকে তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে 'পঞ্চভূত' তুলে দিয়ে নলিনীকান্ত গুপ্তের 'শিল্পকথা' বইটি এলো। তার সঙ্গে আগের মতোই রইল সমালোচনাতত্ত্ব। অর্থাৎ ওই তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধটিকে সম্পূর্ণ সমালোচনাতত্ত্বের অর্ধপত্ররূপে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। ১৯৫১ সালেও এই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথের পূরবীই ছিল।

১৯৫৩ সালে প্রথমেই লক্ষণীয় হলো বাঙলাভাষায় লেখা পাঠ্যসূচী। এতকাল পর্যন্ত পাঠ্যসূচী ইংরেজীতেই লেখা হয়েছিল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহেই এই পরিবর্তন হলো। বিভিন্ন পত্রের বিষয়ও বদলে গেল। প্রথম পত্রের প্রথমার্ধে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতচন্দ্রের পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমার্ধে এলো পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য। দ্বিতীয়ার্ধে এলো বাঙলা ভাষার ইতিহাস। আগে এগুলি অষ্টম পত্রের পাঠ্যসূচী ছিল। তৃতীয় পত্রে প্রথমার্ধে এলো প্রাচীন বাঙলাকাব্য, দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যযুগের বাঙলাকাব্য। আগে এগুলি দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্থ পত্রে এলো আধুনিক কাব্য-কবিতা। প্রথমার্ধে রবীন্দ্রপূর্বযুগ। দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্য। আগে রবীন্দ্রকাব্য ছিল দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্যের কোনো স্থান আগে ছিল না। পঞ্চম পত্রের প্রথমার্ধে এলো আধুনিক গদ্য-প্রবন্ধ। দ্বিতীয়ার্ধে এলো নাটক। আগে তৃতীয় পত্রের প্রথমার্ধে ছিল গদ্য। তাতে প্রবন্ধ-উপন্যাস মিশ্রিত ছিল। আগে নাটক ছিল চতুর্থ পত্রের প্রথমার্ধে। ষষ্ঠ পত্র পূর্বের মতোই রইল। শুধু পূর্বে উদ্ধৃত নির্দেশিকাটি বাদ দেওয়া হলো। সপ্তম পত্রে কতকগুলি বিষয় দেওয়া হলো (বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, উপন্যাস ও ছোট গল্প, আধুনিক গীতিকবিতা, আধুনিক আখ্যানমূলক কাব্য ও মহাকাব্য, নাটক, লোকসাহিত্য এবং তুলনামূলক সাহিত্য)। এবং ১৯৫৩ সালের জন্য বৈষ্ণব সাহিত্যই পড়তে হবে বলা হলো। অর্থাৎ স্পেশ্যাল পেপার বা বিশেষ পত্রের প্রবর্তন হলো কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনের কোন সুযোগ রইল না। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথমার্ধে রইল চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য দ্বিতীয়ার্ধে রইল চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য। অষ্টম পত্রে

CENTRAL LIBRARY

এলো সমালোচনাতত্ত্ব। আগে এটি ছিল তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে এলো রচনা। নম্বর রইল ৫০। আগে এই রচনা থাকতো চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে।

১৯৫৩ সালে একটি কম্‌বাইন্‌ড কোর্স হয়েছিল। এই কোর্স প্রচলিত হওয়ার কারণ এই বছর থেকে সহযোগী ভাষাগুলি উঠে গেল। সেইজন্যই এই কোর্সে বাঙলা, হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া, অসমীয়া—এই কটি ভাষার দুটি করে পত্র দেওয়া হলো। প্রত্যেক পত্রে নম্বর রইল ১০০—মোট ২০০। তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে প্রথম দুটি পত্রে যে ভাষা নেওয়া হয়েছে তাছাড়া অন্য ভাষা গ্রহণ করতে হবে। তার নম্বরও রইল মোট ২০০। পঞ্চম পত্রে সংস্কৃত অথবা ফারসী। ষষ্ঠ পত্রে পালি-প্রাকৃত। সপ্তম পত্রে ভারতীয় আর্য ভাষার সাধারণ ইতিহাস। অষ্টম পত্রে প্রথম থেকে চতুর্থ পত্র পর্যন্ত যে ভাষা দুটি নেওয়া হয়েছে তাদের সাহিত্যের ইতিহাস।

১৯৫৬ সাল অবধি পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। কম্‌বাইন্‌ড কোর্স চলছিল। ১৯৫৭ সালে বিশেষ পত্রে কিছু পরিবর্তন হলো। বৈষ্ণব সাহিত্য ও ছোট গল্প-উপন্যাস—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বেছে নেওয়ার অধিকার হলো। ১৯৫৯ সালে আরও দুটি বিশেষ পত্রের প্রবর্তন হলো—মঙ্গলকাব্য এবং তুলনামূলক সাহিত্য (সংস্কৃত সাহিত্য অথবা ইংরেজী সাহিত্য—রোমান্টিক কবিতার যুগ)। ১৯৬০ সালে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কেবল হিন্দীর পাঠ্যসূচী হিন্দী ভাষায় লেখা হলো। অন্যান্য ভাষার পাঠ্যসূচী ইংরেজীতেই রইল। ১৯৬২ সালে আরও দুটি বিশেষ পত্র যুক্ত হলো—নাটক ও লোকসাহিত্য।

সাধারণভাবে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই পাঠ্যসূচীকে বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। তবু বিশেষ পত্র রূপে আধুনিক কাব্য-কবিতা পড়ানোর প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে গত পঞ্চাশ বছরের বাঙলা প্রবন্ধ সমালোচনা নাটক ও গল্প-উপন্যাসের প্রতিনিধিমূলক নিদর্শনগুলিকে পাঠ্যসূচীর মধ্যে এনে পাঠ্যসূচীকে যুগোপযোগী করা। এদিক থেকে ভাবলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা বর্তমান বর্ষে (১৯৭৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাংলা) এম. এ.-র যে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় নীচে দিলাম—

এম. এ. পরীক্ষা, ১৯৭৩

পাঠ্যপুস্তক তালিকা

বাঙ্গালা

প্রথম পত্র

সাহিত্যের ইতিহাস

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সাধারণ জ্ঞানও এই পত্রের জন্য প্রয়োজন হইবে।

১ম অর্ধ—৫০

আদি হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত

২য় অর্ধ—৫০

ভারতচন্দ্রের পর হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় পত্র

১ম অর্ধ—৫০

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা—পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত মধ্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের ব্যাকরণ সম্বন্ধেও ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

Pali

1. Subhāsitaṃ...Verse
2. Dhaniya Sutta (No. 33)...Verse
3. Anopamā (No. 36)...Verse
4. Nāgasena & Milinda (No. 41)...Prose
5. Makhādēva Jātaka (No. 42)...Prose

Prākrita and Apabhraṃśa

6. Mṛcchakaṭika (No. 55)...Prose
7. Abhijñānaśakuntalam (No. 56)...Prose
8. Abhijñānaśakuntalam (No. 57)...Prose
9. Kālidāsa—Vikramorvaśī (No. 66)...Prose
10. Saraha's Dohākoṣa (No. 68)...Verse
11. Anonymous Verses from Prākrita Paiṅgala (No. 83)...Verse

২য় অর্ধ—৫০

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

তৃতীয় পত্র

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্য

১ম অর্ধ—৫০

১। বৌদ্ধ গান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত (কাণুপা ও ভুসুকুর পদ মাত্র)

২। বড়ু চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত)—বংশী ও বিরহখণ্ড

২য় অর্ধ—৫০

১। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী (বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত)

২। বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল (আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)

৩। মৈমনসিংহ-গীতিকা (নির্বাচিত অংশ)। নিম্নোক্তগুলি পড়িতে হইবে:
মহুয়া, দেওয়ানা মদিনা, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, লীলা ও কঙ্ক

চতুর্থ পত্র

আধুনিক কাব্য-কবিতা

১ম অর্ধ—৫০

১। মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ কাব্য ২। নবীনচন্দ্র সেন—রৈবতক ৩। বিহারীলাল চক্রবর্তী—সারদা-মঙ্গল

২য় অর্ধ ৫০

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কল্পনা, শেষ সপ্তক

২। অক্ষয়কুমার বড়াল—কাব্য-চয়নিকা (নির্বাচিত অংশ)। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পড়িতে হইবে:
ভাবুকতা; কবিত্ব; কবি ও নায়িকা; নারী-বন্দনা; অভেদে প্রভেদ; মানব-বন্দনা; আবাহন; যদি

CENTRAL LIBRARY

('প্রদীপ')। এই পথ দিয়ে যাবে; এই পথ দিয়ে গেছে ('কনকাঞ্জলি')। অলক জ্যোছনাময়ী; নিথর যামিনী ('ভুল')। হৃদয়; আর্ত; শ্রী; প্রার্থনা; বঙ্গভূমি; রবীন্দ্রনাথ; হেমচন্দ্র; অপরাহ্নে ('শঙ্খ')। মৃত্যু; অশৌচ; সান্ত্বনা ('এষা')। পান্থ (সম্পূর্ণ)

৩। সনেটপঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা—প্রমথ চৌধুরী। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পড়িতে হইবে:
কৈফিয়ৎ, অন্বেষণ, স্মৃতি, ভুল, হাসি ও কান্না, গজল, গোলাপ, কাঁঠালী চাঁপা, রূপক, প্রতিমা, মুশকিল-আশান, অপরাহ্ণ, সনেটসুন্দরী, সনেট, একদিন, প্রেমের খেয়াল, বন্ধুর প্রতি, হাসি, ধরণী, চোরকবি, প্রিয়া, বার্ণার্ড শ, আত্মকথা, উপদেশ, ব্যর্থ জীবন।

৪। জীবনানন্দ দাশ—জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (ভারবি)

পঞ্চম পত্র

আধুনিক গদ্য ও নাটক

১ম অর্ধ—৫০

আধুনিক গদ্য

১। বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালান্তর। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইল:
(১) কালান্তর, (২) লোকহিত, (৩) শূদ্রধর্ম, (৪) মহাজাতি সদন, (৫) রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, (৬) সত্যের আহ্বান, (৭) দেশনায়ক, (৮) সভ্যতার সংকট।

৩। সমালোচনা-সাহিত্য—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত (এ. মুখার্জী কোং কর্তৃক প্রকাশিত)। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইল:
(১) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সমালোচনা সাহিত্য, (২) অজ্ঞাত—প্রাচীন কবিসংগীত, (৩) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী, (৪) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি, (৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, (৭) ভূদেব মুখোপাধ্যায়—মৃচ্ছকটিক, (৮) বিশ্বপতি চৌধুরী—গোরা, (৯) অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান।

৪। স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

২য় অর্ধ—৫০

নাটক

১। মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী ২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সিরাজদ্দৌলা ৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অচলায়তন
৪। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাজাহান

ষষ্ঠ পত্র

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ যুগ
(১৮০০ খ্রীঃ অঃ হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত)

১ম অর্ধ—৫০

১। ঈশ্বর গুপ্ত—কবিতাবলী ২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ৩। মধুসূদন দত্ত—বীরাঙ্গনা কাব্য
৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃত্রসংহার ৫। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ ৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

CENTRAL LIBRARY

—সীতার বনবাস, শকুন্তলা ৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ, কমলাকান্তের দপ্তর ৮। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত (সমগ্র) ৯। উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১০। প্যারীচাঁদ মিত্র—প্যারীচাঁদ রচনাবলী (আলালের ঘরের দুলাল, অভেদী)। —অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—কাব্য-সঞ্চয়ন

২য় অর্ধ—৫০

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(কবিতা)—মানসী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, পূরবী, আরোগ্য

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(গদ্য)—জীবনস্মৃতি, মানুষের ধর্ম, চোখের বালি, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ

সপ্তম পত্র

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও একটির বিশেষ অধ্যয়ন :

(১) বৈষ্ণব-সাহিত্য ; (২) মঙ্গল-কাব্য ; (৩) উপন্যাস ও ছোট গল্প ; (৪) আধুনিক গীতি-কবিতা ; (৫) আধুনিক আখ্যানমূলক কাব্য ও মহাকাব্য ; (৬) নাটক ; (৭) লোক-সাহিত্য ; (৮) তুলনামূলক সাহিত্য ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের জন্য (১) বৈষ্ণব-সাহিত্য, অথবা (২) মঙ্গল-কাব্য, অথবা (৩) উপন্যাস ও ছোট গল্প, অথবা (৪) নাটক, অথবা (৫) লোক-সাহিত্য, অথবা (৬) তুলনামূলক সাহিত্যের বিশেষ অধ্যয়ন এই পত্রের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য

১ম অর্ধ—৫০

বৈষ্ণব পদাবলী

১। চণ্ডীদাস—পদাবলী (বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত)

২। বিদ্যাপতি—পদাবলী (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত)

৩। গোবিন্দদাসের পদাবলী (বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)

২য় অর্ধ—৫০

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম

এই পত্রার্ধের জন্য সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সহিত সাধারণ পরিচয় এবং বৃন্দাবন দাস লিখিত চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন হইবে।

মঙ্গল-কাব্য

১ম অর্ধ—৫০

১। চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল ২। শিবায়ন

মুকুন্দরাম, দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব, ভারতচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও রামেশ্বরের কাব্য অবলম্বনে বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিতে হইবে।

CENTRAL LIBRARY

২য় অর্ধ – ৫০

১। মনসামঙ্গল ২। ধর্মমঙ্গল

বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরামের কাব্য অবলম্বনে বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিতে হইবে।

উপন্যাস ও ছোট গল্প

১ম অর্ধ : উপন্যাস—৫০

উপন্যাসের পূর্ব সূচনা ও আদিম রূপ—নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া ইহার চূড়ান্ত রূপ স্থিরীকরণ। উপন্যাসের বিভিন্ন অন্তঃপ্রেরণা—বস্তুতান্ত্রিক, রোমান্টিক, আবেগপ্রধান, মননপ্রধান। উপন্যাসের বিষয়গত শ্রেণীবিভাগ—সামাজিক, ঐতিহাসিক, তত্ত্বমূলক, সমস্যামূলক। উপন্যাসের আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও অস্থিরতা।

২য় অর্ধ : ছোট গল্প—৫০

ছোট গল্পের উদ্ভব ; উপন্যাসের সহিত সম্বন্ধ ; ইহার রূপবৈচিত্র্য ; বিভিন্ন লেখকের হাতে ইহার পুষ্টি ও প্রসার ; অতি-আধুনিকযুগে ইহার অভিনব প্রয়োগ ও শিল্পরূপ।

উপরে লিখিত পাঠ্যক্রম প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, রাজশেখর বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও তারাশঙ্করের ছোট গল্প অবলম্বন করিয়া আলোচিত হইবে। বর্তমান বৎসর ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে পঠিতব্য।

নাটক

বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব, বিকাশ ও বর্তমান প্রবণতা (একাঙ্ক নাটক সহ)। মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত নাট্যকারগণের নাটক অবলম্বনে বিষয়টি অধ্যেতব্য :

১ম অর্ধ—৫০

রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু

২য় অর্ধ—৫০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথ রায়

লোকসাহিত্য

১ম অর্ধ—৫০

(১) সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য (২) ছড়া (৩) লোক-গীতি (আঞ্চলিক, ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক, প্রেম-সঙ্গীত, ঘটনামূলক ও বিবিধ), বাউল ও সূফীগান

২য় অর্ধ—৫০

(১) গীতিকা (নাথ-গীতিকা, মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা) (২) লোক-কথা (রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা), পুরাকথা, ইতিকথা (৩) প্রবাদ (৪) ধাঁধা

CENTRAL LIBRARY

তুলনামূলক সাহিত্য

এই পত্রের পঠন-পাঠন বাঙ্গালায় হইবে, প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তরও বাঙ্গালায় হইবে। মুখ্যতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তুলনীয় বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিতে হইবে।

সংস্কৃত (কালিদাস)

১ম অর্ধ—৫০

১। রঘুবংশম্ (১৩শ ও ১৪শ সর্গ) ২। কুমারসম্ভবম্ (১ম, ৩য় ও ৫ম সর্গ)

২য় অর্ধ—৫০

১। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ২। মেঘদূতম্

ইংরেজী

রোমান্টিক কবিতার যুগ

The Romantic Revival in English Literature (1798-1832) its origin and causes—its characteristics.

১ম অর্ধ—৫০

Polgrave's Golden Treasury—Book IV

Poems of Wordsworth, Scott, Keats and Shelley

২য় অর্ধ—৫০

1. Christabel—Coleridge 2. Adonais—Shelley 3. The Eve of St. Agnes—Keats
4. Manfred—Byron

অষ্টম পত্র

১ম অর্ধ—৫০

সাহিত্য সমালোচনার মূলতত্ত্ব

১। ধ্বন্যালোক ২। Aristotle—Poetics ৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ

২য় অর্ধ—৫০

প্রবন্ধ-রচনা

আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাংলা) এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (১৯৭১)

'আধুনিক ভাষাবিভাগের প্রথম পঁচিশ বৎসর' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯২০ সালে গৃহীত প্রথম বাংলা এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলা এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধারা ও মানের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা দেখানোর জন্য বর্তমান ১৯৭১ সালের বাংলা এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (বিশেষ পত্র—সপ্তম পত্র ছাড়া) যথাযথ উদ্ধৃত হলো—

CENTRAL LIBRARY

1971
BENGALI
FIRST PAPER
Full Marks—100

The questions are of equal value. Answer *six* questions, *three* from *each half*. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

First Half

১। জয়দেব সম্পর্কে নিম্নে-উদ্ধৃত যে-কোনও **একটি** বিষয় অবলম্বন করিয়া আলোচনা কর :

(ক) জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা।

(খ) 'গীতগোবিন্দে' বাস্তবধর্মী মর্ত্যচেতনা এবং ভক্তিপ্লাবিত অধ্যাত্ম-চেতনার তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার।

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুইটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায় : (ক) পাঁচালীর বা মঙ্গলকাব্যের ধারা এবং (খ) পদাবলীর ধারা। এ-বিষয়ে উপযুক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আলোচনা কর।

৩। আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকসমূহ অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস **অথবা** মুকুন্দরামের আবির্ভাব-কাল নিরূপণের চেষ্টা কর।

৪। "যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তি, সেইখান হইতে বাঙ্‌লার বৈষ্ণব পদাবলীর আরম্ভ।"—বিচার কর।

৫। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও অপৌরাণিক আদর্শের যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, যে কোন মঙ্গলকাব্য অবলম্বন করিয়া সে-বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

৬। ভারতচন্দ্রের রচনায় এবং আদর্শে অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোছায়ার প্রগাঢ় প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।—আলোচনা কর।

৭। যে-কোনও **পাঁচটির** উপর টীকা লিখ : (ক) সদুক্তিকর্ণামৃত, (খ) মুনিদত্ত, (গ) 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', (ঘ) মীনচেতন, (ঙ) বাইশকবি মনসামঙ্গল, (চ) সঞ্জয়ের মহাভারত, (ছ) বৃন্দাবনের ষড়্‌ গোস্বামী, (জ) গোবিন্দ দাসের কড়চা, (ঝ) বৈষ্ণব সহজিয়া, (ঞ) মহারাষ্ট্র পুরাণ।

Second Half

৮। বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তন ধারায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে যে-কোনও **চারিটির** বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর : সীতার বনবাস, কমলাকান্ত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, চতুরঙ্গ, ছিন্নপত্রাবলী, ঘরে-বাইরে।

৯। "মাইকেল বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল।"—বাংলা মহাকাব্যের উদ্ভব ও বিলয়ের ইতিহাস আলোচনা করে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যের সত্যতা বিচার কর।

১০। বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং এই ধারায় তিনজন নাট্যকারের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিশদ পরিচয় দাও।

১১। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তার তুলনায় পরবর্তীকালের উপন্যাসের আদর্শগত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য কোথায়, দুইজন মুখ্য লেখকের রচনা অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

১২। "বঙ্গদর্শন বাংলাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশের মনকে এক

CENTRAL LIBRARY

কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।"—এই উক্তির সূত্র ধরে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের গুরুত্ব নিরূপণ কর।

১৩। প্রত্যেক গুচ্ছ থেকে একটি নিয়ে মোট **তিনটি** বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ: (ক) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কবিগান, যাত্রাপালা, বাউল; (খ) আলো ও ছায়া, একেই কি বলে সভ্যতা, অঙ্গুরীয়-বিনিময়, পঞ্চভূত; (গ) মীর মশারফ হোসেন, মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী।

SECOND PAPER

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Part I—Pali

The figures in the margin indicate full marks.

১। পালি ভাষা ও সাহিত্যকীর্তির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। ৮

অথবা—পালি ভাষার সহিত বাংলা ভাষার কি কি লক্ষণের সাদৃশ্য পাওয়া যায় তাহার উদাহরণ সহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

অথবা—'বুদ্ধ' শব্দের রূপ লিখ এবং কারকগুলিতে বিভিন্ন রূপ কেন স্থান পাইয়াছে তাহার কারণ ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত যে-কোনও **দুইটি**, পালি ভাষায়, কি কি নিয়মে গঠিত হয় উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও:— ৪+৪=৮

(ক) স্বরসন্ধি (Vowel Sandhi), (খ) ইচ্ছার্থক ধাতু (Desiderative Verb), (গ) নামধাতু (Denominative Verb), (ঘ) কর্মবাচ্য (Passive Voice), (ঙ) উপসর্গ (Prepositions)।

৩। (ক) নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতে যে কোনও **দুইটি** বাংলায় অনুবাদ কর:— ৩+৩=৬

(i) Uttiṭṭhe nappamajjeyya dhammam sucaritam care,
dhammacārī sukham seti asmim loke paramhi ca.

উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে, ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

(ii) Ārogyaparamā lābhā santuṭṭhī paramam dhanam,
vissāsaparamā ñāti nibbānam paramam sukham.

আরোগ্যপরমা লাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং, বিস্‌সাসপরমা ঞাতি নিব্বানং পরমং সুখং।

(iii) Pakkodano duddhakhīro 'ham asmi, anutīre Mahiyā samānavāso,
channā kuṭi, āhito gini, atha ce patthayasī pavassa deva.

পক্কোদনো দুদ্ধখীরো 'হম অস্মি, অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো
ছন্না কুটি, আহিতো গিনি, অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

(iv) Kissa pana, mahārāja, rukkhā na sabbe samakā : aññe ambilā, aññe lavaṇā,
aññe tittakā, aññe kaṭukā, aññe kasāvā, aññe madhurā ti.

CENTRAL LIBRARY

কিস্‌স পন, মহারাজ, রুক্‌খা ন সব্বে সমকা : অঞ্‌ঞে অম্বিলা, অঞ্‌ঞে লবণা, অঞ্‌ঞে তিত্তকা, অঞ্‌ঞে কটুকা, অঞ্‌ঞে কসাবা, অঞ্‌ঞে মধুরা তি।

(খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে যে-কোন **তিনটির** ব্যাকরণগত অথবা ভাষাতত্ত্বগত টীকা লিখ :— ৩

বিজ্জরে (vijjare) ; কয়িরা (kayirā) ; পটিগচ্চ (patigacca) ; কদরিয়ং (kadariyam) ; সগ্‌গায় (saggāya) ; ধঞ্‌ঞং (dhaññam) ; গিনি (gini) ; পেত্তেয্যাতা (petteyyatā) ।

Part II—Prakrit

The figures in the margin indicate full marks.

৪। (ক) যে কোন **দুইটির** উত্তর লেখ :— ৫

(অ) প্রাকৃতকে আঞ্চলিক ভাষা বলিবার যৌক্তিকতা নিজ ভাষায় বিশ্লেষণ কর।

(আ) প্রাচীন আর্যভাষার শব্দ ও ধাতুরূপকে অকারান্তরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা—মধ্যভারতীয় ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(ই) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাবকর্মবাচ্যের বিবর্তন মধ্যভারতীয় ভাষায় কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া নব্য ভারতীয় ভাষায় তাহার পরিণতি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

(খ) (i) যে কোন **পাঁচটির** সংস্কৃত রূপ লেখ :— ২½

কিজ্জই, দংশঅন্তো, হক্কাসো, পহিরিঅ, চাহসি, গেণ্‌হ, অন্নাবেদি, ঠাবিউ।

(ii) যে কোন **পাঁচটির** প্রাকৃত রূপ লেখ :— ২½

রথ্যা, পঠাতে, স্নেহঃ, আপয়তি, স্ফটিকো, স্পর্শঃ, বিকৃতঃ।

৫। (i) যে কোনও **তিনটির** অনুবাদ কর এবং নিম্নরেখ শব্দের যে কোনও **ছয়টির** ভাষাতাত্ত্বিক টীকা লেখ :— ৩×৩+৩=১২

(ক) ধীবলে মহত্তলে, শংপদং মে পিরবঅশ্‌শকে সংবুত্তেশি। কাদম্বলী সত্তিকে কৃথু পঢমং অস্মাণং শোহিদে ইশ্চীঅদি। তা শুত্তিকাগালং যেব গশ্চম্ব।

(খ) হউং পই পুচ্ছিমি অকৃথহি গঅবঙ্ক ললিঅপহারেং গাসিঅতরুবরু।
দূরবিনিজ্জিঅ সসহর কন্তী দিট্‌ঠা পিঅপই সম্মুখ জন্তী।

(গ) সোবি পঢ়িজ্জই সোবি শুনিজ্জই সখপুরাণেং বক্‌খাণিজ্জই।
ণাহি যো দিট্‌ঠী জো তাউ ণ লক্‌খই এক্কো বরগুরু পাঅ পেক্‌খই।

(ঘ) পুদইণী বওত্তরিঅং বাহরিও ণাণুবাহরেই পিঅং। মুহউল্লুচ্ছ মৃণালো তই দিট্ঠিং দেই চক্কাও।

(ঙ) অরে রে বাহহি কাহ্ন নাব ছোড়ী ভগমগ কৃগতি ণ দেহি।
তুই ণইখি ণইহি সম্মার দেই যো চাহসি সো লেহি।

(ii) ৫নং প্রশ্নের (ক) কিংবা (খ) তে যে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নামোল্লেখপূর্বক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। ৩

CENTRAL LIBRARY

Part III—History of Bengali Language

Full marks—50

The questions are of equal value. Answer *any three* questions.

৬। বাংলাভাষায় নিম্নোক্ত বিষয়ের মধ্যে যে কোনও **চারিটি** সম্বন্ধে উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে বিশদ টীকা লিখ :—

(ক) সম্মুখ স্বর (Front Vowels); (খ) তদ্ভব শব্দের বিভিন্ন প্রকার; (গ) উচ্চারণে ও লেখায় সমাক্ষর লোপ (Haplology ও Haplography); (ঘ) অনুসর্গ (Post-positions); (ঙ) ক্রমিক বা পূরণবাচক সংখ্যা শব্দের (Ordinal numerals) গঠন; (চ) রাঢ়ী উপভাষা (dialect); (ছ) যমজ শব্দ (doublets)

৭। বাংলা কৃদন্তকালের (Participial Tense) ক্রিয়াপদের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৮। বাংলাভাষায় কর্ম ও ভাববাচ্যের (Passive Voice) ব্যবহার সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনা কর।

৯। বাংলা মধ্যম পুরুষের (second person) সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া প্রাচীন ও মধ্য স্তরে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দাও।

১০। বাংলা ব্যঞ্জনগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া সংস্কৃত ব্যঞ্জনগুলি হইতে পার্থক্য যেখানে আছে দেখাইয়া দাও।

১১। বাংলাভাষার বিভিন্ন স্তরের বহুবচনের প্রয়োগরীতি আলোচনা কর।

১২। বাংলাভাষার ক্রমবিকাশে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি স্তরে স্তরে উদাহরণ সহ বিবৃত কর।

১৩। যে কোনও **দুইটি** প্রশ্নের উপযুক্ত উদাহরণসহ উত্তর দাও :

(ক) নিম্নোক্ত বাংলা ধ্বনিগুলির যে কোনও **চারিটির** সংস্কৃত-প্রাকৃত হইতে ক্রমোদ্ভবের বিবরণ দাও—ভ, দ, ঠ, জ্ঞ, থ, হ।

(খ) নিম্নোক্ত শব্দগুলির যে কোনও **চারিটির** মৌলিক অর্থ দেখাইয়া কোন্ বিশেষ ধারায় তাহারা বর্তমান অর্থ লাভ করিয়াছে বুঝাইয়া দাও—

কলম, খুদ, তন্ন তন্ন, দারুণ, নাছ (দুয়ার), শরৎ, খাপদ, সাঙ্গ।

(গ) নিম্নোক্ত শব্দগুলির যে কোনও চারিটির উদ্ভব ও ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ প্রণালীতে আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে উল্লেখ কর :

কাহন, কেওড়া, আনারস, এয়ো, ঝুনা, (ধান) ভানা, বাহাত্ত্ব, সড়ি।

THIRD PAPER

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

First Half

The figures in the margin indicate full marks

১। 'সন্ধ্যা ভাষা' কাহাকে বলে? তত্ত্বমূলক রচনায় এই ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? ইহা দ্বারা ১৬ চর্যাগানের কোন সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কিনা, দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

অথবা—যে-কোনও **দুইটি** বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর : ৮×২

(ক) চর্যার ভাষাকে নিঃসংশয়ে বাংলাভাষা বলিবার কারণ। (খ) চর্যাগীতিতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্র। (গ) 'মহাসুখ' তত্ত্বের স্বরূপ। (ঘ) সাধক কবি ভুসুকুপাদ।

CENTRAL LIBRARY

২। বহির্মুখী রাধা কিভাবে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণমুখী হইয়া উঠিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' অবলম্বনে তাহার পরিচয় দাও। ১৬

অথবা—যে-কোনও **দুইটি** বিষয় লইয়া সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ : ৮×২

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয় লক্ষণ। (খ) 'জন্মখণ্ডে' হাস্যরসের বিভাব হিসাবে নারদমুনির চিত্র।

(গ) বড়ু চণ্ডীদাসের উপর জয়দেবের প্রভাব। (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার ছন্দের বিভিন্ন রূপ।

৩। প্রসঙ্গনির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা কর এবং নির্বাচিত অংশে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত পদগুলির উপর প্রয়োজনীয় টীকা লেখ : ৯×২

(ক) ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী। দুয়ান্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল **সাঙ্কম** গটই। পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

অথবা—চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না। কান্তবিয়োএ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কই সে কাহ্নু নাহি। **করই** অনুদিন তৈলোএ পমাই॥

(খ) পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ। মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে **আগ** বড়াই জগজনে জাণী। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের **পণী**॥

অথবা—বড়ায়ি গো। কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল **মোঞ্** নারী বড় অভাগিনী॥

Second Half

Full marks 50

The questions are of equal value.

৪। (ক) শ্রীচৈতন্যের সুগভীর ভাবানুভূতির দ্বারা পদাবলী সাহিত্য কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের দুইজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কয়েকটি পদের সহিত চৈতন্যোত্তর দুইজন বিশিষ্ট কবির কয়েকটি পদের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দাও।

অথবা—(খ) অভিসার পর্যায়ের পদগুলিতে বাস্তবতার সহিত কল্পনার এবং কাব্যমাধুর্যের সহিত ভক্তিরসের যে অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রতিপাদন কর।

৫। (ক) তোমাদের পাঠ্য 'বাইশকবির মনসামঙ্গল' গ্রন্থের নামকরণের সংগতি বিচার কর এবং বিভিন্ন কবির কাব্যাংশ এক সূত্রে গ্রন্থন করিতে গিয়া কাহিনীর ধারা ব্যাহত হইয়াছে কিনা আলোচনা করিয়া দেখাও।

অথবা—(খ) মনসামঙ্গলের কবিরা শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে লেখনী ধরিয়াছিলেন কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাদের কাব্যে মহিমা ঘোষিত হইয়াছে একনিষ্ঠ প্রেমের এবং অবিচল সহিষ্ণুতার।—'বাইশ-কবি' অবলম্বন করিয়া আলোচনা কর।

৬। (ক) "'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে চন্দ্রাবতীর পালাটি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা জটিল।" এই উক্তির যাথার্থ বিচার কর।

অথবা—মৈমনসিংহ-গীতিকার জীবন ধর্মবন্ধন হইতে মুক্ত এবং স্বাধীন আবেগের দুর্দম শক্তির দ্বারা চালিত।—তোমার পাঠ্য গীতিকাগুলির সাহায্যে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য যুক্তি সহযোগে বিচার কর।

CENTRAL LIBRARY

FOURTH PAPER

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

First Half

The figures in the margin indicate full marks.

১। মেঘনাদ-বধ কাব্যে বিজয়ী 'নরেন্দ্র রাঘব' মনুষ্যমহিমা হইতে বিচ্যুত হন নাই, কিন্তু বিজিত 'রক্ষঃকুলনিধি' রাবণ এবং অস্তগামী 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি' মেঘনাদ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কাব্যে সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এই অভিমত কতখানি গ্রহণীয়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা কর। ১৮

অথবা—মেঘনাদ-বধে 'বধো-নাম' ষষ্ঠ সর্গে সংলাপের মধ্য দিয়া ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ, এই তিনটি চরিত্রের উপস্থাপনা করিয়া কবি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারোচিত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, কোন চরিত্রকে বড়ো বা ছোট করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, এই অভিমতের সমীচীনতা বিচার কর।

অথবা—

"কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?"

কাব্যের উপক্রমে কবি এই যে "কৌশলের" ইঙ্গিত দিয়াছেন, এই কৌশল "উদ্যোগো নাম" পঞ্চম সর্গে কীভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, পঞ্চম সর্গের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া সে-সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর কবি উন্নত সংস্কৃতিচেতনা এবং যুগভাবনার অজস্র উপাদান কবিকল্পনা-রচিত সমৃদ্ধ চিত্রশালায় পরিণত করিয়াছেন, 'গৃহিণীপণার অভাবে' এতখানি বৈভব স্থায়ী ভাবে কাব্যস্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই, ইহা বলিলে ঠিক হইবে কি ? এ-সম্বন্ধে আলোচনা কর। ১৬

অথবা—"খাঁটি ভারতীয় কল্পনায় ও খাঁটি বাংলাভাষায়" লেখা হইলেও স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যে দীর্ঘ একটানা পাশ্চাত্ত্য আধ্যাত্মিক রূপক কাব্যের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নহে ; এবং সেইজন্য ভাষায় ভঙ্গিতে মনোহারিতা সত্ত্বেও এই কাব্য সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, ইহা বলিলে ঠিক হইবে কি ?

৩। 'রৈবতক'-এর কবি উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা-বোধ, ইতিহাস-চেতনা ও পরিপূর্ণ মানবতা-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় কৃষ্ণচরিত্র আশ্রয় করিয়া মহাকাব্য-রচনার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিস্বভাবের অন্তর্নিহিত আবেগপ্রবণতা ও ভক্তিভাবুকতার বশে সে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার কর। ১৬

অথবা—'রৈবতক' কাব্যে নবীনচন্দ্র যে-সমস্ত নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলিতে পৌরাণিক ও আধুনিক নারীজীবনের কতদূর আদর্শগত সমন্বয় হইয়াছে ?

Second Half

Full marks—50

The questions are of equal value.

৪। 'কল্পনার কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ইহাদের নিছক চিত্ররসে ; চিত্রকে অতিক্রম করিয়া তত্ত্বে পৌঁছিবার প্রয়াস এখানে নাই ; কল্পনার প্রধান সৌন্দর্য প্রসাধনকলা, সাধনযোগ নহে।' দুইটি কবিতা অবলম্বনে এই অভিমত বিচার কর।

CENTRAL LIBRARY

অথবা—শ্যামলীতে আছে তিন শ্রেণীর কবিতা : স্মৃতিচারণ, প্রকৃতির লীলা ও গতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন, আর প্রেমের বিচিত্র রূপান্বেষণ। যে-কোন শ্রেণীভুক্ত দুইটি কবিতা অবলম্বনে শ্যামলী কাব্যের পরিচয় দাও।

অথবা—'কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসালোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না। বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে ; কেন না গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।'

৫। 'সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বহির্মুখী কবি। তিনি বিশ্বরূপের খেলাঘরে দুচোখ মেলে দেখতে চেয়েছেন।'

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া এই মত সমর্থন বা খণ্ডন কর।

অথবা—সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলির শিল্পরূপ বিচার কর।

৬। 'অক্ষয়কুমার বড়াল আদর্শায়িত প্রেমের কবি। তাঁর প্রেমকবিতায় লালসা নেই, আত্মবিসর্জন আছে ; উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, সংযম আছে ; সম্ভোগের তীব্রতা নেই, ধ্যানারতির শান্তি আছে।'

তোমার পঠিত কবিতা অবলম্বনে এই মতের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা—'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উগ্র ব্যক্তিত্ববাদী কবি। তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বস্তুসচেতন যুক্তিবাদী কবি।'

মন্দ্র কাব্য অবলম্বনে এই মতের যাথার্থ্য বিচার কর।

FIFTH PAPER

Full marks—100

The questions are of equal value.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

First Half

Answer *any three* questions.

১। কোন-এক সমালোচক 'বিষবৃক্ষে'র 'স্তিমিত প্রদীপে' পরিচ্ছেদটিকে "কলাকৌশল ও কবিত্বশক্তির দিক হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে অতুলনীয়"—বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করিয়া এ-সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি তাহা লিপিবদ্ধ কর।

অথবা—'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপসংহারে "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"—এই মন্তব্যের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় কি ? 'বিষবৃক্ষ' বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা উপন্যাসটীর নায়কচরিত্র বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিপন্ন কর।

২। 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য হইতে সমাজসত্য বিশ্লেষণের দ্বারা ভারতের নবজাগরণের যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা—বাংলাসাহিত্যে রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থরূপে 'কালান্তরের' বিশিষ্টতা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৩। 'প্রাচীন কবি-সঙ্গীত' প্রবন্ধের সমালোচক কবিগানের যে সাহিত্যমূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা একালের সাহিত্যসমালোচকের দৃষ্টিতে কতটা সমর্থনযোগ্য ?

অথবা—"আকুল অনুভূতি লইয়া কঠোর সত্যের সমস্ত ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়া—এই বিষয়ে ছিল তাঁহার যথার্থ

CENTRAL LIBRARY

প্রতিভা; অন্যান্য রচনায় তাঁহার এই প্রতিভার কোন কোন দিক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার যথার্থ পরিচয় পাই 'হাসির গান'-এ"—'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান'-প্রবন্ধের এই বক্তব্যটির বিশদ ব্যাখ্যা কর এবং সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়করূপে এ প্রবন্ধের সাহিত্যমূল্য নির্দ্ধারণ কর।

৪। 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।" ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস হইতে উদাহরণসহযোগে স্বামীজীর এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যদৃষ্টির পরিচয় দাও।

অথবা—স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'বর্তমান ভারত'—গ্রন্থে তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদী চেতনার কী পরিচয় মেলে?

Second Half

৫। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাকালে মধুসূদন তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'What a romantic tragedy it will make.' তাঁহার এই আশা কতখানি পূর্ণ হইয়াছে, তাহা আলোচনা কর।

অথবা—'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র করুণ এবং বিয়োগান্ত পরিবেশে হাস্যরসের প্রয়োগ কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচার কর।

৬। 'গিরিশচন্দ্রের' 'জনা' নাটক উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর 'ভক্তিরত্নাকর'। এই উক্তির তাৎপর্য ও সার্থকতা বিচার কর।

অথবা—'সাজাহান' নাটকের সঙ্গীতগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। 'অচলায়তন' নাটকের পঞ্চক চরিত্রটির মধ্য দিয়া কি ভাব কতদূর সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা কর।

অথবা—'অচলায়তন' নাটক উদ্দেশ্যমূলক রচনা কিনা তাহা বিচার কর। ইহার রচনার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও ব্যক্ত কর।

SIXTH PAPER

Full marks—100

The questions are of equal value. Answer *six* questions, *three* from *each half*. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

First Half

১। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী হইতে দৃষ্টান্ত চয়ন করিয়া বাংলা সাহিত্যে সামাজিক জীবনের কবি হিসাবে তাঁহার স্থান নির্ণয় কর।

২। "কমলাকান্তের দপ্তরে" পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় কর।

৩। "বিবিধ প্রবন্ধ" এবং "কমলাকান্তের দপ্তর" দুই ভিন্ন রীতি ও মানসের ফসল হইলেও একই বঙ্কিমের রচনা বলিয়া গ্রন্থ দুইটির মধ্যে রচনারীতি ও বিষয়গত সাদৃশ্যও বড়ো কম নাই।—এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

CENTRAL LIBRARY

৪। বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক রচনা-ধারায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী এবং বিদ্যাসাগর চরিতের তুলনাত্মক আলোচনা কর।

৫। "সীতার বনবাস" এবং "শকুন্তলা"য় বিদ্যাসাগর অনেকক্ষেত্রেই মূলকে ছাড়াইয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এ-বিষয়ে তোমার নিজস্ব মতামত দাও।

৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তার মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয়ের বোধ ছিল। তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে"র বিষয় ও রীতি উল্লেখ করিয়া উক্ত সমন্বয়ের স্বরূপ বিচার কর।

৭। "বীরাঙ্গনা" এবং "বৃত্রসংহার" দুইখানি কাব্যই পৌরাণিক চরিত্র ও বিষয়কে অবলম্বন করিয়া রচিত। পৌরাণিকতার প্রসঙ্গে মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক পরিচয় দাও।

৮। "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি "সারদামঙ্গল" রচনা করি।" এই তিন বিরহ "সারদামঙ্গলে" কিভাবে "একাকার হইয়া গিয়াছে", সে বিষয়ে আলোচনা কর।

৯। রোমান্টিকতার সহিত "বিষাদময়তার" সম্পর্ক আলোচনা কর। উনবিংশ শতকের বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতার মধ্যে এই "বিষাদময়তা"র ছায়া কিভাবে আপতিত হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহা প্রদর্শন কর।

১০। "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস"—সমালোচকের এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

১১। জীবনানন্দ দাসের কবিপ্রকৃতি উত্তররবীন্দ্রযুগে যে অভিনব কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। তাঁহাকে নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার কবি বলা যায় কি?

Second Half

১২। "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে যদি কোন প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে তবে তাহা কবির (রবীন্দ্রনাথের) সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস।—ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

১৩। "ছিন্নপত্রাবলী" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিয়াছে—"জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে পরিচয় পরিচয় ঘটিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে।—বিষয়টি লইয়া উভয়গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা কর।

১৪। "যোগাযোগ" উপন্যাসের গোড়ার নাম ছিল "তিনপুরুষ"। পরে সে নাম বাতিল করিয়া দিয়া কবি নামকরণ করিলেন "যোগাযোগ।" "যোগাযোগ" নামের তাৎপর্য কি? তিনপুরুষ নামের প্রত্যাশা কি উপন্যাস-খানিতে সফল হইয়াছে? বিচার কর।

১৫। নদীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বড় টান। "নৌকাডুবি"তে ও "চতুরঙ্গে" নদীর যে সব বর্ণনা আছে সেগুলি গুছাইয়া নিজের ভাষায় লেখ।

১৬। "মানসী" ও "চিত্রা" কাব্য দু'খানিতে যে-সব সৌন্দর্যবোধের কবিতা আছে সেগুলি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

১৭। "খেয়া" কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধ যে বিশেষ আকারে দেখা দিয়াছে তাহা সোদাহরণ বিবৃত কর।

১৮। "আকাশপ্রদীপ" অথবা "আরোগ্য" কাব্য অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্য-কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবন ও বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব আলোচনা কর।

CENTRAL LIBRARY

EIGHTH PAPER

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable

First Half—Full marks—50

The questions are of equal value

১। 'যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ব্যক্তিগত তাহাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু; এবং যাহা ঘটা বাঞ্ছনীয় এবং যাহা সার্বজনীন ও সার্বভৌম তাহাই সাহিত্যের উপজীব্য'—ইহার যাথার্থ্য বিচার করিয়া সাহিত্যিক সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কর।

অথবা—আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন—নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতির আখ্যানবস্তু (Plot) প্রধান, চরিত্র গৌণ।—এই উক্তির সমর্থনে আরিষ্টটল্ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তোমার অভিমত প্রদর্শন কর।

অথবা—সাধারণ অনুকরণ ও সাহিত্যগত অনুকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া এ-বিষয়ে আরিষ্টটল্ ও প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের মতামত বিচার কর।

২। ভরত বলিয়াছেন 'বিভাবানুভাব ব্যভিচারিসংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়,—নিষ্পত্তি-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া রস যে উৎপন্ন হয় না, অনুমিত হয় না, অভিব্যক্ত হয়—তাহা যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

অথবা—কোনও কোনও আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' অর্থাৎ অলঙ্কারের জন্যই কাব্য গ্রহণীয় হয়—এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করিয়া কাব্যসৃষ্টিতে অলঙ্কারের উপযোগিতা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

অথবা—আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন—'সেই প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা, এইভাবে পুরাকালে ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব বিয়োগজনিত শোক শ্লোকত্ব বা কাব্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল'—বাল্মীকির ব্যক্তিগত শোক কি করিয়া সার্বজনীন শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা ব্যাখ্যা কর।

অথবা—'মহাকবিদের বাণীতে আর একটী বস্তু আছে, তাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের ন্যায় চিরপরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথকভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে।'—আনন্দবর্দ্ধনের এই উক্তি যে প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে তাহা বিবৃত কর।

৩। কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বিকৃত—এই অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবের অর্থ বিশ্লেষণ কর।

অথবা—'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কি তাহ'লে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখাই আধুনিকতা।' রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার যে অর্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সাহিত্যগত স্বরূপ নির্ণয় কর।

অথবা—'আমরা যে ব্যাপারটিকে বলি জীবলীলা—পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।' রবীন্দ্রনাথের মতে জীবনসংগ্রাম ও জীবনলীলার মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া সাহিত্যে লীলাবাদ বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা নিজ ভাষায় ব্যক্ত কর।

Second Half

৪। **যে-কোনও একটি** প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা কর : ৫০

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব। (খ) বাংলা লোকসাহিত্যের কাব্যগুণ। (গ) বাংলা সাহিত্যে রূপক ও সাংকেতিক নাটক। (ঘ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী-জীবনের প্রতিফলন। (ঙ) বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা।

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাঙলা) বিভাগে নতুন অধ্যাপক-পদ

১৯১৯ সালের ১লা জুলাই থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাঙলা) বিভাগের সূত্রপাত। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বাঙলা বিভাগে একটিমাত্র অধ্যাপক-পদ ছিল। এর পরবর্তীকালে বাঙলা বিভাগে আরও দুটি নতুন অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয়। এ দুটি নতুন অধ্যাপক-পদের নাম হলো—(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক (Rabindranath Tagore Professorship of Bengali) ও (২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাপক (University Grants Commission Professorship of Bengali)। এই দুটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো—

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী শততম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনের পরিকল্পনার অঙ্গহিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাঙলা) বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির একটি প্রস্তাব ১৯৬২ সালের ৭ই এপ্রিল ও ৬ঠা আগস্ট তারিখে যথাক্রমে গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তা অনুমোদন করেন। এই অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তিন লাখ টাকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেকে এক লাখ করে টাকা দিতে সম্মত হন। এই অধ্যাপক পদে যিনি নিযুক্ত হবেন তাঁকে একটি সর্ত মেনে চলার কথা বলা হয়। সেই সর্ত হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বাঙলা বিভাগে অধ্যাপনা ছাড়াও জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে।

১৯৬৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী এই নতুন-সৃষ্ট অধ্যাপক-পদে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রথম যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন অধ্যাপক বিশী এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর অবসরগ্রহণের পর ১৯৬৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। এখনো পর্যন্ত ডঃ ভট্টাচার্য এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক-পদের সর্ত-অনুসারে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তু-বিচার' ও 'রবীন্দ্রনাট্যের কয়েকটি দিক' বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও অনুরূপভাবে ১৯৭১, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে যথাক্রমে 'রবীন্দ্রকাব্যে লোক-সাহিত্যের প্রভাব', 'রবীন্দ্রনাটকে লোক-সাহিত্যের উপকরণ', ও 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাপক

১৯৬৭ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাঙলা) বিভাগে একটি নতুন অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি (University Grants Commission Professorship of Bengali) অনুমোদন করেন এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তিকাল অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই পদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সম্মত হন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এই পদটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। এই নতুন-সৃষ্ট অধ্যাপক-পদে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বর্ষে (১৯৭৩ সাল) যোগদান করেছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৬ সাল থেকে লেকচারার-রূপে ও ১৯৬৭ সাল থেকে রীডার-রূপে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বাঙলা) বিভাগে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা (গুণানুসারে) ১৯৪৫-১৯৭০

১৯৪৫	উমারাণী রায়	নন-কলেজিয়েট
	অবন্তীকুমার সান্যাল	স্কটিশচার্চ কলেজ
	সত্যনারায়ণ বসু	নন-কলেজিয়েট
	শিবমোহন বসু	ঐ
	সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	শান্তিগোপাল সিংহ রায়	নন-কলেজিয়েট
১৯৪৬	সুদেব চৌধুরী	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	দীপ্তি সান্যাল	স্কটিশচার্চ কলেজ
	বৈদ্যনাথ শীল	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	বীণা দেবী	নন-কলেজিয়েট
১৯৪৭-১৯৪৮	কেহ প্রথম শ্রেণী পাননি	
১৯৪৯	সুনন্দা সেন	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
১৯৫০	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৯৫১	সঙ্ঘমিত্রা রায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
	শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
১৯৫২	প্রণবরঞ্জন ঘোষ	নন-কলেজিয়েট
১৯৫৩	ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তশর্মা	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
১৯৫৪-১৯৫৬	কেহ প্রথম শ্রেণী পাননি	
১৯৫৭	শিশিরকুমার দাস	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	অরুণকুমার বসু	ঐ
১৯৫৮	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	নন-কলেজিয়েট
	সাবিত্রী ভট্টাচার্য	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
১৯৫৯	পশুপতি শাসমল	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
১৯৬০	কেহ প্রথম শ্রেণী পাননি	
১৯৬১	পবিত্র সরকার	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
১৯৬২	নির্মলকুমার দাস	ঐ
	শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত	ঐ
	জ্যোতির্ময় ঘোষ	ঐ
	ভারতী দত্ত	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
১৯৬৩	চিরশ্রী বিশী	ঐ
	জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

CENTRAL LIBRARY

১৯৬৪	বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	গীতা চট্টোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
	দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য	ঐ
	দীপালী দাশ	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
	দর্শন চৌধুরী	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
১৯৬৫	পিনাকেশ সরকার	ঐ
	সুলেখা রায়চৌধুরী	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
১৯৬৬	নীরদবিহারী রায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
	মানস মজুমদার	ঐ
	রামরাম চট্টোপাধ্যায়	ঐ
	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
	সোমা ঘটক	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
১৯৬৭	ছন্দা ঘোষ	ঐ
	রমা ভট্টাচার্য	ঐ
	বিমল চট্টোপাধ্যায়	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	সুচেতা ভট্টাচার্য	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী
১৯৬৮	পার্বতী রায়	ঐ
	দীপালী দাশ	ঐ
১৯৬৯	কেহ প্রথম শ্রেণী পাননি	
১৯৭০	মিহির দেববর্মণ	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
	বাণীমঞ্জরী দাশ	বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক (১৯৪৫-১৯৭৩)

১৯৪৫—১৯৭৩ সাল পর্যন্ত যাঁরা রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহায়করূপে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের কালানুক্রমিক নামের তালিকা দেওয়া হলো এবং সেইসঙ্গে তাঁদের গবেষণাকার্যে যোগদানের ও গবেষণাকার্য পরিত্যাগের সাল তারিখ দেওয়া হলো—

হরপ্রসাদ মিত্র	১লা জুন, ১৯৪৪—৩১শে জুলাই, ১৯৪৬
মদনমোহন কুমার	১লা জুন, ১৯৪৪—৩১শে জুলাই, ১৯৪৬
মৃণাল সর্বাধিকারী	১লা জুন, ১৯৪৪—৩১শে জুলাই, ১৯৪৬
প্রফুল্লচন্দ্র পাল	১লা অক্টোবর, ১৯৪৬—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯
উমা রায়	১লা, অক্টোবর, ১৯৪৬—১লা মার্চ, ১৯৫০

CENTRAL LIBRARY

দেবীপদ ভট্টাচার্য	১লা জুলাই, ১৯৪৭—১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৮
বৈদ্যনাথ শীল	১লা জুলাই, ১৯৪৮—১লা মার্চ, ১৯৫১
সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০—১লা জানুয়ারি, ১৯৫৩
শচীনন্দন সিংহ	২রা জুন, ১৯৫০—১লা জুন, ১৯৫৩
তারাপদ মুখোপাধ্যায়	১লা জুলাই, ১৯৫১—১লা জুন, ১৯৫৪
সঙ্ঘমিত্রা রায়	২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	১লা জুলাই, ১৯৫৩—১লা নভেম্বর, ১৯৫৪
ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তশর্মা	১লা জুলাই, ১৯৫৪—১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫
সুনন্দা দাশগুপ্ত	১৭ই মে, ১৯৫৫—১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৬
বিজিতকুমার দত্ত	১লা জুলাই, ১৯৫৫—১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৬
সুনন্দা সেন	১লা নভেম্বর, ১৯৫৬—১লা জুলাই, ১৯৫৮
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১লা এপ্রিল, ১৯৫৬—১লা আগস্ট, ১৯৫৭
মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ	১লা জুন, ১৯৫৭—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
পীযূষকান্তি মহাপাত্র	১লা জুন, ১৯৫৭—১লা জুন, ১৯৬০
নির্মলেন্দু ভৌমিক	৩রা আগস্ট, ১৯৫৭—২৩শে আগস্ট, ১৯৬০
সাধনা সেনগুপ্ত	৪ঠা মে, ১৯৫৯—১লা এপ্রিল, ১৯৬২
পুষ্প দত্ত	১লা জুলাই, ১৯৬০—১লা জুলাই ১৯৬৩
নরেশচন্দ্র জানা	১৫ই নভেম্বর, ১৯৬০—১৬ই জুলাই, ১৯৬৩
নীরদপ্রসাদ নাথ	৩রা জানুয়ারি, ১৯৬১—১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩
দুলাল চৌধুরী	১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪—৪ঠা আগস্ট, ১৯৬৬
ওসমান গণি	৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭
চিরশ্রী বিশী	১লা অক্টোবর, ১৯৬৪—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭
যমুনা গুপ্ত	১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৯—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
শিপ্রা গোস্বামী	২২শে জুন, ১৯৬৯—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
মীনাক্ষী বসু	২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৯—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
সরমা সেন	৫ই আগস্ট, ১৯৭১—
শ্যামল মাইতি	৪ঠা আগস্ট, ১৯৭১—
সুরমা সাহা রায়	৪ঠা আগস্ট, ১৯৭১—১লা জানুয়ারি, ১৯৭১
মানু জানা	১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩—

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, পদক ও পুরস্কার

(নীচে বিভিন্ন বক্তৃতামালায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের নাম ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তৃতার বিষয়ও উল্লেখ করা হলো। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ১৯৫৬ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার প্রকাশিত না হওয়ায়

CENTRAL LIBRARY

এই তালিকা অসম্পূর্ণ রইল। পরবর্তীকালের সংবাদগুলি ইতস্ততঃ প্রাপ্ত রেকর্ড থেকে যথাসম্ভব সংগৃহীত হলো। এই অসম্পূর্ণতার জন্য লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।)

সুধাংশুবালা পুরস্কার

শ্রীযুক্ত ডি. পি. চৌধুরী ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন ২০০০০ টাকা দান করেন। এই টাকা থেকে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য নাট্যকারকে ২০০০ টাকা দেওয়া হয়। পরপর দশ বছর এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৯৬৫	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ধনঞ্জয় বৈরাগী } যুগ্ম প্রাপক	১৯৬৭	বিধায়ক ভট্টাচার্য
১৯৬৬	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৯৬৮	সলিল সেন
		১৯৬৯	বিজন ভট্টাচার্য

লীলা বক্তৃতা

১৯৪৫ (সূচনা):	অনুরূপা দেবী	সমাজ ও সাহিত্যে নারীর স্থান
১৯৪৭	কালিদাস রায়	পদাবলী সাহিত্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ ও রসবিচার
১৯৪৯	ক্ষিতিমোহন সেন	বাংলার বাউল
১৯৫১	অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ওড়িয়া ও বাংলার চিত্র ও সাহিত্যের সাদৃশ্য বিচার (বক্তৃতা দেওয়া হয় নি)
১৯৫৩	রমা চৌধুরী	দশ বেদান্ত সম্প্রদায় ও বাংলা দেশ
১৯৫৫	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	.....
১৯৬৭	অন্নদাশঙ্কর রায়	আমাদের নব জাগরণ
১৯৭১	শান্তিকুমার দাশগুপ্ত	নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

লীলা পুরস্কার

১৯৪৬	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	১৯৫২	অন্নপূর্ণা গোস্বামী
১৯৪৮	সীতাদেবী	১৯৫৪	আশাপূর্ণা দেবী
১৯৫০	আশালতা সিংহ	১৯৫৬	চিত্রিতা গুপ্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা

১৯৪৮	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৩	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
১৯৪৯	মোহিতলাল মজুমদার	১৯৫৪	শ্যামাপদ চক্রবর্তী
১৯৫০	সুশীলকুমার দে	১৯৫৫	কাজী আবদুল ওদুদ
১৯৫১	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৯৬৯	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৫২	অন্নদাশঙ্কর রায়		

শরৎস্মৃতি পুরস্কার ও পদক

১৯৪৮	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৪	প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৯৫১	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়		

CENTRAL LIBRARY

তারাপ্রসাদ থৈতান বক্তৃতা

(শুধু বাঙলা সাহিত্য-সম্পর্কিত বক্তা ও বিষয়ের নাম করা হলো)

১৯৫১	সুকুমার সেন	The myth and cult of Manasa in Literary Tradition.
১৯৫৩	বিমানবিহারী মজুমদার	বিদ্যাপতি
১৯৬৯	প্রণবরঞ্জন ঘোষ	শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য

হিরণকুমার বসু স্মৃতি বক্তৃতা

(শুধু বাঙলা সাহিত্য-সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তার নাম উল্লেখ করা হলো)

১৯৫০	প্রমথনাথ বিশী	১৯৫৬	অশোকবিজয় রাহা
১৯৫৪	জগদীশ ভট্টাচার্য	১৯৬৯	দেবীপদ ভট্টাচার্য

জগত্তারিণী পদক

(১৯২১ থেকে সূচনা)

১৯৪৫	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৫১	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৪৭	যোগেশচন্দ্র রায়	১৯৫৩	কালিদাস রায়
১৯৪৯	রাজশেখর বসু	১৯৫৫	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক

১৯৪৭	শান্তা দেবী	১৯৫৫	সুষমা মিত্র
১৯৫০	রাধারাণী দেবী		

সরোজিনী বসু পদক

(১৯৪০ থেকে সূচনা)

১৯৪৫	রাজশেখর বসু	১৯৫১	নীহাররঞ্জন রায়
১৯৪৬	মোহিতলাল মজুমদার	১৯৫২	সুকুমার সেন
১৯৪৭	সুশীলকুমার দে	১৯৫৩	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯৪৮	মন্মথ বসু	১৯৫৪	ক্ষিতিমোহন সেন
১৯৪৯	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৫	রাধাগোবিন্দ নাথ
১৯৫০	আশুতোষ ভট্টাচার্য		

কমলা বক্তৃতা

১৯৬৯	জনার্দন চক্রবর্তী	Sri Radha in Vaisnava Philosophy & Life—Development of Radha Tattva in Vaisnavism

CENTRAL LIBRARY

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বক্তৃতা (রীডারশিপ)

১৯৬৬	বনফুল	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১৯৬৭	সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল
১৯৬৮	অজিতকুমার ঘোষ	দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক
১৯৬৯	আশুতোষ ভট্টাচার্য	দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন
১৯৭০	মন্মথ রায়	যাত্রা—বাংলার লোকনাট্য

খুজাস্তা আখতারবানু সারওয়ার্দি সুবর্ণপদক

[হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়মূলক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনার ওপর এই পদক দান করা হয়। যে কমিটি প্রতিযোগিতার প্রবন্ধ নির্বাচন করবেন তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকা চাই। পরীক্ষকও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হওয়া চাই।]

১৯৪৭	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি।

বিদ্যাসাগর বক্তৃতা

১৯৫৬	বিনয় ঘোষ	১৯৬৫	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৭	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৬	রমেশচন্দ্র মজুমদার
১৯৫৮	যোগেশচন্দ্র বাগল	১৯৬৭	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৯	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৯৬৮	ফুলরেণু গুহ
১৯৬০	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৯৬৯	অমিয় চক্রবর্তী
১৯৬১	দিলীপকুমার বিশ্বাস	১৯৭০	গোপাল হালদার
১৯৬২	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৭১	ইন্দ্র মিত্র
১৯৬৩	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৯৭২	গোলাম খুরশিদ (বাংলাদেশ)
১৯৬৪	প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়		

সিস্টার নিবেদিতা বক্তৃতা

১৯৭০	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	ভারতীয় শিল্পকলার জাগরণে নিবেদিতার দান

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বক্তৃতা

১৯৬১	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ
১৯৬৩	জনার্দন চক্রবর্তী	
১৯৬৫	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	সাহিত্য-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
১৯৬৭	সাধনকুমার ভট্টাচার্য	
১৯৬৯	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	

CENTRAL LIBRARY

বিশেষ বক্তৃতা

১৯৭২	সুশীলকুমার দে	রামমোহন রায়

বিবেকানন্দ শতবার্ষিক বক্তৃতা

১৯৭১	অমিয়কুমার মজুমদার	বেদান্ত দর্শন

অরবিন্দ শতবার্ষিক বক্তৃতা

১৯৭২	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅরবিন্দ ও সাবিত্রী

রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি বক্তৃতামালা

১৯৭৩	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক বক্তৃতামালা

১৯৬৪	প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার
১৯৬৫	ঐ	রবীন্দ্রনাট্যের কয়েকটি দিক
১৯৭১	আশুতোষ ভট্টাচার্য	রবীন্দ্রকাব্যে লোক-সাহিত্যের প্রভাব
১৯৭২	ঐ	রবীন্দ্রনাটকে লোক-সাহিত্যের উপকরণ
১৯৭৩	ঐ	রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা

১৯৪৫	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	বাংলা নাটক
১৯৪৯	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার নাটক
১৯৫১	কেশবচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির প্রভাব
১৯৫৩	সরলাবালা সরকার	
১৯৫৫	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৯৫৭	অহীন্দ্র চৌধুরী	
১৯৫৯	প্রমথনাথ বিশী	
১৯৬১	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	
১৯৬৩	মন্মথ রায়	
১৯৬৫	ফাদার পি ফার্লো	
১৯৬৭	আশুতোষ ভট্টাচার্য	নাট্যকার শ্রীমধুসূদন
১৯৬৯	দেবীপদ ভট্টাচার্য	

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোক-সাহিত্য সংগ্রহ

১৯১৯—১৯৭১

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার' প্রথম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'ছেলেভুলানো ছড়া', লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রবন্ধ প্রকাশের এগার বছর পরে ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় ছাত্রদের সম্ভাষণ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কুটিরে, প্রত্যক্ষবস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে, তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানী সভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।'

জাতীয় জীবন ও জাতির প্রাণরসের উৎসস্থল লোকজীবনকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুধাবন করে লোকসংস্কৃতির অনুশীলন, সংরক্ষণ ও গবেষণার দ্বারা জাতীয় মানসটিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলে যে শিক্ষার জাতীয়করণ সম্ভবপর হয় না বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না একথাই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় তখন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বাঙলাদেশ জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায়, বঙ্গভঙ্গ-উচ্ছেদ আন্দোলনের প্রাণবন্যায় আন্দোলিত। জাতীয় ভাষা, জাতীয় সাহিত্য, দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার, দেশের সঙ্গীত নাটক যাত্রাগান, মেলা ও উৎসব—সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা জাতীয় বা দেশীয় মানসিকতার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলেছে যে যুগে, সে সময়—দেশের অভ্যন্তরে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিজস্ব মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা বিভাগের উদ্বোধন হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের আহ্বান ঘোষিত হবার প্রায় ১৪ বছর পরে বাঙলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে মাতৃভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের যোগ বা দেশীয় ঐতিহ্যকে চেনার সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা (বঙ্গভাষা) বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই বিভাগের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই বছরেই তিনি মৈমনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ পালাগান-সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসেন। ডঃ দীনেশচন্দ্রের বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি একটি বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং দেশের লিখিত সাহিত্যের পুঁথি ও অন্যান্য নিদর্শনগুলির সংগ্রহের প্রতি তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণও ছিল। তাই চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পূর্ব-মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে পালাগান সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ডঃ সেনকে দেশীয়

CENTRAL LIBRARY

ঐতিহ্যের লুপ্ত অধ্যায়গুলিকে সংগ্রহের জন্য অর্থ ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত নানা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ফলে পঞ্চবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও ব্যাপক অনুসন্ধানের ফসল হিসাবে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৩২২-২৪ সালে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ বক্তৃতা হিসাবে যে গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন তারই ফল এই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'। একদিকে চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের অনলস অধ্যবসায় ও অন্যদিকে দীনেশচন্দ্র সেন-এর সুগভীর পাণ্ডিত্য—দুই একত্রিত হওয়ার ফলে বঙ্গভাষার একটি অবজ্ঞাত অধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে আসন লাভ করল। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এই আশা প্রকাশ করেন —'এই ভাষার ঐশ্বর্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, জাতীয় আদর্শ সংস্থাপনে, কবিত্বে ও কারুণ্যে, মর্মকথার অভিব্যক্তিতে ও চরিত্র-মর্যাদারক্ষণে, ঐতিহাসিকতায় ও কল্পনার শোভায়, এই গাথাগুলি বঙ্গসাহিত্যকে এক নবজয়শ্রী পরাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই' (ভূমিকা, পৃঃ ২৮০)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে দেশের কাব্যে ছড়ায় গানে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রহের ভিত্তিতে গবেষণার দ্বারা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার আহ্বান করেছিলেন, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রথম অধ্যায় সূচিত হল।

প্রতিটি দেশের সাহিত্যের দুটি ধারা লিখিত সাহিত্যের ধারা ও অলিখিত সাহিত্যের ধারা। সাধারণভাবে দেশের জনসাধারণ লিখিত সাহিত্যের প্রতি যেমন কৌতূহলী, অলিখিত সাহিত্যের প্রতি তেমনটি নয়। কেবল জনসাধারণের ক্ষেত্রেই নয়, গবেষক ও পণ্ডিতদের মধ্যেও দেখা যায় তাঁরা লিখিত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, লিখিত সাহিত্যের মূল্যায়নে ও গবেষণায় যত উৎসাহী অলিখিত সাহিত্যের সংগ্রহ, ইতিহাস রচনা ও গবেষণা ব্যাপারে তত আগ্রহী হন না। ফলে প্রতি দেশেই দেখা যায় লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি অলিখিত সাহিত্য ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। দীর্ঘকাল বাঙলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখা যায়। তাই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই গীতিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাঙলার মৌখিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারাই যে পরিচিত হল তা নয়—বাঙলার বিস্তৃত সমাজজীবনের একটি পরিচয় যে এতে বিদ্যমান তাও পরিলক্ষিত হল। আমাদের পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকগণ কেবল শিলালিপি ও তাম্রশাসনকেই তাঁদের ঐতিহাসিক আলোচনায় ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু জনশ্রুতিমূলক অলিখিত সাহিত্যের মধ্যেও যে ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপাদান থাকতে পারে একথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাহিনীগুলির মধ্যে নারীর যে বিশেষ স্থান দেখতে পাওয়া যায় তার কি কোনও সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য নেই? গারো, খাসি প্রমুখ প্রবল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিবেশীরূপে বাস করে পূর্ব-মৈমনসিংহের সমাজ তার নিজ ভিত্তিমূলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আদর্শকে যে একদিন স্বীকার করে নিয়েছিল সেকথা কি এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় না।[১] এছাড়াও এসব গীতিকাগুলির মধ্যে বাংলার অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রাম্য মানুষের যে সুগভীর জীবনদর্শন, সৌন্দর্যপ্রেম ও রসদৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে তা বিস্ময়কর। সুতরাং অলিখিত মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে যে বাঙালীর জীবনের প্রকৃত প্রাণরস প্রবাহিত একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই সুধীসমাজে প্রকাশিত হয়।

কেবল পূর্ব-মৈমনসিংহের বিশেষ একটি অঞ্চলেই যে বাংলার লোক-সাহিত্যের ও দেশীয় ঐতিহ্যের বিশিষ্ট সম্পদগুলি সীমাবদ্ধ আছে, এ কথা মনে না করে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনুরূপ সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, তা অনুসন্ধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই লোক-সাহিত্যের সন্ধান ও সংগ্রহের জন্য সংগ্রাহক নিযুক্ত করলেন। সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৬২, পৃঃ ১৮৮

CENTRAL LIBRARY

বিভাগের অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকা সত্ত্বেও স্যর আশুতোষ প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রকে এই কার্যে অগ্রণী হবার প্রেরণা দিলেন।[২] দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রাণধর্মসমন্বিত গীতিকা সংগৃহীত হল। এই সংগ্রহে যিনি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর নাম আশুতোষ চৌধুরী। তাঁর সংগৃহীত গীতিকাগুলি ৪টি খণ্ডে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'রূপে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় স্যর আশুতোষের অর্থ-সাহায্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে যুগীযাত্রার পালা বা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, মহুয়ামতীর গান এবং জাগ-গান প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেল। রংপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাঙলাদেশ ও ভারতের বাইরে এই সুবিপুল গীতিকা-সাহিত্যকে প্রচারের জন্য দীনেশচন্দ্র প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই গীতিকাগুলির অনুবাদ করান। স্যর আশুতোষের উৎসাহে ও অর্থব্যবস্থায়, দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় *Eastern Bengal Ballads* নামে তিনটি বৃহদায়তন খণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হয়। বিশ্বের লোক-সাহিত্যের সঙ্গে অবহেলিত বাংলার লোক-সাহিত্যকে একাসনে স্থানলাভ করানোর গৌরব যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এ-সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্রের *Folk-literature of Bengal* নামে আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র বাংলার যে সব লোক-সাহিত্যরসিককে আরও ব্যাপকভাবে বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত করেন তার মধ্যে পল্লীকবি জসিমুদ্দীন অন্যতম। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের যে প্রেরণা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন অব্যাহতভাবে তা অগ্রসর হয়েছিল এবং এরই সূত্র ধরে স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের গীত ও মনসুর উদ্দীন পূর্ববঙ্গের বাউল, মুর্শীদা, মারফতি নামক অধ্যাত্মগীতি যথাক্রমে 'পটুয়া সঙ্গীত' ও 'হারামণি' নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। এর পরবর্তীযুগে আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও সংগ্রহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ এবং গ্রন্থপ্রকাশের যে বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে তাতে ঐ সংগ্রহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমতঃ, কোন বিশিষ্ট সংগ্রাহক দ্বারা লোক-সাহিত্য সংগ্রহ। দ্বিতীয়তঃ, সেই সংগ্রহগুলির বিচার ও আলোচনা। তৃতীয়তঃ, সংগ্রহগুলির প্রকাশ। চতুর্থতঃ, সংগ্রহগুলির নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত করা হয়নি বা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে দেশের নিজস্ব সাহিত্যকে সংগ্রহের মাধ্যমে ছাত্রদের সঙ্গে দেশকে পরিচিত করার প্রচেষ্টা হয়নি। তখন তা সম্ভবপর হয়নি তার কারণ তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগ ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল সীমিত। তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকটাই বাইরের সংগ্রাহকদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ের সংগ্রহ

চন্দ্রকুমার দে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ও উৎসাহে যে কয়জন সংগ্রাহক স্বেচ্ছায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে বাঙলার অবজ্ঞাত ও বিস্মৃতপ্রায় মৌখিক সাহিত্যের উপাদানসমূহ উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় লোক-সাহিত্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন চন্দ্রকুমার দে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। চন্দ্রকুমার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহের নেত্রকোণার অন্তর্গত আইথর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি

২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১

CENTRAL LIBRARY

গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষালাভ করে এক টাকা মাসিক বেতনে মুদিখানায় কাজ করতেন। অনুপযুক্ত ও অমনোযোগী বলে তাঁর সেই কাজ যায়। তারপর ছ টাকা মাইনেতে তিনি একটি গ্রাম্য তহশীলদারী যোগাড় করেন। সেই সূত্রে তাঁর চাষীদের সঙ্গে অবাধভাবে মেশবার সুযোগ উপস্থিত হয়। কৃষকরা যখন তন্ময় হয়ে এ সব পালাগান করতো চন্দ্রকুমার তাদের সঙ্গে তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। এভাবেই পল্লীজীবনের মাধুর্য ও কবিত্ব তাঁর মনকে একেবারে দখল করে বসেছিল। ফলে পূর্ব বাঙলার গ্রামে গ্রামে তিনি পর্যটন করেন এবং বহু পালাকার ও গায়কের সংস্পর্শে আসেন। সেইসময় তিনি বহু বাঙলা পুঁথি ও লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু গান ও পালা সংগ্রহ করতে শুরু করেন। চন্দ্রকুমার তাঁর ২৪ বছর বয়সে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহ জেলার কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রাচীন মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটির প্রকাশ দরিদ্র ও অজ্ঞাত চন্দ্রকুমার দের জীবনে এক আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রবন্ধটি পড়ে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কারণ দীনেশচন্দ্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গসাহিত্যের লুপ্ত পুঁথিগুলির উদ্ধারের ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গেই বাঙলাদেশের লৌকিক সাহিত্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো। 'সৌরভ' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি পাঠ করে দীনেশচন্দ্র একদিকে লোক-সাহিত্যের এই ভাণ্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং চন্দ্রকুমার দের মত একনিষ্ঠ সংগ্রাহকের সংস্পর্শে আসবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দের চন্দ্রাবতী সংক্রান্ত প্রবন্ধটি পাঠ করার পর চন্দ্রকুমারের সান্নিধ্যে আসার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন যে তিনি নানাভাবে তাঁর অনুসন্ধানে ব্রতী হন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র তাঁর 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' ভূমিকায় লিখেছেন : 'গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন তাহা একেবারে বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপুর ; সেইদিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।'[৩] এই চন্দ্রকুমার দে কে এবং কেনারামের কবিতাটি কোথায় পাওয়া যায় এই-ই তখন দীনেশচন্দ্রের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিলো। 'সৌরভ' সম্পাদক বন্ধু কেদারনাথ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে চন্দ্রকুমার একজন দরিদ্র যুবক। ভালো লেখাপড়া শিখতে পারেন নি, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বাংলা লিখতে শিখেছেন। আরও জানলেন যে চন্দ্রকুমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে বাড়ীতে বর্তমান রয়েছে। এর ঠিক দুবছর পরে দীনেশচন্দ্র কেদারবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেলেন যে চন্দ্রকুমারের মস্তিষ্ক অনেকটা ভাল হয়েছে এবং শীঘ্রই তিনি কলকাতায় দীনেশবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন কারণ চন্দ্রকুমারের আরো চিকিৎসার প্রয়োজন। এর পরবর্তী ইতিহাস দীনেশচন্দ্রের ভাষায় : 'স্ত্রীর দুই-একখানি রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া চন্দ্রকুমার পাথেয় সংগ্রহ করিলেন ; এবং ১৯১৯ সনে পূজার কিছু পূর্বে বেহালায় আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রোগে-দুঃখে জীর্ণ, মুখ পাণ্ডুর বর্ণ,—অর্ধাশনে অনশনে বিদীর্ণ, ত্রিশবৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাষী, তিনি পল্লীজীবনের যে কাহিনী শুনাইলেন ও মৈমনসিংহের অনাবিষ্কৃত পল্লীগাথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তাঁহাকে আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইল। এখানে শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন, এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কতকদিনের জন্য তাঁহাকে নিজবাটীতে আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার সংগৃহীত পল্লীগাথা সম্বন্ধে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়া একটা ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব

* মৈমনসিংহ-গীতিকা, ৩য় সংস্করণ, ভূমিকা ।৶

CENTRAL LIBRARY

তাঁহাকে এই ভরসা দিলাম।'[৪] এরপর কয়েকদিন চিকিৎসার পর চন্দ্রকুমার দেশে চলে যান এবং সেখানে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে পল্লীগাথা ও ছড়া সংগ্রহের কাজে অধিকতর উৎসাহে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এই সংগ্রহ-কার্যকালে চন্দ্রকুমার দে-কে যে কি পরিশ্রম করতে হয়েছিলো—দীনেশচন্দ্র তারও পরিচয় দিয়েছেন: 'কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবানই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এইসকল গান অধিকাংশ চাষীদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই।··· এইসকল গানও তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত ও তাহাদের তানে সরল কৃষক প্রাণ তন্ময় হইয়া যাইত।··· কিন্তু লোকের রুচি এইদিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবার লোকেরও অভাব হইয়াছে, যেহেতু এইশ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতুকপূর্ণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্যকথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে, কাহারও বা দুইটি,—নানাগ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালার উদ্ধার করিতে পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালাটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।'[৫] এ সব পালা সংগ্রহের প্রথম দিকে দেখা যায় চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কবিগণ লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হয়েছিলেন। মুক্তারামের 'দুর্গাপুরাণ', রামকান্তের 'মনসার ভাসান'—'উমার বিবাহ,' 'শিবদুর্গার কোন্দল,' 'দুর্বাসার পারণ,' দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' এবং 'নরমেধযজ্ঞ' প্রভৃতি বিষয়ক কবিসংগীতগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশী ছিল। যদিও পল্লীগাথা ও ছড়াগুলি তাঁর অন্তরের প্রিয় জিনিস ছিল তথাপি সংস্কৃত শব্দবহুল কাব্যগুলির পাশে সেগুলি তাঁর অনেক সময় ম্লান বলে মনে হত, এইজন্য সেই পল্লীগাথাগুলিকে আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেও তাঁর এই মনে করে ভয় হত যে উচ্চ সাহিত্যের আসরে পাছে তিনি জাতিচ্যুত হয়ে যান।

'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে চন্দ্রকুমার বিচিত্রভাবে নানাদিক দিয়ে সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'সৌরভে' তিনি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন: 'চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। 'সৌরভে' চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম উদ্যম। ইহার পরে 'লোহার মাঙ্গুস' নামে একখানি উপাখ্যান লিখিতে আরম্ভ করি। বলাবাহুল্য, ইহা চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী, ইহার সপ্তম সর্গ পর্যন্ত লেখা আছে। শেষ করিতে পারি নাই। সেই সময়ে শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যাস ও গভীর রাত্রে 'লোহার মাঙ্গুস' লিখিতাম।' 'সৌরভ' সম্পাদক নানা দিক দিয়ে চন্দ্রকুমারকে সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কিন্তু 'সৌরভে' চন্দ্রকুমারের প্রবন্ধে প্রাচীন-পালাগান সম্বন্ধে যে সামান্য নমুনা প্রকাশিত হয়েছিলো তা পাঠ করে দীনেশচন্দ্র কেদারনাথবাবুকে সেগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। কবি কঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' অপেক্ষা কবি কঙ্কের সম্বন্ধে কবিচতুষ্টয় বিরচিত পালাটিই দীনেশচন্দ্রের কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে বোধ হয়েছিলো। চন্দ্রকুমার-রচিত 'চন্দ্রাবতীর' উপাখ্যান অপেক্ষা নয়নচাঁদ-বিরচিত 'জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর' পালাটি জানবার জন্যই দীনেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে আসার পর দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমার দে-কে তাঁর অন্যান্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টা থেকে বিরত

৪ প্রাগুক্ত, ভূমিকা ৶৹

৫ প্রাগুক্ত, ভূমিকা ৶৹

CENTRAL LIBRARY

করে শুধু পালাগান সংগ্রহে মনোযোগী হতে উপদেশ দেন। তাঁর সংগৃহীত কিছু কিছু পালাগানে খুশি হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র তাঁকে এক বছরের জন্য বেতনভোগী পালা-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করেন। আশুতোষ-স্মৃতিকথায় দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারের নিয়োগ-প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'চন্দ্রকুমার নিযুক্ত হইলেন,—তাহা ছাড়া আরও তিনজন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ওটেন সাহেবের সঙ্গে আমার লোক নির্বাচন সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। ভ্রমণের ব্যয়সমেত মাসিক ৭০ টাকা বেতন ধার্য হইল।'[৬] দীনেশচন্দ্রের নির্দেশে চন্দ্রকুমার পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল ঘুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পালা সংগ্রহ করতে থাকেন। অবশ্য প্রথম প্রথম নিরক্ষর কৃষক কবির মৌখিক পালাগান অপেক্ষা পুরাতন ট্র্যাডিশনের পুথিপত্রাদির ওপর চন্দ্রকুমারের বেশী ঝোঁক ছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারকে পৌরাণিক ঘটনার পুথিপত্রাদি ছেড়ে শুধু মৌখিক পালাগান সংগ্রহের উপদেশ দেন। দীনেশচন্দ্রের নির্দেশে চন্দ্রকুমার যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা-সংগ্রাহক রূপে নিম্নলিখিত পালাগানগুলি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন—(১) দ্বিজকানাই রচিত মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) নয়নচাঁদ ঘোষ রচিত জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর পালা, (৪) দ্বিজ ঈশান রচিত কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) রঘু সুত, দামোদর, নয়নচাঁদ ও শ্রীনাথ বানিয়া রচিত কঙ্ক ও লীলা, (৭) মনসুর বয়াতি রচিত দেওয়ানা মদিনা, (৮) রূপবতী, (৯) চন্দ্রাবতী রচিত কেনারাম, (১০) কাজল-রেখা, (১১) দেওয়ান মসনদ আলি, (১২) ফিরোজ খাঁ, (১৩) ভেলুয়া সুন্দরী, (১৪) জিরালনি, (১৫) মদনকুমার ও মধুমালা, (১৬) কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর, (১৭) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, (১৮) কবিগান, (১৯) রাধাকৃষ্ণ-গীতিকা ও যাত্রাগান, (২০) অসমা সুন্দরী, (২১) সুলা গায়েন রচিত গোপিনীকীর্তন, (২২) দেওয়ান মনোহর খাঁ।

১৯২৩ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগুলি প্রকাশিত হবার পর বাংলার মৌখিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারাই যে প্রকাশিত হল তা নয়, বাংলার সমাজ-জীবনের একটি ঐতিহাসিক পরিচয়ও পরিস্ফুটিত হল। বাংলার পথে ঘাটে, নলখাগড়ার বনে, হাওরের বুকে, প্রাণের এত প্রাচুর্য, সৌন্দর্যের এত লীলা, প্রেমের এত তরঙ্গ যে প্রবাহিত হয় তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।[৭] বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রথম পর্ব ময়মনসিংহ-গীতিকার অনেকগুলি পালাতেই অতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব, শিল্পগুণ, মানবরস ও উদার-অসাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্ত্য প্রেমঘটিত ব্যালাডে অনেক সময় ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য তীব্র প্রতিহিংসা, ঘৃণা, হানাহানি ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই গীতিকাগুলির হিন্দু মুসলমান নারীচরিত্রে কোমলতা, প্রেমের জন্য সুকঠোর আত্মত্যাগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কৃষক কবিগণ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।[৮] 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রকাশিত হবার পর এবং তা উচ্চ প্রশংসিত হওয়ায় দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারকে আরও অধিক উৎসাহের সঙ্গে গাথাসংগ্রহের অনুপ্রেরণা দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থসাহায্য করেন। চন্দ্রকুমার পরবর্তী ক্ষেত্রে বহু পরিশ্রমে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে যে সকল প্রাচীন ব্যক্তির নিকট থেকে জনশ্রুতিমূলক যে সব গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন সেগুলির বিবরণ নিম্নে উপস্থিত করা হচ্ছে:

(১) ধোপার পাট—এই পালাটির অধিকাংশ মৈমনসিংহের অন্তর্গত সাকুয়াই বাটা গ্রামনিবাসী রজনীকান্ত ভদ্র এবং অবশিষ্টাংশ চরশম্ভুগঞ্জবাসী দীন গোপ এবং কীর্তনখোলার 'মধুর বাপ' নামে পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত হয়। চন্দ্রকুমার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে এই পালাটি দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠান। পালাটি ৪৬৯টি ছত্রে সমাপ্ত ছিল, দীনেশচন্দ্র এটিকে ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত

৬ দীনেশচন্দ্র সেন—আশুতোষ-স্মৃতিকথা, ১ম সং, ১৯৩৩, পৃঃ ১০৬

৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, ১৯৬৪, পৃঃ ১০১

৮ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৬, পৃঃ ১৩৮

CENTRAL LIBRARY

করেন। তরুণবয়স্ক রাজকুমার ও রাজকন্যা কাঞ্চনমালার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই গীতিকাটি রচিত। ভাব ও রচনাভঙ্গিতে অনুমিত হয় এই কাব্যটি চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত।[৯]

(২) মইষাল বন্ধু—'মইষাল বন্ধু'র দুটি পালাই চন্দ্রকুমারের অসম্পূর্ণ সংগ্রহ। প্রথম পালাটি সূত্রকোণা গ্রামের চন্দ্রকুমার সরকার, ফুল্লার আব্বাস নামক রায়ের বাজারের একজন গাড়োয়ান এবং সোহাগী গ্রামের নিধু ব্যাপারী নামক একজন পাট-ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয় পালাটি ভাওয়াল পরগণার উছি গ্রামনিবাসী গয়া নামক একজন নমঃশূদ্র, উক্ত গ্রামবাসী মাঝিয়া সেখ নামক জনৈক ব্যক্তি এবং কাটঘরা গ্রামের গাছুনী সেখ নামক অপর একজন মুসলমানের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। দীনেশচন্দ্র ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ১ম পালাটি এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ২য় পালাটি পেয়েছিলেন। মহিষ-রক্ষক ডিঙ্গাধর ও সুজাতী কন্যার অনুরাগ কাহিনী অবলম্বনে মইষাল বন্ধুর দুটি পালাই রচিত। এই পালাগানটিও বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগের অর্থাৎ ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলেই মনে হয়।[১০]

(৩) কাঞ্চনমালা—এই পালাটি চন্দ্রকুমার মরিচালী গ্রামবাসী হরচন্দ্র বর্মা ও আইথর-নিবাসী রামকুমার মিস্ত্রীর নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। রূপকথামূলক এই পালাটি দীনেশচন্দ্র পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন।

(৪) ভেলুয়া—এই পালাটি চন্দ্রকুমার বানিয়াচঙ্গ থেকে সংগ্রহ করেন। চাটগাঁ থেকে বহু পূর্বে 'ভেলুয়া সুন্দরী' নামক কাব্য হামিদুল্লা নামক জনৈক মুসলমান লেখক প্রকাশ করেছিলেন। ভেলুয়ার অপর একটি পালাও সংগৃহীত হয়। কিন্তু সেটি এই গান থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ভেলুয়া পালাটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

(৫) কমলারাণী—পালাটি অসম্পূর্ণ। কমলাদেবীর সঙ্গে রাজা জানকীনাথের বিবাহের বিবরণ-সম্বলিত প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকুমার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে ঐ দুটি সর্গের সারাংশ লিখে দীনেশচন্দ্রকে পাঠিয়েছেন। পালাগানটি ৩৪০টি ছত্রে সমাপ্ত। দীনেশচন্দ্র এটিকে দশটি সর্গে বিভক্ত করেন। ভণিতায় অধরচাঁদ পালা-রচয়িতা বলে নিজের উল্লেখ করেছেন। পালা-রচনাকাল গীতোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলে মনে হয়।[১১]

(৬) মদনকুমার ও মধুমালা—চন্দ্রকুমার এই পালাটি মৈমনসিংহ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই কাহিনীটি এতই জনপ্রিয় যে বাংলার প্রতি জেলাতেই এর বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। এই সংগ্রহটি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে লোক-সাহিত্য সংগ্রহকালে তাকে কতখানি অবিকৃতভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে দীনেশচন্দ্র কত সজাগ ছিলেন। মন্তব্যটি এই: 'গল্পের বর্তমান সংস্করণটি চন্দ্রকুমারবাবু কৃষকদের মুখে যেমন শুনিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একাজ বড় দুরূহ। শিক্ষিত লোকের লেখনী মাঝে মাঝে, চাষার কথার প্রতি ঘৃণার দরুণই হউক অথবা অভ্যাসগত অনবধানতাবশতঃই হউক, প্রাচীন রচনার উপর

৯ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, সং ১৯৭০, পৃঃ ৯-১০

১০ ঐ পৃঃ ১১-১৩

১১ ঐ পৃঃ ১৩

CENTRAL LIBRARY

অনেকটা সংশোধন কার্য করিয়া থাকে। কয়েকস্থানে বর্তমান সংগ্রাহক এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই। তথাপি ইনি চাষীর ভাষা যতটা খাঁটি রাখিয়াছেন, ততটা আর কোনও সংগ্রাহক রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।'[১২]

(৭) ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী—জন্মান্ধ কবি কৈজু ফকির এই পালার রচয়িতা। চন্দ্রকুমার শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী বানিয়াচঙ্গের তিনজন গায়কের নিকট থেকে পালাটি সংগ্রহ করেন। আখ্যানটির প্রারম্ভ সম্ভবতঃ উপকথা থেকে সংগৃহীত এবং পালাটি উপকথা ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে রচিত।

(৮) ফিরোজ খাঁ দেওয়ান—চন্দ্রকুমার এই পালাটি রাজীবপুরের সাহরালী গায়েন, চন্দ্রতলার সদীর গায়েন এবং কাটিখালির রহমান গায়েনের নিকট থেকে এই পালাটি সংগ্রহ করেন। এর কিয়দংশ তিনি ন'পাড়ানিবাসী জনৈক অন্ধ ভিক্ষাজীবী ফকিরের থেকে সংগ্রহ করেন। পালাটিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ঘটনা বর্ণিত।

(৯) আয়ন বিবি—চন্দ্রকুমার ৫১১টি পংক্তি-সমন্বিত এই পালাটি সংগ্রহ করেন।

(১০) শ্যাম রায়—মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন মাচুনা গ্রামবাসী কৈলাসচন্দ্র দে-র নিকট চন্দ্রকুমার এই পালাটির প্রথম সন্ধান পান। তারপর কাঠগড় নিবাসী শচিনী সোম এবং মনিনপুর-বাসী অদেলা দাস-এর নিকট আরও কিছু পদের সন্ধান পান। ১৩৩২ সালে বৈশাখ মাসে নেত্রকোণার মালিনী আশ্রমে মনোমোহন সাধু তাঁকে মৈমনসিংহে তীর্থ গুপ্ত বৃন্দাবনে কমলদাস নামক এক গায়কের সন্ধান দেন। দীনেশবাবু এই সংগ্রহটির ইতিহাসে লিখেছেন: 'চন্দ্রকুমারবাবু তখনই গুপ্ত বৃন্দাবনে যাইয়া কমলদাস গায়কের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেন। এই গায়কের অসাধারণ স্মৃতি পল্লীগাথার রত্নাগার বিশেষ। তিনি অনর্গল এত কবিতা মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, চন্দ্রকুমারবাবুর বিস্ময় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই পল্লীগায়কের একমাত্র সঙ্গী একটি একতারা। কমলদাস বাবাজীর নিকট চন্দ্রকুমারবাবু শ্যামরায়ের যাহা পাইলেন, তাহার সঙ্গে পূর্ব-সংগৃহীত অংশগুলি মিলাইয়া তিনি যথাসাধ্য পালাটি সম্পূর্ণ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পালাটি যে সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইয়াছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। মাঝে মাঝে ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।'[১৩]

(১১) গোপিনীকীর্তন—মৈমনসিংহ নেত্রকোণার অন্তঃপাতী ঠাকুরকোণা গ্রামবাসিনী ফুলা নাম্নী মহিলা কবি কর্তৃক গোপিনীকীর্তন রচিত। পালাটি মৈমনসিংহের জমিদার বিজয়নারায়ণ আচার্য দ্বারা সংগৃহীত ও চন্দ্রকুমার কর্তৃক প্রেরিত।

(১২) শীলা দেবী—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহের আদমজি নিবাসী কালু সেখ এবং কদমশ্রীগ্রামের নন্দলাল দাস নামক এক মাঝির নিকট থেকে এই পালাটি সংগ্রহ করেন। পালাটি সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক। মৈমনসিংহের বহুস্থানে শীলা দেবী সম্বন্ধে বহুপ্রবাদ প্রচলিত আছে। পালাটিতে ৫২০টি ছত্র আছে, দীনেশচন্দ্র এটিকে ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।[১৪]

(১৩) রাজা রঘুর পালা—এই পালাটি রাণী কমলার পালার শেষাংশ, চন্দ্রকুমার দে এটি সংগ্রহ করেন।

১২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪

১৩ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, সং ১৯৩৩, পৃঃ ২৯৯, ২৭৩

১৪ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থখণ্ড, ২য় সংখ্যা, সং ১৯৩৪, পৃঃ ৪৯২

CENTRAL LIBRARY

(১৪) ভাবাইয়া রাজার কাহিনী—মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার বিজয়নারায়ণ আচার্য মহাশয়ের সাহায্যে চন্দ্রকুমার এই পালাটি সংগ্রহ করেন। নাজির নামক এক ফকির এই গানের প্রথমাংশ আবৃত্তি করেছিলো, পরে ঐ জেলার ফুলপুর নামক গ্রামবাসী আর একজন ফকির বাকী অংশটা সংগ্রহে সাহায্য করেছিলেন। সিমুলকান্দা-নিবাসী ঈশান নামক এক ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে চন্দ্রকুমার পালাটি সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করেন। পালাটি হিন্দুদের সম্বন্ধে হলেও মুসলমান গায়কদের কৃপায় বহুকাল পর্যন্ত স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৫) আঁধা বন্ধু—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ চন্দ্রকুমার দে বুন্ধু নামক হাজাং শ্রেণীর এক ব্যক্তি ও মঙ্গলনাথ নামক খালিয়াজুড়ির এক ভিক্ষাজীবীর নিকট থেকে এই পালাটি সংগ্রহ করেন।

(১৬) খণ্ডলার বারমাসী—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে চন্দ্রকুমার কর্তৃক পালাটি মৈমনসিংহ জেলার খালিয়াজুড়ি পরগণার মধ্যবাটী নামক গ্রামনিবাসী নকুল বৈরাগী ও কৃষ্ণরাম মাল নামক দুই ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত হয়। পালাটি ৪২৭টি পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ।

(১৭) সন্ন (স্বর্ণ) মালা—পালাটি চন্দ্রকুমার দু বৎসর পূর্বে মৈমনসিংহ থেকে সংগ্রহ করেন। এতে ২৭৮টি পঙ্‌ক্তি আছে।

(১৮) রতন ঠাকুর—পালাটি প্রায় এক বৎসর পূর্বে চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কাঠঘর নিবাসী গাছিম সেখ ও অপর এক গ্রামের রামচরণ বৈরাগী নামক দু ব্যক্তির নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। পালাটি ২৬২টি ছত্রে সম্পূর্ণ।

(১৯) পীর বাতাসী—পালাটি চন্দ্রকুমার দে দু বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সংগ্রহ করেন। এই পালাটির অধিকাংশ আজমীরি বাজার নিবাসী বৃন্দাবন বৈরাগীর নিকট থেকে পাওয়া যায়। অবশিষ্টাংশ লক্ষ্মীগঞ্জ নিবাসী শ্রীদাম পাটুনী ও জগবন্ধু গায়েন-এর নিকট সংগৃহীত হয়।

(২০) রাজা তিলকবসন্ত—পালাটি চন্দ্রকুমার দে সমাজঝিকরলো অঞ্চল থেকে রামচরণ বৈরাগী ও কতকাংশ লোচনদাসের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন।

(২১) জিরালনি—মৈমনসিংহের অন্তর্গত পীর সোহাগপুর গ্রামের রজনী কর্মকার ও ভাদাই ফকির নামক বাউল গায়কের নিকট থেকে পালাটি সংগৃহীত হয়। পালাটি অসম্পূর্ণ, ৫১০টি ছত্র আছে। চন্দ্রকুমার পালাটি সংগ্রহ করেন।

(২২) চাঁদ রায়-সোনা রায়—পালাটি সংগ্রহ করে চন্দ্রকুমার এই পালাটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বিস্তৃত আকারে লিখে দীনেশচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে উপসংহারে লিখেছিলেন: 'বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গপল্লী নায়কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ এইরূপ ছড়াগানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইট পাথর কুড়াইয়া যেরূপ মন্দির নির্মিত হয়, এইরূপ উপাদান কুড়াইয়া আমাদিগকে সেইরূপ দেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে।'[১৫]

(২৩) সোনা বিবির পালা—১৯শে পৌষ তারিখে এই সংগৃহীত পালাটি চন্দ্রকুমার দীনেশবাবুকে পাঠান। পালাটি শ্রীহট্ট অঞ্চলের কাটিহালি গ্রামনিবাসী রহমান সেন ও যদুনাথ বাউল এবং আজমীরি বাজার অঞ্চলের একজন মাঝি রজনী মাল নামক গায়কের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়। পালাটি অসম্পূর্ণ। এতে ৫৫০টি ছত্র পাওয়া গেছে।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬৯

CENTRAL LIBRARY

পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ-গীতিকা ও *Eastern Bengal Ballads* প্রকাশের পর দেশী ও বিদেশীমহলে প্রশংসা ও সন্দেহ দুইই উত্থাপিত হয়। রোঁমা রোঁলা[১৬] থেকে শুরু করে ভগিনী নিবেদিতা[১৭] সকলেই গীতিকাগুলির অনুবাদ পাঠ করে উচ্ছ্বসিত হন। অপর দিকে সে যুগে এবং পরবর্তী যুগে ঐ গীতিকাগুলির বিশেষ করে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত বহু গীতিকার প্রামাণিকতা ও ভাষা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এঁদের মধ্যে ডঃ সুকুমার সেন অন্যতম। তাঁর অভিমত: 'অধিকাংশ পালা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধু ভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথাভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধু ভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়।'[১৮] তৎকালীন সংগ্রাহকদের সংগ্রহের মধ্যে ভাষাগত বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি সংগ্রাহকদের সংগ্রহগুলি যে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই Dr. Dusan Zbavitel এর মতে **'The collectors of the ballads were, of course, not provided with the equipment of modern collectors, such as tape recorders, cameras, etc. Their pioneer work was full of difficulties and it is not surprising to find that the results bear all the signs of amateurish work. However great these short comings may be, and however great the merits of the editor D. C. Sen, it is necessary to mention, with deep respect and admiration, the name of Chandra Komar De, who is the real discoverer of this forgotten and neglected branch of Bengal Literature.'**[১৯] অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাবে সংগ্রহ ও ভাষাগত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও Dr. Zbavitel দীনেশচন্দ্রের উদ্যম ও চন্দ্রকুমার দের সংগ্রহকে অগ্রগণ্যের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করেছেন। কবি জসিমুদ্দীন সাহেব একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও প্রথম দিকে এই সংগ্রহগুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং পরে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে তাঁর এই সংশয় দূরীভূত হয়েছিলো। দীনেশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে তাঁর 'পুরাতনী' গ্রন্থে লিখেছেন কবি জসিমুদ্দিন এত সুন্দর গানগুলি খাঁটি কিনা এজন্য প্রথমত একটা দ্বিধাযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে নিজে পল্লীতে ঘুরিয়া অনেক গান শুনিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, আমার পূর্বে সন্দেহ হইয়াছিল তাহাই আমার দোষ। আর এখন যে আমি এ গান শুনিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া আসিয়াছি তাহা কি কেহ দেখিবে না?'[২০] একথা হয়ত সত্য যে চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল অনেক। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আকর্ষণে সমগ্র জাতি আত্মবিস্মৃত সে যুগে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে গ্রাম্য সাহিত্যের এই নিদর্শনগুলির আবিষ্কার ও সংগ্রহ করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন একথা ভুললে চলবে না। দেশপ্রেমের প্রকাশ যে কেবল বক্তৃতা ও রাজনৈতিক মঞ্চেই সম্ভবপর নয়, দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্ধার ও সংরক্ষণের মধ্যে যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার প্রকাশ ঘটতে পারে চন্দ্রকুমারের একনিষ্ঠ সংগ্রহগুলিই তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৬ Eastern Bengal Ballads, Vol. IV. Pt. I, ed. 1932, Opinions pp. 431-43

১৭ দীনেশচন্দ্র সেন—ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য, পৃঃ ৩৭০

১৮ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৪০ সং

১৯ Bengal Folk Ballads from Mymensing and the Problem of their Authenticity, ed. 1963, p. x

২০ দীনেশচন্দ্র সেন—পুরাতনী, ১৯৩৯ সং, পৃঃ ৯

CENTRAL LIBRARY

আশুতোষ চৌধুরী—কেবলমাত্র পূর্ব মৈমনসিংহের একটি বিশেষ অঞ্চলেই যে লোক-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট সম্পদগুলি সীমাবদ্ধ আছে একথা মনে না করে দীনেশচন্দ্র বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানে লোক নিযুক্ত করেন। তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্রতা যতই থাকুক না কেন স্যর আশুতোষ আরো সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন এবং সংগ্রাহকগণ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্নস্থানে লোকসাহিত্যের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে থাকেন। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু গীতিকা সংগৃহীত হোল এবং দেখা গেল মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলি প্রধানতঃ যাঁর প্রচেষ্টায় সংগৃহীত তাঁর নাম আশুতোষ চৌধুরী। চট্টগ্রামের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে কিরূপ দুঃসহ পরিশ্রম ও কঠোর দুঃখ-কষ্ট ভোগের মধ্যে তাঁকে এই গীতিকাগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছিলো তার পরিচয় আছে তাঁর সংগ্রহ বিবরণীর মধ্যে। আশুতোষ চৌধুরীর সংগ্রহপ্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলেছেন: 'আমার বিশ্বাস, বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্যে যে প্রভূত ঐতিহাসিক উপকরণাদি পাইতেছি, নিকটবর্তী আর কোন প্রদেশে সেরূপ নাই।··· এই কার্যের ব্যাপদেশে যে সকল কর্মীর সহায়তা আমি লাভ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমারের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য, অপূর্ব উদ্যম, পল্লীসাহিত্যের প্রতি অপরাজেয় অনুরাগের সহিত সুলেখক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের বড় বড় নদীর তীরে, সমুদ্রের সিকতায় প্রাণ-সঙ্কল্প করিয়া যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহার তুলনা কোথায়? যদি অর্থাভাবে এই স্বার্থশূন্য বীরবিক্রম কর্মীর কাজ বন্ধ হয়, তবে দেশের পক্ষে তাহা ক্ষতি। ইনি চট্টগ্রাম হইতে অনেক পালা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইঁহার প্রতি চট্টগ্রাম-বাসীর একটী গুরুতর কর্তব্য আছে।'[২১] চট্টগ্রামের বন্দরে বন্দরে, নদীতীরে, মাঝিমাল্লাদের মধ্যে থেকে আশুতোষ চৌধুরীর পালা সংগ্রহ সত্যই একটি পালার মতই রোমাঞ্চকর। 'ভেলুয়া' পালাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে আশুবাবু দেখেন চট্টগ্রামের গুজরা পোষ্ট অফিসের অধীন নয়াপাড়া গ্রামের মকবুল আহাম্মদ ও ঢাকা চুরিহাটা হামিদিয়া প্রেসের মুন্সী মোহাম্মদী ও হামিদুল্লা সাহেব কর্তৃক ইতিপূর্বে 'ভেলুয়া' পালার কয়েকটি ছাপা সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে। পল্লীসাহিত্য প্রকাশকেরা আদত পালাটি বিকৃত করে প্রকাশ করায় এবং তা পল্লীমাঝে প্রচারিত হওয়ায় আসল পালাটি কৃষকদের মুখ থেকে সংগ্রহ করা প্রায় দুরূহ হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু আশুতোষ চৌধুরী কিরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে মূল পালাটি অবিকৃতভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তার পরিচয় বিস্তৃত বিবরণসহ দীনেশচন্দ্র উপস্থিত করেছেন: 'কিন্তু আমাদের অসীম অধ্যবসায়শীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই হটিয়া পড়িবার লোক নহেন। তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পালাটির উদ্ধার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।··· কত নরনারী তাঁহাকে ভেলুয়ার কাহিনী সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অপূর্ব গল্প শুনাইয়াছে। তিনি তাহাদের নানা কুসংস্কার ও আজগুবি গল্পের উপর আস্থা দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছেন, যেহেতু সেই সরল বিশ্বাসের অভ্যন্তরে তাহাদের ভেলুয়ার প্রতি ফল্গুনদীর মত চির প্রবহমান অকৃত্রিম ভক্তির ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে। কোন কোন বৃদ্ধ তাঁহার নিকট শপথ করিয়া বলিতেন, 'হাঁ, মহাশয়, সত্যসত্যই ভেলুয়া ও আমির কোন কোন পূর্ণিমা রাত্রিতে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এই দীঘির জলে সোনা-ডিঙ্গিতে ভাসিয়া বেড়ান, অনেকে তাহা দেখিয়াছে।' আশুবাবু সরল কৃষকদের মুখে এইরূপ নানা উপাখ্যান শুনিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিতেন। কিন্তু কোথায় আদত পালাটি পাইবেন সেই ভাবনায় তাঁহার দিবারাত্র চোখে ঘুম ছিল না। একপত্রে তিনি আমায় লিখিয়াছেন, 'এমনও দিন গিয়াছে যে আমি সারাদিন পল্লীতে পল্লীতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।' কিন্তু কোন সন্ধান মিলে নাই। অবশেষে পুলিশ ষ্টেশন রাউজানের অধীন বাগোয়ান

২১ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৩৪ সং, পৃঃ ৸৶৹

CENTRAL LIBRARY

গ্রামের জেবল্ হোসেন নামক একটি লোকের নিকট তিনি পালাগানটির কতকটা অংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর চট্টগ্রাম জেলার লাম্বর ঘাটের ইস্‌মাইল নামক জনৈক সাম্পানের মাঝির নিকট হইতে আরও কিছু সংগৃহীত হইল।··· এই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন বাঙ্গুনিয়া থানার অধীন পোমরা গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান গায়ক পালাগানটির সন্ধান জানে। শ্রবণমাত্র লাঠি হাঁকাইয়া পালাগান-সংগ্রাহক পোমরা গ্রামাভিমুখে ছুটিলেন। এই গায়কের নাম ওমর বৈদ্য। তাহার বয়স সত্তরের উপরে। এই লোকটি একটি অদ্ভুত ব্যক্তি। দন্ত চিকিৎসাই তাহার ব্যবসায়। যদিও সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর, তাহার মস্তিষ্ক পালাগানের একটি বৃহৎ আড়ৎ। সে ত এত পালাগান মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারে যে এই অদ্ভুত লোকটির ক্ষমতা দেখিয়া আশুবাবুর বিস্ময়ের শেষ রহিল না।··· আশুবাবু লিখিয়াছেন, ১৯২৬ সনের ৮ই অক্টোবর আমি সন্ধ্যা ৬টা হইতে পরদিন বেলা ১২টা পর্যন্ত এই আঠারো ঘণ্টাকাল, তাহার মুখে ভেলুয়ার গান শুনিয়াছিলাম, যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা নিদ্রার বোধ ছিল না।'[২২] সংগ্রাহক হিসাবে আশুতোষ চৌধুরীর আরও অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাঁর ফটোগ্রাফ সংগ্রহ। ভেলুয়া, কাঞ্চনমালা, মহুয়া, মইষাল বন্ধু প্রভৃতি কাব্যে যে সকল ডিঙ্গি নৌকা ও জাহাজের বিবরণ পাওয়া যায় তার বহু ফটোগ্রাফ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে জীবন বিপন্ন করে সংগ্রহ করেন। এই ফটোগ্রাফ সংগ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়: 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী আমাদের অন্যতম পালাগান সংগ্রাহক। ভেলুয়া, কাঞ্চনমালা, মহুয়া মইষাল বন্ধু প্রভৃতি কাব্যে যে সকল ডিঙ্গিনৌকা ও জাহাজের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রামের বালামী নামক একশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা প্রস্তুত হইত। ইহারা এখনও জাহাজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রাচীন নৌকা ও জাহাজের বহুল বিবরণ আছে। সুতরাং বালামীদের হাতের কাজের কতকটা নমুনা দেওয়ায় পালাগানগুলি আরও চিত্তাকর্ষক হইবে, এই ধারণায় আমি আশুবাবুকে চট্টগ্রামে নির্মিত প্রাচীন ও আধুনিক জাহাজের ফটোগ্রাফ পাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন—তন্মধ্যে বিগত মহাযুদ্ধের সময় বালামীরা যে সকল স্তূপ তৈরী করিয়াছিল, তাহাদেরও কয়েকটি নমুনা আমরা পাইয়াছি। আশুবাবু এই ফটোগ্রাফ সংগ্রহের চেষ্টায় একবার ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া মরিবার পথে দাঁড়াইয়াছিলেন।'[২৩] আশুতোষ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পল্লীগীতি ও গাথা সংগ্রহে নিযুক্ত হয়ে বহুকষ্ট ও পরিশ্রমের দ্বারা যে সব স্থান থেকে নানা অভিজ্ঞতা ও অসুবিধার মধ্যে গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করা হলো—

(১) নিজম ডাকাতের পালা—১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে পালাটি আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে পাঠান। এই পালার অধিকাংশ আশুতোষবাবু চট্টগ্রামের বোলখালি থানার অন্তর্গত অল্লা গ্রামনিবাসী সদরআলী গায়েনের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন এবং মতিয়ার রহমান নামক একজন বাজীকরের নিকট থেকে অবশিষ্টাংশের উদ্ধার করেন। পালাটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বত্র প্রচলিত।

(২) কাজেন চোরা—আশুতোষ চৌধুরী হাইদাগাঁও থানার পটীয়া নিবাসী সেকেন্দার গাইন, বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত বেলিরা গ্রামবাসী অলিয়র রহমান (অইল্যা আঁধা) এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চরচাকতাই নিবাসী ওজু পাগলা এই তিন গায়কের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আশুবাবু

২২ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৯৫৭ সং, পৃঃ ৭৫-৭৭
২৩ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৪

CENTRAL LIBRARY

দীনেশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'সেকেন্দার প্রথমে আমাকে আবগারী গোয়েন্দা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহার পুলিশ-ভীতি এতই প্রবল যে, আমাকে পুলিশের লোক মনে করিয়া সে কোনরূপেই ধরা দিতে চাহে নাই।··· পটীয়া থানার পরিগ্রামে নিবারণচন্দ্র সূত্রধরের বাড়ীতে আশুবাবু সেকেন্দারের গান শোনেন। পালাটি শেষ করিতে তাহার প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তাহার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর এবং ভক্তিপ্লুত যে প্রায় চারিশত লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া যেন তাহার গান অমৃতের মত পান করিতেছিল। আসরের চারিকোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি পোতা এবং তাহার উপরে চারিটি প্রকাণ্ড কেরোসিনের ল্যাম্প মশালের মত জলিতেছিল।···আশুবাবু দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন 'এখন দিন ফিরিয়া গিয়াছে। এজন্য মোল্লাজীরা ফতোয়া বাহির করিতেছেন—'গীত হারাম'। কোরান হদিসের দোহাই স্বঞ্চ হইয়াছে, সুতরাং অনতিবিলম্বেই গাজীর পালা বিলুপ্ত হইবে।'[২৪]

(৩) ভেলুয়া—এই পালাটি আশুতোষ চৌধুরী রাঙ্গুনিয়া থানার অধীন পোমরা গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান গায়ক ওমর বৈদ্যের নিকট সংগ্রহ করেন। এই পালাটিতে ১১৮৭টি ছত্র আছে।

(৪) হাতী খেদা—দীনেশচন্দ্র এই পালাটি সংগ্রহ সম্পর্কে লিখেছেন : 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রামের দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ পর্যটন পূর্বক অতিকষ্টে বহু কৃষকের মুখ হইতে এই পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন।··· আশুবাবু এই পালাগানটি সংগ্রহ করিতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেক খেদাকেন্দ্র স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়া পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন।'[২৫]

(৫) কমল সদাগর—পালাটি বঙ্গদেশের প্রচলিত রূপকথা 'শীত-বসন্ত'র নামান্তর। পালাটি প্রধানতঃ ধুপি এবং আরো কয়েকজন মাঝি-গায়কের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। নবচন্দ্র একেবারে নিরক্ষর। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট পালাটি আশুবাবু দীনেশচন্দ্রকে পাঠান, পালাটির ছত্রসংখ্যা ৯৩২।

(৬) সুজা-আম্মার বিলাপ—আশুবাবু দীনেশচন্দ্রকে এ পালাটি সংগ্রহের বিষয়ে লিখেছেন : 'এই ক্ষুদ্র গীতিকাটি আমি চারিজন গায়কের মুখে শুনিয়াছি। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে একজন বেদেজাতীয় গায়ক আমাকে ইহার আভাস দিয়াছিল। কিন্তু তাহা সংগ্রহোপযোগী ছিল না। তৎপরে আমি চর-চাকতাই নিবাসী আঁধা মকবুল নামক একজন গায়কের নিকট হইতে গত মাসে এই গানটির অধিকাংশ উদ্ধার করি। বেলায়ৎ আলী নামক একজন সংসার-বিরাগী মুসলমান এই গানটি গাহিতে পারে। চট্টগ্রাম শহরের মধ্যে একটি দরগাতে তাহাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কিন্তু তাহার মাথায় একরকম রোগ আছে। আমার নিকট এই গানটি কিছুদূর গাহিয়াই সে থামিয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক কাতরোক্তিতেও ইহার মুখ হইতে আর শব্দ হইল না। এমন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক আমি আর দেখি নাই। গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি পালাগান সংগ্রহ কার্যে আমি সুদূর পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে একটি ছোট খালের মধ্য দিয়া সাম্পানযোগে আসিতেছিলাম। সাতকানিয়ার একখানি বৃহৎ সারঙ্গা নৌকা আমাদের অগ্রগামী ছিল। রাত্রির অন্ধকারে সেই সারঙ্গার মাঝি উচ্চকণ্ঠে এই গানটি গাহিয়াছিল।'[২৬]

২৪ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯-৪১

২৫ ঐ পৃঃ ১৫০

২৬ ঐ পৃঃ ৪০০

CENTRAL LIBRARY

(৭) নূরন্নেহা ও কবরের কথা—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই পালাটি আশুতোষ চৌধুরী আলির নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। আশুবাবু সের আলি খাঁ নামক বড় উঠান গ্রামের জমিদারের নিকট প্রথম পালা গানটির সংবাদ পান। 'বড় উঠান' গ্রামটি দেওয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সের আলি খাঁ হয়বৎ আলি নামক এক গায়কের কথা আশুবাবুকে বলেন। হয়বৎ আলির ডাক নাম 'কাদিরের বাপ'। এই গায়ক একটি আশ্চর্য লোক। নদী এবং সমুদ্রই তার বাড়ী। সে প্রায়ই চালাঘরে থাকে না—জলেই আহার, জলেই শয়ন। বড়-পেস্কারের হাট নামক গ্রামে আশুবাবু এর সাক্ষাৎলাভ করেন। হয়বৎ আলির একখানি সাম্পান আছে। সে এখন বৃদ্ধ। আশুবাবু তাঁর সাম্পান ভাড়া করে একটি ক্ষুদ্র নদীপথে আট ঘণ্টা ধরে হয়বৎ আলির এই পালাগানটি শ্রবণ করেন।[২৭]

(৮) নসর-মালুম—পালাটি আশুতোষ চৌধুরী প্রধানতঃ কাঁঠালভাঙ্গার নূর হোসেন ভাইয়ার নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। এই নূর হোসেন ও তার জ্ঞাতিরা বংশানুক্রমে পালা গেয়ে আসছে। নূর হোসেনের পিতার নাম কোর্বান আলি। ইনিও নসর মালুমের পালা গাইতেন। নূর হোসেন ছাড়াও কাঁঠালভাঙ্গার নিকটবর্তী মহিষ-মারা গ্রামে গুরু মিঞা নামক জনৈক 'হারি গায়েন' অর্থাৎ সারি গায়কের নিকট থেকে আশুবাবু আরও কয়েকটি পদ পান, পরে কর্ণফুলি মোহনার নিকট রহমান নামক সাম্পানের একজন মাঝির নিকট সম্পূর্ণ পালাটি প্রাপ্ত হন।

(৯) পরীবানুর হাঁহলা—এই পালাটির সংগ্রহ এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে দীনেশ চন্দ্রকে লেখেন :

"পরীবানুর পালাটি 'সুজা তনয়ার বিলাপে'রই অনুরূপ, কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। বহুপূর্ব হইতেই আমি আপনাকে 'হালদা-ফাটা' নামক পল্লীগীতির কথা লিখিয়া আসিতেছি। এই পালাটিও সেই জাতীয় গান। সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানগুলিতেই 'হালদা-ফাটা' গানের প্রচলন দেখা যায়। এই পালাগায়ক সারেঙ্গ, তানপুরা, খঞ্জরি কি অন্যপ্রকারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। প্রকৃতির সাধারণ সুর ও সমুদ্রের সোঁ সোঁ শব্দসংযোগে তাহারা যেন এই গানের তালমান রক্ষা করিয়া থাকে। ··· গত ফেব্রুয়ারী মাসে মহিষখালি দ্বীপে শ্রীধনঞ্জয় বড়ুয়া নামে একজন জরীপের ডেপুটির সঙ্গে আমি এ পালার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে সাতকানিয়া থানার অন্তঃপাতী 'গোরস্থান' নামক গ্রামে যাইতে বলিয়াছিলেন। ···কিন্তু আমি গোরস্থানে অনেক খোঁজ করিয়াও সেই পালাগায়কের সন্ধান পাই নাই। আরাকানের অন্তর্গত মংডু সব-ডিভিশনের মৌলবী আবুল হালিম নামক একজন সঙ্গীতসম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে এ পালার কিছু বিবরণ জানাইয়াছিলেন।··· তাহার পর আমি সন্ধান করিয়া পেকুয়া দ্বীপে উপস্থিত হই। সিরাজ মিঞা সেইখানকার জমিদার। তিনি বড়ই রসগ্রাহী এবং সৌখীন লোক। আমি তাঁহার নিকট যখন পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ৩য় খণ্ড হইতে কাফন চোরার পালাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম তখন তিনি আমাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উজান ঢেইয়া গ্রামনিবাসী জবাসুর আলীর নিকট হইতে এই পালার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। সেই অঞ্চলে এই গানটি 'পরীবানুর হাঁহলা' নামে পরিচিত।"[২৮]

২৭ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৭

২৮ ঐ পৃঃ ৫২৯-৫৩০

CENTRAL LIBRARY

পূর্ববঙ্গ-গীতিকার অন্য কয়েকজন সংগ্রাহক ও তাঁহাদের সংগ্রহ

জসীমুদ্দীন—'শান্তি ও নীলা' পালাটি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার পিয়ারপুর গ্রামের এছেন খাঁ নামক ৫০ বছর বয়স্ক একজন নিরক্ষর মুসলমানের নিকট থেকে ইহা কর্তৃক সংগৃহীত হয়।

নগেন্দ্রচন্দ্র দে—(ক) রাজা রঘুর পালাটি আহয়ব গ্রামবাসী নগেন্দ্রচন্দ্র দে কর্তৃক সংগৃহীত। (খ) 'বীর নারায়ণের পালা'টি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছার নিকট সলিদা গ্রামের কালাচাঁদ মাল ও সফুরিয়া গ্রামের সেখ পানাউল্লার নিকট থেকে সংগৃহীত হয়। (গ) 'মাঞ্জুর মা' পালাটি নগেন্দ্রচন্দ্র দে কর্তৃক সংগৃহীত।

বিহারীলাল রায়—(ক) 'মাণিক তারা' পালাটি মৈমনসিংহ থেকে বিহারীলাল রায় সংগ্রহ করেন। (খ) 'বারতীর্থে'র পালাটিও তিনি সংগ্রহ করেন।

মনসুর উদ্দীন—'মহীপাল' নামক পালাটি সংগ্রহ করেন।

মনোরঞ্জন চৌধুরী—নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা থেকে 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটি সংগ্রহ করেন।

শিবরতন মিত্র—বীরভূম থেকে সাঁওতাল-হাঙ্গামার ছড়াটি সংগ্রহ করে ৮।১০।২৪ তারিখে দীনেশচন্দ্রকে পাঠান।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহ

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষার পাঠক্রমে 'লোক-সাহিত্য' একটি 'বিশেষ পত্র' রূপে গৃহীত হয় এবং ঐ লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের প্রথম ক্লাশেই এই বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, লোক-সাহিত্য পাঠ সম্পূর্ণ করতে হলে এই সাহিত্যের উৎসস্থল বাংলা দেশের গ্রাম, গ্রাম্য মানুষ, তার সমাজ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও বিশ্বাস, জীবন ও জীবিকা, নৃত্যগীত ইত্যাদি তার জীবন ও সংস্কৃতির বিবিধ বস্তুকে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে হবে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনার দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং পল্লীর বিভিন্নমুখী জীবনের পরিচয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করবার যে মহান্ দায়িত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ খৃষ্টাব্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তার অঙ্কুর কিশলয় রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'লোক-সাহিত্য' বিশেষ পত্রের একদল ছাত্রছাত্রী পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার অন্তর্গত অযোধ্যা পাহাড়ে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের একটি শিবির স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ের সংগ্রহস্থল যেমন ছিল প্রধানতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহস্থল হলো পশ্চিমবঙ্গ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীর দল অযোধ্যা অঞ্চলটিতে সপ্তাহকাল ধরে সমীক্ষা ও সংগ্রহকার্য চালান। ডঃ ভট্টাচার্য এই সংগ্রহ শিবিরের কেবলমাত্র পরিচালক ছিলেন না, তিনি নিজে সংগ্রহ ও সমীক্ষা কার্যে অংশ গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে সমীক্ষা কার্য পরিচালনার রীতি নীতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য, বাছাই ও পর্যালোচনার পদ্ধতি সমস্ত কিছুই একক দায়িত্বে অভূতপূর্ব পরিশ্রমে শিক্ষাদানে সক্ষম হন। এ ধরণের প্রচেষ্টা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রথম। এমন কি, বলা চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও অভিনব। কারণ প্রথমতঃ সাহিত্যের ছাত্রের সঙ্গে সাহিত্যের উৎসস্থলের সংযোগ সাধন, দ্বিতীয়তঃ দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্মতার মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা, তৃতীয়তঃ লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ, চতুর্থতঃ জ্ঞানকে কেবল পুথির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের বৃহত্তর জনজীবনের

CENTRAL LIBRARY

মধ্যে তাকে উপলব্ধি করা, পঞ্চমতঃ ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে সাহিত্যের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ, বাছাই, বিচার ও পর্যালোচনার শিক্ষাদান ও উৎসাহ দেওয়া, ষষ্ঠতঃ দেশের লুপ্তপ্রায় লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদানগুলি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের একটি জাতীয় কর্তব্য পালন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা।

তারপর ১৯৬২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলা দেশের গ্রামে 'লোক-সাহিত্য' বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীর দল সংগ্রহকার্য করে যে বিরাট লোক-সাহিত্যের নিদর্শন উদ্ধার ও সংরক্ষণ করেছেন তা বিস্ময়কর। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি মনীষিগণের প্রচেষ্টায় বঙ্গভাষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো তা আরো ব্যাপক ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংস্থাপিত হল লোক-সাহিত্য প্রেমিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের একক প্রচেষ্টা ও তাঁর লোক-সাহিত্যের বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

সমীক্ষা শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রেখেই তবে স্থান নির্বাচন সম্ভবপর। ডঃ ভট্টাচার্য তার প্রথম শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন হিসাবে পুরুলিয়া জেলাকেই গ্রহণ করেছিলেন। এর বিবিধ কারণ আছে। পরবর্তী শিবিরগুলিও পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের যথাক্রমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। এই শিবিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অনেকে অনুমান করেছিলেন যে ঐ অনুর্বর, শুষ্ক, কাঁকরাকীর্ণ অরণ্যভূমিতে বিশেষ করে যখন তার অধিকাংশ জায়গাই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে বাংলার লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান পাওয়া কি করে সম্ভবপর? কিন্তু ক্রমাগত প্রায় দশ বছর সমীক্ষা শিবির স্থাপিত হওয়ার পর একথা প্রমাণ হয়েছে যে পশ্চিম সীমান্তবর্তী এই গ্রামগুলিতে বঙ্গ-সংস্কৃতির এক বিপুল ঐশ্বর্য এখনও বিরাজ করছে এবং সেখানে বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রচুর উপাদান এখনও বর্তমান আছে, যার মধ্যে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার এই প্রান্তবর্তী গ্রামগুলি কি করে সংস্কৃতির সম্পদে প্রাণবান্ হয়ে উঠলো তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ডঃ ভট্টাচার্য যে স্থানগুলি নির্বাচন করেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর বহুদিনের নৃতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগত একটি শৃঙ্খলা—যা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ভেরিয়ার এলুইন-এর কাছে প্রাপ্ত।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের যে অংশ বিহারের অন্তর্গত ছিল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার যে অংশ মূলতঃ প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই অঞ্চলে দীর্ঘকাল সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেখা গেছে। ইতিহাসের কোন্ যুগ থেকে কিভাবে যে সে কাজ সম্ভবপর হয়েছিল তা অনুভব করা না গেলেও এর বিবর্তনের ধারাটি কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। বৌদ্ধ যুগে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত যে পথ বিস্তৃত ছিল, তা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল, তারপর মধ্যযুগের শেষ ভাগে এসে দেখা গেল চৈতন্যদেব নবদ্বীপ থেকে পুরীর পথে এই ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। খৃস্টপূর্ব যুগে মহাবীর এ অঞ্চলেই জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন, অথচ একথা সত্য, এ দেশে এমন লোক ছিল, যারা তখন মহাবীরকে নানাভাবে অপমান করেছিলেন, তারা সকলে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এমনও নয়। এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্তরে স্তরে এসে সঞ্চিত হয়েছিলো, তারপর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর এই সমগ্র অঞ্চলটি বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো, কিন্তু এ অঞ্চলের জনসংখ্যার মৌলিক ভিত্তি আদিবাসী দ্বারা গঠিত। এই আদিম সমাজও যে একই মানব-গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত তাও নয়, এর প্রধান প্রমাণ এই যে,

CENTRAL LIBRARY

এই অঞ্চলের ভাষাতে দ্রাবিড় ও মুণ্ডা দু শ্রেণীর ভাষাই ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ এই যে, এ অঞ্চলে দুটি ভাষাভাষী জাতির আবির্ভাব এবং শেষ পর্যন্ত তিরোভাব দুইই ঘটেছিলো। নিজস্ব ভাষার মধ্যে ঐ জাতিগুলি তাদের মৌলিক পরিচয় উপস্থিত করে পরবর্তী কালে পরস্পর পরস্পরের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাহ্যতঃ একত্রিত হয়ে গেছে। সেজন্যে এ অঞ্চল থেকে যে সকল লোক-কথা আজও আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে দ্রাবিড় এবং মুণ্ডা ভাষার সংস্কারের পরিচয় এখনও উদ্ধার করা যায়। এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসীর এবং অর্ধ-আদিবাসীর মধ্যে সর্বশেষ যে ঐক্য সূত্র রচিত হয়েছে, তার প্রেরণা বৈষ্ণবধর্ম থেকে যে এসেছে এর প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে নৃত্য গীত ও ঝুমুর গানের মধ্যে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার ব্যবধানকে দূর করে সামগ্রিক একীকরণের এক অভাবনীয় শক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যেমন ছিল, অন্য কোন ভারতীয় ধর্মের তেমন ছিল না, সেজন্য বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর তাদের রাজ্যের সীমায় বৈষ্ণবধর্ম ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ প্রচার লাভ করল এবং তাদের আকর্ষণে এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করতে আরম্ভ করল। একদিন পরস্পর গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও এক ধর্মমতের আকর্ষণে এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের নিয়মিত গোষ্ঠী সংগ্রাম, উৎসব অনুষ্ঠানের কৌতুক সংগ্রামের ক্রীড়া রূপ লাভ করলো। এ অঞ্চলের ছৌ-নাচে যে এত যুদ্ধ-নৃত্যের অভিনয় হয়, তার অর্থই এই যে একদিনের গোষ্ঠীসংগ্রাম বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পর ধর্মীয় আনন্দানুষ্ঠানের রূপ লাভ করলো এবং এই প্রকার যুদ্ধ-নৃত্যে পরিণত হল।

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোথাও শ্যামল বা ধূসর প্রান্তর, কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও বা গৈরিক বর্ণের প্রান্তর, কোন জায়গায় নাতি-উচ্চ পর্বত। এর অধিবাসীদের প্রকৃতি সে অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃতির এই রূপ ছাড়া আর কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় নি; সেজন্যে এর নরনারীও একই অভিন্ন ধাতুতে গঠিত। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা সৃষ্টির এটিও একটি প্রধান কারণ। আর এই সকল কারণেই পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সংস্কৃতির পটভূমিকাটি—এর বৈচিত্র্যপূর্ণ অথচ একটি অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সংস্থাপিত হয়েছে। বহির্মুখী প্রাকৃতিক অখণ্ডতা এ অঞ্চলের মানবসমাজের অন্তর্মুখী অখণ্ডতা সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্য এর অন্তর্মুখী ঐক্যেরই সন্ধান দেয়। অপরদিকে মৌলিক আর্যেতর ধর্মের উপর বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রভাবের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, আজ সেটি এ অঞ্চলে জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যাবে না, বরং এ অঞ্চলের জনসমাজের অলিখিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে তার নিদর্শন সন্ধান করলে এ অঞ্চলের সামাজিক ও ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসটি বুঝতে পারা যেতে পারে। কারণ, সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের বহির্মুখী পরিচয় কালক্রমে লুপ্ত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে তার স্বাক্ষর কিছুতেই মোছা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের উপকরণ বিশ্লেষণ করলেই নিরক্ষর জনসমাজের বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিলুপ্ত উপকরণসমূহ উদ্ধার করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ এ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যেরই কোন কোন অংশে প্রস্তরীভূত রূপে অক্ষয় হয়ে আছে, সুতরাং উপরোক্ত কারণেই এই অঞ্চলটিকেই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষা কার্যের উপযুক্ত হবে বলে অনুধাবন করেছিলেন এবং এও অনুমান করেছিলেন যে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের জাতিগত সংমিশ্রণে গঠিত জনসাধারণের মধ্যে কি ধরণের সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভবপর এবং তার ফসলই বা কি হতে পারে, তার সম্পূর্ণ পরিচয় ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে পারা সম্ভবপর হবে।

CENTRAL LIBRARY

সংগ্রহ শিবির

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগ থেকে এপ্রিলমাসে প্রথম সংগ্রহ-শিবির স্থাপিত হয় পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে। এই প্রথম শিবিরের শিবিরাধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং পরবর্তী যে শিবিরগুলি এই পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে স্থাপিত হয় এবং সমীক্ষা ও সংগ্রহ কার্য পরিচালিত হয় তার সমস্তগুলিতেই ডঃ ভট্টাচার্যই অধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিজে সক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও সমীক্ষা পরিচালনা করে এই অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত লোক-সাহিত্য ভাণ্ডার উদ্ধার করেন। এই প্রথম লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রথম সমীক্ষা-শিবিরে মোট ১৬ জন লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও গ্রামসমীক্ষার প্রথম শিবিরটি যে অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিলো তা বিশেষ কয়েকটি কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ইতিপূর্বে কোন সংগ্রহকার্য সম্ভব হয়নি, বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়ে সরকারী বন বিভাগের সাহায্য ছাড়া কোন শিবির স্থাপন প্রায় অসম্ভব। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর অসাধারণ পরিচিতি এবং অনবদ্য কর্মপ্রচেষ্টায় বনবিভাগের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এমন একটি অঞ্চলে প্রথম সমীক্ষা শিবির স্থাপন করলেন যেখানে ইতিপূর্বে শিবির স্থাপন হয়নি, এমন কি, আজ পর্যন্তও যেসব অঞ্চলে দ্বিতীয়বার সংগ্রহ কার্য পরিচালনা করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলটি আদিবাসীদের দ্বারা বিশেষভাবে পরিপূর্ণ। প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত গভীর অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল এই অঞ্চলটি সভ্য জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই ছিল। তৃতীয়তঃ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল চরমতম দরিদ্র ও রোগগ্রস্ত। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যে কি ধরণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতেন, তারও একটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই অঞ্চলে। সুতরাং বলা যেতে পারে এককালের একটি আদিবাসীর দল অরণ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকে অবলম্বন করে একটি স্থায়ী গ্রাম্য জীবনে রূপান্তর লাভ করেছিলো এবং ক্রমশঃ গ্রাম্য মানুষের রীতি নীতি, আচার ধর্ম ইত্যাদির সংস্পর্শে ক্রমে এক সংহত সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী হয়েছিলো, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান, অনাবৃষ্টি, জমির অনুর্বরতার জন্য তাদের চরম দারিদ্র্য ও মারাত্মক ব্যাধির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বলেই তাদের সাংস্কৃতিক জীবনও শুষ্কপ্রায় হয়ে আসছিলো। ঠিক এমনি সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা দল উপস্থিত হল এই অবজ্ঞাত অঞ্চলটিতে। সেখানে এমন অনেক লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করা হোল, হয়ত আর দু-এক বছর পরে গেলে তা লুপ্ত হয়ে যেতো। অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে যে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ হয়েছিলো তা হচ্ছে ঝুমুর গীত। তার মধ্যে বেশীর ভাগই 'আদিবাসী ঝুমুর'। ছোটনাগপুর থেকে আরম্ভ করে মধ্যভারতব্যাপী গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত যে আদিবাসী বসতি সীমা (**aboriginal belt**) অগ্রসর হয়ে গেছে, তার সর্বত্র যে আদিবাসী সঙ্গীত প্রচলিত আছে তা সাধারণ ভাবে ঝুমুর নামেই পরিচিত। গভীর অরণ্যাবৃত, পার্বত্য ও নীরস প্রস্তরভূমি সমাকীর্ণ এই অঞ্চলে কৃষিকার্য ছিল অত্যন্ত দুরূহ। পশু শিকারই ছিল এককালে এ অঞ্চলের জীবিকা। প্রাকৃতিক জীবন সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপোষক। এই বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী তার অভিন্নতা হেতু এই অঞ্চলে প্রায় এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হয়েছে। এর একটি প্রধান অংশ অষ্ট্রিক শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করলেও দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর অভাব নেই। একই গ্রামে বা পাশাপাশি গ্রামে প্রতিবেশী রূপে অবস্থানের দরুন ভাষাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়ে যে সমস্ত আদিবাসী বাস করে তারা প্রধানতঃ সাঁওতাল বলেই পরিচিত। সেই সূত্রেই তাদের সঙ্গীতও ঝুমুর। ক্রমে বাংলা ভাষার

CENTRAL LIBRARY

সান্নিধ্যে এসে আদিবাসীর ঝুমুর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে। আদিবাসী ঝুমুর তিনটি পদবন্ধে গঠিত।[২১] প্রথম পদটিতে সুর স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হয়ে এসে দ্বিতীয় পদটিতে একটু চড়ায় উঠে, তৃতীয় পদে খাদে নামে। এই সঙ্গীতের সঙ্গে মাদলের বাদ্য ও বাঁশির সুর সংযুক্ত হত। যে মাদল বাজাতো সে একক এবং যারা গান গাইতো তারা সমবেত ভাবে অর্ধবৃত্তাকারে পরস্পর হাত ধরাধরি ও কটি বেষ্টন করে নির্দিষ্ট পদক্ষেপে একবার পিছনে অগ্রসর হত ও পেছিয়ে যেত।

সুতরাং অযোধ্যার অঞ্চলে প্রথম লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে ঝুমুর গানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তী অনেক শিবিরে বিশেষ করে বাঁশপাহাড়ীতে যে উচ্চপর্যায়ের রসমধুর ঝুমুর গান পাওয়া গেছে তার সাহিত্যগুণ উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশুক অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে আমরা প্রথম যে ঝুমুর গানগুলি সংগ্রহ করেছিলাম তার মধ্যে ঝুমুর সঙ্গীতের আদি রূপ এবং তার বিবর্তনের ধারাটি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগ্রহ কালে এবং সন্ধ্যাবেলায় সংগ্রহ-পর্যালোচনার সময়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনার দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহকার্যকালে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে সংগ্রহ শিবির কি ভাবে পরিচালিত হতো তা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত করছি। প্রথমতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের দলটি সংগ্রহ ও সমীক্ষা কার্যের সুবিধার জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত হতো। প্রত্যেক দলে ছেলে এবং মেয়েরা থাকতো। এর ফলে সুবিধা হত :—(ক) তিনটি বা চারটি দল বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গ্রামে যেয়ে সামগ্রিক ভাবে সংগ্রহ কার্যকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতো। (খ) সব দলে ছেলে এবং মেয়ে থাকার জন্য এক একটি গ্রামে যেয়ে মেয়েরা বাড়ীর অন্দরে মেয়েদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সংগ্রহ কার্য চালাতে পারতো। লোক-সাহিত্যের অধিকাংশ উপকরণই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরদিকে ছেলেরা বহিরঙ্গনে পুরুষদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ কার্য চালাতো। দ্বিতীয়তঃ সংগ্রহ কার্য সাধারণতঃ শুরু হত প্রতিদিন সকাল ৬-৩০টা থেকে। তার পূর্বে অর্থাৎ সকাল ৬টার সময় শিবিরাধ্যক্ষ সব সভাসভ্যাকে নিয়ে নিকটস্থ কোন একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করে প্রার্থনা করতেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে শিবিরাধ্যক্ষও কর্মসূচনা করতেন এবং সেই সভাতেই তিনি কর্ম নির্দেশ দিতেন। দল বিভাগ করতেন, দলনেতা নির্বাচন করতেন, এবং কোন দল কোন দিকে যাবে এবং কি ধরনের সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে, কোন কোন জিনিস পরিহার করে চলতে হবে তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তৃতীয়তঃ সামান্য জলযোগের পর খাতা, পেনসিল ও অন্যান্য সামগ্রী সহ দল-নেতারা তাঁর দলটি নিয়ে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তো। তা না হলে শিবিরাধ্যক্ষের মৃদু তিরস্কারের ভয় থাকতো। এমন অনেক সময় দেখা গেছে জলযোগের সময়াভাবে কোঁচড়ে মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে সভাসভ্যারা রাস্তায় রাস্তায় খেতে খেতে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন গ্রামে সংগ্রহ ও সমীক্ষা কার্য চালাতো। শিবিরাধ্যক্ষ এক একদিন একটি বিভাগের সঙ্গে গ্রামে যেতেন এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহের পদ্ধতি, গ্রাম সমীক্ষার রীতিনীতি সমস্ত কিছুই হাতে কলমে শিখিয়ে দিতেন। কোন একটি বিশেষ গ্রামে কোন একজন বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত গায়কের সন্ধান পাওয়া গেলে শিবিরাধ্যক্ষ নিজে পায়ে হেঁটে দীর্ঘমাইল অতিক্রম করে ছাত্রছাত্রীসহ সেখানে উপস্থিত হতেন, ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গান লিখিয়ে নিতেন, নিজে টেপ রেকর্ডে গান সংগ্রহ করতেন এবং প্রয়োজন বোধে সেই গায়ককে সঙ্গে করে শিবিরে নিয়ে আসতেন। পশ্চিম সীমান্তের এই

২১ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৪ সং, পৃঃ ১০৬

CENTRAL LIBRARY

পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে রৌদ্রের উত্তাপ খুব বেশী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রখর থেকে প্রখরতর হতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা এপ্রিল-মে মাসের ঐ অঞ্চলের অসম্ভব গরমেই সংগ্রহ কার্য চালাতো। এমন কি, শিবিরাধ্যক্ষের বয়স ও শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঐ সূর্যতাপকে উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করেছেন। রৌদ্রদগ্ধ ভূমির এই সীমান্ত প্রদেশগুলিতে সমীক্ষা ও সংগ্রহ কার্য শিবির স্থাপনকালে প্রতিদিন এভাবেই প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা ছাত্রছাত্রীও শিবিরাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হত। সংগ্রহকার্যকালে যেমন আমাদের মূল লক্ষ্য লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ, লোকগীতি, লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করা হোত, ঠিক তেমনি গ্রামের সামগ্রিক পরিচয় তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও একটি পরিপূর্ণ সমীক্ষা করা হোতো। সেখানে মন্দির, দেবস্থান, গ্রামদেবতা, দেওয়াল চিত্র, হস্তশিল্প, জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ সমস্ত কিছুই সাধ্যমত পরিবেশন করা হত। তৃতীয়তঃ শিবিরের এক দিনের এই তৃতীয় পর্যায়ে যা করা হোত, তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বিষয়গুলি বাছাই করা এবং বিভিন্ন পর্যায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং সেগুলি ফুলস্কেপ কাগজে বিভিন্ন বিভাগের দল নেতার নেতৃত্বে বিষয় ও শ্রেণী অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে অনুলিপি করে ফেলা। এটিও ছিল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একান্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু শিবিরাধ্যক্ষের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীরা সারাদিনের সংগ্রহের কঠিন পরিশ্রমের পরও এই যে সংগ্রহগুলির লেখার কপি করার কাজ করতো তার দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা লোকসাহিত্যের ছাত্র হিসাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ ত শিখতোই, উপরন্তু লোকসাহিত্যের বাছাই, শ্রেণীবিন্যাস, বিষয়বিভাগ ইত্যাদি কঠিনতম শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেত। লোকসাহিত্য যে কেবলমাত্র শুষ্ক পুঁথিপাঠ বা পুস্তক পাঠ নয়, তার জীবন্ত বিষয়বৈচিত্র্যের মত শিক্ষাপদ্ধতি ও যে হাতে নাতেই (Practical) সম্ভব পর এইসব সংগ্রহ ও সমীক্ষা শিবিরেই হাতে কলমে তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যেত। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতে লোকশ্রুতি পর্যালোচনার পাঁচটি দিক আছে। প্রথমতঃ যথাযথ সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, তৃতীয়তঃ সংগৃহীত বিষয়গুলির মধ্যে লোক-বিশ্বাসের স্বরূপ নির্ণয় করা, চতুর্থতঃ কোন সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর সৃষ্টি, তা নির্ণয় করা, পঞ্চমতঃ ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের উপর সংগৃহীত লোকশ্রুতির প্রভাব কতখানি তার বিচার। লোকসাহিত্য সংগ্রহ শিবিরের প্রত্যেকটি শিবিরেই প্রত্যক্ষ সংগ্রহ, নির্বাচন, শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদির দ্বারা লোক-সাহিত্য সংগ্রহের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতেন এবং ছাত্রছাত্রীরাও কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা সেগুলি আয়ত্ত করতো। তাই তৃতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত বিষয়গুলি নকল করার সময়েই এই শিক্ষার অনেকটাই আয়ত্তে এসে যেত। চতুর্থতঃ একটি সংগ্রহ শিবিরের চতুর্থ পর্যায়ে যে কর্ম অধ্যায়টি অনুষ্ঠিত হত সেটি হচ্ছে সান্ধ্য অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে শিবিরাধ্যক্ষের সামনে সারা দিনের সংগ্রহের তালিকা ও সংগ্রহগুলি পেশ করতে হত। দ্বিপ্রহরে সংগ্রহগুলির বাছাই ও বিন্যাস পর্ব সমাপ্ত করে বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যসহ সংগ্রহগুলির তালিকাবদ্ধ একটি বিবরণ প্রত্যেক দলের নেতাকে পেশ করতে হত এই বিবরণীর মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম থেকে সংগ্রহ কার্য হয়েছে সেই সমস্ত গ্রামের একটি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সমীক্ষা উপস্থিত করা হতো। কোন বিশিষ্ট ধরণের সংগ্রহ থাকলে তার একটি বিশদ বিবরণ দিতে হোত এবং সেই সঙ্গে শিবিরাধ্যক্ষের নির্দেশ মত কিছু কিছু সংগৃহীত লোক-সাহিত্যের উপকরণ পড়ে শোনানো হত। শিবিরাধ্যক্ষ প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, ত্রুটি ও গুণাগুণ বর্ণনা করতেন। এই সময় লোকসাহিত্য সম্পর্কিত বিচারের পদ্ধতিটি ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হত। লোক-সাহিত্য যেহেতু মৌখিক সাহিত্য, লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে এর অবস্থান সেইজন্য লোক-সাহিত্য দেশে দেশে চিরপরিবর্তনশীল। তাই

CENTRAL LIBRARY

লোক-সাহিত্যের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও তার রূপ সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রত্যেক লোক-সাহিত্য গবেষকের একান্ত কর্তব্য। কারণ, এর দ্বারাই লোক-সাহিত্য সৃষ্টি উৎসে কোন্ কোন্ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদান বর্তমান তারও সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভবপর হয়। শিবিরের চতুর্থ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা শিবিরাধ্যক্ষের কাছ থেকে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারতো। ফলে পরবর্তী জীবনে তারা এর দ্বারা বহুভাবে উপকৃত হয়েছে এবং নিজস্ব অভিযানে একক সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

পঞ্চমতঃ শিবিরের পঞ্চম অধ্যায়ে হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এটি ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। তারাই নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করে, অনুষ্ঠানলিপি তৈরী করে অনুষ্ঠান পরিচালিত করতো। এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই দর্শক হিসাবে থাকতো তা নয় গ্রামের অধিবাসীরাও উপস্থিত থাকতো। সকালে যে সমস্ত সভাসভ্য বিভিন্ন গ্রামে যেত সেখানকার সকলকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসতো, সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসীরা শিবিরে আসতো এবং অনুষ্ঠানটি দেখতো। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটিকে শিবিরের ক্ষেত্রে 'গ্রাম সংযোগ' পর্যায়ে ফেলা চলে। গান, নাচ, আবৃত্তি, মূকাভিনয়, নাটিকা নানা ধরনের বিষয় উপস্থিত করা হোত। কয়েকটি শিবিরে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়েছিলো। কয়েকবার, এমন কি, স্বয়ং শিবিরাধ্যক্ষ যাত্রাগানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য এতে গ্রামবাসীরা এত উৎসাহিত বোধ করতেন যে তাদের নিজস্ব যাত্রাদলের সাজসজ্জা আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। গ্রামের লোক-শিল্পীরা তাদের লোক-সঙ্গীত, লোক-কথা দিয়ে কখনও এই অনুষ্ঠানের আসরকে জমজমাট করে তুলতেন। এইভাবে শহরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের এমন একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হত যে পরবর্তী ক্ষেত্রে সংগ্রহ কার্য আরও সার্থক হয়ে উঠতো, পরস্পরের চেনা জানার পরিধি এত বেড়ে যেত যে শিবিরশেষে ফিরে আসার পরও চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বহুদিন পর্যন্ত সংযোগ থাকতো। স্কুলের ছেলেমেয়ে তাদের নিজস্ব গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়েও দিত এবং এইভাবেই এক একটি শিবিরের দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শিক্ষণীয় ও আনন্দময় হয়ে উঠতো।

অযোধ্যা অঞ্চলের সংগ্রহ যে সমস্ত গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিলো তাদের মধ্যে অযোধ্যা, মাঝিডি, সাহেবডি, ইত্যাদি গ্রামই অন্যতম। এই গ্রামগুলি সমীক্ষা করে সেখানকার অর্ধ-আদিবাসী অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সংগ্রহ করা হয়। লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে এই অঞ্চলে সর্বাধিক সংগৃহীত হয় ঝুমুর গান। এই ঝুমুর গানগুলির মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণলীলার ঝুমুর, রাসলীলার ঝুমুর, ভারত-পালা ঝুমুর, লৌকিক ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর, দাঁড় ঝুমুর, নাচনী নাচের ঝুমুর, পাতা নাচের ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, সাঁওতালী ঝুমুর। তাছাড়া টুসুগান। অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু ছড়া ও ধাঁধা উল্লেখযোগ্য। ঝুমুর গানের আদি সুর এবং আদি রূপ বাঙালী সাঁওতাল জাতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছে, সাঁওতাল জাতিও ক্রমে বাংলা ভাষা শিখে বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর গান রচনা করেছে। লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ছাড়াও এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিকভাবে পরিচিত হয়। পুরুলিয়া থেকে কিছু দূরে নিমডি গ্রামে একটি সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ছৌ-নৃত্য দেখা হয় সারা রাত জেগে। পরের দিন পুরুলিয়ার অনতিদূরের একটি গ্রামে গাজন পরব ও চরকের মেলা দেখতে যাওয়া হয়। এ ছাড়া বহু মন্দির, দেবস্থান, গেরাম দেবতার থান ঘুরে ঘুরে দেখা হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র লোক-সাহিত্যই নয়, লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও রীতির সঙ্গে পরিচিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

হাতীবাড়ীর [ঝাড়গ্রাম মহকুমা] লোকসাহিত্য সংগ্রহশিবির

CENTRAL LIBRARY

কুইলাপালে মেয়েলী গীতসংগ্রহ

CENTRAL LIBRARY

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় গ্রামসমীক্ষা ও সংগ্রহশিবির স্থাপিত হয় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে। এই শিবিরেরও পরিচালক ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। যে সব বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এই শিবিরের সমীক্ষা ও সংগ্রহ কাজে অংশ গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা সেবার ২৫ জন ছিল। বাঁকুড়া থেকে ঝিলিমিলির পথ ধরে অনেক পথ অতিক্রম করে ও অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে, শালবনের বুক চিরে বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে পৌঁছুতে হবে ঝিলিমিলির পাহাড়ী প্রান্তে। এখান থেকে সোজা চলে গেছে রাস্তা বাঁকুড়ার সীমান্ত পার হয়ে ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে উঁচু নীচু জমির প্রান্ত ধরে সোজা বাঁশপাহাড়ীতে। বাঁকুড়া জেলা অতিক্রম করে আলের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে পথটি যে অখ্যাত গ্রামটিতে এসে মিলেছে তারই নাম বাঁশপাহাড়ী। পুরুলিয়ার ও অযোধ্যা পাহাড়ের মতই এটিও একটি বনজনপদ (**Forest village**), এটি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। এই গ্রামটির একদিকে বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি, অন্যদিকে পুরুলিয়া ও অনতিদূরে বিহারের সীমান্ত অঞ্চল। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রান্তবর্তী গ্রাম বাঁশপাহাড়ী, চারদিকে ঘন অবিচ্ছিন্ন শাল-মহুয়ার জঙ্গল, দূরে-দূরে অনুচ্চ পাহাড়। এখানকার মাটি রুক্ষ কঠোর গৈরিকবর্ণ। লালমাটি আর মহুয়ার রঙে এক নূতনবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে বাঁশপাহাড়ীর মাটিতে, তা না গৈরিক না লাল। রুক্ষমাটির সঙ্গে সংগ্রাম করে এদের জীবিকা। প্রধানতঃ কৃষিকর্মই বাঁশপাহাড়ীর অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করেছে। জমি অত্যন্ত রুক্ষ কঠোর, কাঁকর আর পাথরে ভরা। উঁচুডাঙা জমি, জলসেচের বন্দোবস্ত খুবই অল্প। দু একটা বাঁধ আছে, কিন্তু তা সংখ্যায় অতি অল্প। তাই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অগ্নিতাপে শালের আর মহুয়ার পাতাগুলো যখন ছারখার হয়ে যায়, লালকাঁকুরে মাটি তপ্ত হয়ে যখন অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে, তখন বাঁশপাহাড়ীর আকাশে বাতাসে বৃষ্টির জন্য করুণ আর্তনাদ। লাল কাঁকুরে-পাথুরে মাটি ফেটে চৌচির। উত্তপ্ত রোদের উজ্জ্বল শিখাগুলো যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে পাথুরে মাটির উপর। আদিবাসী যুবক যুবতী, গ্রাম্য মানুষ হাট থেকে ফেরার পথে উত্তপ্ত রোদের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে।

তারপর পর পর আসে করম উৎসব, টুসু পরব, গাজন। সেই উৎসবে গানে নাচে মেতে ওঠে বাঁশপাহাড়ীর সরল গ্রাম্যমানুষের দল। বাঁশপাহাড়ীর মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ ও সমস্যা থাকলেও সমস্ত বছর ধরে এই সব উৎসব আনন্দে তারা গান বাঁধে, গান গায়, গান শোনায়। মাটি তাদের রুক্ষ ; কিন্তু এই রুক্ষ মাটিতেই সবুজ লাল আর মহুয়ার সমারোহ। জীবনও তাই রুক্ষ কঠোর হলেও জীবন-রসিক এই মানুষের দল তাদের জীবনকে কখনও নীরস হতে দেয়নি। মহুয়ার ফুল যেমন রসে ভরপুর ঠিক তেমনিই তাদের জীবনে খরা অনাবৃষ্টি, অনাহার আর দারিদ্র্য চিরসঙ্গী হলেও মনের মাটিকে তারা পালে-পার্বণে, উৎসবে-কথায়, কাহিনীতে, ছড়ায় ও ধাঁধায়, প্রবাদ ও প্রবচনে মুখর করে রেখেছে। বাঁশপাহাড়ীর লোক-সাহিত্য এ অঞ্চলের মানুষের সরস মনের সবুজ সৃষ্টি। বাঁশপাহাড়ীকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াজেলার যে সমস্ত গ্রাম থেকে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করা হয়েছিলো তার মধ্যে বাঁশপাহাড়ী, পচাপানি, ভীমার্জুন, কাঁঠালিয়া ইত্যাদি গ্রামগুলি অন্যতম। বাঁশপাহাড়ীতে সংগ্রহের মধ্যে বিভিন্নশ্রেণীর লোকগীতিই প্রধান। এর মধ্যে বিভিন্ন ঝুমুরের এক বিপুল সংগ্রহ ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া পাতানাচের, কাঠিনাচের গান, করমগীত, ঢেঁকির গান, বাউল, দেহতত্ত্ব, টুসু, ভাদু গান, গাজনের গান উল্লেখযোগ্য। পচাপানি গ্রামের একজন অশীতিপর বৃদ্ধ হনু মুড়ার নিকট থেকে মুণ্ডা ভাষা এবং বাংলাভাষা মিশ্রিত বহু ঝুমুর পদ যেমন পাওয়া গেছে, ঠিক তেমনি হারাধন পরামানিক নামক এক গ্রাম্য গায়কের কাছ থেকেও প্রচুর পরিমাণে ঝুমুর গান সংগৃহীত হয়েছে। এ দু-ধরণের সংগ্রহ

CENTRAL LIBRARY

পাশাপাশি উপস্থিত করলেই আদিবাসী ও গ্রাম্য নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে কিভাবে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছে সেটি লক্ষ্য করা যাবে।

বাঁশপাহাড়ীতে অবস্থান করে দু একটি ছৌ-নৃত্য অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীরা অবলোকন করে। বিশেষ করে ঐ গ্রামে 'রামায়ণ' এর একটি সম্পূর্ণ পালা ছৌ-নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছৌ-নৃত্য শিল্পীরা যারা জাতে মুণ্ডা-শ্রেণীর তারা এমন কৌশল ও সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করেন যে শহরাগত ছাত্রছাত্রীর দল বিশেষভাবে চমৎকৃত হয়। একটি অপরিচিত গ্রাম্য পরিবেশে একদল অজ্ঞাত গ্রামশিল্পীর মধ্যে যে এমন নৃত্যকুশলতা সম্ভবপর, তা দেখে বাঙলা-দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির বিশালতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে। ঐ বাঁশ-পাহাড়ী গ্রামেই তখন চলছে গাজনের উৎসব। সমস্ত গ্রামীণ মানুষই এই উৎসবে মত্ত। নাচ-গান পূজা মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। কয়েকদিন শহরাগত ছাত্রছাত্রীর দলও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে লৌকিক উৎসবের রূপ ও রীতি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগের লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের তৃতীয় শিবির পুনরায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বনজনপদ বাঁশপাহাড়ীতে স্থাপিত হয়। অন্যান্যবারের মতই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবিরাধ্যক্ষ হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের রীতি-নীতি শিক্ষাদান করেন এবং লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে সহরে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেন। এই সংগ্রহে যে সব বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সমীক্ষা ও সংগ্রহ কার্যে অংশগ্রহণ করেন তাদের সংখ্যাও প্রায় পঁচিশ জন ছিল। দ্বিতীয়বার বাঁশপাহাড়ীতে শিবিরের স্থান নির্বাচনের কতকগুলি কারণ ছিল। শিবিরাধ্যক্ষ মনে করেছিলেন, প্রথমতঃ বাঁশপাহাড়ী একটি সীমান্ত গ্রাম; পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রান্তবর্তী সংযোগস্থল। ফলে বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক মানস এই অঞ্চলে মিশ্রিত হয়ে এক উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন লৌকিক মানস গড়ে উঠেছে। কারণ, এটা বেশ বোঝা গেছে, যে-অঞ্চলে জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত, মিশ্রণ যত বেশী হবে সে অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির উপাদানগুলিও ততবেশীই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ কোন একটি স্থানে প্রথম শিবির স্থাপনের পর সে গ্রামগুলির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে পরিচয় ও যোগসূত্র গড়ে ওঠে তার ফলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার সে স্থানে গেলে নানা সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ আরো অধিক পরিমাণে সম্ভবপর হয়। কারণ, প্রথম শিবির স্থাপনের পর গ্রামগুলির সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও গ্রামবাসীর সঙ্গে পরিচয় খুব সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না। যখন পারস্পরিক সংযোগ ক্রমশঃ গড়ে উঠতে আরম্ভ হয়, তখনই শিবির সমাপ্ত হবার সময় উপস্থিত হয়। সুতরাং দ্বিতীয়বার সেখানে শিবির স্থাপন করলে সংগ্রহ ও সমীক্ষাকার্য অনেক সহজসাধ্য এবং দ্রুত সম্ভবপর হয়। তৃতীয়তঃ বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলটিতে প্রথমবার সংগ্রহ করে এটা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছিলো যে পশ্চিম সীমান্তের এই অঞ্চলটি লোকসঙ্গীতের এক অনন্ত ভাণ্ডার। রুক্ষ, কঠোর পর্বতসঙ্কুল, গৈরিকবর্ণ এই অঞ্চলটি যে লোকসঙ্গীতে এত সমৃদ্ধ ইতিপূর্বে বোঝা যায়নি। পুরুলিয়ার অযোধ্যা অঞ্চলে বহু লোকসঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছিলো বটে, তার অধিকাংশই আদিবাসী ঝুমুরের এই বাংলা রূপ মাত্র। কিন্তু এখানেই সর্বপ্রথম ঝুমুরগানের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সার্থকভাবে অনুভব করা যায়। এমন কি, এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বহু ঝুমুরগানের সঙ্গে বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু পদের সাদৃশ্য ও মিশ্রণ লক্ষ্য করা গেছে। বাঁশপাহাড়ী থেকে বাঁকুড়ার ছাতনা অর্থাৎ চণ্ডীদাসের লীলাভূমি বেশী দূরে নয়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র দ্বিতীয় পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও এই অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত অসংখ্য ঝুমুরগানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু পদের

CENTRAL LIBRARY

মিশ্রণ ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং এর থেকে একটি সিদ্ধান্ত শিবিরাধ্যক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের মনে এসেছে যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদগুলি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনার পূর্বে এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত ঝুমুরগানের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে চণ্ডীদাস সেগুলি পালার আকারে বিধিবদ্ধভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'রূপে একটি কাব্যাকারে উপস্থিত করেছেন।

এখান থেকে সংগৃহীত আরো অনেক ঝুমুর পদে এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। এমন কি, ১৯৬৫ সালের বেলপাহাড়ী অঞ্চলে স্থাপিত শিবিরে সংগৃহীত ঝুমুর গানেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এইসব কারণে দ্বিতীয়বার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে শিবির স্থাপন করে সংগ্রহের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে ঝুমুর গান, করম গান, টুসু গান, পাতা ও নাচনী গান, খেমটা গান, ঢেঁকির গান, গাজনের গান, দেহতত্ত্বমূলক ছুয়াগান, এ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলি যদি সংগ্রহ না করা হোত তাহলে বাংলার মৌখিক সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধতর সম্পদ চিরকাল অজানাই থেকে যেত। সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলি যদি সমস্তই প্রকাশ সম্ভব হয় তাহলে বাঙলাদেশের লোক এই ভেবে বিস্মিত হবে যে বাঙলাদেশের কয়েকটি অঞ্চল থেকেই যদি এরূপ সমৃদ্ধ সংগ্রহ হয়ে থাকে তাহলে এই বিরাট বাঙলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ অভিযান চালালে বাঙলাদেশের মৌখিক সাহিত্যের যে কি বিরাট অজ্ঞাত ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হবে তার সীমা পরিসীমা নেই। এ ছাড়াও দ্বিতীয় বাঁশপাহাড়ী শিবির থেকে প্রচুর পরিমাণে ধাঁধা, ছড়া ও লোক-কথাও সংগৃহীত হয়।

১৯৬৫ সনে মেদিনীপুর জিলার বেলপাহাড়ীতে অনুরূপ সংগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়। শিবিরাধ্যক্ষরূপে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং কুড়িজন ছাত্রছাত্রী তাতে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য বৎসরের মত তাতেও লোক-সাহিত্যের নানা বিষয় সংগৃহীত হয়।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতিবাড়ী অঞ্চলে শিবির স্থাপন হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের মত এই শিবিরেরও অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। যে সমস্ত বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের সংখ্যা ছিল ২০ জন। এই শিবিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই প্রথম লোক-কথার এক বিরাট সংগ্রহ এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়। এই লোক-কথাগুলির বিষয় বৈচিত্র্য ও অভিপ্রায় (Motif) গুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

হাতিবাড়ী গ্রাম এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বিহারের সিংভূম-এর সীমান্তবর্তী বহু গ্রাম এই অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একদিকে অনতিউচ্চ পাহাড় আর শালবন, অপরদিকে সুবর্ণরেখা নদী এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-পরিপূর্ণ করে তুলেছে। প্রকৃতির বিভিন্নতার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংযোগসাধনে এই অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির ভাণ্ডারটি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে।

অন্যান্যবারের মত এবারকার সংগ্রহেও চারিটি দল করা হলো সমীক্ষা ও সংগ্রহকার্যের সুবিধার জন্য। বিভিন্ন বিভাগগুলি বিভিন্নদিক থেকে এক একটি গ্রামের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। প্রত্যেক গৃহে গিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে। সংগ্রহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সুবিধামত ক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে লোক-কথা, ছড়া, গান, ধাঁধা ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের গীত অনেক লোকসঙ্গীত 'টেপ-রেকর্ডারে' তুলে নেওয়া হয়। যে সমস্ত গ্রামে এই শিবিরের সংগ্রহ কার্য পরিচালিত হয় সেই গ্রামগুলির নাম যথাক্রমে মেদিনীপুর জেলার হাতিবাড়ী, দহমুণ্ডাগ্রাম, সিংভূমের ডোমজুড়ি, উড়িষ্যার ঝাড়াপাড়া।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা বিহার উড়িষ্যার সংযোগস্থলে হাতিবাড়ী অঞ্চল। 'ক' বিভাগ প্রধানতঃ ডোমজুড়ি ও ঝাড়াপাড়া গ্রামদুটিতে সংগ্রহকার্য চালিয়েছিল। এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে সংগ্রহ করতে গিয়ে যেটা সবচেয়ে চোখে পড়েছে তা হচ্ছে এখানকার সব অধিবাসীদের উপর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মিশ্রিত প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্র রচনা করেছে।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্য থেকে যে বিপুল পরিমাণ লোক-সাহিত্য সংগ্রহ হয়েছিলো তা বিস্ময়কর। এই সংগ্রহের মধ্যে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি প্রায় একশতের অধিক সংগৃহীত হয়েছিলো। আমাদের শিবিরাধ্যক্ষ প্রথম সান্ধ্যআসরে সংগৃহীত লোককথাগুলির বিষয়বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন বাংলাদেশের লোককথাগুলি তার মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা থেকে যে এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি তার সার্থক প্রমাণ পাওয়া গেল হাতিবাড়ী অঞ্চলে এসে। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, লালবিহারী দে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি সংগ্রাহকদের রূপকথা, উপকথার সংগ্রহের বাইরে বুঝি লোককথার আর অস্তিত্ব নেই, শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝি লোকমানস থেকে অন্তর্হিত হয়েগেছে। হাতিবাড়ীর সন্নিহিত গ্রামগুলিতে সংগৃহীত লোককথাগুলির বিষয় বৈচিত্র্য ও অভিপ্রায়সমূহ (Motif) একথার প্রমাণ করেছে বাঙলাদেশের গ্রামাভ্যন্তরে আজও লোককথার ধারাগুলি অব্যাহত গতিতে লোকমানসে জীবন্তভাবে মৌখিক ধারায় প্রবহমান।

১৯৬৭ সালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগের লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি দল নিয়ে একটি সংগ্রহ শিবির স্থাপিত হয় পুরুলিয়া জেলার কুইলাপালে। এই সংগ্রহ শিবিরে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কুইলাপালে এবারকার সংগ্রহ শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে যেয়ে শিবিরাধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোকশ্রুতি'—কুইলাপাল বিবাহগীতি সংগ্রহ সংখ্যা (১৯৬৭)-য় যা বলেছেন, সেটি উপস্থিত করলে কুইলাপাল স্থান নির্বাচনের ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কৃত হবে।

'পুরুলিয়া জিলার একটি গণ্ডগ্রাম কুইলাপাল। এইখানে আমাদের সংগ্রহশিবির স্থাপন করিবার একটি কারণ এই ছিল যে, পুরুলিয়া জিলার পূর্বাংশে বিভিন্নগ্রাম হইতে যখন আমরা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করি, তখন অধিকাংশ গায়কের গানেই কুইলাপাল হাটে যাইবার আশা প্রকাশ করিতে শুনিতে পাইতাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর গান শুনিতে শুনিতে একবার স্থির করিলাম, কুইলাপাল হাটে কি ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা নিজের চোখে দেখিতে হইবে। কিন্তু স্থানটি কোথায়, কিভাবে আমাদের সংগ্রহ কার্য সেখানে চলিতে পারে, সেখানকার অধিবাসীদের পরিচয়ই বা কি, তাহা আমরা এখনও কিছু জানি না। কিন্তু নামটি আমাদের সকলের মনেই এমন একটি মোহ সৃষ্টি করিল যে, কিছুতেই তাহার প্রভাব হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম না। তারপর কুইলাপালের পথঘাট জানিয়া শুনিয়া একদিন কয়েকজন সভ্যসভ্যা তাহার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বাঁকুড়া হইতে ৫০ মাইল ঝিলিমিলি পর্যন্ত গিয়া সেখান হইতে দুই মাইল পায়ে হাঁটার পথ। এতদিন মনে করিয়াছিলাম, কুইলাপালের হাট বাংলার লোকসঙ্গীতের তীর্থ-ক্ষেত্র। মনে মনে তাহার সম্পর্কে একটি রঙিন স্বপ্ন গড়িয়াছিল। কারণ অসংখ্য গানে কুইলাপালের হাটে গিয়া চুড়ি কিনিয়া হাতে পরিবার কথা, মাকড়ি কিনিয়া কানে দুলাইবার কথা, ফিতা কিনিয়া চুলে বাঁধিবার কথা শুনিতে শুনিতে তাহার সম্পর্কে এমনি একটা ধারণা হইয়াছিল। সেইজন্য হাটের দিনটি বাছিয়া লইয়াই আমরা কুইলাপালের পথে যাত্রা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে সত্যসত্যই দেখিলাম, অসংখ্য গ্রামবাসী হাটে যাইতেছে, কাহারও মাথায় বোঝা, কাহারও কাঁধে বাঁক, কাহারও হাতে ঝোলা। সকলেই

CENTRAL LIBRARY

কুইলাপালের হাটের পথে চলিয়াছে। হাট যত কাছে আসিতে লাগিল, হাটে যাইবার লোকের সংখ্যা তত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অসংখ্য নরনারীর কণ্ঠস্বর একসঙ্গে মিলিয়া এক বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছে, সেই রাগিণী স্পষ্ট নহে, অথচ গম্ভীর; নদীর কলতানের মত স্পষ্ট নহে, মহাসমুদ্রের মত গম্ভীর অথচ অস্পষ্ট। হাটের সেই রাগিণী যে না শুনিয়াছে, সে ইহা বুঝিতে পারিবে না। লোকসঙ্গীত একজন গাহে, কিংবা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গাহে, কিন্তু ইহাতে জনতার কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। আমাদের পাঠক-পাঠিকাদিগকে হাত ধরিয়া সেই জনতার মধ্যে লইয়া গেলাম। আমাদের সভ্যসভ্যাগণ এইভাবে বিভাগে বিভক্ত হইয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল।'

কুইলাপালকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার গ্রামগুলিতে সমীক্ষাকার্য পরিচালিত হয়েছিলো তার মধ্যে কুইলাপাল, নূতনডি, ঘেড়িয়াড়ি, বাঁশডিহা, লাইলামডি, পাহাড়পুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কুইলাপালের জনজীবনে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির স্পষ্ট মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব, অন্যদিকে লৌকিক ও আদিম মানসিকতা। একদিক দিয়ে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ অন্যদিকে লৌকিক আচার আচারণ ও জীবনরীতির সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছে কুইলাপালের জনজীবনে। তাই কুইলাপালে নানাধর্মীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক রীতির সুন্দর সমন্বয় সাধন হয়েছে; ইন্দ্রপূজা, ভেজাবিঁধা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে এর সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে। ইন্দ্রপূজার একদিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আবার অন্যদিকে গ্রামের আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুও অংশগ্রহণ করে। এভাবে উৎসবগুলিকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা গেছে যে কুইলাপালের উৎসব, পূজাপার্বণ ইত্যাদিতে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করেছে, বৈষ্ণবের কীর্তনগানের আসর বসেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা মুরগী এবং পাঁঠাও বলি হয়েছে। এই শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ, জীবনরীতি ও লৌকিক জীবনধারার সমন্বয়ে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক মানস এখানে গড়ে উঠেছে। কুইলাপাল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোকগীতি, রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা, পুরাকথা, ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচনে এরই স্বাক্ষর যে বিদ্যমান লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রামসমীক্ষায় এই জিনিষগুলিই বার বার চোখে পড়েছে।

এই গ্রাম থেকে আমাদের সংগৃহীত গানগুলোর মধ্যে খেমটা গান, টুসু গান, ঝুমুর গান, ছৌনাচের গান, লোককথা ২২টি। খেমটা গানের শেষে পদকর্তা 'পরেশ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যার নিকট থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করে পরেশ নামক ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। পরেশ নামটি মুখ পরম্পরায় তাদের কাছে এসে পৌঁচেছে মাত্র। সাঁওতালী গ্রাম হলেও তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙ্গালী সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাই তাদের মধ্যে পাওয়া গেল এক সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারা। যেমন পাতা পরবের গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাতা পরবের গান বলতে তারা শিবপূজোর গান বলে থাকে। অথচ পাতা পরব একটি লৌকিক উৎসব, শিবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু শিবের প্রভাব কেবলমাত্র তাদের সাংস্কৃতিক জগতেই সীমাবদ্ধ—ধর্মীয় জীবনে তার প্রভাব নেই। তারা শিব ও শ্যামার নাম করে সত্য, কিন্তু শ্যামা ও শিবের পূজো তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গ্রামের প্রতিবাসী গ্রাম হিসাবে প্রতিবাসী বর্ণহিন্দুর আনুষ্ঠানিক গানগুলো মুখ পরম্পরায় তাদের বিস্তার লাভ করেছে মাত্র। গ্রামগুলি আয়তনে যত ছোটই হোক না কেন, লোকসংস্কৃতি, যথা লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোককথা, ছড়া, ধাঁধা এবং লোককথায় পরিপূর্ণ। এখানে শিক্ষার অভাবটি বারে বারে মনে হয়েছে। শিক্ষার অপ্রসারতার দরুণ বাঁশডিহা গ্রামঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই উদাসীনতাকে দূর করে তাদের সচেতন করতে পারলে—কালের বিবর্তনকে তারা অক্ষুন্ন

CENTRAL LIBRARY

রাখতে সমর্থ হবে, তাদের ঐতিহ্যকে গ্রাম্য সম্পদের অস্তিত্বকে পৌঁছে দেবে যুগান্তরের পথে। কুইলাপাল সংগ্রহ শিবিরের সংগ্রহগুলি ছিল বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বিবিধ লোকগীতি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা সমস্ত কিছুই এ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কুইলাপালে যে সমস্ত বিবাহ-গীতি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ।

১৯৬৭ সালের মে মাসে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার হাতিবাড়ী অঞ্চলে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গ্রামসমীক্ষা ও সংগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যই এই শিবিরের শিবিরাধ্যক্ষ হন এবং সমগ্র সমীক্ষা ও সংগ্রহ কার্যটি পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়বার এই সংগ্রহ শিবিরের স্থান নির্বাচন হাতিবাড়ী হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল যে ১৯৬৬ সালে ঐ অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ লোককথা ও ধাঁধা সংগৃহীত হয়েছিল এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা আরো অধিক সংগ্রহ সম্ভাবনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই হাতিবাড়ীতে দ্বিতীয়বার সংগ্রহ কার্য পরিচালিত হয় এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকার দরুণ, ১৯৬৬ সালের হাতিবাড়ী সংগ্রহ শিবিরের সভ্যসভ্যারা গ্রামবাসীর সঙ্গে যে ভাবে যোগস্থাপন করেছিলো তার ফলেই এইবার ১৯৬৭ সালের মে মাসের শিবিরে ছাত্রছাত্রী দ্বারা আরো বিপুল পরিমাণে রূপকথা, উপকথা, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকগীতি, সংগৃহীত হয়। কয়েকটি সংগৃহীত লোক-সাহিত্যের উপকরণ উপস্থিত করলে ঐ অঞ্চলে দ্বিতীয় বার সমীক্ষায় ও সংগ্রহকার্যের যে বিভিন্ন ধরণের বিষয় আহৃত হয়েছিলো তার বৈচিত্র্যও যে কতদূর ছিল তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হাতিবাড়ীর দ্বিতীয়বার সংগ্রহ শিবিরের সংগৃহীত বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপকথা, উপকথার প্রাচুর্যও যেমন ছিল, তেমনিই ছিল ধাঁধা সংগ্রহের প্রাচুর্য। হাতিবাড়ীর সন্নিহিত অঞ্চলে বিহার, উড়িষ্যার সীমান্তে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী ভোমজুড়ি, দহমুণ্ডা, ঝাড়াপাড়া গ্রামগুলিতে অসংখ্য বিচিত্র ধরণের ধাঁধা সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলির রূপ ও রীতি আশ্চর্যজনক-ভাবে বিস্ময়কর। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার এই যে অংশ বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে সংলগ্ন এখানে ধাঁধাকে বলে 'ঢক'। কোন কোন অঞ্চলে ধাঁধাকে 'রাতকথা' বা 'রাতকাহিনী'ও বলে। পুরুলিয়া জেলার কোন কোন অংশে ধাঁধাকে 'দাঁতকথা'ও বলা হয়।

১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার অন্তর্গত মাঠা নামক বন-জনপদ (Forest Village)-এ গ্রাম সমীক্ষা ও সংগ্রহকার্যের শিবির স্থাপিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই সংগ্রহ শিবির পরিচালিত হয়। এই সংগ্রহকার্যে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মাঠা অঞ্চলে গ্রামসমীক্ষা ও সংগ্রহশিবির স্থাপনের কারণ ও মাঠা অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে শিবিরাধ্যক্ষ 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডের 'গ্রামসমীক্ষা সংখ্যা'য় বলেছিলেন,[৩০] 'পশ্চিমসীমান্ত বাংলার যে অংশ অরণ্য ও প্রস্তরময় এবং ছোটনাগপুরের যে অংশ পশ্চিমবাংলার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেই অঞ্চলে কতকগুলি এমন গ্রাম গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে সরকারী ভাষায় বনজনপদ অর্থাৎ Forest Village বলা হয়। এই গ্রামগুলি সংরক্ষিত অরণ্য কিংবা পর্বতের উপত্যকায় অবস্থিত। উপত্যকার সমতল অংশে যে সামান্য চাষাবাদ হয় তার সূত্রেই সেখানে জনবসতি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামগুলি বনবিভাগের শ্রমিকের প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বন-শ্রমিকের দ্বারা গঠিত। সেজন্যে এদের মধ্যে কোন সামাজিক সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। সেকারণে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এই শ্রেণীর গ্রামগুলি চরম অধঃপতিত। এদের মধ্যে সাধারণতঃ কোন যৌথ সামাজিক অনুষ্ঠান হয়না, উৎসব কিংবা ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যেও সামাজিক কোনও ঔৎসুক্য সৃষ্টি হতে পারে না। আর এক শ্রেণীর বনজনপদ পশ্চিমসীমান্ত বাংলার কোন কোন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তাদের চরিত্র একটু স্বতন্ত্র। বিগত

৩০ লোকশ্রুতি, ৪র্থ সংখ্যা, গ্রামসমীক্ষা সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৭৮, পৃঃ ১৪৬

CENTRAL LIBRARY

শতাব্দী থেকেই ইংরেজ সরকার বনসম্পদ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে যাযাবর জাতিগুলির কৃষিকর্মে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছিলেন। অরণ্যভূমিতে যাযাবর বৃত্তি আইনগত নিষিদ্ধ হবার পর তারা গ্রাম ও নগরের উপকণ্ঠে সাময়িক আশ্রয় নির্মাণ করে তাতেই সাময়িকভাবে বাস আরম্ভ করে। পুরুলিয়া জেলার মাঠা এমনই একটি বনজনপদ। এতে বনবিভাগের একটি রেষ্ট হাউস আছে, সেই সূত্রেই এখানে একটি ডাকঘর আছে, ডাকঘরের নাম মাঠা-ফরেষ্ট বা মাঠা-বন-জনপদ। তবে বনজনপদ বলতে যা বুঝায় বর্তমানে মাঠাগ্রাম আর তা নয়। তবে একথা সত্য মাঠাপুর্বে বনজনপদ ছিল, বর্তমানেও এর বিস্তৃত অংশই বনভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর চারদিকেই সরকারী সংরক্ষিত বনভূমি। সেই সূত্রে এখানে যে বনজনপদ গড়ে উঠেছিলো, কালক্রমে বাইরে থেকে এর সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে কৃষিভূমির আকর্ষণে পর্যায়ক্রমে বিভিন্নজাতির লোক এসে বসবাস করেছে, তাদের বংশধরদের মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, তাদের সঙ্গে পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জন-সমাজের বিবাহ এবং অন্যান্য সূত্রে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, এদের সাংস্কৃতিক জীবনেও এর বিশেষ একটি রূপ আজ আত্মপ্রকাশ করে তা ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বনজনপদগুলি যখন এভাবে কোন উপায়ে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে, তখন তার সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে পরিপুষ্টি দেখা দেয়, কিন্তু যদি এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকটি ধরে ফেলে তবে এর বিনাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মাঠা বনজনপদ যে পথটি ধরেছিল, তাতে তার বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে।

মাঠা এবং তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর অধিবাসিগণ দু পুরুষের আগে কেউ আসেনি, সকলেই এ অঞ্চলে নবাগত। পূর্বে এ অঞ্চলে কোন উপজাতির লোক বাস করতো। মাঠা গ্রামে পথের এক পাশে একটি উন্মুক্ত স্থানে একটি স্মৃতিশিলা (**Menheir**) দেখে এ কথাই মনে হয় দ্রাবিড় ভাষাভাষী ওরাওঁ জাতির কোন এক জাতি এখানে একদিন বসবাস করতো। কোন কারণে তাদের বিশেষ চিহ্ন এতে নাই, কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজন প্রাচীন অধিবাসীর নামের পদবীর মধ্যে ওরাওঁ কথাটি এখনও শুনতে পাওয়া যায়। বিভিন্নশ্রেণীর লোকদ্বারা এ অঞ্চলের জন-সমাজ গঠিত হয়েছে, সেজন্য এই গ্রামে একই প্রকৃতির সাংস্কৃতিক উপকরণের পরিবর্তে বিচিত্রশ্রেণীর উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। তবে সবই যে পুরুলিয়া জেলার কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকেই এসেছে, তা নয়। এর এক উল্লেখযোগ্য অংশ আদিবাসীর সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করে এক নূতন রূপ লাভ করেছে। গানের সুর, রূপকথা, উপকথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকথা (**Myth**) ইত্যাদির মধ্যে এই প্রভাব সর্বাধিক অনুভব করা যায়। অন্যত্র পুরুলিয়ার সংস্কৃতিই এখানে সাধারণভাবে বিস্তার লাভ করেছে বলেই মনে হয়। উপরোক্ত বিশ্লেষণটি সার্থকভাবে প্রমাণিত হয়েছে গ্রামসমীক্ষায় এবং সংগ্রহকার্যে।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম সংগ্রহ শিবির দ্বিতীয়বারের জন্য পুরুলিয়া জিলার বাগমুণ্ডি থানার অন্তর্গত মাঠা বনজনপদে স্থাপিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শিবিরের শিবিরাধ্যক্ষ হন এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৫ জন সদস্য এই সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

মাঠা বনজনপদটি একটি গ্রামদেবতা (**Village-God**)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে—তার ধর্ম, আচার বিশ্বাস, নৃত্যগীত, উৎসব ও পূজাপার্বণ সমস্ত কিছুই। এই দেবতাটির নাম মাঠা বুরু (**Hill-God**) বা পর্বত-দেবতা। মাঠা বুরু অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। এখানকার অনেক বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে এই দেবতাটি জড়িত। প্রচলিত আছে যে পৌষসংক্রান্তির দিনে নিশারাত্রে জল এনে দেবতার জন্যে ভাত রান্না হয় নূতন হাঁড়িতে এবং বাখর (নেশা) দিয়ে রাখা হয়। মলমাসের ১লা তারিখে মাঠাবুরুর পূজা হয়। অর্জুন সিং লায়া বলেছে, 'ভোরবেলায় পূজার যোগাড় করতে হবে। চালের গুঁড়ি দিয়ে পুকুরের জলে তিনটা পিঠা সিদ্ধ করতে হবে। তারপর 'ছড়ুম

CENTRAL LIBRARY

চিড়া' (হাতে তৈরী চিড়া) দিয়ে ও ভাত বেড়ে এক মনে আহ্বান করা হবে ঐনার থানে। মাটির ভাঁড়ে সিঁদুর দিয়ে গুড়ি মাখিয়ে পিঠা তিনটি সাজান করা হয়। আর একটি ডালাতে নানাদ্রব্য সাজিয়ে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হয়। গ্রামের সবলোকই এভাবে পূজা দেয়। প্রথমে পাহান (লায়া) পূজা করে পরে ব্রাহ্মণ।' এই মাঠাবুরু কে কেন্দ্র করে মাঘ মাসে যে মেলা হয় তারপর থেকেই শুরু হয় নানা উৎসব মেলা পালা পার্বণ নাচ গান। ফলে সারাবছরই এই অঞ্চলে লৌকিক সাহিত্যের রসে ভরপুর থাকে। তাই এই অঞ্চলের সংগ্রহের ভাণ্ডার প্রতিবারই বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই বছরের শিবিরে কতকগুলি বিশেষ দুর্লভ সংগ্রহ সংগৃহীত হয়েছিলো যার মধ্যে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত একটি বৃহৎ 'বিবাহমূলক' ধাঁধা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এই বৃহৎ বিবাহের আচারমূলক ধাঁধাটি মৎ কর্তৃক হরিডি গ্রামের একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাতোর নিকট থেকে সংগৃহীত হয় ১৮. ৫. ৬৯ তারিখে। প্রাচীনকালে এই আচারমূলক ধাঁধার একটি বিশেষ মূল্য ছিল। এখনও পল্লীর সামাজিক অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যখন বিবাহ, উৎসবাদিতে পুরোহিতের মন্ত্র বা যাগযজ্ঞ পূজানুষ্ঠানের প্রয়োজন হত না সে সময়ে এ ধরনের আচারমূলক ধাঁধার একটি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজ গ্রামীণ লৌকিক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুপ্রবেশ লাভ করায় লৌকিক আচার রীতিনীতির অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচারমূলক ধাঁধা ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু এর ধারা আজও যে বাংলার গ্রাম্য জনজীবন থেকে একবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি তার একটি দুর্লভ নিদর্শন মাঠা শিবির থেকেই সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত যে দুটি বৃহদাকার 'আচারমূলক' ধাঁধা সংগৃহীত হয়েছে এই 'বিবাহ ধাঁধাটি' তারই অন্যতম। এছাড়া এবারের সংগ্রহে কয়েকটি পুরাকথা বা Myth এবং প্রবাদ পাওয়া গেছে।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বাঁকুড়া শালতোড়া থানার অন্তর্গত পাহাড়ী অঞ্চল মুরুলু গ্রামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বঙ্গভাষা বিভাগের লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষা ও সংগ্রহশিবির স্থাপিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শিবিরের অধ্যক্ষ থেকে সমগ্র শিবিরটি পরিচালনা করেন। এই শিবিরে যে সব বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন তাদের সংখ্যা ছিল ২০ জন।

মুরুলু গ্রামটির পশ্চিমে পুরুলিয়ার মারবেদা গ্রাম, পূর্বে বাঁকুড়ার ঝনকা ও আড়াডাং গ্রাম, উত্তরে উদয়পুর ও লক্ষ্মীপুর গ্রাম, দক্ষিণে সুকনিবাসা গ্রাম ও পরে পুরুলিয়া জেলার ঘোড়ামুরগা গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ শতের কাছাকাছি। গ্রামের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ষাটজনই মাঝি সাঁওতাল, কুড়িভাগ কুমোর, আর বাকি মাহাতো, পরামাণিক, মাল, গোয়ালা, কলু, মুচি, ডোম, বাউরী শ্রেণীর লোক। চাষবাস ও টালির কাজই এ অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা। সরস্বতী পুজো এখানকার প্রধান উৎসব। গাজনের পাটা আছে, চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা হয় ২।৩ দিন। ৯ই মাঘ এখানে মাঝি বা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের 'নাগর দোলা পরব' নামে একটি পরব হয়, পরবটি চড়কের একটি আদিরূপ বলে মনে হয়। নাগরদোলা থানে চড়কের মত ঘুরপাক খায়, কাঁটাঝাপ করে। বাণ ফোঁড়ে। গাছের নীচে মাটির বেদীতে দেবস্থান, ঘোড়া দিয়ে সাজান থাকে। পুরুষরা পূজা করে। পাঁঠা, মুরগী, পায়রা বলি হয়। সকলে নাচগান করে। সাঁওতালি ঝুমুরের আসর বসে। দক্ষিণে মুরুলু পাহাড়, উত্তরে পাঁচড়া পাহাড় পশ্চিমে টুটির ডুংরির জঙ্গল। এরই মাঝে মুরলু গ্রাম লোকসংস্কৃতির একটি সার্থক পীঠস্থান। এই গ্রামে চার পাঁচ দিন ধরে যে শিবির অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুরলু, ঝনকা, শালতোড় ইত্যাদি গ্রামগুলিতে অজস্র উচ্চশ্রেণীর রূপকথা, উপকথা, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ও লোকগীতি সংগৃহীত হয়। মুরলু গ্রামটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সমগ্র গ্রামটি আবালবৃদ্ধবনিতা লোক-সাহিত্যের একটি জীবন্ত মৌখিক ঐতিহ্য (Living Oral Tradition) কে বহন করে নিয়ে চলেছে।

CENTRAL LIBRARY

আমাদের বঙ্গভাষা বিভাগের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের দশমবর্ষ পূর্তি হবার পরও এই একাদশ শিবিরের সংগ্রহ করতে করতে একথাই বারবার মনে হয়েছে বাংলাদেশের লোকমানসটি কি বিপুল পরিমাণে সমৃদ্ধ। সংগ্রহের সূচনায় ১৯৬২ সালে প্রথম শিবির অযোধ্যা পাহাড়ের শিবিরে মনে হয়েছিলো যে এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধাদ্বার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় বাংলার লোক-সাহিত্য বাংলার লোকমানস থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। আধুনিক শিক্ষা বুঝি অল্পবয়স্ক মানুষের কাছে লৌকিক সাহিত্যগুলি স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখার অন্তরায় সৃষ্টি করবে, কিন্তু ১৯৭১ সালের মুকলু গ্রামে একদিন শিবিরে সংগ্রহ করতে করতে একথা মনে হয়েছে বাংলার এই লোকসাহিত্যের মৃত্যু নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহ-শিবির থেকে যে উপকরণ সংগৃহীত হয় তা অবলম্বন করে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের রচনা ও সম্পাদনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

১। বাংলার লোক-সাহিত্য ১ম খণ্ড—আলোচনা (প্রকাশক—কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭৩, পৃ. ৯০০)

২। বাংলার লোক-সাহিত্য ২য় খণ্ড—ছড়া (প্রকাশক—ঐ, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ. ৭৩০)

৩। বাংলার লোক-সাহিত্য ৩য় খণ্ড—গীত ও নৃত্য (পরিবেশক ঐ, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪, পৃ. ৮১৬)

৪। বাংলার লোক-সাহিত্য ৪র্থ খণ্ড—কথা (প্রকাশক—কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৭২০)

৫। বাংলার লোক-সাহিত্য ৫ম খণ্ড—ধাঁধা (প্রকাশক—ঐ, প্রথম সংস্করণ ১৯৭১, পৃ. ৬৪৮)

৬। বাংলার লোক-সাহিত্য ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রবাদ (প্রকাশক—দে'জ পাব্লিশিং, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৭২, পৃ. ৬৫৬)

৭। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (**Encyclopaedia of Bengali Folksong**) প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ লোক-সাহিত্য গবেষণা পরিষদ্, কলিকাতা-৩৪, ১ম খণ্ড, ১৯৬৬, পৃ. ৫১২, ২য় খণ্ড, ১৯৬৬, পৃ. ৫১২, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৭, পৃ. ৫১২, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৭, পৃ. ৫১২

৮। বাংলার লোক-সঙ্গীত (বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, কলিকাতা-১৯ প্রকাশিত, হরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক স্বরলিপি সহ) ১ম খণ্ড ১৯৬২, ২য় খণ্ড ১৯৬৩, ৩য় খণ্ড ১৯৬৩, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৫, ৫ম খণ্ড ১৯৬৬

৯। লোক-শ্রুতি (ত্রৈমাসিক পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ্ প্রকাশিত, ১৯৬৭-৬৮)

১০। *Chhau Dance of Purulia* (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) ১৯৭২

লোক-সংস্কৃতির উপকরণ আবিষ্কার

লোকনৃত্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সমৃদ্ধতম লোক-সংস্কৃতির উপকরণ একথা প্রমাণিত হয়েছে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের *Chhau Dance of Purulia* গ্রন্থ প্রকাশের পর। লোকসাহিত্যের উপকরণ সন্ধানে পশ্চিম সীমান্ত বাঙলায় ভ্রমণকালে ডঃ ভট্টাচার্য পুরুলিয়া এবং তৎসন্নিহিত জেলাসমূহে বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্যের সন্ধান পান। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকনৃত্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ডঃ ভট্টাচার্য সেগুলি নিজে পরিদর্শন করে, গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে 'বঙ্গীয় লোক-নৃত্যকোষ' অধ্যায়ে সংকলন করেন। এই অধ্যায়ে তিনি প্রায় ৫৬টি নৃত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর অধিকাংশ নৃত্যই পশ্চিম সীমান্তবঙ্গ থেকে সংগৃহীত। এই সব লোকনৃত্যগুলির মধ্যে

CENTRAL LIBRARY

তিনি ছৌ-নাচের মৌলিকত্ব ও প্রাণপ্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন এবং এই নৃত্য সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানে রত হন। ১৯৬১ সাল থেকে ছৌ-নৃত্যের বিভিন্ন ধারা ও পদ্ধতি অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ছৌ-নৃত্য বাঙলাদেশের খাঁটি লোকনৃত্য যার মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যধারা 'তাণ্ডব-রীতি'র অনেক বৈশিষ্ট্য অবিকৃত অবস্থায় মিশে আছে। এ সম্পর্কে তিনি ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। প্রবন্ধপাঠে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী ১৯৬৯ সালের জুন মাসে বাঙলার ছৌ-নৃত্য দলকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানান, ডঃ ভট্টাচার্যের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ এই নৃত্য দিল্লীর শিল্প-রসিকমহলে এক বিশেষ আলোড়ন তোলে। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী ছৌ-নৃত্য শিল্পীদের বৃত্তিদানের সহায়তা করেন। ১৯৭২ সালের মে-জুলাই মাসে ডঃ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ছৌ-নৃত্যের একটি দল পশ্চিম ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও স্পেন প্রভৃতি দেশ পর্যটন করে এবং বিদেশী দর্শক ও সংবাদপত্র দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। ১৯৭২ এর নভেম্বর মাসে আবার ছৌ-নৃত্যের ডাক পড়ে আন্তর্জাতিক মেলা এশিয়া ৭২-র অঙ্গনে এবং ১৯৭৩এর ২৬শে জানুয়ারীর—**All India Folk Dance Festival**-এ। এই ছৌ-নৃত্য ভারতের অন্যান্য নৃত্যাদির সঙ্গে প্রতিযন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ডঃ ভট্টাচার্য দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। সুতরাং এই দশবছরে কেবল লোকসাহিত্যের উপকরণ আবিষ্কারেই নয়, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান আবিষ্কারেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কম নয়—সেকথা অনায়াসেই বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গের একটি নৃত্যপদ্ধতির ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পিছনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই অনন্য সাধারণ প্রচেষ্টা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

CENTRAL LIBRARY

লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবদান

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আবেগোষ্ণ ঐতিহ্যানুরাগ এবং বিজ্ঞানঘনিষ্ঠ মনন চর্চা ও গবেষণা-অনুশীলনের সম্মিলিত সজ্ঞলতায় বিষয় হিসাবে স্বাধিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতির* নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতা নিঃসন্দেহে আধুনিককালের শিক্ষাপ্রয়াসের সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। অবশ্য লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে এ সত্য প্রায় সতত উদ্ঘাটিত যে Formalised Folklore ও Materialised Folklore-এর সামগ্রিক উপকরণে লোকসংস্কৃতির বিষয়ানুবন্ধন অত্যন্ত জটিল এবং সঠিক জ্ঞানানুবন্ধনে তার শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন অত্যন্ত দুরূহ। বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির interdisciplinary character তথা পরস্পরাশ্রয়ী চরিত্রই সম্ভবত এ সমস্যার মূল। তথাপি লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের যথার্থতা বিশেষ অর্থে একান্তরূপেই শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও শিক্ষানুসারী অধ্যয়ন-অনুশীলনের মুখাপেক্ষী। জ্ঞানচর্চার বহু বিস্তৃতি ও বিষয়গত জটিলতার জন্য জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় বিভাগীয় বিভাজন অনিবার্য। আধুনিক বিশ্বে জ্ঞানের বিস্তৃতি এত অধিক যে একজনের পক্ষে বহুবিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানার্জন যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমন বিষয়ান্তরে সুগভীর পরিক্রমাও সুকঠিন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বিভাজন ও বিষয়ানুসারী মনন-প্রয়াস ক্রমপ্রাধান্য লাভ করে—যদিও তা অনিবার্যভাবেই প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যাকে অঙ্গীকার করে নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বিষয় ভিন্নতর শাখাজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তরূপে অনুশীলিত হলেও ক্রমান্বয়ে বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে তাকে স্বকীয় কক্ষপথে সংস্থাপিত হতে হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাক্রমে যে কোন অধীতব্য বিষয়েরই স্বরূপ লক্ষণ বিশ্লেষণে স্বকীয় পরিধি ও শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন প্রাথমিক কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়, যদিও প্রায়শই জ্ঞাতিবিদ্যা তথা allied discipline-এর সংস্পর্শজনিত জটিলতায় এবিষয়ে অনেকক্ষেত্রে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি উদ্ভূত হয়। জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বিষয়হিসাবে প্রবীণ না হলেও, লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিতর্ক সম্ভবতঃ সর্বাধিক। শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতির বিষয় ও অনুশীলন পদ্ধতি উভয় দিক থেকেই বিতর্কের অবকাশ বিস্তৃত, কেননা যুগপৎ উভয়দিক থেকেই লোকসংস্কৃতির বহুবৈচিত্র্য ও জটিলতা বর্তমান—

> **'The teaching of Folklore is definitely impeded by the extreme diversity of both the materials of folklore and the method of studying these materials.'**

ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত উৎসাহ উদ্যোগ ক্রমবর্ধমান হলেও তার শিক্ষাগত শৃঙ্খলাসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান অদ্যাপি হয়েছে বলে দাবী করা যায় না। জন্মলগ্ন থেকেই (Folklore 1846) শব্দটির তাৎপর্য এবং তার বিষয় পরিধি, শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও সংজ্ঞাপ্রকরণ সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রপাত। Folklore শব্দটি উদ্ভাবনের পূর্বে বংশানুক্রমে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা-বিশ্বাস বোঝাতে ইংরাজী ভাষায় 'Popular Antiquities' শব্দটি ব্যবহৃত হত। টিউটনিক ভাষাভাষী দেশ, বিশেষত জর্মানীতে প্রায় অনুরূপ অর্থে 'Volks Kunde' শব্দটি ব্যবহৃত

* Folklore শব্দের কোন সর্বজনস্বীকৃত ভারতীয় প্রতিশব্দ অদ্যাপি স্থির হয় নি। বর্তমান লেখক Folklore-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকশ্রুতি' শব্দ চয়ন করলেও ব্যবহারিক সার্থকতা ও প্রচলনগত সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণভাবে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী।

CENTRAL LIBRARY

হত, যা প্রাচীন প্রথা অতিরিক্ত লোকশিল্পকলা ইত্যাদিকেও নির্দেশ করত। ক্রমান্বয়ে নানাবিধ উত্থান-পতন ও বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপক অর্থে—লোকসাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য, ক্রীড়া, কৌতুক, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য লোকসংস্কৃতির বিষয় পরিধি সম্পর্কে সকলেই যে একমত এমন বলা যায় না। বিশেষতঃ অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতি বলতে অলিখিত মৌখিক ধারার সাহিত্য —'verbal art' কেই নির্দেশ করে থাকেন। ফোকলোর শব্দটি কালক্রমে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুসারী ব্যবহারে বহুঅর্থের দ্যোতক হয়ে উঠেছে এবং বিষয় পরিধি ও উদ্দেশ্যমুখীনতার বিভিন্নতায় প্রাথমিকভাবে ফোকলোরের শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপনে বহুবিধ জটিলতা দেখা দিয়েছে। অবশ্য পঠন-পাঠন পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতিযে বিশেষ-ভাবে—নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-সাহিত্য-শিল্পরসতত্ত্ব-ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিত—এবিষয়ে সকলেই একমত। লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের allied discipline বা জ্ঞাতিবিদ্যা হিসাবে এই সমুদয় বিষয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানানুশীলনের কলা ও বিজ্ঞান উভয় শাখাশ্রয়ী শাস্ত্র হিসাবেই লোকসংস্কৃতি বিবেচ্য এবং এইসূত্রেই লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা অনুধাবন কঠিন। বিশেষজ্ঞের ভাষায়—

> 'Folklore's necessary liasons with departments of literature on the one hand and departments of social science on the other make it difficult to survey the discipline with any degree of detail.'

লোকসংস্কৃতি জন্মসূত্রে লোকায়ত জীবনাশ্রয়ী। লোকসংস্কৃতির ধারায় যে বস্তুসমূহ সংরক্ষিত হয় সেগুলি নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ, বুদ্ধিহীন বিকার, শিশুভোলানো গাল-গল্প বা স্থূলবিলাস কলা নয়, সেগুলি পূর্ববর্তীযুগের জীবন-যাপন ও জীবন সংগ্রামের এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক, এবং অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব ও রসধারার প্রতিরূপ। এইজন্যই সমাজ-জীবন ও লোকমানসের অভিব্যক্তির স্বরূপ লোকসংস্কৃতি সমগ্র সমাজপরিবেশ ও বস্তুবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। তাই জাতীয় মানসের স্বরূপ সন্ধানে লোকসংস্কৃতির তাৎপর্য অনুধাবন—জাতিতত্ত্ব-কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। হারানো অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কর্ম-প্রয়াসের বহু লুপ্ত উপাদান লোকসংস্কৃতির অয়নে বিন্যস্ত থাকে। ইতিহাস পুনর্গঠনের দুরূহ কাজে লোকসংস্কৃতির পুরাতত্ত্বগত মূল্য অসীম। লোকসংস্কৃতির বহুবিধ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে যে নন্দনতত্ত্বগত প্রতিভাস তার শিল্পরস মূল্য অনস্বীকার্য। সর্বোপরি চলমান কালের প্রতিফলনে ও ব্যবহারিক প্রয়োগে লোকসংস্কৃতির যে সমসাময়িক ব্যবহারিক কার্যকর মূল্য তাও উপেক্ষণীয় নয়। মোটের উপর লোকসংস্কৃতির বিষয় বৈচিত্র্য ও তার সামাজিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক-ভাষা-তাত্ত্বিক-পুরাতাত্ত্বিক-নন্দনতাত্ত্বিক-ব্যবহারিক তাৎপর্য ইত্যাদি বহুবিধ মূল্যের পটভূমিতে লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের কলা ও সমাজবিজ্ঞানাশ্রয়ী দ্বৈত চরিত্র স্বীকৃত। ড: William R. Bascom-এর ভাষায়—

> 'The dual affiliation of folklore with the humanities on the one hand with social science on the other are well recognised.'

সাধারণভাবে পরস্পরাশ্রয়ী চরিত্রের কথা স্বীকার করেও লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের শিক্ষাগত স্বাতন্ত্র্যের কথা বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য। জ্ঞানরাজ্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে বহুবিধ বিষয়ই আধার ও আধেয়র সার্বিক চেতনায় নানাপ্রকার শাখাজ্ঞানের পর নির্ভরশীল। তথাপি শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের অনিবার্যতায় বিষয়ানুবন্ধনগত খণ্ডতা জ্ঞানানু-শীলনের বিভাগীয় পূর্ণতার জন্যই প্রয়োজন। এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নিজস্ব বিষয়ানুশীলনের সম্পূর্ণতা ও সুবিধার্থেই লোকসংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-শিল্পতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব-ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের পর নির্ভর

CENTRAL LIBRARY

করে, কিন্তু মোটেই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠে না এবং বহুবিধ জ্ঞাতিবিদ্যার সহায়ক হিসাবে সদাসক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও লোকসংস্কৃতি অন্যবিধ শাস্ত্রের মধ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে না—

'But folklore studies ethnology as an cillary to its work, and not as central to it. It uses culture pattern as a clue, not as an end. It is as interested in ethnology as it is in psychology and sociology and literature of dominant cultures, but it must not be submerged by any of these. It has a place of its own.'—F. Lee Utley

মোটের উপর শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতির বিষয়গত স্বকীয় অবস্থান অবশ্য স্বীকার্য। লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-ইতিহাস-ভাষাতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির পারস্পরিক সহায়তা কোন অবস্থাতেই লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করে না। জ্ঞানানুশীলনের উচ্চপর্যায়ে অধীত বিষয়মাত্রই একান্তরূপে স্বকীয় শৃঙ্খলাভিত্তিক হয়েও allied discip'ine তথা পার্শ্বজ্ঞানের মুখাপেক্ষী—এ সত্য শিক্ষাক্রমের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কেও অনুরূপভাবে প্রযোজ্য। তাই বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিত হলেও লোকসংস্কৃতির যে বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান একথা অনস্বীকার্য।

প্রায় অধিকাংশ শিক্ষাগত বিষয়ের ন্যায় প্রাথমিক স্তরে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের কোন স্বতন্ত্র শিক্ষানুসারী সচেতন প্রয়াস বা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছিল না। অধিকন্তু লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাথমিক পর্যায় ছিল Mac Edward Leach-এর ভাষায় 'gentleman's amature activity' তথা ভদ্রসমাজের সৌখীন কর্মপ্রয়াস মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে অবশ্য প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব ইত্যাদির অনুষঙ্গেই লোকসংস্কৃতিচর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। একথা সত্য ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-নৃতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক-নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতার পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতি অনুশীলন বিধেয়, অন্যথায় লোকসংস্কৃতি চর্চা বিজ্ঞানবিরোধী পরিপ্রেক্ষিতহীন প্রয়াসে পর্যবসিত হয় এবং লোকসংস্কৃতি অন্বেষা অন্তিমে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। তথাপি এ সত্যও সতত স্মর্তব্য যে লোকসংস্কৃতি উপরোক্ত বিষয়গুলির কোন শাখারই একান্তর্গত নয়, কমবেশী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে একান্তরূপেই স্বতন্ত্র। Tristram potter coffin-এর ভাষায় প্রায়শঃ ভুলরূপে বিবেচিত হবার ক্ষেত্র 'often misunderstood field'—হলেও লোকসংস্কৃতি শতাধিক বৎসরে পরীক্ষিত একটি নবোদ্ভূত জটিল বিষয়। অতীতে নৃতত্ত্ব-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-সাহিত্য-রসতত্ত্ব ইত্যাদির অন্তর্গত বিষয় হিসাবে অনুশীলিত হলেও বর্তমানে লোকসংস্কৃতি প্রধানতঃ কোন মূল বিজ্ঞান বা কলাশাখার উপশাখা মাত্র নয়—নিজেই একটি পূর্ণায়ত শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের বিজ্ঞাননিষ্ঠ অনুশীলনের জন্য—নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য-শিল্পরসশাস্ত্র প্রভৃতি প্রায় সর্বপ্রকার আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের সজ্ঞান সহায়তা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীতেই লোকসংস্কৃতি ভিন্নতর জ্ঞাতিবিদ্যার সংশ্লিষ্ট হয়েও স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়—

'In the twentieth century, folklore as an educational discipline comes finally into its own.' 'Complex interdisciplinary character' তথা জটিল পরস্পরাশ্রয়ী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও শতাধিক বৎসরের পথপরিক্রমায়, আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রমে, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে লোকসংস্কৃতি স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় কমবেশী সুপ্রতিষ্ঠ একটি স্বতন্ত্র অধীতব্য বিষয়।

শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন যেকালে আন্তর্জাতিক শিক্ষাজগতের প্রায় সর্বস্বীকৃত ঘটনা, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের পটভূমিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, বিশেষতঃ কলিকাতা

CENTRAL LIBRARY

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে 'লোকসাহিত্যের' অন্তর্ভুক্তি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়েই সাধারণত একটি বিষয় জীবন্ত হয়ে ওঠে। লোক-সংস্কৃতির শিক্ষাক্রমের বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় ডঃ ডরসন বলেছেন—

> 'The future of Folklore study in the United States rests on its penetration into lecture halls and classrooms. In England little vestige remains today of the great burst of folklore enthusiasm that was kindled seventy-five years ago, and the reason seems to be that folklore never gained entry into the Universities, as did, say, anthropology.'

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ডঃ ডরসনের উপরোক্ত মন্তব্য মূলত আমেরিকা ও ইংলণ্ডের লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের পটভূমিতে গঠিত হলেও, এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির বিকাশ যে বহুলাংশে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির অনিবার্যতায় লগ্ন এই সাধারণ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সূত্রে স্বভাবতই বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ঐতিহাসিক ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রধানতঃ ইউরোপীয় মিশনারী, ভ্রমণকারী, রাজকর্মচারী, সামরিক কর্মচারী, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্, ভারততত্ত্ববিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্, ভাষাতত্ত্ববিদ্, প্রভৃতির উদ্যোগে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য দেশীয় মনীষিদের প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় অগ্রগতি ঘটে, যা কালক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত প্রচেষ্টায় সুসংহতি লাভ করেছে বলা যায়। ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা ও লোকসংস্কৃতি উজ্জীবনের ইতিহাস পরিক্রমার কালসীমায় প্রধানতঃ চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয়—

১। সূচনাকাল থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ জার্নাল অব রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশ পর্যন্ত কালসীমা

২। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও তার মুখপত্র প্রকাশ পর্যন্ত কালসীমা

৩। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত কালসীমা

৪। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পরবর্তী স্বাধীনতা-উত্তর কালসীমা

উপরোক্ত চারটি স্তরের কালসীমায় লোকসংস্কৃতি চর্চার বস্তুগত ও গুণগত সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসকে যথাক্রমে চারটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়—

১। ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব

২। প্রাথমিক সংহতির পর্ব

৩। জাতীয় উদ্যোগের পর্ব

৪। শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক মন্ততার পর্ব

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কালসীমা ও পর্বনামের রেখাচিত্রে প্রকাশ করা যায়:

CENTRAL LIBRARY

স্তর	কালসীমা	পর্বনাম
১	সূচনাকাল থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব
২	১৮৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	প্রাথমিক সংহতির পর্ব
৩	১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	জাতীয় উদ্যোগের পর্ব
৪	১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী কাল	শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক মন্ত্রতার পর্ব

কালানুক্রমিক ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্তুভিত্তিক বিবর্তনের স্তরানুসারে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি সর্বপ্রধান—

প্রতিষ্ঠান

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | বিশ্বভারতী

দেশীবিদেশী মনীষিগণের বিক্ষিপ্ত লোকসংস্কৃতি প্রয়াস প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে সংহতি লাভ করে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যচর্চার অনুষঙ্গে লোকসংস্কৃতি অনুশীলন প্রধানতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবলম্বন করে বহু ব্যাপকতা লাভ করে। পরাধীন ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সম্ভবতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে ভারতীয় ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতি অনুশীলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষা বিভাগের পত্তন হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম প্রাদেশিক ভাষাকে স্নাতকোত্তর বিভাগে পঠনপাঠনের বিষয়রূপে গ্রহণ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের পত্তনের কাল থেকেই লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চা নানারূপে স্থান করে নিয়েছে। বাংলা লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ প্রধানতঃ ষড়মুখী—সংগঠিত রূপে উপকরণ সংগ্রহ, সংগৃহীত উপকরণাদি সংরক্ষণ ও প্রকাশ ব্যবস্থা, লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা ও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা, বাংলা লোকসাহিত্যের গ্রন্থবিশেষের পাঠ্যতালিকাভুক্তি, শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় পাঠ্যক্রমের বিষয় হিসাবে সমগ্ররূপে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ও লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত বিবিধ প্রয়াসের নিম্নলিখিত রেখাচিত্র অঙ্কন করা যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১	২	৩	৪	৫	৬

[১] সংগঠিতরূপে উপকরণ সংগ্রহ [২] সংগৃহীত উপকরণাদি সংরক্ষণ ও প্রকাশ ব্যবস্থা [৩] লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা ও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা [৪] বাংলা লোকসাহিত্য গ্রন্থবিশেষের পাঠ্যতালিকাভুক্তি [৫] শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় পাঠ্যক্রমের বিষয় হিসাবে সমগ্ররূপে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষেত্রানুসন্ধান [৬] লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণা

CENTRAL LIBRARY

মোটের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাথমিক প্রয়াস সুসংহত হয়েছে এবং কালক্রমে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সুবিন্যস্ত হয়েছে ক্রমপ্রসারী শিক্ষাগত শৃঙ্খলায়। বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের পেছনে যতটা জাতীয় ঐতিহ্য চেতনা ও শিল্পরসগত আকর্ষণ সক্রিয় ছিল সম্ভবতঃ ততটা আধুনিক বিষয়ানুসারী বৈজ্ঞানিক মনস্কতা বা শিক্ষাগত শৃঙ্খলাবোধ সক্রিয় ছিলনা। লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রমসম্প্রসারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ঐতিহ্যমণ্ডিত পঞ্চাশ বৎসরের জীবনের বহুমুখী কর্মধারার অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় স্নাতকোত্তর স্তরে 'লোকসাহিত্য' পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পত্তন হয়, আর ১৯৬০-৬২ খৃষ্টাব্দে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম লোকসাহিত্য পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তির পশ্চাতে স্বভাবতই তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহৃদয় সম্মতি ও অনুমোদন ছিল। তবে এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপর তিনটি নাম, সম্ভবতঃ প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—তদানীন্তন ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। মোটের উপর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উদ্যোগে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় স্নাতকোত্তর স্তরে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ও পাঠ্যক্রমের প্রবর্তনার ঐতিহাসিক নেতৃত্ব মুখ্যতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই দিয়েছে, যেমন দিয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাকে স্নাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমানা পেরিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমন স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যক্রমে লোক-সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায়। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা কিংবা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহের পঠন-পাঠনের সঙ্গে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির পাঠ্যক্রম প্রবর্তনা সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির পাঠ্যক্রম অনুসরণ ও উচ্চতর গবেষণা প্রবর্তনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব সতত সক্রিয়। এদিক থেকে সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ও গবেষণা সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে তার মধ্যে—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রধান।

শুধু মাত্র পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে নয়, লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চার আধুনিক রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকসংস্কৃতি চর্চার আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান দিক ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্ম তথা **field-work**. লোকসংস্কৃতি-সংক্রান্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্যে ক্ষেত্রানুসন্ধান শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে তাই নয়, ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্ম ও সরেজমিন গবেষণা ব্যতিরেকে লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মপ্রয়াস কার্যতঃ ব্যর্থ হয়ে যায়। লোকসংস্কৃতি গবেষণায় সংরক্ষক, গ্রন্থাগার গবেষক ও বিশ্লেষকের

CENTRAL LIBRARY

স্থান মূল্যবান হলেও, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ক্ষেত্রগবেষক যার প্রচেষ্টা ভিন্ন লোকসংস্কৃতি গবেষণাকর্ম পরিচালনা অসম্ভব। Kenneth S. Goldstein-এর ভাষায়—

> 'Archivists, library researchers, and analysts all have their importance in furthering the aims of folklore scholarship, but most important are the field workers who harvest the crop of folklore materials and data without which the others would be unable to carry on their work.'

প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্মের মধ্য দিয়েই লোকসংস্কৃতিগত জিজ্ঞাসা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং শিক্ষাগত অন্বেষা লক্ষ্যাভিমুখী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ও লোকসংস্কৃতিবিদ্ Melville J. Herskovits এর ভাষায়—

> 'Once in the field, we found a lively interest in our problem and a desire to help us achieve our aims.'

এদিক থেকে ক্ষেত্রানুসন্ধানের ক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লোকসাহিত্য বিশেষ পত্রের প্রথম বৎসরের ছাত্র হিসাবে মনে আছে লোকাচার্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য অনুশীলনের পূর্ণতা প্রদানে তৎপর হয়ে প্রথম বৎসরেই কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে field-work তথা ক্ষেত্র জরিপের ব্যবস্থার প্রবর্তনা করেছিলেন। তারপর থেকে ক্ষেত্রানুসন্ধানের ঐ ব্যবস্থা নিয়মে-অনিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানের ব্যবস্থার ফলে লোকসাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীগণ যেমন একদিকে লোকসংস্কৃতির উপযুক্ত ছাত্র হয়ে ওঠার সুযোগ পান, তেমন অন্যদিকে চার দেওয়ালের রুদ্ধতার দূরে গ্রাম-বাংলার উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে লুপ্তপ্রায় বহু মূল্যবান উপাদান-উপকরণ সংগ্রহে নিজেদের নিষ্ঠাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে উল্লেখ করা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্মের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান লেখকও অধ্যাপনা জীবনে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরশ্রেণীর লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের নিয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্ম পরিচালনা করেছেন এবং সরেজমিন গবেষণায় পল্লীবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকসংস্কৃতির বিপুল উপকরণ সংগ্রহে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর উদ্যোগও স্মরণীয়। field-work বা ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্ম অদ্যাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসূচকের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাক্রান্ত উদ্যোগ যে সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করেছে, আশা করা যায় তা কালক্রমে শিক্ষাক্রমের অনিবার্য অঙ্গরূপে ক্ষেত্রানুসন্ধানের স্থানকে সুচিহ্নিত করবে।

প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই—'লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি' পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, লোকসাহিত্য পাঠ্যক্রমের অঙ্গহিসাবে ক্ষেত্র জরিপ (field-work), গ্রাম সমীক্ষা (village survey), লোকসংস্কৃতির পশ্চাৎভূমির সঙ্গে পরিচয় (relation to folklore hinterland) স্থাপন, এবং লোকসংস্কৃতির উপকরণাদি সংগ্রহ-সংরক্ষণ-উচ্চতর গবেষণা ইত্যাদি শুরু হয়েছে। লোকসাহিত্যের এই সমুদয় কার্য-কলাপের মধ্যে ক্রমশ জাতীয় চেতনা-স্বাজাত্যবোধ অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বিকশিত হয়েছে এবং উচ্চতর গবেষণায় লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির সাহিত্য-শিল্পরসগত রসাস্বাদের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক মূল্যায়ন প্রয়াস প্রসারতা লাভ করেছে।

CENTRAL LIBRARY

পাশ্চাত্যদেশে লোকসংস্কৃতি শাস্ত্র শিক্ষানুশীলনের ক্ষেত্রে শতাধিক বৎসরে পরীক্ষিত এবং নিজস্ব ইতিহাস ও বিকাশের গৌরবময় ঐতিহ্যে কমবেশী সুপ্রতিষ্ঠ একটি স্বতন্ত্র পঠন-পাঠনের বিদ্যায়তনিক বিষয়। পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতি প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। তাছাড়া সাম্প্রতিক লোকসংস্কৃতি প্রয়াসও সর্বত্র পরিণত প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠার স্বাক্ষর বহন করে এমন দাবী করা যায় না। তথাপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতঃ বাংলাবিভাগের প্রাথমিক উদ্যোগে বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির আত্মপ্রসারের যে প্রচেষ্টা তা আত্মানুসন্ধানে যথাযথ সার্থক হয়ে উঠবে এ আশা নিতান্ত অমূলক নয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনাময় পথেই সাধারণতঃ নিরাশ্রয়ের নির্দায় শিথিলতা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিষয় সম্মানিত শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে—এটাই সাধারণ সত্য। এই প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির আন্তর্জাতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় নিমগ্ন ডঃ ডরসন ইংলণ্ডে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে লোকসংস্কৃতির বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার যে তথ্য উল্লেখ করেছেন তা স্মরণীয়—

> **'A major problem lies in the failure of Folklore studies to attain academic recognition at Oxford, Cambridge, the red brick Universities, or even the University of London, where the Society's library is housed. Hence the dearth of academic scholars, old or young, of founds for archives and field trips, of concerted intellectual effort. In the generation of Lang the private scholar possessed vigour enough, but *it is a fact of contemporary life that any solid field of learning needs University Sponsorship.*'**
>
> **—R. M. Dorson**

এই দিক থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন ও বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতায় লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও উচ্চতর গবেষণা প্রবর্তনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় ভবিষ্যৎকে সূচিহ্নিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগ 'লোকসাহিত্য'র শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ অনুশীলনচর্চার ক্ষেত্রে যে প্রাথমিক উদ্যোগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে, শতসীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার অন্তর্লীন সজীব প্রেরণা পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও নিরন্তর অনুশীলনের সক্রিয়তায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠনের স্বতন্ত্র সামগ্রিক বিষয় হিসাবে Folklore তথা লোকসংস্কৃতির স্বকৃতিকে অনিবার্য করে তুলবে এই আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়। আশা করা যায় শিক্ষামনস্কতার একাগ্রতার এই পথেই (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শিত পথেই) ইতঃস্তত প্রসারী ব্যবসায়িক ও সৌখীন লোকসংস্কৃতি প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হবে, এবং শিক্ষাগত শৃঙ্খলার স্বকীয় কক্ষপথে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতটি প্রত্যাশিত মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হবে।

এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের আলোচনা-চক্রে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে লোকসাহিত্যকে একটি অবশ্য পাঠ্যবিষয়রূপে গ্রহণ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

CENTRAL LIBRARY

লোকসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নির্মলেন্দু ভৌমিক

উনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে স্বাদেশিকতার জোয়ার সুস্পষ্ট মূর্তি নিল। উত্তেজনার উত্তাপ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এ হল স্বাদেশিকতার স্বদেশী মূর্তি। প্রাচীন ইতিহাস চর্চার সেই হল সূত্রপাত।

কিন্তু তারও আগে ছিল বিদেশী, বিশেষতঃ ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার ধারা, যাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সরকারী কর্মচারী। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল এবং দি ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকা (১৮৭২) প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে 'ফোক-লোর' সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করে আসছিলেন।

বিদেশীদের তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসা এবং স্বদেশীদের দেশপ্রেম—এই দুই ধারা মিলে ভারতীয় গবেষণায় এক অভূতপূর্ব জোয়ারের জোর নিয়ে এল। সেই কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসারই একটি শাখা—লোকজীবন, লোক-সংস্কার, লোকসাহিত্যকে জানা। ১৮৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় দেশের মানুষকে জানার যে তত্ত্বগত ইঙ্গিত মেলে, চারবছর পরে প্রতিষ্ঠিত 'ভারতী' পত্রিকায় তা আরো ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। তারপর ১৮৯১ সনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস এবং তারপর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো সংবাদ।

দেশের মানুষকে জানার আগ্রহ থেকেই, একদিকে দেশের অভিজাত সাহিত্যের অপরদিকে অনভিজাত সাহিত্যের সম্পর্কে চর্চা হতে লাগল।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদের এই অভিজ্ঞতার ধারাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে। যতদিন না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজন উপাচার্যের শুভ-আগমন ঘটেছে, যিনি স্বদেশ ও সাহিত্যকে ভালোবাসেন, শুধু বাসেনই না, সেজন্য গর্ব ও বিক্রম প্রদর্শন করেন, ততদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনভিজাত লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা-চর্চা দূরে থাক, অভিজাত বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা বা অনুশীলনই আরম্ভ হতে পারে নি। সকলেই জানেন, স্যার আশুতোষ সেই দুঃসাধ্য কাজ করেছিলেন। ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' নামে যে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন, তাতে তিনিও বলেছেন,

> 'অনেকদিন থেকে ইংরেজী বিদ্যার খাঁচা স্থাবর ভাবে আমাদের দেশের রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সর্ব প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল।'

আশুতোষই উপাচার্য থাকাকালীন, ১৯১৩ সালে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ' গবেষণাবৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সন পর্যন্ত, পরে আবার ১৯২১ সনে তিনি উপাচার্য ছিলেন। ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রকাশের ফলে তিনি সহজেই আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯০৯ সালে দীনেশচন্দ্র 'স্পেশ্যাল ইউনিভার্সিটি রীডার' রূপে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯০৯-এর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চারমাস ধরে তিনি এই বক্তৃতা করেন। অতঃপর রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোরূপে ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সন পর্যন্ত তিনি মোট ছয়টি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলির

CENTRAL LIBRARY

বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। দেখা যাবে, বিষয়গুলিতে একদিকে যেমন অভিজাত সাহিত্যের কথা আছে (যেমন, চৈতন্য এণ্ড হিজ কম্পেনিঅনস্, চণ্ডীদাস, হিউমার ইন ওল্ড বেঙ্গল পয়েট্রি, দি বেঙ্গলি রামায়ণস্, চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ) অপরদিকে তেমনি, চতুর্থ বক্তৃতাটি ছিল অনভিজাত সাহিত্যকে নিয়ে: দি ফোক লিটারেচার ইন বেঙ্গল (১৯১৭)। দেখা যাচ্ছে, অভিজাত ও অনভিজাত দুই ধরণের সাহিত্যকেই সম-দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, এবং অনুমান করে সুখ হয়—স্যার আশুতোষের কাছ থেকেই তিনি এ বিষয়ে প্রেরণাও পেয়েছিলেন।

লোকসাহিত্যকে সেই তখন থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরম সম্মান দেওয়া হয়েছে, যখন বাঙলা সাহিত্যের অভিজাত দিকটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এবং ১৯২০ খ্রীষ্টসনে, যেবার প্রথম বাঙলায় এম. এ. পরীক্ষা নেওয়া হল, সেইবারের সিলেবাসেই লোকসাহিত্যকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। যে বইটি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হল, সেটি নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত এবং ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত 'ময়নামতীর গান'। বইটি দ্বিতীয়পত্রের অন্তর্গত হল।

এইখানে আর একটি কথা বলে নিই। রামতনু লাহিড়ী ফেলোরূপে চতুর্থ বক্তৃতায় দীনেশচন্দ্র লোক-সাহিত্যের নাম দিয়ে কেবল রূপকথার আলোচনা করলেন কেন? কেন লোকসাহিত্যের অন্যান্য দিক, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করেন নি? আমার মনে হয়—এর পেছনে একটি গভীর কারণ রয়েছে। দেখেছি, ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদের ইংরিজী-বাঙলা সব পত্রিকাতেই বাঙলার লোকসাহিত্য বলতে কেবল রূপকথারই আলোচনা হচ্ছে, রূপকথারই সঙ্কলন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার লোকসাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাতই রূপকথা দিয়ে। তারপর ছড়া। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং 'খুকুমণির ছড়া'য় যোগীন্দ্রনাথ (১৩০৬) ছড়া সঙ্কলনের সূত্রপাত করেন। ছড়া যদিও বা সঙ্কলিত হতে থাকে লোকসঙ্গীত এবং ধাঁধা ও প্রবাদের আলোচনা নামমাত্র হতে দেখি। দেখা যাচ্ছে, রূপকথাই প্রাধান্য পাচ্ছে। এর পেছনে একটি গভীর কারণ আছে।

জার্মানী থেকে ভ্রাদার গ্রীমস্-এর দুখণ্ডে পূর্ণ *Kinder-Und-Hous Marchen*, যা ১৮১২-১৫ খ্রী: মধ্যে বের হয়, ১৮৫৬ খ্রী: তার তৃতীয় সংস্করণ বের হল। বড় ভাই Wilhelm Grimm বললেন, জার্মানী থেকে এই সব গল্প ভারতবর্ষে গিয়েছে। ম্যাক্সমূলর প্রমুখ Comperative Mythologist-এর দল দেখালেন, সংস্কৃত পুরাণ ভেঙেই রূপকথার সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৫৯ খ্রী: Theodore Benfey পঞ্চতন্ত্রের যে টীকা-টিপ্পনী সহ সঙ্কলন প্রকাশ করলেন, তাতে নিঃসংশয়িত রূপে জানা গেল, ভারতই রূপকথার উৎসভূমি। তারপর N. M. Penzer তাঁর *The ocean of Story* গ্রন্থে দেখালেন, ভারতের কোন্ কোন্ গল্প বিশেষ করে সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেছে। ভারতই যখন সকল রূপকথার জন্মভূমি বলে ইউরোপীয় গবেষকের কাছে স্বীকৃতির সার্টিফিকেট পেল, তখন স্বভাবতই ভারতবাসীরূপে সকলেই গর্ব ও গৌরব বোধ করেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দীনেশচন্দ্রও করেছেন। দীনেশচন্দ্রের সম্মুখে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের সংগ্রহ কতোখানি আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে, তা একটি প্রশ্ন বটে; কিন্তু ইউরোপীয় গবেষকদের এই স্বীকৃতি যে তাঁকে রূপকথা নিয়েই আলোচনা করতে প্রণোদিত করেছিল, তার নিশ্চিত না হোক অর্ধ-নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। ১৯২০তে তাঁর *The folk literature of Bengal* প্রকাশিত হয়। তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টিরই নাম: 'The striking coincidences between some of the Bengali and European folk tales.' প্রায় ৫১টি পৃষ্ঠা তিনি এজন্য ব্যয় করেছেন। নিশ্চয়ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এজন্য সাধুবাদও অর্জন করেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

দীনেশচন্দ্র শুধু অভিজাত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সূচনাই করেন নি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্যের আলোচনার প্রবর্তনও তিনিই করেন। এবিষয়ে তিনি নানা মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—কখনও আলোচক, কখনও সঙ্কলক ও সম্পাদক। লোকসঙ্গীত-গ্রন্থের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশনা খুব সম্ভবতঃ 'গোপীচন্দ্রের গান' (১৯২২)। ১৯২৪-এ এর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ। সংগ্রাহক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, বসন্তরঞ্জন রায়, সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব গায়েনের মুখ থেকে সরাসরি এটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল, কোনো পুঁথি থেকে নয়, যা দ্বিতীয় খণ্ডে হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সামান্য গায়েনের স্মৃতিশক্তিকে এতখানি মর্যাদা দিয়েছেন, তার ফলে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের একটি বিশিষ্ট দিক—ফিল্ড রিসার্চ—তাই মর্যাদা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গোপীচাঁদের গান ইতিপূর্বে ১৮৭৮ খ্রীঃ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন : ইনি তখন রঙপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) **Song of Raja Manik Chandra** নামে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, নিজস্ব রীতিতে আর একবার প্রকাশ করা। গোপীচন্দ্রের গানের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের যোগ অতি দীর্ঘদিনের এবং নিবিড়। দীর্ঘদিন বইটি এম. এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল, মাঝখানে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকবার পর, যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্যের প্রবর্তন হয়, তখন এটি ৭ম বা বিশেষ পত্রের অঙ্গীভূত হয়। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই, একটি-দুটি করে বইটি তিন-তিনটি সংস্করণের সৌভাগ্য অর্জন করে। তৃতীয় সংস্করণটি প্রস্তুত করেন ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য (১৩৬৬), স্বর্গত আচার্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে।

দীনেশচন্দ্রের আমলে তিন জন লোকসাহিত্য সংগ্রাহক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে লোকসাহিত্য বিশেষতঃ লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতে থাকেন। এঁদের একজনের নাম চন্দ্রকুমার দে, দ্বিতীয় জন আশুতোষ চৌধুরী এবং তৃতীয় জন স্বনামখ্যাত কবি জসীমউদ্দীন। কবি জসীমউদ্দীন পুরোপুরি বেতনভোগী ছিলেন, তিনি মাইনে পেতেন ৭৫ টাকা, বছর তিনেক কাজ করেছিলেন। পরিশেষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। অপর সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে-র সহযোগিতায়, দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় : মৈমনসিংহগীতিকা—পূর্ববঙ্গগীতিকা (১ম খণ্ড-২য় সংখ্যা ১৯২৩, ২য় খণ্ড-২য় সংখ্যা ১৯২৬, ৩য় খণ্ড-২য় সংখ্যা ১৯৩০, ৪র্থ খণ্ড-২য় সংখ্যা ১৯৩১)। মৈমনসিংহগীতিকা-পূর্ববঙ্গগীতিকা বিষয়ের দিক থেকে এতই চমৎকার ও অভিনব বিবেচিত হয়েছিল যে, প্রকাশের প্রায় সমকালেই তার ইংরেজী অনুবাদ করে অবাঙ্গালী ও অভারতীয়ের কাছে তার স্বাদ পৌঁছে দিতে কলকাতা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় মনস্থ করেন। দীনেশচন্দ্রেরই সম্পাদনায় বের হল *Eastern Bengal Ballads* (Vol. I, Pt I 1923 ; Vol. II, Pt I 1926 ; Vol. III, Pt I 1928 ; Vol. IV, Pt I 1932)। মৈমনসিংহগীতিকার সঙ্গেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা এম. এ. ক্লাসের যোগ দীর্ঘ দিনের। এখন পর্যন্ত এটি তৃতীয় পত্রের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট। এই মৈমনসিংহগীতিকা শেষ পর্যন্ত যুগোশ্লাভেকিয়ার একজন বিদেশীকে আকর্ষণ করে। ইনি ডঃ Dusan Zbavitel। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়ে ইনি উপাদান সংগ্রহ করে লেখেন *Bengali Folk Ballads from Mymensing and the problem of their Authenticity*. আনন্দের কথা, ১৯৬৩ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশ করেন এবং প্রকাশিত হবা-মাত্রই বিশেষ পত্র লোকসাহিত্যের অন্যতম রেফারেন্স বই হিসেবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দীনেশচন্দ্র যে লোকসাহিত্য চর্চার শুভ সূচনা করে গেলেন, দুঃখের বিষয়, সে ধারা অকালে মরু-পথে হারিয়ে গেল। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের আমলে, ত্রিশের দশকে সামান্য দুটি-একটি কাজ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য মুহম্মদ মনসুর

CENTRAL LIBRARY

উদ্দীনের হারামণি (২ খণ্ড), ১৯৪০-এ Ph. D. ডিগ্রীর থিসিস ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults* গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ভাবে কিছু লোকসাহিত্যের আলোচনা, এবং গুরুসদয় দত্তের 'পটুয়া সঙ্গীত'। ১৯৩৯ সনে গুরুসদয় দত্ত শ্রীহট্ট থেকে শ' পাঁচেক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন প্রকাশ করবার জন্য। প্রায় ২৭ বছর পর, ১৯৬৬ সনে, বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সম্পাদনায় তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত করেন, 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' নামে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উৎসাহ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বইটি সপ্তম পত্রের রেফারেন্স হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বড়ো কাজ করেছিলেন। ১৯৬৬ সনে বিভাগীয় প্রধান হয়ে তিনি অনেক পরিবর্তন সাধন করলেন। ১৯৫৬ সনের আগেই বাঙলা সিলেবাসে দেখা গেল, ৭ম পত্রটি বিশেষ পত্র রূপে পৃথক হয়ে গেছে ; এবং যে আটটি বিষয়ের বিশেষ অধ্যয়ন করা হবে, তার মধ্যে লোকসাহিত্য একটি। সুতরাং এম. এ. ক্লাসে বিশেষ পত্রের সূচনা এবং তার পাঠ্য একটি বিষয় যে লোকসাহিত্য, সে পরিকল্পনার গৌরব ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রাপ্য। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই লীলা-বক্তৃতামালা রূপে ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মশাই 'বাঙলার বাউল' নিয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার বাউল : কাব্য ও দর্শন' (আগষ্ট ১৯৬৪) একটি উল্লেখযোগ্য বই। শিলিগুড়ি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, অধুনা শান্তিনিকেতনের ইংরিজির অধ্যাপক কালীপদ বিশ্বাস পেয়েছেন ডি. ফিল.,—*Folk-Culture of Rangpur*, এই বিষয়ে। বইটি আজও অপ্রকাশিত।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিভাগের প্রধান হন, ওই বছরই একজন লেকচারার রূপে বাঙলা বিভাগে যোগ দিলেন বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বিশেষ পত্র রূপে লোকসাহিত্য পাঠনের যে পরিকল্পনা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় করে গিয়েছিলেন তা বাস্তবে রূপ নিল ১৯৬১ সনে, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের কার্যভার গ্রহণের পর প্রায় ছ বছর বাদে। এই বিলম্বের কারণ কি ? নিশ্চয়ই পুস্তকের অভাব। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকে দিয়ে এ বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিয়ে তবে লোকসাহিত্য অধ্যয়নের শুভ-সূচনা করেন। লোকসাহিত্যের যে বিষয়গুলো ও গ্রন্থগুলো পাঠ করতে হয়, যে ভাবে দুটি অর্ধকে বিভক্ত করা হয়েছে, সবেরই পরিকল্পনা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিভাগের অধ্যক্ষ হবার পরে পরেই ১৯৫৮ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল ডঃ মতিলাল দাশ এবং শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্রের যুগ্ম সম্পাদনায় 'লালন গীতিকা', লালনশাহ ফকিরের গানের সঙ্কলন। ইতিমধ্যে ১৩৬৪ বাঙলা সালে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল. উপাধি পেল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৯৬০ সনে তা ডি. ফিল. ডিগ্রী পায়। ডঃ প্রফুল্লকুমার পালের 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' এই সময়েই প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কার্যকালে লোকসাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ দেখি না। বাঙলার লোকসাহিত্য যাঁর হাতে বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে, যিনি বাঙলার লোক-সাহিত্যকে দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত করেছেন, সেই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গে এবার আসি। লোকসাহিত্য গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি Ph. D. (১৯৫৯) ডিগ্রী পান ; ১৯৬৩ সনে তিনি গঙ্গার ধারাকে ভল্গার ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দেন সোভিয়েত দেশে বঙ্গ লোকসাহিত্যকে নিয়ে গিয়ে ; ১৯৭১ সনে ভারতীয়

CENTRAL LIBRARY

রামায়ণ সংস্কৃতির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ সংস্কৃতির ছিন্ন ও অপরিচয় যোগসূত্রটির পুনরুদ্ধার করেন; আর ১৯৭২ সনে তিনি পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকা কালেই তিনি এসব করেছেন। বাঙলার লোকসাহিত্যের প্রসারণা ও প্রচারণার জন্য এ বিষয়ে অজস্র গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ডঃ ভট্টাচার্য আর দুটি কাজ করেছেন: (১) লোকসাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের তিনি গ্রামে নিয়ে গিয়ে সংগ্রহ কাজ শিখিয়েছেন হাতে কলমে; বছর বছরই তিনি এ কাজ করেছেন; এবং লোক-সাহিত্যের প্রথম বছরের (১৯৬১) ছাত্রছাত্রীদের থেকেই এই ধারার প্রবর্তন করেছেন। এজন্য কলকাতা বিশ্ব-থেকে তিনি অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। (২) তাঁর দ্বিতীয় অবদান, গবেষণার ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যকে মর্যাদা দান। যদিও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত থেকেই এই ধারার সূচনা হয়, তথাপি ডঃ ভট্টাচার্যের হাতেই তার পুষ্টি হয়েছে। বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর কাছে লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। এইভাবে তিনি বাঙলা সাহিত্যের গবেষণার দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। তাঁর আর একটি কাজ—স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্তি। এ সব কাজের জন্য দেশের লোক তাঁকে অনেক দিন মনে রাখবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য যে সব উপায়ে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণা করে এসেছেন, এবার তা বলি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের মুখপত্র 'জার্নাল অফ দি ডিপার্টমেন্ট, অফ লেটার্স' এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আশুতোষ মিউজিয়ামে লোকশিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এবং পুথিবিভাগের গ্রন্থাগারে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান পুস্তক সংগৃহীত আছে।

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার যে ধারাটি পশ্চিম বাঙলায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, সে ধারাটিতে ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনার অভাব আছে। অথচ, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা ঢাকার বাঙলা একাডেমীর দিকে তাকালে দেখা যায় লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য সেখানে কি ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও যদি এই ধরণের কাজ করেন, তবে অনেকের সাধুবাদ অর্জন করবেন।

সর্বশেষে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। সেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক সাহিত্যের পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে। এ বিষয়ে কিছু আত্মসমালোচনা ও আত্মঅধ্যয়নের তিক্ত প্রসঙ্গ আছে। আমরা যেভাবে লোকসাহিত্য পড়াই, সেটা কতোখানি বিজ্ঞানসম্মত? আধুনিক ফোকলোর সায়েন্সের সঙ্গে তার যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। একথা সত্যি, ডঃ ভট্টাচার্য ছাত্রছাত্রীদের গ্রামের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতেকলমে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের যাবার সময় নির্দিষ্ট একটি সময়, এবং বছরের সব অনুষ্ঠানই তাই দেখা বা সংগ্রহ করা হয়ে ওঠে না। এইজন্য এক-এক বছর এক-একটি অনুষ্ঠানের সময় গ্রামে গিয়ে সংগ্রহ কাজ করলে, কয়েকবছর পর দেখা যাবে বিভাগে প্রধান লোকউৎসবগুলির বিবরণ সংগৃহীত হয়ে গেছে। মুভি ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডে তা ধরে রাখলে ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগবে।

দ্বিতীয়তঃ, লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও বড়ো দিক লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত পাঠনের সময় আমাদের অজ্ঞতার জন্য সঙ্গীতের দিকটিকে সভয়ে এড়িয়ে যাই, এবং সেই অজ্ঞতা যুগপরম্পরায় ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাউল গান পড়াচ্ছি, অথচ বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাউল গানের সুরের যে বিভিন্ন টাইপ আছে, তা সেই বিশেষ আঞ্চলিক প্রভাব দ্বারা কতখানি প্রভাবিত কদাচ তার উল্লেখ করি নে। ভাদুগান রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলিত আছে, অথচ সব অঞ্চলের ভাদুগানের সুর কি এক? তা কি ছাত্রদের জানাই?

CENTRAL LIBRARY

এখানেই উঠবে নানা কথা। শুধু লোকসঙ্গীত বলেই নয়, সমগ্রভাবে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের পাঠনের প্রসঙ্গেও প্রশ্নটি ওঠে।

একথা সত্যি, মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্য সঙ্গীত হিসেবে রচিত হলেও আমরা তাকে সাহিত্য হিসেবে পড়ি ও পড়াই। এ approch কতোখানি ভুল বা শুদ্ধ, সাহিত্য-ভারতীই তা জানেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সকল অধ্যাপকই গান জানেন না, এবং সকল ছাত্রছাত্রীই গান সম্পর্কে আগ্রহী নন। অথচ, মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্য বা লোকসঙ্গীত পাঠনের কালে সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। আমি অবশ্যই প্রস্তাব করি না, অধ্যাপক ক্লাসে গিয়ে প্রতিদিন গান গাইতে বসুন, অথবা একদিনও তিনি গান গেয়ে ফেলুন। আমি বলি, স্লাইড, মুভি ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ড-করা জিনিস মাঝে মধ্যে ক্লাসে দেখানো হোক, শেখানো হোক। অধ্যাপক বুঝিয়ে দিন। কবিতা না লিখেও আমরা যখন কবিতার সমালোচনা করতে পারি, তখন গায়ক না হয়েও কেন গান বোঝাতে পারব না? হ্যাঁ, গানের গ্রামার সকলেরই জানা থাকে না। বেশ তো, সেক্ষেত্রে যোগ্যতর অন্য কাউকে আনিয়ে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হোক। এ ব্যয়সাধ্য কিন্তু দুঃসাধ্য নয়, একটু সচেতন হলেই এ কাজ করা যেতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লোকসাহিত্যের পোষকতা করে এসেছেন বহুদিন থেকে, বহুভাবে। আমি এখানে তার একটা অসম্পূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরলাম। অনেকের নামই হয়তো বাদ পড়ে গেল, ভুলভ্রান্তির কলঙ্ক-চিহ্ন প্রবন্ধটির অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো আছে। কারো নাম বা গ্রন্থ যদি বাদ পড়ে থাকে তবে সে আমার অবজ্ঞা নয়, অজ্ঞতা; উপেক্ষা নয়, অনবধানতা।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই শুধু এ সংবাদ সুখকর নয়, এতে বাঙলা-ভাষা-ভাষী প্রতিটি মানুষই গর্ব ও আনন্দ বোধ করতে পারেন। পঞ্চাশ বছর আগে 'বিমাতা শিক্ষাগারে' ('Stepmother's hall') স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমে যেদিন মাতৃভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনের এক শুভক্ষণ। আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য পুরাতন এবং অবশ্যই গৌরবমণ্ডিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ক্ষেত্রে তার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা কিন্তু বেশী দিনের নয়। কিন্তু এই অত্যল্পকালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ মাতৃভাষার সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যে যে প্রয়াস ও সাধনা করেছে তা বিস্ময়কর। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন, কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি এই বিভাগ স্থাপনের প্রাথমিক পর্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার কামনায় যা করে গেছেন বাঙালী তা চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। নিত্যনূতন মৌলিক সৃষ্টির দ্বারা বাংলা সাহিত্য সেই চর্যাগীতিকার আমল থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে আসছে। সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও প্রয়োজন। সমালোচনা সৃষ্টির মূল্য নিরূপণ করে ও সাহিত্যের সঠিক গতিধারার নির্দেশ দেয়। আমাদের সমালোচনাকর্মের উদ্যোগ-আয়োজন সৃষ্টির তুলনায় অবশ্যই নবীন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি ও সমালোচনা—এ দুদিক থেকেই বাংলা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেছে। এই পঞ্চাশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় মাতৃভাষার সঠিক উন্নতিকল্পে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বা কর্মসম্পাদনের তরঙ্গ উঠেছে তার প্রমাণ অথবা প্রভাব চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সাহিত্যের বিভিন্ন ও বিচিত্রমুখী বিকাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যখন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হল, তখন পাঠক্রম তৈরীর সময় উপযুক্ত সমালোচনামূলক গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। সে অভাব দূরীকরণের প্রয়াস বহুদিন চলেছিল এবং বলাবাহুল্য আজ আর আমাদের তার জন্যে আক্ষেপের বিশেষ কারণ নেই। কিন্তু সেই প্রারম্ভিক লগ্নে সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের অভাব সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অবদান কতখানি তা ভেবে দেখতে ইচ্ছা করে। আর এই কারণেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ভূমিকা। একথা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগটি স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল। সে ধারাকে যাঁরা বহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনার আগ্রহ মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগেরই ফল। এগুলি পুঁথি-নির্ভর বা তথ্যের দিক থেকে নির্ভুল না হলেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অবশ্যই মূল্যবান। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার

CENTRAL LIBRARY

ধারায় এই সমস্ত লেখাগুলির মূল্য চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। বলাবাহুল্য প্রথম পুঁথিভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয় ডঃ দীনেশচন্দ্রের হাতে। কিছু পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা সুরু হলেও দীনেশচন্দ্রের কাল থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগৃহীত হয়। পরে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীতেও বাংলা পুঁথি সংগ্রহের প্রয়াস চলতে থাকে। আজও পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত আছে। পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য ও দীনেশচন্দ্রের প্রয়াসের কথা কিছু না বললে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার পত্তনকাহিনী বোঝা যাবে না। দীনেশচন্দ্রের পাত্রসায়ের নিবাসী (বাঁকুড়া জেলা) ভৃত্য রামকুমার তাঁরই নির্দেশে বহু পুঁথি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে। এই রামকুমার-ই 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রায় ৩।৪ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করে দেয়। 'বিশ্বকোষ' অফিসের এই পুঁথিগুলি দীনেশচন্দ্রের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিন হাজার টাকায় ক্রয় করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এইভাবে পুঁথিশালার সৃষ্টি হলে ঐ রামকুমার এবং অবিনাশের দ্বারাও আরও বহু পুঁথি সংগৃহীত হয়। এর অনেক পরে সাবডেপুটি সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় বীরভূম ও অন্যান্য স্থান থেকে যে সব পুঁথি সংগ্রহ করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলিও ক্রয় করেন। এভাবে আরও দেড়হাজার পুঁথি সংগৃহীত হয়ে শেষে দীনেশচন্দ্রের সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পুঁথির সংখ্যা প্রায় কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। সেই থেকে অকৃপণভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় এই পুঁথি ক্রয় করে চলেছে। পুঁথি আবিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ না হলে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে রচনা করা কঠিন। দীনেশচন্দ্র ও তৎপরবর্তীকালেই তাই পুঁথি-আশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হয়েছে।

একদিকে পুঁথি আবিষ্কার ও অন্যদিকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সেই সব জীর্ণ ও অনেকসময় অপাঠ্য হস্তলিপি পাঠের সাহায্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু নূতন নূতন উপাদান বা তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস চলেছে। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রদের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ও এই উপাদান সংগ্রহ ও ইতিহাস-রচনার জটমোচনে বরাবর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াসও উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের পরিচয় দেবার পূর্বে ঐ সব গ্রন্থ রচনার পথকে যাঁরা উন্মুক্ত করেছেন সংক্ষেপে তাঁদের কথাও স্মরণের প্রয়োজন আছে। প্রথমেই চর্যাগীতিকার পুঁথি আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা বলতে হয়। নেপাল রাজদরবার থেকে তিনটি অপভ্রংশ দোহার সঙ্গে তিনি চর্যাগীতিকার পুঁথি আবিষ্কার করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ক'রে 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'এর ভাষাকে খাঁটি বাংলা বলে সিদ্ধান্ত করেন। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতিকার একটি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার ক'রে আরও অতিরিক্ত সাড়ে তিনটী পদের সন্ধান দিয়েছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও এ বিষয়ে কিছু নূতন আলোকপাত করেছেন। মোটকথা চর্যাগীতিকা সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মণীন্দ্রমোহন বসু, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের নেপাল-তিব্বত থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি নূতন পদ অর্বাচীন বলে এখন অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে। বিদ্যাপতি সম্পর্কে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জন বীমস 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' পত্রিকায় ও পরে ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব 'মৈথিলী ক্রেষ্টোম্যাথি' পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতি সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং পরে খগেন্দ্রনাথ মিত্র

CENTRAL LIBRARY

ও বিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ প্রকাশ করেন। সতীশচন্দ্র রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছিলেন। বসন্তরঞ্জন রায়ের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পুঁথি, এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে এবং এর ফলে উদ্ভূত চণ্ডীদাস সমস্যা সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী ও কাব্য সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বসন্তরঞ্জন রায়, মণীন্দ্রমোহন বসু, স্টেপলটন সাহেব অনেক চিন্তা করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ হারাধন দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। তারপর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত করেছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে নানামুখী আলোচনার দ্বারা যাঁরা এ বিষয়ে বহু জটিলতা উন্মুক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রাধাগোবিন্দ নাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তমোনাশ দাশগুপ্ত যে আলোচনা করেছিলেন তা ছিল সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সুবিস্তৃত ও বিপুল তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। এই কাব্য সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ তিনিই জাগ্রত করেছেন বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার পালাগানগুলি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। নেত্রকোণাবাসী কবি চন্দ্রকুমার দে প্রধানত এই পালাগানগুলি সংগ্রহ করেন। কবি জসীমুদ্দিনও দু'একটি পালার সংগ্রাহক। ডঃ দীনেশচন্দ্র এই সব সংগৃহীত পালাগানগুলি সম্পাদনা করেছিলেন এবং 'গীতিকা' নাম তাঁরই প্রদত্ত। অনেকে এই গীতিকাগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেও ১৩৬৯ এর 'প্রবন্ধ' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় বিদেশী পণ্ডিত ডুসান জ্বাবিটেল এদের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ সব পালাগানের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং অনেক ত্রুটি প্রদর্শন করেছেন। বাংলাদেশের প্রচলিত ছড়া সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ডঃ সুশীলকুমার দে বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ ও তার আলোচনায় অসাধারণ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে এই সব বিক্ষিপ্ত আলোচনা ও সংগ্রহ ছাড়া এ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনায় যিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তিনি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বিপুলায়তন 'বাংলার লোকসাহিত্য' নামক গ্রন্থের ছয়টি খণ্ডে, বাংলা প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া, মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা, জারি গান, মুর্শিদা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সজ্জা এবং তার অতি গভীর রস-বিশ্লেষণ ডঃ ভট্টাচার্যের এক অসাধারণ কীর্তি। সাহিত্যের অবহেলিত এই দিকটি সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘকালীন শ্রম, গবেষণা ও সুচিন্তিত আলোচনা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁরই উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় আজ আমাদের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির গবেষণায় বহু মেধাবী ছাত্র আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং বিশ্বের দরবারেও এ শাখাটি আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে।

বাংলার বাউল গান সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথই প্রথম আকৃষ্ট করেন। রবীন্দ্রনাথের বাউল

CENTRAL LIBRARY

গান সংগ্রহের পরে ক্ষিতিমোহন সেন কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর মৌলবী মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন তাঁর 'হারামণি' গ্রন্থে এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের পুঁথি সংগ্রহ আলোচনার কাজে সবচেয়ে বেশী শ্রম স্বীকার করেছেন মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পরিচয়ও বিস্তৃত ভাবে দিয়েছেন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেনও ইসলামী সাহিত্যের বহু পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। এ সংগ্রহের কাজ সবচেয়ে বেশী হয়েছে অবশ্য বাংলাদেশে—যদিও সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আমরা এখনও পাইনি।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও প্রাচীন নাথধর্ম, সহজিয়া তত্ত্ব, শাক্ত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, চর্যাগীতির ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তাপূর্ণ মূল্যবান তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ওপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপ্রেরণায় যে গবেষণার কাজ চলছে এ প্রসঙ্গে সে কথাও স্মরণযোগ্য। ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে এবং এখনও নূতন নূতন অনালোচিত বিষয়গুলির ওপর কাজ বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হচ্ছে।

এইভাবে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার বাধাগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যাঁরা এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং করেছেন তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ খুবই নিবিড়। পূর্বে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কৃতী ছাত্র অথবা বিশ্ববিদ্যালয়-অনুপ্রাণিত। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াস সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নের ক্ষেত্রকে অনুকূল করেছে। সেইজন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন ও তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূলে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রত্যক্ষ, গৌণ বা নিগূঢ় প্রভাবের কথা বিস্মৃত হওয়া চলে না।

প্রথমেই দীনেশচন্দ্রের পূর্ববর্তী এ শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার ধারার কথা বলা দরকার। এ ধারাকে সম্যকরূপে না জানলে বিশ্ববিদ্যালয়-অনুপ্রাণিত ধারার মূল্য ঠিক বোঝা যাবে না। কিন্তু সে ধারারই বা জন্ম-ইতিহাস কি?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলতেই হবে যে উনিশ শতকে বাঙালীর বিস্ময়কর নব-জাগরণের লক্ষণ বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মগত বিরোধের প্রাথমিক উত্তেজনা মন্দীভূত হলে বাঙালী স্ব-স্থ হবার চেষ্টা করে। বাইরের সেই অতি প্রবল আঘাতের পরবর্তী পর্যায়ে জাতির আত্মসাক্ষাৎকার ঘটছিল। সেই লগ্নে পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহু শাখান্বিত প্রসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি জাতির সুপ্ত চৈতন্যের প্রাণমূলে নাড়া দিয়েছিল। আর এরই পরিণামী পর্যায়ে বিচিত্র পথে বাঙালীর জাগৃতি-চিহ্ন ফুটে উঠছিল। দেশের অতীত ঐতিহ্য ও সাহিত্য-কৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়-সাধনের আগ্রহও তাই জাতির জাগ্রত মানসিকতারই ফল। বস্তুত উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার কোনো প্রয়াসই লক্ষ্যগোচর হয়নি। মাতৃভাষার নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের আয়োজন তো দূরে থাক সহজপ্রাপ্য সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্যায়ন আকাঙ্ক্ষাও জাতির মধ্যে দেখা দেয়নি।

উনিশ শতকের কবি ঈশ্বরগুপ্তই তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ বাংলা সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের জীবনী ও তাঁদের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশে তিনিই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও পরে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর প্রায় প্রতি সংখ্যায় ইউরোপীয় রীতিতে বাংলা সাহিত্যের বিচার শুরু করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'

CENTRAL LIBRARY

(১৮৫৬ খ্রীঃ) গ্রন্থে সাহিত্যের তত্ত্ব, রূপ রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে স্বাধীন আলোচনার পথ দেখিয়েছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যের অশ্লীলতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন। এইভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্য আলোচনার একটি অতি সংকীর্ণ পথ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিল।

বাঙালী কবিদের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁদের রচিত কাব্যের চয়ন এবং বাংলা কাব্য রচনার ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'কবিচরিত' (১ম ভাগ) গ্রন্থে। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে সঙ্কলনকর্তা জানিয়েছেন—'কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বর গুপ্ত এই সাতজনের জীবনবৃত্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, এই গ্রন্থমধ্যে তাহা সন্নিবেশিত হইল।'

তিনি উপক্রমণিকায় লিখেছেন—'বাঙ্গালা কবিতার আমূল সমালোচনা করা গিয়াছে। কবিগণের লিখিত প্রবন্ধও অনেক ইহাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অশ্লীল ভাবের লেশমাত্র নাই।' হরিমোহনের মতে জীবগোস্বামীর 'কড়চা'ই বঙ্গভাষার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা, ২৬শ পল্লবের প্রমাণদৃষ্টে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে সমসাময়িক মনে করেছিলেন। প্রাচীন বঙ্গভাষার সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর, তাঁর ধারণা জীবগোস্বামী, সনাতন, রায়শেখর গোবিন্দদাস প্রভৃতি আবির্ভূত হন। তারপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হয়। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী নন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে প্রাণরামই প্রথম বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা—পরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র ঐ কাব্য লেখেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের সামান্য পরিচয় উপলক্ষে তিনি রামমোহন ও রাধামোহনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া উপক্রমণিকায় তিনি রামনিধি গুপ্ত, কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি, রঘুনাথ গোস্বামী, দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী, মধু কান, 'অনঙ্গমোহন কাব্য' রচয়িতা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির কথা বলেছেন। মধুসূদন, হরিমোহন গুপ্ত, রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ রায়, হরিশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির জীবনবৃত্ত তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে বিবৃত করবেন বলে জানিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র মিত্রের 'কবিকলাপ', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিকঙ্কণের সমালোচনা', নন্দলাল দত্তের 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' নিউপ্রেসে মুদ্রিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ সঙ্কলন' এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্র—প্রভাকর, বিবিধার্থসংগ্রহ, নব-প্রবন্ধসার, হিতসাধক প্রভৃতির সাহায্যে এই ১৮১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি লিখিত হলেও নানাদিক থেকে এটি মূল্যবান। উপক্রমণিকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিচয়টুকু সামান্য হলেও প্রথম এ-ইতিহাসের উদ্যম সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

এরপর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ) গুপ্তযন্ত্র কলকাতা-২৪ মির্জাফর্শ লেন থেকে প্রকাশিত হয়। ১০০ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির কোনো সূচীপত্র নেই—একটানা আলোচনা। পুস্তিকার 'পূর্বপীঠিকা'য় লেখক বলেছেন—'প্রায় একবৎসর অতীত হইল, 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধ 'জ্ঞানদীপিকা' সভার দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশন সময়ে মৎকর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।... এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে তাহার অনেকস্থান পরিবর্তন ও সংযোজনপূর্বক সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিলাম।... বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট,...বহু অনুসন্ধান দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বঙ্গভাষার ইতিহাসঘটিত কয়েকটি কথা লিখিত হইল।' গ্রন্থের সূচনাতেই লেখক বাংলাভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন যে হিন্দীরই অপভ্রংশে বাংলাভাষার উৎপত্তি এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের রচনাপাঠে তা প্রমাণিত হয়। তারপর

CENTRAL LIBRARY

প্রাচীন রচনা ও গ্রন্থকারদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যথাক্রমে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জীবগোস্বামী, নরহরি দাস, বৃন্দাবন দাস, শেখর রায়, সনাতন, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। কতকটা উদ্ধৃতির সাহায্যে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের কথা আলোচিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের আলোচনায় তিনি বলেছেন 'প্রকৃত গুণ ধরিয়া বিবেচনা করিলে কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের প্রথম কবি' (পৃঃ ২০)। সম্রাট আকবরের সমসাময়িক বলে কবিকে স্থির করেও তিনি তাঁর জন্মতারিখের কথা কিছু বলেন নি। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমকালীন মুকুন্দরামের কথা এবং পরে প্রথম বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা কবি প্রাণরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল'-এর তিনি উল্লেখ করেছেন। কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, আদু গোসাঞী, রামনিধি গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালংকার, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রাসু সিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে লেখক আধুনিক যুগের ঈশ্বর গুপ্ত, কেরী, মিশনারীদের দান, তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহনের কথাও কিছু বলেছেন। বঙ্গভাষার বিদ্যালয় ও বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কেও কতকটা ধারাবাহিক আলোচনা গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। পরিশিষ্টে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। পরিশিষ্টে সমকালীন অনেক লেখকেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ পুস্তক রচনায় লেখক *Calcutta Review*, *Westminister Review* এবং 'বিবিধার্থসংগ্রহ' এর সাহায্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

'কবিচরিত' ও 'বঙ্গভাষার ইতিহাস'-এর পর বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ইংরেজি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির রচনাকাল সঠিক বলা না গেলেও এর প্রকাশকাল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুচিন্তিত সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি '*The Calcutta Review*'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে তাঁর কালের ভারতবর্ষের সকল জাতির মধ্যে বাঙালীর স্থান বুদ্ধি ও চিন্তার চর্চায় সর্বোচ্চ হলেও প্রাচীনকালে বাঙালী সে গৌরবের অধিকারী ছিল না। প্রাচীন কবিদের মধ্যে জয়দেবের নামই শুধু উল্লেখযোগ্য যদিও তিনি প্রথমশ্রেণীর কবি নন। কালিদাস, মাঘ, ভারবি বা শ্রীহর্ষের সঙ্গে তুলিত হতে পারেন, এমন কোন বাঙালী কবি প্রাচীনকালে ছিলেন না। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন ও জগন্নাথ সুপণ্ডিত কিন্তু পরবর্তী-কালের। প্রাচীন বাঙালী কবিদের অনেকেরই গ্রন্থ পুরাতন, কিন্তু তাঁদের তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। প্রাচীন লিরিক কবিদের মধ্যে তিনি বিদ্যাপতির কথা উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণবকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীচৈতন্যের পবিত্র কথাই প্রধান। তিন হাজার গান-সম্বলিত একটি কীর্তনগানের সংগ্রহ-গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ছিল। তাঁর বিশ্বাস এরূপ আরও অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত রয়েছে। তাঁর সংগ্রহ-গ্রন্থের কিছু কিছু অংশের ভাষাকে তিনি প্রাচীনতম বাংলাভাষার নিদর্শন বলে মনে করেছিলেন। সে ভাষায় হিন্দির মিশ্রণ ছিল। আবার ঐ গানের এক দশমাংশকে তিনি অতি উচ্চ কবিত্বযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে বৈষ্ণব-পদসাহিত্য ও চৈতন্যদেবকে আশ্রয় ক'রে সাহিত্যের একটি ধারা এবং রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্যের আর একটি ধারা প্রাচীন সাহিত্যে বহমান ছিল। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের অনুবাদে তিনি স্বাধীন কল্পনা ও মৌলিকতার ছাপ দেখেছিলেন। এঁদের চেয়ে মুকুন্দরাম শক্তিমান হলেও তাঁর ধারণা বৈষ্ণব কবিদের চেয়ে তিনি দুর্বল।

কবিকঙ্কণের রচনা পুরাণনির্ভর। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রচিত ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছন্দের প্রশংসা ক'রেও তিনি তাঁর অশ্লীলতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে রাম বসু, হরু ঠাকুর ও নিতাই দাসের সামান্য পরিচয় দিয়ে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের সুখ্যাতি করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সন্ধিযুগের কবি। তাঁর ব্যঙ্গরচনা যে প্রথম শ্রেণীর, তাঁর সম্পাদন-কৃতিত্ব যে প্রশংসনীয় এবং তিনি যে অতিশয় জনপ্রিয় এ সব কথা বলেও তিনি তাঁকে

CENTRAL LIBRARY

উচ্চ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন কবি বলতে পারেন নি। তাঁর অশ্লীলতাকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী সাহিত্যিকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতপন্থী ও ইংরেজিপন্থী—এই দুই দলের উল্লেখ করেছেন। প্রথম দল সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করে। তাঁদের রচনায় প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, উপমাপ্রয়োগ এবং মৌলিকতাহীন মন্তব্য থাকত। বিদ্যাসাগর ছিলেন এ দলের প্রধান। অপরদলের প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে সংস্কৃত-পন্থীদের বিরুদ্ধে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই পথেই পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু এসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও মানবপ্রেমের প্রশংসা করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি লিখেছিলেন—**'Beyond translating and primer-making Vidyasagar has done nothing.'** ! মধুসূদনের উচ্চ প্রশংসা ক'রে তিনি লিখেছিলেন—**His rightful place in Bengali literature is perhaps the highest'**. মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার শক্তিতে অবশ্য তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না যদিও তাঁর প্রহসন দুটির প্রশংসা করেছিলেন। 'নীলদর্পণ' এর মূল্যকে তিনি বড় ক'রে দেখেন নি—তবে তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' নাটক সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে এ গ্রন্থে নাট্যকার **'has proved himself the greatest humourist,'**. রঙ্গলালের চেয়ে হেমচন্দ্রের প্রশংসাই তিনি বেশী করেছেন। রোমান্স লেখকদের মধ্যে 'বঙ্গবিপ পরাজয়'-এর লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও নিজের কথা বর্ণিত হয়েছে। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর সামান্য উল্লেখ করে তিনি কপালকুণ্ডলার কাহিনী বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধের উপসংহার হয়েছে এই কথা দিয়ে—**'Here must end our brief and imperfect sketch of Bengali Literature.'**

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি অতিশয় মূল্যবান। তাই এই অসম্পূর্ণ আলোচনার কথা একটু বিস্তৃতভাবেই বলা হল। সাহিত্যবিচারে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের সাহিত্য-বিচারের সূত্রগুলি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও তার প্রমাণ আছে। সমসাময়িক সাহিত্য-মূল্যায়নে তিনি অনেক মৌলিক কথার ইঙ্গিত করেছেন। মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু সম্পর্কে তিনি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত আজিও গ্রাহ্য। তবে ভারতচন্দ্র ও বিশেষত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য নিরপেক্ষ সমালোচকের নয়। সে যাই হোক, একেবারে প্রাথমিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রবন্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছে।

এ প্রবন্ধ প্রকাশের এক বছর পর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ' (১ম ভাগ) নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকজন লেখকের বিভিন্ন রচনার এটি একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ। লেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলকাতা নর্মাল স্কুলের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। গ্রন্থটি বিশেষত্বহীন হলেও সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনায় লেখকের আন্তরিকতা ও বাংলাভাষা প্রীতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ-কাহিনীর ধারাবাহিক বিবরণী দেওয়ার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় রামগতি ন্যায়রত্ন মশায়ের ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থখানিতে। গ্রন্থটির কিয়দংশ প্রথমে প্রথমভাগ নামে প্রচারিত হয়েছিল, পরে অন্যান্য অংশ তার সঙ্গে যুক্ত ক'রে লেখক সমগ্র গ্রন্থটিকে একটি খণ্ডেই প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির পশ্চাৎ-ইতিবৃত্তের কথা জানাতে গিয়ে ন্যায়রত্ন মশায়ের পুত্র শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ দেবশর্মা জানিয়েছেন—'বঙ্গভাষায় এই ধরণের এই প্রথম পুস্তক। এরূপ পুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই এবং পরবর্তী গ্রন্থকারদিগের বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনাস্থলে পিতৃদেবের এই পুস্তকখানি বিশেষ অবলম্বন স্বরূপই হইয়া আছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়ন সম্পর্কে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ

CENTRAL LIBRARY

অর্থব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন, কত পাণ্ডুলিপি কত গ্রাম ও প্রদেশের কত স্থান যে সন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়' (পৃঃ ৮/০ সূচনা – গিরীন্দ্রনাথ দেবশর্মা—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)। গ্রন্থটি মোট চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলা অক্ষর ও বাংলা ভাষা কোন সময় থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ আছে। বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন-ধারাকে লেখক তিনটি কালের অন্তর্গত করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। সূচনা থেকে চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালকে 'আদ্যকাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তিকালের সঠিক তারিখ নির্দেশ লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই অনির্দিষ্ট উদ্ভবকাল থেকে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদ্যকালের পরিধিতে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসকে স্থাপন করে তাঁদের কবি ও কাব্য-পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে সমস্ত বাংলা গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই চৈতন্য-পরবর্তীকালের। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কতকগুলি গীতই প্রাক্-চৈতন্য-কালে রচিত বলে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। এ-বিশ্বাসের মূলে ছিল বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে বর্ণিত চৈতন্যদেব কর্তৃক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতশ্রবণে মুগ্ধ হওয়ার ঘটনা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে তিনি গ্রন্থকার না বলে পদকর্তা বলেছেন। কৃত্তিবাসই তাঁর মতে আদ্যকালের বাংলার আদি গ্রন্থকার। বিদ্যাপতির জীবৎকাল নির্ণয় সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাদের নিকট একটি একটি দুরূহ সমস্যা। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাপতির একটি মৈথিলপদ 'অনলরন্ধকর লকখণ নন্দই সঙ্কসমুন্ধকর অগিনি সসী' ইত্যাদি পদের আলোকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির কারণ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তাতে তাঁর যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। তিনি বলেছেন যে প্রথমত সেকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার ব্যাপারে বাংলা ও মিথিলার মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। দ্বিতীয়ত কারো কারো মতে সেনবংশীয় রাজাদের আমলে মিথিলা ও বাংলা অভিন্ন রাজ্য ছিল। তৃতীয়ত বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের শক মিথিলায় এখনও 'লংসং' নামে প্রচলিত। চতুর্থত বঙ্গদেশের কবির অনুসরণেই বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গান রচনা করেছেন এবং সর্বোপরি চৈতন্যদেব ও পরবর্তী গায়কগণ তাঁর গান ভক্তিসহকারে পাঠ করেছেন। অতএব তাঁকে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের বাইরে স্থাপন করা অনুচিত। বিদ্যাপতির রচনায় ভাবের প্রগাঢ়তা ও গভীরতা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর পদকে মধুক্ষরা ও রসাঢ্য বলেছেন। বিদ্যাপতির ওপর জয়দেবের প্রভাব বিষয়েও তিনি মূল্যবান ও সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক কবি। এই দুই কবির একইকালে অবস্থিতি সম্পর্কে লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং 'পদকল্পতরু'র ২৪১০ ও ২৪১২ নং পদে উভয় কবির সাক্ষাৎকারের বিবরণীর ওপর নির্ভর করে লেখকের এমন সিদ্ধান্ত।

চণ্ডীদাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে বিদ্যাপতির মতো রচনা পরিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্য না থাকলেও চণ্ডীদাসের ভাব সাদাসিধে ও তাঁর কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই পদে কিঞ্চিৎ পরিপাট্য লক্ষ্য ক'রে লেখক অনুমান করেছেন যে এঁদের পূর্বে বাঙলা রচনার কিছু অনুশীলন ছিল—যদিও তথ্যের অভাবে সে আলোচনায় তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি। আদ্যকালের রচিত সাহিত্যের ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কেও তিনি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন। একালের পদ্যে তিনি পয়ার ও ত্রিপদী মাত্র এই দুই ছন্দের প্রয়োগ দেখেছেন এবং সেই পয়ার ও ত্রিপদী আধুনিককালের পয়ার ত্রিপদীর নিয়মকে কঠোরভাবে অনুসরণ করেনি। কবিতা সেকালে সঙ্গীতময় হওয়ায় যতিপতনে তা সঙ্গীতানুবর্তী হয়েছে—ফলে কোথাও কোথাও অক্ষরের কম-বেশী লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বর্ণের

CENTRAL LIBRARY

মিল বিষয়েও সেকালের কবিরা খুব সতর্ক ছিলেন না। কৃত্তিবাসের পরিচয়েও লেখক যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। সন ১০৯৯ সালে লিখিত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের একখানি পুস্তক তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ বলে তিনি প্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণের ওপর নির্ভর করেছিলেন। তবে প্রচলিত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের নানা বিষয়ে পার্থক্যও তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি কৃত্তিবাসকে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিরূপে স্থির করেন এবং ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থের 'কবির্ধীমান সোমাঃ শান্তো জনপ্রিয়ঃ' উক্তিটির আলোকে ও কতকটা সম্ভাব্য অনুমানের ওপর নির্ভর করে তিনি কবির জন্মসন নির্ণয় করেন ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ। মূল রামায়ণের কিছু কিছু ঘটনা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই, আবার কৃত্তিবাসের কিছু কিছু ঘটনা মূল রামায়ণে অনুপস্থিত—এদিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাজার-প্রচলিত বিভিন্ন রামায়ণে পাঠভেদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে কলকাতা থেকে মুদ্রিত রামায়ণগুলিতে ভেদ নেই। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত রামায়ণের সঙ্গে অন্য রামায়ণের ভেদ আছে। লেখক এ তথ্যও জানিয়েছেন যে কৃত্তিবাস ভাল হিন্দী জানতেন। খনার বচন সম্পর্কে ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু আলোচনা না করলেও গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন যে, যেহেতু খনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম মিহিরের পত্নী, সেইজন্য তাঁর লেখা বাংলা ভাষায় হতে পারে না। এগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা থেকে পরে ভাষান্তরিত হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক চৈতন্যদেবের জীবনী ও তাঁর ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্যের সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত ও বাংলাকাব্যের যথার্থ সমৃদ্ধি। বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে জীবগোস্বামীর কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের তিনি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। লেখক আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজবংশের তালিকাসূত্র ধরে মুকুন্দরামের প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ রায়ের কাল নির্ণয় করেছেন—১৫৭৩ খ্রীঃ থেকে ১৬০৩ খ্রীঃ। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, মুকুন্দরামের কাব্য ১৫৯৫ থেকে ১৬২৫ শকের মধ্যে রচিত। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে লেখক দুজন কবিরূপে স্থির করেছিলেন। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে লেখক কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদের কাল নির্ণয় করেছেন ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে। তাঁর গ্রন্থে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' ও রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যেরও পরিচয় আছে। রামেশ্বরের গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থরচনার শক লেখক কষ্ট ক'রেও পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্ত সিংহের ঢাকায় যাবার সূত্র ধরে লেখক স্থির করেছেন যে 'শিবায়ন' গ্রন্থটি কাশীদাসী মহাভারতের পরে এবং রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্বে কোনও এক সময়ে রচিত। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর কোন প্রাচীন মূল ছিল বলে তাঁর ধারণা—যদিও তথ্যের অভাবে তার ইঙ্গিত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রামপ্রসাদের বিস্তৃত জীবনী তিনি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এইখানেই মধ্যকালের আলোচনা শেষ হয়েছে। লেখক আক্ষেপ করে বলেছেন যে একালে আরও অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়ে থাকবে। এরূপ কিছুর সন্ধান পেলেও তিনি অনাবশ্যক বোধে সমালোচনা করেন নি। মধ্যকালের বাংলা ভাষা যে ক্রমে ক্রমে মার্জিত, বিশদ ও সংস্কৃতশব্দ-গর্ভজ হয়ে উঠছে—তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। একালে মুকুন্দরাম ও রামপ্রসাদের হাতে বাংলা ছন্দ যে অনেকখানি পারিপাট্যযুক্ত হয়েছিল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে 'ইদানীন্তন কাল'-এর পরিচয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র থেকেই একালের সূচনা। ভারতচন্দ্রের জীবনী, তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য ও অনুবাদকাব্য রসমঞ্জরীর পরিচয় এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ১৭৫০ খ্রীঃ থেকে ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত 'গানের যুগ'-এর

CENTRAL LIBRARY

নিধুবাবু, হরুঠাকুর ও রাম বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইংরেজদের কৃত বাংলাভাষার উন্নতির আলোচনায় হ্যালহেড সাহেবের ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ (১৭৭৮), চার্লস উইলকিন্সের বাংলাভাষায় অক্ষরসৃষ্টি (১৭৭৮), ফস্টর সাহেবের বাংলা ভাষায় ব্যাকরণরচনা (১৮০১), মার্শম্যান, কেরী প্রভৃতিদের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রকাশ, বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা উল্লেখ ক'রেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে উনিশ শতকের আরও পরবর্তী লেখকদিগের আলোচনা তৎপুত্র গিরীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে রামগতি ন্যায়রত্ন ম'শায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজেরও তিনি একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর রচিত ১০।১২ খানি গ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইংরেজি শিক্ষিতাভিমানীদের বাংলা ভাষার প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞার দিনে এ শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগেরই পরিচায়ক। লেখকের সাহিত্য-বিচার পদ্ধতিতে কতকটা নীতিবাদের প্রভাব দেখা যায়। দু'একটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা গুণ যে পতিগতপ্রাণতা, তাহা তাঁহার (কপালকুণ্ডলার) কিছুমাত্র ছিল না—সুতরাং সে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না।' 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পরস্পর সমান বর্ণত্ব-জ্ঞান হওয়ার পূর্বে অনুরাগ-সঞ্চারে লেখক খুশি হতে পারেন নি। 'মেঘনাদবধ'কাব্যের চেয়ে 'বৃত্রসংহারে'র ছন্দের বৈচিত্র্য ও ভাবের ঔদার্য্য লেখককে বেশী আকৃষ্ট করেছে—প্রভৃতি। তথাপি তাঁর গ্রন্থই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-সম্বলিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এহিসেবে এর গুরুত্ব অনেকখানি।

সাহিত্য-ইতিহাসের পরবর্তী গ্রন্থ হিসেবে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের একখানি মূল্যবান ইংরেজি গ্রন্থের কথা স্মরণীয়। অতিশয় সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপটে লিখিত আছে—**'The Literature of Bengal, An attempt to trace the progress'.** গ্রন্থের সূচনায় ২২ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় লেখকের পরিচ্ছন্ন সাহিত্যবোধ, এ জাতীয় গ্রন্থ লেখার পদ্ধতি ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহু ধারণার পরিচয় মেলে। তিনি মনে করতেন—**'The Literature of every country slowly expanding through successive ages reflects accurately the manners and customs, the doings and thoughts of the people.'** পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলা গীতিকাব্যের একটি চমৎকার পরিচয় আছে।

ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে দুটি বড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। একটি মোগলদের হাতে পাঠানদের পরাজয় ও বাংলাদেশে মোগল-অধিকার এবং দ্বিতীয়টি চৈতন্যের আবির্ভাব। এ দুয়ের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছে। ১৫শ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে শুধুই রাধাকৃষ্ণের গান; তারপর জাতীয় মনের জাগরণ এবং Classical Style-এর বড় দৃষ্টান্ত—রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদে জাতির আত্মনিয়োগ-চেষ্টা। তারপরই Original epic—মুকুন্দরামের চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। Religious, Literary ও Philosophical এই তিন দিকেই ষোড়শ শতকের বিদ্রোহের ফল ফলেছিল বলে লেখকের ধারণা। এর পর ৩০০ বছর নির্বিঘ্নে কেটে গেছে, পরে ইংরেজদের আগমনে আরও বড় ধরণের বিপ্লব জাতির জীবনে এসেছে। Spirit of freedom ও individuality-র বিকাশে এ জাগরণ সহায়তা করেছে। লেখক সমগ্র আলোচনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। (১) Period of Lyrical poetry—দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একালের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। (২) Period of Classical influence—ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ—চৈতন্যগোষ্ঠী, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম,

CENTRAL LIBRARY

কাশীরাম দাস ও ভারতচন্দ্র যার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। (৩) **The period of European influence,**—উনিশ শতকের সূচনা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত—রামমোহন, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি যার কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি।

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থটিতে নূতন তথ্য না পাওয়া গেলেও আলোচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতিকে সুন্দরভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি যুক্তিনিষ্ঠ মন সমস্ত প্রকার ভাবালুতাকে বিসর্জন দিয়ে বিচার বিশ্লেষণে যে দক্ষতা দেখিয়েছে তা সে-যুগের পক্ষে বিস্ময়কর। আজও বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখক সম্পর্কে তাঁর মৌলিক মত গ্রহণযোগ্য।

রমেশচন্দ্রের পরে রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য' (১৮৭৮ খ্রীঃ) এবং গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' (১৮৭৯ খ্রীঃ) বিষয়ে দুটি লিখিত বক্তৃতার কথা বলতে হয়। বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন। গঙ্গাচরণের বক্তৃতাটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে ঢাকার কলেজ ভবনে পঠিত হয় এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া 'সাধারণী' যন্ত্রে নন্দলাল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ বক্তৃতায় বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে লেখক কিছু আলোচনা করেন নি। পুস্তিকার প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন—বঙ্গভাষার 'ক্রমশ গতি ও উন্নতি দেখাইতে চেষ্টা করিব এবং সেই চেষ্টা 'বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে করিব, স্বতন্ত্রভাবে করিবার প্রয়োজন নাই।' বক্তা বিশ্বাস করেন বিদ্যাপতিই বঙ্গভাষার আদি কবি এবং তাঁরই গীতিকাব্য থেকে বঙ্গসাহিত্যের সূত্রপাত। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে গ্রামদান ক'রে যে শাসন-পত্র লিখে দেন তারই আলোকে লেখক বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল স্থির করেছেন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পার্থক্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'বিদ্যাপতির কবিতা কিছু গভীর, চণ্ডীদাসের কবিতা তরল রসে ঢল ঢল; বিদ্যাপতির রচনা চমৎকারিতায় চিত্তহারা, চণ্ডীদাসের রচনা সাদাসিদা এবং সহজভাবে সুখকরা……।' বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পর সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মতে কবিকঙ্কণ 'সুবিখ্যাত প্রকৃত বঙ্গ কবি', এবং ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস দুজন পৃথক কবি। ভারতচন্দ্রের কবিকৃতিত্বের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, (ভারতচন্দ্র) 'অতি যত্নের সহিত তাহার (বঙ্গভাষার) অঙ্গরাগ করিয়াছেন··ইনি যেন বঙ্গভাষাকে বড় মানুষের মেয়ে করিয়া তুলিয়াছেন।' রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন 'তাঁহার প্রতিভা অতি তেজস্বিনী ও চিত্তহারিণী।' বঙ্গের অরাজক অবস্থার মধ্যে কিভাবে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব ঘটল ও ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবে কিভাবে শান্তি স্থাপিত হলো, সেকথা তিনি সংক্ষেপে বলেছেন। আধুনিক কালের রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, বলদেব পালিত, আনন্দচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। উপসংহারে তিনি বলেছেন—'বঙ্গ-ভাষার বর্তমান অবস্থা তাহার নিন্দার বিষয় নহে বরং ইহা তাহার শ্লাঘার বিষয়; বঙ্গবাসীদের বিশেষ ভরসার স্থল।' রাজনারায়ণ বসুও অনুরূপ পন্থায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মোটামুটি একটি বিবরণ দিয়েছেন—আধুনিক কালের কথায় তিনি মাঝে মাঝে মৌলিক মন্তব্যও করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে তিনি শ্রদ্ধাবান তাঁর আলোচনাই তার প্রমাণ। মধুসূদনের কবিপ্রতিভার পরিচয়দানে লেখক যথেষ্ট মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

এরপর আর একটি মূল্যবান আলোচনার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বাংলা ১২৮৭ সালের ৩০শে চৈত্র 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ

CENTRAL LIBRARY

পাঠ করেন। ঐ বৎসরেই 'বঙ্গদর্শন'-এর ফাল্গুন সংখ্যায় এটি মুদ্রিত হয় এবং ১২৮৮ সালে 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' এই নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'এই প্রবন্ধটিকে আধুনিক কালের বাঙালী লেখকের হাতে ইংরেজি যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম সম্পূর্ণ ও সার্থক আলোচনা বলিতে পারা যায়। সেইজন্য এ প্রবন্ধটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে' (হরপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম সম্ভার—ভূমিকা)।

লেখক হরপ্রসাদ ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ক'রে তারই পটভূমিকায় একালের সাহিত্যকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিনটি লেখকের মতে সমগ্র ভারতের পক্ষেই দুর্দিন। লুঠতরাজ, মারামারি, লাঠালাঠির সেই অশান্তিময় পরিবেশটি প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল ছিলনা। পুরাতন সমাজ তখন ভেঙে গেছে, প্রাচীন সাহিত্যও লোপ পেয়েছে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ সকলেই বিদায় নিয়েছেন। কবিওয়ালারা ছিল বটে, কিন্তু বিশৃঙ্খল পরিবেশে বাবু ও জমিদারদের মনোরঞ্জনের ফলে তাঁদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারেনি। বিদেশীয়রাই এ সময় সাহিত্যের সূত্রপাত করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এ ব্যাপারে অগ্রণী। প্রথম গদ্য লেখক হলেন ফরেস্টর, কেরী ও মৃত্যুঞ্জয়। লেখকের মতে রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ও রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' অপাঠ্য। ১৮০১ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত কাল একরূপ বন্ধ্যাকাল। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে সাহিত্য-রচনার উপযোগী আবহাওয়া গড়ে ওঠে। রামমোহনের আবির্ভাব কাল থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরিবর্তন-কালে সাহিত্যের উন্নতি না হলেও লেখাপড়া চর্চা বৃদ্ধি পায়। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—ইনি 'ব্রাহ্মসমাজের প্রথম স্থাপনকর্তা, ইনি সর্বপ্রথম সমাজ সংস্কারক, ইনি সর্বপ্রথম ইয়ং বেঙ্গল, ইঁহার ক্ষমতা অপার, ইঁহার বিদ্যা অগাধ, তাঁহার মত দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেহ ছিল না।' এই পরিবর্তন যুগের আরও কয়েকজন গদ্যলেখকের কথা তিনি বলেছেন। তারপর সংস্কৃত কলেজ-দলের কথা। সংস্কৃতের ভাবকে বাংলায় ব্যক্ত করা ছিল এঁদের অভিপ্রায়। এঁদের সর্বাগ্রণী ছিলেন বিদ্যাসাগর—তিনি 'একা একশত'। বাঙালীকে ইনিই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ বাংলা শিখিয়েছেন। এই দলের মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও রামনারায়ণ তর্করত্নের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে বাঙালীর মনে অক্ষয়কুমার দত্তই ইংরেজি ভাব সর্বপ্রথম প্রবেশ করান। এ যুগের কাজ হলো—'ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক ইংরেজী ভাবের প্রচার ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি।' মাইকেলের ১৮৬০ খ্রীঃ প্রকাশিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি যুগ। তাঁর গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন—'তাঁহার মত সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল।' হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'-এর স্বদেশপ্রেম ও 'কবিতাবলী'র মহার্ঘতার দিকে তিনি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারী চরিত্র দেখানো এবং আরও যে সৎপথ ভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখানো।' এছাড়া তিনি রঙ্গলাল, নবীন সেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পূর্ণচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও সংক্ষেপে বলেছেন। বঙ্গদর্শনের লেখকদের সংক্ষিপ্ত তালিকা, কয়েকজন ঔপন্যাসিক, আখ্যানকাব্য লেখক ও নাট্যকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'কে তিনি 'বাঙ্গালায় ইংরেজীওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস' বলেছেন।

CENTRAL LIBRARY

প্রবন্ধের শেষে শাস্ত্রী ম'শায় স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় না থাকায় বাংলা সাহিত্যের অভিপ্রেত উন্নতি হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করেছেন।

উনিশ শতকের একজন অসামান্য পণ্ডিত লেখক এই হরপ্রসাদ। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিন সাহিত্যেই তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনি আধুনিক কালের সাহিত্য-ইতিহাসের যে খসড়া প্রস্তুত করেছেন, তা অত্যন্ত সুচিন্তিত। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও বক্তব্য স্পষ্ট। ভারতীয় সমালোচনা পদ্ধতির প্রতি তাঁর পক্ষপাত থাকলেও প্রয়োজনস্থলে তিনি পাশ্চাত্য প্রণালীকেও গ্রহণ করেছেন।

হরপ্রসাদের পর সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াসের ফলে তাঁর সাহিত্য-জীবনের অসাধারণ কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক এ গ্রন্থ রচনার ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য একালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা অত্যন্ত দুরূহ ছিল উপাদানের অভাবে। ন্যায়রত্ন ম'শায় প্রধানত মুদ্রিত পুঁথির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেগুলি ছাড়াও বহু অমুদ্রিত পুঁথি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন। গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন—'এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সামাজিক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তিচিহ্ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ভাষা, সামাজিক আচার, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি' (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)।

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতি অধ্যায় পরিশিষ্টযুক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির উৎপত্তি, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক, বিভক্তিচিহ্ন ও ছন্দ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম কালের সীমা নির্দেশ করেছেন ৮০০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। একালের নাম দেওয়া হয়েছে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ'। এযুগের অন্তর্গত ক'রে শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, নাথ সাহিত্য, কথাসাহিত্য ও ডাক-খনার বচনের আলোচনা করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রেই তিনি এগুলিকে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান ও নাথসাহিত্যের পুঁথি দীনেশচন্দ্রের আবিষ্কৃত নয়। তবে এগুলির আলোচনায় তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এ সমস্তের মধ্যে হিন্দু পুনরুত্থান-পূর্ব বাংলা দেশের হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের ছাপ বর্তমান। গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কেমন করে ঘটে তার চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনায় এ অধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য-পূর্বযুগের সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় আছে। এযুগের সাহিত্যকে অনুবাদ শাখা, লৌকিক ধর্মশাখা, পদাবলী শাখা ও কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা—এই চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ যুগ হিন্দুধর্ম-উত্থানের যুগ—অথচ ব্রাহ্মণগণ ভাষা-গ্রন্থ প্রচারে তেমন উৎসাহী নন। বাংলা দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁদের আনুকূল্যে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। গৌড়েশ্বরদের চেষ্টায় ও উৎসাহে একালের অধিকাংশ গ্রন্থ লিখিত—এই প্রমাণের ওপর ভিত্তি ক'রে দীনেশচন্দ্র একালকে 'গৌড়ীয় যুগ' নামে অভিহিত করেছেন।

এই অধ্যায়েই লেখক হারাধন দত্তের নকলীকৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীমূলক একটি পুঁথি পাঠ ক'রে

CENTRAL LIBRARY

কৃত্তিবাসের জন্মকাল স্থির করেছেন ১৩৮০ খ্রীঃ বা তৎসন্নিহিত কোন কাল। করুণানাথ ভট্টাচার্য সংকলিত 'অনন্ত রামায়ণ'কে প্রাচীন গ্রন্থ বলে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। মহাভারতের যে সব পুঁথি তিনি দেখেছিলেন তার মধ্যে সঞ্জয়ের মহাভারতকেই সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। সঞ্জয় ছাড়া আরও দু'জন মহাভারত-অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী ব্যাসকৃত মহাভারত অপেক্ষা জৈমিনীর উপর অধিক নির্ভর করেছিলেন বলে তিনি দেখিয়েছেন। ভাগবত অনুবাদকরূপে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৭৩ খ্রীঃ—১৪৮০ খ্রীঃ) রচয়িতা মালাধর বসুর কথা বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি তাঁর মতে আক্ষরিক নয়—এক অভিনব অনুবাদ। ভালোবাসার মহিমায় আরাধ্য ও আরাধকের গূঢ় চিত্তসংযোগের যে চিত্র দেখানো হয়েছে তা মূল ভাগবতে নেই। এ গ্রন্থের দানলীলা ও ভারখণ্ড তাই কীভাবে এতে সন্নিবিষ্ট হল, তার উৎস নির্ণয় করতে তিনি পারেন নি। লৌকিক ধর্মশাখার আলোচনায় শিবের ছড়া, চাঁদসদাগর ও বেহুলার কথা, কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, জনার্দন প্রভৃতির পরিচয় আছে। শিবের ছড়ায় কৃষক শ্রেণীর অনুষঙ্গীরূপে শিবের নৈতিক চরিত্রচিত্রণ, কৃষিতত্ত্বের জ্ঞান ও তাঁর মাদক দ্রব্যাসক্তির কাহিনী লেখক 'গোরক্ষবিজয়ে' লক্ষ্য করেছেন। এ কাহিনীতে শিবের দেবভাবও বর্জিত হয় নি। শিবের এই প্রাচীনতম কাহিনীই লেখকের মতে পরবর্তী সাহিত্যে নানাভাবে পুষ্ট হয়েছে। চাঁদসদাগরের চরিত্রে তিনি ক্ষাত্রতেজের ধনুর্ভঙ্গপণ এবং *Paradise Lost*-এর দেবদ্রোহীর ছায়া দেখেছেন। লেখক সতী সাধ্বী বেহুলাকে গ্রাম্য কবিদের এক অতুলনীয় সৃষ্টি বলে ধারণা করেন। কাণা হরিদত্ত একাদশ শতকের শেষ ও দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব সমসাময়িক এবং পঞ্চদশ শতকের কবি—প্রভৃতি তাঁর বিচারমূলক সিদ্ধান্ত।

পদাবলী সাহিত্যের আলোচনায় দীনেশচন্দ্র একালের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কথা বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি—দীন চণ্ডীদাসও পৃথক কোন কবি নন। বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে তিনি বিদ্যাপতির জন্মকাল ১৩৫৮ খ্রীঃ বা ঐরূপ কোন সময় স্থির করেছেন। একালের সৃষ্ট সাহিত্যের ভিত্তিতে এযুগের একটি সুন্দর সমাজচিত্রও অঙ্কন করা হয়েছে।

গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ। এ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের জীবনী, বিভিন্ন পদকর্তাদের পরিচয়, পঞ্চদশ শতকের প্রেমসাহিত্য, চৈতন্য-চরিতকাব্যের কবি ও কাব্য পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মভূমি এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। এ কারণে লেখক এ যুগের সাহিত্যকে নবদ্বীপের প্রথম যুগ নামে অভিহিত করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে লৌকিক ধর্মশাখা ও অনুবাদ শাখার পূর্ব-বহমান সাহিত্যধারারই পরিচিতি আছে। একালের কবিরা প্রাচীন ধারাকে সংস্কৃত ক'রে তাকে নবরূপ দান করেছেন। রামায়ণ মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিবসংকীর্তন প্রভৃতি পুস্তক একালে লোকমনোরঞ্জনের অনুকূলে নবরূপে লিখিত হয়েছে। আর এ জন্যই দীনেশচন্দ্র এ যুগের সাহিত্যকে সংস্কার যুগের সাহিত্য বলেছেন। নবম অধ্যায়কে আখ্যাত করা হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ। এ যুগের সাহিত্যকে আলোচনার সুবিধার জন্যে নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র, সাহিত্যে নূতন আদর্শ, কাব্যশাখা ও গীতিশাখা—এই চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থান্তর ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীকে ভাল ক'রে না জানলে একালের সাহিত্য বোঝা যাবে না। তাই অধ্যায়ের প্রথমেই নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথা। লেখকের মতে এ যুগের বাংলা কবিতা আর 'কৃষকের গান' নয়—রাজসভার অনুগৃহীতা হয়ে কামনার কেলিবিলাসে উন্মত্তা। এখন থেকে কাব্যে রূপবর্ণনায়

CENTRAL LIBRARY

উপমার বিকৃতি, করুণরসের দুর্গতি এবং সাহিত্যে কুটনী দাসীর আমদানি হয়েছে। কাব্যশাখার মধ্যে আলাওলের পদ্মাবতী ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, প্রসাদী-সঙ্গীত, কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, গিরিধর ও রসময় দাসের গীতগোবিন্দের অনুবাদ, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি গীতিশাখায় রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্ত পদকর্তাদের কবি ও কাব্য-পরিচয়, কবিওয়ালাদের জীবন ও সৃষ্টি-পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বাংলা গদ্যের আদিপর্বের রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও রামবসুর আলোচনাসহ একালের সমাজচিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে পল্লীগাথার দীর্ঘ আলোচনায় কাঞ্চনমালা, কাজলরেখা ও কেনারামের পালার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিকে প্রথম ভাগ রূপে আখ্যাত করায় স্পষ্টই অনুমান করা চলে যে আধুনিক যুগেরও সাহিত্য-ইতিহাস লেখার তাঁর ইচ্ছা ছিল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি প্রাপ্ত বহু পুঁথির পরিচয় দিতে পারেন নি। এ সকল পুঁথির একটি তালিকা তিনি গ্রন্থশেষে দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় আত্ম-নিয়োগের পূর্বেই তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থের রচনা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীডাররূপে কাজ করার সময় তাঁর ঐ বিখ্যাত গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রেরণা বলবতী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ডঃ সেনের কর্মধারাকে প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। আর তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যের পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের নেশা তাঁর বেড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হোক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হোক, বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করুক—এই ছিল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তরের কামনা। তাঁরই আগ্রহ ও প্রেরণায় ডঃ সেন বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত উপাদান সংগ্রহে একদিকে যেমন মনোনিবেশ করেন, অন্যদিকে ঐ সব গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে বাংলা ভাষার প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনুকূল পরিবেশে মাতৃভাষার উন্নতি ও কল্যাণযজ্ঞের যে আয়োজন এখন থেকে সুরু হল তারই প্রভাবে পরবর্তী-কালে আমাদের বাংলা সাহিত্য নানাদিকে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।

সে যাই হোক, দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থখানি নানাদিক থেকেই আমাদের জাতীয় সম্পদ। এ ধরণের গ্রন্থ রচনায় লেখকের যে শ্রমনিষ্ঠা ও রসজ্ঞতার প্রয়োজন দীনেশচন্দ্রের তা ছিল। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যও তিনি বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন।

এমন সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তিও সর্বকালেই দুর্লভ। তাই তাঁর গ্রন্থ প্রকৃত কাব্যরসরসিকেরই সাহিত্য-মূল্যায়ন। ভারতীয় হিন্দু-আদর্শের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও সাহিত্যবিষয়ে তিনি ছিলেন অনেকখানি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী। বাঙালীর সমাজজীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর গ্রন্থেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করলাম। তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ-কাল পর্যন্ত চর্যাগীতিকার পুঁথির সন্ধান মেলে নি। পঞ্চম সংস্করণ-এর কালে (১৯২৬ খ্রীঃ) এ পুঁথি আবিষ্কৃত হলেও তিনি নিঃসন্দেহে তখনও একে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর পরবর্তীকালে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে—ফলে তাঁর আলোচনার ফাঁক ভরাট করার সুযোগ পরবর্তী লেখকেরা পেয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর গ্রন্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করি না। বৈষ্ণবসাহিত্য ও পল্লীগাথাগুলির আলোচনায় তাঁর সমস্ত কবিপ্রাণ যেন সাড়া দিয়েছে। কাব্যের মধ্য দিয়েই দীনেশচন্দ্র কবিকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন—মাঝে মাঝে

CENTRAL LIBRARY

তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতিকেও গ্রহণ করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার আদর্শকে মেনে নিয়েছেন, অন্যদিকে হিন্দু-নারীত্বের আদর্শ, হিন্দুর সমাজ, বিধি-বিধান প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব নিয়েই তিনি নারীর সতীত্ব, পতিপ্রাণতা, ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রশংসা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের ভাষা সুললিত কবিত্বপূর্ণ এবং শিষ্টরীতির আভিজাত্যমণ্ডিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তিনি যে দুশ্চর সাধনা ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার মূল্য কোনদিনই অর্থহীন হবে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখা সম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির 'আভাস' এ গ্রন্থে লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়েছিলেন। এই ইতিহাসের আভাসই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের-ঐতিহাসিকদের হাতে নানাভাবে স্ফুটতর হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়াও দীনেশচন্দ্র বাংলার লোক-সাহিত্য, বাংলা-রামায়ণ, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কেও বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের বিখ্যাত গ্রন্থের পরে 'বঙ্গবাসী'র সহকারী সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থখানি বাংলা ১৩১১ সালের ১৯শে ভাদ্র প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন—'গ্রন্থের ইহা প্রথম ভাগ মাত্র। সুতরাং এ গ্রন্থের অভিধেয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবৃতি শেষ ভাগে করিবার ইচ্ছা রহিল। ইহা গ্রন্থাবলীর সমালোচনামূলক পুস্তক নহে—গ্রন্থকারসমূহের জীবনী সংগ্রহ। আট বৎসর যাবত বঙ্গবাসী আফিস হইতে এ চেষ্টা হইতেছে। ইহাই সে চেষ্টার প্রথম ফল।' দশটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সমাপ্ত। ১০০৮ পৃষ্ঠার এই বিপুলায়তন গ্রন্থটিতে প্রাচীনকাল থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সমকালীন জীবিত লেখকদের জীবনী স্বয়ং লেখক কর্তৃকই লিখিত। সর্বসাকুল্যে এতে ১২১ জন লেখকের জীবনী স্থান পেয়েছে। গ্রন্থখানি সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় না হলেও সাহিত্য-ইতিহাসের পরবর্তী লেখকদের এ গ্রন্থ নানাভাবে সাহায্য করেছে। সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে লেখকদের শুধুই সাহিত্য পরিচয় নয়, শুধুই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার কথাই নয়, লেখকদের জীবনীর কথাও সংক্ষেপে বলতে হয়। সেদিক থেকে গ্রন্থটি বহু পরিশ্রমের ফলে বাংলা-সাহিত্যের একটি মূল্যবান দলিল।

এ গ্রন্থের একমাস পরে ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে মজিলপুর ২৪ পরগণা 'কর্ণধার কুটীর' থেকে গ্রন্থকার রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য' নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে লেখক বলেছেন যে ১৩০১ বাংলা সালের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় 'বাঙ্গালাভাষার লেখক'রূপে এ গ্রন্থের সূচনা হয়েছিল। তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে লেখক অকারাদি বর্ণানুক্রমে অনেক লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঐ পত্রিকাতেই দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের দুর্ভাগ্যবশত সে লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। পরে তাঁর কথায় 'পুনরায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া, সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিয়া, নূতন পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।' লেখক এ শ্রেণীর আদি গ্রন্থকার রামগতি ন্যায়রত্নের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আভাস, মঙ্গলাচরণ ও সূচনার পর গ্রন্থ-রচনা সুরু হয়েছে। সমগ্র আলোচনাকে 'পূর্বভাগ' ও 'উত্তরভাগ'—এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বভাগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম দাস, শ্রীরামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, গানের যুগের নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কবিগানের রাম বসু, হাফঠাকুর প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরভাগে মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, তারাশঙ্কর, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, ভূদেব, দ্বারকানাথ, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, দাশরথি, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনের যুগ, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সংবাদপত্র ও থিয়েটার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ভিক্টোরিয়া যুগের

CENTRAL LIBRARY

বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-দান করা লেখকের উদ্দেশ্য হলেও পটভূমিকাস্বরূপ তিনি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যেরও আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, শ্রীরামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও রাম বসুর পরিচয় বিস্তৃতভাবেই দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-লেখক শ্রীরামপ্রসাদের কথায় আবেগ-উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করতে পারেননি। রামপ্রসাদকে তিনি 'জাতীয় কবি' এবং 'বঙ্গভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক' কবি বলে অভিহিত করেছেন। ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ দক্ষতা ও কবিত্বের তিনি প্রশংসা করেছেন। তাঁর অশ্লীলতাকে তিনি বড় ক'রে দেখেন নি। রামচরিত্রকে হীন করার জন্য মধুসূদনকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করা হয়েছে। 'বৃত্রসংহার'-এর বহুস্থলকে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। বঙ্গদর্শন-যুগের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের আলোচনায় লেখক অনেক নূতন তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন। মোটকথা গ্রন্থ-রচনায় লেখকের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। কিন্তু লেখক নীতিবাদের দ্বারা অনেকখানি চালিত। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার রীতিকে অনুসরণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ক'রেও লেখক তাঁর 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' প্রভৃতি রচনার নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন—'চোখের বালি'র রুচি মার্জিত কিংবা সন্নীতিরও পরিচায়ক নয়। অন্ততঃ রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় সুসভ্য সুশিক্ষিত কবির যোগ্য নয়। তাঁহার 'নষ্টনীড়ে'ও এই কুৎসিত ছবি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান' (পৃঃ ৩৩২)।

এরপর আর একখানি বিখ্যাত পুস্তক ইংরেজিতে লেখা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। গ্রন্থখানি ডঃ সুশীলকুমার দে-র রচিত এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century.* সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এতে আলোচিত না হলেও বিশেষ একটি যুগের প্রামাণ্য ও প্রচুর তথ্যপূর্ণ আলোচনার দলিল হিসেবে এমন অপূর্ব গ্রন্থ পূর্বে লিখিত হয়নি। সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক সমালোচনার পদ্ধতিতে গ্রন্থটি লিখিত। সাহিত্য যে জাতির জীবনধর্মের স্বভাবানুবর্তনে গড়ে ওঠে এবং তার বিকাশের ধারা যে সুসঙ্গত এবং বাইরের শত পরিবর্তনের মধ্যেও তাতে যে জাতির আত্মিক বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ণ হয় না—এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই লেখক তাঁর গবেষণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে এবং তারও পূর্বে পাশ্চাত্ত্যের টেইন তাঁর গ্রন্থে এ সূত্রের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এ সূত্রের এমন সার্থক প্রয়োগ ডঃ সুশীলকুমার দে-র পূর্বে আর কেউ করেননি। মিশনারীদের দান, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর ভূমিকা, কবিওয়ালা ও পাঁচালি-কারদের রচিত গানের মূল্যায়নে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে আজিও তা তুলনারহিত। দুঃখের বিষয় লেখক তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে উনিশ শতকেরও পূর্বার্ধ পরিচয় শেষ করতে পারেননি। তার জন্য দ্বিতীয় একখানি অনুরূপ গ্রন্থের প্রত্যাশায় আমরা ছিলাম। কিন্তু আমাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

দীনেশচন্দ্রের পর যাঁরাই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন, স্বীকার করতেই হবে তাঁদের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের মূলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও নিগূঢ় অনুপ্রেরণা ছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে এম.এ. ক্লাসে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ক'রে তার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রসারিত হওয়ার সুযোগ দেয়। দীনেশচন্দ্রের সাধনাও পরবর্তী লেখকদের কম উৎসাহ দেয়নি। দীনেশচন্দ্রের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংগ্রহেরও পূর্বে সাহিত্য-ইতিহাস লেখার যে ধারাটি উপাদানের অভাবে অত্যন্ত ধীরভাবে অগ্রসর হচ্ছিল তা এখন প্রবলতর স্রোতোবেগ লাভ করল।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুস্তক ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। বাংলা ১৩৪৭ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৩৫০ সালে

CENTRAL LIBRARY

ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৩ সালে তৃতীয় খণ্ড এবং ১৩৬৪ সালে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি-কাল থেকে ইংরেজি ১৯৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত কালসীমায় তার বিবর্তন ও বিচিত্র বিকাশের ইতিবৃত্তকে ডঃ সেন তাঁর গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী পুস্তিকা বা পুস্তকে বাংলা সাহিত্যের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল তা নানাদিক থেকেই অসম্পূর্ণ। তাছাড়া পূর্ববর্তী লেখাগুলিতে সাহিত্য ইতিহাসের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়নি। রমেশচন্দ্র ও হরপ্রসাদ এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সে পরিচয় বিশদ করার অবকাশ ছিল না। দীনেশচন্দ্র এ সম্পর্কে বিশেষভাবেই অবহিত ছিলেন, কিন্তু গ্রন্থের আভ্যন্তর প্রমাণের বাইরে দেশ-কালের পরিচয় দিতে তিনি তেমন উৎসাহবোধ করেন নি। অবশ্য তিনিই সর্বপ্রথম পুঁথিনির্ভর বাংলাসাহিত্য আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পথেই অগ্রসর হয়ে ডঃ সেন তাঁর আলোচনাকে যেমন পুঁথিনির্ভর করেছেন, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পটভূমিকায় সাহিত্যকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্দ্রের পরে দীর্ঘকালের ব্যবধানে বহু নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। পুঁথিসংক্রান্ত বহু বাদানুবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় চলার ফলে অনেক বিষয়ে সত্য-উদ্ঘাটনের পথ সুগম হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মনীষিগণ বিতর্ক-কণ্টকিত বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রাথমিক বাধা যখন অনেকখানি অপসারিত হয়েছে, তখন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন এই দুরূহ গ্রন্থ-প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের পুঁথিপাঠ দুরূহ হলেও এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষ। এক-দিকে অশেষ ধৈর্য ও নিপুণতার সঙ্গে পুঁথিপাঠ ও প্রাচীন লেখকদের অনিশ্চিত জন্মকাল সম্পর্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ এবং অন্যদিকে তাঁদের সাহিত্যকর্মকে উপযুক্ত পটভূমিকায় রেখে বিচার তিনি দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। গ্রন্থের প্রথমখণ্ডের ১ম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা বস্তুগতভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' এই গ্রন্থ রচনায় লেখককে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, বিশ্বভারতীর পুঁথি, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের পুঁথি, বর্ধমান সাহিত্য-সভার পুঁথি—প্রভৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরেজি সাহিত্যের উদার প্রসার ও ঐশ্বর্যের তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এতই দুর্বল যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আদর্শ গ্রহণযোগ্য নয় বলে তাঁর ধারণা। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লেখক ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালের ইতিহাস লিখেছেন। গ্রন্থের পর্বভাগ এইরূপ—বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তিকাল থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ১ম পর্ব, পঞ্চদশ শতাব্দী ২য় পর্ব, ১৪৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৫৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ৩য় পর্ব, ১৫৭৫ খ্রীঃ থেকে ১৬০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ৪র্থ পর্ব, ১৬০৯ খ্রীঃ থেকে ১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ৫ম পর্ব এবং ১৭০৭ খ্রীঃ থেকে ১৭৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ষষ্ঠ পর্ব।

নানাদিক থেকে ডঃ সেনের গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালীর সর্বপ্রাচীন সাহিত্য চর্যাগীতিকার আলোচনা এ শ্রেণীর গ্রন্থে এই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। চর্যাগীতিকা যে 'চর্যাপদ' নয়—এ তথ্যও তিনি আমাদের প্রথম জানালেন। ভাষা-তত্ত্ববিদ্ ডঃ সেন চর্যাগীতিকার ভাষা বিচার ক'রে এর কালসীমাকে ৯৫০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীঃ এর মধ্যে স্থির করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব-পূর্বকালে বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের তিনিই প্রথম পরিচয় দিলেন।

প্রথম সংস্করণ কালেই ডঃ সেনের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বিপুলায়তন ছিল। সমগ্র কালকে তিনি ৬টী পর্বে বিন্যস্ত করে ৩৫টী পরিচ্ছেদে বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি যে তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন

CENTRAL LIBRARY

এবং খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে যে সব উপাদানের উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর গ্রন্থের বস্তুতান্ত্রিক মূল্য যে খুব বেশী এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলাদেশের কবি ও কাব্যের আলোচনায় তিনি দেশের ইতিহাসকেও বিস্মৃত হননি। ইতিহাসের ঝড়ঝঞ্ঝায় সমাজজীবনের আলোড়ন কিভাবে ও কতখানি সাহিত্যকে নাড়া দিচ্ছে সেদিকেও তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মপূর্বকালে বাঙালীর রচনায় তিনি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। ছোট ছোট কবিতা লেখার আগ্রহ, নাট্যরচনার উৎসাহ, শাস্ত্র চর্চায় আসক্তি, কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বর্ণনার প্রবণতা, বাংলার পল্লীর বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস প্রভৃতি স্বভাব বাঙালীরই বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য কতখানি প্রতিফলিত তা তিনি না দেখালেও আমাদের অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। জয়দেব যে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন একথা তিনি আমাদের জানিয়ে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী কবি-পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষাই সাহিত্য রচনার বাহন ছিল—আর যাঁরা এদের ধার ধারতেন না তাঁরা জনগণের সহজবোধ্য ভাষায় ছড়া ও গান রচনা করতেন। চর্যাগীতিকা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের। তুর্কী আক্রমণের বহু বৎসর পর ধীরে ধীরে যখন দেশে শান্তি ফিরেছে তখন মুসলমান রাজশক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্যের মিলন ঘটেছে। আর তখন থেকেই প্রকৃত পক্ষে বাঙালী জাতি বিশিষ্ট রূপে জন্মলাভ করেছে। আবার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই যে জাতির জন্ম তার মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় জাতির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া জেগেছে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তার প্রমাণ আছে। এই চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর সপ্তদশ শতকে গোস্বামীদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের মৌলিক ধারাটি শুকিয়ে এল এবং মোগল সাম্রাজ্যের খরচের যোগান দিতে গিয়ে জাতি হয়ে পড়ল দেউলিয়া। তাই সপ্তদশ শতকের সাহিত্যে অবক্ষয়ের চিহ্ন। কেবল এই কালে আরাকান ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে সাহিত্য রচনার সার্থক প্রয়াস হয়েছিল, কারণ আরাকান তখনও স্বাধীন এবং দক্ষিণ পশ্চিম রাঢ় মোগল শাসনের নাগপাশে তখনও বদ্ধ হয়নি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে সাহিত্যের পুরাতন ধারা-গুলিই বহমান ছিল—তবে ভারতচন্দ্রের অনুসরণে এই শতকেই রোমান্টিক প্রণয়-গাথার অনুসরণ চলতে থাকে—একেবারে উনিশ শতকে প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। এইভাবে তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের ইতিহাসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। তাছাড়া কবি ও কাব্য সম্পর্কেও তিনি আমাদের পূর্ববর্তী তথ্য বা অনুমানকে যুক্তির সাহায্যে বহু স্থলে খণ্ডন করেছেন, অনেক বিষয়েই নিজস্ব মত দিয়েছেন। ১৭০৪ খ্রীঃ-এর নিকটবর্তী সময়ে সঙ্কলিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বৈষ্ণব পদসংগ্রহ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোন পদ না থাকায় তিনি পদাবলীর চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসকেই তিনি একমাত্র চণ্ডীদাস মনে করেন। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলা দেশে চণ্ডীদাসের নাম ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে তান্ত্রিক নিবন্ধকদের দ্বারা এবং চণ্ডীদাস-ক্যাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে প্রাচীন বহু উৎকৃষ্ট পদ চণ্ডীদাসের নামে চালান হতে লাগল কীর্তনীয়াদের জন্যে। সতীশচন্দ্র রায়ও অবশ্য এই মতের অনুবর্তী ছিলেন। কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয়ে ডঃ সেন তাঁর গ্রন্থের ১ম ও ৩য় সংস্করণে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ৩য় সংস্করণে তিনি জানিয়েছেন যে হারাধন দত্তের কপি করা 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী' বিশ্বাস্য নয়। আর সেইজন্যই কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় সহজ নয়। গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) নিকট থেকেই যে মালাধর বসু 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন এবং তাঁর কবিপ্রতিভা যে উচ্চ স্তরের ছিল না সেকথা ডঃ সেন জানিয়েছেন। 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মতো দুখানি বিখ্যাত

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থের রচনাকাল জানা এখনও সম্ভব হয়নি—এ বিষয়ে ডঃ সেনের অনুমান প্রথমটি আনুমানিক ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি আনুমানিক ১৫৬০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। ডঃ সেন বিপ্রদাস পিপিলাইকে মনসামঙ্গলের আদি কবি মনে করেন। দীনেশচন্দ্র ও মণীন্দ্রমোহন বসু সঞ্জয়কে আদি মহাভারত রচয়িতা বললেও ডঃ সেন বলেন যে সঞ্জয় কোন বাঙালী কবির নাম নয়। ইনি পরমেশ্বর দাসের 'পাণ্ডববিজয় পঞ্চালিকা'কেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মহাভারত বলেছেন। 'নাথসাহিত্য', 'শূন্যপুরাণ', 'ময়নামতীর গান' প্রভৃতিকে তিনি আদি যুগের সাহিত্যের অন্তর্গত করেননি। শুধুমাত্র চর্যাগীতিকা ও মানসোল্লাসের সম্ভাব্য লৌকিক রচনাকে এই কালের অন্তর্গত বলে তিনি মনে করেন। ডঃ সেনের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ৭৫২ পৃঃ পর্যন্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ধৈর্যের সঙ্গে পাঠ ক'রে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি এ গ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছিলেন। এ গ্রন্থে প্রাচীন পুঁথি-নির্ভর বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে, তাতে রবীন্দ্রনাথ খুশী হন এবং সাহিত্যের ইতিহাস সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত হওয়ায় এর মূল্য বৃদ্ধির কথাও তিনি জানিয়েছিলেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত রচিত সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই কালসীমা মধুসূদন পর্ব ও বঙ্কিম পর্ব নামে দু'ভাগে বিভক্ত। মধুসূদন পর্বে ৮টী এবং বঙ্কিম পর্বে ১০টী পরিচ্ছেদ আছে। লেখক একই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিলাতি সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাবে নগরবাসী ভদ্র বাঙালীর যে মানসিক পরিবর্তন শুরু হলো তার ফলে বাংলা সাহিত্যেরও যে গতি পরিবর্তন ঘটেছে—এ কথা তিনি বিশেষ ভাবে মনে রেখেছেন। ঐ প্রভাবের ফলে প্রথমে জাতির আত্মরক্ষার চেষ্টা। তারপর সমাজ সংস্কারের চেষ্টা। দ্বিতীয়ত বাঙালীর মধ্যে প্রথম ব্যক্তিচেতনাবোধের-এর প্রমাণ মধুসূদনের সাহিত্যে। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনাও লক্ষণীয়। তৃতীয়ত আত্মকেন্দ্রিকতার জাগরণ—বিহারীলালে তার প্রমাণ। আর চতুর্থ লক্ষণ আত্ম-সম্প্রসারণ—রবীন্দ্রনাথে তার উদাহরণ। লেখক এই-ভাবে উনিশ শতকে বাঙালীর নবজাগরণ লক্ষণকে সাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন। মধুসূদন পর্বকে (১৮৪৫-১৮৭২ খ্রীঃ) তিনি সংগঠন যুগ বলেছেন। গদ্যে, নাট্যে, কাব্যে মধুসূদন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী বিকাশ চেষ্টা সমৃদ্ধির দিকে যাচ্ছিল। সেই সমৃদ্ধি এসেছে বঙ্কিম পর্বে (১৮৭২ খ্রীঃ বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত) উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নাট্যে, কাব্যে, ব্যঙ্গাত্মক ও অদ্ভুতরসাত্মক গদ্যরচনায়। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থেরও দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর তথ্যাদি সহযোগে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর কাব্য, নাট্যসাহিত্য, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের আলোচনা এতে আছে। 'অনুপর্বে' ১৯০১ থেকে ১৯৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত কালের সৃষ্ট সাহিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৪র্থ খণ্ডে ১৬টী পরিচ্ছেদ। এই খণ্ডে বিশ শতকের প্রথম দশ বছরের কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সমসাময়িক কবিতা, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের কবিতা, অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতীর আসর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভাগলপুরের দল, সবুজপত্রের যুগ, কল্লোল যুগ, একালের প্রবন্ধ ও নাট্য রচনা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত তথ্যাশ্রয়ী আলোচনা আছে। বিশ শতকে বিভিন্ন বিষয়ের লেখক সংখ্যা সীমাহীন। অনেক লেখক কাব্য, উপন্যাস বা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা অনেকেরই নাম জানি না—বা নাম জানলেও তাঁদের রচনার খবর রাখি না। লেখক এই সমস্ত বিস্মৃত বা বিস্মৃতপ্রায় লেখকদের রচনার তালিকা বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছেন। বিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে এ গ্রন্থ যে পরবর্তীকালে বিশেষ সহায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

CENTRAL LIBRARY

ডঃ সেনের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় শ্রম ও নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অনেকদিন পূর্বে যে বৃহৎ একটি কর্মে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন, তাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। দুঃসাধ্য পরিশ্রম, স্থির বুদ্ধি ও অশেষ ধৈর্যের ফলস্বরূপ তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজ সমাপ্ত করেছেন। পরবর্তী লেখকেরা নানাভাবে এগ্রন্থের কাছে ঋণী থাকবেন। ডঃ সেনের বক্তব্য যুক্তিপ্রধান, আলোচনা মননঋদ্ধ, বিচার-বিশ্লেষণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যসমালোচনার সূত্রনির্ভর এবং ভাষায় উচ্ছ্বাসহীন বস্তুনিষ্ঠা। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি লেখকের স্বগভীর শ্রদ্ধা। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস-শ্রেণীর বৃহৎ গ্রন্থে এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের পরিচয় পর্যন্ত কেউ আসিতে পারেননি। ডঃ সেনের গ্রন্থের বস্তুতাত্ত্বিক মূল্য তো সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও নিজস্ব মৌলিকতায় উজ্জ্বল। বিচার-বিশ্লেষণে অধিক মনঃসংযোগ করলে তাঁর গ্রন্থ কি অপূর্বতা লাভ করতে পারে এখণ্ডে তার প্রমাণ আছে। পাণ্ডিত্য এবং স্মৃতিশক্তির যুগ্ম সহায়তায় লেখকগণ তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হন। ডঃ সেন এ গ্রন্থে তুলনামূলক বিচারের দিকেই অধিক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগ তাঁর গ্রন্থ রচনায় যে কতখানি সহায়ক হয়েছিল সেকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিভাগের প্রধান ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার যে পন্থাকে সর্বপ্রথম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন —সেই পন্থা ডঃ সুকুমার সেনের হাতে আরও বেশী বস্তুতাত্ত্বিক মূল্যে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুচারুমণ্ডিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই খ্যাতনামা অধ্যাপকদের কাছে এ ব্যাপারে বাঙালীর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সাহিত্যাধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুও দুই খণ্ডে বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। 'বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড কমলা বুক ডিপো থেকে ইং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। লিপিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথমেই দীর্ঘ আলোচনা আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of Bengali Language*, বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'পালিপ্রকাশ'; P. D. Gune-এর *An Introduction of Comparative Philology*' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্যে তিনি এ আলোচনাকে প্রামাণ্য করতে চেয়েছেন। 'সাহিত্য' অধ্যায়ে লেখক 'চর্যাপদ', 'বিদ্যাপতি' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যে পরিকল্পনায় তিনি গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন, তাতে মনে হয় ১০।১২ টি খণ্ডে তিনি সমগ্র ইতিহাস লিখবেন এরূপ অভিপ্রায় ছিল। কোনও একখানি সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে মাত্র তিনটি বিষয় নিয়ে এমন সুদীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কেউ করেন নি। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তির ক্রম অনুসরণ করে বর্তমান গ্রন্থ পাঁচখণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাস শতাব্দী বিভাগে রচিত হবে, না যুগবিভাগে রচিত হবে—এই বিতর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি ঠিক করেছেন—'শতাব্দী বিভাগে গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হইতে পারে বটে, সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। এইজন্য যুগবিভাগেই গ্রন্থরচনাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।' ভূমিকাতেই লেখক প্রাচীন ভারতবর্ষ ও বঙ্গের ধর্মকলহের একটি স্বচ্ছ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। বাংলাদেশে কিভাবে হিন্দুদর্শনের সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্যে উদার মহাযানী মতবাদের উৎপত্তি হল, কিভাবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হল, এবং শেষে কিভাবে তার পরাজয় ঘটল এবং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত শৈবদর্শনের ক্ষেত্রে কিরূপে বৈষ্ণবধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হল—প্রভৃতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের বাংলা জয়ের ফলাফল ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের শুভফলও নিপুণতার

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে দেখানো হয়েছে। চর্যার সাহিত্যিক মূল্য ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিত্ব—সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রোক্ত পন্থায় চিন্তাশীলতার সঙ্গে নির্ণয় করা হয়েছে। 'কমলাবুক ডিপো' থেকেই ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। শুধুমাত্র অনুবাদ-সাহিত্যেরই পরিচয় এ-খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য আলোচনার পূর্বে 'প্রবেশিকা' অংশে লেখক তৎকালীন ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদের তিনটি শ্রেণীভাগ করে লেখক ৫১ জন রামায়ণ-অনুবাদক, ৩৯ জন মহাভারত-অনুবাদক এবং ২৪ জন ভাগবত-অনুবাদকদের পরিচয় দিয়েছেন। মণীন্দ্রমোহন প্রভূত পরিশ্রম করেই তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি নিজে পুঁথিপাঠেও দক্ষ ছিলেন। প্রাচীন লেখকদের সন তারিখ সম্পর্কে তিনি নিজস্ব স্বাধীন মতামত দিয়েছেন। লেখক মনে করেন বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারী ভাষারূপে ফার্সীর সঙ্গে বাংলাও স্বীকৃতি পায়। এ দুইয়ের মাতৃভাষার প্রতি হিন্দুদের অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। আর তারই ফল পুরাণাদির অনুবাদ-কামনা। কথকতাই বাংলা অনুবাদের প্রথম ভিত্তি। মুসলমানদের আগেও বাঙালী অনুবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। পুরোহিত ও কবিরাজেরা সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করে অনেক সময় শোনাতেন। ভাগবতাদি পুরাণ ও কথকতার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হত। পরে মুসলমানি আমলে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববশত অনুবাদ রচনায় বাঙালীর আত্মনিয়োগ সম্ভবপর হয়েছিল। অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখকের আলোচনায় প্রাচ্য সমালোচনার রীতিই মূলত অনুসৃত। তবে পাশ্চাত্ত্য রীতির আদর্শে তিনি যুগ বিভাগ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে অসম্পূর্ণ হলেও গ্রন্থ দুটি মূল্যবান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির সাহায্য না পেলে এ গ্রন্থ দুটি রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভবই হত না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আর একটি প্রশংসনীয় উদ্যম দেখা যায় শ্রীযুত গোপাল হালদারের দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের ২টি পর্ব—প্রথমপর্বে প্রাচীন যুগ (৯০০-১২০০ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়পর্বে মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০ খ্রীঃ) আলোচনা। মধ্যযুগের আলোচনাও আবার তিনভাগে বিভক্ত—প্রাক্‌চৈতন্যপর্ব (১২০০-১৫০০ খ্রীঃ), চৈতন্যপর্ব (১৫০০-১৭০০ খ্রীঃ) এবং নবাবী আমল (১৭০০-১৮০০ খ্রীঃ)। লেখক কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারের গৌরব দাবি করেননি। কিন্তু একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। লেখক বিশ্বাস করেন যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সমস্ত তথ্য এখনও লভ্য নয়। উপাদান সংগ্রহের কাজ শেষ না হলে সাহিত্যের ইতিহাসের সামগ্রিক বিবরণী লেখা খুবই কঠিন। তথাপি তিনি হতাশ হননি। নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনীয় পূর্বসূরীদের তথ্যাদি অবলম্বনে মূলত সাহিত্যিকবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি মনে করেন সাহিত্যের ইতিহাস শুধু কবি, কাব্য ও তাদের কাহিনীর বৃত্তান্তমাত্র নয়। এখানে প্রধান জিজ্ঞাসা হল সৃষ্টির প্রেরণা এবং এ প্রেরণার অন্তর্গত ঐতিহ্য। এই প্রেরণা ও ঐতিহ্যের প্রয়োজনে অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশের আলোচনা।

শ্রীযুত গোপাল হালদারের 'বাংলাসাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের বছরেই অধ্যাপক ডঃ সুকুমার চৌধুরীর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থের প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম প্রকাশকালে ডঃ চৌধুরীর গ্রন্থ আয়তনে বর্তমান ৪র্থ সংস্করণের তুলনায় ক্ষুদ্র ছিল। ডঃ চৌধুরীর গ্রন্থ যখন সাহিত্যবিচার ও তথ্য-সন্নিবেশের মধ্যে সুসমঞ্জস হয়ে প্রকাশিত হল, তখন তাকে ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু তাই বলে এমন মনে করা ঠিক নয় যে তাঁর গ্রন্থ ছাত্রসমাজের পরীক্ষা-বৈতরণী অতিক্রমণের ভেলা মাত্র। তথ্যাদির ব্যাপারে তিনি পূর্বসূরীদের ওপরই নির্ভর করেছেন। কোন নূতন পুঁথির সন্ধান প্রয়াস বা পুরাতন পুঁথি-পাঠের সাহায্যে গ্রন্থ রচনার চেষ্টা তাঁর নেই। তথাপি নির্বিচারেও তিনি তথ্যাদি গ্রহণ করেন নি। তিনি বাঙালি-জীবনের স্বচ্ছন্দ-বিকশিত ধারাটির দিকে চেয়েছেন এবং এ ধারারই অনুষঙ্গীরূপে তিনি বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব বিকাশ ও তার পরিণতির মূল্যায়ন করেছেন। বাঙালীর রচিত সাহিত্যে বাঙালীর জীবনধর্ম কতখানি প্রতিবিম্বিত—এই জিজ্ঞাসার দ্বারা লেখক আত্মস্থ চালিত হয়েছেন। বাঙালীর সাহিত্যে বাঙালীর জীবনস্বভাব বা তার প্রাণধর্মের সন্ধান ডঃ সুশীলকুমার দে ও মোহিতলাল মজুমদার করেছেন। সাহিত্যের এই তত্ত্বটি পাশ্চাত্যের টেইনের আদর্শ ছিল। ডঃ চৌধুরী এ সূত্রটি গ্রহণ করলেও কোথাও তিনি জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে পূর্ব থেকে স্থির ক'রে আরোপ করেননি—সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তিনি তার সন্ধান করেছেন।

ভারতচন্দ্রের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-পূর্বকালের সাহিত্য-পরিচয় আছে লেখকের গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এ গ্রন্থেও অক্ষুণ্ণ আছে। লেখক বলেছেন—'তথ্যাদি বিষয়ে পূর্বসূরীদের গবেষণার পরে নির্ভর করেছি। আর সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যবিষয়ক বিচিত্র সংবাদের মাঝে খুঁজে দেখেছি বাঙালীর অখণ্ড-শাশ্বত জীবনধর্মকে।' কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থে ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে বাঙালীর নব-জাগরণ,—নিজস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেও বাঙালীর দ্বিজত্বলাভের পটভূমিকায় একালের সাহিত্য বিশ্লেষিত হয়েছে। বাঙালীর চিন্তা-ভাবনায় কর্মে ধর্মে সর্বত্রই নবচেতনার স্বাক্ষর—অমিশ্র মানবতাবোধেই তার চরম পরিণতি।

এর পর গ্রেটব্রিটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত জে. সি ঘোষের *Bengali Literature* নামক একখানি ইংরেজি গ্রন্থের কথা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি মাত্র ২০০ পৃষ্ঠার হলেও সুচিন্তিত এবং সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কালের সাহিত্য-পরিচয় এতে আছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমেই লেখকের **Introduction** ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী। তারপর সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—গৌড়যুগ, নদীয়াযুগ, কলকাতার যুগ ও রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থরচনায় লেখক ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ লেখকের আখ্যাত গৌড়যুগের প্রথমার্ধে বাংলাভাষা ও সাহিত্য অপরিণত, ভাষা প্রাকৃতঘেঁষা, ভাব সাম্প্রদায়িক রহস্যময়, ধর্মীয় ও গ্রাম্য সমাজকথায় পূর্ণ। দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে প্রকৃত বাংলাভাষার জন্ম—সাধুভাষা বা সাহিত্যিকভাষা তৎসম শব্দে আভিজাত্যপূর্ণ ও সংস্কৃতের প্রভাবে একালের সাহিত্যে অনেকখানি মানবীয় ভাব লক্ষণীয়। নদীয়াযুগে অর্থাৎ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বসূচিত লক্ষণগুলির বিস্তার, ভাষার পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদালাভ, প্রচুর সাহিত্যের সৃষ্টি, চাঁদসদাগর, কালকেতু, ধনপতি লাউসেন প্রভৃতির জাতীয় কাহিনীরূপে স্বীকৃতিলাভ, বিশেষ করে বৈষ্ণবীয় সাহিত্যে মানবিক ভাবের অধিকতর স্ফুরণ এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ধর্মীয় পরিবেশ প্রভৃতি এ যুগের সাহিত্যবৈশিষ্ট্য। কলকাতার যুগ ১৮০০ খ্রীঃ থেকে শুরু—সম্পূর্ণরূপে এটি লেখকের মতে পাশ্চাত্যপ্রভাবের কাল। একালে সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার সৃষ্টি, প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য জিনিসের সৃষ্টি, ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস প্রভৃতি লক্ষ্যযোগ্য। লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট ও জোরালো এবং পাশ্চাত্য সমালোচনার সূত্রেই তিনি সাহিত্যবিচারের চেষ্টা করেছেন।

অধ্যাপক ডঃ মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থখানি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পুঁথি-সাহিত্য নির্ভর নয়। এ পুস্তক রচনায় লেখক দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থের প্রভূত সাহায্য

CENTRAL LIBRARY

পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাছাড়া J. Long-এর *Descriptive Catalogue of 1400 Vernacular Works and Pamplets*, রমেশচন্দ্র দত্তের *Literature of Bengal*, রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি সহায়তা লাভ করেছেন। তথ্য বা উপাদানের দিক থেকে প্রধানত তিনি পূর্বসূরীদের ওপরই নির্ভর করেছেন। তথাপি অধ্যাপনায় লিপ্ত থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উপযোগিতা অনুভব করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লেখকদের সুনির্ণীত পাঠযুক্ত সংস্করণের অভাবও তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। আর এরই ফলে বড়ু, চণ্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত ও কৃত্তিবাসের রচনার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা। স্বীয় গ্রন্থ রচনার আদর্শ লেখক সবিস্তারেই উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং তদনুষঙ্গী সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণীও তিনি দিয়েছেন। ৮০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত কালসীমায় সাহিত্যের ইতিহাস-পরিচয় তাঁর গ্রন্থে আছে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র ও ডঃ সুকুমার সেনের পর পুঁথি-ভিত্তিক প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে যিনি আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁর নাম ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুতপক্ষে পুঁথিকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা কঠিন। একই মুদ্রিত গ্রন্থের পুঁথি নূতন করে পাঠের ফলে অনেক সময় নূতন তথ্যের সন্ধান মেলে, প্রতিষ্ঠিত সত্য সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয় আবার কখনও তার ভিত্তিদেশের দুর্বলতাও উদ্ঘাটিত হয়। তবে এ কাজে অত্যন্ত ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শ্রমের প্রয়োজন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সানন্দে এ কষ্ট বরণ করে এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। একথা সত্য যে সাহিত্যের ইতিহাস শুধুমাত্র তথ্যপঞ্জী বা উপাদান-আহরণ নয়। বিশিষ্ট সমাজ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সে সব তথ্যকে রেখে একদিকে যেমন সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হয়, অন্যদিকে রসাস্বাদন-সাহায্যে রচিত সাহিত্যের সৌন্দর্য-মূলে প্রবেশ করতে হয়। একদিকে তথ্য ও উপাদানের সমাবেশ, অন্যদিকে তারই অনুষঙ্গীরূপে অপক্ষপাত রস-দৃষ্টিতে সাহিত্যের মূল্যায়ন। এ দু'য়ের নিবিড় সাযুজ্যই সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনাকে সার্থক ক'রে তোলে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে এ-বিষয়ে তাঁর সচেতনতা সর্বত্র লক্ষ্যগোচর। লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক। এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বৃহৎ পটভূমিকায় তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্বোধিত করেন। ইং ১৯৫৯ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে জানিয়েছেন—'এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে বহু পুঁথির সাহায্য পাইয়াছি।' বহুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইংরেজি সাহিত্যে *The Cambridge History of English Literature* বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। একজনের পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ এবং একরূপ অসাধ্য।

তথাপি আমাদের দেশের লেখকদের এই দুরূহ ব্রত একাই পালন করতে হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজনেই এ ব্যাপারে যে ক্লান্তিহীন শ্রম, সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা ও জাতীয় গৌরব পুনরুজ্জীবনে অতন্দ্র সাধনার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। চারটি খণ্ডে এই ইতিহাস রচনার কাজ শেষ করার ইচ্ছে লেখকের ছিল। কিন্তু তাঁর আলোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা দেখে মনে হয় আরও তিনটি খণ্ডের প্রয়োজন হতে পারে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দশম থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত ৫০০ বছরের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এই কাল প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আদিযুগ (খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) এবং

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় পর্বে—প্রাক্ চৈতন্য যুগের (খ্রীঃ ১৩শ থেকে ১৪৯৩ অব্দ) আলোচনা। গ্রন্থের পরিশিষ্টে সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ কাহিনী এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর গ্রন্থগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে এই একই ধারার অনুবর্তন আছে। পরিশিষ্টের এই অংশগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় যে নূতন সংযোজন এতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্যের উন্মেষ, বিকাশ ও সমৃদ্ধি লগ্নে বিশ্বের প্রধান প্রধান সাহিত্য এবং আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্য কিভাবে অগ্রসর হয়েছে তা জানার কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। আমাদের এই প্রচ্ছন্ন কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য লেখকের চেষ্টা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সন-তারিখের গোলযোগ এড়ানো কঠিন। নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুঁথি আমাদের বেশী নেই—যা আছে অধিকাংশই মূল পুঁথির নকল। তাছাড়া প্রাচীন বহু কবির আত্ম-পরিচয় নেই অথবা অসম্পূর্ণ। ফলে প্রাচীন কবি-বিশেষকে কোন্ পর্বের অন্তর্গত করা হবে —এ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও লেখক নিজের অতি তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও স্বাধীন নিরপেক্ষ একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বদা সতর্ক রেখেছেন। এই কারণে সমস্যামূলক অংশে তাঁর সিদ্ধান্তসূচক বক্তব্যগুলি অতিশয় মূল্যবান। প্রাচীন বাংলাদেশের পরিচয়, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর জনজীবনের ধারা, বাঙালীর রচিত সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, প্রাক্ বাংলা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য—প্রভৃতি নিয়ে গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি কবিরূপে জয়দেবকে স্থির ক'রে লেখক জয়দেব-গোষ্ঠী ও জয়দেবের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। ৫র্থ অধ্যায়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির আলোচনায় তিনি পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং ব্রাহ্মীলিপি যে ভারতীয় মৃত্তিকা-উদ্ভূত যথেষ্ট যুক্তিসহকারে এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে চর্যাগীতিকার পরিচয়-পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিবর্তন আলোচনার পর চর্যাগীতিকার পদ-পরিচয়, ভাষা ও ছন্দ, তত্ত্ব-দর্শন, কাব্যরস ও বাঙালীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা আছে। শৈব নাথসাহিত্য, কথাসাহিত্য, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচনকে আদিযুগের অন্তর্গত করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের কালগত সাহিত্যের পরিচয় দেবার পূর্বে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও বিভিন্ন মুসলমান শাসকদের আমলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণ বিবরণী দেওয়া হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মকে বোঝাতে গিয়ে গীতগোবিন্দ, ভাগবত ও শ্রীধর স্বামিকৃত ভাগবতের টীকার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির দ্বারাই বাংলাদেশে ভক্তিবাদের পথ প্রশস্ত হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা।

অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা। এ গ্রন্থের পুঁথি সম্পর্কে একটি নূতন তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রমাণের সাহায্যে লেখক দেখিয়েছেন এ গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নয়, কবিপ্রদত্ত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এ গ্রন্থের পুঁথি ও কবি, এর প্রাচীনতা বিচার, কাহিনী, চরিত্র, কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত, তথ্যবহুল ও মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিন অধ্যায় জুড়ে কবি বিদ্যাপতির আলোচনা। বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল, তাঁর পদাবলীর উৎস ও শ্রেণীবিভাগ, তাঁর অন্যান্য পদাবলী, কবিত্ব, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক আলোচনা ক'রে সর্বশেষে বিদ্যাপতি সমস্যার দিকেও তিনি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালী'র পরিচয়। রাম ভক্তিবাদ থেকে সুরু ক'রে কৃত্তিবাস সম্পর্কিত বহু জিজ্ঞাসারই উত্তর এ অধ্যায় দুটিতে আছে। গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আদিযুগের মহাভারত অনুবাদকদের কথাই আলোচিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, সঞ্জয় ও বিজয় পণ্ডিত এই চারজন আদি অনুবাদক সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু লিপিযুদ্ধ ঘটেছে। সকল

CENTRAL LIBRARY

পণ্ডিতদের মতবাদের উল্লেখ ক'রে লেখক নিজস্ব স্বাধীন যুক্তিবলে একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরকেই তিনি আদি কবিরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দীকে একই ব্যক্তি বলার যুক্তিকে মানতে পারেননি। মালাধর বসুর কথা আছে গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে। মালাধরের আবির্ভাব ও কাব্যরচনা কালজ্ঞাপক প্রাপ্ত দুটি ছত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে লেখক সংশয় প্রকাশ করেছেন।

লেখকের একই মনোভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'চৈতন্যযুগ'-এ। গ্রন্থে 'লেখকের নিবেদন' অংশে তিনি বলেছেন—'আমি সমগ্র জাতির মনোজীবনের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যকেই সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তনের প্রধান নিয়ামক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং সেইজন্য এই আলোচনায় মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি।' পনেরটি অধ্যায়যুক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পরিচয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ, মনসামঙ্গল কাব্য ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা। মঙ্গল কাব্যগুলিতে আর্যেতর ও আর্য সংস্কৃতির সমন্বয় রূপ দেখেছেন লেখক। আর এক শ্রেণীর মঙ্গল-কাব্য দেবীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ইত্যাদি সংস্কৃত পুরাণ নির্ভর। ব্রতকথা ও পাঁচালীর মধ্য দিয়েই যে মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি এ অভিমত তিনি সমর্থন করেছেন। চৈতন্যদেব ও বাঙালীর জীবনসাধনার কথা এবং বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীদের কথা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে লভ্য। অষ্টম অধ্যায়ে চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নবম থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত ৬টী অধ্যায়ে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা। লেখক ৪ জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভাগবত অনুবাদক রঘুনাথ, মাধবাচার্য ও দুঃখী শ্যামাদাসের কবি ও কাব্য পরিচয়।

আয়তন ও আলোচনার দিক থেকে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৩টি অধ্যায়ে রচিত এ গ্রন্থের দুটি পর্ব—প্রথম পর্বে উত্তরচৈতন্য সাহিত্য ও দ্বিতীয় পর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি পর্বের সাহিত্য পরিচয়ের পূর্বে এখানেও ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটকে উজ্জ্বল করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্য, কালিকামঙ্গল, শিবায়ন ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের আলোচনা এ গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সপ্তদশ শতকের মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকার কথা মনে রেখেই। চৈতন্যযুগের অবসানে জাতির সাহিত্য ও সাধনায় যে শিথিলতা প্রকট হয়ে উঠছিল একালের রচিত মঙ্গলকাব্যে তার প্রতিফলন পড়েছে। সেইজন্যে মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতির মতো মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি এ যুগে দেখা যায় না। লেখক অতিশয় সূক্ষ্মতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে এ যুগের মঙ্গলকাব্যে লৌকিকভাব হ্রাস পেয়ে পৌরাণিক-প্রভাব দৃঢ়মূল হচ্ছিল, ভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্য ঘটছিল এবং বৈষ্ণব প্রভাবও স্পষ্ট হচ্ছিল। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়া আর এক প্রকার মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর অনুবাদধর্মী কাব্য সপ্তদশ শতকে রচিত হয়েছিল। এর নাম 'দুর্গামঙ্গল'। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতীর আখ্যানটি এতে বিস্তারিত আকারে অনুসৃত হলেও পুরাণ বহির্ভূত কিছু কিছু ঘটনাও এতে স্থান পেয়েছে। সেইজন্য একে অনুবাদ-সাহিত্য বলাও ঠিক নয়। লেখক একে অনুবাদধর্মী মঙ্গলকাব্য বলতে চেয়েছেন।

নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য সম্পর্কেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। এগুলি যে আদি-যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। লোকমত এবং লোকসমাজে প্রচলিত একপ্রকার দেহঘটিত রহস্যময় দর্শনের ওপর 'গোরক্ষবিজয়'-এর কাহিনী পরিকল্পিত। উচ্চতর কবিদের সৃষ্ট সাহিত্য এ নয়।

CENTRAL LIBRARY

সেইজন্যে গ্রাম্য পরিবেশ এবং রুচির স্থূলতা এতে আছে। তথাপি লেখক মনে করেন গোরক্ষ চরিত্রের পরিকল্পনায় একটি উচ্চতর জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। মীননাথের চরিত্রে আধুনিককালের পাঠক-পাঠিকা বাসনাজর্জর চিত্ত-সংকটের পরিচয় ও একটি মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ও তার পরিণামের ইঙ্গিত পেতে পারেন বলে তিনি মনে করেন। ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের কাহিনী 'গোরক্ষবিজয়'-এর তুলনায় অনেক বেশী মানবিক গুণসমৃদ্ধ। লেখক গোপীচন্দ্রের গানকে 'এপিকধর্মী' বলেন না, ডঃ দীনেশচন্দ্রের মতো একে ছড়া ও পাঁচালী জাতীয়ও মনে করেন না এবং ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতো একে শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার ক'রে নিকৃষ্ট বলতেও চান না। লোক-সাহিত্য ও লোকধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে এদের যে ঐতিহাসিক মূল্য তার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সপ্তদশ শতকের অনুবাদ-সাহিত্যের কথায় তিনি বলেছেন যে কাশীরামকে বাদ দিলে একালের অনুবাদ-সাহিত্য মৌলিকতাহীন ও বৈচিত্র্যহীন। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিচিত্র ঐশ্বর্য ও মঙ্গলকাব্যের সমারোহ অনুবাদ সাহিত্যকে কোণঠাসা ক'রে রেখেছিল বলে তিনি মনে করেন। একালের বৈষ্ণব সাহিত্যও গোবিন্দদাসের তিরো-ভাবের পর ম্লান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অসুবিধার কথা বলেছেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মুসলমান কবিদের রচিত সাহিত্যের প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ-বাসীদের হাতে বড় একটা নেই। এ-সংক্রান্ত অধিকাংশ পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এগুলি অনাবশ্যক ভার বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শাক্তপদাবলীর তত্ত্ব ও বাউল গানের দুরূহ তত্ত্বকথাকে লেখক অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্বন্ধেও লেখক অনেক মৌলিক কথা বলেছেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যেই লেখকের একটি উদার অপক্ষপাত মনোভাব, রস-রসিক মন ও নৈয়ায়িক চিন্তা-পরিশীলিত বুদ্ধি লক্ষ্যগোচর।

বৃহৎ পটভূমিকায় তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণে সুসমঞ্জস এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করব। কোন কোন সমালোচক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে এমন কথা বলেন যে সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থে তথ্যপঞ্জী ও তত্ত্বেরই বর্তমানে অধিক সমাবেশ দেখা যায়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই এ অপবাদ থেকে মুক্ত। তিনি শুধুই তত্ত্ব ও তথ্যেরই ভারে গ্রন্থগুলিকে পীড়িত করেন নি। তত্ত্ব ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি লেখক বা লেখকরচিত সাহিত্যের মূল্যায়নের দিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখকের সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনা এ শ্রেণীর গ্রন্থে পূর্বে দেখা যায় নি। তথ্য সমাবেশ, বিচার ও বিশ্লেষণের জন্যে যে পাণ্ডিত্য ও রসবোধ আবশ্যক, তা তাঁর আছে। সমাজমানসের বিবর্তনে বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তাতে বৃহদায়তন কোন গ্রন্থ ধৈর্যের সঙ্গে পাঠ করার সময়াভাব। স্বল্প-আয়তনে সাহিত্যের ইতিহাসের মূল প্রবণতাগুলি কোন গ্রন্থে সমাজ-সংস্কৃতির অতিসংক্ষিপ্ত পটভূমিকায় লিখিত হলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হয়। সেই কারণে ব্যাপক প্রেক্ষাপটে অতিদীর্ঘ আলোচনার প্রতি অনেকেই আকর্ষণ অনুভব করেন না। কিন্তু এই অজুহাতে কোন গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যের প্রতি আমরা যেন শ্রদ্ধাহীন না হই। দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের গ্রন্থ পাঠ করতে গেলে পাঠক পাঠিকারও এঁদের মতো **Australian Miner** এর সহিষ্ণুতা চাই। অভিনিবেশ সহকারে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় যে পাঠক-পাঠিকার সকল জিজ্ঞাসারই সেখানে সদুত্তর আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের যে 'পুঁথি-বিবরণী' তিনি দিয়েছেন তা আমাদের বহু অস্পষ্টতাকে দূরীভূত করে।

CENTRAL LIBRARY

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্বচ্ছ, আলোচনা যুক্তির অধীন হয়েও সরস, সিদ্ধান্ত তথ্যভিত্তিক। তাঁর গ্রন্থগুলির আর একটি বড় আকর্ষণ তাঁর অপরূপ ভাষা। লেখকের নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্বদীপ্ত স্টাইল আছে। সেই স্টাইল অভিজাত্যমণ্ডিত অথচ সুললিত ভাষার মধ্যে দীপ্যমান। ভাষার ওপর লেখকের অসামান্য অধিকার থাকায় তাঁর আলোচনার অদ্ভুত একটি আকর্ষণী শক্তি আছে।

ইং ১৯৫৯ সালে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে প্রকাশিত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থখানি মূলত ছাত্রপাঠ্য হলেও কয়েকটি কারণে বিশেষত্বের দাবি রাখে। এ গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দুটি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যালোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক সাহিত্যের পরিচয়। গ্রন্থে কোন নূতন তথ্য দেবার অভিপ্রায় নেই—মুদ্রিত গ্রন্থের ওপর ভিত্তি ক'রেই তাঁর গ্রন্থ রচিত। তথাপি সাহিত্যের রসাস্বাদনে এবং বিভিন্ন কাব্য ও কবি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার পরিচয় এতে আছে। বিশুদ্ধ সাহিত্য রসাস্বাদনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে এ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর নিজেরও একটি পূর্ণতর সাহিত্যের ইতিহাস লেখার ইচ্ছা ছিল। অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিকে অধিক গুরুত্ব দিলেও তিনি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেন নি। তাই তুর্কী আক্রমণে বাঙালী জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়, তুর্কী আমলে সংস্কৃত অনুশীলন, হিন্দু-বৌদ্ধ প্রতিযোগিতা, একালে হিন্দুর আত্মরক্ষার নানা চেষ্টা, শাক্তপদাবলীর উদ্ভব-পূর্ব রাষ্ট্রবিপ্লব, লোকসাহিত্য ও নাথ সাহিত্যের উৎস—প্রভৃতির কথা তাঁকে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করতে হয়েছে। আধুনিক কালের সাহিত্য-মূল্যায়নে তাঁর দুর্লভ সমালোচনা-শক্তির পরিচয় আছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যকে আখ্যান কাব্যরূপে বিচার, যতীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখবাদের অন্তরালে অতিপ্রবল ভোগবাদের কামনা-আবিষ্কার, আধুনিক যুগের রুচিবৈচিত্র্য ও তীব্রতর জীবন-কৌতূহলের দাবি মেটানোর কাব্যরূপে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যকে নিরীক্ষণ, নজরুলের কাব্যে বিদ্রোহের পর প্রেম ও সৌন্দর্যের বিবর্তন-ইঙ্গিত প্রভৃতি সেই মৌলিক শক্তিরই পরিচয়বহ। দীর্ঘদিন ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল এবং বিশ শতকের তিনি একজন অতি উচ্চশ্রেণীর মৌলিক ক্ষমতাসম্পন্ন সমালোচক ছিলেন।

এই পর্যায়ের আর একখানি গ্রন্থ অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস' (প্রাচীন পর্ব)। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট প্রকাশিত এ গ্রন্থে বাংলাভাষা সাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে ইংরেজপ্রভাবের পূর্ববর্তী-কালের সাহিত্য-পরিচয় দেওয়া হয়েছে। একটি নূতন পদ্ধতিতে এটি লিখিত। ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও লেখক লিখেছেন যে সে গ্রন্থে 'প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা মাত্র হইয়াছে।' বিভিন্ন গ্রন্থ-পরিচয়ের মাধ্যমে জাতির রসবোধ, মনীষা ও মনোজীবনের অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় না থাকলে কোন সাহিত্যের ইতিহাসই রচিত হতে পারে না বলে লেখক 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন। আর সে অভাব মোচনের জন্যই 'প্রাচীনপর্ব' নাম দিয়ে তাঁর এ গ্রন্থ রচনা। তিনি লিখেছেন—'প্রাচীনগ্রন্থগুলিতে প্রকাশিত বাঙালী জাতির রসবোধ ও মননশক্তির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জাতীয় প্রতিভার ক্রমবিকাশ নির্দেশ—এই দুই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান গ্রন্থ রচিত হইল।' সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় লেখক পটভূমিকাকে বড় ক'রে দেখতে চাননি—সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রের দিকেই তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে পটভূমিকাকে যতখানি জানা প্রয়োজন তা তিনি স্মরণ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, যুগবিভাগ, শাখাভেদ, রেনেসাঁস প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রন্থে নূতন মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে। ২১টি অধ্যায়ে বিভক্ত পুস্তকটির প্রতি অধ্যায়ের দুটি অংশ। প্রথম অংশে বিশেষ কবি বা সাহিত্য সম্বন্ধে

CENTRAL LIBRARY

লেখকের মৌলিক বক্তব্য ও বিচার বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় অংশ 'নেপথ্যবার্তা'র সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী। 'নেপথ্য-বার্তার' জন্যে অবশ্য লেখককে প্রধানত পূর্বসূরীদের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন তথ্য যেখানে বিভ্রান্তিকর সেখানে তাঁর সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকের অভ্রান্ত অঙ্গুলি সংকেতকেই স্মরণ করায়। প্রতি অধ্যায়ের প্রথম অংশ লেখকের চিন্তার স্বচ্ছতায়, রস-বিশ্লেষণের নিপুণতায় এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে উজ্জ্বল। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে লেখক প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন—ইংরেজি আদর্শে তিনি মধ্যযুগকে স্বীকার করতে চাননি। দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন যুগ এবং তৎপরবর্তীকাল আধুনিক যুগ। প্রথমটি ধর্মান্ধ, ভাবালু ও জীবনবিমুখ; দ্বিতীয়টি মননশীল, বাস্তব ও জীবনসচেতন। ভাষার দিক থেকে তিনটি যুগকে স্বীকার করলেও তিনি ভাবের দিক থেকে এ দুটি যুগকেই মেনে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার জন্যে তিনি ইংরেজদের অবদানকে খুব বেশী গুরুত্ব দেননি। তিনি বিশ্বাস করেন যে মননশীলতা আধুনিকতার জন্ম দিয়েছে, তা বাঙালীর জীবন অভিব্যক্তির স্বাভাবিক পরিণাম। ইংরেজপ্রভাবে আধুনিকতার বিকাশ দ্রুততালাভ করেছে মাত্র। ভাবালুতা ও মননশীলতার ভেদই প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করছে। রূপভেদে লেখক সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে সভাসাহিত্য, গোষ্ঠিসাহিত্য, জনসাহিত্য ও ব্যক্তিসাহিত্য—এই চারভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম তিনটিকে প্রাচীন এবং শেষেরটিকে আধুনিকযুগের অন্তর্গত করা হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী, নাথসাহিত্য, ভারতচন্দ্র,বাউলসঙ্গীত, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি সম্পর্কে লেখকের গভীর ও মৌলিক মন্তব্য আমাদের নতুন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে।

গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যায়ের বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং একটি বিশেষ প্রয়োজনে এগুলি লিখিত বলে লেখকগণ নিজস্ব স্বাধীন মতামতকে সবসময় এসকল গ্রন্থে ব্যক্ত করতে পারেননি। সেইজন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেগুলির আলোচনা সম্ভব হল না। তবে এই ক্ষুদ্র আয়তনে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে তিনখানির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (১৯৪৯), অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তীর 'নব পরিচয় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৬৪) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৯৬১)। এর মধ্যে প্রথমটির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। শেষের দুটি গ্রন্থেও লেখকগণের চিন্তাধারার স্বকীয়তা এবং সাহিত্য রসাস্বাদনের মৌলিকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক চক্রবর্তী এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের নূতন জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘকালের মৌলিক ভাবনা আভাসিত হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থেও অনুরূপ মৌলিকতা দৃষ্টিগোচর। বাংলার নবজাগরণ, আধুনিক কালের নাট্যসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও মোহিতলাল মজুমদারের আলোচনায় তিনি নূতন দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

সাহিত্যের ইতিহাসে রচনার যে ধারা শতাধিক বৎসরের পুরাতন এবং যে ধারা ডঃ দীনেশচন্দ্রের সময় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রেরণায় প্রবলতর স্রোতোবেগ লাভ করেছিল—আজও তার প্রবাহ স্বচ্ছন্দে বহমান। এর অন্তহীন ভবিষ্যৎ প্রবাহের কথা মনে রেখে এইখানেই এ আলোচনার উপসংহার হল।

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান

নন্দদুলাল রায়

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুদীর্ঘকাল পরে ১৯১৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষায় আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রবর্তন হয়। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয়দের মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ শিক্ষা পাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন বিদেশী শাসকবর্গের অভিপ্রেত ছিল না; এই কারণেই দেখি যে যদিও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষাগ্রহণ ১৯১৯ সালের পরেই সম্ভব হইয়াছিল।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিধি স্বীকৃত হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন দেশের বৃহত্তম গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল তখন স্নাতকোত্তর বিভাগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। স্যার আশুতোষই সর্বপ্রথম কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের স্থাপনা করেন এবং তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষায় ভারতীয় ভাষাবিভাগ স্থাপিত হয়। অসামান্য দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভাবীকালে প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষা আপন মহিমায় প্রাধান্য লাভ করিবে। এইজন্য বাংলায় উচ্চতম শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আর্য ও দ্রাবিড়ভাষাসম্ভূত অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলিতেও তিনি উচ্চতম পরীক্ষা ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশুতোষ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, 'সেদিন আর দূরে নহে যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।' সুতরাং 'ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয় তবে তাহা যতদূর সম্ভব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে।' ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই উদার মনোভাব বিচার করিলে আশুতোষকে জাতীয় সংহতির প্রধান উদ্গাতা বলা যায়।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, 'বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাতেও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন, বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজীভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত।.....এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাঁহারা উচ্চশিক্ষাবর্জিত সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহসম্পন্ন করিতে পারিবেন' ("জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি")। আশুতোষের আশা ফলবতী হইয়াছে; বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা পাইবার আগ্রহ আজ শুধু বাংলাদেশের ভিতরেই নয়, বাংলার বাহিরেও দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাবিভাগের আদর্শেই দিল্লী ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত নামেই একটি করিয়া বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে যেখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯১৭ সাল হইতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষায় স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা হিন্দী, উর্দু,

CENTRAL LIBRARY

মৈথিলী এবং ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সহিত একজন বিভাগাধ্যক্ষের দ্বারাই পরিচালিত হইত। ১৯৫১ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় স্নাতকোত্তর বিভাগ স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের বাংলাভাষায় এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ করিত। পাটনার বর্ষীয়ান্ অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় রঙ্গীনচন্দ্র হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা পরীক্ষার পাঠ্যসূচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন দিক্‌পাল—আচার্য সুনীতিকুমার এবং আচার্য সুশীলকুমারের নির্দেশে নির্ধারিত হইয়াছিল। তখন মূলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দই পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ১৯৫২ সালে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন পরীক্ষার্থী (প্রাইভেট) পরীক্ষায় বসিতেন। সম্প্রতি বিহার ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে বাংলাভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও ভারতীয় অন্যান্য ভাষার প্রতি আশুতোষের অনুরাগ কম ছিল না। এইজন্যই প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার উচ্চতম শিক্ষায় তিনি সেই সেই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষারূপে মৈথিলীর প্রচলন চতুর্দশ শতাব্দী অথবা তাহার পূর্ব হইতে অব্যাহত ছিল। উচ্চ হিন্দী ও উর্দু ভাষার চাপে পড়িয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে মৈথিলী ভাষা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুপ্রাচীন ভাষার প্রতি এই অবহেলা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় মিথিলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। স্যার আশুতোষ স্নাতকোত্তর বিভাগে মৈথিলী পড়াইবার জন্য সুপণ্ডিত বাবুয়া মিশ্রকে (বিহার সরকারের বর্তমান বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীহরিনাথ মিশ্রের পিতা) অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল সর্বপ্রথম হিন্দীভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীভাষার স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের জন্য নলিনীমোহনই সর্বপ্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মৈথিলী ও হিন্দীভাষার স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ বিহারে অনেক পরে এই ভাষাগুলিতে স্নাতকোত্তর বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৮ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার বহুকাল পরে ১৯৩৮ সালে হিন্দীভাষায় এম. এ. পড়াইবার ব্যবস্থা হয়; এখনও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী ভাষায় স্নাতকোত্তর বিভাগ স্থাপিত হয় নাই, তবে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে উক্ত বিভাগ রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম মৈথিলী ভাষার নানা প্রাচীন গ্রন্থ পুনরুদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' এসিয়াটিক লাইব্রেরীর পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্করণ মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে এবং ঐ একই সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'র সম্পাদনা করিয়াছিলেন (শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার ও শ্রীবাবুয়া মিশ্রের যুগ্ম সম্পাদনায় 'বর্ণরত্নাকর' অবশ্য অনেক পরে, ১৯৪০ সালে এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল)।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষার জন্য পাঠ্যসঙ্কলন রচিত হইয়াছিল। ওড়িয়া ভাষার পাঠ্য হিসাবে 'টিপিক্যাল্ সিলেক্‌শন্‌স্ ফ্রম ওড়িয়া লিটারেচর' বইখানি ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় সমগ্র ভারতের ভাষাগত উন্নতির মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য বিজড়িত রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের ছাত্রেরাই আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া শিক্ষাজগতের নেতৃত্ব করিতেছেন।

১৩২৩ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে আশুতোষ মর্মস্পর্শী ভাষায়

CENTRAL LIBRARY

আবেদন জানাইয়াছিলেন, 'বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্বক জন্মভূমির তথা বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন।'

আশুতোষের এই আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। বিশিষ্ট মনীষী এবং জ্ঞানতপস্বীদের গবেষণার দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস হইতেই সমগ্র জাতি প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়াছে এবং জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা সাহিত্যের যে ব্যাপক গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নানা অন্ধকারময় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক-অধ্যাপকদের নিয়োগ আশুতোষের এক স্মরণীয় কীর্তি। ১৯১৩ সালে তিনিই প্রথম বাংলায় রিসার্চ-ফেলোশিপ সৃষ্টি করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শত শত গবেষণামূলক গ্রন্থ পরবর্তীকালের গবেষকদের সম্মুখে আলোকস্তম্ভরূপে বিরাজ করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের পুঁথিশালার বিপুল সংগ্রহ ভাবীকালের মৌলিক গবেষণায় প্রেরণা সঞ্চার করিবে। আচার্য দীনেশচন্দ্র বাংলার লোকসাহিত্যের অমূল্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অনাবিষ্কৃত প্রদেশে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বিস্ময়কর গবেষণা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষাবিভাগই চৈতন্যজীবনী সম্বন্ধে সমালোচনাত্মক বিচারে প্রথম পথপ্রদর্শক। বৈষ্ণবসাহিত্য, ব্রজবুলি ইত্যাদি বিষয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুশীলকুমার দে, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ আচার্যগণের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইঁহারা নিজের সাধনার দ্বারা 'মধ্যযুগের ভাবধারায় অবগাহন করিয়া মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে এক মানসিক সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।' এই প্রসঙ্গে পাটনার ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গবেষণামূলক গ্রন্থ 'চৈতন্য-চরিতামৃতের উপাদান' উল্লেখযোগ্য রচনা। পুণ্যশ্লোক আশুতোষের প্রেরণায় ও কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থসাহায্য লাভ করিয়া বিমানবাবু বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার বহু পল্লী হইতে চৈতন্যবিষয়ক পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁহার ডক্টরেট পরীক্ষার এই নিবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম গবেষণা গ্রন্থ। ১৯৩৬ সালের ২৬শে জুন তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন সিণ্ডিকেট নিবন্ধটিকে বাংলাভাষায় 'লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি দিয়া ভারতীয় গবেষণার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন।' বর্তমানে পাটনা, বিহার ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ে গবেষণায় প্রচুর উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

এই আলোচনা প্রধানতঃ বিহারের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও বাংলাভাষা শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। বিহার বাংলার সন্নিহিত প্রদেশ। এককালে উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাববিনিময়ের প্রচুর অবসর ছিল। সুপ্রাচীনকাল হইতেই বাংলা ও বিহার ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাই এই প্রদেশের ভাষাশিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ভূমিকা অনস্বীকার্য।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গবেষণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান : রবীন্দ্রনাথ

বেলা সেনগুপ্ত

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। গৌহাটী থেকে দিল্লী পর্যন্ত এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় নেই যেখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের কোন না কোন একটির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা নেই। শুধু তাই নয়—বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এসব বিষয়ে গবেষণারও বিস্তারিত ব্যবস্থা রয়েছে। আজ ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয় যে এমন একটা সময়ও ছিল যখন ভারতীয় কোন আধুনিক ভাষারই এই মর্যাদা ছিল না। ফলে, ভারতের সর্বত্র আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ছিল অবহেলিত। সেকালে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিভার প্রকাশ-পথ ছিল ইংরেজি। মাতৃভাষা ছিল অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গবেষণা ছিল শিক্ষিতজনের কল্পনা-বহির্ভূত। বঙ্গভারতীর এই দীনহীনা মূর্তি সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছে শ্রীঅরবিন্দের মর্মস্পর্শী বাণীতে। ১৮৯৪ সালে লেখা *Bankim Chandra Chatterji* পুস্তকে তিনি বলেছেন—'Even now you will hear Anglicized Bengalis tell you with a sort of triumph that the only people who read Bengali books are the Bengali ladies. The sneer is a little out of date, but a few years ago it would not have been so utterly beside the mark. All honour then to the women of Bengal, whose cultural appreciation kept Bengali literature alive! And all honour to the noble few who, with only the women of Bengal and a small class of cultured men to appreciate their efforts, adhered to the language our forefathers spoke, and did not sell themselves to the tongue of the foreigner! Their reward is the heartfelt gratitude of a nation and an immortal renown.

বঙ্কিম-সাহিত্যের আবির্ভাবের ফলে মাতৃভাষার প্রতি বাঙালীর মমতা জেগেছে। শ্রীঅরবিন্দ সে সম্বন্ধে বলেছেন—'The dialect of Bengal is no longer a dialect, but has become the speech of Gods, a language unfading and indestructible which cannot die except with the death of the Bengali nation.' আজ বাংলা ভাষা এমন একটা স্তরে উঠেছে যাতে সে ভাষায় সব রকম ভাব প্রকাশ করাই সম্ভব। ভারতের অন্যান্য দেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই এর ঐশ্বর্যের ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তা বোঝাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'When a Mahratha or Gujerati has any thing important to say, he says it in English ; when a Bengali, he says it in Bengali. That is, I think, the fact which is most full of meaning for us in Bengal.' এ কথার মধ্যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। সে সময়ে সাহিত্য-সৃষ্টি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে লেখাপড়া করার প্রচলন ছিল ইংরেজি ভাষাতে। বর্তমানে বিদেশের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পর্কীয় বিষয়ে বা সংবাদপত্রে লেখা—এইরকম কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ইংরেজির প্রাধান্য আর কোন স্থলে প্রায় দেখা যায় না। মাতৃভাষার প্রতি বাঙালীর এই প্রত্যাবর্তনের মূলে অনেকখানিই যে রয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালগণের প্রতিভা—সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

CENTRAL LIBRARY

তবু বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গবেষণা একালে যে স্বীকৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে বঙ্গভারতীর দুজন একনিষ্ঠ সাধক ও আদর্শ শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াস—তাঁদের প্রতি বাঙালীর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। বাঙালীর সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তাঁর নিরলস প্রয়াসের জন্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের' উদ্বোধন করে তিনি অসীম দুঃসাহসিকতা ও অতুলনীয় ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯১৯ সাল ভারতীয় ভাষা-শিক্ষার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ঐ বছরেই স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের স্থাপনা হয়। এ শুধু বিচক্ষণ শিক্ষাবিদের দূরদর্শিতার পরিচায়কই নয়—এ তার প্রগাঢ় মাতৃভাষা-মমতারও নিদর্শন। এ সময়ে বিভিন্ন সাহিত্য সভায় সভাপতিরূপে তিনি যে সব বক্তৃতা করেছেন তাতেও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার প্রকাশই পরিলক্ষিত হয়। হাওড়া বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন—'বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু নির্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য।' সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বাংলা নয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষার উদ্বোধন তিনি করেন। আজ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের নিজের আঞ্চলিক ভাষাশিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু যে সময়ে স্যার আশুতোষ শুধু বাংলা নয়, অপরাপর আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে শিক্ষা-গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেন তখন অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই দিক দিয়ে আশুতোষের কাছে ভারতবাসীর ঋণ অপরিশোধনীয়। কবিগুরু স্যার আশুতোষের এই মহৎ প্রয়াসকে স্মরণ করেই বলেছেন—'অনেকদিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ীর দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সর্বপ্রথম আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। ···বাংলা ভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হয়ে উঠবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি, সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে, না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে।'

বাংলা-ভাষা-চর্চার প্রসার ব্যাপারে যাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়াস বিদ্যমান তিনি বঙ্গভারতীর মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্যের মাধ্যমে বাঙালীকে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট করেই নিরস্ত হন নি, আদর্শ শিক্ষাবিদের মতো মাতৃভাষা চর্চার সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন ও প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তিকে তাঁর অমোঘ ভাষায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। কল্পনাবিলাসী কবির এ আর এক মূর্তি। কবিগুরুর কয়েকটি প্রবল যুক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-চর্চার ব্যবস্থা করেন। সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই—বাঙালীর ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না।' এ ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন, যারা ইংরেজি জানে তাদের বিদ্যাকে 'চৌকস করার ব্যবস্থা।' তিনি বলেন—'চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা।' সেই ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার না থাকলে কোন রকম মৌলিক চিন্তা করাই সম্ভব হয় না। ফলে যে বিদ্যা আমরা শিক্ষা করি

CENTRAL LIBRARY

তা আমাদের পরিপাক হয় না। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষামূলক একাধিক প্রবন্ধে মাতৃভাষা অনুশীলনের সার্থকতা অব্যর্থভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তার ফলে বাংলাভাষী মাত্রেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষালাভ করার প্রয়োজন শুধু মাতৃভাষা-মমতার জন্য নয়, যে কোন বিদ্যাকে আয়ত্ত করার জন্যও অত্যাবশ্যক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ সম্পর্কে অনেকের ধারণা ছিল যে কবিগুরু নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এ সম্মান প্রদান করেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা কবিকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাঁর নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই। অতএব এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে বলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তৎপূর্বে ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কবি জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ পদক লাভে সম্মানিত হন। ১৯৩২ সালে 'কমলা-বক্তৃতা' দেবার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবিকে সাদর ও সশ্রদ্ধ আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালে জানুয়ারী মাসের ১৬ই, ১৮ই ও ২০শে তারিখে 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে পর ১৯৩২ সালে দু'বছরের জন্যে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ'-এর ঐ পদে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদ গ্রহণের পর রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' ও 'শিক্ষার বিকিরণ' শীর্ষক দুটি বক্তৃতা করেন। প্রথম ভাষণে তিনি প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপের তুলনামূলক আলোচনা করার পর আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ দেন। আর দ্বিতীয় বক্তৃতা 'শিক্ষার বিকিরণে' তাঁর বক্তব্য হ'ল—মুষ্টিমেয়ের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা অর্থহীন, শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত সর্বসাধারণের জন্যে—তাতেই হবে দেশের উন্নতি, তাতেই পাবে দেশ অগ্রগতি। সময়োপযোগী এ দুটি বক্তৃতাই তখন দেশবাসীর প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। বর্তমান কালেও এ দুটির মূল্য সমানই রয়েছে। ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই তিনি সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে যোগস্থাপন করতে চেয়েছিলেন—তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন সংস্কৃতিমূলক এই যে যোগ এর ভিত্তিই সবচাইতে দৃঢ়। আর এটা সম্ভব হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ আদর্শ হলে শিক্ষার বিকিরণের মাধ্যমে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে। ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন ভাইস-চান্সেলার। সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ব্যক্তি কিংবা উচ্চপদস্থ সরকারী কোন কর্মচারীই সমাবর্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার সম্মানলাভ করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সমাবর্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও বেসরকারী ব্যক্তি এই প্রথম আহূত হলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছরের ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যে কত বড় সম্মান তা সহজেই অনুমেয়—এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে শ্যামাপ্রসাদেরই প্রাপ্য। এই সমাবর্তন উৎসবের আর একটি বড় বিস্ময় ও কীর্তি—রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষায় বক্তৃতা-দান। সে সময়ে ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই মাতৃভাষায় সমাবর্তন-ভাষণ দেবার কথা

CENTRAL LIBRARY

কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না—রবীন্দ্রনাথ তাকেই বাস্তব-সত্যে পরিণত করে বাংলাভাষার যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন বাঙালী চিরদিন তা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করবে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। সে প্রতিভা যেন একটা জ্যোতির্গোলকের মতো—সর্বত্র একই কালে আলোকবিকিরণক্ষম। তাই যেমন কবিকল্পনার ক্ষেত্রে তেমনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তার অবাধ প্রকাশ। ভাবলেও বিস্ময়ের সীমা থাকে না যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাতত্ত্বেরও পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা হয়েছে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আর রবীন্দ্রনাথের আলোচনা একদিক দিয়ে আজও অনতিক্রমণীয়। রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন ঠিক সেই বস্তু অন্য কারুর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিনয় করে বলেছেন, 'আমি যেন পায়ে-চলা-পথের ভ্রমণকারী।..... চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব।.....বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয়নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও।' ভাষাতাত্ত্বিকের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বাংলাভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করেন নি সত্য; কিন্তু তার চাইতেও বড় কাজ তিনি করেছেন—নিপুণ চিত্রশিল্পীর মতো তুলির কয়েকটিমাত্র টান দিয়ে তিনি বাংলাভাষার একটা জীবন্ত মূর্তি এঁকেছেন। এখানেই রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা।

ভাষার রহস্য কবির কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বহুপূর্বেই—উনিশ শতকের শেষ দশকে মানসী-সোনার-তরীর যুগে—কবিপ্রতিভার বাধাবন্ধহীন স্বচ্ছন্দ প্রকাশের কালে। বাংলাভাষার স্বরূপ-উদ্ঘাটন-প্রয়াসী কবির যে সব লেখা ১৮৮২ সাল থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায়, বিশেষভাবে 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত হয় সেইগুলিই সংগৃহীত ও সংশোধিত হয়ে পুস্তকাকারে 'শব্দতত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। কবির এই বাংলাভাষা-জিজ্ঞাসার শেষ দান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা-পরিচয়'। বাংলা-ভাষার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেননি সত্য, কিন্তু যেমন 'শব্দতত্ত্ব'-এ তেমনি 'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এ বাংলাভাষার অভ্রান্ত নাড়ীজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রই বাণীশিল্পী। সেই শ্রেষ্ঠ বাণীশিল্পী যখন ভাষাবিশেষের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন তখন তা কেমন সার্থক ও সুন্দর হতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এ কবি নিপুণভাবে চলিতভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন—'যা হোক, যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলাভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধুভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপট।' কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যের কথ্যভাষা বলে মেনে নেওয়া হবে তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে-সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টসকানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সর্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত।' এর ৩৮ বছর আগে স্বামী

CENTRAL LIBRARY

বিবেকানন্দও ঠিক এ কথাই বলেছিলেন—'কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কলকাতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এখায় গ্রাম্য ঈর্ষ্যাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।' আর বলেছিলেন—'দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা দু'হাজার ছাদি বিশেষণেও নেই।' তাই দেখতে পাচ্ছি কথাভাষাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মূলে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এর প্রভাব অল্প নয়।

ব্যাকরণ-বিষয়ে যখন আমরা অতিরিক্ত সচেতন হই তখন প্রায়ই একটা কথা ভুলে যাই যে ভাষা সব সময় যুক্তি মেনে চলে না। একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'মাত্র চারজন লোক : এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায় শুনি। বরাবর বলে এসেছি 'চারজন মাত্র লোক,' অর্থাৎ চার-জনের দ্বারা মাত্রা পাওয়া, পরিমিত হওয়া লোক। অবশ্য 'মাত্র' শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার সুবিধে হয়।' এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষাবিশেষের শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যাকরণে আছে ভাষার মৃতরূপ। জীবন্তরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ভাষাবিশেষের শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায়। তাই নলিনীকান্ত গুপ্তকে ইউরোপীয় ভাষায় শিক্ষাদান কালে শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক আরম্ভ করলেন Euripides দিয়ে, লাতিন Virgil এর Aeneid দিয়ে, ইতালীয় Dante দিয়ে, ফরাসী Moliere দিয়ে। এ পন্থা অনুসরণ করে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজের অনুভূতি সম্পর্কে নলিনীকান্ত বলেছেন—'মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়েছি গিয়ে ভাষার অন্তস্তলে, ভাষার যেখানে প্রাণস্পন্দন, সার সৌন্দর্য, পূর্ণ শক্তি সেই মর্মমূলে প্রবেশ করছি, এইজন্যেই হয়ত ফরাসী ভাষায় কবিতা বা গদ্য রচনা করতেও অনুপ্রাণিত হয়েছি, যেন ভাষার আন্তর রহস্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি।' এ হল একেবারে জিনিসের মাঝখানে গিয়ে প্রবেশের রীতি। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার স্বরূপ যেভাবে উদ্ঘাটন করেছেন তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে তাঁর দৃষ্টিও মুখ্যত প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের উপরই নিবদ্ধ। বাণীশিল্পের এইরকম রহস্যোদ্ঘাটন রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ বাণীশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এই 'বাংলাভাষা-পরিচয়' পুস্তকখানা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেই দিক দিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র দানের কিছুটা গৌরব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যই প্রাপ্য।

CENTRAL LIBRARY

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

'বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেলধারা বাঙ্গালী চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।'

'শিক্ষা' গ্রন্থের শিক্ষার বিকিরণ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা উন্মুখর হয়েছিল বিশ শতকের শুরুতেই। অবশ্য তারও আগে, মানে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে ও ভাষণে বঙ্গভাষা-সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে শিক্ষায়তনের, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুদায়িত্বের কথা বলে আসছিলেন। বিদেশী শাসন যখন দেশের সর্বস্তরে বাঙ্গালী মনীষা ও মেধাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার পথে একটা মস্ত বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ, স্যর গুরুদাস ও স্যর আশুতোষ প্রভৃতির এই ভাষা-সংস্কৃতিগত স্বাধিকার প্রচেষ্টা আজ সর্বজনমান্য হতে বাধ্য। ১৯১৯-২০ সালে বাংলা তথা অপরাপর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পঠন পাঠনের মুক্তিদুয়ার খুলে গেল। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এই পরিকল্পনা তখনও গৃহীত হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য কি করতে পারে? সমস্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দেখেছিলেন এখানে তার একটুখানি আলোচনা বোধহয় অবান্তর হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে যাতে বাঙ্গালী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এজন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন। যদিও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাংলা তখনও সাবালকত্ব অর্জন করেনি তথাপি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গভাষা সেই স্বারাজ্য না পেলে কোনো কাজই হবে না। অনুবাদ পরিভাষা নির্মাণ ও শিক্ষার সর্বস্তরে বাঙ্গলা ভাষার একটা ন্যায়সঙ্গত দাবীকে কবি উপস্থিত করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত বিবেকবান ব্যক্তির কাছে তাঁর আবেদন বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন।

অপর একটি দিক হল, সাহিত্যের দিক। প্রাচীন মধ্যযুগীয় বঙ্গসাহিত্যের লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার এবং সমস্ত বাঙ্গালী ছাত্রসমাজে সাহিত্য পঠনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া।

১৮৯১ সালে স্যর গুরুদাসের উৎসাহ পেয়ে ফ্যাকালটি অব আর্টসের এক সভায় আশুতোষ প্রস্তাব করলেন, ফার্স্ট আর্টস (পরবর্তীকালে ইন্টারমিডিয়েট) পরীক্ষায় এমন কি বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত ছাত্রদের বাঙ্গলা অথবা ওড়িয়া অথবা হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু আশুতোষের এই প্রস্তাব গৃহীত হলো না। হলে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সেদিনই সার্থক হবার প্রশস্ত পথ খুঁজে পেত।

১৮৯৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য বিষয় করবার জন্য যে প্রস্তাব পাঠালেন মনে হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা পরোক্ষভাবে অনেকটা কার্যকরী হয়েছিল। ফ্যাকালটি অব আর্টস গঠিত কমিটি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বাঙলাভাষার অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগ্রহণ, রীডারশিপ বক্তৃতামালা, ১৯০৯ সালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে বঙ্গভাষা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনার বক্তৃতায়

CENTRAL LIBRARY

আমন্ত্রণ এবং শেষ পর্যন্ত বাঙ্গলাকে প্রধান ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেবার সনদ লাভ—এই এতগুলি আন্দোলনের ধারা—সংক্ষেপে এই হল বঙ্গভাষার বিশ্ববিদ্যালয়গত অধিকার লাভের ইতিহাস।

বাংলাভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার না দিলে নিরক্ষরতার অন্ধকার ঘুচবে না, দেশের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আপামর জনসাধারণের আঁতের যোগ ঘটবে না, এই সত্য রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্যগ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হবে।' কিন্তু ইংরেজির পাশাপাশি এই ভাষা তখনই সমস্ত রকম সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ পায়নি। এজন্য কেবল বিদেশীদের দোষ দেওয়া যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের মধ্যেও একটা উচ্চমন্যতার ভাব বদ্ধমূল ছিল। এইজন্যই তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, 'শিক্ষাসরস্বতীকে সাড়ি পড়ালে আজও অনেক বাঙ্গালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা সাড়িপরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পরিতাপের অনেকটা নিরসন হয়েছিল। কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি ছিল।

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে আবেদন উপস্থিত করেছিলেন তার একটা ব্যাপক গুরুত্ব আমরা আজো উপলব্ধি করতে পারি।

তিনি বলেছিলেন, 'দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি পেটাপিটি করিতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরই মধ্যে একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন। তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক, বাঙ্গলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এতো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকস করিবার ব্যবস্থা। আর যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতো বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথায় আছে?..... আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আমদরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙ্গালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তবে বাধাটা কি?'

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও সাহিত্যই কেবলমাত্র নয়, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষা ইংরেজি গণ্ডীর বাইরেও সর্বজনীন ভাবে বিস্তৃত হোক এটাই কামনা করেছিলেন। এ দায়িত্ব কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ আর নয়—জাতীয় সরকারের। তাই আমরা বিচার করে দেখব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গঠনমূলক উন্নতিকল্পে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি কি কাজ করেছে। গবেষণা, গ্রন্থপ্রকাশ ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সংরক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াস কি ভাবে কতভাবে বিভিন্নখাতে বিস্তৃত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একটা গঠনমূলক কাজ শুরু হোক এবং মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রসমাজের মন আকৃষ্ট হোক এই আকাঙ্ক্ষায় কবি 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্যর আশুতোষ ও আচার্য দীনেশচন্দ্র প্রমুখ দিকপাল ও সাহিত্যরথিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শিক্ষার জাতীয়করণের সঙ্গে এই ভাষা সাহিত্য অনুশীলনের কাজটি ছিল পরস্পর সম্পর্কে যোগযুক্ত।

CENTRAL LIBRARY

'বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।'

'বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। ..... আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।'

'আমাদের ব্রতপার্বণ গুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে' (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ)। এই প্রবন্ধ রচনার কাল হলো উনিশ শতকের শেষ থেকে নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। আগেই বলেছি ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারশিপ বক্তৃতামালার সূত্রপাত হয়। স্যর আশুতোষ তখন উপাচার্য। ১৯০৯ সালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বলতে গেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা-সাহিত্যক্ষেত্রে এটিই প্রথম গঠনমূলক অবদান। দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রথম গবেষক যাঁর অক্লান্ত নিষ্ঠা আজও অম্লান দীপ্তিতে বঙ্গভারতীর পুণ্য নিকেতনটিকে আলোকিত করে রেখেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইতোপূর্বে প্রাচীন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন গবেষণার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, দীনেশচন্দ্র প্রবৃত্ত হলেন ব্যাপক অনুসন্ধানে। পরবর্তীকালে অনেক প্রাজ্ঞ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাঁর গ্রন্থাদির ভ্রমকে একটু বড়ো করে দেখিয়েছেন; কিন্তু প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে তিনি যদি পথরেখা প্রস্তুত করে না যেতেন তবে আমরা গতিপথ পেতেম কোথায়? ছাত্র ছিলাম যখন, তখন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছে আচার্য দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা-প্রীতি ও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিষয়ে অনেক গল্পই শুনেছি। শুধু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও যশের আকাঙ্ক্ষা নয়, দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চার একটা শক্ত বুনিয়াদ গড়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

একদিকে দীনেশচন্দ্র অপরদিকে সুনীতিকুমার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই দুজন দিকপাল আমাদের ইতিহাস সাহিত্য সংস্কৃতির বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ সৃষ্টি হওয়ার প্রথম যুগে। দীনেশচন্দ্রের সুবৃহৎ গ্রন্থ, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।' সাহিত্য রসাস্বাদন ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়া সর্বত্র সম্ভবে না। সুনীতিকুমার এই ভাষাতত্ত্ব গবেষণার বৃহৎ ভিত্তি নির্মাণ করে দিলেন। পরবর্তীকালে প্রাচীন মধ্যযুগীয় বঙ্গসাহিত্য ইতিহাসের বৃহৎ স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। সাহিত্য ও ভাষার লোকায়তিক ও বিদগ্ধ জগতের সেতুবন্ধনের প্রকৃত ইতিহাস না জানলে কোনো জাতিরই সংস্কৃতি-সাহিত্যের পূর্ণপরিচয় লাভ অসম্ভব। কেবল গবেষণা গ্রন্থ নয়, এই দিক দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই বোধহয় ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণ ও সংগ্রহকার্যে প্রথম পথিকৃৎ। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক প্রাচীন পুঁথি সম্পাদিত হয়ে আমাদের বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, অজস্র উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে লোকসাহিত্যের। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিকাশে অগণিত জনমানসের প্রেরণাটি কেমন করে যুগে যুগে কার্যকর হয়েছে এসব বিষয়ের সমীক্ষণ বিশেষ আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বহু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

আমাদের সহস্র বছরের অতি উচ্চ সমৃদ্ধ সাহিত্যকে বিশ্বের সভায় উপস্থিত করেছেন। বিশ্বের বহু দেশ থেকে ভেরা নবীকোভার মত সাহিত্যভক্ত যে বঙ্গভারতীর আঙিনায় অঞ্জলি দিতে এসেছেন এজন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিসীম অবদানের কথা স্মরণ করি।

কেবল প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য নয়, বিশেষত প্রমথনাথ বিশী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন সম্পর্কে এবং নীহাররঞ্জন রায় ও সুবোধ সেনগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ সাহিত্য মূল্যায়নের যে অভিনব স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণ করবো।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ আজো অক্লান্তভাবে বঙ্গভাষা সাহিত্যের গবেষণা ও অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন। কিন্তু আরো বহু কাজ বাকী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদের আবেদন, জাতীয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নকে তাঁরা আরো প্রয়োগভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তব, প্রগতিশীল ও উৎপাদনক্ষম করে তুলুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বঙ্গভাষা-সাহিত্য বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ব্যবহারিক বিভাগ চালু হোক। বাংলা অভিধান, পরিভাষা, অনুবাদ, সাংবাদিকতা, টাইপ শর্টহ্যাণ্ড ইত্যাদির উন্নয়ন, বিবলিওগ্রাফি, গ্রন্থতালিকা নির্মাণ, ইতিহাস রচনা ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্র সমাজের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হোক। অতি আধুনিক সাহিত্য পঠন পাঠনের প্রগতিশীল পাঠসূচীরও একান্ত আবশ্যক। সৃষ্টিশীল সাহিত্যকলার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহারিক দিকটি আরো সম্প্রসারিত হোক। তবেই ছাত্ররা তাদের মাতৃভাষাকে সম্মান করতে শিখবে।

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যবিচারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান

শুকদেব সিংহ

সে ছিল এক রাখালছেলে, গ্রামের পথে আপন মনে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াত। রাজবাড়ীর হাতী বেরিয়েছিল রাজা খুঁজ্‌তে। হাতী পথের মধ্যে রাখালছেলেকে দেখ্‌তে পেয়েই শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্য হাওদায় তুলে নিল, ছুটে চ'ল্‌ল রাজবাড়ীর দিকে। তারপর রাখালছেলে রাজা হ'ল, তবে রাজকার্য সে কেমন চালাতে লাগল রূপকথায় লেখেনি। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ রূপ দেওয়ার কথায় আরেকজনের কর্মকৃতির ইতিহাস সোনার অক্ষরে লেখা আছে। তিনি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। পূব-বাংলার সুয়াগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যাবান্ অথচ সরলপ্রাণ মানুষ ছিলেন দীনেশচন্দ্র। তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বৈষ্ণবপদাবলীর রস-মাধুর্য আস্বাদনে নিরত ছিলেন, চণ্ডীদাস পদাবলীর রসে সিক্ত মন নিয়ে বাংলাসাহিত্যের বিধিবদ্ধ এক ইতিহাস রচনায় ছিলেন ব্রতী। তাঁর ওপর দৃষ্টি পড়ল 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষের। স্যার আশুতোষ দীনেশচন্দ্রকে সাদর আহ্বান জানালেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করার জন্য। নবসৃষ্ট বিভাগের অধ্যাপক-প্রধানরূপে দীনেশচন্দ্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করলেন, তখন বাংলাসাহিত্য-আলোচনার বিভিন্ন দিক হল সমুদ্ভাসিত, বৈষ্ণবসাহিত্য-দর্শন অনুশীলনের মরা গাঙে এল পরিবর্তনের জোয়ার।

দীনেশচন্দ্রের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তনা দেওয়ার আগে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য বিচারের ছিল এক সঙ্কীর্ণ চরিত্র। আখড়া-বাড়ীর বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা করতেন সত্য, কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় তাঁদের অটল বিশ্বাস। তাই তাঁরা মনে ক'রতেন, শ্রীভগবানের সব লীলা সব সময়েই হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে কালক্রম বা পারম্পর্য বিচার অবিধেয়। এমন মতবাদ থাকার দরুণ আখড়াবাড়ীর বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও সাহিত্যের ইতিহাসসম্মত আলোচনা ক'রতেন না। বৈষ্ণব-আবেষ্টনীর বাইরে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীরা বৈষ্ণব পদাবলীর যে আলোচনা ক'রেছেন তাতেও সাহিত্যের রসাস্বাদনই হ'য়েছে; বৈষ্ণব পদাবলী যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনসঙ্গীত, তাই বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের নিরীখে যে তার বিচার হওয়া উচিত সে-বিষয়ে কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। দু-এক জন যাঁরা বৈষ্ণব বিষয়ের ঐতিহাসিক বিচার ক'রতে গিয়েছেন তাঁরাও ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ বিচারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসে চালিত হ'য়ে কেউ প্রমাণ ক'রতে ব'সেছেন বিখ্যাত পদকার বিদ্যাপতি ছিলেন বাঙ্গালী আবার কেউবা বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা গোবিন্দদাস কবিরাজকে অবাঙ্গালী গোবিন্দ ওঝা ক'রে তুল্‌তে চেয়েছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনার এমন সঙ্কীর্ণ চরিত্রের পটভূমিতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তনা সুরু হ'য়েছে। দীনেশচন্দ্র স্বয়ং কলম ধ'রেছেন। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই রচনা ক'রেছেন **'The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal'**। গ্রন্থখানিতে দীনেশচন্দ্র সত্যকার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাক্-চৈতন্য পর্বের বৈষ্ণব সাহিত্যের দিশা নির্ণয় ক'রেছেন, বিদ্যাপতির দেশ মিথিলার রাজাদের জয়দেব-অনুরাগের দিয়েছেন তথ্যভূয়িষ্ঠ বিবৃতি; আরও বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার ও গোস্বামীগণের জীবনেতিহাস তিনি অতি নিপুণতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিস্ময়ের বিষয়, প্রেমবিলাস সম্পর্কে বল্‌তে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেই যুগেই অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছেন যে, গ্রন্থটির ১৮।২০শ বিলাস পর্যন্তই বিশ্বাস্য। বৈষ্ণব

CENTRAL LIBRARY

পদাবলীর রস-মাধুর্য বিশ্লেষণ ক'রতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন 'পদাবলী-মাধুর্য' (১৯৩৭ খ্রীঃ)। এ গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব বাদ দিয়ে নিছক সাহিত্য বিচার করেন নি, তাই গ্রন্থ মধ্যে নিজেই ব'লেছেন—'চণ্ডীদাসের বহু পদে শুধু পার্থিব ভাব দিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে ঠকিতে হইবে' (পদাবলী-মাধুর্য, পৃঃ ১৩)। চৈতন্যোত্তর কালের পদকারগণ শ্রীরাধার পরিকল্পনায় অনেক স্থলেই যে শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনের আরোপ ক'রেছেন আবিষ্কারক দীনেশচন্দ্র তা ভক্তিনম্রতায় ব্যক্ত ক'রেছেন আলোচ্য গ্রন্থটির পত্রপুটে। কেবল গ্রন্থরচনাই নয়, বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য অধ্যয়নের অবাধ সুযোগ ক'রে দিয়েছেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে; তাই স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী। নানান্ অঞ্চলে সংগ্রাহক পাঠিয়ে তিনি বৈষ্ণব বিষয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও প্রাচীন পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ ভাণ্ডারে আহরণ ক'রে এনেছেন। এভাবে দীনেশচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রয়াসে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনায় সর্বজনস্বীকার্য এক উন্নত মানের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে।

দীনেশচন্দ্রের পর স্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কে তিনি একের পর এক জ্ঞানগর্ভ ক'টি বক্তৃতা দিয়েছেন। সে-সব বক্তৃতা আজ 'বাংলার বৈষ্ণব দর্শন' নামে গ্রন্থরূপ পেয়েছে (১৯৬৩ খ্রীঃ)। প্রমথনাথ তর্কভূষণের বৈষ্ণব আলোচনায় এরূপ শাস্ত্র ও সাহিত্য বিচারের আরেক দিগন্ত হয় অবারিত। তাঁর পূর্বে সংস্কৃতে যাঁরা বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাঁরা বেদ-উপনিষদ্ বা কালিদাস-ভবভূতি ছেড়ে বাংলার বৈষ্ণব বিষয়ে তেমন দৃষ্টি দিতেন না, কেমন যেন উপেক্ষার মনোভাব নিয়ে চ'লতেন। অন্যদিকে যাঁরা কেবল বাংলা জানতেন তাঁরা সংস্কৃত বিষয়ে অজ্ঞতার দরুণ শ্রীরূপ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যদের সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থাদির মর্মোদ্‌ঘাটন ক'রতে পারতেন না। ফলে সংস্কৃত ও বাংলা জ্ঞানের তুলসী-গঙ্গাজল সম্মিলনে বৈষ্ণব-আলোচনার যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'তে পারতো তা হয়নি। সেই কাজটিই প্রথম করেছেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 'বাংলার বৈষ্ণবদর্শন' বক্তৃতামালায় তিনি বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, লৌকিক কাব্য শাস্ত্রকারদের রসবাদ প্রভৃতির সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের অতি সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ ক'রেছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ পাশ্চাত্য কলাবিদদের মতের সঙ্গেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের তুলনা ক'রেছেন। তাই এ সময় থেকে বৈষ্ণব আলোচনার রস-গঙ্গায় বৈচিত্র্যের বান এসেছে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্রের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্ণধার হ'য়েছেন কীর্তনপ্রেমী খগেন্দ্রনাথ মিত্র। দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনার প্রভূত অভিজ্ঞতা, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য অনুশীলনের দীপ্ত দীক্ষা ও অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে খগেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব আলোচনা সুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইটপাথরে তৈরী কক্ষকে বৈষ্ণব আলোচনা-বাসরের মধুমর্ম প্রেক্ষাপটে ক'রেছেন রূপান্তরিত। বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশেও খগেন্দ্রনাথ হয়েছেন অগ্রণী। তিনি তাঁর গুরু অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর পদ-সংকলনের পাণ্ডুলিপি থেকে নবদ্বীপ ব্রজবাসীর সহযোগিতায় কয়েক খণ্ড 'পদামৃতমাধুরী' প্রকাশ ক'রেছেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে একযোগে তিনি সম্পাদনা ক'রেছেন বিদ্যাপতি-পদাবলী (১৯৪১ খ্রীঃ)। খগেন্দ্রনাথের 'প্রেমের ঠাকুর' গল্পে বৈষ্ণবীয় ভক্তির সুন্দর অভিব্যক্তি আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ছায়ায় এক বৈষ্ণব ভক্তের অতন্দ্র প্রতীক্ষা সেখানে রূপায়িত হ'য়েছে। হৃদয়ের স্বত-উৎসারিত ভক্তিকে অনুশীলনের অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে খগেন্দ্রনাথ রচনা ক'রেছেন 'বৈষ্ণব রস-সাহিত্য' (১৯৪৬) ও 'কীর্তন' নামে দুখানি বই। চতুর্বিধ কীর্তনের আঙ্গিক এ দু'খানি গ্রন্থে স্পষ্টত আলোচিত হ'য়েছে। প্রয়োগবিধি স্থান পেয়েছে পদাবলীর তত্ত্ব আলোচনার মাঝেই। সুতরাং বৈচিত্র্য আরও বেড়েছে। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মনীষী অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু

CENTRAL LIBRARY

'দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী' দু-খণ্ড ও 'সহজিয়া পদাবলী' সম্পাদনা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশ করেছেন। এ দু'টি গ্রন্থের ভূমিকা ও মূল পাঠে বৈষ্ণব জগতের অনাবিষ্কৃত অনেক ইতিহাস সকলের সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

এতদূর পর্যন্ত যা আলোচনা হ'য়েছে তাতে এটিই প্রমাণিত যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তনায় দু-প্রস্থ কাজ হ'য়ে এসেছে। একদিকে বৈষ্ণব গ্রন্থের আবিষ্কার, অধ্যাপনা ও আলোচনা গ্রন্থ প্রণয়ন চলেছে, অন্যদিকে ব্যবস্থা হ'য়েছে বৈষ্ণব বিষয়ে বক্তৃতামালার। অতঃপর তৃতীয় একপ্রস্থ কাজের সংযোজন হ'য়েছে, সে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা। এ বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেনের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ডক্টর সেন ইংরাজি ভাষায় **'History of Brajabuli Literature'** (১৯৩৫ খ্রীঃ) গবেষণা গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। গ্রন্থে ব্রজবুলি ভাষাশ্রয়ী বৈষ্ণব পদকারদের রচনা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা হ'য়েছে, আরও ব্রজবুলি পদসাহিত্যের হ'য়েছে রস-ঋদ্ধ আলোচনা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে গবেষকের বিরাট ভূমিকা নিয়ে অতঃপর আবির্ভূত হ'য়েছেন ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার। ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্বে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, তার ওপর নবদ্বীপের সন্তান এবং বৈষ্ণববাড়ীর ছেলে—বৈষ্ণব-আচার্য অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর সাক্ষাৎ দৌহিত্র। তাই বৈষ্ণবতা ছিল ডক্টর মজুমদারের মজ্জাগত। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বাংলা, সংস্কৃত, ওড়িয়া ও অসমীয়া গ্রন্থগুলি নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা ক'রে শ্রীচৈতন্যের জীবনের নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলি আবিষ্কারে ব্রতী হ'য়েছেন। শ্রীচৈতন্যজীবনের বহু ঘটনার নির্ভুল সাল-তারিখ নির্ণয় ক'রেছেন ডক্টর মজুমদার। তাঁর এই অসামান্য গবেষণার ফল—'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থ (১৯৩৮ খ্রীঃ)। এই প্রথম গবেষণা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হ'য়েছে এবং এই একখানি গবেষণা গ্রন্থেরই অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। ডক্টর মজুমদার পরে অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা ক'রেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা-কক্ষে বিদ্যাপতি সম্পর্কে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছেন, তবু তাঁর শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত প্রথম বইখানিই আলোচক-মহলে রসকেন্দ্রের কাজ ক'রেছে, এটিকে অন্তরে রেখেই প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পিভূষণ তর্কবাগীশ শ্রীচৈতন্যচরিতের ধারাবাহিক আলোচনা করেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, সাহিত্যিক ও সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন 'বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য' সম্পর্কে। রায়চৌধুরী মশাই পরে অন্য একটি বক্তৃতা দিয়েছেন, সেটি প্রকাশিত হ'য়েছে 'শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ' গ্রন্থে।

যমুনায় ঢেউ দেওয়ার মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-সময় বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য প্রকাশের আকাশ ছোঁয়া উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। মণীন্দ্রমোহন বসু, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী প্রমুখ আলোচকদের পূর্ব-উল্লিখিত বইগুলি তো বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ ক'রেছেনই, আরও পদ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ ক'রেছেন, দ্বারেশ শর্মাচার্য ও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রায়শেখরের পদাবলী।' নিজে গ্রন্থ প্রকাশ করাই নয়, অন্যত্র প্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থের স্বীকৃতিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন অনেকভাবে। যেমন, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদিত 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' বইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরে ইংরেজি সাহিত্যের সুধী সমালোচক ও মনীষী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হ'য়ে, তখন তাঁর সহজাত বৈষ্ণব-অনুরাগে বৈষ্ণবসাহিত্যের অনুশীলন বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয়ে অধ্যাপনা ক'রেছেন, তেমনি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY

হ'য়েছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সহযোগিতায় সম্পাদনা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশ করেছেন 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর রসমাধুর্য সম্পর্কে লীলা বক্তৃতামালা প্রদান ক'রতে আসেন কবিশেখর কালিদাস রায়। বৈষ্ণবপদকর্তা লোচনদাস ঠাকুরের বংশধর তিনি, তাছাড়া বৈষ্ণবভাবাপন্ন প্রখ্যাত কবি। তাই তাঁর সহৃদয় বিশ্লেষণে পদাবলীর রস-পর্যায়গুলি অতি অপূর্ব সূক্ষ্মতায় প্রতীত হ'য়েছে। গোষ্ঠীভুক্ত প্রাচীন গীতিকবিতার নিদর্শন যে বৈষ্ণব পদাবলী তাও কবিশেখরের অনিন্দ্য বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এই বক্তৃমালা 'পদাবলী সাহিত্য' নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই হয়েছে প্রকাশিত। বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মের অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ডক্টর সুশীল কুমার দে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকালে বৈষ্ণব সাহিত্য ও রসতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণাতেও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর সতী ঘোষ অধ্যাপক-প্রধানের অধীনেই গবেষণা ক'রে ডি-ফিল্ উপাধি পান, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে শ্রীচৈতন্য'। পরে ডক্টর (শ্রীমতী) ঘোষ বৈষ্ণব বিষয়ে আরও গবেষণা ক'রেছেন। তারই ফল—'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ' (১৯৬৯) ও 'দাক্ষিণাত্যের 'আড়বার' গীতি ও বাংলার বৈষ্ণব 'মহাজন' পদাবলী' (১৯৭২)। ডক্টর উমা রায় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ ক'রেছেন। ভরত মুনির রস-ব্যাখ্যার পটভূমিতে ভুক্তিবাদ, মুক্তিবাদ আদি যে চারটি মতবাদের উৎপত্তি হ'য়েছে তারই নিরীখে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করেছেন ডক্টর রায়। তিনি নিজে কবি, তাই বৈষ্ণব রসের চাতুর্য তাঁর আলোচনার প্রতিটি ছত্রে অনুভবগম্য হয়ে উঠেছে।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'য়েছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ডক্টর দাশগুপ্ত অধ্যাপক-প্রধানের পদ পাওয়ার আগেই 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—সাহিত্যে ও দর্শনে' এই নামে অসামান্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (১৯৫২ খ্রীঃ)। এ গ্রন্থে বৈদিক শ্রী বা রাত্রি দেবী থেকে সুরু ক'রে কালক্রমে শক্তিকল্পনা কিভাবে বৈষ্ণবের শ্রীরাধায় রূপপরিগ্রহ করল তার অতি সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ডক্টর দাশগুপ্ত ক'রেছেন। তিনি তাঁর কার্যকালে জ্ঞানীগুণী অনেককেই আহ্বান ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাক্ষেত্রে নিয়ে আসেন। শ্রীশর্বরীপ্রসাদ বসু বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে মনোজ্ঞ দু'খানি আলোচনাগ্রন্থ লেখেন—'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' এবং 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।' এ দু'খানি অসামান্য বৈষ্ণব গ্রন্থের স্বীকৃতি স্বরূপই ডক্টর দাশগুপ্ত শ্রীবসুকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যাপনার দায়িত্ব প্রদান করেন। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও ডক্টর দাশগুপ্তের প্রেরণাতেই 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামে বিরাটকায় যে তিন খণ্ড বই লিখেছেন তার দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের ক'রেছেন বিস্তৃত আলোচনা। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে ষড়্‌গোস্বামীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি নিয়ে দ্বন্দ্ব আলোচনা ক'রেছেন।

বৈষ্ণব গবেষণার দিক দিয়েও ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের কার্যকাল বিশেষ উল্লেখ্য। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ মাইতি ডক্টর সুকুমার সেনের তত্ত্বাবধানে শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচরদের জীবনেতিহাস নিয়ে গবেষণা ক'রেছেন, গ্রন্থটির নামকরণ হ'য়েছে 'চৈতন্যপরিকর।' ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের তত্ত্বাবধানে পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরূপের প্রভাব নিয়ে কাজ ক'রেছেন বর্তমান প্রবন্ধকার। তাঁর গ্রন্থটি 'শ্রীরূপ ও পদাবলীসাহিত্য'। এতে বৈষ্ণবজগতে শ্রীরূপের স্থান ও মাহাত্ম্য বিশিষ্টভাবে নিরূপিত হ'য়েছে, বৈষ্ণবের মঞ্জরীভাবের সাধনার তথ্যভূয়িষ্ঠ বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া

CENTRAL LIBRARY

হ'য়েছে, আরও অধুনালুপ্ত 'রসবিলাসবল্লী' গ্রন্থ থেকে ঘনশ্যাম কবিরাজের এমন পঞ্চান্নটি পদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে যেগুলি প্রচলিত বার হাজার বৈষ্ণব পদপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত নয়। ডক্টর দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে আরও আরও দুটি অমূল্য গবেষণা পরবর্তীকালে শেষ হ'য়েছে—একটি ডক্টর নরেশচন্দ্র জানার 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী', অন্যটি ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তীর 'বিদ্যাপতি-সমীক্ষা'। ডক্টর জানার বইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ ক'রেছেন। ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তীর গ্রন্থে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বহু পদ হ'য়েছে আবিষ্কৃত। এ গবেষণা কার্যটি শেষপর্যন্ত সুসম্পন্ন হ'য়েছে অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে।

চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিজ্ঞ ব্যাখ্যাতা পরমবৈষ্ণব ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ ডক্টর দাশগুপ্তের ব্যবস্থাপনাতেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি-লিট্ উপাধি পান। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব বিষয়ের পৃষ্ঠপোষকতাই লক্ষণীয়।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের অকালবিয়োগে বাংলাবিভাগের কর্ণধার হন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। তাঁর আমলে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গবেষণা ক'রে ডক্টর জয়গুরু গোস্বামী বৈষ্ণব গবেষণায় উল্লেখ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ডক্টর জয়গুরু গোস্বামীর গবেষণার বিষয় ছিল—'লোচনদাসের কাব্যকৃতি।'

সাম্প্রতিককালের মধ্যে বৈষ্ণব বিষয়ে সবচেয়ে বড় কাজ বৈষ্ণবসাহিত্যের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা ও রসোপভোক্তা আচার্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীকে কমলা বক্তৃতামালার জন্য আমন্ত্রণ। শ্রীচক্রবর্তী বৈষ্ণবদর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধা সম্পর্কে অতি গভীর এক আলোচনার অবতারণা ক'রে সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী ১৭।১৮ শতকের পদকারদের নিয়ে গবেষণা ক'রে এ-সময় ডি-লিট্ উপাধি পেয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ—'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য' (১৯৬৮ খ্রীঃ)।

এবার অধ্যাপক-প্রধানের শ্লাঘ্যপদে আসীন হ'য়েছেন অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম শ্রমশীলতার প্রতীক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। পূর্ব থেকেই তিনি বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শনবিষয়ে যে বিশেষ অনুরাগী তার অভিজ্ঞান রয়েছে তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে। গ্রন্থমধ্যে ডক্টর ভট্টাচার্য বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অতি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা ক'রেছেন। এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ। বৈষ্ণব বিষয়ে অনেকের অনেক প্রত্যাশাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে, ধীরে ধীরে সেগুলি যে বাস্তব রূপ পাবে তা সুনিশ্চিত।

প্রবন্ধ-শেষে নীরব হওয়ার পূর্বে বলি, আজ দিল্লী ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শন যে স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যসূচীতে আবশ্যিক বিষয়রূপে নির্ধারিত হ'য়েছে, সে-সব জায়গায় বৈষ্ণব বিষয়ে যে দুরূহ গবেষণাদি চলছে, সেক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক দশক ব্যাপী বৈষ্ণব-অনুশীলনের ফলশ্রুতিই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই শেষ নয়, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

CENTRAL LIBRARY

বাংলাভাষা বিষয়ক গবেষণা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

আমাদের ১৯৭১ সালের সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'ভাষাতত্ত্বের দিক্‌দিগন্ত' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি আজ পর্যন্ত বিচিত্র বহুমুখী ভাষাবিষয়ক গবেষণার প্রধান তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারা আমাদেরই দেশের প্রাচীন মনীষীরা প্রবর্তন করেছেন অপরূপ ভাষা-বিশ্লেষণে, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে। এক বিশিষ্ট ঋষিদৃষ্টি দিয়ে ভাষার সর্বদিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ বিস্তারিত বিচার, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাবলীর সাহায্যে। এর তুলনা নেই জগতের কোথাও। ঐ প্রবন্ধের দুএকটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলতে আগ্রহ বোধ করছি। 'পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অগভীর অনুশীলন এবং অনেকে ঈর্ষামূলক পক্ষপাত দুষ্ট কুবিচার করে প্রাচীন ভারতের প্রাপ্য সমুচিত সম্মান দেন নি।.....কিন্তু অপক্ষপাত বিচারে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাশাস্ত্রেই ভাষাতত্ত্ববিদ্যার প্রথম পরিচয়।' দ্বিতীয় ধারা প্রবর্তিত হল অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে। স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা ভারতের সংস্কৃত ভাষা শিখে তার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলির সাজাত্যের সন্ধান পেয়ে পরস্পর তুলনা ও তারই সাহায্যে ইতিহাসমূলক (historical) বা পূর্বাপরকালীন (diachronic) ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ধারার ভাষাচর্চার ফলে নির্ণীত হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়, হামিটিক, সেমিটিক প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠী এবং স্তরে স্তরে ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি। বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও এর ছিল অবিচল প্রতিপত্তি। তার পরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এক নবধারা ভাষাতত্ত্ব-চিন্তাক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছে। এর উদ্ভব একেবারে পাশ্চাত্ত্যজগতে—আমেরিকা একদিকে, আর অন্যদিকে ইউরোপ এর ধারক বাহক। এই ধারার বক্তব্য, ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে বর্তমান জগতের ভাষা উপাদানগুলির চাই সঠিক তালিকাভুক্তি, বর্ণনা, বিভাগ ইত্যাদি। আর তার উপর প্রতিষ্ঠা করা চাই নব নব তত্ত্ব। এঁদের প্রবর্তিত ভাষাতত্ত্বের নাম সমকালীন (synchronic) বা বর্ণনামূলক (descrip tive) ভাষাতত্ত্ব। নানা দৃষ্টিকোণ দিয়ে ভাষাকে দেখার প্রয়োজন বোধ হয়েছে, আর সেইসঙ্গে অন্যান্য বহুবিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এর ফলিতবিদ্যার হয়েছে প্রতিষ্ঠা। এসব নিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলেও পরিসরে কুলিয়ে উঠবে না।

আমাদের আজকার বক্তব্য—বাংলা ভাষা বিষয়ক গবেষণা কতদূর হয়েছে এবং হচ্ছে—বিশেষত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা এই কলকাতা মহানগরীতে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩০৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আলোচনা করে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখেছিলেন একটি প্রবন্ধ 'বাংলা ব্যাকরণ'। তাতে বিশেষ করে বক্তব্য ছিল যে ঠিক বাংলা ব্যাকরণ লেখা হচ্ছে না। যে ব্যাকরণ পাওয়া যায় তার আদর্শ,—হয়, পুরোপুরি সংস্কৃত ব্যাকরণ, নয় তো, ইংরাজী ব্যাকরণ। এমন কি খাঁটি বাংলা উপাদানও এই সব ব্যাকরণে গ্রহণ করতে ছিল আপত্তি, অথবা ছিল অজ্ঞাত। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় ঐ একই সালে একই শিরোনামায় আলোচনা করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের মালমশলা সংগ্রহ করছিলেন। তার প্রকাশের সঙ্গে ছিল সকলের প্রতি অনুরূপ কাজের জন্য খোলা আহ্বান। অনুপ্রাণিত হয়ে সাড়া দিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ব্যোমকেশ মুস্তফী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের শব্দ ও শব্দসমষ্টির সংগ্রহ নিঃসন্দেহে মূল্যবান্। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে সার্থক ভাষা ব্যাকরণের প্রবন্ধও লিখতে আরম্ভ করেন ১২৯৮ সাল থেকে। অসাধারণ প্রতিভাবান্ কবির পক্ষে

CENTRAL LIBRARY

নিজের থেকে ভাষাতত্ত্বের গবেষণার সঠিক পদ্ধতি নির্ণয় করা শক্ত হয় নি। উদাহরণ সংগ্রহ করে, তাদের সাজিয়ে সাদৃশ্য ও বৈষম্য মিলিয়ে নিয়ম তৈরী করে নিয়মের ব্যতিক্রমগুলির বিশেষ বিশেষ অবস্থা নির্ধারণ করে তিনি যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তাদের সৃষ্টি-সার্থকতা অপরিসীম। তখনকার প্রকাশিত পাশ্চাত্ত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের গ্রন্থ তিনি খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মতও অনেক সময় খণ্ডন করেছেন। তবু তিনি ভাষাতাত্ত্বিকের আসন নিতে চান নি। তখন তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন ভাবী ব্যাকরণকারের। নিজেকে তিনি ভাষার মালমশলা জোগাড় কাজে মজুর বলেই গণ্য করেছেন। প্রথম দিকের সব প্রবন্ধ 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাষাবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলা ভাষা পরিচয়' অনেকখানি নিয়মবদ্ধ, ধারাবাহিক। এই গ্রন্থ প্রকাশের আগেই আমাদের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিরাট গবেষণা শেষ করে বিলেত থেকে ফিরে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করে উপাধি দিয়েছিলেন 'ভাষাচার্য'। বহুস্থানে তাঁকে ভাষাতাত্ত্বিকের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন ভাষাসম্বন্ধে পায়ে চলা পথিক বলে, যদিও এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই বাংলা বিভাগে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন—সম্ভবত সাহিত্যেই, যদিও ভাষাবিষয়েও তিনি পাঠ দিতে পারতেন। এ বিষয়ে সুনীতিবাবুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।[১]

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভাষাতত্ত্বের পাঠ দিয়েছেন বহু বৎসর ১৯৫২ সালে অধ্যাপকের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইংরাজীতে লেখা তাঁর *Origin and Development of the Bengali Language* ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষাতত্ত্বের শুধু বাংলার নয় অন্যান্য বহু ভাষার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই বিরাট গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট। এর অনুসরণে অথচ স্বতন্ত্রভাবে তিনি বাংলার প্রকৃত একটি Historical Grammar লিখলেন 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' নামে ১৯৩৯ সালে। এই দুইটি গ্রন্থই ভাষাতত্ত্বের স্বর্ণখনি। কিন্তু সাধারণ ব্যাকরণে অভ্যস্ত যারা তাদের কাছে এই ব্যাকরণ দুরূহ দুর্বোধ্য হওয়ায় ক্রমে তাদের মুখ চেয়ে এর একটা সরল রূপ দিতে হল। এর আগে বাংলায় 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামে আর একটি ছোট গ্রন্থ প্রণয়ন করে দুরূহ ভাষাতত্ত্ব সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সম্বন্ধে তাঁর এই দানগুলিই উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর সময়ে বাংলাভাষাতত্ত্বের কোনও সমস্যা নিয়ে বাংলা বিভাগের কোনও ছাত্র সম্ভবত নিবন্ধ রচনায় আগ্রহী হন নি। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সময়ে বাংলাভাষার কোনও কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বে বাংলা ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপনা করেছিলেন শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। তাঁর বাংলাভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল—'*The History of the Bengali Language*' গ্রন্থে। তাঁর এই রচনায় মৌলিকতা দেখা যায়।

১. ১৯২৬ সালে ODBL প্রকাশের সময় সুনীতিবাবু লিখেছিলেন 'Linguistics as a modern science is still in its infancy in India···we have elaborate grammar of Sanskrit masquerading as Bengali grammar in which the genuine Bengali forms have been branded as vulgar (*asādhu*) beside the so-called 'polite' (*sādhu*) forms borrowed from Sanskrit····· But the first Bengali with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore ; and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the lanugage and by a scholarly appreciation of the methods and findings by the western Philologist'—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব কৃতিত্বের কথা আমার 'বাংলাভাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

CENTRAL LIBRARY

ডঃ সুকুমার সেন সুনীতিবাবুর অবসর গ্রহণের পর তৎস্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁর বাংলায় লেখা 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ ইতিপূর্বেই ODBL এর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বিকল্প পাঠ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলছিল। ভাষার আলোচনা ছাড়া ডঃ সেন সাহিত্যের বিষয়েও অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর সময়ে বাংলা বিভাগের দুই একজন ছাত্র বাংলা উপভাষা ইত্যাদি নিয়ে নিবন্ধ রচনা করেছেন।

ডঃ সেনের অবসর গ্রহণের দুই একবছর পরে বাংলা বিভাগের ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপনার ভার আমি গ্রহণ করি। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাদান ও পরীক্ষার প্রশ্ন নির্মাণ। বাংলাবিভাগের চার পাঁচজন ছাত্র এখন আমার নির্দেশনায় ভাষা বিষয়ক নিবন্ধ রচনায় ব্রতী রয়েছেন। এখনকার ভাষা বিষয়ক গবেষণার মধ্যে একটি দিক হল বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনার থেকে তাঁদের ভাষা বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন। এইসব ছাত্র এই কাজেই ব্রতী। আমার নিজস্ব রচনা যা অধিকাংশই দুইটি ভাষাতত্ত্ব পত্রিকায় প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত, তার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাচীন বাংলা বা চর্যার ভাষার Syntax বা পদরীতি, আর ODBL এ প্রকাশিত অনেক তথ্য ও তত্ত্বের মণ্ডন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ODBL এ ৯৯৯-১০০২ পৃষ্ঠায় আলোচিত—ইতে-যুক্ত বাংলা পদগুলির উদ্ভব সম্বন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেছেন এগুলি-ই-যুক্ত-ক্রিয়ানামপদ (verbal noun) সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এ নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন এর উদ্ভব 'তৃতীয়া—সপ্তমী যুক্ত শতৃ পদ হইতে'। ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে সুনীতিবাবু বলেছেন 'এই উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক 'ইতে' প্রত্যয়ের উৎপত্তি কি, তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অংশতঃ ইহা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ হইতে অভিন্ন।...উভয়ের অর্থের মধ্যেও একটু সংমিশ্রণ দেখা যায়। অর্ধমাগধী প্রাকৃতে প্রাপ্ত 'ইত্তএ' প্রত্যয় হইতেও আসিতে পারে। (৩০৯।১০ দ্রঃ)। আমি প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলায় এই প্রত্যয়ের বহু বিচিত্র ব্যবহার বিশ্লেষণ করে ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণের বক্তব্যের সঙ্গে মতৈক্যে এসেছি যে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Participle) উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerundial Infinitive) অভিন্ন। তারপর যৌগিক ক্রিয়া সম্বন্ধে O.D.B.L (১০৪৯-১০৫২ পৃঃ)-এ দেখানো হয়েছে বাংলাভাষায় এই ক্রিয়ারূপ পুরাতন স্তরের ধাত্বর্থ বিকার, ভাব, কাল ও প্রকার বৈচিত্র্য বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি দেখিয়েছি এ ছাড়াও অনেক কাজ সম্পন্ন করছে যৌগিক ক্রিয়া। ইচ্ছার্থ, আতিশয্যার্থ, পৌনঃপুনিকার্থ, নিয়োজকার্থ, কর্মভাববাচ্যার্থ ইত্যাদিও বোঝায়, এমন কি আত্মনেপদ পরস্মৈপদ ক্রিয়ার্থও এই যৌগিক ক্রিয়া দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে। তথাকথিত সমাসকে আমি যৌগিক নামপদ বলে এই যৌগিক ক্রিয়াপদগুলিরও অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ করা দরকার বলে দেখিয়েছি। O. D. B. L (৪১৯ ও ৫৫৫ পৃষ্ঠায়) দেখিয়েছে নঞর্থ সহায়ক ক্রিয়া অতীতকালে 'নাই' রূপে ব্যবহৃত হয়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ণতর আলোচনা করে দেখিয়েছি এই পদটি 'বিষমচ্ছেদে'র (metanalysis) ফল। প্রসঙ্গত বলেছি—অতীত-কালে নয়—perfect tense বা সম্পন্নার্থককালে নঞর্থে এই পদটির ব্যবহার করা হয়। এই সব দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় নয়। এর মধ্যে দিয়ে আমি বলতে চেয়েছি আমার আচার্যেরা ভাষাবিষয়ক যা গবেষণা করেছেন Historical study বলে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে Modern Descriptive studyই শুধু করা উচিত আমি তা মনে করিনা। পুরাতন ধারায় তাঁরা যা গবেষণা করেছেন তার বিচার, পুনর্বিবেচনা, খণ্ডন, মণ্ডন করতে হবে। নূতন ধারাতেও আলোচনা এবার সুরু করা দরকার। ভাষার শুধু পদগুলির ব্যুৎপত্তি দেখলেই চলবে না। আরও অনেক কাজ আছে। বাংলা বিভাগে হয়ত তা করা চলবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগ এখন দুইধারারই পথিক। Phonetics বা ধ্বনিবিজ্ঞান বাংলা ধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে প্রচলিত তথ্যের বিচার করে দেখবে। আমি Instru-

CENTRAL LIBRARY

mental Phonetics বা যন্ত্রসহযোগে ধ্বনিপরীক্ষা করে দেখিয়েছি—ODBL যে বলেছে সংস্কৃত বা প্রাচীন সংস্কৃত 'তালব্য স্পর্শধ্বনি' বাংলায় 'তালব্য ঘৃষ্টধ্বনিতে' পরিণত হয়েছে, আধুনিক উচ্চারণে তা ঠিক নয়, বরং 'ভাষার ইতিবৃত্ত' এই ধ্বনিকে দন্তমূলীয় তালব্য ঘৃষ্টধ্বনি বলেছে তাই সমর্থনযোগ্য।

ভাষার ফলিত বিদ্যার মধ্যে Sociolinguistics একটি বিশেষ শাখা। এরই আওতায় আসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর উপভাষা বা class dialects। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য অবশ্যই দেখা যায়। পুরুষের ভাষা থেকে নারীর ভাষার পার্থক্য বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে ইতিপূর্বে ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন। মুখের কথায় যে পার্থক্য আছে তাও দেখানোর প্রয়োজন আছে। সমাজের ব্যবস্থা অনুযায়ী বাঙালী বিবাহিত নারী তার বোনের ছেলেমেয়েদের বলে 'বোন পো' ও 'বোনঝি' কারণ স্বামীর বোনের ছেলেমেয়েদের তাকে 'ভাগনে' ও 'ভাগনী' বলতে হয়। এইসব বিষয়ে আলোচনা দরকার। একটি ছেলে সম্বন্ধে কেউ বলল—'ছেলেটি কে হে,' কেউ বলল—'ছেলেটা কে হ্যা, কেউ বলল 'ছোকরাটা কে'। এইসব উদাহরণে বক্তা ও বাচকের সম্বন্ধে কি আলোকপাত করে দেখা যায়। স্থানের নাম ধরে সংস্কৃতি সম্বন্ধে, ভূগোল সম্বন্ধে আলোকপাত করা যায়। চিৎপুর, বৌবাজার ইত্যাদি নামের পিছনে রয়েছে ইতিহাস। শিয়ালদহ, খড়দহ, ইত্যাদি নামের পিছনে আছে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত—আজ যে নদী বা খালের চিহ্ন নেই একদা এই সব স্থানের ধারে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যায়।

অতএব বাংলাভাষা চর্চার ভবিষ্যৎ দুই ধারাতেই নিহিত। দ্বিতীয় ধারায় বাংলাভাষার চর্চা এখনও তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি, কিন্তু তার বহুবিচিত্র রূপের জিজ্ঞাসা এখনকার বাংলাবিভাগের ছাত্রদের মন অধিকার অবশ্যই করবে। বর্তমান ব্যবস্থায় বাংলা বিভাগে যে পাঠ্য আছে তার পুনর্গঠন সম্ভব নয়, কিন্তু এই বিভাগে ভাষার প্রাধান্যমূলক এক শাখার উদ্বোধন আবশ্যক, যেখানে বাংলা ভাষার আধুনিক পদ্ধতিতে বহুতর পঠন পাঠন সম্ভব হতে পারে।

CENTRAL LIBRARY

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ছন্দচর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দ তেরশ' চব্বিশ সালের ভাদ্র সংখ্যা সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন :

'অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি।'

কিছু কিছু কেন, অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থটি (১ম সং ১৯৩৬ জুলাই, ১৩৪৩ আষাঢ়। পরিবর্ধিত সং—১৯৬২ নভেম্বর, ১৩৬৯ কার্তিক) তার পরিচয়স্থল। বাংলা ছন্দ, সংগীত ও ছন্দ, ছন্দের অর্থ, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের প্রকৃতি, গদ্য ছন্দ, কাব্য ও ছন্দ—এই ন'টি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে গৃহীত হয়। ১৩২১ থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে এগুলি রচিত। কিন্তু ১৩২১ সালের পূর্বে ও ১৩৪৩ সালের পরেও তিনি ছন্দ-সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। 'ছন্দ' গ্রন্থের পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণে সেগুলি গ্রথিত হয়েছে। তার ফলে ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় ছন্দ বিষয়ক আলোচনার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ কেবল যে অপূর্ব ছন্দশিল্পী ও বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন ছন্দের দ্রষ্টা। ছন্দের, বিশেষতঃ বাংলা ছন্দের, নানা মৌলিক সত্য তাঁর কাছেই প্রথম প্রতিভাত হয়, এবং এর পরিচয় তিনি দিয়েছেন কেবল স্বরচিত ছন্দোবন্ধে নয়, বহু সূক্ষ্ম আলোচনা ও বিচারের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এদেশে বাংলা ছন্দের তত্ত্বের আলোচনায় তিনিই পথিকৃৎ। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সে-যুগের ব্যাকরণ গ্রন্থের ছন্দ-প্রকরণে কেবলমাত্র কয়েকটি চলিত ছন্দোবন্ধের বহি-রঙ্গের সামান্য কিছু উল্লেখ থাকত, কিন্তু বাংলা ছন্দের তত্ত্বের যথার্থ বিচার কিছুই তাতে থাকত না। রবীন্দ্রনাথই এই বিচারের প্রবর্তন করেন, তাঁর প্রবন্ধগুলি এই আলোচনায় যুগান্তর আনে। গত শতাব্দে লালমোহন বিদ্যানিধি 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে (১৮৬২) বাংলা ছন্দ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ যোজনা করেন। তাতে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষায় বাংলা ছন্দের গঠনের কয়েকটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে মাত্র। ১৩২১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৩৪৬ পর্যন্ত অর্থাৎ পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ ও ভাষণে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে নানা তথ্যের উপর কবি-মনীষার আলোকপাত করে বাংলা ছন্দের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন।

বাংলা ছন্দের কয়েকটি মূল তথ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছন্দের বিচারে চলনের (অর্থাৎ পর্বের) গুরুত্ব, ছন্দের বিভিন্ন রীতি, পয়ারজাতীয় ছন্দের মূল প্রকৃতি ও তার 'শোষণ শক্তি' হলন্ত অক্ষরের মাত্রাবিচার, কাব্যের ছন্দ ও সঙ্গীতের তালের মধ্যে সাদৃশ্য, বাংলা ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রভাব, গদ্যছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা তথ্য আবিষ্কার করেন, এরূপ দাবী অসঙ্গত নয়।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কি ? 'ছন্দ' গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ—'ছন্দের প্রকৃতি' ও 'গদ্যছন্দ'—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট থেকে দু বছরের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি ছয়টি

CENTRAL LIBRARY

প্রবন্ধ[১] পাঠ করেন। ১৯৩৩-এর ষোলই সেপ্টেম্বর তারিখের কলকাতা ষ্টেটসম্যান পত্রের বিজ্ঞপ্তি —Dr. Rabindra Nath Tagore will deliver his next lecture as the University Professor of Bengali, in the Senate Hall, College Square today at 5 P. M. The lecture will deal with Bengali Prosody.

এই ভাষণের নাম ছিল 'ছন্দ'। উদয়ন পত্রিকার ১৩৪৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'ছন্দ' নামেই ভাষণটি প্রকাশিত হয়। 'ছন্দ' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে এটির নাম ছিল 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি'। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণে এটি 'ছন্দের প্রকৃতি' নামে মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই প্রবন্ধটি। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ও তার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ধারণা এখানেই প্রকাশিত। প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমত এই প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে।

এই প্রবন্ধের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল, আর কোনো সময়ে বলবার ইচ্ছা আছে।' সেই ইচ্ছাপূরণের ফল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-রূপে প্রদত্ত আর একটি ভাষণ—'গদ্যছন্দ' (১৯৩৩-এর শেষভাগে)। প্রবন্ধটি পরে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৪১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। গদ্য কবিতা ও গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান অভিমত এই প্রবন্ধেই প্রথম প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ছন্দ-চিন্তায় এই প্রবন্ধের গুরুত্ব অসামান্য। 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় (আশ্বিন ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব'—সেই বিশ্বাসের সমর্থন 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধটি।

তাই একথা স্বীকার করতে হয়, কবি ও ছন্দোবিৎ রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের গুরুত্ব কম নয়।

ছন্দোবিজ্ঞান গড়ে তোলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। 'ছন্দ' গ্রন্থে লেখকের 'বিজ্ঞপ্তি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হোলো। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বাদ প্রতিবাদ হয়েছে, তাঁদের তর্কের উত্তর এই গ্রন্থের অন্তর্গত করেছি। এই উপলক্ষ্যে বলা আবশ্যক তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও বাংলা ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন।'

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ বাংলা ছন্দচর্চা করে আসছেন এবং তাঁদের হাতেই বাংলা ছন্দোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেন নি। তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়ে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে কোন সুসম্বদ্ধ সামগ্রিক ধারণা করা যায় না। সুললিত ভাষায় কবিজনোচিত উপমা ও উদাহরণ সহযোগে তিনি ছন্দের কয়েকটি তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ছন্দোবিজ্ঞান রচনা করেন নি। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে তাঁর রুচি বা প্রবণতা ছিল না। তার ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। ছন্দের উপযুক্ত পরিভাষা তিনি রচনা করতে পারেন নি এবং যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ প্রবর্তনের প্রয়াস করেছেন, তার ব্যবহারেও সর্বদা সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নি।

১ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৯৩২ ডিসেম্বর), শিক্ষার বিকিরণ (১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী), ছন্দ (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৬), গদ্যছন্দ (সম্ভবত ১৯৩৩ এর শেষে), সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৩৪ ফেব্রুয়ারি ৮) এবং সাহিত্যের তাৎপর্য (১৯৩৪ জুলাই ১৬)—এই ছয়টি প্রবন্ধ। 'মানুষের ধর্ম' নামে তাঁর কমলা-বক্তৃতামালাও পঠিত হয় এই সময়ে ১৯৩৩ জানুয়ারি মাসের ১৬, ১৮ ও ২৪ তারিখে।

CENTRAL LIBRARY

সেই দায়িত্ব পালন করেছেন প্রবোধচন্দ্র ও অমূল্যধন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ গবেষণা-কর্মরূপে বাংলা ছন্দের মূলসূত্র সম্পর্কিত আলোচনা অমূল্যধন দাখিল করেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। ঐ গবেষণা-প্রবন্ধের ভিত্তিতে তিনি লেখেন 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থটি। তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, শ্রাবণ ১৯৩৯ বঙ্গাব্দে। ১৩৪৬ বৈশাখে পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৩৫৩ বৈশাখে ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৫ মাঘে ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৪ বৈশাখে ৫ম সংস্করণ ও ১৩৬৮ ফাল্গুনে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রথম প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থটি। এটি প্রকাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রণালীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্য প্রয়োজন যে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, তা এই গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে অনুপস্থিত। ঐ প্রবন্ধ জোড়াসাঁকো বিচিত্রা ক্লাবে ১৩২৪ সালের ১৫ ফাল্গুন তারিখে পঠিত হয় ও 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৫ বৈশাখ সংখ্যায় (১৯১৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। বাংলায় বিভিন্ন ছন্দ পদ্ধতির কথা সম্ভবতঃ প্রথম এই প্রবন্ধে স্বীকৃত হয়। কিন্তু পদ্ধতিগুলির নামকরণ সত্যেন্দ্রনাথ করেন নি। বাংলা শব্দের মাত্রাবিচার নিয়ে তিনি নানা সংশয় উত্থাপিত করেন। এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা তিনি করেন নি, যদিচ সে অধিকার তাঁর ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পরে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন প্রবোধচন্দ্র। প্রবাসী পত্রিকায় ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে 'বাংলা ছন্দ', 'স্বরবৃত্ত ছন্দ', 'স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব', 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ', 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ', 'বাংলা ছন্দ ও সংগীত' শীর্ষক আটটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩৩৭-৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিচিত্রা, পঞ্চপুষ্প, প্রবাসী, পরিচয় পত্রিকা ও জয়ন্তী-উৎসর্গ গ্রন্থে বাংলা ছন্দের বিবর্তন, বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ, বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান, বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ, বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ ও আইনকানুন, বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে রচনা করেন। প্রবোধচন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দ-চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোকপাত করেন ('ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক ও মাঘ সংখ্যা ১৩৭১)।

অমূল্যধনের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' দুটি কারণে বিশেষ মূল্যবান। প্রথমত, প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রবর্তনা, দ্বিতীয়ত, বাংলা ছন্দের একটি ঐক্যসূত্র নির্ধারণ, যাকে তিনি বলেছেন **The Beat and Bar Theory** বা 'পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ'। বাংলা ছন্দের আলোচনার পটভূমি তিনি নির্ধারণ করেন। কী ভাবে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হল, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের কী সম্পর্ক, বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যোগসূত্র কী, প্রাক্-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাব্যচ্ছন্দের রীতি কী, তা জানা আবশ্যিক বলে তিনি মনে করেন। তার জন্য বাংলার ভাষাতত্ত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব, ছন্দোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যসমূহ, বাংলা ছাড়া অপর দুই একটি ভাষার কাব্য ও ছন্দের প্রকৃতি ও সেইসঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের সূক্ষ্মতা থাকা আবশ্যিক বলে তাঁর ধারণা। এই পটভূমি ও প্রস্তুতির পর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থটি সেকারণেই প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-বিচার গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। পর্ব-পর্বাঙ্গবাদের মূল কথা, ভারতীয় সঙ্গীতের মতো বাংলা প্রভৃতি ভাষার ছন্দের ভিত্তি **Bar** ও **Beat**, এবং এই মতবাদ প্রাচীন তথা অর্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই প্রযোজ্য।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীর অবশ্যকরণীয় পরবর্তী গবেষণাকর্মের ফলস্বরূপ অমূল্যধনের চারটি মূল্যবান নিবন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **Journal of the Dept. of Letters** এবং **Calcutta Review** পত্রিকায়

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশিত হয়। সেগুলির নাম – Studies in Rabindranath's Prosody (J. O. D. L. Vol XXI, 1938) The Rhythm of Bengali prose & prose verse (J. O. D. L. Vol XXXII, 1939), Studies in Bengali Prosody in the 19th Century (J. O. D. L. New Series, Vol II, Part I. 1958), Miltonic Blank Verse in Bengali (The Calcutta Review, 1958). সম্প্রতিকালে Asiatic Society Journal এ অমূল্যধন যেসব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন তার বিষয়বস্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দ। এ বিষয়ে তিনি আরো গবেষণা করছেন।

প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য প্রবন্ধগুলির নাম ও প্রকাশকাল : (১) Rhythm in Sanskrit Syllabic Metres (J. A. S. B., 4th Series, Vol. VII, Nos. 3, 4, 1965 ; Issued in May 1967), (২) Lyric metres in Jayadeva's Gita Govinda (J.A S. B , Vol. IX, Nos. 3, 4, 1967 ; Issued in December 1969) ; (৩) Rhythm in uneven Syllabic Metres in Sanskrit (J. A. S. B., Nos. 1-4, 1969, Issued in April 1971) ; (৪) Development of Sanskrit Prosody in the post-epical age (read out in the monthly meeting of the Asiatic Society held on 8-1-73 ; to be published soon in J. A. S. B.).

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের যে ভাষণ দুটি তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে, তার পটভূমিরূপে ১৩০৮-১৩৪১ বঙ্গাব্দে, ১৯০১-১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিচিত্রা, পরিচয়, শনিবারের চিঠি ও উদয়ন পত্রিকায় প্রকাশিত ছন্দসম্পর্কিত বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি এখানে স্মরণযোগ্য। নেপথ্যে থেকে যে দুজন এই বিতর্কের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন, সে দুজনের নাম অবশ্য স্মরণীয়—বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরিচয়-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সেই ছন্দবিতর্কের রণক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অমূল্যধন, প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আরো অনেকে যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিলীপকুমার রায়, মোহিতলাল মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। দিলীপকুমারের 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড, ১৩৬৮, পৃঃ ১৪২-৪৬), উপেন্দ্রনাথের 'বিগতদিন' (১৩৬৪, অধ্যায় ৭-৮) ও সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত' (১৯৩৮) গ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছন্দবিতর্কের সূত্র ধরেই লিখিত হয় প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪২ আষাঢ়), 'ছন্দ পরিক্রমা' (১৩৭২ বৈশাখ, মে ১৯৬১) ও 'ছন্দজিজ্ঞাসা', দিলীপকুমার রায়ের 'ছান্দসিকী' (বৈশাখ ১৩৪৭) ; মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (শ্রাবণ ১৩৪২) প্রভৃতি গ্রন্থ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ গবেষণা-কর্ম শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা'। তা ১৯৩৩-এ বৃত্তির জন্য পেশ করা হয় ও গৃহীত হয়। ঐ কর্মের সূত্র ধরেই তিনি প্রকাশ করেন 'ছন্দোবিজ্ঞান' (ভাদ্র ১৩৪৫, সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গবেষণার সর্বশেষ ফল 'ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' (১৯৭১)। ১৯৭৩ সালে এই গ্রন্থের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। গত বিশ বছরে বাংলা ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আরো কয়েকজন ছন্দোবিৎ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য ('বাংলা ছন্দ', ফাল্গুন ১৩৬২), ডঃ নীলরতন সেন ('আধুনিক বাংলা ছন্দ' জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯), ডঃ আরতি মিত্র ('সংস্কৃত ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ'), ডঃ আনন্দমোহন বসু ('বাংলা পদাবলীর ছন্দ')।

বিগত অর্ধ-শতাব্দীর ছন্দচর্চার ফল এইসব গ্রন্থ। বাংলাছন্দের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে, ভারতীয় ছন্দের পটভূমিতে বাংলা ছন্দের গুরুত্ব নির্ণয়ে এবং বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস রচনায় যেসব ছন্দোবিৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত, তাঁদের মূল্যবান গবেষণাকর্মের বিবরণ এখানে উপস্থিত করা গেল। আশা করা যায় বাংলা ছন্দের চর্চায় তাঁদের প্রয়াস উত্তরোত্তর সার্থকতা লাভ করবে।

CENTRAL LIBRARY

গল্প-উপন্যাস রচনা ও চর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ প্রবর্তনের প্রথম দিকে পাঠ্যসূচীতে, বিংশ শতকের তো কথাই নেই, উনবিংশ শতকের সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যালোচনার ওপরেও খুব বেশি ঝোঁক ছিল না। কিন্তু প্রথম দিকে যাঁরা অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজনের নাম করতে পারি যাঁরা তৎকালীন বাংলা গল্প-উপন্যাস ও সমালোচনা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত লেখক বলে গণ্য হয়েছিলেন, এঁরা তিনজন হলেন দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশাঙ্কমোহন সেন।

প্রথম বিভাগীয় প্রধান দীনেশচন্দ্র সেন মূলতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণা পেয়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পঠন পাঠনের যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতকের গল্প, উপন্যাস সম্পর্কে বিচারকের ভূমিকায় তাঁকে দেখা না গেলেও গল্প-উপন্যাস রচনার সৃষ্টি-প্রতিভা তাঁর ছিল। এবং সহকর্মী চারুচন্দ্রের কিছু পরেই (চারুচন্দ্রের প্রথম অনুবাদ গল্প 'রূপার কাঠির জয়' বেরোয় ১৩১৫ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৯০৮ সালে) দীনেশচন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসেছেন। ১৯১১ সালে দীনেশচন্দ্রের প্রথম রূপকথানির্ভর উপন্যাস বেরোয় 'তিনবন্ধু'। তারপর আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বেরিয়েছিল তাঁর : আলোকে আঁধারে (১৯২৫), চাকুরীর বিড়ম্বনা (১৯২৬), শ্যামল ও কজ্জল (১৯৩৮)। ইতিপূর্বে কিছু গল্পের বইও তাঁর বেরিয়েছিল : গায়ে হলুদ (১৯২০), লতিকা (১৯২২), ভাঙাতা (১৯২৩) ও দেশমঙ্গল (১৯২৪)।

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে অধ্যাপক চারুচন্দ্রকে মূলতঃ স্রষ্টার ভূমিকাতেই দেখি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অন্ততঃ পনের-ষোল বছর আগে থেকেই চারুচন্দ্র 'ভারতী' 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এবং ওই দুই পত্রিকার নিয়মিত লেখকও তিনি। বরণডালা (১৯১০), পুষ্পপাত্র (১৯১০), সপ্তপাত (১৯১১), ধূপছায়া (১৯১২), চাঁদমালা (১৯১৫), মণিমঞ্জীর (১৯১৭), কনকচূর (১৯১৮), পঞ্চদশী (১৯২৭), বনজ্যোৎস্না (১৯৩৮), শমীশাখা (১৯৩৮), দেউলিয়ার জমাখরচ (১৯৩৯) ইত্যাদি ছোটগল্প-সংকলন প্রবীণ বাংলা সাহিত্য পাঠকের খুব অপরিচিত নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাঁর বেশির ভাগই বিদেশী উপন্যাসের ভাববস্তু থেকে সংগৃহীত। দেশী-বিদেশী সমকালীন সাহিত্যে যে তাঁর সমান প্রবেশাধিকার ছিল তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যই তার প্রমাণ। যমুনাপুলিনে ভিখারিণী, চোর কাঁটা, সর্বনাশের নেশা, বায়ু বহে পুরবৈয়া, বাবধান ইত্যাদি সেকালের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি সবই বিদেশী উপন্যাসের ছায়াবহ। মৌলিক উপন্যাস স্রোতের ফুল, পরগাছা, দুই তীর, হেরফের, পঙ্কতিলক, দোটানা ইত্যাদির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্পের কিছুটা অনুসরণ। রবীন্দ্র-উপন্যাসের বুদ্ধিমত্তা ও কাব্যৈশ্বর্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে যে দুর্গমতা এনেছিল চারুচন্দ্রের উপন্যাস তার অনুসরণ হলেও তরলীকৃত সংস্করণ এবং সেই জন্যই সাধারণ পাঠকের কাছে প্রিয়তর হয়েছিল। বোধ হয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যের বিনোদন মূল্যকে যে ধারায় রক্ষা করে আসছিলেন চারুচন্দ্র ও সমসাময়িক সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল কিংবা হেমেন্দ্রকুমার রায় সেই ধারাকেই রক্ষা করে আসছিলেন। কাজেই চণ্ডীমঙ্গল রোহিনী ও রবিরশ্মির লেখকের অধ্যাপকবৃত্তি ছাড়াও যে

CENTRAL LIBRARY

মৌলিক স্রষ্টার একটি স্বাধীন বৃত্তিও ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। শিশু সাহিত্যেও তাঁর কিছু লেখা আছে। কাদম্বরী, পারস্য উপন্যাস, বিষ্ণুপুরাণ এবং রবিনসন ক্রুসোই তার প্রমাণ।

শশাঙ্কমোহন সেন ছিলেন কবি ও সমালোচক। তাঁর মধুসূদন (১৯২৮), বঙ্গবাণী (১৯১৫) ও বাণীমন্দির (১৯২৮) তাঁর দুর্লভ সমালোচনা শক্তির নিদর্শন। যদিও বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে বাংলাকাব্য বিচারই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, তবু বিশেষ করে গল্প উপন্যাসের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্ত বিশেষ স্মরণীয়। বঙ্কিম সমালোচনায় উনবিংশ শতকের সমালোচকদের কথা বাদ দিলে বিংশ শতকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এবং বিপিনচন্দ্র পালের পরেই সমসাময়িক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শশাঙ্ক-মোহন সেনের নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করতে হয়। বাণীমন্দির (১৯২৮) বইটিতে তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে 'অদৃষ্টের পরিহাস' ও 'প্রকৃতির বিপ্লবসীরূপ' বঙ্কিম উপন্যাসের ট্র্যাজেডির স্বরূপলক্ষণ এবং পাপের ধারণা বঙ্কিমের উপন্যাসে শিল্পরূপে গভীর তাৎপর্য আনতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্কিমের শিল্পজগৎ ও মননশীলতার নানাদিকগুলিকে ইতিপূর্বে উনবিংশ ও বিংশ শতকের সমালোচকরা নানাভাবে স্পর্শ করেছেন কিন্তু বঙ্কিমের মনোজগৎকে ইতিপূর্বে কোনো সমালোচকই এমন গভীরভাবে স্পর্শ করেন নি। এই নিয়তিধারণা ও পাপবোধের সূত্র নিয়েই পরবর্তী কালে মোহিতলাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্কিমের জগৎকে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন। বঙ্কিম সম্পর্কে আধুনিক মনোভঙ্গির বিকাশ শশাঙ্কমোহন থেকেই সুরু হয়েছে বলে মনে হয়।

আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথমযুগের উল্লেখযোগ্য ছাত্র ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীকে প্রথমে সাহিত্যিক ও পরে সমালোকের ভূমিকায় দেখা গেছে। চারুচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্রের কিছু পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিশ্বপতি চৌধুরীর আবির্ভাব। ১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম গল্পের বই 'ব্যথা' বেরোয়। তারপর অন্ততঃ আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্পের বই তাঁর বেরিয়েছে : স্বপ্নশেষ (১৯৩০), সেতু (১৯৩৪) ও বহুরূপী (১৯৩৭)। উপন্যাসও লিখেছিলেন চারটি : ঘরের ডাক (১৯২১), বৃন্তচ্যুত (১৯২২), আশীর্বাদ (১৯২২) ও ঘূর্ণি (১৯২৯)। পরে খুব সম্ভবতঃ চল্লিশের দশকে তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' (নতুন তয়-সং ১৩৭১ ১ম-সং ১৯৬৭ ?) প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও পার্থক্য খুব পরিচ্ছন্নভাবে বলা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সব উপন্যাসেরই পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ রয়েছে। যদিও রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিস্তৃততর বিশ্লেষণের ব্যাপকতর পটভূমি আমাদের কাম্য ছিল এবং উপন্যাস-শিল্পের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ এখানে নেই, তবু পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত বিশ্লেষণের মূল্যে বইটি এখনও পাঠককে মুগ্ধ করে। দীনেশচন্দ্রের পরে বিভাগীয় প্রধান খগেন্দ্রনাথ মিত্র শুধু বৈষ্ণবসাহিত্যরসিক ছিলেন না। তাঁরও তিনখানি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল : নীলাম্বরী, বিবি-বউ ও সারি। তিনটিরই প্রকাশকাল দেওয়া নেই। প্রকাশক খুব সম্ভবতঃ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড্ সন্স্।

গল্প উপন্যাস সাহিত্যে দুর্লভ বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি ও ধারাবাহিকতার সূক্ষ্মনিপুণ চেতনা নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে আসার বহু আগে থেকেই তাঁর বিখ্যাত বই বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-র সূচনা হয়েছিল। বইটির প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমের জন্মশতবর্ষের উৎসবক্ষণে। কিন্তু তারও পনের বছর আগে থেকে ১৩৩০ সালে নব্যভারত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলা উপন্যাস ধারার সমালোচনা আরম্ভ করেছিলেন তিনি। এর কয়েকবছর আগেই ভারতবর্ষ পত্রিকায় ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিম-উপন্যাসের নারীচরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং

CENTRAL LIBRARY

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় কিছু পূর্ব থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা-সূচনার সমকাল পর্যন্ত বিপিনচন্দ্র পালের বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক চারটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। শশাঙ্কমোহন সেনের কিছু কিছু গল্প-উপন্যাসনির্ভর আলোচনা বিশেষতঃ বঙ্কিমনির্ভর আলোচনা গৃহস্থ পত্রিকা ও মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় বেরোতে শুরু করেছে। নারায়ণ পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের ত্রয়ী অর্থাৎ আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমের অনুশীলন-পদ্ধতি স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙলা উপন্যাসের উৎস ও ক্রমবিকাশের ব্যাপ্তির সূচনা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই করলেন। রচনাটি নব্যভারতে বেরোবার পর কিছু অংশ বঙ্গবাণী ও উদয়ন পত্রিকায় বেরোয়। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকায় ও রাজশাহী কলেজ পত্রিকায় এর কিছু কিছু অংশ বেরোয়। সম্পূর্ণ বইটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহানুভূতিশীল দৃষ্টির কথা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। মূলতঃ রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় সমালোচনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সাহিত্যের আলোচনায় গভীর রসবোধ, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও অনাস্বাদিত সৌন্দর্য আবিষ্কারের যে ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। কিছু পরেই অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর *Western Influence on Bengali Literature* (1932) এবং *Western Influence on Bengali Novels* (1932) বই দুটিতে গল্পউপন্যাস সাহিত্য আলোচনায় তুলনামূলক আলোচনার দিকটি বিশদ করেন। পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিতলালের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কিত একটি বক্তৃতা স্মরণীয়), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র), অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এবং আরও সাম্প্রতিককালে প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের আলোচনায় ওই রকম স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকুমারবাবুর দৃষ্টি বিশুদ্ধ শিল্পসম্ভোগের দৃষ্টি, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চেতনার অভাব বোধ করা যায় মাঝে মাঝে। সমাজসচেতন দৃষ্টির প্রকাশ পরবর্তীকালে নীরেন্দ্রনাথ রায় (তাঁর সাহিত্য-বীক্ষার অন্তর্ভুক্ত দুএকটি প্রবন্ধে) অরবিন্দ পোদ্দার, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রণেন্দ্রনাথ দেব, রবীন্দ্রকুমার গুপ্ত এবং কার্তিক লাহিড়ীর সদ্যপ্রকাশিত বাঙলা উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় চোখে পড়ে। নীরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ পোদ্দার ছাড়া আর সকলেই বাঙলাবিভাগের ছাত্র এবং তাঁদের সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁরা যে সমালোচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতির পরিণত জ্ঞানকে আয়ত্ত করে কোথাও কোথাও সফল হয়েছেন এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর বইটির (১৯৬৩, ২য়-সং ১৯৭১) একটু পৃথক উল্লেখ প্রয়োজন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও সরোজবাবু তাঁর আলোচনায় কোনো অহেতুক সংকীর্ণতা দেখান নি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাঙলা উপন্যাসের শিল্পরূপের গভীর ও সংযত আলোচনাই তাঁর বইটির বৈশিষ্ট্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইএর পর বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ও স্বরূপ-সন্ধানের এত পরিমিতিজ্ঞানসম্পন্ন আলোচনা আর হয় নি।

ছোটগল্প সম্পর্কে শিল্পসম্মত আলোচনা বিশেষভাবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই সূচনা করেন। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা বইটিতে ছোটগল্পের আলোচনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের সঙ্গে বাঙলাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের আলোচনাও তিনি করে গেছেন। তাছাড়া পরে উপন্যাস-ছোটগল্প যখন বিশেষভাবে ছাত্রদের পাঠ্য হয় সেইসময় ছোটগল্পের ধারাবিকাশকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য তিনি বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা (প্রথমপর্ব উত্তরভাগ, ১৩৬৩) প্রকাশ করেন। জগদীশ গুপ্ত থেকে শুরু করে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত লেখকদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাকে পর্বে পর্বে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ইচ্ছা তাঁর পূরণ হয়নি।

CENTRAL LIBRARY

শশিভূষণ দাশগুপ্তের কৌতূহল প্রাচীনতম কাব্য ও ধর্মসাহিত্য থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাব্যসাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে (বিদ্রোহিণী, ব্যান ও বন্যা, জ্বলা মাঠের ফসল ইত্যাদি তাঁর গল্পের বই) বিশেষ ক'রে শিশুসাহিত্যে তাঁর ভূয়িষ্ঠ দানের কথাও কেউ বিস্মৃত হবেন না ঠিকই, কিন্তু গল্প উপন্যাস সম্পর্কে তিনি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা রেখে যাননি। কিন্তু তাঁরই উদ্যোগে শক্তিমান কথাসাহিত্যিক স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলাবিভাগে যোগদান করেন এবং গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে ছাত্রদের কৌতূহলকে বিস্তৃততর ও ব্যাপকতর করতে তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। ছাত্রজীবন থেকেই ঔপন্যাসিক ও ছোট-গল্পকার হিসাবে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া গিয়েছিল এবং সেই সাহিত্যিক পরিচয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেবার পরিসর এখানে নেই। তবু এটুকু বলতে পারি, উপন্যাস ও গল্পকার হিসেবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সৃষ্টিক্ষেত্রের এই সজাগ মননশীলতাকে তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে পেরেছিলেন গল্প-উপন্যাস পড়াতে এসে। ১৩৬৩ সালে তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়: সাহিত্যে ছোটগল্প এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিক। সাহিত্যে ছোটগল্প বইটির পরবর্তী সংস্করণে (১৩৬৫) তিনি বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছোটগল্পের ধারার উৎসসন্ধান ও স্বরূপনির্দেশ করেন এবং বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপক পটভূমিতে বাঙলা গল্পের যোগ্য মর্যাদাকে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য হলো বিচিত্র দেশের গল্প বলতে বলতে তিনি ছোটগল্পের সৃষ্টির উৎসের স্পন্দনটিকে ধরে দেন এবং ছোটগল্পের উত্থানকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট করে দেন। বিস্তৃত পটভূমিকার জন্য আলোচনা কিছুটা অগভীর হয়ে গেলেও সমাজচেতনা, শিল্পবোধ এবং তুলনামূলক আলোচনার যে সদাজাগ্রত কৌতূহলকে তিনি দেখিয়ে গেছেন ভবিষ্যৎ গল্পলেখক ও গবেষক তা কিছুতেই ভুলতে পারবে না। এছাড়াও কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা গল্পবিচিত্রা এ দুটি বই যথাক্রমে উপন্যাস সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিমিত চর্চা ও সাম্প্রতিক গল্পলেখকদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। শেষ বই ছোটগল্পের সীমারেখা-তে (১৩৭৬) ছোটগল্পের মনোভূমি, কবিতা ও ছোটগল্প এবং ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করেছেন, সাহিত্যের অন্য শ্রেণী বা genre এর সঙ্গে তুলনায় ছোটগল্পের বিচিত্র রূপ ও স্বভাবকে স্পষ্ট করেছেন।

রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশি একাধারে স্রষ্টা ও সমালোচক। তাঁর জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার ও কোপবতী-তে যেমন উপকরণগত প্রাচুর্য ও বিশালতাকে বর্ণাঢ্য করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে তেমনি ইতিহাসনির্ভরতা ও ভৌগোলিক সীমানা বিস্তারের চেষ্টা দেখা গেছে কেরী সাহেবের মুন্সী কিংবা লাল কেল্লাতে ও কিছু কিছু গল্পে। ব্যঙ্গগল্পের সৃষ্টিতেও তিনি দক্ষ। পরশুরামের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গের ধারাতেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। পরশুরামের গ্রন্থাবলী সম্পাদনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যই তাঁর প্রথম আকর্ষণের বিষয় হয়েছিল। পরে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬১, ২য় সং ১৩৬৩) তাঁর সমালোচনায় নতুনভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর ছোটগল্পকে দেখার চেষ্টা তিনিই প্রথম করেছেন। পরিবেশ ও ব্যক্তি কীভাবে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গল্পের মধ্যে মিশে গেছে তার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তিনিই প্রথম বিশদভাবে করেছেন। যদিও ইতিপূর্বে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় ও সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক তৃতীয় খণ্ডের আলোচনায় পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বিশেষ জোর দিয়েই বলা হয়েছিল। এছাড়া বাংলাসাহিত্য নরনারী (১৯৬৬), রবীন্দ্রবিচিত্রা (১৩৬৮) ও রবীন্দ্রসাহিত্যবিচিত্রা (১৩৭৪) ইত্যাদি বইতে রবীন্দ্র-নাথের গল্প, উপন্যাসের গঠন, চরিত্র ও ভাষা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ছড়িয়ে আছে। বঙ্কিমসরণী বইটি বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে প্রমথনাথ বিশির অসাধারণ বিশ্লেষণ-নিষ্ঠার শেষ প্রমাণ। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের লেখক পর্যায়ে

CENTRAL LIBRARY

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ শিল্পের স্বরূপ উদ্ঘাটনের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রমথবাবুর বিশ্লেষণ দক্ষতা বিশেষতঃ চরিত্র বিশ্লেষণ দক্ষতা যতখানি ততখানি সমাজমুখী নয়; এবং সেই দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা সত্ত্বেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচলিত ধারাতেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের কৌতূহল মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি কবি এবং গল্পকারও। তাঁর মনের আগুন ও বনতুলসী গল্প সংকলন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বনতুলসীর একটি গল্প রুশ ভাষায় অনূদিত হ'য়ে রুশ ভাষায় প্রকাশিত বাংলা গল্প সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। ১৩৭১ সালে তাঁর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস নামে যে বইটি বেরোয় তাতে আলোচ্য বিষয়ের একটু নতুনত্ব আছে। মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য, ছোটগল্প, নাটক, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকা, লোককথা, রোম্যান্স্ ও ইতিহাসের সঙ্গে তুলনায় উপন্যাসের শ্রেণীগত বিচার স্পষ্ট করা হয়েছে এবং সমাজ-জীবন, ব্যক্তি ও নীতির প্রকাশে উপন্যাসের উৎসস্পন্দনটিকে ধরার চেষ্টা আছে। ইতিপূর্বে উপন্যাস আলোচনার ভূমিকায় লেখকরা যে প্রসঙ্গগুলি সংক্ষেপে ভূমিকাস্বরূপ আলোচনা করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য সেই জন্ম-উৎস-নির্ণয় প্রসঙ্গে উপন্যাসের শ্রেণী চরিত্রকে স্পষ্ট করেছেন। স্বর্গত রথীন্দ্র নাথ রায়, ছোট গল্পের কথা-য় ছোটগল্পের বিশ্বপরিক্রমা করে বাংলা ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। দেবীপদ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের কথা বইটিও এই জাতীয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ছোটগল্প বইটির বিস্তৃতি, তুলনা-মূলক আলোচনার তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় এক্ষেত্রে পাই না, তবু সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসাবে বইটির মূল্য আছে। তারাশংকরের গল্প সংকলন ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংকলনে রবীন্দ্রনাথ যে পরিচায়িকা লিখেছিলেন তাতে সামগ্রিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় আছে। হরপ্রসাদ মিত্র কবি হিসাবে বেশি পরিচিত হলেও পরিচয় পত্রিকায় ১৯৪০ সালে ছোটগল্পের স্বরূপ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা সত্যই ছোটগল্প-ধারণার একটি দিকনির্দেশক হয়ে থাকবে এবং উচিত কারণেই যে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি দুখণ্ড, বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ ও প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের বিষয়, রচনারীতি, প্লট ইত্যাদি সম্পর্কে নানা চিন্তা ছড়িয়ে যদিও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ববর্তী রচনাটির মতো শিল্পজ্ঞাননিষ্ঠার যথেষ্ট যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর সম্পর্কে তাঁর বইটি এবং সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টিকে স্পষ্ট করেছে, তবে আলোচনার মধ্যে কিছু শৈথিল্য আছে যা পরবর্তীকালে দূর হবে আশা করি।

অন্যান্য যাঁরা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বা প্রাক্তন ছাত্র তাঁদের মধ্যে অনেকেই গল্প-উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় আগ্রহী হয়েছেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আবদুল ওদুদ, অজিতকুমার ঘোষ ও শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক কৃতিত্ব নিয়ে কাজ করেছেন জীবেন্দ্র সিংহরায়, রবীন্দ্রনাথ রায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। বাংলা ছোটগল্প নিয়ে বিস্তৃত কাজ করেছেন ভূদেব চৌধুরী, শিশিরকুমার দাশ ও সরোজমোহন মিত্র (সরোজবাবু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন, মাণিক-গ্রন্থাবলী সম্পাদনাও করেছেন), বঙ্কিমসমকালীন অপ্রধান ঔপন্যাসিক ও গল্পকার নিয়ে কাজ করেছেন রামদুলাল বসু, আধুনিক পর্যায়ের কয়েকজন বাঙালী ঔপন্যাসিক নিয়ে কাজ করেছেন রণেন্দ্রনাথ দেব, উপন্যাসের শিল্পরূপের বিবর্তন নিয়ে অপরিহার্য দুটি বই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কার্তিক লাহিড়ী। ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কাজ করেছেন বিজিতকুমার দত্ত ও অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। বিশেষ বই বা লেখক ধরে কাজ করেছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (ত্রৈলোক্যনাথ) ও দেবব্রত দে (রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা), চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ও পশুপতি

CENTRAL LIBRARY

শাসমল ও দীপক চন্দ্র। কাল বা যুগ ধরে ও উপন্যাস-গল্প রচনার ধারাবাহিকতা সূচক আলোচনা লিখেছেন গোপিকা রায়চৌধুরী ও জীবেন্দ্র সিংহরায়। এছাড়া বাঙালী গল্প লেখকদের গল্প সংকলন ক'রে পরিচায়িকা লিখে জগদীশ ভট্টাচার্য ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকদের জীবন, পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও রচনার বৈচিত্র্যকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে স্পষ্ট করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা সংকলন করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যকর্মের সম্পাদনা করেছেন শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। এছাড়া গল্প-উপন্যাসে বিশেষ যুগ ও ব্যক্তি ধরে অন্ততঃ চার পাঁচজন গবেষক অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

বাঙলা বিভাগের বহু অধ্যাপককেই আমরা দেখেছি 'এ্যাকাডেমিক' জগৎ ছাড়াও সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজস্ব জগৎ খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী থেকে সুরু করে প্রমথনাথ বিশি ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেই কমবেশি সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যেও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিভাগীয় সুনামের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। প্রাণতোষ ঘটক, পরিমল গোস্বামী, বিমল মিত্র, অবন্তী সান্যাল, দীপ্তেন্দ্র সান্যাল, চিত্তরঞ্জন মাইতি, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মিহির মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র দত্ত, ফণিভূষণ আচার্য, প্রলয় সেন, রমানাথ রায়, তপোবিজয় ঘোষ, নিখিল সরকার—বাঙলা বিভাগের এই সব প্রাক্তন ছাত্রদের গল্প উপন্যাস সাহিত্যে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলা বিভাগের সূচনাপর্বে অধ্যাপক ও ছাত্রদের গবেষণা ও সৃষ্টি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্যার আশুতোষকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—'এ বিভাগ শুধু ফসল জমানোর বিভাগ নয়, ফসল ফলানোর বিভাগ।' গল্প উপন্যাস সাহিত্যের এই অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী অক্ষুন্ন চর্চার কথা স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথের ওই মন্তব্যের মর্যাদা আমরা রাখতে পেরেছি বলেই মনে করি।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মংগলকাব্য চর্চার ধারা

আশুতোষ দাস

বাংলা মংগলকাব্যের কালানুক্রম ত্রয়োদশ শতক। এর ব্যাপ্তি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। প্রায় ছয় শ বছর ধরে বাঙালীর সাহিত্যরসনিক্ষা ত মনের পরিচয়ে মংগলকাব্য পরিপুষ্ট। মংগলকাব্য বাঙালীর কাব্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ। ১৯১৯ সনে পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভারতীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা-দানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। বাংলায় এম. এ. পড়ানোর সুব্যবস্থা-সূত্রে বিভাগীয় প্রধান দীনেশচন্দ্র সেন ও জন কয়েক গুণীজ্ঞানী শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। কবিকঙ্কণচণ্ডী পড়ানোর ভার ন্যস্ত হল সুপণ্ডিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার বিস্ময়কর কাজে প্রাতঃস্মরণীয় দীনেশচন্দ্র সেনের অপূর্ব প্রতিভা বিভাসিত হলো। বাঙালীর জাতীয় জীবনের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের দুর্লভ উপকরণ স্বয়ং সংগ্রহ করে, সন্ধানকারী নিযুক্ত করে তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতির উপকরণ দিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলেন। তাতে বাংলা মংগলকাব্যের এক অপূর্ব রসলোক উদ্‌ঘাটিত হলো। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগল সম্বন্ধে গবেষণার ফল 'চণ্ডীমংগলবোধিনী' প্রথম খণ্ড (১৯২৬) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৯) মংগলকাব্য চর্চার উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক পরিচয়। বাংলা মংগলকাব্যের এক অনালোকিত মহীতলে প্রবেশ করে তাঁর অনন্য প্রতিভার প্রখর প্রভাকরদীপ্তি ছড়িয়ে মংগলকাব্যের অন্তর্নিহিত রত্ননিচয়ের বিভূতিসমাধ্য যে বিচিত্র পরিচয় তিনি প্রকাশ করলেন তা বিস্ময়কর, প্রশংসাভূয়িষ্ঠ ও শ্রদ্ধার্হ। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে তদানীন্তন গবেষণা-সহায়ক জনার্দন চক্রবর্তীর আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র অবলম্বনে গবেষণায় সর্পদেবতা মনসা সম্পর্কে ফার্গুসন সাহেবের প্রবাক্ত মত-বহির্ভূত এক অভিনব মনন ও বৈদগ্ধ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। দীনেশচন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে জনার্দন চক্রবর্তীর পঠদ্দশায় রচিত গবেষণা-প্রবন্ধ ১৯৩৩ সনের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় **'Manasa cult and its literary expression'** এই নামে প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক তমোনাশ দাশগুপ্ত মূলতঃ বাংলা মংগলকাব্যের সামাজিক ঐতিহাসিকত্বের উপকরণ অবলম্বনে রচিত তাঁর *Aspects of Bengali Society*—পি. এইচ. ডি. গবেষণা-গ্রন্থে (১৯৩৫) মধ্যযুগের বাঙালীর লোক-জীবনের বিকীর্ণ উপাদানের যে সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন তা মংগলকাব্য-বিষয়ে অধ্যেতার মনোভাবদীপ্ত গবেষণার প্রথম প্রশস্ত পরিচয় ও মংগলকাব্যে ভবিষ্যৎ গবেষণার আদর্শকর ও অনুপ্রেরণাপ্রসূত। ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ (১৯৪২) ও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (১৯৪৩) কেতকাদাসের মনসামংগল বাংলা মংগলকাব্য চর্চার এক প্রাগ্রসর পদক্ষেপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন শিক্ষক ও মংগল-কাব্যের ইতিহাস রচয়িতা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য দেশবিভাগোত্তর কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর বাংলা মংগলকাব্যের পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটিকে পর্যায়ক্রমে সংগৃহীত নতুনতর উপকরণ ও গবেষণার আলোকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে মংগলকাব্য চর্চার এক অপূর্ব দিগন্তবিস্তার সম্পন্ন করলেন। 'বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা কার্যে এই বইখানি সহায়তা করতে পারবে, এজন্য লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন।'—অধ্যাপক ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের এই

CENTRAL LIBRARY

প্রশস্তি উত্তরকালে মংগলকাব্য চর্চায় সত্যে পরিণত হয়েছে। মংগলকাব্যের অন্তরলোকে প্রবেশেচ্ছু মাত্রেই এই গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এই গ্রন্থটি পড়ে মংগলকাব্যসমুদ্রে স্নানের সুকৃতি প্রথম অর্জন করেছি। পরে গভীরে ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করেছি। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত বাইশ কবির মনসামংগল বা বাইশা (১৯৫৪) মংগলকাব্য চর্চার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস এবং গবেষণাশীল মনের উৎসাহসঞ্চার।

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত (১৯৫২) দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমংগল গীত মংগলকাব্য চর্চা প্রসংগে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। তিনি চণ্ডীমংগলের দেবীপ্রসঙ্গ, গীতপ্রসঙ্গ, কবিপ্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন সমালোচক চূড়ামণি তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগলের কালকেতু-উপাখ্যানের ভূমিকায় তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীমংগল কাব্যধারায় মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধবের কাব্যবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা এবং রসঋদ্ধ সমীক্ষায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব মনস্বিতার পরিচয় ভূমিকায় প্রকীর্ণ।

ডঃ সুকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় রূপরামের ধর্মমংগল (লাউসেন-চুরি পালা পর্যন্ত) বর্ধমান সাহিত্যসভা থেকে (১৩৫১) প্রকাশিত হয়। এঁরা বহু পরিশ্রম করে রূপরামের পুঁথি সংগ্রহ করেন। সম্পূর্ণ পুঁথি মেলে নি। বিভিন্ন খণ্ডিত পুঁথির পাঠ মিলিয়ে বন্দনা পালা থেকে লাউসেন-চুরি পালা মোট আটটি পালা এই সংস্করণে স্থান পেয়েছে। রূপরামের বংশ-পরিচয়, অভিজন, কবিত্বলাভের কাহিনী নিয়ে ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রূপরামের কাব্যের রচনাকাল নির্ধারণ করেছিলেন ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এঁদের আদর্শ পুঁথিতে শাহ সুজার উল্লেখ রয়েছে। 'শাকে সীমে জড় হইলে যত শক হয়' এই ছত্রের সাহায্যে এঁরা গ্রন্থরচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬১৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। রূপরামের ধর্মমংগল দ্বিতীয় বার ছাপা হয় (আরো একটি পালা নিয়ে) ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ও ডঃ সুনন্দা দত্তের (সেন) সম্পাদনায়। এই সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ডঃ সুকুমার সেনের ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নির্ধারণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা বলেছিলেন। ডঃ সেন বেদ, পুরাণ, বাংলার লৌকিক উপাদান বিশ্লেষণ করে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত খণ্ডন করেছেন। ধর্মঠাকুর মূলত বেদোক্ত বরুণ দেবতা। আরো নানা দেবভাবনা কালে কালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ডঃ সেনের এই বিশ্লেষণ মনীষার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করছে। দ্বিতীয় সংস্করণে আর একটি নতুন পালা যুক্ত হয়েছে, সেটি হল আঙড়া পালা। প্রথম সংস্করণের অর্বাচীন পুঁথির কিছু পাঠান্তর যথাসম্ভব এই সংস্করণে বর্জিত হয়েছে। এই সংস্করণে অতিরিক্ত পুঁথির পাঠও গৃহীত হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত বিপ্রদাসের মনসাবিজয় (১৯৫০) বাংলা মংগলকাব্য চর্চার ধারায় বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় অন্ধকারময় অধ্যায়ে নতুন আলোক সম্পাত এবং জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র' এবং ডঃ মদনমোহন গোস্বামীর 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' সম্পর্কিত গবেষণা বাংলা মংগলকাব্যের মণিময় হর্ম্যে প্রবেশের ঐকান্তিকতা ও সাহসিকতার প্রমাণ। মংগলকাব্যের রসসূত্রে এঁদের আলোচনা প্রশংসার্হ। এঁদের সমসাময়িক কালে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের আবিষ্কৃত দ্বিজ রামদেবের অভয়া-মংগল অবলম্বনে ডঃ সুকুমার সেনের অধীনে গবেষণায় বাংলা মংগলকাব্যে নতুন আলোকসম্পাত সম্ভব হয়েছে। (ডি. ফিল. থিসিস্ রচনা ও গবেষণা সমাপনের কাল ১৯৫৩ সনের ২৭শে জুলাই)। বর্তমান প্রবন্ধকারের আবিষ্কৃত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সম্পাদিত (১৯৬০) জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামংগল কাব্যে জীবনধর্মিতার প্রকাশ-পরিসরের এক অভিনব চিত্র উদ্‌ঘাটন হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে উত্তরবঙ্গের দুর্গম পল্লীঅঞ্চল ঘুরে ঘুরে পুথি সংগ্রহের প্রয়াসে অপ্রত্যাশিত সার্থকতা লাভ করেছিলাম সেদিন, যেদিন তন্ত্রবিভূতির অনাবিষ্কৃত মনসাপুরাণের পুথি আমার হস্তগত হয়। বহু সাধ্যসাধনা ও কৌশল অবলম্বন করে পুথিখানি অনিচ্ছুক মালিকের হস্ত থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করে আমি আমার নিবন্ধ রচনা করি এবং সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিট থিসিসরূপে গৃহীত হয়। সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় (পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৫) প্রকাশিত তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বাংলা মংগলকাব্যে দেবী' আখ্য নিবন্ধ মংগলকাব্যসিন্ধু-মথিত জীবনঅমিয় পরিবেষণ ও শাস্ত্রীয় পটভূমি বিশ্লেষণের পরিচয়ে পরিবদ্ধ। অধ্যাপক যোগীলাল হালদার সম্পাদিত (১৯৫৭) রামেশ্বরের শিব-সংকীর্তন মূলের অনুলিপি-অবলম্বী হলেও বাংলা মংগলকাব্যানুরাগের অসামান্য পরিচয়ে পরিণমিত বলে তাঁর গবেষণাশীল মনের ঐকান্তিকতায় নতুন আলোকসম্পাত সম্ভব হয়েছে। বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের লোকসংস্কৃতির উপাদান বাধার বিন্ধ্যগিরি ঠেলে সংরক্ষণের প্রশংস প্রয়াসে অধ্যাপক হালদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের পরিচালনায় কৃষ্ণরাম দাসের রচিত কাব্যাবলী নিয়ে গবেষণা করে মংগলকাব্যের নতুন দিক উদ্ঘাটন করেছেন (১৯৫৮)। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মংগল কাব্যের কিছু আলোচনার উল্লেখ ব্যোমকেশ মুস্তাফি প্রমুখ ব্যক্তিরা করেছেন। কিন্তু এঁর কাব্যের স্বরূপ লোকলোচনগোচর হয়নি। তাছাড়া এঁর রচিত ষষ্ঠীমংগল, শীতলামংগল, কমলামংগল, কালিকামংগল কাব্যসমূহের সংগে প্রথম পরিচয়ের পথ ডঃ ভট্টাচার্যের পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিস্মৃতপ্রায় উপকরণ অবলম্বনে গবেষণাব্রতের মাধ্যমে উন্মুক্ত হল। পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি ও জনজীবনের যে চিত্তাকর্ষক তথ্য তিনি গ্রন্থসম্পাদনার নিষ্ঠায় ও শক্তিতে প্রকাশ করলেন উত্তরকালে তা মংগলকাব্যের সংগে লোকসাহিত্যের নিবিড় সম্পর্কের সন্ধানে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ বিজিতকুমার দত্ত ও ডঃ সুনন্দা দত্তের সম্পাদনায় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে ১৩১২ সালে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমংগল প্রকাশ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মাণিকরামের সম্পূর্ণ পুথি অবলম্বনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণটি প্রস্তুত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণটি নকল করবার দোষে ও সম্পাদনের ত্রুটির জন্য অব্যবহার্য। মাণিকরামের পুথির সেজন্য একটি বিশুদ্ধ সংস্করণের অপেক্ষা ছিল। সম্পাদকদ্বয় শাস্ত্রী-মহাশয়ের পাঠ ও পুথির পাঠের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। মাণিকরামের বংশপরিচয়, অভিজন, কবিত্বলাভ ও কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভূমিকার অপর বৈশিষ্ট্য মাণিকরামের ভাষা-বিচার। অষ্টাদশ শতকের ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে এ বিচার উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থশেষে দুরূহ, অপ্রচলিত শব্দের অর্থ-সম্বলিত বিস্তৃত তালিকা আছে। রূপরাম, ঘনরাম এবং যদুনাথের ধর্মপুরাণের সংগে মাণিকরামের রচনার সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্দেশ করে সম্পাদকদ্বয় মাণিকরামের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। ধর্মমংগলকাহিনীর গঠনপ্রণালী সম্বন্ধেও নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। কালু ডোম ও লখ্যা ডুমনীর কাহিনীর বাস্তব ভূমিকা নির্দেশ করে সম্পাদকদ্বয় ধর্মমংগল-কাহিনীর অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

মংগলকাব্য চর্চায় ঘনরামের ধর্মমংগল নিয়ে ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্রের গবেষণা ও গ্রন্থসম্পাদনা (১৯৬২) এক বহু প্রতীক্ষিত প্রশংসনীয় সারস্বত প্রয়াস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং বর্ধমান সাহিত্যসভার পুথি অবলম্বন করে কাব্যটি সম্পাদন করা হয়েছে। বারমতি ধর্মমংগলকে ঘনরাম চল্লিশটি পালায় বিভক্ত করেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থে এই পালাগুলি কাহিনীর ক্রম অনুযায়ী রাখা হয়েছে। সুবিস্তার পালার

CENTRAL LIBRARY

একটি ভিন্ন পাঠ পাওয়া গেছে। সেই পালার ভিন্ন পাঠটি পরিশিষ্টে সঙ্কলিত হয়েছে। ধর্মমংগলের সুদীর্ঘ ভূমিকায় ডঃ মহাপাত্র ধর্মমংগলের গঠনরীতি এবং ধর্মমংগল-কাব্যধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরামের বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পুথি-পরিচয়, কবি-পরিচয়, কাব্যপরিচয় (রূপ), কাব্যপরিচয় (আত্মা), ধর্মমংগলের অন্যান্য কবি এবং ধর্মঠাকুরের রূপ ও ধর্মপূজা—এই অধ্যায়গুলিতে ঘনরামের ধর্মমংগলের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি কবিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং গবেষকদের সুদীর্ঘকালের অভাব মোচন করেছে।

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত-সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (১৯৬২) মংগলকাব্যে তাঁর অপরিসীম অনুরাগ, অতি প্রতিকূল পরিবেশজনিত দুর্লঙ্ঘ্যতা অতিক্রম করে বরিশালের গ্রামাঞ্চলের প্রাচীন পুথি অবলম্বনে সেখানে বসে পুথি-সম্পাদন-প্রয়াসে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সঙ্গে বিশ্বং-সংযোগ রক্ষা করে যে অপূর্ব সারস্বত ও সাংস্কৃতিসুন্দর মনের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসা-প্রণিহিত। ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগল কাব্যের বণিকখণ্ড সম্পাদন করে (১৯৬৬) তাঁর মঙ্গলকাব্যানুরাগের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে মংগলকাব্য রসিকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাছাড়া মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগলের পাঠান্তর প্রসঙ্গে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতামালা (১৯৬৮) মুদ্রিত ভাণ্ডার থেকে প্রসন্নতা-পরিলব্ধ জ্ঞানসম্ভার। শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ডঃ সুকুমার সেনের অধীনে দ্বিজ রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমংগল কাব্য নিয়ে গবেষণা করে এক নবতর মংগলকাব্যের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি এবং বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুথি অবলম্বনে প্রভূত পরিশ্রম করে ১৮শ শতাব্দীর মংগলকাব্যের অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থটি সম্পাদনা করে বাংলা মংগলকাব্যসম্ভারে একটি নূতন রত্ন সংযোজন করেছেন। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজটি মংগলকাব্য সম্পর্কে একজন সুকবির সন্ধান দেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে এক প্রশংসনীয় প্রয়াস। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ মংগলকাব্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অধীনে মংগলকাব্যের রূপ ও রীতি সম্বন্ধে গবেষণা করে শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী ডি. ফিল্. উপাধি পেয়েছেন। এই গ্রন্থে তাঁর প্রভূত পরিশ্রম ও রসজ্ঞতার পরিচয় বিভিন্ন প্রসঙ্গাশ্রয়ে প্রমূর্ত। 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগল কাব্যে যুগের স্বাক্ষর এবং আগামী যুগের সম্ভাবনা' এই বিষয় অবলম্বনে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর অধীনে গবেষণা করে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস পি. এইচ ডি. উপাধি পেয়েছেন। অতি-সম্প্রতি শ্রীতুষারকান্তি নিয়োগী বাংলা মংগলকাব্যে লোকসাহিত্যের উপাদান বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রধান ও রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অধীনে গবেষণা করে মঙ্গলকাব্য-মহীরুহের দিগন্তবিস্তারী, শাখাবাহুবিসর্পিত, মৃত্তিকালগ্ন ও জীবনরসসুস্নিগ্ধ রূপবৈচিত্র্য অবলোকনের উদ্‌গ্রীব প্রয়াস ও শ্রমসুন্দর মানসিকতার যে প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন তা মঙ্গলকাব্য-রসনিষ্কাত ও মুগ্ধ মনের আনন্দোদ্রেককর।

বাংলাসাহিত্যের প্রথম ও প্রণম্য ঐতিহাসিক ৺আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মংগলকাব্য সম্পর্কে বিদগ্ধ ও রস-সমৃদ্ধ আলোচনা আজও কালজয়ী হয়ে রয়েছে। মংগলকাব্য চর্চায় ডঃ সুকুমার সেনের মনীষা ও মনস্বিতার পরিচয় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থনিবহে প্রতিভাত। এরপর মংগলকাব্য চর্চায় বিজ্ঞতা, রসানুসন্ধ মন ও নিজের মত প্রকাশের দৃঢ়তায় বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিরপেক্ষতা রক্ষণে উল্লেখ্য।

বাংলা মংগলকাব্য সম্পর্কে সাধারণতঃ একটা বিরূপ ধারণা দীর্ঘপোষিত। যাঁরা জীবনসিন্ধুমন্থিত বাংলা মংগলকাব্যের রসসংবাদ না রেখে প্রতিকূল মন্তব্য করেন তাঁদের বিরোধিতা অভ্রংলিহ। তাঁদের মতে মংগলকাব্যে

CENTRAL LIBRARY

মংগলও নেই, কাব্যও নেই। অবশ্য স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন মংগলকাব্যরসিকোত্তম হয়েও মংগলকাব্যের কবিদের পুচ্ছগ্রাহিকতার অপবাদ দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন অভিমত ছিল না। মংগলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনী অবলম্বনে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কাব্যরচনায় মৌলিকতা প্রদর্শনের অবকাশ না থাকার জন্য এবং অপ্রতুল উপকরণের জন্য এই বিরূপতা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত মংগলকাব্য সমূহের আলোকে এই পরিহাসপুষ্ট বৈরূপ্য সংহরণযোগ্য। আমি দীর্ঘ তেইশ বছর প্রাচীন পুথি নিয়ে মংগলকাব্য চর্চা করছি। মংগলকাব্যের অন্তরলোকে প্রবেশের সৌভাগ্যে আমার ধ্যানধারণা স্বতঃ কিছুটা ভিন্ন। আমার উপলব্ধির পরিচয় তিনটি গবেষণাগ্রন্থে পরিশ্লিষ্ট। এতক্ষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মংগলকাব্যচর্চার সাধারণ পরিচয় নিবেদন করেছি। এখন আমি বাংলা মংগলকাব্যবিষয়ে কিছু স্বকীয় অন্তরঙ্গ পরিচয় সবিনয়ে ব্যক্ত করছি।

কবি দ্বিজ রামদেবের অভয়ামংগল দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমংগল কাব্যের অনুকরণে রচিত, বলাবাহুল্য। একই কাঠামো অনুযায়ী উভয় কবি কাহিনী বয়ন করেছেন। স্থলবিশেষে উভয়ের কাব্যে ভাষাগত সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিজ রামদেবের উন্নত কবিত্ব সম্পর্কে কারো কারো মনে সংশয় জেগেছে। মুকুন্দরামের কাব্যের শব্দগত, এমনকি পংক্তিগত মিল ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগলে সুপ্রকটিত কিন্তু তা সত্ত্বেও মূলের চেয়ে অনুকরণ ভাল হয়েছে বলে দীনেশচন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন। দ্বিজ মাধবের সংগে তুলনায় অনুকরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসংগে অনুরূপ প্রশংসা দ্বিজ রামদেবের প্রাপ্য বলে আমার মনে হয়েছে।

দ্বিজ রামদেব উত্তম কবিত্বের কাব্যকার ও মুকুন্দরামের সমপ্রতিভাসম্পন্ন। মাঝে মাঝে রামদেব মুকুন্দরামকে ছাড়িয়ে গেছেন—কাব্যপাঠে তা প্রতীত হবে। বৈষ্ণব কবিতা রচনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় কাব্যে রয়েছে। মুকুন্দরামের পরবর্তী হয়েও তিনি মুকুন্দরামের প্রভাববিনির্মুক্ত। রামদেব জীবনধর্মী কবি, কিন্তু তাঁর কাব্যে কোথাও অশ্লীলতা নেই। রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনায় রুচির শোভনতা তাঁর অপূর্ব কৃতিত্ব। এমনকি ধনপতি-খুল্লনার বিহার বর্ণনায় দ্বিজ রামদেবের সুরুচিনিষ্কাত মন দীপ্যমান। এই দিক থেকে তিনি ভারতচন্দ্রের ঈর্ষার যোগ্য। এ কবির সংযম মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বিরল।

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে চণ্ডীবন্দনা অংশে—

নম নম বন্দম নম নারায়ণী।
ভএতে অভয়রূপা দীন উদ্ধারিণী॥
নম নম নম বন্দম শঙ্করের জায়া।
সঙ্কটনাশিনী তুমি দেবী মহামায়া॥ ইত্যাদির ভাব কবিগুরুর 'একটি নমস্কার'-এর গীতিভাবের সংগে তুলনীয়। প্রাণের একটি উৎসার এখানে আছে।

পশুশিকারে কালকেতুর বনযাত্রা প্রসঙ্গে অকস্মাৎ পথে এক সুবর্ণগোধিকা দেখে কালকেতুর উক্তি—

হেমনিন্দিত অঙ্গ সুতরুণ।
আখিযুগ নিন্দিয়া অরুণ॥
মুই তোহ্মা দেখি চলিছম কানন।
শুভাশুভ বুঝিমু অখন॥
জদি আহ্মি না পাই পশুগণ
গড়্যো মুণ্ড করিমু ছেদন॥ ইত্যাদিতে কবিপ্রাণতার অন্তরালে ভক্তিবীর্য

CENTRAL LIBRARY

স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এর সংগে কবিগুরুর 'ভকতিরে বীর্যদেহ' প্রভৃতির ভাবসঙ্গতি সমান্তরলতায় তুলনীয়।

ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনায় তার নিদারুণ দুঃখ রামদেব করুণ পরিবেশ ও শব্দচিত্রের সংগে পরিবেষণ করেছেন। বারমাসের দুঃখ বর্ণনার সমাপ্তি অংশে ফুল্লরার বয়ানে—

দুঃখ মোর শুনরে মোহিনী।

এহাথু অধিক দুঃখ তুমিরে হইবা সতিনী।—এই উক্তিতে রামদেবের কাব্যের ফুল্লরা কেবল ব্যাধরমণী নয়, সপত্নীজনিত অন্তর্বেদনা প্রকাশে সে নিখিল নারীমনের প্রতিনিধি। এটা খুবই চিত্তাকর্ষক যে কবি ভারতচন্দ্রের আগমনের শতাধিক বছর আগে রামদেবের কাব্যে আমরা ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবের সংমিশ্রণ দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া মংগলকাব্য তৎস্থানিক ও তৎকালিক বলে যে যৌক্তিক অভিযোগ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এনেছিলেন তা দ্বিজ রামদেবের কাব্যপ্রয়াসে খণ্ডিত।

বিয়ের পরদিন পিতৃগৃহ থেকে খুল্লনার বিদায় প্রসঙ্গে রামদেবের বর্ণনা—

কান্দে খুলনা রামা মায়ের প্রাণসমা

জননীরে আবরি তখন।

আল মা কি করিমু কিরূপে বঞ্চিমু

জননীর না দেখিয়া চরণ। ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার কারুণ্যের সম্ভাবনা বিধৃত।

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কলিঙ্গরাজের আজ্ঞায় মৃত্যুপ্রতীক্ষারত কালকেতুর কারাগারে ষোড়শ স্বরবর্ণে চণ্ডীবন্দনা বাংলা মংগলকাব্যে একান্ত অভিনব। তন্ত্রসাধনার অনাহত চক্র অতিক্রম করে বিশুদ্ধচক্রে ষোড়শ দলপদ্মে অবস্থিত থেকে কালকেতু ব্যাধ মাতৃ-উপাসনাশীল। তান্ত্রিক তপস্যার সংগে যাঁদের নিবিড় পরিচয় রয়েছে তাঁরা দেখতে পাবেন তিন শতাধিক বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও কারাগারে কালকেতু ও কারাগারে অরবিন্দের মাতৃ-আরাধনা এক আকস্মিক সাদৃশ্যে অভিন্ন ও চিত্তাকর্ষক।

সপ্তদশ শতকের উত্তরবঙ্গের মনসামংগলের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তাঁর পূর্বসূরী তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলছি। আমার আবিষ্কৃত জগজ্জীবনের পূর্ণাঙ্গ পুথিতে যে অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি তাহল—(১) বাংলা মংগলকাব্যে শাক্তপ্রবণতা। কাব্যের প্রারম্ভে কবি পদ্মার বন্দনা করেছেন। তাও মাত্র চার পংক্তিতে পরিসমাপ্ত। উপাস্য দেবতার মধ্যে তিনি যেন তাঁর মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

নম গো নমগো পদ্মা নমো নারায়ণী।

তুমি জারে নিদারুণ মা বিধি তারে বাম॥

তুমি নিতে তুমি দিতে তুমি সুখদাতা।

মাও জদি দিবে দুঃখ নিবেদিব কোথা॥

কবি রামপ্রসাদের 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' এরূপ মিনতির আগে শাক্তপ্রবণতাপ্রীত এমন কথা আর কোথাও শোনা যায়নি। বাংলা মংগলকাব্যে এটি চিত্তাকর্ষক।

(২) কাহিনীবয়নে মৌলিকতা। দেবখণ্ডের অন্তর্গত ধর্ম-মনসা-গৌরীর কাহিনী বাংলা মংগলকাব্যধারায় একান্ত অভিনব। ধর্ম, মনসা ও গৌরীর এই জন্মকাহিনী উত্তরবঙ্গের মনসামংগলে অশ্রুতপূর্ব, পরম্পরাগত দেবখণ্ডের কাহিনী থেকে পৃথক এবং মনসামংগল কাব্যের কাহিনীধারায় কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ে সমুজ্জ্বল।

CENTRAL LIBRARY

পুত্রবিরহকাতর ধর্মের তাক্ত নিশ্বাস থেকে মনসার জন্ম, নপুংসক রূপে সৃষ্ট ('নপুংসক হৈঞা হৈল জন্ম') মনসাকে নারীরূপ দিয়ে তার রূপ দেখে ধর্মের মোহ, মনসার সংগে ধর্মের বিবাহ, সলজ্জ মর্মবেদনায় ধর্মের মনসাকে পরিত্যাগ ও নিজের মরণোপায় চিন্তন, ধর্মের আপন মরণসৃষ্টি, শিবের কাছ থেকে ধর্মের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনসার ধর্মের চিতাগ্নিতে অনুমৃতা হওয়া, চিতাগ্নিমধ্য থেকে এক শিশুকন্যার উদ্ভব ও ক্রন্দন, অগ্নিসম্ভবা কন্যাকে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পরামর্শ, ব্রহ্মার পরামর্শ মত লোহার খাঁচায় করে শিশুকন্যা সমুদ্রে ভাসানো, ভাসমান লৌহমঞ্জুষ সাগরতীরে তপস্যারত হেমন্তঋষির কাছে পৌছান, ঋষিকর্তৃক লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ কন্যাশিশুকে উত্তোলন ও স্বগৃহে আনয়ন, প্রতিপালন, পরে কন্যা বড় হলে কাপালিকরূপী মালঞ্চকর শিবের সংগে গান্ধর্ব বিবাহ ইত্যাদি দেবখণ্ডের কাহিনীকলিত।

(৩) কবির ঔপন্যাসিক প্রতিভা। তন্ত্রবিভূতির কাব্যের মানসিক উৎকর্ষের সাক্ষীকরণ প্রয়াস সত্ত্বেও চরিত্রসৃষ্টিতে জগজ্জীবনের মানবিক দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশিত। সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের চিত্রাঙ্কনে, পরমদুঃখিনী বেহুলার সকরুণ চরিত্র চিত্রণে, মনসার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনায় কবি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ও বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কবির প্রতিভার গুণে তুচ্ছ কাহিনীও লাবণ্যদীপ্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মনসামংগল-কাব্যধারায় তথা বাংলা মংগলকাব্যে কবি তন্ত্রবিভূতি বিলক্ষণ কবিত্বের কাব্যকার। আমার পুথিসংগ্রহ প্রয়াসে মালদহের পল্লীঅঞ্চল থেকে তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এ কাব্যের একটি ছিন্নপত্রও লোকলোচনগোচর হয়নি। প্রায় বার বছর ধরে খুঁজে আমি তন্ত্রবিভূতির কাব্যের চারখানি পুথি পেয়েছি। এ কাব্যটি বাংলা মংগলকাব্যের নতুন দিগদর্শন—গতানুগতিকতা-আশ্লিষ্ট কাব্যের সংযোজন মাত্র নয়।

তন্ত্রবিভূতির কাব্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কর্তৃক ধর্মঠাকুরের পূজা-প্রসঙ্গ, শারদাতিলক তন্ত্রের অনুরূপ দেবীমনসার আকৃতি বর্ণনা, চতুর্ভুজমূর্তি সুন্দরী পদ্মার অষ্ট নাগসজ্জায় অষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা, চাঁদসদাগরের পক্ষ নিয়ে মনসার বিরুদ্ধে খাণ্ডাতি ভাস্কর ও তেজবল হাজরার সংগ্রামে অতীত বাংলার শৌর্যচেতনা, বহুশ্রুত চাঁদমনসার কাহিনীতে কবিচন্দ্রের কপিলামংগলের চিত্তাকর্ষক কাহিনী সংযোগে মালাবতী-কাহিনী সৃজন, চাঁদের হাতে জালুপত্নী হীরাকৈবর্তিনীর নির্যাতনকাহিনী, বেহুলা ও ধন্বন্তরির তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় পরিচয়, সমুদ্রবক্ষে মনসার জন্য আবাস নির্মাণের অভিনব কাহিনী, অবিদ্যা-অস্মিতায় আচ্ছন্ন, দ্রোহপরায়ণ, পরমত-অসহিষ্ণু, গোঁয়ার চাঁদসদাগরের মনসাবিদ্বেষ, মনস্বিনী দয়াবতী মনসার মনের প্রকাশ, পরিশেষে বামহাতে পদ্মাকে পূজনের অঙ্গীকারে পূজা করতে বসে পূর্বাভ্যাসবশে ডান হাতেই মনসার পায়ে চাঁদসদাগরের পুষ্পাঞ্জলি দান ইত্যাদি অভিনবতায় উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিকতা নিখিল ভারতীয় ধর্মজীবনের সাধারণ সম্পদ। কিন্তু তান্ত্রিকতা বিশেষভাবে বাংলার—এটি মনে করবার ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। তন্ত্রবিভূতির অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য এই যে পৌরাণিকতা ও তান্ত্রিকতাকে এই কবি উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করেছেন। এইদিক থেকে তিনি মংগলকাব্যের কবিদের মধ্যে একক ও অসঙ্গ। আমার গবেষণায় তা আমি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করবার প্রয়াস পেয়েছি।

গ্রন্থশেষে মনসার বয়ানে—

কপিলা হরিবে ক্ষীর, মেঘে অল্প জল।
পৃথিবী হরিবে শস্য লোকে মিথ্যা বোল॥
রাজা হৈঞা না করিবে প্রজার পালন।
মিথ্যা হস্তী ঘোড়া আর সিংহাসন।

CENTRAL LIBRARY

যোগী হঞা না জানিবে যোগের বিচার।
মিথ্যা কার্যে কলহ করিবে অনিবার॥
স্ত্রী হঞা না জানিবে স্বামীপ্রীতি যোগ।
জন্মে জন্মে দুঃখী হবে পিত্তে বাঢ়ে রোগ॥
ব্রাহ্মণ তুলসী বেদ কিছু না মানিবে।
কলির আচরণে নদী গঙ্গা ছাড়িবে॥
হেন সব শুনহে কলির ব্যবহার।
শিষ্য জাবে আগে আগে গুরুর কান্ধে ভার॥
ডিম্বরেত কোড়ি হবে টিকরেত ধান।
সুন বালা লক্ষ্মীন্দর কলির বাখান॥
হেন মতে হইবেক জে কলির ভাও।
ওরসিক পুত্রে না পুষিবে বাপ মাও॥
ভাই ভাই কন্দল করি ঘারে দিবে কাটা।
জাতিতে অন্ন দিঞা প্রভাতে দিবে খোটা॥ ইত্যাদি কলিকালের লোক-ব্যবহার বর্ণনায় আনাতোল ফ্রান্সের 'পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড' গ্রন্থের ব্যভিচার-বিজল্পিত লোকধর্মের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। লোকধর্মের বিপরীত ব্যবহারের প্রকাশ কবি তন্ত্রবিভূতির জীবনরসিকতাসুন্দর অপূর্ব বাণীবৈভব।

CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই এদেশের শিক্ষিত নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে মনোযোগী হন। টোল মাদ্রাসার উপযোগিতা যতই থাক না কেন, তাদের কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং শক্তি-সীমিত। ইংরেজের হাত দিয়ে ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির অপরিমেয় ঐশ্বর্যের যে ঈষৎ-মাত্র আভাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল তা দেখে আমাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হল। আমরা অনুভব করলাম পশ্চিমের দ্বার খুলে আমাদের ঘরে ওদিককার আলোর পথ অবারিত করে দিতে হবে। আমরা বুঝলাম জ্ঞানের সূর্য দিঙ্‌নাগের শাসন মানে না, অনুকূল দিগন্ত পেলে শুধু পূর্বে নয় পশ্চিমেও তার উদয় হতে পারে।

সেদিনকার কয়েকজন সুশিক্ষিত চিন্তাশীল দেশহিতৈষী দূরদর্শী হিন্দু মনীষী দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে বিশেষভাবে উদ্‌যোগী হলেন। হিন্দু কথাটার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক কটাক্ষ নেই, আছে ঐতিহাসিক সত্য। তাঁরা তৎকালীন রাজশক্তির কাছে যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার যে ফল ফলেছিল সেটা বিস্মৃত হবার মত প্রত্নতাত্ত্বিক ঘটনা নয়। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্ট্ (Sir Edward Hyde East)-এর লিখিত একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—

> 'About the beginning of May a Brahmin of Calcutta, whom I know, and who is well known for his intelligence among the principal native inhabitants and also intimate with many of our own gentlemen of distinction called upon me and informed me that many of the leading Hindoos were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner as practised by Europeans of condition and desired that I would lend them my aid toward it by having a meeting held under my sanction···the meeting was held at my house on the 14th of May, 1816 at which 50 and upwards of the most respectable Hindoo inhabitants of rank and wealth attended, including also the the principal Pundits, when a sum of nearly half a lac of rupees was subscribed and many more subscriptions were promised...all expressed themselves in favour of making the acquisition of the English language a principal object of education together with its moral and scientifie productions.'

ইংরেজী শিক্ষা যে ইংরেজ আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়নি বরং আমরাই তার প্রবর্তনের জন্যে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের উপর চাপ দিয়েছিলাম, অর্থসামর্থ্যও জোগাচ্ছিলাম, তারও প্রমাণ আছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টরি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ (Alexander Duff) বলেছিলেন—

> 'English Education was in a manner forced upon the British Government , it did not

CENTRAL LIBRARY

itself spontaneously originate it. There were two persons who had to do with it. The one was Mr. David Hare. The other was a native Ram Mohan Roy'.

এই বলে ডাফ সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করেন।

দেখা যাচ্ছে, এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার যে প্রাথমিক পরিকল্পনা হয় তার সূত্রপাত করেন রামমোহন রায়, তাঁকে সমর্থন ও তাঁর সহযোগিতা করেন হেয়ার সাহেব। তার থেকেই জন্মলাভ করল চল্লিশ বৎসরের সম্ভাবনাকে সম্মুখে রেখে প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিগর্ভ বীজ হিন্দু কলেজ।

(২)

ইংরেজী শিক্ষা কথাটার অর্থ কি? অর্থ এই নয় যে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে যা শেখানো হয় তাই ইংরেজী শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষা কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থে চিরকাল ব্যবহার করে এসেছি। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যেটুকু বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত হয়েছে ইংরেজের সংস্পর্শে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যেটুকু সম্পদ আমরা প্রায় দেড়শ বছর ধরে আহরণ করেছি তা ইংরেজীর মারফতে অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষাবিধির মধ্য দিয়ে। ভারতহিতৈষী অনেক ইংরেজকে আমরা বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম। তাঁদের সান্নিধ্য তাঁদের সহযোগিতা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের সহায়ক হয়েছিল।

ইংরেজী শিক্ষা মানে কেবল ইংরেজী ভাষা শিক্ষা নয়। একটা দেশের অধিকাংশ লোক ইংরেজী ভাষা না জেনেও ইংরেজী শিক্ষা অর্থাৎ ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে এ কথা আজকের দিনে কল্পনা করা কঠিন নয়। জাপান তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আজও বিংশ শতাব্দীর এই অষ্টম দশকেও—ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের অনুপাত সংখ্যা কত? মাতৃভাষায় অ আ ক খ যারা লিখতে পড়তে পারে—যাদের সাক্ষর ব'লে সংজ্ঞা দিয়েছি—তাদের সংখ্যাই এখনও ত্রিশ শতাংশের উর্ধ্বে উঠতে পারল না। এর মধ্যে তো অনুমান বা কল্পনার কোনো অবকাশ নেই, এটা তো নির্মম সত্য। যে কোন সভ্য দেশের পক্ষে, যে কোনো সভ্য জাতির পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? আমরা 'রোহিণী'র গালিচায় চড়ে আকাশ কুসুম তুলি। আর অজ্ঞানের অন্ধকারে আজন্ম যাদের দিন কেটে যায়, বলদ এবং কাস্তে এবং হাতুড়ি দিয়ে যাদের ইষ্টানিষ্ট বিধান করি—তাদের সবার ঘরে, বিজলি বাতি নয়, একটি করে মাটির প্রদীপও যে দেওয়া গেল না! অদূর ভবিষ্যতে যাবে এমন ভরসাই কি আছে?

এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করলে উদ্বেগ ও উত্তেজনার উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবং তার ফলে একদল মানুষ নিতান্তই চরমতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। সারা ভারতবর্ষে এইরকম একটা দলের উদ্ভব হয়েছে দেখতে পাচ্ছি যাঁদের স্লোগান হচ্ছে 'আংরেজী হটাও'। আমি প্রথমেই বলে রাখি 'আংরেজী হটাও' দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার যত ব্যাপক হবে এবং যত দ্রুত হবে ততই ভারতের কল্যাণ। দেশের সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয়েও আমি একমত যে, পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ অব্যাহত রাখবার জন্যে পশ্চিমের এক বা একাধিক ভাষা শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আর তার মধ্যে ইংরেজীর স্থান যে সর্বাগ্রে, অন্ততঃ আমাদের পক্ষে বৈদেশিক সকল ভাষার মধ্যে ইংরেজী যে সর্বাগ্রে শিক্ষণীয়, তাও আমি মানি। এই ভাষার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয় বশতঃ অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য ভাষার তুলনায় ইংরেজী শেখা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।

ইংরেজী শেখার জন্যেই ইংরেজী শেখা দরকার। সুশিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজী শিখবেন এ আশা অবশ্যই

CENTRAL LIBRARY

করব। শিক্ষিত ভারতবাসী গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করব যার বিভিন্ন স্তরে ইংরেজী পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, দেখব ইংরেজী ভাষা বিষয়ে অধ্যাপনা এবং পরীক্ষণের মান ক্রমশঃ উন্নীত হয়। সুলভ জনপ্রিয়তার মোহে প্রতিদিন ইংরেজীর মানের অবনয়ন ঘটাব এবং সভাস্থলে ইংরেজীর জন্যে অশ্রুবর্ষণ করব—এতে ব্যক্তির লাভ হতে পারে কিন্তু দেশের ক্ষতি রোধ করা যাবে না।

(৩)

আমাদের কর্ম ও চিন্তার মধ্যে সব সময় সঙ্গতি দেখা যায় না। গত কয়েক বছরের মধ্যেই প্রবেশিকা থেকে বি-এ পর্যন্ত পাঠক্রমের সকল সোপানেই ইংরেজী শিক্ষার মানকে অবনমিত করেছি। একটি পাপচক্রের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিপর্যস্ত হতে হতে বিনষ্টির প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। ইংরেজী ভাষার শিক্ষক কোথায়? কথাটা শুনতে মধুর লাগবে না, কিন্তু কথাটা যে সত্য তা অভিভাবক মাত্রেই স্বীকার করবেন। ইংরেজী শিক্ষার পত্তন যেখানে হয় সেই স্কুলে সুযোগ্য ইংরেজী শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আর এঁদের কাছে যারা ইংরেজী শিখে কোনোরকমে বি-এ পাশ করেছেন তাঁরা আবার পরবর্তী প্রজাতিকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। তার যে ফল অবশ্যম্ভাবী তা ঘটছে। পাশ নম্বরের হার কমিয়ে এবং গ্রেস নম্বরের হার বাড়িয়ে সে বিপত্তির হাত থেকে কদিন রক্ষা পাব? চোখের সামনে যে বিপদ ঘটছে আমরা তা দেখেও দেখিনি, আজও দেখছি নে।

যাঁরা বলেন শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন মাতৃভাষা হলেই ইংরেজীর জ্ঞান কমবে তাঁদের বলি শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন যখন পুরোপুরি ইংরেজীই ছিল—তখনও তো কমেছে, তখন থেকেই তো কমেছে। কেন্দ্রীয় চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যম এখনও ওঠেনি সেখানে বাঙালী ছাত্রেরা আপন যোগ্যতা দেখাতে পারছে না কেন? এ বিষয়ে যাঁদের বলবার অধিকার আছে তাঁরা বলেন, ইংরেজী লেখা এবং ইংরেজী বলার অক্ষমতাই অসাফল্যের প্রধান কারণ।

ইংরেজী শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যেই প্রধান গলদ। দেশে স্কুল বাড়ছে যে হারে উপযুক্ত শিক্ষক সেভাবে তৈরী হচ্ছে না। সকল বিষয় সম্বন্ধেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য, ইংরেজী সম্বন্ধে বিশেষভাবে। ইংরেজীর গোড়া পত্তন হচ্ছে না, ভিত্তি আলগা থেকে যাচ্ছে। কলেজে গিয়ে সে আলগা ভিত্তি শক্ত হবে কেমন করে? কলেজের অধ্যাপকদের যোগ্যতা বিচার করব না। শুধু এই বলব তাঁরা যোগ্য হলেও তাঁদের পক্ষে ছাত্রদের ইংরেজী ভাষা বিষয়ে জ্ঞানদানের সুযোগ অল্প। তাঁরা মিল্টন শেক্সপীয়রের কাব্য নাটক পড়াবেন, কিন্তু ব্যাকরণ ও রচনা শেখানোর সময় পাবেন কোথায়?

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ছেলেরা প্রবেশিকা থেকে এম-এ পর্যন্ত পড়ছে। ছাঁকনির মধ্য দিয়ে গলতে গলতে দু চারজন শেষ পর্যন্ত থাকছে। তাদের মধ্যে যারা যোগ্যতম, শিক্ষা বিভাগ সাধারণতঃ তাদের আকর্ষণ করতে পারে না। ফলে শক্তিমানের সেবা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা বঞ্চিত হচ্ছে। তার ফল পড়ছে সমগ্র জাতির উপরে। এই পাপ-চক্রের আবর্তন কোনো এক জায়গায় কোনো এক সময়ে বন্ধ করতে হবে। তা যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ একজনের অপরাধে অন্যজনকে আক্রমণ করে আত্মপ্রসাদের বেশি আর কিছু লাভ হবে না।

পূর্বেও একাধিকবার বলেছি—এখনও বলছি ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আমি অবহিত। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত ইংরেজী জ্ঞান আশানুরূপ হয় না। আমার তো মনে হয় রুশ জর্মন ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স খোলা হয়েছে

CENTRAL LIBRARY

ইংরেজীর জন্যে সেরকম একটি বিশেষ কোর্স খোলা আবশ্যক। সাহিত্যতত্ত্ব বা রসতত্ত্ব নয় ভাষা শিক্ষাদানই হবে সে পাঠক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু ইংরেজী ভাষা শেখা এক জিনিষ আর ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করা আর এক জিনিষ। পূর্বে ইংরেজী শেখা আবশ্যক কিন্তু ভাষা হিসেবেই তা শিখতে হবে। বিষয়-শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে প্রায় আশি বৎসর পূর্বে লিখেছেন—

'স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে তার কোন গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল মোগল গেল, ইংরেজ আসিল যাবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে; কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে। যাহা কিছু বাংলার থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশু ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মত প্রতীয়মান হইবে। ভালোরূপে নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলোকে বুদ্বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোক-প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্পস্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারেনা। ... জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।'—সাধনা, চৈত্র, ১২৯৯

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলেই যে ইংরেজী শেখার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এরকম একটা ধারণা আজও আমাদের মধ্যে অনেকের আছে। সেকালে তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথ প্রতিপক্ষের আপত্তি নিজেই উত্থাপন করে তা খণ্ডন করেছেন।

শিশুকাল থেকে সমস্ত শিক্ষা ইংরেজী ভাষায় নির্বাহ না হলে বাঙালীর ছেলে ভালো করে ইংরেজী শিখতে পারবে না এ ধারণা তাঁর মতে একেবারেই ভিত্তিহীন। যে ভাষা সবচেয়ে পরিচিত সেই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার প্রণালীটি যত সহজে আয়ত্ত হতে পারে অন্য কোনো ভাষার দ্বারা তা হওয়া কখনো সম্ভব নয়। পরিচিতের সাহায্যে অপরিচিতকে চিনি—এটাই হল মনুষ্যপ্রকৃতির বিধান। শুধু ইতিহাস ভূগোল গণিত রসায়ন নয় একটি অপরিচিত ভাষা শিক্ষা করতে গেলেও মাতৃভাষাই হবে তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় এই মত প্রকাশ করেন যে ইংরেজী কখনো বাংলার স্থান অধিকার করতে পারবে না। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, ছেলেমেয়েরা ইংরেজী শিখবে বাংলার পরিবর্তে নয়, বাংলার অনুষঙ্গরূপে।

CENTRAL LIBRARY

'বাল্যকাল হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে, অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরাজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরাজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার অধিক সময় পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া শিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।'

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়ে ইংরেজী শিক্ষা সেই অনুপাতে কমতে থাকে।

'তাহার প্রধান কারণ, আগাগোড়া মুখস্থ করিতে গিয়া ইংরেজী বুঝিবার এবং রচনা করিবার সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।'

এই মুখস্থীকরণ প্রবণতার পরিণাম যে কতখানি হাস্যকর হতে পারে ছিন্নপত্রে কবি তার দু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করা গেল। ইংরেজী শিক্ষার সুফলের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে কোনো সংশয় ছিল না একথা বারংবার বলেছি। ইংরেজী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের (১৩০৮ পৌষ, ১৯০১ ডিসেম্বর) ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজী ভাষার অনেক ক্লাস তিনি নিজেই নিতেন। ইংরেজী ভাষা শেখানোর পক্ষে কোন্ প্রণালী সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে সে নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। 'ইংরেজী সোপান', 'ইংরেজী পাঠ', 'ইংরেজী শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজী সহজশিক্ষা' এবং দু-খণ্ড 'অনুবাদচর্চা' এই বইগুলি ইংরেজী শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষাদান বিষয়ক অনুশীলনের ফল। ইংরেজীকে রবীন্দ্রনাথ হটাতে চান নি। তিনি শুধু শিক্ষার বাহকতার ভারটা তার হাতে দিতে নিষেধ করেছিলেন যেহেতু সে কাজটা নির্বাহ করা মাতৃভাষার পক্ষেই সহজ।

'কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'

(৪)

পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও আমাদের জীবনক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে তাকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই করতে হবে। কিন্তু সহজ কথাটা আজ পর্যন্ত সবাইকে বোঝানো গেল না। অধ্যয়ন অধ্যাপন পরীক্ষণ প্রশাসন প্রভৃতি সকল বিষয়ে মাতৃভাষা প্রবর্তনের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। যাঁরা চতুর লোক তাঁরা কলহ করেন না। তাঁরা বলেন, নীতি হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহার অবশ্যই স্বীকার্য তবে এখন সময়টা অনুকূল নয়, আরও কয়েকটা দিন যাক।

বেশী দিন নয় মাত্র বছর দশেক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (১৯৬২) সভা মাতৃভাষার প্রসঙ্গ নিয়ে একটা বিতর্ক সভার আকার ধারণ করে। সমাবর্তন উৎসবের প্রথম দিনের নিমন্ত্রিত সমাবর্তন-বক্তা অধ্যাপক

CENTRAL LIBRARY

সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই মন্তব্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে এবং সকল শ্রেণীতে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম-রূপে গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয় দিনের ভাষণদাত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই মতের বিরোধিতা করে যা বললেন, তার তাৎপর্য এই যে শিক্ষার নিম্নস্তরে মাতৃভাষা যদি বা চলে—কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীকেই মাধ্যম রাখা উচিত।

তৎকালীন উপাচার্য তাঁর ভাষণে ইংরেজীর সপক্ষেই মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—

'I have applied my mind to the question whether the English language can be retained as the medium of instruction at least in Post-graduate and Honours classes.'

এ স্থলে **at least** কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। শিক্ষার নিম্নতর স্তরেও ইংরেজীকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতে পারলেই তিনি সুখী হন কিন্তু জনমতের চাপে তা যদি নিতান্তই সম্ভব না হয় তা হলে অন্ততঃ অনার্স এবং এম-এ, এম-এস-সি-র ক্ষেত্রে না রাখলেই নয়। ইংরেজীর স্থলে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের জন্য জনসাধারণের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছে কি কারণে? তিনি বলেন স্বাদেশিক ভাবাবেগ এর কারণ। আর এক কারণ—আঞ্চলিক ভাষার সমুন্নতি বিধানের আগ্রহ। কলিকাতার উচ্চতম আদালতের প্রাক্তন বিচারক মহাশয়ের মন্তব্যের সুর শুনে মনে হয় দুটোই অমূলক এবং অর্থহীন। তিনি এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করে বলেন—

'It (ইংরেজীর স্থলে আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তনের ইচ্ছা) is also partly based on a theory that it will be easier for our students to understand a subject in their own mothertongue than in a foreign lauguage. It is said that the attempt to acquire mastery over a subject in a foreign language involves to some extent a waste of our national energy.'

অর্থাৎ 'বিদেশী ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয় শিক্ষা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে বেশি সহজ এরকম একটা মতবাদ প্রচলিত আছে এবং আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরেজীর স্থলে প্রবর্তন করার ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। বিদেশী ভাষার সাহায্যে জ্ঞানার্জন করতে গেলে জাতীয় শক্তির কিছু অপচয় ঘটে। এ ধরণের কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন।'

কি কি কারণে লোকে ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে ইচ্ছা করেন বলে তিনি মনে করেন, সেগুলি বিবৃত করে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মহাশয় রায় দিলেন—

'I regret to say that I can not accept any of the aforesaid grounds as a reason for discarding English as a medium of instruction.'

উল্লিখিত কোন যুক্তিকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে বর্জন করার পক্ষে সংগত কারণ বলে গ্রহণ করতে তিনি অক্ষম।

পূর্বোক্ত কারণ দুটির অসারতা প্রমাণের জন্যে তৎকালীন উপাচার্য মহাশয় যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তার উপরে কারও কথা চলে না। সে যুক্তিটা কি?

'With regard to the patriotic sentiment, I need hardly point out that almost all the great patriotic leaders of our country were masters of the English language'.

দেশনায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইংরেজী ভাষার উপরে ছিল অখণ্ড অধিকার। তাতে তো তাঁদের দেশভক্তি ব্যাহত হয়নি। সুতরাং স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গে ইংরেজীর কথা উত্থাপন করা তাঁর মতে বাতুলতা মাত্র।

CENTRAL LIBRARY

এতেও যদি প্রতিপক্ষ স্তব্ধ না হয় তাহলে তিনি জাতির জনকের নাম করবেন—যিনি ইংরেজীতে অনন্যকরণীয় ভঙ্গীতে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন এবং প্রকাশ করতেন।

> **'It will be enough for my purpose if I cite the instance of the father of the Nation who could and did express his thought in English in an indimitable style.'**

জাতির জনক ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ করতেন শুধু নয় অনন্যকরণীয় ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশ করতেন—ইংরেজীতে তাঁর এমনি অধিকার ছিল। ইংরেজীর সঙ্গে দেশপ্রেমের যে কত ঘনিষ্ঠ যোগ তা আমরা এই সমাবর্তন ভাষণের মধ্যে দিয়েই প্রথম জানতে পারি। আমরা জানতে পারি গোখলে, তিলক, লাজপত রায়, মতিলাল নেহেরু, স্বামী বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন **'were remarkable for the English style.'** এর পরেও মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার কথা আর কি বলা যায়?

আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিবিধানের জন্য ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত এটাও তাঁর মতে অন্তঃসারশূন্য অজুহাত মাত্র। তাঁর ধারণা—

> **'The retention of English, as a medium of instruction has never hampered the progress of the regional language at least in Bengal.**

ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রচলিত রাখার দরুণ আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি কখনো ব্যাহত হয়নি, অন্তত বাংলা-দেশে তো নয়ই। আঞ্চলিক ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া তো দূরের কথা বরং যে সকল বাঙালী সাহিত্যিকের দানে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল তাঁরা সকলেই ইংরেজীর মাধ্যমেই বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন।

> **'The litterateurs of Bengal who have made valuable contributions to the progress of the Bengali lauguage received their education in the English medium.'**

এই তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে পাছে কেউ সংশয় প্রকাশ করে সেজন্যে বক্তা আগে থেকেই মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যকে কি পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমরা জানি। কিন্তু তাঁদের সকলে ইংরেজীর মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন বলে সেটা সম্ভব হয়েছে এটা মানতে গেলে সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হবে। কারণ, ইতিহাস বলে তাঁরা সকলেই ইংরেজীর মাধ্যমে বিদ্যালাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—কারণ যে ভাষণ থেকে অনুচ্ছেদটি উত্থাপন করছি সেটি প্রদত্ত হয়েছিল এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই। বক্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—

> 'বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জুম্ভিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up' তিনি হন উপরে, যারা ইংরেজী 'I' সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I by myself I' তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষা বিভাগ,

CENTRAL LIBRARY

ছাত্রবৃত্তি পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদ্গতি ছিল 'নর্মাল স্কুল-নামধারী মাথা-হেঁট করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা বিদ্যালয়ে স্বল্প সন্তুষ্ট বাংলা পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত।...আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জিত এই শিক্ষাই চলছিল।...এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নর্মাল স্কুলে পড়ার ফলে বাংলা ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের সাধনাও চলতে লাগল। রচনার সাধনা স্বভাবতই সহজ নয়। তাও যদি আবার বিদেশী ভাষার মাধ্যমে করতে হয় তা হলে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অল্প বয়সে বাংলা ভাষাটা এইভাবে আয়ত্ত হয়েছিল বলেই ইংরেজী শেখাও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। নিজের বাল্যশিক্ষার ইতিহাস অনুসরণ করে বলেছেন—

'নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।...ইস্কুল পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজী আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি, তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলা ভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত।'

ইংরেজী ভাষায় তিনি যে অধিকার অর্জন করেছেন তার কারণ কি? কবি বলেছেন—

'নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল না দেওয়া মাতৃভাষায়, সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর যাদুমন্ত্র দিয়েছেন।'

হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনের শিক্ষা প্রধানত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছিল বটে কিন্তু মধুসূদনের জীবন-চরিত পাঠ করলে দেখতে পাই কবি নিজে পরভাষাবাহিনী এই শিক্ষাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। বলছেন—

'Such of us as owing to early defective education, know little of it (Bengali) and learn to despise it are mirseably wrong.'

এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করেও যে বাংলাভাষায় তাঁর অসামান্য অধিকার এবং গভীর অনুরাগ জন্মেছিল তার প্রধান কারণ শৈশবের গৃহশিক্ষা—সে শিক্ষা স্বভাবত একান্তভাবেই মাতৃভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রও যে একদা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার উপযোগিতার সপক্ষে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে। যে ভাষার মাধ্যমেই তিনি শিক্ষা পান না কেন মাতৃভাষাই যে যোগ্যতম বাহন এ সম্পর্কে তাঁর মনে কখনো সংশয় ছিল না।

(৫)

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রবর্তন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে। সেদিনও বিতর্ক কম হয়নি। প্রবর্তনের পক্ষে

CENTRAL LIBRARY

যাঁরা উদ্‌যোগী হয়েছিলেন বিরোধী দলের হাতে তাঁদের বারংবার পরাজয় ঘটেছে। যুক্তির চেয়ে সংখ্যার বল সর্বদাই বেশী। সেকালেও তাই ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অভিভাবকেরা এ বিষয়ে কি ভেবেছিলেন কি করেছিলেন একবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখা যাক। আজ থেকে আশি বছর আগের কথা চিন্তা করুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেও এক স্মরণীয় কাল। সেই প্রথম একজন ভারতীয় বসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে। সার জেমস্ উইলিয়াম, উইলিয়াম রিচি, জেমস্ আরস্কাইন, সামসার মেন, সেটন কার, বেলি, ইলবার্ট, হাণ্টার প্রভৃতির মত বাঘা বাঘা ইংরেজ ভাইস্ চ্যান্সেলরের পর ওই পদে অধিষ্ঠিত হলেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯০ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে পাঠ করলেন তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণ। তাঁর সেই প্রথম ভাষণেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হল। তিনি বললেন—

> **'I firmly believe that we can not have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars. Consider the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India not withstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars.'**
>
> অর্থাৎ 'যদি না মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় তাহলে জাতি হিসাবে আমরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপক সংস্কৃতি অর্জন করতে সমর্থ হব না। ইতিহাস আমাদের কি শিক্ষা দেয় তা বিবেচনা করে দেখুন। বিবিধ আধুনিক ভাষার বাহকতায় জ্ঞানের আলোক যতদিন না তার দীপ্তি বিকীর্ণ করেছিল ততদিন ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। ভারতবর্ষেও তাই। একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যমের সাহায্যে জ্ঞানের আলোক আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু সমাজের উপরের স্তরেই তার সঞ্চরণ। সমগ্র দেশ যে অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যতক্ষণ না মাতৃভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া হয় ততক্ষণ সে অন্ধকার অপসারিত হবে না'।

শুধু মাধ্যম হিসেবে নয়, অধ্যয়নের বিষয় হিসেবেও মাতৃভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি এই অভিভাষণে ব্যক্ত করে বললেন—

> **'I.....deem it not merely desirable, but necessary that we should encourage the study of those Indian vernaculars that have a literature by making them compulsory subjects of our examinations.'**

প্রথম ভারতীয় উপাচার্যের ভাষণে দেশের মর্মকথা সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অভিভাবকেরা এই অভিমতকে কর্মক্ষেত্রে রূপ দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন। ১৮৯৯ এর ১লা মার্চ তারিখে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রেজিষ্ট্রারের কাছে এ সম্পর্কে প্রস্তাব করে একটি পত্র পাঠালেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে

CENTRAL LIBRARY

মাতৃভাষা প্রবর্তন প্রয়াসের ইতিহাসে এই পত্রের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে তার প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করছি—

'It will be in the recollection of all that at the last convocation for conferring degrees, the Hon'ble the Vice-Chancellor drew attention to the necessity of encouraging the study of Indian vernaculars. He is reported to have said, 'I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should eneourage the study of those Indian vernaculars that have a literature by making them compulsory subjects of our examinations in the conjuction with their kindred classical language'. Sharing the view thus set forth, and believing that the time has come when the University should take action in the matter, I beg to submit for the consideration of the Syndicate the following propositions. (1) That in the Arts Examinations candidates who take up Sanskrit should also be examined either in Bengali or Hindi or Urdu ..

Umesh Chandra Datta seconded. Raja Pyarimohan Mookherjee proposed as an amendment that it is not desirable to modify the Arts Examinations Regulations in the way suggested in the motion. Maulavi Sirajul Islam seconded the amendment.

Col. H. S. Jarrett, Nawab Abdul Latif, Babu Rajaninath Roy and Mm. Mahesh Chandra Nyayaratna opposed the motion.

Babu Bankim Chandra Chatterji, Chandranath Basu and Mahendra N. Ray spoke in favour. Babu Nilmoni Mukherji spoke against the motion.

Dr. Macdonald, Mr. A. M. Bose and Haraprasad Shastri supported the motion.

With the consent of the meeting the amendment was withdrawn, being taken as a direct negative of the original motion.

The motion was then put to vote and declared lost by a majority of 17 to 11.'

'গত বৎসর উপাধি বিতরণের উদ্দেশ্যে আহূত সমাবর্তন সভায় মাননীয় উপাচার্য মহাশয় ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির অধ্যয়নে উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়তার দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সে কথা সবার স্মরণ থাকবে। প্রকাশ যে তিনি বলেন, - যে-সকল ভারতীয় ভাষা সাহিত্য-সম্পদে সম্পন্ন, সংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাষাগুলির সঙ্গে ওইসকল ভাষাকেও আমাদের পরীক্ষাসমূহের জন্যে অবশ্য পাঠ্য করে, এই ভাষাগুলির অধ্যয়নে উৎসাহ দান করা কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাই নয় আমার মতে তা একান্ত আবশ্যক। তাঁর অভিমত সমর্থন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে এই মনে করে সিণ্ডিকেটের বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করছি।'

যে প্রস্তাবগুলি স্যার আশুতোষ উপস্থাপিত করেছিলেন তার প্রথমটি এই—

'কলাবিভাগের পরীক্ষার জন্যে যে সকল ছাত্রছাত্রী সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, তাদের বাংলা, হিন্দী, উর্দু এই তিনের মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে।'

CENTRAL LIBRARY

প্রস্তাবটি সামান্য হলেও সেদিন এটিকে নিতান্ত সামান্য মনে করা হয়নি। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল কেবল সেইসব ছাত্রকে একটি মাতৃভাষা পড়তে দেওয়া হোক যারা আর্টস অর্থাৎ কলা বা প্রজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী। তাও আবার সকল আর্টস পরীক্ষার্থীর জন্যে নয় কেবল তাদেরই জন্যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হচ্ছে যারা প্রাচীন ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে একটি পরীক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য করতে হবে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন ভাষার (যেমন গ্রীক, ল্যাটিন) ছাত্রকে এই ব্যবস্থার অধীন করতে চাওয়া হয়নি। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদেরও এই প্রস্তাবের বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য এই অতি নিরীহ প্রস্তাবটির অভ্যন্তরেও কেউ কেউ বোধ হয় বিপত্তির আশঙ্কা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রস্তাবটি সিণ্ডিকেটে পাঠানোর আগে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে উত্থাপন করা হল (তারিখ ১১ জুলাই, ১৮৯১)। পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হল। শেষপর্যন্ত আশুতোষই হেরে গেলেন। আশুতোষের পরাজয়ের অংশীদার ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রনাথ রায়, আনন্দমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি।

(৬)

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হল, এ অনুমান স্বাভাবিক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সে আন্দোলন অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রমাণ বিরল নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে একযোগে আন্দোলন এই প্রথম। উনবিংশ শতকের শেষ দশকটি মাতৃভাষানুশীলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

বাংলা ১২৯৯-এর পৌষমাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হয়—পৌষের প্রথমার্ধ হলে ১৮৯২-এর ডিসেম্বরে। প্রবন্ধটি তার আগে পঠিত হয়েছিল রাজশাহী এ্যাসোসিয়েশনে। এখানে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত ইতিপূর্বেও প্রকাশিত হয়েছিল (১২৯০ সালের কার্তিক, অক্টোবর, ১৮৮৩ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এটা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিন্তাশীল বিশিষ্ট মনীষীর মতের আনুকূল্য পাওয়ায় আন্দোলনের কিছুটা প্রসার হল। তবে অনুরাগীর দল সংখ্যায় লঘু। গৌরবের গুরুত্বে সংখ্যা লাঘবের দুর্বলতা দূর হয় না। আজ সেটা যেমন সত্য সেদিনও তেমনি সত্য ছিল। আর সমস্যাও সেদিন যা ছিল আজও বোধ হয় তা-ই আছে। প্রকারে ঠিক আছে, পরিমাণে কিছু পার্থক্য ঘটলেও ঘটতে পারে।

মাতৃভাষাকে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কর্ম-পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা কেউ কেউ ব্যবহার করতে চাচ্ছি, তার একমাত্র কারণ এই নয় যে তাতে কাজটা সহজ হবে স্বাভাবিক হবে এবং সেটা দ্রুততর নিষ্পন্ন হবে। তার আর এক কারণ এই যে, আমার মাতৃভাষা এই অনুশীলনের দ্বারা শক্তিশালী হবে, পুষ্ট হবে এখনও তার পরিণতির যেটুকু বাকী আছে সেটুকু সে লাভ করবে। তাকে যদি অকেজো অকর্মণ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখি তাকে শ্রদ্ধা না করে কৃপামাত্র প্রদর্শন করি তাহলে সে বৃদ্ধির অবকাশ পাবে কেমন করে?

উপরিউক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না।...ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংস্পর্শ আমরা লাভ করি না এবং

CENTRAL LIBRARY

সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাব সকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সম্বদ্ধরূপে পায় নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সেকথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মত শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে। প্রকৃত কথা আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক্ বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেকসময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি। যেদিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায় আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে।'

সে সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনার কি কোনো উপায় নেই? একটিমাত্র উপায় আছে। রবীন্দ্রনাথ সেটি নির্দেশ করে বলেছেন—এ মিলন সাধন করতে পারে 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য'।

এই প্রবন্ধটি স্বভাবতই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

'আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দু একটি কথা আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি।'

তারপর বলেছেন—'আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সদস্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।

এই উক্তিটি যে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের সভায় আনীত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ওই প্রস্তাবের সমর্থকদের মধ্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসুর নাম দেখেছি। বোঝা যাচ্ছে মাতৃভাষার অনুশীলন সম্পর্কে এঁদের চিন্তাও নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এঁদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই দুজন মনীষীও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে আপন আপন মত জানান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—

'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতে ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সিনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।'

আশুতোষের আনীত প্রস্তাবের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন এখানেও তারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর চেষ্টার কি ফল ফলেছিল তা তো আমরা দেখেইছি। প্রস্তাবের পক্ষীয় যে এগারোজন সদস্য ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ইনিও রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ পড়েছিলেন এবং খুশী হয়ে প্রবন্ধ লেখককে পত্র লিখে তাঁর ঐকমত্য জানিয়েছিলেন। তিনি লেখেন—

'পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত, সুতরাং সেই মত এমন সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই।... এখন আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা ও নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে

CENTRAL LIBRARY

পাবলিক ওপিনিয়ন অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি কিন্তু যে পর্যন্ত এই পরিবর্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি।'

(৭)

নিজে প্রস্তাব উত্থাপন না করেও আনন্দমোহন বসু যে আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আনন্দমোহন বসু শুধু যে বাংলা নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকেও উচ্চতর পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব এবং সে জন্যে চেষ্টা করেছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস্-এর ২৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর অংশ—

'Item No. 326. A letter from Miss Adams Head Mistress, La Martiniere College for girls, having been read, the President proposed that French be accepted as a second language for female candidates at the B. A. Examination. Ashutosh Mookherjee seconded. A. M. Bose proposed that words 'German or an Indian vernaculars' be added.'

মিস অ্যাডামসের প্রস্তাব ছিল দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ফরাসীর নাম পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হোক। আনন্দ মোহন বসুর সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হল ফরাসীর বিকল্পরূপে জর্মনেরও নাম থাকুক। আর যদি কোনো পরীক্ষার্থী ভারতীয় ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকেও সে অধিকার দেওয়া হোক। সংশোধনী প্রস্তাবটি লক্ষ্য করে দেখুন। ভারতীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক করার কথা বলা হয় নি। ঐচ্ছিক রূপে পরীক্ষণীয় বিষয়-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হল না। কারণ সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি আগে থেকে দেওয়া হয়নি। নিতান্তই আইনের ফাঁকি।

শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার কর্তৃত্ব ছাত্রগণের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের অন্তরায় হচ্ছে একথা তখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন সদস্যদের কারও কারও ভাবনার বিষয় হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র বলেছেন—

'One great reason why our University fails to awaken much original thinking is because it is imparted through the medium of a difficult foreign language, the genius of which is so widely different from that of our own. The acquisition of such a language must to a great extent be the work of imitation ; and the habit of imitation gradually becomes so deeprooted as to influence our intellectual operations generally. Again the costly foreign drapery in which our students have to clothe their thought taxes their limited mental resources to an extent which does not leave enough for the proper feeding of thought.'—Convocation address, Cacutta University, 1892.

CENTRAL LIBRARY

এর তাৎপর্য—

'যে কঠিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা দিই—আমাদের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃতির পার্থক্য দুস্তর। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে মৌলিক চিন্তা জাগ্রত করতে সমর্থ হয় না এইটি তার একটি মুখ্য কারণ। এই রকম একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনুকরণের প্রয়াসই প্রাধান্য পায়। আর এই অনুকরণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে এমনই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাছাড়া যে দুর্মূল্য বিদেশী বেশবাস দিয়ে আমাদের ছাত্ররা আপন আপন ভাবনাকে সজ্জিত করতে বাধ্য হয় তার জন্যে তাদের মনঃশক্তির এতই অপচয় ঘটে যে তাদের চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'

(৮)

ইংরেজীকে আজও যাঁরা শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমরূপে রক্ষা করার পক্ষপাতী তাঁরা যেন লক্ষ্য করেন, আট দশক আগেও বিদেশী ভাষার বাহকতাকেই সেদিনকার প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ভাষণে সে কথা উচ্চ কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। ঠিক সত্তর বছর পরে উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ী ১৯৬২ সালের সমাবর্তন ভাষণে এই বিষয়েই অন্য মত প্রকাশ করেছেন। একই বিষয় নিয়ে দুই কালের দুই শিক্ষাবিদের চিন্তায় ও মতে কত পার্থক্য থাকতে পারে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি উল্লেখ করছি এই জন্যে যে, সকল রকম মত এবং সকল রকম চিন্তার মধ্যে থেকেই সত্যের সন্ধান করতে হবে। ইংরেজীর মাধ্যমে ছাত্ররা যে জ্ঞান অর্জন করবে বাংলার মাধ্যমে সেই জ্ঞান অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে সুরজিৎ লাহিড়ী তাঁর সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন, কিছুদূর পর্যন্ত হলেও হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয়। অনার্স এবং এম-এর ক্ষেত্রে দেশী ভাষা অচল। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষার ব্যবহার তাঁর মতে সম্ভব নয়, না বিজ্ঞানে না কলা বিষয়ে। যুক্তি এই যে ইংরেজী ভাষায় লেখা বই না পড়তে পারলে উচ্চতর শ্রেণীর অধ্যয়ন বা গবেষণা কোনটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে না। তাঁর মতে—

'Research work in Science and Technology as also in Humanities will suffer unless the students are able to understand authoritative text books which are written in English.'

ইংরেজী বই পড়াকে নিষেধ কে করেছে, ইংরেজী শুধু নয় অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার বইও পড়তে হবে। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা কেউ তো অস্বীকার করেনি। প্রয়োজনীয় বললে যথেষ্ট বলা হয় না আমরা অপরিহার্য বলছি, বিশেষত বিজ্ঞানের গবেষণায়। আর বাংলায় বই নেই বলে হতাশ হয়ে বসে থাকবই বা কেন, আজ নেই কাল হবে। নিম্নতর মানের বিজ্ঞান পুস্তকও তো আগে ছিল না, এখন অনেক রচিত হয়েছে আরও হচ্ছে। বি-এ পরীক্ষার উপযুক্ত দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক এখন আঞ্চলিক ভাষায় সকল প্রদেশে অবিরাম লেখা হচ্ছে। স্নাতক মানের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। প্রবেশিকা স্তরের তো কথাই নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বাহকতা পুরোপুরি স্বীকৃত। সুতরাং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সকল পাঠ্যই মাতৃভাষায় রচিত হচ্ছে। মাতৃভাষা পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষার মুখ্য বাহন।

CENTRAL LIBRARY

(৯)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে অর্থাৎ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপাচার্য হলেন প্রায় সেই সময় থেকে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার যে প্রস্তাব ওঠে তার প্রথম সুফল—অবশ্য আংশিক সুফল ফলল ঠিক অর্ধ শতাব্দী পরে—১৯৪০ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪০ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মাতৃভাষায়। দীর্ঘদিনের অতন্দ্র চেষ্টায় পরীক্ষার নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যাঁদের নিরলস চেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁরা জাতির নমস্য।

স্যাডলার কমিশনের নিয়োগ হল ১৯১৭ সালে। তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ। রিপোর্টে বলা হল—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজী ব্যবহারের আতিশয্যের ফলে ছাত্রদের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও অঙ্ক ছাড়া আর সকল বিষয়ের জন্যে মাতৃভাষার নির্বিকল্প ব্যবহারই বোধহয় সঙ্গত হবে।

> **'The use of the English medium is at present excessive in the secondary school to the detriment both of the pupils' education and the rational use of both media and that a substantial change should be made and that it would probably be desirable as a rule to use the vernacular as the medium throughout the secondary schools for all subjects other than English and Mathematics.'**

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আশুতোষ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্যে আর একবার উদ্‌যোগী হলেন। সে ইতিহাস স্মরণযোগ্য। প্রধান শিক্ষকদের উদ্‌যোগে ১৯২১ সালের ৭ মে তারিখে সেনেট হাউসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য সংস্কার। এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। এরপর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকদের একটি সভা হয়। সভার স্থান ছিল দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস। এই সভা পূর্ববর্তী প্রধান শিক্ষকদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন।

শিক্ষকদের সভা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সভা—এই দুইটি সভাই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুমান স্বাভাবিক যে, আলোচ্য দুই সভার পিছনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ আশুতোষের প্রেরণা ছিল। এ অনুমান আরও সমর্থিত হয় এই কারণে যে, প্রধান শিক্ষকদের গৃহীত এবং পরবর্তী সভার অনুমোদিত শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ক সিদ্ধান্তটি নিয়ে সিণ্ডিকেটে আলোচনা হল। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য সিণ্ডিকেটে প্রস্তাব উত্থাপিত হল। সিণ্ডিকেট প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে পাঠালেন আর্টস্ ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টির যুক্ত বৈঠকে। উভয় ফ্যাকাল্টির মিলিত বৈঠকে পাঠ্যবিধির খসড়া প্রস্তুত হল। তাতে প্রস্তাব করা হল—

> **'Instruction and examination in all subjects other than English shall be conducted in the vernaculars, provided that the syndicate may, in special cases make exception to this rule or postpone its operation for a prescribed time.'**

অর্থাৎ 'ইংরেজী ছাড়া আর সকল বিষয়ের অধ্যাপন এবং পরীক্ষণের কাজ মাতৃভাষার সাহায্যে নির্বাহিত হবে। তবে সিণ্ডিকেট বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই বিধানের ব্যতিক্রম করতে পারেন, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এই বিধানের প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারেন।'

CENTRAL LIBRARY

যুক্ত ফ্যাকালটির প্রণীত প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী ১৯২২-এর ৭ই জুলাই তারিখে সেনেট অনুমোদন করলেন। কিন্তু সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেল না। তারপর কয়েক বছর কাটল। আশুতোষের মৃত্যু হল। প্রবেশিকার নিয়মাবলী নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা চলতেই লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও আলোচনার বিরাম নেই। তার একটি কৌতুকাবহ নিদর্শন, তৎকালীন একটি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করি—

'শিক্ষার বাহন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথা। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সাহায্যে ইতিহাস পড়ান যায় কি না, সেই সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই প্রস্তাবের একটি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম এইরূপ—যদি ইংরাজী ইতিহাস ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ফরাসী দেশের ইতিহাস ফরাসী ভাষায় জার্মান দেশের ইতিহাস জার্মান ভাষায় এবং গ্রীসের ইতিহাস গ্রীক ভাষায় শিখানো হইবে না কেন? আমার মনে আছে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমি রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায় প্রণীত একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম। তিনি একজন আইনবিশারদ ছিলেন। সর্বদা আইনের পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও তিনি তাঁহার মাতৃভাষার অনুশীলনের সময় পাইতেন।……আধুনিক গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তাদের অন্যতম শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বাংলা ভাষায় রোম দেশের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। যদি ৬০ কিংবা ৮০ বৎসর পূর্বে এরূপ হওয়া সম্ভবপর ছিল, তবে এখন হইবে না কেন?……যখন উইলিয়াম শেকস্‌পীয়র ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার সামান্য জ্ঞান লইয়া লণ্ডনে অভিনেতা হইয়া দু পয়সা অর্জনের অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহাকে ল্যাটিন প্রাইমার পড়িয়া সিনট্যাকস্ মুখস্থ করিয়া জুলিয়াস সীজারের… উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল? সৌভাগ্যক্রমে তিনি নর্থ অনূদিত প্লুটার্ক পাইয়াছিলেন। এই অনুবাদ পড়িয়াই অমর কবি শেকস্‌পীয়র অতুলনীয় নাটকসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।'
—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ শ্রাবণ ১৩৩২, ১৫ আগস্ট

(১০)

অবশেষে ১৯১৯ সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। এই কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন এবং তার অনেক অংশ পরিবর্তন করলেন। শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে গোড়ায় যে প্রস্তাব হয়েছিল তার ভাষাটি কিছু বদলে দেওয়া হল। প্রথমে ছিল—

'Instruction and examination in all subjects other than English shall be conducted in the vernaculars.'

অর্থাৎ 'ইংরেজী ছাড়া সকল বিষয়ের অধ্যাপন এবং পরীক্ষণের কাজ নির্বাহিত হবে মাতৃভাষার সাহায্যে।' কমিটি এটি বদল করলেন—

'Unless otherwise provided answer papers in all subjects other than English and all other European languages shall be written in one or other of the major vernaculars.

অর্থাৎ 'অন্যরকম নির্দেশ না থাকলে ইংরেজী বা আর কোনো ইউরোপীয় ভাষা ছাড়া সকল বিষয়ের উত্তর এই কোনো-না-কোনো একটি মুখ্য দেশীয় ভাষায় লিখতে হবে।'

CENTRAL LIBRARY

কমিটি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই রিপোর্ট গ্রহণ করবার জন্য সেনেটকে অনুরোধ করে যে ভাষণ দিলেন তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি—

'The regulations have been long overdue. We trust that the good effects which we hope will emanate from their introduction will be to the lasting benefit of our province. Let us recall today the great idealism which was behind the scheme when it was first brought forward in 1921 and let us declare that the time has come to bring this long and heated controversy to an end. Let us not falter, but let us go forward looking ahead to the time when our mothertongue will be the medium not only of our Matriculation examination but also of the highest examination of the University.'

অর্থাৎ 'এই সকল বিধান অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস এই বিধানগুলির প্রবর্তনে যে সুফল উদ্ভূত হবে তাতে আমাদের প্রদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার প্রথম উপস্থাপনার সময় এর পশ্চাতে যে মহান আদর্শবাদ ক্রিয়া করেছিল আজ তা স্মরণ করি। আজ এই কথা ঘোষণা করা হোক যে, এই দীর্ঘকালীন উত্তপ্ত বিতর্কের সমাপ্তি সাধনের সময় এসেছে। আমাদের আর দ্বিধা করলে চলবে না। অবিচলিত পদক্ষেপে আমাদের সেই দিনটির দিকে এগিয়ে যেতে হবে যেদিন শুধু প্রবেশিকার নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার বাহনও হবে মাতৃভাষা।'

শ্যামাপ্রসাদ সেনেটের সদস্যদের সেই মহান্ আদর্শবাদের কথা স্মরণ করতে বললেন যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পিতৃদেব ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন। সদস্যদের কাছে তিনি এই বলে আবেদন করলেন যে তর্ক-বিতর্ক ভুলে তাঁরা মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন করুন।

তিনদিন ব্যাপী আলোচনার পর সেনেট কর্তৃক ওই রিপোর্ট অনুমোদিত হল (তারিখ ১৫ই আগষ্ট ১৯৩২)। হাসান সুরাবর্দী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে সুরাবর্দী সাহেব বললেন, তিনি যা করেছেন সেজন্য আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি না থাকলে এই নিয়মগুলি কখনই অনুমোদিত হত না। তাঁর পিতার আরব্ধ প্রয়াসের উল্লেখ করে উপাচার্য বললেন, পিতার আরব্ধ কল্যাণ-কর্মকে তিনি যে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন এ জন্যে তাঁর সুখী হওয়ার কথা, গর্ববোধ করার কথা।

এটা ১৯৩২-এর কথা। আমরা জানি সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় তখনই পরীক্ষা সম্পর্কীয় বিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেল আরও তিন বছর পরে, ১৯৩৫-এর জুন মাসে। বাংলা দেশে সেদিন থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন ধারার প্রবর্তন হল।

মাধ্যমিক শিক্ষা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেই এসেছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের হাতে। পর্ষদ তাঁদের গৃহীত হায়ার সেকেণ্ডারী এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন।

প্রবেশিকা স্তরে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের নীতি স্বীকৃত এবং প্রবর্তিত হবার ফলে আর একটা বড় লাভ হল। বাংলা ভাষায় বই নেই বলে যে আশঙ্কায় অনেকের মন আন্দোলিত হচ্ছিল সে আশঙ্কার অনেকখানি অবিলম্বে অপসারিত হল। বাংলা ভাষায় বই বেরোতে দেরি হল না।

শ্যামাপ্রসাদের কাছে বাংলা দেশের ঋণ অপরিমেয়। তিনি শুধু নিয়ম অনুমোদন করিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন

CENTRAL LIBRARY

না, যাতে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচিত হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল এদেশের শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অসামান্য। কাজের পরিমাণে গুরুত্বের বিচার নয়। কয়েকটি বিষয়ে বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করে তাঁরা যে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক মাতৃভাষায় রচনা করবার পথ প্রথম উন্মুক্ত করে দিলেন তার ফলেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্ভব হয়। এই পরিভাষা রচিত হয়েছিল বলেই ১৯৪০ থেকে ইংরেজী ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বাংলার মাধ্যমে গৃহীত হতে পেরেছিল। পরিভাষা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ আরো একটি কাজে হাত দেন। বাংলা বানান সংস্কারের জন্যে তিনি একটি বিশেষ সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতি কর্তৃক যে বানানবিধি প্রস্তাবিত হয়েছিল, অদ্যাবধি আমরা সেই বিধিই প্রধানতঃ অনুসরণ করে আসছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধি প্রণয়নের ইতিহাস অন্যত্র বিবৃত হয়েছে (চতুষ্কোণ, ১৩৭৭ পূজা সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই কারণে এখানে তার বিশদ আলোচনা করলাম না।

মাধ্যমিক স্তরে তো কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তাতেই নিশ্চিন্ত থাকলেন না। এবার তিনি কলেজীয় শিক্ষার স্তরেও মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রয়োগ করার জন্যে মনোযোগী হলেন। এই পুণ্যপ্রয়াসে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭-এর সমাবর্তন সভায় (তারিখ ৫ ফাল্গুন ১৩৪০) বাংলায় প্রদত্ত বিখ্যাত ভাষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা, শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্য থাকার কালেই যা ঘটেছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা প্রদানে পিতাপুত্রের নিরন্তর এবং নিরলস সাধনার প্রতি সম্মান নিবেদন করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন একলা তিনি নন, তিনি এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গ মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করে নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে এসেছেন দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সেই প্রয়াস স্বীকৃতি পায়নি। তিনি বলেন—

> 'বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্যোগকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রেখেছেন, তাকে ভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন। যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষার লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্য গর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গী মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তারপরে তিনিই বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করালেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই ছুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন।'

CENTRAL LIBRARY

রীতির গ্রন্থি মুক্ত হলেও শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হয়নি। পিতার মত তাঁকেও অনেক বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

(১১)

তারপরেও প্রায় দশ বছর চলে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম ভারতীয় আচার্য (চ্যান্সেলর) শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়া মহাশয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করলেন। তারও কিছু পরে ধীরে ধীরে বাংলার ব্যবহার আরম্ভ হল। তখন ছিল দু'বছরের আই. এ, আই. এসসি এবং বি. এ, বি. এসসি-র পাঠক্রম। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স তখনও প্রবর্তিত হয়নি। আই. এ, আই. এসসি এবং বি. এ-র ইংরেজী ছাড়া সকল বিষয়েই বাংলায় পঠন পাঠনের অনুমতি দেওয়া হল। বি. এসসি-তে ইংরেজী নেই। বি. এসসি-র সকল বিষয়েই বাংলায় পঠন পাঠন সিদ্ধ হল। তবে বি. এ, বি. এসসি-র অনার্স পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেল না।

কলেজীয় স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকা কালে। আশুতোষ এবং শ্যামাপ্রসাদের সাধনাকে তিনি অধিক সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাচার্য হবার পর তাঁর সমাবর্তনের ভাষণ বাংলায় লেখার কথা ভেবেছিলেন বলে আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজীতে তাঁর ভাষণ লিখলেও তার একটি বাংলা অনুবাদও প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর ভাষণের ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষারই পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছিল। তাঁর পূর্বে বা পরে সমাবর্তন উপলক্ষে আর কোনো উপাচার্যের ভাষণ বাংলায় লিখে বা অনুবাদ করে সমাবর্তন সভায় পঠিত বা বিতরিত হয়েছে বলে জানি না।

বি. এ, বি. এসসি পাশ কোর্স পর্যন্ত বাংলার ব্যবহার অনুমোদিত হওয়ায় আজ পদার্থ বিজ্ঞান উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বাংলা বই রচিত হয়েছে। অর্থনীতি রাজনীতি দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েরও পাঠ্য পুস্তকের অভাব নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করার ফলেই বাংলা ভাষার চর্চা বেড়েছে, বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের বই লিখিত হয়েছে। সুরজিৎ লাহিড়ী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও বাংলার চর্চা ব্যাহত হয়নি। আমরা বলছি শিক্ষার মাধ্যম বাংলা থাকলে বাংলার চর্চা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত। কেননা ইতিহাসে সেই প্রমাণই পাওয়া গেল।

যে কোনো প্রথারই সংস্কার করতে যাই না কেন একটু সাহস, একটু আত্মবিশ্বাস এবং একটু দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। আমরা ভীরুতা পরিহার করে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর বিভাগেও মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত আগে নিতে পারিনি। কিন্তু আর বিলম্ব না করে এখন তো নিতে পারি। মাতৃভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপন শুরু হলেই বই লেখা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগী হলে উৎসাহ দিলে বেশী পরিমাণেই হবে। আগে পড়ার ব্যবস্থা হলে লেখক বই লেখার প্রেরণা পাবেন। কারণ বই বেরোলেই অন্ততঃ কয়েকজন পাঠকও পাওয়া যাবে এমন আশা থাকা চাই। কবে পড়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে সেই সুদূর ভবিষ্যতের আশা নিয়ে কেউ বই লেখায় উৎসাহ পেতে পারেন না। ঘোড়ার আগে গাড়ী না গাড়ীর আগে ঘোড়া—এ প্রশ্ন অতি পুরাতন। এবং উত্তরও নূতন

CENTRAL LIBRARY

নয়। প্রায় আশি বৎসর আগেও এ জাতীয় প্রশ্নোত্তর শোনা গেছে। রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ লোকেন্দ্রনাথ পালিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাংলায় শিক্ষা পুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় যে বাঙালিতে বাঙালি ছেলেদের জন্য বাংলার ইতিহাস লিখিয়াছেন কিন্তু ইংরাজী ভাষায়। যদি বাংলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় লিখিতেন না?'—সাধনা, মাঘ, ১২৯৯। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষণে বলেছেন—'আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই, সেকথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে?·····বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা গ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন লজ্জায়?'—শিক্ষার বাহন, ১৯১৫।

একদিনেই প্রয়োজনীয় সব বই বাংলায় লেখা হবে এমন আশা কেউ করে না। কোনোদিনও না হতে পারে। ইংরেজ ছাত্র যখন উচ্চতর বিজ্ঞান পড়ে সে জার্মান ভাষা শেখে না? ফরাসী শেখে না? সেই সকল ভাষার প্রামাণিক বই, বিশেষতঃ পত্র পত্রিকা না পড়লে গবেষণার কাজ কি কখনো চলে? আমাদের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররাও কাজ চলার মত ইংরেজী অবশ্যই শিখবে। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে জেনেও বলি, ভাষা হিসেবে ইংরেজী আমাদের শিখতে হবে। তার মারফতে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বজায় থাকবে। ইংরেজীকে তাই আমরা বলি আমাদের পশ্চিমের জানালা। সে জানালা আমরা বন্ধ করব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাতৃভাষার সব কাজ তার হাত দিয়েই চলবে।

যাই বলি না কেন, এবং যতই বলি না কেন তবু ভয় যায় না। যাঁরা দায়ে পড়ে চাপে পড়ে অথবা চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাতৃভাষার বাহকতা মানতে-বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে শিক্ষার উচ্চতর স্তরে মাতৃভাষার উপযোগিতা যে স্বীকার করতে চান না। তার প্রধান কারণ সাহসের অভাব।

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পূর্বেই এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার যাথার্থ্য আজও হ্রাস পায়নি—'বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি।·····দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশী হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ খুব গোড়ার দিকের গোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্। আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনদিনই বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে!···আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।'

(১২)

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভরসা আগের চেয়ে বেড়েছে। মাতৃভাষার পক্ষে জনমত ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে।

CENTRAL LIBRARY

তাকে বেশিদিন রোধ করা যাবে না। এতদিন কেবল শিক্ষা ও পরীক্ষায় বাহন হিসাবে বাংলা ব্যবহারের কথা চলছিল, সম্প্রতি প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাংলাভাষা প্রয়োগের কথা উঠেছে। এই প্রসঙ্গে সে কথাটাও উল্লেখ করা আবশ্যক। খ্রীঃ ১৯৬২ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেনেট সভায় এই রকম একটি প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি আসে। সে বিজ্ঞপ্তির জন্ম-মৃত্যু-সমাধির ইতিহাসে কিয়ৎপরিমাণে কৌতুকের উপকরণ আছে বলেই এখানে সেটির উল্লেখ করছি এই ভেবে যে সেটি একবার কোথাও প্রকাশিত না হলে তার কথা অজ্ঞাত থেকে যাবে।

খ্রীঃ ১৯৬২ সালের ৩রা মার্চ তারিখে সেনেট সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করবেন বলে বর্তমান লেখক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন। সেনেট সভার উক্ত অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী থেকে সমগ্র বিজ্ঞপ্তির পাঠটি উদ্ধৃত করছি—

'97. A letter dated 12. 6. 61. from Dr. Bijanbihari Bhattacharya, member of the Senate, stating that he intends to move the following at the next meeting of the Senate'—

বাংলার প্রাচীনতম ও প্রধানতম এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার হওয়া আবশ্যক বলিয়া সেনেট মনে করেন। এই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সেনেট একটি উপসমিতি গঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন।

কর্ম পরিচালনার সকল ক্ষেত্র, যথা—

(১) সেনেট, সিণ্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, স্নাতকোত্তর ও প্রাক্-স্নাতক বিভিন্ন বোর্ড ও অন্যান্য সমিতি উপসমিতি প্রভৃতির আলোচনায়, পরিচালনায়, সদস্যবর্গের বক্তৃতায়, সভাপতির ভাষণে।

(২) শিক্ষার সকল স্তরে—অধ্যয়নে, অধ্যাপনে, প্রশ্নপত্রে, পরীক্ষায়।

(৩) শিক্ষা ও নিয়োগসংক্রান্ত সকল মৌখিক পরীক্ষায়।

(৪) সকল বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধে (অন্ততঃ বিকল্প ভাষা হিসাবে)।

(৫) সমাবর্তন সভায় আচার্য ও উপাচার্যগণের ভাষণে (অন্য দেশবাসীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারে) স্নাতকদের প্রতি উপদেশে, অভিজ্ঞান পত্রে, উপাধি পত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদকে, ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞপ্তিটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্যে যে এর ভাষা ছিল বাংলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটা একটা নূতন ঘটনা অনুষ্ঠানসূচী ইংরেজী টাইপরাইটারে মুদ্রিত হয়ে থাকে। বাংলা টাইপরাইটার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্মে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই আমার বিজ্ঞপ্তিটি হাতে স্টেন্সিল কেটে সাইক্লোস্টাইল করতে হয়েছিল। হস্তলিপির অনুলিপিগুলি সহজেই নজরে পড়েছিল।

সেনেটের এই অনুষ্ঠানসূচী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হল। পত্র পত্রিকার মধ্যে কেউ কেউ বিরোধীর ভূমিকা নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রবর্তন প্রয়াসের অন্তরালে কিছু গভীর ষড়যন্ত্র আছে—এমন সংশয়ও মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষাকে সর্বাত্মক ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টার ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচারে সভাসমিতিগুলি মুখর হয়ে উঠল। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে দেশের পক্ষে বিপদ হতে পারে তা অনুমান করে কোনো কোনো পত্রিকার লেখক এবং সম্পাদকরা গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ইং ১৯৬১ সালের জুন মাসে। তারপর সেনেটের একাধিক অধিবেশন হয়। অনুষ্ঠানসূচীতে বিজ্ঞপ্তিটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ইং ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে। সূচীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সময়ের

CENTRAL LIBRARY

অভাবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি, পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছিল। তারপরেও সেনেটের কতকগুলি অধিবেশন হয়। সবকটির অনুষ্ঠানসূচীতে প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে থাকে কিন্তু প্রতিবারই আমার প্রস্তাব পৌঁছানোর আগেই সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়ে যায়। প্রত্যেক অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই প্রস্তুত হয়ে সভারোহণ করতেন। বিবাদী দলের মধ্যে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ অনেক বন্ধুও ছিলেন যাঁরা আমাকে ভূপাতিত করার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবার সভার শেষে আমরা উভয় দলই নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরেছি। শেষপর্যন্ত খুব সহজেই সমস্যার একটা সমাধান হয়ে গেল চীনের ভারত আক্রমণে। উপাচার্য তখন বিধুভূষণ মালিক। তিনি একদিন আমাকে আহ্বান করে আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেশানুরাগ ভাষাপ্রেম প্রভৃতির প্রশংসা করে এই আশাপ্রকাশ করলেন যে দেশের জরুরি অবস্থা বিবেচনা করে প্রস্তাবটি আমি প্রত্যাহার করে নেব। প্রত্যাহার না করলে অধিকতর সুফল ফলত না। সুতরাং উপাচার্য মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম।

সেনেট সভার অভ্যন্তরে আলোচনার সুযোগ না হলেও প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তিতেই অনেক ফল ফলেছিল। বাইরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ভিতরে তার প্রতিক্রিয়া চলতে লাগল ধীরে ধীরে। পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছিল সত্য কিন্তু প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষদলও নিরুত্তর রইলেন না। পূর্বপক্ষ উত্তর-পক্ষের তর্কবিতর্কে কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধেই হল। তাঁরা উভয়পক্ষের বক্তব্যের মধ্য থেকে সার নির্বাচনের সুযোগ পেলেন। জনমত এইভাবেই গড়ে ওঠে এবং এইভাবেই গড়ে উঠেছে এবং সে জনমত যে সম্প্রতি বাংলাভাষার অভিমুখেই সংসরণশীল আজ তার কিছু কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মাস হল বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স, এম. এ, এবং এম. এস-সি পরীক্ষায় বাংলা মাধ্যম প্রবর্তনের উপযোগিতাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের এটি একটি সাহসিক এবং সার্থক পদক্ষেপ। তাঁর দ্বিতীয় চাতুর্বার্ষিক কার্যকালের মধ্যে শিক্ষা, পরীক্ষা ও প্রশাসনের সকল বিভাগে এবং সকল স্তরে মাতৃভাষার সর্বাত্মক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চাশ বছরের নাট্যচর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অরূপকুমার ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত নাটক বিষয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত পঞ্চাশ বছরের অনুশীলন নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। যদিও দেখা যায় যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার জন্য স্নাতকোত্তর বিভাগে যে পাঠ্যক্রম গৃহীত হয়, তাতে নাটকের কোন গ্রন্থ বিশেষভাবে পাঠ্য ছিল না, তথাপি ১৯৪০ সনের পরিবর্তিত পাঠ্যক্রমে স্বতন্ত্র পত্রে ৭০ নম্বর নাটকের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। কিন্তু তার পূর্বেই নাটক সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা-সমিতি বলে কলকাতায় একটি সমিতি গঠিত হয়। তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি বক্তৃতামালা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ৩০০০'০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দেওয়া হয়। ১৯৩১ সন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি দু'বছর অন্তর এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বক্তৃতাগুলো প্রথমদিকে সবই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রাযন্ত্র থেকেই প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তীকালে কোন কোন বক্তৃতা ব্যবসায়ী প্রকাশক মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট নাট্যসাহিত্য অনুরাগিগণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতায় বাঙ্গালীর নাট্যপ্রতিভা নিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'বাংলা নাটক', মন্মথমোহন বসুর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ', কিরণচন্দ্র দত্তের 'গিরিশচন্দ্র', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্যসাহিত্যে অবদান,' অহীন্দ্র চৌধুরীর 'বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র,' ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' বক্তৃতাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোন কোন বক্তা গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়কেও অবলম্বন করেছেন।

গিরিশচন্দ্র বক্তৃতাবলী ব্যতীতও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার নানাদিক নিয়ে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কুমুদবন্ধু সেনের 'গিরিশচন্দ্র' (১৯৩৬), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'গিরিশচন্দ্র' (১৯৩৮), দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'গিরিশচন্দ্র' (১৯৩৯), মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'গিরিশচন্দ্র—মন ও শিল্প' (১৯৪২), অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'গিরিশনাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' (১৯৫৬) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে আলোচনায় উক্ত গ্রন্থগুলোতে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা শ্রদ্ধাপ্রকাশের প্রেরণাই অধিক প্রকাশ পেয়েছে; তথাপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যে গিরিশ-প্রতিভার আলোচনা করে তা' বহুদূর অগ্রসর করে নিয়েছিল, এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের গবেষণার ভিতর দিয়ে তার ধারা আরো বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

গিরিশচন্দ্র বক্তৃতামালার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র লালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে ১৯৬৬ সন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রীডারশিপ্ বক্তৃতার প্রবর্তন হয়। প্রতি বৎসরই এই বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হয়। বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিশিষ্ট কয়েকজন সমালোচক যেমন—ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ অজিতকুমার ঘোষ এবং বিশিষ্ট দুজন নাট্যকার ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এবং মন্মথ রায় এ যাবৎ এই বক্তৃতা দেন—তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে (এঁদের

CENTRAL LIBRARY

বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে 'সুবর্ণলেখা', পৃ. ১৬২ দ্রষ্টব্য)। তা' ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে কবি-পুত্র দিলীপকুমার রায় রচিত 'মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থখানিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু মাত্র নাটকের আলোচনাই নয়—মৌলিক নাটক রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চৌধুরী এককালীন ২০,০০০'০০ টাকা দান করেন। সেই অনুযায়ী ১৯৬৫ সন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থদাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী সুধাংশুবালা পুরস্কার নামে বাৎসরিক ২০০০'০০ হাজার টাকার এক পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। বৎসরের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে এই পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (পুরস্কার প্রাপকদের নামের তালিকা 'সুবর্ণলেখা' ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তবে এই বক্তৃতা দশ বৎসরকাল চলবে।

১৯৬২ সন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নূতন পাঠ্যক্রম গৃহীত হয়, তাতে সাধারণ একটি পত্রে ৫০ নম্বর রাখার পরও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের মত বাংলা নাট্যসাহিত্য বিষয়টিকে একটি 'বিশেষ পত্র'রূপে গ্রহণ করা হয়। তখন থেকেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিশেষ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ নাটক সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনামূলক গ্রন্থাদি এবং ছাত্রছাত্রীগণ বাংলা নাটকের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে গবেষণা করবার সুযোগ লাভ করেন।

নাট্যসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫ থেকে যোগদান করবার আগে তাঁর রচিত 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' মাত্র একটি খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিষয়ে তাঁর অধ্যাপনার সূত্রপাত হবার পর বহু নূতনতর তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উক্ত গ্রন্থখানি দু'টি সুবৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চেরও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অন্তর্নিবিষ্ট হবার ফলে তার মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। বইখানির আরও পরবর্তী সংস্করণে ১৯৭০ সন পর্যন্ত বাংলা নাটক বিষয়ক সামগ্রিক তথ্যের সমাবেশে তা' একটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের কোষগ্রন্থের (encyclopaedia) রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাসাহিত্যে এই বইখানিই এ পর্যন্ত বাংলা নাটকের বৃহত্তম ইতিহাস।

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের রচিত একখানি বাংলা নাটক বিষয়ক বইয়ের নাম 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' (১৯৬৪)। বইখানির পরিকল্পনা বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অভিনব। বইখানি একদিকে সাহিত্য ও আর একদিকে সমাজতত্ত্বের আলোচনা। বহুবিবাহ প্রথা থেকে আরম্ভ করে বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত বিবাহ প্রথার ক্রমপরিবর্তন উপলক্ষে বাংলাসাহিত্যে কেবলমাত্র বিবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সকল নাটক রচিত হয়েছে, এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে কেবলমাত্র তারই আলোচনা করা হয়েছে। তার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের বিবর্তনের ধারাটি তার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রকার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোন দিক নিয়েই কেউ আলোচনা করেন নি।

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থখানি মধুসূদনের নাটক সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। নাট্যকার রূপে মধুসূদনের আলোচনার উপর তাঁর আগে কেউ এমন গুরুত্ব দেন নি। কবিসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে এখানেই তাঁকে নাট্যকার রূপে স্বাধীনভাবে বিচার করা হয়েছে। ডাঃ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র নাট্যধারা' গ্রন্থটিতেও রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে নূতন ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

ডাঃ ভট্টাচার্য উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি নাটক সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ পর রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব নাটক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর ভূমিকায় এর নূতন যে মূল্যায়ন করেছেন, পরবর্তী বহু সমালোচকই তা' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

CENTRAL LIBRARY

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে আর যাঁরা নাট্যসমালোচনার গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ' (১ম ও ২য় খণ্ড) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ভিতর দিয়ে আমাদের রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের নূতন দিগ্‌দর্শন ঘটেছে। স্বর্গত রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থখানি তাঁর ডি. ফিলের গবেষণা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এত বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে নাটকের আলোচনা ক'রে যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 'নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা'র রচয়িতা স্বর্গত বিভাস রায় চৌধুরী ও ডাঃ অজিতকুমার ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় নাট্যতত্ত্ব নিয়ে বিভাস রায়-চৌধুরীর পূর্বে আর কেউ আলোচনা করেন নি। ডাঃ অজিত কুমার ঘোষেরও 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'এই বিষয়ক সর্বপ্রথম রচনা এবং একখানি সর্বজন পাঠ্যগ্রন্থ। তাঁর 'নাটকের কথা'তেও সংক্ষেপে নাটকের নানা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বর্গত সাধনকুমার ভট্টাচার্য নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে এবং নাট্যসাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে বহু গ্রন্থের যশস্বী লেখক। তিনি নাটক রচনার মূলসূত্র, নাট্যশিল্প এবং নাট্যতত্ত্ব নিয়েই অধিক আলোচনা করেছেন, এইবিষয়ে তাঁর অধিকার সর্বজনবিদিত ছিল। ডাঃ বৈদ্যনাথ শীল 'বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারা' 'বাংলা লঘুনাট্যের ধারা' নামে দু'খানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ডাঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক' সম্পর্কে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম রসগ্রাহী আলোচনা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আর যাঁরা নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'অভিনয় প্রযোজনা পরিচালনা', 'মহলা ও মঞ্চ,' শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' ডাঃ ক্ষেত্র গুপ্তের 'নাট্যকার মধুসূদন', অরুণকুমার মিত্রের 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য', অশ্রুকুমার সিকদারের 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপকদিগের অধীনে নাটকবিষয়ে গবেষণা ক'রে বহু ছাত্রছাত্রী এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি (ডি. ফিল বর্তমানে পি. এইচ. ডি) লাভ করেছে। তাদের মধ্যে, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে বৈদ্যনাথ শীল 'বাংলাসাহিত্যে নাটকের ধারা' প্রমথনাথ বিশীর অধীনে প্রণয়কুমার কুণ্ডু 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য', শান্তিকুমার দাশগুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য', ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অধীনে সুনীলবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্রের নাটক ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ,' প্রভাতকুমার গোস্বামী 'বাংলা নাটকে গান', জয়ন্তকুমার গোস্বামী 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে সমাজচিত্র', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'বাংলা নাটকে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের প্রভাব', ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য 'বাংলা নাটকে স্বদেশচিন্তা' ইত্যাদি বিষয়ে সফল গবেষণা করেছেন। তা ছাড়াও নাটকের আরও বহু বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট এখনও প্রায় ত্রিশজন ছাত্রছাত্রী গবেষণা করে চলেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নাটক বিষয়ে গবেষণার দুটি সুস্পষ্ট যুগ-বিভাগ অনুভব করা যায়। প্রথমযুগে একমাত্র গিরিশচন্দ্রই গবেষণা ও আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সমালোচনা-সুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় নি। অধিকাংশ আলোচনাই ছিল নাট্যকারের প্রশস্তি-বাচন মাত্র। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশিত হবার পর এই বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচারের সূচনা দেখা দেয়। তাঁর মধ্যেই গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল এঁদের সম্পর্কে নূতন মূল্যায়ন হয়। পূর্ববর্তী

CENTRAL LIBRARY

যুগে যাঁরা নমস্ত নাট্যকার ছিলেন, ক্রমে তাঁদের ব্যক্তিত্ব দূরবর্তী হয়ে যাবার ফলে তাঁদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনার সুযোগও দেখা দেয়। তখন বিস্তৃততর পটভূমিকার উপর তার সূচনা হয়। পূর্বে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার পদ্ধতি আমাদের নাট্যসাহিত্যের বিচারে আরোপ করা হ'তো না, কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতিকেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত বলে মনে করেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটু ত্রুটি থেকে যায়; কারণ, পাশ্চাত্ত্য জীবন-বোধ এবং ভারতীয় জীবন-বোধ এক নয়, ভারতীয় জীবন-বোধের আলোকেই ভারতীয় নাটকের বিচার করা সঙ্গত, কিন্তু এক্ষেত্রে তা' হবার কোন উপায় নেই।

কেবলমাত্র নাটকের আলোচনা এবং গবেষণায় নয়, মৌলিক নাটক রচনায়ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী বাংলাসাহিত্যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রহসনের রচয়িতা, স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'দিনান্তের আগুন' ও 'হাবা হলধর' নামক দু'খানি নাটক রচনা করেন। পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দু'খানি নাটক 'রামমোহন' ও 'আগন্তুক' এবং দু'খানি প্রহসন 'ভাড়াটে চাই' ও 'বারভূতে' বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক কালে উদ্ভট নাটকরূপে যে একশ্রেণীর নাটক রচিত হচ্ছে, তার রচনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁর রচিত নাটক কয়খানির নাম 'মৃত্যু-সংবাদ' 'রাজরক্ত', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'। সাম্প্রতিককালে কাব্যনাট্য রচনার যে যুগ এসেছে তা'তেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণ ধর বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর রচিত একখানি নাটকের নাম 'একরাত্রির জন্ম'। তা' ছাড়াও বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নিতাই গড়গড়ির বউ', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এই পৃথিবী', বিষ্ণু বসুর 'প্রৌঢ় প্রহর' ইত্যাদি নাট্যগ্রন্থও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক নাটক রচনায় আর একজন প্রাক্তন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি বাণিক রায় এই ছদ্মনামে কয়েকখানি নাটক রচনা করেছেন।

১৯৭২ সনে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিক উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলা নাটক ও অভিনয়ের নানাদিক নিয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন। সর্বশ্রী মন্মথ রায়, শম্ভু মিত্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সলিল সেন এবং ডাঃ অজিতকুমার ঘোষ এঁরা বক্তৃতা দেন। প্রতিটি বক্তৃতাতেই বিভাগীয় প্রধান ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডাঃ অজিতকুমার ঘোষের সম্পাদনায় 'শতবর্ষে নাট্যশালা' বিষয়ক সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন বাংলা পুঁথি

প্রফুল্লচন্দ্র পাল

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতির পরিচয় প্রাচীন বাংলা-পুঁথিতে বর্তমান রহিয়াছে। দুঃখের কথা হউক আর সুখের কথা হউক এই সেইদিন মাত্র আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ নজীর বাংলা-পুঁথির অনুসন্ধান, সকলন ও রক্ষার ব্যবস্থার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিছুদিন পূর্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নের জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছিল তাহার সব কিছু ছিল প্রকাশিত মুদ্রিত গ্রন্থ। রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গসাহিত্যের ইংরাজী ইতিহাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক ইংরাজী পুস্তিকা ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারি যে এই সকল সাহিত্যের ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের পরিচায়ক নহে, উক্ত গ্রন্থগুলিতে বাংলার মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত অপ্রকাশিত গ্রন্থ যাহা পুঁথির আকারে রহিয়াছে তাহার ব্যবহারের সুযোগের অভাব রহিয়াছে। পুঁথির আকারেই আমরা প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের বিভিন্ন অনুবাদ, বিভিন্ন গ্রন্থকারের চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, বিভিন্ন পদকর্তার পদাবলী, বিভিন্ন কবির রচিত চৈতন্যজীবনী, বৈষ্ণব-পরিকরদের ইতিহাস, সহজিয়া সম্প্রদায়ের পদাবলী ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুঁথি, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজাপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কাহিনী, পীর ও সন্তদের অলৌকিক কার্য-কলাপ ও তাঁহাদের পূজাপ্রতিষ্ঠার কথা, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, ছন্দ, বৈদ্যগ্রন্থ, মন্ত্রের ছড়া, পাঁচালী, দলিল দস্তাবেজ—ইত্যাদি বহু উদ্ধার করিয়াছি। বাঙ্গালীর এই কৃষ্টির পরিচয় কালক্রমে চর্চার ও পঠনপাঠনের অভাবে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সে যুগে বাঙ্গালী পরিবারের ভিতর ২।৪ খানি পুঁথি থাকিতই, উল্লেখযোগ্য পুঁথি নকল করিয়া অন্য লোক লইয়া যাইত, পুঁথিগুলির পুষ্পিকায় পুঁথি নকলের পারিশ্রমিকের ফিরিস্তি, সাল ও দিনক্ষণেরও উল্লেখ থাকিত। কালক্রমে ইংরাজী বিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি পাওয়ায় পুঁথিগুলি অনাদরণীয় হইয়া উঠিতে থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা জন্মায় প্রাচীন পুঁথিগুলি কেবল খণ্ডিত রামায়ণ, মহাভারত কিংবা পাঁচালী ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুখের কথা, এইসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে পুঁথিতে লিপিবদ্ধ কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের স্বকীয় প্রচেষ্টায় কিছু কিছু গ্রন্থ পুঁথি হইতে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

এই সময়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কুমিল্লায় কর্মস্থলে থাকিয়া কিছু কিছু পুঁথি নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেন। উল্লেখযোগ্য পুঁথি দেখিলে তিনি উহার সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যসহ সাহিত্য-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি পুঁথির সংগ্রহকার্যে দেখিলেন যে ইহা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভবপর নহে, কোনও সমিতি বা ধনী ব্যক্তি যদি এই কার্যে অগ্রসর হইয়া আসেন তবে এই ব্যাপক পুঁথি-সংগ্রহের কার্য কিছুটা সফল হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির শরণাপন্ন হইলেন, এই সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সোসাইটির অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে রাজী হইয়া তিনি সোসাইটির কর্মী পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট প্রেরণ করেন। ডঃ সেন ও

CENTRAL LIBRARY

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের সহায়তায় প্রায় ৪০০র অধিক পুঁথি সংগৃহীত হয় ও তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়।

এই পর্বের পর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পুঁথি সংগ্রহ-ব্যাপারে নিজে আর অংশগ্রহণ না করিয়া তাঁহার বাটীর ভৃত্য রামকুমার দত্তকে পুঁথি সংগ্রহ কার্যে অভিজ্ঞ করিয়া তোলেন। ভৃত্যটির বাড়ী বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র নামক গ্রামে। ডঃ দীনেশচন্দ্র তাহাকে তাহার নিবাস পাত্রসায়র হইতে সংগ্রহ কার্য করিতে বলেন। রামকুমার আপন দেশ হইতে বারকয়েক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। ডঃ সেন রামকুমারকে পুঁথি সংগ্রহকার্যে বিশেষ পারদর্শী বিবেচনা করিয়া কলিকাতায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুকে তাঁহার বিশ্বকোষ গ্রন্থাবলীর উপকরণের জন্য পুঁথি-প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ প্রেরণ করেন। পত্রে ইহাও তিনি জানাইলেন যে পুঁথিসংগ্রহ কার্যে প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি তাঁহার ভৃত্য রামকুমারের সাহায্য লইতে পারেন। নগেন্দ্রনাথ ডঃ দীনেশচন্দ্রের কথায় তাঁহার পুঁথিসংগ্রহের প্রয়োজন আছে জানাইলে রামকুমার তখন ২০০০র অধিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের জন্য নগেন্দ্রনাথের ও এসিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত পুঁথিগুলি সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইলেন। রামকুমার দত্তের কার্যে সফলতা দেখিয়া ডঃ সেন মহাশয় তাহাকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পুঁথিসন্ধান ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য প্রেরণ করেন, এই ব্যাপারেও রামকুমার কৃতকার্যতা দেখাইয়া তাহার কর্মকর্তাদের সুখী করেন। তদানীন্তন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয়ের অনুরোধে ডঃ সেন এই রামকুমারকে পরিষদের পুঁথি সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ-শালায় বাঁকুড়া, পাত্রসায়র হইতে আনীত পুঁথি গুলি সবই রামকুমারের সংগৃহীত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। স্নাতক পরীক্ষায় বাংলা আর ঐচ্ছিক বিষয় ছিল না, আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। অচিরে স্নাতকোত্তর বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হইলে উপযুক্ত গ্রন্থাদির প্রয়োজন হইবে। বাংলা-পুঁথির বিষয়ে বাঙালী জনসাধারণের কেন শিক্ষিত জনবৃন্দের ধারণা অস্পষ্ট। বাংলা পুঁথির ভিতর হইতে হয়ত অনেক অজানা কবির ও কাব্যের পরিচয়, শুধু কাব্য কেন, হয়ত বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এমন কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে, যাহা হয়ত কোথাও পাওয়া সম্ভবপর নহে—এই সকল বিষয়ে স্যর আশুতোষ একসময় বিশেষ চিন্তান্বিত ছিলেন। এমন সময়ে (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার নিজস্ব পুঁথি-সংগ্রহ বাংলা-বিভাগের জন্য ক্রয় করিবার অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। স্যর আশুতোষ অবিলম্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩০০০'০০ টাকার বিনিময়ে নগেন্দ্রনাথের সমগ্র পুঁথি-সংগ্রহ ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ডঃ সেনের মধ্যস্থতায় এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিবিভাগের সূত্রপাত হইল নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত এই পুঁথিগুলির দ্বারা। পুঁথি সংগ্রহ-কার্যে ইহাই হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অন্যতম অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় স্যর আশুতোষের কর্ণগোচর করান যে, জনৈক মেদিনীপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলি হস্তান্তরিত করিতে উৎসুক আছেন। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্মতি হইলেই হয়। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের এইরূপ সদিচ্ছায় স্যর আশুতোষ বিশেষ সন্তোষ ও

CENTRAL LIBRARY

আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন এবং অবিলম্বে তাঁহার পুঁথিগুলি গ্রহণের জন্য আগ্রহ করিয়া পত্র লেখেন। যথাসময়ে সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুঁথিগুলি বাংলা-পুঁথিশালার অন্তর্ভুক্ত হয়। সনৎবাবুর পুঁথিগুলিই বাংলা-পুঁথিশালার সংগ্রহকার্যে দ্বিতীয় বড় পদক্ষেপ। এই সময়ে পুঁথিগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কাঠের আলমারির ব্যবস্থা করিলেন।

রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থ—দুই ভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করেন, তাহাতে যে সকল পুঁথির পাঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা সবই যে বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথির সংগ্রহশালা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এমত নহে, কলিকাতার বিভিন্ন পুঁথিশালা হইতেও পুঁথির পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন পুঁথিশালার প্রবর্তন হইল, লিপিবিদ্যায় পারদর্শী বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়কে ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইল। তিনিই সর্বপ্রথম সুদক্ষ কর্মচারীর সহায়তায় পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করিতে থাকেন। ইহার পর রামকুমার দত্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অবিনাশও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি-শালার জন্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য বেতনের কর্মচারী হরিদাস পালিত এই পুঁথিশালায় তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত পুঁথিভাণ্ডার দান করেন। ইহার পর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় কাশীমবাজারের বর্তমান রাজকুমার শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সকল বাংলা পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বাংলাবিভাগের একজন ছাত্র সুনীতকুমার শেঠ তাঁহার নিজস্ব সংগৃহীত পুঁথি এই পুঁথিশালায় দান করেন।

বর্তমান আমাদের সংগ্রহীত পুঁথি ৭০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। অনেকগুলি পুঁথি তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে আমাদের পুঁথি রাখিবার স্থানের অভাব ঘটিয়াছে, আশা করা যায় আমাদের এ অভাব শীঘ্রই মিটাইবার ব্যবস্থা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথিশালার আর একটি গৌরবময় অধ্যায় সূচনা করিলেন বাংলা পুঁথি বিভাগের একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া। শুধু তাই নয় পুঁথি নকলনবিশের জন্য প্রতি বছর বাংলা বিভাগ হইতে ৬টী ছাত্রকে ত্রিশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থার সূত্রপাত করা হইল, আজিও তাহা চলিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বর্ণনাত্মক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে—(১ম) রামায়ণ, (২য়) পদাবলী ও চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থ ও (৩য়) মহাভারত। প্রথমটীর সম্পাদক ছিলেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ। দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ, ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই তিন খণ্ড তালিকা খ্রীঃ ১৯২৬—খ্রীঃ ১৯৩০এর মধ্যে প্রকাশিত হয়।

দুইটী সাধারণ তালিকাও প্রকাশিত হয়। একটি মণীন্দ্রমোহন বসু, এম.এ.-র সম্পাদনায়—পুঁথির সংখ্যা ১ হইতে ২১১১, প্রকাশকাল ১৯৩০ সাল। অপরটী মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ. ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পালের যুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে ২১১২ হইতে ৬৯২৭ সংখ্যক পর্যন্ত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

রামায়ণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত বাংলা পুঁথির মধ্যে রামায়ণের পুঁথি সর্বাধিক এবং রামায়ণের পুঁথি-গুলির রচয়িতা মধ্যে কৃত্তিবাসের পুঁথি অন্যান্য রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। সারা বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত

CENTRAL LIBRARY

কোনও একটী বিষয় লইয়া যদি পুঁথি মিলাইতে যাওয়া যায় তবে দেখা যাইবে কোনটির সহিত কোনটির পুঁথির মিল নাই। পুঁথির পাঠের এইরূপ বিভিন্নতার জন্য কৃত্তিবাসের কোনও বিশুদ্ধ সংস্করণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কৃত্তিবাসের নামে যে অসংখ্য রামায়ণের পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ সম্পাদন করা অসম্ভব। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা এই পুঁথিশালার ১৩ নম্বরের পুঁথি ও ৪ নম্বর পুঁথির অংশবিশেষ লইয়া মিলাইয়া দেখিতে পারি—

১৩নং পুঁথির প্রারম্ভে পাওয়া যায় নারায়ণের বর্ণনা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি তাহার সেবায় নিযুক্ত, দেবগণের উপস্থিতিতে জগতে রামনামের প্রচারের অভাব দেখিয়া নারদ চ্যবন পুত্রের নাম করিয়া ব্রহ্মাকে আশ্বাস দিলেন যে অচিরে রামনাম জগতে প্রচার হইবে। ৪নং পুঁথির প্রারম্ভের দিকে দেখা যায় যে, ব্রহ্মা সরস্বতীকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া রামভক্তের কণ্ঠে থাকিয়া রাম নাম প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। ব্রহ্মার অনুরোধে সরস্বতী বাল্মীকি মুনিকে কবিত্বলাভের বর দিতেছেন। এই অবস্থায় সমগ্র কৃত্তিবাসের পুঁথিগুলিকে আমরা একভাবে দেখিতে পাইতেছি না, বিষয়টি আদিকাণ্ড কিন্তু বিভিন্ন পুঁথিতে ভাব, ভাষা সবই পৃথক দেখা যাইতেছে।

১৩০৭ সালে ও ১৩১০ সালে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রকাশের পর তিনি আর সংস্করণ কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্বপ্রথম বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ১৩০৫ সালে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী প্রকাশ করেন। এই আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখের একটি ইঙ্গিত আছে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তিথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

কৃত্তিবাসের এই জন্মগ্রহণ সময়ের ইঙ্গিতটুকু লইয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার বিরাম নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ কৃত্তিবাসের এই জন্ম-তারিখের ইঙ্গিত লইয়া বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ ও জন্মক্ষণের বিভিন্ন সালের কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য বস্তুত ঐ আত্মকাহিনী আদৌ প্রকৃত কি না। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি পুঁথি পাইতেছি এবং এই পুঁথিগুলিই হয়ত এই বিষয়ে কিছু প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে পারে। সকল তর্কের অবসান হইবে এমন কথা বলা যায় না, তবে আরও প্রশ্ন উঠিতে পারে।

একটি রামায়ণের পুঁথিতে ত্রিশঙ্কুর পুত্র কল্মাষদের জন্মের প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পাওয়া যাইতেছে—

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাসে। পুত্র প্রসবিল কন্যা রাত্রি অবশেষে॥

অন্য পুঁথিতে দশরথের জন্ম তারিখের এইরূপ নিম্নলিখিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ মাসে। প্রসবিল পুত্র রাণী জন্ম বিষ্ণু অংশে॥

ভরতের জন্মক্ষণ কবি এইরূপ নিম্নলিখিত ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

আদিত্যবার পৌর্ণমাসি প্রথম মাসে। প্রসবিল রাজরাণী রাত্রি অবশেষে॥

উপরি উল্লিখিত জন্ম তারিখগুলির সহিত কৃত্তিবাসের জন্মতারিখের মিল সুস্পষ্ট। আমাদের বক্তব্য, শুভ দিন বা শুভ মাসগুলি রামায়ণ-রচয়িতা রঘুবংশের বিশিষ্ট রাজকুমারদের জন্মদিনের সহিত জড়াইয়া দিয়াছেন, আবার এই সকল জন্ম-তারিখের সহিত কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখের মিল সুস্পষ্ট। ইহার কী হেতু থাকিতে পারে?

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় (৬৫।২৫৩-২৬২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে প্রদত্ত জন্ম সময়টি বিশ্বাসযোগ্য নহে, যেহেতু রঘুবংশের বিভিন্ন রাজকুমারদের জন্ম সময় ঐ একই থাকায় ইহার গূঢ় সঙ্কেত অন্য কিছু আছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সঙ্কেতটি এইরূপ হইতে

CENTRAL LIBRARY

পারে যে, উহা কবির একান্ত পছন্দসই আদর্শ কোন তিথি, অথবা উহাই কবির প্রকৃত জন্ম সময় যাহা বারংবার তিনি অন্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিতেছেন। বিদগ্ধ জন কৃত্তিবাসের জন্মদিন লইয়া যেরূপ বাদানুবাদ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত পুঁথিগুলির উপরিউক্ত অংশবিশেষ পাঠ করিলে তাঁহাদের মতের বিভিন্নতা, আশা করি, দূর হইবে।

(খ) দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের রচিত 'রামলীলা'র একাধিক খণ্ডিত পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। ইনি কবি কৃত্তিবাসের খুল্লতাত ভ্রাতা লক্ষ্মীধরের পৌত্র এবং ইঁহার পিতার নাম ছিল সুষেণ।

(গ) কবিচন্দ্রের রচিত রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ডে'র পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আছে। ইঁহার গ্রন্থেরও নাম ছিল 'রামলীলা'।

(ঘ) গঙ্গাদাস সেন রচিত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের খণ্ডিত পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে রহিয়াছে। ইনি বোধ হয় মহাভারত রচনাও করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার ভণিতা মধ্যে পাওয়া যায়—

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব। ব্যাসমুনি বাকৌ জান অষ্টাদশ পর্ব॥

(ঙ) দ্বিজ শঙ্কর ও শঙ্করদাস ভণিতাযুক্ত রামায়ণের অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাকাণ্ডের খণ্ডিত পুঁথি আমরা পাইয়াছি। খুব সম্ভব তাঁহার উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিজয়রাম ও পিতামহের নাম ছিল গোবিন্দ। কিন্তু তাঁহার ভণিতা মধ্যে আরেকটি নাম পাওয়া যাইতেছে—ভবানীশঙ্কর। হয় ইহা তাঁহার আরেকটি নাম, নয়ত অন্য কোন ব্যক্তির নাম যিনি কবির সহযোগী ছিলেন।

(চ) লক্ষ্মণ কবির 'রামের যুদ্ধ' পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার সমগ্র রামায়ণের পুঁথিও পাওয়া যায়।

(ছ) দ্বিজ ভবানীনাথের 'লক্ষ্মণের দিগ্বিজয়' পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। কবি ইঁহার ভণিতা মধ্যে সামান্যভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

জএছন্দ নরপতি রসিক সুজন অতি সভাসদ ভবানি ব্রাহ্মণ

(জ) কবি জগদ্রাম বা জগৎরাম রায় ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদের তীরবর্তী ভলুই গ্রামের অধিবাসী। ইঁহারা পিতা-পুত্রে মিলিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। পুত্রের নাম ছিল রামপ্রসাদ রায়। এখন হইতে দুইশত বৎসরের কিছু অধিককাল পূর্বে ইঁহাদের রামায়ণ অর্থাৎ 'জগদ্রামী রামায়ণ' রচিত হইয়াছিল।

জগদ্রামী রামায়ণের আরেক নাম 'অদ্ভুত রামায়ণ'। কারণ, এই রামায়ণে আটটি কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকির রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, কিন্তু জগদ্রামী রামায়ণ অষ্টকাণ্ড—অর্থাৎ পুষ্কর কাণ্ড নামে অতিরিক্ত একটি কাণ্ড (লঙ্কাকাণ্ডের ঠিক পরেই) ইহাতে আছে। জগৎরামের পুত্র রামপ্রসাদ লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ড পদ্মপুরাণের অনুসরণে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছিলেন।

(ঝ) মেদিনীপুর জেলার সাহাপুর পরগণার অন্তর্গত কোলকুড্যা গ্রামনিবাসী কমললোচন দত্ত একটি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের পুঁথিশালায় কবির স্বহস্তে লেখা অরণ্য, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ড-সমন্বিত (খণ্ডিত) রামায়ণের পুঁথি আছে।

(ঞ) কবি শিবরামের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নামক একটি পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(ট) দ্বিজ পঞ্চানন রচিত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(ঠ) খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের দ্বিজ দয়ারামের 'তরণীসেনবধ' পালার একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(ড) দ্বিজ মাণিকচন্দ্রের 'লঙ্কাকাণ্ড' পালা, (ঢ) রামরুদ্রের 'সুন্দরাকাণ্ড' পালা, (ণ) রঘুনন্দনের 'গয়া পালা',

CENTRAL LIBRARY

(ত) ভিথম শুক্লদাস ওরফে কৃপারাম দাসের অরণ্যকাণ্ডের পুঁথি এবং (থ) মতিরাম রচিত একটি 'কুম্ভকর্ণবধ' পালার পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে।

(দ) হরিচরণ রচিত 'রামায়ণ'-এর মধ্যে কতকগুলি গানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি মধুকণ্ঠের ভণিতাযুক্ত। এছাড়া কবি 'শুক-পরীক্ষিত সংবাদের' শেষ দিকে আত্মপরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

দ্বিজ মিশ্রী রামকান্ত কামদেব মিশ্রী তাত রমাকান্ত সুত দাশরথী।
মুনিরাম তার সুত কৃষ্ণ ভজে অবিরত সদাকাল নারায়ণ মতি॥

(ধ) কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। ইঁহার রচিত একখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(ন) দ্বিজ ভবানীনাথের 'লক্ষ্মণের দিগ্বিজয়' পালার একটি পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে।

(প) রঘুনন্দন গোস্বামী ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৫ বৎসর বয়সে 'রামরসায়ন' রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল কিশোরীমোহন গোস্বামী। রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম-রসায়নের' পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে।

(ফ) অদ্ভুতাচার্য—ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্দ আচার্য। ইঁহার রামায়ণের নাম 'অদ্ভুত রামায়ণ'। ইঁহার রচনাকাল ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ। কবির বাসস্থান ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত বড়বাড়ী গ্রাম। ইঁহার উপাধি অদ্ভুতাচার্য ছিল কিংবা ইঁহার রামায়ণে বিস্তর অদ্ভুত খবর থাকায় ইঁহার রামায়ণের এই নাম হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর।

(ব) থাকিরাম বিদ্যাভূষণের একখানি রামায়ণ পাওয়া যায়। ইহা অষ্টাদশ শতকের পূর্বের রচনা নহে।

(ভ) দ্বিজরামের রামায়ণের পুঁথির খণ্ডিত অংশ আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। ইঁহার ভাষাও প্রায় আধুনিক অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের হইতে পারে।

(ম) রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহার পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নদীয়া জেলার মেটেরিগ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একখানি রামায়ণ রচনা করেন। ইঁহার রামায়ণের একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে।

কৃত্তিবাস ওঝা গায়েন ছিলেন কিনা, অর্থাৎ নিজের লেখা রামায়ণ তিনি গান করিয়া বেড়াইতেন কিনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় না বটে, কিন্তু ঐতিহ্য অনুসারে তিনি প্রথম বাংলা রামায়ণ রচয়িতা। তাঁহার রচিত শ্রীরামমঙ্গল পাঁচালী কাণ্ড ও পালায় বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন স্থানে গাহিয়া কৃত্তিবাসের অল্পকাল পরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন দ্বিজ মধুকণ্ঠ। গাওয়ার সুবিধার জন্যই সম্ভবতঃ দ্বিজ মধুকণ্ঠ সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের রচনাকে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত করেন। গায়েনরা যে যে কাণ্ড বা যে যে পালা গাহিতেন তাহা তাঁহারা লিখিয়া রাখিতেন এবং মুখস্থ করিতেন। দ্বিজ মধুকণ্ঠের নামাঙ্কিত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষার পালার প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি আমরা পাইয়াছি। দ্বিজ মধুকণ্ঠের মত অথচ তাঁহার পরবর্তীকালের বহু রামায়ণ গায়কের পালা-বিশেষের পুঁথি আমাদের হাতে আসিয়াছে। এইসব গায়ক খ্রীষ্টীয় ১৭শ-১৮শ শতকে জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে (২) নিধিরাম, (৩) রামশঙ্কর, (৪) প্রসাদ দাস, (৫) কৃষ্ণমোহন, (৬) রামদাস, (৭) ভক্তদাস, (৮) অনন্ত আচার্য, (৯) বাণীকণ্ঠ, (১০) সম্পদ রায়। এই সব গায়েনের নামে প্রচলিত খণ্ডিত পালা বা কাণ্ড-এর পুঁথি ছাড়াও আমরা ফকিররাম বিদ্যাভূষণের (ক) 'অঙ্গদ রায়বার,' (খ) কাশীরামের 'কালনেমির রায়বার,' (গ) দ্বিজ তুলসীর 'অঙ্গদ

CENTRAL LIBRARY

রায়বার,' (ঘ) কাশীনাথের 'কালনেমির রায়বার,' (ঙ) গোশাল শর্মার 'গোট্টা অঙ্গদ রায়বার,' 'বিভীষণের রায়বার,' 'লক্ষ্মণের রায়বার' ইত্যাদির পুঁথি পাইয়াছি।

মহাভারত

বাংলা মহাভারতের পুঁথি আমরা কাশীরাম দাস ছাড়া অন্য অনেক লেখকের পাইয়াছি। আবার এই সব লেখকের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কবি সঞ্জয়, শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতির লেখা মহাভারতের সম্পূর্ণ পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। মোট যে সব লেখকের লেখা ও সম্পূর্ণ মহাভারতের পুঁথি এবং মহাভারতের পর্ববিশেষের বা পালাবিশেষের পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে তাঁহাদের নামের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, (২) কবীন্দ্র সঞ্জয়, (৩) শ্রীকর নন্দী বা শ্রীকরণ নন্দী, (৪) নিত্যানন্দ ঘোষ, (৫) কাশীরাম দাস, (৬) দ্বিজ অভিরাম, (৭) দৈবকীনন্দন দাস, (৮) সারলা দাস, (৯) রামচন্দ্র খান, (১০) কৃষ্ণানন্দ বসু, (১১) দ্বিজ কৃষ্ণরাম, (১২) রাজেন্দ্র দাস, (১৩) গঙ্গাদাস সেন, (১৪) শঙ্কর কবিচন্দ্র ও (১৫) জয়ন্তি দেব।

(১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের মতে এই সব লেখকের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস সবচেয়ে প্রাচীন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের সাধারণ্যে প্রচলিত নাম 'পরাগলী মহাভারত'। ইনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এবং হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নির্দেশ ও আদেশ অনুযায়ী এই মহাভারত লিখিয়াছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে ইহার আসল নাম ছিল মুনিম খাঁ এবং ইনি রাস্তি খানের পুত্র। কিন্তু ইহার 'পরাগল' নামের উদ্ভব হইল কিরূপে ইহাই প্রশ্ন। যাই হোক কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার গ্রন্থখানি পৃষ্ঠপোষক মুনিম খাঁ বা পরাগল খাঁর নামে চালাইয়া আনুগত্য ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

(২) মুনিম খাঁ ওরফে ছুটি খানের সভাকবি শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দী জৈমিনী ভারতের বিষয়বস্তু লইয়া যে মহাভারত লেখেন তাহার নাম হয় 'বিজয় পাণ্ডব কথা' অথবা 'ছুটি খানের মহাভারত'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ছুটিখানের আসল নাম ছিল গাজুর খান। শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারতের ভাষা প্রাচীনতায় প্রায় পরাগলী মহাভারতের সমসাময়িক। বোধহয় এই কারণেই ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুমান করিয়াছিলেন যে শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দী ও পরমেশ্বর একই ব্যক্তি। তাঁহার অনুমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি দেখান যে দুইজনের কাব্যেই পরাগল ও তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে একই রকম প্রশস্তি আছে এবং দুইজনেই পিতা পুত্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

(৩) কবীন্দ্র সঞ্জয় অধিকাংশ সমালোচক ও ঐতিহাসিক-এর মতে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় (অর্থাৎ বাংলায়) প্রথম মহাভারত রচনা করেন। তাঁহার মহাভারতকে নিছক অনুবাদ সাহিত্য বলিতে পারি এবং ইহাতে বেদব্যাস ও জৈমিনীর ভাবানুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারত ও জৈমিনীয় সংহিতায় প্রদত্ত মূল ও সমগ্র আখ্যায়িকা ইহার মধ্যে বজায় আছে।

শ্রীহট্টস্থিত লাউড়ের এক ব্রাহ্মণ বংশে সঞ্জয়ের জন্ম হয়। প্রভু অদ্বৈত আচার্য ইহার উত্তরপুরুষ। আমাদের পুঁথিশালার সংগৃহীত সঞ্জয়ের মহাভারতের একাধিক পুঁথিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) আদ্যন্ত সঞ্জয়ের রচনা, (২) বিভিন্ন কবির রচিত মহাভারতের সঙ্কলন ও সম্পাদন, (৩) দুই বা এক পর্বের পুঁথি, (৪) দুইটি বা একটি উপাখ্যানযুক্ত পুঁথি, (৫) জৈমিনী ভারত বা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব, (৬) দণ্ডীপর্ব।

সঞ্জয়ী মহাভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ এম. এ., পি-এইচ. ডি. কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

(৪) কবীন্দ্র সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতির পর নিত্যানন্দ ঘোষের কথা আসে। নিত্যানন্দ, সর্বসম্মতভাবে কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী। পুঁথিবিশেষে নিত্যানন্দ ঘোষ ভণিতা মধ্যে আপনাকে 'নিত্যানন্দ দাস'ও বলিয়াছেন। ইঁহারও একাধিক মহাভারতের পুঁথির মধ্যে আদ্যন্ত মহাভারত, পর্ববিশেষ ও আখ্যানিকাবিশেষ পাওয়া গিয়াছে। পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গলে' পাই—

অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।

ইহার দ্বারা নিত্যানন্দের পূর্বসূরিত্ব প্রমাণিত হয়।

নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীরাম দাসের আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত থাকায় স্বয়ং কাশীরাম দাসও আপনার মহাভারতে নিত্যানন্দের রচনার অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। যেমন—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী। শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন। নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারথ কথন॥

ইহার সহিত তুলনা করুন—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী। কাহার সকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শুনহ ভারথ কথা হয়্যা একমন। কাশীরাম দাস কহে ব্যাসের বচন॥

(৫) কাশীরাম দাস সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায় তাঁহার প্রদত্ত নিজস্ব বাসস্থান ও বংশ-পরিচায়ক ভণিতার মধ্যে—

ইন্দ্রাণি নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে জথা দেবি ভাগীরথি॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম প্রিয়শঙ্কর নামে। প্রিয়শঙ্কর দাস পুত্র সুধাশঙ্কর নামে॥
তস্য পুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণ দাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥

আবার প্রিয়শঙ্কর দাসের (দেবের) ঊর্ধ্বতন পুরুষদের নাম গদাধর দাসের (দেবের) 'জগৎমঙ্গল' গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারত সমগ্রভাবে কাশীরাম দাসের রচনা নহে, কারণ—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। রচি কাশীরাম দাস গেলা স্বর্গপুর॥—মুদ্রিত পুস্তকে এই উক্তি পাওয়া যায় কিন্তু অনেকে মনে করেন এই উক্তি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণতর নহে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য একটি পুঁথিতে কাশীরামের মহাভারত রচনা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রকার সংবাদ পাওয়া যায়—

কায়স্থ কুলেতে ধন্য ছিল কাশীদাস। চারিপর্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা বিরাটাদি সৃজিত পাঁচালি। ইহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্বে বন পর্ব আরম্ভিয়াছিল পুঁথি। কালবশে মৃত্যু তার হৈল উপনীত॥
অগণিত আখ্যান করি হৈল কৃষ্ণ প্রাপ্তি। বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্তি॥

আরও একটি পুঁথিতে কাশীরাম দাসের বন পর্ব রচনায় অসমাপ্ত অবস্থার সঙ্কেত পাওয়া যায়। যেমন—

পূর্বে তিহো আরম্ভ করিলা এই পুঁথি। কালবশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি।
অগণ্য উপাখ্যান করি হৈল কালপ্রাপ্ত। বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত॥

কাশীরাম দাস যে দেব উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন সে সংবাদ পাই আমরা গদাধর দাসের 'জগৎমঙ্গল' গ্রন্থে।

CENTRAL LIBRARY

যাহা হউক কাশীরাম দাসের অসমাপ্ত মহাভারত সমাপ্ত করেন—'শেখর তনয় জিত' বা জিত ঘটক, শিবরাম ঘোষ, অভিরাম মুখুটি ও দ্বৈপায়ন দাস। 'দ্বৈপায়ন দাস কহে কাশীর নন্দন' ভণিতা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে দ্বৈপায়ন দাস (দেব) কাশীরাম দাস (দেব)-এরই পুত্র ছিলেন। আমরা এই দ্বৈপায়ন দাসের লেখা 'আশ্চর্য পর্ব' নামে মহাভারতের এক নূতন পর্বের পুঁথি পাইয়াছি যাহার বর্ণনীয় বিষয় বেদব্যাসের মহাভারতের বহির্ভূত এক নাগরাজ্যের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর নাগগণ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবকে ও দ্রৌপদীকে বন্দী করিয়া নাগরাজ্যে লইয়া যান—এবং ভগবান বাসুদেবের করুণায় তাঁহারা সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা ছাড়া 'জান পর্ব' নামক উপরস্তু এক পর্বের (প্রকৃতপক্ষে মুষল পর্ব) ও দণ্ডীপর্বের একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। 'জান পর্ব' কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত। কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত 'উনশান্তি পর্ব' নামে আরেক পর্বের পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। 'উনশান্তি পর্ব' প্রকৃতপক্ষে শান্তিপর্বের পূর্বভাগ বা ভূমিকাস্থানীয় এবং 'পয়াণপর্ব' প্রকৃতপক্ষে স্বর্গারোহণ পর্ব। মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্বকে কেন্দ্র করিয়া 'জৈমিনি ভারত'। জৈমিনি ভারতের একাধিক খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বাধিক পাওয়া গিয়াছে বিরাট পর্বের পুঁথি। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে প্রাচীনকালে আত্মশ্রাদ্ধ ও সভারোহণ ব্যাপারে বিশেষভাবে আত্মার সদ্গতি বা মুক্তির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিরাট পর্ব অধ্যয়নের রীতি ছিল এবং হিন্দুদের ঘরে ঘরে বিরাট পর্ব আত্মার সদ্গতি বা মুক্তির উদ্দেশ্যে পড়া হইত।

বাংলা রামায়ণের অধিকাংশ পুঁথি যেমন—কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত, বাংলা মহাভারতের অধিকাংশ পুঁথিও তেমনি কাশীরাম দাসের ভণিতাযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাস ছাড়া বা কাশীরাম দাস ছাড়াও অন্যান্য বাঙালী গ্রন্থকারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রামায়ণ ও মহাভারতের পুঁথি পাওয়া যায়।

(৬) কাশীরাম দাস ও দ্বৈপায়ন দাসের পর উৎকল-ব্রাহ্মণ কবি সারলাদাসের ভণিতাযুক্ত বিরাটপর্বের একাধিক পুঁথি আমরা পাইয়াছি। এই সারলা দাসই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উড়িষ্যার রাজা কপিলচন্দ্র দেবের রাজ্যকালে ওড়িয়া ভাষায় মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। উৎকল-কবি ওড়িয়া মহাভারত-কার সারলাদাস যে শূদ্র ছিলেন এবং উৎকলীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ইহা তাঁহার ভণিতা মধ্যে পাওয়া যায়।

(৭) দৈবকীনন্দন নিমাঞ্চির 'কর্ণপর্বের' পুঁথি একখানি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় ইহার মাতার বা পিতার নাম দৈবকী ছিল কারণ ইহার নাম যে 'নিমাঞ্চি' ছিল তাহা ভণিতা মধ্যে সুপরিস্ফুট। সুতরাং দৈবকীনন্দন অংশের যদি কোন অর্থ থাকে তবে ধরিয়া লইতেই হয় যে উহা তাঁহার মাতার বা পিতার নাম। 'গোপাল বিজয়' রচয়িতা ইহার পিতা কিনা জানা যায় না, তাঁহার নামও দৈবকীনন্দন সিংহ ছিল।

আমাদের পুঁথিশালায় দ্বিজ অভিরামের 'অশ্বমেধ পর্বের' একাধিক পুঁথি আছে। ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিবারবর্গের বন্দনা করিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং অশ্বমেধ পর্ব লিখিতে গিয়া তিনি বেদব্যাসের অনুসরণ না করিয়া জৈমিনি ভারতের অনুসরণ করিয়াছেন।

(৮) কবি ঘনশ্যাম দাস রচিত মহাভারত প্রকৃতপক্ষে জৈমিনি ভারত। প্রকারান্তরে জৈমিনি ভারত বা অশ্বমেধ পর্ব বা পাণ্ডববিজয়কথা। ঘনশ্যাম দাস বর্ধমান জেলার অধিবাসী এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১০৪০ বাংলা সনে তিনি এই পাণ্ডববিজয়কথার রচনা শেষ করেন।

(৯) রামচন্দ্র খাঁ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস ছিল জম্বীপুরে। 'লস্কর খাঁ' তাঁহার মুসলমান নবাবদের দেওয়া উপাধি মাত্র। তাঁহার পিতার নাম ছিল মধুসূদন ও মাতার নাম পুণ্যবতী। তাঁহার

CENTRAL LIBRARY

রচিত মহাভারত, জৈমিনি ভারত বা অশ্বমেধ পর্ব। ১৭১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পাণ্ডববিজয়-কথা-র রচনা শেষ হয়।

(১০) দ্বিজ কৃষ্ণরামের লেখা 'অশ্বমেধ পর্ব' বাংলা ১২০৮ সালে অর্থাৎ ১৮০০-১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

(১১) কৃষ্ণানন্দ বসুর 'মহাভারত' সম্ভবতঃ ১১৯৯ বাংলা সন অর্থাৎ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইঁহার রচিত মহাভারতের একখানি খণ্ডিত পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে।

(১২) ষষ্ঠীবর সেনের পুত্র গঙ্গাদাস সেন। ইঁহার রচিত মহাভারতের খণ্ডিত পুঁথি আমরা পাইয়াছি। ইনি সপ্তদশ শতকে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

(১৩) রাজেন্দ্র দাস সম্ভবতঃ গঙ্গাদাস সেনের সমসাময়িক ছিলেন কিংবা কিছুটা পূর্বকালীন বা কিছুটা পরবর্তীকালীন হইতেও পারেন। ইনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এবং কবীন্দ্র সঞ্জয় রচিত মহাভারতের স্থানে স্থানে রাজেন্দ্র দাসের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কবীন্দ্র সঞ্জয় ও রাজেন্দ্র দাসের মধ্যে স্থান ও কালগত ব্যবধান প্রচুর। তথাপি দেখা যায়, বিশেষভাবে, সঞ্জয়ের মহাভারত নানাজনের ভণিতা-মিশ্রণ দোষে দুষ্ট। ইঁহার মহাভারতের পুঁথির লিপি ও ভাষা সপ্তদশ শতকের হইতে পারে।

(১৪) চন্দন দাস মণ্ডল 'অশ্বমেধ পর্ব' বা 'জৈমিনি ভারত' লিখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত পাণ্ডববিজয়-কথার একখানি খণ্ডিত পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। পুঁথির মধ্যে রচনা-সমাপ্তির যে তারিখ আছে তাহা ১৫৪৩ শক অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ এবং বাংলা সন ১০২৭।

(১৫) অনন্ত মিশ্রের পিতার নাম কৃষ্ণরাম মিশ্র। ইনি যে অশ্বমেধ পর্ব বা জৈমিনি ভারত রচনা করেন তাহার একটিমাত্র খণ্ডিত পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। পুঁথির মধ্যে রচনা-সমাপ্তির তারিখ ১৬১১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ দেখা যায়।

(১৬) জয়ন্তি দেব-এর লিখিত মহাভারতের 'স্বর্গারোহণ পর্ব'-এর একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। বাংলা ১২০৫ সনে অর্থাৎ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথিখানির লেখা সমাপ্ত হইয়াছিল।

(১৭) বিশারদের 'বিরাট পর্বের' পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল বিশারদ চক্রবর্তী। গ্রন্থারম্ভে লেখক রচনার তারিখ দিয়াছেন এবং যথাসম্ভব বেদব্যাসের মূল মহাভারতের অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সভাকবি ছিলেন।

(১৮) শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বা দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত-এর খণ্ডিত একখানি পুঁথি আমরা পাইয়াছি। ইনি কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ-এর আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

(১৯) বাসুদেব আচার্যের মহাভারতের 'স্বর্গারোহণ পর্বের' খণ্ডিত পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে জীবিত ছিলেন।

(২০) নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধর দাসের পুত্র। ইনি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত দ্রোণ পর্বের একখানি খণ্ডিত পুঁথি আমরা পাইয়াছি। রচনাকাল ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

(২১) ত্রিলোচন চক্রবর্তীর মহাভারতের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে জীবিত ছিলেন।

(২২) রামেশ্বর নন্দী বোধ হয় সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত মহাভারত বেদব্যাসের মূল মহাভারতের প্রায় যথাযথ পদ্যানুবাদ। ইনিও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের লোক ছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

(২৩) লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন। ইনি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে জীবিত ছিলেন।

(২৪) কামতা-কামরূপের রাজা বিশ্বসিংহের সভায় পীতাম্বর দাস নামে একজন কবি ছিলেন। তিনি মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত 'নলদময়ন্তীর উপাখ্যান' পয়ার ছন্দে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার তারিখ ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি বিশ্বসিংহের পুত্র সমর সিংহের রাজত্বকালে মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

(২৫) দ্বিজ অনিরুদ্ধের ভীষ্মপর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার পিতার নাম ছিল কবিচূড়ামণি ভীম সেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল কবিচন্দ্র। ভীষ্মপর্ব ছাড়াও দ্বিজ অনিরুদ্ধ বনপর্ব ও উদ্যোগপর্ব রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজ অনিরুদ্ধের বোধ হয় আরেক নাম ছিল রাম সরস্বতী।

(২৬) ইঁহার পুত্র গোপীনাথ পাঠক দ্রোণপর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কামতা-কামরূপের রাজসভায় রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে আরও অনেকে মহাভারত রচনায় বা অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, যেমন, গোবিন্দ কবিশেখর 'কিরাতপর্ব,' রুদ্রদেব ও দ্বিজ রঘুরাম 'আদিপর্ব'; জয়দেব, হরেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজসুন্দর 'সভাপর্ব'; কৌশারি, দ্বিজ বলরাম, বৈদ্যনাথ, পরমানন্দ, মহীনাথ ও রামবল্লভ দাস রচনা করেন 'বনপর্ব'; লক্ষ্মীরাম ও পঞ্চানন বৈদ্যের 'কর্ণপর্ব' পৃথক-পৃথক রচনা; কবিরাজ দ্বিজ শ্রীনাথের 'দ্রোণপর্বের' কথা আগেই বলিয়াছি; রামনন্দনের 'শল্যপর্ব' রামনন্দন ও বৈদ্যনাথের 'গদাপর্ব'; মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের 'ঐষিকপর্ব'; দ্বিজ বৈদ্যনাথের 'শান্তিপর্ব,' মহীনাথ শর্মার 'অশ্বমেধপর্ব'; দ্বিজ কীর্তিচন্দ্রের 'আশ্রমিকপর্ব' মহীনাথ ও মাধবচন্দ্রের 'মহাপ্রস্থানপর্ব'-এর পুঁথি আছে।

মনসামঙ্গল

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের চারিটি পুঁথি আছে। পুঁথিগুলিতে কিন্তু মনসা-মঙ্গলের বিভিন্ন কবির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় ফলে নিছক নারায়ণ দেবের ভণিতা খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। শুধু একখানি পুঁথির গোড়ার দিকে নিম্নরূপ কবি-পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়—

জাতি আর জন্ম মোর কায়স্থের ঘর। মৌদ্গল্য গোত্র মোর গাঙ্গি গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা। মাতামহ প্রভাকর, রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি। রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রাম বসতি॥

অসমীয়া ভাষায় নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের অসমাপ্ত পুঁথি পাওয়া যায়। ইনি পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে জীবিত ছিলেন। বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসা-বিজয় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের পূর্ববর্তী হইলে উহা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বা মধ্য ভাগে রচিত হইয়া থাকিবে।

নারায়ণ দেবের পর ফুল্লশ্রীর বিজয় গুপ্তের 'মনসার ভাসান' বা 'মনসামঙ্গল' ও দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' রচিত হয়। ইঁহার নাম ছিল বংশীদাস রায়। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, পিতামহের নাম হৃদয়ানন্দ এবং মাতার নাম ছিল অঞ্জনা। মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী গ্রামে দ্বিজ বংশীদাসের আদি নিবাস ছিল। আমাদের পুঁথিশালায় দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের ৩ খানি পুঁথি আছে। আর দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণের একটি পালার পুঁথিও আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। ইহাদের একটি খণ্ডিত এবং অন্যটি সম্পূর্ণ। বর্ধমান জেলার বনভূম পরগণায় কাঁকুটনন্দন গ্রামে লেখকের আদি নিবাস ছিল এবং সেখান হইতে

CENTRAL LIBRARY

বাঁকুড়া জেলার আখড়া শালগ্রামে গিয়া বাস করেন। কবির পিতার নাম প্রসাদ এবং পিতামহের নাম ছিল মহেশ। ইহার দুইটি উপাধির উল্লেখ পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়, যথা 'কবিবল্লভ' ও 'কবিকঙ্কণ'।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের কাব্যের 'দেবখণ্ড' ও 'বণিকখণ্ড' পালার পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। মোট ৩ খানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। লেখকের পিতার নাম ছিল অনন্ত, মাতার নাম স্বর্ণমালা এবং ইহার উপাধি কবি ভূষণ। কবির বাসস্থান ছিল করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে। জীবনকৃষ্ণের কাব্যটির রচনাকাল ১৬৬৫ শকাব্দ বা ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।

সম্প্রতি ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্রের সৌজন্যে আমরা কবি গুণচন্দ্রের মনসামঙ্গলের একখানি পুঁথি পাইয়াছি।

এগুলি ছাড়া আমাদের সংগ্রহশালায় বিপ্র জানকীনাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, ষষ্ঠীধর সেন, গঙ্গাদাস সেন, বর্ধমান দাস, গুণানন্দ খান প্রভৃতির মনসামঙ্গলের খণ্ডিত পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

চণ্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। কবিকঙ্কণ তাঁহার উপাধি। জনসমাজে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' নামেই প্রসিদ্ধ। সন-তারিখযুক্ত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার সংগ্রহে রহিয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভে কবির আত্মপরিচয় আছে। আমাদের পুঁথিমধ্যে কবির আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে পথপ্রদর্শক মাণিক দত্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যাহা হইতে হৈল গীত-পথ পরিচয়॥

তবে কি মাণিক দত্তের কোন চণ্ডীমঙ্গল ছিল, না মাণিক দত্তের উপদেশ ও নির্দেশক্রমে মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতানুসারে—'মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি মাণিক দত্তের কোন জীর্ণ ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বর্তমান কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল' (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ)

মাণিক দত্ত রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল আমাদের হাতে আসিয়া না পৌঁছিলেও তাঁহার রচিত 'ভবানীমঙ্গল'-এর একখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। কিন্তু ভবানীমঙ্গল যদি চণ্ডীমঙ্গলের পর্যায়বাচী হয়, তথাপি ইহার ভাষা তো আদৌ প্রাচীনতর নহে, বরং সমকালবর্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতের দুইখানি সম্পূর্ণ পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। ১৬৯৯ শকাব্দে ইহাদের অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল।

কৃষ্ণমঙ্গল

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একাধিক পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একমাত্র উপাদান শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধই, এমন নহে। লেখক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ হইতেও কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে দানলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি বিষয় ইহাতে স্থান পাইত না।

পরমানন্দের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। কবির পিতার নাম ছিল দুর্লভ। ইহার মধ্যে ভাগবতের অল্প বিস্তর সকল স্কন্ধের ভাবানুবাদ বা ভাবানুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগবতাচার্য পণ্ডিত রঘুনাথের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র চৌদ্দটি পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। একমাত্র 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'ই মূল শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ইহার রচয়িতা রঘুনাথ পণ্ডিত বরাহনগর নিবাসী গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

দ্বিজ মাধবের 'কৃষ্ণমঙ্গল' অনেকটা ভাগবতানুসারী লেখা হইলেও, ইহার মধ্যে নৌকাবিলাস, দানলীলা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতবহির্ভূত ব্যাপারও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং ইহার রচনার উল্লেখ রসময় দাসের 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'তে দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল'-এর পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। ইনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণায় অবস্থিত হরিহরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম শ্রীমুখ ও মাতার নাম ভবানী। দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধের আংশিক এবং দশম স্কন্ধের প্রায় সমগ্র অংশ অনূদিত রহিয়াছে দেখা যায়।

দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয়ের' একাধিক পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। একখানি পুঁথির শেষ ভাগে রচনার তারিখ দেওয়া আছে 'শাকেগজাঙ্কি শরচন্দ্রমিতে'—অর্থাৎ ১৫৪৮ শক বা ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ। রসময় দাসের 'রসকল্পবল্লী'র মধ্যে 'গোপালবিজয়ে'র উল্লেখ আছে।

দ্বিজ হরিদাসের 'মুকুন্দমঙ্গল' শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাবানুবাদ। ইহার একখানি পুঁথি আছে।

অভিরাম দাসের 'গোবিন্দবিজয়ের' অনেকগুলি পুঁথি আমরা পাইয়াছি। পুঁথিগুলির মধ্যে দুইটি অখণ্ডিত এবং বাকি ষোলটি খণ্ডিত। শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গলে' অভিরাম দাসের 'গোবিন্দবিজয়ের' উল্লেখ আছে। অভিরাম দাস প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং দশম স্কন্ধের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। একটি পুঁথিতে দেখা যায় মথুরার রাজপদে উগ্রসেনকে প্রতিষ্ঠিত করার পর কবিচন্দ্রের ভণিতা আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং 'কবিচন্দ্র'কে লইয়া এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে একাধিক কবিচন্দ্র ছিলেন অর্থাৎ একাধিক মঙ্গলকাব্যের কবি 'কবিচন্দ্র' উপাধি পাইয়াছিলেন। অভিরাম দাস কি গোবিন্দবিজয় রচনাকালে 'কবিচন্দ্র' উপাধি পাইয়াছিলেন, না অন্য কোন লোক (যাঁহার 'কবিচন্দ্র' উপাধি ছিল) অভিরাম দাসের রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? কিন্তু ঐ কাব্যের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে অভিরাম দাস নিম্নপ্রকার ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

(ক) গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময়। গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাসে কয়।

(খ) গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুব্ধ মতি। অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী॥

সুতরাং অভিরাম দাস তাঁহার বৈষ্ণব বিনয় ত্যাগ করিয়া হঠাৎ ভণিতা মধ্যে 'উপাধি ব্যাধিরেবচ' ব্যবহার করিবেন, ইহা আদৌ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ফলে কবিচন্দ্র ভণিতাযুক্ত নন্দবিদায়ের কাহিনী প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমাদের সিদ্ধান্ত। আবার দানলীলা, নৌকাবিলাস এবং রাসলীলার পর বংশীচুরির আখ্যান লৌকিক বলিয়াই প্রক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। শঙ্কর চক্রবর্তীর উপাধি যে কবিচন্দ্র ছিল তাহা রসময় দাসের রসকল্পবল্লীতেই পাওয়া যায়, সুতরাং শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রই কি অভিরাম দাসের রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন?

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর 'গোবিন্দমঙ্গলের' পুঁথি যাহা আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে তাহার নাম পুঁথির বিভিন্ন স্থলে ভণিতা মধ্যে দেখা যায়—'ভাগবতামৃত', 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ও 'রাধিকামঙ্গল'। এরূপ একই কাব্যের একাধিক নাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা অর্থ আমাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নহে।

ভবানন্দের হরিবংশের পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে রহিয়াছে। বাংলা হরিবংশ কিন্তু বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত হরিবংশের অনুবাদ নহে। যদিও গ্রন্থারম্ভে কবি বলিয়াছেন—

CENTRAL LIBRARY

সত্যবতী সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ। সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ।
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে। লোক বুঝিবারে বলে দীন ভবানন্দে।

তথাপি কবির এই উক্তি সত্য নহে। বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত হরিবংশ মোটেই সংক্ষিপ্ত নহে, বরং উহা যথেষ্ট পরিমাণ বিশদ ও বিস্তৃত। সুতরাং কবি কি অর্থে বা কি উদ্দেশ্যে তাঁহার কাব্যের নাম হরিবংশ রাখিলেন, ইহা এক প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত হরিবংশের কিছু কিছু কিছু মিল আছে। উভয়েই নাটপালা, উভয়েরই অঙ্গীরস আদিরস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট। হরিবংশের ভাষা সেরূপ কিছু নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা হরিবংশে চরিত্র সংখ্যা কিছু বেশী। কিন্তু উভয়েরই আকর-সাহিত্য হইতেছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'।

আরেকখানি হরিবংশের পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে, তাহার নামান্তর 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'। ইহার লেখকের নাম ঘনশ্যাম। ইনি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামেও পরিচিত ছিলেন এবং জয়গোপাল দাসের শিষ্য ছিলেন। কবি ভবানন্দের মত ইনিও আপনার কাব্যে শ্রীকৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। সব কিছু লক্ষ্য করিয়া এই কথাই মনে হয় যে, বাংলায় বিবর্তিত পরব্রহ্ম শ্রীহরির কায়ব্যূহ-ই 'বংশ' শব্দের দ্বারা উক্তিষ্ট হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ হরিরূপে বিবর্তিত পরব্রহ্মের লীলার্থে গঠিত কায়ব্যূহ।

পদ্মাপুরাণের রচয়িতা বংশীদাস রায়ের শ্রীকৃষ্ণলীলাবলম্বনে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণগুণার্ণব' নিবন্ধের দুইখানি পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে। এগুলি ব্যতীত প্রাণনারায়ণ ও রামসুন্দরের ক্রিয়াযোগসার, ভবিষ্যপুরাণ, একাদশীব্রতমাহাত্ম্য, তুলসী মাহাত্ম্য, অক্রূরাগমন প্রভৃতি নিবন্ধও সংগ্রহ মধ্যে আছে।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে রূপরামের গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার এতদ্দেশে সর্বাধিক ঘটিয়াছিল। আমাদের সংগ্রহ মধ্যে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের কয়েকটি পালা আছে। সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ন্যূনাধিক ১৬টি বিভিন্ন পালার পুঁথি আছে। কবি ১১০৪ মল্লাব্দে তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম ছিল দেবীদাস এবং ইহার নিবাস সুখসায়র গ্রাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘনরামের পিতার নাম ছিল গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম সীতা। ইহার নিবাস ছিল বর্ধমানে। আমাদের সংগ্রহ মধ্যে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কয়েকটি পালার পুঁথি আছে। পালাগুলির নাম যথাক্রমে, (১) কলানির্মাণ পালা, (২) হরিশ্চন্দ্রের পালা, (৩) বাঘজন্ম পালা, (৪) সুরিক্ষার পালা, (৫) ইছাইবধ পালা। আবার এই কয়টি পালার মধ্যে কলানির্মাণ পালা ও ইছাইবধ পালা সম্পূর্ণ, বাকী পালাগুলি খণ্ডিত।

মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে জীবন বাঁড়ুজ্যের পুত্র রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে ১০৩৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় যে কয়েকটি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যের ধর্মমঙ্গলের পালার পুঁথি আছে তাহাদের সব কয়টিই খণ্ডিত। পালাগুলি যথাক্রমে (১) আখড়া পালা, (২) কলা-নির্মাণ পালা, (৩) গৌড়যাত্রা পালা, (৪) জামতি পালা, (৫) মায়ামুণ্ড পালা, (৬) হরিশ্চন্দ্র পালা, (৭) হাকন্দ পালা, (৮) অঘোর-বাদল পালা, (৯) জাগরণ পালা, (১০) পশ্চিম-উদয় পালা, (১১) বাঘজন্ম পালা। ইহাদের মধ্যে আখড়া পালা ও হরিশ্চন্দ্র পালার পুঁথি তিনটি করিয়া আমাদের সংগ্রহে আছে।

রামচন্দ্র একখানি ধর্মপুরাণ লিখিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক এই ধর্মপুরাণটি মথুর ভট্টের রচনা

CENTRAL LIBRARY

বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার একটি বিচ্ছিন্ন পালা 'কানাড়ার সম্বন্ধ' সাহিত্য-সংহিতার ৯ম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

নরসিংহ বসু প্রণীত 'ধর্মমঙ্গলে' আমরা লেখকের বিস্তৃত পরিচয় ও ধর্মমঙ্গল রচনার কারণ জানিতে পারি। নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলের পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় ৩৩টি আছে।

নরসিংহের পিতামহ মথুরা বসু, পিতার নাম ঘনশ্যাম ও মাতার নাম নবমল্লিকা। বর্ধমানের অন্তর্গত শাঁখারীতে ইহার নিবাস ছিল। ইহার ধর্মমঙ্গল কাব্যটির রচনাকাল ১৬৩৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ।

রামনারায়ণের ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত 'ইছাইবধ' পালার পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। লেখকের ভণিতা এইরূপ : 'রামকৃষ্ণানুজ গায় রামনারায়ণ'।

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের রচিত ধর্মমঙ্গলের 'লাউসেন চুরি' পালার একখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে।

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গলের সহিত যে কোন কারণেই হউক, বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ায় কাব্যের শীর্ষক 'কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর' হওয়া উচিত। মঙ্গলকাব্যের সহিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী জড়িত হওয়ার পূর্বে হয়ত ইহার অস্তিত্ব রূপকধর্মী প্রেম-কাব্য হিসাবে ছিল—যেমন লোরচন্দ্রানী ও মৃগাবতীর কাহিনী বা রূপক প্রণয়-কাব্য প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গের কবি ভবানন্দের হরিবংশের শেষ দিকে মৃগাবতীর কাহিনী সংক্ষেপে দেখিতে পাওয়া যায়। দৌলৎ কাজীর 'লোরচন্দ্রানী বা 'লোর-চন্দ্রালী'র শীর্ষক বোধ হয় 'চন্দ্রাবতী' ছিল। ফলতঃ দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সাহিত্যের (সুফী) প্রেম-রূপক-কাব্যের ঐতিহ্য আসিয়া পৌঁছিয়াছিল ১৫শ-১৬শ শতক নাগাদ। তাই আমরা ঐ সময়ে শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটপালা দেখিতে পাই। হিন্দীতে সুফী প্রেম-রূপক-কাব্য খ্রীঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা। এই প্রেম-রূপক কাব্যের ধারা মঙ্গলকাব্যের সমকালীন এবং পূর্ববঙ্গের কবি ভবানন্দের 'হরিবংশের' পরিশিষ্ট মধ্যে যে মৃগাবতীর কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীনতর হইলে চতুর্দশ শতকেই নয়ত খ্রীঃ ১৫শ-১৬শ শতকেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মোট কথা মুসলমান নবাবদের প্রেরণায় বাংলাদেশে যে প্রেম-রূপক-কাব্যের ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পতনের শেষ চিহ্ন বিদ্যাসুন্দর নাটপালা। দ্বিতীয়টি সৈয়দ আলওয়ালের পদ্মাবত বা পদমাবত কাব্য এবং তৃতীয়টি লোরচন্দ্রানী বা লোরচন্দ্রালী কাব্য এবং এই আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী কালিকামঙ্গলের অঙ্গীভূত হইয়াছিল যে কারণে তাহা এই যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে মঙ্গলকাব্যের প্রচার খুবই জোরাল ছিল এবং সেরূপ অবস্থায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকে শিবশক্তির মিলনের রূপক ধরিয়া লইয়া তাহাকে কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রথম কালিকামঙ্গল রচয়িতা গোবিন্দদাস ছিলেন চট্টগ্রামের লোক। চট্টগ্রাম-মৈমনসিংহেই বিশেষভাবে শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর নাটপালা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ঐ অঞ্চলের অধিবাসী গোবিন্দদাসের পক্ষে চরম আকর্ষণীয় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল কাব্যটি অতি বৃহৎ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একাধিক কবির রচিত কালিকামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়, যথা প্রাণরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম ও বলরাম চক্রবর্তীর। বলরামের অসম্পূর্ণ পুঁথি এই সংগ্রহে রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

বলরাম রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সভাসদ-কবি ছিলেন, উক্ত রাজা ১৬৬৯-১৬৯২ খ্রী: পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনুমান হয় এই সময়ের মধ্যেই কবি কালিকামঙ্গল রচনা করিয়া থাকিবেন।

কবি প্রাণরাম যে কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী তাহার একটি প্রমাণ কবি প্রাণরামের নিম্ন-লিখিত ভণিতায় পাওয়া যায়—

বসুদ্বয় বাণচন্দ্র শক নিরূপণ। কালিকামঙ্গল গীত হইল সমাপন॥

এই সাঙ্কেতিক রচনায় আমরা কালিকামঙ্গলের পরিসমাপ্তির কাল পাইতেছি, ১৫৮৮ শক বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ। উক্ত কবি প্রাণরাম কবিবল্লভ রূপেও পরিচিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের রচনায় ভক্তিরসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং অশ্লীলতার অংশ ইঁহাদের মধ্যে খুবই কম।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে কবি দ্বিজ রাধাকান্ত, কবীন্দ্র মধুসূদন ও নিধিরাম—ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক-একখানি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজ রাধাকান্ত কলিকাতার বাসিন্দা এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইঁহার পিতার নাম রামনাথ মিশ্র, পিতামহ শ্রীবল্লভ। আমাদের সংগ্রহালয়ে দ্বিজ রাধাকান্তের কালিকামঙ্গলের দুইখানি পুঁথি আছে। মধুসূদনের কালিকামঙ্গলে ভণিতার মধ্যে কোথাও কবীন্দ্র, কোথাও কবিচন্দ্র এবং কয়েকটি স্থানে মধুসূদন কবীন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিধিরাম ১৭৫৩-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালিকামঙ্গল প্রণয়ন করেন এবং ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁহার 'শ্যামামঙ্গল' পরিসমাপ্ত করেন।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। আমাদের সংগ্রহালয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একাধিক পুঁথি বর্তমান, অন্নদামঙ্গলের ৩টী অধ্যায়ের মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দরের' পুঁথির প্রাচুর্য আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে।

শিবমঙ্গল

আমাদের সংগ্রহশালায় রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ'র তিনখানি পুঁথি রহিয়াছে। মৃগলুব্ধক শব্দের অর্থ মৃগ ও ব্যাধ, এই মৃগ ও ব্যাধ শিবচতুর্দশীর আখ্যানবস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং শিবরাত্রির প্রতীক। এক ব্যাধ বনমধ্যে কৃষ্ণ-চতুর্দশীর রাত্রিতে যে শিবের সাক্ষাৎ লাভ করে তিনি পশুপতিরূপে পাশুপত শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্য। পশুপতির পরিকল্পনা প্রাক্-বৈদিক যুগের এবং খুবই প্রাচীন। যাহা হউক শিবচতুর্দশীর কাহিনীর সহিত রতিদেব পুরাণোক্ত মুচুকুন্দ রাজার কাহিনী এবং ভদ্রসেন ও রত্নাবলীর কাহিনী উপন্যস্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছে তাহা এইরূপ—

পিতা গোপীনাথ বন্দম বসুমতী। জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দ, শ্রীরাম নারায়ণ। তস্যানুজ রতিদেব……।

অষ্টাদশ শতকের রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' বা শিব-সঙ্কীর্তন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পর উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য। কবি রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ পুঁথিও আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে।

দ্বিজ সৃষ্টিধরের 'মহেশমঙ্গল'ও অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের রচনা। ইহার উপজীব্য 'কাশী-পরিক্রমা' ও 'কাশী-খণ্ড'। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তনের তুলনায় দ্বিজ সৃষ্টিধরের 'মহেশ-মঙ্গল'-এর সাহিত্যিক মূল্য অনেক কম। ইহার একখানি পুঁথি সংগ্রহশালায় রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

সূর্যমঙ্গল

সূর্যমঙ্গলের পুঁথি আমাদের সংগ্রহে কিছু রহিয়াছে। রচয়িতার নাম মালাধর কালিদাস ও রাজকিশোর শর্মা চৌধুরী। ইহাদের সকল মঙ্গলকাব্যেই এক ব্রাহ্মণের কমনা ও ঝুমনা নাম্নী দুই কন্যার দুঃখ-দারিদ্র্য ও সূর্য আরাধনার কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক উচ্চারণে যাহা 'কমনা,' 'ঝুমনা' প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল অমুনা, যমুনা। সূর্য ব্রতকথায়ও ইহাদের উল্লেখ আছে।

জীতাষ্টমী ব্রতকথা বা জীমূতমঙ্গলের দুইখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। দুইখানি পুঁথি দুইজন ভিন্ন রচয়িতার। একজনের নাম মধুসূদন ও অন্যজনের নাম শম্ভুরাম। জীমূতবাহনের কাহিনী বড়ই অদ্ভুত। সূর্যের ঔরসে এক বিধবা-ব্রাহ্মণীর গর্ভে জীমূতবাহনের জন্ম হয়। বালাবন্ধুরা তাহার জন্ম-ব্যাপার লইয়া জীমূত-বাহনকে নানারূপ বাঙ্গবিদ্রূপ করিতে থাকে। জীমূতবাহন সূর্যের আরাধনা করিতে থাকেন তাঁহার মায়ের নির্দেশে। সূর্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাহাকে বরদান করায় তিনি কলঙ্কের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। শম্ভুরামের জীমূতমঙ্গলে এই কাহিনী ছাড়াও 'মগধ-পালা' ও 'জাগরণ পালা' নামে দুইটি অতিরিক্ত কাহিনী আছে। ফলে মধুসূদনের জীমূতমঙ্গল অপেক্ষা শম্ভুরামের জীমূতমঙ্গল নিঃসন্দেহে লোকপ্রিয় ও আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

সারদামঙ্গল

'সারদামঙ্গল' কাব্যের দুইখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহালয়ে আছে। একটি পুঁথিতে কবির নাম পাইতেছি দয়ারাম, দয়ারামের পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহ পরীক্ষিৎ ও প্রপিতামহের নাম রমেন্দ্রজিৎ। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়া কবির বাসস্থান ছিল। সুবাহু নামক রাজার পুত্র লক্ষ্মীধর কিভাবে সারদা বা সরস্বতীর বরে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তাহাই সারদামঙ্গলের উপজীব্য।

গঙ্গামঙ্গল

জয়রাম দাস রচিত ও শঙ্কর আচার্য রচিত গঙ্গামঙ্গলের দুইখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। জয়রাম দাসের গঙ্গামঙ্গলের নাম 'বিষ্ণুপদ তীর্থমালা'। কবিচন্দ্র অযোধ্যারামের একটি 'গঙ্গা' বন্দনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের রচনাকাল খ্রীঃ ১৮শ-১৯শ শতক।

শীতলামঙ্গল

শীতলামঙ্গলের একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে রহিয়াছে। ভিন্ন-ভিন্ন পুঁথির রচয়িতা বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন,—শঙ্কর, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি। ইহাদের রচনাকাল খ্রীঃ ১৮শ-১৯শ শতক।

ষষ্ঠীমঙ্গল

আমাদের পুঁথিশালায় রামধন চক্রবর্তী রচিত ষষ্ঠীমঙ্গলের পুঁথি আছে। ইহারও রচনাকাল খ্রীঃ ১৮শ-১৯শ শতক।

কপিলামঙ্গল

কপিলামঙ্গল কাব্যটির রচয়িতা জনৈক কাশীনাথ। ভাগবতপুরাণে বর্ণিত অষ্টবসু কর্তৃক কপিলা গাভী হরণের কাহিনী এই মঙ্গলকাব্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনাকাল খ্রীঃ ১৮শ-১৯শ শতক। ইহার একখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে।

CENTRAL LIBRARY

রায়মঙ্গল

রায়মঙ্গলের 'রায়' ব্যাঘ্র দেবতা, তাঁহার নাম দক্ষিণরায়। একাধিক লেখক রচিত রায়মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। আমাদের সংগ্রহে নিমতাবাসী কবি কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের 'রায়মঙ্গল' রহিয়াছে। পুঁথিটি শেষদিকে খণ্ডিত।

বৈষ্ণব পদাবলী

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর প্রায় ৩৬ খানি পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। মৈথিল ভাষায় তিনি পদাবলী রচনা করিলেও তাঁহার পূর্বতন রচনা—'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' অবহট্টে এবং 'পুরুষপরীক্ষা' প্রভৃতি সংস্কৃতে লিখিত।

বিদ্যাপতির পদাবলীর পর আমাদের সংগ্রহ মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুঁথি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসকে লইয়া এমন দারুণ সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে যাহার সমাধান কোনও দিন হয়ত হইবে না। বর্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলে 'চণ্ডীদাস' শব্দ আজিও সিদ্ধ গায়েন বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। পূর্বেও বোধ হয় একই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ হইত। সভায় দাঁড়াইয়া যে গায়েন অবাধে পদবন্ধ রচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিতে পারিত সে-ই কালক্রমে 'চণ্ডীদাস' উপনাম লাভ করিত। অপরপক্ষে এমনও হইয়া থাকিতে পারে, প্রথম, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস-এর কবিপ্রসিদ্ধি জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার পরবর্তী সিদ্ধ গায়েন বা পদ-রচয়িতা 'চণ্ডীদাস' শব্দ উপাধি বা উপনাম রূপে লাভ করেন। অবশ্য আদি চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ুর পক্ষে 'চণ্ডীদাস' শব্দ উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং বাসলীচণ্ডীর সেবক অর্থেই হইয়াছিল। সুতরাং পরবর্তী গায়েনের ক্ষেত্রে উক্ত শব্দের উপাধিরূপে প্রয়োগ কাল্পনিক মাত্র।

আমাদের সংগ্রহ মধ্যে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস', 'দীনহীন চণ্ডীদাস', 'দীনক্ষীণ হীন চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত পদাবলীর পুঁথি আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের স্থান, কাল লইয়া মতভেদ আছে,—অর্থাৎ তিনিই ছাতিনা গ্রামের চণ্ডীদাস কিনা এবং তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালের, না চৈতন্য-পরবর্তীকালের লোক? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে 'চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি শুনে প্রভু গায় রাত্রিদিনে'—সুতরাং দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রাক্ চৈতন্যযুগের কিনা, যাহার পদবন্ধের রসাস্বাদন মহাপ্রভু করিতেন, অথবা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার নাটপালা ছাড়াও অন্যান্য-পদবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা মহাপ্রভুর নিকট সুলভ থাকিলেও আমাদের নিকট লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—এইরূপ নানা অনুমান সমালোচকগণ করিয়া থাকেন।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের পর দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর আবিষ্কর্তা স্বর্গত মণীন্দ্রমোহন বসু। আমাদের সংগৃহীত পুঁথি হইতে প্রায় ৭০০ দীন চণ্ডীদাসের পদবন্ধ সঙ্কলিত করিয়া দুইখণ্ডে সঙ্কলন গ্রন্থটি তিনি সম্পাদিত করেন।

ইহার পর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক থাকা কালে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বনপাশ গ্রাম হইতে চণ্ডীদাস পদাবলীর যে অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া লইয়া আসেন তাহার মধ্যে দীন-হীন চণ্ডীদাস ও দীন-ক্ষীণ-হীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে নাটপালা ও পদাবলীকার চণ্ডীদাস অন্ততঃ ৪।৫ জন ছিলেন। কিন্তু ইহার বহির্ভূত যদি কোন চণ্ডীদাস থাকেন তবে তিনি আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াই গিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পর উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হইতেছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাস কবিরাজের পদাবলীর ভাষা ছিল ব্রজবুলি। ইহার পদাবলীর অনেকগুলি পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলা হয়। ছোট বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের শব্দগত ও সংগঠনগত মিল যথেষ্ট দেখা যায়। উভয়ের পদবন্ধের মধ্যে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্যও দেখা যায়। ইঁহার পদাবলী-পুঁথিও আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে।

পদকর্তা জ্ঞানদাসের পদাবলীর পুঁথি আমরা পাইয়াছি। ইনিও ব্রজবুলীতেই পদ রচনা করিতেন। জ্ঞানদাসের পর লোচনদাসের পদাবলী আমরা পাইয়াছি। বলরাম কবিশেখর, যদুনন্দন দাস, রায়শেখর, রামগোপাল দাস, জগদানন্দ, তরুণীরমণ, শশিশেখর, বল্লভ ও ভূপতিনাথের পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রঘুনাথ দাস, নরহরি সরকার ও বংশীবদন দাসের পদাবলী আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর যে সকল বৈষ্ণব পদকর্তা পদবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে নয়নানন্দ দাস, দৈবকীনন্দন দাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী, শিবানন্দ সেন, যদুনন্দন চক্রবর্তী, মাধবদাস, পুরুষোত্তম দাস, পরমানন্দ দাস প্রভৃতির রচিত পদাবলীর পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। বলাবাহুল্য এই সকল পদকর্তা খ্রীষ্টীয় ১৫শ হইতে ১৬শ শতকের মধ্যে জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৬শ হইতে ১৭শ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে নরোত্তম ঠাকুর, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস ভট্টাচার্য, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, নৃসিংহ, ভূপতি, নৃপ উদয়াদিত্য, বল্লভ চৌধুরী, কবিশেখর, কবিবল্লভ, কবিরঞ্জন, ও দিব্যসিংহের পদাবলীর পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে গতিগোবিন্দ, ঘনশ্যাম দাস, যদুনন্দন দাস, জগদানন্দ দাস, রতিপতি ঠাকুর, রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস ও তরুণীরমণের পদাবলীর পুঁথি আমাদের আছে।

শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর (১) 'পদামৃতসমুদ্র' নামে একটি পদবন্ধের সঙ্কলন গ্রন্থ সম্পাদিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে 'পদামৃতসমুদ্রের' একাধিক পুঁথি আছে (২) বৈষ্ণবদাসের 'গীত-কল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু'র দুইটি খণ্ডিত পুঁথিও আছে। (৩) নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার' সঙ্কলন-এর পুঁথিটি সুবৃহৎ। (৪) অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে নটবর দাস 'রসকলিকা' নামে একটি পদসঙ্কলন গ্রন্থ সম্পাদিত করেন। ইহার একটি পুঁথিও আমাদের আছে।

ব্রতকথা ও ব্রতকথার পাঁচালী

লক্ষ্মীর ব্রতকথার কয়েকটি পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। এইসকল পুঁথির রচয়িতা যথাক্রমে শঙ্কর, দ্বিজ বসন্ত, ধনঞ্জয়, যাদব দাস প্রভৃতি।

সত্যনারায়ণ পূজার অঙ্গস্বরূপ যে ব্রতকথার পাঁচালী প্রচলিত আছে তাহার একাধিক পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রহিয়াছে। কবি বল্লভদাসের (মদনসুন্দরের পালাসমন্বিত) পাঁচালী, দ্বিজ রঘুরামের (বাঘাম্বরের পালাযুক্ত) পাঁচালী, শঙ্কর ও কৃষ্ণবিহারীর (কাঁসিয়াড়ার পালাযুক্ত) পাঁচালীর পুঁথি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য লেখকের (যথা, দ্বিজ হরিদাস, বিজয় ঠাকুর, শিবরামরাজা, দেবকীনন্দন, গঙ্গারাম, শিবনারায়ণ ও বিদ্যাপতি) সত্যনারায়ণ পাঁচালী আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। শঙ্কর বা কিঙ্কর, ফকিররাম ও কৃষ্ণবিহারী প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত সত্যনারায়ণের পাঁচালীও আমাদের সংগ্রহে আছে। ইহাদের কোনটিরই রচনাকাল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেকার নহে বরং পরবর্তী অর্থাৎ সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যে হইবে।

শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্য

আমাদের সংগৃহীত চৈতন্যজীবনী কাব্যের পুঁথির সংখ্যা প্রচুর। বোধ হয় চারিশতের কাছাকাছি।

CENTRAL LIBRARY

প্রথম উল্লেখযোগ্য চৈতন্য-জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাস রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। আমাদের সংগ্রহশালায় ৪০টির অধিক চৈতন্যভাগবতের পুঁথি রহিয়াছে।

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত : আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলার পুঁথিই আমাদের সংগ্রহে সর্বাধিক।

আমাদের পুঁথি-সংগ্রহশালায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথির সংখ্যা দেড়শতেরও অধিক হইবে।

আমাদের পুঁথিশালায় লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলের' পুঁথি শতাধিক আছে। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যটি এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় আকারে ছোট। মোট চারিটি পর্যায়ে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল বিভক্ত যথা : সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড। লোচনদাসের 'নিমাইসন্ন্যাস' পালা এক সময়ে অত্যধিক জনপ্রিয় ছিল, তাই আমরাও লোচনদাসের নিমাইসন্ন্যাস পালার অনেকগুলি পুঁথি পাইয়াছি।

প্রভু নিত্যানন্দের আরেকজন শিষ্য জয়ানন্দও একখানি চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। আমাদের পুঁথিশালায় ২৫টির উপর জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পুঁথি আছে। ইহাদের মধ্যে আবার ৪।৫টি পুঁথি সম্পূর্ণ এবং বাকী পুঁথি কয়টির মধ্যে নিমাইসন্ন্যাস পালাই সংখ্যায় অধিক।

অন্যান্য জীবনী কাব্য

কবি হরিচরণ দাস রচিত 'অদ্বৈতমঙ্গলের' পুঁথি আমাদের সংগ্রহালয়ে আছে। ইহার বিষয়বস্তু প্রভু অদ্বৈত আচার্যের জীবনচরিত। কৃষ্ণদাস রচিত 'অদ্বৈতসূত্র কড়চা' বা 'অদ্বৈত প্রভুর মূল কড়চা'র দুইখানি পুঁথিও আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। রচনামধ্যে অদ্বৈতাচার্যের জীবনচরিত অপেক্ষা তত্ত্বভাবনার প্রাধান্য দেখা যায়।

কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করেন অষ্টাদশ শতকের পুরুষোত্তমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'। অনুবাদ পদ্যেই লিখিত এবং লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রেমদাস'।

ভগীরথ বন্ধুর 'চৈতন্যসংহিতা', চূড়ামণি দাসের 'চৈতন্যবিজয়ের'ও খণ্ডিত পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। জগদানন্দের 'শ্যামচন্দ্রোদয়'-এর পুঁথি যাহা আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে তাহা অখণ্ডিত। এই রচনাগুলির কোনটিই নাতিদীর্ঘ বা বিস্তৃত নহে।

কৃষ্ণদাস রচিত 'শ্যামানন্দ—প্রকাশের' একখানি পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। শ্যামানন্দের জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ লেখক তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে করিয়াছেন।

লৌকিক দেব-দেবী বন্দনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ মধ্যে পরমানন্দ দাস রচিত ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা, রামকৃষ্ণের তারকেশ্বর বন্দনা এবং জগদানন্দ দাস, লোচন দাস ও পরমানন্দ দাসের মদনমোহন বন্দনার পুঁথি আছে। হরগোবিন্দ, রঘুনাথ, রাম কৃত্তিবাস ও দয়াময় দাসের রচিত জগন্নাথ বন্দনার পুঁথিও আমাদের সংগ্রহে আছে। ভবানী মিত্র রচিত ব্রাহ্মণ বন্দনার একটি পুঁথিও আমাদের সংগ্রহে আছে।

'মহারাষ্ট্র পুরাণ'

গঙ্গারাম রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র একটি পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। মহারাষ্ট্র পুরাণ প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতায় লেখা ইতিহাস। ইহার বর্ণনীয় বিষয় অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে বর্গীর উৎপাত ও উপদ্রব।

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণব সাধনা বিষয়ক নিবন্ধ

মুকুন্দরাম দাস নামক জনৈক অখ্যাতনামা ব্যক্তির রচিত নব্য বৈষ্ণবধর্ম সাধনা বিষয়ক একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় রহিয়াছে।

রঘুনাথ গোস্বামী রচিত (১) 'আত্মনির্ণয়' ও (২) 'প্রেমকল্পতরু'র পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। ইহা ছাড়া যুগল দাসের 'বৈষ্ণব আগম', বলরাম দাসের 'পাষণ্ড দলন', শ্রীনিবাস আচার্যের 'কাষিকা পটল', শ্রীকৃষ্ণদাসের 'বৃন্দাবন লীলা', শ্রীরূপের 'ব্রজতত্ত্ব নির্বর্ত', লোচন দাসের 'বৃহৎ নিগম', দামোদর দাসের 'রসকল্পসার', রত্ন দাসের 'ভজনতত্ত্ব কথা' ও বৈষ্ণব দাসের 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব'-এর পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। এছাড়া কৃষ্ণদাস রচিত 'বৃন্দাবন ধ্যান', 'দণ্ডাত্মিকা' ও 'নৃলোকসার-চিন্তামণি'-র পুঁথিও আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। বলা বাহুল্য এই সকল নিবন্ধ খ্রীষ্টীয় ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল এবং ইহাদের উৎস বা আকরস্থানীয় গ্রন্থ হইতেছে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', নরহরির 'হরিনামামৃত', 'ভক্তিরত্নাকর' ও শ্রীজীবের 'ষট্‌সন্দর্ভ'।

বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য ও বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের প্রচুর পুঁথি রহিয়াছে। স্বর্গত অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু সঙ্কলিত করিয়া 'সহজিয়া সাহিত্য' নামে একখানি গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়া যান। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে যথেষ্ট পরিমাণ সহজিয়া পদাবলী দেওয়া হইয়াছে এবং শেষদিকে সহজিয়া সাধনতত্ত্ব সংক্রান্ত তিনখানি পুঁথির বিষয়বস্তু, যেমন, 'আগমসার', 'আনন্দ-ভৈরব' ও 'অমৃতরসাবলী' মণীন্দ্রবাবু সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু সহজিয়া তত্ত্বের আরও কিছু পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে যেগুলি মণীন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এই পুঁথিগুলি হইতেছে 'অমৃত রত্নাবলী', 'সহজ কলিকা', 'সহজ পটল', 'সহজ পুঁথি', 'সহজতত্ত্ব', 'সহজতত্ত্ব-গ্রন্থ', 'সহজ উপাসনা', 'সহজবস্তু', 'সহজবস্তু তত্ত্ব-সার' ও 'সহজিয়া' শীর্ষকযুক্ত। 'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী' গ্রন্থে সহজিয়া তত্ত্বের উপর যে চারিখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের নাম যথাক্রমে 'আগমসার', 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরত্নাবলী' ও 'অমৃতরসাবলী'। এগুলি ব্যতীত বৈষ্ণব সহজিয়া অলঙ্কারের পুঁথিও আমাদের সংগ্রহ মধ্যে একাধিক আছে।

বৈষ্ণব রস ও অলঙ্কার সাহিত্য

রামগোপাল দাস বাংলায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রচার বিষয়ে পথিকৃৎ। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার জন্ম হয়। ১৫৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' নামক বৈষ্ণব রস-অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামক একটি বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই দুইজন লেখকই শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র ভাবাদর্শ আপন আপন রচনায় বজায় রাখিয়াছেন। আমাদের পুঁথিশালায় 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'র চারখানি পুঁথি রহিয়াছে। রামগোপাল দাসের অনুগামী রসময় দাসের 'কৃষ্ণভক্তিবল্লী' একখানি উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহার পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে। নারায়ণ দাসের 'উজ্জ্বলরসবিবরণ' প্রকৃতপক্ষে উজ্জ্বলনীলমণির ভাবানুবাদ। ইহার পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। এই জাতীয় রচনা আরও আছে, যেমন, জগন্নাথ দাসের 'উজ্জ্বলরস', শচীনন্দনের 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' এবং একাধিক অনামী লেখকের 'উজ্জ্বলনীলমণির' পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে আছে। নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা' বোধ হয় এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর এবং প্রায় তালিকার মতই। রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের 'অষ্টরসব্যাখ্যা' ও 'রসমঞ্জরী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক 'অষ্টরসব্যাখ্যা'য় অষ্টবিধ নায়িকার

CENTRAL LIBRARY

বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলী হইতে বিভিন্ন পদ উৎকলিত করিয়াছেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' কিন্তু ভানু দত্তের সংস্কৃত গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'র অনুবাদ নহে, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা। 'অষ্টরসব্যাখ্যা' ও 'রসমঞ্জরী'র ৫।৬ খানি পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় নরোত্তম দাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র ৯৬টি এবং তাঁহার প্রার্থনা বিষয়ক পদাবলীর ৩০টিরও অধিক পুঁথি আছে। অন্যান্য কিছু বৈষ্ণব সাধন বিষয়ক গ্রন্থের পুঁথিও আছে, যথা, 'ভক্তি উদ্দীপন', 'সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা', 'রসভক্তি চন্দ্রিকা', 'গুরুশিষ্য সংবাদ', 'উপাসনাতত্ত্ব', 'চতুর্দশ পটল', 'রাধারসকারিকা', 'নাম সঙ্কীর্তন', 'স্মরণ মঙ্গল' ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যেও নরোত্তম দাসের ভণিতাযুক্ত পদবন্ধ দেখিতে পাওয়া যদিও এই সকল গ্রন্থের পুঁথির রচয়িতা নরোত্তম দাস ব্যতীত অন্যান্য লোক। আমাদের সংগ্রহ মধ্যে অন্ততঃ ১৭ খানি এমন পুঁথি আছে যাহাদের মধ্যে অন্যান্য পদকর্তার পদের সঙ্গে নরোত্তমের দুই-একটি পদ রহিয়াছে। এরকম পুঁথি ছাড়াও নরোত্তম দাসের রচিত অথচ খণ্ডিত গ্রন্থের পুঁথিও অনেক রহিয়াছে।

পুরাণ-অনুবাদ

অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে সংস্কৃত পুরাণের সামগ্রিক ও আংশিক অনুবাদ বাংলায় করা হইয়াছিল। এই রকম অনুবাদের কিছু কিছু পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। পদ্মপুরাণান্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসারের' অনুবাদ দুইজনের কৃত পুঁথি আমাদের আছে। এই দুইজন অনুবাদকের নাম প্রাণনারায়ণ ও রামসুন্দর। রামসুন্দরের অনুবাদ মধ্যে মাধব-সুলোচনার কাহিনীটি আছে, প্রাণনারায়ণের অনুবাদে কিন্তু উহা নাই। বরাহপুরাণ অবলম্বন করিয়া নন্দকিশোর দাস 'বৃন্দাবনলীলামৃত' রচনা করেন। দ্বিজ বসুদেবের একাদশী মাহাত্ম্য বা একাদশ পাঁচালী নারদীয় পুরাণের অংশবিশেষ অবলম্বনে লেখা, ইহার একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। এই সকল অনুবাদকের নাম, শ্যামদাস দত্ত, মহাদেব দাস ইত্যাদি।

প্রহ্লাদ চরিত্রের অনুবাদের পুঁথি একাধিক পাওয়া গিয়াছে। অনুবাদক একাধিক, যেমন, কৃষ্ণদাস, কবিচন্দ্র, ভরত পণ্ডিত ও কবিশঙ্কর। কবিচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ছাড়াও 'উষাহরণ পালা'র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবিবল্লভ ও কেতকী দাসের অনূদিত 'উষাহরণ পালা'র পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। মুকুন্দদাস, গুণরাজ খান, কৃষ্ণদাস, ভক্তিদাস ও আনন্দদাসের লেখা 'অর্জুন সংবাদে'র একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহশালায় আছে। উৎকল খণ্ড অবলম্বনে রচিত জগন্নাথ বন্দনার একাধিক পুঁথি আমরা পাইয়াছি। এই সকল পুঁথি বিভিন্ন লেখকের লেখা, যেমন, রঘুনাথ দাস, দয়ারাম দাস, কৃত্তিবাস ও হরগোবিন্দ। গিরিধর দাস ও রসময় দাসের অনূদিত গীতগোবিন্দের পুঁথি আমাদের আছে। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন যে দুইজন তাঁহাদের নাম গোপাল দাস ও পরাণ দাস। তাঁহাদের অনুবাদ-সাহিত্যের একাধিক পুঁথি আমাদের সংগ্রহ মধ্যে রহিয়াছে।

বচন ও আর্যা

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সমালোচকের মতে প্রকীর্ণ বা প্রকৃষ্ট সাহিত্য বাংলা ভাষায় লিখিত হইবার পূর্বে যে লোক-সাহিত্য প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল তাহা (১) খনার বচন ও ডাকের বচন, (২) শুভঙ্করের আর্যা, (৩) দেবদেবী বিষয়ক শিশুদের উপযোগী কিছু গান, (৪) হেঁয়ালি, (৫) প্রবাদ-প্রবচন ও (৬) ধাঁধা ও ছড়া। এইগুলির মধ্যে আমরা পুরুষপরম্পরাক্রমে প্রচলিত কিছু খনার বচন ও ডাকের বচন, কিছু সংখ্যক আর্যা, কিছু হেঁয়ালি, ধাঁধা ও ছড়া পাইয়াছি। ইহাদের পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় আছে।

CENTRAL LIBRARY

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা যে যুগে ছাত্র ছিলাম, তাহা ছিল নবজাগরণের যুগ। তখন পুরাতন ভারত ভাঙিয়া নূতন ভারত গঠনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সময়েই কলিকাতায় প্রথম বেলগাছিয়া বে-সরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—একদল সহপাঠী তাহাতে যোগদান করিতে চলিয়া যান। পুরুষশ্রেষ্ঠ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস' বিষয়ে এম-এ ক্লাস খোলা হইয়াছে—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদানের জন্য এম-এ ক্লাসে ৯টি বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত পড়ানো হইতেছে। আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত অনার্স পাঠ করি—তাহা ছাড়া স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে পাঠ করি। আর্থিক অভাবের মধ্যে লেখাপড়ার সুযোগ হইত না—পরীক্ষা দিবার পূর্বে অনার্স ছাড়িয়া দিয়া পাস কোর্সে ১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিলাম। তখন ১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বর্গত পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের কাছে থাকি। তাঁহার গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ দেখাশুনা করি। তাঁহার গৃহে নিজস্ব ভাল পাঠাগার ছিল—দর্শন, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের বই বেশী ছিল। সকল বই-ই নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতাম। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, লোচন ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষার শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীমদ্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ সে সময়ে দেখিবার সুযোগ হয়।

পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ পল্লীরই অধিবাসী। তিনি আমাদের পরিচিত, কারণ আগড়পাড়ায় আমার প্রতিবেশী পূজনীয় ডাক্তার সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল—সুনীতিবাবু আমাকে সংস্কৃত অনার্সের কয়খানি বই কিনিয়া দিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার খবর তখনও প্রকাশিত হয় নাই—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আচার্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্নেহ ও কৃপার পাত্র ছিলাম – তিনি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার ১০।১৫ দিন পূর্বে আমাকে জানাইয়া দেন যে আমি পাশ করিয়াছি। পথে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা—তাঁহাকে পাশের খবর বলিলাম ও জানাইলাম সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পড়িব। তিনি হাসিয়া বলিলেন—'তাহা করিও না—আজই সকালে আমি সুশীলবাবুর বাড়ীতে (আচার্য শ্রীসুশীলকুমার দে) কলিকাতা গেজেট দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে নূতন বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দান সম্বন্ধে সকল খবর প্রকাশিত হইয়াছে'—বলিয়াই একটুকরা কাগজে সুশীলবাবুকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন এবং আমাকে সুশীলবাবুর বীডন রো'স্থ বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। সুশীলবাবুর সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত হইয়াছিলাম—তিনি পূজনীয় কুলদাপ্রসাদবাবুর বন্ধু, কুলদাপ্রসাদবাবুর গৃহে প্রায়ই যাইতেন। গেজেট দেখিলাম ও পরে জানিলাম, প্রতি অতিরিক্ত ভাষা গ্রহণকারী একজন করিয়া ছাত্রের এম-এ ক্লাসের বেতন লাগিবে না—অধিকন্তু মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পাওয়া যাইবে। প্রথম যাঁহারা অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তাঁহাদের তালিকায় সুনীতিবাবু ও সুশীলবাবু উভয়েরই নাম ছিল। তবে তাঁহারা উভয়েই সে সময়ে সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত চলিয়া যান—তাঁহারা মাত্র ২।১ দিন ক্লাসে আসিয়াছিলেন। সুনীতিবাবুর স্থলে স্বর্গত কোবিদ আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার (অন্ধ) এবং সুশীলবাবুর স্থানে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজির খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আমাদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রফুল্লবাবু ইংরাজি

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যের লোক হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আচার্য মজুমদারের যে কত গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা বলার ক্ষমতা নাই। তিনি বহুদিন পূর্বে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহা এত মধুর ও সরস করিয়া বলিতেন যে ক্লাসে ছাত্র-ধারণের স্থান থাকিত না। সংস্কৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ক্লাসের ছাত্ররা তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আসিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও মধুর ছিল—তিনি যখন সংস্কৃত কাব্য বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত হইয়া তাহা শুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতাম।

আমরা এম. এ ক্লাসে বহু সুধী ব্যক্তিকে অধ্যাপকরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। 'শিবাজী' ও 'পৃথ্বীরাজ' মহাকাব্য এবং মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত-লেখক আচার্য যোগীন্দ্রনাথ বসু আমাদের মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' পড়াইতেন। শৈশবে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম—কৈশোরে সেই প্রিয় কবিকে অধ্যাপকরূপে পাইয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধুসূদনকে তিনি কত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বহুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এম. এ ক্লাসে পড়াইবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম করিতেন ও বোধ হয় বয়সে প্রবীণ হইলেও তরুণ অধ্যাপকদের মত যতটা সম্ভব নিজেকে তৈয়ারী করিয়া আসিতেন। আমাদের দলে ভাল ছেলেও ছিল—উত্তরকালে তাহারা খ্যাতনামা অধ্যাপকরূপে পরিণত হইয়াছিল। কাজেই অধ্যাপকগণকেও সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইত। স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সে সময়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রের সহ-সম্পাদকের কাজ করিতেন ও শিবনারায়ণ দাস লেনে বাস করিতেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক উপন্যাস তাঁহাকে কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি আমাদের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পড়াইতেন। আমাদের পড়াইবার জন্য তিনি যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার লিখিত 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের পড়াইবার জন্যই তাঁহাকে ঐ সুবৃহৎ টীকা-পুস্তক রচনা করিতে হইয়াছিল। লোক চিনিয়া রাখার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রথম দিন নাম ডাকিয়া তিনি রোল-কল করিবার সময় সকলকে চিনিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দিন ক্লাসে আসিয়া রোল-কল করিলেন না। তৃতীয় দিন তিনি আসিতেই আমরা বলিলাম, স্যার, কাল আপনি রোল-কল করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন—আমি তোমাদের সকলকে চিনিয়া লইয়াছি। আর রোল-কল করার প্রয়োজন নাই। তোমরা আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারো। ৩।৪ জন সহপাঠী পর পর দাঁড়াইয়া উঠিতেই তিনি তাহাদের পূর্ণ নাম বলিয়া দিলেন, আমরা সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বহু প্রকার রন্ধনের বর্ণনা আছে। আমাদের সকলকে একদিন তিনি স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ সকল রান্না তরকারী দিয়া ভূরিভোজে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল দুর্লভ জিনিষ সংগ্রহ করিতে এবং 'ঘৃত দিয়া নালিতার পাতা ভাজা' প্রভৃতি করিতে তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি কত ছাত্রবৎসল ছিলেন, তাহা আজ স্মরণ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। আমাদের চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়াইতেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি-শালার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির পাঠোদ্ধার ও টীকা রচনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা—তাঁহার ছাত্রগণ—পরিষদ প্রকাশিত ৫০ টাকা মূল্যের গ্রন্থ মাত্র ১০ টাকায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনিও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ছাত্রদের পড়াইবার জন্য নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম

CENTRAL LIBRARY

করিতেন। স্যার আশুতোষ সারা বাংলাদেশ হইতে আমাদের অধ্যাপক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন—এই সকল অধ্যাপককে তিনি বৎসরে মাত্র তিনশত টাকা গাড়ীভাড়া দিতেন—কোন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব ছিল না। আমাদের পালি ও প্রাকৃত পড়াইতেন যথাক্রমে অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলেন্দ্রবাবু তখনও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী হন নাই—তিনি তখন বৌবাজার শাঁকারীটোলায় বাস করিতেন। তিনি আমার বাসগ্রাম-সন্নিহিত আঁড়িয়াদহের অধিবাসী—পরে টালা পার্কে নিজস্ব বাড়ী করেন। অধ্যক্ষ মুরলীধর আমার পূর্বপরিচিত, আমি সংস্কৃত কলেজে তাঁহার নিকট শিশুপালবধ (সাধারণ সংস্কৃত বিভাগে), নীতিশাস্ত্র (দর্শন বিভাগে) ও কিছুকাল সংস্কৃত অনার্সের ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার নিকট যে উৎসাহ ও স্নেহ লাভ করিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। বাহিরে তাঁহাকে গম্ভীর বলিয়া মনে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনা সরস ও ব্যবহার অতীব কোমল ও মধুর ছিল। আমাদের সময়ে স্যাডলার কমিশনের সদস্যগণের সহিত স্যাডলার সাহেব নিজে সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসেন। মুরলীধরবাবু তখন আমাদের শিশুপালবধ পড়াইতেছিলেন। শ্লোকের প্রথমাংশ ছিল 'উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈ'—তিনি এমন সুন্দর করিয়া তাহা ছাত্রদের বুঝাইলেন যে, স্যাডলার তাহা শুনিয়া মুরলীধরবাবুর অধ্যাপনার উচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মুরলীধরবাবুর পিতা আচার্য ধরণীধর খ্যাতনামা কথক ছিলেন এবং মুরলীধরবাবুর পুত্র শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস শুধু তাঁহার সহৃদয়তার সহিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নহেন, গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। এম-এ ক্লাসে অধ্যাপক অভয়কুমার গুহ আমাদের কিছুদিন সৌন্দর্যতত্ত্ব পড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বন্ধুবর হেমন্তকুমার সরকার তখন গবেষক ছাত্র—বিজয়চন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তিনি মধ্যে মধ্যে ভাষাতত্ত্ব পড়াইতে আসিতেন। চট্টগ্রামের কবি শশাঙ্কমোহন সেনও অল্প কিছুদিন আমাদের অধ্যাপক হইয়াছিলেন ও সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন। তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সে সময়ে আমাদের বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। তাঁহারই একান্ত আগ্রহে ও চেষ্টায় স্যার আশুতোষ অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হন—অর্থাৎ বিমাতার (ইংরাজি) গৃহে মাতার (বাংলা) স্থান দেন। দীনেশবাবু বাংলা এম-এ ক্লাসের শুধু প্রবর্তক ছিলেন না—প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করিয়া স্যার আশুতোষের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। লেখক এম-এ ক্লাসে গুজরাটী ভাষা পাঠ করিয়াছিল—তখন হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, তামিল, অসমিয়া, তেলুগু, কানড়ী, মালয়ালাম, মারাঠী, গুজরাটী, পস্তু প্রভৃতি বহু ভারতীয় ভাষার একটি বাংলার এম-এ পরীক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্য ছিল—অবশ্য পালি ও প্রাকৃত মূল-ভাষা হিসাবে সকলকেই শিক্ষা করিতে হইত। গুজরাটীর অধ্যাপক ডক্টর আই-জে-এস তারাপুরওয়ালা পার্শী, বোম্বাইবাসী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন—পুরা নাম ছিল ইরাক জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা। তাঁহার নিজের নাম ইরাক, পিতার নাম জাহাঙ্গীর, পিতামহের নাম সোরাবজী ও তারাপুর গ্রামের লোক বলিয়া তারাপুরওয়ালা। আমরা ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, ঐ সঙ্গে ডাকঘরের নামটি যোগ করিয়া দিলে পুরা ঠিকানা হইয়া যাইবে। তিনি বয়সে তরুণ, উৎসাহী ও সহৃদয় লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই সন্ধ্যায় তাঁহার ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাটবাড়ীর বাসায় যাইয়া পড়িতাম ও তাঁহাদের সহিত একত্র আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইতাম। পার্শী হইলেও তাঁহারা নিরামিষভোজী, কাজেই কোন অসুবিধা ছিল না। ৪০ বৎসর পরেও তাঁহার সুমধুর, স্নেহময় ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারি নাই।

CENTRAL LIBRARY

বাংলায় এম-এ নূতন খোলা হইল, আমরা প্রথম বর্ষের ছাত্র—তখনও বেশী ছাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা ১৫ জন ছাত্র ছিলাম। পরে সুখলতা ও সুধালতা দোয়ারা নাম্নী দুইটি অসমীয়া ছাত্রী আমাদের সঙ্গে পড়িতে আসিয়াছিল। সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর কলেজ ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপক হইয়াছেন। স্বর্গত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত আমাদের সহপাঠী ছিলেন বটে, কিন্তু ১৯২১ সালে আমাদের সহিত পরীক্ষা না দিয়া পরে এম-এ পাশ করেন ও কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বপতি একাধারে কবি, গল্প-লেখক, উপন্যাস লেখক, সমালোচক, শিল্প ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বহুগুণের অধিকারী, কিন্তু আলস্য তাঁহাকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রাপ্তির পথে বাধাদান করিয়াছে। ৺যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া সাবডেপুটী ও পরে ডেপুটী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করিতেন। শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া চট্টগ্রামে চলিয়া যান। তিনি চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত ডাঃ বেণীমোহন দাস ও কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাসের ছোট ভাই—নিজেও কংগ্রেস-নেতা। চট্টগ্রাম হইতে দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে শচীনন্দন পাল রাজসাহী নাটোরে ফিরিয়া গিয়া কয়লার ব্যবসা করিতেন, পরবর্তীকালে একবার নাটোরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অধ্যাপক ও সহপাঠীরূপে আরও কয়েকজনকে পাইয়াছিলাম, আজ দীর্ঘকাল পরে আর তাঁহাদের সকলের কথা মনে পড়ে না। যতীন্দ্রকুমার, অম্বিকাচরণ ও লেখক এক বৎসর কাল ৫০।৩ বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেসে বাস করিয়াছিল। সে সময় তথায় বহু এম-এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, অনেকে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি ১৯২০ সালের প্রথমেই শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহকারী রূপে দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করি। কাজেই এম. এ পড়া ও পুরাপুরি সাংবাদিকের কাজ করা একই সঙ্গে চলিয়াছিল। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের সভানেত্রীত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করি—রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং তখনকার দিনে তরুণ ব্যারিস্টারযুগল—বসন্তকুমার লাহিড়ী ও ইন্দুভূষণ সেন প্রধান কর্মকর্তা। তাহার পর ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে আবার কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল—সভাপতি পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। এবার সাংবাদিকরূপেই কংগ্রেসে যোগদান করি এবং প্রায় সর্বক্ষণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। এইভাবে কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়—গান্ধীজী সে আন্দোলনের নেতা ও স্রষ্টা। সমগ্র ভারতকে তাহা অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে ইতিহাসের কথা। তাহার ফলে আমাদেরও পাঠ্যজীবন কিছুকাল বন্ধ রহিল—আন্দোলনের তীব্রতা কাটিয়া গেলে বা আমাদের মন ভিন্নমুখী থাকায় ১৯২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৮ দিন এম-এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করিয়াছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের জ্ঞান, বিদ্যা, মনুষ্যত্ব, জীবনে সাফল্য প্রভৃতির কথা যতই লেখা যাক না কেন, তাহা সম্পূর্ণ করা যাইবে না। যে দেবতার নিত্যপূজা করি তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য কোন দিন হইবে কিনা জানি না—কিন্তু আচার্যগণের মধ্যে যে দেবত্ব দেখিয়াছি, আজ সেই আদর্শই জীবনপথের সম্বল হইয়া আছে। ['ভারতবর্ষ' (১৩৬৪) পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত]

CENTRAL LIBRARY

কাছের মানুষ দীনেশচন্দ্র

বিশ্বপতি চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তীর খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকাল আগেকার আমার সেই ছাত্রজীবনের কত ভুলেযাওয়া পুরাতন স্মৃতি নূতন করে আবার মনের পর্দায় ছায়াছবির মত ফুটে ফুটে উঠছে, আর সেই সঙ্গে বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই মানুষটিকে, যাঁর হস্তচিহ্ন আমাদের এই বাংলা বিভাগের ভিত্তিমূলে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

কত কাছেই না পেয়েছিলাম আমরা এই মানুষটিকে। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী দীনেশচন্দ্রকে নয়, আমাদের অর্থাৎ তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রদের অত্যন্ত কাছের মানুষ এই দীনেশচন্দ্রকেই আজ আমি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের সামনে যতটা পারি তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

এতদিন পরে আজও বেশ মনে পড়ে সেদিনের কথা। দীনেশবাবু ক্লাসে পড়াতে পড়াতে একদিন বললেন—'কোন ভালো কীর্তনিয়ার কণ্ঠে গান হিসাবে না শুনলে বৈষ্ণবপদাবলীর সত্যকার রসমাধুর্য ঠিক পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না।'

আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসলাম—'তাহলে স্যার একদিন কাছেপিঠে কোথাও কীর্তনের আসর বসাবার ব্যবস্থা করুন।' দীনেশবাবুও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই আসরের ব্যবস্থা হয়ে গেল। পটুয়াটোলার বাঁড়ুয়োদের উঠোনে বসল আসর। বিখ্যাত কীর্তনিয়া গৌরদাস বাবাজীকে এনে হাজির করলেন দীনেশবাবু।

আসর সেদিন খুবই জমেছিল এবং বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতরকার আসল রস আমরা সেদিন সত্যই প্রাণভরে উপভোগ করেছিলুম।

তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে জেনে দীনেশবাবুর সেদিন কি আনন্দ! তাঁর সেইসময়কার আনন্দোজ্জ্বল মুখের ছায়াছবি আজ যেন আবার নূতন করে মনের পর্দায় জেগে উঠছে।

ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন দীনেশবাবু। একদিনের একটি মজাদার ঘটনার কথা আজও ভুলতে পারি নি।

আশুতোষ বিল্ডিংয়ের তিনতলার হলে সেদিন কি একটা সাহিত্যসভার আয়োজন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকেরা এই সভায় যোগদান করেছেন। দীনেশবাবু উঠেছেন বক্তৃতা দিতে। তাঁর বক্তৃতার বিষয়টা যে কি ছিল তা আজ মনে পড়ছে না। কেবল এইটুকু মনে পড়ছে যে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বারবার মহাকবি কালিদাস এবং সেক্সপিয়ারের কথা তিনি উল্লেখ করছিলেন। এর মধ্যে মজার কথাটা এই যে, যতবার তিনি সেক্সপিয়ারের নাম উচ্চারণ করছিলেন, ততবারই 'সেক্সপিয়ার' না বলে তিনি বলছিলেন 'সেক্ষপীর' এবং যখনই তিনি ঐভাবে উচ্চারণ করছিলেন, তখনই অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ত বটেই অধ্যাপকেরাও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিলেন।

আমাদের তখন যা মনের অবস্থা হয়েছিল সে আর কি বলব! অপমানে, লজ্জায় আমাদের একেবারে ঘাড় হেঁট। দীনেশবাবুর ওপর তখন যা রাগ হচ্ছিল সে আর বলবার নয়।

CENTRAL LIBRARY

দীনেশবাবুর বক্তৃতা শেষ হল।—এইবার তাঁর বসবার পালা; কিন্তু তখুনি না বসে এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন—'এর পরও আমার একটা কথা বলবার আছে। সে কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি আমার বক্তৃতার মধ্যে যখনই সেক্সপিয়ারকে 'সেক্ষপীর' বলে উচ্চারণ করেছি, তখনই লক্ষ্য করেছি, আমার শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রূপের হাসি হাসছেন। তাঁদের আমি আর কিছু বলতে চাই না, শুধু এইটুকু বলেই আমার কথা শেষ করতে চাই যে, সেক্সপিয়ারকে 'সেক্ষপীর' বলে উচ্চারণ করতে শুনে তাঁরা ত খুব হাসাহাসি করলেন, কিন্তু সাহেবরা যখন আমাদের গঙ্গাদেবীকে গ্যাঞ্জেস্ বলে উচ্চারণ করে অথবা আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতকে স্যাংস্কৃট্ বলে উচ্চারণ করে, তখন ত কোন মিঞার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠতে দেখি না।'

এতক্ষণে আমরা বুঝলুম, দীনেশবাবু আগে থেকে মৎলব করেই ওরকমভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। এরপরে আমরা সেদিন যে ভাবে প্রাণ খুলে হো হো করে হেসেছিলাম, তাকে উচ্চহাস্য না বলে জয়োল্লাস বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।

আর একদিনের আর একটি ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনাটির ভিতর দিয়ে আমরা সেদিন দীনেশবাবুর ভিতরকার আসল মানুষটিকে যেন খুঁজে পেয়েছিলাম।

ঘটনাটার কথা এইবার খুলে বলি।—প্রতিদিন বিকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ছুটি হয়ে গেলে আমরা অর্থাৎ ছাত্রের দল যখন ভিড় করে সিঁড়ি দিয়ে নাবতাম, তখন প্রায়ই দেখা যেতো, দীনেশবাবু আমাদের বাংলা বিভাগের অন্যতম বেয়ারা মোহনের কাঁধে হাত দিয়ে পরমানন্দে গদগদভাবে গল্প করতে করতে আমাদের আগে আগে চলেছেন। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতো। এটা আমাদের খুব খারাপ লাগতো। দীনেশবাবুর কিন্তু ওদিকে আদৌ নজর নেই।

একদিন থাকতে না পেরে দীনেশবাবুকে বললুম, 'দেখুন স্যার, ওরকম করে মোহনের কাঁধে হাত দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আর নাববেন না। ও নিয়ে সবাই বড্ড হাসাহাসি করে। ঘরের ভেতর আপনি যা খুসি তাই করুন, বাইরে সবার সামনে ওরকমটা আর করবেন না।'

আমার কথা শুনে দীনেশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠে একটু হেসে বললেন, 'তবে শোন বিশ্বপতি, আমি যখন খুব ছেলেমানুষ, তখন আমাদের দেশের বাড়ীর দাওয়ায় বসে আমার বাবা আর ঐ মোহনের বাবাকে দিনের পর দিন গল্প করতে আর দাবা খেলতে দেখেছি।—সে সব কথা কি করে ভুলি বল!' তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'আচ্ছা, তুমি যখন অত করে বলছ, তখন কাল থেকে আর ওভাবে সিঁড়ি দিয়ে নাববো না।' তাঁর এইকথা শুনে সেদিন যে কি অপ্রস্তুতে পড়েছিলুম তা আর কি বলব!

সত্যই কি চমৎকার মানুষ ছিলেন আমাদের এই দীনেশবাবু! তিনি যে একজন অতবড় জ্ঞানী গুণী এবং পদস্থ ব্যক্তি, তা তাঁর চাল-চলন, কথাবলার ভঙ্গি এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কোনদিন এতটুকু বোঝা যেত না। বাইরে থেকে দেখে বা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে একজন অর্ধশিক্ষিত অতি সাধারণ নিরীহ পল্লীবাসী ছাড়া আর কিছুই মনে হোত না। এমন সরল নিরহঙ্কার আত্মভোলা মানুষ এ সংসারে সত্যই দুর্লভ।

আজ তারই হাতেগড়া এই বাংলা বিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে তাঁর একজন স্নেহধন্য ছাত্ররূপে তাঁকে মনে মনে নতমস্তকে বারবার আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

CENTRAL LIBRARY

সুবর্ণজয়ন্তীর উৎস-সন্ধানে

জনার্দন চক্রবর্তী

প্রসিদ্ধি আছে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন হয়েছিল। পদকল্পতরু-ধৃত একাধিক বৈষ্ণব পদে এই প্রসিদ্ধি সমর্থিত হয়েছে। 'দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল'। বলা হয়েছে, ভাগীরথী-তীরে প্রাচ্যখণ্ডের এই দুই শ্রেষ্ঠ রসিকের সাক্ষাৎকার ও অভাবনীয় ভাব-বিনিময় হয়েছিল। মানুষের মতো মানুষ দু'জনের মিলনে অঘটন ঘটে, অপ্রত্যাশিত বাস্তব হয়ে ওঠে। ইতিহাস বহুবার এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। কুরুক্ষেত্র ঐতিহাসিক ব্যাপার হ'লে ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথির সঙ্গে পার্থ মিলিত হয়েছিলেন। তার ফলে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' ভারত-মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শুধু তা নয়, মানুষের অন্তর্লোকে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে পাবনী ধারা বয়ে গিয়েছিল। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মিলিত হয়েছিলেন, তাতে মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তেমন বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস, জয়দেব ও লক্ষ্মণসেন, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ মিলিত হয়েছিলেন। এমন কত মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটে গিয়েছে, যার সুদূরপ্রসারী ফল ভারতজিজ্ঞাসুর অবিদিত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মিলন তেমন একটি যোগ। একজন এদেশে বিশ্ববিদ্যার বিধাতা। আর একজন 'সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী' মায়ের আত্মহারা ভক্ত সন্তান। এঁদের মিলনে মন্ত্রশক্তির কাজ করেছিল 'বন্দে মাতরম্'। অলক্ষ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের সুবর্ণ-জয়ন্তীর আমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের চিন্তাধারা অনিবার্যভাবে এই পথরেখা ধরে বইছে। কেন, তার একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করব এই স্মৃতিকথার মাধ্যমে। আমরা জানি, আজকার নৈর্ব্যক্তিকেরা ব্যক্তিপূজার অর্ঘ্যপ্রদানে আপত্তি জানাবেন। শিশুপালের নিন্দা কোনদিন শুরু হবে না। কালাপাহাড়ের ধ্বংসক্রিয়াও নিরন্তর বয়ে চলবে। এই বাটে যাঁদের আনাগোনা তাঁদের মধ্যে একজন পুরোনো বহিরঙ্গ সেবক সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে আহূত হয়ে এই 'কেন'র একটা জবাব দিয়ে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে চাইলে তা ক্ষমার অযোগ্য বিবেচিত হবে না, আশা করি।

আজকার দেশবাসীর আত্মবোধে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে আন্তর্জাতিকতার অভিমান, সাংস্কৃতিক-ভাষায় যার নাম বিশ্বমানবতা। সেই অনুপাতে সেখানে বাংলা ও ভারতের স্থানসঙ্কোচ হয়েছে। সেইজন্যে গোড়াতেই দোহাই দিলাম 'স্মরণীয় যাঁরা, বরণীয় যাঁরা' এমন চারজন বাঙালীর, ভাব-কলেবরে একই সঙ্গে, একই কালে, যাঁরা ছিলেন বাঙালী, ভারতীয় ও বিশ্বমানব, সর্বান্তঃকরণে জীবনসাধনায় যাঁরা অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক বহুমুখিতা ও বহুরূপিতার গুরু দায়িত্ব। কোনও ভাব-সঙ্কট বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি তাঁদের মনুষ্যত্বের এই ত্রিবেণীস্নানে। তাঁরা ছিলেন মহামানব। তাঁদেরই উত্তরসাধক আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্র।

প্রথমে বিদ্যাসাগর। টোলের পড়ুয়া, অথচ মানবতার মহাসাগরের হাওয়ায় মানুষ। ব্যাস-বাল্মীকি, মনু-পরাশর, কালিদাস-ভবভূতির সুসঙ্গ-লালিত অথচ ইংরেজ ও ইংরেজির আওতায় স্বচ্ছন্দচারী দৃপ্ত পুরুষসিংহ। একই ব্যক্তি 'বিদ্যার সাগর' ও 'করুণার সিন্ধু'। 'ভারতীয় ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের সাহস ও বাঙালী মায়ের প্রাণ' একই পৌরুষবিগ্রহে। বালবিধবা, স্বামি-সৌভাগ্যবঞ্চিতা কুলীনকন্যা ও বালিকা-বধূর চোখের জলে বিচলিত সমাজ-

CENTRAL LIBRARY

সংস্কারক, ভগবতী-মায়ের ডাকে অধীর অনুগত সন্তান, বাংলা বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক রীতির উদ্ভাবনে, সংস্কৃতশিক্ষার ভিত্তিস্থাপনে, ইংরেজি-অনুশীলনের প্রয়োজনবোধে, সীতা-শকুন্তলার নারীমহিমার অনুচিন্তনে, আদর্শ বাংলা গদ্যরীতির প্রবর্তনে আগ্রহী অদ্ভুতকর্মা বিদ্যাসাগর। পায়ে চটিজুতা, গায়ে চাদর, গলায় উপবীত। পথিপার্শ্বে বিসূচিকায় আক্রান্ত হরিজনের নিদানবন্ধু, লাট-হ্যালিডে-ভবনে স্বাধীনচেতা মর্যাদাপরায়ণ অতিথি, অনাহূত অভ্যাগত শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে সরস দৈন্যবিনয়ে বিগলিত বিদ্যাসাগর।

এরপরে বঙ্কিম, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-বঙ্কিম। সপ্তকোটি কণ্ঠের কলকলনিনাদে যাঁর মন্ত্রের উৎসার, কেদার-বদ্রি হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত উপমহাদেশের সুপ্তিভঙ্গে তাঁর মন্ত্রের বিনিয়োগ। 'বঙ্গদর্শন'-প্রতিষ্ঠায় 'বাংলার ইতিহাস', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাঙালীর বাহুবল', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রভৃতি আলোচনায় যাঁর বলিষ্ঠ বঙ্গাভিমুখী মনন অনুস্যূত, আবার 'কৃষ্ণচরিত্র'-অনুধ্যানে, জ্ঞান-কর্ম-প্রেমের সর্বভারতীয় পূর্ণতম মনুষ্যবিগ্রহের মনীষা-দীপ্ত উপস্থাপনায় তাঁর অখণ্ড অভিনিবেশ। মানসদুহিতা মতিবিবি-শৈবলিনী কুন্দ-রোহিণীর প্রতি কণ্টককেত্রবর্ষী দেবতার মেঘের মতো যাঁর বিগলিত করুণা, আবার সতীলক্ষ্মী ভ্রমর-সূর্যমুখী, দলনী-আয়েষা, প্রফুল্ল-লবঙ্গলতার কাছে তিনি পৌরাণিক ঋষির মতো 'প্রণতিনম্র-শিরোধরাংস'। আনন্দমঠের বীর সন্ন্যাসি-সন্তানসম্প্রদায় এবং হেমচন্দ্র-ভবানী পাঠক-প্রতাপ-মীরকাসিমের যিনি কল্পপিতা, ক্ষুধার্ত বিড়ালের আর্তনাদে উৎকর্ণ, বুভুক্ষিত সর্বহারার নির্ভীক অন্তর্যামী বন্ধু সেই একই বঙ্কিম।

বঙ্কিমের কবি-অগ্রজন্মা মধুসূদন। যাঁর সম্বন্ধে সারস্বত অনুজ বঙ্কিমের উপলব্ধি, 'জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লিখ শ্রীমধুসূদন।' হোমর-ভার্জিল দান্তে-ত্যাসো পেত্রার্কা-মিল্টনের ভাব-সহোদর, বিশ্ব সারস্বত-সংঘের অদ্বিতীয় বহুভাষাবেত্তা, বহুসাহিত্য-রসিক, কবি শ্রীমধুসূদন। 'বাল্মীকি হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি', 'ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি ভারতীর, কালিদাস সুমধুর-ভাষী', 'শ্রীভর্তৃহরি', 'সুরী ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ', 'মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি মনোহর', 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার', এই 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে' 'দূরতীর্থ দরশনের', সীতাতীর্থ দর্শনের অভিলাষী কবি-অভিযাত্রী মধুসূদন, যাঁর গীতময় কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল অশ্রুতপূর্ব সতীস্তোত্র, 'আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি দশদিশ', 'সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে, গোধূলিললাটে আহা, তারারত্ন যথা', 'যথা গো-মুখীর মুখ হইতে সুস্বনে, ঝরে পূত বারিধারা', ফরাসী-প্রবাসের দুর্দিনে 'সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ', 'সু-বঙ্গ-মণ্ডল', 'গৌড়-সুভাজন'-স্মরণে যিনি 'শ্যামা জন্মদা'র আরাধনার গুচ্ছ গুচ্ছ নব নব গীতোপচারের উদ্ভাবন করে অশ্রুত 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রের অস্ফুট ঝঙ্কার তুলেছিলেন। চতুর্দশপদীর একটি গুচ্ছে সাজানো যায় 'বঙ্গভাষা, 'কৃত্তিবাস', 'হে কাশী, কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্', 'কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ', 'কমলে কামিনী', 'শ্রীমন্তের টোপর', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'ঈশ্বরী পাটনি', 'ঈশ্বর গুপ্ত', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। দ্বিতীয় গুচ্ছে, 'ভারতভূমি', 'পরিচয়', 'আমরা', 'সংস্কৃত', 'বাল্মীকি', 'রামায়ণ', 'সীতাদেবী', 'সীতা বনবাসে', 'শকুন্তলা', 'পুরূরবা', 'সুভদ্রা', 'মেঘদূত', 'কুরুক্ষেত্রে', 'গোগৃহ-রণে', 'হিড়িম্বা', 'দুঃশাসন', 'শিশুপাল', 'কিরাতার্জুনীয়ম্', 'করুণরস', 'শৃঙ্গাররস', 'জয়দেব' 'ব্রজবৃত্তান্ত'। তৃতীয় গুচ্ছে, 'কবিগুরু দান্তে', 'কবিবর আলফ্রেড টেনিসন', 'পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ড ষ্টুকর', এমন আরও কত গুচ্ছ, কত স্তবক। 'বিফল তপ' এবং 'অবরণ্যে-বরণ'-এর ব্যর্থতার অবসানে, স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠার আত্ম-প্রসাদ, 'পাইলাম কালে, মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে'। অসমাপ্ত পূজার অন্তর্ভেদী হাহাকার 'সমাপ্তে', 'নারিনু মা তোমারে চিনিতে'। একই সঙ্গে বাঙ্গালী, ভারতীয় ও বিশ্বমানব কবি-শ্রীমধুসূদন।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বমানবতার অবিসংবাদিতভাবে আদি ও শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা, আন্তর্জাতিকতার অধ্যাত্ম-

CENTRAL LIBRARY

সংকেতবাহী কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। 'ভুবন-মনোমোহিনী' 'জনক-জননী-জননী' এবং 'নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'র ভক্ত সন্তান। একদিকে 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট-মারাঠা দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ, বিন্ধ্যহিমাচল যমুনা-গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গে'র মহিমায় উদ্বেল, অপরদিকে 'বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা, সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান' প্রার্থনায় মুখর। 'ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে'—এই মাতৃ-সাক্ষাৎকারের পশ্চাৎপটে রয়েছে, 'ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর', 'হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে, উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে', 'হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। ভারত-উপমহাদেশে, 'বাংলাদেশে' সেদিন যে অঘটন ঘটে গেল, বিশ্বনাশী কুলিশপাণি বিশ্বশক্তি-নিবহের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে মাতৃমন্ত্র যে অভাবিত বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে বঙ্গভাষাভাষী একটি বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জন করল তাতে কি সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে, প্রাণপ্রমাথী মাতৃসঙ্গীতের দুর্ধর্ষ শক্তি কতখানি। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'—কে ভাবতে পেরেছিল, শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত একটি স্বল্প-অনুশীলিত গীতের অন্তরে এতখানি সম্ভাবনা নিহিত ছিল? 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' এ-যে অপরোক্ষানুভব-লব্ধ সত্যের সাক্ষাৎকার, ভারত-বাংলা-বিশ্ব এই তিনের এ-যেন এক অভিনব অচিন্ত্যভেদাভেদ। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী এবং 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'। ভারতচন্দ্রের শ্লেষাশ্রিত কবি-ভাষায় 'যে ভজে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে, ভারতে নাহি এই খেদ।'

মনীষী আশুতোষ ভারতে বিশ্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠাকল্পে ভাবের এই ত্রিস্রোতোগায় পুণ্যস্নান করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংকীর্ণপরিসর বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি মেনে নিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায় পারঙ্গম এই তীক্ষ্ণধী ব্যবহারাজীব এশিয়া খণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়-গঠনে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা ও দুর্জয় কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রতিষ্ঠা। কলা ও বিজ্ঞানের পৃথক্‌করণ ও স্বতন্ত্র অনুশীলন এবং গবেষণা-প্রবর্তন। এতদিন শুধু পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্ররূপে কাজ করেছিল যে প্রতিষ্ঠান তা এখন উন্নততর স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন এবং সম্প্রসারিত কলা ও বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার পরিচালনাভার গ্রহণ করল। সংস্কৃতে কাব্য ব্যাকরণ বেদ বেদান্ত সাংখ্য ন্যায়-বৈশেষিক প্রাকৃত প্রভৃতি নানা শাখা, বৌদ্ধ পালি সাহিত্য, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, আরবী, ফার্সী, গণিত রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানের নানা শাখা, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, ভূগোল, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি নবোদ্ভিদ্যমান বিজ্ঞানশাখার অনুশীলন ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। একটি মানুষের ঐকান্তিকতার যাদুস্পর্শে ঘোষ-পালিত-গয়রা-দ্বারবঙ্গের দানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। আত্মবিলোপী সমাহিত বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন আশুতোষের আবিষ্কৃত মাদ্রাজী আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানবীর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ এবং কৌমার্যব্রতধারী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানজসন্তান জ্ঞানচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ মেঘনাদ নীলরতন শিশিরকুমার প্রমুখ নব্যভারতের দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানি-সংঘ, যাঁরা বঙ্গের বাহিরে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানসাধনা প্রসারিত করেন। আশুতোষের আমন্ত্রণে-আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ, দাক্ষিণাত্যের দর্শনাচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, মহারাষ্ট্রীয় ভারতৈতিহাসিক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বহুভাষাবেত্তা ভাষাবিজ্ঞানী পার্সী ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা। অর্থশাস্ত্রবেত্তা মনোহরলাল, গাণিতিক কালিশ, বহুশ্রুত অধ্যাপক হেনরী স্টীফেন, প্রতীচ্য কলাবেত্রী স্টেলা ক্রামরীশ, ফার্সী-পণ্ডিত আগা কাজিম সিরাজী, আরবী ও ঐস্লামিক শাস্ত্রবিশারদ

CENTRAL LIBRARY

আবদুল্লা সুরাবর্দী, দ্রাবিড়ী মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, আয়েঙ্গার ও রামচন্দ্রম্, জাপানী কিমুরা, সিংহলী শ্রমণ সিদ্ধার্থ।

এঁদের সঙ্গে সহযোগিরূপে যোগ দিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দ। ইংরেজিতে হেরম্বচন্দ্র হরেন্দ্রকুমার জয়গোপাল রজনীকান্ত প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনারায়ণ জ্ঞানরঞ্জন জিতেন্দ্রলাল সুনীতিকুমার সুশীলকুমার শ্রীকুমার অপূর্বকুমার মোহিনীমোহন। সংস্কৃতে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ গুরুচরণ কালীপ্রসন্ন মুরলীধর আশুতোষ রাজেন্দ্রনাথ শিতিকণ্ঠ বহুবল্লভ পশুপতিনাথ প্রভাতকুমার কোকিলেশ্বর সকলনারায়ণ। পালিতে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বেণীমাধব নলিনাক্ষ শৈলেন্দ্রনাথ। অর্থনীতিতে প্রমথনাথ বিনয়কুমার সতীশচন্দ্র দুর্গাগতি কয়াজি। দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র হীরালাল আর্কুহার্ট আদিত্যনাথ খগেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ হরিদাস সরোজকুমার। গণিতে হরিদাস বিভূতিভূষণ সতীশচন্দ্র ইন্দুভূষণ সুরেন্দ্রমোহন। ইতিহাসে র‍্যামস্‌বটম্ হেমচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ ত্রিপুরারি। আরও কত বিষয়ে কত দিক্‌পাল। মনীষি-সমাগমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যানিকেতনে পরিণত হল। বাঙালীয়ানার দরদী কবি গাইলেন, 'হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নবনালন্দা শিক্ষাগেহ, দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষিমাতার স্নেহ'। মার্কিন স্থাপত্যের সর্বনাশা প্রভাবে বিলুপ্ত সিনেট হল সেদিন পাগড়ী-ফেজ-হ্যাট-টুপি-নেকটাইয়ের সঙ্গে শিখা-ত্রিপুণ্ড্রক-তিলক-উত্তরীয়-উপবীতের নয়নমনোবিমোহন শোভায় শোভিত হ'ল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত, বিশ্ববিদ্যার আদান-প্রদান-রত গুরুশিষ্যমণ্ডলীর ঐকতানে অধুনা বিলুপ্ত বিশাল সৌধটি গৃহবলিভুক্ বায়সসমাকুল চৈত্যবৃক্ষের মতো মুখরিত হয়ে উঠত।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিভাগের সূচনা হল যাঁর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিশ্চয়ই এই উপলক্ষ্যে বাংলা বিভাগের সুযোগ্য বিভাগীয়-প্রধান সঙ্কলন করছেন এবং যা আমাদের এই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার আয়ত্তসীমার বাইরে। বিমাতৃ-মন্দিরে মায়ের আসন পাতা হ'ল। দ্বারভাঙ্গা ভবনের দ্বিতীয় তলে প্রতিষ্ঠিত আশুতোষের মর্মরমূর্তির অধোদেশে উৎকীর্ণ ইংরেজিভাষায় বিরচিত দু'টি পংক্তিতে এই কথাটিই আভাসিত হয়েছিল **'The noblest of his achievements, the surest of all : The place of his Mother in the Step-Mother's Hall.'** মায়ের সন্তানেরা অসহিষ্ণু হয়ে এই বাণী ও মূর্তি বিলুপ্ত করেছেন। আশুতোষ সারা জীবন হাসিমুখে যেমন এঁদের সব আবদার মিটিয়ে গিয়েছেন তেমন, জীবনের পরপার থেকেও আজ সইবেন তাঁদের সমস্ত দাপট, যদি তাঁরা শিলামূর্তি চূর্ণ করে তার পরিবর্তে তাঁর চিন্ময় বিগ্রহ স্থাপন করতে পারেন বহুধা-বিচ্ছিন্ন আত্মঘাতী জাতির অন্তর্লোকে। যা বলছিলাম, বাংলার এম. এ. পঠন-পাঠনই প্রবর্তিত হল ১৯১৯ এ, আমাদের মতো কত পতিত অধমের পরিত্রাণের ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু নব-প্রবর্তিত বিষয় ও বিভাগের নাম দেওয়া হ'ল ভারতীয় ভাষাসমূহ, **Indian Vernaculars**, শুধু বাংলা নয়। বাংলার সঙ্গে আরও বারোটি ভারতীয় ভাষা, হিন্দী উর্দু মৈথিল অসমিয়া ওড়িয়া মারাঠি গুজরাতি তামিল তেলেগু মালয়ালি কানাড়ী সিংহলী। তত্তদ্‌ভাষা-ভাষী বিভিন্ন বিষয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা নিজ নিজ মাতৃভাষা পড়াবার দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। যেমন গুজরাতি ভাষা পড়েছি আমি ডাঃ তারাপুরওয়ালার পাদদেশে বসে। বাংলার এম. এ. পড়তে হলে অপর বারোটি ভারতীয় ভাষার যে-কোনও একটি ভাষা পড়তে হ'ত, যাতে থাকত দু'টি পত্র (পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র)। সেই সঙ্গে মৌল ভাষা হিসেবে পড়তে হ'ত পালি প্রাকৃত ও ফার্সী-এর মধ্যে যে-কোনও দু'টি। বলা বাহুল্য আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষাবিনিময়ের মাধ্যমে ভাবসংহতি গঠন এবং অখণ্ড ভারত-সংস্কৃতির ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা আশুতোষ দীনেশচন্দ্র ও অপরাপর প্রকল্প-রচয়িতার অভীপ্সিত লক্ষ্য ছিল। আমাদের আত্মবোধের উদ্বোধনে বাংলা ভারত ও বিশ্ব, তিনই চাই, এই স্বপ্নের সাংস্কৃতিক সত্যরূপ তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

বিগত শতকের শেষ দশকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের স্বল্পবেতনভোগী প্রধান শিক্ষক, ইংরেজি-অনার্স গ্রাজুয়েট দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা পুঁথিখোঁজায় মজেছিলেন। এই একই অধ্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন ভারতবিদ্যার পিতামহকল্প পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চট্টগ্রামের মুনসী আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ), বীরভূমের শিবরতন মিত্র এবং আরও অনেকে। নিজে এবং পুঁথির ঘাটিয়ালদের সাহায্যে রাশি রাশি কীটদষ্ট চন্দন-লিপ্ত জীর্ণ লুপ্তাক্ষর পুঁথি সংগ্রহ করে প্রাচীন স্বল্পপরিচিত ও অপরিচিত কবিদের রচনা ও ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে দীনেশচন্দ্র অশ্রান্তভাবে অজস্র প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন তখনকার 'ভারতী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। মনীষী হরপ্রসাদ *Calcutta Review* পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে এই সত্যকার মহাগ্রন্থকে অভিনন্দিত করলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের '*Calcutta Review* পত্রিকায় **'The Discovery of our Literary Heritage'** প্রবন্ধে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংকলনের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মুখেই শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকপদ লাভে কিছু অর্থাগম হ'তে পারে এই প্রত্যাশা নিয়ে অর্থসংকটের দুর্দিনে শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি কোলকাতায় আশুতোষের সঙ্গে দেখা করেন। গণিত ও বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য এই মনীষী ব্যবহারাজীব তখন সিনেট-সিণ্ডিকেটের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। সেই সাক্ষাতে তিনি দীনেশচন্দ্রের নাম শুনেই তাঁর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত সারস্বত কর্মের উল্লেখ করে জীবনসংগ্রামজর্জর সাহিত্যিক-শিক্ষককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। দীনেশচন্দ্রের সাক্ষাৎকারে সদ্য কোনও লাভ হ'ল না। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর ডাক পড়ল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে গবেষণামূলক বক্তৃতা দেবার জন্য। তাঁরই জন্য যাচ্ঞালব্ধ (**Lahiri's Select Poems'**-এর আয় থেকে) অর্থে রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ পদের সৃষ্টি হয়েছে। দীনেশচন্দ্র এই নবসৃষ্ট পদে প্রথম পদস্থ হলেন। এই পদগ্রহণ করে দীনেশচন্দ্র যে অতন্দ্র সাধনায় সমাহিত হলেন তার সুদূরপ্রসারী ফল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা। তারই ক্রমবিবর্তিত ফল বাংলাসাহিত্য-সাক্রান্ত তাঁর ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থরাজির প্রকাশ। *History of Bengali Language and Literature, History of Mediaeval Vaisnava Literature, Chaitanya and His Companions, Chaitanya and His Age, Bengali Ramayanas, Folk Literature of Bengal, Development of Bengali Prose Style, Glimpses of Bengal Life,* 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়' (প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে সুবৃহৎ সঙ্কলন দুই খণ্ডে), 'মৈমনসিংহ গীতিকা', *Eastern Bengali Ballads*, 'বৃহৎ বঙ্গ' (২ খণ্ড) ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসাশ্রিত গবেষণামূলক গ্রন্থরাজি দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার একটি বিশেষ দিক। দীনেশচন্দ্র নিতান্তই বাঙালী ও বাঙাল ছিলেন, শেষোক্ত পরিচয়ের সমগ্র গৌরব বহন করবার চরিত্র ও সাধনা তাঁর ছিল। বাংলা ভূখণ্ডের ভৌগোলিক চতুঃসীমার বাইরে সারা জীবনে হয়ত তিনি কটি দিনের বেশি অবস্থান করেন নি। বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে অশ্রান্ত লেখনীচালনা তাঁর ডান হাতের আঙুলে স্থায়ী কালির ছাপ ফেলেছিল। মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাঁর অনুরাগী ছাত্র বন্ধু-শ্যামাপ্রসাদ এ-কথা বলেছিলেন। 'প্রেম একবার মাত্র পৃথিবীতে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে।' মহাপ্রভু সম্পর্কে এই মহাবাক্য তাঁরই আবেগ-কম্পিত লেখনীমুখে উৎসারিত হয়েছিল। বাঙালীর বৈষ্ণব-প্রাণতার অভিব্যক্তিতে তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনার পরিমাণ কম নয়। মুক্তাচুরি, রাগরঙ্গ, কানু-পরিবাদ ও শ্যামলী-খোঁজা, রাখালের রাজগি, সুবলসখার কাণ্ড, পদাবলী-মাধুর্য প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার আরও একটি দিক্ আছে,

CENTRAL LIBRARY

ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতির মর্মগ্রাহী বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা রূপে। গুরুগৃহে অবস্থানকালে দেখেছি, সময় পেলেই তিনি আবৃত্তি সহকারে বাল্মীকি-রামায়ণের উন্নতকবিত্বপূর্ণ অংশগুলি পড়ে যেতেন। তাঁর 'রামায়ণী কথা'র সমকক্ষ বই বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। এই বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁকে 'ভক্ত-পূজারি' এবং নিজেকে আরতিকালের ঘণ্টাবাদক বলেছেন। দীনেশচন্দ্রের এই পূজাকে তিনি প্রকৃত সমালোচনা বলেছেন। নিখিল-ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তিনি অজস্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সতী, বেহুলা, জড়ভরত, ধরাদ্রোণ, কুশধ্বজ এক সময়ে এক বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর মন দেশাভিমুখী করে তুলেছিল। আশুতোষের মতো দীনেশচন্দ্রের সাংস্কৃতিক চেতনা অখণ্ড ভারত-বাংলা দেশাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুয়েরই বেশভূষায়, ভাষাব্যবহারে, অভ্যাসে-মননে, আশা আকাঙ্ক্ষায় তা অভিব্যক্ত হয়ে উঠত।

দ্রষ্টা ও স্রষ্টা আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের সহযোগিতায় বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রায় বিশ বছর আগে থেকে তাঁর সূচনা করেছিলেন। এ-যেন একরকমের রাম না হ'তেই রামায়ণ-রচনা! ১৯১৯ থেকে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে এম. এ. পরীক্ষায় বাংলার পাঠ্যবিন্যাস এই রকমের ছিল। প্রথম পত্রে সাহিত্যের ইতিহাস, তার একটি অর্থে ছিল শুধু বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয় পত্রে পুরোনো বাংলা, পাঠ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গোপীচন্দ্র এবং বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (সুবহৎ সংকলন)। তৃতীয় পত্রের প্রথমার্ধে মধ্যযুগের বাংলা—এতে সমগ্র কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ্য ছিল। দ্বিতীয় অর্ধে আধুনিক বাংলা, পাঠ্য সমগ্র মেঘনাদবধ, নীলদর্পণ ও নানা প্রবন্ধ। চতুর্থ পত্রের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের বিকাশ (প্রবন্ধ রচনা)। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রে অপর একটি ভারতীয় ভাষা (পূর্বোক্ত বারোটির মধ্যে একটি)—গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ইতিহাস। সপ্তম পত্রে, পালি প্রাকৃত ও ফার্সীর যে কোনও দু'টি, দুই অর্ধে বিভক্ত। পালিতে পাঠ্য ছিল বৌদ্ধ জাতক, ধর্মপদ, ধনিয়াসুত্ত ও পধানসুত্ত এবং ক'টি দার্শনিক প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ ও পালিপ্রকাশ ব্যাকরণ। প্রাকৃতের পাঠ্য, সমগ্র কর্পূর-মঞ্জরী নাটক ও বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ ব্যাকরণ। অষ্টম পত্রে বাংলা ভাষাতত্ত্ব—দুই অর্ধে বিভক্ত, এক অর্ধে ভাষার ইতিহাস, আর এক অর্ধে, ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব প্রভৃতি। প্রথম দু'বছর যাঁরা এম. এ পরীক্ষায় বসেছিলেন তাঁরা নিয়মিত ক্লাসের ছাত্র ছিলেন না, বহিরাগত ছাত্র। ইংরেজিতে কৃতবিদ্য স্বনামখ্যাত প্রিয়রঞ্জন সেন বাংলার এম. এ পরীক্ষায় প্রথমবার প্রথম শ্রেণীর প্রথমস্থান অধিকার করে শুভ সমারম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্ঠাবান্ গবেষণারত অধ্যাপক বন্ধুবর মণীন্দ্রমোহন বসু ও তমোনাশ দাশগুপ্ত, বর্ধমান কলেজের বাংলার অধ্যাপক স্বর্গত প্রবোধচন্দ্র সেন এই বছরের কৃতী পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে ছিলেন। পরের বছর সুখলতা সুধালতা দুয়ারা ভগিনীদ্বয় অপরাপর পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কৃতিত্বপ্রদর্শন করেছিলেন। আমাদের পূর্বে উত্তীর্ণ নিয়মিত ছাত্রদলে ছিলেন অগ্রজপ্রতিম প্রতিভাধর অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী। আরও ছিলেন, শচীন রুদ্র ও শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২১ সালে বি. এ. পাশ করে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বারোজন এম. এ. ক্লাশে যোগ দিই। আমাদের সতীর্থ ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নৃপতিকান্ত রায়, অমলেন্দু উপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভদ্র, কুমুদনাথ গুপ্ত, দয়ানন্দ চৌধুরী, আশাতরু চৌধুরী, আশুতোষ ঘোষাল, আবদুল জলিল, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কান্তি ধোলকিয়া (গুজরাতী)। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র সুকুমার সেন (পরে স্বনামখ্যাত অধ্যাপক সুকুমার সেন) সুযোগ পেলেই বাংলার ক্লাসে এসে বসতেন।

গুরুমহিমা প্রসঙ্গে এখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হ'ল। আমি প্রথমে ইংরেজির এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির স্বনামখ্যাত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হেনরি স্টিফেন ছিলেন আমাদের বি. এ.

CENTRAL LIBRARY

পরীক্ষায় ইংরেজির পরীক্ষক সংঘের Chairman. সাহস করে Spency's Hotel-এ তাঁর কাছে নম্বর জানতে গিয়েছিলাম। আমার ইংরেজির নম্বরে খুশী হয়ে তিনি আমাকে ইংরেজিতে এম. এ পড়বার উপদেশ দেন। অবশ্য সংস্কৃত ও বাংলার প্রতি পত্রে আশী নম্বরেরও বেশি করে পেয়েছিলাম। ভর্তির পর একদিন মার্ক-শীট ও বেতন-মকুবের আবেদন হাতে নিয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারি ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরের ধারে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় আমার সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাগুরু পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এক মাননীয় প্রবীণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। স্বভাবসুলভ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার মার্ক-শীটটি হাতে নিয়ে সঙ্গী প্রবীণকে বললেন, 'রায়সাহেব, একটি ভালো শিকার আপনার। আমার 'Father'-এর নম্বরের বাহার দেখেছেন সংস্কৃত বাংলা এবং ইংরেজি তিন বিষয়ে?' নম্বর দেখে মাননীয় অপর ব্যক্তি স্মিতমুখে আমাকে বললেন, 'আপনি বিষয় পরিবর্তন করে বাংলার এম. এ. ক্লাসে চলে আসুন (তিনি প্রথম দিকে ছাত্রদের সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করতেন)। স্যার আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজি অনার্সের কৃতিতম ছাত্র হয়েও বাংলার এম. এ. ক্লাসে যোগ দিয়েছেন।' অবিলম্বে আদেশ পালিত হল। বলাবাহুল্য বিদ্যাভূষণের সেদিনকার সঙ্গী হ'লেন, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন।

এইবার স্নাতকোত্তর বিভাগের আচার্যদের কথা কিছু বলি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতেন। তাঁর নিজস্ব ভাষায় ও উচ্চারণভঙ্গিতে আবেগের সঙ্গে তিনি আলোচ্য বিষয় প্রাণবন্ত করে তুলতেন। কখন-কখনও ইংরেজি বলতেন, এবং ইংরেজিতে নোট দিতেন। আমাদের সময়, যে-সমস্ত পত্রে বাংলায় উত্তর লেখা আবশ্যিক ছিল না, সেখানে আমি ইংরেজি ব্যবহার করতাম। বলতে সঙ্কোচ হয় আমাদের সময়ে ইংরেজির বেশি কদর ছিল। গবেষণার দিকে আচার্য দীনেশচন্দ্র কি-ভাবে আমাদের উৎসাহ-সঞ্চার করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। মঙ্গলসাহিত্যের তিনটি মুখ্য শাখা নিয়ে বিশেষ পড়াশুনা করে মঙ্গলকথার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখবার নির্দেশ দিলেন তিনি আমাদের তিনজনকে, সতীর্থ শ্যামাপ্রসাদ, অমলেন্দু উপাধ্যায় ও আমি। বন্ধুদ্বয় নানা কারণে মনোযোগী হতে পারেন নি। আমি প্রায় তিনমাস ধরে খেটে পড়াশুনা করেছিলাম। সংস্কৃত কলেজের বেদাধ্যাপক আমার শিক্ষাগুরু পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রী, বেদপ্রবক্তা পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ আচার্যদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে সর্পপূজার আভাস ও ক্রমবিকাশ নিয়ে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। এই উপলক্ষ্যে প্রায় সমস্ত পুরাণগুলি, Fergusson এর *Tree and Serpent-worship* এবং আরও নানা প্রত্নগবেষণামূলক গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার লিখিত প্রবন্ধটি দুইদিন ধরে ক্লাসে পড়া হ'ল। আচার্য দীনেশচন্দ্র প্রবন্ধটি চেয়ে নিলেন। পরদিন দ্বারভাঙ্গা সৌধের একতলার পিছনের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যাপক-দিক্‌পালদের হাতে-হাতে আমার সেই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটি ফিরছে, দেখে লজ্জায় সঙ্কোচে সন্তর্পণে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। আশুতোষ বিল্ডিং এর তখন অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে ছিল মাধববাবুর বাজার। দ্বারভাঙ্গা সৌধের একতলের পিছনের দিকে ছিল অধ্যাপকদিগের একমাত্র বিশ্রামকক্ষ। প্রবীণেরা মাঝে মাঝে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসে পড়াশুনা ও আলাপ-আলোচনা করতেন। সেদিন দেখলাম, সারস্বত-মহারথীদের সমাবেশে বিরাজ করছেন ডাঃ হীরালাল হালদার, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, ডাঃ ভাণ্ডারকর, ডাঃ তারাপুরওয়ালা, অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন-প্রমুখ অধ্যাপক। পার্শ্বে উপবিষ্ট আচার্য দীনেশচন্দ্র তাঁদের কাছে আমার সামান্য লেখাটি নিয়ে কি সব বলছেন। আমাদের আচার্যদের অপার স্নেহকরুণা ও অমেয় ছাত্রবাৎসল্যের কথা ভাবতে গেলে চোখে জল আসে। মনসামঙ্গল সম্পাদন করতে গিয়ে গৌহাটির অধ্যাপক বন্ধুবর যতীন্দ্রমোহন

CENTRAL LIBRARY

করলেও ভুলতে পারব না। সুদর্শন, সুপ্রাবৃত, অনলস এই জ্ঞানপ্রবীণ অধ্যাপক পরে পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী হয়ে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, পরিচালনদক্ষতা ও ছাত্রবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর পড়াশুনা ও কিছু কিছু লেখাও ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথিতযশা ইংরেজির অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর স্যার আশুতোষ দিয়েছিলেন **Western influence on Bengali literature** পড়াবার ভার। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিমাপ করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, আশা মিটিয়ে তানলয়বিশুদ্ধ চোস্ত ইংরেজি শুনব। কিন্তু যখন ইনি ধুতিচাদর গলাবন্ধ কোট পরে বাংলার ক্লাসে এলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মতো প্রাণখোলা আলাপ শুরু করে দিলেন এবং কার কোন্ দিকে কতটুকু পড়াশুনা আছে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তখন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে কতকটা নৈরাশ্য আমাদের পীড়িত করেছিল, একথা গোপন করব না। মহাকাব্য নিয়ে পড়াশুনো কি করেছি, আমাকে এই প্রশ্ন করেন। আমাদের দিয়ে বেশ কিছু পড়াশুনো ও লেখার কাজও তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন। 'Spectator' পত্রিকায় Addison-এর লিখিত *Paradise Lost*-এর সমালোচনা ও Ker-এর '*Epic and Romance*' বইখানি এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রাপ্তব্য সমস্ত জীবনীগুলি পড়িয়ে নিয়েছিলেন। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা সম্পর্কে পেত্রার্কার *Heroic Epistles* এর পত্রগুলির অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করে কিছু নোটও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বেশিদিন তিনি বাংলার ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন নি। নানা কর্মব্যস্ততায় অল্পদিনেই তিনি এই বিভাগের সংস্রব ত্যাগ করায় অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন এই বিষয়ে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করতেন। ব্যক্তিগতভাবে পরে অধ্যাপক ঘোষের সংস্পর্শে এসে অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার অধিকারী এই ভারতীয় ইংরেজির অধ্যাপকের আড়ালে প্রত্যক্ষ করেছি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল পরদুঃখকাতর একটি মানুষকে। চট্টগ্রাম কলেজে কার্যকালে একবার অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে দেখেছিলাম, তাঁর গুরু ও সহকর্মী অধ্যাপক পার্সিভালের তত্রত্য শৈলনিবাসে সোপানারোহণ-রত অবস্থায়। স্বর্গত গুরুর ব্যবহৃত পুস্তকগুলি প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করার জন্য তিনি সেখানে অভিযান করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলী হয়ে এসে অধ্যাপক ঘোষের স্নেহসান্নিধ্যের এবং চরণবন্দনার সুযোগ পাইনি। আমার স্মৃতিভারে গ্রন্থে তাঁর মহিমার সামান্য অংশ তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছি।

মধুসূদনের জীবনীকার এবং বাংলায় কয়েকখানি মহাকাব্য-প্রয়াসের স্বনামখ্যাত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার আগে স্বল্পকালের জন্যে অধ্যাপনা করেছিলেন। শুনেছি অধ্যাপক অভয়কুমার গুহও অল্পকাল এই বিভাগে পড়িয়েছিলেন।

অন্ধকবি ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of Bengali Language* গ্রন্থ অবলম্বনে আমাদের ভাষাতত্ত্ব পড়িয়েছিলেন। সহায়ক বৃদ্ধ শশিবাবু ছিলেন এই কবিপ্রাণ সারস্বত-প্রবীণের অবলম্বন যষ্টি। তিনি হাত ধরে এনে তাঁকে ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে যেতেন। অধ্যাপক-মজুমদার প্রায়ই তাঁর বই থেকে পড়ে যেতে বলতেন—পড়বার ভারটা আকস্মিক ভাবে আমার ওপর পড়েছিল। তিনি মাঝে মাঝে সরস ও দীপ্ত আলোচনা চালিয়ে যেতেন। পূজনীয় সুনীতিবাবু তখনও বিলেত থেকে ফেরেননি। আমাদের অবলম্বন ছিল বিজয়বাবুর ভাষাতত্ত্ববিষয়ক মীমাংসা। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মনীষার আলোক-বিচ্ছুরণের পূর্বে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ছিল বে-বন্দোবস্তি মহাল। দ্রাবিড় প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মত ও আলোচনা আমাদের আকর্ষণের বিষয় ছিল। তাঁর আলোচনায়

CENTRAL LIBRARY

মাঝে-মাঝে মৌলিকতার বিদ্যুৎ-শিহরণ দেখা যেত, এই কবি-ভাষাতাত্ত্বিক মেঘদূত গীতগোবিন্দ ও অপরাপর প্রেমের কাব্য থেকে আবৃত্তি করে আমাদের শোনাতেন। গীতগোবিন্দের উচ্চাঙ্গের পদ্যানুবাদও তিনি করেছিলেন। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদন ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই জ্ঞানতাপস ব্যবহারাজীব কবি-ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে আমরা নানাভাবে প্রেরণা লাভ করেছিলাম।

ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত পালি ফার্সি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছাত্রদের একসঙ্গে নিয়ে ক'টি সাধারণ ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিতেন অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালা। তাঁর কাছে আমি গুজরাটীও পড়েছিলাম একতম ছাত্ররূপে। ধর্মতলা স্ট্রীটে মিন্টো-ম্যান্সনের চতুর্থ তলে আমি ও সুহৃদ্বর সুকুমার সেন প্রায়ই গুরুগৃহে যেতাম। তাঁরা দুভাই একসঙ্গে ছিলেন। ছোটভাই ইয়াকুব তারাপুরওয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ফরাসী বিপ্লবের অধ্যায়টি পড়াতেন। গৃহে অজস্র গ্রন্থসম্ভার। তাঁদের বৃদ্ধা মাতা ও আমাদের গুরুপত্নীর সদাশয়তায় এবং সুরুচিসম্পন্ন একটি পার্সী পরিবারের সংস্পর্শে আমি ও বন্ধু সুকুমার নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলাম। ১৯২২ সালে সিলভ্যা লেভির সভাপতিত্বে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'Oriental Conference'-এর তিনটি শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বহুশ্রুত বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক ডাঃ ইরাচ্ জাহাঙ্গীর সোরাবজি তারাপুরওয়ালা। পূর্বেই বলেছি, এম. এ পরীক্ষা আমি নির্ধারিত বৎসরে দিতে পারিনি। তাতে একটি বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলাম। আচার্য সুনীতিকুমার এর মধ্যে বিলেত থেকে ফিরে এসেছিলেন। বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে সুকিয়া রোতে তাঁর বাসায় যেতাম এবং তাঁর পাদমূলে বসে কিছু কিছু উপদেশ সংগ্রহ করতাম। আমাদের এম. এ. পরীক্ষায় ভাষাতত্ত্বের একটি অর্ধে তিনি পরীক্ষক ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধুবর অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য তিনি ছিলেন 'Keeper of Bengali manuscripts'। অধ্যাপনার কাজ তাঁকে করতে হয়নি। কিন্তু প্রাকৃত-প্রকাশ ব্যাকরণের বিদগ্ধ সম্পাদক এবং ভাষাতত্ত্ব ও পুরোনো বাংলার নানা বিষয়ে বহুপ্রবন্ধের রচয়িতা হিসাবে তিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই শিক্ষককল্প ব্যক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বঙ্গ বিভাগে অধ্যাপনা করতে গিয়ে তাঁকে স্বল্পকালের জন্য সহকর্মিরূপে পেয়েছিলাম। তাঁর মতো আমারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকাল স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। পরে আমরা দুজনে ও বন্ধু সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজসংগ্রহের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিলাম। এর মধ্যে সরকারী কলেজে বাংলা পড়ানোর জন্য একটি করে পদ সৃষ্টি হ'ল। আমি ছিটকে পড়লাম দেশের পূর্ব-দক্ষিণ প্রত্যন্তভাগে শৈলসিন্ধু-সেবিত চট্টগ্রামে। বসন্ত বাবু কাজ পেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে রাজশাহীতে। বন্ধু সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বিপ্লবাত্মক দেশান্তরালের পরিবাদ নিয়ে সরকারি কলেজে কোনও চেষ্টা না করে স্কটিশ চার্চ কলেজে কাজ নিলেন এবং নিষ্ঠা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলার উন্নত অধ্যাপনার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ১৯৪৪-এর পরে অবশ্য কিছুদিনের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠনায় আমরা দুই বন্ধু আবার মিলিত হয়েছিলাম।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩৪-এ বি.এ. পরীক্ষায় বাংলার পরীক্ষক হিসাবে চাটগাঁ থেকে কোলকাতায় পরীক্ষক-সভায় যোগ দিতে এসেছিলাম। প্রধান পরীক্ষক ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র। আমিই শুধু অবাচীন পরীক্ষক ছিলাম। আমাদের অপরাপর পরীক্ষক-সহকর্মী ছিলেন জলধর সেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরথী। পরীক্ষক-সভায় কে যেন বললেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলার ক্লাসে পড়াতে এসেছেন। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে বাংলার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করাবার প্রয়াসে সাফল্যলাভ করেছিলেন। মাঝে-মাঝে কবি দু'একটি ক্লাস নিতে আসতেন। দীনেশবাবু আমাদের প্রার্থনায়

CENTRAL LIBRARY

অভিভাষণ*

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

১

আজ এই শুভক্ষণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরেছি, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। এই সম্মান আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত। এই জন্য আমার বিধাতার নিকট প্রণতি জানাই এবং আমার বন্ধুগণ ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানাই।

১৯২৬-২৮ এর কথা। আমি ভারতীয় ভাষাসমূহ বিভাগের ছাত্র ছিলাম। এই দিনগুলির কথা আমি ভুলতে পারব না। আমরা এম. এ ক্লাসে বোধ হয় জন কুড়ি ছাত্র এবং একজন ছাত্রী ছিলাম। আজকে বোধ হয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বহুগুণিত হয়েছে।

বাংলা বিভাগকেই এই ভারতীয় ভাষা সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলা হোত। দীনেশচন্দ্র সেন এই বিভাগের প্রধান ছিলেন। তাঁর ত দেশে বিদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতেন এবং আমার যতদূর মনে আছে ইংরেজীতেই বক্তৃতা দিতেন। তিনি অত্যন্ত রাশী মানুষ ছিলেন, ক্লাসে আমরা চুপচাপ থাকতাম। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। তিনি ক্লাসে আসা মাত্র খড়ি মাটির কাঠি দিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডে নানা ছক আঁকতেন এবং ইংরেজীতেই বক্তৃতা দিতেন। আমরা বুঝি না বুঝি বক্তৃতা লিখে নিতাম। এত তন্ময় চিত্তে তিনি ক্লাসের কাজ করতেন তা ভেবে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। তিনি ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে ভারী অমায়িক ব্যবহার করতেন। তিনি কোট প্যান্ট পরে ক্লাসে আসতেন। অন্য এক অধ্যাপকও আমাদের ভাষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর নাম বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি অন্ধ ছিলেন। একটি লোক সঙ্গে করে এনে তাঁকে আসনে বসিয়ে দিত। তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা দিতেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি কবি ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পত্রিকায় আমার কিছু লেখা ছাপা হয়েছিল। সুনীতিবাবু ও বিজয়বাবু দুজনেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভও আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়াতেন। তিনি একজন সরল ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বেশ পাকা ও লম্বা দাড়ি ছিল। কবি শশাঙ্কমোহন সেনও আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কি পড়াতেন তা আদৌ মনে নেই। তিনি একজন ঋষিকল্প মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন। শৈলেনবাবু আমাদের পালি পড়াতেন। তিনি বক্তৃতা দিতেন আর আমরা লিখে নিতাম। তাঁর নোট মুখস্থ করেই পালিতে ভাল নম্বর পাই। আগা মোহাম্মদ কাজিম সিরাজী আমাদের ফার্সী পড়াতেন। ফার্সী আমার আগেই জানা ছিল। কাজেই ফার্সীতে আমি ভাল নম্বর পাই। সিরাজী সাহেব একেবারে দিলখোলা পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তিনি ফার্সী কবিদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ফার্সী কবিদের জীবনী লিখতে আমাকে বিস্তর সাহায্য করেন। অন্য একজন অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ আমাদের নাটক পড়াতেন। তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন সেনও আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র লাজুক ও বাক্‌সংযমী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতাও ইংরেজীতে হত।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে পঠিত।

CENTRAL LIBRARY

আমার সহপাঠীদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ, হেমন্তকুমার, ক্ষেত্রগোপাল আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ আমাদের পরীক্ষাবর্ষে প্রথম, হেমন্ত দ্বিতীয় এবং আমি তৃতীয় স্থান লাভ করি।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। আমার পড়াশুনা এখানেই হয়। ইমপিরিয়েল লাইব্রেরীতেও কিছু কিছু পড়াশুনা করেছি। সুনীতিকুমার, কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আমাকে দীর্ঘকালের জন্য পাঠ্যপুস্তক ধার দিয়ে উপকৃত করেন।

সে সময় 'স্যার আশুতোষ পুরস্কার' বলে একটী পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। আমরা কয়েকজন লিখিত উত্তর পেশ করি। ধীরেন্দ্রনাথ ও আমি সেবারে পুরস্কার পাই। ছাত্রজীবনে আমি বালিগঞ্জে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে অবস্থান করি, পরে আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, আরও পরে কার্মাইকেল হোষ্টেলে থাকি। রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর সুপারিসে হোষ্টেলে অর্ধেক সীট ভাড়া দিতে হত বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কলিকাতাতে আমার সাহিত্য জীবনের স্ফুরণ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথই এইসময় আমার বাউলগান সংগ্রহের ভূমিকা লিখে আমাকে ধন্য করেন। রাজ্যের সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী, দীনেশরঞ্জন দাস, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, আকরাম খাঁ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, জলধর সেন প্রভৃতি মহাত্মাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

২

বাঙলাদেশের ইতিহাস বিচিত্র। দাক্ষিণাত্য থেকে দ্রাবিড়রা এসে এদেশ শাসন করেন। মুসলমানেরা এদেশ শাসন করেন। মুসলমানদের মধ্যে তুর্কী, আফগান, মোগল এবং হাবসীরাও রয়েছেন। বর্গীরা এদেশের শান্তি সম্পদ ও জনপদ উচ্ছন্ন দিয়েছে। হারমাদ পর্তুগীজরা এদেশের মানুষের জান ও ইজ্জত নষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ এদেশ শাসন করেছেন। তাঁরা এদেশের লোককে শায়েস্তা করবার জন্য **Rowlat Act** পাশ করেছেন। তারপর স্বাধীনতা এল, বাঙলাদেশ ভাগ হয়ে গেল। এক অংশ পশ্চিমবঙ্গ আর অংশ পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গ আবার পরে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান এখন বাঙলাদেশ। স্বাধীন বাঙলাদেশ।

আজকার বাঙলাদেশের জন্ম হয়েছে রক্তের দলারূপে। এত রক্ত সচরাচর দেখা যায় না। কারবালার রক্তের চেয়েও বেশী ও ভয়াবহ। চেঙ্গিস খাঁ হালাকু খাঁ এত বর্বরভাবে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করে নি, ইয়াহিয়া খাঁ তার চেয়ে বেশী রক্তমোক্ষণ করেছে।

পূর্ববঙ্গ বা পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকার স্বাধীন বাঙলাদেশে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান বাঙালীর বাস। সুতরাং বাঙলাদেশে এই অমানুষিক ও বর্বর হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হল কেন তার কারণ নির্ণয় দরকার। বাঙালীরা ত শান্ত ও নিরিবিলি প্রকৃতির মানুষ।

বাঙলাদেশের বাঙালী আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী একই বাঙালী জাত। সমস্যা উভয়দেশের একই ধরণের। জীবনধারণের সমস্যা এক। পরিবেশ এক। বাঙলাভাষা এক।

ভাগ হয়ে যাওয়ার পর দুদেশের ভাগ্য দুটি সূত্রে আবদ্ধ হল। আমরা জুটলাম গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আর আপনারা ত রইলেন 'ভারতের' সঙ্গে। কিন্তু এক যাত্রায় দু'ফল হল। আমাদের যাঁরা জননেতা ছিলেন তাঁরা জনসাধারণকে ভালবাসতেন না। বাঙলা দেশের জনসাধারণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের ভালোবাসা ছিল না। বাঙলা দেশের জননেতারা গত পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের হাঁ জী হাঁ জী করেছেন। দেশের দিকে তাঁরা নজর দেননি। নজর দেওয়া প্রয়োজনও মনে করেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বাঙ্গালীর

CENTRAL LIBRARY

জননেতাদের অলক্ষ্যে 'invisible light' অদৃশ্য আলোর মত নীরবে নিভৃতে বাঙলাদেশের মারণ অস্ত্র তৈরী করেছেন। সেদিন এক বাঙ্গালী VIP কে জিজ্ঞাসা করলাম 'ভায়া, এতত দেশের উচ্চপদস্থ লোকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশলেন, খানা খেলেন অথচ এরা যে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পন্থা অবলম্বন করছে, তা কিছুই জানতেন না এ কেমন কথা।' তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি কিছুই আঁচ করতে পারেন নি।

আঁচ অবশ্য কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কথাও কিছু বলেন নি। কিন্তু বাঙ্গালীর বিদ্রোহী সন্তান ছাত্ররা তাদের ভাষার মর্যাদা দাবী করেছিল। এমন কি পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বিশ্ববিদ্যালয় ভাষণকালে বলেছিলেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন কার্জন হলে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল, ছাত্ররা অবোধ্য ও অস্ফুট প্রতিবাদ করেছিলেন। ছাত্ররা ব্যথা কোথায় তা ধরতে পেরেছিলেন। বাংলাভাষার মূল উৎস সংস্কৃত, আর সংস্কৃত ত হিন্দুর ভাষা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাভাষা নিয়ে তুমুল কাণ্ড ঘটল পশ্চিম পাকিস্তানী দুচারজন উদ্ধত উর্দ্ধতন কর্মচারীর উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালীতে। রক্তের ভেতর দিয়ে বাঙালী মুসলমান জনসাধারণ একজোট হলেন। এখানেই স্বাধীন বাংলা সাধনার সূত্রপাত হল সকলের অলক্ষিতে। তাই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা চালালেন, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে উর্দু বা আরবী হরফের মারফতে বাংলা শেখানো চললো। এটা যখন সফল হ'ল না তখন হিন্দু বাংলাভাষাকে ত্যাগ করে মুসলমানী বাংলাভাষা চালানোর কৃত্রিম চেষ্টা চললো। আমাদের দু' একজন মূর্খ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ফাঁদে পা দিলেন। তাঁরা খোর্মা ফুবানী বিয়াবানের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

আয়ুব আমলে শিক্ষানীতি এত উৎকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াল যে ছাত্ররা সহ্য করতে পারলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও না। ফলে কিছু কিছু ছাত্র মার খেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও বাদ গেল না। আয়ুবের শাসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারত না। আয়ুবের চেলারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কী নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন তা বলে শেষ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত হটে গেলেন আয়ুব, তাঁর ছেলে গওহর এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডারা। এলেন ইয়াহিয়া। তিনিও একই নীতি অনুসরণ করলেন। তবে তিনি একটা বড় কাজ করলেন—নির্বাচন দিয়ে। পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচন। ইয়াহিয়া বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলেন। ফলে তিনি এখন গৃহবন্দী। পাকিস্তান ভেঙ্গে চুরমার। ইসলামের মিছে ধুয়োর মৃত্যু ঘটল। গোলাম মোহাম্মদ থেকে আরম্ভ করে ইয়াহিয়া পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করেছেন সুরার বোতলে এবং নটীর নূপুর নিক্কণে। গুজব পাকিস্তানী VIP-রা সুরা দিয়ে রোজার ইফতারী সমাপন করতেন। বাঙলা দেশ স্বাধীন হল, এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই অভাবনীয় ঘটনা কি করে সংঘটিত হল তা তাবৎ পৃথিবীর কূটনৈতিক মহলে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

তবে এখন একটা কথা ধীর স্থির ভাবে ভেবে দেখতে হবে, আমরা আর কতকাল ইউরোপ এমেরিকার দাস হয়ে থাকবো? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা না করে ভাবালুতা দ্বারা আবিষ্ট হয়ে থাকব? হিন্দুকে হিন্দু এবং মুসলমানকে মুসলমান বলে কতকাল ভাবব। হিন্দুও মানুষ, মুসলমানও মানুষ এই বোধ কবে জীবনে-কর্মে-স্বপ্নে সদা জাগ্রত হবে। ইংরেজ আমেরিকার ম্যাজিক খেল কতদিন দেখব। এর জন্য প্রয়োজন মানবিকতাবোধ। রবীন্দ্রনাথ যার পরম আদর্শ। হিন্দু সমাজের মারী ভেদবুদ্ধি রয়েছে, সামাজিকতায়, লৌকিকতায়, অস্পৃশ্যবাদে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদে, অন্নপ্রাশনে, বিবাহে এবং সর্বোপরি আহারে বিহারে।

বহিরাগত মুসলমান আক্রমণকারীদের নিকট বারংবার হিন্দুভারত যে পরাজিত হ'ল তার প্রধান কারণ জাতিভেদ জনিত আহার বিহার ব্যবস্থা এবং নিম্নস্তরের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধরীতির জন্য। ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যের অভাবের

CENTRAL LIBRARY

জন্ম নয়। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আমরা ভুলতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে স্পেনে মুসলমানেরা সমূলে উৎখাত হ'লেন তার কারণ tribal feud এবং পরস্পরের মধ্যে জন্মগত hatred. আমাদেরও বাঙালী, বাঙালীর feud ও hatred সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে, নতুবা জাতি হিসেবে আমাদের মুক্তি ও বাঁচোয়া নেই।

রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, রবিদাস ও লালনশাহ মানুষে মানুষে মিলের কথা বলেছেন তা আমাদের সমাজজীবনে, শিক্ষাজীবনে, এককথায় সর্বস্তরে চারিয়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।' সুতরাং প্রেমের বাণী করুণার বাণী আমাদের সাধনার লক্ষ্যস্থল হওয়া দরকার। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব এক সময় সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রেমের বাণী ও করুণার বাণীতে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'জনার সাধনাই শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই শ্মশানভস্মের উপর আবার নূতন স্বপ্নের ইমারত গড়ে তুলতে হবে,—যার সূচনা করে গেছেন রাজা রামমোহন রায়।

স্বাধীন বাঙলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সেতুবন্ধ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই দুই বাঙলার বোঝাপড়া সহজ ও সম্ভব হবে। স্বাধীন বাঙলার মর্মকথা রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুস্পষ্ট ও সুগভীর। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা ও মানবতাবাদ আমাদের জীবনযাত্রার পরম সম্বল। রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে গভীর মমতার সঙ্গে এদেশের জীবন ও প্রকৃতিকে দেখেছেন, বুঝেছেন ও প্রকাশ করেছেন তা অলৌকিক এবং আনন্দময়। আমাদের জীবনের সমস্যার সমাধান তাঁর রচনাতেই পাওয়া যাবে। তাঁর কর্মজীবনের মহত্তম প্রোগ্রাম—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও কারিগরি শিক্ষায়তনের এখানে জন্ম হয়। ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, কৃষিকর্মক্ষেত্র তিনি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন শিলাইদহে। সুতরাং আমার মনে হয় অচিরে শিলাইদহে একটি রবীন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উভয় সরকারের একটী গুরুতর কর্তব্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শ্রীনিকেতনের আদর্শকে সম্মুখে রেখে জনসাধারণের শ্রমিক সমস্যা পটভূমিকায় রেখে, সাহিত্য সঙ্গীত কথকতা কারিগরি শিল্পবিদ্যা, ভূমিবিদ্যা, মৎস্যবিদ্যা, ব্যাঙ্কিং, হাসপাতাল কর্মপন্থা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার প্রভৃতি শিখাতে হবে। আপাততঃ ঠাকুর জমিদারদের কাছারীবাড়ী কলেজের গৃহরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এবং কর্মচারীদের বাসগৃহ শিক্ষকদের আবাসরূপে রূপান্তরিত হবে। রবীন্দ্রনাথের আঁখির পরশ যেখানে পেয়েছে সেখানেই আমাদের তীর্থ। রবীন্দ্রনাথের পদ্মা আজ মৃতা, সেই মৃতা পদ্মাকে নব ভগীরথের সাধনায় জীবনচঞ্চল করে তুলতে হ'বে।

৩

পশ্চিম বাঙলা ও স্বাধীন বাঙলা পরস্পরের লোক-সাহিত্যের মাধ্যমে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। লোকসাহিত্য উভয় দেশের জনমানসের নিবিড় পরিচয় বহন করে। গ্রাম্য জীবনের হাসিকান্না, আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা অতীব চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। মানুষকে মানুষের কাছে টানবার এবং জানবার অদ্বিতীয় যাদুময় দর্পণ।

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে লোকসাহিত্যের দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আজকাল আমরা লোকসাহিত্যের সংরক্ষণ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছি, তার প্রধানতম উৎস রবীন্দ্রনাথ। আমাদের পল্লীজীবনে রসের যে ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সেই ট্রাডিশনের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম লালনশাহের গান সংগ্রহ করে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। ক্ষিতিমোহন সেনের সংগৃহীত অপূর্ব বাউল গান বারংবার স্মরণ করেছেন তিনি হিবার্ট বক্তৃতামালা ও কমলা বক্তৃতামালায়। জীবনের নিগূঢ় রহস্য অশিক্ষিত বাউল কবিরা প্রকাশ করেছেন তাঁদের বাউল গানে। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মর্মবাণীর সমধর্মিতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন : 'ক্ষিতিমোহন সেনের অমূল্য সঞ্চয় থেকে

CENTRAL LIBRARY

এমন বাউল গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে তার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন বাউল গানের তত্ত্ব তেমনি তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।' রবীন্দ্রনাথ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা সম্পর্কেও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাল নির্ণয় করা চলে না, জাত নির্ণয় চলে। ওটা আবহমান কালের। কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে। এই কাল যদি কিছু করতে চায় তখনি সেটা ধরা পড়বে। এবং সেটাতে সবটার দাম নষ্ট হবে।'

লোকসঙ্গীত যে অত্যন্ত মূল্যবান এ সম্পর্কে একজন বিদেশী, Dr. R. V. Williams ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের ভাষণে লণ্ডন সম্মেলনে বলেন : **'I believe that folk song has in it the possibilities of the greatest and purest beauty'.** সুতরাং আমাদের পল্লীসঙ্গীতের এই অপূর্বতা সন্ধান করে বের করতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে। এর জন্য ব্যাপক প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। দেশকে সত্যিকার ভাবে জানবার এটি একটি চমৎকার পন্থা। বহু মানুষের বহুদিনব্যাপী পরিশ্রমের ফসল হবে এই লোকসঙ্গীত সংগ্রহ। আমাদের এই দুরূহ সাধনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। 'দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক কর।' এই প্রেমের মাধ্যমে বাংলা-ভাষাভাষী উভয় অঞ্চলের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন স্থাপিত হবে।

৪

বাংলাভাষা একমাত্র বাংলা দেশেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। বিগত পঁচিশ বৎসর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতা সুলভ ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে বাংলা ভাষার চর্চা গভীর, ব্যাপক ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় ও সৃষ্টিধর্মী সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের দেশের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও মহৎ।

সম্প্রতি আমাদের বাঙলাদেশের বিশিষ্ট একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে আমার হঠাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি আমাকে বলেন 'আপনারা বাংলা ভাষার সম্পদ গ্রামের দীন দরিদ্রের কুটিরে পৌঁছাইয়া দিন।' তাঁর এই উপদেশ বিশেষ মূল্যবান ও সময়োপযোগী। আমাদের গ্রামের সাধারণ লোক গৃহ-সংসার কর্মে এত ব্যস্ত যে ভাত খাবার, সন্ধ্যা আহ্নিক করবার, নামাজ পড়বার অবসর পর্যন্ত পায় না। যন্ত্রের মত উদয়াস্ত কায়িক মেহনত করেই চলে। অবসর কাজের অঙ্গ তারা তা জানে না। বাংলাভাষারূপ খনির গর্ভ হতে মণিমুক্তা আহরণ করে গ্রাম-বাংলার নরনারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, আলিফলায়লা কাছাছোল আম্বিয়া প্রভৃতির ন্যায় নূতন জীবনাদর্শের বাণী সহজ সরল ও মধুর ভাষায় তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার। এই বাংলাভাষা অজ্ঞানতিমিরবিদারী, জ্যোতির্ময়-স্বরূপ। জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি নেই, জ্ঞান ব্যতিরেকে দারিদ্র্যকে কিছুতেই হটানো যাবে না। মানুষে মানুষে গ্রামে গ্রামে এবং গ্রামে নগরে মিলের জন্য সভ্যতার মাধুর্য ও সম্পদ-আলো বাংলাভাষার মাধ্যমেই মাত্র পৌঁছিয়ে দেওয়া। সহজ ও সম্ভবপর মানুষের প্রতি মানুষের যে দাবী তা বাংলাভাষার সাহায্যেই জারী করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন,

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—

এই ভাষা অন্য কোন ভাষা নয়—বাংলাভাষা। বাংলাভাষার সহযোগেই তাদেরকে জীবনচঞ্চল, মুখর, আনন্দোজ্জ্বল ও নবজীবনের আশায় প্রবুদ্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ও মহৎ জীবন চাই সকলের জন্যে, দূরতম

CENTRAL LIBRARY

গ্রামেও। নানা কারণে, ধর্মের কারণে, সামাজিক আচরণের জন্যে আমরা পরস্পরে হৃদয়ের নিকটবর্তী হতে চাই নি এবং পারিও নি। সুতরাং বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে আমাদের হৃদয় বিস্তারিত করতে হবে। নূতন প্রেরণা, নূতন আদর্শ, জাগ্রত আধুনিকতা প্রচার করতে হবে। ল্যাটিন একসময় শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের বাহন ছিল, ধর্মের বাহন ছিল। ধরুন ইংলণ্ডের কথাই—ইংরাজ ইংরাজীভাষা দিয়েই শেষে পৃথিবী জয় করল। ইংলণ্ডে তার প্রাধান্য বিস্তার করেছিল spirit of adventure, দুঃসাহসিক অভিযান এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের জন্য এবং ফলে ইংরাজী ভাষার অসম্ভব স্ফূর্তি ঘটেছিল। ওই পন্থা আমাদেরও অনুসরণ করতে হবে। আমরা নিজেদেরকে আর কতকাল 'বাঙালী' করে রাখব? ভাষার সঙ্গে দেশের সামগ্রিক ঐশ্বর্যের ও উন্নতির গভীর যোগ রয়েছে। বাংলাভাষা জাতির মস্তিষ্কস্বরূপ। নানা জটিল পন্থায় এর সরবরাহ সমাজদেহে সঞ্চারিত করতে হবে। বাংলাভাষার মাধ্যমেই আমাদের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটবে। বিশ্বজ্ঞানসভায় এই বাংলা ভাষার পরিচর্যাতে আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দখল করতে সক্ষম হব, যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্ভব করে তুলেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের ও বাঙলাদেশের সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। আমাদের বাংলা ভাষায় শুধু রম্য কাহিনীরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। গভীর ও কঠিন বিষয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক বিরল। এদিকে সকলের নজর দেওয়া দরকার। অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যের ধার্ঢ্য শক্তি বিকশিত করতে হবে। আব্বাসীয় যুগে বাগদাদের খলিফা মনসুর বয়তুল হিকমত গঠন করে তার সাহায্যে সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা হতে আরবী ভাষায় বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভূরি ভূরি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এই আরবী সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতিরূপে আমরা দেখতে পাই ইউরোপের রেনাসাঁসের সূচনা। সম্প্রতি শুনেছি জাপানেও বহু বিদেশী গ্রন্থ বহুল পরিমাণে অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের মান ও আদর্শ বিশ্ববিজয়ী হওয়া দরকার এবং এর জন্যে আমাদের প্রত্যেকের সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য এর প্রয়োজন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি যে বাংলা ভাষার একটি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রয়োজন। যেমন আমরা দেখি *Oxford English Dictionary*, উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি 'তুলসী বনের বাঘ' একটি বাগ্‌বিধি আছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দেও এই বাগ্‌বিধির অর্থ জানতুম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে এ সম্পর্কে পত্র দেই। কিন্তু উত্তর পাই না। পরে বাগ্‌ধারাটি মধুসূদনের নাটকে দেখতে পাই। বিদেশী যাঁরা বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছেন তাঁদেরও নির্ভরযোগ্য একখানি বৃহৎ অভিধানের প্রয়োজন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার একটি সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদন করেছেন। এটার মত পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রয়োজন।

Oxford University Press প্রকাশিত *Bible*-এর মত আমাদের বেদ কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের সুলভ ও সহজলভ্য সংস্করণ প্রকাশ করা দরকার। *Dictionary of National Biography* আমাদের দরকার। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার 'জীবনীকোষে' যে সূচনা করে গেছেন তার বিস্তার প্রয়োজন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সংস্কৃত পুথি পুস্তক বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি জ্যোতিষ বিদ্যা সম্পর্কে সংস্কৃতে লেখা পুথি পুস্তকের ইংরাজী বা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ দেখিনি অথচ Cheess সাহেব এই বিদ্যার বই সম্পর্কে ভারতের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

আমাদের বিভিন্ন ভাষায় মোক্ষম দখল থাকা দরকার। রাজা রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে

CENTRAL LIBRARY

পারে। তিনি ইসলামের মূলবাণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই বিরাট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আমাদের আধুনিক ভাষা বিভাগ সমূহ কেন তৈরী হবে না, যেমন স্যার যদুনাথ ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে মোঘল ইতিহাসের উৎসের সন্ধান ও ব্যবহার করেন। আসল কথা বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যে আমাদের মৌলিক শক্তি জগৎকে জানাতে হবে। ব্রাউন, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতের মত আমাদেরও অগ্রণী হতে হবে। ভাষা বিজ্ঞানে শ্রীসুনীতিকুমার, সংখ্যাতত্ত্বে শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ ও আরো অন্যান্য পণ্ডিত আরো বেশী সংখ্যায় প্রয়োজন। এই দেশের সংস্কৃতির প্রচার পাদ্রীদের মত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু-সংস্কৃতির মুসলিম সংস্কৃতি বিষয়ক একটি discipline আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা দরকার। ১৯২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দে একথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমার মনে হয় আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগে আপাততঃ ৫০ নম্বরের একটি অর্ধ paper বা পরীক্ষাপত্রের ব্যবস্থা করা দরকার। সত্যই আমি ত হিন্দু সংস্কৃতির মর্মকথা জানি না। আমার ছাত্রজীবনে অন্ততঃ বেদের বাংলা অনুবাদ পড়া উচিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি সম্প্রতি সহস্রারের উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্ধান করতে গিয়ে অথর্ববেদে এর উল্লেখ দেখতে পাই, সহস্রার শব্দটী রয়েছে। অথচ সহস্রারের উল্লেখ বাউল গান সম্পর্কে কেউ করেন নি। এবিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করা দরকার।

স্বাধীন বাংলাদেশ এবং এই দেশের মধ্যে গভীর ও বাস্তব যোগাযোগ গভীর হওয়া দরকার। এবং সে কাজ পরস্পরের মধ্যে পুথি পুস্তক উপহারের দ্বারা সহজ ও সুন্দর হবে। আমাদের দেশে ত পুস্তক নেই, অথচ যে পুথি পুস্তক ছিল ব্যক্তিগত ও আধা সরকারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সমূলে বুলেটে ও আগুনে পুড়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। কী গভীর পরিতাপের বিষয়।

৫

আমাদের জীবনদর্শন সম্পর্কে দুই একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমরা ট্রাডিশন ও পরিবেশের মানুষ। সুতরাং আমাদের জীবনকে সফল করে তুলতে হলে আমাদের আত্মবিকাশের প্রয়োজন। বিদ্যাচর্চা ও শরীরচর্চা অবশ্য করণীয়। কুসংস্কার, কুভাব সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। উদার ও মহৎ আদর্শ জীবনের জন্য প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা মানবিক স্বার্থ অধিকতর কাম্য। ধর্মগত বুদ্ধি অপেক্ষা বিশ্বজনীন বুদ্ধি একান্ত চর্চা করবার জিনিষ। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি হিংসা, বিদ্বেষ ভাব সম্পূর্ণ দূরে রাখতে হবে। যা সুন্দর ও মঙ্গলজনক সেই সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বৈদিক যুগের প্রকৃতি, মানুষ পরিবেশ, সমাজনীতি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগের ধ্যান ধারণা ও জীবনপ্রণালী ঘৃণা করে লাভ নেই। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে প্রবুদ্ধ করতে হবে মঙ্গল সাধনায়। জয় হোক।

CENTRAL LIBRARY

স্মৃতিচারণ

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

আমি এক যুগ (১৯২৯-১৯৪১ ইং) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এই ১২ বৎসরের মধ্যে এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা ৩০ বৎসর পরে আজ আর আমার মনে নাই। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি মনে যেন বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যত দিন যাইতেছে ততই যেন তাহাদের স্মৃতি—তাহাদের আনন্দ-বেদনা মনে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। বড় ঘটনার মধ্যে মানুষের সত্যিকারের পরিচয় যতটুকু পাই—অতি ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও সেই পরিচয়ই যেন সূত্রাকারে আভাসিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, তুচ্ছতম আচরণ মানুষের সত্যিকারের রূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। একই ঘটনা এক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে যাহা অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়—সেই ঘটনাই যখন অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি তাহা মনে মধু ঝরায়। আমি তেমন দুই তিনটি ঘটনা নির্বাচন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম যাহার সঙ্গে যুক্ত আমার গুরুজনের একজনও আজ আর মরজগতে নাই। তাঁহাদের আচরণবিশেষের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা বিচার করিয়া নিন্দা বন্দনা যাহাই আজ করি না কেন তাহা তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু ছাত্রবৎসল, স্নেহপ্রবণ অধ্যাপক হিসাবে এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হিসাবে যিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের চরিত্রের দিক্‌বিশেষ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাহার চাইতেও বড় কথা আমার জীবনে এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

নিজেকে দূরে রাখিয়া নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনাই লেখকের পক্ষে শ্রেয় ও বাঞ্ছিত। কিন্তু বর্তমান অংশে তাহা সম্ভব হয় নাই। অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে সকল চিত্র বা ঘটনারাজি মনের মানসপটে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে ব্যক্তি হিসাবে আমি নিজে দূরে থাকিতে পারিতেছি না। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে আমি যেন সেই সকল বিচ্ছিন্ন চিত্রসমষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া আছি। আমার ভাল লাগা না লাগা, আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণেরই প্রতিফলন এই লেখায় রহিয়াছে। ইহা নৈর্ব্যক্তিক ত নহেই—'অতি ব্যক্তিক' হইয়া পড়িয়াছে। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের বিবরণ পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতে গিয়া প্রারম্ভেই আমার রচনার এই অংশের বিশেষ ত্রুটির জন্য মার্জনা চাহিয়া লইতেছি।

এই স্মৃতিচারণে আমার আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রিয়রঞ্জন সেন এবং রাজশেখর বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্যামাপ্রসাদ জড়িত। ইঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

(১) ১৯২৯ ইং শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের বাংলা শ্রেণীতে ভর্তি হই। সঙ্গে সঙ্গে আইন শ্রেণীতেও ভর্তি হইয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে থাকিতাম। সেই সময় হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের মধ্যে ৩৪ জন বাংলা এম. এ-রও ছাত্র ছিলেন। শ্রদ্ধেয় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সপ্তাহে দুইদিন আমাদের শ্রেণীতে পড়াইতেন—সম্ভবতঃ সোম ও শুক্রবার। আমি শ্রীহট্ট হইতে আসিয়াছি, আমার পূর্ব পরিচিত কোন ছাত্রই আমাদের শ্রেণীতে ছিল না। শ্রেণীতে শেষের দিকের 'বেঞ্চে' বসিতাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে 'আশুতোষ পুরস্কারের' জন্য প্রবন্ধ

CENTRAL LIBRARY

প্রতিযোগিতা হইত। সম্ভবতঃ ১০৫ টাকা মূল্যের বই দেওয়া হইত। এক শুক্রবার আচার্য দীনেশচন্দ্র ছাত্রদের জানাইলেন যে পরবর্তী সোমবারে 'আশুতোষ পুরস্কার' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। ছাত্রেরা যেন কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসে। ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ—তন্মধ্যে কবি জসিমুদ্দিনও ছিলেন—কি জাতীয় বিষয়ের উপর প্রশ্ন হইবে তাহা জানাইবার জন্য আব্দার করেন। দীনেশচন্দ্র পরে নাকি বলিয়াছিলেন যে 'বৈষ্ণব সাহিত্যের' উপর হইবে। আমার দুর্ভাগ্য আমি ঐ শুক্রবার 'ক্লাসে' যাই নাই এবং আমার সহপাঠী যাঁহারা হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে ছিলেন তাঁহারাও ঐ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কথা আমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমার আইনের 'ক্লাস' সকালে ছিল। সোমবার ভোরের ক্লাসে যাইব রওয়ানা হইয়াছি এমন সময় আমার বাংলা ও আইন শ্রেণীর এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন –'কি ভায়া, আজকের পরীক্ষার জন্য কেমন প্রস্তুত হলে।' আমি তাঁহার নিকট হইতে কি পরীক্ষা জানিয়া লইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলাম। আইন শ্রেণীতে যাওয়ার মত মনের অবস্থা তখন আর আমার ছিল না। হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে তখন ত্রিপুরা জেলার শিবপুরের কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী আইন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার কোঠার সম্মুখ দিয়াই আমার কোঠায় যাইতে হয়। আমার মুখের দিকে তাকাইয়া—আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া, আমার কি হইয়াছে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। আমি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কথা বলি এবং আমার ছাত্রাবাসের সহপাঠী একজনও এই কথা আমাকে বলেন নাই—জানাই। কুমুদবাবু আমাকে সান্ত্বনা দিয়া পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর প্রশ্ন হইবে এই কথা কুমুদবাবুকে বলিয়াছিলাম। সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা শ্রেণীতে যোগ দিয়াছি। বইপত্র বড় কিছু ছিল না। কুমুদবাবুর নিকট বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী' বইখানি ছিল, তাহা আমাকে পড়িতে দিলেন। আমার নিকট শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা ছিল। ইহাতে 'বিদ্যাপতির প্রতিভা' শীর্ষক আমার লেখা একটি প্রবন্ধ ছিল। আমি একখানি পদাবলী গ্রন্থ এবং একটি প্রবন্ধ পড়িয়া লইয়া পরীক্ষা দিতে গেলাম। যথাসময় আচার্য দীনেশচন্দ্র আসিলেন এবং 'ব্ল্যাক বোর্ডে' প্রশ্নটি লিখিয়া দিলেন—**'Place of Chandidas in the lyrics of Bengal'**। কিছুক্ষণ পরে দীনেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন —রহিলেন তখনকার রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়। একে একে অন্যান্য পরীক্ষার্থীরা তাঁহাদের খাতা জমা দিয়া গেলেন। সকলের শেষে বিশ্বপতিবাবু আমার খাতা 'আর কত লিখবে হে'—বলিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। আমার মন দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। গোপন মনে ধারণা ছিল, আমি সুযোগ পাইলে, পরিশ্রম করিয়া লিখিতে পারিলে—আমার রচনা হয়ত পরীক্ষকের খানিকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত। মুরারিচাঁদ কলেজে আই. এ. এবং বি. এ. শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় ৪টি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেকবারই প্রথম হইয়া পুরস্কার পাইয়াছিলাম। আমার অবচেতন মনে এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সময় পাইলে আমি আমার প্রবন্ধের দ্বারা আমার শিক্ষাগুরুর খানিকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সফল হইব। সুদূর মফঃস্বল হইতে আগত ভীরু ছাত্রের মনের দুঃখ মনেই রহিল। সহপাঠীদের বিশেষতঃ হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসের সহপাঠীদের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়া উঠিলাম। মুখ ফুটিয়া কিছু বলার দুঃসাহস সেদিন আমার ছিল না।

পরের সোমবার দীনেশচন্দ্র 'ক্লাসে' আসিলে অনেকে তাঁহাকে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করিতে অনুরোধ করেন। দীনেশচন্দ্র কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া—জসিমুদ্দিন কেমন লিখিয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন। শ্রেণীর পিছনের সারিতে বসা আমি, বুঝিয়া লইলাম যে—জসিম ভায়াই প্রথম হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার পরীক্ষার কথা দীনেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? জসিমুদ্দিন দাঁড়াইয়া তাঁহার লিখিত বিষয় সম্পর্কে দু'এক কথা বলেন। কিছুক্ষণ

CENTRAL LIBRARY

পরে আমাদের সহপাঠিনী শোভা সেনকে জিজ্ঞাসা করেন—'শোভা, তুমি কেমন লিখেছ?' শোভা সেন দাঁড়াইয়া নতমস্তক হইয়া রহিলেন, কোন জবাব দিলেন না। আমি অনায়াসে বুঝিয়া লইলাম—শোভা সেন দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন 'যতীন ভট্টাচার্য কে হে'। আমি ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইলাম। আবার প্রশ্ন 'বাংলা কেন নিয়েছ?' আমার মনে হইল নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক ভুল ত্রুটি কিছু করিয়াছি যাহার জন্য আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছেন। আমি বলিলাম—'ভালবাসি তাই নিয়াছি।' 'বি. এ.-তে তোমার কি ছিল'—আমি বলিলাম—'Economics, Mathemetics'। 'Honours ছিল নাকি?' ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'অঙ্কে ছিল, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেই নাই।' আবার বলিলেন—'বাংলা ভালবাস তাই নিয়েছ। আমার বাড়ী কোথায় জান।' আমি বলিলাম—'না'। দীনেশচন্দ্রের মুখে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত হাসির ঝলক খেলিয়া গেল—বলিলেন—'বাংলা পড়তে এসেছ—আর ৭ নং বিশ্বকোষ লেন জান না! যেও যেও, আমার বাড়ী যেও।'

পরের রবিবার ভোরে আমার ছাত্রাবাসের এক সতীর্থের নিকট হইতে বিশ্বকোষ লেনে যাওয়ার পথের সন্ধান জানিয়া লইয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। দীনেশচন্দ্রের বাহিরের বসিবার ঘরে এক তক্তাপোষ পাতা ছিল। তিনি তাহাতে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত উঠিয়া আসিয়া আমার বাম কাঁধে সস্নেহে হাত রাখিয়া তক্তাপোষের উপর বসিতে বলিলেন। তিনি প্রথম জীবনে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন বলিলেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-লেখক অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় নাকি তাঁহার বিশেষ পরিচিত সুহৃৎ ব্যক্তি। আমার আত্মীয় পরিজন সকলের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। কথাপ্রসঙ্গে এক সময় বলিলেন—আমার প্রবন্ধই নাকি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। একথা শুনিয়া আমার চোখ সজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'দেখ আমাদের বাংলা বিভাগে মেয়েরা পড়তে বেশী আসছে না। এবার মাত্র একটি মেয়ে পড়ে। এ বিভাগে অধিক সংখ্যক মেয়ের আসা বাঞ্ছনীয় নয় কি? মেয়েদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে এই পুরস্কারের অর্ধেক যদি শোভাকে দেই কেমন হয়? তুমি কী বল?' আমি নতমস্তকে সবিনয়ে বলিলাম—আমার এই প্রবন্ধ যদি আপনার সামান্য ভাল লাগিয়া থাকে—আমি পুরস্কার পাইয়াছি মনে করিব। বাংলা বিভাগে অধিকসংখ্যক মেয়েদের আসা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আপনি সম্পূর্ণ পুরস্কার শোভাকে দিন। সেই দিবস কয়েক ঘণ্টা তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া চা-মিষ্টি খাইয়া উৎফুল্ল মনে আমার ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলাম। আমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দিন—এই দিনটি। এ দিনের স্মৃতি, আমার শিক্ষাগুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার স্মৃতি আমার মনে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

কি কারণে জানি না, দীনেশচন্দ্র পরদিন সোমবার আমাদের বাংলা শ্রেণীতে আসেন নাই। পরের শুক্রবার তিনি ক্লাসে আসিলে ছাত্রেরা তাঁহাকে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল জানাইবার জন্য অনুরোধ করেন। দীনেশচন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'কেন! পরীক্ষার ফল তো বলে দিয়েছি।' ছাত্রেরা একে অন্যের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কে সে? যে ফল জানিয়াও বলে নাই? কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'যতীন ও শোভা পেয়েছে।' আমি পুরস্কার পাইয়াছি জানিয়াও কাহাকে বলি নাই ভাবিয়া দীনেশচন্দ্র খুশী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি পাইয়াছি বলিলে আমার সহপাঠীরা হয়ত বিশ্বাসই করিবে না মনে করিয়াই আমি বলি নাই। দীনেশচন্দ্র অনেকদিন ক্লাসে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার কোন প্রিয় ছাত্রের কাঁধে হাত রাখিয়া ক্লাসে প্রবেশ করিতেন। এই ঘটনার পরে কোন কোন দিন আমার কাঁধে হাত রাখিয়া তিনি ক্লাসে প্রবেশ করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

(২) এম. এ. পরীক্ষার ৩।৪ মাস পূর্বে হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের কোঠা হইতে আমার পাঠ্য সকল বই চুরি হইয়া যায়। আমার পাঠ্য কোন কোন গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠার পর এক একটি সাদা পাতা যোগ করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছিলাম। এ সব সাদা পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কোন্ বৎসর কোন্ প্রশ্ন আসিয়াছিল, তাহাও লেখা ছিল। যেদিন এই বই চুরি হইয়া গেল, সেই দিবস আমার ক্লাসে যাওয়ার মত মনের অবস্থা ছিল না। আমি বহুকষ্টে আমার পঠনীয় গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, গত ১১ বৎসরের প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা আমার দ্বারা আবার লেখা সম্ভব নহে মনে করিয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে বিছানায় শুইয়াছিলাম। দীনেশচন্দ্র তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের ক্লাসে না দেখিলে, সে কেন অনুপস্থিত এই সংবাদ জানিয়া লইতেন। সে দিন আমি ক্লাসে না যাওয়ায় 'যতীন কেন ক্লাসে আসে নাই?' এই প্রশ্ন করিলে আমার জনৈক সহপাঠী আমার সকল বই চুরি গিয়াছে, মন খারাপ, তাই ক্লাসে যাই নাই—এই কথা বলেন। এই কথা শুনিয়া ক্লাসের পরে তিনি আমার হোষ্টেলে আসিয়া উপস্থিত। পিতা যেমন সন্তানকে আদর করেন তেমনি করিয়া, আমার মনের দুঃখ লাঘব করার জন্য বলিলেন—'এক সেট পাঠ্য বই গিয়েছে তো কি হয়েছে।' তাঁহার বাড়ী হইতে যেন সকল বই এক কপি করিয়া লইয়া আসি।—এই নির্দেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার বিশেষ যত্নসহকারে Note করা গ্রন্থ চুরি যাওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। পাঠ্য গ্রন্থ ক্রমশঃ ক্রয় করিয়া লইব মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। Second Hand বই কোন জায়গায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায় তাহা আমার জানা ছিল—আমি বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সংবাদপত্র নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। এ দিকে দীনেশচন্দ্র আমি তাঁহার বাড়ী গিয়া কোন বই না আনায় কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া আমার প্রয়োজনীয় বই প্রত্যেক দিন একখানি দুইখানি করিয়া সকল পাঠ্য বই আমার হোষ্টেলে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এই ছোট্ট ঘটনাটি বর্ণনা করিতে গিয়া আমার মন অতি স্বাভাবিকভাবেই আমার স্বর্গত শিক্ষাগুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানত হইতেছে। আমার বই চুরি যাওয়ার পূর্বে কয়েকবারই তাঁহার বেহালার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে বলেন। আমার অধ্যাপকের এই সস্নেহ আমন্ত্রণ কখনও মুখে উপেক্ষা করি নাই—অথচ যাইও নাই। এইবার বই চুরি যাওয়ার পর বারবার আমাকে তাঁহার বাড়ী গিয়া থাকিতে বলিতে লাগিলেন। এক সময় তাঁহাকে বলিলাম—এখন আপনার বাড়ী যাইব না। আমার M. A. পরীক্ষার ফল বাহির হইলে পরে হয়ত যাইতে পারি। এখন কেন যাইব না একাধিক বার জিজ্ঞাসা করায় বলি—আমার সহপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে আপনি নাকি আমাকে M. A. পরীক্ষায় প্রথম করিয়া দিবেন। আমার জন্য আমার অধ্যাপকের বদনাম হওয়া আমার পক্ষে কোন অবস্থায়ই বাঞ্ছিত হইতে পারে না। আমার কথা শুনিয়া তিনি গম্ভীর ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন, একবার বলিলেন, 'তাহা হউক, এখন তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আবার বলিলেন—কোন কোন ছাত্র তাদের আচার আচরণে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পরীক্ষায় কাহাকেও চিনি বলিয়া বেশী, আর চিনি না বলিয়া কম নম্বর ত দেই না। তোমার বন্ধুদের ধারণা ভুল।' দীনেশচন্দ্রের কথা নীরবে শুনিয়া গেলাম, কোন মন্তব্য করিলাম না। পরে অনেক সময় আমার এই উক্তির দ্বারা দীনেশচন্দ্রকে বেদনা দিয়াছি অনুভব করিয়া আমি দুঃখ বোধ করিয়াছি।

(৪) দীনেশচন্দ্র ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া বেহালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন। আমাদের ছাত্রমহলে 'পংখীরাজ ঘোড়ার গাড়ী' বলিলে দীনেশচন্দ্রের গাড়ী বুঝাইত। আমার এম. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পর একদিন তিনি আমার হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে আসিয়া হাজির। তাঁহার এক বিশ্বাসী বিহারী চাকর ছিল। ডাক নাম 'আরু'। আরু সময় সময় গাড়োয়ানের পাশে বসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিত। সেদিন দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে আরুও

CENTRAL LIBRARY

আমার কোঠায় আসিয়া হাজির। আয়ুকে বলিলেন—'যতীনবাবুকো সামান গাড়ীমে লে যাও।' আমি ত অবাক! আয়ু দীনেশচন্দ্রের নির্দেশ পাওয়ামাত্র আমার বিছানা গুছাইবার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। আমি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলাম—'স্যার, এর অর্থ!' তিনি সমান গম্ভীরভাবেই বলিলেন—'এম. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হলে আমার বাড়ী যাবে বলেছিলে না, এখন তো ফল বাহির হয়েছে।—আয়ু, (সামান) নামাও'। আমি বুঝিলাম আমার নিজের কথায়ই আমি বন্দী হইয়াছি। আমাকে তাঁহার বাড়ী যাইতে হইবে। তবুও আমার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলাম—'স্যার, Law পরীক্ষা শেষ করিয়া গেলেই তো ভাল।' তিনি সমান গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—'না, Law' পড়া তোমার কর্ম নয়! বাংলা সাহিত্যচর্চাই তোমার সারাজীবন করতে হবে।' আমি দীনেশচন্দ্রের বাড়ীতে বৎসরখানেক ছিলাম। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ Training Period'এই একটি বৎসর। এ সময় দীনেশচন্দ্রের 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। তিনি মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন। আমি লিখিয়া লইতাম। তাঁহার বাড়ীতে আমার যাওয়ার পূর্বে বেশ কয়েক অধ্যায় লিখিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অধ্যায়সমূহের শ্রুতিলিপি আমি করিয়াছিলাম।

(৫) 'বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়' শীর্ষক আমার লিখিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থের প্রস্তাবনায় স্বর্গত তিন পণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিম্নলিখিত মর্মে জানাইয়াছিলাম। 'এই গ্রন্থ মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিতে গিয়া আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এম.এ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ রচনাকালে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, অথচ এই ন্যায়নিষ্ঠ উদারহৃদয় মনীষী আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন—অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।'—আমার এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমার পরিচিত এক সুহৃদ্ ব্যক্তি—রাজশেখর বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, অথচ তিনি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন—এই উক্তির ব্যাখ্যা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার সঙ্গে এর ব্যাখ্যা জড়িত বলিয়া, খানিকটা দ্বিধা ও সঙ্কোচ লইয়া এইপ্রসঙ্গ যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম। এই কাহিনীর সঙ্গে যাঁহাদের নাম যুক্ত সেই অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, রাজশেখর বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও প্রিয়রঞ্জন সেন—ইঁহারা কেহই আজ জীবিত নাই। এতদ্ব্যতীত আরও দুই ব্যক্তি যাঁহাদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে উহ্য রাখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জনের সঙ্গে একসময় আমার গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অবিকল্প হয়ত আমার বয়সের চাপল্যবশতঃ কালে তাঁহার সঙ্গে আমার মনান্তর ঘটে। তবুও এই পণ্ডিতের আমার প্রতি শুভেচ্ছা ছিল তেমন একাধিক পরিচয় পাইয়াছি। এই উভয় ব্যক্তিও স্বর্গগামী হইয়াছেন। আমিও হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী বনে যাওয়ার বয়স একযুগ পূর্বেই অতিক্রম করিয়াছি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগ-সংশ্লিষ্ট এই কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

আমি গ্রিফিত পুরস্কারের জন্য 'বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়' শীর্ষক নিবন্ধ দাখিল করিয়াছিলাম। অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রমোহন বসু তাহা জানিতেন। আমার নিবন্ধ দাখিলের ৯।১০ দিন পরে একদিন অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় আমাকে একা পাইয়া কাছে ডাকিয়া মৃদু কণ্ঠে জানাইলেন যে আমার নিবন্ধের একমাত্র পরীক্ষক হইয়াছেন—রাজশেখর বসু। রাজশেখর বসু মহাশয় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সভাপতি। মণীন্দ্রমোহন আরও বলিলেন, শ্যামাপ্রসাদের নাকি এই মানুষের পাণ্ডিত্যের অবিকল্প ইহার সততা ও

CENTRAL LIBRARY

আদর্শনিষ্ঠার উপর বিশেষ আস্থা আছে। তাই চলন্তিকা অভিধানের সম্পাদক ও পরিভাষা সমিতির সভাপতিকে অভিধান সম্পর্কীয় আমার এই নিবন্ধের একমাত্র পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। ছাত্রবৎসল অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন আমার প্রতি স্নেহবশেই এই গোপন সংবাদ আমাকে দিয়াছিলেন। আমি এই সংবাদ জানিয়া খানিকটা বিমর্ষ হইয়া উঠিলাম। রাজশেখরের কজ্জলী, গড্ডলিকা প্রভৃতির অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকের মধ্যে আমিও একজন। এই মানুষের পাণ্ডিত্য, সরস রসিকতা, উদারতার কথা আমার একাধিক পরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু ইঁহার একান্ত পরিচিত গোষ্ঠীতে এমন দুই ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা আমার উপর—বিষ্টি। ইঁহাদের একজন আমার লিখিত অভিধান বিষয়ক একটি প্রবন্ধের ২১ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই কথা স্মরণ করিয়া স্বভাবতই আমার মন চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ইতোমধ্যে আমার সহিত একদিন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দেখা হইলে আমি তাঁহাকে রাজশেখর বসুর আমার নিবন্ধের একমাত্র পরীক্ষক হওয়ার সংবাদ জানাই। শুনিয়াই বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে—উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আমার নিবন্ধ গিয়াছে। আমি তাঁহাকে রাজশেখরের একান্ত পরিচিত গোষ্ঠীর দুই ব্যক্তির নাম করিয়া আমার আশঙ্কার কথা বলি, আমার কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও যেন খানিকটা চিন্তিত মনে হইল। বলিলেন—'রাজশেখর বাবু খাঁটি মানুষ। তাঁর অনুগতদের কথায় নিশ্চই তোমার উপর অবিচার করবেন না।' ৭।৮ দিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তাঁহার স্বভাবসুলভ, মুখমণ্ডল হাসি ও কৌতুকে উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন—'তোমার থিসিস পড়ে রাজশেখর বাবু খুব খুসী হয়েছেন হে।' আমার মন নানা সন্দেহ ও অশুভ আশঙ্কায় দোদুল্যমান। রাজশেখর বসু কোন নিবন্ধের পরীক্ষক হইয়াছেন তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিবেন এরূপ মনের করার দূরতম সম্ভাবনা নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পক্ষেও আমার নিবন্ধ রাজশেখরের নিকট গিয়াছে কি না ইহা জিজ্ঞাসা করাও সম্ভব নহে। D. Phil., Ph. D. প্রভৃতি থিসিসের উপর লেখকের নাম থাকে। কিন্তু গ্রিফিতের থিসিসের উপর লেখকের নাম থাকে না—থাকে 'মটো' (Motto)। এরূপ অবস্থায় তিনি কি ভাবে বুঝিলেন যে আমার নিবন্ধ পড়িয়া রাজশেখর খুসী হইয়াছেন—ইহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই—তিনি রাজশেখরের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র জন্য অভিধান, শব্দ, অর্থ ও বিশেষ ভাবে বাংলা অভিধানের ইতিহাস লেখার জন্য রাজশেখরকে অনুরোধ করেন। চলন্তিকা সম্পাদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সভাপতি রূপে একমাত্র রাজশেখরই এই সম্পর্কে লেখার যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি নাকি স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তিনি চলন্তিকা সম্পাদন করিয়াছেন এবং পরিভাষা সমিতির সভাপতিও বটে কিন্তু বাংলা অভিধানের ইতিহাস তাঁহার জানা নাই। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—'কতদিনের মধ্যে আপনার অভিধানের ইতিহাস পেলে চলবে।' বিদ্যাভূষণ মহাশয় উত্তরে বলিলেন ৮।১০ মাসের মধ্যে পেলেও চলবে'। ইহা শুনিয়া নাকি তিনি বলেন যে কয়েক মাস পরে হইলে বাংলা অভিধানের এক চমৎকার ইতিহাস পাইবেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কার্য সিদ্ধ হইল। আমার নিবন্ধ নিশ্চয়ই রাজশেখর পাঠ করিয়াছেন এবং খুসী হইয়াছেন মনে করিয়া প্রসন্নচিত্তে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমি এই কথা জানিয়া মনে মনে খানিকটা আশান্বিত হইলাম বটে কিন্তু আমার বিপক্ষ দলের কথা স্মরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। এদিকে অন্যান্য সকল থিসিসের পরীক্ষকরা তাঁহাদের অভিমত পাঠাইয়া দিয়াছেন শুধু আমার নিবন্ধ সম্পর্কে অভিমত আসে নাই। কয়েকবার Reminder যাওয়ার পর রাজশেখর নিজে এই নিবন্ধ পরীক্ষার অনুপযুক্ত এই মন্তব্য

CENTRAL LIBRARY

করিয়া নিবন্ধ ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।* এই গোপন মন্তব্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরতলার কয়েকজনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল। যথাসময় ইহা আমারও কর্ণে পৌঁছিল। আমি যে আশঙ্কা করিতেছিলাম তাহাই ফলিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেহ কেহ বলিলেন যে কয়েকমাস পরে কেহ নিবন্ধ ফেরৎ দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার অসুস্থ থাকায় এক নিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ দিয়াছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েকমাস পরে ফেরৎ দিবার নিদর্শন আর নাই। এরকম আলোচনাও হইল—হয় এই নিবন্ধ অত্যন্ত অনুপযুক্ত। নিবন্ধ-লেখকের পক্ষে এই অনুপযুক্ত নিবন্ধকে স্বীকৃতি দানের জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি Reject না করিয়া, নিজে অনুপযুক্ত এই কথা বলিয়া নিবন্ধ ফেরৎ দিয়াছেন। অথবা এই নিবন্ধ উপযুক্ত, নিবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধদল তাহা Reject করার জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি এ নিবন্ধের পরীক্ষক হওয়ার অনুপযুক্ত বলিয়া তাহা ফেরৎ দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেহ কেহ জানিতেন যে রাজশেখর বসুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। এবং আমার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করার মত লোকও ছিল না। এই গোপন সংবাদ যখন বেশ খানিকটা জানাজানি হইয়া পড়িল—আমি শ্যামাপ্রসাদের বাড়ী গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম এবং বলিলাম আমি দীনেশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র—আমার উপর কেহ কেহ খুশী নহেন ইহা তো আপনি জানেন। আমার নিবন্ধের পরীক্ষক সৎ লোক তাই তিনি এতদিন পরে নিবন্ধ পরীক্ষা না করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছেন। **I reject the Thesis** শুধু এই বাক্য লিখিয়া নিবন্ধ ফেরৎ পাঠাইলে সকল আপদ চুকিয়া যাইত। কিন্তু ইনি তাহা করেন নাই। আপনি আমার নিবন্ধ ভারতের বাহিরে কোথাও পাঠাইয়া দিন। টমসন সাহেব বা স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের বাংলার কোন অধ্যাপকের নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন। আমার নিবন্ধে বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস, বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী প্রভৃতিতে রক্ষিত বাংলা অভিধান সমূহের উল্লেখ করিয়াছি। সকল অভিধান ইংলণ্ডে নাই সত্য। কিন্তু আমি যে ভঙ্গিতে আলোচনা করিয়াছি, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতরা এই নিবন্ধ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত নিশ্চয়ই দিতে পারিবেন। আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি নিরপেক্ষ পণ্ডিতের বিচার চাই। শ্যামাপ্রসাদ সকল কথা জানিতেন, তিনি আমার কথা শুনিয়া আরও গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—'তোমার Thesis এখন আর ভারতের বাইরে পাঠানো চলে না। তোমার Thesis-এর জন্য অন্যান্য সকল Thesis-এর **Result withheld** হয়ে আছে। আমি দেখছি, উপযুক্ত ব্যক্তিই তোমার Thesis পরীক্ষা করবেন।' আমি চিন্তাভারাক্রান্ত মন লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দিনদশেক পরে আমার বাসার একতলার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া দু'তলার জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দরজার কড়া নাড়িতেছেন। তিনি আমার একতলার ভিতর বারান্দায় আসিয়াই বলিলেন—'তোমার থিসিস এবার আমার কাছে এসেছে।' আরও বলিলেন এবার নাকি দুই পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এম. এ পি. আর. এস, কাব্যতীর্থ, অপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়। 'তোমার Thesis সম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর মনে সংশয় তুমি কি সকল বই দেখে লিখেছ।' বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে আমার Thesis-এর প্রত্যেক টাইপ করা পৃষ্ঠা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং আমার বক্তব্যসমূহ যে অভিধানের মুদ্রিত বিভিন্ন সংস্করণ অথবা অন্যান্য মুদ্রিত আকর হইতে লওয়া ইহা ভালরূপে জানিতেন তবুও প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়কে ইহা বলিতে

*No. 28. Read a letter dt. the 20th June, 1938, from Mr. Rajsekhar Bose, M. A., a member of the Board of Examiners for the Griffith Memorial Prize in letters for the year 1938, returning a thesis sent to him for adjudication saying that he does not find himself competent to judge many of the matters dealt with in the thesis and expressing regret for not sending back the thesis earlier owing to oversight.—University of Calcutta Minutes of the Syndicate for the year 1938, Part II. P. 2053

CENTRAL LIBRARY

অনিচ্ছুক ছিলেন মনে করিয়া আমি বলিলাম—পরীক্ষকেরা তো ইচ্ছা করিলে পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা লইতে পারেন। আমাকে মৌখিক পরীক্ষা দিবার জন্য নির্দেশ দিন। অধ্যাপক সেন আমার ৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই নিবন্ধের যে কোন তিনটি পৃষ্ঠা বাহির করিয়া এই তিনপৃষ্ঠায় যাহা লিখা আছে তাহা মূল অভিধান বা অন্যান্য আকর গ্রন্থ হইতে অথবা আমার সংগৃহীত ভারতের বাহিরের কোন কোন গ্রন্থের 'ফটোষ্টেট' কপি দ্বারা যদি নির্ভুল প্রমাণ করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমার প্রত্যেকটি মন্তব্য নির্ভুল বলিয়া অভিমত দিতে হইবে। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে আবার দেখা হইল। বলিলেন, তাঁহারা আমার নিবন্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়াছেন। হাসিয়া বলিলেন 'তোমাকে ইণ্টারভিউতে ডাকার প্রয়োজন নাই।' আমি পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ১৯৩৭ ইং গ্রিফিত পুরস্কার আমাকে এবং ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্তকে যুক্তভাবে দেওয়া হয়। ডক্টর দত্ত গত বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে অবসর লইয়াছেন। আমি গ্রিফিত পুরস্কার পাওয়ায় শ্যামাপ্রসাদকে 'কৌশলী' বলিয়া পত্রিকাবিশেষে কটূক্তি করা হইয়াছিল।† পত্রিকাবিশেষের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমি বহুদিন শ্যামাপ্রসাদের কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি। আমার মনে এই ভাবিয়া দুঃখ হইয়াছিল যে এই শ্রদ্ধেয় মানুষ আমার জন্য অন্যায় সমালোচনার পাত্র হইয়াছেন। আমাকে অন্যায়ভাবে কৌশল করিয়া পুরস্কার পাওয়াইয়া দিয়াছেন কিনা এ সংবাদ শ্যামাপ্রসাদই ভাল জানিতেন। ইহার বেশ কয়েকমাস পরে একদিন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে শ্যামাপ্রসাদ নাকি আমাকে Part-time lecturer এবং এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন।

† 'শ্যামাপ্রসাদ কৌশলী লোকষতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যকে গ্রিফিত পুরস্কার পাওয়াইয়া দিয়াছেন।—শনিবারের চিঠি।

CENTRAL LIBRARY

স্মৃতিকণা

ফুলরেণু গুহ

অর্ধ শতাব্দী না হলেও প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর আগের কথা লিখবার জন্য অনুরোধ এসেছে। এ অনুরোধ যাদের কাছ থেকে এসেছে তাঁদের কথা না রেখে উপায় নেই কিন্তু তাঁরা কি করে বুঝবেন যে সাধারণ মানুষের জীবন ধারাকে যেমন কেউ মনে রাখে না সাধারণ মানুষেরও জীবনের স্মৃতিকথা তেমনি সবখানি মনে থাকে না।

তাছাড়া এ কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছে তার মধ্যে অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে। এল সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ, এল বৃটিশের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মহামারী, এল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, দেশবিভাগের ফলে এল লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের স্রোত। বাংলাদেশ থেকে খণ্ডিত হয়ে এ দেশ নাম গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ। অবশ্য এত সব দুর্যোগের মধ্যেও ভারতবর্ষ হলো স্বাধীন। জাতির জনজীবনে নূতন ঢেউ এসে আঘাত করল।

স্বাধীনতা লাভের পর দেখা দিল দেশ গড়ার কাজ। এক নূতন উদ্যম দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূর। নূতন ভারত গড়ে তুলবার জন্য দেশমাতৃকার ডাক পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে। যা কিছু জীর্ণ যা কিছু মলিন সব ফেলে দিয়ে নূতন সজ্জা নূতন অস্ত্র ধারণ করে এগিয়ে আসবার আহ্বান প্রতিধ্বনিত হল প্রাণ থেকে প্রাণে। এর মধ্যে পুরাতনকে স্মরণ করবার, স্মৃতিসাগর মন্থন করবার অবসর কোথায়? পিছন ফিরে তাকাবার সময় কোথায়?

শুধু কি এই? এর মধ্যে চীন আক্রমণ করল ভারতকে, আক্রমণ করল পাকিস্তান। আবালবৃদ্ধবনিতা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার পণ নিয়ে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে গণনির্বাচন পর্ব শেষ হতে মনে হলো বিভেদের বুঝি অবসান হ'লো। এবার বোধহয় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে দুই দেশের মধ্যে। তার পরেই পূর্ব পাকিস্তানে গর্জে উঠল বিপ্লব। এরই পটভূমিতে নয় মাস ধরে ভারতকে তার গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসের মূল্য দিতে হ'লো। পশ্চিম বাংলার পাশে গড়ে উঠল নূতন স্বাধীন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। মনে হ'লো এবার বোধহয় একটু পিছন ফিরে দেখা যেতে পারে।

দেখতে গিয়ে অনেক কিছুই মনে পড়ছে কিন্তু কোনটা লিখি কোনটা ছাড়ি। যা লিখব ভাবি তার সবটাই কি ঠিক মনে আছে। অনেক দিনের পথ এগিয়ে এসে পিছন ফিরে চাইলে অনেক কিছুই ঝাপসা আবছায়া মনে হয়। অনেক বিস্মৃতির প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বিশেষ করে আধুনিক ইতিহাসের যে ঝঞ্ঝাসঙ্কুল অধ্যায় আমাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে, তার এপারে দাঁড়িয়ে ওপারটাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার আশাই করা যায় না। তবু সুযোগ পেয়ে ছাত্রীজীবনের আনন্দের কথা স্মরণ করে স্মৃতিভাণ্ড আলোড়িত করে চলেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার আবহাওয়া এখনকার চেয়ে অনেক তফাৎ ছিল। এখনকার তুলনায় কিছু না হলেও মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তখনও কিছু সংখ্যাতে। কিন্তু ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর ছিল। তাই মেয়েদের আড্ডা ছিল মেয়েদের কমনরুমে। আর সেই কমনরুমের সামনে সহ-ছাত্রদের ভিড় জমে না গেলেও কিছু আসা যাওয়া ত ছিলই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ঘর বেঁধেছেন। এতদিন বাদে এ বয়সে নাম করে আর তাঁদের সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে নাই বা দিলাম।

CENTRAL LIBRARY

মনে পড়ে অনেকের কথা। ৺ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বৃদ্ধ শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রী বেশ কিছু দিন ক্লাসে না এলেই বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে খোঁজ করতেন তার কি হ'লো।

মনে পড়ে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ৺ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রকে যাঁরা ছাত্রীদের কোনদিনই সহজ করে নিতে পারেন নি। 'আপনি' সম্বোধন ছাড়া ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। সকলকে চিনতেন কি না তাও সন্দেহ হয়।

মনে পড়ে ৺ মণীন্দ্রমোহন বসু ও ৺ ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তকে—যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সমান ভাবে গ্রহণ করতেন, সহজ করে নিতে পারতেন।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা বলা হলো না। তা হলো, এ সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে সার্থক করতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অবদানের মধ্যে এও একটি সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিভাগে পড়াবেন, এ কথা কানে শোনা মাত্র তখনকার ছাত্রছাত্রীদের মনে যে কি অবস্থার উদয় হয়েছিল, তা শুধু অনুভূতি দিয়ে বোঝা যায়, কাউকে বোঝানো যায় না।

কিন্তু ক্লাস করবার দিন সময় কিছু ঠিক ছিল, তা নয়। কবির সুবিধা অনুসারে কখনও ক্লাস নিতেন। পড়াতেন কবি তাঁর নিজের লেখা, বোঝাতেন তারই ভাষাকে, ভাবকে ব্যাখ্যা করতেন। তার ভিতর দিয়ে তাঁর লেখা সহজ হোতো না জটিল হোতো তা বুঝবার মত ক্ষমতা কি সকলের ছিল?

একদিন যথাসময়ে এসেছিলেন অনেকক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করেছিলেন হাসিমুখে, সেদিন সব ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফটো তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আজ শুধু এ কথা মনে হয় যে সে সময়ের ছাত্রছাত্রীরা ধন্য হয়েছে এ মহাপুরুষের অতি নিকটে আসবার, কাছে বসবার, কথা শুনবার, প্রশ্ন করবার অধিকার পেয়ে।

আরও ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো কত কথা মনে ভিড় জমেছে, একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করে তুলে ধরা কি যায়? তবু সব চিন্তার শেষে ছাত্রীজীবনের সুখ-স্মৃতির একটুখানি আভাস মনটাকে মধুসিঞ্চিত করে রাখে।

আজকে এই স্মৃতির কণিকা গ্রন্থনের শেষে শ্রদ্ধা জানাই সব শিক্ষকদের যাঁদের কাছে আমরা অনেক রকমে ঋণী। গুরুর ঋণ পরিশোধ করার স্পর্ধা কেউ রাখে না, তাঁদের কাছে রইল শুধু প্রণতি। আজকে স্মরণ করি সব সহপাঠীদের। তাঁরা কে কোথায় আছেন আজ জানি না। লেখার মাধ্যমে তাদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

CENTRAL LIBRARY

চল্লিশ বছর আগে

কল্যাণী কার্লেকর

চল্লিশ বছর পূর্ণ হ'তে চলল, ১৯৩২ সালে ডায়োসেসান কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে একটা অত্যন্ত অবুঝ ছেলেমানুষি কারণে বাংলায় এম-এ পড়তে এসেছিলাম। তারপর থেকে বাংলায় এম-এ হওয়ার জন্য কর্মজগতে অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছে কিন্তু মনোজগতে কোনদিন ক্ষতিবোধের কোনো কারণ দেখিনি। বি-এতে পড়েছিলাম ইংরেজির সাম্মানিক পাঠ এবং সংস্কৃত ; আর এম-এ-তে পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, বাংলা। ইংরেজিতে এম-এ পড়লে ভাষাদৃষ্টির এই প্রসার পেতাম না। পরে বিবাহসূত্রে মারাঠী-গুজরাটির সম্মুখীন হয়ে লাভটা আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি।

তবু এখনকার বাংলার ছাত্রদের অবধানের জন্য একটা নালিশ এখানে লিখে রাখি। বাংলা আমাদের রাজ্য ভাষা, কিন্তু ছাত্রজীবনে যারা বাংলার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে তারা এই পশ্চিমবঙ্গেই কোনো স্বীকৃতি পায় না। কর্মক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বাংলার ছাত্রকে অগ্রাহ্য করে অন্য বিষয়ের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছাত্রকে নির্বাচন করা হয়। এখানে বাংলার উৎকৃষ্ট ছাত্র বলে তাদের উল্লেখ করছি না যারা বাংলা মাতৃভাষা হওয়ার ফলে কেবল এই বিষয়ের বিশেষিত পাঠে সাফল্য পেয়েছেন, আমি তাদের কথাও বলছি যারা আগাগোড়া ভালো ছাত্র এবং বাংলাতেও ভালো। এই ক্ষেত্রে একটা ধারণা কাজ করছে যে বাংলার ছাত্রেরা বাংলাই পড়াতে পারে, আর কিছু পারে না, আবার এই বাংলা পড়ানোর কাজটাও ইংরেজির ছাত্রেরা যেমন পারে বাংলার তেমন নয়।

বাংলার ছাত্রদের এই অস্বীকৃতির একটা কুফল হয়েছে যে ভালো ছাত্রেরা বাংলা পড়তে চায় না, তারা জানে যে বাংলায় ভালো ফলের চেয়ে অন্য বিষয়ে সাধারণ ফলই কর্মজগতে বেশি ফলপ্রসূ।

আমাদের সময়ে 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগ' এই নাম ছিল না, তখন বলা হ'ত—'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার্স'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বহুভাষী ভারতবর্ষে ঐক্য স্থাপনের জন্য যে নীতির নির্ধারণ করেছিলেন তা হ'ল এই যে সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতে শিক্ষালাভ করবে কিন্তু যারা ভাষাবিদ্ হ'বার জন্য উচ্চস্তরে বাংলার চর্চা করবে তাদের সেই সঙ্গে অন্য একটি ভারতীয় ভাষা অবশ্যপাঠ্য হবে। তাঁর আশা ছিল যে এই নীতি যদি দেশের সর্বত্র অনুসৃত হয় এবং প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার ছাত্রেরা যদি নিজ ভাষার সঙ্গে অন্য একটি আঞ্চলিক ভাষা পড়তে বাধ্য হয় তবে প্রত্যেক ভাষার স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠতা বজায় রেখেও একটা আন্তর্ভাষিক ঐক্য স্থাপিত হবে এবং ভারতের জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠবে।

আজকের হিন্দি প্রাধান্যমূলক সরকারি ত্রিভাষা সূত্র যেখানে বিভেদের সৃষ্টি করেছে সেখানে আশুতোষের নীতি ঐক্যের সোপানস্বরূপ হ'তে পারতো।

আমি ওই 'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার্স' নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হলাম ১৯৩২ সালে আর এম-এ পাশ করে বেরিয়ে এলাম ১৯৩৪-এ। বিহার-প্রবাসী কন্যারূপে হিন্দীর সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় থাকাতে আমি বাংলার সঙ্গে হিন্দীভাষা পাঠ্যরূপে বেছে নিয়েছিলাম।

তখন আটটি পত্রের প্রথম চারটিতে বাংলা সাহিত্য পড়ানো হ'ত। এগুলির বিষয় বিভাগ ঠিক মনে নেই।

CENTRAL LIBRARY

পরের চারটিতে ছিল পালি ও প্রাকৃত মিলিয়ে এক, হিন্দীর দুই আর ভাষাতত্ত্বের এক পত্র। আজকালকার ছাত্রেরা হয়তো শুনে অবাক হবেন যে শেষের চারটি পত্রের উত্তর ইচ্ছা করলে ইংরেজিতে লেখা যেত।

আশুতোষ ভবনের দোতলায় বাংলা বিভাগ ছিল : সেখানেই দুটি মাঝারি মাপের ঘরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস হ'ত। শ্রেণীতে আমরা তিরিশজন ছেলে ও ছয়জন মেয়ে ছিলাম। আজকের ছাত্রছাত্রীর মতো তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ মেলামেশা, তুইতোকারি ছিল না। অধ্যাপকের সামনাসামনি ও ডানদিকের বেঞ্চিতে ছেলেরা বসতো আর মেয়েরা বসতাম বাঁদিকের দুটো বেঞ্চে। আমরা অধ্যাপকের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকতাম ও বেরোতাম।

এরকম অবস্থাতেও ছেলেমেয়েতে যে হাসিঠাট্টা ও মেলামেশা হ'তনা তা নয়, এবং মাঝে মাঝে সমাজপতিদের ভ্রূকুটিভঙ্গি অবহেলা করে সহপাঠীরা বিয়েও করে ফেলতো।

তখন মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করার একটা উপায় ছিল বোর্ডে লেখা। আমরা ক্লাসে ছ'জন মেয়ে ছিলাম বলে একদিন লেখা হ'ল—

ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে!'

আমরাও ছেলেদের নাম দিতাম যদিও সেগুলি তাদের জানতে দেওয়া হ'ত না। উদাহরণ-স্বরূপ তার কয়েকটি লেখা যায়, যেমন,—ভালো ছেলে, পেঁয়াজ, শেয়াল, ভেড়া, ভেড়ামতন ইত্যাদি।

সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করতে পারি। 'ভালো ছেলে' সত্যেন্দ্রচন্দ্র দেব মজুমদার শিলংয়ের কোনো কলেজে বাংলার অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন, পরবর্তী খবর জানি না। ইলাকণা গুপ্ত বহুদিন রেলের স্কুলে চাকরি করে এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। অরুন্ধতী সেন এখন যোগমায়াদেবী কলেজের অধ্যক্ষা। লক্ষ্মী চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা হয়েছিলেন, এখন কোথায় আছেন জানি না। সন্তোষ বাগচিকে অনেকদিন দক্ষিণ কলকাতায় দেখেছি, তারপর জানি না।

দীনেশচন্দ্র সেনের প্রিয় ছাত্র, পল্লীকবি জসীমউদ্দীন তখন গবেষণারত ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শুনতে পেতাম। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সম্ভবত দুইবার এপারে আসেন। একবার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে 'বেদের মেয়ে' পল্লীনাটকের দল নিয়ে, অন্যবার বিভিন্ন সাহিত্য সভায় সম্বর্ধিত হন। শুনেছি মুজিবর রহমানের প্রশস্তি কবিতা রচনার অপরাধে গত ২৬শে মার্চের পর তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল।

দেশবিভাগের পর কবি জসীমকে আক্ষেপ করতে শুনেছিলাম—'বাঙালি হিন্দু পরিবারের সংস্কৃতির সংস্পর্শ না পেলে আমাদের ছেলেপিলে মানুষ হবে কি করে?' কিন্তু তারপর বাংলাদেশে তাঁরা বঙ্গসংস্কৃতির যে প্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন তার থেকে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত।

এই বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাদের পরের বছর প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। যাঁরা তাঁর বয়স্ক জীবনের ভাব, চেহারার কথা জানেন তাঁদের পক্ষে তখনকার সেই ছিপছিপে পাৎলা, ছোটখাট তরুণের আকৃতির কল্পনা করা কঠিন হবে।

আমার এম-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার সময়ে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম-প্রয়াসীদের মধ্যে গণ্য ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। আমরা তাঁকে অল্প ক'দিন মাত্র পেয়েছিলাম।

CENTRAL LIBRARY

তারপর প্রধান হয়ে এলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি অত্যন্ত সুন্দর বাচনভঙ্গিতে বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতেন। কীর্তনীয়া হিসেবে তাঁর যশের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন কোনদিন হয়নি।

এখনকার জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। বিরাট পণ্ডিত মানুষটির অধ্যাপনার রীতি চিত্তাকর্ষক ছিল না, তার ওপর তিনি মেয়েদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে পড়াতেন বলে তাঁর অনেক বক্তব্য আমরা বুঝতে পারতাম না। অবশেষে আমরা, মেয়েরা, ঠিক করলাম যে এর একটা সুরাহা করতেই হবে। প্রথম ধাপে ক্লাসে বারবার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের দিকে না চেয়েই উত্তর দিতেন। এ-জন্য পরের পদক্ষেপের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। একদিন ক্লাসে ঢুকবার মুখে মেয়েরা সকলে তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে লাগলাম। উনি সংক্ষেপে বল্লেন—'ক্লাসে'। আমরা মরিয়া হয়ে অনুযোগ করলাম—'ক্লাসে তো উল্টোদিকে ফিরে কথা বলেন, আমরা কিছুই বুঝতে পারি না'। তারপর কিছুদিন তিনি ক্লাসে পড়াবার সময়ে মাঝেমাঝে আমাদের দিকে ফিরে চাইতেন, কিন্তু সে নেহাৎই কয়েকদিন, তারপর যথা পূর্বং তথা পরম্।

প্রিয়রঞ্জন সেন বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের বিষয়ে পড়াতেন, তিনি ভালো বক্তৃতা দিতেন না বটে, কিন্তু তাঁর মতো নিষ্ঠাবান অধ্যাপক আর দেখিনি। আমাদের দিয়ে তিনি নিয়মিতভাবে লেখার কাজ করাতেন, সংশোধন করার সময়ে কেবল দাগ দিয়ে দিতেন না, পৃষ্ঠার পাশে পাশে ছোট ছোট মুক্তার মতো সুন্দর হস্তাক্ষরে টীকা লিখে দিতেন।

মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পড়াতেন। ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত পড়াতেন মধ্যযুগীয় সাহিত্য। শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, নাটক, গদ্য আর রবীন্দ্রনাথ। পালি পড়াতেন শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র যিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। প্রাকৃত কে পড়াতেন তা মনে নেই। হিন্দি বিভাগের প্রধান শ্রীললিতাপ্রসাদ শুক্ল হিন্দি পড়াতেন। এঁকেও যাঁরা ভগ্ন-স্বাস্থ্য শেষ বয়সে দেখেছেন তাঁরা তাঁর প্রথম বয়সের দীর্ঘ, দৃপ্ত আকৃতির কথা কল্পনা করতে পারবেন না।

এর মধ্যে এক সুনীতিবাবু ছাড়া সকলেই গত হয়েছেন। প্রিয়রঞ্জনবাবু আর অধ্যাপক শুক্লের সঙ্গে তাঁদের জীবনের শেষ পর্যন্ত আমার যোগাযোগ ছিল। কয়েক বছর আগে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আগ্রহের সঙ্গে প্রণাম করেছিলাম, মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করাতে বলেছিলেন—'ওঃ সে তো অনেকদিনের কথা'। সত্যিই সে অনেকদিনের কথা, আমি যখন বাংলা পড়েছি তখন এই বিভাগ শিশু ছিল আর যতদিন আগে পড়েছি ততদিনে একটা মানুষ জন্মিয়ে প্রৌঢ় হয়ে যায়, দুটো নোতুন প্রজন্ম পার হয়ে যায়।

এতক্ষণ যাঁর কথা বলিনি, শেষে বলব বলে জমিয়ে রেখেছিলাম, তিনি হ'লেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সময়ে তিনি কমলা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একথা শুনে সবাই বলে—'তোমাদের কি সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা পড়তে পেয়েছ!' কিন্তু আমরা জানি যে আমরা তাঁর কাছে পড়িনি, কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গে তোলা গ্রুপ ফটোটাই সম্বল হয়ে আছে।

এখন যেখানে বহুতল শতাব্দী-সৌধ দাঁড়িয়ে আছে তখন সেখানে বড় বড় থামওয়ালা সেনেট হাউস ছিল। সেনেটের সেই হল ঘরে কমলা বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল: যেখানে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার, সেখানে আমরা একপাশে ভিখিরির মতো উঁকিঝুঁকি করে করে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম।

ঠিক হ'ল তিনি সপ্তাহে একবার আমাদের শ্রেণীকক্ষে আসবেন। এই সূত্রে দু'দিন মাত্র তাঁকে কাছে

CENTRAL LIBRARY

পেয়েছিলাম। দু'দিনই তাঁর বার্ধক্যনত, শ্রান্ত চেহারা দেখে আমরা ব্যথিত হয়েছিলাম। 'বলাকা' আমাদের পাঠ্য ছিল তিনি তার থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। যাকে পড়ানো বলে তা তিনি করেননি, কিন্তু আমরা তাঁর পাঠ শুনে ধন্য হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় দিন খগেনবাবু আমাকে বল্লেন—'তোমাকে ক্লাসে প্রশ্ন করতে হবে'। আমার মন তাতে সায় দিল না, আমার মতে কবিকে তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা করতে বলা অন্যায়। কিন্তু খগেনবাবুর হুকুম নড়বার নয়, তিনি প্রায় ঘাড় ধরে আমাকে বেঞ্চি থেকে উঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঠেলে দিলেন। বলাকার কোনো একটা পাতা খুলে, কোনো একটা ছত্রের তলায় আমার আঙুল ঠেকিয়ে তা কবিগুরুর সামনে স্থাপিত করলেন।

মনে হ'ল আমি যেন ক্লাস ভরা ছেলেমেয়ের নিশ্চল নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যুগ যুগ দাঁড়িয়ে রইলাম, মা ধরণী দ্বিধা হলেন না, কবিগুরু কি কথা বল্লেন আমার কানে ঢুকলো না, কেবল মনে মনে প্রার্থনা করলাম—'গুরুদেব, নিজ গুণে বুঝে নিন্ যে নিতান্ত নাচার হয়েই আমি প্রশ্নের উত্থাপন করেছি।'

আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। বেঞ্চে বসে, একটু সুস্থির হয়ে, কবি-কণ্ঠের আবৃত্তি শুনলাম। হয়তো সেই কবিতাটাই তিনি পড়লেন যার অর্থ আমি বুঝতে চেয়েছিলাম।

CENTRAL LIBRARY

জীবনের পরমতম অধ্যায়

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

জানুয়ারি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগে—(আমাদের সময়ে নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলারস্, বেঙ্গলী) ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র। বিভাগীয় অধিকর্তা স্বনামখ্যাত বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস লেখক প্রধান অধ্যাপক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট. মহোদয় দীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনার পরে কর্মক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁর স্থানে অভিষিক্ত হবেন বিশ্ববরেণ্য অমিতলাবণ্য ভারতপথিক ঋষিকল্প মহামানব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আর সহকারী অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়।

মানবজীবনে ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ্য। গুরুঋণ, দেবঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। গুরুঋণ শোধ ক'রবার (সুযোগ পেয়েছি)—দুর্লভতম সৌভাগ্য লাভ করেছি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ সুযোগ ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পল্লীগ্রাম না হলেও হাওড়াসহর তখনও এতখানি সাবালক হয়ে ওঠেনি। আমি যে অঞ্চলে থাকতাম তা সহর হতে দূরে—শেষপ্রান্তে। সেখানে এমন অঞ্চলও ছিল যেখানে রাত্রে নিরাপত্তা বিপন্ন হ'তো। স্নাতক পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েও নানাকারণে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যোগদান করতে পারিনি। দু'বৎসর পরে সে সুযোগ পেলাম। চোখভরা স্বপ্ন—বুকভরা ধ্যান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যশ্রেণীতে এসে পড়লাম।

দীনেশবাবু বৈষ্ণব কবিতা পড়াবেন। স্বপ্ন কী সত্য হয়। অন্যত্র হয় কিনা জানিনে কিন্তু আমার জীবনে সত্য হল। বিশাল-আয়তনেত্র, কুঞ্চিত দীর্ঘকেশকলাপ—দীর্ঘাকার পুরুষ—পোষাকের বাহুল্য নেই, বৈষ্ণব পদাবলীর একাংশ—

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেলা।
শ্রবণকো পথ দুহু লোচন লেলা॥ আবৃত্তি করতে করতে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। অপূর্ব মিষ্ট কণ্ঠস্বর—উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরঝংকারে পড়লো ভেঙ্গে। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন রাধা অপূর্ব নারীমূর্তি। তাঁকে দেখতে পেলাম—রূপের তরঙ্গ উঠছে; আঁখিতট ভরি দৃষ্টির চঞ্চল সমুদ্র। আমি কোথায়। স্বপ্নময় মুহূর্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব যেন দূরে সরে গিয়েছে।

অনেকদিনের কথাই মনে পড়ে। আর একদিনের কথা বলি। সেদিন পদাবলী আবৃত্তি করছেন—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

রসোদ্গারের এই পদটির তুলনা নেই অথবা চণ্ডীদাসের পদেই আছে। সেদিন বর্ষার সমগ্ররূপ, বর্ষার সমগ্র বেদনা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এই পদটির ব্যাখ্যা আমি করতে সাহস করিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'ভারতী' পত্রিকায় যে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন তা উদ্ধৃত করি—

CENTRAL LIBRARY

'এইপদের ইঙ্গিত এইরূপ—ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি; তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন – পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।'

এত কথা বুঝিনি। কিন্তু অনুভব করেছিলাম যে কাব্যের সৌন্দর্যলোকের পারে আছে আর এক লোক—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—এক অধ্যাত্মলোক। সেদিন আচার্যদেবের পঠন-পাঠনে আমরা সে পথের যাত্রী হয়েছিলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ের বিমুগ্ধতা কাটেনি। বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে পড়তে আজও যখন সেই অধ্যাত্মলোকে প্রবেশ করি তখন নেত্রযুগে জাগে বহুদূর অতীতের একখানি চিত্র—অপাবৃত অধ্যাত্ম-আলোকে স্পষ্ট দেখতে পাই আচার্যদেব দাঁড়িয়ে আছেন, কণ্ঠে তাঁর সুরের প্রদীপ শিখা, তার দীপ্তমনেকবর্ণ, জ্যোতিঃতে তার ভগবানের চরণ সমুদ্ভাসিত। এ জীবনের পারে দাঁড়িয়ে সন্নতমস্তকে আচার্যদেবকে প্রণাম নিবেদন করি, বুঝতে পারি কেন উপনিষদে বলা হয়েছে 'আচার্যদেবো ভব।'

শ্রেণীসভা এখনকার মতো বৃহদায়তন ছিল না; পরিমিতকায়, ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে দশবারোজন, পরিমিত পরিসর কিন্তু অপরিমিত আমাদের সম্প্রীতি ও সদ্ভাব। আচার্যগণের স্নেহ এবং নিবিড়তম সংস্পর্শ ও সাহচর্য অন্যান্য শ্রেণীর ঈর্ষার বস্তু ছিল। তাছাড়া আমাদের চোখে ছিল স্বপ্ন, আর আমরা আচার্যগণের কণ্ঠস্বরে এবং সুমিত ভাষণে অনাগত, অভাবিত দূর সৌন্দর্যের পদধ্বনি শুনতে পেতাম। বৌদ্ধ গান ও দোঁহায় ফিরে গিয়েছি বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভবের পরম লগনে—

ভবণই গহন গম্ভীর বেঁগে বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

আচার্যদেব বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভের স্নেহমধুর কণ্ঠস্বরে যে ভবনদী চোখে পড়েছিল তাজও তার গম্ভীরবেগ দৃষ্টি হতে মুছে যায়নি।

যাক্ আপাতত দীনেশবাবুর পঠন-পাঠনের কথাই শেষ করি অবশ্য অশেষের যদি শেষ থাকে।

দীনেশবাবু 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' পড়াবেন। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছি; চোখে অলকার স্বপ্ন, বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় সুরু হয়েছে; সে যে আসে আসে, পায়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। দীনেশবাবু শ্রেণীকক্ষে এসে দাঁড়ালেন, পড়াবেন 'মহুয়া'র বেদনামধুর কাহিনী। মহুয়ার সঙ্গে নদেরচাঁদের দেখা হয়েছে। এ দেখা তো চোখের দেখা নয়। অন্তরের অন্তরতম সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে। ঢেউএর চূড়ায় চূড়ায় সাতরঙা স্বপ্ন—তাকে পেতে হবে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

CENTRAL LIBRARY

কী করি উপায় ? তোমায় না পেলে কন্যা জীবনমরণ সব যে বৃথা হয়ে যায়। মহুয়া হর্ষে ডগমগ হয়ে মুখে বলে, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মর। নদেরচাঁদ সহর্ষ বিষাদে উত্তর দেয়—

কোথায় পাবো কলসী, কন্যা
কোথায় পাবো দড়ি ?
তুমি হও গহীন গাঙ
আমি ডুব্যা মরি।

খাঁটী পূর্ববঙ্গের ভাষা না মানবজীবনের ভাষা তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। এ ভাষা মরমে প্রবেশ করে একটি দিগন্তকে উদ্ঘাটিত করে যেখানে সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার—এমন সমুদ্র পারে 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' পড়ানোর ব্যাপারে এমন তন্ময় হতে কাউকে দেখিনি—দীনেশবাবু যেন গীতি-কবিতা প্রাণবন্ত। তাঁর কথা যখন মনে করি নেত্রে ভাসে পল্লীবাংলার দিগন্তবিস্তৃত সুদূরলীন প্রান্তর, নদীতে কলধ্বনি উঠেছে, নেমেছে কোমল নীলিম ছায়া শ্যামল বনানী ঘিরে, উঠছে বাঙলার প্রাণমন্ত্র যা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে আকুল ক'রে তোলে প্রাণ। সেদিন এর পরিচয় পেয়েছিলাম।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ছোটখাটো মানুষটি কৃষ্ণাভ জ্যোতিঃসংহত মূর্তি, সদানন্দ পুরুষ, জ্ঞানস্পৃহা, অনুসন্ধিৎসা ও ভক্তিপ্রবণতার অপূর্ব সমন্বয়। বৌদ্ধগান ও দোঁহা (চর্যাগীতি) পড়াতেন সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—তাঁর কণ্ঠস্বর ও ভাষণের মাঝ দিয়ে একটি ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হ'তো। একদিন পড়ালেন—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥.....
মাথে শম্ভুসম থোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর॥

ভগবানকে পাবার জন্য এই যে চিত্তের বেদনাময় আকুতি এর তুলনা কোথায় ? নারীজীবনের পরম সম্পদ, আমৃত্যু কামনা সিঁথির সিঁদুর মুছতে এবং হাতের শাঁখা চুরমার করে ভাঙতে চাইছেন—যোগিনীর মূর্তি ধরে দেশান্তর যেতে চাইছেন।

আচার্যদেব 'যোগিনী' শব্দটির উপর জোর দিলেন। সামাজিক বর্ত্ম অতিক্রম করে এখানে কবিতার আধ্যাত্মিক বর্ত্মে উন্নয়ন ঘটলো। এই সূত্রে দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ ও অনুরাগ' শীর্ষক পদাবলীর একাংশ—

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

অনুবৃত্তি করলেন। অবশ্য শেষোক্ত পদটির সৌন্দর্যের ও অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যের তুলনা বিরল। 'এই পদে চণ্ডীদাস রাধার

CENTRAL LIBRARY

পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখা গিয়াছিল। ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইতেই মহাপ্রভু একা নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন—চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।'.

যতদূর মনে পড়ে দীনেশবাবুও এই যোগিনীমূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুবর্তন সংসারবর্ত্মে এবং সমাবর্তন অধ্যাত্মমার্গে। বলাবাহুল্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার—গীতি-কবিতার কেন সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ইহাই পরম সত্য। এখানে অহং-এর আত্মা-পরিণাম ঘটে বিশ্ব এখানে বিশ্বেশ্বরের পদে লুণ্ঠিত—সান্ত এখানে অনন্তের যাত্রী। কবিগুরুর ভাষায় **Art is an expression of aspiration to infinity.**

আচার্যদেবকে প্রণাম নিবেদন করি।

হস্তলিখিত পুঁথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু পড়াবেন মেঘনাদবধ কাব্য। যথাসময়ে শ্রেণী-কক্ষে এসে দাঁড়ালেন—সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ নাতিস্থূল দেহ, হাতে 'মেঘনাদবধ কাব্য'। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেনের মধুসূদন সম্পর্কে মনোজ্ঞ এবং অতুলনীয় আলোচনা পড়েছি। পরম আগ্রহে অপেক্ষা করছি এই অমর কাব্য প্রসঙ্গে কী নূতন কথা ইনি বলবেন। মিষ্ট কণ্ঠস্বর, একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা শেষে কাব্য পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রথম কয়েক ছত্রের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে আছে তা অতুলনীয়, অনস্বীকার্য সুন্দর। তিনি সহজেই সেই অংশটুকু পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন এই ছত্রত্রয়ের কাছে—

কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্মিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?

উর্মিলাবিলাসী অর্থাৎ লক্ষ্মণ। এই একটিমাত্র বাক্যাংশে মেঘনাদবধ কাব্যের রামানুজ লক্ষ্মণের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। উর্মিলাবিলাসী অর্থাৎ উর্মিলাতে বিলাস যাঁর—ইনি কী ইক্ষ্বাকুচন্দ্রমা রামচন্দ্রের ত্যাগভূষণ বীরর্ষভ লক্ষ্মণ? কখনই নয়। মেঘনাদবধ কাব্যে লক্ষ্মণের যে চৌর্যবৃত্তি—যে বীরত্বহানি ও কাপুরুষোচিত হীনবৃত্তি অবলম্বন বর্ণিত হয়েছে তার সম্যক্ এবং যথার্থ পরিচয় এই সমস্ত পদে আছে। অস্ত্রহীন মেঘনাদকে তিনি অন্যায় সমরে হত্যা করেছেন—তিনি ক্ষত্রিয়-কুলগ্লানি। তাই তাঁর নামান্তর 'উর্মিলাবিলাসী'। শ্রীমধুসূদনের শিল্পসৌন্দর্যে এবং অধ্যাপকবরের ব্যাখ্যায় বিমুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

পরবর্তীকালে তাঁর কাছে এই কাব্যের প্রথম ছত্রের 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি' এই অংশে 'সম্মুখ' শব্দটির অভূতপূর্ব সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম যে 'সমরে'র বিশেষণ রূপে কবি প্রচণ্ড বা ভীষণ এই শব্দ ব্যবহার করেন নি। বীরসত্তম বীরবাহু তো লক্ষ্মণের মতো কৌশলে যুদ্ধ করেন নি, তিনি বীর যোদ্ধার মতোই 'সম্মুখ সমরে' যুদ্ধ করে দেশের জন্য প্রাণদান করেছেন। তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন কবি তা অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে, যূথনাথ সহ গজ যূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রবি

CENTRAL LIBRARY

গগনে ; বিদ্যুৎ ঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

আর রামচন্দ্র আহবে প্রবেশ করলেন—

অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে !

উভয়ত্রই বীরত্বের শৌর্যের পরাকাষ্ঠা। কবি মধুসূদনের শব্দ ব্যবহারে সংযত মহিমা ও সতর্ক বিচক্ষণতা সর্বত্র লক্ষিতব্য। অধ্যাপক বসুর কাছে এই নির্দেশ পেয়েছিলাম। এ যে কত বড় সম্পদ পরবর্তীকালে দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যাপক-জীবনে তা উপলব্ধি করেছি। কাব্যপাঠে সুতীক্ষ্ণ অথচ রসময় দৃষ্টিলাভে সমর্থ হয়েছি। বারে বারে তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছি।

মঙ্গলকাব্যের মাঙ্গল্য সম্পদ এনে দিলেন প্রৌঢ় অধ্যাপক শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত। শালপ্রাংশু মহাভুজ, বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, অবশ্য দুই বাহু লোহার শাবল নয়, স্নেহের নির্ঝর। বলিষ্ঠ মধুর ভাষণ। কালের তমিস্রা ভেদ করে ব্যাধ-দম্পতী কালকেতু-ফুল্লরার সরল দাম্পত্য জীবনের একটি অপূর্ব ছবি চোখে পড়ছে। স্বর্ণ-গোধিকারূপিণী চণ্ডীদেবীকে তালপাতার ছাউনি নড়বড়ে ঘরে বেঁধে রেখে অন্নসংস্থানের উদ্দেশে দু'জনেই বেরিয়ে পড়েছেন। ফুল্লরা গৃহে ফিরে—

কুঁড়ার দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্রমুখী।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্নের উত্তরে সে যখন শুনলো—

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে॥

সে তো আর বোঝেনি ধনুকের গুণে নয়। সে বুঝলো চারিত্রিক ঐশ্বর্যে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। দরিদ্রজীবনে একমাত্র সম্পদ স্বামীপ্রেম, আজ বুঝি তাও হারাতে বসেছে। কিছুতেই রমণীকে বোঝাতে পারলো না। তখন 'নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী' স্বামীর উদ্দেশে গোলাহাটে ছুটলো। সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলা রাতা॥

ফুল্লরা উত্তর দিল—

সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার যোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥

CENTRAL LIBRARY

শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্বার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥

কালকেতু কিছু না বুঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিল—

সুবাক্ত করিয়া বামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥

ফুল্লরা বললে—

সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী।
তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বস্তা দেখি॥

উভয়ে ঘরে ফিরে দেখে—

ভাঙ্গা কুঁড়া ঘরখানি করে ঝলমল।

সরল দাম্পত্য-কলহের অপরূপ চিত্র। সেদিন শ্রেণীকক্ষে কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য-জীবনের কলহমধুর অপরূপ ছবি নেমে এসেছিল। আর চোখে পড়ছিল কবিকঙ্কণের দুষ্ট মধুর হাসি।

অধ্যাপক-প্রবরের পঠন-পাঠনের গুণেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী আমাদের সময়ে অধ্যাপনা-কাজে যোগদান করলেন। ঋজুশির, স্বল্পকায় তারুণ্যের প্রতীক শুভ্র জ্যোতির্ময় মূর্তি, প্রথমদিনেই প্রীতির রসে আমাদের মনকে লুট করে নিয়েছিলেন। এমন মধুবাক্ পুরুষ আমি কম দেখেছি—

মৃদু মধু বাক্যরাশি মিষ্ট ব্যবহার।
মুহূর্তেই লুটে নিল হৃদয় সবার॥

অধ্যাপকের এমন প্রীতিমধুর ব্যবহার সচরাচর লক্ষিত হয় না। তিনি আমাদের 'অত্যাগসহনো' বন্ধুর মতো ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়াতেন। তাঁর আবৃত্তি এবং কাব্যালোচনা মুগ্ধভাবে শ্রবণ করেছি। এককথায় বলা যেতে পারে যে কাব্যামৃত পান করেছি। কবিগুরুর ছন্দোমাধুর্য এমন করে প্রকাশ করতেন যে আমরা সুরের করণাতলায় নেমে আসতাম। একদিনের কথা বলি—তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সোনার তরী' পড়াচ্ছেন। পড়াতে পড়াতে এক জায়গায় থেমে পড়ে বললেন, 'কাব্যের এমন সুরমাধুর্য তোমরা শুনেছ?' বলে আবৃত্তি করলেন—

'ভরা পালে চলে যায়
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দুধারে।'

এর চিত্রসৌন্দর্য এবং সুরমাধুর্যের তুলনা কোথায়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে অধ্যাপকজীবনে একদিন বন্ধুবর শ্রীভবতোষ দত্ত (বর্তমানে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত আছেন) মহাশয়ের সঙ্গে কবি মোহিতলালের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন বেহালায় 'মুনিবন তরুচ্ছায়া'-ময় তাঁর ভবনে ধ্যানের আসন পেতেছেন। তিনি কবিগুরু সম্পর্কে অপূর্ব

CENTRAL LIBRARY

ভাষায় মর্মস্পর্শী আলোচনা করলেন। আলোচনা-শেষে চিত্রাকাব্যের 'দিনশেষে' কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করে শোনালেন—

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বনশয়নে
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে···
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

নিদাঘের পরিণামরমণীয় দিবস, সন্ধ্যা নামছে, সূর্যাস্তের ক্ষীণতম রশ্মি মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠানে ঘন ছায়া ঘনতর হয়ে এলো। চারিদিকে স্তব্ধতার নিঃশব্দ সঞ্চরণ। হঠাৎ আবৃত্তি থামিয়ে মুগ্ধ নেত্রে আমাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, এমন সঙ্গীত তোমরা শুনেছ? এমন প্রাণভোলানো ছবি তোমরা দেখেছ? পূজনীয় বিশ্বপতিবাবুর স্মৃতিপূজায় কবি মোহিতলালের কবিপূজা স্মরণ না করে পারি না। তাই কিছুটা অবান্তর হলেও ঘটনাটি উদ্ধৃত করলাম। সেদিনের সন্ধ্যা আমার জীবনে চিরকালের স্নিগ্ধমধুর ছায়া মেলে আজিও বর্তমান।

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এমন অভিজনবান পুরুষ কচিৎ দৃষ্ট হয়। আভিজাত্যের পরম স্পৃহণীয় সম্পদ ভদ্রতা, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যের ত্রিবেণীসঙ্গম তাঁর চরিত্রকে সমুন্নত মহিমায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল। তিনি আমাদের পালিভাষা ও গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক পড়াতেন। শুভ্রতার প্রতিমূর্তি মৃতদার এই মানুষটিকে দেখে আমার বোধিসত্ত্বের কথা মনে পড়ত। যাক্ সে-কথা। 'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে তাঁর একটি উক্তি আমার চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কথাটা উঠেছিল রমেশ চরিত্র নিয়ে অর্থাৎ রমেশ খাঁটি শয়তান—**absolute villian** কিনা? তিনি বললেন, না, রমেশ **absolute villian** নয়। তাঁর উক্তির সমর্থনকল্পে তিনি নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক থেকে (এই দৃশ্যের) একাংশ উদ্ধৃত করলেন। ঘটনাটি বলি, রমেশ কাঙালীচরণ ও জগমণির সহায়তায় ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবের প্রাণনাশ করবার চেষ্টা করছেন। যাদব অত্যন্ত কাতর হয়ে যখন বললে—কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকাবাবু।

রমেশ—দাও, একটু জল দাও।

Absolute Villian খাঁটি শয়তান, হৃদয়বিহীন। এখানে কি হৃদয়বত্তার ক্ষণিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়? দেহভৃৎ নর হৃদয়বিহীন হতে পারে না। সেকস্‌পীয়রের **Iago** বা **Edmond**এর মধ্যেও হৃদয়তার পরিচয় একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

তাঁর সহানুভূতি ও সদাশয়তার অন্ত ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদকও ছিলেন। আমি কোনমাসেই যথাসময়ে বেতন নিতে পারতাম না। কিন্তু কোনদিনই 'অতিরিক্ত' শুল্ক (**fine**) আমায় দিতে হয়নি। সুদীর্ঘকাল তাঁর অধীনে পরীক্ষক এবং গণকের (**Scrutineer**) কাজ করেছি। এইটুকু উপলব্ধি করেছি যে তাঁর মতো মানুষ আধুনিক যুগে দুর্লভতর হতে চলেছে। তাঁকে স্মরণ করলে শুভ্রতার পুণ্যদেবালয়ে প্রবেশ করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভারতবিশ্বর' বিশ্বভাষা-রত্নাকর। বিপুল কর্মশক্তি, অনলস অধ্যবসায় ও দুরারোহ বৈদগ্ধ্যের অভূতপূর্ব সমন্বয়—এককথায় তিনি বিরাটের সম্রাট। তাঁর দিকে চেয়ে কেন জানিনে মহাজীবন স্বামীজীকে মনে পড়ে। তাঁর মানস গিরে আন্তর্জাতিক ভাষাহোমানলশিখা দূরনভোমুখী। তাঁর পুণ্য

CENTRAL LIBRARY

উপস্থিতিতে শ্রেণীকক্ষ আন্তর্জাতিক শ্রীক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতো। তাঁর ভাষণ বিচিত্রধ্বনি মাধুর্য-সম্মেলনে সমুদ্রগর্জন। যখন তাঁর কথা স্মরণ করি তখন মনে পড়ে যে তাঁকে লক্ষ্য করেই ক্রান্তদর্শী ঋষির এই ঔপনিষদিক মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছে—

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥
ঈশোপনিষৎ—শ্লোঃ ২

স্মরি তাঁর পুণ্য নাম
পদতলে রাখিনু প্রণাম।

স্নিগ্ধকান্তিব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সত্যই প্রিয়রঞ্জন। ইংরাজি সাহিত্যের দিকপাল, বাঙলা ও ওড়িয়া সাহিত্যে অসাধারণ তাঁর দক্ষতা। 'বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' এই ছিল তাঁর আলোচ্য (শিক্ষণীয়) বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের কায়ানির্মিতিতে এবং ভাববিস্তৃতিতে যে বিশ্বসাহিত্য, বিশেষ করে ইংরাজি সাহিত্যের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ছায়া পড়েছিল তা ঐতিহাসিক, সুপরিচিত এবং সুপরীক্ষিত সত্য। শ্রীমধুসূদনের কাব্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে-সমালোচনা সাহিত্যে, কাব্যরচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় ও নাট্যশিল্পে যে পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব পড়েছিল তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনার শিল্পকায়ানির্মাণে সেকস্‌পীয়র, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, ও জার্মান মহাকবি গোটের ভাব ও ভাবনার প্রতিফলন লক্ষিতব্য বিষয়। বালক রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। 'রাজা ও রাণী'-নাটকে রেবতীচরিত্রে লেডী ম্যাকবেথের ছায়া আছে। তিনি গোটের ফাউষ্ট মূল জার্মানভাষায় পড়েছিলেন। ফাউষ্টের শেষ সঙ্গীত Mysticus Chorus এবং রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলির' 'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা' গানটির ভাবগত ঐক্য আছে।

যাক সে কথা। শেলীর অতীন্দ্রিয়বাদ, কীট্‌সের চিত্রকল্প, ওয়ার্ডসওয়ার্থের অধ্যাত্মচেতনা রবীন্দ্রকাব্যে লক্ষণীয় সম্পদ। অধ্যাপক সেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন। সীমাবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি সুদূর অসীমের পথে যাত্রা করেছিল—তিনি হাত ধরে আমাদের অসীমের দ্বারে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দীনেশবাবুর বিদায়ের ভূমিকায় রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বিভাগীয় সহকারী প্রধান অধ্যাপকরূপে বৃত হলেন। তখন কবিগুরুর দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তিনি প্রধান অধ্যাপক (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) রূপে বৃত হয়েছেন। কবে যে তাঁকে শ্রেণীকক্ষে আমাদের মাঝে দেখতে পাবো তার স্থিরতা নেই। তাই রায় বাহাদুরের আগমন আমরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এই সৌম্যকান্তি মানুষটি আমাদের চিত্ত জয় করেছিলেন তাঁর স্নেহমধুর ভাষণে এবং অধ্যাপনার বিচক্ষণতায়। সৌজন্যের প্রতিমূর্তি ছাত্রবন্ধু এই মানুষটিকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

আমার অন্যতম পাঠ্য ছিল মৈথিলী সাহিত্য। অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক মিশ্র মহাশয়ের কাছে পাঠ নিতাম। তিনি আমাকে মৈথিলী সাহিত্যের স্বর্ণাভ দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রাকৃতের অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস মহোদয়ের সরস বাচনভঙ্গী প্রাকৃতকে আমাদের কাছে প্রকৃতিমধুর করে তুলেছিল—'কর্পূরমঞ্জরী'র সুরভি সৌন্দর্যে আমরা বিমুগ্ধ হয়েছিলাম।

CENTRAL LIBRARY

২

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি

'তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি কি তাঁর পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।'

আসছেন, আসছেন, এসে পড়লেন। কান পেতে শোন, হৃদয়খানি বিছিয়ে দাও, পায়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ আসছেন—আমাদের বলাকা পড়াবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় সংযোজিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান-প্রান্তরে 'তৃণে তৃণে' রোমাঞ্চ জাগে; আকাশ কী গাঢ় নীল! প্রসন্নজ্যোতিঃ আলোকধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। এ ত আগমন নয়, আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত পরিচ্ছদে আমাদের শ্রেণীকক্ষে এসে দাঁড়ালেন। এত কাছে এও কী সম্ভব? স্বর্গ কী আজ মর্তে নেমে এল? অথবা বিদ্যাঙ্গনে জ্বলে উঠলো সুরভি-সমুজ্জ্বল দূরনভোমুখী হোমাগ্নি শিখা। দেখলাম অপূর্ব মূর্তি—

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং 'ব্রাহ্মণো' ধর্ম ইবাশ্রিতঃ।

জীবনের দুঃখদ্বন্দ্ববন্ধুর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আকাঙ্ক্ষিত তীর্থক্ষেত্রে সূর্যকরসমুদ্ভাসিত জাহ্নবীধৌত দেবতাত্মা পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছি। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনে মনে উচ্চারণ করি ভারতবর্ষের পরমতম ধ্যানমন্ত্র—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ধীশক্তি যেন জাগ্রত থাকে। আকাশে মধু, মধু বাতা ঋতায়তে।

সেদিন শ্রেণীকক্ষে উপাচার্য শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণ সমবেত হয়েছিলেন। আর অন্যান্য সহাধ্যায়ী বন্ধুগণের মধ্যে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তও সেখানে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'উদাত্ত মধুরকণ্ঠে' 'চঞ্চলা' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। 'নাহি কাল দেশ।'-সব হারিয়ে যাচ্ছে—হারিয়ে যাচ্ছে, কেবা আমি? কোথা আমি? কীবা পরিচয়? শুধু গতি অনিবার ধাবমান কালস্রোত—অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি। প্রাণের তরঙ্গ উঠছে, রূপের বুদ্‌বুদ্ ফুটছে, ভেঙ্গে পড়ছে। অবারিত, অনাহত, অনাদ্যন্ত গতিবেগ—'অতল আঁধারে অকূল আলোতে।' বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ঔপনিষদিক, তা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেনরি বের্গস'র নিরুদ্দেশ যাত্রী Elan vital নয়। তা নঙর্থক নয়, সদর্থক যার শেষ কথা 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ.....। তাই 'চঞ্চলা'র শেষ কথা শুধু 'অতল আঁধার' নয় 'অকূল আলো।'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ধ্যাননেত্রে মুহূর্তের জন্য ঝলসে গেল অবিরামগতি প্রকৃতির অকূল আলোকাভিমুখী অন্তহীন যাত্রা। শুধু ছেড়ে যাওয়া নয়—শুধু চাওয়া নয়। এ দুয়ের মাঝখানে আছে কোনো মিল; তাঁর ভাষাতেই বলি—

'এমন একান্ত করে চাওয়া -
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সত্য সেই মতো।'
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল।'

CENTRAL LIBRARY

কেন জানি না পরবর্তীকালে এই কবিতা পাঠকালে উপনিষদের এই পরম মন্ত্র মনে পড়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

পূর্ণতার ভূমিকায় শূন্যতা এবং পবিত্রতার অপরূপ ছবি।

এবার দ্বিতীয় কবিতা পাঠ করলেন, 'শা-জাহান।' অনেকটা আত্মসংবরণ করেছি, স্থিতধী-হয়েছি। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কবিকে কিছু প্রশ্ন করার ভার আমার উপর দিয়েছিলেন। কবি গন্ধর্ব-কিন্নরকণ্ঠে আবৃত্তি শেষ করলেন। দুঃসাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম, মাথা নীচু করে বলে উঠলাম : এই কবিতায় যেখানে আছে—

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

তারপরেই আছে—

মিথ্যা কথা! কে বলে যে ভোল নাই?
কে বলে যে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির?

কানে যেন খট্ করে বাজে, কেমন যেন বিসদৃশ শোনায়। হয়তো এই বিস্মৃতি জীবনের সত্য, কিন্তু এখানে কি কাব্যের রসাভাস ঘটেনি? কবি চুপ করে শুনলেন। তারপরে স্মিত হেসে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কাব্যমূল্য বিচারে তুমি যা বলছো তা হয়তো ভেবে দেখবার মতো, কিন্তু সমগ্র 'বলাকা' কাব্যের মূল সুর যদি বিচার করে দেখো তবে দেখবে তার সঙ্গে এর মিল আছে। মানুষ ভুলে যায়, যাত্রা তার কোনোদিন থামে না।' দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস হয়নি। আজ জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছি মানুষ ভোলে না, হারায় না কিছুই।

হারানো, হারানো নয় হৃদয়ের ধন,
হারানোর ভূমিকায় প্রাপ্তি চিরন্তন।

তাঁর 'ছবি' কবিতায় আমার উক্তির সমর্থন মিলবে। সুদীর্ঘ জীবনে যে বেদনা উপলব্ধি করেছি তা বিনম্রশিরে নিবেদন করলাম।

পরদিন পাঠভবন স্থানান্তরিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উত্তর কোণস্থিত দ্বিতলের প্রশস্ত কক্ষে, আয়োজন সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায়। মেঝেতে সুদৃশ্য কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হ'ল—ধূপ-সুরভিত কক্ষতল। কবির আসনের পুরোভাগে একখানি প্রশস্ত চৌকি। তদুপরি পুষ্পার্ঘ্য, লেখনী ও মসীধার। সময়ও পরিবর্তিত হয়েছে সকাল

CENTRAL LIBRARY

আট ঘটিকা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ আমরা সমবেত হ'লাম। অন্যান্য বিভাগের ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য অধ্যাপকবৃন্দ অবারিত দ্বার। কক্ষদ্বারে প্রশস্তবক্ষ দীর্ঘকায় প্রসন্নমূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্মসচিব পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দণ্ডায়মান বা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান পাছে কোনো অত্যুৎসাহী ছাত্রের অতর্কিত আগমন ঘটে।

যথাসময়ে কবিগুরু আবির্ভূত হলেন। প্রভাতের সূর্য বুঝি সহসা প্রকাশ 'আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আনীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ'। মনে মনে এই প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গেলাম। 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।' কবিগুরু আসন পরিগ্রহ করলেন। বীণাবিনিন্দিত উদাত্ত মধুর কণ্ঠে আলোচনা সুরু করলেন। বিষয়বস্তু তার 'কৈশোর কালের বাঙলাদেশ ও বাঙলাসাহিত্য'। ফিরে গিয়েছি ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে ভারতবর্ষের পুণ্যতম কালতীর্থে। মধু বাতা ঋতায়তে, আকাশে মধু, বাতাসে মধু, আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে মধু। কালের যবনিকা সরতে থাকে। চোখে পড়ে বিদ্যাসাগরের করুণাঘন পরমমূর্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের খড়্গনাসা ঋজুকায় সমুজ্জ্বলকান্তি প্রতিভার নিঃসংশয়িত স্বাক্ষর। 'রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহ সভা, রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?' মানসনেত্রে ধরা দিল সে যুগের একটি মনোজ্ঞ চিত্র। কবির সুমধুর ভাষণে সে যুগ আমাদের কাছে সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। সেদিন অনুভব করেছিলাম সুযোগ্য কণ্ঠে বাক্ সত্যই ঋত, সত্যই ব্রহ্ম।

দীর্ঘ আলোচনা শেষ হ'ল। কবি গাত্রোত্থান করলেন। অধ্যাপকবৃন্দের নির্দেশ মতো আমি সন্ত্রস্ত মস্তকে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অনুরোধ জানালাম—'আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।' স্মিতমুখে প্রসন্ননয়নে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আজ আর নয়, চলো তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলবো।' সে মুখের দিকে চেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আর কথা বলতে পারিনি।

সে ছবি আমাদের আছে। রত্নখনি—বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষিগণের আলোকচিত্র—মধ্যে মধ্যমণি অমৃতবিন্দু রবীন্দ্রনাথ। জীবনের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। আমাদের পরিবারের শাশ্বত সম্পদ।

CENTRAL LIBRARY

নানা রংএর দিনগুলি

সতী ঘোষ

সেদিন সুবর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রধান অধ্যাপকের ঘরে ডাক প'ড়েছিল। যে চেয়ারটায় ব'সেছিলাম, তার উল্টোদিকের দেয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিত অধ্যাপকদের ছবি। ডানপাশের কোণায় খগেনবাবুর হাসি-হাসি মুখখানা। চশমার ভেতরকার নীলরংএর আভা বাইরে থেকেও বোঝা যেত, তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল ৩৫ বৎসর আগে এই ঘরটাই আমাদের 'কমনরুম' ছিল। আশুতোষ বিল্ডিংস্-এর দোতলায় অর্থনীতি ও কমার্সের ক্লাশও হ'ত। সবশুদ্ধ আমরা ছিলাম ১৫।২০ জন, কি তারও কম, মনে নেই।

'কমনরুমের' চারদেয়ালের বাইরে অবাধগতিতে বিচরণের হুকুম ছিল না আমাদের। 'কমনরুমে'র সামনের বারান্দাটুকুর সামনে আধখানা গোলগেটের মত, এখন চেয়ারটেবিলে ঠাসা, বেয়ারারা ব'সে থাকে; ঘণ্টার শব্দ শুনে ঐখানে এসে দাঁড়াতাম আমরা। এখনো স্পষ্ট যেন শুনতে পাই বেয়ারা মনোমোহনের গলা·····'দিদি! ক্লাশে যেতেন·····অর্থাৎ অধ্যাপক ক্লাশে গিয়ে বসলে তবে আমরা ঢুকব, এই ছিল নিয়ম; নৈলে অনর্থ ঘটবে।

অধ্যাপকের চেয়ারের ডানপাশে একটা ছোটবেঞ্চে বসতাম আমরা পাঁচজন—হিমানী, যূথিকা, চিত্রা, কমলা, আমি। মাঝে মাঝে এসে বসতেন মণিকুন্তলাদি, বিন্দুদি। আর কে ছিল, মনে পড়ছে না। অধ্যাপকরা কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন না; অধ্যাপকদের ঘরে ঢুকেছি ক্বচিৎ কদাচিৎ, কেউ ডেকে পাঠালে। একদিন মণিবাবুর সঙ্গে ঢুকেছিলাম; চেয়ারে ব'সেছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, প্রায় বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি। মণিবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ম'শায়। তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি নিয়ে খুব হৈচৈ হ'চ্ছে; সশ্রদ্ধ প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করেছিলেন মনে আছে, ·····ফলতে বেশী সময় লাগেনি।

সুকুমার মিত্র এখন যেখানে বসে, সেইটে ছিল খগেনবাবুর ঘর। একদিন ঐ ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে প্রবন্ধ পড়তে হবে। 'তপতীর' সুমিত্রা চরিত্র সম্বন্ধে তর্কালোচনার সভা। সেবার বি. এর পাঠ্য ছিল 'তপতী'। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরা শুদ্ধু এসেছে আলোচনা শুনতে। সুকুমারের ঘরের উল্টো দিক্‌কার বড় হলের মত ক্লাশঘরটা একেবারে ঠাসা। 'ন স্থানং তিলধারণে'·····প্রথমে প্রবন্ধ পড়লেন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর অনিলবাবু; তারপর আমার পালা, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর। প্রবন্ধ পড়ব কি, ভয়ে বুক দুর দুর করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে; কোনোমতে শেষ করলাম এক নিঃশ্বাসে। কেউ শুনল কিনা তাও জানি না। শেষ পর্যন্ত প্রশংসাই পেয়েছিলাম সভাপতি বিশ্বপতিবাবুর কাছে।

অধ্যাপকদের ঘরের কথায় মনে পড়ে শশীবাবুর কথা। যা দু'একদিন ঘরে ঢুকেছি, দেখেছি একমনে নতনেত্রে শশীবাবু লিখে যাচ্ছেন। রিসার্চ স্কলার বললেই আমার শশীবাবুকে মনে পড়ে। এত লাজুক ছিলেন যে, যখন অধ্যাপক হয়েছেন, তখনো কথা বলতে গেলে আড়ষ্ট বোধ করতেন ব'লে মনে হ'ত।

যাঁদের কাছে প'ড়েছি, তাঁদের মধ্যে মনে আছে সুনীতিবাবু অত্যন্ত কঠিন বিষয়টাকে কেমন সরস ক'রে পড়াতেন; একটা বাঁধা রসিকতা ছিল, যারা চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করতে পারে না, তাদের নিয়ে তাদের কথায় 'পাচ বললেও পাচ, পাচ বললেও পাচ।'

CENTRAL LIBRARY

বিশ্বপতিবাবুর ক্লাশ ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করত না ; সাহিত্যের মাধুর্য উপলব্ধি করিয়ে দিতেন পরিপূর্ণভাবে। একদিন ভূতের গল্প ব'লে ক্লাশশুদ্ধ সবাইকে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিলেন, তারপর সেইসূত্র ধ'রে বুঝিয়েছিলেন ছোট-গল্প ও হিউমার সৃষ্টির আর্ট।

মনে পড়ছে মণিবাবুকে ; ফর্সা, লম্বা, ঋজু-দেহধারী মণিবাবু ; সব সময়েই ছাত্র-ছাত্রী পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছেন। ছাত্রছাত্রীদের যত আপদ্ বিপদ্, যত মুস্কিলের আসান তাঁর কাছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে ধৈর্যের সীমা ছিল না, কখনো বিরক্তবোধ করতে দেখিনি তাঁকে।

মহেশ্বর দাস অধ্যাপকদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট কিন্তু 'মা' বলতেন। তখন খুব লজ্জা করত কিন্তু ঐ জন্যই তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারতাম। 'প্রাকৃত' নিয়ে বড় মুস্কিল হ'ত। তাই মহেশ্বরবাবুর অকৃপণ সাহায্যের জন্য খুব কৃতজ্ঞবোধ করতাম।

অধ্যাপকেরা করুণার চোখেই দেখতেন আমাদের ; তবে একদিন দুষ্কর্মের জন্য লাঞ্ছনাভোগ করতে হ'য়েছিল।

সেদিন বসে আছি ; ৫টার পর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশন। বন্ধুদের খুব পীড়াপীড়ি—'একটা গান কর, এখন আবার কে শুনবে ?'

গলা ছেড়ে গান ধরেছি আমাদের কালের আধুনিক ; অজয় ভট্টাচার্যের লেখা—'যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে।'...

পাশের ঘরে কমার্স ক্লাস ৫টার পর বসত, কারুর মনে নেই। ছেলেরা যেই এসে জুটেছে আমাদের কমনরুমের সামনে, অমনি ভীষণ রেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন অধ্যাপক রোহিণীবাবু ; মস্তবড় গোঁপের জন্য খ্যাতি ছিল তাঁর। ইংরিজিতে 'এটা গানের ক্লাশ নয়' বলে খুব বকে দিলেন। পরের দিন আবার ভর্ৎসনা করলেন মণিবাবু 'কমনরুমে' মেয়েদের গান গাওয়া—ছি ! ছি ! সিণ্ডিকেটে কথা উঠেছে।

কথায় কথায় বকুনি দিতেন—সেক্রেটারী শৈলেন্দ্র মিত্র। সন্ধ্যাবেলা যখন নানা ভাষার ক্লাশ হয়, তখন নাকি কে কবে জানালার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ছিল, আবার শুধু বসা নয়, বসে বসে রসগোল্লা খেয়েছিল, সবই নজরে পড়ত শৈলেনবাবুর। তাই নিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড।

একবার ছুটীর আগে নোটিশ দেখিনি বলে আমাদের ক্লাশশুদ্ধ সবাইকে 'ডিফল্টার' বলে নাম কেটে দিয়েছিলেন ; অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছিলাম।

এখন যেমন সেক্রেটারী প্রভাসবাবুর ঘরে সাত মণ ভারী দরজাটা ঠেলে দলে দলে ছাত্রছাত্রী হুড়মুড় ক'রে ঢোকে, আমাদের কালে কল্পনার বাইরে।

যাদের সঙ্গে পড়তাম, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মনে আছে কমলাকে আর বিনয়কে। বিনয়কে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম, আর আসত কমলা হোষ্টেল থেকে। একসঙ্গে পড়তাম আমরা তিনজন। তিনজনের মধ্যে দু'জনেই নেই, শুধু আমিই আছি। বিনয় যে শুধু পড়াশুনায় ভালো ছিল তা নয়, সব কাজেই অগ্রণী ছিল সে, কি সাহিত্য-সমিতির অধিবেশন, কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কি বাইরে বেড়াতে যাওয়া। অধ্যাপকদের সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিল বিনয়। তারই উৎসাহে আমরা সকলে মিলে গিয়ে সুনীতিবাবুকে ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স চালু করেছিলাম, নৈলে 'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার্স'-এ এম. এ. পাশ ক'রে আমরা চাকরী পাব কি ক'রে ? তখন সিণ্ডিকেট, সেনেট থেকে কিছু পাশ করাতে সময় লাগত না ; ১৯৩৮ সালে আমরা পাশ ক'রে বেরোলাম ; ১৯৪১ সালে আশুতোষ কলেজ থেকে সর্বপ্রথম ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স পরীক্ষা দিল।

CENTRAL LIBRARY

কিংবা কোনো নিরালা কোণে ঘাসের গালিচার উপরে বসে চীনাবাদাম অথবা মুড়ি সহযোগে আড্ডাটা খুবই জমে উঠত। সাহিত্য নিয়ে তর্কবিতর্কই বেশি হত। রাজনীতির আলোচনা হত কম। আমরা ছিলাম শরৎচন্দ্রের ভক্ত, শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে পারতাম না। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা তখন ছাত্রমহলে খুব উত্তেজনা জাগিয়েছিল। বিদেশী লেখকদের মধ্যে বার্ণার্ড শ ছিলেন আমাদের গুরু। হামসুন, বোয়ার, রোমা রোলাঁ, গোর্কি, কুপরিন প্রভৃতি লেখকদের নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলাম। আর একটি নিভৃত আড্ডার জায়গা ছিল বসন্ত কেবিন। সরু, অপ্রশস্ত একখানা ঘর। কিন্তু তাতে কি মধুই না মাখানো ছিল! আসবার জন্য মনটা সবসময়ে আনচান করত। কখনো রসনাতৃপ্তির আশায় চলে যেতাম দ্বারিক ঘোষের দোকানে, কিংবা পুঁটিরাম মোদকে। গ্রীষ্মকালে প্যারাগনের শরবৎ তো না খেলেই চলত না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে কোনো কোনোদিন অ্যালবার্ট হলে ঢুকে পড়তাম। বড় বড় বক্তারা সেখানে বক্তৃতা করতেন—জওহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি।

এম. এ. ক্লাসে যখন ঢুকলাম তখন সকলেই ছিল অপরিচিত, সকলেই স্বাতন্ত্র্যের বেড়ার মধ্যে নিজেদের যেন বদ্ধ করে রেখেছিল। আস্তে আস্তে বেড়া আলগা হ'তে আরম্ভ করল। পরস্পরকে চিনতে শুরু করলাম। একটি রোগা পাতলা চেহারার ছেলে—বেশবাসের মধ্যে কোনো পারিপাট্যের ছাপ নেই। কথার মধ্যেও বরিশালের উচ্চারণ, কিন্তু তবুও তার চলনে-বলনে এমন একটা তীক্ষ্ণতা ছিল যা সহজেই আকর্ষণ করত। প্রথম দিনেই সারা ক্লাস চমকে দিয়ে সে একটা চ্যালেঞ্জ ঠুকে বসলো—'আমার মতে শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস হ'ল তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আপনাদের ইচ্ছা হয়, প্রতিবাদ করতে পারেন।' প্রথমে আমল দিইনি, তারপর আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লাম। তার কয়েকটি গল্প 'শনিবারের চিঠি'তে বেরিয়েছিল। শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বেশ লাজুক প্রকৃতির ছিল। নিজেকে কখনো জাহির করতে চাইত না। কিন্তু অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কাছে নিজেকে সে উজাড় করে দিত। তার বাক্যগুলো তীক্ষ্ণ বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎ-বাণের মত ঝলসে উঠত এবং তার অফুরন্ত রসের উৎস থেকে অনর্গল সরসতার ধারা বইতে থাকত। এম. এ. পরীক্ষার আগে নারায়ণ কোথায় উধাও হয়ে গেল। শুনতে পেলাম বরিশালের বাড়িতে চলে গেছে, বিয়ে করেছে। পরের বছর এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হ'ল। তারপর অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, আমি চলে গেলাম যশোহর কলেজে। সে যোগ দিল জলপাইগুড়ি কলেজে। 'উপনিবেশ' বেরোতে লাগল, দূর মফঃস্বল থেকে দেখলাম, আমাদের বন্ধু নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক।

মাথায় একরাশ উস্কো খুস্কো পাতলা চুল, দিনরাত পান চিবোচ্ছে, হাসাতে, ক্যারিকেচার করতে, প্যারডি রচনা করতে তার তুলনা নেই—এই হ'ল বর্তমান কালের খ্যাত সাহিত্যিক সুশীল জানার তখনকার চিত্র। সুশীল প্রাণখোলা, দিলদরিয়া মেজাজের ছেলে ছিল, তার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেক মধুস্মৃতি জড়িয়ে আছে। এক সঙ্গে অনেক বেড়িয়েছি, অনেক নিভৃত কথা, অনেক রসের আলাপের সে ছিল নিত্য সঙ্গী। পরীক্ষার কয়েক মাস আগে সুশীল, দেবু—দেবব্রত ঘোষ (এখন বাংলা সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার) ও আমি পড়াশুনা করতে যেতাম রাজু, অর্থাৎ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনের বাড়িতে। রাজকুমার প্রকাণ্ড ধনী, তাই তার বাড়িতে পড়াশুনা যাই হোক না কেন, তার আয়োজন ছিল দস্তুরমত রাজকীয়। রাজকুমারের বিরাট গাড়ি এসে মেসের খুপরি থেকে আমাদের নিয়ে যেত তার প্রাসাদে। আমাদের তদ্বির করবার জন্য দু'তিন জন চাকর-বাকর সব সময়ে হাজির থাকত, খাওয়া দাওয়ার রাজসিক আয়োজন হত। মাঝে মাঝে রাজকুমারের বাড়িতে গানের জলসা বসত, বড় বড় ওস্তাদরা আসতেন। একবার এসেছিলেন ওস্তাদ

CENTRAL LIBRARY

নাথ ঠাকুর, সেই আসরের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। নিত্যকার এইসব আনন্দ উত্তেজনার মধ্যে পরীক্ষার চিন্তাভাবনা আর মনে বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না।

হরপ্রসাদ মিত্র ছিল তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক। আভিজাত্যমণ্ডিত চেহারা, কথাবার্তা ওজন করা এবং বিশেষ মার্জিত। গম্ভীর ব্যক্তিত্ব সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করত। তার কবিতা রবীন্দ্রনাথের সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। তাকে বেশ একটু সমীহ করেই চলতাম। বীরেশ্বর সেন তার বিরাট বপু নিয়ে ক্লাসের মধ্যে জাঁকিয়ে বসত। গম্ভীর মুখে এমন সব রসিকতা সে করত যে সমস্ত ক্লাস হেসে গড়িয়ে পড়ত, অথচ নিজে সে কখনও হাসত না। দিল্লী পর্যন্ত আমরা যখন শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন সে ছিল আমাদের দলনেতা। পড়বার সময় বীরেশ্বর একটু আধটু অভিনয় করত বটে, কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে সে কয়েক বছর পরে চিত্র ও বেতারের একজন বিখ্যাত অভিনেতা হবে। আমাদের ক্লাসে আর একজন হাস্যরসিক ছিল ধীরেন বিশী। বীরেশ্বর যেমন ছিল অভিনয়-পটু, ধীরেন তেমনি ছিল কমিক আবৃত্তিতে পারদর্শী। মনে পড়ে তার শিবাজী উৎসব কবিতার আবৃত্তি। অসুস্থ কণ্ঠে ধীর লয়ে আবৃত্তি করতে করতে একটি জায়গায় এসে হঠাৎ এমন দ্রুত ও তারস্বরে চীৎকার করত যে শ্রোতারা প্রথমে ভীত, হতভম্ব হয়ে পড়ত এবং তারপর প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ত। ক্লাসের আরো অনেক মুখ মনে পড়ছে, কোনো কোনোটি অস্পষ্ট, কোনো কোনোটি কিছুটা স্পষ্ট। টুকরো টুকরো স্মৃতিচিত্র চোখে ভাসছে। বন্ধুদের সঙ্গে কোনো জননেতার বক্তৃতা শুনছি অ্যালবার্ট হল কিংবা টাউন হলে, ভারহীন তরুণ জীবনের হাল্কা হাসি ও খুশি ছড়িয়ে চলেছি গড়ের মাঠে, ইডেন গার্ডেনে কিংবা লেকে, ইলিসিয়াম বোর্ডিং কিংবা বিবেকানন্দ রোডের পাঁচ তলার মেসে বসে বর্ণার্ড শ, হামসুন, গোর্কি নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক। চিত্রের পর চিত্র সরে যায়, রেখে যায় ঝরা ফুলের মধুগন্ধ।

যে সব আচার্যের পায়ের তলায় বসে সেদিন বাংলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের কক্ষে কক্ষে বিস্মিত কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ করেছি তাঁদের কথা বলতে গেলে শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। বিভাগীয় অধ্যক্ষ ছিলেন রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সেরা কীর্তনিয়া ছিলেন তিনি। কীর্তনের দু'একটি আসরে মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনেছি। ক্লাসেও তেমনি মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর কথা শুনতাম। কথা মনে হত গান। পাঠ্যজগৎ থেকে তিনি প্রায়ই আমাদের নিয়ে যেতেন তাঁর জীবনের বহু ব্যক্তিগত ঘটনার জগতে। শুনতে ভারী ভালো লাগত। চেহারায়, ব্যক্তিত্বে গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন, কিন্তু যখন রসিকতার উৎসমুখ খুলে দিতেন তখন সমস্ত ক্লাস হেসে গড়িয়ে পড়ত। তাঁর সুমার্জিত চেহারা এবং অতিশয় পরিষ্কৃত ও যত্নবিন্যস্ত বেশভূষা আমাদের মনে সব সময়ে সপ্রশংস সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়ে রাখত।

বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। বেশিদিন তাঁকে আমরা পাইনি, কারণ তিনি প্রায়ই পৃথিবীর নানা জায়গায় সভা-সম্মেলনে যোগ দিতে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁকে যতটুকু আমরা পেয়েছি তাতেই আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতাম। তিনি ছাত্রদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন, এতে অস্বস্তি বোধ করতাম আবার একটু অহঙ্কারও বোধ করতাম—অত বড় পণ্ডিত লোকটি আমাদের 'আপনি' বলছেন, সুতরাং আমাদের মূল্য কিছু কম নয়। তিনি তাঁর বৃহৎ দুই খণ্ড ভাষাতত্ত্বের বইয়ের মাত্র ভূমিকা-অংশ আমাদের পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কতটুকু পড়িয়েছিলেন সেটা সেদিন বড় ছিল না। কারণ পড়াবার সূত্র ধ'রে তিনি আমাদের বিশ্বের অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিয়ে ছেড়ে দিতেন, আর আমরা কূল-কিনারা না পেয়ে কেবল হাবুডুবু খেতাম। ঐন্দ্রজালিকের মত নানা ভাষার শব্দ নিয়ে তিনি যেন চোখধাঁধান খেলা দেখাতেন, আর

CENTRAL LIBRARY

আমরা বিস্ময়বিমূঢ় হ'য়ে সেই খেলা উপভোগ করতাম। অতবড় রাশভারী অধ্যাপকের কাছে যেতে পারলে দেখা যেত যে, এমন ভদ্র, সহৃদয়, উদারচেতা ও উপকারী লোক কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। একটা সার্টিফিকেট চাইলে উচ্চতম প্রশংসায় ভূষিত ক'রে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রসন্নচিত্তে যে কোনো বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতেন। ছাত্রদের যে কোন উপকারে বিচার না ক'রে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

সুনীতিবাবুর যোগ্য শিষ্য ডঃ সুকুমার সেনের কাছেই আমরা বেশিদিন পড়েছি। তাঁকে আমরা অত্যন্ত ভয় করতাম, কারণ ক্লাসে তিনি কঠোরভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু তাঁর আপাত-কঠোরতার অন্তরালে যে কোমল ও রসাল হৃদয়টি ছিল তা' আমরা আবিষ্কার করলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার পর। আমরা বাংলা বিভাগের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর কিছু ছাত্র দিল্লী পর্যন্ত শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া ঠিক করলাম। অনেক অধ্যাপকের দ্বারস্থ হলাম, কিন্তু কেউ সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। ডঃ সেনের কাছে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কয়েকদিনের জন্য তাঁর নিত্য সঙ্গী হয়ে তাঁর আন্তরিক স্নেহের যে স্পর্শ পেয়েছিলাম তা আমার জীবনের অমূল্য সঞ্চয় হ'য়ে রয়েছে। সারাদিন ঘুরে নানা জায়গা দেখে সন্ধ্যার পরে হোটেলে যখন সকলে তাঁকে ঘিরে বসতাম তখন গল্প শুরু করতেন—নিছক ভূতের গল্প। ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই গল্পের রোমাঞ্চকর অনুভূতি এক হ'য়ে মনের মধ্যে স্থায়ী হ'য়ে যেত। কত সহজ ও সাধারণভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে সকল কষ্ট ও আনন্দে সমানভাবে অংশ নিতেন। কুতুবমিনারের অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে ফেলে উঠেছিলেন। মথুরা স্টেশনের গাছতলায় পরম আনন্দে বসে গল্প করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ দ্বিজেন সান্যালের বাড়িতে আমরা মজলিসে জমে উঠেছি, তিনি সেই মজলিস থেকে বাদ যান নি। ভ্রমণে গিয়ে তাঁকে নানাভাবে দেখেছিলাম ও পেয়েছিলাম। সেই স্মৃতি কোনোদিন মন থেকে মুছে যাবে না।

আমাদের সবচেয়ে প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী। এমন সুভাষ, রসিক ও ছাত্রদরদী অধ্যাপক খুব কমই মেলে। তিনি গম্ভীর হ'য়ে পড়াবার সময় এমন এক একটা রসিকতা করতেন যে, আমরা হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়তাম। তিনি আমাদের 'বলাকা' পড়াতেন। তাঁর সম্মোহিনী বক্তৃতায় ও চোখমুখের চাহনিতে এমন একটা গতির তরঙ্গ এনে দিতেন যে আমরা সত্য সত্যই যেন অন্য কোন্ এক জগতের উদ্দেশে ধাবমান হতাম। তাঁর গল্প বলার কৌশল ছিল অসাধারণ। প্রায়ই আমরা পড়ার মাঝে আবদার ক'রে বসতাম, গল্প বলতে হবে। তিনি বলতেন, বানানো গল্প আমি বলতে পারব না। তবে একটি সত্য ঘটনা বলব। তিনি সত্য ঘটনা বলতে শুরু করতেন। সত্য ঘটনা—ঠিক গল্পের মত শোনাচ্ছে—আমরা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হ'তাম! গল্প শেষ ক'রে তিনি বলতেন, গল্পটি আমার জীবনে ঘটেনি বটে, এটা নেহাতই গল্প। বলতেন, মিথ্যাকে যিনি সত্যের মত বলতে পারেন, তিনিই বড় শিল্পী, শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বিশ্বপতিবাবুর ঝামাপুকুরের বাড়ির বৈঠকখানা ছিল এক সেরা মজলিসের জায়গা। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে উঁকিঝুঁকি মারতাম। দেখতাম, ছবি আঁকছেন, আর সাহিত্যিক ও অধ্যাপক বন্ধুদের মধ্যে রসের ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন। সত্যি, এমন মধুর ও সরস স্বভাবের অধ্যাপক আর দেখলাম না।

বাংলা বিভাগের আরো অনেক অধ্যাপকের কথা মনে আসছে। মণীন্দ্রমোহন বসু আমাদের পড়াতেন চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। সরল, আত্মভোলা অধ্যাপক—অতি অল্পতেই রেগে যেতেন, আবার মুহূর্তমধ্যে সেই রাগ ভুলেও যেতেন। মঙ্গলকাব্যের অধ্যাপক ছিলেন তমোনাশ দাশগুপ্ত। মঙ্গলকাব্যের রস প্রথম তাঁর কাছেই পেয়েছিলাম। প্রাকৃত ও পালি পড়াতেন যথাক্রমে মহেশ্বর দাস ও গোকুল দে। আর হিন্দীর অধ্যাপক ছিলেন ললিতাপ্রসাদ

CENTRAL LIBRARY

স্কুল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সবেমাত্র বাংলা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। দু'জনেই ছিলেন নবীন অধ্যাপক। ছাত্ররা তাঁদের একটু জ্বালাতন করত, কিন্তু হাসিমুখে সব অপরাধ তাঁরা ক্ষমা করতেন।

অনেকদিন আগেকার কথা, অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেল। সেদিন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই। পূজনীয় আচার্যদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো আছেন, তাঁদের দেখলেই যেন আবার সেদিনকার ছাত্র হয়ে যাই। সতীর্থ বন্ধুদের মধ্যে নারায়ণ, বীরেশ্বর, মণ্টুরাণী ঘোষ (পরে মিত্র) আমাদের অগ্রজ হয়ে অন্য লোকের দিকে যাত্রা করেছে। এক বছর আগে হাসপাতালের চত্বরে নারায়ণের সেই প্রাণহীন বরতনু দেখে ভাবছিলাম, এই কি সেই ত্রিশ বছর আগেকার প্রাণোজ্জ্বল, নম্র অথচ সতেজ ছেলেটি! গোলদীঘির পাশ দিয়ে চলবার সময় এখনো সেই বড় বড় বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি। থামওয়ালা সেই বাড়িটি আর নেই। বিরাট মৌচাকের মত একটা আকাশছোঁয়া ইমারত সেখানে উঠেছে—মহাকাব্যের গম্ভীর ঝঙ্কারের জায়গায় যেন অসংখ্য কেজো কবিতার ছেঁদো বকবকানি। আশুতোষ বিল্ডিংস্, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্ এখনো সগর্বে তাদের পুরোনো ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা আনাগোনা করছে, হাসছে, তর্ক-বিতর্ক করছে। আজ আমি ওদের অপরিচিত, অনাত্মীয়, কিন্তু একদিন আমিও এখানে ছিলাম, আমিও ওদের মত ছাত্র ছিলাম।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু পুরাতন দুই ভল্যুমের মূল্য হাঁকিল নগদ পঞ্চাশ টাকা। শিরে বজ্রাঘাত হইল। হায়, কেমন করিয়া দশটাকার পাঁচখানি নোট সংগ্রহ করিব? বদমেজাজী পিতৃদেবের নিকট পুরাতন পুস্তকের জন্য এত টাকা চাহিতে সাহস হইল না। সেই সময়ে কপালক্রমে জুবিলী স্কলারশিপটাও জুটিয়া গেল। মাসে বত্রিশ টাকা হিসাবে জলপানি পাইব এই আনন্দেই মশগুল হইয়া উঠিলাম। একসঙ্গে তিনমাসের বৃত্তি হাতে আসিলে দুর্ভাবনা কাটিল। বিদ্যাসাগর কলেজের সহপাঠী অজিত-অ্যাণ্ড-কোম্পানী ছোঁ মারিয়া আমাকে পাকড়াও করিয়া ফেলিল এবং 'দিলখুশা'য় টানিয়া লইয়া গিয়া বৃত্তিলব্ধ করকরে নোটের বেশ কয়েকখানা নোট চপ-কাটলেট-ডেভিল প্রভৃতি বিজাতীয় আহার্যে অপব্যয় করিয়া ফেলিল। বাকি টাকা ভিতরপকেটে গচ্ছিত রাখিয়া করিম উদ্দীনের শরণাপন্ন হইলাম। ODBL-এর দুই ভল্যুম, সুশীলকুমার দে মহাশয়ের *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*-র প্রথম সংস্করণ এবং দীনেশচন্দ্র-সম্পাদিত *Typical Selections from the Bengali Language from its earliest times to the Middle of the Nineteenth Century*-এর দুই খণ্ড, নগদ আশিটাকায় কিনিয়া ফেলিলাম। করিম উদ্দীন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, আমার অনুরোধে কেনাদামেই এই অমূল্য (এবং অতিশয় গুরুভার) গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিল। বোধ করি তাহার কিছু লোকসানই হইয়া থাকিবে, অন্ততঃ তাহার মুখ দেখিয়া তাই মনে হইল। তবে কিনা একই জেলায় আমাদের বাড়ী বলিয়াই এটুকু ঘাটতি সে স্বীকার করিল। তাহাকে মনে মনে দু'শো আশীর্বাদ করিয়া বহি কয়খানি ভালো করিয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া বড়োবাজারগামী ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। বাড়ী আসিয়া সর্বাগ্রে ODBL খুলিয়া বসিলাম। দেখিলাম ইতিপূর্বেই এই মহাগ্রন্থটি বার তিনেক হাত বদল করিয়াছে। না জানি কোন্ মহাজন ইহার মার্জিনে মূল্যবান নোট টুকিয়া রাখিয়াছেন। আমার ডবল লাভ হইল; ফাউ স্বরূপ মার্জিনাল নোট পাইয়া গেলাম। বেশ খানিকটা মানসিক ব্যায়ামের পর গ্রন্থ দু'টির যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত করিলাম এবং উপনিষদে যাহাকে বলা হইয়াছে 'অভীঃ', কতকটা সেই ভাব লইয়া ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে যোগদান করিলাম।

এ-হেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কৌতুক করিতে গিয়া আমরা কেমন কানমলা খাইয়াছিলাম তাহা বলিয়া লই। ১৯৪৪ সালের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের অনেকটা বাকি আছে। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন, দু-একটি বাড়তি ক্লাস লইয়া মর্ফোলজি অনেকটা দুরস্ত করিয়া দিবেন। হঠাৎ অজিতের মাথায় একটা প্ল্যান আসিল। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এবং ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে কৌতুক করিবার জন্য সে এক মজার পরিকল্পনা করিল। আমি ও তাহার দু-একজন অন্তরঙ্গ ছাড়া এ ব্যাপার সকলের কাছে গোপন রহিল। পরদিন ১লা এপ্রিল, শনিবার। শনিবারে বাংলার ক্লাস বন্ধ থাকে। সকলকে 'এপ্রিল ফুল' বানাইবার জন্য সে আমাকে দিয়া স্কুলের বকলমে ইংরেজীতে নোটিশ লিখাইয়া লইল, যাহার মর্মার্থ—১লা এপ্রিল, শনিবার বেলা ১১টায় ডক্টর এস. কে. চট্টোপাধ্যায় ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি স্পেশাল ক্লাস লইবেন, সাত নম্বর কক্ষে সকলে যেন হাজির থাকে। তার আগের দিন ৩১শে মার্চ মণীন্দ্রবাবু শেষ ঘণ্টায় চর্যা পড়াইতেছেন, 'নৈরামণি'-কে লইয়া বড়োই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিমধ্যে বেয়ারা গম্ভীর মুখে নোটিশ পেশ করিল। মণীন্দ্রবাবু নোটিশ পড়িয়া দিয়া 'নৈরাত্মাবধূতিকা'র গ্রন্থিমোচনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরদিন ১লা এপ্রিল বেলা ১১টার সময়ে ছাত্রছাত্রীরা সাত নম্বর ঘরে সমবেত হইয়া ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে ঘণ্টা শেষ হইয়া আসিল, তখন কে যেন অফিস ঘর হইতে ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করিয়া জানিয়া আসিল, এ সমস্তই 'পরিহাসবিজল্পিতম্'। গোটা ক্লাসকে 'এপ্রিল ফুল' বানাইবার জন্য এটি অজিতের একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। পরের দিন ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে মাষ্টার মহাশয় আমাদের বেশ একহাত লইলেন। এপ্রিল

CENTRAL LIBRARY

ফুলের উদ্যোক্তাদের ধিক্কার দিয়া অম্লাক্ত ইংরেজীতে বলিলেন, আপনারা (তিনি আমাদের 'আপনি' বলিতেন) ইংরেজী সামাজিক রীতিনীতির কাছে এমন দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন যে, রঙ্গকৌতুকেও উহাদের কপি করিয়া থাকেন। ইহার চেয়ে নষ্টচন্দ্র উদ্‌যাপন করিলেন না কেন? তাহাতে বাঙালিয়ানা রক্ষিত হইত। এপ্রিল ফুল কি আমাদের দেশের প্রথা? আপনারা উহার ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য জানেন? বলিয়াই ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া পাশ্চাত্য দেশের এপ্রিল ফুলের ব্যাপার ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্যসহ বুঝাইয়া দিলেন। সকলের অলক্ষ্যে সেই উপাদেয় বক্তৃতা হইতে আমি কিছু কিছু নোট করিয়া লইলাম। অজিত অতিশয় ভালোমানুষের মতো চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সেযুগে বাংলা বিভাগের বিখ্যাত আচার্যদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইয়াছিল, কারণ আমরা ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়া জন সত্তরের বেশী ছিলাম না। তখন এত বহি ও 'সহায়িকা'র আড়ম্বর ছিল না। নোট বহি বাজারে ছিল না, তাহার প্রয়োজনও হইত না। সাহিত্য পরিষদের স্বল্পালোকিত কক্ষে বসিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এবং পুরাতন গ্রন্থ দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর তৈয়ারি করিতাম। এখানে-সেখানে হাতড়াইয়া যাহা মিলিত তাহা হইতে নিজের মতো করিয়া সবকিছু বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতাম।

মনে পড়িতেছে, বিভাগীয় প্রধান রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির রস বিশ্লেষণ করিতেছেন, মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যাপদ, বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস লইয়া হিমসিম খাইতেছেন, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীদের যথাসাধ্য ভবাবেশে ভদ্রসভায় পেশ করিতেছেন, প্রিয়রঞ্জন সেন বিলম্বিত লয়ে রোল ডাকিয়া মোটা খাতা খুলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কুলজি উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। আর একজন, বাংলা বিভাগের তরুণতম অধ্যাপক, শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা পরে বলিতেছি। মনে আছে শ্রদ্ধেয় তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ধর্মমঙ্গল কাব্য পড়াইতেছেন। যদিও আমি ঐ পেপার ছাড়িয়া দিয়া থীসিস পেপার লইয়াছিলাম, তথাপি পার্সেন্টেজের গোলমাল হইবার আশঙ্কায় ঐ ক্লাসেও নীরবে বসিয়া থাকিতাম। ধর্মমঙ্গলের 'ঢেকুর গড়ে'র প্রসঙ্গ উঠিলে তমোনাশবাবু ইতিহাস হইতে নজির তুলিয়া 'ঢেকুরী বিষয়ে'র সঙ্গে ঢেকুর গড়ের সম্পর্ক বিচার করিতে-ছিলেন। হঠাৎ অজিতের মাথায় গবেষণা গজাইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তাহার এইরূপ হইত। সে উঠিয়া গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, 'স্যর, ঢেকুর গড়টার একটা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমার মনে উদিত হয়েছে। মাঝে মাঝে সে সীরিয়স হইয়া সাধুভাষা ব্যবহার করিত)। দেখুন, প্রাচীন গ্রন্থে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে মহাপুরুষদের কত তুচ্ছ বিষয়কে মহিমান্বিত করে দেখান হয়েছে। আমার মনে হয়, ঢেকুর গড়ের নামকরণের তাৎপর্য—কর্ণ সেন বা ইছাই ঘোষ এখানে ঢেকুর তুলেছিলেন। তাঁদের সেই মহান্ ঢেকুর তোলাই ইতিবৃত্তে ও ধর্মমঙ্গলে ঢেকুর গড় নামের মধ্যে ব্যঞ্জনার আকারে রয়ে গেছে। ভক্তের কাছে ঢেকুর তোলার মধ্যেও মহিমা আছে। যেমন ধরুন—বাল্যকালে চৈতন্যদেব যে রীতিতে অ-আ-ক-খ শিখেছিলেন, আমিও সেই রীতিতে শিখেছি। কিন্তু আমার বর্ণপরিচয়ের কথা ইতিহাস মনে রাখবে না। অথচ বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য-ভাগবতে' সে কথা ফলাও করে লিখেছেন—'কি মাধুরী করি প্রভু 'ক খ গ ঘ' বোলে।' তাই আমার মনে হয়.....'

তাহার থীসিস পুরা হইল না, তাহার পূর্বেই তমোনাশবাবু চোখ পাকাইয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এসব কথা খাতায় লিখলে এই ক্লাসেই বছরের পর বছর মৌরসি পাট্টা নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। আগে পাশ কর, তারপর এসব অপূর্ব 'গবেষণা' ছাপিও।'

অজিত আবার উঠিয়া কি বলিতে গেল, এদিকে চশমার ফাঁকে তমোনাশবাবুর একটি চক্ষু বিস্ফারিত, আর

CENTRAL LIBRARY

একটি চক্ষু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে—ঝড়ের সঙ্কেত। আমরা পিছন হইতে অজিতের জামার খুঁট ধরিয়া বসাইয়া দিলাম। ঘণ্টা শেষ হইলে অজিত গজগজ করিতে লাগিল, 'এই এঁদের বড় দোষ, কোন মৌলিক গবেষণার মূল্য দিতে চান না।' তারপর ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, 'তোমরা দেখে নিও, কাল থেকে এ শর্মা আর কোন প্রফেসরকে রেহাই দেবে না। ফ্রম ষোল বাহাদুর (কীর্তন বিশারদ শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর খগেন্দ্রবাবুকে সে আড়ালে ঐ বলিয়াই উল্লেখ করিত) টু শশীবাবু, প্রত্যেককেই মৌলিক গবেষণার বাঁটুল ছুঁড়ে কেমন কাত করি তোমরা দেখবে।'

আশ্বাসের কথা, অজিত যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তেমনি আবার খপ্ করিয়া নিভিয়াও যাইত। ভাগ্যে সে তাহার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে নাই। উত্তরবঙ্গে বন্যার জন্য চাঁদা আদায়, বাগবাজার অ্যামেচার তুবড়ী কমপিটিশন প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া সে গবেষক হইবার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল। আমি তাহাকে কলেজ-জীবন হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। বাহিরে সে যাহাই বলুক, পরীক্ষার পূর্বে রাত জাগিয়া এবং দুই প্যাকেট সিগারেট ভস্মীভূত করিয়া পরীক্ষায় ভালোই ফললাভ করিত। কিন্তু এম. এ. পরীক্ষার সময়ে তাহার জীবনে একটা দুর্বিপাক ঘটিয়া গেল। শেষপত্রের পরীক্ষার দিন অকস্মাৎ তাহার মাতৃবিয়োগ হইল, সুতরাং শেষপত্রের পরীক্ষা দিতে পারিল না, তবে ফল বাহির হইলে দেখিলাম, মাত্র সাত পত্র পরীক্ষা দিয়াই সে ভালো দ্বিতীয় শ্রেণী পাইয়াছে। কপালে করাঘাত করিয়া সে বড়ো দুঃখে বলিত, যার গর্ভধারিণী জননী এমন শত্রুতা করিয়া পরীক্ষার শেষ দিনটাতেই ধরাধাম ত্যাগ করিলেন, তাহার ভবিষ্যৎ ফর্সা। বলিয়াই মৃদু মৃদু হাসিত। হাসি কি কান্না বুঝিতে পারিতাম না।

শ্রদ্ধাস্পদ মহেশ্বরদাস মহাশয়ের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি 'কর্পূরমঞ্জরী'র "ঈসারোসণসাঅপ্পণ-ইস্স বহসো সগ্গগঙ্গাজলেহিং আমূলং পুরিআএ তুহিনকরকলাঅপ্পসিরীয় রুদ্দো" দাঁতভাঙা শ্লোকটির ব্যাকরণ ও ইংরেজী অনুবাদ লিখাইয়া দিয়া আমাদিগকে চিন্তাজ্বর হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লিখিতে লিখিতে মনে মনে ভাবিতেছি, অবন্তিসুন্দরীর বিদগ্ধ ভর্তা আমাদের শিরে এ কী মুষল নিক্ষেপ করিয়াছেন! মহেশ্বরবাবু শুনিলে রাগ করিবেন, কিন্তু তখন ইচ্ছা হইতেছিল, শৌরসেনী প্রাকৃতের নাট্যকারকে পৈশাচী প্রাকৃতে কষিয়া গালি দিই। পালির অধ্যাপক মৃদুভাষী গোকুলদাস দে মহাশয়ের সেই আপ্রাণ চেষ্টা মনে আছে। ভগবান তথাগতের জনপদ-নিরুক্তিকে বঙ্গালবাণীর সহিত জোড়কলম বাঁধিবার যে দক্ষতা তিনি দেখাইতেন তাহাতে তাজ্জব বনিয়া যাইতাম। এ-সব কথা যেন এখনও সেদিনের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে।

বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় 'বলাকা' পড়াইতেছেন, নানাভাবে গতিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। ব্যাপারটাকে সজীব করিবার জন্য অদূরে গোলদীঘির পারে গাছগুলির দিকে তর্জনী উঁচাইয়া বলিতেছেন, 'ঐ যে গাছ, ওরাও চলেছে, প্রতিমুহূর্তে ওরা ধাবমান, নীল আকাশের পানে দু'হাত বাড়িয়ে ওরা চলেছে।' ভয়ে ভয়ে গাছগুলির দিকে দৃষ্টি হানিয়া গতিতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি। গাছেরা তেমনই নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে, মাটির বন্ধন ফেলিয়া আকাশের ঠিকানা খুঁজিবার কোনও চেষ্টা করে না। এক-এক দিন দুপুরের দিকে পূবের আকাশে মেঘ জমিয়া উঠিত, হু হু শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আসিয়া অকাল-বর্ষণের সংবাদ আনিত। আমরা বিশ্বপতিবাবুর কাছে আব্দার পেশ করিতাম, 'আজ ভূতের গল্প স্যার।' দক্ষিণ হস্তের তর্জনী-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এক চিমটি নস্য টিপিয়া ধরিয়া বিশ্বপতিবাবু সত্যই জ্যান্ত ভূতের গল্প ফাঁদিতেন যাহার সংবাদ ত্রৈলোক্যনাথ পরশুরাম কেহই জানিতেন না। তখন তাঁহাকে প্রেতকথাকোবিদ নব-বাণভট্ট বলিয়া মনে হইত; আমরাও যেন দূর কালে সরিয়া গিয়া সম্রাট হর্ষবর্ধনের মণিকুট্টিমের একপাশে জড়োসড়ো হইয়া বসিতাম।

CENTRAL LIBRARY

বিশেষ পত্র মৈথিলী ভাষার বৃদ্ধ অধ্যাপক দ্বারভাঙার বাবুয়া মিশ্র বাংলা মৈথিলী মিশাইয়া 'উদয়নকথা' পড়াইতেছেন। আমরা আব্দার ধরিয়াছি, বাংলায় লিখিব, মৈথিলীতে বিদ্যা কুলাইবে না। অজিত গো ধরিয়াছে ৯০-এর ঘরে নম্বর না পাইলে তাহার কিছুতেই চলিবে না। প্রসন্নমূর্তি, স্নেহার্দ্র বাবুয়া জী সকলকেই আশ্বাস দিতেছেন, আমরা ঘন ঘন তাঁহার পদধূলি রিপিট করিতেছি। মৈথিলী-শরণ বন্ধুবর মনোজিৎ বসু এদিকে বাড়ীর দ্বারভাঙাবাসী পাচকঠাকুরের কাছে মৈথিলী ভাষায় গোপনে তালিম লইয়া আমাদিগকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং নানা চিন্তা মাথায় ভর করিল।

বন্ধুবর দেবীপদ ভট্টাচার্য ও সুরেশ মৈত্রের কথা এখনও জল্ জল্ করিতেছে। যাহাকে বলে প্রসন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আমাদের মধ্যে তাহাই চলিত। দেবীপদবাবুর পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা হাতের লেখা ও ক্ষুরধার বুদ্ধিকে কত দিন ঈর্ষা করিয়াছি। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আলোচনা উদ্দাম হইয়া উঠিত—বিশেষতঃ ছাত্র-ইউনিয়নের নির্বাচনের সময়ে। সুরেশ মৈত্র হঠাৎ একদিন পায়জামা ও জহরকোট অঙ্গে চড়াইয়া এবং শ্রীচরণে কাবুলি চপ্পল গলাইয়া বিপ্লবের মূর্তিমান দূত হইয়াই যেন আবির্ভূত হইলেন। রাজনীতি লইয়া বিস্তর তর্কবিতর্ক চলিল। কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠিলেও মনের তারে বেসুরা বাজিত না। বোধ হয় রাজনীতি তখনও আমাদের হাড়ে-মজ্জায় ঢুকিতে পারে নাই, তাই মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও একে অপরকে ভালোবাসিতে পারিয়াছি।

বেদনার সঙ্গে প্রশ্ন করি, কোথায় গেল সেই বিয়াল্লিশ-চুয়াল্লিশের দিনগুলি? ক্লাসের সহপাঠীরা সংসারে প্রবেশ করিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। রথীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদারের সহিত কালেভদ্রে দেখা হয়। ছোটখাটো মানুষটি, আমরা আড়ালে ঠাট্টা করিয়া বলিতাম ফিল্ড্‌মার্শাল গোয়েরিং। দিবারাত্র সাহিত্যরসে বুঁদ হইয়া থাকিতেন, ক্লাসের তুচ্ছ পড়া তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না। একটু কানে খাটো ছিলেন, কথাবার্তাও মৃদুস্বরে বলিতেন। কতদিন তাঁহাদের বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার মাতৃহস্তে তৈয়ারি চিঁড়ামুড়ির নাড়ু গোগ্রাসে গিলিয়াছি। এখন তিনি যাদুঘরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অফিসারোচিত গাম্ভীর্য ও আদবকায়দা রক্ষা করাই এই সমস্ত পদের রীতি। কদাচিৎ দেখা হইয়া গেলে তিনি কিন্তু সহাস্যে কলকণ্ঠে আগাইয়া আসেন। সেই তিরিশ বৎসর আগেকার দিনগুলি আর ফেরে না কেন?

যে কথা বলিতেছিলাম। ক্রমে পাঠ সাঙ্গ হইতে চলিল। এবার বিদায়ের পালা। বোধহয় পঞ্চম-ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর মিলনোৎসব বা ঐ-ধরনের কোনও একটা অনুষ্ঠান। আশুতোষ হলে কিছু গান, কৌতুক—অনুষ্ঠানের শেষে কিঞ্চিৎ জলযোগ। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেই হইবে। মাঝখানে মাইকে ঘোষণা—'এবার ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর অজিতকুমার রায়চৌধুরী কীর্তনের সুরে লুইপাদের একটি চর্যা পরিবেশন করবেন।'—একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! অজিত যে গান গাহিতে পারে, তাহার শত্রুরাও এমন বদনাম রটাইতে সাহস করিত না। সঙ্ঘের থিয়েটারে সে বরাবর বৃদ্ধ ঠাকুর্দা বা ঐ শ্রেণীর চরিত্র অভিনয় করিত এবং ভালোই করিত। চামড়ার একটি পুরাতন ছোট স্যুটকেশে তাহার পরচুলা, পাকা গোঁফদাড়ি, চাদর, বেনিয়ান, চায়না কোট, ডাঁটিভাঙা চশমা আমরা কতবার দেখিয়াছি। তাহার কাছেই শুনিয়াছি, নরেশ মিত্র নাকি একবার তাহার অভিনয় দেখিয়া তাহাকে পাবলিক স্টেজে লইবার জন্য বহু সাধাসাধি করিয়াছিলেন। কিন্তু অজিতের পিতা শাসাইয়াছিলেন, তাহা হইলে পুত্রকে তিনি কান ধরিয়া তদ্দণ্ডে বাটীর বাহির করিয়া দিবেন। ইহার জন্য সে কত আপসোস করিত। জীবনে একটা কত বড়ো চান্স্ নষ্ট হইল! 'বিজয়া'র রাসবিহারীর ভূমিকায় তাহাকে দেখিয়া আমরাই কতবার এন্‌কোর দিয়াছি। সেই অজিত কিনা কীর্তন ধরিবে! হইবেও বা! কোন্ বস্তায় দেশোয়ারী আতস আছে বোমা না মারিয়া

CENTRAL LIBRARY

বুঝা যায় না। সম্মুখের সারিতে বিভাগীয় প্রধান খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ধূমল চশমা পরিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন, আরও অনেকে রহিয়াছেন। সদ্য-প্রকাশিত 'চর্যাপদ'-এর সম্পাদক অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ও রহিয়াছেন। কৌতূহলে তাঁহার দুই চক্ষু চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

ড্রপ উঠিল। হাঁ, আমাদের অজিতই তো। আশ্চর্যের কথা ঈষৎ খোনা স্বরে কীর্তনের ঢঙে আরম্ভ করিল 'কাহ্না তরুবর পঞ্চ বি ডাল' ইত্যাদি। খোল করতাল বাদ্যযন্ত্রাদি কিছুই নাই, কিন্তু অজিতের উৎসাহ দেখে কে! খালি গলায়, কখনও বিলম্বিত লয়ে, কখনও দ্রুত তালে কীর্তনের ঢালাও সুর ধরিল। মাঝে মাঝে আখর দিবার সময়ে 'দাদা গো' বলিয়া করুণ মিনতিও জুড়িয়া দিল। করতালি, হাসি, হৈচৈ চীৎকারের মধ্যে যবনিকা পড়িল। মণীন্দ্রবাবু নিজের শুভ্র মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাঃ-হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, খুশি হইয়া বলিলেন, 'ওজিত বর দুষ্ট'!

মূর্তিমান হাস্যরস অজিতকুমার রায়চৌধুরী তাহার সমস্ত হাস্যকৌতুক রঙ্গপরিহাস এপারে ফেলিয়া বহুদিন পূর্বে ওপারে চলিয়া গিয়াছে। যক্ষ্মারোগে অকালে তাহার জীবনান্ত হয়।

আলোছায়ার দিনগুলি চলিয়া যায়-যায়। পড়াশুনার যে এখনও অনেক বাকি। মাথায় পর্বতপ্রমাণ ভার। ইতিপূর্বে-লব্ধ খ্যাতির বেলুনটাকে এম. এ.র তীক্ষ্ণ সূচী আবার ফুটা করিয়া না দেয়। অন্তরঙ্গ বন্ধু মোহনবাগান রোয়ের রবি ঘোষকে কথাটা বলিয়া ফেলিলাম এবং পড়াশুনার জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু হাবেভাবে রবির কোন চিন্তার লক্ষণ দেখিলাম না। সে তখন সবেমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাড়া বাঁধিয়াছে, তাহাতেই মশগুল হইয়া আছে। আমার আশঙ্কার কোনও মূল্য দিল না, বরং মৃদু হাসিয়া গান ধরিল, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক-না।' আমি কিন্তু মনের মধ্যে অতটা বৈরাগ্যের ভাব আনিতে পারিলাম না; কারণ পিতৃদেব অতিশয় রসমেজাজী, রাগিলে হাত-টাত বিলক্ষণ চলিত। সুতরাং পুঁথিপত্র খুলিয়া বসিতেই হইল।

১৯৪২-৪৪ সাল—আমার ছাত্রজীবনের শেষ দুই বৎসর চলিয়া গেল। ফিস্ জমা দিয়া রসিদ পকেটে পুরিয়া আবার সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চড়িয়া বসিলাম। হাওড়া ষ্টেশন হইতে শিবপুরের ট্রাম ধরিয়া মল্লিক ফটকে অবতরণ, তারপর পশ্চিমদিকে পদব্রজে পাঁচমিনিট হাঁটিয়া, কালীবাবুর বাজার পাশ কাটাইয়া সেই পুরাতন, ধূলিধূসর খোলা ড্রেনের গন্ধে-মাতাল চৌধুরীবাগান লেনের বৈচিত্র্যহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন একটানা পরিবেশে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন কখনও ভাবিতে পারি নাই, এম. এ. ক্লাসের বেঞ্চে না বসিয়া পাটাতনের উপরে চেয়ারে বসিতে হইবে; ভাবিতে পারি নাই—কোনও দিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে শ্রোতার পদ হইতে বক্তার পদে প্রমোশন পাইব।

সর্বশেষে আমার শিক্ষাগুরুর কথা বলিয়া পুঁথিতে ডোর দিই। বাংলা বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ক্লাস আরম্ভের প্রথম দিনেই বোধ হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঘণ্টায় ক্লাস লইতে আসিলেন। খর্বতনু, ক্ষীণকণ্ঠ, চলনেবলনে অতি ধীর, বয়সের তুলনায় বেশী গম্ভীর। তাঁহাকে ঠিক 'বাঘা' অধ্যাপক বলিয়া মনে হইল না। তাঁহাকে চেয়ারে বসিতে দেখিয়া কেহ কেহ কিছু বিস্মিত হইল, ইনি এখনও যেন ছাত্র। তাঁহার ক্ষীণ সানুনাসিক স্বরে ক্লাসের মধ্যে যেন নীরব হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল। কিন্তু অচিরেই কৌতূহলের গুঞ্জন থামিয়া গেল—সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কি যেন নূতন কথা শুনিতেছি। অন্যান্য ক্লাসের অপেক্ষা ইহার স্বাদ যে সম্পূর্ণ পৃথক। খাতা খুলিয়া নোট লইতে বসিয়া গেলাম। সেইদিন হইতে তাঁহাকে শিক্ষাগুরুরূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলাম। কতদিন তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতাম। তরুণ মনের কত প্রশ্নই না তাঁহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিতাম। তখন ইচ্ছা করিলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রের পরিবর্তে 'থীসিস পেপার' লওয়া যাইত—মোট নম্বর ছিল

CENTRAL LIBRARY

হ'শ। মঙ্গলকাব্যের ক্লাসে এমন ঘাবড়াইয়া গেলাম যে দেবী চণ্ডিকা ও মনসা ঠাকুরাণীকে সেলাম ঠুকিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠপত্র ছাড়িয়া দিয়া থীসিস পেপার লওয়ার সিদ্ধান্ত করিলাম। একালের ডি. ফিল.-পি এইচ. ডি.র মতো উক্ত থীসিস পেপার বিভাগীয় কোনও অধ্যাপকের অধীনে প্রায় দুইবৎসর ধরিয়া প্রস্তুত করিতে হইত। পরীক্ষার পূর্বে টাইপ করিয়া তিন কপি বাঁধানো থীসিস জমা দিতে হইত, কিন্তু বাড়তি কোনও দক্ষিণা লাগিত না। তাহার পরীক্ষক হইতেন তিন জন,—একজন বিভাগীয় প্রধান, অন্য দুইজন বাহিরের অধ্যাপক। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী কাব্য, পদাবলী ও উনবিংশ শতাব্দী লইয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠপত্র। তাহার বদলে রবীন্দ্রনাথের নাটকের উপর থীসিস লিখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। বিভাগীয় প্রধান খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট সকাতরে দরবার করিলাম। দুই-চারিটা প্রশ্ন করিয়া করুণাময় খগেন্দ্রবাবু অধমকে দয়া করিলেন, শশীবাবুর কাছে গবেষণা করিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বার বার সাবধান করিয়া দিলেন, থীসিস পেপারে প্রলোভন যেমন, পতনের সম্ভাবনাও তেমনি। কিন্তু তখন মরীয়া হইয়া পড়িয়াছি, যাহা হয় হউক, দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়ি। শশীবাবু স্থিরভাবে আমার কথা শুনিলেন, পত্রা ছকিয়া দিলেন। য়ুনিভার্সিটির ফ্রেস্‌কোশোভিত চারিতলার লাইব্রেরী কক্ষ, যুদ্ধের জন্য জবাকুসুম হাউসে স্থানান্তরিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (অধুনা ন্যাশনাল লাইব্রেরী) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঘাঁটিয়া রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে বিস্তর কেতাব জোগাড় করিলাম এবং গবেষকসুলভ অটল গাম্ভীর্য লইয়া পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণী হইতেই থীসিস রচনারূপ যোগব্যায়ামে লিপ্ত হইলাম। বন্ধুরা কিঞ্চিৎ সমীহ করে—বুকের পাটা বটে, থীসিস লইয়াছে! ফাঁসির গলরজ্জু যে সাধ করিয়া গলায় পরে তাহার আহাম্মকির নিন্দা করিয়া কি হইবে? হিতৈষীর দল আমাকে বিরত হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিল, কিন্তু তখন আমার রোখ চাপিয়া গিয়াছে। শশীবাবুর নিকট প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরেও তাঁহাকে রেহাই দিই নাই, রসা রোডের তাঁহার সেই ছোট বাসাবাটীতে গিয়া খাতাপত্র মেলিয়া ধরিয়াছি। মনে আছে, প্রতিটি অধ্যায় লিখিয়া ফুটনোট মিলাইয়া (কে বলিয়াছিলেন, থীসিসে ফুটনোটের ছড়াছড়ি চাই) তাঁহাকে শুনাইতাম। শীতকালের অপরাহ্ণ। তিনটা বাজিতে না বাজিতেই আশুতোষ বিল্ডিংস্‌-এর দ্বিতলের কক্ষে ছায়া নামিয়া আসিত, শীতও চাপিয়া ধরিত। শশীবাবু শুভ্র একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি ও চাদর মুড়ি দিয়া খাড়া বসিয়া থাকিতেন, আমি পড়িয়া যাইতাম। পড়িতে পড়িতে ভাবিতাম, ঐ-খানটায় বেজায় কেরামতি দেখাইয়াছি, যাহাকে বলে ক্রিয়েশন। কী ভাষার প্যাঁচ, ভাবের কী অতলস্পর্শী গভীরতা! রসজ্ঞ মাষ্টার মহাশয় নিশ্চয় তাঁহার তরুণ ছাত্রের প্রশংসা করিবেন। তিনি শুনিলেন, একটু চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলাম ঔষধ ধরিয়াছে। বলিলেন, 'আর একবার পড়।' আনন্দে গলা ঝাড়িয়া আবার পড়িলাম। নিজের কানেই কী চমৎকার শুনাইতেছে! কিন্তু হা হতো'স্মি! গুরু আদেশ করিলেন, 'ঐ লাইনটা কেটে দাও, বড় cheap হয়ে গেছে।' দর্পহারী মধুসূদন ভালো করিয়াই আমার দর্পচূর্ণ করিলেন। পাশ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া দুইতিন কলেজ ঘুরিলাম, বিস্তর ছাত্রের মস্তক চর্বণ চলিতে লাগিল। তাঁহার নিকট নাম রেজিষ্টারি করিয়া বৃহত্তর গবেষণায় প্রস্তুত হইলাম। চারি-পাঁচ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের পর অবশেষে তরী ঘাটে ভিড়িল। তাঁহার পদ-ধূলি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

আমার জীবনের সর্বোত্তম সৌভাগ্য—একদা গুরুর পদপ্রান্তে বসিয়া পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার নিকট গবেষণা করিয়াছি, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কনিষ্ঠ অধ্যাপকরূপে তাঁহার স্নেহার্দ্র ছায়াতলে আশ্রয় পাইয়াছি।

পাণ্ডিত্য নহে, মনুষ্যত্বই শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রধান পরিচয়। তাঁহার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অসামান্যকে

CENTRAL LIBRARY

প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। প্রয়োজনকে সীমাবদ্ধ করিয়া, লোভকে সংযত করিয়া, বাসনার রসনায় বল্গা পরাইয়া জীবন-যাপনের যে সাত্ত্বিক প্রণালী তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার সে আদর্শের কতটুকুই বা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি?

শশিভূষণ অস্ত গিয়াছেন। দারুণ যন্ত্রণা পাইয়া তিনি কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন।

মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শবযাত্রার পূর্বেই পৌঁছাইয়া গেলাম। দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সেই রোগজীর্ণ শরীরে তখনও দিব্যালোক ছিল, কোটরগত চক্ষুর্দ্বয়ে তখনও জ্ঞানের জ্যোতি অম্লান ছিল। এখনও যেন তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। এখনও যেন তাঁহার স্নেহার্দ্র কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছি, যেন তিনি অঞ্জলি পূরিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন।

CENTRAL LIBRARY

শিক্ষক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আশা দেবী

১৯৫৬ সালে ১লা ডিসেম্বর সিটি কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। সেই স্মরণীয় দিনটির কথা আমার আজও মনে আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার কয়েকদিন আগে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত টেলিফোনে আমাকে ডাকলেন। তাঁর জরুরী দরকার আজই সন্ধ্যায় যেন ওঁর বাসায় আমি দেখা করি।

সন্ধ্যের সময় আমি বাবলুকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি উনি জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার, মাষ্টারমশায় আমাকে বাদ দিয়ে তোমার সঙ্গে কিসের পরামর্শ করবেন? উনি বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম : মাষ্টারমশায় আমার সঙ্গে যেন কী বিষয়ে জরুরী পরামর্শ করতে চান। ফিরে এসে সব জানাব।

মাষ্টারমশায় তখন সাদার্ণ এভিনিউতে থাকতেন। আমি আর বাবলু ওঁর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। বাইরেই বসেছিলেন মাষ্টারমশায়—সস্নেহে আহ্বান জানালেন। গিয়ে বসতেই বিনা ভূমিকায় কথাটি পাড়লেন।

: নারাণকে পার্টটাইম টিচার হিসাবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতে চাই। একটু থেমে মিষ্টি এবং শান্ত স্বরে বললেন : তুমি কি বল?

এ কথার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, ভারি সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম : আমি কি বলবো স্যার। আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন, আপনার ছাত্র—, এতে আমার আর কী বলবার আছে।

: আছে বৈ কি বলবার। তোমার মত মানেই নারাণের মত।

: স্যার, ওঁর সঙ্গে কথা বললে ভাল হতো না?—বিব্রতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

: আরে তাতো হতো, কিন্তু যদি নিতে না পারি তাহলে ও কষ্ট পাবে। এইজন্যই তোমাকে ডাকা।

ওঁর মনটা যেন আমার কাছে জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল। যাকে ভালোবাসেন—তাকে সামান্যতম দুঃখ দিতেও ওঁর বাধে। আমি বললাম : না স্যার, চাকরী না হলেও উনি কোন কষ্ট পাবেন না। আপনি যে ওঁকে স্মরণ করেছেন—এতেই উনি খুশী হবেন।

মাষ্টারমশায়ের মুখের দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেলে, বললেন : একটা কথা মনে রেখো নারাণের বিশ্ববিদ্যালয়ে না এলে কিছু এসে যায় না—; কিন্তু ও এলে ছাত্রদের উপকার হবে বলেই আমি মনে করি।

এমন করে যে কেউ ছাত্রকে ভালোবাসতে পারে—, সম্মান দিতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। বাড়ী ফিরে কথাটা ওঁকে বলতেই উনি বললেন : মাষ্টারমশায়ের আমার প্রতি অন্ধ ভালোবাসা আছে।

: তা আছে, আমি বললাম। আমাদের ক্লাশেই মাষ্টারমশায়কে বিনা প্রসঙ্গে কতবার বলতে শুনেছি তোমার মত ছাত্র কখনও ইতঃপূর্বে উনি পাননি।

কথাটা শুনে খুব কৌতূহল অনুভব করলেন উনি। বললেন : এ সব কথা স্যার ক্লাশেও বলেন নাকি? লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে গেল ওঁর। : দেখতো স্যারের কী কাণ্ড।

সানন্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন উনি। পড়াবার উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ওঁর যেন আরো বেড়ে গেল

CENTRAL LIBRARY

এখানে এসে। কাজের সময় ভাগ করে নিলেন। সকালে পড়তেন এবং রাতে লিখতেন। কোন দিন না পড়ে—, তৈরী না হয়ে আমি কখনও ক্লাশে যেতে দেখিনি ওঁকে। অসুখ-বিসুখ হলেও যথাসাধ্য ক্লাশ করতেন—। কর্তব্য জ্ঞান এত প্রবল ছিল যে কিছুতেই হাজার বলেও ক্লাশ কামাই করাতে পারতাম না। কর্তব্যে শিথিলতা বা ফাঁকি দেওয়া স্বভাবের বাইরে ছিল ওঁর।

ছাত্রছাত্রীরা ছিল ওঁর প্রাণ—এবং তারাও ওঁকে যে কী ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো এবং ওঁর নামে পাগল হয়ে যেত, তা আমি স্বচক্ষে বারবার দেখে বিস্মিত হয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের ওপর ওঁর কি পরিমাণ আস্থা এবং বিশ্বাসের গভীরতা ছিল তার একটু পরিচয় দিলেই বোঝা যাবে।

একদিনকার কথা আমার মনে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরলেন সঙ্গে একটি ছাত্র। দরজা থেকেই 'আশা'—'আশা' করে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন : দেখ কে এসেছে। এ আমার ছাত্র—ও ভারি বিপদে পড়েছে। কদিন আমাদের বাড়ী থাকবে।

এত কথা বলার কারণ আমি জানি। যাতে ছেলেটির ওপর আমি অপ্রসন্ন না হই এ তারই সতর্কতা। আমি একটু অপ্রসন্ন অপ্রীতির দৃষ্টি মেলে দিলাম ওর দিকে। ওঁর চোখে সেটা এড়াল না। উনি ওকে বসতে দিয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন : ছেলেটি বড় দুঃস্থ—তার ওপর বোবা। কোথায় যাবে বল? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায়। থাক না কদিন আমাদের বাড়ী। উনি যত আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়েই ওকে ছাত্র বলুন, আমি কিন্তু কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। ওঁর ছাত্রপ্রীতির সুযোগ নিয়ে কেউ ওঁকে হয়তো প্রতারিত করছে—এই আশঙ্কায় আমি বললাম : ছাত্র-টাত্র ওসব বাজে কথা—ধাপ্পা দিয়ে ও তোমার কাছে কিছু আদায় করতে চায়। আমার কিন্তু ছেলেটিকে ভালো লাগছে না।

: তোমার মন ভারি সন্দিগ্ধ—কারুকে সহজে বিশ্বাস করতে পার না। ও নিশ্চয়ই ছাত্র। ওকে আমি কথা দিয়েছি ও আমার বাড়ী থাকবে। আহা, বোবা ছেলেটা—স্নেহে গলার স্বর যেন গভীর হয়ে এলো। চটে গিয়ে আমি বললাম : গাড়ী করে বয়ে যখন এনেছ থাকবে বৈকি।

রাগতঃ ভাবেই নীচে নেমে এসে আমাদের লাইব্রেরী ঘর খুলে দিলেন, ছেলেটির থাকার ব্যবস্থা হল ওই ঘরেই। ছেলেটি কিন্তু আমার প্রতি কেমন যেন আস্থা রাখতে পারছিল না। বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। উনি ওকে অভয় দিয়ে বললেন : তোমার কিছু চিন্তা নেই। যতদিন অন্য জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা না করতে পার এখানেই থাকবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাব। চিন্তা কিসের?

দুদিন পর আমার ভৃত্য প্রফুল্ল খবর দিলো : মা, ও বোবা নয়। সারারাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য বেরুতে যাচ্ছেন উনি, আমি বললাম : তোমার ছাত্র কিন্তু বোবা নয় প্রফুল্ল বলছে। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলে।

: তুমি তো প্রথম থেকেই ওর প্রতি অপ্রসন্ন। শোবার ঘরটা ওর রাস্তার পাশে। পথচারীর কথা শুনে প্রফুল্ল ভেবেছে ছাত্রটিই কথা বলে। আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলে ও এখানে আশ্রয় নিয়েছে বলতে চাও তুমি? ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উনি।

কোন ছাত্র যে ওঁর সঙ্গে মিথ্যে বলতে পারে এ কল্পনাও আসে না ওঁর।

পরদিন রাতে যখন ঘুমের মধ্যে ছেলেটি কথা বলছে প্রফুল্ল আমাদের ডেকে শোনালো। শুনে উনি যেন কেমন হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না যেন।

CENTRAL LIBRARY

আমি বললাম : তোমার বাড়ীর এমন গুণ যে মূকও মুখর হয়ে ওঠে।

: তোমার দাক্ষিণ্যের অভাব আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি। যাক্‌গে কাল থেকে ওর আমি অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

পরের দিন নিজে হাতে বাজার করলেন। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে খাওয়ালেন তারপর গাড়ী করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন স্টেশনের দিকে।

খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে সগর্বে বললেন : ও আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। আমি ওকে টিকিট করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলাম। তুমি ঠিকই ধরেছ ও ছাত্র নয়। ছাত্র হলে ও আমায় কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারতো না। কোন ছাত্র আমাকে ঠকাবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ছেলেটি যে ছাত্র নয়—, এই সত্যটিতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন উনি।

ছাত্রছাত্রীদের উনি যেমন ভালোবাসতেন তারাও ওঁকে তেমনি করে ভালবাসতো—, শ্রদ্ধা করতো।

উনি বলতেন, আমার ছাত্রছাত্রীরা যে আমায় চায়, শিক্ষকজীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার আর কী আছে? আমি সত্যিই গর্বিত। ওরা আমায় ভালোবাসে, ওদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো।

৮ই নভেম্বর শুক্রবার। হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসে ওঁর স্বরচিত দুটি কবিতা রেকর্ডিং হবে। উনি ৯টায় বেরিয়ে গেলেন খেয়ে দেয়ে। আমি বললাম : আজ আর ক্লাশ নিও না। রেকর্ডিং হলেই বাড়ী ফিরে এসো। একদিন ছুটি নিলে আর কী ক্ষতি হবে।

চটে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উনি বললেন, ওদের পরীক্ষা আসন্ন—অনেক কোরস্ এখনও বাকী। না পড়ালে পরীক্ষা দেবে কি করে? বলেই ছুটে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। শুনেছি সেদিন রুটিনের ক্লাশের পরও আর একটি অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়েছেন। তারপর মন্ত্রমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের রুদ্ধশ্বাসে নোট করা দেখে বলেছিলেন : তোমাদের চিন্তা নেই সামনে শুক্রবার আমি আরও একটা অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়ে যতটা পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

এ প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেননি। বোধ হয় এই প্রথমবার ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেননি।

যে বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে মাষ্টারমশায় তাঁর প্রিয়তম ছাত্রকে ডেকে এনেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে—সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে তিনি শেষ দিনটি পর্যন্ত সগৌরবে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কর্তব্য পালন করে গেছেন। কি পেলেন না পেলেন এ প্রশ্ন তাঁর কাছে গৌণ ছিল। শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায়ের কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর ছাত্রকে ঠিকই চিনেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মনের সাম্রাজ্যে যিনি চিরদিন অম্লান স্মৃতি হয়ে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করবেন, শিক্ষকজীবনে তাঁর আর কি চাইবার থাকতে পারে? ক'জন শিক্ষকের ভাগ্যে এই দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটে?

CENTRAL LIBRARY

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

পথের নির্দেশ কে প্রথম দিয়েছিলেন ?

আজ মনে নেই। কলকাতায় এসে অবধি তবু সেইপথেই ঘুরে ফিরে চলেছি। যদি এ জীবনে পথ-হাঁটার ইতিহাস বা সংখ্যাতত্ত্ব লিখে রাখা যেতো, তাহলে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার ছোট্ট পথটুকুই দীর্ঘতম হয়ে উঠতো, সন্দেহ নেই। সে কি শুধু ছাত্র বলে ? অধ্যাপনার জীবিকাগত প্রয়োজনে ? নিশ্চয়ই তাই, তবু তারও বেশী কিছু কলেজ ষ্ট্রীটে রয়ে গেছে।

একদিকে বইয়ের পাড়া, আর একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়। বেশীর ভাগ শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণভোমরা এই কলেজ ষ্ট্রীটের কোথাও লুকিয়ে আছে। নতুন বইয়ের আবির্ভাব ঘোষণায়, পুরোনো বইয়ের দুর্লভ আবিষ্কারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসংগ্রহরূপ মধুচক্রে গৌড়জনের নিত্য আনাগোনায় —গোলদিঘির পাশ দিয়ে দিনে অন্ততঃ একটি-বার আসা যাওয়ায় —কলেজ ষ্ট্রীট আমাদের প্রিয়তম, হ্রস্বতম এবং দীর্ঘতম পথ।

যদি আয়তন বলেন, এর চেয়ে বিশাল আকৃতির বিশ্ববিদ্যালয় এই বাংলাদেশেই আছে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। একদা পামগাছের যে বীথিপথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে কিছুটা শ্যামলিমা এনে দিতো, দ্বারভাঙ্গা-ভবনের সামনে যে ছোট্ট উদ্যানটি চোখকে বিশ্রাম দিতো ক্ষণকালের জন্য, সে সবই প্রয়োজনের চাপে অন্তর্হিত হতে চলেছে বা হয়েছে। সতীদেহের বিচ্ছিন্ন অংশের মতো এই কলকাতারই উত্তরে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন শিক্ষণ-বিভাগ। রোমান স্থাপত্যের সিনেটভবন চূর্ণ হয়ে আধুনিক প্রয়োজনবাদী স্থাপত্যের ত্রয়োদশতল ভবন দৃষ্টিরোধ করে থাকে। তবু এই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। আর এইখানেই একদিন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-আশুতোষ-দীনেশচন্দ্রের আরাধিতা বঙ্গসরস্বতীর পাদপীঠ রচিত হয়েছিল বাংলা-বিভাগকে কেন্দ্র করে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ নামে। বাংলাসাহিত্যের পঠন পাঠন সৃজন সমালোচন—সবকিছুর স্পর্শকাতর স্নায়ুকেন্দ্ররূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগই আজ অবধি সর্বভারতীয় (এবং বহির্ভারতীয়) বাংলাচর্চার নিয়ামক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাংলাবিভাগ তার সার্থকতা ও অসম্পূর্ণতা নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের পথ দিয়ে যাঁরা হেঁটে চলেন তাঁদের অনেকের মনেই স্পন্দন তুলে থাকে।

হয়তো আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির কোনোটিই এখনো জীবিকা-উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন হতে পারে নি বলে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষাবিভাগগুলির প্রতি একটু প্রশ্রয়গত মমত্বের ভাব কারু কারু মনে আছে। হিন্দীর প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বলে হিন্দীশিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যও বেশী। কিন্তু দ্বিধাসংকট কাটিয়ে আমরা যে মাতৃভাষামাধ্যম শিক্ষার পথেই অগ্রসর হবো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাবিভাগের ছাত্ররূপে এসেছিলাম। স্বাভাবিক প্রত্যাশা তখন অনেক বেশী ছিল। আজ বুঝি, পায়ের শৃঙ্খল ঘুচলেও মনের শৃঙ্খল ঘোচে না। শিক্ষার স্বরাজ এখনও, এই বাংলায়ই—অনায়ত্ত। তবু বাংলাবিভাগের প্রচেষ্টাই সে স্বরাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে, অন্ততঃ মূল দায়িত্ব এই বিভাগের। বর্তমানের প্রয়োজন কেন জানি অতীতস্মৃতি জাগিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে ছাত্রজীবনের বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ফিরে আসি।

CENTRAL LIBRARY

১৯৪৮-এ বি. এ. পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে যেদিন এসেছিলাম, কোনো বিপুল সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এক উন্মুখ তরুণের কৌতূহলের তীব্রতা ছিল বেদনার কাছাকাছি এক অনুভবের সত্য। একটি একটি ক্লাশ হয়ে যেতো, আর মনে হতো কতো কিছু জানার রয়েছে, আরো কতো কিছু সংগ্রহ করতে হবে। আমার অধ্যাপকেরাই আমার মনে এ প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। সব বই—পাঠ্যসূচীর সবকয়টি বই মূলে পড়তে হবে। সে সম্বন্ধে যা যা নির্দেশসূত্র পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। তারপর ক্লাশ ও লাইব্রেরীর সংগ্রহ থেকে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। সকাল ন'টায় এসে গ্রন্থাগারে হাজির হ'তুম। ক্লাশের শেষে আবার গ্রন্থাগারে ছ'টা সাতটা অবধি কাটিয়ে বাড়ী ফিরে যেতুম। ক্লাশে যা পড়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছি লাইব্রেরিতে। পাঠ্যতালিকার বাইরে তাকাতে পেরেছিলুম বলেই পাঠ্যবইয়ের বোঝা কখনো গুরুভার হয়ে ওঠেনি।

আশুতোষ ভবনের চারতলায় চারদিকের দেয়ালে ভারত-ইতিহাসের চিত্রমালার মাঝখানে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর সেই নিঃশব্দ অধ্যয়নের জগত! মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকার পর্দায় অগণিত নক্ষত্রের নীরব সাক্ষীর কথা মনে পড়ে। সেই ছিল গ্রন্থসমুদ্রে ডুবে যাওয়া সেরা মুহূর্ত! আবার বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন চারপাশের চিন্তা-তরঙ্গের অভিঘাতেই কতো নতুন সঙ্কল্প, নতুন ইঙ্গিত জেগে উঠতো মনে। ছোট হলেও সেদিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ছাত্রেরা আত্মীয়তার আস্বাদ অনেক বেশি পেতো বলেই আমার ধারণা। দীর্ঘদিনের অনুষঙ্গে আজও আমাদের মতো পুরানো ছাত্রদের কাছে আশুতোষ ভবনের গ্রন্থাগারটির জন্য দীর্ঘশ্বাস তাই স্বাভাবিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে (সহপাঠীদের অনেকের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য) যে দুজন অধ্যাপকের কাছে পাঠগ্রহণের কথা সবার আগে মনে জাগে—তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত। কিন্তু শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গে ছাত্রজীবনে মেলামেশার সৌভাগ্য ততটা হয় নি, শশীবাবু নিজে থেকে এগিয়ে এসে উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধা করতাম দু'জনকেই, আত্মীয় মনে করতাম দ্বিতীয়জনকে।

প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় জীবনে কখনো দাঁড়াইনি। কিন্তু বি. এ. পাশের ফল সর্বদাই মনে করিয়ে দিত প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। এ অস্বস্তি থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন শ্রীকুমারবাবু ও শশীবাবু তাঁদের অধ্যাপনার আলোকে জ্ঞানের জগতে দূরদিগন্তের জানালাটি মনের সামনে খুলে দিয়ে। অনেক স্মৃতির মধ্যে দুটি মাত্র পাঠকের কাছে তুলে ধরি।

শ্রীকুমারবাবু প্রথমে বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য (বিশেষতঃ বিদ্যাপতি) পড়িয়ে তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান কবিদের সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শুরু করলেন। আমি প্রথম দিকে অসুস্থতার জন্য মাস দেড়েক ক্লাশ করতেই পারিনি। যখন থেকে নিয়মিত ক্লাশ করতে পারলুম, তখন উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে শ্রীকুমারবাবুর ক্লাশে। যাঁরা তাঁর ক্লাশে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা জানেন তাঁর কোনো কথা, কোনো মন্তব্যই প্রয়োজনের বাইরে মনে হতো না। আর এমন সুগ্রথিত পরম্পরায় তাঁর বক্তব্য ধীর গতিতে উচ্চারিত হতো যে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে প্রায় সব কথাই লিখে নিতে পারতো। কিন্তু লিখে নেওয়ার পরে বাড়ীতে এসে সেগুলি অধিগত করতে গেলেই বোঝা যেত কী প্রসারিত সাহিত্যচেতনার অধিকার আমরা এই মনস্বী অধ্যাপকের কাছে পেয়েছি। সাহিত্য, সমকালীন যুগ, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভিঘাত, কলানৈপুণ্যের বিশ্লেষণ—এসব কিছু সম্বন্ধে অব্যর্থলক্ষ্য শায়কের মতো শ্রীকুমারবাবুর এক একটি মন্তব্য আমাদের মনের উপরে এসে পড়তো এবং অধিকাংশ সময়েই আমরা সেই মুহূর্তে যা পেতাম, তাকে ছাড়িয়ে যেতো পরবর্তীকালে সে সব মন্তব্যের গভীরতা ও সারবত্তার অনুধ্যান।

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যচর্চা ও পঠন পাঠনের যে সমুন্নত মানদণ্ড শ্রীকুমারবাবু স্থাপন করলেন, আমরা তার প্রথম যুগের অংশীদার। তখনও বাংলাসাহিত্যের সমালোচনায় শ্রীকুমারবাবুর নিজস্ব স্থান সুদৃঢ় নয়। 'বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' তাঁকে যে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে, তার সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়ের অপেক্ষা তখনও থেকে গেছে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলাবিষয়ের পাঠ্যসূচীতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা এনে এবং বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যচর্চায় নবপ্রেরণা সঞ্চার করে শ্রীকুমারবাবু যখন বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষপদ থেকে বিদায় নিলেন, তত দিনে তিনি বাংলাসাহিত্যপারঙ্গম অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচকে পরিণত। ইংরেজীসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা ইংরেজীর ছাত্ররাই বিশেষভাবে বলতে পারবেন। বাংলাসাহিত্যের বেলায় তাঁর বিশ্লেষণীপ্রতিভা—সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যরস—এ দুয়েরই উপভোগে ছাত্রদের চির-কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে।

আর শশীবাবুর কাছে আমরা পড়িনি এমন কোনো পত্রের কথা (বিশেষ পত্র ছাড়া) মনে পড়ে না। আমাদের কাছে শশীবাবু ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর সেই সৌম্য, শুভ্র, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব কী অনায়াসে চর্যাপদ থেকে শরৎচন্দ্র অবধি বাংলাসাহিত্যের সবযুগ ও সবক'টি প্রধান ধারার সঙ্গে আমাদের মানসমিলন ঘটিয়েছিল! শ্রীকুমারবাবু যে মূলতঃ ইংরেজীর অধ্যাপক সে অনুষঙ্গ তাঁর অধ্যাপনায় জড়ানো থাকতো স্বাভাবিক-ভাবেই। কিন্তু শশীবাবুর পড়ানোতেই ছিল বাংলার শ্যামলমাটির করুণাকোমল অন্তরঙ্গতা। অথচ ভাবোচ্ছ্বাস নয়, দুরূহতম বক্তব্যের অনায়াস উত্তরণ ঘটতো তাঁর অধ্যাপনায়। চর্যাগীতি, চৈতন্যচরিতামৃত, রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের কাব্য ও প্রবন্ধসাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব—আরো অনেক কিছুই তাঁর কাছে পড়েছি, জেনেছি। কিন্তু এ অক্লান্ত মননচর্চার পাশাপাশি তাঁর নিরভিমান আত্মস্থতায় মুগ্ধ হয়েছি।

ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা ছেড়ে বিষয়গত উদাহরণটি এবার উল্লেখ করি। চর্যাগীতি এবং চৈতন্যচরিতামৃত—এ দুটি বিষয় আমরা পড়েছিলুম শশীবাবুর কাছে। যতদূর মনে পড়ে চর্যাগীতিপাঠের সূত্রপাত হয়েছিল স্বনামধন্য মণীন্দ্রমোহন বসুর আছে। কিন্তু বার্ধক্যে জীর্ণ মণিবাবুর পক্ষে তখন অধ্যাপনা অসম্ভব হয়ে এসেছে। ফলে কিছুদিন চর্যাগীতির পাঠ বন্ধ রইলো। আমাদের ষষ্ঠবর্ষের ক্লাশ শেষ হবার মুখে শশীবাবু এলেন চর্যাগীতি পড়াতে। একহিসাবে এই-ই তাঁর বিশেষ বিষয়। **'Obscure Religious Cults as the background of Bengali Literature'** নামে তাঁর পথনির্দেশক গ্রন্থটির কথা তখন সুবিদিত। আর ক্লাশে পড়ানোর অপেক্ষা না রেখেই আমি আগ্রহবশে ও বই-খানির অধিকাংশ পড়ে ফেলেছি কিছুটা বুঝে এবং অনেকটাই না-বুঝে। তবে বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাকে সহায়তা করেছিলেন আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর—তখন গবেষকছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারী। সচ্চিদানন্দদা এখন জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ফলে শশীবাবুর ক্লাসে বিষয়বস্তু অনুধাবনে আমার বিশেষ সুবিধাই হয়েছিল। তবু কী সহজ ভঙ্গিমায় চর্যাগানের মূল অধ্যাত্মতত্ত্বটি শশীবাবু বিশ্লেষণ করে গেলেন, যখন পড়ানো শেষ হলো তখনই ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

অকালমৃত্যুর সামান্য আগে এই চর্যাগানের সংগ্রহের জন্য শশীবাবু নেপাল অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে নূতন বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি থাকলে বৌদ্ধসাধনার ধারাবাহিকতার নিদর্শন এই-জাতীয় রচনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সীমা আরো কতদূরে প্রসারিত হতো। কিন্তু সেদিন ক্লাশের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমায় যা পেয়েছিলাম আজও তা আমাদের দিকনির্দেশক হয়ে আছে।

শ্রীকুমারবাবু যেমন মূলে ইংরেজীসাহিত্যের ছাত্র, শশীবাবু তেমনি স্নাতকপর্বে দর্শনের ছাত্র এবং সুরেন্দ্রনাথ

CENTRAL LIBRARY

দাশগুপ্তের কাছেই তাঁর গবেষণা। সাহিত্যের মননভূমিতে দর্শনচিন্তার বিশেষ স্থানটি তাই বাংলায় এম. এ. পড়ার সময় থেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যতত্ত্ব, নবযুগের বাংলা সাহিত্য, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিশেষ দিক—এসব জাতীয় লেখা তাঁর থাকলেও বৌদ্ধদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, শাক্তদর্শন ও উপনিষদের ভিত্তিতে যে বইগুলি লিখেছেন সেই-জাতীয় গ্রন্থেই তাঁর সিদ্ধি ও পারঙ্গমতা। 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি', 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও সাহিত্য', 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' এই জাতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থেই তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার প্রকাশ। স্বল্পায়ু জীবনের শেষ পর্বে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরো মিলিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস অসমাপ্তই থেকে যায়।

বৈষ্ণবতা শশীবাবুর স্বভাব। কিন্তু দার্শনিক সত্তার নিরপেক্ষ বিচারভঙ্গীতে 'চৈতন্যচরিতামৃত' যখন আলোচনা করতেন, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি ছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত করে দিতেন। ভাবুক কবিমনের অধিকারী হয়েও বিষয়নিষ্ঠ নিরাসক্ত বিশ্লেষণের গুণে তাঁর অধ্যাপনা ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাধারা গড়ে তোলায় বিশেষ সহায়ক হতো। আধুনিক জীবনচেতনা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু অধিকার ছিল প্রাচীন ভারতীয় ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির পটভূমি-বিষয়ে। 'উপমা কালিদাসস্য', 'ত্রয়ী' এবং 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যরসপিপাসু এবং ধ্রুবপন্থার সন্ধানী সাধকসত্তার আর এক পরিচয় মেলে।

বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ছাত্রহিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমে সবচেয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের জন্য যাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের পরমপূজনীয় সেই অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী আজও কলকাতার বিদ্বৎসমাজে আপন আদর্শবাদের ঋজু স্বাতন্ত্র্যে তেমনি অনন্যমহিমায় বিরাজিত। কলেজে তাঁর কাছে পড়বার সৌভাগ্য অর্জন করিনি, কিন্তু তাঁর বহুবিস্তৃত খ্যাতির কথা জানতাম। বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের মানসপ্রতিষ্ঠায় শশাঙ্কমোহন সেন, মোহিতলালের পাশেই তাঁর স্থান। কিন্তু গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে নয়, সশ্রদ্ধ অভিনিবেশে ছাত্রদের অন্তরে মধুসূদনকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর অক্ষয় সাফল্য। মধুসূদনের কাব্য এবং বৈষ্ণবপদাবলী—তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছিলাম বলেই ও দুটি বিষয়ের অন্তর্লোকে কিছু পরিমাণে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়েছিল। অর্থ বা কীর্তি জীবনের মাপকাঠি নয়, নিষ্ঠাই অধ্যাপকজীবনের মূলমন্ত্র—একথা তিনি মুখে বলেন নি, তাঁর জীবন আমাদের সেকথা উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে।

বলা বাহুল্য, এসব কথা কেবলমাত্র গুরুবন্দনা নয়, যদিও গুরুবন্দনা অবশ্যকর্তব্য বলেই মনে করি। জীবনের প্রথম অরুণোদয়ে যাঁদের মনন ও প্রেরণা এ জীবনের নিত্যসঙ্গী, তাঁদের কথা বলবো যখন, তখন সমস্ত হৃদয় খুলেই বলা ভালো। তাই আমাদের ছাত্রজীবনের শেষপ্রান্তে এসে যে দু'জন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কথা মনে জাগে—তাঁদের কথা একটু বলি। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তখন কাব্যালোক গ্রন্থখানির জন্য পি. এইচ. ডি উপাধিতে ভূষিত। কাব্যতত্ত্বের আলোচনা যে তার আপাত দুরূহতা সত্ত্বেও কী পরিমাণে রসগ্রাহী হয়ে উঠতে পারে সুধীরবাবুর অধ্যাপনায় ছিল তারই পরিচয়।

আর একজন—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—যাঁর ছাত্র হয়েছিলাম বাংলাসাহিত্যে অনুরাগের ফলে প্রায় কৈশোর থেকেই—অবশ্য পাঠকরূপে ছাত্র। প্রমথবাবু রবীন্দ্রসাহিত্য পড়াতে এলেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচনৈপুণ্যে সারা ক্লাশের মন জয় করে নিলেন। ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে যে তাঁর খুব বেশী গেছি তখন, তা নয়। কিন্তু তাঁর সব লেখাই খুঁটিয়ে পড়তাম, পড়তে হতো। বাংলাসাহিত্যে আমার প্রিয় লেখকদেরই একজন, বাংলাসাহিত্য সমালোচনায়ও

CENTRAL LIBRARY

তিনি অন্যতম দিশারী। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বড়ো আকারে লিখবার সঙ্কল্প করেছি অনেকদিন। অন্য দেশে এ কাজ বহু আগেই হতো।

জনপ্রিয়তায় সবচেয়ে হৃদয়হারী অধ্যাপক ছিলেন শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী। তাঁর অধ্যাপনায় বহু বিস্তৃত পঠন-পাঠনের সঙ্গে এক রসবোধের সমন্বয় ছিল। নানান প্রসঙ্গ অবতারণার দরুণ তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত দ্যুতি অনেক ছাত্রেরই অগোচর থেকে যেত। সাহিত্যের মজলিসী আসর যেন প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী থেকে কিছুক্ষণের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখা দিত। সাহিত্যমানসিকতার পক্ষে এমন স্বাস্থ্যদায়ক উপকরণ খুবই কম। কিন্তু স্থান ও কাল স্বভাবতঃই বিপরীত ছিল। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত, একটু পরবর্তীকালের ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখদেরও আমরা ছাত্র।

'নবজন্ম' কথাটি জাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এক অর্থ হয়, কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এক যুগব্যাপী নবজীবন-বোধের ব্যঞ্জনা দেখা দিলে তার অর্থও কম অসামান্যতা লাভ করে না। যদি বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়েই আমার এবং আরো অনেক সহপাঠীর 'নবজন্ম' ঘটেছে, কথাটি এতটুকু আতিশয্যপূর্ণ নয়। সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতার পট-ভূমিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা তথা আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের তখন সত্যিই এক স্বর্ণযুগ।

কিছু কি অতৃপ্তি, অপূর্ণতা ছিল না সেখানে? নিশ্চয় ছিল। কিন্তু যা পাওয়া যায়, তার মূল্য দিতে আমরা ক'জনে পারি? কিন্তু একদিন অনবরত চাওয়ার মোহ ঘুচে যখন নিজের দিকে ফিরে তাকাবার সময় হয়, তখন দেখা যায় পেয়েছিও অনেক। এমন কি যা পেয়েছি, হয়তো সত্যিই তার তুলনা নেই। যেমন ধরুন, আমাদের সময় সাহিত্যের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ডঃ সুকুমার সেন, আর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক (সুকুমারবাবুর আচার্য) ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দু'জনেই ছাত্রদের 'আপনি' সম্বোধন করতেন। আর এক একটি ক্লাশে তাঁদের অধ্যাপনার বিষয়বস্তু অবলম্বনে বিশ্ব-পরিক্রমায় আমাদেরও সহযাত্রী করতেন।

পালির অধ্যাপক গোকুলদাস দের কথা মনে পড়ে। প্রাচীন ভাষার অন্তর্নিহিত মাধুর্য দিয়ে বাংলাভাষার ইতিহাসের ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠতো। আর ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত শ্রীমহেশ্বর দাস, যাঁর কাছে প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য পড়ার ফলে অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যের দ্বারস্থ হতে হয় নি কখনো।

পড়াশুনো যতক্ষণ পরীক্ষার স্তরে থাকে, তখন অনেক সময়ই গোষ্ঠীবদ্ধ আলোচনায় সহায়তা হয় নিজের এবং বন্ধুজনেদের। পড়াশুনোর অনুপাতে আড্ডা না থাকলে বুদ্ধি জমাট বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুখের বিষয়, আমাদের আড্ডার জগৎটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল অল্পদিনের মধ্যে। আড্ডাবাজদের মধ্যে সবাই যে এক মনের বা এক ধরণের লোক ছিলেন, তা নয়। বোধ হয় ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যই আড্ডার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিলো। বাংলা, ইংরেজী, রাজনীতি, অর্থনীতি নানা বিভাগের বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে সব গল্প হয়েছে কফি হাউসে, বসন্ত কেবিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অথবা কোলকাতার নানান্ চা-চক্রে—সে সব উপাদানও মনের খোরাক কম জোগায় নি। বরং আরো বিস্তৃত পরিসরে বন্ধুত্ব হলে হয়তো দৃষ্টি আরো প্রসারিত হতো। যথার্থ বিদ্যাচর্চা মানুষকে কেবল বইয়ের মধ্যেই আবদ্ধ করে না, জীবনকে জানতে দেয়। জগৎকে প্রসারিত করে। আমার বন্ধুদের কাছে অনেক গল্পঘন সকাল-সন্ধ্যার জন্য আমি অশেষ ঋণী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ামণ্ডপেই এ বন্ধুত্বের ফসল অঙ্কুরিত হতে পেরেছিল। জীবনের কর্মস্রোতে আমরা আজ নানা পথের পথিক হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটিমাত্র বছর আমাদের অক্ষয় বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ছাত্রজীবনে, গবেষণাকালে, অধ্যাপনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত থাকলেও কিছুদিন এই

CENTRAL LIBRARY

কলকাতায়ই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি। নানা দিক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রয়াস এবং আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবু যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, আপন আত্মীয়লোকে মিলিত হওয়ার আহ্বান। বিশ্ববিদ্যালয় আরো হয়েছে এবং হবে। কিন্তু এখন অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রসারিত শাখাপ্রশাখা ছাড়া তাদের স্বতন্ত্র কিছু মনে হওয়া কঠিন। কেন এমন হয়, একথা না ভেবে বরং ভাবা ভালো এমনটিই প্রত্যাশিত। দীর্ঘদিনের সাধনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং করে চলেছে, তার ফলাফলভোগী শুধু বাংলা নয়, এক হিসাবে সমগ্র ভারত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আবার এ কথাও স্মরণীয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ই বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর আশা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি। জেনে এবং না জেনে মহত্তম দায়িত্বের আমরা সবাই অংশভাগী।

শতাব্দীর একপাদ আগে যখন বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নের সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, হিতৈষীরা অনেকেই সায় দিতে পারেন নি। উন্নতির সিঁড়িগুলি উচ্চপদের শ্বেত পাথরে মোড়া থাকবে না জেনেই এ পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। আজ আমাদের ছাত্রদের বিপুল সংখ্যার দিকে তাকিয়েও একই কথা মনে হয়। 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'। তবু, যে আনন্দের সত্যকে অবলম্বন করে এ পথে এসেছিলাম, আজও কিছু ছাত্রছাত্রী সেই সম্বল নিয়েই বাংলা সাহিত্য পড়তে আসে। শুধু কি বাংলা সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য? আসলে শিক্ষা জগৎটাই তাই। জ্ঞান-সংগ্রহ ও জ্ঞান-বিস্তার এ দুইয়ের মধ্যে এক বিপুল সার্থকতার গভীর তৃপ্তি রয়েছে। একবার সে তৃপ্তির স্বাদ যে পেয়েছে, তার পক্ষে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

দেশের ও জাতির সহস্র ভাঙনের প্রভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্মম আঘাত হেনেছে। কিন্তু কে না জানে, বিশেষ করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের তো একথা ভালোভাবেই জানা আছে যে, এরই মধ্যে জানার আগ্রহ, খোঁজার আনন্দ, ভাববিনিময়ের ঐতিহ্য নানা ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্লোকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে সমুদ্র তরঙ্গের মতো, আর সমুদ্রের নিঃশব্দ অতলে জমেছে শঙ্খ, শুক্তি, ঝিনুকের মেলা। বিশ্ববিদ্যার সমুদ্রসঙ্গমে আমরা যারা একদিন মিলেছিলাম এবং আবার মিলিত হবো—তারা কেউ কলেজ স্ট্রীটকে ভুলবো না।

CENTRAL LIBRARY

আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্র স্মরণে

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য

সেটা ছিল ১৯৩৬-৩৭-এর শিক্ষাবর্ষ। আমি সেবছর কাশী থেকে এসে বাংলা পড়বার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা-বিভাগে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। সে সময় যাঁদের শিক্ষকরূপে পাবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাঁরা সবাই ছিলেন অসাধারণ। তাঁদের অনেকের সঙ্গে পরবর্তী জীবনেও সংযোগ রাখার সুযোগ হয়। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতীয় ভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। এই উপলক্ষে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখবার সুযোগ পেয়ে আনন্দ বোধ করছি।

খগেন্দ্রনাথ বাইরে ছিলেন খুব রাশভারী লোক। ধীর পদক্ষেপে হাঁটতেন। গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখিনি। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর মধ্যে কোনও শুষ্কতা ছিল না। তাঁর গাম্ভীর্যের অন্তরালে এক সূক্ষ্ম রসবোধ ও কৌতুক-প্রিয়তা তাঁর অন্তরকে সর্বদা সজীব ক'রে রাখতো। খগেন্দ্রনাথের বেশভূষা, চিন্তা-ধারা ও বাচন-ভঙ্গী ছিল আতিশয্য-বিহীন ও সুরুচি-পূর্ণ। তাঁর সব ব্যাপারে একটা পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠতো। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। এ পরিচয় গবেষক ও শিক্ষকের বহিরঙ্গ, ব্যাপক পরিচয় নয়। এ পরিচয় অন্তর্মুখী, ভক্তজনসুলভ ও উপলব্ধি-ধন্য। এই গভীর চেতনা তাঁর মানসিক গঠনকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

খগেন্দ্রনাথ ছিলেন দর্শনের মেধাবী ছাত্র। দীর্ঘ-দিন ঐ বিষয়ে অধ্যাপনা ক'রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। সেযুগে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রব্যক্তি বাংলার কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালীর এই গৌরবের বস্তুটি প্রতিষ্ঠিত করা। খগেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। এইভাবে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে অবগাহনের সুযোগ পান। প্রাচীন কীর্তনীয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন ব'লে তিনি রসলোকে উপনীত হ'তে পেরেছিলেন। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর এই অধিকার বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপন করে দিতে সক্ষম হ'য়েছিল।

খগেন্দ্রনাথের মধুর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর বাংলা ও ইংরেজী লিখন-ভঙ্গীর বেশ মিল ছিল। 'সুখ দুঃখ' নামে তাঁর একখানা বাংলা প্রবন্ধ-সঙ্কলন আমার কাছে আছে। তাঁর গদ্যভঙ্গী আমার বেশ ভাল লাগে। পরিমার্জিত ও সংহত বাক্যাংশ সাজিয়ে তিনি ছন্দোময় গদ্য লিখতেন। বক্তব্য যাতে অব্যক্ত না থাকে, সেজন্য তিনি অনেক সময় বহু ছোট ছোট বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাদের অবিন্যস্ত হ'তে দিতেন না। আর ভাল লাগতো, আবেগে উদ্বেল হ'য়ে বাক্যের প্লাবনে তিনি কখনও তাঁর বক্তব্য ও পাঠকের গ্রহণ-শক্তি ভাসিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন না। আমার মনে হয়, বাংলা গদ্যের স্টাইলিস্টদের মধ্যে তাঁর স্থান উপরের সারিতে।

CENTRAL LIBRARY

এ অনুষ্ঠান আমারও

সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

ঠিক ষোলো বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে এসেছিলাম। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক সম্পর্কটাও শেষ হয়েছে প্রায় তেরো বছর আগেই। তবে আত্মিক সংযোগে যে এখনও টোল খায়নি তা বুঝি যখন কলকাতায় এসে কখনো-সখনো আশুতোষ বিল্ডিংস্-এর পাশ দিয়ে যাই আর অতলান্ত কোন অনুভবে ওর দোতলার প্রতিটী জানলা, প্রতিটী থাম চোখ আর মনকে আটকে রাখতে চায়; যখন অলক্ষ্যে এবং বিনা কারণেই এ বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে মনে করতে চেয়েছি—এর সব কিছুতেই তো আমারও অস্তিত্ব মিশে আছে,—আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা আমার সেই বিগত দিনের দাপটের কথা নাই বা জানুক। আর মনে হ'লো হঠাৎ যখন আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে আমার শ্রদ্ধাভাজন মাস্টারমশাই আশুতোষ ভট্টাচার্যের নিমন্ত্রণ পেলাম। আনন্দ ও ঐতিহ্য-চারণের দিনে পুরোনো মাস্টারমশাই সংযোগহারী পুরোনো ছাত্রকেও যে স্মরণ করেছেন, এ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিক ব্যাপ্তির পরিচায়ক, তেমনি আমার কাছেও সবচাইতে বড়ো সংযোগ।

সংযোগসূত্র আরো একটা রয়েছে—অভিমানের। সেই স্কুল থেকেই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উপর গভীর অনুরাগ জন্মেছিল এবং তারই রেশ ধরে অনেক অনুৎসাহের বাধা অমান্য করেও এই বিষয়কেই আমার উচ্চতর শিক্ষার মূল হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। এর চর্চায় নিষ্ঠা ও সম্প্রীতির অভাব কখনোও হ'তে দিইনি; তাই দাবী ও অভীপ্সাও বোধহয় একটু বড়ো রকমেরই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বলে সব দাবীই কি মাননীয়; সব অভীপ্সাই চরিতার্থ হয় নাকি? কিন্তু অভিমানের দগদগে জ্বালাই বা এড়াই কি করে? এই অভিমানই আমার প্রিয় বিভাগ, প্রিয় বিষয় থেকে আমাকে সরিয়ে নিলো অনেক দূরে—এতো দূরে যেখানে কথন-লিখনে বাংলা ভাষার অবকাশ প্রায় অনুপস্থিত; আর বাংলা সাহিত্য?—**You are an M.A. in Bengali Literature?—strange!**—এ সব কথা আবার সেই অভিমানবশেই মনকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো আজকের এই গৌরব-সভায়।

……স্মৃতিচারণ একটা নেশা। আমার এই নেশায় মোহনীয় ইন্ধন জুগিয়েছে আমার স্ত্রী মণিকা যে এই বাংলা বিভাগেরই ছাত্রী ছিল। আমাকে সে প্রায়ই ওদের সময়কার দারুণ দারুণ মজার গল্প শোনায়—ছেলেমানুষির হাল্কা হাসিতে ভরা, বুদ্ধির দীপ্তিতে চটকদার। আমারও ভাণ্ডার কি কম?…একদিন প্রমথনাথ বিশী বললেন: '…সেই যে পরমারাধ্য দেবাদিদেব, তিনি ভূত নন, ভূতনাথ—প্রমথ নন, প্রমথনাথ।' প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় আমরা সবাই হঠাৎ সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লাম; কারণ আমরা তো আব্ছার ওঁকে প্রমথ বিশীই বলতাম! আর একদিন। বিকেল তিনটের ক্লাস—পড়ানোর কথা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র। মেঘলা পরিবেশ, আকাশে গুড়্ গুড়ানির ঘুম-পাড়ানি সুর, বর্ষণের প্রস্তুতি চলছে। বিশী মশাই বললেন—'এই বিষণ্ণ-মধুর পরিবেশে নিজেদের বিরহী মনে হ'চ্ছে নাকি? এসো, আজ আমরা কালিদাসের মেঘদূত পড়ি।' এই বলতে বলতেই আমাদের মধ্যে একটী 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠ' হঠাৎ হাই তুললো; আর আমরা মন্দাক্রান্তার হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শুনলাম বিশী মশাই বলছেন: 'এমন পরিবেশে যদি কেউ হাই তোলে, তবে কি **his highness**-কে আমরা ক্ষমা করতে পারি না?'……আমাদের সময়কার পঠন-পাঠনে এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে **humour** ও **wit**-এর এই **highness** অবক্ষিম-রেখায় উত্তুঙ্গ ছিল—নিশ্চয়ই আজোও আছে।

CENTRAL LIBRARY

আগে-পরের কাহিনী আমার জানা নেই, তবে আমার সময়কার শিক্ষণ-পরিবেশে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে প্রীতি-সংযোগ ও উৎসাহ-উদ্‌বোধনের সম্পর্কই সহজ-প্রাপণীয় ছিল। কতো সকাল-সন্ধ্যে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, প্রভৃতি মাস্টার মশাইদের বিদগ্ধ সাহচর্যে। এঁরা শুধু নির্দেশই দিতেন না, নিজেদের তাৎকালিক লেখার প্রথম বা দ্বিতীয় পাঠের সংগে পরিচয় করিয়েও দিতেন এবং আমার মতো অর্বাচীনের কাছ থেকেও সে-সব বিষয়ে আলোচনা গৃহীত হ'তো। এ ধরণের সুযোগ অনায়াসেই এসেছিল; কিন্তু হায়, কেমন অনায়াসেই আবার সেই সুযোগের সৌরজগৎ থেকে প্রত্যাখ্যাত হলাম। কিন্তু একটা কথা কিন্তু বেঁচে রইলোই। মাস্টার মশাইয়ের নিকট ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে না এলে যেমন শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক গোড়াপত্তন মজবুত হয় না, উচ্চশিক্ষার বেলাতেও তাই-ই। এ জিনিষ মাস্টার মশাইদের কাছে চাইলেই অনায়াসেই পাওয়া যেতো আমাদের সময়ে। আসলে ছাত্রের নিষ্ঠাবান কৌতূহলের পরিচয় পেলে ওঁরাই এগিয়ে আসতেন,—অনেক সময় নিজের কাজ ও অবকাশকে অবহেলা করেও। মনে পড়ছে, আশুতোষবাবু কতোবার তাঁর পরীক্ষার খাতা ও নিজের লেখাকে সরিয়ে রেখে আমার অনেক কৌতূহলের দাপট নিরলসভাবে সহ্য করেছেন। হরপ্রসাদবাবু লিখছেন আর আমাকে উঠতে না দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে যাচ্ছেন। নারায়ণবাবু সন্ধ্যার কোন অলস অবকাশে যখন পরিবারের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন তখন আমার প্রাদুর্ভাব তাঁকে কোনদিনই এতটুকুও বিরক্ত করেনি; বরং হাসিমুখে তক্ষুনি বসে একই অধিবেশনে আমার কাঁচা হাতের লেখা একটী পূর্ণাঙ্গ নাটক পুরোটাই পড়ে ফেললেন এবং তারপর চা-সহযোগে আলোচনাও করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

আশুতোষ বিল্‌ডিংসের রাস্তার দিকের স্কুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রমথনাথবাবুর বিদগ্ধ সান্নিধ্যে যে কতোবার সাহিত্য-বিষয়ক উত্তেজনার আগুন পুইয়েছি, তা কি ভোলবার? আর শশিভূষণবাবু ও বিজনবাবু তাঁদের নির্দেশ ও উপদেশ অকৃত্রিম ছাত্র-বাৎসল্যে দিয়ে চল্‌তেন ঘর পেরিয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তেও। মনে হতে পারে আমি বোধ হয় ভ্রাম্যমান ছাত্র ছিলাম। তাই বটে; কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে যে পথ গড়ে উঠেছিল তা এক রাজসিক পথ; সেই রাজসিকতায় ছিল নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ প্রণতি, প্রত্যয় ও প্রাচুর্য।

পথ যে সর্বদাই সহজ ছিল তা নয়, তবে প্রত্যুদ্‌গমন ছিল না; শাসন ছিল, সেই সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কের অস্বচ্ছতা ছিল না। আমাদের সময়েও ছাত্রদের 'ইউনিয়ন' ছিল, নির্বাচনের উত্তেজনা ছিল, 'চীপ' এবং 'ডীয়ার' মিলিয়ে ক্যান্‌টিনের সংখ্যাও বোধ হয় বেশীই ছিল, কিন্তু এসবের জন্যে কোনদিন 'ক্লাস' বন্ধ হয়নি বা ছাত্র-সৌহার্দে একটুকু ফাটল ধরেনি এবং মাস্টার মশাই-এর নির্দেশ, তা কঠিন বা কমনীয় যা-ই হোক্ না কেন, সসম্মান স্বীকৃতি পেয়েছে সবার কাছ থেকেই।—একে স্বর্ণযুগ বলে কিনা ঠিকঠিক জানি না, তবে এই ঐতিহ্য যে সোনার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?

CENTRAL LIBRARY

আচার্যবৃত্ত

CENTRAL LIBRARY

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬-১৯৩৯

শোভা রায়

ম্যাকসমূলারের একটি কথায় আছে: 'যে দেশের জনসাধারণ তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত নয় অথবা তা স্মরণ করে গৌরববোধ করে না, তারা তাদের জীবনে ও জাতীয় চরিত্রের একটি প্রধান অবলম্বনকেই বিস্মৃত হয়।' কথাটি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন একজন বাঙালী সন্তান। তিনি সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। তিনিই আমাদের আত্মবিস্মৃতির অগৌরব দূর করে সর্বকালের জন্য তাঁর স্বজাতিকে এক অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করে গিয়েছেন। বাংলাভাষা, সাহিত্য ও বাঙালী জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচনা করে তিনি যে মহৎ কাজ করে গিয়েছেন, আজ বোধ হয় আমরা তার মূল্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। বাংলার অতীত বিস্মৃতযুগের সাহিত্যকীর্তির ইতিহাস রচনা এই সাহিত্যাচার্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শুধু কি সাহিত্যের ইতিহাস? বাংলাভাষার রূপান্তর সম্পর্কে যথেষ্ট অনুশীলন করার পর তিনি এর উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আজ তা সুধীসমাজে স্বীকৃত হয়েছে। আবার বাংলা অক্ষরের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কেও তিনি যে আলোচনা করেছেন, পরবর্তীকালের ভাষাবিদ্‌গণের নিকট তাও স্বীকৃতি পেয়েছে। মোট কথা, বাংলাভাষা ও বর্ণমালার ক্রমবিকাশকে দীনেশচন্দ্রের পূর্বে এমনভাবে ইতিহাসবদ্ধ করার কথা আর কেউ চিন্তা করেননি।

দীনেশচন্দ্রের কাছে আরো একটি বিষয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শুধু ভাষা ও লিপির ইতিহাস নয়, প্রাচীনবাংলার বিস্মৃত কাব্য ও সাহিত্যকে বর্তমানযুগের পাঠকের কাছে প্রথম তিনিই তুলে ধরেছেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে আরো তিনজনের নাম স্মর্তব্য, যথা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। শেষোক্ত দুইজন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এইক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহের শেষ ছিল না। তখন তিনি হয়তো জানতেন না যে, তাঁর এই আকুতি ভবিষ্যতে এমন একজনের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে যিনি বাংলার গ্রামপ্রান্তে জন্ম নিয়েছিলেন। সেই মানুষ দীনেশচন্দ্র সেন। অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েই বাঙালী সমাজে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, অথচ তিনিই ছিলেন এক নূতন পথের দিশারী। কেমন করে এটা সম্ভব হলো? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যেহেতু বাংলার মাটিঘেঁসা মানুষ তিনি ছিলেন, যেহেতু বাংলার মাটির প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ, সেইহেতু দীনেশচন্দ্র অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, গ্রামবাংলায় উৎপন্ন গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেই আছে বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস ও তার সভ্যতার পরিচয়। বর্তমান কালের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি আজ যে কথা বলেছেন, বাঙালী দীনেশচন্দ্র বহুপূর্বেই আমাদের সেইকথা বলে গিয়েছেন। শুধু বলে যাওয়া নয়, হাতেকলমে তার প্রমাণও দাখিল করে গিয়েছেন। বহু আয়াসে সংগৃহীত পুঁথিপত্রের পাঠোদ্ধার করে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করে যেদিন দীনেশচন্দ্র সারস্বত সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই দিনটি আমাদের জাতীয় পঞ্জিকায় চিহ্নিত হয়ে থাকা উচিত।

দীনেশচন্দ্র উনিশ শতকের ষষ্ঠদশকে (১৮৬৬) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে সেই শতাব্দীর প্রথমার্ধের বর্ণাঢ্য ইতিহাস। সে ইতিহাস স্বল্প বিস্তর সকলেরই জানা আছে। রাজা রামমোহন

CENTRAL LIBRARY

রায়ের বহুমুখী চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের দ্বারাই এক নূতন যুগের উদ্বোধন হয়েছিল। রামমোহনের পর প্রবলভাবে যিনি আত্ম-অনুসন্ধানে যুগের উদ্বোধন করলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সময় থেকেই বাঙালী ঘরের দিকে মুখ ফেরাতে থাকে। দীনেশচন্দ্র ছিলেন এই আত্ম-অনুসন্ধান যুগেরই একজন সন্তান। শহর কলকাতায় যখন রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ লেখকবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন বাংলার গ্রামপ্রান্তে জন্ম নিয়ে যিনি সেই সন্ধানকে একটি বাস্তব রূপ দেবার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন তিনি তখন কুমিল্লার শম্ভুনাথ স্কুলের একজন অখ্যাত শিক্ষকমাত্র ছিলেন। এই শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গৌরব যতখানি আচার্যের, ঠিক ততখানি ভক্তের। ভক্তের অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই তিনি বঙ্গভারতীর মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এবং যেসব বিবিধ অর্ঘ্যসম্ভারে তিনি বঙ্গভারতীর সেবা ও পূজা করে গিয়েছেন তা ছিল একান্তভাবে তাঁরই আহৃত উপচার। আবার সেসব উপচারের অধিকাংশই ছিল বিস্মৃতির আবরণে অবলুপ্ত। সেই বিস্মৃতির অন্ধকার দূর করা তাঁর পূর্বে আর কোনো সাহিত্যসেবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি, একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে, একমাত্র তাঁরই একক উদ্যম ও নিষ্ঠার ফলেই শুধু গৌড়বঙ্গের নয়, বৃহত্তর বঙ্গের পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং সেই পরিচয়ের আলোকেই আমাদের জাতীয়জীবনের সাংস্কৃতিক দিকটা আজ যথার্থ উদ্ভাসিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র ছিলেন তাই একাধারে সত্যসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক এবং জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ সাহিত্য-সাধক।

আচার্য দীনেশচন্দ্র ১৮৬৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৯ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল তিনি ছিলেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবায় সমর্পিতপ্রাণ। খ্যাতি ও যশের প্রতি বীতস্পৃহ শিক্ষাগুরু, রসস্রষ্টা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক এই মানুষটি অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে যে মহৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁর জীবনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে সেই সাধনারই ইতিহাস। বস্তুত যতদিন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষিত জনসাধারণের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের বিষয় হয়ে থাকবে, ততদিন আচার্য দীনেশচন্দ্রের গৌরব অম্লান থাকবে। দীনেশচন্দ্রের জীবন প্রকৃতপক্ষে একটি মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসাধকের জীবন। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—যা-কিছু বাংলার নিজস্ব জিনিস, যা কিছুতে বাংলার মাটির সংস্পর্শ লেগেছে তার প্রতি তিনি বোধ করেছেন নিবিড় অনুরাগ। তাঁর অর্ধশতাব্দীকাল ব্যাপ্ত সারস্বত-সাধনার মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতি-প্রীতি যেন অকুণ্ঠভাষায় ঝরে পড়েছে। তাই এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটিকে বুঝতে হলে, তাঁর সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়ন করতে হলে এই অনুরাগের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র তাঁর কর্মবহুল জীবনের কথা, তাঁর বংশের কথা ও সমসাময়িক সমাজের কথা বিস্তারিতভাবেই বর্ণনা করেছেন। সেই কাহিনীপাঠে আমরা জানতে পারি যে, ঢাকাজেলার অন্তর্গত বগজুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬৬ সনের ৩রা নভেম্বর দীনেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন ঢাকার সুয়াপুর গ্রাম-নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যপরিবারের সন্তান। পুত্রের জন্মকালে তিনি ধামরাই স্কুলে হেডমাস্টারি করতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে দীনেশচন্দ্রও শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। নয়টি কন্যার পর ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর পত্নী রূপলতাদেবী পুত্রলাভ করেন বলে দীনেশচন্দ্র পিতামাতার বিশেষ আদরের সন্তান ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সেন রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করে ক্রমশঃ তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট ও অনুরাগী হন। ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি হিন্দুর বিগ্রহ পূজা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে দীনেশচন্দ্রের মাতা ছিলেন একান্ত ধর্মপরায়ণা আচারনিষ্ঠ হিন্দুরমণী। শাস্ত্রীয় পূজাঅর্চনা বিশেষ করে বিগ্রহপূজাই ছিল তাঁর ধ্যান-

CENTRAL LIBRARY

ধারণা। এই উভয় প্রভাবের টানাপোড়েনে তাঁর শৈশব ও যৌবন গঠিত হয়েছিল। এছাড়া পাঠ্যাবস্থায় দীনেশচন্দ্র খ্রীস্টান মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গেও এসে পড়েছিলেন। ঢাকার চ্যাপলেন ইলিয়ট সাহেব দীনেশচন্দ্রকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তথাপি শেষপর্যন্ত দীনেশচন্দ্র রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের প্রতিই অনুরক্ত হন। তাঁর বিধবা দিদির নিকট রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতেন দীনেশচন্দ্র এবং এঁর কাছে পুরাণের গল্প ও বৈষ্ণবগান শুনে মুগ্ধ হতেন।

দীনেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন খুব দেদীপ্যমান ছিল না। মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুল থেকে তের বৎসর বয়সে তৃতীয় বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ঢাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন। ঢাকা জগন্নাথ স্কুল থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৮৮৪ সনে ঢাকা কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে তাঁর জীবনে দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়। তিনি যখন সবে বি. এ. পড়তে সুরু করেছেন তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং সেই অল্পবয়সেই সংসার প্রতিপালনের গুরু দায়িত্বভার তাঁকে বহন করতে হয়। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ স্কুলে দীনেশচন্দ্রের শিক্ষকতা জীবন সুরু হয় চল্লিশ টাকা বেতনে। এইখানে শিক্ষকতাকালে তিনি ১৮৮৯ সনে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, শৈশবেই দীনেশচন্দ্রের মনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে কবিতা-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরম্ভ হইয়াছিল। যখন আমার ৭ বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ক্লাসে ভাল ছাত্র না হইলেও পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাহিরের সাহিত্যচর্চায় আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না।' শৈশবকাল থেকেই কবিখ্যাতি লাভের স্বপ্ন দেখতেন ও লেখক হওয়ার উচ্চাভিলাষ পোষণ করতেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র দীনেশচন্দ্র তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন: 'বাংলার সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব।' কবি তিনি হতে পারেন নি, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের গৌরব লাভ করেছিলেন।

হবিগঞ্জ স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে ইস্তাফা দিয়ে দীনেশচন্দ্র অতঃপর কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এই স্কুলে তিনি অল্পদিনই কাজ করেন। উন্নতির আশায় তিনি নিকটবর্তী ভিক্টোরিয়া স্কুলে যোগদান করেন। কুমিল্লায় অবস্থানকালে তাঁর জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—তাঁর অক্ষয় কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ এইখানেই জন্মলাভ করেছিল। এই পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে ও দারুণ মস্তিষ্ক-পীড়ায় তিনি দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করেন। এই সময়ে সরকার তাঁর জন্যে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। অতঃপর এই শতাব্দীর সূচনায় দীনেশচন্দ্র স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন ও তখন থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। আশুতোষের চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯০৯ ও ১৯১৩ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হন এবং তারপর 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় বিশ বৎসরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২১ সনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দানে সম্মানিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠনের প্রবর্তনে আশুতোষের

CENTRAL LIBRARY

কৃতিত্ব যতখানি, দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্বও তার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এইটি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম। বাংলার সাহিত্যসমাজ কর্তৃকও তিনি বিশেষ ভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৩৯ সনের ২০শে নভেম্বর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই সাহিত্যাচার্য লোকান্তর গমন করেন

উচ্চাভিলাষ মানুষকে বড়ো করে—সকল কীর্তিমান পুরুষের জীবনে এটি একটি পরীক্ষিত সত্য। আমরা জানি শৈশবাবধি দীনেশচন্দ্রও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। 'হয় কবি হইব, কবি হইতে না পারিলে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইব' ছাত্রজীবনের এই আকাঙ্ক্ষা তিনি পরিণত জীবনে চরিতার্থ করেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ রচনা করে। এটি একটি কত বড়ো বৃহৎ কর্ম তা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুধীজনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতেই প্রমাণিত হয়েছে। সিঁড়ির উপরের ধাপ থেকে পা বাড়ালেই উঁচুতে পৌঁছান যায় বটে, কিন্তু সেই উপরের ধাপটিই গোটা সিঁড়ি নয়। নীচের ধাপ না থাকলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যায় না, এ সত্য সকলেই জানেন। তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও আমাদের দিগ্বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বা এইরকম মুষ্টিমেয় দু'চারজন জগজ্জয়ী প্রতিভা যদিও বাংলার সাহিত্য ও সর্বোপরি তার জীবন ও ইতিহাসকে বিস্ময়কর প্রতিভার দ্বারা প্রায় রাতারাতি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, এ শুধু কোনো একক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। দীনেশ-প্রতিভা আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। দীনেশচন্দ্রের আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়নি এমন নয়; তাঁর পূর্বে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহের কাজ করেছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম বিপুল বঙ্গসাহিত্যকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলেন এবং বঙ্গভাষার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের বিকাশের ধারাকে যুক্ত করে দেখালেন। প্রতিযোগিতামূলক একটি প্রবন্ধে যার সূত্রপাত, পরবর্তীকালে তারই পরিণত রূপ হলো বিপুল-কলেবর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার নেপথ্য ইতিহাস দীনেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর মনের মধ্যে বাংলাভাষার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখবার সংকল্প জেগেছিল, আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে তা জানবার উপায় নেই। শুধু আমরা এইটুকু মাত্র জানি যে, মফঃস্বলে মফঃস্বলে পদব্রজে ঘুরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে এবং কীটদষ্ট সেইসব পুঁথির পাঠোদ্ধার করে দীনেশচন্দ্র এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে। তিনিই গ্রামে গ্রামে ঘুরে অদম্য অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের আনুপূর্বিক একটি ইতিহাস রচনা করেন। এর পিছনে ছিল তাঁর ছয় বছরের একনিষ্ঠ পরিশ্রম। আজ যখন আমরা কল্পনা করি যে, আজ থেকে সাতাত্তর বছর পূর্বে, কুমিল্লার একজন অখ্যাত অজ্ঞাত স্কুল শিক্ষক, প্রাচীন হাতেলেখা পুঁথির সন্ধানে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে ও বহু বিপদের মধ্য দিয়ে —তখন আমাদের মন স্বতঃই তাঁর প্রতি কি শ্রদ্ধায় অবনত হয় না? এইভাবে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও বিরল। ইংরেজী সাহিত্যে স্যামুয়েল জনসন বা বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত 'কবি-জীবনী' রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন সত্য, কিন্তু দীনেশচন্দ্রের প্রয়াস ছিল আরো ব্যাপক ও কষ্টসাধ্য। ১৮৯৬ সনে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুঁথি সংগ্রহের কাজে দীনেশচন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটি ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। ছয় বছরের চেষ্টায় বহু ক্লেশ স্বীকার করে তিনি যে পুঁথি সংগ্রহ করেন তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'-র কলেবর।

এই বিপুল-কলেবর ইতিহাসে তিনি কেবল সংখ্যাতীত নূতন আবিষ্কৃত পুঁথির সাহায্যেই বাংলা সাহিত্যের

CENTRAL LIBRARY

ক্রমবিবর্তনের ধারাটি শেখালেন না, তার সঙ্গে ধর্ম ও সামাজিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সারস্বত-সৃষ্টির নিগূঢ় সম্পর্কটিও সূক্ষ্মভাবে এঁকে দেখালেন। গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম আমরা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারের রীতি দেখতে পাই। তাঁর এই ইতিহাস-খানি যদি শুধু তথ্যভারাক্রান্ত হতো, তাহলে সুধীসমাজে এর সমাদর এমন হতো কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাসের যুগ-বিভাগ আদর্শ নিরূপণ করেছেন। কেবল তথ্য সমাহরণ নয়, সেই সঙ্গে রসাত্মক উদ্ধৃতির সাহায্যে একটি সাহিত্যধারার সামগ্রিক রূপটি যেমন পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়, তেমনি গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্মত সমালোচনামূলক মন্তব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সব্যসাচীর মত তিনি ইতিহাস ও সমালোচনার যুগল দায়িত্ব পালন করেছেন। এইভাবে সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার আলোচনা গ্রন্থখানির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হলে দেশের সাহিত্যানুরাগী সুধীসমাজের বিস্মিত দৃষ্টি গ্রন্থটির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনা লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর বাংলাদেশের পাঠক সমাজে যেমন আনন্দ কলরোল জেগেছিল তেমনি বিগত শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজে যে আলোড়ন জেগেছিল তার তুলনা বিরল। তারপর অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ (*History of Bengali Language and Literature*) প্রকাশিত হলে দীনেশচন্দ্র কেবল স্বদেশের নয়, বিদেশীদেরও সাধুবাদ অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাধনা ও সেবার ফলেই বঙ্গভাষার ইতিহাস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থগুলির পাশে সমমর্যাদায় স্থান লাভ করেছিল। ইংরেজী অনুবাদের কাজে ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন—এ কথা দীনেশচন্দ্র স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাভেল, হেনরি ব্র্যান ডাইক, রীজ ডেভিডস, হলস বুথ, কের্ণ, ওল্ডেনবার্গ, জে. ভি. এণ্ডার্সন, সিলভাঁ লেভি প্রমুখ সেকালের খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীনেশচন্দ্রের ইতিহাস-মনীষার প্রশংসা করেছিলেন। লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'টাইমস লিটরারি সাপ্লিমেন্ট' পত্রিকায় দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ হল ১৯১২ সনের ঘটনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি যখন লণ্ডনে ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয় তখন দীনেশচন্দ্রের ইতিহাসই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পথ বহুলাংশে সুগম করে দিয়েছিল। দীনেশচন্দ্রের পক্ষে এটি কম গৌরবের কথা নয়।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় ওই গ্রন্থের এক উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ পরিচিতি লেখেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা উপলক্ষে লিখেছেন—

> 'এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এত বড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না, তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম। দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনা-মূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই, আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইতেছি।'

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থটি সত্যই ইতিহাস-বনস্পতিতুল্য। বাঙ্গালী জাতির বিচিত্র কাব্যসাধনার শাখা-প্রশাখা এক বৃহৎ

CENTRAL LIBRARY

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাণ্ডকে আশ্রয় করে মহীরুহের আকারে চারদিকে ডালপালা মেলে ধরেছে। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মধ্যে এমনি বিশালতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সম্পূর্ণ বাংলাদেশের মর্ম-জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাঙালী জাতির মর্মগত সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের একটি বিশেষ ধারণা ছিল। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, 'পূর্ববঙ্গগীতিকা', 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির ভিতরে এবং অন্যান্য লেখায় তিনি তাঁর এই ধারণা প্রকাশ করেছেন। দীনেশচন্দ্রের লেখার প্রতিটি ছত্রে রয়েছে জাতীয়তার আবেদন। আর এই আবেদন, এই দেশপ্রেমের প্রেরণা মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকারী। তিনি বাঙালী তথা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই তিনি বাঙালী তথা ভারতীয়ত্বের চিহ্নসম্বলিত যে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা উদারতায় গরীয়ান, মানবতায় মহীয়ান্।

মানবসম্পর্কের ভিতর শ্রেষ্ঠ যে সম্পর্ক তা শ্রদ্ধাভক্তি দয়ামায়া প্রেমপ্রীতির এক অপূর্ব বন্ধনে গ্রথিত। আর এই গুণগুলি বাঙালীর সহজাত সংস্কার। এই চিরকালীন সত্যাদর্শকে, মহৎ প্রেরণাকে বাঙালী জাতির মৌলিক সংস্কাররূপে গ্রহণ করে তাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন দীনেশচন্দ্র। যাতে সর্বকালের শিক্ষিত অশিক্ষিত সব ব্যক্তিরাই এই আদর্শে দীক্ষিত হতে পারেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্বস্থ হবার জন্যেই তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার গৌরব দীনেশচন্দ্রকেই দেওয়া উচিত। তাঁর আগে মুদ্রিত পুস্তকাদি নিয়ে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'র লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন ও *The Literature of Bengal* গ্রন্থের লেখক মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেশচন্দ্রের সমসাময়িক যশস্বী লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। আমরা বাংলার নবজাগৃতিতে গৌরব অনুভব করে থাকি, এই জাগরণের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ইতিহাস-চেতনা এবং প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণকে এই ইতিহাস-চেতনাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমরা কয়েকজন বাঙালী মনীষীর ভিতরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করি। এঁরা হচ্ছেন 'কবি-চরিত' রচয়িতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁদেরও পূর্বগামী হচ্ছেন হরিশচন্দ্র মিত্র। হরিশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের নাম 'কবি-কলাপ'। এঁদের রচনার খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দীনেশচন্দ্রের উদ্যমে একটি সংহত রূপ লাভ করেছিল। দীনেশচন্দ্রের এই পুস্তকটি মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তথ্যের পুঞ্জীভবন মাত্র নয়, এর মূলে ছিল জাতির প্রতি একটি মমতা ও আদর্শবোধ। এই গ্রন্থটিতে গবেষণা থাকলেও সেটাই একমাত্র নয়, তার চেয়েও আরও বেশি কিছু ছিল, তা হচ্ছে একটা গঠনাত্মক দৃষ্টি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা পূর্বে হয়েছে, এ কথা সত্য, কিন্তু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর পূর্ণতা এগুলির কোনটিতেই ছিল না। 'ইতিহাস' কথাটির মধ্যে ধারাবাহিকতার যে অর্থটি নিহিত আছে, এই পুস্তকটি রচিত হওয়ার পূর্বে, বাংলা সাহিত্য বিষয়ে যে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার কোনটিতেই এই আদর্শের ফলশ্রুতি ছিল না।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে দীনেশচন্দ্রকে যে অসামান্য পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ফলে

CENTRAL LIBRARY

তিনি দুরারোগ্য মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং দীর্ঘ দিনের জন্য কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিতে বাধ্য হলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এরপর তিনি চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় চলে আসেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রীয়ারসন ও অন্যান্য সাহেবদের সাহায্যে তিনি সরকার থেকে একটি বিশেষ মাসিক বৃত্তিলাভ করেন এবং পরে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে আজীবন একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করেন। এই সময়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের পর দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অভিনন্দনপূর্ণ চিঠি পেয়েছিলেন। সম্ভবত ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের সর্বপ্রথম পরিচয় হয়। দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার পরীক্ষকের পদপ্রার্থী হন। অশেষ বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি পূর্বেই এই শক্তিমান সাহিত্য সাধকের ওপর পড়েছিল। তাঁর রচনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সুতরাং দীনেশচন্দ্রের প্রার্থনা অচিরেই মঞ্জুর হয়।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজীতে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দেবার জন্যে দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' নিযুক্ত হন। তিনি যে বক্তৃতা দেন সেই বক্তৃতা পরে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে *History of Bengali Language and Literature* গ্রন্থরূপে সংবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। এতকাল দীনেশচন্দ্রের খ্যাতি বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ইংরেজী বইটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্য দেশেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মনীষী এই বইটির উচ্চ প্রশংসা করতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি একটি পত্র লিখে দীনেশচন্দ্রকে এই বলে অভিনন্দন জানান—

> 'I cannot give you praises enough—your work is a *Chintamani*—a *Ratnakar*. No book about India would I compare with your·····Never did I find such a realistic sense of literature···Pundit and peasant, Yogi and Raja, mix together in a Shakespearian way, on the stage you have built up.'

সচরাচর প্রশংসাকৃপণ ইংলণ্ডের 'টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট' ২০শে জুন ১৯১২ তারিখের সংখ্যায় লেখা হয়—

> 'In his narration, as becomes one who is the soul of scholarly candour, he tells those, who can read him with sympathy and imagination more about the Hindu mind and its attitude towards life than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans·····Mr. Sen may well be proud to the lasting monument he has erected to the literature of his native Bengal.'

এই গ্রন্থ প্রকাশের পর *Typical Selections from Old Bengali Leterature* দুখণ্ডে ইংরেজী ভূমিকা সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যপদে সমাসীন হন এবং বিশবছর এই পদে বহাল ছিলেন। পুনরায় তিনি 'রীডার' নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকলেও তাঁর লেখনী স্বল্পকালের জন্যেও বিশ্রামলাভ করেনি। পর পর তিনি অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে 'মীডিয়েভাল বৈষ্ণব লিটারেচার' নামে গ্রন্থ এবং রামতনু লাহিড়ী ফেলোরূপে 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ কম্পেনিয়নস্' 'দি ফোক

CENTRAL LIBRARY

লিটারেচর অব বেঙ্গল', 'বেঙ্গলী রামায়ণস্' 'গ্লিম্পসেস অব বেঙ্গল', 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ এজ', 'বেঙ্গলী প্রোজ স্টাইল' প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অধ্যয়নের জন্যে পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হয়। বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। দীনেশচন্দ্র এই বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হন। এই নতুন ব্যবস্থার নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্যার আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। এ দিক থেকে দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী' ও ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

এত বড়ো দায়িত্ব গ্রহণ করেও দীনেশচন্দ্র এক মুহূর্তও তাঁর গবেষণা ও লেখা পরিত্যাগ করেননি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পল্লীগীতি সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের গীতিকাসমূহের সংগ্রহকার্যে তাঁর সহায়তা করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন, যতীন্দ্র সেন প্রভৃতি। এঁদের সংগৃহীত পল্লীগীতিকা একত্র করে দীনেশচন্দ্র ইংরেজী ও বাংলায় আটখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলি পাশ্চাত্ত্যদেশে পৌঁছলে বহু পণ্ডিত সাহিত্যিক এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই গীতিকাগুলি সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন—'মেটারলিঙ্কের নাটকে ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি একেবারে নিখুঁত।' *Eastern Bengali Ballads* গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন বাংলার ভূতপূর্ব গভর্ণর ও ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড। এই পুস্তকটি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রোঁমা রোঁলা এই বইয়ের ফরাসী অনুবাদ পড়ে বিশেষ মুগ্ধ হন রোঁলার ভগিনী মাদাম রোঁলা পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির অভাবিত কবিতা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এগুলির আবিষ্কারের জন্যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় দীনেশচন্দ্রের প্রশংসা করেন। মাদাম রোঁলা এই গ্রন্থ থেকে কয়েকটি পল্লীগীতি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকা সমেত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত শুধুমাত্র এই গাথাগুলির মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। প্রখ্যাত চেকোশ্লাভাক ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক লেস্নীর শিষ্য ডক্টর দুসান জুবিটেল বাংলাদেশে থাকা-কালীন দীনেশচন্দ্রের সংগৃহীত মৈমনসিংহগীতিকাগুলির বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন এবং তার কিছু অংশ চেক্ ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৯২০ থেকে ১৯৩২ এই বারো বছর দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় বাংলার পণ্ডিত ও গুণিজনকর্তৃক তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হন। দেশবাসী তাঁকে সাহিত্যাচার্যের পদে স্বাভাবিকভাবেই বরণ করে নেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীনেশচন্দ্রকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' (ডি. লিট) উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯২২)। শুধু দেশবাসীর কাছ থেকেই নয়—তদানীন্তন ইংরেজ সরকার গুণাবলীর জন্যে তাঁকে 'রায়সাহেব' খেতাব দান করেন। এছাড়া নবদ্বীপের 'বিদগ্ধ জননী' সভার মহামহোপাধ্যায়গণের কাছ থেকে তিনি 'কবিশেখর' এবং ভারতধর্ম মহামণ্ডল থেকে 'প্রত্নতত্ত্বভূষণ উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী' পদক প্রদান করে তাঁর গুণের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করেন।

ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তথাপি তাঁর সাহিত্য রচনায় ছেদ পড়েনি। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হচ্ছে বাংলার ইতিহাস আর 'বৃহৎ বঙ্গ' বাংলার সংস্কৃতি, ধর্ম ও লোকজীবনের ইতিহাস। এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা ব্যাপক—এটি দু'খণ্ডে সুবৃহৎ রচনা। এই গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্র, সমাজ,

CENTRAL LIBRARY

ধর্ম, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা আছে। এতে তিনি বাঙালীর জাতিত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মননশীলতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। এই কাজ এককভাবে করার পিছনে যে শ্রম ও নিষ্ঠা প্রেরণা জুগিয়েছে, তার স্বরূপ আজকের শ্রমকুণ্ঠ শিক্ষক ও লিখনব্রতীরা হয়ত ধারণাই করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর কর্মশক্তি এখানেই শেষ হয়নি। 'বৃহৎ বঙ্গ' রচনার পর 'শ্যামল ও কজ্জল' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'কিশোর গৌরাঙ্গ' (নাটক) ও 'পদাবলী মাধুর্য' প্রকাশিত হয়। এই সময় 'পুরাতনী' পুস্তিকাটিও রচিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দু'খানি পুস্তক লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, প্রথমটি পল্লী সাহিত্য সম্পর্কে। শেষ হলেও এটি মুদ্রিত হয়নি। দ্বিতীয় পুস্তকটির নাম 'বাংলার পুরনারী'। মৃত্যুর দু'মাস পরে এটি প্রকাশিত হয়। আর একটি গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', এতে তাঁর আত্মজীবনের বহু কথা লিখিত আছে। এছাড়া এর মধ্যে পারিপার্শ্বিক অনেক কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইংরেজী শিক্ষা ও মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচারের ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে গেল। ফলে এযুগের শিক্ষিত বাঙালীর মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম ছাড়া আর কারো সঙ্গেই পরিচয় রইল না। এই অপরিচয়ের হাত থেকে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার কারণে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে একটা দূরত্ব ছিল। দীনেশচন্দ্র এই ব্যবধান দূর করবার জন্যে দুয়ের মধ্যে নতুন করে যোগস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এ চিন্তা উনবিংশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা পূর্বেই করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও দীনেশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ ধরেই তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে'ও (১৩১১) এই দুইধারার মিলনের কথা বলেছেন। দীনেশচন্দ্র ব্যাপকভাবে বাংলাকাব্যের পুনরুদ্ধার করেন।

য়ুরোপে গ্রীক রোমীয় সাহিত্যের অনুশীলনের ভেতর দিয়ে যেমন আধুনিক জীবন ও সাহিত্য আলোচিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের দর্পণেই বাঙ্গালীর আসল স্বরূপ ধরা পড়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের লক্ষ্য ও আদর্শও ছিল তাই।

> 'প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়েছিলাম—তাহারও পূর্বে যেদিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমরুর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়াছিল সেইসকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনোই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি পাঠকালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের পথে কাণাকড়ি খুঁজিতে গিয়া যেন আমি স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার পাইয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় আমরা জানি না যে বঙ্গদেশের পল্লী-লক্ষ্মী এইরূপ শত শত রত্ন তাঁহার অঞ্চলে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্বলিত পালাগান এই দেশময় প্রচলিত ছিল।'

এর থেকেই বোঝা যায় আধুনিক সাহিত্য-রসিক হয়েও পল্লীগাথা বা পালাগানের প্রতি তাঁর অনুরাগ কত গভীর ছিল। এই অনুরাগের কারণেই তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

> 'আমি বুঝিয়াছিলাম, এই বাংলাভাষার চর্চাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার হাত রিক্ত হইবে, প্রাণ অবলম্বনশূন্য হইবে এবং যা একটু অবশিষ্ট আছে তা হারাইয়া হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে।'

য়ুরোপের অনেক মনীষী বা সাহিত্যিক এই সব অখ্যাত পালাগানের চিরন্তনতা স্বীকার করেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

দীনেশচন্দ্র পল্লীগাথাগুলিকেই বাংলার যথার্থ ইতিহাস মনে করেছিলেন। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নিছক ঐতিহাসিক তাগিদই তাঁর সাহিত্যসাধনার পেছনে ছিল না। তাই যদি হত তাহলে ঐতিহাসিকের সাথে তাঁর পার্থক্য থাকত না। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। তার কারণ তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক হয়েও একজন প্রকৃত সাহিত্যিক। তাঁর ছিল একটি কবি-মন। এই কবি-মন বা সাহিত্যিক-মনই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। তিনি প্রাচীন সাহিত্যকে তাই নিছক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেননি—করেছেন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে। এই বিচারের ভিতর তাঁর 'ভক্তিমিশ্রিত পূজা'র পরিচয় পাওয়া যায়। মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই বলেছেন—

> 'দীনেশচন্দ্র শুধু যে কীটদষ্ট পুঁথির একজন অক্লান্ত সংগ্রাহকই ছিলেন, তাহা নয়: তিনি কবিত্ববোধ-শক্তিসম্পন্ন রসবেত্তাও ছিলেন।'

আসলে সাহিত্য-সাধক বলতে যা বোঝা যায় দীনেশচন্দ্র ছিলেন তাই। সাহিত্য সাধনার দুটি পথ। একদিকে সৃষ্টি অন্যদিকে পুরাতন সৃষ্টির আবিষ্কার। দীনেশচন্দ্র একদিকে যেমন নিজে সৃষ্টি করেছেন অন্যদিকে তেমনি পুরাতন সৃষ্টিকে আবিষ্কার করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। 'একদিকে তিনি প্রাজ্ঞ গবেষক—অন্যদিকে তিনি রসিক সাহিত্যিক।'

দীনেশচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান গুণ আন্তরিকতা। এই কারণেই তাঁর রচনা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তাঁর আরো একটি গুণ গল্প বলার সরস ভঙ্গী। তিনি বাংলার ঐতিহ্য ও ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেশের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ—এই কারণেই তিনি প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, মৈমনসিংহগীতিকা, বৃহৎ বঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তারই নিদর্শন। প্রাচীন পৌরাণিক গাথা, মঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকা বা গীতিকার কাহিনীগুলি এইজন্যেই তিনি বাঙালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন।

ভাষার ব্যবহারেও দীনেশচন্দ্রের কবি-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস-রচনায় এমন সরস, সুষমাযুক্ত বর্ণাঢ্য ভাষার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে বা পরে—কেউ করেননি। তিনি ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি—তাতে কবিত্বরসধারা বর্ষণ করেছেন। ভাষাও যথোপযোগী হয়েছে। এটি তাঁর সৃজনী প্রতিভার গুণেই সম্ভব হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে বর্ণিত কয়েকটি সুপরিচিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করে, 'সতী', 'জড়ভরত', 'ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ', 'বেহুলা' ও 'ফুল্লরা' এই কটি পুস্তক রচনা করেন। পরে এই কাহিনীগুলি 'পৌরাণিকী' নামে মুদ্রিত হয়েছে। 'বেহুলা'র ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

> 'স্বদেশের পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিবেন কি ভরসায়?'

এই উক্তি স্বদেশপ্রেমিক ও শ্রদ্ধাবান দীনেশচন্দ্রের। এই পুস্তকগুলির ভাষা মনোমুগ্ধকর, সুললিতধ্বনিযুক্ত ও ঝঙ্কারময়। এই ভাষা কবি-প্রাণ দীনেশচন্দ্রের মত লেখকের উপযুক্ত ভাষা। ভূমিকাগুলিরও সেই একই বক্তব্য - স্বদেশের পুরাতন সম্পদের প্রতি আধুনিক শিক্ষিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁদের স্বস্থ হবার আহ্বান। 'সতী'র ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন, তা আজও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> 'আমাদের সর্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্তমানের উপযোগী সমাজগঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইব।...সেই শিল্প সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত।'

CENTRAL LIBRARY

পুরাতনীর ভূমিকায় বলেছেন—

'বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে সকল রত্নমাণিক্য লুক্কায়িত আছে……এই বঙ্গভূমির লুপ্তরত্নের খোঁজে আমার মন উতল হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইত।'

তার পথ অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যের অনেক লুপ্ত রতন উদ্ধার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে দীনেশচন্দ্র আশা করেছিলেন—

'আজ যাঁহারা বাংলায় এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছেন ও করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।'

উপরোক্ত গ্রন্থকয়েকটি ছাড়াও তিনি কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সব আখ্যায়িকা সে-সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত কৃষ্ণলীলার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। এই আকর্ষণের মূলে ছিল দীনেশচন্দ্রের গল্প বলার সরস ভঙ্গী। এই পুস্তকগুলির নাম হচ্ছে—'মুক্তাচুরি', শ্যামলী খোঁজা', 'কানুপরিবাদ', 'রাগরঙ্গ', 'রাখালের রাজগী' ও 'সুবলসখার কাণ্ড'। সুপণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখেছেন—

'এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি নব্যশিক্ষিত সমাজের সগৌরব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।'

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলাভাষায় কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করেছেন, 'দেশমঙ্গল', 'চাকুরীর বিড়ম্বনা' প্রভৃতি। উপন্যাসগুলি উদ্দেশ্যমূলক হলেও রসোত্তীর্ণ হয়নি। তাঁর আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' বইটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি অতিশয় সুখপাঠ্য। কিশোর সাহিত্যরচনায়ও দীনেশচন্দ্রের সবিশেষ কুশলতা ছিল। কৃশধ্বজ, সুবলসখার কাণ্ড ও বৈশাখী গল্পগুলির মধ্যে তাঁর এই কুশলতার পরিচয় নিহিত আছে।

সৃষ্টিশীল হিসাবে কোন বই না লিখে দীনেশচন্দ্র যদি একমাত্র 'রামায়ণী কথা' বইটি লিখে যেতেন তাহলেও তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকতো। দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা' শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, বহু সহৃদয় পাঠকেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রের আলোচনা করেছেন, করেছেন নিপুণ মনোবিশ্লেষণ। দীনেশবাবুর এই পুস্তকপাঠে জানা যায় তিনি একাধারে চিত্রকর ও শব্দের যাদুকর। রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করে ভূমিকায় লিখেছিলেন—

'কবি-কথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।'

দীনেশচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন হয় তিনি শ্রেষ্ঠ কবি হবেন নতুবা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। তাঁর এ স্বপ্ন সফল হয়েছিল। তিনি দেশের ও বিদেশের বহু মনীষীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করেছিলেন। সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্রের উপর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, তাই তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবাণীর আরাধনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্নেহ ও প্রীতি লাভেও ধন্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের মধ্যে যে একটা গভীর প্রীতির রাখীবন্ধন হয়েছিল তা এঁদের চিঠিপত্র থেকে স্পষ্টই জানা যায়।

মাটির পৃথিবীকে সোনার পৃথিবী করে গড়ে তোলার কাজে মানুষের উদ্যমের শেষ নেই। পৃথিবীর দুর্গমতম সর্বোচ্চ পর্বতশীর্ষ থেকে শুরু করে এই উদ্যম চলেছে অতলান্ত সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করবার জন্যে। আবার এই

CENTRAL LIBRARY

উদ্যম চলেছে সুদূর নীহারিকা ভেদ করে দূরদূরান্তরের গ্রহ উপগ্রহের সংবাদ জানতে। কিন্তু এই উদ্যম সকলের মধ্যে থাকে না। যাদের মধ্যে থাকে, প্রকৃতপক্ষে মন আছে তাদেরই এবং হয়তো অকৃত্রিম মানুষও তারাই। এই উদ্যম আর আরাধনার, নিষ্ঠার ও চেষ্টার উজ্জ্বল আলোকপাতে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সপ্তরঙের আলোকে সুধামণ্ডিত করে তোলাই তাই প্রকৃত মানুষের কাজ। যাঁরা এইভাবে নিজেদের জীবনকে এই ইন্দ্রধনুর ছটাদান করতে পারেন আমরা তাদেরই স্মরণ করি। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর জীবনকে ফুটে উঠেই ফেটে পড়তে দেননি। নানা সাহিত্যের আলোক আহরণ করে নিজের জীবনকে বর্ণচ্ছটায় আলোকিত করে তুলেছেন। এই জন্যে কেবল বাংলা বা ভারতের অধিবাসীই নয়, ভারতের সীমানার বাইরেও সুধীসমাজ তাঁর নাম স্মরণ করে।

'হিন্দুশাস্ত্রে আছে প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে মিশে যায়, দেহের আকাশ যখন অমৃতময় মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়, তখন ভস্মেই দেহের অন্ত হয়। সে অন্ত একেবারেই অন্ত। তখন যা স্মরণীয় থাকে তা হল সেই ব্যক্তির আচরিত কর্ম, সেই ব্যক্তি সারাজীবন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সেই যজ্ঞ।'

দুর্গম সংসারে সীমাহীন অন্ধকারে পথভ্রষ্ট জীবনকে আলোর দেওয়ালী দেখিয়ে পথনির্দেশ করা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনুপম দিক। দীনেশচন্দ্র আমাদের সম্মুখে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, লুপ্ত রত্ন উদ্ধারে আমাদের প্রেরণা দান করেছেন।

মানুষ হিসাবে দীনেশচন্দ্র অতুলনীয় ছিলেন। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালী। বাংলার সাহিত্য, বাঙালীর শিল্পরুচি, বঙ্গ-সংস্কৃতির নমনীয় সমন্বয়মুখিতা, সবকিছুর সমবায়ে গঠিত তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছোট-বড়ো সকলকেই সমানভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই বড়োদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, নিবেদিতা আর ছোটদের মধ্যে অগণ্য দেশবাসী সাধারণ মানুষ তাঁকে একই সঙ্গে বঙ্গভারতীর ভগীরথ-জ্ঞানে ভালোবেসেছিল। আশুতোষের কীর্তিরূপে আমরা বলি বিমাতার মন্দিরে তিনি মাতার আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই মাতৃ-প্রতিষ্ঠার ব্রতে প্রধান সহায় ও সেনাপতি ছিলেন দীনেশচন্দ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলা পড়ানো শুরু হলে তিনিই হন তার প্রধান অধ্যাপক ও সংগঠক, কেননা তিনিই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক যিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক বিলুপ্ত মহাদেশকে দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই অসামান্য সাহিত্যাচার্যের স্মৃতি ও কীর্তি আমাদের ইতিহাসে অক্ষয় হোক।

CENTRAL LIBRARY

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৮৮০-১৯৬১

সুধীর গুপ্ত

এক

আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে তাঁহার পরিণত জীবনে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার বহিরঙ্গগত সর্ব শুভ্রতাকে কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অঙ্গের কান্তি শালীনতা-সম্পন্ন বঙ্গ-সংস্কৃতিবাহী শুভ্র কার্পাস-বাসে সমধিক স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইত বলিয়াই, প্রথম দর্শনেই উহা দর্শকের চিত্তে সম্ভ্রম বিমিশ্রিত বিমুগ্ধ ভাবের উদ্রেক করিত। জীবনের পূর্ব-পর্বে দর্শন-শাস্ত্রের শৃঙ্খলা-সমন্বিত পরিশীলনের প্রভাবে তাঁহার অধীত বিদ্যা পরিমার্জিত হওয়ায় এবং জীবনের উত্তর-পর্বে উহাতে কীর্তন-সঙ্গীত-সাধনা-লব্ধ ভাগবতী ভক্তি-প্রীতি স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত হইতে থাকায়, তাঁহার অন্তরও কালের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে ক্রমেই শুচিতা-শুভ্রতা-বিমণ্ডিত হইয়া, তৎসান্নিধ্য-লব্ধ ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধা-বিনম্র ভাব উদ্রিক্ত করিয়া তুলিত। তাঁহার অন্তরস্থ রস-দ্যুতি বহিরঙ্গের কান্তিকে বিভিন্ন পরিবেশে বিবর্ধিতই করিত।

অবিভক্ত বাংলার যশোহর জিলার অন্তর্গত ধূলগ্রামের [বর্তমানে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রান্তর্ভুক্ত] সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে খগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺দীননাথ মিত্র মহাশয় গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। পিতার হিন্দু-ধর্মাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ ও সঙ্গীতানুরাগ এবং মাতা ৺রাজলক্ষ্মী দেবীর দেবে-দ্বিজে ভক্তি ভাব, শৃঙ্খলাবোধ ও জ্ঞান-স্পৃহা বাল্য হইতেই খগেন্দ্রনাথের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

জ্ঞানলাভেচ্ছু প্রতিভাবান ছাত্র হওয়ার জন্যই, পিতামাতার সদিচ্ছা-সমৃদ্ধ উচ্চ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, প্রথম হইতেই প্রতিটি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে করিতে, অবশেষে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে খগেন্দ্রনাথ সাম্মানিক ইংরেজী ও সাম্মানিক দর্শন-শাস্ত্রে যুগপৎ সমধিক যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে দর্শন-শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্দিষ্ট স্বর্ণ-পদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া ধূলগ্রামকে ধন্য করেন।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দেই তিনি রাজসাহী কলেজে অস্থায়ীভাবে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯ ২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে উক্ত দর্শন-শাস্ত্রে অধ্যাপকের কার্য যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করিয়া, খগেন্দ্রনাথ ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যথাক্রমে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্ম-সম্পাদনান্তে সরকারী কার্য হইতে সসম্মানে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার কর্ম-নিষ্ঠার, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও বিশেষ পারদর্শিতার স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন ভারত সরকার তাঁহাকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের' মনোনীত সদস্য পদে এবং ১৯২৪

CENTRAL LIBRARY

ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় রাজ্য সভা'র মনোনীত সদস্য-পদে বৃত করেন। ইহার পরে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক সম্মান-সূচক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

বেসরকারী দিক হইতে সুযোগ্যতার স্বীকৃতি হিসাবে তালিকাভুক্ত স্নাতকবৃন্দের ভোটে নির্বাচিত হইয়া ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। এককালে তিনি 'Calcutta University Institute'-এর কর্ম-সচিব এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সহকারী কর্ম-সচিব ছিলেন। আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকার এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার কোন কোন সময়ে তিনি সম্পাদকও ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' রাধানগরস্থ অধিবেশনে তিনি দর্শন-শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁহার ভাব-সমৃদ্ধ অভিভাষণে চিন্তাবিদ্‌বৃন্দ চমৎকৃত হন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে থাকিবার সময়ে অধ্যাপনার খ্যাতি বিস্তারের জন্য ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ হইতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের সাময়িক অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে রায়সাহেব আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রায়বাহাদুর আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের' প্রধান অধ্যাপকের [প্রথম 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপকের] কার্যভার গ্রহণ করেন; এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরের মত সময় উক্ত পদে অবস্থিতির দ্বারা এই বিভাগটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি তৎপর থাকেন। তাঁহার অধ্যাপনার, কর্ম-পরিচালনার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হিসাবে ব্যবস্থাপনার সুযোগ্যতার স্বীকৃতি-স্বরূপ অবসর গ্রহণের দিন হইতে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের তেসরা অক্টোবর তারিখ অর্থাৎ মৃত্যু-দিন পর্যন্ত অতি দুর্লভ প্রতিষ্ঠা-সংবাহক 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্যের সম্মানিত অধ্যাপক পদ (Emeritus Professor of Bengali) তিনি অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া কেম্‌ব্রিজে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের অধিবেশনে' এবং নরওয়েতে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ভাষাতাত্ত্বিক মহাসভায়' যোগদান করিয়া যথাযোগ্য ভাষণের দ্বারা ভারতের বর্তমান যুগের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির পরিধি বিস্তৃত করিতে সহায়তা করেন।

সর্বদিক হইতেই বঙ্গদেশের শিক্ষাধারার সমুন্নতি-সাধনে তৎপর ছিলেন বলিয়াই, তিনি কলিকাতা রাণী-ভবানী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিষ্ঠাতাও হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কর্ম-সচিবরূপে এবং পরে বিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক সভার সভাপতিরূপে অবস্থিত থাকিয়া তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা 'মুরলীধর গার্লস কলেজ'-এর কার্য-পরিচালক সমিতিরও তিনি সভাপতি ছিলেন। নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকার জন্য এ দেশের শিক্ষার বিবিধ সমস্যার মর্মমূলে তিনি প্রবেশ করিতে অনেকাংশেই সক্ষম হইতেন এবং সমাধান সূত্রও খুঁজিয়া বাহির করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। ইহাতেও তাঁহার এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগই ব্যক্ত হয়।

দুই

গান গাহিবার শক্তি ও সাহিত্য-সৃজন ক্ষমতা খগেন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর হইয়া তিনি গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। এইভাবেই 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'প্রদীপ' ও 'আর্যাবর্ত' পত্রিকানিচয়ে প্রকাশিত 'নীলাম্বরী',

CENTRAL LIBRARY

'হতভাগা', 'প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া', 'আশার সমাধি', ঘুমের পাহাড়,' 'প্রত্যাবর্তন' ও 'বাঁশীচোর' এই আটটি গল্প লইয়া তাঁহার 'নীলাম্বরী' নামক প্রথম গল্প-গ্রন্থ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক জলধর সেন ও সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যথাক্রমে 'আর্যাবর্ত', 'মানসী' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় উক্ত গল্প-গ্রন্থের প্রশংসাজ্ঞাপক সমালোচনা করিয়া লেখকের উৎসাহ বর্ধন করেন।

আবার ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় গল্প-পুস্তক 'কানের দুল' প্রকাশিত হইলে, উহা গল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাব-সমর্থন লাভ করে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পের সংখ্যা সাতটি'— 'কানের দুল', 'প্রতিদান', 'কোডর সাহেব', 'কল্যাণী', 'যমুনা', 'পরিচয়' ও 'বিদেশী'; এই গল্পনিচয় 'মানসী', 'ভারতবর্ষ' এবং 'আগমনী' মাসিক-পত্রে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'মুদ্রাদোষ' গ্রন্থ-নাম লইয়া প্রকাশিত হয় তাঁহার ব্যঙ্গ-রস-প্রধান দশটি রচনার সমষ্টি। 'মুদ্রা-দোষ', 'প্রশংসা-প্রসঙ্গ', 'ফলিত জ্যোতিষ', 'যন্ত্র ও জীবন', 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'স্বর্ণ-মধ্যম', 'তালকেরতা', 'আত্ম-পরিচয়', 'আমার সেতার শিক্ষা' এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত নাটিকা 'পূজার ছুটি' উক্ত 'মুদ্রাদোষ'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনানিচয়।

ইহার পরে বিভিন্ন মাসিক-পত্রে প্রকাশিত 'বিবি বউ', 'কলঙ্কিনী', 'ঝি', 'শুকতারা', 'মন্দের ভালো', 'নন-কো-অপারেটার', 'পথি নারী বিবর্জিতা' ও 'ভক্তের ভগবান'—এই আটটি গল্প লইয়া তাঁহার তৃতীয় গল্প-গ্রন্থ 'বিবিবউ' প্রকাশিত হইলে, গল্প-লেখক হিসাবে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সুপরিচিতি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শেষ গল্প 'ভক্তের ভগবান' লেখকেরই কন্যা শ্রীমতী রেণুকার লেখা; তবে লেখক কর্তৃক স্নেহাধিক্যে পরিমার্জিত হইয়াই উহা গ্রন্থভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ইহার কয়েক বৎসর পরে খগেন্দ্রনাথের পরবর্তী-কালে বিরচিত ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত গল্পনিচয়ের কয়েকটিকে সংকলিত করিয়া 'সারি'-নামক গল্প-পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

গল্প-লেখক হিসাবে তৎকালে খগেন্দ্রনাথের খ্যাতির কারণ অবধারণ করিতে হইলে, সেই পরাধীন যুগের মধ্যবিত্ত সমাজের সাধারণ মানের চাহিদার কথাটি মনে রাখিতে হইবে। সমস্যা-কণ্টকিত, প্রগাঢ় ভাব-ব্যঞ্জক, গুরু-গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা না করিয়া, বঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজের সহজ সুখ-দুঃখকেই সুরুচিসম্মত-ভাবে চরিত্র-সৃজনের ও তদনুযায়ী স্বাভাবিক পরিবেশ এবং কাহিনী-রচনার দ্বারা লেখক পরিবেশন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়াই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পনিচয় নর-নারীর সহজাত ও সমাজানুসারী প্রেম-বিষয়ক হওয়ায়, সাধারণ পাঠকের মন উহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইত। অধিকাংশ গল্পই উপাখ্যান-প্রাধান্যে উজ্জীবিত। এই বিষয়ে তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পাদর্শকেই বিশেষ-ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। গল্প-রচনার ভাষা অতি সহজ, সাবলীল ও কৃত্রিমতা-বিবর্জিত; অপ্রাসঙ্গিক প্রাকৃতিক বর্ণনার দ্বারা গল্পগুলির গল্পত্ব বিখণ্ডিত হয় নাই; কদাচিৎ যে প্রাকৃতিক বর্ণনাদি পরিদৃষ্ট হয়, উক্ত বর্ণনাদির ভাষাও সরল ও প্রাঞ্জল।

এই বক্তব্যের পরিস্ফুটনের জন্য 'নীলাম্বরী' গল্প-গ্রন্থে বিধৃত 'ঘুমের পাহাড়' গল্প হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি উপস্থাপিত হইল—

> 'শরতের অপরাহ্ণ; হিমালয়ের তুষারস্নিগ্ধ রৌদ্রে সোনালী আভায় সে উপত্যকাটিকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষণলঘু মেঘের পুঞ্জ বাতাসের আন্দোলনে মৃদু বিতাড়িত হইয়া পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় মাগিতেছিল। এই রূপ মেঘখণ্ডসকল নিম্নে ও ঊর্ধ্বে পর্বতের বিভিন্ন স্তরে সংলগ্ন হইয়া শ্যাম শষ্প-লতামণ্ডিত পর্বত-গাত্রে যুথিকাস্তবকের শোভা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিল।'

CENTRAL LIBRARY

রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক গল্পের আদলে রচিত রম্য-রচনাদির লেখন-শৈলী লঘু-চপল ও প্রায়শঃই প্রসঙ্গের অনুকূল। উদ্ধৃতি-প্রয়োগেই বক্তব্য সমর্থিত হইবে ভাবিয়া খগেন্দ্রনাথের 'মুদ্রাদোষ'-গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ'-রচনা হইতে কয়েকটি পংক্তি তুলিয়া দেওয়া হইল।

'ভবের বাজারে জিনিস চিনিবার উপায় নাই; তাই একটু আধটু জ্যোতিষ চাই বই কি! এ বাজারে তো জিনিসের কেনা বেচা হয় না, কেনা বেচা হয় বিজ্ঞাপনের। মাসিকে, সাপ্তাহিকে, পঞ্জিকায়, প্রাচীরে, পুস্তকে, প্লাকার্ডে, ট্রামে, বায়স্কোপে—কেবল বিজ্ঞাপন। এই কৃষি-প্রধান দেশে ধানের চাষ, পাটের চাষে, যাহা না ফলে, তাহা বিজ্ঞাপনের চাষে ফলে। কিন্তু মজা এই, সকলেই বলে—বিজ্ঞাপনে ভুলিবেন না। সকলেই বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরকে ঘৃণা করেন; তবুও কিন্তু বিজ্ঞাপন কমে না, বিজ্ঞাপনের হার কমে না। বিজ্ঞাপনের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। বিজ্ঞাপনের খাতিরে কত মাটি সোনার দরে বিকাইয়া যায়।'

সুপুরুষ, মিষ্টভাষী অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথের পত্রিকা-সম্পাদক-মহলে গল্প-প্রবন্ধাদির সমাদরের ও তাঁহার লেখার লোকপ্রিয়তার কথা ভাবিয়া সমালোচক-মন স্বভাবতঃই স্বীকার করিতে বাধ্য হয়—'বিজ্ঞাপনের খাতিরে কত মাটি সোনার দরে বিকাইয়া যায়'। তবে মহাকাল কোন সৃষ্টিকেই অযথা খাতির করে না;—যাহা অকিঞ্চিৎকর, সাময়িক, অবিদগ্ধ জন-মণ্ডলেরই মাত্র মনোরঞ্জক, তাহা অজস্রভাবেই বিকশিত হইয়া, সুবাস বিলাইয়া মিলাইয়া যায়। ছাপার অক্ষরে বিন্যস্ত থাকিলে কোন কোন সময়ে গবেষক হয়তো বা এই বিবর্ণ বিশুষ্ক দলগুলি সংগ্রহ করিয়া ও পুরাতনকে নবীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া কৌতুককর কৌতূহল চরিতার্থ করেন। আবার উহারা সাময়িক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে দিয়া মহাকালের অনাদি পাণ্ডুলিপির মলাটের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া চিরতরে হারাইয়া, ফুরাইয়া যাইবার জন্যই বোধহয় আত্মগোপন করে।

তিন

খগেন্দ্রনাথ কিশোর-পাঠ্যগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। একসময়ে তাঁহার রচিত 'প্রথমশিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস' বিদ্যালয়ের ইতিহাস-গ্রন্থের চাহিদা মিটাইয়া লেখককে অপ্রত্যাশিত অর্থ উপহার দিয়াছিল। বস্তুতঃ অনেক গ্রন্থের রচয়িতা হইলেও, তাঁহার রচিত অন্য কোন গ্রন্থই লেখকের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে নাই। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যথার্থই নির্ণয় করিয়াছেন যে, এদেশে স্কুল-কলেজ পাঠ্য আবশ্যিক গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন সংগ্রন্থ কাটে না, তবে পোকায় কাটে।

খগেন্দ্রনাথের চিন্তা-গর্ভ প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সুখদুঃখ', 'কীর্তন', ও 'বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-ধারা' গ্রন্থত্রয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের, বচন-পারিপাট্যের ও রস-দৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয়ই বিদ্যমান। গল্প-লেখক হিসাবে লেখন-শৈলীর যে অনায়াস সাবলীলতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, উহা ব্যর্থ না হইয়া এক্ষেত্রে সার্থকই হইয়াছে;—দুরূহ বিষয়-বস্তুও রচনা-শৈলীর প্রসাদ-গুণে চিত্ত-রঞ্জক হইতে পারিয়াছে।

'ব্রহ্মবিদ্যা', 'আর্যাবর্ত', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী', 'বসুমতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' ও 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধনিচয়—'সুখ', 'দুঃখ', 'রস-তত্ত্ব', 'চিৎশক্তি ও রসানুভূতি', 'অজানার রূপ', 'বিশ্বের জাগরণ,' 'অভিব্যক্তির ধারা,' 'আত্মদর্শন', 'ভারতীয় ভাবধারা ও স্বাধীন চিন্তা', 'বিরোধ ও সামঞ্জস্য,' 'বঙ্গসাহিত্যের ভাব-ধারা' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী'—গ্রন্থভুক্ত হইয়া 'সুখদুঃখ' শিরোনাম গ্রহণ করিয়া ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে 'ভারতীয় ভাবধারা ও স্বাধীন চিন্তা' রচনাটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে দর্শন-শাখার সভাপতি-রূপে লেখকের প্রদত্ত অভিভাষণেরই সার-সংক্ষেপ।

CENTRAL LIBRARY

কঠিন বিষয়কেও কত সহজ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, উপর্যুক্ত প্রবন্ধাবলীতে তাহার বহু দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইবে। নিম্নে 'অভিব্যক্তির ধারা'-রচনার যৎ-সামান্য অংশ আমার বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত হইল—

'জড়ে যে শক্তি, যে উপাদানপুঞ্জ বর্তমান রহিয়াছে, তাহাই জীব-জগতের ধারক এবং পরিপোষক। যে আলোক গ্রহনক্ষত্রে দীপ্ত হয়, তাহাই হীরক মরকত স্বর্ণে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাই পত্রপুষ্পের অফুরন্ত শোভায় বিকশিত হইয়াছে। যে রস মেঘের বাষ্পকণায় পুঞ্জীভূত হইয়া রহে, তাহাই সরিৎ-সরোবরে বাহিত হইয়া বনৌষধির প্রাণে সঞ্চারিত হয়। আবার তাহাই জীব-দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। এই ক্রমবিকাশের ধারা স্বীকার করিলে জড়বাদী হইতে হয়, ইহা আমি স্বীকার করি না। কারণ, এই যে উন্নতির স্তর-লীলায়িত পন্থা, ইহা দৈবের দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে পারে না।'

১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লেখকের ক্ষুদ্র 'কীর্তন'-গ্রন্থখানি বিষয়-গৌরবে ও আলোচনা-মাধুর্যে বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। কীর্তনের তাৎপর্য, নাম-সংকীর্তন, লীলা-কীর্তন, কীর্তন ও পদাবলীর পরস্পর সম্পর্ক, কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা, কীর্তনের ইতিহাস, 'খেতরীর মহোৎসবে কীর্তনের প্রসার, 'কীর্তনের শ্রেণীবিভাগ', 'কীর্তনের অবনতির কারণ', 'বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের পারস্পরিক সম্বন্ধ,' 'কীর্তনের রাগরাগিণী', 'কীর্তন ও ভাব', 'কীর্তন ও রস', 'কীর্তনের তাল' প্রভৃতি বিষয়ের উপরে অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও রস-জ্ঞান-লব্ধ আলোচনাই গ্রন্থখানির মূল্য বিবর্ধিত করিয়াছে।

'ভগবদ্‌ভক্তির জন্য যে গুণকথন, লীলাবর্ণন প্রভৃতির প্রয়োজন, তাহা হইতেই সংগীতের নাম হইয়াছে কীর্তন। সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ক সংগীত ব্যতীত অন্য সংগীতকে কীর্তন নামে অভিহিত করা যায় না,' 'নবধা ভক্তির প্রধান সাধন কীর্তন', 'পদাবলীর জন্যই কীর্তন এবং কীর্তনের জন্যই পদাবলী', 'গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগিতা না থাকিলে গান সফল হয় না,' কীর্তন সুর, কাব্য ও ধর্মের ত্রিবেণী', কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, গায়ক এবং শ্রোতা উভয়কেই রসজ্ঞ হইতে হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল সূত্রের সহিত সুপরিচিত থাকা আবশ্যক' প্রভৃতি কীর্তন-বিষয়ক গভীর উপলব্ধি-সঞ্জাত ভাবদ্যোতক-বক্তব্য পাঠক-চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলে এবং উহাতে কীর্তনের গভীরে প্রবেশ করিতে স্বচ্ছন্দেই পাঠক সক্ষম হন।

চার

খগেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই বিরাট গ্রন্থের গবেষণা-মূলক সুদীর্ঘ ভূমিকায় সম্পাদকের সহিষ্ণুতার, অধ্যবসায়ের, মনীষার ও বৈষ্ণবতার সার্থক পরিচিতি অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন—

'শ্রীমদ্ভাগবতের পটভূমিতে মালাধর যে কাব্য লিখিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রচারই মূল বিষয়।.....শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, ইহা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাগবতে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত হইলেও, বৈষ্ণব-ধর্মে তাঁহাকে পরতত্ত্ব-রূপে প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু মালাধরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—'বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। এই উক্তির প্রশংসা করিয়া যখন শ্রীচৈতন্য কুলীন গ্রামবাসীদিগকে অভিনন্দন করিলেন, তখনই আমরা ইহার গুরুত্ব এবং প্রভাব বুঝিতে পারি।

তিনি আবার প্রত্যয়-পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছেন,—'মালাধর বসু কৃষ্ণলীলাকে বাঙালীর ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন'—এই মধুর মন্তব্যটিও গবেষণা-মূলক আলোচনা-সঞ্জাত যথার্থ উক্তি, সন্দেহ নাই।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র ও খগেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'-পুস্তকের ভূমিকাটি মূল্যবান মন্তব্যে সুসমৃদ্ধ এবং উহাতে চয়িত বৈষ্ণব পদনিচয় সুদুর্লভ মণিনিচয়ের মতই মূল্যবান,—সম্পাদকেরা যে বৈষ্ণব-পদরত্নাবলী নির্বাচনে প্রকৃত জহুরীর দক্ষতাই দেখাইয়াছেন, উহা রসিক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

পাঠ্য-তালিকাভুক্ত সংকলন-গ্রন্থ একদিক হইতে নীরবে একটি মূল্যবান কৃত্য সম্পাদন করিতে বিশেষ সহায়তা করে। অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ও উহার সম্বন্ধ রক্ষা করিবার অন্যতম সহায়ক এই সংকলন-গ্রন্থাদি।

'রুইদাস', 'প্রেমের ঠাকুর', 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রভৃতি লেখা বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে পাঠ্য-গ্রন্থ-ভুক্ত হইয়া অনেকেরই গোচরে আসিয়াছে, নতুবা শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও অনেকেই বোধ হয় খগেন্দ্রনাথের ছোট-গল্প, রম্য-রচনা ও সাধারণ প্রবন্ধরচনার কথা এতদিনে সম্পূর্ণ বিস্মৃতই হইতেন।

পাঁচ

খগেন্দ্রনাথের এবং তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষাগুরু ব্রজধাম-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া কৃষ্ণদাস ব্রজবাসীর সুযোগ্য সন্তান স্বনামখ্যাত কীর্তনগায়ক ও পাখোয়াজ-বাদক নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর মিলিত প্রচেষ্টায় যে বিপুল-কলেবর বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ 'শ্রীপদামৃত মাধুরী'-নামাঙ্কিত হইয়া বৃহৎ চারিখণ্ডে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়, উহা অধ্যাপক-প্রধানের পাণ্ডিত্যের ও সূক্ষ্ম রস-দৃষ্টির প্রকৃষ্টতম পরিচয় বহন করিয়া গৌড়জন তথা গৌরজনবৃন্দকে যুগপৎ পুলকিত ও বিস্ময়াবিষ্ট করে।

'শ্রীপদামৃত মাধুরী'র ভূমিকা ভাগে যথার্থ বৈষ্ণব-বিনয়ের অবতারণা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই এই বৈষ্ণব কবিতা আমাকে মুগ্ধ-প্রলুব্ধ করিয়াছিল। যাহা বুঝিতাম না তাহাও মনের স্নেহ-বেদনা অনুরাগে অভিষিক্ত করিয়া কমনীয় করিয়া তুলিতাম। একদিন এক শুভ মুহূর্তে সুযোগ ঘটিল। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় বৃন্দাবনধাম হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। ইনি একাধারে বিখ্যাত বাদক এবং সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ গায়ক। এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমি জানিতাম ব্রজবাসী মহাশয়ের পিতা ৺কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার নিকটে ও সম্প্রতি স্বধামগত পূজ্যপাদ অদ্বিতীয় কীর্তন-গায়ক পণ্ডিত অদ্বৈতদাস বাবাজীর নিকটে বহুদিন ধরিয়া ইনি গান শিক্ষা করেন। এই উভয়ের নিকট হইতে ইনি বহু হস্তলিখিত পুঁথিও প্রাপ্ত হয়েন।.....পদগুলির টীকা-টিপ্পনী ও আস্বাদন নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে সংযোজিত করিয়াছি। তাহাই 'পদামৃত মাধুরী'। 'মাধুরী-নাম্নী সরল ব্যাখ্যা-সংবলিত মহাজনপদাবলী'—'শ্রীপদামৃত মাধুরী' বিনয়নম্রতা সহযোগে আস্বাদনের দ্বারা খগেন্দ্রনাথের সংবেদনশীল রসিক-চিত্তের পরম পরিচয়টিই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দর্শন-শাস্ত্র তাঁহাকে দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার বিদ্যার প্রকৃত ভার-মুক্তি ঘটিল বৈষ্ণব সাহিত্যের পঠনে, পাঠনে ও আলোচনায়।

পরিশেষে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ হইতেই নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর সান্নিধ্যলাভের জন্য কীর্তন-সঙ্গীতে পারদর্শিতা প্রাপ্তিতে তাঁহার অন্তর ভক্তি-ভাবে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ছয়

১৯৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে খগেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Stephanos Nirmalendu Ghosh'—বক্তৃতামালা

CENTRAL LIBRARY

প্রদান করেন। বক্তৃতায় বিন্যস্ত এই প্রবন্ধমালাই ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে *The Dynamics of Faith* নামে গ্রন্থরূপ লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থই খগেন্দ্রনাথের একমাত্র ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ। **Zoroastrianism, Buddhism, Judaism, Christianity, Islam, Sufism** ও **Hinduism**—সভ্য মনুষ্য সমাজে প্রচলিত উক্ত প্রধান সাতটি ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনারই অবতারণা করিয়াছেন এই গ্রন্থে দর্শনশাস্ত্রবিদ প্রবীণ আচার্য।

গ্রন্থখানির ভূমিকা ভাগে প্রথমেই তিনি জ্ঞাপন করিয়াছেন,—**'In the following lectures, I have tried to show that the essence of every religion tends to lead its followers towards the goal of love and sacrifice.'**—অর্থাৎ 'এই বক্তৃতামালায় আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, প্রত্যেক ধর্মেরই সার-ভাগ উক্ত ধর্মাবলম্বীদিগকে প্রেম ও ত্যাগের লক্ষ্য-লাভের দিকে পরিচালিত করে।' আবার গ্রন্থের উপসংহার ভাগেও স্বচ্ছ ও পাণ্ডিত্য-মণ্ডিত আলোচনার অবসানে তিনি যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—

'No religion ever taught discord and hate, greed and lust. These natural propensities were kept down, subdued and often eradicated by religion'—অর্থাৎ 'কোন ধর্মই কখনও বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা, লোভ এবং কাম শিক্ষা দেয় নাই। এই স্বাভাবিক প্রবণতা সমূহকে ধর্মের দ্বারা বশীভূত, অবদমিত এবং প্রায়শঃই উৎপাটিত করা হইয়া থাকে।' লেখকের বক্তব্য যেমন ভাব-গর্ভ, সমন্বয়মূলক ও ধর্মের আধ্যাত্মিক মূলান্বেষী, তেমনই তাঁহার ইংরেজী রচনা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য।

সাত

গান গাহিবার স্বভাব-দত্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন খগেন্দ্রনাথ। ছাত্রজীবনে বিবিধ পরীক্ষায় সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জনের স্পৃহা এবং একুশ বৎসর বয়স হইতেই অধ্যাপক জীবনের অভিভাবকত্বে ভারাতুর হইবার জন্য বহিঃস্থ চাপ, তাঁহার গীতি-প্রবণতাকে অনেক পরিমাণে অপ্রকাশই রাখিয়াছিল। সম্ভবতঃ এইজন্যই সঙ্গীত-রস-সৃজন-শক্তি সাহিত্য সাধনায় ও গল্প রচনায় আংশিক চরিতার্থতা লাভ করিত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে দর্শনশাস্ত্র চর্চার ফাঁকে ফাঁকে এই প্রকার সাহিত্য সাধনার দ্বারাও উহার সম্যক বিকাশ সংসাধিত হইত না।

মধ্য জীবনে ভাগবতী করুণায় সঙ্গীত-বিশারদ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর সঙ্গলাভে ও সঙ্গীত শিক্ষালাভে পুঁথিগত অর্জিত বিদ্যার বালুকার আচ্ছাদন উদ্ভিন্ন করিয়া অন্তরালবর্তী এই সঙ্গীত-ফল্গুধারা কীর্তনের কলোচ্ছ্বাসে ভাবুক, সাধক, সহকর্মী, ছাত্র সকলকেই সুরগ্রামে চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। বিদ্যার বিশুষ্ক ভার সঙ্গীত-রস-পরিসিক্ত হইয়া, জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং এই জন্যই তাঁহার পরিণত জীবনের নিবন্ধ-পুস্তক রস-গাঢ় হইতে পারিয়াছে। তাঁহার বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা ও বাংলার বিশিষ্ট কীর্তন-সঙ্গীতের পর্যালোচনা এতই জ্ঞান-গভীরতা-প্রকাশক ও সাফল্যসূচক হইয়াছে যে, উক্ত রচনা পরিমাণে অল্প হইলেও, উহা বাংলা-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদরূপে সর্ব-প্রযত্নে রক্ষিত হইবার মতই বস্তু।

আট

কবি-প্রাণ প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও গবেষক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অবসর গ্রহণের পরেই আচার্য খগেন্দ্রনাথ যখন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'-রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে চাপা ও সরব প্রতিবাদমূলক সমালোচনা যে উচ্চারিত না হইয়াছিল তাহা নহে; এবং উহার তিন বৎসর পরে, ১৯৩৫-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এই বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করিতে আসিয়া, আমরা পর্যন্ত

CENTRAL LIBRARY

এই অসহিষ্ণু দৃষ্টিবিভ্রমে পড়িয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মত এই অধ্যাপক-প্রধানের মৌলিকতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে যথোপযুক্তভাবে অবহিত হইতে পারি নাই। অদ্যাপি তাঁহার অধিকাংশ কৃতবিদ্য ছাত্র-ছাত্রী পর্যন্ত তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতার ও বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতম স্তরে অনুপ্রবেশের সংবাদ তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে তৎপর নহেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি-প্রাপ্ত হইবেন, এই সুপ্রথাটি ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে প্রচলিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী তিনজন স্বনামধন্য আচার্যের ক্ষেত্রে এই ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ কবি-ধর্মের, খগেন্দ্রনাথ গায়ক-ধর্মের এবং শ্রীকুমার সমালোচক-ধর্মের অধিকারী; এই জন্যই এই তিন আচার্যের পরম্পরাগত পরিচালনা লাভের দৈব-নির্দিষ্ট প্রয়োজন বাংলা বিভাগের ক্রমোন্নতির পক্ষে একান্তভাবে কাম্য ছিল।

মহানুভব স্যার আশুতোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া স্যার আশুতোষেরই আহ্বানে কর্মে যোগদান করিয়া এই স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগটিকে যিনি অক্লান্ত কর্মের, মনীষার, অধ্যবসায়ের, ছাত্র-বৎসলতার, এবং উপযুক্ত সাহিত্য ও গবেষণা-গ্রন্থ-রচনার দ্বারা সর্বপ্রথমে শ্রীবৃদ্ধি-মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন, সেই কবি-প্রাণ দীনেশচন্দ্র একাই বোধ করি একশত পারদর্শী লোকের সাহিত্য সৃজন-লেখন-কার্যাদি সুচারু-রূপে সম্পাদন করিয়া, জন্মভূমির সুযোগ্য সন্তানের কীর্তি লাভে ধন্য ও বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন।

নয়

বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বাংলা-বিভাগের ভিত্তি-ভূমি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সঙ্গীতজ্ঞ, কীর্তন-বিশারদ, দর্শন-শাস্ত্রাভিজ্ঞ খগেন্দ্রনাথের পরিচালনার প্রয়োজন বোধ করি আবশ্যকই ছিল; কারণ উহাতে কীর্তন-সঙ্গীতে পরিপ্লুত বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম সংস্কৃতি-গত সাধনাটি অলক্ষিত-ভাবে এই বঙ্গ-সাহিত্য-বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সাধনাভূমির প্রসার সম্ভাবিত করিয়া তুলিল। বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তরে বাহিরে সঙ্গীতের উৎসার। দর্শনে এবং সঙ্গীতে যাঁহার সহজ প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, তাঁহার পাঠন-প্রণালীতে যে সূক্ষ্মতার সমাবেশ ঘটে, উহা মর্মানুসন্ধানীকে সঙ্গীতভাবগাহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সুগভীর তাৎপর্য অনুধাবন করিতে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে। এই জন্যই স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক-প্রধান যতই কৃতবিদ্য হইবেন, ততই অন্য অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে তাঁহার বিদ্যার বিচ্ছুরিত দীপ্তি বিলসিত হইয়া সমগ্র বিভাগটিকেই উজ্জ্বলতার স্তরে সমুন্নীত করার সহায়তা প্রদান করিতে থাকিবে; শিক্ষার্থিগণও এইরূপ অধ্যাপক-প্রধানের এবং তৎসঙ্গে অন্য কৃতবিদ্য অধ্যাপকবৃন্দের পাঠন সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, সাহিত্য-জ্ঞানের স্তর-পরম্পরা পরিক্রমণের সুযোগ লাভ করিবে। খগেন্দ্রনাথের বলপ্রদ পরিচালনায় বঙ্গ-সাহিত্যবিভাগের যে সমৃদ্ধি ঘটিল, উহা হয়তো তখন অন্য কাহারও দ্বারা ঘটান সম্ভব ছিল না। এমন করিয়া কোন সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিত-প্রধানকে বিভাগীয় প্রধান-রূপে পাইবার সৌভাগ্য সহজ-ভাবে সম্ভব নহে।

বঙ্গ-সমাজের উচ্চ স্তরে উচ্চাঙ্গ কীর্তন-সঙ্গীতের প্রসার সাধনে অকুণ্ঠিত গায়ক খগেন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, তাহা ভুলিবার নহে। নাম-সংকীর্তনে ও লীলা-কীর্তনে পারঙ্গম এবং আখর-যোজনায় পরম পারদর্শী খগেন্দ্রনাথের কীর্তন যাঁহারাই শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিমুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই।

কীর্তনের আবেদন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন,—'গানের অর্থ বিশদ করিবার জন্য, অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, রচয়িতার গূঢ় মনোভাবকে সুরের বেদনায় প্রকাশ করিবার জন্য আখর দেওয়া হয়। গায়ক নিজে যাহা যোজনা করেন তাহাই আখর। গায়কের কবিত্বশক্তি ও সুরতালের নৈপুণ্য থাকিলে

CENTRAL LIBRARY

এই সকল আখর অনেক সময়ে তত্ত্ব পদাবলী অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর হয়। অনেক অল্পশক্তি-সম্পন্ন লোক আখর-যোজনার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া এমন কথা হয়তো বলিয়া ফেলেন যাহা রস পরিপোষক তো নয়ই বরং তাহার বিপরীত। সে সকল স্থানে রসিক সমাজ অত্যন্ত মর্মাহত হন।' সত্যই আখরের অভিনবত্বে, ব্যাখ্যানের পরিমিতিতে, সুললিত কণ্ঠস্বরে, এবং মাধুর্যমণ্ডিত দেহদ্যুতিতে কীর্তন গায়ক খগেন্দ্রনাথ শ্রোতার চিত্ত ভাগবতী ভাবাত্মিকতায় ও ভক্তিতে ভরিয়া দিতে পারিতেন।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের এক স্বর্ণ-স্নাত শারদ প্রভাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, সেই শুচি-শুভ্র প্রবীণ অধ্যাপকবরের মুখে তাঁহারই বসিবার ঘরে বসিয়া, নিরালায় একলা আমি যে অপূর্ব কীর্তন এবং উহার আখর যোজনা শ্রবণ করিয়া পরিপ্লুত-প্রাণ হইয়াছিলাম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয় কবি বিদ্যাপতি বিরচিত 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর।'—এই অভিনব পদের গভীরতম দ্যোতনায় ও সুর ধ্বনি রসব্যঞ্জনায় স্মৃতি দুষ্ট হইয়াছিলাম, উহা প্রার্থনাবিহীন ছাত্রের দৈব লব্ধ সুযোগ সৌভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে!

শিক্ষক-সম্পর্কিত সুচয়িত সুখ-স্মৃতি সত্তার সর্বদাই মধুপ্রদ; প্রৌঢ় প্রাণকে পর্যন্ত মধু-নিষেকে রসান্বিত, স্নেহায়িত ও ছাত্রায়িত করে। আমার রচিত 'আলেয়ার আলো' (প্রকাশকাল—১৯৩৫) ও 'মাধুকরী' (প্রকাশ-কাল—১৯৪৯) কাব্যগ্রন্থ যে তাঁহার অযাচিত, অপক্ষপাত প্রশংসানুকূল্য লাভ করিয়াছে, এবং 'মাধুকরী'র অন্তর্ভুক্ত 'তারা ও প্রদীপ' কবিতাটি যে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় অতিরিক্ত বাংলার প্রশ্ন-পত্রভুক্ত হইতে পারিয়াছে, উহাতেও কি তাঁহার সংগুপ্ত স্নেহ অভিব্যক্ত নহে? ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে মন্থর হেমন্ত-মধ্যাহ্নে তাঁহার মধুপুরের 'অপরাজিতা' নামক নিবাসে যে স্নেহ-স্নাত সমাদারে সন্তৃপ্ত হইয়াছিলাম, সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ছাত্র-বৎসলতার স্মৃতি-রস অদ্যাপি আস্বাদন করি।

তাঁহার বৈষ্ণব-পদাবলী পড়াইবার ধারাটি ছিল বড়ই কমনীয়। কোন একটি পদের ভাব-সম্পদকে সম্যক্ ভাবে গোচরীভূত করাইবার বাসনায় এবং শিক্ষার্থীর চিত্তে উহার রস-চেতনা জাগাইবার প্রেরণায়, তিনি পরিপাটী করিয়া ধীরে ধীরে প্রসঙ্গানুরূপ আখর যোজনা করিতেন। যাঁহারা মনোযোগ-সহকারে এই রস ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতেন, তাঁহাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর অন্তর্গত রস-মাধুর্য ও অহৈতুকী প্রেমাতি হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন অসুবিধা হইত না।

পদামৃত মাধুরী বুঝাইতে যাইয়া তিনি কত মূল্যবান কথাই না লিখিয়াছেন!—'বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য শুধু কথায় বা ছন্দে নহে। হীরার টুকরার মত সুন্দর ভাব এক একটি ক্ষুদ্র গীতের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়াতে রূপসী কিশোরীর কানের হীরার দুলের মত কবিতাগুলি যেন সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঝলমল করিতেছে।' স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—'ঋষিরা যেমন মন্ত্রের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বৈষ্ণব সাধকও তেমনি শ্রীরাধা গোবিন্দ-লীলার প্রত্যক্ষ দর্শক। এই জন্যই তাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলে।' পুনরায় লিখিয়াছেন—'ইহার প্রকৃত রস-মাধুরী কেবল তাঁহারাই উপভোগ করিতে পারেন, যাঁহারা এই কবিতার মধ্যে একটি পরম আত্মীয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। আবার উদ্বেলিত হইয়া লিখিয়াছেন—'অখণ্ড রসের আস্বাদন লাভ করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াগণের সাজানো পালার অনুসন্ধান করিতে হয়।'

এই মর্মজ্ঞ, রসজ্ঞ, দার্শনিক কীর্তনীয়ার অধ্যাপনা কি দুর্লভ বস্তু নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগ কি তাঁহার সাহচর্যে সুসমৃদ্ধ ও উজ্জীবিত হয় নাই।

CENTRAL LIBRARY

দশ

ইংরেজী-সাহিত্য-রসে সুস্নাত মন লইয়া ইংরেজী-সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক সুবিজ্ঞ-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খগেন্দ্রনাথের অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি-প্রাপ্ত বাংলা-বিভাগের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হইয়া সুযোগ্য হস্তে ইহার পরিচালনা ভারগ্রহণান্তে, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করিয়া এই বিভাগটিকে প্রকৃত প্রস্তাবেই অনেকাংশে সার্থকতা-বিমণ্ডিত করিলেন। স্বাধীন দেশের স্বাধীনতার স্বাদ-লব্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ও গবেষণার পরিধি আরও বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইল; এবং বাংলায় এম. এ. ডিগ্রি-প্রাপ্তদের সম্মানও বাড়িয়া গেল। নানাবিধ সংস্কার সাধনের দ্বারা সুদৃঢ় হস্তে শ্রীকুমার ক্রমশঃই বিভাগটির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন। গবেষণার সঙ্কুচিত ক্ষেত্র প্রসারিত হইল; বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইল। সমালোচক শ্রীকুমার বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলা-সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে উপন্যাস-সাহিত্যের সুবৃহৎ সমালোচনা-পুস্তক রচনা করিয়া সাহিত্যের এই দিকটিকে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

এগার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বাংলা-বিভাগের খগেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যাপক-প্রধানের বৈশিষ্ট্যের সামান্য উল্লেখের দ্বারা তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করিবার প্রসঙ্গে তাঁহার শিক্ষাপ্রদান প্রসঙ্গটিও আসিয়া পড়ে। দীনেশচন্দ্র বিশেষভাবেই চাহিতেন,—শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহিত্য-প্রীতি বর্ধিত হউক; তাঁহারা মৌলিক সাহিত্য সৃজনে আত্মনিয়োগ করুন এবং স্নাতকোত্তর-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশের নানাস্থানে অযত্নে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পত্রাদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেশের বিলীয়মান সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাত সম্পদকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা সাধনে অবহিত হউন আর অন্যকেও অবহিত করিয়া তুলুন। আবার শ্রীকুমার মনে-প্রাণে চাহিতেন শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক সমালোচনা-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়া বাংলা সাহিত্যের এইদিকের দীনতা দূর করিতে যত্নপর হউন। ভিতরের অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস-বাষ্প উবিয়া যাইয়া, তাঁহাদের চিত্তাকাশে ঘনীভূত মেঘ-সম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া অবশেষে রস-বর্ষণের দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে বলবর্ধক, অতি প্রয়োজনীয়, চর্বণোপযোগী শস্য-সম্ভার উৎপাদন সম্ভবপর করিয়া তুলুক এবং উহাতে স্বদেশ সুসমৃদ্ধ হউক। খগেন্দ্রনাথ বিশৃঙ্খলা আর অতি-শৃঙ্খলাকে পরিহার করিয়া, শিক্ষা ব্যাপারে মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করিতে তৎপর থাকিতেন। বৌদ্ধ-দর্শনে প্রকীর্তিত এই 'মজ্ঝিম পন্থা' বা মধ্য-পন্থা এবং গ্রীক-দর্শনে প্রশংসিত **'The golden mean'**-এর তিনি নিজে প্রশান্তিভরে নাম দিয়াছেন 'সুবর্ণ-মধ্যম'; এই নামে তাঁহার মুদ্রিত রচনাও রহিয়াছে।

শিক্ষার সহিত আজীবন সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে বিয়াল্লিশ বৎসরাধিক কাল স্বেচ্ছায় অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগকারী খগেন্দ্রনাথ যে, এ দেশের শিক্ষা ধারার মর্মমূলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এ দেশের পরাধীনতার যুগেই তাঁহার কার্যকর অধ্যাপক-জীবনের আরম্ভ এবং অবসান উভয়ই ঘটিয়াছে। এই জন্যই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মুখস্থ-সর্বস্ব, মৌলিকতা-নিষ্পেষক ধারার গতানুগতিক, পরাধীনতা-পর্যুদস্ত অন্তঃসারহীনতাকে পর্যবেক্ষণ সহকারে তিনি অনুধাবন করিতে পারিলেও, বিশৃঙ্খলার ভয়ে উহার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইতে পারিতেন না।

গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমকে বা স্যার আশুতোষ নির্দেশিত ও তাঁহার কীর্তিমান দেশবরেণ্য পুত্র ও খগেন্দ্রনাথেরও ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমর্থিত শিক্ষাধারা পরিহারকারী অন্য কোন শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ সম্ভবতঃ এই আচার্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও সাধ্যাতীত ছিল। এই জন্যই লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী

CENTRAL LIBRARY

উৎক্ষেপের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, এবং 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের উদ্দামতার মধ্য দিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির যুগসন্ধির অব্যবহিত পূর্বের বৎসর কাল পর্যন্ত বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের কর্ণধার থাকিয়া, তরণীর হাল ধরিয়া, উহাকে যথাবিহিত পথে পরিচালনের দ্বারা বন্দরে উত্তরিত করিয়া দেওয়া সহজসাধ্য কার্য নহে। খগেন্দ্রনাথ তরুণের তারুণ্যকে প্রতিহত না করিয়া, অতিরিক্ত শৃঙ্খলাপরায়ণতার বাহিরের সৌষ্ঠবকে পরিবর্জন করিয়া এবং বিশৃঙ্খলার আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিয়া, পাঠন-ব্যবস্থা পরিচালনায় তৎপর থাকিতেন। দর্শন-শাস্ত্রানুশীলন-সঞ্জাত প্রত্যয় বোধ, সাহিত্য-সৃজনোদ্ভূত আবেগাত্মক সদাচার এবং সঙ্গীতচর্চা-লব্ধ সূক্ষ্ম, সংযত পরিমিতি জ্ঞান সর্বরকম ব্যর্থতার অভিঘাত হইতে খগেন্দ্রনাথকে রক্ষা করিয়াছিল।

পরিণত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যনির্ধারণ ক্ষমতা লইয়া খগেন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালের যাবতীয় কার্যক্রমকে এবং অধ্যাপনা কর্মকে বিচার সহযোগে পরিমাপ করিতে প্রয়াসী হইলেই বোধগম্য হইবে যে, এই নীরব, নিষ্ঠা-সমন্বিত, শৃঙ্খলাপরায়ণ অধ্যাপক-প্রধানের প্রয়োজন সেই তরঙ্গায়িত ঝটিকাক্ষুব্ধ সময়ে সম্ভবতঃ অপরিহার্যই ছিল।

বার

শিক্ষক, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষার্থী এই ত্রিধারার যুগপৎ সুষ্ঠু সমন্বয় না ঘটিলে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসুন্দর উৎকর্ষ ও চরিতার্থতা সংসাধিত হইতে পারে না। যে শিক্ষাধারার অনুষঙ্গের মধ্য হইতে শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটে, সময়ের অতিবাহনের ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষাধারারও বিবর্তন ঘটিতে থাকে। এই বিবর্তনের সহিত শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর সমভিব্যাহারী হইয়াই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, চলিতে অভ্যস্ত থাকিবার সাধনা তৎপরতায় সদা নিযুক্ত রহিতে হয় এবং উহাতেই নবাগত শিক্ষার্থীর প্রাণের ও তাঁহার সমসাময়িক কালের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা প্রদান পারিপাট্য অর্জিত হওয়ায়, শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহচর্যে সহজেই স্বাস্থ্যপ্রদ, প্রকৃষ্টতম জ্ঞান ভাণ্ডারের সঞ্চিত পরমান্নে পরিতৃপ্ত হইতে সক্ষম হন।

সঙ্গীতের নানারূপ 'ঘরণা' রহিয়াছে এবং উহাতেই সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষক প্রবাহ অব্যাহত, অবিঘ্নিত ও অনুশীলন-সিদ্ধ থাকিয়া, ভারতীয় মহাসঙ্গীত সাগরগামী নানা দিক্‌বাহী সঙ্গীততরঙ্গ ভঙ্গময়ী নদীধারাসমূহকে মুখর রাখিতেছে। সাহিত্য শিক্ষারও সেইরূপ 'ঘরাণা' না থাকিলে, উহার সর্ববিধ সূক্ষ্ম বিকাশের প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ এবং শ্রীকুমার—এই আচার্যত্রয় সাহিত্য-সঙ্গীত সমালোচনার যে সার্থক 'ঘরাণা'র প্রবর্তন, পরিপোষণ ও উজ্জীবন সাধন করিয়া বাংলা-বিভাগকে সুসমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, উত্তরোত্তর উহার সার্থক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতে থাকিলেই, তাঁহাদের শিক্ষা প্রদান ও গবেষণা সঞ্চালন সমন্বিত বাংলা-বিভাগ পরিচালনা যে সর্ব-সিদ্ধিকরই হইতেছে, উহা পরবর্তী সারস্বত সমাজও স্বীকার না করিয়া পারিবেন না।

অকস্‌ফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ইংরেজী-সাহিত্য-শিক্ষার অপূর্ব দুইটী 'ঘরাণা' সংসৃষ্ট হইয়া, ইংরেজী-সাহিত্যাদর্শকে সর্বদা জাতীয় জীবনের পুরোভাগে উপস্থাপিত রাখিয়াই যাইতেছে, বাংলার এই শ্রেষ্ঠ বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপভাবে বাংলা-সাহিত্যাদর্শের সর্বোত্তম 'ঘরাণা'কে সম্যক-ভাবে অনুশীলন-সহযোগে সঞ্জীবিত রাখিলেই শিক্ষাগুরুত্রয়ের প্রবর্তিত শিক্ষা সার্থকতা-বিমণ্ডিত হইবে,—তাঁহাদের স্বপ্ন-সাধও সফল হইবে। আর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা সাহিত্য-শিক্ষার অনুরূপ 'ঘরাণা' সমুদিত হইয়া জাতীয় সারস্বত সাধনাকে অব্যাহত রাখিবে।

CENTRAL LIBRARY

তের

খগেন্দ্রনাথ 'অকিঞ্চন দাস' এই ছদ্ম-নাম প্রয়োগে কোন কোন সময়ে আত্মগোপন করিয়া প্রবন্ধ-গল্পাদি সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃই অকিঞ্চন থাকার বৈষ্ণববৃত্তি তাঁহার চরিত্রেরই একটি সংগুপ্ত ধর্ম ছিল। এইজন্যই শিক্ষার্থীর নিন্দাস্তুতির উর্দ্ধে থাকিয়া সর্ব-প্রযত্নে বাংলা-বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তিনি করিয়া গিয়াছেন। স্নাতকোত্তর বাংলা সাহিত্যের বিভাগীয় পথ-প্রদর্শক প্রথম পরিচালকের খ্যাতি-লাভ এবং স্বাধীনোত্তর যুগের তৃতীয় পরিচালকের অনুরূপ যশোলাভ, মধ্যবর্তী তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, উক্ত সঙ্কটান্দোলিত অশান্ত সময়ে উহা ঘটিতেও হয়ত পারে না; কিন্তু শান্ত-চিত্তে বিচার করিলে বলিতেই হইবে, খগেন্দ্রনাথের সাধনাও কোনওভাবে ব্যর্থ হয় নাই। প্রকৃত শিক্ষাবিদ্ ও সঙ্গীতজ্ঞের জীবন তাঁহার জীবনাবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় না। উহা সহস্রচিত্তে সংগোপনে যে ভাবের শতদল বিকশিত করে, তাহারই পরাগ-রেণু অলক্ষ্যে শতদলের পরে শতদল ফুটাইবার সম্ভাবনাকে আর অবসিত হইতে দেয় না।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯২—১৯৭০

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন পরম সম্মানের। ইংরেজী সাহিত্যের পঠন-পাঠনে মধ্য-যৌবন পর্যন্ত কাটিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথম কয়েকবছর তাঁর বাংলা লেখার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও তেমন সুযোগ-সুবিধা বা যোগাযোগ হয়নি, ইংরেজীর সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকের বাংলা সাহিত্যচর্চার অবকাশ ছিল খুবই সীমিত। বাংলা-সাহিত্য সেবার হিসাবে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষয়কীর্তি, কিন্তু এই বইখানি 'নব্যভারত', 'বঙ্গবাণী', 'উদয়ন' 'প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা,'—অনেকগুলি সাময়িক পত্রে অল্প অল্প করে প্রকাশিত হ'য়ে শেষপর্যন্ত দীর্ঘ পনেরো বছর পরে (১৩৩০—১৩৪৫ সাল) গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা বই হ'য়ে প্রকাশিত হবার সাতবৎসর পরে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই নূতন দায়িত্ব বা কর্তব্যভার ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যসেবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ঠা, সময় ও শ্রম সংযোগে দ্রুত ফলপ্রসূ ক'রে তুললো, বয়সের বা কাজের চাপ অগ্রাহ্য করেই তিনি বাংলাসাহিত্য চর্চায় মনপ্রাণ অর্পণ করলেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প-উপন্যাস-কবিতা রচয়িতা নন, তিনি সাহিত্য সমালোচক; কাজেই অন্যের লেখা পড়া, সে লেখা সম্পর্কে চিন্তা করা এবং নিজের মনের আলো সেই লেখার উপর ফেলে লেখাটির স্বরূপ উপলব্ধিতে ও প্রকাশে স্বভাবতঃই তাঁকে অনেক সময় দিতে হয়েছে। তবু ভাবলে অবাক হ'তে হয় আজীবন ইংরেজী সাহিত্যের নিষ্ঠাবান ছাত্র ইংরেজীর কৃতবিদ্য অধ্যাপক ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫—এই দশবছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের কর্ণধাররূপে কাজের সময়তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেও ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত অশেষ প্রীতি ও অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে বাংলা পঠন-পাঠনের মান অভূতপূর্ব উন্নীত হয়, সার্থক পরিচালক হিসাবে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চায় পূর্ণ মনোনিবেশ ক'রে ব্যক্তিগত সাফল্যে বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় অগ্রগতি সম্পাদনেও তিনি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জন করেন।

বাংলা সাহিত্যে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলম্বিত আবির্ভাব একদিক থেকে ক্ষতির কারণ হ'লেও অন্য দিক থেকে এতে কিছুটা লাভ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপের পূর্বেই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী সমালোচক হিসাবে যশস্বী হয়েছিলেন। ইংরেজী রোমান্টিক কবিতার উপর তাঁর গবেষণা সুধী-সমাজে আদৃত হয়েছিল। কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের যৌথ কাব্য-প্রয়াস 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর কাব্যরূপ ও রীতির উপর গবেষণা গ্রন্থ লিখে (*Critical theories and Poetic Practice in the Lyrical Ballads*) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি পান। কোলরিজ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছাড়া প্রখ্যাত রোমান্টিক কবি কীটসের উপরও তাঁর প্রতিভাদৃপ্ত সমালোচনা রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর

CENTRAL LIBRARY

উপর লেখা উল্লিখিত গবেষণা গ্রন্থের সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিক কবি কোলরিজ এবং কীট্‌সের উপর লেখা সমালোচনা গ্রন্থখানি (*Studies in the Poetry of Coleridge and Keats*) মূল্যবান এবং প্রকৃতপক্ষে লেখকের ভাব-ভাবনার প্রকাশ হিসাবে শেষোক্ত গ্রন্থখানিকে প্রথমোক্ত গ্রন্থের পরিপূরক বলা চলে। কবি শেলী, সাদে এবং সুইনবার্ণের কবিতার সমালোচনায়ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সৃজনী-সমালোচক-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্যের সমালোচনার এই বিস্তৃত অধিকার ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সাহিত্য বিচারে কাজে লাগালেন। ইংরেজী সাহিত্যের অভ্যস্ত বিদগ্ধ অথচ জীবন্ত সমালোচনা রীতি বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রয়োগেই স্বর্ণপ্রসূ হ'ল, বাংলা সাহিত্যের সেও এক বিস্ময়কর অগ্রগতি। সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার স্নিগ্ধ আবেগ পরিসিঞ্চিত। রোমান্টিক সাহিত্য-রুচির প্রাজ্ঞ রসবেত্তা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনা-পদ্ধতির মূলসূত্র প্রয়োগ ক'রে কৃতিত্বের নিরিখে খুবই সন্তোষজনক ফল পেলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক পণ্ডিত ও হৃদয়বান স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের সগোত্র ছিলেন, কোলরিজের রোমান্টিক সাহিত্য সমালোচনার মূলসূত্রটি তাঁরও মূলসূত্র। কোলরিজের মতই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টি নিয়ে রোমান্টিক সাহিত্য কৃতির বিরুদ্ধে বন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারী আত্মপ্রকাশরীতির প্রচলিত সস্তা অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছেন, প্রত্যেক সাহিত্য শিল্পীকেই তাঁর আপন প্রতিভার আলোকে চিনতে হবে, সেই আলোকেই সমালোচকদের উপলব্ধি করতে হবে শিল্পীর প্রতিভার বিধিবদ্ধ রূপ। পৃথক শিল্পীর প্রতিভার রূপ এবং রঙ পৃথক, কিন্তু এই প্রতিভা কোনক্ষেত্রেই নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন ভুঁইফোড় নয়। নিজের নিজের হিসাবে প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব শিল্পরীতি বর্তমান, তা খুঁজে পেতে হ'লে সন্ধানী চোখের সঙ্গে সমালোচককে দরদী মন মেলে দিতে হবে। সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবরূপকে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিচার করেছেন, তখন তিনি সৌষম্যগত ও সমষ্টিগত প্রকৃতির উপর রসিক দৃষ্টি ক্ষেপণ করেছেন, প্রচলিত সংজ্ঞা অথবা পরিণত রূপের সম্ভাব্য কারণের জন্য তিনি মাথা ঘামান নি। কারণ নিশ্চয়ই আছে, তার প্রকাশ এমনি ঘটলে ভালই, তবে না ঘটলেও ক্ষতি নেই যদি আলোচ্য সৌষম্য ও সমষ্টিগত প্রকৃতির লালিত্য যথার্থ পাঠক মন পরিপ্লাবিত করবার শক্তি রাখে। *Studies in the Poetry of Coleridge and Keats* গ্রন্থে (১৯৬৫) ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই মানস-বৈশিষ্ট্য দ্বিধাহীনভাবে ফুটিয়ে লিখেছেন :

> 'How can we account for this persistent refusal of romanticism to yield up the secret of its soul···Our failure has been due to our continued inability to see that in a question of such subtlety and complexity, the true standpoint should be the effect, and not the cause, we should begin by estimating the precise quality of the romantic effect attained from the most diverse sources, and then try to arrive at the common element in all these various kinds of appeal. When there is an appreciable measure of success in the attaiament of this common element, there we must work backwards to reconstruct of the cause, if possible. If no cause is discoverable, we must at any rate hold fast to the effect, as to a solid unmistakable reality, and be prepared to admit

CENTRAL LIBRARY

that the effect is brought out not by one, but by many causes independent of the rest. (P. 3-4).

উৎকৃষ্ট রোমান্টিক ভাবের আবেদন মানুষের মনকে প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা থেকে সমুন্নীত বা উর্ধ্বায়িত করে, এই প্রত্যয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-চিন্তা মহৎ হয়ে উঠেছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সমালোচক, সেই তাঁর পরিচয়। এ পরিচয় সার্থক এই অর্থে বিশেষ করে যে, বাংলা সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর সমালোচকের সংখ্যা নগণ্য এবং সেইজন্য সমালোচকের মানস-মুকুরে উপস্থাপিত সাহিত্য-রূপের স্বরূপ উদ্ভাসনের যে বিস্তৃত সম্ভাবনা থাকে, যে সম্ভাবনা সাহিত্য-বোধকে সার্বজনীনতার দিকে ছড়িয়ে দেয়, সাহিত্যের নিহিত মূল্য সম্প্রসারিত করে, লেখকের মনের জিনিষ ক্রমে বিশ্বের জিনিষ হয়ে ওঠে,—বাংলা সাহিত্য সেই সমালোচনার আলো থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত হয়ে স্বাভাবিক বিকাশলাভে রুদ্ধ-গতি হয়েছে। এরই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত কোন কোন সমালোচক, রবীন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ডঃ সুশীলকুমার দে, প্রথম চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাবান সমালোচকের নাম বাংলা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও নিহিত ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমালোচনা সাহিত্য পরিমাণে কম তো বটেই, সাহিত্যের স্বরূপ উদ্ভাসনের প্রয়োজনীয় সহায়তার নিরিখে তা বাস্তবিক অপ্রতুল। এঁদের সকলের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে যে সার্থক সাধনার স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন, তা কারুর দ্বারাই আচ্ছন্ন হবার নয়। একালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৫-২৭) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় ভাষার দুরূহতা কখনও কখনও আপত্তিকর বাক্যবিন্যাস, উপমার বাহুল্য, নিকৃষ্ট রচনাকে অতিরিক্ত প্রাধান্যদান প্রভৃতি দোষ দেখিয়েও তাঁর দৃষ্টির সমগ্রতা ও অখণ্ডতা, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমালোচিত রচনার সামগ্রিক সৌষ্ঠবের উপর অতন্দ্র দৃষ্টি, দৃষ্টির ব্যাপকতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য, সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ ক'রে 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় অমরত্বের আশ্বাস আছে'—এই উদাত্ত মন্তব্য করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে (*The Mother, August, 1970*) ডঃ সেনগুপ্ত নৈতিক সমালোচক হিসাবে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চ প্রশংসা ক'রে লিখেছেন : ···In my opinion he is the first pure critic in Bengali literature, and so far, the greatest. By a pure critic I mean who makes 'interpretation' the sole aim of his literary pursuits, and who is not deflected from his work by any ethical, philosopical, sociological or political bias, and who, in Arnolds' language, wants to see the object—here the literary work—as it is.

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন : 'কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সকলের জন্য লেখেন।' এই যে লেখক সকলের জন্য লেখেন, বহু মনে আপনাকে প্রসারিত করবার আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি, তাঁর এই আবেগের সহযোগিতা করা সমালোচকের কাজ। প্রকৃতপক্ষে সমালোচক লেখার যতখানি বিচারক, ততখানি উদ্ভাসক। স্বমহিমায় বা স্বরূপে লেখাটিকে সকলের সামনে তুলে ধরে সমালোচক সেটির প্রতি সকলের দৃষ্টি যেমন আকর্ষণ করেন, তেমনি লেখক কতখানি

CENTRAL LIBRARY

আগ্রহে বা মননের সাহায্যে লেখাটিকে দাঁড় করিয়েছেন, সেদিকেও তিনি সচেতন দৃষ্টি রাখেন। লেখাটি উচ্চমানের না হ'লেও তার মাধ্যমে সমালোচক লেখক-মনের সঙ্গে বিশ্বমনের যোগসূত্র আবিষ্কার করেন এবং সমালোচনা বা ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সেই যোগসূত্র ফুটিয়ে তোলেন। এইভাবে সমালোচকের মনের আলোয় আলোকিত হয়ে লেখাটি স্বল্পদৃষ্টি পাঠক সমেত সকল পাঠকের হৃদয়-সংবেদী হয়। সহানুভূতির সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সমালোচিত লেখাটির পরিপূরণ করেন সমালোচক। সমালোচনা বিষয়াশ্রিত হ'লেও তা অনুভূতিনির্ভর, কাজেই সমালোচকের ভাব-ভাবনা বস্তুভূমিকে রস-সমুদ্রমুখী করে তোলে।

সমালোচকের সহানুভূতি সমালোচনার প্রাণ। এই সহানুভূতির গৌরবেই জি. কে. চেস্টারটন ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের শিথিল রচনারীতি সত্ত্বেও তাঁর সামগ্রিক মহৎ স্বীকৃতি পাঠক-হৃদয়ে স্থায়ী করেছেন। ইংলণ্ডের এক অজ্ঞাত কবি সিভিল সারভিস পরীক্ষার কল্পিত ছাত্র হিসাবে সেক্সপিয়ারের ব্রাডলের সমালোচনা পড়া না থাকায় নিজের লেখা ব্যাখ্যায় অসমর্থতার যে কৌতূহলজনক কবিতা লিখেছেন, তাও এই সত্যের দ্যোতক। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সম্পর্কিত যে সব বিষয়বস্তু সমালোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, সেগুলির উপর প্রথম তাঁর অজস্র প্রীতি উৎসারিত হয়েছে, লেখক-মানসকে তাঁর নিজের দিক থেকে সহানুভূতির সঙ্গে তিনি বুঝে নিয়েছেন, তারপর সম্ভাবনার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে তিনি সেগুলির সমালোচনা করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লক্ষণীয় যে, তাঁকে পুরোপুরি রোমান্টিক সমালোচকও বলা যায় না, তাঁর মধ্যে রোমান্টিক সমালোচনা রীতির সঙ্গে ক্লাসিক রীতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। তিনি আলোচ্য বিষয়ের বস্তু-কাঠামোর উপর ক্লাসিক রীতিগত নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে মাথা ঘামাননি, অথচ ক্লাসিক রীতির রচনায় সংবদ্ধতা রক্ষা এবং স্বাভাবিক নীতি-বোধ তাঁর সমালোচনার ভিত্তিস্বরূপ। এর বিপরীতে আবার রসানুবর্তনের রোমান্টিক আবেগে তাঁর সাহিত্যকৃতি ভরপুর। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিশ্লেষণ-প্রণালীতে সৌন্দর্য-সন্ধানী ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথের মত ভাবের ঊর্ধ্বলোকে বস্তু-সৌন্দর্যকে তিনি রহস্যময় ক'রে তুলতে চাননি, মোহিতলালের মত বস্তুবিশেষের সৌন্দর্যবৃত্তে নিমগ্ন হ'য়ে আত্মাভিযুক্ত হননি। তিনি অতুল গুপ্তের মত রীতিসম্মত সংযত রসোপলব্ধির জন্য সচেতনভাবে অগ্রসর হতেন না, প্রমথ চৌধুরীর মত বিষয়বস্তুর পরিধি-কাঠামোর উপর জোর দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক ক্লাসিকাল সমালোচনা পদ্ধতি তাঁর পথ নয়। তিনি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বা অল্প জনপ্রিয় লেখকের সম্ভাবনাপূর্ণ লেখা নিয়ে সযত্নে হীরক-মালা রচনা করেছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিল বিশ্বের অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্য প্রবাহের তত্ত্বে আস্থা রেখে ছোট-বড় সব বস্তুতেই এবং অখ্যাত-বিখ্যাত সকল লেখকের মধ্যেই সুন্দরের স্পর্শলাভের আশা রেখেছেন। সাহিত্যিক এডগার এ্যালান পো *The Poetic Principle* গ্রন্থে লিখেছেন: 'In the contemplation of Beauty we alone fi d it possible to attain that pleasurable elevation, or excitement of the soul.' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সৌন্দর্য আনন্দ সংশ্লেষে এই আত্মোন্নতিতে বিশ্বাস করতেন। এই তত্ত্ব সনাতন সত্যরূপে মনে জাগিয়ে রেখে জীবনের সমালোচনা রূপেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর আবেগোচ্ছ্বাস রোমান্টিক রীতির জন্য হয়তো কোথাও কোথাও একটু বেশি হয়ে গেছে, অলঙ্করণের প্রবণতার জন্য অথবা অভ্যাস অনুযায়ী অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহারের জন্য তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হয়তো কোথাও কোথাও অস্পষ্ট অথবা কঠিন হয়েছে, কিন্তু সমগ্রভাবে বাস্তব জগৎ ও জীবনভিত্তিক সাহিত্যরূপের বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টাই তাঁর সাহিত্যকৃতির প্রধান পরিচয় বলে বস্তুগত বা তথ্যগত বিচারে তাঁর লেখা কখনও হতমান হবে না। বাস্তব রূপ বা বাস্তব ভিত্তির উপর জোর দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে জগতের সংযোগ বোঝাবার দিকে তাঁর যে সার্থক

CENTRAL LIBRARY

প্রবণতা ছিল, তাতে আধুনিক সমালোচনার জগতে তিনি উচ্চাসনের অধিকারী। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একালের মার্ক্সবাদী সমালোচকদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ রীতি অনুসরণ করেননি, মার্ক্সীয় দর্শন বা হৃদয়-নিরপেক্ষ অর্থনীতির তত্ত্বপ্রাধান্য সাহিত্য-বিচারে তিনি স্বীকার করেননি, কিন্তু সমালোচনার পটভূমিতে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের সংযোগ নির্ধারণে প্রয়োজন মত ইতিহাসের দেশ-কালগত তথ্যভিত্তির উপর তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে রেনাসাঁস বা ইঙ্গভারতীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ের পটভূমি বিশ্লেষণ এই বৈশিষ্ট্যের স্মারক। প্রকৃতপক্ষে একেবারে একালের সাহিত্য বিভাগ উপন্যাসের মূল অনুসন্ধানে তিনি জাতক পঞ্চতন্ত্রের যুগ থেকে মঙ্গলকাব্য লোকসাহিত্যাদিতে যেভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, তাও এই বিশেষত্বের পরিচায়ক। 'সাহিত্য জীবনের সমালোচনা', এই আর্ণল্ডীয় সংজ্ঞা মেনে নিয়ে আস্তিক্য প্রত্যয়ী, কল্যাণধর্মী, সহৃদয়, রসবেত্তা ডঃ শ্রীকুমার আলোচিত সাহিত্য-বৃত্তের বাইরেও এর পটভূমিকার সন্ধান করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পবিত্রতাবোধী ছিলেন, তবে সমালোচক হিসাবে দৃষ্টির সর্বমুখিতায় এই পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও কম নয়। সামগ্রিক সহানুভূতি নিয়ে তিনি সুনীতি দুর্নীতি নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য বিচারে এগিয়ে এসেছেন, কোন পূর্ব সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি বিষয় বিশেষকে এড়াতে চাননি। সুবোধ ঘোষের উপন্যাস 'শতকিয়া' এবং অবধূতের উপন্যাস 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' নিয়ে তিনি যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মননশীলতার সঙ্গে যেভাবে এদের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করেছেন, তা লক্ষ্য করলে কথাটা বোঝা যায়। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কেউ কেউ নৈতিকতার প্রশ্ন তোলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অবান্তর বলে এ প্রশ্ন তোলেননি, অধিকন্তু শরৎসাহিত্যের মূলে লেখকের যে কল্যাণী ইচ্ছা ক্রিয়াশীল ছিল, তার উদার প্রকাশে তিনি যত্নবান হয়েছেন। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি মননশীল শক্তিশালী সমালোচনা হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান, তবে এই গ্রন্থের শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটিও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের ও আধুনিক মননশীলতার উজ্জ্বল পরিচিতিবাহী। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' গ্রন্থে 'সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক' শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্রের মনোধর্ম সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক দুঃখ করে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে দেবতা বানিয়ে আমরা যেমন তাঁকে জীবন-নিয়ামক মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছি, শরৎচন্দ্রকেও আমরা তেমনি পাশ কাটিয়েছি। শরৎচন্দ্র আঘাত ক'রে জড়তা দূর করতে চেয়েছিলেন, সকলকে দায়িত্বশীল করতে চেয়েছিলেন, বিকাশের পথে চলবার প্রেরণা দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এই আগ্রহের সত্যকার মূল্য আমরা দিই নি। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন : 'সমাজের অনুদার রক্ষণশীলতা ও অযৌক্তিক সংস্কার হইতে তিনি আমাদের যতটা মুক্ত করিয়াছেন এমন আর কোন লেখক করেন নাই। আধুনিক জীবনযাত্রার মোটামুটি রূপ ও উহার পিছনকার ভাব-প্রেরণার মূলে আছে তাঁহার উপন্যাসে জীবন-মূল্যায়ন। তবে তিনি যতটা অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহার অপেক্ষা অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছি ও তাঁহার জীবনদর্শনের গঠনমূলক দিকের পরিবর্তে তাঁহার সমর্থিত বন্ধন-শিথিলতাকেই চূড়ান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তিনি সমাজকে উদার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা সমাজকে একেবারে প্রত্যাখান করিয়াছি। তিনি যে উন্নততর আদর্শ ও ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশের প্রয়োজনে সংস্কারমূঢ় সমাজ নিয়ন্ত্রণে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার পরিবর্তে নিছক প্রবৃত্তি বা খেয়ালের দাবীতেই সমাজ শাসন ছিন্ন করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছি না।'

CENTRAL LIBRARY

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ কথাসাহিত্য বিভাগটির স্বরূপ প্রভূত জ্ঞান, মনন, পরিশ্রম, সাহিত্যরুচি, জীবনবোধ এবং সহানুভূতির বিস্ময়কর সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে উপন্যাস বা ঔপন্যাসিকের বিচারে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতি অথবা বয়সের দিকে তাকান নি, সাহিত্য-সম্পদের দিক থেকে মূল্যবান বা সম্ভাবনাময় যে কোন রচনাই ভালো করে আলোচনা করেছেন। এজন্য তাঁকে প্রচুর পড়াশুনা ও চিন্তা করতে হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। পুরাতন লেখকের নূতন রচনা, তাঁর চেতনার রূপান্তর, নূতন লেখকের প্রতিভার সন্ধান, সাহিত্যধারার নূতন প্রাণপ্রবাহ,—এসব সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিরূপ অবহিত ও সতর্ক ছিলেন, তা গ্রন্থটির প্রত্যেক সংস্করণে বিপুল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। এই গ্রন্থের আর এক বৈশিষ্ট্য এতে উপন্যাসের ক্রমানুবর্তনিক আলোচনার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সমগ্র সৃষ্টির নিরিখে আলোচ্য বিশেষ উপন্যাসের বিচার করা হয়েছে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রোপম সাহিত্য-সম্ভারের পূর্ণ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা' নামে বিশালায়তন গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা লইয়া এই দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কার্যে ব্রতী হইয়াছি।' লিখতে লিখতে মনস্বী সমালোচকের মনে হ'ল তিনখণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথম খণ্ড থেকে দ্বিতীয় খণ্ড আয়তনে দ্বিগুণ হ'ল, তবু দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি গ্রন্থখানি চারখণ্ডে সমাপ্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় খণ্ড মৃত্যুর কয়েকমাস মাত্র পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, কাজেই দ্বিতীয় খণ্ডের পর এই মূল্যবান গ্রন্থের অল্প উপকরণই মজুত রাখা সম্ভব হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে, কালানুক্রমিক আলোচনা গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা'য় মোটামুটি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি আলোচিত হয়েছে। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৃহৎ অংশের সমীক্ষা এখনো বাকি আছে। এই গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার কিরূপ বিস্তারিতভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্যালোচনা করছিলেন তা এর দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসখানির দীর্ঘ ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী মনোজ্ঞ আলোচনাটি পড়লেই উপলব্ধি করা যাবে।

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ছাড়া 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', বাংলা উপন্যাস 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' প্রভৃতি গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আদ্যন্ত নানা বিষয়ের উপর সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। 'সমালোচনা সাহিত্য' নামক সঙ্কলন গ্রন্থের অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের তিনি যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন তা তাঁর বিপুল জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁর কিছু সমালোচনা নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ বা গ্রন্থ নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সুলিখিত এবং হীরকখণ্ডের মত দ্যুতিমান; এগুলি থেকে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসলোকের চমৎকার পরিচয় মিলবে। তাঁর পবিত্রতাবোধ অথচ সংস্কারহীনতা, ভদ্রতা অথচ দৃঢ়তা, বাস্তবানুগামিতা অথচ ভাবসমৃদ্ধি ও ভাষাগত অলঙ্করণ-প্রবণতা সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' গ্রন্থের 'সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি এ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েও মনের দিক হতে সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিলেন তা তাঁর সমাজ ও ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধগুলি পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উপর খণ্ড খণ্ড ভাবে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাদের

CENTRAL LIBRARY

সবগুলি সম্মানের না হ'লেও প্রত্যেক বিষয় অধিকতর আয়ত্ত করবার জন্য তিনি ছাত্রোচিত নিষ্ঠায় সর্বদা চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে ছাত্রদের কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় অথবা কোন বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার বা কোন প্রবন্ধ লেখবার দায়িত্ব গ্রহণে তিনি সে সব বিষয়ে কিরূপ প্রচুর পড়াশুনা করতেন, তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরাই তা জানেন। পরিণত বয়সে হঠাৎ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ পরিচালনার ভার নিলেন, ছাত্রসুলভ অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমে অল্প সময়ে তিনি সমগ্রভাবে বিশাল বঙ্গসাহিত্যাকাশে যে ভাবে পক্ষ বিস্তার করেছেন, সে কৃতিত্ব তাঁর মত মনীষীর পক্ষেই সম্ভব। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায়ও তিনি প্রাজ্ঞতা এবং প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় ধর্মমূলক সাহিত্যানুধাবন তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও সাহিত্যবোধের দ্বারা অনুপূরিত হয়েছে। বৈষ্ণব-ভাবমুগ্ধ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্যকে অন্তরের সামগ্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান যতখানি, প্রজ্ঞা ততোধিক। তাঁর একটি প্রবন্ধের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যধর্ম; প্রবন্ধের এইরূপ নামকরণের মধ্যেই ভক্ত শ্রীকুমারের অন্তর-সৌরভ অনুভূত হয়, তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা হয় প্রবন্ধ পাঠের পর।

বাংলা সাহিত্যের ও সাহিত্য-সেবকদের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিবশতঃ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক সম্ভাবনা সন্ধান করতে এবং সন্ধান পেলে তা প্রেরণা ও প্রচার দ্বারা বিকাশমুখী ক'রে তুলতে সবসময় আগ্রহী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত লেখকের প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী অনেক রচনার তিনি সানুরাগ আলোচনা করেছেন। বৈষ্ণব কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কাব্য', আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের কবিতার বই 'ঘোড়া কর ভগবান', ভুবনমোহন দাশগুপ্তের ধর্মমূলক গ্রন্থ 'অবতারতত্ত্ব', আবুল ফজলের মুসলিম সমাজের উপর লেখা কাহিনী 'চৌচির' অমিয়ভূষণ মজুমদারের দুর্ভিক্ষ ও দেশবিভাগের পটভূমিতে লেখা বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের কাহিনী 'গড় শ্রীখণ্ড' প্রভৃতির সমালোচনা এ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাথুর' উপন্যাসের সমালোচনা 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এইভাবেই যত্ন ক'রে করেছেন। বৈষ্ণব ভাবানুভূতির উপর লেখা 'মাথুর'-এর আলোচনা শুধু দীর্ঘ নয়, সমালোচকের হৃদয়ানুরক্তি এই উপন্যাসের সমালোচনায় যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের বিসরণধর্মিতার জন্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহ ছিল, এইজন্যই কারাজীবনের উপর লেখা বাংলা উপন্যাসগুলি তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। 'কারাকাহিনী' নামক এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' ও অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি কেলাস' উপন্যাসগুলির সমালোচনা করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনাগুলিতে তাঁর রসগ্রাহী প্রসারণধর্মী মন লীলায়িত হবার অধিকতর সুযোগ পেয়েছে ব'লে মনে হয়। এ হিসাবে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' গ্রন্থের 'মধুসূদন—জীবনী ও কাব্য', 'মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র', মধুসূদন থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত আলোচনা 'নবযুগের বাংলা সাহিত্যের সূচনা, প্রভৃতি লেখাগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

* জন্ম— ২৩শে মার্চ, ১৮৯২, হাতিয়া, বীরভূম। বাঁকুড়ার রোল ইনস্টিটিউশন ও বীরভূমের হেতমপুর কলেজ থেকে যথাক্রমে এন্ট্রান্স ও ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা পাশ। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার (১৯২০ খ্রীঃ) ও 'ঈশান' বৃত্তি লাভ। ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার (১৯১৯খ্রীঃ)। রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে যোগদান (১৯১২ খ্রীঃ)। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান (১৯৪১ খ্রীঃ)। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে যোগদান ও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ। মৃত্যু—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।

CENTRAL LIBRARY

তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

১৮৯৩—১৯৬৯

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

'অতীত বাংলার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে রচিত আপনার নিবন্ধাবলী প্রকৃতই এক প্রাণবন্ত ও অনন্ত ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।' পরম একনিষ্ঠ গবেষক ও শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি একদা প্রতিবেদন করেন সুবিখ্যাত ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ ডঃ সিলভাঁ লেভি। প্রকৃতপক্ষে, ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে ক্রমান্বয়-ভাবে একটি বিশিষ্ট প্রেরণা ও চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে সর্বদাই পর্যবেক্ষিত হবে মৌলিকতার দৃঢ় ভিত্তি ও ঐতিহাসিকের কৌতূহল ও পরিশ্রমলব্ধ বিন্যাস।

ইংরাজি ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলায় অবস্থিত ধামরাই থানার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামে এক প্রাচীন জমিদার বংশে তমোনাশ দাশগুপ্তের জন্ম হয়। পিতা অবিনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং মাতা কুমুদিনীর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিসর্গ সৌন্দর্যময় পূর্ববঙ্গের ব্যাপকতার গহনে ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষা নদীদ্বয়ের মিলন-স্থলের অদূরে অবস্থিত সুয়াপুর গ্রামে তমোনাশ দাশগুপ্তের শৈশব ও প্রথম বাল্য-জীবন অনেকাংশে অতিবাহিত হয়। তাঁর শিক্ষাকাল অবশ্য সূচিত হয় ময়মনসিংহ জেলার দুইটি বিদ্যালয়ে, ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ও সুবর্ণখালি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সুলেখক ও ইতিহাসবিদ্ অবিনাশ দাশগুপ্তের আকাঙ্ক্ষা ছিল পুত্রকে ইংরাজি ও ইতিহাস শিক্ষায় পারদর্শী করা। ফলে ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি প্রেরিত হন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। এরপর ১৯১২ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন। এখানে উল্লেখ্য, কলেজীয় অধ্যয়নকালে তমোনাশ দাশগুপ্তের বিশেষ প্রেরণা প্রদর্শিত হয় ইতিহাস-চর্চায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্লেশময় পরিবেশে এবং পারিবারিক দুর্যোগবশত অবশ্য তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর উপাধিলাভ করলেও আপন গবেষণা-ক্ষেত্রকে তিনি অন্বেষণ ক'রে চলেন। ইতিপূর্বে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন-কালেই তাঁর উচ্চতর গবেষণার মননশীলতা স্ফুরিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছাত্রাবস্থায় তমোনাশ দাশগুপ্ত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ও বঙ্গ-জননীর একনিষ্ঠ সেবক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রতিভার সংস্পর্শে আসেন। মনীষার এই সান্নিধ্য যে তাঁর সাহিত্য-চেতনা ও ইতিহাস-ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছে সন্দেহ নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন পিতা অবিনাশ দাশগুপ্তের বাল্যবন্ধু। ছাত্রবয়সে তমোনাশ দাশগুপ্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে তমোনাশ দাশগুপ্ত 'ইণ্ডিয়ান ভারনাকুলার' (পরবর্তীকালে 'মডার্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজেস' নামে পরিচিত)-এ এম. এ. পাশ করেন (১৯২০)। এই সময়ে তাঁর মূল বিষয় ছিল বাংলা। ১৯২১ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ইণ্ডিয়ান ভারনাকুলার বিভাগে গবেষক পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়-বস্তু ছিল প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তথ্যাদিকে ভিত্তি করে বাঙালীর অতীত সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিককে আলোচনা করা। বিগত পর্বের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বাণিজ্য, জাহাজ-নির্মাণ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, রণবাদ্য, অলঙ্কার, কৃষি, স্থাপত্য, রন্ধনশিল্প এ সবই ছিল তাঁর গবেষণার অন্তর্গত। এছাড়া

CENTRAL LIBRARY

এদেশের গ্রামীণ জীবনের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, বিশেষত বাঙালীর কাব্য-ভাবনায় বিহঙ্গকুল যে বর্ণাঢ্যতা সৃজন ক'রেছে তা'ও তাঁর দৃষ্টিকে অতিক্রম করেনি এবং সমাপ্ত গ্রন্থকে দান করেছে এক বিশিষ্ট আঘ্রাণ ও সুস্নিগ্ধ ব্যাপ্তিবোধ। তমোনাশ দাশগুপ্তের এই গবেষণা পরিচালিত হয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে। ১৯৩১ সালে তাঁর এই অনন্য তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'আস্পেক্টস্ অফ বেঙ্গলী সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটেরেচার' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি-এইচ. ডি-র মাল্যভূষিত হয়। ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ ইংরাজি ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। পাশ্চাত্ত্যের যে সব সুধীবৃন্দ তাঁর এই গবেষণাকে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন অথবা সম্মান জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, স্যার জর্জ. এ. গ্রিয়ারসন, উইলিয়াম রথেনস্টাইন, স্টেন কোনো এবং অধ্যাপক জে. ব্লক অন্যতম। অধ্যাপক লেভি এই গবেষণামূলক গ্রন্থের একজন পরীক্ষক ছিলেন। বাংলার ইতিহাস রচনায় এই পুস্তকটির অপরিমেয় মূল্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর দ্বিমত ছিল না।

ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর প্রথম গবেষণাকাল থেকেই শিক্ষকতা ক'রে এসেছেন।* বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রারম্ভকাল ১৯২১ সাল থেকে যখন তিনি প্রথম রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্টান্ট রূপে নিযুক্ত হন, এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্টান্টদের উপর শিক্ষকতার দায়িত্বও যথাযোগ্যভাবে অর্পিত হ'ত। নিয়োগবিধি অনুসারে ডঃ দাশগুপ্তের উপর যেমন ইণ্ডিয়ান ভারনাকুলার বিভাগে পড়াবার ভার দেওয়া হ'ল তেমন ইতিহাস বিভাগেও তাঁকে বাংলার সামাজিক ইতিবৃত্ত পড়াতে হ'ত (১৯২১-২৪)। এরপর ১৯৩১ সালে ডঃ দাশগুপ্ত মডার্ন ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজেস বিভাগে পূর্ণ দায়িত্বে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সালে অবসর গ্রহণের পূর্বে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদটি অলঙ্কৃত করেন। সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতায় ব্যাপৃত ডঃ দাশগুপ্ত অবসর লাভের পর কলিকাতার অদূরে অবস্থিত কোন্নগরে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (১৯৫৭)। এই অধ্যক্ষ পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬০ সালে। অধ্যক্ষ থাকাকালীন এই কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তিনি যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেন। অবসর গ্রহণের পরও ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর গবেষণা থেকে বিরত থাকেন নি। প্রাচীন বাংলার সমাজ-জীবন ও তার ইতিহাস রচনায় বাংলা-সাহিত্যের যে এমন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যা'র তাৎপর্যের প্রকৃত মূল্যায়ন অদ্যাবধি অপেক্ষমান সে বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ও তথ্যতৃষ্ণা তখন প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সীমান্তে উপনীত। ১৯৬৯ সালের ৭ই অক্টোবর কলিকাতায় এই চির-তাপস ও সাধকের জীবনাবসান হয়। সামান্য কাল পূর্বে ১৯৬৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি তাঁর সহধর্মিণী চিরনিদ্রা লাভ করেন।

ছাত্রহিতৈষী ও সত্যনিষ্ঠ ডঃ দাশগুপ্তের কর্মসাধনায় শিক্ষকতা ও গবেষণা দু টি দিকই প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তাঁর লেখায় প্রায়ই পর্যবেক্ষিত হয় একটি স্বকীয় বলিষ্ঠতা ও ইতিহাস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্বদেশানুরাগ। বাংলা ও ইংরাজি দু'টিতেই তিনি ছিলেন দক্ষ সংলাপী। কেবলমাত্র লাবণ্য ও পেলবতার চেয়েও যেন তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল প্রাচীন বাঙালীর এক অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি যা'র প্রতি জীবনার্ঘ্য দান ক'রেছেন বঙ্গ-প্রেমিকের এক চিরন্তন পথ-প্রদর্শক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের যে লেখনী-তুলিকার স্পর্শ বিদ্যমান তারই বর্ণালী যেন ডঃ দাশগুপ্তের জীবন-শেষের প্রেরণাস্বরূপ। যে ভাবমূর্তি জীবন-প্রভাতে বিকশিত বিদায়ী অপরাহ্ণে তার

* কর্মজীবনের প্রারম্ভে তমোনাশ দাশগুপ্ত নিম্নোক্ত দুইটি বিদ্যালয়ে সামান্যকাল শিক্ষকতা করেন :

১। শশিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। হেমনগর। ময়মনসিংহ জেলা।

২। গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। ছিন্দোয়ারা। মধ্যপ্রদেশ।

CENTRAL LIBRARY

সামীপ্য মুদ্রকর। এ ছাড়া, কি পুঁথি সম্পাদনা, কি নানাবিধ নিবন্ধ-রচনা, দুইয়েই তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হ'য়েছে সমভাবে। একদিকে তিনি যেমন রচনা ক'রেছেন কতিপয় অমূল্যগ্রন্থ, অপরদিকে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাসহকারে সম্পাদনা ক'রে গেছেন কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। এতদ্‌ভিন্ন, তাঁর লিখিত প্রবন্ধাবলীর সংখ্যাধিক্য অধ্যাপকের নিরলস কর্মসাধনার সাক্ষ্যস্বরূপ। ছাত্র-পাঠ্য ('সমগ্র বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা') ও শিশু-পাঠ্য ('অজানা দেশে' ও 'সাহিত্যকুসুম') পুস্তকাদিও বিভিন্ন বয়সে রচনা ক'রেছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। প্রথম তারুণ্যে গবেষকের হৃদয়-গহনে যে এক অভিযাত্রীর স্বপ্নরঞ্জিত আকাঙ্ক্ষা মুকুলিত ছিল তারই পরিচয় পাওয়া যায় স্যান্‌সেন, কুক্‌, লিভিংস্টোন ও মাঙ্গোপার্কের কাহিনী মুখরিত 'অজানা দেশে' পুস্তকে (এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৯২৪)। এইজন্যই কি পরবর্তীজীবনে মঙ্গল-কাব্যে বর্ণিত লবণাম্বু-অতিক্রমশীল বাঙালী সদাগরদের কাহিনী তাঁর এত প্রিয় ছিল? তাঁর দ্বারা রচিত ও সম্পাদিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি নিম্নে উল্লিখিত হ'ল—

১। 'আস্‌পেক্‌টস্‌ অফ বেঙ্গলী সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটেরেচার'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। ইংরাজিতে অনূদিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'জার্নাল অফ লেটারস্‌' ঊনবিংশতিতম ও বিংশতিতম খণ্ড।

৩। 'দি নোবিলিটি অফ বেঙ্গল ইন ওল্ড বেঙ্গলী লিটেরেচার'। ঐ। দ্বাবিংশতিতম খণ্ড।

৪। 'রাজা গণেশ'। ঐ। ত্রয়োবিংশতিতম খণ্ড।

৫। 'সারদামঙ্গল'। ইংরাজিতে অনূদিত ও সম্পাদিত। ভূমিকা সম্বলিত। ঐ। ত্রয়োবিংশতিতম ও ঊনত্রিংশতিতম খণ্ড।

৬। 'নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ'। সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮।

৮। 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। ঐ ১৯৫১।

৯। 'রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়'। মডার্ণ বুক এজেন্সি। কলিকাতা ১৯৫৬।

১০। 'সাম জিওগ্রাফিকাল অ্যাণ্ড টপোগ্রাফিকাল অ্যাকাউন্টস্‌ অফ বেঙ্গল'। অপ্রকাশিত।

১১। 'সাম আসপেকটস্‌ অফ রবীন্দ্রনাথস্‌ লিটেরেচার'। 'ক্যালকাটা রিভিউ', এপ্রিল ১৯৬৪।

১২। 'স্লিমপ্‌সেস অফ এনসিয়েন্ট ইণ্ডো-ইরাণিয়ান পোলিটিকাল অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাফিনিটিস ইন দি নিয়ার অ্যাণ্ড মিডল্‌ ইস্ট'। 'ইণ্ডো-ইরাণিকা,' চতুর্থ খণ্ড, নং ২-৪।

CENTRAL LIBRARY

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১৯১১-১৯৬৪

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

উনিশ শ' চৌষট্টি সালের একুশে জুলাই তারিখটি মনে পড়িতেছে। ঐদিন শশিভূষণ দাশগুপ্ত* মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। কালস্বরূপ কর্কটব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু ছাত্রের আচার্য, বহুজনের অন্তরঙ্গ, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, আদর্শ গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্ত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে জীবনরশ্মি সংহরণ করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' স্বল্পভাষী শশিভূষণ দাশগুপ্ত জীবিতকালে লোকচক্ষু ও সাময়িক পত্রের অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সভা-সমিতির বরাসন লাভে তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না, 'রাজা ভাঙাগড়া'র রাজসূয় যজ্ঞেও তাঁহার ডাক পড়ে নাই।

বাংলা সাহিত্যের সৌধিন পাড়ায় যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা হয়তো শশিভূষণকে চিনিবেন না। যাঁহারা সাহিত্যের গবেষণাকে পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারাই তাঁহাকে যথার্থ চিনিবেন। বৌদ্ধতন্ত্র, বাংলার লোকধর্ম ও লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তদর্শন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যাদিকে—যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনঃপ্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর পৈতৃক সংস্কার বলে, শশিভূষণ তাহাকেই দুর্জ্ঞেয় জটিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলাদেশের চিত্তভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিশ্ছিদ্র গবেষণা ও একনিষ্ঠ সাধনা ইদানীং এদেশের বিদ্বৎসমাজ হইতে যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে হয়, এ ধরনের নিষ্কাম গবেষণার আদর্শ ক্রমেই অপসৃত হইয়া যাইতেছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করিতে চাহিতেছে কমলদলবিলাসী রম্যরচনাকারের দল।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় শশিভূষণের অসাধারণ নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতা যেন পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের দ্বারাই অর্জিত হইয়াছিল। তাঁহার সূচাগ্র-তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও দূরসন্ধানী মনন বিষম, বিপরীত ও দুর্জ্ঞেয়কে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। চিত্তগুহাশায়ী বজ্রমণিকে বিদীর্ণ করিয়া তিনি যেভাবে মাল্যগ্রন্থন করিয়াছেন, আজিকার 'প্রাগম্যাটিক' যুগের নগদ বিদায়ের দিনে তাহার মূল্যাবধারণ করা সম্ভব নহে। এই খর্ব মানসিকতার যুগে শশিভূষণের প্রতিভা ও চরিত্রের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি আমরা 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত-মুষল' না হই, তাহা হইলে শশিভূষণ-রচিত গ্রন্থের মধ্যে সেই কুলপরিচয় ও পৈতৃক সংস্কার আমাদিগকে খুঁজিয়া লইতে হইবে।

* জন্ম—১৯১১; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; পি. আর. এস.—১৯৩৭; পি. এইচ. ডি.—১৯৩৯; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে স্থায়ীভাবে অধ্যাপকের পদে যোগদান—১৯৩৯; রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের সর্বাধ্যক্ষ—১৯৫৩; মৃত্যু—২১শে জুলাই, ১৯৬৪।

CENTRAL LIBRARY

২

শশিভূষণ একাধিক কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, শিশু-সাহিত্যেও তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনাতেও তাঁহার সমৃদ্ধ ও পরিচালিত মনের পরিচয় পাওয়া যাইবে কথাসাহিত্য ও নাটকের কমলবনেও তাঁহার মনমধুপ মত্ত হইয়াছিল।* কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক শশিভূষণের পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এখানে তাহার স্থানসঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার যে চারিখানি (দুইখানি ইংরেজী ও দুইখানি বাংলা) গ্রন্থ বাংলাদেশের মনঃপ্রধান গবেষণা-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এখানে সে-সম্পর্কে দুই-চারি কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অতি তরুণ বয়সে শশিভূষণ প্রবীণ তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি নূতন শাখা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যূষপর্বের সঙ্গে যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা একদা এই অঞ্চলের জনচিত্তে যেমন গভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বের মুখে সেই অপরিণত বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পদ (চর্যাগীতি নামে পরিচিত) রচনা করিয়াছিলেন—যাহার আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে আছে গূঢ় গহন অধিমানসের নির্বাণমুক্তির কথা। বাংলা চর্যাগীতিকাগুলি অনুশীলন করিতে গিয়া ছাত্রাবস্থাতেই শশিভূষণ প্রহেলিকাধর্মী পদের পর্দা সরাইয়া তাহার যথার্থ দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করাচার্য-কুমারিল ভট্টের বৌদ্ধ-বিরোধিতা তদানীন্তন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গোপনচারী করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ চর্যাগীতিকা। তালপাতা ও তুলোট কাগজে লেখা বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন পুঁথিতে মহাযান শাখা হইতে উদ্ভূত এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কৃত্য, আচার ও দর্শনের কথা লেখা আছে—কখনও 'সন্ধ্যাভাষা'র ('সন্ধাভাষা') ধূমল আবরণের ছদ্মবেশে, কখনও-বা তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় গৃহীত দেবভাষার সাহায্যে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সিদ্ধাচার্যেরা কিছুমাত্র সতর্ক ছিলেন না। তাঁহাদের এই সমস্ত সংস্কৃত রচনায় সমাস সন্ধির নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে, ষত্ব-ণত্ব, বিভক্তি-প্রত্যয় ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহারা এমন উদাসীন ছিলেন যে, একালের সংস্কৃত পাঠার্থী বালকেরাও লজ্জা পাইবে। সেই সমস্ত পুঁথির কিছু আছে এসিয়াটিক সোসাইটির হেফাজতে, কিছু আছে প্যারিসের 'বিব্লিওথেক ন্যাশনেলে', কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। ভারতে বরোদা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধ তন্ত্রের কিছু কিছু পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

শশিভূষণ কিছু মূল পুঁথি, কিছু মূলের 'ফোটোগ্রাফ', কিছু-বা মুদ্রিত পুঁথি লইয়া এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করিলেন। বস্তুতঃ চর্যাগীতিকা ও দোঁহার যথার্থ স্বরূপ ও তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাহিত্যের বিপুল জঞ্জাল ঘাঁটিতে হইবে নিরঙ্কুশ ধৈর্যের সঙ্গে—একথা তিনি তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজটি যে কী অসাধারণ পরিশ্রমসাধ্য তাহা এ পথের পথিকেরা কিঞ্চিৎ অবগত আছেন। এ বিষয়ে ইদানীং দেশে-বিদেশে কিছু-কিছু আলোচনা হইতেছে; কিন্তু আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই তত্ত্বদর্শনের তিনিই ছিলেন একমাত্র গবেষক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য অধিগত করিয়া ফেলিলেন। এম. এ. পাস করার পর দুই বছরের মধ্যে তাঁহার প্রথম গবেষণা *An Introduction to Tantric Buddhism* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিল (১৯৩৭)। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক বাধার

* এই প্রবন্ধের শেষে শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচনা দিব তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে অনেক পরে—১৯৫০ সালে। অবশ্য এটি প্রকাশের কিছু পূর্বে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য লেখা তাঁহার *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৪৬)। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তত্ত্বসন্ধানী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা শশিভূষণের বিপুল পরিশ্রম ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। দুরূহ তত্ত্বপূর্ণ এই গ্রন্থ দুইটি পরিপক্ক প্রবীণ বয়সের রচনা নহে, একথা ভাবিতেই বিস্ময় জাগে।

প্রথম গ্রন্থে শশিভূষণ তান্ত্রিকতার স্বরূপ নির্ধারণপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, তন্ত্রাচার ব্রাহ্মণ্য সাধ্যসাধনার মতো বৌদ্ধ দার্শনিকতাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বরং বৌদ্ধতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও জটিলতা ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের চেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পর্ক, একের উপর অপরের প্রভাব। মূল বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে তন্ত্রের খিড়কীপথে বহমান রহস্যময় যান-উপযান, মন্ত্রযান ('মন্ত্র-নয়'), বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি উপদর্শনের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ ইত্যাদি দুরূহ ব্যাপারে নিযুক্ত তরুণ শশিভূষণ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে ঘৃণা-নিন্দার হাত হইতে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পূর্বে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু শশিভূষণ বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের পক্ষ হইতে বহুনিন্দিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপসম্প্রদায়ের কৃত্য, চর্যা ও দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেন এবং এই গোপনচারী ও রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের বিচিত্র তত্ত্বকথা ও বিচিত্রতর সাধনপ্রণালীর প্রতি সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের প্রথম বিষয়—হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধরনের সম্পর্ক ছিল, এবং বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দু তন্ত্রেরই কোন অবাচীন শাখা কিনা সে বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান। এই বিষয়ে বহু মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অসংখ্য পুঁথি হইতে নানা তথ্য উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইলেন—তন্ত্র ও তন্ত্রচর্যা ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দুসমাজের একচেটিয়া কারবার নহে। আধি-মানসিক সংস্কারকেও যে দেহাধারে উপলব্ধি করা যায়, তন্ত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় সাধনা তাহারই দিঙ্‌নির্দেশ করিতেছে। বৌদ্ধ মহাযান শাখার বিভিন্ন উপশাখা কীভাবে হিন্দুতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, শশিভূষণ তাহারই 'অবজেকটিভ স্টাডি' করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে তন্ত্রসম্বন্ধে নানাধরণের বিরক্তি জমিয়া উঠিতেছিল। তন্ত্রের 'ভুক্তি-মুক্তি'র তত্ত্ব হইতে অচিরে 'মুক্তি' খসিয়া পড়িল এবং ক্রমে মুক্তির স্থানলাভ করিল 'ভুক্তি'। 'পঞ্চ মকার', নাদবিন্দুসাধন, প্রজ্ঞা-উপায়ের যুগনদ্ধরূপ—ইত্যাকার ব্যাপারের ফলে বাহিরের দিক হইতে লালসার লোলতা যেভাবে বিরাসাকে উদগ্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে এ মতবাদকে শ্রদ্ধা করা কঠিন। তন্ত্র কোথাও 'পর্ণোগ্রাফি', কোথাও কামসংহিতা, কোথাও-বা ভোগায়তন দেহের উদ্দাম বর্ণনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাই ব্যক্তিগত অভিরুচিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া তন্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। শশিভূষণকে এই 'ক্ষুরস্য ধারা'-র উপর দিয়া অতি সাবধানে চলিতে হইয়াছে। তন্ত্রের মূলতত্ত্ব, তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ, সাধ্য-সাধনায় তন্ত্রের প্রয়োগ, বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব ও নির্বাণের স্বরূপ নির্ণয়ে তন্ত্রের সহায়তা, পরবর্তীকালে মহাযানের উপশাখা সমূহের দার্শনিক ভূমি প্রস্তুতিতে তন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে শশিভূষণের মৌলিক অনুসন্ধান গবেষণাক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেইদিক হইতে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে শশিভূষণের *An Introduction to Tantric Buddhism* একখানি উৎস-গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইবে।

উল্লিখিত গবেষণাগ্রন্থে দেখা যাইতেছে, চর্যাগীতিকার দার্শনিক পটভূমি বিচার করিতে গিয়া শশিভূষণ ছাত্র-জীবন হইতেই বৌদ্ধধর্মের শেষপর্বের রূপান্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়ের

CENTRAL LIBRARY

মহাসমুদ্রের মতো রত্নগর্ভ চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া এবিষয়ে শশিভূষণেরও কৌতূহল জাগ্রত হয়। সুরেন্দ্রনাথের দীপশিখা হইতে শশিভূষণ নিজের অন্তর প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের গবেষণালব্ধ সূত্রের সাহায্যে অধিকতর ব্যাপক পটভূমিকায় তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা-সম্পর্কিত উক্ত গবেষণাগ্রন্থটি ১৯০৭ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ঐ বৎসরেই তিনি ইহার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু এতবড় গুরুতর কর্ম সম্পাদনের পর তিনি ক্ষণমাত্র বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ১৯০৯ সালের মধ্যেই আর একটি দুরূহ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করিলেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের দুই বৎসরের মধ্যেই পি-এইচ. ডি. উপাধিলাভের জন্য *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* রচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিলেন (১৯০৯) এবং অচিরে (১৯৪০) উক্ত বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই শশিভূষণ প্রবীণতার জ্ঞানগৌরবে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। পূর্বের গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং ঈষৎ সীমাবদ্ধ-ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম চালাইয়াছিলেন। উপরন্তু উক্ত আলোচনাটি অ্যাকাডেমিক ও দার্শনিক ধরণের হইয়াছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল অল্প। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে আলোচনা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত হইল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য পুঁথিপত্রের ধূলিধূসর কলেবর ঝাড়িয়া মুছিয়া শশিভূষণ সেকালের বাঙালী-জীবনের এক গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন।

বিবিধ, বিচিত্র ও রহস্যবাদী 'কাল্ট্' (cult) এবং নানা উপসম্প্রদায়ের বিচিত্রতর অধ্যাত্মচেতনা, সংস্কার, অভিমানসের ব্যঞ্জনা, আচার-আচরণের দুর্জ্ঞেয় টটেম (totem) তত্ত্ব প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক ব্যাপার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কারকে যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, অস্ট্রোলয়েড, হোমো-আলপাইন, প্রোটো-নর্ডিক, মেলানিড, ইণ্ডিড প্রভৃতি নানাবিধ জন-সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে পূর্বভারতে যে বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, চলতি কথায় তাহাকে বলে বাঙালী জাতি। কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই মিশ্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক কটাহে। আকারে-আয়তনে বাঙালী উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সদাসর্বদা গঙ্গা-যমুনার মতো দুইটি পৃথক্ ধারা দেখা যায় না। গাত্রবর্ণে, আয়তনে, নাসাকর্ণের মাপে এবং মুণ্ডের গোলত্বে অনেকসময়ে নৈকষ্যকুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে জল-অচল অন্ত্যজবর্ণের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। মহাকালের সূপশালায় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ইতর-ভদ্র, জলচল ও জল-অচল—সমস্ত বিচিত্র ও বিপরীত নরগোষ্ঠী একসঙ্গে 'সূপক্ক' হইয়াছে। তাহারই নাম বাঙালী জাতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা ও ভিত্তিভূমি বিচার করিলে দেখা যাইবে, দুইটি বড়ো বড়ো সংস্কৃতির ধারা বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে সুগ্রথিত করিয়াছে। একটি আদিম জীবনধারা, আর-একটি পরবর্তিকালে-অর্জিত ইন্দোয়ুরোপীয় ভাবাবশেষবাহী (অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থরাজি) ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা। মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, শিবায়ন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ভবানন্দের 'হরিবংশ' (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রভৃতি কাব্যে আদিরসের উল্লাস, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল-বাউল, সাঁইগুরু, কর্তাভজা প্রভৃতি রহস্যবাদী সাধকদের যৌন প্রতীক আশ্রয়—এগুলির মধ্যে সেই আদিকালের জীবনচেতনা অস্পষ্টভাবে রহিয়া গিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত-গীতিসাহিত্য—ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যের পরিশ্রুত ধারাও আছে। কিন্তু কালক্রমে এই দুই বিভিন্ন প্রবাহ এমনভাবে একাকার হইয়া গেল যে, পরে তাহাদের পৃথগ্‌ভাবে চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। কিন্তু বাহিরের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেই সেই পুরাতন রূপের

CENTRAL LIBRARY

আভাস পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে যেসমস্ত লোকধর্ম (অর্থাৎ আদিম সংস্কারের ধ্বংসাবশেষ এবং পুরাতন যুগের যৎসামান্য) বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার মধ্যেই এজাতির পৈতৃক সংস্কারের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। শশিভূষণ বাঙালীর সেই পরিচয় আবিষ্কারের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মৃত্তিকা-খননকার্যে একাকী প্রস্তুত হইলেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে বাঙালীর সে-কুলপরিচয় আবিষ্কার করা যাইবে না। সকলের উপর ক্রান্তদর্শী সাহিত্যবোধ না থাকিলে বাঙালী-চেতনার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের স্থলে শুধু 'পাণ্ডুয়া প্রমাণ' আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিবে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শাখার সঙ্গে শশিভূষণ গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। আবার অপরদিকে সাহিত্য সংক্রান্ত সহজাত রসবোধ তাঁহার সমস্ত চেতনাকেই নিয়ন্ত্রিত করিত—এই ব্যাপারে তাঁহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই চলে। তাঁহার পূর্বতন গ্রন্থে দেখা যাইতেছে যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের রহস্যাচার ও দুর্জ্ঞেয়তাকে তিনি বুদ্ধির সীমার মধ্যে অবধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে সেই চারিটির সাহায্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল স্বরূপ বিশ্লেষণের নিপুণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে।

Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature-এ চর্যাগীতিকা ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল সম্প্রদায়, নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য, ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল কাব্য—মোট পাঁচটি প্রধান উপধর্ম শাখা, তাহাদের দর্শন, কৃত্য ও সাহিত্যরূপ লইয়া শশিভূষণ সবিস্তারে গবেষণা করিয়াছেন। অবশ্য সাহিত্যের রূপ ও রীতি অপেক্ষা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বালোচনাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক আদর্শ এবং অপৌরাণিক—গ্রাম্য, অপ্রচলিত ও রহস্যভারাতুর বিশ্বাস—উভয় রীতিই এ-সমস্ত উপসম্প্রদায়ে স্বীকৃত হইয়াছিল। শশিভূষণ এই সময়ে গুরুমুখী ও দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে অতিতরুণ বয়সেই বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের বশে রহস্যবাদী উপসম্প্রদায়ের তুচ্ছ সাহিত্য-নিদর্শনকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার এবং পৌরাণিক তান্ত্রিক ও বৌদ্ধসংস্কারের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে বাঙালীর অভিনব মানসপ্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে। সাহিত্যের পশ্চাদ্‌-পটে অবস্থিত বাঙালীর মিশ্র চিত্তপ্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য ভবিষ্যতের পণ্ডিত সমাজ শশিভূষণকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ দিবেন।

৩

ইহার পর আমরা শশিভূষণের অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থের মধ্যে মোট দুইখানি গবেষণা পুস্তকের উল্লেখ করিব। এইগুলি তাঁহার প্রবীণ জীবনের প্রথম ভাগে রচিত। তন্মধ্যে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে' এবং 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থ দুইখানিতে তাঁহার পরিপক্ক বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থটি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই একটি অতিমূল্যবান গবেষণাকর্ম বলিয়া বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। রাধা চরিত্রের মূল বেদে না পুরাণে, অথবা অর্বাচীন কালের লোকসাহিত্যে প্রোথিত, তাহা লইয়া ইতিপূর্বে নানা তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু এই বিচিত্ররূপিণী নারীচরিত্রের মধ্যে যে একটি বিশেষ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শশিভূষণ সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ মন্থন করিয়া রাধা চরিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহারই সঙ্গে 'রাগাত্মিকা' ভক্তিধর্মের প্রভাবে সাহিত্যের বিকাশ-পরম্পরাকে নূতনভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

রাধাতত্ত্বের মূলকথা শক্তিতত্ত্ব। বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে তাই গোত্রগত সম্পর্ক আছে—যদিও আপাত-দৃষ্টিতে তাহার সবটা ধরা পড়ে না। বাংলাদেশের মধ্যযুগে বাঙালীসমাজ দুই নারীর ভজনা করিয়াছিল। একজন রাধা—যিনি কুলত্যাগিনী; ভাববৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লোকেই তাঁহার নিত্য অভিসার। ইহা যেন অনন্ত সৌন্দর্য ও অনশ্বর প্রেমের সন্ধানে উধাও হইবার রোমান্টিক অভীপ্সা, বিজ্ঞানের ভাষায় 'সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স' (Centrifugal force)। আরজন উমা—যিনি কুলকন্যার প্রতীক। উমাপার্বতীর মধ্য দিয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি ঘরের মেয়ের রূপ ধরিয়াছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পারি-'সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স' (Centripetal force)। বাঙালীর চিত্তগহনে এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে সুপ্রাচীন কাল হইতে। সেই তত্ত্বের পটভূমিকায় শশিভূষণ রাধাতত্ত্বকে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাধাতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্বসাধ্যসার হইলেও শশিভূষণ সমগ্র ভারত ঐতিহ্যের আদর্শেই এই তত্ত্বের বিকাশ আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাধাতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কিশোরী-ভজনের অতিগূঢ় দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে, সমগ্র ভারতের প্রায় যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তসম্প্রদায়ের নানা শ্রেণী, শাখা ও প্রস্থানের বিবরণ দিয়া এই বিচিত্র 'কাল্ট' (cult)-এর দার্শনিক ভিত্তিভূমি এবং তাহার সঙ্গে অন্বিত হইয়া আছে যে বিশেষ ধরণের সাধ্যসাধন তত্ত্বকথা—তাহাকে শৈব ও বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমিকায় নবরূপে আবিষ্কার এবং তাহার যথাযথ মূল্য বিচার করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে নিজ ভাব-ভাবনা ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

> 'বৈষ্ণবধর্মের লীলাবাদ—বিশেষ করিয়া রাধাবাদ—আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক। ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমাদের মনকে নাড়া দিয়াছে, সুতরাং জিনিসটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি—সেই লক্ষ্য নূতন তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে। জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে পাইয়াছি রাধাবাদের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়। ব্যাপকভাবে সে বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শক্তিবাদে।' ('শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে,' প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

সমগ্র ভারতীয় মানস, বিশেষতঃ বাঙালীর অধিমানস, রাধাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কীভাবে রসসাহিত্যে ও মননসাহিত্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, কখনও আবেগকে, কখনও চিন্তাকে, কখনও উভয়কে প্রভাবিত করিয়া যুগপৎ ধর্মসাধনা ও সাহিত্যসাধনাকে নব নব বৈচিত্র্যের সম্মুখীন করিয়াছে, শশিভূষণের এই গ্রন্থে সেই জাতিগত ঐতিহ্য-সাধনাটি গবেষণার আধারে বিবৃত হইলেও আসলে শিল্পীর রসসংবেদনই তাঁহাকে এই কষ্টসাধ্য কর্মে প্রেরণা দিয়াছে।

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব (রাধাবাদী)—এই শাখাত্রয় যে মূলতঃ একই ভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সে-ভাবটি আদ্যা-শক্তির কায়ব্যূহ, এই তত্ত্ববাদ—ইহাকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় গবেষণার আকাশে তিনি একটি উজ্জ্বল তারকারূপেই স্বীকৃত হইবেন। তাঁহার এই গ্রন্থটির সর্বভারতীয় মর্যাদা ও ব্যাপক প্রসার অন্য প্রদেশ বা দেরও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছে। তত্ত্বদর্শনের দিক হইতে গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের যে রাখী-বন্ধন হইয়াছে, ইহার সমস্ত গৌরব শশিভূষণের প্রাপ্য—যদিও এই নীরব ও নিরলস কর্মযোগী কোনও খ্যাতিগৌরব কামনা করেন নাই। যে-কোন আত্মপ্রচারের প্রতি তাঁহার স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্য ছিল। তাই এই মহাগ্রন্থ তাঁহাকে যে কতটা গৌরবের অধিকারী করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন কৌতূহল ছিল না। এখন তিনি দিব্যধামবাসী। সুতরাং আজ এ-কথা বলিতে কোনও সঙ্কোচ নাই যে, ইদানীং গবেষণার নামে যে গুরুভার তথ্যপুঞ্জ ক্রমেই বিকটাকার লাভ

CENTRAL LIBRARY

করিতেছে, তাহার তুলনায় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের জর্মানপণ্ডিতসুলভ এই বিপুল সৃষ্টি আগামীযুগের মননের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচিত না হইলে শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের যথার্থ সম্পর্ক ধরা পড়িত না। অবশ্য এটি গবেষণাগ্রন্থ হইলেও রসজ্ঞ পাঠক এই গ্রন্থ হইতে শুধু 'জ্ঞান-নিষ্ফল'-ই নহে, তাহার সঙ্গে মানসিক আরামও পাইবেন প্রচুর। একাধারে 'Literature of power' এবং Literature of knowledge'-এর চমৎকার সমন্বয় ইদানীং গবেষণাগ্রন্থে খুব অল্পই চোখে পড়িবে। এই একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা অবলীলাক্রমে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের তত্ত্বসাগর পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি। কাঞ্চী-কেরল-অঙ্গ-হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী-কোশল-বিদেহ পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারি, গান্ধার-পুরুষপুর-তক্ষশিলা হইতে ব্রহ্মাবর্ত-আর্যাবর্ত পরিক্রমাতেও বাধা নাই। পরিশেষে অঙ্গ-দ্বারবঙ্গ-তীরভুক্তি পার হইয়া গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম-সমতট-হরিকেল-প্রাগজ্যোতিষ পর্যন্ত একই অয়নরেখাকে অনুসরণ করিতে পারি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে আধুনিক যুগের রাজনীতিসর্বস্ব স্বদেশানুরাগমূলক রাষ্ট্রিক ঐক্যচেতনা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী বিশেষ-বিশেষ ধর্মচেতনা, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আধিমানসিক সত্তাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা শশিভূষণের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' হইতেই প্রতিভাত হইবে। মোট কথা, এই গ্রন্থ তত্ত্বদর্শন ও সাহিত্যরূপে যতটা মূল্যবান, ভারত-ঐতিহ্যের স্মারকসূত্র হিসাবেও ততটা মূল্যবান।

৪

শশিভূষণের বহুখ্যাত ও পুরস্কারে সম্মানিত গবেষণাগ্রন্থ 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' ১৩৬৭ সনের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্বের গ্রন্থেরই পরিপূরক। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' আলোচনাপ্রসঙ্গে শশিভূষণ ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার মূলপ্রকৃতি যে শক্তিকেন্দ্রিক, সেবিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হন এবং সেই নিরিখে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তত্ত্ববাদ, দর্শন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শাক্ত তত্ত্বকথা এবং শাক্ত সাহিত্যকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রথমে তিনি প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দর্শন ও সাহিত্যে শক্তিদেবীর স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কীভাবে আদ্যাশক্তিরূপে উমাপার্বতীর আবির্ভাব হইল, কেমন করিয়া ইতিহাস ও জনমানসের নানা স্তর পার হইয়া শিবের অর্ধাঙ্গিনী বাংলা দেশে এক বিচিত্র রূপলাভ করিলেন—শশিভূষণ এই গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত এবং চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। রামায়ণাদি অনুবাদ-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যাদিতেও শক্তিদেবতার বিকাশ হইয়াছে। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের পার্বতী-চণ্ডী-দুর্গা অভয়ার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ বাঙালীর আদিম আরণ্য সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে হরপার্বতীর উপাখ্যান আছে যাহাতে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের বাস্তব চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে নিজ পূজা প্রচারের জন্য দেবীকে বিশেষ তৎপর হইতে দেখা যায়। এই কাব্যে প্রয়োজন স্থলে তাঁহাকে নির্মম হইতে হইয়াছে, পূজালাভের জন্য কিছু নীচতাও আশ্রয় করিতে হইয়াছে। ইহা আদিম মনের লক্ষণ। একদা নিষাদ ও পাহাড়ী জাতির মধ্যে পশু-অধিষ্ঠাত্রী এবং কান্তারবাসিনী কোন-এক শিকারের দেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে এবং পৌরাণিক যুগে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রাক্কালে এই অরণ্যবাসিনী আদিম-দেবীকে আদ্যাশক্তিরূপে গ্রহণ করা হইল। ইহার উপর পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের পালিশ পড়িলেও এই দেবীর পরিকল্পনায় আবেতর বৈশিষ্ট্য জড়িত ছিল। লোভ, স্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা—এগুলি মঙ্গলকাব্যের চণ্ডিকাচরিত্রে নিতান্ত অপ্রতুল নহে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শাক্তসাহিত্য মঙ্গলকাব্যের অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া আর-একটি শাখাপথ খনন করিয়া

CENTRAL LIBRARY

লইল। ইহা শাক্ত গীতিকা। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃতন্ত্রের ভক্তসাধক ও কবিগণ মঙ্গলকাব্যের শক্তিকেই মাতৃরূপে দেখিলেন, আপনাকে অসহায় শিশুর মতো কল্পনা করিয়া সর্বশক্তিময়ীর অঞ্চলতল আশ্রয় করিলেন।

বহুকাল ধরিয়া বাংলাদেশ তন্ত্রের দেশ বলিয়া পরিচিত। বেদগোপ্য সাধনায় শিরঃস্থিত সহস্রারের সহস্র-দলে শিবশক্তির সামরস্যসম্ভূত দিব্যানন্দ লাভ করা, পিণ্ডদেহেই মোক্ষপ্রাপ্তি, ভুক্তি-মুক্তিকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া—তন্ত্রসাধনার ইহাই প্রচলিত রীতি। এদেশের তন্ত্রসাধকেরা গুরুশিষ্যানুক্রমে মন্ত্রগুপ্তির রীতিতে ইহাকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এখানে-ওখানে তন্ত্রাচারের যৎসামান্য উল্লেখ থাকিলেও এই তত্ত্বকথা ও কৃত্য এই যুগের সাহিত্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে নাই। কিন্তু উমাপার্বতী ও মেনকাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সাধক ও ভক্তসমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—যদিও শাক্ত কবি-সাধকগণ কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যের ভারতব্যাপী ঐতিহ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য শশিভূষণ অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষায় রচিত কাব্য ও গান হইতেও অনেক উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যকে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নানা অঞ্চল হইতেই এই তত্ত্বদর্শনের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য বাংলার শাক্তসাধনা ও শক্তিসাহিত্যই তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয়। কারণ ভারতের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রের একটি বিশেষ সাধনপ্রণালী যেমন দীর্ঘদিন ধরিয়া বিকশিত হইয়াছে, তেমনি আদ্যাশক্তির মানবীমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার ভক্তিসাহিত্য (মূলতঃ গীতিসাহিত্য) বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। বাৎসল্যভাব এ ভক্তির মূল উপাদান। মাতাপুত্রের মানবীয় লীলা এই ভক্তিশাখার আলম্বন-বিভাব। বৈষ্ণব সাধ্যসাধনার আদিরসাশ্রিত সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা পরবর্তিকালে অনধিকারীর হস্তক্ষেপের ফলে অমেধ্য গৌড়ীয়রায় পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাক্ত ভক্তিসাধনার সেইরূপ কোনও বিকার দেখা দেয় নাই। কারণ মাতা-পুত্রের চিরপবিত্র বাৎসল্যরসের সম্পর্ক কোনওপ্রকারেই বিকৃত হইতে পারে না।

শশিভূষণ তথ্য, তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদান হইতে শাক্ত-দর্শনের মূল রহস্যের সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষয়টিকে তিনি কোন্ দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে দেখিয়াছেন, সেইপ্রসঙ্গে উক্তগ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন :

> 'বিষয়টির দুইটি দিক রহিয়াছে ; একটি ঐতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্মিক সকল সত্যকে অস্বীকার করিতে হইবে এমন কথার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না·····ঐতিহাসিক দৃষ্টির উপরে যাঁহারা জোর দিতে চান তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্যঘটনা দ্বারা সে জাগাইয়া তোলে ভাবব্যঞ্জনা ; সেই ভাবব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্মদৃষ্টির রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনাই সত্য—মানুষের চিত্তভূমিতে তাহার যতরকমের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা করি এমন কথা কোন ঐতিহাসিকই বলিবেন না। আবার যাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপরেই জোর দিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্ম সত্য যদি নিত্য এবং পূর্ণও হয়, তথাপি কালে কালে যে-সব তথ্যের ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ, তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে পারি না।' ('ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য,' প্রথম সংস্করণ,—নিবেদন')

CENTRAL LIBRARY

এখানে তিনি তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতির কথা সুস্পষ্টভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। শাক্ত ভক্তির যেটুকু 'সাধনসমর', সেটুকু ব্যক্তিসাপেক্ষ; আর বাকি অংশটুকু বস্তুপ্রবাহের উপরেই ভাসমান। সুতরাং এই সাধনার যেমন একটি দেশকাল-নিরপেক্ষ নির্বিকল্প সত্তা আছে, তেমনি এই বিবর্তনের পিছনে দেশকালের প্রভাবও অল্প নহে। এই দুইয়ের যুক্তরূপ দর্শনই যথার্থ তাত্ত্বিক ও গবেষকের দৃষ্টি। শশিভূষণ শাক্ত ভক্তিবাদ ও দর্শনকে যেমন অধ্যাত্ম-মার্গের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন, তেমনি আবার আর পাঁচটি বিকাশধর্মী চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। তত্ত্বদর্শন ও ইতিহাস দর্শন তাঁহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অধিকতর স্বচ্ছ করিয়াছে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহার এই গ্রন্থ একটি বিশেষ দিঙ্‌নির্দেশক বলিয়া গৃহীত হইবে।

উপরে আমরা শশিভূষণের যে প্রধান চারিখানি গবেষণা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, সেগুলি ছাড়াও সাহিত্যবিচার, অলঙ্কার শাস্ত্র, হিন্দুধর্মের গঠনপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। আসলে তাঁহার মনের বাতায়ন সব সময়ে খোলা থাকিত। সেই বাধাহীন পথে নানা চিন্তা ও তত্ত্বকথা অবাধে প্রবেশ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে 'দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুর্দান্ত সিদ্ধান্তে' নিমগ্ন ভীতিকর গবেষক বলাও ঠিক হইবে না। গবেষণাকে কৌতূহলের রসে মিশাইয়া পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়া দিয়া তিনি আধুনিক কালে তত্ত্বগ্রন্থের একটি বিচিত্র মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন।

অকালে শশিভূষণ বিদায় লইয়াছেন, আকস্মিকভাবে মৃত্যুদূত আসিয়া তাঁহার কর্মোদ্যমে ছেদ রেখা টানিয়া দিয়াছে। 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্তসাহিত্যে' তিনি দক্ষিণ ভারতের শক্তিসাধনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ পান নাই। কারণ এই বিষয়ে ইংরাজীতে কিছু কিছু আলোচনা হইলেও তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সবটা নির্ভরযোগ্যও নহে। যে তথ্যগুলি second hand উৎস হইতে পাওয়া যাইতে পারিত, তিনি তাহার উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> 'অন্ততঃ তথ্যগুলি যাচাই করিয়া লইবার মত কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় অধিকার থাকিলেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম; কিন্তু তাহাও নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ধার করা তথ্য অবলম্বনে আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার সঙ্কল্পও পোষণ করিতেছি।' (ঐ)

তাঁহার এই মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষা শিখিয়া তিনি ঐ ভাষায় রচিত শাক্ত-সাহিত্য ও শাক্তদর্শন পাঠ করিবেন এবং পরে তাঁহার রচনায় দক্ষিণ-ভারতীয় উপাদান সংযুক্ত করিবেন—এই ছিল তাঁর মনোগত অভিলাষ। কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিল না, এ গ্রন্থের ক্রোড়-অঙ্ক কোনও দিন অভিনীত হইবে কিনা কে বলিতে পারে?

৫

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে শশিভূষণ চর্যাগীতিকার এক মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' বিভাগের সংস্কৃতের অধ্যাপক আরনল্ড বাকে ছিলেন গানপাগল। রবীন্দ্রনাথের দ্বীপময়-ভারত পরিক্রমার সাথী বাকে সাহেবের কথা অনেকের মনে পড়িবে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও অনুরাগী বাকে এক নেপালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বিচিত্র গান শুনিয়া তাহাকে লোকসঙ্গীত মনে করেন এবং সেই সন্ন্যাসীর অনেকগুলি গান টেপ-রেকর্ড করিয়া লন। লণ্ডনে তিনি শশিভূষণকে সেই গানগুলি শুনাইয়াছিলেন। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন, লণ্ডনে

CENTRAL LIBRARY

বসিয়া ভারতীয় লোকসঙ্গীত শুনিয়া ডক্টর দাশগুপ্ত খুশি হইবেন। শশিভূষণ নিশ্চয় খুশি হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারও চেয়ে কৌতূহলী হইয়াছিলেন বেশী। গানগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, ইহাই তো অতি পুরাতন বজ্রযানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভজনগীতিকা। বাকে সাহেবের কাছে তিনি এই শ্রেণীর বাইশটি গানের সন্ধান পাইয়াছিলেন—যাহার মধ্যে অন্ততঃ চার-পাঁচটি গানে হাজার বছরের পুরাতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাগীতিকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাঁহার আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর একটি গানের উল্লেখ করা যাক :

এ মহিমণ্ডল হেঙ্গ সমুদ্রা
ধনজনযৌবন উদকবিন্দু চন্দা।
প্রেমুরে অমুস্মিন্ লোয়ন গয়নে
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ লয়া ॥ ধ্রু ॥
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয়া বিষয় সর্ব একা
সমুদ্রতরঙ্গ জিম এক্কু অনেকা।
পবন তুমি ভেদিয়া দৃঢ় থিরে চিআ
জলতি বজ্রানল দহদিহ কাহা।
সুগতি ভণি ভাবয়িয়া না হোয়ি রে স্বধা
সুগতবজ্র ভণয়িয়া অচিন্তালয় বোধা ॥

(শশিভূষণের সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত)

সুগতবজ্রের এই পদটি চর্যাগীতিকারই অনুরূপ। অনেকে মনে করেন, বাংলা হইতে পলাতক চর্যাগীতিকাগুলি নেপালে আশ্রয় লওয়ার পর ইহার কিছু অংশ তিব্বতে চলিয়া যায়, তিব্বতী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়। কালক্রমে হিন্দুধর্মের দাপটে এবং ইসলামের প্রতিকূলতার জন্য এই দেশে প্রকাশ্যভাবে চর্যাগীতিকার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু শশিভূষণ অধ্যাপক বাকে-পরিবেশিত তথ্য হইতে বুঝিতে পারিলেন, এখনও দার্জিলিং, নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধ গুহায় চর্যার অনুরূপ গীতিকার ব্যবহার আছে। নেপালী ভাষায় ইহাকে বলে 'চা-চা' গীত। মনে হয়, 'চা-চা' শব্দ চর্যারই অপভ্রংশ। সেই সমস্ত পুরাতন তথ্য উদ্ধারের জন্য শশিভূষণ দেহে কালব্যাধিভার লইয়াও সেখানে গিয়াছিলেন এবং চর্যার আধুনিক উপাদান-সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানের উপশাখা বজ্রযান ও সহজযানের সাধনভজন বিষয়ক গীতিকা হইলেও পরবর্তিকালে ইহাতে ব্রাহ্মণ্য শাক্ততন্ত্রের প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে এবং তাই এই সমস্ত আধুনিক পদের অনেক স্থলে বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে শাক্ততন্ত্রের অনেক তত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে। 'নৈরামণি'-কে উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডিকায় পরিণত করিতে ভক্তসাধকদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই।* 'বাঙ্গলী শ্রীবজ্রযোগিনী' কোন কোন চা-চা গীতে (চর্যাগীতে) প্রায় শাক্ত মাতৃকা-মূর্তিতে পর্যবসিত হইয়াছেন। নিম্নে এইরূপ একটি বজ্রযানী-শাক্তভাবমিশ্রিত পদের উল্লেখ করা যাইতেছে :

* ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত নবচর্যাগীতিসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই পদসংগ্রহে দেখা যাইতেছে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী এবং তাহার পরে রচিত বলিয়া অনুমিত পদগুলিতে 'নৈরামণি', 'ঘোইনি', 'বাঙ্গালি', 'বজ্রবারাহী', 'বজ্রযোগিনী' প্রভৃতি বজ্রযানী দেবীরা ক্রমে ক্রমে দেবী কালিকায় পরিণত হইয়াছেন। যথা :

করোটি খর্পর ছেদানি মুকুটকেশা দিগম্বরা
মুণ্ডমালা খট্টাঙ্গমণ্ডিতা লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা।

(শশিভূষণের সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত)

CENTRAL LIBRARY

বারাহিবে স্থিত ত্রিদলসরোজা দিনকরমণ্ডলমধ্যস্থিতা।
রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মুক্তকেশা দিগম্বরা ॥ ধ্রু ॥
প্রণমামি বাজ্ছলী শ্রীবজ্রযোগিনী অনুত্তর-বোধি-প্রদায়িনী।
দ্বিভুজ একমুখ ত্রিনি লোচনা লৌহিত বর্ণ প্রজ্জ্বলিতা ॥
ত্রিভুবনব্যাপিনী দহিন করোটীধারী মজ্জপূরিত কপালধারী।
চক্রী-কুণ্ডল-কণ্ঠিধারী হাথে লোচক বিভূষিণী ॥
চরণে নৌপুর দহিণ কটিয়ে মেখলা নরশিরমালা বিভূষিতা।
বিশ্বজননী পরম গুহ্যেশ্বরী ভবভয়তারিণী বীরেশ্বরী
সহজানন্দ স্বরূপিণী দেবী সিদ্ধি সিদ্ধি চরণপ্রসাদদায়িনী।

শশিভূষণ মনে করিয়াছিলেন, হয়তো এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ সহজিয়া মত ও শাক্ত-মতের এক বিচিত্র রসায়নের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে এবং বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা সম্ভব হইবে। খ্রীঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বিশেষ কোন বাংলা গ্রন্থ হস্তগত হয় নাই। অথচ তাহার পূর্বে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহার যৎসামান্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। অসুস্থ শরীরেই শশিভূষণ পদগুলির ভাষা ও বক্তব্য বিষয় ধরিয়া একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করেন এবং প্রথম দিকে অল্প কয়েকটি পদে পাঠান্তর ও টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত করিয়া নব-আবিষ্কৃত পদগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অভিলাষ করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত এই গীতিকাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বস্তুতঃ বন্ধ্যা নহে, খুব সম্ভব বজ্রযানী ও সহজযানী চর্যাগান এই দুই শতকে এবং তাহার পরেও অনুশীলিত হইয়াছিল। এইভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিল না, মৃত্যু আসিয়া যবনিকা টানিয়া দিল। জানি না, এপথে আবার কোন্ নূতন পথিক আসিয়া অতীতের বাণীকে মূকত্বের অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।*

* শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত গ্রন্থাদি :

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস; উপমা কালিদাসস্য; এপারে ওপারে; কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্যায়; ঋগ্বেদদর্শন; ঘরে বাইরে সাহিত্যচিন্তা; ছুটির দিনে মেঘের গল্প; ছেলেবেলার বিবেকানন্দ; ছোটদের ছোট গল্প; ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ; ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত; জড়লা মাঠের ফসল; টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ; ত্রয়ী (বাল্মীকি ও কালিদাস, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ); নিরীক্ষা; নিশি ঠাকুরের কড়চা, বাঙলা সাহিত্যের একদিক; বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি; ব্যান ও বন্যা; ভারতীয় সাধনার ঐক্য; ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য (আকাদামি পুরস্কার), মিলটনের অ্যারিওপ্যাগিটিকার অনুবাদ (সাহিত্য আকাদামি প্রকাশিত); রাজকন্যার ঝাঁপি; শিল্পলিপি, শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে; শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে; সাহিত্যের স্বরূপ, সীতা, হারা হলধর; *Aspect of Indian Religious Thought*; *An Introduction to Tantric Buddhism*; *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature.*

সাময়িক পত্রাদি ও নানা সঙ্কলনে ডঃ শশিভূষণের কিছু কিছু রচনা বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। সেগুলি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

CENTRAL LIBRARY

যোগীন্দ্রনাথ বসু

১৮৫৭—১৯২৭

হারাধন দত্ত

সুলেখক ও শিক্ষাব্রতী হিসেবে একদা যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রসিদ্ধি ছিল। উনিশ শতকে প্রতীচ্যশিক্ষার প্রভাবে বাঙালীমানসে যে নব্যসাহিত্য সংস্কৃতির সমারোহ দৃষ্ট হয়—সাধকোচিত নিষ্ঠায় যোগীন্দ্রনাথ আপন চৈতন্যে তা সঞ্চারিত করেছিলেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কে এতাবৎ প্রকাশিত প্রখ্যাসিদ্ধ ইতিহাসে বহু অক্লান্ত কর্মী সাহিত্যসেবীর অনুল্লেখ যথার্থই পীড়াদায়ক। সাহিত্যের সামগ্রিক চলমানতাকে অস্বীকার করে বিশেষ মুহূর্ত ও চরিত্রকে সহনীয় করে তুলতে আমরা কদাচ কার্পণ্য করি না, কিন্তু কার্যতঃ পূর্ণাবয়ব সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে অনেকানেক ব্যক্তি-চরিত্রের বিশ্লেষণে আমাদের অনীহা অপরিসীম। আর বলাবাহুল্য, সেই কারণেই সাম্প্রতিক সাহিত্য চর্চায় যোগীন্দ্রনাথ বসু এক প্রায় বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জাতীয়তাবাদের এক অভূতপূর্ব উজ্জীবন ঘটে। বিচিত্র-ভাব-কর্ম-চিন্তা ও ধর্মান্দোলনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ ভাবতরঙ্গে সেকালের অনেক সাহিত্যব্রতীই জাতীয়তার মন্ত্রে মুক্তিস্নান করেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথের যাবতীয় সারস্বত কর্মের উৎস তাঁর জীবৎকালের এই স্বাদেশিকতা-জাতীয়তা ও ধর্মবোধের মধ্যে অনুস্যূত। তাঁর কবিতা-গল্প-নাটক-শিশুসাহিত্য ও ধর্মবোধক রচনারাজির মধ্যে সাহিত্যের পালাবদলের কোনও নূতন সংকেত না থাকলেও শিক্ষাবিস্তার, চরিত্র গঠন, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের সামগ্রিক পরিপুষ্টির দিক থেকে এগুলি মূল্যবান। আধুনিক বাংলা চরিতসাহিত্যে তিনিই প্রথম শক্তিধর শিল্পী। বলাবাহুল্য গত যুগের সাহিত্য ও শিক্ষাচর্চায় যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন ওতপ্রোত।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যসেবার সামগ্রিক মূল্যায়ন এতাবৎ হয়েছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। তাঁর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের কোনটিই একালে প্রচলিত নয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক সমূহ থেকে তাঁর রচনাদির নির্বাসন অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এমন কি তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩) নামক সেই অসামান্য গ্রন্থখানি সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকায় সাম্প্রতিক সারস্বত চিন্তাচর্চায় যোগীন্দ্রনাথ একপ্রকার বিস্মৃত। তাঁর সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন নয়—বরং সেই সুদুর্লভ জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আপাততঃ লক্ষ্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত, নবজাগৃতির সূর্যালোকে সমগ্র দেশ ও জাতিচিত্ত উদ্ভাসিত। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পদসঞ্চারণই নয়—ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলমোচনের জন্য সমগ্র জাতি-মানস উদ্বেলিত। বাঙালীর স্বরাজ সাধনার সেই প্রথম আত্মঘোষণার লগ্ন এসে গেল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় কাল। সভ্যতার কনকপদ্ম কলকাতা তখন নবজাগরণের পীঠস্থান। কলকাতার নূতন চিন্তা নূতন ভাবনার ঢেউ দূর গ্রাম বাংলার জনপদকে প্লাবিত করেছে—বিঘোষিত হয়েছে নব্যশিক্ষার মন্ত্র। এই বৎসরের ১লা আগষ্ট (বাংলা ১৮ শ্রাবণ, ১২৬৪) ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার 'নিতাড়া' নামক ছোট্ট গ্রামে যোগীন্দ্রনাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিতাইচাঁদ বসু, মাতা বামাসুন্দরী। পিতামাতার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় শিশু যোগীন্দ্রের লেখাপড়া সুরু। পুত্রকে আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী করবেন মাতা-পিতার এই বাসনা। কিন্তু শৈশবেই তিনি দুজনকেই হারালেন। নিরুপায় যোগীন্দ্রনাথ বারাসতে মাতামহ দীনবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে এসে

CENTRAL LIBRARY

উপস্থিত হলেন। মাতামহী ক্ষমাময়ী চৌধুরীর পরম স্নেহচ্ছায় তিনি আশ্রয় পেলেন। দক্ষিণ বারাসত বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁর শৈশব শিক্ষার সূচনা। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রজনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে মাতৃভাষা ও সাহিত্যে অনুপ্রাণিত করেন। বিশুদ্ধ বাংলা লেখার পাঠ নিলেন যোগীন্দ্রনাথ। শৈশব গুরু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ সলজ্জ পদক্ষেপে বঙ্গবাণীর অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। উত্তরকালের যশস্বী সাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথ তাঁর এই শৈশবগুরুকে বিস্মৃত হননি। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিতা প্রসঙ্গ' (১৮৯৯) গ্রন্থখানি শৈশব-পণ্ডিত ব্রজনাথ ভট্টাচার্যের নামে উৎসর্গ করেন।

অল্প বয়সেই সাহিত্যের প্রতি যোগীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ছাত্রজীবনেই সেই অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। ইতিমধ্যে 'বসিরহাট মিউনিসিপ্যাল স্কুল' থেকে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১] এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় প্রেরিত হ'লেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ কলকাতা 'মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন' থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন।[২] আর বি. এ. পাশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে।[৩] অতঃপর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষাতে অবতীর্ণ হয়েও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখেন। এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' উদ্যোগে কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'একশত নবতম' জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কবি পৌত্র ৺অমলেন্দু বসু মহাশয় রচিত একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্র প্রকাশিত হয়। এই প্রচারিত বিবরণ থেকে অবগত হওয়া যায় যোগীন্দ্রনাথ কর্মজীবনের সূচনাতে কিছুকাল রিপন কলেজে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত নিবন্ধেও রিপন কলেজে অধ্যাপনার কথা সমর্থিত হয়।[৪] কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য যোগীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য উদ্ধারের কারণে দেওঘরে উপস্থিত হন। এখানে অবস্থান কালে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যোগীন্দ্রনাথ 'দেওঘর এইচ্. সি ই স্কুলে' প্রধান শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর কর্মজীবনের যথার্থ সূচনা এই দেওঘর বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবনেই অচিরকাল মধ্যে শিক্ষক ও সাহিত্যসেবী হিসেবে যোগীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক স্বাদেশিকতা-জাতীয়তাবোধ ও উগ্র হিন্দুত্ববোধের পুনরুজ্জীবন লগ্নরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত। বাংলার এই উনবিংশ শতাব্দী যেমন একটা বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের যুগ, তেমনই সে যুগ আত্ম-প্রতিষ্ঠার যুগও বটে। এই উপচেতনা যোগীন্দ্রনাথে সংক্রামিত হয়েছিল। দেওঘরের শিক্ষক জীবনেই যোগীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবা সমাজসেবা ও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠেন। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যপুষ্ট বাংলা কবিতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। বিচিত্র বিষয়িণী সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাংলার জাগ্রত স্বাদেশিকতার পরিবর্ধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই সময়েই দুরূহ সমাজসেবাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। সাহিত্য-সমাজ-শিক্ষা ও স্বাদেশিকতার মিলিত ভাবগঙ্গায় যোগীন্দ্রনাথ নিজেকে নিমগ্ন রাখেন।

দেওঘরে অবস্থান কালে যোগীন্দ্রনাথ লোকহিতকর বহুবিধ কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন করেন। দেওঘরে দেশ ও সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর আসন ছিল শীর্ষস্থানে। এখানকার Rajkumari Lepar Asylum নামক কুষ্ঠাশ্রম মূলতঃ

১। The Calcutta University Calendar, 1881-82
২। Ibid 1883-84
৩। Ibid 1886.
৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ), প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৪

CENTRAL LIBRARY

তাঁর প্রচেষ্টার ফল।[৫] তাঁর কর্মদক্ষতা ও একাগ্র সাধনার ফলে প্রতিষ্ঠানটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এখানকার 'সংস্কৃত পাঠশালা' দাতব্য চিকিৎসালয়, শববাহীদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি একাধিক প্রতিষ্ঠান যোগীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থায়ী রূপলাভ করে। যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রবাসী (ভাদ্র, ১৩৩৪), মডার্ণ রিভিউ (আগস্ট, ১৯২৭), মাসিক বসুমতী (শ্রাবণ, ১৩৩৪) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা থেকে এসব বিষয় অবগত হওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেওঘরের এই জনপদে আধুনিক শিক্ষাপ্রসারে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীটির কথা উল্লেখ কালে তাঁর বিদায় মুহূর্তে দেওঘরের গুণমুগ্ধ সুহৃদসমাজ তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছিল 'An educationist and Sanskrit Scholar as you are, you took the loveliest interest in the Baidyanath Sanskrit Pathsala and did your best to establish it on a strong and lasting basis, by your advice, assistance and co-operation (বিদায়কালীন মানপত্র, ৩০ জানুয়ারী ১৯০১)।

গতযুগের কৃতবিদ্য শিক্ষকসমাজে যোগীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বহু কৃতী ছাত্রের মধ্যে দেশপ্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দেওঘর বিদ্যালয়ে সখারাম প্রথমে যোগীন্দ্রনাথের ছাত্র পরে তাঁর সহকর্মী শিক্ষকরূপে অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যোগীন্দ্রনাথের মত সুযোগ্য শিক্ষকের প্রযত্নে ছাত্রজীবনেই সখারামের হৃদয়ে দেশাত্মবোধের বীজ উপ্ত হয়। যোগীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সখারামের মনে শুধু যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই উদ্দীপ্ত হয় তা নয়—বাংলা রচনায় তাঁর হাতে খড়ি হয়। যোগীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই বাংলাভাষা চর্চায় সখারামের অনুরাগের মূল। ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলা ছিল যোগীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহিত্যসেবার মূল লক্ষ্য। বাংলার এই গৌরবদীপ্ত স্বদেশীযুগে শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ রাজশক্তির কোপানলে পড়েন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এ সম্পর্কে লিখেছেন—'মিঃ হার্ড তখন দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার বিরুদ্ধে নানাকথা হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রবাবু ও সখারাম দুজনেরই বাঙ্গলা লেখক অপবাদ ছিল। তাই দুজনেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।'[৬] হার্ড সাহেব ক্ষমতাবলে স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন। গুরু শিষ্যের এই ইংরেজ বৈরিতা সম্পর্কে প্রসঙ্গত আরও দুটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭]

দেওঘরের শিক্ষক জীবন যোগীন্দ্রনাথের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। দেওঘরে অবস্থানকালে আদর্শ শিক্ষক ও বঙ্গসাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ বসু-ভূদেব মুখোপাধ্যায়-গৌরদাস বসাক প্রমুখ মনস্বী পুরুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ঘটে এখানে। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩), নামক তাঁর অমূল্য গ্রন্থখানির উপকরণ তিনি এখানে বসেই সংগ্রহ করেন। দেওঘরের শিক্ষক জীবনেই বাংলা সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় চরিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়ে তাঁর যশোগরিমাকে ব্যাপ্ত করে দেয়। এখানেই দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁকে বিচিত্র সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করেন। যোগীন্দ্রনাথের অহল্যাবাই (২য় সং ১৩০৭), তুকারাম (১৩০৮), শিবাজী (১৩২৫) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সখারামের অনুপ্রেরণার ফল।

৫। Presidency College, Cal. 1927

৬। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সখারাম গণেশ দেউস্কর। আর্য্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

৭। (ক) মহাদেবপ্রসাদ সাহা কৃত ভূমিকা। দেশের কথা (১৯৭৭)

(খ) সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। সখারাম গণেশ দেউস্কর। পরিচয়, ডিসেম্বর, ১৯৭০

CENTRAL LIBRARY

বস্তুতঃ দেওঘরের জীবন যোগীন্দ্র জীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব। পনেরো বৎসরকাল প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করার পর যোগীন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন (৩০ জানুয়ারী, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ)। এই উপলক্ষে তাঁর সুহৃৎ ও গুণমুগ্ধজন তাঁর একাধিক মহত্ত্বের কথা বলতে গিয়া লিখেছেন—'You have been to the boys of your school what the celebrated Dr. Thomas Arnold was to those of his, when he was Hd. Master at Rugby. Like that model teacher you loved not simply of your boys, but also to the development of their moral feelings and spiritual instincts.' (বিদায়কালীন মানপত্র হ'তে উদ্ধৃত)।

তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী পর্ব কলকাতাতে অতিবাহিত হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাবক শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতা ও চরিত্রমাধুর্যে তিনি এই এস্টেটের এক্সিকিউটার পদে উন্নীত হন। এই সঙ্গে একাদিক্রমে তিনি কুড়ি বৎসর চাকুরী করেন। কলকাতা তাঁর সাহিত্য সাধনার দ্বিতীয় বৃহৎ ক্ষেত্র। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক যোগীন্দ্রনাথ কলকাতার এই কর্মক্ষেত্রে বসে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাতৃভাষার অনুশীলন করে গেছেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অন্তহীন। 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজী' (১৩২৫) দু'খানি ঐতিহাসিক মহাকাব্য ও অন্যান্য বহুবিধ সাহিত্য-কর্ম কলকাতার কর্মজীবনে সম্পন্ন হয়। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে নবস্বজ্যমান সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ এক বিশিষ্টতম নাম। এই পর্বেই কবি ও শিশু সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্গসাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিতে'র (১৮৯৩) পর পৃথ্বীরাজ (১৩২২) ও শিবাজী (১৩২৫) মহাকাব্য দু'খানি তাঁর দ্বিতীয় মহৎ সাহিত্য কীর্তি। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের প্রকাশ কাল ১৩১২ বঙ্গাব্দ। এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কাব্যরসিক সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডলী যোগীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজ সংস্কৃত কলেজের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগীন্দ্রনাথকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। এই উপাধি প্রদানের কাল ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ, শকাব্দ ১৮৩৮, সৌর ফাল্গুন চতুর্থ দিবস। কবিভূষণ প্রশস্তিপত্রে স্বাক্ষর-কারী তিরিশজন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রমুখ মনস্বীগণের নাম দেখা যায়। কবি-ভূষণ প্রশস্তিপত্রে লিখিত অংশ এইরূপ—

> 'পৃথ্বীরাজ ইতি প্রসাদমধুরং গম্ভীরভাবং মহাকাব্যং যস্য মহাকবেরনুপমং
> ব্যাপ্নোতি কীর্ত্যা মহীম্, তস্মৈতে কবিভূষণেতি মতিমন্ যোগীন্দ্রনাথাইতে
> প্রীত্যোপাদিরয়ং প্রদীয়ত ইহানীভিঃ সমং গৃহ্যতাম্।'

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার আপাততঃ আমার আলোচনার বিষয়ীভূত নয়—তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে তাঁর রচনারীতির উপর প্রাসঙ্গিকভাবে দু' একটি কথা নিবেদন করতে চাই। যোগীন্দ্রনাথ কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাস ধর্মগ্রন্থ-জীবনচরিত-শিশুসাহিত্য এবং বিদ্যালয় পাঠ্য বহুবিধ পুস্তক রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। সমসাময়িক কালে তাঁর যথেষ্ট কবিখ্যাতি ছিল। তাঁর খণ্ড কবিতা সমূহ বিদ্যালয় পাঠ্য হওয়ায় বহুল প্রচারিত হয়। যোগীন্দ্রনাথের সংকলিত কাব্যগুলির মধ্যে কবিতা প্রসূন (১৮৯৯), আদর্শ কবিতা (১৩০৬ ?), পৃথ্বীরাজ (১৩২২), শিবাজী (১৩২৫), মানবগীতা (১৩২২) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত কাব্যের ভাবনা ও রচনায় নতুন কোনও জীবন বাণী ছিল না। মধুসূদন দত্ত-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিবৃন্দের অভ্যুদয়ে বাংলাকাব্যের যে গতিপথ নির্ণীত হয়—যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই উনিশ শতকীয়

CENTRAL LIBRARY

কাব্য ঐতিহ্যের মুগ্ধ উপাসক। ফলতঃ তাঁর কাব্য চর্চায় কোন উচ্চতর তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না। সমকালীন কাব্য প্রবাহকে গতিশীল রেখে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন। এমন কি যুগান্তকারী মেঘনাদবধ কাব্য অনুসৃতির অনিবার্য ফলস্বরূপ পৃথ্বীরাজ (১৩২২) ও শিবাজী (১৩২৫) নামক যে দু'খানি মহাকাব্য প্রণয়ন করেছিলেন—সেখানেও কোন নূতনতর জীবন সঙ্কেত ছিল না। এমন কি উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকাব্যের যে উৎসমুখ উন্মোচন করেন—যোগীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই কাব্যরীতির প্রভাব বিরল। বস্তুতঃ সুরুচি-সুনীতি-ঈশ্বরানুরাগ-বিশ্বাস সদ্ভাব স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তা কেবলমাত্র তাঁর কাব্যসমূহেই নয়—তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য ছিল। যুগের হিসেবে এগুলি নূতন ছিল না। তথাপি সুললিত গাম্ভীর্যপূর্ণ বিশুদ্ধ ও ভাবগর্ভ বর্ণনায় এই কবি সিদ্ধহস্ত।

যোগীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রহসনমূলক রচনাসমূহ কোন নতুন দিগন্তের বার্তা বহন করে আনেনি। এগুলি নিতান্তই সাময়িক তাগিদে রচিত। তাঁর শিশু ও কিশোর পাঠ্য রচনাসমূহ এদিক থেকে মূল্যবান। বাংলা শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর ছবি ও কবিতা (১৯২৩), দু'খণ্ড রামায়ণের ছবি ও কথা (১৯০৯), ছোট-ছোট গল্প (১৯২৩), ছবি ও কথা (?) বিদ্যালয়-পাঠ্য 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' (১৩১৭) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম এই সূত্রে উল্লেখ্য। তাঁর বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসমূহ এদেশে আধুনিক শিক্ষাপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যোগীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে আধুনিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত। যোগীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস' (১৩১৪) ও 'সরল কাশীরাম দাস' (১৩১৫) গ্রন্থ দু'খানি কিশোরদের উপযোগী করে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। উভয়গ্রন্থে সম্পাদকের বিস্তৃতভূমিকা ছাড়াও দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দসূচী ও অর্থ সন্নিবেশিত আছে। রবীন্দ্রনাথ 'সরল কৃত্তিবাসের' (১৩১৪) ভূমিকায় লিখেছেন—'ইহাতে আমাদের মৃতশিক্ষা প্রাণ পাইয়া উঠিবে এবং যোগীন্দ্রবাবুর এই কীর্তি দেশে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।' তিনি আরও লিখেছেন—'যোগীন্দ্রবাবুর মত লোক একাজের ভার লইয়াছেন শুনিয়া আমি নিজেকে দায়মুক্ত জ্ঞান করিলাম। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সকল চেষ্টাই সফল হইয়াছে। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না। এখন কেবল অপেক্ষা করিয়া রহিলাম তিনি কাশীরামের মহাভারত কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া, বাংলায় শিশুসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবেন।' রবীন্দ্রনাথের এই আশা বিফল হয়নি। যোগীন্দ্রনাথ 'সরল কাশীরাম দাসেও' (১৩১৫) সেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই গ্রন্থে কাশীরামের বিস্তৃত জীবন আলোচনা ছাড়াও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি ভূমিকা আছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যসেবায় যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছেন—'সরল কাশীদাস, সকলশ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী হইয়াছে এবং বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি প্রধান অভাব পূর্ণ করিয়াছে।' পরবর্তীকালে 'কঠোপনিষদে'র (১৩১৯) সম্পাদনা করে যোগীন্দ্রনাথ প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদকরূপে বাংলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করেন।

বাংলাসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সারস্বতকীর্তি—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)। বস্তুতঃ উনিশ শতকের বাংলা চরিতসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ একটি অবিস্মরণীয় নাম। বাংলা চরিত সাহিত্যে তাঁর 'অমর কীর্তি বা ফাদার ডাসিয়েনের জীবনচরিত (১৮৯০), অহল্যাবাই (২য় সং ১৩০৭) ও তুকারাম (১৩০৮) গ্রন্থসমূহ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই চরিতগ্রন্থের সব ক'খানিই উনিশ শতকের শেষদশকে রচিত। 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত' (১৮৯৩) গ্রন্থখানি সম্পর্কে মোহিতলালের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিকভাবে স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন—স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার যে জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্যসেবী বাঙালীমাত্রেই তাঁহার

CENTRAL LIBRARY

নিকট কৃতজ্ঞ ; উক্ত গ্রন্থে—কবির জীবনকাহিনী, সাহিত্যসাধনা ও কাব্যপরিচয় যেরূপ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যসহকারে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থ একহিসাবে আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে।'[৮]

বঙ্গসাহিত্যসেবায় যোগীন্দ্রনাথের এই সাফল্য সমাদৃত হ'তে বিলম্ব হয়নি। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষাসমূহে এম. এ. পরীক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পঠন-পাঠনের বিষয়ীভূত করার এই সিদ্ধান্ত একটা যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা। স্যার আশুতোষের এই মাতৃভাষা প্রীতি বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার পরবর্তী অধ্যায়কে গৌরবমণ্ডিত করে তুলেছে। বাংলায় এম এ. প্রবর্তনের প্রথম বৎসরে অধ্যাপকমণ্ডলী নিয়োগের ব্যাপারে তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। গুণগ্রাহী আশুতোষের আহ্বানে দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আই-জে-এস্-তারাপুরওয়ালা, প্রমুখ সুধীবর্গ বাংলাবিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের সম্বন্ধের সূত্রপাত এই সময় থেকে। আশুতোষ যোগীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর আহ্বান ও অনুকম্পায় যোগীন্দ্রনাথ প্রথম বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম্. এ. বিভাগে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র থেকে জানা যায় এম্. এ থার্ড পেপারে মেঘনাদবধ কাব্যপাঠের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর।[৯] ১৯১৯-২০ খ্রীস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার' বিভাগে স্নাতকোত্তর বিভাগে যে সব শিক্ষকবৃন্দের নাম মুদ্রিত আছে—সে তালিকার প্রথম নাম যোগীন্দ্রনাথ।[১০] ১৯১৯-২০ খ্রীস্টাব্দের জন্য গঠিত Council of Postgraduate teaching in Arts' ও 'Board of higher studies (Arts)' এই উভয় বিভাগে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম সদস্য।[১১] পরবর্তী বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে যোগীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায় না। অতএব বাংলা বিভাগের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বৎসর কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বার্ধক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু অধ্যাপনার দায়িত্ব চালানো সম্ভবপর হয়নি। পি-আর-এস্ পরীক্ষকের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উপর ন্যস্ত করেন।[১২] দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আদর্শ শিক্ষকের গৌরব লাভ করেছিলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে যোগীন্দ্রনাথ মনস্বী ও পণ্ডিত অধ্যাপকরূপে প্রশংসিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বৎসরের ছাত্র ভারতবর্ষ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্মৃতি-তর্পণচ্ছলে লিখেছেন—'আমরা এম্. এ. ক্লাসে বহু সুধী ব্যক্তিকে অধ্যাপকরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শিবাজী ও পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লেখক আচার্য যোগীন্দ্রনাথ বসু আমাদের মধুসূদনের মেঘনাদবধ পড়াইতেন। শৈশবে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম—কৈশোরের সেই প্রিয় কবিকে অধ্যাপকরূপে পাইয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধুসূদনকে তিনি কত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বহুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ

৮ মোহিতলাল মজুমদার। কবি শ্রীমধুসূদন। উপক্রমণিকা। (৩য় সং ১৩০৪)।

৯ Post Graduate Teaching in the University of Calcutta, 1918-1919.

১০ The Calcutta University Calender, 1918-1919.

১১ Ibid

১২ The Calcutta Review, August, 1927.

CENTRAL LIBRARY

মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এম্-এ ক্লাসে পড়াইবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম করিতেন ও বোধ হয় বয়সে প্রবীণ হইলেও তরুণ অধ্যাপকদের মত যতটা সম্ভব নিজেকে তৈয়ারী করিয়া আসিতেন।'[১৩]

ভগ্নস্বাস্থ্য যোগীন্দ্রনাথ অতঃপর অধিককাল জীবনধারণ করেন নি। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ২০শে জুলাই (বাং ৬ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৪) যোগীন্দ্রনাথ কলকাতার নিজ বাসভবনে লোকান্তরিত হন। যোগীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে সাময়িক পত্র-পত্রিকার স্তম্ভে শোকাঞ্জলি নিবেদিত হয়। *The Calcutta Review* যোগীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখেন—'A notable personality has been removed from the field of Bengali literature by the hand of death —Mr. Jogindranath Bose, whose death last month we deeply mourn, was a lifelong devotee to the causes of Bengali literature and was one of the pre eminent writers who contributed to its present wealth. His pure and modest life was naturally reflected in the simple and chaste style which he adopted in his writings. He began his life as a teacher, and his examplary character, which endeared him to students and guardians alike, remained principle trait of the man even when he became known to fame and fortune. His life of Michael Madhusudan Dutta is an enduring monument to his industry and critical faculty, and it has become a classic in Bengali biographical literature. His Prithviraj and Sivaji received in his life time the full meed of praise which they deserve, and his numerous other writings have been acclaimed with unstinted praise by an appreciating public. A strong undercurrent of patriotism and of lofty ideals breathing the purity and sanctity of ancient lore pervades his works. When Sir Asutosh Mookerjee introduced the scientific study of Indian vernaculars in the Post Graduate Department of the University, he invited Mr. Bose to take part in the work, and Mr. Bose responded with characteristic enthusiasm, but it was his failing health that stood in the way of his continuing the work. He was appointed to examine Premchand Roychand theses and though illness prevented him from performing his duties, no small joy was his to see his beloved Vernacular a subject for examination for the Blue Ribond of the University.[১৪]

গত যুগের বাংলাসাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের অবদানের কথঞ্চিৎ উপর্যুক্ত মন্তব্যটিতে আভাসিত। বাংলাসাহিত্যের বহুধা বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির স্বাক্ষর বর্তমান সন্দেহ নেই, তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্যাচনা সাম্প্রতিক পাঠককে সাক্রমিত করে কচিৎ; তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকৃতিও বলা চলে, কালোত্তীর্ণ নয়; বস্তুতঃ জীবনচরিতকার হিসেবেই তাঁর দুর্মরতর প্রসিদ্ধি। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৮৯৩) গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর পরেও যোগীন্দ্রনাথের সেই অসামান্য গ্রন্থখানির কোনও নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। আশা করা যায় কোনও সহৃদয় প্রকাশক অচিরে একাজে অগ্রণী হবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে আচার্য যোগীন্দ্রনাথ একালে এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব, এমতাবস্থায় কেবলমাত্র রচনাদির পুনর্মুদ্রণের দ্বারাই তাঁর প্রতি সানুরাগ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভবপর।

১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন। ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪৪।

১৪ The Calcutta Review, August, 1927

CENTRAL LIBRARY

যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থপঞ্জী

জীবনী

(১) অমর কীর্তি বা কাদার দাসিয়েনের জীবনচরিত (১৮৯০), (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৮৯৩), (৩) মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত (বিদ্যালয়-পাঠ্য, ১৩১৭), (৪) অহল্যাবাই (২য় সং, ১৩০৭), (৫) তুকারাম (১৩০৮)।

কাব্য

(১) কবিতা প্রসঙ্গ, ১ম—৩য় খণ্ড (১৮৯৯), (২) আদর্শ কবিতা (১৩০৬ ?), (৩) পৃথ্বীরাজ (১৩২২), (৪) মানবগীতা (১৩২২), (৫) শিবাজী (১৩২৫)।

নাটক

(১) একাদশ অবতার (?), (২) গন্ধর্বনগর (১৯১৪), (৩) দেববালা (১৯১৫), (৪) রাজউদাসীন (?)।

উপন্যাস

(১) পর্ণকুটীর (?)।

ধর্মগ্রন্থ

(১) সরল কৃত্তিবাস (১৩১৪), (২) সরল কাশীরাম দাস (১৩১৫), (৩) কঠোপনিষৎ (১৩১৯), (৪) পতিব্রতা—১ম (১৯১১), (৫) পতিব্রতা—২য় (১৩২০), (৬) সীতা (১৯১৩)।

শিশু সাহিত্য

(১) রামায়ণের ছবি ও কবিতা (১৯০৯), (২) ছবি ও কবিতা—১ম (১৯১৪), (৩) ছবি ও কবিতা—২য় (?), (৪) ছোট ছোট গল্প (১৯২৩), (৫) ছবি ও কথা (?)।

বিদ্যালয়-পাঠ্য

(১) সরল প্রবন্ধ ও কবিতা (১৯১০), (২) রচনা প্রকরণ, ১ম (১৯১০) সহ-লেখক ঈশানচন্দ্র ঘোষ, (৩) আদর্শ পাঠ—১ম (?), (৪) আদর্শ পাঠ—২য় (?), (৫) আদর্শ পাঠ—৩য় (?), (৬) রচনা প্রকরণ, ২য় (?), (৭) সরল ইতিহাস (?), (৮) সুখপাঠ ইতিহাস (?), (৯) সরল শিশুপাঠ (?)।

CENTRAL LIBRARY

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৮৬১ — ১৯৪২

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রথম যুগে প্রথিতযশা কবি ও মনস্বী বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম অধ্যাপক। বস্তুতঃ তাঁর মতো বহু বিদ্যার অধিকারী যথার্থ জ্ঞানান্বেষী অধ্যাপক যে কোনো যুগেই বরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টির প্রমাণ পরিণত বয়সে দৃষ্টিশক্তিহীন বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে নিযুক্তি। অতিরিক্ত পড়াশুনোর ফলেই বিজয়চন্দ্র অকালে অন্ধ হয়েছিলেন, সে অন্ধত্ব তাঁর মনীষাকে ম্লান তো করেই নি, বরং জীবনসম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে অন্ধত্বের বেদনা হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রথম প্রকাশিত, বিজয়চন্দ্রের কবিতায় সে বেদনা অতিক্রম করে দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত।

১৮৬১ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বিজয়চন্দ্রের জন্ম। জীবনের দীর্ঘকাল তাঁর উড়িষ্যায় কেটেছে। বি. এ পাশ (১৮৮৩) করার পরে দেশীয় রাজ্য বামরা ও সোনপুরে কর্মোপলক্ষে থেকেছেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করবার পরে ১৮৯৫ সালে বি. এল পাশ করে সম্বলপুরে আইনব্যবসায়ে যোগ দেন এবং এর ফলে প্রচুর বিত্ত ও সম্মানের অধিকারী হ'ন। উড়িষ্যার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। সুদীর্ঘ অনুশীলনের দ্বারা বিজয়চন্দ্র নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। একাধারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, ভাষাতত্ত্ব—ইত্যাদি বহু বিষয়ে অনুরাগের ফলে তাঁর গভীর ও উদার চিন্তাধারা সমকালীন সাহিত্যে পাঠকমণ্ডলীর বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উড়িষ্যার বিশিষ্ট নেতা মধুসূদন রাওয়ের কন্যা বাসন্তীদেবীর সঙ্গে বিজয়চন্দ্রের বিবাহ হয়। বাসন্তীদেবী নিজেও সংস্কৃতসাহিত্যে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা সুনীতিদেবী বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প-লেখিকারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হওয়ার সূচনা-কাহিনীটি বিজয়চন্দ্র *History of the Bengali language* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৯২০) ভূমিকায় এইভাবে জানিয়েছেন—It was in 1909 that I first gave a definite shape to the results of my study of the Bengali language and its history, but certain eyetroubles which began at about that time interfered with the immediate completion of my plans. Three or four years later, after those troubles has ceased with the total loss of eyesight, I turned to my materials again, and worked at them, till in 1917, not knowing what to do with these unpublished papers, I sent them at the instance of a friend to the Hon'ble Sir Ashutosh Mukherjee, President of the Council of Post Graduate Teaching in Arts in the University of Calcutta, to see if any use could be made of them in connection with that scientific study of the Vernaculars, which had long been one of Sir Ashutosh's cherished projects in his scheme of University reconstruction and extension.

CENTRAL LIBRARY

To my great surprise, not unmixed with thankfulines, I found myself called upon, months later, to deliver a course of lectures on the History of the Bengali language in the Post Graduate Department in the University of Calcutta. (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলাভাষা ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার গবেষণালব্ধ চিন্তাধারাকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হই, কিন্তু এইসময়ে চোখের অসুখের সূত্রপাত হয়ে সে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এ অসুখের ফলে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাই এবং তিন চারবছর পরে আবার আরব্ধ কাজে হাত দিয়ে ১৯১৭ অবধি এবিষয়ে কাজ করি। এই গবেষণা কাজ নিয়ে কি করবো ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে জনৈক বন্ধুর পরামর্শে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর অধ্যাপনা বিষয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই ভেবে এই গবেষণা কাজগুলি পাঠিয়ে দিই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে ও বিস্তারসাধনে মাতৃভাষাসমূহের শিক্ষাদানে আশুতোষের সুদীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনায় যদি এরা কোনো কাজে লাগে। মাসকয়েক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বাংলাভাষার ইতিহাস বিষয়ে বিস্তৃত বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণ পেয়ে বিপুল বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলাম।)

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয়চন্দ্র একই সঙ্গে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপনা করতেন। কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গেও এডভোকেট হিসাবে তাঁর যোগ ছিল। বাংলাবিভাগের প্রথম যুগে তিনিই ছিলেন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। সমকালীন ছাত্রেরা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই মনীষী অধ্যাপকের নিপুণ অধ্যাপনার কথা স্মরণ করে থাকেন। পরবর্তীকালে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণায় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে যুগান্তর ঘটে যায়, তার দ্বারা বিজয়চন্দ্রের গবেষণার মূল্য হ্রাস পেলেও বাংলাভাষার ইতিহাসচর্চায় তাঁর বিশিষ্ট স্থান এখনও স্বীকার্য।

নৃতত্ত্বের পটভূমিকায় ভাষাতত্ত্বকে স্থাপন করে এবং বাংলা ও উড়িষ্যার ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বিজয়চন্দ্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আধুনিক ভাষাসমূহের মূল বৈদিকভাষা এবং পরবর্তীকালে যে সব বৈচিত্র্য এই ভাষাসমূহে দেখা দেয় তার কারণ দ্রাবিড় প্রভাব। বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষা তাঁর মতে পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত।

মনীষী বিজয়চন্দ্র বাংলাসাহিত্যে কবিতা, প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভাষাতত্ত্বের চর্চা তাঁর ছন্দোজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল। ফলে বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্যতম সার্থক উদাহরণরূপে তাঁর কবিতার বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সঙ্গে আত্মিক যোগস্থাপনের ক্ষেত্রে বিজয়চন্দ্র অনেক পরিমাণে রবীন্দ্র-প্রভাবিত এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের তিনি গুণগ্রাহী রসজ্ঞ পাঠক। রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী সমসাময়িকদের মধ্যে রুচির এই অগ্রগামিতা বিজয়চন্দ্রের অভ্রান্ত সাহিত্যরুচির পরিচায়ক। বস্তুতঃ সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্যের আস্বাদনে বিজয়চন্দ্রের মানসলোকে অতি উচ্চমানের সাহিত্যবোধ গড়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজয়চন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ে মানসিক সাধর্ম্যের পরিচায়করূপে বিজয়চন্দ্রের 'জীবনবাণী' প্রবন্ধসংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত কবিগুরুর একটি পত্র এখানে উদ্ধৃত করা চলে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বিজয়চন্দ্রের 'আদর্শ সাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ বিজয়চন্দ্রকে লিখেছিলেন—

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন, শান্তিনিকেতন

এই মাত্র আপনার চিঠি ও ভারতবর্ষ পাইলাম। 'আদর্শ সাহিত্য' প্রবন্ধটি পড়িয়া আনন্দবোধ করিলাম।

CENTRAL LIBRARY

আপনি সাহিত্যের যে আদর্শ আলোচনা করিয়াছেন, এখনকার দিনে তাহা অনাদৃত। সূর্যকে মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকে, তাই বলিয়াই সূর্যকে অবিশ্বাস করা চলে না। বহু যুগ হইতে যাহা মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, অকস্মাৎ তাহার অবমাননা কখনোই স্থায়ী হইতে পারে না। বিশেষ কারণে বিশেষ কোনো যুগের ক্লান্তি চিরযুগের সত্যকে অপ্রমাণ করিতে পারে না। যে সত্যকে মানুষ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, যাহাকে সে আপন চির ঐশ্বর্য বলিয়া মানিয়াছে, আজ তাহাকে যে বলিতেছে মরীচিকা, তাহার দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিব—মনুষ্যত্বের অন্তরতম সত্যকে নয়। ইতি—

১৬ নবেম্বর, ১৯৩৩

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম জীবনে বিজয়চন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর ফলে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিজয়চন্দ্রের একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, যা তাঁর পরবর্তী অধ্যয়ন ও মননের দ্বারা পরিশীলিত হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য তিনি লণ্ডনে ধর্মমহাসম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে মানবচিন্তায় ধর্মীয় ধারণার ক্রমবিকাশ যুক্তিনিষ্ঠ স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচিত।

আশুতোষের উদ্যোগে এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রথম দু'বছর এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। বিজয়চন্দ্রের সম্পাদিত এ পত্রিকাটি সুধীসমাজের প্রশংসাধন্য। এই পত্রিকায়ই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়।

বিজয়চন্দ্রের রচনাবলীর তালিকায় তাঁর উদার বিস্তৃত মননের পরিচয় মেলে। বাংলা রচনা—কবিতা (১৮৮৯), যুগলপূজা (১৮৯২), কথা ও বীথি (১৮৯৫), ফুলশর (১৯০৪), যজ্ঞভস্ম (১৯০৪), পঞ্চকমালা (১৯১০), হেঁয়ালি (সংকলন, ১৯১৫)।

কথাসাহিত্য: কথানিবন্ধ (কথা ও বীথি কাব্যের কথা অংশ-সহ গদ্য ও পদ্য রচনা, ১৯০৫), তপস্যার ফল (১৯০২)।

প্রবন্ধ: প্রাচীন সভ্যতা (১৯২০), জীবনবাণী (১৯৩৩), কালিদাসের কাব্য ও রঘুবংশের আলোচনা।

অনুবাদ: সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী (ওড়িয়া কবিতার বাংলা অনুবাদ), গীতগোবিন্দ, থেরীগাথা, সুত্তপিটক খুদ্দক নিকায় উদানম্ (পালি কবিতার বাংলা অনুবাদ)।

ইংরেজী রচনা—*The Aborigines of the Highlands of Central India, The History of the Bengali Language* (১৯২০), *Student's Handbook of Social Anthropology* (১৯৩৬), *Orissa in the Making, Sonepur in the Sambalpur Tract*, Typical Selections from Oriya Literature (১৯২৫)

ছন্দোনিপুণ বিজয়চন্দ্রের রচনাবৈশিষ্ট্যের দু'একটি উদাহরণ—

নহে সিন্ধু, কাবেরী, যমুনা, গঙ্গা,
নর্মদা গোদাবরী সে
সে ত আর্যকীর্তি স্মৃতি তরঙ্গা
গাথা নাহি সেথা বরিতে।

CENTRAL LIBRARY

এ যে শবরভবনে বিজনবাহিনী
শৈলমঞ্চে নটিনী,
গাহে কেনিল লাস্যে স্বর্ণ কাহিনী
চিত্রোৎপলা তটিনী।

('চিত্রোৎপলা'—হেঁয়ালি)

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু বিজয়চন্দ্র কিছু হাস্যরসের কবিতাও লিখেছিলেন, যার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ব্যথাবেদনার ঊর্ধ্বে রসিকচিত্তের সন্ধান মেলে। সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিসচেতনতা প্রসঙ্গে উপভোগ্য কটাক্ষ—

আরাম চেয়ারে বসে ভেবে কূল পাইনে
কিম্বিধ শাসনরীতি হবে ফিলিপাইনে।
ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা
ম'ল কি বাঁচিল তথা;
বিচার হইবে এবে কিরকম আইনে
রীতিনীতি দেশাচার চলিবে কি লাইনে!

('পলিটিক্স'—ফুলশর)

অনুবাদের ক্ষেত্রে বিজয়চন্দ্রের সার্থকতার পরিচয়—

সঙ্গীতে তব নামে করি কত সঙ্কেত
গাহিছেন হরি মৃদু, বেণুতে;
তব তনু-পূত বায়ু ধূলি দেয় অঙ্গে তো,—
তিরপিত তবু সেই রেণুতে।
মর্মরে পাতা, কিবা পাখি উড়ে গহনে;
তুমি এলে ভেবে চায় চকিতে।
পাতি শেজ সযতনে সচকিত নয়নে
চাহে তব পথ-পানে ত্বরিতে।

('গীতগোবিন্দে'র পঞ্চম সর্গে একাদশ গীতি)

বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিমালয়-বর্ণনা—

জলে শৈলে সূর্যকিরণ-বিম্ব
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ
ধেয়ানমগ্ন ধূর্জটি।
ঐ সাম্বর সোপানমালার ঊর্ধ্বে
শৃঙ্গচরণ রঞ্জিকা
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা।

('হিমাচলে'—হেঁয়ালি)

CENTRAL LIBRARY

'হেঁয়ালি' নামের সংকলনটিতে 'অন্ধের মৃগয়া' অংশে বিজয়চন্দ্র অন্ধকবির হৃদয়ালোকের যে অপূর্বচিত্রটি এঁকেছেন, সেইটি স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি—

আঁধার নহে,– এ যে আমার মুক্তালোকের গুপ্ত ঝরা।
অনুভূতির উপাদানে উঠছে গড়ে লুপ্ত ধরা।
প্রলয়ান্তে এ যে শান্ত মৃত্যুঞ্জয়ের শুদ্ধি-কণা;
আত্মভোলা স্বার্থমাঝে সুপ্রসন্ন উদ্দীপনা।
নির্বাপিত লীলার এ যে উজ্জীবিত উষ্ণ হাসি।
প্রাচীন শুষ্কমালায় এ যে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি।

দিনেই আগে উঠত সূর্য, রাতেই কেবল চন্দ্র তারা;
শ্যামলিমায় ছিল সীমা, শূন্য ছিল অন্তহারা;
প্রহেলিকায় ছিল ঢাকা সিন্ধুপারের ধু-ধু ছায়া;
প্রীতির মুখে থাকত ফুটে শুধু মোহ, শুধু মায়া।
চিরদীপ্ত পটের কোলে নিত্য দোলে মোতির মালা।
আঁধার নহে এ যে আমার দেব-পূজার জ্যোতির ডালা।

ড: সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড ও শ্রীশ্রবন্তী সান্যাল সম্পাদিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অনূদিত কবি জয়দেব বিরচিত 'গীতগোবিন্দ'—গ্রন্থের সূচনায় 'অনুবাদক প্রসঙ্গে'—এ লেখার উপকরণ সংগ্রহে স্মরণীয়।

CENTRAL LIBRARY

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

১৮৬৫—১৯৫২

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে ১৮৬৫ ইং (১২৭২ বাং) জন্ম, ১৯৫২ ইং (১৩৫৯ বাং ২৩ কার্তিক রাত্রে) ঝাড়গ্রামস্থ তাঁহার পুত্রের বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু। ইনি কিছুদিন সমস্তিপুর রেল অপিসের কর্মচারী ছিলেন। বসন্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্বরূপ 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারের' সদস্য ছিলেন। ইনি সাহিত্য পরিষৎ সৃষ্টির প্রথমাবধি ইহার সহিত যুক্ত। যৌবনে পরিষৎ সদস্য হিসাবে পরিষৎ গ্রন্থাগারের জন্য পুথি-সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার একক চেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু পুথি সংগৃহীত হয়। এই সকল সংগৃহীত পুথির বিস্তৃত তালিকাও তিনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন পরিষদের পুথিশালার কর্মচারীরূপেও কাজ করিয়াছিলেন। সেখানকার কাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৯১৯ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবস্থাপিত ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান ভাষা বাংলার অন্যতম অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯৩২ ইং পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

সাহিত্য-সাধনা—সাহিত্য পরিষদের ২য় বর্ষ ১৩০২ বঙ্গাব্দের (১৮৯৫ ইং) ৫ম সংখ্যায় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' শীর্ষক তাঁহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ইহাই তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ। পরিষৎ পত্রিকায় এবং অন্যান্য কতিপয় সাময়িক পত্রে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে [খ] পরিশিষ্টে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি কালানুক্রমিক তালিকা মুদ্রিত হইল।

প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ সঙ্কলন-কার্যে যে দুই বাঙ্গালী মনীষী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বিদ্বদ্বল্লভ সঙ্কলিত পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা যথাক্রমে ১৯২৪ ইং (১৩৩০ বাং) এবং ১৯২৬ ইং (১৩৩৩ বাং) প্রকাশিত হয়। ইহার সঙ্কলিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রক্ষিত পুথির বিবরণ যথাক্রমে ১৯২৬ ইং এবং ১৯২৮ ইং প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয় তালিকা সঙ্কলন-কার্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের একাধিক ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যরসিক বসন্তরঞ্জন কতিপয় প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ৭ খানি। যথা—

১। ক্ষেমানন্দ দাসের মনসামঙ্গল, ২। রঘুনাথ দাস ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ৩। আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশের গীতা-ভাষা সারসুন্দরসুধা, ৪। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৫। গোপীচন্দ্রের গান ১ম ও ২য় খণ্ড, ৬। কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন, ৭। হরিলীলা। নিম্নে [ক] পরিশিষ্টে বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থের এক কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশিত হইল।

বসন্তরঞ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম হইতেছে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থের আবিষ্কার ও ইহার সুষ্ঠু সম্পাদনা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে

CENTRAL LIBRARY

সর্বপ্রথম এই অজ্ঞাত-পূর্ব গ্রন্থের পরিচয় প্রকাশ করেন। ১৩২৩ বাং (১৯১৬ ইং) বিস্তৃত টীকা টিপ্পনী সহযোগে এই গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও সাধারণ ভাবে পণ্ডিত-মণ্ডলী ইহাকে চণ্ডীদাসের রচনার দুর্লভ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থখানি সম্পাদনায় বসন্তরঞ্জন যে কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পণ্ডিত সমাজের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদনের পূর্বে তাঁহার সম্পাদিত তিনখানি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরেও তিনখানি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় সম্পাদিত হয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল প্রাচীন বাংলা শব্দের একখানি অভিধান সঙ্কলন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু কিছু উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বসন্তরঞ্জন তাঁহার নিরলস সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৯৪৯ ইং (১৩৫৬ বাং) তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত করেন। ১৯৪১ ইং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার কৃতিত্বের জন্য 'সরোজিনী বসু স্বর্ণ পদক' দান করেন। ১৯৩৩ ইং (১৩৪০ বাং), এবং ১৯৪১-১৯৪৬ ইং (১৩৪৮-১৩৫৩ বাং) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯১০ ইং (১৩১৭ বাং) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বসন্তরঞ্জনকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচনের প্রস্তাব করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—'বসন্তবাবু পরিষদের পুথি সংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নূতন নূতন পুথির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুথি সংগ্রহের জন্য ইঁহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়। তজ্জন্য ইঁহার বাহনের খরচ আছে, খাই-খরচ আছে, পরিষৎ হইতে তিনি তাহার এক কপর্দকও লয়েন না বা এই কার্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহবশে তিনি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়াও এই কার্য করেন। অধিকন্তু তিনি পরিষদের প্রথমবর্ষ হইতেই ইহার সদস্য আছেন এবং চিরকাল সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোন না কোন কার্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। অথচ নিয়মিতভাবে ইহার চাঁদা দেন। পূর্বে তিনি সমস্তিপুরে রেল অপিসে কার্য করিতেন। এখন পেনসন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্বস্নেহ সমান বজায় রাখিয়াছেন। এইসকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী সদস্যকে ইহার বিশেষ সদস্যপদে নির্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।' [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী, ১৭শ বর্ষ]

'ক' পরিশিষ্ট

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত গ্রন্থ-মুদ্রণ কালানুক্রমিক

১৯০৯ ইং—মনসামঙ্গল, ক্ষেমানন্দ দাস রচিত, ১৩১৬ বাং।

১৯১০ ইং—রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ, ১৩১৭ বাং, বঙ্গবাসী কার্যালয়।

১৯১০ ইং—আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারীর গীতাভাষা সারঙ্গরঙ্গদা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১৮।

১৯১৬ ইং—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৪৮, ১৩২৩ বাং (এপর্যন্ত বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।)

১৯২২ ইং—গোপীচন্দ্রের গান, ১ম খণ্ড, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র সেন সহ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

১৯২৪ ইং—গোপীচন্দ্রের গান, ২য় খণ্ড, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র সেন সহ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

১৯২৪ ইং—বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৪৩, ১৩৩০ বাং।

১৯২৬ ইং—কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন, অটলবিহারী ঘোষ সহ সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৭১, ১৩৩২ বাং।

১৯২৬ ইং—Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I. Edited jointly with Basanta Kumar Chatterjee M.A. Calcutta University Publication, 1926.

১৯২৬ ইং—বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সহ সঙ্কলিত, ১৩৩৩ বাং।

১৯২৮ ইং—হরিলীলা, দীনেশচন্দ্র সেন সহ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

১৯২৮ ইং—Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts Vol. II. Edited with Manindra Mohan Basu M.A. and Basanta Kumar Chatterjee M. A, Calcutta University Publication.

'খ' পরিশিষ্ট

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ রচিত ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ—মুদ্রণ কালানুক্রমিক

১৩০২ বাং, ৩য় সংখ্যা—ছেলে ভুলানো ছড়া (১. বাঁকুড়া বেলেতোড় হইতে সংগৃহীত, ২. মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত, ৩. বন-বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত), পৃ ৩৬৭-৩৭১

১৩১৮ বাং, ২য় সং—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ ১২৩-১৩২

১৩২৫ বাং, ৩য় সং—'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য, পৃ ১৪১-১৪৬

১৩২৬ বাং, ২য় সং—দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ, পৃ ৯৩-১০৪

১৩২৮ বাং, ২য় সং—ময়নামতীর পুথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ, পৃ ৪৯-৬১

১৩২৯ বাং, ৩য় সং—পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ ১-১৬

১৩২৯ বাং, ৪র্থ সং— ঐ পৃ ১৭-৫২

১৩৩০ বাং, ৪র্থ সং— ঐ পৃ ৩৩-৯৬

১৩৩১ বাং, ১ম সং— ঐ পৃ ৯৭-১২৮

১৩৩১ বাং, ২য় সং— ঐ পৃ ১২৯-১৫৯

১৩৩২ বাং, ১ম সং— ঐ পৃ ১-৪০

১৩৩২ বাং, ২য় সং— ঐ পৃ ৪১-৬৪

১৩৩২ বাং, ৩য় সং— ঐ পৃ ৬৫-৮০

১৩৩৫ বাং, ৪র্থ সং—তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা ১৭ তত্ত্ব, পৃ ১-১৮১

১৩৪০ বাং, ৩য় সং—কৃত্তিবাসের জন্ম-শক (আলোচনা), পৃ ১১১-১১২

১৩৪৩ বাং, ৪র্থ সং—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল, পৃ ১৩৯-১৪১

১৩৪৪ বাং, ১ম সং—চণ্ডীদাস (আলোচনা), পৃ ৩৩-৩৮

১৩৪৫ বাং, ৪র্থ সং—আলোচনা, কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল, পৃ ২৮১-২৮৪

CENTRAL LIBRARY

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৫—১৯৩৩

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়া থানার অন্তর্ভুক্ত খাঁটুরা গ্রামে বঙ্গাব্দ ১১ই বৈশাখ ১২৭২, ইংরাজি ২৪শে এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে মুরলীধরের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষগণ উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মাতামহ ভগবানচন্দ্র তর্কালঙ্কার এই অঞ্চলে এক বিখ্যাত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা ধরণীধর শিরোমণি এই চতুষ্পাঠীতেই বিদ্যাচর্চা করেন। পরে তিনি নিজ পিতৃব্য রামধন তর্কবাগীশের অধীনে কথকতা শিক্ষা করে তাকেই জীবিকার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। [সেকালে একাধারে চিত্তবিনোদন, নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার বাহন হিসাবে বাংলাদেশে কথকতার ব্যাপক প্রচার ছিল। শোনা যায়, তিনি কথকতায় এমন যশস্বী হয়ে ওঠেন যে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিগণিত হতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে যে তরুণ বয়সে তিনি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁর কথকতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'তাঁর পরিণত বয়সেও ধরণীধরের গানের সুর কানে লাগিয়া আছে' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। মুরলীধরের পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনিই প্রথম বিধবাবিবাহ করে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মুরলীধর ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র এবং বিশেষ আদর ও যত্নের পাত্র। পিতা তাঁর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে পারিবারিক প্রথা অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং বাল্যকালে তাঁর কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটে। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে এমন অবস্থান্তর ঘটল যে বালক মুরলীধরের ভবিষ্যত শিক্ষণের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর পিতা তাঁকে দশবৎসরের বালক অবস্থা রেখে মারা যান। তখন তাঁর বিধবা মাতার পিতার অভাব পূরণের চেষ্টা আদরের মাত্রা পরিবর্ধনেই সীমাবদ্ধ ছিল; শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এইভাবে কয়েকবছর কাটার পর কৈশোরের প্রারম্ভেই এই বালকের মনে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা আপনা হতেই অঙ্কুরিত হয়। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কলিকাতায় গিয়ে পাঠ আরম্ভ করলেন।

সুতরাং বেশ বয়স্ক অবস্থায় সংস্কৃত কলেজের সহিত সংযুক্ত বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু প্রতিবছর ডবল প্রমোশন লাভ করে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ইংরাজি ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে সংস্কৃত অনার্সে উচ্চ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হতে তিনি এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। এইজন্য সংস্কৃত কলেজ তাঁকে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন।

এমন অনেকে থাকেন যাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি জ্ঞান অর্জনের শক্তি প্রবাহিত হয়। মুরলীধরের প্রতিভা ছিল সেই ধরণের। সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ হয়েও তাঁর ইংরাজিতে অধিকারের খ্যাতি এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে ইংরাজির অধ্যাপকরূপেই প্রথম চাকুরী পেতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কটক

CENTRAL LIBRARY

র‍্যাভনশ কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে বারোবৎসর কাল অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে বদলি হন। এখানে তিনি দর্শনের অধ্যাপনা করতেন। এখানেই তিনি ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ হতে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। পরে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে সরকার তাঁর কার্যকালের মেয়াদ দেড় বৎসরকাল বৃদ্ধি করেন; কিন্তু এক নূতন পরিস্থিতির ফলে হঠাৎ সে আদেশ প্রত্যাহৃত হওয়ায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার একবৎসর আগেই ২৬শে অক্টোবর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী হতে অবসর নিতে বাধ্য হন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর ওপর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপনার ভার এসে পড়ে। তিনি এম.এ. শ্রেণীতে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' পড়াতেন। তার সঙ্গে এই গ্রুপের প্রাকৃত শিক্ষণের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। প্রাকৃত পাঠনের জন্য তিনি পণ্ডিত হরগোবিন্দ দাস শেঠকে সহকর্মী হিসাবে পান। পরে যখন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় এম. এ. পাঠক্রম প্রবর্তিত হয় তখন বাংলার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতের পাঠনের ভার মুরলীধর গ্রহণ করেন। প্রাকৃতে রচিত 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটক তিনি বাংলা বিভাগের ছাত্রদের পড়াতেন।

মুরলীধর যে সমস্ত পুস্তক রচনা করে গেছেন সেগুলি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু চিন্তায় তাহাতে মৌলিকতা আছে; এই হল সেগুলির বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার অনুভাবে কেবলমাত্র স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে কোনো বিষয় আয়ত্ত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সকল বিষয়েই বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে বুঝে নিয়ে তারপর আয়ত্ত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এইপ্রসঙ্গে শিশুদের বর্ণপরিচয়ের জন্য রচিত তাঁর 'বাংলা অক্ষর পরিচয়' পুস্তিকাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের পক্ষে বর্ণমালার অক্ষরগুলির পরিচয় সহজসাধ্য করা এবং শিশু অবস্থাতেই তাদের বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করবার সুযোগ দেওয়া।

এই পুস্তিকার দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা জানি বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃতের অনুসরণে উৎপত্তি স্থান অনুসারে সাজানো। তিনি এই রীতি অনুসরণ না করে বর্ণগুলিকে আকৃতি অনুসারে সাজিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি এই যে বর্ণমালার বিভিন্ন শব্দ শিশুদের ইতিমধ্যেই আয়ত্ত হয়ে গেছে, কারণ বাংলা তাদের মাতৃভাষা। সে ত ইতিমধ্যে বাংলায় কথা বলতে শিখেছে। কাজেই যে অবস্থায় অক্ষরের সহিত পরিচিত হবার সময় আসে সে অবস্থায় তার আকৃতির সহিত পরিচয়ই তার বেশী প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত তিনি অক্ষরশিক্ষার জন্য একটি বিশেষ রীতি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। তার নাম তিনি দেন জননানুক্রমিক রীতি (Genetic Method)। মানবজাতির ইতিহাসে যেভাবে অক্ষরের ক্রমবিকাশ ঘটেছে সেই-ভাবেই ধীরে ধীরে তিনি শিশুর অক্ষরের সহিত পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। অক্ষর বিকাশের ইতিহাসে তিনটি অবস্থা দেখা যায়। প্রথমে একটি অর্থব্যঞ্জক শব্দসমষ্টি ছবি দ্বারা লিখিত আকারে সূচিত হত; যেমন প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপি (Hieroglyphic)। তারপরের অবস্থায় একটি অক্ষর একটি সমগ্র শব্দসমষ্টিকে সূচিত করত। যেমন চীনাভাষায়; সেখানে একটি অক্ষর একটি পদের (word-এর) সমস্থানীয়। বিকাশের শেষ অবস্থায় একটি পদের যে বিভিন্ন শাব্দিক উপাদান আছে তা বিশ্লেষণ করে পৃথক করে নিয়ে একটি পৃথক অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়। এখানে একটি অক্ষর একটি বিশেষ শব্দের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন রোমান বর্ণমালা। সংস্কৃত বর্ণমালা বা বাংলা বর্ণমালাকেও এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। মুরলীধর অক্ষর শেখাতে এই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়েই শিশুকে নিতে চেয়েছিলেন। যেমন 'আ' শিখতে শিশুকে প্রথমে একটি আমের চিত্রের সহিত পরিচিত করাতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

তারপর চিত্রের পরিবর্তে 'আম' পদটির সহিত সমগ্রভাবে তার পরিচয় ঘটাতে হবে। তারপর সেই পদটি বিশ্লেষণ করে দুটি পৃথক শব্দের প্রতীক হিসাবে 'আ' ও 'মি' অক্ষরের সহিত তাকে পরিচিত করাতে হবে। প্রস্তাবটি অভিনব এবং বিজ্ঞানসম্মত। মনে হয় এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি দুখানি পুস্তক সম্পাদন করেন। প্রথমটি হল হেমচন্দ্র প্রণীত 'দেশী নামমালা'। তা প্রাকৃত ভাষার একটি প্রসিদ্ধ অভিধান। তার একটি সংস্করণ জার্মান পণ্ডিত পিশেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশ করেছিলেন। তারপর বইখানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য তিনি 'দেশী নামমালার' একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা-ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন তিনি তার একটি সংশোধিত সংস্করণ ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁর চিন্তার মৌলিকতা সব থেকে বেশী পরিস্ফুট হয় তাঁর দার্শনিক গবেষণায়। বিশ্বের সকল দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে দর্শনের ইতিহাস লেখা তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। এই ইতিহাস রচনার জন্য তিনি আলোচনার একটি বিশেষ রীতিও উদ্ভাবন করেন এবং তার নাম দেন 'জননানুক্রমিক আলোচনা' (Genetic Method)। বিষয়টি একটু জটিল, তাই এই প্রবন্ধের সীমিত অবসরে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে কোনো বিশেষ দার্শনিক সমস্যার যে পথে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে সব থেকে পরিণত রূপটি পায় সেইপথেই তিনি আলোচনার প্রস্তাব করেছিলেন।

তাঁর বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে জগতের সকল দার্শনিক চিন্তার মধ্যেই অল্পবিস্তর সত্য নিহিত আছে। এই মতগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে, যে বিরোধ দেখা যায়, তার কারণ এই যে তারা কেউ একা সমগ্র সমাধানটির পরিচয় লাভ করতে পারে না। সুতরাং সমগ্র সত্য বা সমস্যার সমাধানটি লাভ করতে হলে এই পরস্পর-বিরোধী মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে; সেই সামঞ্জস্যের মধ্যেই পূর্ণ সত্য আত্মপ্রকাশ করবে। তাঁর ধারণায় প্রতি সমস্যার সমাধান পরিণতির পথে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়: প্রথম অবস্থায় সমাধান সরল এবং তাই সঙ্গতির অবস্থা পাই (Stage of harmony)। বিষয়টি সম্বন্ধে আরও আলোকপাত হলে অসামঞ্জস্য এসে পড়ে; ফলে বিপরীতধর্মী সমাধানের সংঘাত দেখা দেয় (Stage of conflict)। পরে এই বিরোধী মতগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পুনরায় সঙ্গতি স্থাপন করে পরিপূর্ণ সমাধানের মধ্যে প্রাথমিক সঙ্গতির অবস্থা ফিরে পায় (Stage of re-established harmony)।

তত্ত্বটি সহজবোধ্য করবার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ ব্যবহৃত একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্প হল, এক বনে এক বহুরূপী বাস করত। তার রঙ বদলাত বলে বিভিন্ন মানুষের তার সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন ছিল। তাদের ধারণায় যে অসঙ্গতি তার দূর হল যখন যিনি বার বার তাকে দেখেছেন তিনি বললেন যে এই জন্তুটি রঙ বদলায়। সুতরাং এইভাবে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার অসঙ্গতির ব্যাখ্যা হয়ে গেল। উপরের নীতি অনুসারে জন্তুটির প্রকৃতি কি এই সমস্যার সমাধানে তিনটি অবস্থা পাওয়া যায়। যে দেখেছে কিন্তু প্রতিবাদীর মতের সম্মুখীন হয় নি, তার ধারণা প্রাথমিক সঙ্গতির অবস্থা সূচিত করে। যখন বিপরীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিতর্ক এসে পড়ল তখন পাই সংঘাতের অবস্থা। পরে যখন বহুরূপীর প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে বিতর্কের অবসান হল, তখন তৃতীয় অবস্থায় সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ সমাধানটি পাওয়া গেল।

তিনি এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। মাত্র দুটি অধ্যায় লিখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর তৃতীয় পুত্র তাঁর জীবিত অবস্থায় গ্রন্থখানি শেষ করেন; কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই তিনি

CENTRAL LIBRARY

মারা যান। তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থটি ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম *A Genetic History of the Problems of Philosophy*।

দেশের নিকট তাঁর সব থেকে বড় দান তাঁর সমাজ সংস্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। অতি প্রাচীন কাল হতে কোন রকমে বেঁচে থাকায় হিন্দু সমাজের তিনি কোনো সার্থকতা দেখতেন না। তাঁর ধারণায় এই সমাজের প্রাণ-শক্তি আছে, কিন্তু তা বার্ধক্যের দোষ ক্লেদযুক্ত। সেই আবর্জনা হল কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, নারীদের প্রতি অবহেলা। তাঁর মতে হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন মহত্ত্ব নিহিত আছে যাকে পরিস্ফুট করবার জন্যই হিন্দুসমাজকে সংস্কার করে আবর্জনা মুক্ত করতে হবে। সাম্য প্রচার করা যে ধর্মের মূল নীতি তার মাঝে জাতিভেদের যুক্তি নেই; সর্ব-ভূতে যে ধর্ম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে তার মধ্যে নীচতার স্থান নেই, নারীকে শ্রদ্ধা করা ও পূজা করা যে ধর্মের শিক্ষা, সেখানে নারীপুরুষের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার অনুমোদন নেই।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে যখন বুলাভাই প্যাটেল ভারতীয় আইন সভায় অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক আইনের প্রস্তাব করেন, মুরলীধর সংস্কার-বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও সেই প্রস্তাবিত আইনের সপক্ষে তুমুল আন্দোলন চালান। এই জন্য বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয় এবং তিনি এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সমিতির উদ্যোগে মেদিনীপুরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার প্রথম সমাজ সম্মেলনের বৈঠক হয়। তার সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে তিনি হিন্দুসমাজের কতকগুলি দোষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের সংস্কারের প্রস্তাব করেন। অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন তাদের অন্যতম। ফলে তিনি কোনো মহলে যেমন প্রশংসা পান অন্য মহলে তেমন শ্লেষাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রশংসা করে 'প্রবাসীতে' সম্পাদকীয় উক্তি করেন। অপর-পক্ষে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'নায়কে'র সম্পাদকীয়তে 'মেদিনীপুরে মুরলীধ্বনি' নাম দিয়ে অনেকগুলি ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করেন। আরও দুঃখের কথা সমাজের রক্ষণপন্থীদের চাপে সরকার কাজের মেয়াদ এক বছর কমিয়ে দেন। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের সক্রিয় ভূমিকা নেবার জন্য তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল।

শেষ জীবনে অবসর গ্রহণের পর তিনি সমাজ-সংস্কার ও নানা জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে বসে জ্ঞান সাধনা করতেই ভালবাসতেন। তিনি এত স্বল্পভাষী ছিলেন যে অনেকে উপহাস করে বলতেন, তার কারণ সম্ভবত তাঁর কথক পিতা তাঁর সব কথা আগেই বলে গেছেন।

তা সত্ত্বেও জনহিতকর কার্যে তিনি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। সমাজ সংস্কারের জন্য, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেবার জন্য, জাতিভেদ দূর করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কত বিধবা বিবাহে, কত অসবর্ণ বিবাহে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। যেখানে উৎপীড়ন বা লোকনিন্দার ভয়ে পুরোহিতের সাহায্য পাওয়া যায় নি, সেখানে তিনি নিজে পৌরোহিত্য কার্য সম্পাদন করেছেন। দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জে তাঁর বাসস্থান ছিল। এই বালিগঞ্জের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তিনি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বালিগঞ্জের প্রথম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন এবং বহু বৎসর তার কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বালিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিদ্যালয় তাঁর নাম দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং পরবর্তী-কালে তার যে কলেজ শাখা গড়ে ওঠে তা পৃথক হয়ে একই নামে চিহ্নিত হয়। বালিগঞ্জে অবস্থিত কর্পোরেশনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর কয়েকদিন রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেদিন বালিগঞ্জবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে কার্পণ্য করেনি।

CENTRAL LIBRARY

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১৮৭০—১৯২০

নির্মলেন্দু ভৌমিক

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পৈতৃক নিবাস ছিল নবদ্বীপ। এঁদের বংশের নাম—সরযূপারী গ্রহ বিপ্রবংশ। পিতার নাম—পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। সতীশচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। মৃত্যু ১৯২০ খ্রীস্ট সনে।

ছাত্রজীবনে কৃতী ও পরিশ্রমী ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে পাশ করলেন মাইনর (এখনকার ষষ্ঠ শ্রেণী)। তারপর অনলস ভাবে চলল বিদ্যাসাধনা। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করেছেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে পালি ভাষাতে এম. এ. পরীক্ষায় সতীশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। স্যার আশুতোষের প্রয়াসেই এই প্রথমবার পালিতে এম. এ. পরীক্ষা নেওয়া হয়। সতীশচন্দ্রই ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে প্রথম মানুষ যিনি পালিতে এম. এ.। তাঁর পালি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ রাইজ্ ডেভিড্স্। সতীশচন্দ্রের উত্তরপত্র পড়ে অধ্যাপক ডেভিড্স্ এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেজিস্ট্রারের কাছে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে একটি চিঠি লেখেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্রের ধারা সম্বন্ধে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Doctor of Philosophy উপাধি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Griffith পুরস্কারও তিনি অর্জন করেছিলেন।

নবদ্বীপের 'বিদ্বজ্জননী সভা'-গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়ে সতীশচন্দ্র 'বিদ্যাভূষণ' হন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পড়াশোনা ও অন্যান্য কর্মের জন্যে সতীশচন্দ্রকে নানা দেশ ভ্রমণ করতে হয়েছে। এর মধ্যেও তাঁর পাঠস্পৃহা ও জ্ঞানান্বেষণবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের অনুগ্রহে তিব্বতে যান। তাঁর পদটি ছিল অনুবাদকের। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের সঙ্গে তিনি তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত অভিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশেই বৌদ্ধ দর্শন ও পালিভাষার উচ্চতর অধ্যয়নের উদ্দেশে সতীশচন্দ্রকে সিংহলের কলম্বো বিদ্যোদয় কলেজে প্রেরণ করা হয়। সিংহল থেকে ফিরে এসে সতীশচন্দ্র কাশীতে বেদ, জৈন, দর্শন ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের পাঠ নেন। প্রখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত থিবোর কাছে তিনি জার্মাণ ভাষা ও ইউরোপীয় দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। এ অবশ্য পড়েছিলেন কলকাতাতেই।

এম. এ. পাশ করেই সতীশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে—সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। অধ্যক্ষরূপে তাঁর এই নিয়োগের পশ্চাতে তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষের বিশেষ তৎপরতা ছিল।

সেই আশুতোষই যখন ১লা জুন, ১৯১৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন শুরু করেন, তখন প্রাকৃত পড়াবার জন্যে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে সতীশচন্দ্রকে নিযুক্ত

CENTRAL LIBRARY

করেন। যোগ্যজনকেই তিনি এনেছিলেন। এ বিভাগের যখন প্রথম পত্তন হল, তখন চারজন পুরো সময়ের অধ্যাপক এবং সতেরো জন আংশিক সময়ের অধ্যাপক ছিলেন। সতীশচন্দ্র সেই সতেরোজনের অন্যতম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি দীর্ঘকাল এখানে অধ্যাপনা করবার সুযোগ পান নি। কিছুকাল অধ্যাপনা করবার পরই ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হল।

সতীশচন্দ্র একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বুদ্ধদেব', 'পালি ব্যাকরণ', আত্মতত্ত্ব প্রকাশ', এবং ন্যায়দর্শনের আলোচনা (ইংরেজী অনুবাদ) জ্ঞানিজনের সশ্রদ্ধ প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থখানি তাঁর একটি সুখপাঠ্য জনপ্রিয় গ্রন্থ। এইজন্য গ্রন্থটির সামান্য পরিচয় দিই।

'বুদ্ধদেব' (কার্ত্তিক, ১৩১১; অক্টোবর, ১৯০৪; জি. সি. বসু এণ্ড কোং, বসু প্রেস, ৬৩ নং বেচু চাটুজ্জের স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত) গ্রন্থটি বসুপ্রেসের 'সাহিত্যরত্ন গ্রন্থাবলী'র প্রথম গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৭। নামপত্র এইরকম: বুদ্ধদেব / অর্থাৎ / গৌতমবুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবনচরিত ও উপদেশ / কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, / লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী ও বেঙ্গল / এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য / শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ. প্রণীত।

গ্রন্থের ভূমিকায় সতীশচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে তাঁর ধর্মপ্রাণতার একটি সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, 'অধুনা এতদ্দেশে বৌদ্ধসাহিত্য পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন আমি তাঁহাদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র ব্যক্তি। বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব অবিকৃতভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই আমার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদর্শনের সম্যক আলোচনাও আমার অন্যতম লক্ষ্য। তদনুসারে এই 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ বিরচিত হইল।'

ব্যক্তিগত জীবনে সতীশচন্দ্র বিশেষ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। পাণ্ডিত্যের কোনো অভিমানই তাঁর ছিল না। সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে অনেকেরই স্নেহ ও শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির। পরোপকারপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক। এমন মানুষকে অধ্যাপকরূপে পেয়ে বাংলা বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

CENTRAL LIBRARY

শশাঙ্কমোহন সেন

১৮৭২—১৯২৮

তারাপদ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের আদি যুগে অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন শশাঙ্কমোহন সেন। অধ্যাপকরূপে ইনি দীনেশচন্দ্র সেন, যোগীন্দ্রনাথ বসু (মাইকেল জীবনী প্রণেতা), বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার (বঙ্গবাণী সম্পাদক) ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী। কৌতুকের কথা—ইঁহারা এম. এ. পড়াইতেন বটে কিন্তু নিজেরা এম. এ. পাশ করেন নাই। শশাঙ্কমোহন সেন ছিলেন বি. এ., বি. এল.—চট্টগ্রামের উকিল। স্যার আশুতোষই ইঁহাকে অধ্যাপনা কর্মে অনুপ্রেরণা দেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. অধ্যাপকের চাকুরী দেন। আশুতোষ যে সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন এবং উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারিতেন ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। শশাঙ্কমোহন সেন ছিলেন প্রকৃতই আদর্শ পণ্ডিত এবং আদর্শ অধ্যাপক।

শশাঙ্কমোহনের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমার এম. এ. পড়ার কিছু আগেই তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার সাক্ষাৎ-ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, রিপন কলেজের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ কাঁঠাল, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুধীর দাশগুপ্ত, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ইঁহাদেরই নিকটে শশাঙ্কমোহনের কথা শুনিয়াছি।

সহকর্মী যোগীন্দ্রনাথ বসু ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতো শশাঙ্কমোহন সেনও ছিলেন কবি। তাঁহার প্রধান কাব্য 'সিন্ধুসঙ্গীত', 'শৈল সঙ্গীত' ও 'ব্যোম সঙ্গীত' বা 'বিমানিকা'। তিনি দুইটি নাট্য-কাব্যও রচনা করেন 'সাবিত্রী' ও 'বিশ্বামিত্র'। তাঁহার শেষ জীবনের কাব্য 'রূপসুন্দরী' অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত। কবি হিসাবে তিনি কিন্তু খ্যাতি-লাভ করেন নাই। চমৎকার কল্পনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য রচনায় যথোচিত পারিপাট্যের অভাব ছিল, বিশেষতঃ তাঁহার কাব্য ভাষা ছিল তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রামের মতোই বন্ধুর ও সুদৃঢ়—উহাকে ঠিক সুললিত বা সুমসৃণ বলা চলে না। সে-যুগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রচণ্ড তেজে দীপ্যমান, তাঁহার জ্যোতিচ্ছটায় সমসাময়িক অনেক কবি-জ্যোতিষ্কই ম্লান হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক।

শশাঙ্কমোহন সেনের প্রকৃত পরিচয় তিনি সার্থক অধ্যাপক এবং সাহিত্য সমালোচক। অধ্যাপনা সম্বন্ধে শুনিয়াছি—ছাত্রদের নিকটে তিনি নিজেকে নিঃশেষে দান করিতেন। পাঠ্য বিষয়কে ছাত্রের শুধু বুদ্ধিগত নহে, মর্মগত করারও চেষ্টা ছিল তাঁহার সাধনা। পাঠতন্ময়তা ছিল তাঁহার স্বভাব। কবিতার ও নাটকের ক্লাসে হইয়া উঠিতেন রসস্রষ্টা অভিনেতা। শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরীর কাছে শুনিয়াছি একবার দীনেশচন্দ্র সেন কীর্তন গানের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানে ছাত্র শিক্ষক সকলেই শ্রোতারূপে উপস্থিত। হঠাৎ দেখা গেল—উপবিষ্ট শশাঙ্কমোহন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, একেবারে আত্মহারা—তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছে সুরের ও তালের লীলায়িত দোলা—অপূর্ব নৃত্য ঠিক 'অভিনয়-দর্পণে'র মূর্ত দৃষ্টান্ত—

আঙ্গেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥

CENTRAL LIBRARY

যতো হস্তো স্ততো দৃষ্টি যতো দৃষ্টি স্ততো মনঃ।
যতো মনো স্ততো ভাবো যতো ভাব স্ততো রসঃ।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি দেখা দিয়াছিলেন সার্থক প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক রূপে। প্রবাসী, নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ইহাদের প্রতিটি গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, তাৎকালিক সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে এই সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা দেখা যায়; যেমন ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা মানসী পত্রিকার মন্তব্য—'শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাঙ্গালা ছন্দ' এ-সংখ্যার প্রবাসীতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।' কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯১৫ সালে 'বঙ্গবাণী' নামে ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে বৃন্দাবন-চন্দ্র বসাক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

শশাঙ্কমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁহার তেজস্বিতা, অকুতোভয়তা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার সমালোচনা-গ্রন্থ 'মধুসূদনে' ও 'বাণীমন্দিরে' পরিস্ফুট। এই দুইটি গ্রন্থ রচনার কারণ প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ। সে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ইতিহাস, এখানে সংক্ষেপে সে কথা বলা যাইতে পারে।

বাংলা ১২৮৪ সালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ (বয়স ১৬) 'ভারতী' পত্রে মেঘনাদবধ কাব্যের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। বালক-সমালোচকের এই সমালোচনায় বাংলার মহাকবির সুপ্রতিষ্ঠ মহিমা প্রায় ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের অনুরাগী সেকালের লেখকদের কেহই রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের সদুত্তর দিতে পারেন নাই,—ঠিক বালক অভিমন্যুর শরবর্ষণে কুরু মহা-রথীদের দশা। দুই একজন এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন মাত্র, সত্যকার যুক্তি কেহই উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। ফলে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর মাইকেল অবজ্ঞাত হইয়া ছিলেন। [জনান্তিকে বলা চলে এখনও কোন কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক মধুসূদনকে কবি বলিয়া স্বীকার করেন না—বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্য-চর্চা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

পরবর্তী কালে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোক্ত মধুসূদন-সমালোচনার রূঢ়তার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু কখনই তিনি এই লেখায় প্রকাশিত যুক্তিকে অস্বীকার করেন নাই। কাজেই বঙ্গসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

শেষে ইংরেজি ১৯২১ সালে 'গোপালদাস চৌধুরী' বক্তৃতামালায় অর্থাৎ 'মধুসূদন তাঁহার অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' গ্রন্থে সর্বপ্রথম* শশাঙ্কমোহন সেনই যথার্থ অব্যর্থ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করেন—রবীন্দ্রনাথের কথা অযৌক্তিক; মধুসূদনের রচনার দোষ নহে, প্রকৃত ত্রুটি রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথেরই সংকীর্ণ দৃষ্টিতে; রবীন্দ্রনাথ অসম্যক্-দর্শী, তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচন 'অন্ধের হস্তিদর্শন' মাত্র। যুগন্ধর কবি মাইকেলের কলঙ্কমোচনের জন্য বঙ্গদেশ শশাঙ্কমোহনের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে।

এইখানে কৌতূহলী পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন—রবীন্দ্রনাথ এমন কী যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন যাহার উত্তর খুঁজিতে বাঙ্গালীর চুয়াল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়াছে?

মাইকেল লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে একজায়গায় আছে—**'I despise Ram and his rabble, but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.'**

* পরবর্তী কালে কবি মোহিতলাল মজুমদার মেঘনাদবধ কাব্যের প্রশস্তি রচনা করেন, শশাঙ্কমোহন সেনের 'মধুসূদন' গ্রন্থই তাহার উৎস।

CENTRAL LIBRARY

কিশোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্য না বুঝিয়া ইহাকেই মধুসূদন-বধে মূল মারণাস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—সীতা হরণকারী পাপিষ্ঠ রাবণের স্মরণে যাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় এবং ধার্মিক রামচন্দ্রের স্মরণে যাঁহার ঘৃণা, এ-হেন ব্যক্তিকে মহাকবি কেন, কবিও বলা চলে না। এ-যুক্তি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মাস্ত্র। কে ইহার প্রতিবাদ করিবে?

দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর পরে শশাঙ্কমোহনের কথায় বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল—ইতরতা নহে, মহত্ত্বই প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের কল্পনা উত্তেজিত করে। স্বল্পবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের মর্মস্থলে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়াই এ-কথা বুঝিতে পারেন নাই।

শশাঙ্কমোহন যেন দেখাইলেন—রাবণ নহে, রামলক্ষ্মণই নারীর সম্ভ্রমহানি-কারী ও বর্বর অত্যাচার-কারী; রাবণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র—তাহাও ভদ্রভাবে ও বিনা-অত্যাচারে। সেকালে নাসিকাচ্ছেদ ছিল ব্যভিচারিণীর দণ্ড। শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন শুধু বর্বর অত্যাচার নহে, ইহার দ্বারা রামচন্দ্র রাবণ ভগিনীকে ব্যভিচারিণীরূপে চিহ্নিত করিয়া দেন—অর্থাৎ রাবণের শুদ্ধান্তঃপুরের কলঙ্ক ঘোষণা করেন। ভগিনীর প্রতি রামের এই জঘন্য অপমান সহ্য করা রক্ষোরাজ রাবণের পক্ষে কাপুরুষতা মাত্র। সীতাহরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহার প্রতিশোধ (আধুনিক ভাষায় 'বদলা') সম্ভব নহে (১ম সর্গে 'অভাগী' শূর্পণখাকে স্মরণ করিয়া রাবণের বিলাপ দ্রষ্টব্য)। তথাপি রাবণ রামের মত অভদ্র নহেন। তিনি যে সীতার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই তাহার প্রমাণ চতুর্থ সর্গে সরমার প্রতি সীতার উক্তি—'বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি' ইত্যাদি। মেঘনাদবধের রাবণ যে আসলে প্রোমিথিউস প্রভৃতির ন্যায় নিয়তিপিষ্ট মহাপ্রাণ বীররূপেই অঙ্কিত, তাহা নানাভাবে দেখাইয়া শশাঙ্কমোহন মাইকেলের কবিত্ব সুপ্রমাণিত করিয়াছেন—ইহাই 'মধুসূদন ও তাঁহার অন্তর্জীবন' গ্রন্থের উৎপত্তির ইতিহাস।

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্র-মতের অযৌক্তিকতার প্রতিবাদেই শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাণীমন্দির' গ্রন্থের উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' অতি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবন্ধ, সূক্ষ্ম চিন্তায় ভাবুকতায় ও ভাষালালিত্যে ইহা বঙ্গ সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট রস-রচনা, তথাপি ইহার মধ্যে যে এক ধরণের অবিচার ও রসগ্রাহিতার যৎকিঞ্চিৎ অভাব আছে তাহা মনস্বী সমালোচক শশাঙ্কমোহনের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে—অপরিণত মনের কিশোর রবীন্দ্রনাথ নহে, পরিণত মনের যুবক রবীন্দ্রনাথই সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের ত্রুটি এই প্রবন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—কাদম্বরী কাব্যে অন্যতম স্ত্রী-চরিত্র 'পত্রলেখার' নারীত্ব কবি বাণভট্টের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছে। পত্রলেখা পূর্ণ যুবতী, কুমার চন্দ্রাপীড়ও অনাত্মীয় যুবক, উভয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পরস্পরের মনে যৌন বাসনা জাগে নাই—ইহা অস্বাভাবিক। বাণভট্টের জবরদস্তিমূলক নীতিবাগীশ-তা হইতেই এইরূপ অস্বাভাবিকতা সম্ভব হইয়াছে, এইজন্য পত্রলেখা হইতেছে বাণভট্টের কাব্যের উপেক্ষিতা। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সময়ে বাংলা দেশে সংস্কৃতজ্ঞ বহু পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাও বাণভট্টের পক্ষে ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। কিন্তু বীরপ্রসবিনী চট্টলার উপযুক্ত সন্তান শশাঙ্কমোহন সেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অথবা রবীন্দ্রভক্তদিগের ভয়ে অন্যায় সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দেখাইয়া দেন—বাণভট্টের চন্দ্রাপীড় ও পত্রলেখা যুবক-যুবতী হইলেও উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ভগিনীভাব যথাক্রমে বর্তমান; এখানে যৌন লালসার বিকাশ পশুত্ব মাত্র, মনুষ্যত্ব নয়, এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ না করিয়া পারেন নাই—

'যৌন উদ্দীপনার বাহিরে যে কোনপ্রকার সৌন্দর্য সংঘটনা, শিল্পরস বা সাহিত্যিক ভাবুকতা থাকিতে

CENTRAL LIBRARY

পারে—উহা যেন আধুনিক ধারণার অগোচর হইয়া গিয়াছে।...সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে কেবল পরস্পরের খাদ্য ও ভোগ্যরূপেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে এই (আধুনিক) আদর্শ। কাদম্বরীর দুর্ভাগ্য—প্রাচীন কবি বাণভট্টের চন্দ্রাপীড় উক্ত আদর্শ সমক্ষে সভ্য (!) সমাজ হইতে নির্বাসন দণ্ড যোগ্য একটা বেকুবি এবং ভুল করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রাপীড় নাকি পত্রলেখার নারীত্বের দাবী উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বেকুব চন্দ্রাপীড় ভগিনীত্ব স্থির করিয়া পত্রলেখার প্রতি নিজের ধর্ম-ভগিনীর মতই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কবি মনে করিয়াছিলেন, তিনি ওইরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অতুলনীয় ভাব-প্রাণ (idealist) চিত্র এবং উহার সৌভ্রাত্র রসের দৃষ্টান্তই সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু আধুনিক কালের realist-এর দৃষ্টিতে চন্দ্রাপীড়ের ওই ধর্মবুদ্ধি ও ভালোমানুষী পত্রলেখার প্রতি একটা অস্বাভাবিক বেয়াদবি বলিয়াই স্থির হইয়া গিয়াছে। উহাতেই আধুনিক কালের 'নারীত্বের দাবী' আদর্শের তরফ হইতে বাণভট্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে—'কবি অন্ধ', একেবারে বে-রসিক! কোন বুদ্ধিমান ভদ্রপুরুষ কিংবা নারী এমন অবস্থায় একেবারে নিরামিষভাবে বসিয়া থাকিতে পারে? বাণভট্টকে ধিক্!' ('বাণী মন্দির', পৃ. ৫৭০-৭১)

কেবল রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, সাধারণভাবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের বহুস্থলে যৌন প্রবৃত্তির ব্যাপকচিত্রণ শশাঙ্কমোহনকে ভাবাইয়া তোলে। তিনি বুঝিতে পারেন—'art for art's sake' নীতি বঙ্গসাহিত্যে ইতরতার জন্য বহুপরিমাণে দায়ী। এই নীতি অবলম্বনে রচিত সাহিত্য হয়ত সৌন্দর্য-সাহিত্য বা রস-সাহিত্য হইতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট ও মহৎ সাহিত্য হইতে পারে না। 'সুন্দরে'র সঙ্গে 'শিবে'র যোগের ফলেই উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্য সম্ভব। শশাঙ্কমোহনের এই সিদ্ধান্ত আমি একসময় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে বলিয়াছিলাম। তিনি এ-মত স্বীকার করেন, বলেন, তাঁহারও ধারণা—'শিবে'ই 'সুন্দরে'র স্বাভাবিক ও সার্থক পরিণতি। দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনান—

রুধির যখন ক্ষীর হয়ে আসে রমণী যখন মাতা,
নয়ন-বহ্নি নীর হ'য়ে যবে আবরে আঁখির পাতা,
তরঙ্গ যবে রঙ্গ ছাড়িয়া হয়ে ওঠে রস-ধারা,
বিশ্বে তখন সুন্দর হয় শিবের মাঝারে হারা।

শশাঙ্কমোহনের মতে এই 'শিব' সামাজিক কল্যাণরূপ সংকীর্ণ অর্থে প্রযোজ্য নহে, ইহা আসলে আত্মার কল্যাণ; মানুষের মনে যে মহত্ত্ব সুপ্ত থাকে—যাহা নিঃস্বার্থ কর্মে, দুঃখবরণে ও আত্মত্যাগে প্রকাশিত হয় তাহাই শিব। এই শিবযুক্ত সত্য বা শিবযুক্ত সুন্দরই হইতেছে সাহিত্যের যথার্থ যজ্ঞ; শিব-হীন হইলে উহা হয় 'দক্ষ-যজ্ঞ' মাত্র। এই মতের প্রতিষ্ঠায় শশাঙ্কমোহন বিশ্ব-সাহিত্য মন্থন করিয়াছেন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—অর্থাৎ একদিকে বাংলা ও সংস্কৃত, অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসী, জর্মাণ, ইতালীয় ও গ্রীকসাহিত্য হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন হাজার পৃষ্ঠার 'বাণীমন্দির'। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এ গ্রন্থ পবিত্র 'মন্দির'ই বটে—যথার্থ জ্ঞানদেবী 'বাণী' ইহাতে প্রতিষ্ঠিত, এই 'বাণীমন্দির' শশাঙ্কমোহন সেনের অক্ষয়কীর্তি।

আমার ধারণা, অনেক পাঠকই এ-বই পড়েন নাই—ইহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৯২৮ সালে ইহার প্রকাশ ঘটে এবং ইহাই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ সংস্করণ। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে (National Library) বর্তমানে একখানি মাত্র 'বাণীমন্দির' আছে—উহা ছিন্ন, জীর্ণ ও অব্যবহার্য। বলাবাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত না হইলে এ-জাতীয় বই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

দুর্ভাগ্যের কথা—সমালোচনা-রীতিমূলক বা সাহিত্য-নীতিমূলক বিশেষ কোন বাংলাগ্রন্থ এখনও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য হইতে পারে নাই। কাজেই বাণীমন্দিরের মতো হাজার পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ দুরাশা মাত্র। এইপ্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহনের শেষদিনের কথা মনে পড়িতেছে।

ইংরাজি ১৯২৮ সাল, ১৬ই এপ্রিল। উন্মাদ কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা আহত হইয়া অসুস্থ শশাঙ্কমোহন দেহত্যাগ করেন। তখন বাণীমন্দির ছাপা হইয়াছে মাত্র, বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। শশাঙ্কমোহনের মহাপ্রয়াণ আসন্ন বুঝিয়া তাঁহার অনুরক্ত অনুচর নগেন্দ্রচন্দ্র পাড়িয়াল (বারুইপুর, মদারাট পপুলার একাডেমির প্রধান শিক্ষক) আপ্রাণ চেষ্টায় দপ্তরীর নিকট হইতে বাঁধাই করিয়া এক কপি বাণীমন্দির লইয়া আসেন। বইখানি দেখিয়া মুমূর্ষু শশাঙ্কমোহনের মুখে একটা ক্লান্ত ম্লান হাসি ফুটিয়া ওঠে, নগেন্দ্রবাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখেন, তাহার পর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

শশাঙ্কমোহনের কথা স্মরণ হইলেই এই শেষ দৃশ্য এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে; দেখিতে পাই—উন্মাদ বাঙ্গালীজাতি তাঁহার উপর উপেক্ষার দণ্ডাঘাত করিয়া তাঁহাকে বিস্মৃতির পারে পাঠাইতেছে, বাণী-মন্দিরের জীর্ণাবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে এবং তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের সহচর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের দিকে করুণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭৭—১৯৩৮

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

'ঐতিহাসিক দিক থেকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের প্রথমতম অধ্যাপকদের অন্যতম, কেননা যে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা'য় এম্. এ. খোলা হলো, সে বছরই তাঁকে আংশিক সময় অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্রের মতোই, তিনি কখনো এম্. এ. উপাধি উপার্জন করেননি; তবু যে তিনি অধ্যাপনার জন্য আহূত হয়েছিলেন—প্রথমে কলকাতা, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—এতে বোঝা যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়িক মহলে তখন পর্যন্ত গুণগ্রাহিতা ছিলো নির্বাধ, ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতার স্বীকৃতি। মানতেই হবে, এর পিছনে ছিলো স্যর আশুতোষের উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি যেমন দীনেশচন্দ্র সেনের যোগ্যতার মূল্য দিতে দ্বিধা করেননি, তেমনি দীনেশচন্দ্রও নিষ্ঠুঠভাবেই আহ্বান জানিয়েছিলেন 'নেহাৎ সাহিত্যিক' চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে।'—এই কথাগুলি লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু ১৩৭৩ সালের দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায়।

কিভাবে আমার পিতা স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহূত হন তার বিবরণ দিই।

আমার তখন বালক বয়স। তবু বেশ মনে আছে যে, একদিন সন্ধ্যার দিকে আমাদের শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়ীতে দোতলার পূর্বমুখী বড় ঘরটির মধ্যে গলাবন্ধ কোট-পরা এক ব্যক্তি এসে প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোকটির মুখে হাসি, চোখে অতুলনীয় দীপ্তি। তিনি ঘরে ঢুকতেই আমার পিতা তাঁকে আহ্বান জানিয়ে নমস্কার করলেন, ভদ্রলোকটি প্রতিনমস্কার করলেন। বাবা কয়েকদিন যাবৎ শয্যাগত—হঠাৎ পা মচ্‌কে যাওয়ায় ঘরের মধ্যেই বদ্ধ। সেই ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই, না একটি খাট, না একটি চেয়ার। মেঝের উপর বিছানা পাতা, সেই শয্যায় বাবা উঠে বসেছেন—আগন্তুক ভদ্রলোকটি কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বসে পড়লেন ঘরের জানালার চওড়া ধাপির ওপর। শুরু হল দুজনের কথাবার্তা।

আগন্তুক ঐ ভদ্রলোক দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি কথায় কথায় বললেন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম্. এ. পড়ানো ও বাংলায় এম্. এ. ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা শীঘ্রই শুরু হবে।

বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সম্মানিত স্থান দেবার জন্য স্যার আশুতোষ উদ্যোগী হয়েছেন জেনে বাবা আনন্দিত হলেন এবং স্যার আশুতোষকে তাঁর আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে অনুরোধ করলেন। দীনেশচন্দ্র বললেন, স্যার আশুতোষই তাঁকে আমার বাবার কাছেপাঠিয়েছেন। যাঁরা মাতৃভাষার সেবায় রত, তাঁদের সহায়তা তিনি চান। বাংলা পড়ানোর জন্য স্যার আশুতোষ আমার পিতার সহায়তা চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বাবা তখনই রাজি হয়ে গেলেন।

দীনেশচন্দ্র বললেন, 'তোমাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়াবার ভার নিতে হবে।'

CENTRAL LIBRARY

কথাবার্তা শেষ হল। বিদায় নেওয়ার সময়ে দীনেশচন্দ্র বললেন, 'তুমি যে বাংলা বিভাগে পড়াতে রাজি আছো তা জানিয়ে স্যার আশুতোষকে একখানি চিঠি লিখে দাও।'—বাবা তখনই স্যার আশুতোষের কাছে একখানি স্বীকার-পত্র লিখে দিলেন।

কিন্তু এই স্বীকৃতি-পত্র লিখে দিয়ে বাবা মহা চিন্তায় পড়লেন এবং বিব্রত বোধ করলেন। তিনি ভাবলেন—সময়ের ওপর তাঁর স্বাধিকার কই! তিনি ত' তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ—এই দুখানি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। মাসের অর্ধেক দিন তাঁকে প্রবাসীর জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়—প্রবাসীর বিভিন্ন বিভাগের জন্য নানাবিধ রচনা লিখতে হয়। বাকি অর্ধেক দিন তাঁকে মডার্ণ রিভিউয়ের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। পত্রিকা দুখানিতে তিনি পুরো সময়ের জন্য নিযুক্ত।

কাজেই তিনি ভাবলেন, রামানন্দবাবুর মত না নিয়ে দীনেশবাবুর কথায় স্যার আশুতোষের কাছে স্বীকৃতি জানিয়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। যাই হোক্, স্বীকৃতি যখন জানানো হয়ে গিয়েছে তখন রামানন্দবাবুর কাছে সম্মতি চাওয়া যাক্।

সেই সময়ে রামানন্দবাবু ছিলেন গিরিডিতে। বাবা সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে তাঁকে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠির উত্তর এলো—সে চিঠিতে রামানন্দবাবু তাঁর সানন্দ-সম্মতি জানালেন। রামানন্দবাবুর চিঠি পাবার পরে বাবা স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করেন। স্যার আশুতোষ এম্. এ.-র জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বইগুলির মধ্য থেকে যে কোন একটি বই বেছে নেবার জন্য বাবাকে বলেন। বাবা কবিকঙ্কণ চণ্ডীই বেছে নেন। সেই দিনই বাবা স্যার আশুতোষকে বলেন—বিদেশের অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশে কি পড়ানো হবে পূর্বাহ্নেই তার একটি synopsis দেওয়া হয়। শুনেই স্যার আশুতোষ বলেন—'তুমি যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্পর্কে একটি synopsis of lectures তৈরী করো, ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তা ছাপাবার ব্যবস্থা হবে এবং তখন তা ছাত্রদের কাছে দেওয়াও যেতে পারবে।' অতঃপর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে তিনি ক্লাশে আলোচনা করবেন, তা বাবা লিপিবদ্ধ করেন। সেটি ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় এবং সেটি ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করাও হয়েছিল।

স্যার আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাতের অল্প কিছুদিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ানো যখন পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল, তখন বাবা একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডী অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি ঠিক বই-ই বেছে নিয়েছ। তুমি পড়াতে আরম্ভ করার আগে ঐ বই সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করব।'

এরপর বাবা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বার বার মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি পড়েছেন—পড়তে পড়তে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছে। কবিকঙ্কণের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা, কাব্যমধ্যে ব্যবহৃত পৌরাণিক-প্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা তাঁর মনে এক এক করে সৃষ্টি হয়েছে। সেই সকল জিজ্ঞাসা নিরসনে তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পুরানো বইয়ের দোকানে খুঁজে খুঁজে এক এক করে প্রায় সমস্ত পুরাণ-গ্রন্থ, তন্ত্রের বই এবং অন্য বেশ কিছু সংখ্যক প্রয়োজনীয় বইও কিনে কিনে সংগ্রহ করেছেন। পড়তে পড়তে যা মনে হয়েছে, যে সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে জেগেছে, সবই বইয়ের মার্জিনে টুকে রেখেছেন—পাছে ভুলে যান এই আশঙ্কায়। বাবার নিজের হাতে এমনিতর মার্জিনে নোট করা তিনখানি বিভিন্ন সংস্করণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তাঁর সংগ্রহশালায় আজও আছে।

CENTRAL LIBRARY

মুকুন্দরামের কাব্য কিছুটা পড়ে নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আবার গিয়েছেন শান্তিনিকেতনে—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য ; কিন্তু গিয়ে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতে মুকুন্দরামের কাব্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে মুকুন্দরামের কাব্যখানি বাবা রেখে এলেন—রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে। তিনি লিখে তাঁর মন্তব্য জানাবেন বললেন।

কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

কল্যাণীয়েষু,

কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট করে রেখেছি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (ইংরাজি ১৭ মে ১৯১৯)।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা তাঁর কবিকঙ্কণ চণ্ডী বইখানি ফেরৎ পেলেন—বইয়ের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য মূল্যবান্ মন্তব্য। কবির মন্তব্যগুলি দীর্ঘ নয়, তবে দীপ্তিময়—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পড়ে কবির মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিচায়ক। ১৩৭৩ সালের 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় (জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত) দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'মঙ্গলকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে আমি একটি নিবন্ধ লিখি। নিবন্ধটি পরে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর মূল্যবান্ গ্রন্থ 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের' মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন (দ্রষ্টব্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য : পঞ্চম সংস্করণ—১৯৭০ : পৃষ্ঠা ১৩৭—১৫৭)। আমার লেখা উক্ত নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সেই সকল মন্তব্য আমার পিতার দৃষ্টি এবং সমালোচনা-ভঙ্গিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল বোধিনীর ভূমিকাতেই লিখে গেছেন—তিনিই (রবীন্দ্রনাথ) প্রথমে তাঁহার মন্তব্যের দ্বারা আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। এই তথ্য আমি পরে আন্তর ও বাহ্য বহু প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি বোধ হয়।'

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভালভাবে মনের মতো করে পড়াবার জন্য আমার পিতা সে সময়কার বহু মনীষীরও শরণাপন্ন হয়েছেন। মুকুন্দরামের কাব্য সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কাছে এবং এই দুই মহামনীষীর কাছ থেকে অনেক জিজ্ঞাসার মীমাংসা পেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখে গেছেন, 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তখন খুব পীড়িত। তথাপি তিনি দুই-তিন দিন আমাকে অনেক বিষয়ে উপদেশ ও সন্ধান দিয়াছিলেন। তারপর সর্ববিদ্যাবিশারদ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি স্বাভাবিক সৌজন্য ও অমায়িকতার বশে তাঁহার আশ্চর্যজনক জ্ঞান-ভাণ্ডার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত তিন দিন পরেই তিনি মহীশূরে চলিয়া গেলেন।'

মুকুন্দরামের কাব্যখানি সংস্কৃত জ্ঞানবিদ্যার ভাণ্ডার, বিভিন্ন পৌরাণিক allusions পরিপূর্ণ। সেই সব পৌরাণিক allusion-সমূহের সমাধানের জন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের শরণাপন্নও হয়েছেন। এঁদের একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, অন্যজন আমার পিতার বাল্যবন্ধু পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী।

CENTRAL LIBRARY

এঁদের কাছ থেকেও বাবা অনেক কিছুই জেনেছেন এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পড়াবার সময়ে অথবা চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রকাশ করার সময়ে কাজে লাগিয়েছেন।

পৌরাণিক allusion-সমূহের সমাধানের জন্ত বাবা সবচেয়ে বেশী সহায়তা পেয়েছিলেন ডক্টর ছরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছ থেকে। তবে অল্প কিছুদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার পর হঠাৎ তিনি বিলাত চলে যান।

অতঃপর আমার পিতা স্থির করেন যে নিজেই সমস্ত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রসকল পাঠ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে উল্লিখিত পৌরাণিক কাহিনীগুলির আবিষ্কার ও তাদের ক্রমপুষ্টির ইতিহাস তিনি নির্ণয় করবেন। এ সম্পর্কে চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীর ভূমিকায় আছে—'কিন্তু বই কই! আমার ত' সময় নাই যে কোনো লাইব্রেরীতে গিয়া অধ্যয়নে সময় যাপন করিতে পারিব।'

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় তখন ছিল না। তথাপি তিনি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া এই অপরিচিতকে বিশ্বাস করিয়া ক্রমাগত পুস্তক জোগাইয়াছেন; যখন যে বই চাহিয়া পাঠাইয়াছি, তখনই তিনি অবিলম্বে নিজের গ্রন্থাগার হইতে অথবা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী বা এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী হইতে তাহা আনাইয়া লোক দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; যাহা চাহিয়াছি তাহা ত' পাঠাইয়াছেনই, যাহা না চাহিয়াছি অথচ আমার ক'জে লাগিতে পারে এমন বই তিনি নিজেই নির্বাচন করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে এইরূপ অসাধারণ সাহায্য না করিলে এত পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ আমি পাইতাম না।'

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পড়াবার জন্ত তাঁর মধ্যে জেগেছে অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা। একটি বিষয় সম্পর্কে জানার বাসনা যখনই জেগেছে, তখনই সেই বিষয়টির শেষ না জানা পর্যন্ত তাঁর মন ক্ষান্ত হয় নি। এজন্ত তিনি পাঠার্থী ছাত্রের মত নিষ্ঠা ও কৌতূহল নিয়ে পড়েছেন অসংখ্য বই—আলোচনা করেছেন, যাঁদের নাম আগে উল্লেখ করেছি, তাঁরা ছাড়াও—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে। বাবা প্রায়ই বলতেন,—অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেন একটি জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

প্রবাসীর 'বেতালের বৈঠক' বিভাগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-সম্পর্কিত অমীমাংসিত বহু প্রশ্ন মুদ্রিত হয়েছে এবং বহু ব্যক্তি সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা পাঠিয়ে আমার পিতার সহায়তা করেছেন।

ক্লাশে পড়ানো আমার পিতার কাছে ছিল আনন্দ—সাধনা। স্বর্গত ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছে যা শুনেছিলাম, তাই লিখি। তিনি বলেছিলেন—পড়াতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ আনন্দে আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, রাঙা হয়ে যেত। একজন পণ্ডিতের মনন এবং রসিকের রসবোধ—এ দুয়ের সমন্বয় আমরা তাঁর মধ্যে পেতাম। তাছাড়া, তখন তিনি একদিকে ক্লাশে চণ্ডীমঙ্গল পড়িয়েছেন, নানা আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে অজস্র নোট লিখেছেন। সেই সব নোট ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন নকল করে নেবার জন্ত।

প্রায় প্রতিদিনই পড়াতে শুরু করেই ভাষাতাত্ত্বিক নোট লিখে আমার পিতা ক্লাশের blackboard ভরে ফেলতেন। উদ্দেশ্য চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সুস্পষ্ট করা। এ সম্পর্কে একদিনকার একটি ছোট্ট ঘটনা বলি।

তখন সবেমাত্র বাংলায় এম্. এ. ক্লাশ শুরু হয়েছে। বিদ্যার্থীমহলে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে যে 'পরগাছা,' 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার এম্. এ. ক্লাশ পড়াতে আসবেন।

CENTRAL LIBRARY

একদিনকার কথা—ক্লাশ হচ্ছে, বাবা পড়াচ্ছেন।

বোর্ড ভরে গিয়েছে, কেউ কেউ নোট নিচ্ছেন। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলায় এম্. এ. ক্লাশের প্রথম বছরের জনৈক ছাত্র) তাঁর পাশের ছাত্রকে (শচীন্দ্রনাথ রুদ্রকে—পরে ইনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা ব্যারিষ্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন) চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভাই, সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পড়াবেন কথা ছিল। কৈ তাঁর ক্লাশ ত' এখনও একদিনও হল না?' শচীনবাবুর বাড়ী ছিল শিবনারায়ণ দাস লেনে, আমাদের বাড়ীর বল্‌তে গেলে উল্টো দিকেই। তিনি বাবাকে ভালো করেই চিনতেন। তাই তিনি হেসে উত্তর দিলেন—'এই ত' এখন যিনি পড়াচ্ছেন, তিনি ত' চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শচীন রুদ্রের উত্তর শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ হল না। তিনি মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'আমি বিশ্বাসই করিনে যে আজকের এই অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ত' একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। সাহিত্যিক ইনি হতেই পারেন না।'

সত্যিই প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার অফিসে, কান্তিক প্রেসের দোতলায়, ভারতীর আড্ডায় অথবা সুধীর সরকার মহাশয়ের দোকানের আড্ডায়; কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির সাহচর্যে যখন তিনি থাকতেন, তখন তিনি এক মানুষ। কিন্তু ক্লাশে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ক্লাশে প্রকাশ পেতো তাঁর পাণ্ডিত্য, অবশ্য দরকার মত রসবোধও। কিন্তু ক্লাশের বাইরে পরিচয় পাওয়া যেতো শুধু তাঁর রসসত্তার।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রন্ধনের বিচিত্র বর্ণনা আছে। একদিন পড়ানো শেষ করে বাবা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসেছেন—সেদিন রান্নার বিচিত্র ফর্দ তিনি ক্লাশে বেশ রসিয়ে পড়িয়ে বেরিয়েছেন। ছাত্রেরা তাঁকে ঘিরে ধরে বললেন—সার! চণ্ডীমঙ্গলের রান্নাগুলো খেয়ে পরখ করে দেখলে কেমন হয়।' বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবা রাজি হয়ে গেলেন, বললেন—'বেশ আমার বাড়ীতে ঐ সব রান্না আমি তোমাদের খাওয়াব। তোমাদের সবাইকার নিমন্ত্রণ রইল। তবে 'চিংড়ির বড়া' পর্যন্ত খাওয়াতে পারব—'নকুল গোধিকা-পোড়া' কিংবা 'শিক পোড়া সজারু' খাওয়াতে পারব না, তা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি।'—হাসির রোল উঠল ছাত্রদের মধ্যে।

যাই হোক্, মুকুন্দরামের যুগের রান্না খাওয়ানোর দিন স্থির হয়ে গেল। বাবা নিজে বাজার করলেন, নিজে বসে থেকে সমস্ত রান্নার তদারকি সেদিন করলেন। রাত্রে বাংলার এম্. এ. ক্লাশের ছাত্রেরা সবাই এসেছিলেন, আর এসেছিলেন বাবার বন্ধু বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক। যেমন—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্র দেব, অমল হোম, চিত্রকর চারু রায় প্রভৃতি। এই নিমন্ত্রণ সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখা 'যাঁদের দেখেছি' বইয়ে লিখে গেছেন—

'চারুচন্দ্র একদিন বললেন, প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের কাব্যে মধ্যযুগের বাংলাদেশে প্রচলিত অনেক খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালীরা তখন গোধিকার মাংস পেলেও ছাড়ত না।'

আমি বললুম, 'গোধিকা ত' গোসাপের আর এক নাম।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! সেকালের বাঙালীরা গোসাপ খেতে ভালবাসত।'

কিছুদিন যায়। চারুচন্দ্র একদিন এসে আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, 'কবি মুকুন্দরাম যে খাদ্যতালিকা দাখিল করে গিয়েছেন, তারই কোন কোন খাবার আপনাদের খাওয়াবার চেষ্টা করব।'

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু তাঁর কথা শুনে আশ্বস্ত হলুম না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনার নির্বাচিত খাবারগুলির মধ্যে গোধিকাও আছে ত'?

চারুচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠে অভয় দিয়ে বললেন, 'না হেমেনবাবু, গোধিকাভক্ষণের দুঃসাহস এখনো সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি।'

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পড়ানোর জন্য তিনি পরিশ্রম করেছেন প্রচুর, লিখেছেন অনেক। তাঁর সেই অধীত বিদ্যা এবং লিখিত সিদ্ধান্তগুলি পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। (চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী : প্রথম খণ্ড ১৯২৪ : চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী : দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৮)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর ভার পেয়ে, অর্থাৎ তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের একেবারে প্রথম পর্বেই তিনি যে কী কঠোর পরিশ্রম ও কী গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন তার পরিচায়ক গ্রন্থ 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী'-র দুটি খণ্ড। এইখানে তাঁর যে নিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল, তা বরাবরই ছিল অক্ষুণ্ণ। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি যে যে বই পড়িয়েছেন তারও মধ্যে দুখানি অবলম্বন করে তাঁর দুটি গবেষণাগ্রন্থ বা সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল 'শূন্য-পুরাণে'র সটীক সংস্করণ, অন্যটি 'রবি-রশ্মি'।

আমার পিতার অধ্যাপনা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন—'অধ্যাপনায় তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ ছিলো বললে ভুল হয় না। বন্ধুদের মুখে শুনেছি, চয়নিকার যে কপিটি তিনি ক্লাশে ব্যবহার করতেন, তার পাতায় পাতায় তাঁর স্বরচিত পাণ্ডুলিপি গ্রথিত ছিলো। বহু ব্যাখ্যা, উল্লেখ, ভারতীয় ও বৈদেশিক কবিদের রচনা থেকে তুলনীয় অংশ—এই সব ছিলো ছাত্রদের জন্য তাঁর আয়োজিত ভোজ। পরবর্তীকালে সেইসব মন্তব্য পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে দুই খণ্ড রবি-রশ্মির আকৃতি ধারণ করে।

'রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি তাতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', 'শূন্যপুরাণ'; 'মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক' ও 'বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস' বিষয়ে তাঁর পুস্তক দুটি এবং বিবিধ বিষয়ে তাঁর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত বহু প্রবন্ধ—এইসব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর আগ্রহ ও চর্চার পরিধি কত ব্যাপক ছিলো।'—দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পড়িয়েছেন, তখন তাঁর সৃষ্টিধর্মী লেখনী কিন্তু ক্লান্তি মানে নি বা আদৌ বিরত থাকে নি। বরং ঐ সময়েই তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার একেবারে কোটালের জোয়ার। তখন একদিকে তিনি প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউয়ের কাজ করেছেন—ঐ দুই পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ পূরণ করবার জন্য নানা বিষয়ে রচনা করেছেন, পড়ানোর জন্য নানাবিধ তথ্যানুসন্ধানের পরিশ্রম করেছেন, আবার অন্যদিকে ঐ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার কাল পরিধির মধ্যে তিনি এক এক করে লিখেছেন বারোখানি উপন্যাস, দুটি ছোট গল্পের বই এবং 'বারোয়ারি উপন্যাসে'র ১২।১২ পরিচ্ছেদ। বারোয়ারি উপন্যাস—বারোজন সাহিত্যিক এই উপন্যাসের লেখক। উপন্যাসটি আরম্ভ করেছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শেষ করেন প্রমথ চৌধুরী। মাঝখানে পর পর যাঁরা লেখেন, তাঁরা হলেন—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এ ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন একটি ছোট জীবনী গ্রন্থ—নাম 'রাবেয়া' (প্রকাশকাল ১৩২৯) এবং 'বেদ-বাণী' নামে বেদ-পরিচায়ক একখানি গ্রন্থ (১৩৩০)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সময়ে যে বারোখানি উপন্যাস তিনি রচনা করেন তা হল—১. দুই-তার

CENTRAL LIBRARY

১৩২৪, ২. পঙ্কতিলক ১৩২৫, ৩. হেরফের ১৩২৫, ৪. চোরকাঁটা ১৩২৬, ৫. আলোকলতা ১৩২৭, ৬. দোটানা ১৩২৭, ৭. বিয়ের ফুল ১৩২৭, ৮. মুক্তিস্নান ১৩২৮, ৯. পারুল (১৩২৮ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত) পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৩৩০, ১০. সর্বনাশের নেশা ১৩৩০, ১১. জোড়বিজোড় ১৩৩১, ১২. নোঙর ছেঁড়া নৌকা ১৩৩১। এই বারোখানি উপন্যাসের মধ্যে কয়েকখানিই রসিক ও মননশীল জনমণ্ডলীর দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়েছে। এরই মধ্যে কোন কোন উপন্যাসকে আধুনিককালের কোন কোন খ্যাতিমান্ লেখক আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করেছেন।

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে নবীন কথাসাহিত্যকগণ দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা গল্পসাহিত্যের আধুনিক পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, চারুচন্দ্রের নাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবার যোগ্য। যে বাস্তবতা ও স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধগত বিশ্লেষণমুখিতা এখনকার কথাসাহিত্যে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহার পূর্বাভাস চারুচন্দ্রের গল্পে ও উপন্যাসে পাওয়া যায়। চারুচন্দ্রের পুস্তকগুলি আধুনিক যুগধারাকে আগাইয়া আনার সহায়করূপে অবশ্যই স্মরণীয় থাকিবে।' শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল : যুগান্তর ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

এই সময়ে আমার পিতার দুটি ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়, সে দুটির নাম ১. মণিমঞ্জরী ১৩২৪, ২. কনকচূর ১৩২৫।

স্যার আশুতোষ বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে তাঁর প্রতি বাবার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে বাবা তাঁর 'চোরকাঁটা' নামক উপন্যাসখানি স্যার আশুতোষকে উৎসর্গ করেন। তাছাড়া, 'চোরকাঁটা' উপন্যাসখানি যখন বেরুল, তখন ঐ বইয়ের দু কপি বিশেষভাবে বাবা তাঁর নিজের পছন্দমত অতিশয় সুদৃশ্য করে বিলিতি নরম ভালো চামড়ায় বাঁধাই করে আনেন এবং তারই এক কপি স্যার আশুতোষকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে দিয়ে আসেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বোধিনীর প্রথম খণ্ডও স্যার আশুতোষকে উৎসর্গীকৃত। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি স্যার আশুতোষের তিরোধানের পর প্রকাশিত হয়। এজন্য বাবার আক্ষেপের অন্ত ছিল না এবং চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বাবা সে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবা তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সুগভীর প্রীতি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়েছেন। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কথা উল্লেখ করে আমার এই নিবন্ধ সমাপ্ত করি—

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্ভুত নিয়ম অনুসারে অনার্স ছাত্রদের মাতৃভাষা বাংলা পড়তে হতো না; তাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ছাত্র হবার সুযোগ আমি পাই নি। কিন্তু আমি জানতাম, তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন—আর সেটাই শিক্ষক-জীবনের উচ্চতম সার্থকতা। বিদ্যার্থীদের মৌখিক ভক্তি সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের ভালোবাসা পেতে হলে বহুগুণের সমন্বয় চাই—শুধু পাণ্ডিত্য নয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ, মনোহর ব্যক্তিত্ব, প্রসন্ন বাচনভঙ্গি, স্নিগ্ধ আচরণ এবং চারিত্রিক উদারতা। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই সব গুণের সমন্বয় ঘটেছিলো।'—দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩।

CENTRAL LIBRARY

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৮৮৫—১৯৬৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৯২৮ সনে যখন আমি সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখন পরলোকগত অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (পরে তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক হয়েছিলেন) আমাকে ভাষাতত্ত্বের কোন বিষয় পড়াবার জন্যে ক্লাসে এলেন। তিনি প্রথম দিনই আমাকে বললেন, 'ভাষাতত্ত্ব আমি তোমাকে পড়াব না, পূজোর ছুটি পর্যন্ত অর্থাৎ তিন মাস আমি আছি। তারপর শহীদুল্লাহ সাহেব আসবেন, তাঁর কাছেই পড়বে। তিনি প্যারিস থেকে ডি. লিট্ উপাধি নিয়ে দেশে ফিরছেন। ছুটির পরই যোগদান করবেন।

সদ্য আই. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলাম; কোন বিষয় সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কোনই জ্ঞান কিংবা ধারণাই হয় নি। সুতরাং ভাষাতত্ত্ব কি যে এমন জটিল বিষয়, তা' প্যারিস থেকে শিখে এসে আমাদের পড়াতে হবে, তা' বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। তবু যিনি প্যারিস থেকে এত বড় ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরছেন, তাঁর কাছে পড়বার এবং তাঁর কাছ থেকে প্যারিসের গল্প শুনবার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হ'লো। তাঁর জন্য অধীরভাবে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পূজোর ছুটির আগেই অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে খুব ঘটা করে বিদায় সম্বর্ধনা জানালাম। পূজোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হ'য়ে গেল।

ছুটির পর প্রথম দিনেই ভাষাতত্ত্বের ক্লাস ছিল, আগেই শুনেছি, শহীদুল্লাহ সাহেব আজ ক্লাস নিবেন। আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন বিদেশী পোষাক-পরা ছোট খাট মানুষ, ঘনকালো গোঁপ দাঁড়িতে মুখটি প্রায় আচ্ছন্ন, ক্লাসে এসে ঢুকলেন। বুঝ্‌তে পারলাম, ইনিই শহীদুল্লাহ সাহেব। আমি দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালাম।

তিনি বসেই বল্লেন, আর ছাত্র কোথায়?

আমি বল্লাম, আর কেউ নেই! আমি একাই আছি। তিনি সহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, তুমি একাই ছাত্র? তা' বেশ তুমি একাই পড়্‌বে। আমি বল্‌লাম, আর একজন ছাত্র আমার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত সন্দেহ করে পুলিশ তা'কে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখেছে, আমি খবর পেলাম, তাকে আর ছাড়বে না।

তিনি একটু শঙ্কিত হয়ে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, যেন, আমাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান।

আমি নিজে থেকেই বল্লাম, না, আমি সন্ত্রাসবাদী নই, তবে পুলিশ এখন অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকেই আটক করে রাখছে। ঢাকায় এই আন্দোলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র নেই।

CENTRAL LIBRARY

তিনি আর কিছু না বলে রেজিস্ট্রি খুললেন, খুলে আমার নামটি দেখলেন। সেখানে দু'টি নাম একটি ক্রমাগত অনুপস্থিত। সুতরাং যে উপস্থিত তার নামটি যে কি তা' অতি সহজেই বুঝতে পারলেন।

তথাপি জিজ্ঞেস করলেন, আশুতোষ ?

আমি বল্লাম, হাঁ স্যর।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি জান এক আশুতোষের কাছে আমার ঋণ কত গভীর ?

আমি কিছুই জানতাম না, বললাম, না স্যর, কিছুই জানি না।

তিনি বললেন, তাঁর জন্যই আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি, আজ যে দেখছ আমি বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে ঘুরে এসেছি, তাও তাঁরই জন্য।

আমি তখন পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

আমি বললাম, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ?

তিনি বললেন, সাধারণ লোক তাঁকে তাই বলে জানে, কিন্তু আমার কাছে তিনি আরও অনেক বেশি। তিনি আমার পিতৃতুল্য, তাঁর নিকট আমি পিতৃঋণে আবদ্ধ।

আমি বেশ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ স্যর, আমি জানি, তিনি অনেকেরই অনেক উপকার করেছেন, যেমন দীনেশচন্দ্র সেন...

তিনি আমাকে একরকম ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি কিছুই জান না, তোমার জানবার কথাও নয়। সব কথা এখনও কেউ জানে না, তোমার কাছে সে কথা কিছু কিছু বলব, তাতে আমার মন কিছুটা হাল্কা হবে, তুমিও বুঝতে পারবে, তিনি কেবল ভাইস্ চ্যান্সেলারই ছিলেন না, তাঁর মহত্ত্ব কতদিকে প্রসারিত হয়েছিল।

ধমক খেয়ে আমি চুপ ক'রে গেলাম, ভাবলাম, যে বিষয়ে কিছু জানি না, সে বিষয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

তারপর দিনের পর দিন নানাপ্রসঙ্গে স্যর আশুতোষ সম্পর্কে আমাকে যে কত গল্প শুনিয়েছেন, তা' আজ সকল স্মরণ করতে পারব না।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সর্বপ্রথম ছাত্র। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব বিষয়টি সেদিন তাঁকে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়েছিল। তিনি ১৯১০ সনে কোলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ পাশ করেন। একজন মুসলমান ছাত্র সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ পাশ করেছে ব্যাপারটি তখনকার কোলকাতার বিদ্বৎসমাজে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে। সকলেরই কৌতূহল তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়।

বি.এ অনার্স পাশ করবার পর তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম.এ. পড়বার জন্য যথারীতি ভর্তি হন। অত্যন্ত আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে যখন তিনি সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস ক'রে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। এম. এ ক্লাসে বেদ পড়াবার জন্য নূতন একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন, তিনি সত্যব্রত সামশ্রমী। তিনি শহীদুল্লাহ সাহেবকে বেদ পড়াতে অস্বীকার করলেন। অহিন্দুর বেদ পড়বার অধিকার নাই এই তাঁর বিশ্বাস ছিল। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বৈদিক সাহিত্যে সে যুগে অসাধারণ

CENTRAL LIBRARY

পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি যে বিষয়ে অস্বীকার করেছেন, তাঁকে যুক্তিতর্ক দিয়ে আবার সেইবিষয় স্বীকার করানো কারো সাধ্য ছিল না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা স্যর আশুতোষের পক্ষ থেকেও সে চেষ্টা আর কেউ করলেন না। অনেকেই শহীদুল্লাহ সাহেবকে সংস্কৃতে এম. এ পড়া থেকে নিরস্ত হ'তে পরামর্শ দিলেন, কেউ কেউ তাঁকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিবার কথাও বললেন।

এই নিয়ে এই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে দেশে তুমুল বাদানুবাদ চলতে লাগল। উদারপন্থী পত্রিকাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগল, রক্ষণশীল পত্রিকাগুলো ব্যাপারটাকে সমর্থন করতে লাগল। স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় কার্য পরিচালনায় কোন হস্তক্ষেপ ক'রে দেশের সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের বিরাগভাজন হ'তে চাইলেন না।

শহীদুল্লাহ সাহেব এই সকল বাদানুবাদের মধ্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন, নিজেও কোন বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন না, কিংবা বাইরের বিক্ষোভের মধ্যেও যোগ দিলেন না। এই ঘটনাটি ভারতের অন্যত্রও সকল-শ্রেণীর শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শিক্ষাজগতে এই ঘটনাটি 'Shahidullah Affair' নামে পরিচিত হয়েছিল।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি, শহীদুল্লাহ সাহেব নিজে এই আন্দোলনে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। এই ঘটনাটি প্রায়ই আমার কাছে উল্লেখ ক'রে তিনি বলতেন, ইচ্ছা থাকলে সবই হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সংস্কৃতে এম এ পড়তে দেয় নি ব'লে কি আমি সংস্কৃত শিখি নি? দেখ, আমার কত সংস্কৃত বই? পণ্ডিতমশায় আমাকে বেদ পড়াতে চান নি'। দেখ, সমগ্র বেদের সংগ্রহ আমার লাইব্রেরীতে আছে। তার জন্য কারো উপর আমার কোন মান-অভিমান নেই।

এ কথা সত্য, এই ঘটনার জন্য কারো বিরুদ্ধে তিনি কোনদিন কোন অভিযোগ করেন নি। এমন কি, যে বৈদিক পণ্ডিত তাঁকে তাঁর জ্ঞাবা অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেছিলেন, তাঁরও পাণ্ডিত্যের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে তিনি পড়তে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করতেন।

স্যর আশুতোষের বিরুদ্ধেও এই বিষয়ে কোন অভিযোগ করবার কথা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন নি। বরং স্যর আশুতোষ পণ্ডিতদিগের ধর্মবিশ্বাসে যে আঘাত করেন নি, সেজন্য তাঁকে প্রশংসাই ক'রেছেন। কারণ, শহীদুল্লাহ সাহেব নিজেও স্বধর্মে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন, সেজন্য সর্বদাই অন্যেরও ধর্মবিশ্বাস রক্ষা পাক, তাই কামনা করতেন। সেইজন্য এই ঘটনায় বাইরে যে প্রতিক্রিয়াবই সৃষ্টি হোক, তা' কোনমতেই তাঁকে নিজেকে স্পর্শ করতে পারে নি। ঘটনাটি বর্ণনা ক'রে তিনি কৌতুক অনুভব করতেন মাত্র, কোন দিন ক্রোধ কিংবা অভিমান প্রকাশ করতেন না। যখন সংস্কৃতে এম. এ. পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না, তখন তিনি বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' (Comparative Philology) বিষয়ে এম. এ. পড়তে আরম্ভ করলেন, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় নি। ১৯১২ সনে শহীদুল্লাহ সাহেব এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এম. এ. তে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাসেও ভর্তি হয়েছিলেন। দু'বছরের মধ্যেই তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায় করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। ১৯১৪ সনের মার্চ মাস থেকে তাঁর জন্মস্থানের অদূরবর্তী ২৪ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র সদস্য ছিলেন। এম. এ. পাশ করবার আগে

CENTRAL LIBRARY

থেকেই তিনি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন বাংলা ভাষা সম্পর্কে নানাপ্রবন্ধ রচনা করতে আরম্ভ করেন। গুণগ্রাহী স্যর আশুতোষের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হয়। শহীদুল্লাহ সাহেব যখন বসিরহাট মহকুমা আদালতে ওকালতি করছিলেন, তখন স্যর আশুতোষ হাইকোর্টের পক্ষ থেকে একদিন বসিরহাট মহকুমা আদালত পরিদর্শন করবার জন্য যান। সেখানে শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্যর আশুতোষ শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখবামাত্র বলে উঠেন, শহীদুল্লাহ, আদালত তোমার জন্য নয়, তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কাজ দেব, তুমি সেখানে চলে এস।'

শহীদুল্লাহ সাহেবও কিছুকাল আদালতে যাতায়াত করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সত্যই আদালত তাঁর জন্য নয়। সুতরাং স্যর আশুতোষের কথা শুনে তিনি হাতে স্বর্গ পেলেন। স্যর আশুতোষ মাসিক দুই শ টাকা মাহিয়ানায় তাঁকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে শরৎচন্দ্র লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক নিযুক্ত করলেন। ১৯১৯ সনের ১লা জুন তিনি কাজে যোগদান করেন। সেই বছরই কিছুদিন আগে স্যর আশুতোষের একান্ত প্রচেষ্টায় বিভাগটি স্থাপিত হয় এবং বিভাগটি স্থাপিত হ'বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্যর আশুতোষ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করেন; তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব।' ১৯২০ সনে তিনি বিভাগের একজন 'লেকচারার' রূপেও কাজ করেছেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৭১)র উৎসর্গ পত্রে স্যর আশুতোষের প্রতি এই বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন—

'যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 'Shahidullah, Bar is not for you, come to University' বলে আমাকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করে আমার জীবনের গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল।'

কিন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বেশীদিন স্থায়ী হলেন না। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'লো এবং সেখানকার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'লেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাসমিতির মাধ্যমে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ পরিচয় ছিল এবং তিনিও শহীদুল্লাহ সাহেবের পাণ্ডিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করতেন।

শহীদুল্লাহ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেকচারার পদের জন্য প্রার্থী হলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ সাহেব তখনকার রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে গবেষণা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি দীনেশচন্দ্রের গভীর বিশ্বাস ছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, বেশি মাইনে পাবার আকর্ষণে শহীদুল্লাহ সাহেব কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি প্রার্থী হয়েছেন, তখন তিনি স্যর আশুতোষের নিকট গিয়ে তাঁকে আরও কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের মধ্যেই রেখে দিবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। এই সম্পর্কে 'আশুতোষ-স্মৃতিকথা'য় দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

'শহীদুল্লা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ২৫০ টাকা বেতন পাইতেন, ঢাকা হইতে তাঁহাকে ৪০০ টাকা বেতন দেওয়ার প্রস্তাব আসিল। শহীদুল্লাহ আমাকে বলিলেন, 'আর ৫০ টাকা আশুবাবু আমাকে বাড়াইয়া দিন, আমি থাকিয়া যাইব—আমার পরিবার বৃহৎ। আমার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।' শহীদুল্লা বাঙ্গালা বিভাগে ছিলেন, আশুতোষ জানিতেন, ইঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। ইনি ইংরেজি, ফরাসী, উর্দু, আরবী, পারসী, সংস্কৃত, প্রাচীন বাংলা প্রভৃতি বহু ভাষা ক্ষেত্রে শুধু কৃতী নহেন, বিশেষজ্ঞ। আমি বলিলাম, এমন লোককে

CENTRAL LIBRARY

৫০টি টাকা বাড়াইয়া রাখা উচিত। কিন্তু দূরদর্শী স্যর আশুতোষ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বরং এই বিষয়ে তিনি একটু কঠিন মতামত প্রকাশ করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার অর্থকৃচ্ছতা বিষয়ে যাঁর সামান্যও জ্ঞান আছে, তাঁর কাছে স্যর আশুতোষের এই সিদ্ধান্ত যথাযথ বলেই গণ্য হ'বে।'

স্যর আশুতোষ সেদিন যা বলেন, তা' দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষাতেই বলি, তিনি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখছেন, স্যর আশুতোষ তার উত্তরে তাঁকে বলেন —

'আপনি শুধু শহীদুল্লাকে দেখিতেছেন, আর ১০।১২ জন অধ্যাপককে দেখিতেছেন না। সকলের উপরই যে আকর্ষণ আসিয়াছে, অনেকেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছেন, কিছু কিছু বেতন বাড়াইয়া দিলে ইঁহাদের অনেকেই থাকিয়া যাইবেন; আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহারা অনেক লোভ সম্বরণ করিতে প্রস্তুত। কিছু বিবেচনা আমরা করি, এইরূপ ন্যায্য দাবী অবশ্যই তাঁহারা করিতে পারেন। শহীদুল্লাকে ৫০ টাকা বাড়াইয়া দিবার অর্থ হইতেছে যে, মাসিক ২।৩ হাজার টাকা আমাকে সর্বসাকুল্যে বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। কাহারও নিকট প্রস্তাব আসিয়াছে এবং আর কাহারও নিকট প্রস্তাব আসিবে। সকলেরই বেতন বাড়াইবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হইয়া শহীদুল্লার বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আর যাঁহারা অপর স্থানে যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন না, অথচ এখানে যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন, সহকর্মীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করাও তো সঙ্গত হইবে না কো।' কিছুক্ষণ থামিয়া তিনি বলিলেন, 'এইরূপ প্রলোভনে যাঁহারা ছাড়িয়া যাইবেন, তাঁহাদের দাবীর প্রশ্রয় দেওয়াও আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। যে কেহ অপর স্থানে বেশি টাকা পাইয়া যাইবেন, তিনিই ঐরূপ দাবী উপস্থিত করিবেন। স্বাভাবিকক্রমে এই স্থানে থাকিয়া যাঁহারা বেতনের উন্নতির প্রত্যাশা করিবেন, আমরা যদি যথাসময়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অবশ্যই তাহা করিব। আমাদিগের উপর এই বিশ্বাসটুকু না থাকিলে আমরা কি করিতে পারি?'

কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেবের কোন উপায় ছিল না, 'তাঁহার পরিবার বৃহৎ' এ কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। সেইজন্য অনন্যোপায় হয়ে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি সেদিন পরিত্যাগ করে ১৯২১ সনের জুন মাস থেকেই নূতন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যোগদান করেন। ঐ বছরই জুলাই মাস থেকে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। শহীদুল্লাহ সাহেব তার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের বাংলা বিশেষতঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বইখানি পড়াতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সর্ববিষয়ে অত্যন্ত নিবিড় যোগ রক্ষা করে চলতেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ১ম খণ্ড বইখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। এমন কি তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ কোনদিনই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। তিনি প্রায় সারা জীবনই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ের গবেষণার পরীক্ষক ছিলেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পরলোকগত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শহীদুল্লাহ সাহেবের পরম বন্ধু ছিলেন। যে কোন উপলক্ষেই হোক, শহীদুল্লাহ সাহেব কোলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেতেন না। তাঁর উদার ব্যবস্থাপনায় শহীদুল্লাহ সাহেব পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পরও এবং দুই দেশের মধ্যে সকল প্রকার টাকা কড়ি আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেলেও পরীক্ষক হিসাবে তাঁর পারিশ্রমিক লাভ করতে কোন বাধা পেতেন না। তা কি করে সম্ভব হতো তা একটু খুলে বলা আবশ্যক। তার ভিতর দিয়েও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। শহীদুল্লাহ সাহেবের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট গবেষণা-পরীক্ষক হিসাবে যখনই যা প্রাপ্য হ'তো, তা' বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ স্বর্গত সতীশচন্দ্র ঘোষের ব্যবস্থাপনায় এবং শহীদুল্লাহ সাহেবের নির্দেশে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের নিকট জমা থাকত। শহীদুল্লাহ সাহেব যখনই কোলকাতা আসতেন, তখনই নগদ তা' তাঁর হাতে দিয়ে দেওয়া হ'তো। তাঁর প্রাপ্য কোন পারিশ্রমিক থেকেই তাঁকে বঞ্চিত হ'তে হয় নি। এই ভাবে দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা আদান-প্রদান অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাঁর প্রাপ্য তার হাতে পৌঁছে দিতেন। পাকিস্তানের আমলেও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন। কোন দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ যথার্থ অর্থে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে দিবার পর পুনরায় তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তখন সার আশুতোষ বেঁচে ছিলেন না, সেই জন্যই তাঁর আবেদন পত্র সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি বলে অনেকে মনে করতেন।

১৯৩২ সনে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। সেই শূন্য পদে বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও একজন প্রার্থী হ'লেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে আচার্য সুশীলকুমার দের অধীনে একজন 'লেকচারার'। এইপদের জন্য আচার্য দে-ও একজন প্রার্থী হলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব একদিন আমাকে বল্লেন, 'এই পদে ডক্টর দের মত যোগ্য প্রার্থী আর কেউ নেই, তবে দীনেশবাবু বল্লেন তাই আমি আমার একখানি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলুম। স্যর আশুতোষ বেঁচে থাকলে হয়ত তিনি আমার কথাও ভাবতেন। তবে ডক্টর দে ঐ পদে নিযুক্ত হলে যোগ্য প্রার্থীই নিযুক্ত হয়েছেন ব'লে আমার মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না। দীনেশবাবু না বল্‌লে আমি দরখাস্ত পাঠাতুমই না।'

এই পদের জন্য আরও অনেকেই প্রার্থী হ'য়েছিলেন এবং প্রার্থীদের গুণাগুণ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানারূপ মন্তব্যও করা হয়েছিল। অন্য একজন মুসলমান লেখকের বইকে শহীদুল্লাহ সাহেবের রচিত বাংলা ভাষার নিদর্শন ব'লে উল্লেখ ক'রে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রার্থী হওয়া সম্পর্কে মন্তব্য ক'রেছিলেন,—

'ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তাঁহার সংস্কৃত আরবী ও ফারসীতে বিদ্যাবত্তা বশতঃ দীনা বঙ্গভাষার ধনদৌলত অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে।'...

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র নিযুক্ত হলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব নিযুক্ত না হ'বার জন্য 'প্রবাসী' পত্রিকা তাঁর সম্পর্কে পুনরায় লিখেছিল,—

'অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষাতত্ত্বে প্রভূত জ্ঞান আছে। হয় ত আবেদকদিগের মধ্যে তিনিই এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—যদিও এ বিষয়ের চর্চা আমরা করি নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। ডক্টর শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত আরবী পারসী প্রভৃতি ভাষা জানেন।' (আশ্বিন, ১৩৩৯)।

কিন্তু আগেই বলেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শহীদুল্লাহ সাহেবের যোগ কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয় নি। তিনি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ের পরীক্ষক থাকতেন এবং পাকিস্তানের আমলেও বিশ্ববিদ্যালয় যে তাঁকে কিভাবে পরীক্ষক রেখে যথাযথ পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থাও করেছিল, তার কথাও আগে উল্লেখ করেছি।

১৯৬৭ সনে আমি যখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদ লাভ করলাম, তখন এই সংবাদটি

CENTRAL LIBRARY

তাঁকে জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে যে পত্র লিখেছিলাম ৮৩ বৎসর বয়সে তখন তিনি নিজের হাতে লিখে তার যে জবাব দিয়েছিলেন, তা' নিয়ে উদ্ধৃত করছি। এই চিঠিখানি শুধু আমার নিকটই তাঁর শেষ চিঠি তাই নয়—হয়ত তাঁর জীবনের নিজের হাতে লেখা শেষ চিঠি। কারণ, এই চিঠি লেখার ২।৩ দিনের মধ্যেই তিনি আকস্মিক অসুস্থ হ'য়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন; তারপর অবশিষ্ট জীবনে নিজের হাতে আর চিঠি লিখতে পারেন নি। তাঁর অজ্ঞাতে তাঁকে দিয়ে টিপ সই করিয়ে নিয়ে তাঁর দস্তখতের কাজ করা হতো। এই চিঠিখানির মধ্যে তখন পর্যন্তও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁর একদিনকার সহকর্মীদের সম্পর্কে যে কত কৌতূহল তখনও তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল, তা' অনুভব ক'রে বিস্মিত হ'তে হয়। তাঁর জন্মভূমি পশ্চিম বাংলায় একবার আসবার জন্য তাঁর করুণ আকুতি প্রকাশ পেয়েছে এই চিঠিতে—

পেয়ারাভবন
৭৯, বেগমবাজার রোড, ঢাকা—১
১২-১০-১৯৬৭

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার ২।১০।৬৭ তারিখের পত্র ১০।১০।৬৭ তারিখে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম, তোমার পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি, চিরং জীবতু, সুখী ভবতু।

দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপ জন্মভূমিও বদলায় না। আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়া তোমাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু নানাকারণে তাহা ভাগ্যে ঘটিবে কি না জানি না।

আমি গত ১লা এপ্রিল বাংলা একাডেমী হইতে অবসর পাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor-এর পদ স্বীকার করিয়াছি। আমি বাংলা একাডেমীতে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে ১৩২০'০০ টাকা মাসিক বেতন পাইতেছিলাম। সেখানে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান সম্পাদন শেষ করিয়াছি। তাহার দুই ভল্যুম প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় ভল্যুম যন্ত্রস্থ। আমার দ্বিতীয় কার্য ইসলামী বিশ্বকোষও শেষ হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার ছাপা আরম্ভ হয় নাই। সুনীতিবাবু আঞ্চলিক বাংলা ভাষা অভিধানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ৫০০'০০ টাকা সৌজন্যমূলক ভাতা দিবেন। কোন কাজের নির্দেশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিবার কোনও আদেশ নাই। ইহা যাবজ্জীবনের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে আমারই জন্য সর্বপ্রথম এই পদ সৃষ্টি করা হইল। তজ্জন্য আমি ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমি এক্ষণে আমার রচিত বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণের জন্য ব্যাপৃত আছি। ছাপা শেষ হইলে তোমাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে তোমার গবেষণার অনেক স্বীকৃতি আছে।

ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার রায় (সেন ?) প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করি। জানিনা এ জীবনে এই বাসনা পূর্ণ হইবে কি না। সুনীতিবাবু Indian (National) Professor-এর পদ পাইয়াছেন, শুনিয়াছি। উহার মাসিক ভাতা কত জানি না। আমি ভাল আছি। আমার ৮৩ বৎসর বয়স চলিতেছে। তোমার দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ইতি

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

CENTRAL LIBRARY

মণীন্দ্রমোহন বসু

১৮৮৫—১৯৫২

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. ক্লাসের পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীগণ এখনও ছাত্রবৎসল অধ্যাপক ও নিরভিমান গবেষক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের কথা মনে করিতে পারিবেন। আমরা তাঁহার প্রবীণ বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. ক্লাসের ছাত্ররূপে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ১৯৪২ সালের ঘোর বর্ষাকালে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হইয়া বাংলা বিভাগে আসিয়া দেখিলাম পুঁথিশালার টেবিলের ধারে গৌরবর্ণ ঋজুকায় এক প্রৌঢ় অধ্যাপক পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া একখানি মোটা গ্রন্থে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কাছে যাইতে ভরসা হইল না। হঠাৎ চোখ তুলিয়া তিনিই সদয়ভাবে কাছে ডাকিলেন। তাঁহার আহ্বানে দূর হইতেই যেন তাঁহার উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শ পাইলাম। তিনি মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পরিচয় লইতে লাগিলেন, যেন আমি তাঁহার পূর্বপরিচিত। তাঁহার মাথায় শুভ্র কেশরাশি প্রবীণতার নিশানা উড়াইয়া দিয়াছিল। অতিশয় সাধারণ বেশবাস, ধুতির উপরে সামান্য একটি লংক্লথের সার্ট। তিনি অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবু, তাহা পূর্বেই বেয়ারার নিকট জানিয়াছিলাম। মণীন্দ্রমোহন বসু তখন দুই চক্ষুতে কৌতূহলের দীপ জ্বালাইয়া কি যেন একখানা মোটা বহি পড়িতেছিলেন। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধানের এক খণ্ড। মণীন্দ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন যে, অভিধান হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারা যায়। তিনি সারা জীবন ধরিয়া নানা অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে ভিড়িয়াছিলেন, অনেক শিখিয়াছিলেন, দুর্মেধস ছাত্রসম্প্রদায়কে অনেক কিছুই শিখাইতে চাহিয়াছিলেন। চর্যাগীতি, বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত সর্বত্র তাঁহার অবারিত গতিবিধি ছিল। পরম ভক্তিভাজন আচার্যের দক্ষিণ পাণির অজস্র দান কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি জানি না।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে (১৮০৬ শক) ২১ বৈশাখ রবিবার মাতুলালয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কনকসার গ্রামে মণীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস—বিক্রমপুরেরই পূর্ব-শিমুলিয়া গ্রাম। গ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৭ অথবা ১৯০৮ সালে ঢাকা হইতে বি. এ. পাশ করেন। গ্রাজুয়েট মণীন্দ্রমোহন অর্থকরী চাকুরী ছাড়িয়া স্বল্প বেতনের স্কুল মাস্টারী গ্রহণ করিলেন এবং ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুরের এক ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ভাওয়াল রাজবাটীর সংযোগ স্থাপিত হয়। ভাওয়ালের মেজকুমার, রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের (ভাওয়াল-সন্ন্যাসী) তিনি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, উক্ত মেজকুমারকে তিনি বিশেষ কিছুই শিখাইতে পারেন নাই, শুধু নাম সহিটি শিখাইয়াছিলেন। তিনিই স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন, কুমার বাহাদুর তাহার উপর দাগা বুলাইয়া মক্শ করিতেন এবং কোনও প্রকারে নাম স্বাক্ষর রপ্ত করিয়া তদ্দ্বারাই বিষয়কর্ম নির্বাহ করিতেন। মণীন্দ্রমোহন মাঝে মাঝে আমাদিগকে হাসিয়া বলিতেন, তোমাদের মেধা মেজকুমার অপেক্ষা অধিক কিনা পরীক্ষার খাতায় তাহার প্রমাণ দিতে হইবে, শুধু মক্শ করিলে এবং দাগা বুলাইলে চলিবে না। বহুকাল পরে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা চলাকালে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন—ভাওয়াল সন্ন্যাসী, মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

CENTRAL LIBRARY

সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরের পুরাতন ঘটনা-সংক্রান্ত দুই-চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মণীন্দ্রমোহন বুঝিতে পারিলেন আগন্তুক যথার্থই তাঁহার পুরাতন ছাত্র রমেন্দ্রনারায়ণ। কুমারের অনুরোধে তিনি বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সাক্ষী সংখ্যা—৪২৫ নম্বর। রাণী বিভাবতীর পক্ষের ব্যারিস্টার এ. এন. চৌধুরী মণীন্দ্রমোহনকে তিন দিন ধরিয়া জেরা করিয়া একটুও হেলাইতে-টলাইতে পারিলেন না। সত্যসন্ধ মণীন্দ্রমোহন সত্যের অনুরোধে রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

১৯১৫ সালের দিকে মণীন্দ্রমোহন কলিকাতায় আসিয়া দু-একটি সওদাগরি আফিসে কিছুদিন কাজকর্ম করিয়াছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল; বাংলা, সংস্কৃত ও পালিভাষায় তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হইলে প্রথম বৎসরের (১৯২০) পরীক্ষায় বসিয়া মণীন্দ্রমোহন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন, প্রথম হইয়াছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন। কিছুদিন গবেষণা করিয়া মণীন্দ্রমোহন ১৯৩১ সালে বাংলা এম. এ. বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করিলেন। বিশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া বার্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি ১৯৫০ সালে অবসরগ্রহণ করেন। অবসর লইয়াও তিনি কর্মস্থান ভুলিতে পারেন নাই, প্রায়ই বাংলা বিভাগে আসিতেন, ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিতেন।

মণীন্দ্রমোহন দিবারাত্র অধ্যয়ন করিতেন, গবেষণার কথা চিন্তা করিতেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার কথা ভাবিতেন। সময় পাইলেই পুঁথি পড়িতেন, পুঁথির Descriptive Catalogue তৈয়ারি করিতেন। মোট কথা অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই ছিল ধ্যান ও সাধনা। বাহিরের দিকে তিনি সরল ও সাদাসিধা প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার শিশুসুলভ সারল্য লইয়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় মাঝে মাঝে কৌতুকরসসিক্ত আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিতেন। আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও তাহার কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতাম। মণীন্দ্রমোহন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিতেন, 'বিশ্বপতি বড়ো দুষ্ট।' এখনও যেন তাঁহার সেই প্রাণখোলা হাসি শুনিতে পাইতেছি, সেই কৌতুক-প্রফুল্ল মুখের প্রসন্নতা লক্ষ্য করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের (১৯৫০) পর অধ্যাপনা হইতে বঞ্চিত হইয়া মণীন্দ্রমোহন কেমন যেন মনমরা হইয়া গেলেন। আপনভোলা অবস্থায় যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কখনও কখনও বাংলা বিভাগে হাজির হইতেন, কখনও বা সেনেট হলের সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। পুরাতন ছাত্রেরা দেখিতে পাইলে তাঁহাকে রিকসায় তুলিয়া লইয়া বেলেঘাটার বাসাবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিত। অবসর গ্রহণের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার গৌরবর্ণ মলিন হইতে শুরু করিয়াছিল, শরীরে ভাঙনের রেখা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, বেশ-বাসেও কোন শ্রীছাঁদ ছিল না। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে তিনি যে মন সঁপিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঘরে ফিরিয়া আর বাগ মানিল না। শেষ জীবনে তাঁহার মানসিক সুস্থতা কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় আটষট্টি বৎসর বয়সে ১৯৫২ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার মণীন্দ্রমোহন মর্ত্যধাম ত্যাগ করেন।

বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় মণীন্দ্রমোহন যে অনুসন্ধিৎসা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার জন্য শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নহে, সমগ্র বাংলাদেশ তাঁহাকে দীর্ঘকাল স্মরণে রাখিবে। বাংলা পুঁথিবিভাগের আজ যে সুশৃঙ্খল বিন্যাসব্যবস্থা দেখা যাইতেছে তাহার অনেকটাই মণীন্দ্রমোহনের পরিশ্রমপ্রসূত। বস্তুতঃ এই পুঁথিগুলি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমরা ছাত্রের দল বিবর্ণ পুঁথির স্তূপ দেখিলে তাঁহার সম্মুখ হইতে পালাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তিনি পলাতক ছাত্রদের সহজে রেহাই দিতেন না, পাকড়াও করিয়া পুঁথিপড়া শিখাইতেন। বুদ্ধিমান সহপাঠীরা পাশ কাটাইত, আমরা দুই-একজন অকৌশলী ছাত্র

CENTRAL LIBRARY

সে বেড়াজাল ছিঁড়িতে পারিতাম না। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পুঁথি পাঠের চেষ্টা করিতাম। কীটদষ্ট তুলোট কাগজে পিপীলিকার সারির মতো কালো কালো অক্ষরগুলিকে মহেঞ্জোদড়োর লিপি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তিনি হাল ছাড়িতেন না, অতিশয় যত্ন করিয়া আমাদিগকে পুঁথি পড়িতে উৎসাহিত করিতেন। পরবর্তী কালে পুঁথির রাশি পড়িতে পড়িতে গলদঘর্ম হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার কথা বার বার স্মরণ করিয়াছি।

মণীন্দ্রমোহনের প্রথম গ্রন্থ *The Post Caitanya Sahajiyā Cult of Bengal* ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যের একটি অনালোচিত অধ্যায় সম্বন্ধে পাঠক সমাজ কৌতূহলী হইল। প্রথম গ্রন্থেই তাঁহার গবেষণার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনভজন, দর্শন, কৃত্য ও রচনাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতো অভিজ্ঞ গবেষক আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। পরবর্তী কালে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং সম্প্রতি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-এশিয়া ভাষাকেন্দ্রের অধ্যাপক এডোয়ার্ড ডিমক বৈষ্ণব সহজিয়া সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম গবেষকের প্রাপ্য সম্মান হইতে মণীন্দ্রমোহনকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সহজিয়া সাহিত্য ও দর্শন আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রচুর পালি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। পালি ভাষায় তিনি এইভাবে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যক্ষ) আনুকূল্যে মণীন্দ্রমোহন পালি ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক বলিয়া পালি সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করেন। পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্মে তাঁহার অভিজ্ঞতা শুনিয়া লণ্ডনের পালি টেক্‌স্‌ট সোসাইটীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ধর্মপালাচার্যের 'পরমত্থ-দীপনী-ইতি বুত্তকট্‌ঠকথা'* সম্পাদনার ভার দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় বসিয়াই বহু পালি পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যে 'পরমত্থ'-এর প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদনা করেন। উক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী সি. এ. এফ. রিজ ডেভিড্‌স্‌ মণীন্দ্রমোহনের ধৈর্যের প্রশংসা করিয়া লিখেন: 'On behalf of the Society I thank him very sincerely for his patient labours.' এই পালি গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে গিয়া মণীন্দ্রমোহন নানা স্থান হইতে পালি পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সিংহলী ও শ্যামদেশীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহের জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা সফল হইয়াছিল। শুধু ব্রহ্মদেশীয় কোন পুঁথি বা মুদ্রিত পালিগ্রন্থ পান নাই বলিয়া ভূমিকায় কিছু সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *The Journal of the Department of Letters* এর কয়েক খণ্ডে ইংরেজী ভাষায় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে পাঠকেরা তাঁহার প্রতিভার সম্যক্‌ পরিচয় পাইবেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মণীন্দ্রমোহনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ দীনচণ্ডীদাসের বিশাল পদসংগ্রহের পুঁথি আবিষ্কার করিয়া ও সম্পাদনা করিয়া (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'দীনচণ্ডীদাস' ১ম খণ্ড—১৯৩৫; ২য় খণ্ড—১৯৩৮) চণ্ডীদাস সমস্যার *gordian knot* মোচনের অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইলে প্রাচীন সাহিত্যামোদী ও চণ্ডীদাস-রসিক বাঙালী সমাজে মতামতের যে প্রচণ্ড ধূলিঝড় সৃষ্টি হইয়াছিল, মণীন্দ্রমোহন দীনচণ্ডীদাসকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে সোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন এবং জটিল তর্ক উত্থাপন করিয়া প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বড়ু চণ্ডীদাসকে ও উত্তর-চৈতন্যযুগে দীনচণ্ডীদাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুদৃঢ় যুক্তির ঢালে লাগিয়া প্রতিপক্ষের তীক্ষ্ণ শায়ক ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল। কৃত্তিবাস

* Paramatha-Dipanī Iti-Vuttakaṭṭhakathā—Vol. I. Edited by M. M. Bose, M. A., The Pali Text Society, London, 1934.

CENTRAL LIBRARY

কোন্ রাজার সভায় হাজির হইয়াছিলেন সে-বিষয়েও নানা সাময়িকপত্রে তিনি বহু তথ্যগত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যে' (১ম ও ২য় খণ্ড) এই সমস্ত তথ্য অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হইয়াছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সংক্রান্ত বিশাল গ্রন্থের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার ফলস্বরূপ দুই বৎসরের মধ্যে 'বাংলা সাহিত্য', ১ম খণ্ড (১৯৪৬) ও ২য় খণ্ড (১৯৪৭) প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খণ্ডে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি একখানি মোটা বাঁধানো খাতা হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে কিছু কিছু অংশ আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 'বাংলা সাহিত্য'-এর তৃতীয় খণ্ড আর বাহির হইল না, সেই মোটা খাতাখানি কোথায় গেল জানি না।

চর্যাপদ, সহজিয়া সাহিত্য ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (অংশতঃ) সম্পাদনা করিয়া মণীন্দ্রমোহন ছাত্রসমাজের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' বহুকাল ছাপা ছিল না, তাহার অভাবে বাংলা ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদিগে অশেষ কষ্ট করিয়া পাঠ্য চর্যাগুলি সংগ্রহ করিতে হইত। মূলতঃ পাঠার্থীদের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ভাষাতাত্ত্বিক টীকা-টিপ্পনী ও সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'চর্যাপদ' (১৯৪৩) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি অদ্যাপি পরীক্ষার্থীদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু তন্ত্র ও ষড়্‌দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধদের যে নিগূঢ় যোগাযোগ ছিল, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের দ্বারা মণীন্দ্রমোহন তাহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

শুধু প্রাচীন সাহিত্য নয়, আধুনিক সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। একবার কৃষ্ণকান্তের উইল পড়াইতে গিয়া স্থির করিলেন যে উক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া একখানি চটি বহি লিখিবেন। কারণ তরুণ ছাত্রেরা কাহিনীর নির্মম পরিণাম কিছুতেই সহিতে পারিত না, শরৎচন্দ্রের তীব্র মন্তব্য তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল হিন্দু মনোবৃত্তির নিন্দা করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই সেকালের কোন কোন পাঠক রোহিণীর হত্যাকাণ্ডের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় তুলিয়া প্রশ্ন করিত, 'রোহিণীকে মারিলেন কেন ?' বঙ্কিমচন্দ্র তিক্তবিরক্ত হইয়া জবাব দিতেন, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' লেখক-প্রদত্ত এই উত্তরে সেযুগের পাঠক শান্ত হইত কিনা জানি না, কিন্তু একালের পাঠকেরা এত সহজে লেখককে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহে। মণীন্দ্রমোহন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নজির তুলিয়া নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়িকার আদর্শে গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর পরিণাম সমর্থন করিতেন। রসশাস্ত্রের স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী নায়িকার আদর্শে আধুনিক কথাসাহিত্য বিচারের পুরাতন মানসিকতা একালের তরুণ ছাত্রেরা সহিতে পারিত না। যেদিন তিনি বলিলেন, 'এই গ্রন্থের নাম কৃষ্ণকান্তের উইলের' পরিবর্তে 'অভিমান' রাখিলেও অসঙ্গত হইত না। অভিমানের প্রাণ গর্ব এবং ক্রোধ ইহার অভিব্যক্তি। গ্রন্থের সর্বত্রই ইহার লীলাখেলা চলিয়াছে' ('কৃষ্ণকান্তের উইল চরিত্রালোচনা, পৃঃ ২০১), সেই দিন হইতে ছাত্রেরা তাঁহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিল। তাহাদের মতে রোহিণীর হত্যাকাণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রের bad art-এর দৃষ্টান্ত। কিন্তু মণীন্দ্রমোহন থামিলেন না, লিখিয়া চলিলেন, 'রোহিণীর হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যেন জড়ীভূত দুর্বলতার সমষ্টিতে রোহিণী গঠিতা হইয়াছিল। একে তো ভোগতৃষ্ণায় সে পাগলিনী, তাহার উপর শক্তিসামর্থ্যহীনা ও স্থিরবুদ্ধিরহিতা হওয়াতে সে কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় আবেগপ্রবাহে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়াছে। কখনও স্থির লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে সংস্কার আসিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাবে ঠেলাগাড়ীর ন্যায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সে মধ্যপথে থামিয়া গিয়াছে, অথবা গতি পরিবর্তিত করিয়া নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়া বসিয়াছে।' (ঐ, পৃঃ ১৫০)। নবীন ছাত্রের দল একথা মানিতে পারে নাই, কিন্তু মণীন্দ্রমোহন নিজ সিদ্ধান্তে অটল

CENTRAL LIBRARY

ছিলেন, রোহিণীর পরিণাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ তিনি পুরোপুরি সমর্থন করিতেন। উক্ত বহি লিখিবার আগে, ছাত্রেরা তাঁহার সহিত একমত না হইলে সহাস্যে তিনি শাসাইতেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মত আগাগোড়া সমর্থন করিয়া তিনি একখানি চটি বহি লিখিবেন। যে কথা সেই কাজ। অচিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল—চরিত্রালোচনা' (১৯৪১) প্রকাশিত হইল। সমালোচকের দল এই বহিখানি পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব বদলাইবেন কিনা জানি না। কিন্তু মণীন্দ্রমোহন, যাহা তাঁহার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হইত, তাহা অকুতোভয়েই প্রকাশ করিতেন। এইজন্য, তাঁহার সাহিত্য-সংক্রান্ত মতামত সম্বন্ধে যেরূপ অভিমতই পোষণ করি না কেন, তাঁহার সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি।*

বেলিয়াঘাটার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি বাসা বাড়ীতে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া মণীন্দ্রমোহন চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন গবেষণার আদর্শ, স্নিগ্ধ চরিত্র ও সুকঠোর ন্যায়ানুবর্তিতা। আমরা কি তাহার যোগ্য হইতে পারিয়াছি ?

* মণীন্দ্রমোহনের জীবনী-সংক্রান্ত তথ্যগুলি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু সংবরাহ করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

১৮৮৯—১৯৬৮

অমিতাভ মিত্র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসে কলকাতার অদূরে আঁড়িয়াদহ গ্রামে প্রসিদ্ধ মিত্রপরিবারে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা কালীপ্রসন্ন তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুরে প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। আইনজীবী হলেও কালীপ্রসন্ন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ও বিশেষ করে প্রাচীনসাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতার সাহিত্যানুরাগ বালক শৈলেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল।

বাল্যকালে পিতৃহারা শৈলেন্দ্রনাথের লালনভার কলিকাতার বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনস্থ মাতামহ রাখালদাস বসু মহাশয় গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ মাতামহের মৃত্যুতে কিশোর শৈলেন্দ্রনাথের পায়ের তলার মাটিটিও যেন অপসারিত হল। কিন্তু পরপর ভাগ্যবিড়ম্বনায়ও শৈলেন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রত অবিচলিত ছিল। এইসময়ে শৈলেন্দ্রনাথের অসাধারণ সাধনা তাঁর পিসতুতো ভাই বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিদ্ আচার্য হরিনাথ দে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হরিনাথের উৎসাহ ও নির্দেশনায় শৈলেন্দ্রনাথ তৎকালীন ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু এবারেও ছিল তাঁর ভাগ্য অপ্রসন্ন। তাই পরীক্ষার কয়েকমাস আগেই হরিনাথের মৃত্যু শৈলেন্দ্রনাথের জীবনের ধারাকে আমূল পরিবর্তিত করল। হরিনাথের সান্নিধ্য শৈলেন্দ্রনাথকে বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায় প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং উত্তরকালে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী ছাড়াও ফরাসি, লাতিন, আরবি, পারসি ও উর্দু ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

পরবর্তীকালে শৈলেন্দ্রনাথ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে পালিভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তৎপূর্বে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় বঙ্কিম-সুবর্ণপদক লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ১৯১৩-১৫ খ্রীস্টাব্দে রিসার্চ-ফেলোশিপ্ (Research Fellowship) পান। এইসময় তিনি বৌদ্ধদর্শন, কৃষ্টি ও ধর্ম সম্বন্ধে বহু গূঢ় তথ্যের লিখন-পঠন সম্পন্ন করেন।

ইহার অব্যবহিত পরে শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে পাড়ি দিলেন রেঙ্গুনে সেখানকার র‍্যাঙ্গুন্ কলেজের পালিভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। সেখানে অধ্যাপকমহল ও ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষ সমাদৃত হন শৈলেন্দ্রনাথ।

কিন্তু মাতৃভূমি যেন শৈলেন্দ্রনাথকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। রেঙ্গুনে ৪ বছর শিক্ষকতার কাজ শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরলেন আবার বিচারপতি স্যার আশুতোষের নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের পালি ও বাংলাভাষার অধ্যাপক হয়ে (১৯১১-১৮)। ১৯১৮ হতে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থেকে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে শৈলেন্দ্রনাথ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৪ বছর এই পদ অলঙ্কৃত করে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

শৈলেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা শুধু সুধী সমাজেই সমাদৃত হয় নি, তাঁর বাংলা ও পালি সাহিত্যের প্রসার পরিকল্পনা স্যার আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশুতোষের পাণ্ডিত্যের বৈদগ্ধ্য, তাঁর বিচারকসুলভ মনীষা

CENTRAL LIBRARY

শৈলেন্দ্রনাথকে শুধু কাছে টানে নি, তাঁকে বাৎসল্য স্নেহে বেঁধে দিয়েছিল এবং শৈলেন্দ্রনাথও ভক্তের সহজ ভক্তির অভিব্যক্তিকে সার্থক করেছিলেন। আশুতোষের বিশ্বজনীন সংবেদনা শৈলেন্দ্রনাথকে আশুতোষ পরিবারের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। তাই স্যার আশুতোষ পরবর্তীকালে শৈলেন্দ্রনাথকে আপন সন্তান ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এম. এ. পরীক্ষায় ২টি পত্রের পরিবর্তে গিরিশের 'অশোক' নাটকের সমালোচনার নির্দেশক নিযুক্ত করেন।

কর্মজীবনে শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে শৈলেন্দ্রনাথ ঢাকা ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নবিরচক ও পরীক্ষক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত বাংলা ও পালি ভাষা সাহিত্যের গবেষণা নিবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। কর্ম ও পরবর্তী জীবনে শৈলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভাষা ও সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি দ্বৈভাষিক সংস্করণে (১) 'বালকার' ও (২) 'ধর্মপদ' নামে দুটি পালি পুস্তক প্রকাশিত করেন। এ ছাড়া তিনি *The Calcutta Review* এবং *Journal of the Department of Letters* প্রমুখ নানান দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বহু শিক্ষাপ্রদ ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এছাড়া বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা **Indian Stage** সম্বন্ধে মৌলিক শীর্ষ সমালোচকদের মধ্যে শৈলেন্দ্রনাথের স্থান অন্যতম। মনোমোহন বসু ও গিরিশ নাট্যসাহিত্য এবং মধুসূদনের নাট্যকাব্য শৈলেন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রজীবন ও সাধনার প্রভাব থেকে শৈলেন্দ্রনাথ বিমুক্ত হতে পারেননি। তাই বৃদ্ধবয়সে 'মুখপত্র' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রকাব্যে ভাবের মিলন' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ তুলনামূলক সমালোচনা প্রকাশ করেন।

কর্মজীবনে শৈলেন্দ্রনাথ বহুপণ্ডিত ও গুণী অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দি, হাসান সুরাবর্দি, ডঃ রাধাকৃষ্ণন (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), সতীশচন্দ্র ঘোষ ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। সতীশচন্দ্র ও প্রমথনাথের সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সাহচর্য কর্ম ও তৎপরবর্তী জীবনে শৈলেন্দ্রনাথের ছিল অন্তরের সম্পদ। সহকর্মী হিসাবে সর্বপল্লীর দান শৈলেন্দ্র-জীবনের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

শৈলেন্দ্রনাথের জীবনের আর দিক হল তার মানবিকতা ও সঙ্গীতানুরাগ। তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ ছিলেন সুদক্ষ গাল্পিক। দিনান্তের কর্মাবসরে তাঁর অফিসে সহকর্মী পরিবৃত হয়ে নানান বিষয়ে কি ইতিহাস কি সাহিত্য কি রাজনীতি সম্বন্ধে নানান চিত্তাকর্ষক আলোচনায় আসর জমিয়ে তুলতেন।

সর্বোপরি শৈলেন্দ্রনাথের জীবনের পূর্ণ ইতিহাস হল তাঁর বেদান্তসাধনা ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষানুশীলনের ইতিহাস। স্বামীজী ছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শ পুরুষ। ঈশ্বর-ভক্তি ও জীবে-সেবা শৈলেন্দ্র জীবনের যথার্থ চরিতার্থতা।

শৈলেন্দ্রনাথ শিক্ষাব্রতী ছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালবেসেছিলেন জীবন দিয়ে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর অবসরপ্রাপ্ত জীবনসায়াহ্নে অপরিসীম পরিশ্রমসাপেক্ষ বি. এ. পালি সিলেকশনের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রণয়নের গুরুভার দিয়েছিল শৈলেন্দ্রনাথকে এবং সেই গুরুভার শৈলেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্যে যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে পালি সিলেকশন প্রণয়ন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের প্রতি শৈলেন্দ্রনাথের সমবেদনা ও ঔদার্য বহু দুঃস্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রকে ছাত্রজীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দের প্রতি তাঁর আচরণ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল।

অবসর গ্রহণের প্রায় ১৯ বছর পরে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ মে তারিখে তাঁর টালাস্থিত বাসভবনে শৈলেন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

CENTRAL LIBRARY

সুশীলকুমার দে

১৮৯০—১৯৬৮

আশুতোষ ভট্টাচার্য

আচার্য সুশীলকুমার দে ১৯২০ সনে এক বছরের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা ক'রেছিলেন, তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব।

অনন্যসাধারণ মনীষী ও পণ্ডিত সুশীলকুমার ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী কোলকাতার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র—যিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে টেকচাঁদ ঠাকুর নামে পরিচিত, তাঁর দৌহিত্র। তাঁর পিতামহ নীলমণি দে প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রও তখনকার কোলকাতার সমাজে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

সুশীলকুমার পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা সতীশচন্দ্র দে মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কালক্রমে নিজের যোগ্যতা দিয়ে সরকারী চিকিৎসা বিভাগে সিভিল সার্জনের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি যখন কটকে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সুশীলকুমার কটক রেভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলের একজন ছাত্র ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সুশীলকুমারের আবাল্য সুহৃদ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সেইখানে তাঁর সহপাঠিরূপে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একজায়গায় লিখেছেন যে বাল্যকাল থেকেই সুশীলকুমার বিলাত যাওয়ার অভিলাষী ছিলেন। তাঁর এক খুল্লতাত কিরণচন্দ্র দে আই. সি. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনর হ'য়েছিলেন। আর একজন খুল্লতাত প্রবোধচন্দ্র দে-ও আই. সি. এস্ পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা কিশোর সুশীলকুমারকে চিঠিপত্র লিখে ইংলণ্ডে গিয়ে তাঁকেও আই. সি. এস্ পরীক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি যথাকালে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বাল্যকাল থেকেই ইউরোপীয় পোষাক পরে বিদ্যালয়ে আসতেন এবং পাশ্চাত্ত্য জীবনে অভ্যস্ত হতে শিক্ষালাভ করতেন, এফ. এ পাশ করবার পর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সুশীলকুমার এবং রমেশচন্দ্র উভয়েই বিভাগীয় বৃত্তি লাভ ক'রে উত্তীর্ণ হন।

কটক রেভেনশ' কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে সুশীলকুমার কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. তে First Arts-এ ভর্তি হ'ন। সুশীলকুমার ইংরেজিতে অনার্স এবং রমেশচন্দ্র ইতিহাসে অনার্স নিলেন, তবু সংস্কৃতের পাশ ক্লাসগুলো উভয়েই তখন একসঙ্গেই করতেন। কারণ, পাশ ক্লাসগুলো একসঙ্গেই হ'তো।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অনার্স পড়বার সময় সংস্কৃত পাশ ক্লাসের একদিনের একটি ঘটনার কথা আচার্য রমেশচন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণার মধ্যে উল্লেখ ক'রেছেন, তা অত্যন্ত কৌতুককর।

একদিন সংস্কৃতের ক্লাসে সংস্কৃতের অধ্যাপক মনুসংহিতা থেকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বিধি পড়াচ্ছিলেন। কোন্ পাপে মনু কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন, তাই তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বুঝাচ্ছিলেন। তার মধ্যে গো-হত্যার পাপ, স্ত্রী-হত্যার পাপ, ব্রহ্মহত্যার পাপ ইত্যাদি সব পাপের কথা হচ্ছিল।

CENTRAL LIBRARY

সহসা সুশীলকুমার ক্লাসের মধ্যে সকলের মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে উঠে অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন,—

স্যার, দুপুর রাত্রে স্ত্রীকে মারধোর করে বাড়ী থেকে রাস্তায় বার ক'রে দিবার প্রায়শ্চিত্ত কি, তা' ত বলেন না। সুশীলকুমার জানতে পেরেছিলেন যে এই অধ্যাপক আগের দিনই গভীর রাত্রে স্ত্রীকে গুরুতর প্রহার ক'রে রাস্তায় বার করে দিয়েছিলেন।

সুশীলের প্রশ্ন শুনবামাত্র অধ্যাপক অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তিনি সুশীলকুমার এবং রমেশচন্দ্র উভয়কেই ক্লাস থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বল্লেন। রমেশচন্দ্রের অপরাধ সুশীলকুমার অধ্যাপককে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবার আগে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে কানে কানে ফুসফুস করে কি বলছিলেন, অধ্যাপক তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন।

কোন প্রতিবাদ না ক'রে সুশীলকুমার এবং রমেশচন্দ্র ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর সুশীলকুমার অধ্যাপকের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে ভেবে আবার ক্লাসে যোগদান করলেন, কিন্তু রমেশচন্দ্র ভয়েই হোক কিংবা অভিমানেই হোক আর তাঁর ক্লাশে গেলেন না, তিনি সংস্কৃত পরিত্যাগ করে দর্শন শাস্ত্র পড়তে লাগলেন।

সুশীলকুমার ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতেন, যদিও প্রথম বয়সে তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর ছয়খানি কাব্যগ্রন্থই তাঁর মধ্যজীবন থেকে আরম্ভ করে শেষ জীবন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, তথাপি বিদ্যালয়ে পড়বার সময় থেকেই তিনি বাংলায় কবিতা লিখতেন। পরবর্তীকালে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়, তাদের নাম 'দীপালী' 'প্রাক্তনী' 'লীলায়িতা, 'কৃষ্ণদীপিকা' 'সায়ন্তনী' 'অন্তরতনী' এদের মধ্যে 'দীপালী' তাঁর রচিত সনেটগুচ্ছ, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের বিষয় প্রধানত যুগে যুগে নারী। কবিধর্মে তিনি একান্ত রোমান্টিক ছিলেন।

সুশীলকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী লাভ করে সসম্মানে বি. এ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন, যথাসময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ-তেও তিনি ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক (লেকচারার) নিযুক্ত হলেন। পরের বৎসরই তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হলেন। সেই সময়ই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগেও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়াবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ইতিপূর্বেই সুশীলকুমার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করে *History of Bengali Literature in the 19th Century* (1800—1825 A.D.) বইখানি রচনা করেন, তা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সনে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এই বছরই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের উদ্বোধন হয়। বইখানি প্রথম থেকেই এই বিষয়ের পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়ে এসেছে এবং আজ পর্যন্তও একখানি উল্লেখযোগ্য পঠনীয় (Reference) গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। শেষজীবনে আচার্য সুশীলকুমার তাঁর এই বহু পঠিত গ্রন্থখানিকে পরিবর্ধিত করে তার কালসীমা ১৮৫৭ সন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে তার মূল্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯২১ সনে সুশীলকুমার ইংলণ্ডে যান। কিন্তু আই. সি. এস্ পরীক্ষা দিবার জন্য নয়, বরং উচ্চতর শিক্ষালাভ করবার জন্য। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করে সেখান থেকে ডি. লিট্, উপাধি লাভ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চ কৃতিত্ব দেখিয়ে অনার্স এবং এম. এ. পাশ করার পরও তিনি প্রথমত বাংলা বিষয় নিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং সংস্কৃত বিষয় নিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি

১'R. C. Majumdar, 'Susil Kumar De : A Reminiscence,' S K *De Memorial Volume* (Calcutta, 1972) PP. 1-9.

CENTRAL LIBRARY

ডি. লিট্ লাভ করলেন। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি বাংলা এবং সংস্কৃত শিক্ষার এমন অভাবনীয় সমন্বয় ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সুশীলকুমার কোলকাতা ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের রীডার নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় চলে এলেন। তখন অক্সফোর্ডের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সি. এল্. রেন (Prof. C. L. Wren) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯২৬ সনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষতার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পাণিনি ব্যাকরণে সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী অস্থায়ী-ভাবে তাঁর পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি দেশীয় ধারায় শিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কোনই জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ধারায় শিক্ষিত একজন সংস্কৃত পণ্ডিতকেই এই পদে নিয়োগ করতে চাইলেন। ইতিপূর্বেই সুশীলকুমারের বালাবন্ধু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে যোগদান করেছিলেন, তাঁর সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর সহায়তায় সুশীলকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তবে তিনি বিভাগীয় প্রধান এবং রীডার নিযুক্ত হলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রথমেই অধ্যাপক (Professor) নিযুক্ত হলেন না। পরে অবশ্য তিনি সেখানে অধ্যাপক (Professor) পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৯৩২ সনে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন আচার্য সুশীলকুমার সেই পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পদটি লাভ করবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু এই কথাও তিনি জানতেন, এই পদে নিয়োগ ব্যাপারে তখন কোলকাতায় যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না ব'লেই তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে। শেষপর্যন্ত তাই হলো। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সেই পদ লাভ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে একজন 'বিশেষ' অধ্যাপক নিয়োগ করা হ'লো। তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সেবা করতে পারলেন না বলে তিনি মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন।

ঢাকার চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে রইলেন না। ১৯৫১-৫৬ সন পর্যন্ত কোলকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন। তখন কিছুকাল কয়েকদিন অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গবাসী কলেজে স্থাপিত গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত ভবনে বাংলায় এম. এ পড়ানোর ব্যবস্থার মধ্যেও নিজেকে সংযুক্ত ক'রে কিছুদিন অধ্যাপনা করলেন। তারপর প্রথম থেকেই নূতন প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। ১৯৬১ সনে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

তিনি জীবনে বহু সম্মান লাভ ক'রেছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ সনে তিনি গ্রীফিথ স্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯১৭ সনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ১৯৪০ সনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ঐ বছরের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গবেষকরূপে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক দান করেন। তিনি ১৯৫৯-৬০ সন পর্যন্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৫০ সনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দীনবন্ধু মিত্র।' বক্তৃতাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও দেশে এবং বিদেশে তিনি যে সম্মানলাভ ক'রেছেন, তা'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সনে পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যারত্ন', ১৯৫০ সনে নবদ্বীপ বিবুধজননী সভা তাঁকে

CENTRAL LIBRARY

'বিদ্যাসিন্ধু' উপাধি দান ক'রে সম্মানিত করেন। ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, এবং ১৯৫৪ সনে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ড-এর সম্মানসূচক 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৯ সনে প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের দ্বারভাঙ্গা অধিবেশনে মূল সভাপতি মনোনীত হন। তিনি ১৯৫৬-৫৭ সন পর্যন্ত ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত সংস্কৃত কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমির অন্তর্গত সংস্কৃত উপদেষ্টা সমিতিরও তিনি কিছুদিন (১৯৫৫) সভ্য ছিলেন। তিনি আজীবন পুনার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন সমিতির সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

তাঁর রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় লিখিত। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি তা' নির্ণয় করা কঠিন। তবে পুনা ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের উদ্যোগ এবং দ্রোণ পর্বের সম্পাদনায় তিনি যে পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন, তা' ভারতীয় পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে দুর্লভ। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মান্দোলন সম্পর্কে তিনি যে ইংরেজি বইখানি লিখেছেন, তা'ও যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক। তাঁর দুইখণ্ডে প্রকাশিত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থখানিও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের পরিচায়ক। জীবনের শেষভাগে তিনি গ্রন্থখানির পরিবর্ধিত আকারে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

তাঁর রচিত ও সম্পাদিত ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা মোট ১৮। এদের মধ্যে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ***Bengali Literature in the Nineteenth Century*** ইংরেজিতে রচিত হ'লেও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক। আগেই বলেছি দ্বিতীয় সংস্করণে তার কালসীমা ১৮০০-১৮২৫ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আচার্য দে'র রচিত বাংলা বইয়ের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ, তাদের কথা আগে উল্লেখ করেছি। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাংলা বই 'বাংলা প্রবাদ।' ১৯৪৬ সনে তা' প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ধিত আকারে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে প্রথম সংস্করণ থেকে প্রায় চার হাজার বেশি প্রায় ১০ হাজারের মত বাংলা প্রবাদ সংগৃহীত সঙ্কলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা এবং দুরূহ শব্দসূচী রচনায় গ্রন্থকার যে পাণ্ডিত্য, রসবোধ, ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা' ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের মধ্যেও বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে। প্রবাদ সংগ্রহের ভিতর দিয়ে বর্তমান লেখককে তিনি একদিন লোক-সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ ক'রেছিলেন।

তাঁর 'নানা নিবন্ধ' গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি। বাংলা নাটকের আদিযুগ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন—সেইবিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান্ আলোচনা তাঁর উক্তগ্রন্থের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে আচার্য দে অভিজাত আচরণে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও লৌকিক আমোদ প্রমোদ এবং লোক-সাহিত্য সম্পর্কেও যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে কবিওয়ালা, যাত্রা পাঁচালীর আলোচনা ও প্রবাদের সঙ্কলন থেকে বুঝতে পারা যায়।

CENTRAL LIBRARY

গোকুলদাস দে

১৮৯১—১৯৬৯

অজিতকুমার দে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক গোকুলদাস দে সুদীর্ঘকাল বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতা হেমচন্দ্র দে; পিতামহ ৺ডঃ কালাচাঁদ দে সরকার প্রথম বাঙালী ডাক্তারদের একজন। গোকুলবাবুর শিক্ষাজীবনের সূচনা তাঁর জন্মস্থান মশাট গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মশাট থেকে কলকাতায় এসে জেনারেল এসেম্ব্লিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন ১৯০৮ সালে। বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব ছিল জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে সরকারের উপর। কৃষ্ণচন্দ্র কটকে কিছুদিন র‍্যাভনশ' কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে গোকুলবাবু রেঙ্গুন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন ১৯১০ সালে। বি. এ. পড়ব'র সময় প্রায় তিন বছর অসুস্থ ছিলেন এবং এই সময়ে আবার কলকাতায় আসেন ও ১৯১৪ সালে বি. এ. পাশ করেন। এই পাঠ্যকালীন সময়ে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ও এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বিশেষ কৃপালাভ করেন। এর পর ১৯১৭ সালে এম. এ. পাশ করেন ও ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার অধ্যাপক হন। এই কাজে তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় এবং এম. এ. পরীক্ষায় গোকুলবাবু পালি সাহিত্যে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

দীর্ঘ ২৭ বছর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত থেকে ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তাঁর সরল প্রকাশভঙ্গী, ছাত্রদের প্রতি সহৃদয় আচরণ এবং জ্ঞাননিষ্ঠা তাঁকে ছাত্র ও অধ্যাপক সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল।

স্যার আশুতোষ ১৯১৮ সালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পালি বিভাগ খুলে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই অধ্যাপকের কাজে তাঁকে বিশেষ বাধা পেতে হয়। তখন ডঃ রাধাকৃষ্ণন, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীআদিত্য মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তাঁকে অধ্যাপকের কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

দীর্ঘ ৩৭ বছরে তিনি অনেক বই লেখেন, বিশেষ পালি সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন বই লিখে দেন এবং তা পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়।

১৯৬৯ সালের ২৬শে মে বেলা ১টার সময়ে তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। যাবার একদিন আগেও তিনি প্রতিদিনের মত বাজারে গেছেন, সন্ধ্যায় গান করেছেন। যাবার আগের দিন রাতেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত যথারীতি তিনি তন্ময়চিত্তে পাঠ করেন। মৃত্যুর ঘন্টাখানেক আগেও বলেছিলেন 'আমি তো মায়ের কাছে চলেই গেছি।' মা বলতে এক্ষেত্রে তাঁর গুরু ও ইষ্ট সারদাদেবী।

অধ্যাপক গোকুলদাস দে'র গ্রন্থাবলী—

(১) *Significance and importance of Jatakas with special reference to Bharhut 1951.* (২) *Democracy of Early Buddhist Sangha, C. U. 1955.* (৩) *Sri Radha & Srikrishna of Vrindavan, C. U. 1954.* (৪) *Middle Indo-Aryan Reader—[1st Edn.] in Collaboration with Suniti Kumar Chatterjee & Sukumar Sen.*

CENTRAL LIBRARY

প্রিয়রঞ্জন সেন

১৮৯৩—১৯৬৭

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

১৮৯৩-এর ২৫শে জানুয়ারী উত্তর কলিকাতায় প্রিয়রঞ্জন সেনের জন্ম। তাঁর অগ্রজ কুমুদবন্ধু সেন (১৮৮০-১৯৬২) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পিতা প্রসন্নকুমার সেন এ্যাটর্নী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং সেইসূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। প্রসন্নকুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত *Florence Nightingle's Indian Letters* এই মহীয়সী নারীর ভারতপ্রীতির স্মারক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান।

মাত্র দু'বৎসর বয়সে প্রিয়রঞ্জনের পিতৃবিয়োগ হয়। বড়ো ভাইদের মধ্যে হেমন্তকুমার, প্রফুল্লকুমার ও শরৎকুমার অল্প বয়সেই মারা গেলে চতুর্থ সহোদর কুমুদবন্ধু প্রিয়রঞ্জনের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রমুখ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী—এঁদের সকলের স্নেহ-শুভেচ্ছা লাভ করে কুমুদবন্ধুর অন্তরেও স্বাভাবিকভাবেই বৈরাগ্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অনুজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই তিনি সে সঙ্কল্প থেকে বিরত ছিলেন। এ কথা একসময় লেখককে কুমুদবন্ধুবাবু বলেছিলেন। সুবক্তা ও সুলেখক কুমুদবন্ধুর পৌরুষব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বর এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অভিস্নাত ভক্তিতন্ময়তা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল।

ছোটবেলায় নানা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার জন্য প্রিয়রঞ্জন ১৯১৩ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন কুড়ি বছর বয়সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ অবধি কটকে র‍্যাভেনশ' কলেজে পড়াশুনো করেন। ছাত্রজীবনে বন্ধুমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভের যে সহজাত ক্ষমতা প্রিয়রঞ্জনের দেখা গিয়েছিল, তার ফলে পরবর্তী জীবনেও সেই বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে আত্মীয়োপম সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। র‍্যাভেনশ' কলেজ থেকে আই. এ ও বি. এ. পাশ করে প্রিয়রঞ্জন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজীতে এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ সনে কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন ১৯২৫ সনে এবং উক্ত বিভাগের অধ্যাপকরূপে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জনবাবুর তথ্যসংগ্রহ ও যুক্তিনিষ্ঠ বিন্যাসপদ্ধতি লক্ষণীয় ছিল। ইংরেজী সাহিত্য তাঁর বিশেষ বিষয় হলেও বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগের ফলস্বরূপ 'ওড়িয়া সাহিত্য' (১৩৫৮), *Western Influence on Bengali Literature* (১৯৩২), *Western Influence on Bengali Novels* (১৯৩২), *Modern Oriya Literature* (১৯৪৭) প্রভৃতি গ্রন্থ সুধীসমাজে প্রশংসিত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মানোএল দা আসসুম্পসাঁও-এর বাংলা ব্যাকরণের (*Bengali Grammar : Manoel da Assumpcam*) সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাংলা সাহিত্যে অন্যতম সার্থক অনুবাদকরূপেও তাঁর দান স্মরণীয়। প্রেমচন্দের 'গোদান' (১৯৪৫), র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডোর 'অনন্তের সুরে' (*In Tune*

CENTRAL LIBRARY

with the Infinite) (১৯৬৯), হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' (১৯৫৮), রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'আত্মকথা' গান্ধীজীর *All men are Brothers* গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি প্রিয়রঞ্জনবাবুর সাহিত্যনিষ্ঠার উদাহরণ।

গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী প্রিয়রঞ্জনের সহজ সরল সৌম্যগম্ভীর মূর্তির মতোই চরিত্রটিও বিনয়, সৌজন্য, পরোপকার-পরায়ণতা ও নম্রতার আধার ছিল। ১৯৪২-৪৩-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৪ অবধি হরিজন সেবক সংঘের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৬-এর ভারতীয় গণপরিষদের এবং ১৯৫২-৫৭-এ তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭-তে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে ইনস্টিট্যুট অফ রুর্যাল হায়ার এডুকেশনের সঞ্চালকরূপে এবং লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালকরূপে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়েছিলেন (১৯৫৭-৬০)।

আত্মপ্রচারবিমুখ প্রিয়রঞ্জন সেইসব শিক্ষকদেরই একজন ছিলেন, যাঁদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা ও মানবহিতৈষণা ছাড়া জীবনে অন্য কোনো উচ্চাশা ছিল না। বাংলাবিভাগের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ তিনি অধ্যাপনায় ও গবেষণায় পরিপূর্ণ করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। সবার উপরে তাঁর নির্মল মনুষ্যত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ স্মরণের বিষয় হয়ে রয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

১৮৯৪—১৯৫৬

অরুণকুমার ঘোষ

বাংলা ভাষায় প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র ও সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ সুঅধীতী, স্বদেশব্রতী, কৃতী অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের জন্ম হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় (১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ), বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামে, পিতৃগৃহে। তাঁর বাবা গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত, মা সরলাবালা দাশগুপ্ত, মামার বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার লৈলা গ্রামে—যা অনেক কৃতী বৈদ্য সন্তানের বাসভূমি রূপে আমাদের কাছে সুবিদিত হয়ে আছে। জীবনের প্রথম থেকেই শ্রীদাশগুপ্ত ছাত্র হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পটুয়াখালি জুবিলী হাইস্কুল হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন এবং ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি বিশ্রুত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে এখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ব্রজমোহন কলেজে পড়ার সময় তাঁর জীবনে দুটি উল্লেখ্য ঘটনা ঘটে। একটি হল ব্রজমোহন কলেজের প্রাণপুরুষ জীবনযোগী মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শনিষ্ঠা তাঁর বিকচোন্মুখ তরুণ মনকে উদ্দীপিত করে। অপরটি হল তিনি সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যুগান্তর বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন। এখানে তাঁর উল্লেখ্য সমমানসতাসম্পন্ন সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন সতীন সেন ও মনোরঞ্জন গুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্ত বি. এ পরীক্ষা দেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে এবং ডিস্টিংশন পেয়ে তাতে উত্তীর্ণ হন। বি.এ. তে তাঁর সংস্কৃতে অনার্স ছিল; কিন্তু তিনি অনার্স পরীক্ষা দেন নি। বি. এ পাশ করার পর তিনি কলকাতার য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট পরিচালিত বাংলা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পান। উল্লেখ্য যে এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন।

বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময়েই শ্রীদাশগুপ্ত বিখ্যাত শিবপুর ডাকাতী মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং দোষী সাব্যস্ত হয়ে ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ এই তিন বছর কারাবাস করেন। নদীয়া জেলার শিবপুরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হয় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর। এর পরিকল্পনা ও রূপায়ণ—উভয়তঃই নেতৃত্ব দেন বরিশাল বিপ্লবী দলের নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী। তিনি উত্তরবঙ্গ বিপ্লবীদলেরও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ডাকাতির জায়গাটা স্থির করেছিলেন উত্তরবঙ্গ বিপ্লবীদলের নরেন সরকার। ডাকাতি করতে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সতীন সেন, বিজয় মিত্র, রাধিকা গঙ্গোপাধ্যায়, সানুকূল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, ভূপেন ঘোষ, সুরেন বিশ্বাস, নিখিল গুহ রায় (ইদিলপুর), হরেন কাব্যতীর্থ প্রভৃতি। গভীর রাতে দলটি কৃষ্ণনগর থেকে একটি বড় নৌকা বেয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়। তারপর জনৈক কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়িতে তাঁরা ডাকাতি করেন। কিন্তু লুঠের মাল নিয়ে তাঁরা যখন পালাচ্ছিলেন সেই ভোরবেলায় গ্রামবাসীরা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তারই ফলে তাঁদের পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় এবং নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী সুদ্ধ তাঁদের কয়েকজন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। নিজন রিপোর্টে লেখা হয়েছিল যে বন্দুক এবং মউজার পিস্তলে সশস্ত্র 'ভদ্রলোক' ডাকাতরা ২০, ৭০০ টাকা লুঠ করে এবং একজন কনস্টেবল সুদ্ধ চারজনকে হত্যা ও এগারজনকে আহত করে। লুণ্ঠিত অর্থ অবশ্য

CENTRAL LIBRARY

বিপ্লবীদের কোনো কাজে লাগে নি, কারণ, পালাবার সময় তাঁরা তাড়াতাড়ি মাটির নীচে ঐ টাকা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু পরে আর তা উদ্ধার করতে পারেননি।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছু পরেই শ্রীদাশগুপ্তের রাজনৈতিক মতাদর্শে উল্লেখ্য পরিবর্তন দেখা যায়। সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ থেকে তাঁর মন ক্রমশ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে আকৃষ্ট হতে থাকে। অবশেষে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগ দেন এবং এর জন্য তাঁকে ছমাসের জন্য কারাবরণ করতে হয়। এর আগে ১৯২১এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষা দেবেন এইরকম তিনি ঠিক করেছিলেন, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ফলে ঐ সংকল্প কার্যকর হয়ে উঠতে পারল না। এই সময়েরই স্বল্পকাল পরে তাঁর বিবাহ হয়। পাত্রী ছিলেন বরিশালের জয়শিরকাঠি গ্রামনিবাসী অক্ষয়কুমার সেনের কন্যা নির্মলাবালা। ঈপ্সিত সময়ের চারবছর পরে ১৯২৫এ তিনি নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দেন এবং তাতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন পরবর্তীকালে বিশ্রুত পণ্ডিত ও কৃতী অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী। তিনি অবশ্য রেগুলার ছাত্র হিসেবেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ঐ একই বছরে পরবর্তীকালের আরও দুজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দেন—বিনায়ক সান্যাল ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী। বিনায়ক সান্যাল হয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয়, শ্যামাপদ চক্রবর্তী প্রথম শ্রেণীতে সপ্তম। ১৯২৫ থেকেই সুধীরবাবু প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকেন এবং রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ক্ষীণ হতে হতে ১৯২৮ এর পরে একেবারে লোপ পায়।

এম. এ পাশ করার পর শ্রীদাশগুপ্ত কিছুদিন য়ুরোপীয়দের ভারতীয় ভাষা শিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত দার্জিলিং ল্যাংগোয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৯এ তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত সম্মিলিত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, ঐ বিভাগের তখন প্রধান ছিলেন 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের লেখক সুখ্যাত নাট্যরসিক মন্মথমোহন বসু। স্কটিশচার্চ কলেজে সুধীরবাবুর অধ্যাপক হিসেবে প্রবেশ করার ঘটনাটির পেছনে তাঁর শিক্ষণ-নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল পরিচয় নিহিত ছিল। তখন ঐ কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে প্রাক্তন ছাত্র ছাড়া অন্য বহিরাগতকে নেওয়া হত না। সুধীরবাবু যখন স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য উইলিয়াম আর্কুহার্ট। তিনি ১৯২৮ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন। তাঁর ভাগ্নী কুমারী জে. হেলেন রোল্যাণ্ডস্ (**J. Helen Rowland**) ১৯২৬এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। সুধীরবাবু কুমারী রোল্যাণ্ডস্‌কে বাড়িতে পড়িয়ে এম. এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। সুধীরবাবুর শিক্ষাদান-ক্ষমতার এই সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়ে আর্কুহার্ট মুগ্ধ হন এবং সুযোগ পাবামাত্রই তাঁকে নিজের কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৯৩৪এ মন্মথমোহন বসু অবসর গ্রহণ করলে সুধীরবাবু স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান হন। এর আগেই বাংলা ও সংস্কৃত দুটি পৃথক বিভাগ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭এ প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্যতত্ত্বের আলোচনামূলক 'কাব্যালোক' গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৯এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পার্ট-টাইম লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৩৬২ বাংলা সনের ২৯শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ, ১৯৫৬)।

অধ্যাপকরূপে শ্রীদাশগুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রধানত কাব্যতত্ত্বই পড়াতেন। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাছে পাঠগ্রহণ করবার সৌভাগ্য অর্জন

CENTRAL LIBRARY

করতে পারি নি, তবে স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র হিসেবে বি.এ ক্লাসের দুবছরই বাংলা অনার্সে তাঁর কাছে পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মহুয়া, মুক্তধারা—এই কটি বই। তাঁর কাছে 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পড়তে পাই নি, এটা আমার কাছে এক বিশেষ পরিতাপের বিষয়। তাঁর অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ ও অধিকার বহুমুখী ছিল, অনেকের মতো দু একটি বিষয়ে মাত্র সীমায়িত ছিল না। সাহিত্যের পাঠক ও আলোচক হিসেবে তিনি ছিলেন সহৃদয় ও উদার, তাঁর অধ্যাপক-মন ছিল অন্ধ গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা থেকে অনেকটা মুক্ত, নিছক শুষ্ক তত্ত্বপ্রবণতায় অনীহ, আবেশ ও কল্পনায় ঋদ্ধ হয়ে সংবেদনশীল, গ্রহণ-অভিলাষী। সাহিত্যের প্রকরণ বা রূপকলা সম্পর্কেও তাঁর অভিনিবেশ ছিল গভীর।

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখে গেছেন। তার মধ্যে একাধিক গ্রন্থই বিষয়গৌরবে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর রচিত বইগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর কাব্যতত্ত্ব ও অলংকার-বিষয়ক গ্রন্থ তিনটি—'কাব্যালোক' (প্রথম খণ্ড) 'কাব্যশ্রী' ও 'কাব্যপ্রদীপ'। 'কাব্যালোক' (প্রথম খণ্ড) তাঁর সমগ্র গ্রন্থমালার মধ্যেই সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। অলংকার বিষয়ক সুবিদিত আলোচনা গ্রন্থ 'কাব্য-শ্রী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। 'কাব্যালোক' ও 'কাব্যশ্রী' প্রণয়নের অনেক আগে সুধীরবাবু 'কাব্য-প্রদীপ' নামক বাংলা অলঙ্কারতত্ত্ব, সাহিত্যরূপ, ছন্দ ইত্যাদির অনুধাবন-সংবলিত একটি ক্ষুদ্রকায় কিন্তু উল্লেখ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ বাংলা সনে, লেখকের নাম রয়েছে শ্রীসুধীরকুমার দাশ। গ্রন্থটির আর কোনো সংস্করণ হয় নি।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে ডক্টর দাশগুপ্ত সশ্রদ্ধ অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা বিশেষভাবে পোষণ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর তিনটি বই রয়েছে 'গল্পে উপনিষৎ', 'ঋষিদের প্রার্থনা' ও 'আমাদের পরিচয়।' 'গল্পে উপনিষৎ' ও 'ঋষিদের প্রার্থনা' গ্রন্থ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। প্রথম গ্রন্থটিতে রয়েছে বিভিন্ন উপনিষদ হতে আহরিত গভীর অধ্যাত্ম ভাবব্যঞ্জক চিত্তাকর্ষক কাহিনীনিচয়, দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত উপনিষদের বিচিত্র প্রার্থনা-মালার আবেগস্পন্দিত বাংলা গদ্যরূপ। 'গল্পে উপনিষৎ' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে। এতে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ও প্রশ্ন এই কটি উপনিষৎ হতে ষোলোটি আখ্যান সংগ্রথিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের অন্যতম পাঠ্য-পুস্তকরূপে সুপরিচিত। কিন্তু এই অতীব সুখপাঠ্য বইটিকে নিছক স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমায়িত করলে খুবই ভুল করা হবে। লেখকের উপস্থাপন নৈপুণ্যে বইটি সাধারণ পাঠকের কাছেও বিশেষ মনোজ্ঞ ও আকর্ষক হয়ে উঠেছে। 'আমাদের পরিচয়' গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয়দানসূত্রে লেখক হিন্দুধর্মের শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি মতাদর্শগুলিরই প্রধানতঃ পর্যালোচনা করেছেন।

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত আরও কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য 'বাণী-দীপ' নামক, মুখ্যতঃ প্রবেশিকা শ্রেণীর পাঠ্য, ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ নির্ভরযোগ্য, বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থটি। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বাংলা সনে। এই বইটির প্রায় বিশবছর আগেই শ্রীদাশগুপ্ত ব্যাকরণ রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন। তখনকার লেখা 'ব্যাকরণ-সোপান'—৩য় ও ৪র্থ সোপান, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সোপান ব্যাকরণ রচনার এক নূতন আদর্শ স্থাপন করে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে সমাদর পেয়েছিল। এ ছাড়া 'প্রভাতী' নামে শ্রীদাশগুপ্ত ষষ্ঠশ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী একটি বাংলা গদ্য পদ্যের সংকলন এবং 'রচনা-শ্রী' বের করেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯০১—১৯৫৩

আশা দাশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্যার আশুতোষ উন্নত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সকলের ঊর্ধ্বে বিরাজিত। এই কর্মযোগী পুরুষের বিরাট কর্মযজ্ঞের পরিণতি স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণার মহান প্রতিষ্ঠানরূপে নব-নালন্দা রূপ পরিগ্রহ করে। এই নব-নালন্দার উন্নয়নে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ পিতা আশুতোষের উত্তর-সাধকদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আশুতোষের ধ্যানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রূপ-পরিকল্পনা ছিল শ্যামাপ্রসাদ তাহাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করেন। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন স্বাভাবিক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়া স্বদেশের সর্বজনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মীয়তা সংগঠনের পথরেখা তিনি রচনা করেন। একদা ইংরেজী শিক্ষার সার্থকতার ফলভার বহন করিবার প্রয়োজনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেদিন বাংলার ছাত্রসমাজ তাহাদের সত্য সন্ধানের উপকরণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে গ্রহণ করিত ; বাংলা ভাষা ছিল কেবল প্রাথমিক বিদ্যার্থীদের ধাত্রীমাতা। স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরভাষামিশ্রিত কৌলীন্যবোধের কৃত্রিমতা ও অকৃতার্থতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বাংলার বরণীয় সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষার পরিণত শক্তিকে এই বিদ্যানিকেতনের প্রাঙ্গণে সাদরে আহ্বান জানাইলেন। সেদিন মাতৃভাষার অবরুদ্ধ জলপ্রপাত বাংলাদেশকে ভূমি-উদ্ভিদ ফলশস্যে সুশোভন করিয়া তুলিল। অল্প কালের মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দীর্ঘদিনের উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার বাধা অপসারিত হইয়া সমগ্র দেশের মনঃক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ গভীরতর হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল ইতিহাসে আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ দুইটি অবিস্মরণীয় অতুলনীয় নাম। এই বাণী-দেউলে মাতৃভাষার পাদপীঠ-তলে আজ পিতার সঙ্গে পুত্রও অমরত্বের আসন লাভ করিয়াছেন।

১৯০১ সালের ৬ই জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্ম। পিতার প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীকতা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষানুরাগ ও গভীর দেশাত্মবোধ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। আশুতোষ সব সময় পুত্রের শিক্ষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। 'ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশানে' পিতার তত্ত্বাবধানে এবং উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের যত্নে শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালে এই ইন্‌স্টিটিউশান হইতে তিনি বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করেন আশুতোষ পুত্রের মেধা ও প্রতিভার দিকটির পরিচয় পাইয়া শ্যামাপ্রসাদের পড়াশুনার প্রতি আরো যত্নবান হইলেন। কলেজে ভর্তি হইবার পর শ্যামাপ্রসাদের বিদ্যানুরাগ ও অধ্যয়নস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। কেবল কলেজের পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত ইংরেজী ও বাংলাভাষার নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থও পাঠ করিতেন। পারিবারিক গ্রন্থাগারের বিপুল সংগ্রহরাশির মধ্যে বসিয়া তিনি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পরম আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। বি. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য যেসব ইংরেজী ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল শ্যামাপ্রসাদ কলেজ জীবনে তাহার অনেক বেশী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। এই অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার জীবনে সুফল দান করে। ১৯২১ সালে বি. এ. পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে মোট ২০ জন পরীক্ষার্থী ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স

CENTRAL LIBRARY

লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের স্থান ছিল তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ। ইহার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯১৯ সালে পিতা আশুতোষ রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খুলিয়াছেন। কিন্তু বাংলা বিভাগের ছাত্র সংখ্যা কিছুতেই বাড়িতেছে না। ১৯২০ সালে প্রথম গৃহীত পরীক্ষায় সব পরীক্ষার্থীই প্রাইভেট পরীক্ষা দিলেন। আশুতোষের ইচ্ছা তাঁহার কৃতী পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজী ক্লাশে ভর্তি না হইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করুক। সে সময় শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অধিকাংশের বাংলা ভাষার প্রতি একটা অবজ্ঞার মনোভাব ছিল। কিন্তু আশুতোষ ছিলেন মাতৃভাষার একনিষ্ঠ পূজারী। বাংলা অধ্যয়নের প্রতি শিক্ষিত সমাজের মন হইতে অবহেলার মনোভাব দূর করিবার জন্য তিনি বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানের অনার্স পাওয়া পুত্রকে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা বিভাগে ভর্তি করাইয়া দিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে এবং নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজী সাহিত্যে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসাদও ইংরেজীতেই স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন করিতেছেন। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল শ্যামাপ্রসাদও এইবার ইংরেজী সাহিত্যেই স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সেই কৃতী ছাত্র সেদিন পিতার মনোবাসনাই পূর্ণ করিলেন। মাতৃভাষার প্রতি পিতার অনুরাগ পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল। বাংলা পাঠক্রমানুযায়ী এক বৎসর অধ্যয়ন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তৃতীয়-চতুর্থপত্রের পরিবর্তে একটি গবেষণা পত্র রচনা করিবার বাসনা পিতার কাছে নিবেদন করিলেন। ইতিপূর্বে ১৯২২ সালে আবদুল মজিদ বাংলা বিভাগে তৃতীয়-চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে গবেষণাপত্র সহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করিয়া প্রথম এই ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেন। পিতার সম্মতিক্রমে শ্যামাপ্রসাদ পালি ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিচালনায় ৬ষ্ঠ বর্ষে 'গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক' (*The Social Plays of Girishchandra*) বিষয়ে গবেষণা পত্র প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন। অবশেষে ১৯২৩ সালে এই গবেষণা নিবন্ধ এবং সহকারী ভাষা (**Subsidiary Language**) সিংহলী সহ তিনি এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। এই বৎসর বাংলা বিভাগে মোট ১২ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকার শীর্ষে ছিল যে নামটি তাহা—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের কৃতী ছাত্ররূপে তিনি স্বর্ণ পদক লাভ করিলেন। মাতৃভাষার উন্নতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠাদান পিতাপুত্র উভয়ের কাম্য ছিল। শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাভাষার ক্রমপ্রসারের ইতিহাস প্রমাণিত করে শ্যামাপ্রসাদের সেদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন পিতাপুত্রের যুগপৎ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিমূল রচনা করিয়াছিল।

শ্যামাপ্রসাদের প্রথম কর্মজীবনের সূচনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে। ১৯২৪ সালের ১লা জুন হইতে ভারতীয় ভাষা বিভাগে (বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, উর্দু) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে তিনি শিক্ষাদান কর্মে ব্রতী হইলেন। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার একান্ত সান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ ইং এবং ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ ইং এই কয় বৎসর তিনি এই বিভাগে অধ্যাপনা কার্যে রত থাকিয়া মাতৃভাষার সেবা করেন। **Board of Higher Studies**-এর **Indian Vernacular** বিভাগেরও তিনি একাধিক বৎসর সদস্য ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরই শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের **Council of Post Graduate Teaching Arts and Science-**

CENTRAL LIBRARY

এর সভাপতিরূপে এবং দুইবার উপাচার্য পদে আসীন হইয়া (১৯৩৪-১৯৩৭) কমপক্ষে ২৬ বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। এই বৎসরকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। পিতার মতই এই সারস্বত মন্দির ছিল তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র, তাঁহার স্বপ্ন, তাঁহার জীবন। যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একদিন কেবল অনুমোদন দান ও পরীক্ষা গ্রহণের অফিস মাত্র স্যার আশুতোষ তাহাকে দেবী ভারতীর অন্যতম পীঠস্থানে উন্নীত করেন। আর শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টাকে বিপুল সার্থকতার পথে পরিচালিত করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য একটি নূতন দিগন্তের সূচনা করেন। ছাত্র জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে দরদের বীজ তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল তাহা বাস্তবে রূপায়িত করার পূর্ণ সুযোগ তিনি এইবার লাভ করিলেন।

১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ গ্রহণ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র ভারতে, কেবল ভারতেরই বা কেন, যাহা সমগ্র এশিয়ায় বৃহত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত তাহার কত কর্ম-প্রচেষ্টা, কত সমস্যা, এই বহুবিধ কর্মসূচীকে পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার মাত্র ৩৩।৩৪ বৎসরের একটি তরুণ যুবকের স্কন্ধে অর্পিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেখ্য প্রমাণিত করে এই তরুণ যুবকের পরিচালনাধীনে বিশ্ববিদ্যালয় কত নূতন নূতন কর্ম প্রয়াসের পরিচয় দিয়াছে। উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার রেগুলেশনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এই রেগুলেশান একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এইজন্য আবশ্যক। ১৯২৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে এক পত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়সীমা নির্ধারিত করিতে বলিলেন। সে অনুযায়ী সিণ্ডিকেট বিভিন্ন বোর্ড অফ্ স্টাডিস্‌কে প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তৃত সিলেবাস প্রেরণ করিবার অনুরোধ জানায়। ১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে সিণ্ডিকেটকে বোর্ড অফ্ স্টাডিস্ এই রিপোর্ট প্রদান করে। রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া তাহার উপর রেগুলেশান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ২১শে জানুয়ারী কমিটি সিণ্ডিকেটের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কলা ও বিজ্ঞান ফেকাল্টির যুক্ত মিটিং-এ তাহা প্রেরিত হয়। এই কমিটির রিপোর্ট প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন—'এই রেগুলেশানগুলি প্রায় দশবৎসর পূর্বে লেখা হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিনেট-এর সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ ছিল। প্রাচীনভাষার পঠন পাঠন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্য রহিয়াছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহার ইতিহাসে এই প্রথম প্রবেশিকা পাঠক্রমে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিতে যাইতেছে।' কমিটি ১৯৩২ ইং ২৩শে জুলাই সিনেটে তাহার রিপোর্ট পেশ করে। এই তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। রিপোর্টে প্রবেশিকা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী ব্যতীত সকলবিষয়ে বাংলাভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠন ও পরীক্ষাদানের অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজীতে ২০০ নম্বরের পরিবর্তে ২৫০ নম্বর এবং মাতৃভাষায় ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ২০০ নম্বর ধার্য হয়। একটি প্রাচীনভাষা আবশ্যিক পত্রের অন্তর্গত হয়। কিন্তু পরীক্ষার্থী ইংরেজী ব্যতীত যে কোন ইউরোপীয় ভাষা অথবা মাতৃভাষা ব্যতীত যে কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করিতে পারিত। প্রাথমিক বিজ্ঞান ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্গত হয়, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে তাহা অবশ্য পাঠ্য হইবে স্থির হয়। বালিকারা সেলাই সূচীকর্ম, গান, গৃহবিজ্ঞান পড়িতে পারিবে। অঙ্কে কেবল গণিত আবশ্যিক, জ্যামিতি ও বীজগণিত ঐচ্ছিক হইল। এই রেগুলেশানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষাকে শিল্পকর্ম ভিত্তিকতার পথে পরিচালনা। এই রিপোর্টপ্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক

CENTRAL LIBRARY

ভাষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার ভাবী সম্ভাবনার শুভ উদ্যোগের সূচনা করিয়াছে। তিনদিন এই রিপোর্ট সিনেটে আলোচিত ও সমালোচিত হয় এবং সামান্য সংশোধন সহ ১৯৩২ সালের ১৩ই আগষ্ট তাহা গৃহীত হয়। সিনেট সিণ্ডিকেটের অনেক প্রাচীন সদস্য বাংলাভাষার প্রতি প্রবল অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিতেন এবং বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার যোগ্য মনে করিতেন না। তাঁহাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাকালে শ্যামাপ্রসাদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও বাগ্মিতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনন্যসাধারণ। প্রাক্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই উপলক্ষে যাঁহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম পুরুষ শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দিত করেন। অবশেষে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে নূতন প্রবেশিকা আইন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৪০ সাল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা এই আইনানুসারে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে। এই আইনের প্রত্যক্ষ পরিণতি-রূপে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য বাংলা পরিভাষা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা উচ্চারণবিধি নির্ণয়, বিজ্ঞান ও কারিগরি শব্দের বাংলা পরিভাষা রচনা এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য দুইটি কমিটি গঠিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিভাষা কমিটি বাংলা শব্দের কয়েকখণ্ড *glossaries* তৈয়ারী করে। বাংলা বানানের সংস্কারও সাধিত হয়। বাংলাসাহিত্যের দুই দিক্‌পাল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কমিটি কর্তৃক গৃহীত বানান পদ্ধতিকে স্বীকৃতি জানাইলেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থে তাহা গ্রহণ করিলেন। ১৯৩৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বাংলাভাষায় পাণ্ডিত্য সম্পন্ন গুণীজনের কাছে তাঁহার আবেদন সফল হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে শ্যামাপ্রসাদের উৎসাহে ও প্রেরণায় নানাবিষয়ে অনেকগুলি বাংলাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী রচিত 'প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জদড়ো', কলেজ ছাত্রদের জন্য রচিত ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের কথা', সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক', অসিত হালদারের 'ভারতীয় শিল্পকলা' ও 'ইউরোপীয় শিল্পকলা' এবং ভারতীয় দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন ছোটগ্রন্থ।

প্রবেশিকাস্তর পর্যন্ত বাংলাভাষা পঠনপাঠনের মাধ্যম হওয়ার পরোক্ষ পরিণাম বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রশস্ততর হইল এবং উচ্চ শিক্ষিতেরাও বাংলা ভাষাচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার সুদূরপ্রসারী পরিণতি মাতৃভাষা বাংলা এই বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ১৯৩৭ সালে তাঁহার উপাচার্য থাকাকালীন বাংলাভাষায় লিখিত বিমানবিহারী মজুমদারের 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' নামক গবেষণাগ্রন্থকে প্রথম পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী দেওয়া হয়। এই বৎসর সমাবর্তন ভাষণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষাকে শিক্ষার উচ্চ মান পর্যন্ত বাহন করিবার পক্ষে বক্তৃতা করেন। দশবৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় আচার্য রাজাগোপাল আচারী তাঁহার সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার বিষয় আবার উত্থাপন করেন। পর বৎসর ১৯৪৮ সালে উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় বাংলা ভাষার এই দাবী কতকটা স্বীকৃতি পাইল। আই. এ, আই. কম. আই., এস-সি, বি. এ, বি. কম, বি. এস-সি, পরীক্ষায় ইংরেজী ব্যতীত সকল বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল।

১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমন্ত্রণ জানাইলেন। কবি এই পদবী বিতরণ অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় তাঁহার দীক্ষান্ত ভাষণ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে কবিকে 'ডক্টরেট' পদবী প্রদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গুণীজন সমাবেশে মাতৃভাষার প্রতি তাহার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে। রামতনু অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র যখন বিভাগীয় প্রধান তখন বিশ্ববিদ্যালয় দুই বৎসরের জন্য

CENTRAL LIBRARY

তাঁহাকে অধ্যাপক পদে বরণ করেন। 'কমলা' বক্তৃতা প্রদানের জন্যও তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন গুরুদেবের সমাবর্তন ভাষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য একটি নূতন দিগন্তের উন্মোচন করিল।

দেশের ছাত্র সমাজকে সুসংগঠিত করিয়া তাহাদের দৈহিক ও নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান ও এক-জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রথম প্রতিষ্ঠাদিবস ১৯৩৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে পরস্পর সহযোগিতা আনয়ন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার ভাবধারা জাগ্রত করা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল।

কেবল শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাসম্প্রসারণের কাজে শ্যামাপ্রসাদের কর্মজীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক জীবনের কঠিন ঘূর্ণাবর্ত তাঁহাকে আহ্বান জানাইল। কিন্তু বাঙলা মায়ের এই চিরবিদ্রোহী সন্তানকে ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির মোহ ক্ষণকালের জন্যও কর্তব্য নির্ণয়ে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন এক স্বাপ্নিক স্রষ্টা, রাজনৈতিক জীবনে তিনি অক্লান্ত যোদ্ধা, আর সেবামূলক কাজে তিনি পরম হৃদয়বান পুরুষ।

বাঙলাকে ভালবাসিতে গিয়া তিনি ভারতকে ভুলিতে পারেন নাই। ভারতের জনগণের তিনি প্রিয় নেতা ছিলেন। ভারতের কল্যাণের জন্যই তিনি জীবন দান করেন। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের অন্তিমকাল ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন। কাশ্মীর ও জম্মুর সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই আন্দোলনের পরিণতি স্বরূপ কাশ্মীরে রাজনৈতিক বন্দীরূপে ১৯৫৩ সালে ২৩শে জুন মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শ্যামাপ্রসাদের এই জীবন বিসর্জন স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভারতের শিক্ষাজগত ও রাজনীতি হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইলেন এক মহান শক্তিমান কর্মবীর। শ্যামাপ্রসাদের তিরোধান—স্বদেশের যজ্ঞে একটি পরিপূর্ণ আত্মাহুতি।

CENTRAL LIBRARY

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৮—১৯৭০

নির্মলেন্দু ভৌমিক

১

কবি, কথাশিল্পী, সমালোচক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। হয়তো ওই নামে অপর একজন অগ্রজ সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে পরিচিত থাকায় নারায়ণবাবু তাঁর পোষাকী নাম ছেড়ে ঘরোয়া নামে নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ, মাতা সরোজবাসিনী। শৈশবেই মাতৃহারা হন, মৃত্যুর কারণ সাধারণ জ্বর। প্রমথনাথ দারোগা ছিলেন। নারায়ণবাবু যেবার বি. এ. পরীক্ষা দেন (ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল, ১৯৩৯) সেবারই প্রমথনাথের মৃত্যু হয়। বরিশালে কবি জীবনানন্দ দাশ নারায়ণবাবুর ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮, শুক্রবার, দিনাজপুর জিলার বালিয়াডিঙ্গিতে নারায়ণবাবুর জন্ম। তাঁরা পাঁচ বোন ও তিন ভাই। সন্তান সংখ্যার দিক থেকে তিনি পিতামাতার অষ্টম সন্তান। অপর দুই অগ্রজের নাম—নিখিলনাথ ও শেখরনাথ। এঁদের পেশা—ব্যবসায়। পাঁচ বোনের মধ্যে চারজন বেঁচে আছেন।

১৯৪১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

১৯৪২ সনে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গে জন্ম, সেখানেই কর্মারম্ভ। ১৯৪৬ সনে কলকাতার সিটি কলেজে যোগ দেন। ১৯৫৬ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট-টাইম অধ্যাপকরূপে পড়াতে আরম্ভ করেন। পরের বৎসর সিটি কলেজ পরিত্যাগ করে পূর্ণরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। কালক্রমে তিনি 'রীডার' পদে উন্নীত হন (১৯৬৭)। রীডার থাকাকালীনই ৮ই নভেম্বর, ১৯৭০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। ৬ই নভেম্বর, শুক্রবার রাতে তিনি রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই রাতেই পি. জি. হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার বিকেলে সেখানে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃতদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আনীত হয়েছিল। অধ্যাপকবর্গ এক বিরাট শোকসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

তাঁর পত্নী অধ্যাপিকা ডঃ আশা দেবী, পুত্র অরিজিৎ। মাতা-পুত্র দুজনেই সিটি কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, যথাক্রমে বাংলায় ও ইতিহাসে।

ব্যক্তিগত জীবনে নারায়ণবাবু অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। যেমন তিনি প্রিয়দর্শন ছিলেন, তেমনি তিনি প্রিয়দর্শীও ছিলেন। মধুভাষী নারায়ণবাবু বহুভাষীও ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ও আগ্রহ ছিল। অধ্যাপকরূপে তাঁর সাফল্য ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদরদ তাঁকে শিক্ষকরূপে আদর্শ স্থানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর পরিহাসরসিকতা মৃত্যুর পরও তাঁকে প্রাণময় করে রেখেছে।

তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১০২-এর মতো।

CENTRAL LIBRARY

২

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে নারায়ণবাবুর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতে। এই পত্রিকায় প্রধানত গল্প এবং গৌণত কবিতা লিখেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দেবার স্থান এবং আবশ্যকতা কোনোটাই নেই। কেবল ইতিহাস রক্ষার জন্যে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত নারায়ণবাবুর কয়েকটি রচনার নাম উল্লেখ করি : 'বর আসিতেছে' (চৈত্র, ১৩৪২), 'অন্তঃশীলা' (আষাঢ়, ১৩৪৩), 'প্রতিষ্ঠা' (মাঘ, ১৩৪৩), 'মায়াপুরী' (বৈশাখ, ১৩৪৪), 'বাঁচিবার অধিকার' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫), 'ভিত্তি' (মাঘ, ১৩৪৫), 'তান্ত্রিক' (বৈশাখ, ১৩৪৬)। 'বিচিত্রা'য় নারায়ণবাবুর কবিতাও প্রকাশিত হয় : 'আমি একা বাতায়নে' (ফাল্গুন, ১৩৪২), 'চৈতালি হাওয়া পথ ভুলিয়াছে' (ফাল্গুন, ১৩৪৩)। 'খোলা চিঠি' নামে কবিতাটিও এ পত্রিকাতে পত্রস্থ হয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস নারায়ণবাবুকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নারায়ণবাবুর অনেক লেখা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। তাঁর উপন্যাস 'উপনিবেশ' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের মতো নারায়ণবাবুরও আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই ঘটেছিল।

কবিতার রেশ নারায়ণবাবুর জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মৃত্যুর দু'দিন আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে দুটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কবিতা দুটির মধ্যে একটির নাম 'রবীন্দ্রনাথকে'। কবিতা লেখা থেকে তাঁর মধ্যে আরো দুটি বিশেষত্ব এসে গিয়েছিল : একটি কবিতা পাঠ, অপরটি গান রচনা। বাংলা কবিতার এমন একনিষ্ঠ এবং শ্রুতিধর পাঠক সহসা মেলে না। কবিতাপ্রিয়তা থেকে সহজেই গীতিচর্চা এসে গিয়েছিল। চলচ্চিত্রের গীতিকার হিসাবে তিনি অনায়াসেই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর বহু গান জনপ্রিয়ও হয়েছে।

কবি হিসেবে নারায়ণবাবু রোমান্টিক। এই রোমান্টিকতা তাঁর মর্মে-মর্মে সঞ্চারিত ছিল। সেই রোমান্টিকতাই তাঁর কথাশিল্পে ও অন্যান্য ধরণের রচনাতে ছায়া বিস্তার করেছে। নারায়ণবাবুর রোমান্টিকতার-বিশেষত্ব আমার কাছে এই মনে হয় : তাঁর রোমান্টিক-বোধেরপটভূমি বাংলা দেশ, বাংলা দেশের তিনটি অঞ্চল : পূর্ববঙ্গ, উত্তর বঙ্গ এবং কলকাতা ও ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল। তাঁর মনকে ভুলিয়েছে একদিকে পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়ালখাঁ-র উত্তাল ও ভীষণ তরঙ্গদোলা, ছোরার মতো কালো-নীল জল ও জীবন ; অপরদিকে হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘার পদতলে শায়িত জলঢাকার বনভূমি, বনভূমির হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, পাহাড়ী মেয়ের মতো তিস্তার বন্য রূপালি জল ; দিনাজপুরের মাটি। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নিসর্গ প্রকৃতিই তাঁর রোমান্টিক মনকে গড়ে তুলেছে। এই দুই বঙ্গের গ্রামজীবন তাঁকে দিয়েছে ভাবদৃষ্টি। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বাংলা দেশ তাঁকে দিয়েছে নগর-সভ্যতার আনন্দ ও বিষ, সত্য ও চিন্তার উপলব্ধি। 'স্বর্ণসীতা', 'সূর্যসারথি', 'বৈতালিক', 'লালমাটি', 'শিলালিপি', 'মহানন্দা', 'অসিধারা', 'ভাটিয়ালি' প্রভৃতি রচনা এ কথার সত্যতা প্রমাণিত করে।

এই রোমান্টিকতার অপর ফল ইতিহাস চর্চার মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনি রচনা করেন নি, কিন্তু ইতিহাস-ভিত্তিক বেশ ক'টি মনোরম সৃষ্টি তাঁর রয়েছে : 'উপনিবেশ', 'পদসঞ্চার', 'অমাবস্যার গান' ইত্যাদি।

ইতিহাসচারণা আসলে অতীতের চর্বণা। রোমান্টিক মন তাতে তৃপ্তি পায়। প্রাচীন দিনকে সোনায় ভরা, সোনায় গড়া বলে মনে হয়। ফেলে আসা দিনের সকল প্রকার সামাজিক ও মানসিক সংস্কারকে পুণ্যময় পুরস্কার বলে মানে। নারায়ণবাবুও তাই। অতীতের সব কিছুকে মূল্য দিয়ে ধ্যানের ধন, শিরের সম্পদ, জীবনের বিত্ত, বলে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। নারায়ণবাবু অতীতের মূল্যবোধকে একটি আদর্শের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

তাঁর সেই আদর্শের আধার কয়েকটি অধ্যাপক-শিক্ষক চরিত্র। সচেতন পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর বহু রচনাতেই শিক্ষক-অধ্যাপকের আনাগোনা এক সাধারণ ঘটনা।

'রামমোহন'-এর জীবন নিয়ে নাটক রচনা এই জন্যেই তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয় নি।

আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েছেন কবিত্বের অমর স্পর্শ, রোমান্টিকতার মনোরম দৃপ্তি, মানবিকতার মধুময় অনুভূতি। তাই তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থের নামচয়নেও রবীন্দ্রনাথ: 'উর্বশী', 'চিত্ররেখা', 'চোখের বাহিরে', 'নীলদিগন্ত', 'মেঘের ওপর প্রাসাদ' ইত্যাদি। '২২শে শ্রাবণ' নামে একটি সুন্দর গল্পও লিখেছেন তিনি।

স্বাদেশিকতার বীজ নারায়ণবাবুর রচনায় প্রথম থেকেই দেখা যায়। বাঙলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতার দুই রূপ লক্ষ্য করা যায়। একটি ইংরেজ শাসনাধীনে থাকবার বেদনা-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ; অপরটি, সেটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী, শোষক ও ধনিক-বণিকের নিষ্পেষণে সর্বহারা মানুষের প্রতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-সমুখ সমবেদনা। শেষেরটিই নারায়ণবাবুর সাহিত্যে শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি কেবল 'বাঁচিবার অধিকার' গল্পটির নাম করব। এই দ্বিতীয় ধরণের স্বাদেশিকতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে; যেমন, এই স্বাদেশিকতা কেবল স্ব-দেশের মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, গোটা বিশ্বের সর্বহারা মানুষের প্রতি তা প্রসারিত হয়ে পড়ে; এবং তার অবধারিত ফল হিসেবে বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের ছায়া তার ওপর আপতিত হয়। উপরন্তু, রোমান্টিকতার যে মোহময় একটি স্নিগ্ধ আবরণ থাকে, তাও তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। নারায়ণবাবুর রাজনৈতিক সচেতনতা ও পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সাহিত্যসত্তা অথবা তাঁর রোমান্টিক চেতনাই হয়তো ওই দ্বিতীয় ধরণের স্বাদেশিকতার পথে পা বাড়াতে বারণ করেছিল। নইলে যাত্রা-শুরুর আভাস থেকে নারায়ণবাবুকে আর একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে সহজেই সনাক্ত করা যেত।

এই জন্যেই নারায়ণবাবু 'ইতিহাস'-এর মতো গল্প লিখেছেন। 'মন্ত্রমুখর' উপন্যাসটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি।

নারায়ণবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে একটি বিবর্তন আমার চোখে পড়ে: নৈসর্গিক শোভামুগ্ধ, আদিম কামনা-বাসনার প্রাচীনতাময় সারল্য ও উদ্দামতায় প্রাণবন্ত গ্রামকেন্দ্রিক নারায়ণবাবুর মন ক্রমেই নাগর বৈদগ্ধ্যে তীক্ষ্ণমুখ চিন্তাঋদ্ধ হয়ে পড়েছে, এবং তখন তাঁর চারণভূমি হয়েছে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধি ও চাকুরিজীবী কলকাতার বাঙালী সমাজ। ঠিক যেন 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দিকে শিলাইদহের পদ্মাকেন্দ্রিক গল্পমালা; ক্রমেই নাগরিকতার ছোঁয়া লেগে তা বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে ওঠা।

নারায়ণবাবুর চিন্তাধারার অপর পরিচয় তাঁর প্রবন্ধমালা। কিন্তু এখানেও একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে। গল্পশিল্পী নারায়ণবাবু প্রবন্ধে গল্পপাঠক ও সমীক্ষক, তার সমালোচক ও ইতিহাসকার। সেখানে ভাষা ও দেশের দেওয়াল ভেঙে তিনি বিশ্বের পথে ছোট গল্পের অমৃত সঞ্চয় করেছেন। তার দৃষ্টান্ত তাঁর এই রচনাগুলো: 'সাহিত্যে ছোটো গল্প', 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ', 'বাঙলা গল্প বিচিত্রা' ইত্যাদি।

মানবপ্রেম থেকে শিশু ও কিশোর প্রেম এসে গিয়েছিল। নারায়ণবাবু, কিশোর-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈভব। তাঁর পটলডাঙার প্রখ্যাত টেনিদা বাঙলার অনেক কিশোর তো বটেই, বয়স্ক মানুষের মনেও বহু আনন্দের খনি হয়ে থাকবে। তাঁর 'কিশোর সঞ্চয়ন,' 'খুশির হাওয়া,' 'ছুটির আকাশ' 'ছোটদের ভালো

CENTRAL LIBRARY

ভালো গল্প', 'টেনিদার গল্প', 'ট্রাফি' ইত্যাদি রচনা যে কিশোর আজ পড়েছে, পরবর্তী জীবনে আপন কিশোর পুত্রের সঙ্গে আবার সে তা পড়তে প্রলুব্ধ হবে।

নারায়ণবাবুর প্রতিভা বিচিত্র ও বহুমুখী। অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে চলচ্চিত্র-নাটক বা চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। নিজের যে সব গ্রন্থ চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে সে গুলো তো বটেই, অপরের রচনারও তিনি চিত্রনাট্যরূপ দিয়েছেন। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উল্লেখযোগ্য।

৩

জীবনের অন্তবেলায় পৌঁছে নারায়ণবাবু এক অভিনব ও বিচিত্রস্বাদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন : 'সুনন্দর জার্নাল'। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় এই রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘ সাত বছর ধরে। প্রথম রচনার নাম 'গোরুর রচনা' (২৪ আগস্ট, ১৯৬৭)। আমৃত্যু তিনি এই জার্নাল লিখে গিয়েছেন। পুরো সাতবছর এবং কমবেশি তিন মাস সময় ধরে লিখেছেন। এর কিছু অংশ নিয়ে তিনি একটিব ই বের করেন—'সুনন্দর জার্নাল প্রথম পর্যায়'।

'সুনন্দর জার্নাল' নারায়ণবাবুর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার সর্বাত্মক ও নিঃশেষ প্রকাশের অসন্দিগ্ধ বিকাশস্থল। যেমন, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনার পরও আত্মপ্রকাশের শেষ উপায় হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত' নামে এক আফিংখোরের বকলমে নিজেকে তুলে ধরেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক, গাড়ী-বাড়ীর মালিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তেমনি সেজেছেন এক ব্যাঙ্কের কেরাণী, 'কমনম্যান' সুনন্দ রায়। যিনি ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, সাধারণ একজন বাঙালী গৃহস্থ ছাড়া যাঁর অন্য পরিচয় নেই। আফিংখোর কমলাকান্তের যেমন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক বাধাকে ঠেলে ফেলা সম্ভব হয়েছিল, সুনন্দও সেই সুযোগ করে নিয়েছেন এই ছদ্মপরিচয় গ্রহণ করে।

বঙ্কিমের প্রসঙ্গ উত্থাপনের অন্য গূঢ়তর কারণ আছে। 'সুনন্দর জার্নালে'র কয়েকটি ভঙ্গি বা রীতির সঙ্গে কমলাকান্তীয় রীতি সাদৃশ্য আছে। 'কমলাকান্তে দপ্তর' সম্পর্কে নারায়ণবাবু বিশেষ সচেতন ছিলেন, গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখেছেন। অনেক জার্নালে বঙ্কিম-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নারায়ণবাবুর জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, জার্নালের মধ্যেও তাই। 'ছিন্নপত্রে'র পরিহাস-রসিকতা ও রচনার বিশিষ্টতা সুনন্দ স্বাঙ্গীকরণ করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথই নারায়ণবাবুর শক্তি ও দৃষ্টির উৎস, তাঁর সৌন্দর্যচারণা ও আদর্শবাদের মর্মকেন্দ্র, তাঁর রোমান্টিকতার অনিঃশেষ ভাণ্ডার। নারায়ণবাবু বিশেষভাবে রবীন্দ্রধনন্য। সুনন্দর জার্নালে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে নন্দিত পুরুষ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ফরাসী সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্য সুনন্দের দৃষ্টিকে গড়াতে সাহায্য করেছে। ফরাসী দেশ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর চেতনা জার্নালের মধ্যে 'অতিচেতনা'র মুদ্রাদোষে পরিণত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের যে শিল্পী জার্নালের সর্বাধিক উল্লিখিত—তিনি 'পরশুরাম,' রাজশেখর বসু। এইখানে অধ্যাপক নারায়ণবাবু, প্রবন্ধকার নারায়ণবাবু এবং সুনন্দ এক হয়ে যাওয়াতে, নারায়ণবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সরাসরি জার্নালে ধরা দিয়েছে। অধ্যাপকরূপে 'নারায়ণবাবু ক্লাশে পরশুরামের গল্প পড়াতেন, প্রবন্ধকাররূপে পরশুরামের গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন, আর সাহিত্যশিল্পী রূপে পরশুরামের পরিহাস রসিকতার ধারাকে ধরেছিলেন। নিজের পরিহাসবোধের প্রতিফলন পরশুরামের মধ্যে দেখেছিলেন। এ সবের জন্যেই জার্নালে বারংবার তাঁর নামোল্লেখ।

CENTRAL LIBRARY

৪

যিনি সুষ্ঠু নন্দয়িতা, যাঁর বাক্, কর্ম ও ধর্ম অতি প্রীতিকর বা হর্ষজনক, তিনিই 'সুনন্দ'। জীবনকে যিনি আনন্দময় দৃষ্টিতে দেখে আনন্দময় ভঙ্গিতেই প্রকাশ করেন। যাঁর স্নিগ্ধ ভঙ্গি অপরের হৃদয় হরণ করে। যিনি জীবন ও ভুবনের জয়গান করে থাকেন। অর্থাৎ বিশেষরূপে আনন্দময় দৃষ্টি যাঁর—তিনিই 'সুনন্দ'।

এই আনন্দময়তার সূত্র ধরেই সুনন্দের জার্নালে এসেছে জীবনসম্পর্কে কৌতুকসজল, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল, সমবেদনায় মনোরম, এক পরিচ্ছন্ন, পরিমার্জিত ও পরিপক্ক জীবনরুচি। গোটা মানুষই তাঁর লক্ষ্য। তিনি বিশ্বচারী। বিশ্বের সকল প্রকার সংবাদের হৃদয়সংবেদ্য কারবারী। কিন্তু তা প্রকাশিত বা উৎসারিত হয়েছে সমকালীন বাঙালি জীবন ও বাঙলাদেশকে ভিত্তি করে। এ বাঙালি আবার পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের (কলকাতার) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভাব নিয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত। আগেই বলেছি, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের গ্রামজীবন ও নৈসর্গিক শোভা তাঁর ভাবজীবনের একদিককে গড়েছে; আর পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ কলকাতার নগরজীবন এবং চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বাঙালি তাঁর চিন্তার জগৎকে নির্মাণ করেছে। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ তাঁর বাল্য ও কৈশোরের এবং পিতৃপুরুষের অতীত স্মৃতিতে জড়ানো। বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ অগম্য হয়ে উঠলে সেখানকার রোমান্টিক-আকর্ষণ আরো বেড়ে গেছে। পূর্ববঙ্গ যেন তাঁর প্রাণেমনে এক মোহাবেশ, এক স্বপ্ন-সুন্দর পরিবেশ হয়ে উঠেছিল। আর কলকাতা তাঁর বর্তমান কর্মজীবনের ক্ষেত্র, তা তাঁকে দিয়েছে সমস্যা-জর্জরিত আধুনিক মানুষকে নানাভাবে দেখবার, চিনবার, বুঝবার ও বিশ্লেষণ করবার শাণিত শক্তি। দুই বঙ্গের দুই বিপরীত সত্তা সুনন্দকে দুই বিরুদ্ধ দিকে প্রাজ্ঞ করেছে বলেই জীবনকে তিনি পূর্ণ ও অখণ্ডরূপে দেখবার অধিকারী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, তাঁর 'একতলা' উপন্যাসের জনৈক চরিত্র পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানসিকতার পার্থক্য নিরূপণ করেছে।

সাধারণভাবে মনে হয় জার্নাল অত্যন্ত সহজ সুরে, লঘু-কৌতুকের ভঙ্গিতে নিছক আমোদ বিতরণের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু দেখা যায়, কৌতুক করতে করতেই সুনন্দ সিরিয়াস হয়ে যান। কখনো অবশ্য এর বিপরীত কাণ্ডও ঘটে। আসলে তাঁর মন সর্বদা দুই বিরুদ্ধ কোটিতে বাস করে। একমন পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে, অপরমন পশ্চিমবঙ্গে। একমন অতীতচারী রোমান্টিক, অপরমন বর্তমানের জটিলতা ও সমস্যায় বিক্ষুব্ধ ও বিশ্লেষণময়। একমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাসে আধুনিক, অপরমন মানুষের প্রতি সমবেদনায় চিরপুরাতন, কাতর ও অশ্রুসজল। একমন বুদ্ধি-ধর্মী, অপরমন আবেগপ্রবণ। কিন্তু সব বৈপরীত্যকে ছাপিয়ে একটি সামঞ্জস্যময়, সুন্দর, সুস্থ, আশা ও আদর্শদীপ্ত জীবনই সুনন্দের শেষ লক্ষ্য। তাঁর শেষ পরিচয় তাই—তিনি রোমান্টিক আশাবাদী ও আদর্শবাদী। জীবনের আলো-কালোকে সংহরণ করে নিয়ে তাঁর এই দৃষ্টিগড়া। 'কমনম্যান্' সুনন্দ এখানেই 'আন্-কমন'।

সুনন্দর জার্নালে প্রতিফলিত জীবনবিশ্বাসের সঙ্গে নারায়ণবাবুর গল্প-উপন্যাসের জীবনাদর্শের বেশ মিল খুঁজে পাই। তবে তাঁর কথাশিল্পের মধ্যে যে একটি আদিম জীবন-প্রবাহের প্রখর চেতনা আছে, জার্নালের মধ্যে সেটি যেন নেই।

ছোটো গল্পে ও উপন্যাসে সে কাহিনী কথন, চরিত্র চিত্রণ এবং ঘটনা বর্ণনের দায়-দায়িত্ব নিয়ে অনেক সময়েই লেখক যেন জীবনকে খুশিমতো প্রকাশ করতে পারেন না। অনেকগুলো 'কমিট্‌মেন্ট'-এর কাছে তাঁর হাত-পা বাঁধা থাকে। জার্নাল, ডায়েরি, রসরচনায় লেখকদের সে বালাই নেই। তাঁরা সেখানে অনেকটা মুক্ত ও স্বাধীন। এই কারণেই কথাসাহিত্যে নারায়ণবাবুর যে জীবনদর্শন অনেকটা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, জার্নালে তা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত।

CENTRAL LIBRARY

'সুনন্দ'র জার্নালের লিখনভঙ্গিতেও কথাশিল্পীর রীতি আছে। অনেক জার্নালের মধ্যেই ছোটোগল্পের রূপ ও রীতি স্পষ্ট। কৌতুকচিত্র ও সংলাপগুলো তো নিশ্চিতরূপে কথাশিল্পীর কলমের। ছোটো ছোটো কাটা-কাটা চরিত্রগুলো কেবলই বিশিষ্ট মানসিকতার ফল নয়, সেগুলোর অঙ্কনের মধ্যেও কথাশিল্পীর প্রতিভা লুকিয়ে আছে।

'সুনন্দ'র জার্নালের আর একটি বিশেষত্ব—এর 'নক্শা'-ধর্মিতা। 'নক্শা' রচনায় সুনন্দ সিদ্ধহস্ত। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যও স্মরণ করা যেতে পারে। নক্শার প্রতি এই প্রবণতার ফলেই কি নারায়ণবাবু 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সম্পাদনা-ভার নিয়েছিলেন?

সুনন্দর ব্যঙ্গ কখনই দীপ্ত, প্রখর, স্পষ্ট, মুখর, তীব্র ও তীক্ষ্ণ নয়। এ যে ব্যঙ্গ হঠাৎ করে তা বোঝাই যায় না, অনেকটা হাঙরের কামড়ের মতো। তাঁর ব্যঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নম্র-নীরব, নিরীহ, কমনীয়, মৃদু ও প্রায় অনুচ্চারিত। কিন্তু নিরীহ বলে নিষ্প্রাণ নয়, অস্ফুট বলেই অসাধারণ। অনেক সময় দেখা যায়, গোটা জার্নালটি একটি চালে বা ঢঙে লিখে শেষে হঠাৎ একটি বিপরীতমুখী মোচড় দেন,—ওই আকস্মিকতার মোচড়টুকুই তাঁর ব্যক্তিত্ব, ওটির শীর্ষবিন্দুতে এসে পৌঁছনোর জন্যেই যেন এতক্ষণের এতো আয়োজন, যেন ছোটোগল্প শিল্পীর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ল্যাবরেটরি। কখনো মনে হয়, এ বুঝি পাঠকের সঙ্গে লেখকের এক মনোরম বিশ্বাসঘাতকতা,—পাঠককে এক ভাবে ও ভাবনায় প্রস্তুত করে এনে আচমকা এক বিপরীত ভাবনার নদীতে নিক্ষেপ করা। সচকিত হয়ে অতি সতর্ক পাঠকও সম্বিত ফিরে পেতেই দেখেন, লেখক কোন্ ফাঁকে একটি দাড়ির যবনিকা টেনে বিদায় নিয়ে ফেলেছেন। নিরুপায় পাঠক তখন যে চিন্তার শিখাটি লেখক তাঁর মনে সদ্যই জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, তার চারণা করতে থাকেন; অথবা, তা রসের বস্তু হলে তার আনন্দঘন চর্বণায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

CENTRAL LIBRARY

রথীন্দ্রনাথ রায়

১৯২৪—১৯৬৮

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিভাগের অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু বিভাগীয় অধ্যাপনার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল বললে অন্যায় হবে না। বাংলাবিভাগের পক্ষে এই শতকের ষাটের দশক খুবই দুর্ভাগ্যের দশক বলতে হবে। কারণ এই দশকেই আমরা মনস্বী অধ্যাপক ও গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় এবং অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে হারিয়েছি। তিন জনেই কর্মরত অবস্থায় অকালে মারা গেছেন এবং বিভাগের গবেষণা, অধ্যাপনা ও সৃষ্টিমূলক সাহিত্যকৃতির অজস্র সম্ভাবনাকে হঠাৎ স্তব্ধ করে দিয়ে গেছেন।

স্বর্গত রথীন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম দিনাজপুর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) অন্তর্গত বালুবাড়ী গ্রামে ১৩৩১ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ মাসে। ১৯৪০ সালে পাবনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) বনমালী নগরের করোনেশন বনমালী স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন, ১৯৪৪ সালে রাজসাহী কলেজ থেকে তিনি (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) বাংলা অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করেন এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৪৮ সালে রথীন্দ্রনাথ উত্তর কলকাতার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং ক্রমশঃ অধ্যাপনা ও ছাত্রবৎসলতার জন্য তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই কলেজে অধ্যাপনা করতে গিয়েই সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধলেখকরূপে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে 'দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার' এই বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. উপাধি পান। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে অধ্যাপক থাকার সময় তিনি উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন কলেজে আংশিক অধ্যাপকরূপে কিছুকাল কাজ করেন এবং বঙ্গবাসী কলেজে স্থাপিত তৎকালীন আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু স্নাতকোত্তর বাংলাবিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং অধ্যাপনার পূর্বখ্যাতিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৬৮ সালের মার্চমাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে।

অদম্য উৎসাহ, কর্মশক্তি, মহানুভবতা ও প্রসন্ন মানসিকতার অধিকারী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। ১৯৪৭ সালে রেল দুর্ঘটনায় পিতৃবিয়োগের পর থেকে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন এবং তারই মধ্যে পড়াশোনা অধ্যাপনা গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপারে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। মনে হয় সাংসারিক সংগ্রামই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়েছিল, কিন্তু সংগ্রামশীল মন কোনদিনই তাঁর প্রবর্তনা ও প্রসন্নচিত্ততাকে হারিয়ে ফেলে নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি রথীন্দ্রনাথ যখন উত্তরপাড়া কলেজ ছেড়ে গেলেন তার কিছু দিনের মধ্যেই আমি উত্তরপাড়া কলেজে যোগদান করি (১৯৫৮) এবং ১৯৬৮ সালের মার্চে তাঁর মৃত্যুর পর ঠিক একবছর কেটে গেলে ১৯৬৯ সালের মার্চে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি এবং উভয় ক্ষেত্রেই বহু ছাত্র যাঁরা রথীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন তাঁরা আমারও ছাত্র হয়েছেন আর তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই রথীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা, বাগ্মিতা ও হৃদ্যতার অজস্র প্রশংসা শুনেছি। স্বাভাবিকভাবেই রথীন্দ্রনাথের সহকর্মী অধ্যাপকেরা পরবর্তী-কালে আমারও সহকর্মী হয়েছেন এবং তাঁদের মুখেও রথীন্দ্রনাথের পড়াশোনার কৌতূহল, রসিকতা ও সজাগ

CENTRAL LIBRARY

মননশক্তির কথা শুনেছি। কাজেই শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতেই নয়, ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মী অধ্যাপকদের কাছেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও সজাগ বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছি।

রথীন্দ্রনাথের রচিত উল্লেখ্য বইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার আগে তাঁর দুটি বই সম্পর্কে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করবো। বই দুটির প্রথমটি হলো তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কবি ও নাট্যকার'। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর গদ্যপদ্যময় কাব্যপরীক্ষা, ছন্দ, শব্দ ও মিলের বিচিত্র প্রয়োগ, তাঁর জটিল মানসিকতা ও বিংশশতকীয় আধুনিক মননবৃত্তির ব্যাপক ও গভীর আলোচনা রথীন্দ্রনাথই প্রথম করেন এবং নাটকগুলির গভীর বিশ্লেষণ, কাব্যধর্মিতা ও পশ্চিমী প্রভাব, প্রথামুক্ত ভাবে চরিত্রচিত্রণের চেষ্টা, অভিনয় সাফল্যের কারণ ও দোষত্রুটির প্রথম সংযত ও যুক্তিসিদ্ধ আলোচনায় তিনিই পথিকৃৎ। বোধ হয় দিলীপকুমার রায়ের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ও মূল্যবান আলোচনা ছাড়া রথীন্দ্রনাথের আগে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক কৃতিত্বের এমন সামগ্রিক গভীর মূল্যায়ন আর কেউ করেননি। দ্বিতীয় বইটি হলো 'বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'। এই বইটিতে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রতিভাবিকাশে তৎকালীন সাহিত্যিক পরিবেশ, চৌধুরী বাড়ির সাহিত্য কলাচর্চার আবহাওয়া এবং ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে চৌধুরী বাড়ির যোগাযোগ সম্পর্কিত আলোচনাটি মূল্যবান। আরও মূল্যবান প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট মননভঙ্গিটির উৎস সন্ধানের চেষ্টা। ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাব ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যিকের প্রভাব যে প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার বিশেষ গঠনে সহায়তা করেছে এই তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তটি তথ্য ও যুক্তি দিয়ে রথীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা পূর্বেও প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত কয়েকটি আলোচনায় এত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় নি।

রথীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের ও সম্পাদনাকার্যের (দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলী ও তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ সম্পাদনার কথা বিশেষভাবে মনে রেখে বলছি) উল্লেখযোগ্য গুণগুলি হলো বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞান, সাহিত্যিক মূল্যের বিশ্লেষণনির্ভর আলোচনা এবং তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা। তাঁর আলোচনার সর্বত্রই পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ছাপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

রথীন্দ্রনাথের রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য বইগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল :

রচিত গ্রন্থ :—

১। সাহিত্যবিচিত্রা (প্রবন্ধ সংকলন)—(১৩৬৮)

২। ছোট গল্পের কথা—(১৯৫৯)

৩। বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী—(১৯৫৮, দ্বি-সং ১৯৬৯)

৪। দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার—(১৯৬০)

সম্পাদিত গ্রন্থ :—

১। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সংগ্রহ—(১৯৬৯)

২। দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলী—(১৯৬৩)

৩। মন্দ্র (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য)—(১৯৬৬)

৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পপঞ্চাশৎ

৫। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—(প্রথম খণ্ড), প্রথম সং, ১৩৭০

৬। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'—(১৩৭৪)

CENTRAL LIBRARY

সংস্কৃতিবৃত্ত

CENTRAL LIBRARY

স্যর আশুতোষ ও ভারতীয় ভাষা বিভাগ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি না হইলে জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগ্রত হইতে পারে না, এই কথা এই দেশের তিনজন মনীষীই সমান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—একজন বঙ্কিমচন্দ্র, আর একজন রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহারা এই বিষয় কেবলমাত্র যে উপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে—প্রত্যেকেই নিজেদের প্রতিভা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী এই ভাবে জাতির আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হইবার পথে প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার উপরোক্ত তিনজন বরেণ্য সন্তানের মধ্যে স্যর আশুতোষের পথ অন্য দুইজন হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহার যখন আবির্ভাব হয়, তখনও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহগ্রস্ত জাতি পরানুকরণ এবং পর-ভাষা চর্চায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাষার অনুশীলনের ভিতর দিয়াই দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষার সেদিন বিকাশ হইত। এমন কি তিনি নিজেও সেইভাবেই শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার অসামান্য জ্ঞান-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে আত্মতৃপ্তি থাকিলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় কল্যাণ সম্ভব হইতে পারে না। আত্মতৃপ্তিই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, স্যর আশুতোষ সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। শিক্ষার ভিতর দিয়া জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া সামগ্রিকভাবে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তিনি জীবনে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু স্যর আশুতোষ যদি সেদিন উচ্চশিক্ষার মধ্যে বাংলা ভাষাকে স্থান না দিতেন, তবে জাতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সৃষ্টি হইতে পারিত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমেই সামগ্রিকভাবে জাতির পক্ষে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। তাহার ফলেই বাঙালীর আত্মমর্যাদাবোধের জাগরণ এত সহজ এবং ত্বরান্বিত হইয়াছে। যে জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় সাহিত্যের কথা স্যর আশুতোষ প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন, তাহা যে কি ভাবে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করিতে সক্ষম হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইলেও ইহার জাতীয় ভাষার অনুরাগের ভিত্তি যে স্যর আশুতোষ প্রবর্তিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় বাংলা অনুশীলনের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। কারণ, দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এক ঢাকা শহর ব্যতীত সমগ্র বাংলা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং স্যর আশুতোষের মনে সমগ্র বাঙালীর জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত করিবার যে সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল, তাহার উপরই তাহার জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার যে সৌষ্ঠবই বৃদ্ধি করুন না কেন, তাহার প্রেরণা স্যর আশুতোষই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় জাতীয় ভাষাকে গ্রহণ করিবার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

সেদিন স্যর আশুতোষের পক্ষেও এই কাজটি সহজে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু কোন বাধাই তাঁহার এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

বাংলা বাঙালীর জাতীয় ভাষা, সেই সূত্রে বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষায় বাংলা ভাষা মাধ্যম এবং উচ্চশিক্ষায় বাংলাভাষার বিশেষ স্থান থাকা আবশ্যক, স্যর আশুতোষ কেবল মাত্র এইটুকু উপলব্ধি করিয়াই যদি ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলিবার ছিল না। কিন্তু ভারতীয় যে বিশাল পটভূমিকার উপর বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে না পারিলে যে বাংলা শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তিনি তাঁহার উদার চিত্তে এই কথাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আজ যে প্রাদেশিক কূপমণ্ডুকতা চারিদিকে ইহার হিংস্ররূপ প্রকাশ করিতেছে, তাঁহার বাংলা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় তিনি তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙালীকে কেবলমাত্র বাংলা শিখিয়া বাংলার নাগরিক হইলেই চলিবে না, সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলার বিচ্ছিন্ন কোন পরিচয় নাই। সেইজন্য তাঁহার বাংলা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে বহির্বাংলার কোনও ভারতীয় ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা যেমন ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখায়, তেমনই অন্যান্য আধুনিক ভাষা ভারতের আভ্যন্তরীণ অখণ্ডতার মধ্যে তাহার বহির্মুখী নানা বৈচিত্র্যের এবং বিশালতার সন্ধান দেয়। সমগ্র ভারতের বিশালতার উপলব্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে জীবনের বিকাশ সম্ভব হয় না, এই কথা উপলব্ধি করিয়াই বাংলা ভাষাকে তিনি উচ্চশিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্যর আশুতোষ প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিত, তবে আমরা নিজেদের ভাষা শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের আরও নিকটবর্তী হইতে পারিতাম। দেশীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বহুদিন পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯০ সালে যখন তিনি প্রথম ভারতীয় হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন তখন তিনি এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। ১৮৯১ সালের সমাবর্তনে তিনি দেশীয় ভাষা প্রসঙ্গে বলেন—'I deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations....The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study.' পরবর্তীকালে স্যর আশুতোষ স্যর গুরুদাসের এই চিন্তার সফল রূপায়ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষাগুরু স্যর আশুতোষের বহুধাবিভক্ত কার্যাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র এই একটির জন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষায় পঠন-পাঠনের কথা চিন্তা করিয়া স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহা দেশপ্রেমের আবেগ নহে, যথার্থ বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক। তিনি সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে দেশীয় ভাষা শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। তিনি অবিচল বিশ্বাসে বলিয়াছেন—'I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a Nation unless knowledge is desseminated through our Vernacular.'

স্যর গুরুদাসের এই অভিমতকে সমর্থন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসু। পরবর্তীকালে প্রচণ্ড কর্মশক্তি নিষ্ঠা এবং সুদৃঢ় মনোবলে স্যর আশুতোষ এই অভিমতের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিবেন, জাতীয় ভাষাকে তাহার পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা

CENTRAL LIBRARY

করিবেন এই অত্যন্ত মহৎ আকাঙ্ক্ষাটি তিনি হৃদয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং যথাসময়ে বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়া যথাশক্তি নিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার স্বপ্নকে রূপদান করিয়াছেন।

জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় জীবনের প্রতি স্যর আশুতোষের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কিন্তু বিজাতীয়ের প্রতি অহেতুক অশ্রদ্ধার পরিচায়ক নহে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণজনক সেইগুলি আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে; সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। তাঁহার চিন্তা ছিল স্বচ্ছ নির্মল এবং সর্বপ্রকার গোঁড়ামি হইতে মুক্ত। যাঁহার মনন একান্তভাবে পরিণত এবং পরিশীলিত তিনিই এইকথা ঘোষণা করিতে পারেন যে, 'বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না—যাহা উত্তম তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্বথা গ্রাহ্য; সুতরাং মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার পশ্চাতে তাঁহার উগ্র জাতীয়তাবোধই শুধু ছিল না, সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্তমুক্তি যাহাতে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই স্যর আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলির পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সাহিত্যিক, সামাজিক এবং মানসিক সাম্যবিধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তাহা তিনি বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই উপলব্ধির ক্ষেত্র এতই বিস্তৃত এবং উদার ছিল যে তাহাতে প্রাদেশিকতার কোন স্থান ছিল না। সেইজন্যই তিনি একথা বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই যে, 'আজ একবার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে।' তাঁহার ধ্যানে এবং জ্ঞানে বিরাজ করিত এক এবং অভিন্ন ভারতবর্ষ। ভারতের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার যে বিশিষ্ট সুচিন্তিত অভিমত ছিল, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি কোন জাতিরই ভাষাকে অবহেলা করিবার বিরোধী ছিলেন, ঠিক তেমনি বিরোধী ছিলেন কোন একটি বিশিষ্ট ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাবে। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের ভাষা এবং কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে ইহাই ছিল তাঁহার আশঙ্কা। আজ বহুভাষী ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা আন্দোলনের গতি এবং প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা যায়, স্যর আশুতোষের সুচিন্তিত অভিমতের মূল্য আজও হ্রাস পায় নাই। তিনি বহুদিন পূর্বেই তাঁহার সুদূরপ্রসারী কল্পনায় ভারতবর্ষের এক অখণ্ড বহুবর্ণ সাহিত্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি সুগভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব সব একসূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে।' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগ তাঁহার এই বিশাল অনুভূতির সৃষ্টি। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা এবং সাহিত্য অনাদৃত ছিল। ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বাংলা একটি অবশ্য পাঠ্যবিষয়রূপে গণ্য হইলেও পরে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার মোহে অন্ধ বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বাঙালীর এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। স্যর আশুতোষ ছিলেন প্রকৃত কর্মবীর। তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা ইহাদের ধিক্কার দিয়াছেন, প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বাংলাভাষাকে তাহার যথার্থ মর্যাদা দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার অনলস প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। বাংলাভাষায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পঠন পাঠনের সুব্যবস্থাই শুধু নহে বাংলাবিভাগের সুপরিচিত পুঁথিশালাটির পত্তনও তাঁহার উদ্যোগেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বাংলা পুঁথিসংগ্রহের কাজে প্রথম যিনি অগ্রণী ছিলেন তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলি বিশ্বকোষ-সম্পাদক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে

CENTRAL LIBRARY

বাংলা বিভাগ গঠনের সময় স্যর আশুতোষ এই পুঁথিগুলি লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার পত্তন করেন। ইহার পর বিভিন্ন সূত্র হইতে আরও বহু পুঁথি সংগৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব-পুঁথিসংগ্রহ যখন দশহাজারের কাছাকাছি তখন প্রভূত অর্থকষ্ট সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্রের আবেদনে স্যর আশুতোষ বাংলা বিভাগের জন্য চার ব্যক্তির গবেষণা-বৃত্তি মঞ্জুর করাইয়াছিলেন।

কেবলমাত্র পুঁথিসংগ্রহ এবং গবেষণাই নহে, বাংলাভাষার উন্নতিবিধানে তিনি সর্বপ্রকার কর্মপ্রয়াসেই আগ্রহান্বিত হইতেন। দীনেশচন্দ্র যখন ময়মনসিংহ পল্লীগীতিকাগুলি আবিষ্কার করেন এবং সেগুলি প্রকাশের জন্য স্যর আশুতোষের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন, তখন তিনি সাগ্রহে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশে রসিকজনের নিকট যখন এই পল্লীগানগুলি সমাদৃত হইল, তখন দেখা গেল, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্যর আশুতোষ একটি সার্থক কার্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'বহুলোক এ সকল গানের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আশুবাবুর মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,' কিন্তু স্যর আশুতোষ সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তিনি যাহা কর্তব্য বিবেচনা করিতেন, তাহাতে অবিচল স্থির থাকাই ছিল তাঁহার নীতি। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে নিরলস প্রয়াস স্যর আশুতোষ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আরও স্মরণ-যোগ্য এই কারণে যে এই পথ সুষমাস্তীর্ণ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে ত বটেই, ইহার অভ্যন্তরেও বিরোধী লোকের অভাব ছিল না। স্যর আশুতোষ কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হন নাই, ক্ষণিকের অবসাদে তাঁহার বিশাল কর্তব্যভারকে শিথিল হইবার অবকাশ দেন নাই। তাঁহার এই বিরাট কর্মযজ্ঞে যাঁহারা সেদিন নিজেদের প্রয়াসকে আহুতি দিয়াছিলেন তাঁহাদের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে। বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস প্রণেতা দীনেশচন্দ্রের নাম এই সম্পর্কে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রবল প্রতিপক্ষতার সম্মুখীন হইয়াও স্যর আশুতোষের সর্বকার্যে আন্তরিক সহায়তা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কাউয়েল সাহেব এবং রামপ্রসাদের কবিত্বের শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যায়ন করিয়া ভগিনী নিবেদিতা বিশ্বের দরবারে বাংলাভাষার ঐশ্বর্যকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

স্নাতকোত্তর ভাষা বিভাগের মধ্যে শুধু যে মাতৃভাষা বাংলার প্রতিই তাঁহার অতন্দ্র মনোযোগ ছিল এ কথা বলিলে ভুল হইবে। মাতৃভাষায় যথাযথ শিক্ষা লাভ করিয়া অন্যান্য ভাষাকেও জানিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার অভিলাষ। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির পঠন পাঠনও যাহাতে উচ্চমানের হয় সেদিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। স্নাতকোত্তর ভাষা বিভাগে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তরুণ এবং প্রবীণ কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের সাদরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিভাগকে সুসম্পূর্ণ এবং সুগঠিত করিবার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের সম্বন্ধে সর্বদা সন্ধান রাখিতেন। অখণ্ড ভারতসাহিত্য-সাম্রাজ্যগঠনে তাঁহার প্রয়াস যথার্থই আন্তরিক ছিল।

'কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে আমাদের বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজসজ্জায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষা-ফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ তাঁহার এই মানসচিন্তারই বাহ্যিক কর্মক্ষেত্র। বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী এই কর্মক্ষেত্রে অদ্যাবধি তাঁহার অনুভাবনাকে সফল রূপদান করিবার অক্লান্ত প্রয়াস করিয়া চলিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিদ্যার চর্চা

নীলরতন সেন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং দীনেশচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই সঙ্গে বাংলা-সহ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের এম. এ. পাঠক্রম প্রবর্তিত হল। তার দু বছর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হল এবং বাংলা ও সংস্কৃতে এম. এ. পাঠক্রম প্রবর্তিত হল। তারপর গত অর্ধশতাব্দীকালে ভারত ও বাংলাদেশে কমপক্ষে ষোল-সতেরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. এবং অনার্স পড়ানো আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রথম যেখানে আঙুলে গোনা যেত এখন তা কয়েক সহস্রে পৌঁছেছে। সম্ভবত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে এখন বাংলার অধ্যাপকের সংখ্যাই সহস্রাধিক হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গত অর্ধশতাব্দীকালে বাংলা বিদ্যার চর্চা ঠিক কোন্ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এখন তার পর্যালোচনার সময় হয়েছে মনে হয়। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেই আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন। উৎসব কমিটির উদ্যোক্তারা সেজন্য আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিদ্যার চর্চা বলতে মুখ্যত অনার্স এম. এ. এবং পি. এইচ. ডি/ডি. লিট্ গবেষণা পর্যায়ের পঠন-পাঠনকে বুঝতে হবে। সম্প্রতি একটি সেমিনারে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ পারস্পরিক মত বিনিময় করেছেন। তাঁদের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, সমস্যাটি মুখ্য চারটি দিক থেকে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম, শিক্ষার্থী। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে যখন প্রথম কলকাতা ও ঢাকায় বাংলা এম. এ. পাঠক্রম প্রবর্তিত হল তখন অধ্যাপকগণকেই ছাত্র সন্ধান করতে হত। সেযুগের কৃতী অনেক ছাত্রই পরবর্তীকালে শিক্ষক, সমালোচক বা সাহিত্যিক হিসাবে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে বোধহয় চল্লিশের দশক থেকেই পরিবর্তন সুরু হল। সাধারণ্যে একটা ধারণা হল, কম পরিশ্রমে যে বিষয়ে সহজে এম. এ. বা অনার্স ডিগ্রি পাওয়া যেতে পারে সে হল বাংলা। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাংলার পরীক্ষার্থীদের একটি বড় সংখ্যা হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। উচ্চতর ডিগ্রি তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে উন্নতির সহায়ক। এঁরা অবশ্য অধিকাংশই 'প্রাইভেট' পরীক্ষার্থী। অপর একটি বড়ো গোষ্ঠী এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হল বি. এ. ডিগ্রিলাভের পর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি বলে।—এই দুইদল শিক্ষার্থীই বাংলা হয়তো পড়তে চাইতেন না অন্যপথে তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছানোর উপায় থাকলে। এত বেশী সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিছক ডিগ্রির লোভে বাংলা পড়ছেন তার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হল, এখনো কলকাতা বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তর লিখতে হয় ইংরেজিতে। কেবলমাত্র মাতৃভাষায় লেখার সুযোগ রয়েছে বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে। সুতরাং ডিগ্রিপ্রাপ্তিটা যাদের প্রধান লক্ষ্য তারা বাংলা পাঠক্রম নিয়ে এম. এ. পড়তে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। কিছু মেধাবী সাহিত্যানুরাগী শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই প্রতি বৎসর এম. এ. বা অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু অধ্যাপকগণ তাদের প্রতি পৃথক নজর দেবার অবকাশ পান কোথায়? তাছাড়া অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী

CENTRAL LIBRARY

বাংলার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা মনে রেখে অন্য বিষয় নিয়ে পড়েন। বাংলায় ডিগ্রি নিয়ে যে জীবিকার পথ পাওয়া কষ্টকর অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের সে-বিষয়ে সতর্ক করে দেন। সুতরাং গত তিন দশকে বাংলা এম. এ. ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মান অনিবার্যভাবেই নিম্নমুখী হয়েছে। সংখ্যায় যে-পরিমাণে বেড়েছে গুণগত মান ততটাই নেমেছে।

দ্বিতীয়, শিক্ষক। গত তিন দশক ধরেই মেধাবী ভাল ছাত্র-ছাত্রী বাংলা এম. এ পড়তে সবচেয়ে কম আগ্রহ দেখিয়েছেন। তার ফলে বাংলার শিক্ষকগণ অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র নন। যাঁদের অধ্যবসায় আছে তাঁরা পি. এইচ. ডি বা ডি. লিটের থিসিস করে অভাবটা পুষিয়ে নিতে চাইছেন। ফলে, সেখানেও আবার গবেষণার মান ক্রমান্বয়ে নেমে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত কুলীন বিষয়গুলির অধ্যাপকদের পাশে এঁদের অনেকেই নিজেদের হীনপ্রভ বলে মনে করছেন। অন্য ডিসিপ্লিনগুলির অধ্যাপকেরাও অনেক সময়ে আচার আচরণে নিজেদের কৌলীন্য প্রকাশ করে এদের মেরুদণ্ড আরও দুর্বল করে দিচ্ছেন।—সব মিলিয়ে বাংলার অধ্যাপকদের কিছুটা দীন চেহারাই ফুটে উঠছে। তাছাড়া জ্ঞানের গণ্ডীটাও যেন অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে একজন ইংরেজির অধ্যাপক যতটা প্রবেশ করেছেন বাংলার একজন অধ্যাপক কি ততটা সুযোগ পেয়েছেন? এখনো বিদ্বৎ-সমাজে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারলে যে যশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় বাংলার সে মর্যাদা নেই। সেখানে বাংলার অধ্যাপকেরা স্বভাবতই পিছু হটতে বাধ্য হন। অন্যান্য বিদ্যার অধ্যাপকগণ তাদের প্রতি অনুকম্পার দৃষ্টি হানেন। অবশ্য স্বীয় প্রতিভা ও নিষ্ঠার দ্বারা কিছু বাংলার অধ্যাপক এ সব বাধা কাটিয়ে না ওঠেন এমন নয়। তবে তাঁদের সংখ্যা তো নিতান্তই সীমিত। আসলে সমাজ যেখানে বাংলা বিদ্যার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বঞ্চনা করছে সেখানে এই হীনম্মন্যতার গ্লানি কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়।

তৃতীয়, পাঠক্রম। অন্যান্য ডিসিপ্লিনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বাংলায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে সরাসরি একটি প্রশ্ন রাখেন, অনার্স বা এম. এ. তে ইংরেজির একজন শিক্ষার্থী যতটা বিদ্যার্জনের সুযোগ পান একজন বাংলার শিক্ষার্থীর সে সুযোগ থাকে কি? কেউবা প্রশ্ন রাখেন, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিদ্যার শাখায় আট বছর পরে স্কুলের নবম শ্রেণী থেকে এম. এ দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত একটি ছাত্র যতটা জীবনসংগ্রামের উপযোগী জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করে পরে সে সুযোগ লাভ কখনো সম্ভবপর কি? বস্তুতঃ বাংলার অধ্যাপকদের অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে, গত পঞ্চাশ বছর ধরে মুখ্যতঃ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের যে সীমিত রাজ্যে শিক্ষার্থীরা বিচরণ করছেন তাকে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বিদ্যা বলা চলে কি না। অনার্স ও এম. এ.—মিলিয়ে পাঁচ বছর ধরে ষোলটি পত্রে (বা বত্রিশটি অর্ধপত্রে) একই বিষয়ের চর্বিত চর্বণ চলছে না কি? প্রশ্নগুলি অমূলক নয়। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য অনেক দুর্বল, অনেক সীমিত। সেখানে বাংলার পটভূমি হিসেবে ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় সাধন করলে এই সীমা প্রসারিত হতে পারে। ভাষাবিজ্ঞান পঠনে আরও আধুনিক রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন চলতে পারে। চিন্তাশীল অধ্যাপকেরা প্রচলিত ভাবমুখীন বিশ্লেষণের গুরুত্ব কমিয়ে ভাষা, ছন্দ, রীতি প্রভৃতি আঙ্গিকের বিশ্লেষণ মাধ্যমে সাহিত্য বিচারের উপযোগিতা স্বীকার করছেন। তাঁরা সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতির আলোকে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের পাশে লোক-সংস্কৃতি-উদ্ভূত সাহিত্যকে স্থান দিতে চাইছেন। নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য, নন্দনকলা, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে সাহিত্যকে দেখতে চাইছেন। তাছাড়া প্রতিবেশী সাহিত্যের তুলনায়ও নিজের সাহিত্যকে মেপে নিতে চাইছেন। বাংলা পাঠক্রমে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে তার লঘুত্ব অনেকাংশে কেটে যাবে। জ্ঞানের

CENTRAL LIBRARY

পরিসর বিস্তৃত হবে। হয়ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা হীনম্মন্যতার ব্যাধিও অনেকাংশে কাটিয়ে উঠবেন। সুখের বিষয়, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরীর ব্যাপারে অধ্যাপকগণ উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি পূর্বের তুলনায় বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাছাড়া ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে বাংলা অনুবাদ, শ্রুতিলিখন, সংক্ষেপীকরণ, পত্রলিখন, টাইপ-লিখন, সর্টহ্যাণ্ড-লিখন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে স্নাতক পর্যায়ের পৃথক 'ব্যবহারিক বাংলা' পাঠক্রম রচনার প্রচেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে।

চতুর্থ, বঙ্গবিদ্যার সামাজিক স্বীকৃতি। উনবিংশ শতকে সমাজের শিক্ষিত বাঙালীরা বাংলা ভাষার সেবায় গৌরব বোধ করেছিলেন। আশুতোষ, দীনেশচন্দ্র, এবং হরপ্রসাদ (শাস্ত্রী) প্রমুখ বঙ্গভাষা প্রেমীরা যে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার এম. এ. পাঠক্রম প্রবর্তনে এত আগ্রহী হয়েছিলেন তার পিছনে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহিত্যসৃষ্টি প্রেরণা যুগিয়েছিল। ইংরেজ রাজত্ব ছিল বলে সরকারী কাজকর্ম ইংরেজিতে চলত। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই বাংলাকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ধর্ম ও সংস্কৃতির আন্দোলনে তখন তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার দান স্মরণ করা যেতে পারে। তারপরও সবুজপত্র, সাহিত্য, প্রবাসী, বিচিত্রা, কল্লোল প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা কিছু উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং এই ঐতিহ্যের পটভূমিতে স্বভাবতই বাংলা-প্রেমীরা আশা করেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্ততঃ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে বাংলা ভাষা চালু হবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে স্থান দেবার দাবী তো রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ থেকেই করে এসেছেন (দ্র. শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, শিক্ষা)। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশ স্বাধীন হবার পর পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল এখনো পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গভাষা প্রতিষ্ঠা পেল না। এখনো সরকারী, বেসরকারী অফিসগুলিতে সর্ববিধ কাজকর্মের ভাষা ইংরেজি। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় বাংলা ব্যতীত সব বিষয়ের উত্তর লিখতে হয় ইংরেজিতে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজে বাংলা সত্যি সত্যিই উদ্বাস্তু। গত পঁচিশ বছরে তার পুনর্বাসন হলে অনেকগুলি গুরুতর সমস্যা হয়তো আদৌ দেখা দিত না। পুরোনো অনেক সমস্যারই সমাধান খুঁজে পাওয়া যেত। প্রথমত, বাংলায় অনার্স বা এম. এ. পড়া ছেলেমেয়েদের অনেক বেশী কর্মসংস্থান হত ; দ্বিতীয়ত, কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য—সব শাখাগুলির শিক্ষার্থীরাই বাংলায় উত্তরপত্র লিখতে পারবে জানলে বাংলা ভাষার প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধাশীল হত, ভাল করে বাংলা শিখতে আগ্রহী হত ; তৃতীয়ত, উচ্চতম পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করলে এবং পরীক্ষাপত্রে উত্তর দিতে সুযোগ পেলে ইংরেজি আয়ত্ত করতে ছাত্রছাত্রীদের যে পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটে সেটা বন্ধ করা যেত ; চতুর্থত, ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী একটি বাংলা পাঠক্রম প্রবর্তন করা যেত ; পঞ্চমত, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যার অনার্স বা এম. এ পাঠক্রমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ফিরে আসতে আগ্রহী হত। কয়েক বৎসরের মধ্যে তার দূরপ্রসারী সুফলও দেখা দিত। সুতরাং সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হল শিক্ষিত বাঙালী সমাজে বাংলা ভাষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বাংলা ভাষাপ্রেমীদের মুখ্যতম দাবী হল বঙ্গসমাজে উদ্বাস্তু বঙ্গভাষার পুনর্বাসন চাই। রাজনীতিকরাই আজকাল সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। যদি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজ বাংলা ভাষাকে রাজ্যের সর্ববিধ আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের ভাষা করে তুলতে আগ্রহী হন তবেই বাংলা বিদ্যাকে বাঁচানো সম্ভবপর হবে। নইলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বাংলা বিদ্যা দুয়োরানীর মনোবেদনা ও গ্লানি নিয়েই দিন কাটাতে বাধ্য হবে।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা ভাষা মাধ্যম চর্চা ইত্যাদি : ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা

রমেন্দ্র বর্মণ

পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।

ঈশ্বর গুপ্তের আশুবোধ্য নিরাভরণ এই উদ্ধৃতাংশটিকে কবিতার মর্যাদা দিতে অনেকেই হয়ত কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত। কিন্তু একে কবিতাই বলি আর পদ্যময় বুনন যাই বলি না কেন এর মধ্যে ঝলমল্ করছে যে মাতৃভাষা-সংরাগ তাকে সম্মান জানাতে আমরা বাধ্য। কারণ, 'বিনা স্বদেশীয় ভাষা মিটে কি আশা' ইত্যাদি প্রশ্ন ও আবেগের দ্বারা সে যুগের অনেকের মতো অল্পবিস্তর আমরাও আক্রান্ত হই অহরহ। বস্তুত, মাতৃভাষা-কেন্দ্রিক এই উচ্ছলিত আবেগ বা অনুভূতি স্বদেশচেতনারই এক ভিন্নতর মুদ্রা। ঈশ্বর গুপ্ত কথিত 'মাতৃসম মাতৃভাষা' নিশ্চয়ই আমাদের অস্তিত্বের দোসর, আমাদের শোণিত-কণিকায় নিয়ত উপলব্ধি করি এর অন্তর্লীন উপস্থিতি, হয়ত আমাদের হৃদয়ের এবং মনন কল্পনার উর্মিময় দেশের কিংবা নৈঃশব্দ্য চূড়ার গাঢ়তর অভিজ্ঞান এক এবং একমাত্র মাতৃভাষাতেই লভ্য। মৃত্তিকা, জল, সূর্যালোক, বায়ু বা অন্য যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদের মতোই প্রায় অপরিহার্য এই মাতৃভাষা। ফলে, এর অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত, সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চল, স্তব্ধ। আমাদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ মাতৃভাষার জঠরে অনুস্যূত। মাতৃভাষার বহতা স্রোতস্বিনীর অন্তহীন কলনাদে যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুরোধারূপে গণ্য। কারণ, মাতৃভাষা প্রীতি ঈশ্বরচন্দ্রের একটি তাৎক্ষণিক উপলব্ধি কিংবা একটিমাত্র কবিতারই বিষয়বস্তু নয়। 'স্বদেশ' নামক কবিতার একাংশে মাতৃভাষার সম্প্রসারণের যে মহৎ অভিলাষ ('বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা, দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।) ব্যক্ত হয়েছে, সেই একই আবেগানুভূতির দ্বারা তাড়িত হয়ে 'ভাষা' নামক কবিতায় গুপ্ত কবি লিখেছিলেন—

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥

CENTRAL LIBRARY

অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে॥
... ...
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচার পত্রে লিখে কত যাবে রাখা॥

দেশজ ফল্গুর অক্লান্ত অনুসন্ধানী, ঈষৎ অভিমানী, কখনো কখনো প্রার্থনাপ্রাণ, ঘরোয়া এবং জর্নালধর্মী কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ঈশ্বর গুপ্তই মাতৃভাষার মর্যাদা এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠাদানে সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় দর্পিত যোদ্ধার বেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গুপ্ত কবির এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা-আন্দোলন-ইতিহাসের বিহঙ্গ-পরিক্রমা অপরিহার্য বলে মনে করি।

২

জনশ্রুতি এই নবাবঙ্গীয়েরা (ইয়ংবেঙ্গল নামে সমধিক খ্যাত) ইংরেজীতে স্বপ্নদেখার মতো উদ্ভট ও হাস্যকর কর্মে একদা আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। যদিও 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'-জাতীয় বলিষ্ঠ স্বীকৃতি সকলের নিকট হতে পাওয়া যায়নি এবং এর মধ্যে যে উৎকট ইংরেজী ভাষাপ্রীতি জড়িত তা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়—কিন্তু ইংরেজী ভাষাশিক্ষার আগ্রহ একসময় কিরূপ গভীরমূল হয়েছিল তার একটি উদ্ধৃতিযোগ্য নজির হয়ত উপরের এই ঘটনা। অবশ্য বিদেশী ভারতপথিকদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের আত্মজাগরণে এবং বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রপদী মহিমায় যেমন তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি দেশীয় ভাষার চর্চা ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্বের কথাও সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন—'শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশনের পাদরী ডঃ জশুয়া মার্শম্যান ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ 'হিন্টস' নামক এক শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ইহার অনুকূল আলোচনা করেন।'[১]

শিক্ষার মাধ্যমরূপে দেশীয় ভাষাকে গ্রহণ ও প্রচলনের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রধান অংশটা বরাবরই ইতস্ততঃ মনোভাব দেখিয়েছে, ফলে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫-র 'মিনিটে' উচ্চশিক্ষার প্রধান বাহনরূপে ইংরেজীর অনুকূলে রায়দান করে বলেন—'His Lordship in Council directs that all the funds which these reforms will leave at the disposal of the Committee be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literature and Science through the medium of the English language; and His Lordship in Council requests the Committee to submit to Government, with all expedition, a plan for the accomplishment of this purpose.'[২] অবশ্য এই একদেশদর্শী সিদ্ধান্তকে শিক্ষাকমিটি একবছরের মধ্যেই পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হন এবং মাতৃভাষা-শিক্ষার গুরুত্বকে কুণ্ঠিত স্বীকৃতি জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখেন—'We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of the vernacular languages. We do not conceive that the order of the 7th March precludes us from doing this, and we have constantly acted on this constru-

১. যোগেশচন্দ্র বাগল: জাগৃতি ও জাতীয়তা, পৃঃ ৫৩
২. S. Nurullah and J. P. Naik, History of Education in India গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

CENTRAL LIBRARY

ction……We conceive the formation of a vernacular literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed."[৩]

কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতদের একাংশ সর্বদাই দেশীয় ভাষার সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ। অগ্রগণ্য পণ্ডিত উইলসন্ নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা উচিত, জাতীয় সাহিত্য কেবল জাতীয় ভাষার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানবিস্তার চর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে সেটা সমাজের একদল মুষ্টিমেয় লোক, যাঁদের অর্থ ও অবসর দুই-ই আছে, তাঁদেরই বিলাসের বিষয় হয়ে ওঠে। একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মৌলিক পার্থক্য এত বেশী যে ইংরেজী কখনই এদেশের শিক্ষার প্রধান বাহন হতে পারে না।'[৪]

এক্ষেত্রে (মাতৃভাষা চর্চা ও প্রসার) সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, হিন্দুকলেজ পাঠশালা, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়সমূহ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। রামমোহন রায় (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, বেদান্ত গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করে মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের পরিচয় দেন) বেথুন সাহেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যমের পরিচয় দেওয়া কিংবা মূল্যায়ন করা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সম্ভব নয়। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান আন্দোলন তাঁদের বিচিত্র কর্মৈষণা ও মনন সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে এককভাবে আলোচিত না হলে তাঁদের প্রতি অবিচারের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

আরেকটি শুভলক্ষণ এই যে, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রশ্নে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ঈর্ষণীয়ভাবে নব্যতন্ত্রী ইয়ংবেঙ্গলদের কেউ কেউ একত্রিত হতে পেরেছিলেন। বস্তুত মাতৃভাষা অনুশীলনের প্রথম এবং প্রধান আশীর্বাদই হলো মাতৃভাষা আমাদের সংস্কারের সীমাবদ্ধ পাঁচিলটাকে ভেঙ্গে সেতুবন্ধনের উদার আয়োজন করে। মাতৃভাষার মুকুরেই মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা দীপ্যমান। আমাদের অস্তিত্বের ও চেতনার শাশ্বত ঘোষণাগুলি মাতৃভাষাতেই লভ্য। ১৮৪০-এ হিন্দুকলেজ পাঠশালার উদ্বোধন দিনের বক্তৃতায় পঠিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—

'সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয় ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিক ভাষা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জন বহুকাল ও বহুপরিশ্রমসাধ্য, অতএব দেশান্তরীয় ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জন যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা সকল সংস্কৃত ভাষার অবলম্বনে বর্ত্তিবার সম্ভাবনা, এ কারণ দেশস্থসাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারেনা, এই হেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাদ্বারা বিদ্যোপার্জন করান যাইবেক অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালন দ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।……'[৫]

৩. ডাফেল, ১৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (৩য় খণ্ড), গ্রন্থের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৫. সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ শীর্ষক আলোচনার ২১—২২ পৃঃ হতে গৃহীত।

CENTRAL LIBRARY

ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্র এবং রিচার্ডসনের অন্যতম প্রিয় ছাত্র রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারাও একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। মাতৃভাষা চর্চার বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর আশ্চর্য সংবেদী কণ্ঠের ঘোষণায় পাওয়া যায়—'এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি ইংরাজী ভাষার অনুশীলনী যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষাদ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে?.....ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে এবং এইক্ষনকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এ কথা কহেন তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। .....ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অল্প অল্প বিদ্যাশিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। এমন বিবেচনা কর, যেস্থানের নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতাপিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তনদুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষ অন্যসকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে।.....পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্মভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই।'[৬]

পাঠ্যপুস্তক রচনা, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা, সভাসমিতি গঠন, বক্তৃতা প্রদান, সাময়িক পত্রিকার মারফতে জনমত গঠন ইত্যাদি বহুধা কর্মের মাধ্যমে জাতির সার্বিক উজ্জীবন প্রয়াস ত্বরান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের যথার্থ ভূমিকা রচিত হয়েছিল।

৩

ফলে ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সপক্ষে দিনের পর দিন প্রচার চালানো একক বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। গুপ্ত কবির জীবন ও কর্মধারায় দোলাচল বৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি একনিষ্ঠ দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বঙ্গরঞ্জিনী সভার সম্পাদকরূপে 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় ঈশ্বরগুপ্তের পত্রটিকে তাঁর মাতৃভাষা সচেতনতার প্রথম নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যায়। বঙ্গরঞ্জিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাভাষার চর্চা ও প্রসার সাধন। গুপ্ত কবির দীপ্ত ঘোষণাটি স্বতঃ উদ্ধৃতিযোগ্য—'অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভাভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহুভাগ্য কিন্তু ধর্মদ্বেষী নাস্তিক মতাবলম্বী বিবেচনাশূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা তদ্দায় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভাপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না.....'[৭]—ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃভাষা প্রীতি যেরূপ উগ্র আকারে প্রকাশ পেয়েছে তা অনেকের হয়ত পছন্দ হবে না; কিন্তু সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় আমরা দেখবো এই 'ভাষাপ্রীতিও আবেগের সঙ্গে মননচিন্তা এবং যুক্তির শোভন পরিণয় সাধিত হয়েছে।

৬. সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৪র্থ খণ্ড), রাজনারায়ণ বসু শীর্ষক রচনার ২০—২৬ পৃঃ হতে গৃহীত।

৭. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

CENTRAL LIBRARY

শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষাকে প্রচলন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে সংবাদপ্রভাকর একে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে আগ্রহী। শিক্ষা-সৌধের স্থায়িত্ব, ব্যবহারোপযোগিতা এবং সৌন্দর্য যে মাতৃভাষার উপর মূলতঃ নির্ভরশীল তা সংবাদপ্রভাকর স্বার্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে। শিক্ষার আলোককে যদি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয় এবং শিক্ষাকে যদি সাধারণের সম্পদে পরিণত করতে হয় তাহলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর ভূমিকা সংবাদপ্রভাকরের বেদনার এবং সমালোচনার কারণ হয়েছে—'যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, 'ইয়ং বেঙ্গল' যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সর্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাঁহারদিগের ভাষার শিক্ষাগুরু মহাশয়ের নিকট পরম কল্যাণীয় পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা? তাহা সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গলচেষ্টার আদিসূত্রেই দোষ পড়িতেছে,...'[৮] পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষার মোহান্ধতা মাতৃভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। সংবাদ-প্রভাকর ১৮৪৮ সালে এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন—'এই বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের স্থানে স্থানে যেসকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিতা করণাভিপ্রায়ে কতিপয় বিলাতীয় ব্যক্তি বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষা প্রচার নিমিত্ত রাজ-ভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের ঐ দুরাশা কখনই সিদ্ধি হইবেক না, একজাতির ভাষা পরিবর্তন করা সামান্য কার্য নহে, যুগ যুগান্তর মন্বন্তরযোগে ঐশ্বরিক কোন ঘটনার দ্বারা এই জগতের সমুদয় শোভার বিশেষ ভাবান্তর ভিন্ন ঐ কার্য্য নির্বাহ হয় না, কতিপয় শ্বেতকান্তি এই রাজ্যের রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ অসাধ্য কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া পিপীলিকার সিন্ধু সন্তরণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট একাল পর্য্যন্ত স্বজাতীয় ভাষার বিস্তার জন্য টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষোপকার কি হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, ঐ টাকা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনার্থে ব্যয় করিতেন তবে এতদিনে এই দেশের ভাষার লাবণ্য বিকীর্ণ হইত, দেশীয় ভাষার পুস্তকাদির কিছুমাত্র অভাব থাকিত না, শিক্ষকও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইত,.....বর্তমান অধিকারী ব্রিটিস জাতি যদ্যপি বঙ্গভাষানুশীলনের প্রতি উচিতমত যত্নানুরাগ ও অর্থ ব্যয় করিতেন তবে আমারদিগের বিশেষ উপকার হইত, দেশমধ্যে বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হইয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকাররাশি বিনাশ করিত,.....।'[৯]

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ইংরেজীর বিতর্কে সংবাদপ্রভাকর অবিচলিত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে বাংলা ভাষার সপক্ষে প্রচারকার্য চালায়। এ সম্পর্কে দেশ বিদেশের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে সংবাদপ্রভাকর বাংলা ভাষার দাবীকে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র একদা মন্তব্য করেছিলেন যে 'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্মের শত্রু। ..... মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্মিক, ধর্ম খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত।'[১০] ঈশ্বরগুপ্ত মেকি সাংবাদিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের নামে যে প্রহসন চলছে তা সংবাদপ্রভাকরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। সংবাদপ্রভাকর আমলাতন্ত্রের উপর কুঠারাঘাত করে লেখেন—'বহুদিন হইল ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আমলারূপে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই—বঙ্গভাষা লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ

৮. ঐ পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত।

৯. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড), ১৯৪-১৯৫ পৃঃ

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড), ৮১৭ পৃঃ (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ)

CENTRAL LIBRARY

তাঁহারা মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যে সকল দরখাস্ত অথবা পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহাতে কতক বাঙ্গালা, কতক পারস্য, কতক ইংরাজী ও কতক ওলন্দাজী শব্দ ব্যবহার করেন, এ কারণ তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গভাষায় সুনিপুণ অন্য কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজপত্রের মর্ম অবধারণ করিতে পারেন না, গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল আমলাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ না করাতেই রাজবিচারে অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং দেশীয় লোকেরাও বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইয়াছেন, যেহেতু বিচারালয়ের কর্ম্মার্থিরা জানিয়েছেন যে বাঙ্গালাভাষার প্রতি রাজার দৃষ্টি নাই, যেরূপে লিখিতে পারিলেই বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়েন, এজন্য তাঁহারাও বঙ্গভাষার প্রতি অযত্ন করিয়া কেবল আইনের ধারা সকল কণ্ঠস্থ করত রাজকার্যে মনোনীত হইয়া থাকেন, অতএব আমারদিগো অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতিবিষয়ে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখি না, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্যার্থ অল্প ব্যয়ও করিতে পারেন না।'[১১]

মাতৃভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় সংবাদপ্রভাকর বাংলা ভাষাপ্রীতি বা আবেগের নিকট যুক্তি এবং বিচারবোধকে বিসর্জন দেয়নি। বস্তুত, সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকের পরিচ্ছন্ন মানসিকতায় সমস্যাটা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতসহ উপস্থিত ছিল দেখতে পাই। ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম চালু করলে সমস্যাটার যথার্থ সমাধান হবে না। দেশে গণশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা সুসম্পন্ন হতে পারে। বাংলা ভাষা চর্চা ব্যাপক করার পথে প্রধান অন্তরায়টি (উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব) সংবাদপ্রভাকরের দৃষ্টি এড়ায়নি। মাতৃভাষার এই দৈন্য বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমেই দূর হতে পারে। সংবাদপ্রভাকর সরকার এবং শিক্ষিত মানুষের নিকট বারংবার এই আবেদন উপস্থিত করেছে। মাতৃভাষায় 'জ্ঞানদপুস্তক' রচনার গুরুদায়িত্ব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর অর্পণ করার প্রস্তাব করে সংবাদপ্রভাকর উদার মানসিকতা এবং বিদ্যাসাগরের অবিসংবাদিত পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নিঃসংশয় পরিচয় দিয়েছে। সংবাদপ্রভাকরের ভাষায়—'বঙ্গভাষা সুচারুরূপে প্রচলনের তাদৃশ জ্ঞানদ পুস্তক নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে, এতদ্ভাষার দ্বাদশখানি জ্ঞানদ পুস্তক সংগ্রহ করা সুকঠিন হয়, কিন্তু এই উত্তম পুস্তকই বা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? এই সকল পুস্তক ইংলণ্ডীয় ভাষা হইতে অনুবাদ ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এতাদৃশ গুরুভার কাহার প্রতি অর্পণ করা যাইতে পারে, সাহেবদিগের এ কর্ম নহে, ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অথচ বঙ্গভাষায়ও পণ্ডিত এমত ব্যক্তিকেই এ ভার অর্জিতে পারে, কিন্তু এমত ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া সাধারণ নহে, আমরা জানি এক ব্যক্তিকেই এই কর্ম যোগ্য হইতে পারে, তাঁহার নাম শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুনিপুণ। অতএব এডুকেশন কৌন্সেলের এইক্ষণে এই আবশ্যক যে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষার কোন পুস্তক অনুবাদ করিতে হইলে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়, বলিতে কি তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা কাহাকেও লিখিতে দেখিতে পাইনা, অতএব তাঁহার কৃত বা অনুবাদিত পুস্তক যে সকলে সমাদরপূর্বক পাঠ করিবে তাহার সংশয় কি আছে, কত কত পাদরির লিখিত পুস্তকই গ্রাহ্য হইল, তবে তাঁহার পুস্তক যে পূজ্য না করিবে এমত ব্যক্তি আমারদিগের পরিচিত নাই।'[১২]

পাঠ্যপুস্তক রচনা, অধিক সংখ্যায় বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংবাদপ্রভাকর বাস্তবসম্মতভাবে সমস্যার মোকাবিলা করতে চেয়েছে। সংবাদপ্রভাকরের বাস্তববোধ এবং

১১. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৭

১২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৩

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রামের বাংলা শিক্ষকদের (বস্তুত বাংলা শিক্ষাকে তাঁরাই হাতেকলমে রূপায়িত করবেন) পারিশ্রমিকের প্রশ্নে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। মাথাভারী শিক্ষাপ্রশাসন সাম্প্রতিককালেরই বৈশিষ্ট্য নয়—ঈশ্বর গুপ্তের কালেও একই চিত্র লাভ করা যায়। সংবাদপ্রভাকর মাতৃভাষা শিক্ষার পিলসুজধারীদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নটাকে কৌশলে এড়িয়ে গালভরা বুলি কপচিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করতে চায়নি। সংবাদপ্রভাকরের ১৮৫৬-র সম্পাদকীয় মন্তব্যে পাই—'তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রামে যে কতিপয় পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অবস্থার কথা লিখিতে হইলে অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ উপস্থিত হয়, ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন ১ টাকা, ২০ টাকা অথবা ২৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই বিষয়ে বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের যেরূপ অবিবেচনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ধীমানবর্গই বিবেচনা করিবেন, যেমন নির্ম্মাতা আপনার পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না হইলে কার্য্য বিষয়ে তাহার অনুরাগ জন্মে না, সেইরূপ শিক্ষকগণ আপনার পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন না পাইলে বালকদিগের উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্টের এই একটি প্রবল ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে যে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদান প্রেষয়ে কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত বা কোন্ ব্যক্তি অনুপযুক্ত তাহা তাঁহারা কিছুই বিবেচনা করেন, একজন সাহেব যিনি বাঙ্গালা বিষয়ে শ্রীপঞ্চমী বলিলেই হয়, তিনি অল্পপি টুমি আমি বলিয়া দুই একটা বাঙ্গালা শব্দোচ্চারণ করিতে পারেন তাঁহাকেই বাঙ্গালার বৃহস্পতি বিবেচনা করেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যথার্থরূপে বাঙ্গালা লিখন পঠনে উপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা কোনরূপেই আদর প্রাপ্ত হয়েন না, আমরা বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদানের অভিনব নিয়ম সন্দর্শনে আশ্চর্য হইয়াছি এবং আমারদিগের বিশেষ প্রতীত হইয়াছে যে এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করণে সম্মত হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজাদিগের উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।'[১৩] মাতৃভাষার শিক্ষকদের 'পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন' পাওয়ার প্রস্তাব করায় ঈশ্বর গুপ্ত নিশ্চয়ই পণ্ডিতের শিরোপা লাভ করবেন। অপিচ, গুপ্ত কবি প্রতিপক্ষকে (বাংলা জ্ঞানের বহর দেখে) যে তীক্ষ্ণ শায়কে বিদ্ধ করেছেন তাতেও বাংলার শিক্ষকদের মর্যাদা বহুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের সূচনা করে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদপ্রভাকরের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেননি—কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাবিকিরণের কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেনি এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তার প্রয়াস খুবই নগণ্য। ১৮৬০-এ সংবাদপ্রভাকর লিখছে—'আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইঙ্গলণ্ডীয় রীতিমতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, সকলেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদর পূর্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত ও সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।.....দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি প্রচারিত করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় স্বতন্ত্ররূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়।'[১৪] —ঈশ্বর গুপ্তেরও অন্যান্য অনেকের মতো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রত্যাশা ছিলো অনেক বেশি, সেজন্য আশাভঙ্গের বেদনাও সমান তীব্র। মাতৃভাষা যেভাবে ঈশ্বর গুপ্তের 'সর্বকর্মচিন্তা'কে অধিকার করেছিল তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে শিক্ষা আন্দোলন, বাংলা ভাষার চর্চা, শিক্ষার

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৬৪
১৪. তদেব, পৃঃ ৩৬১

CENTRAL LIBRARY

মাধ্যম নির্ণয় (নিশ্চয় বাংলা ভাষা) ইত্যাদি বহু প্রশ্নে সংবাদপ্রভাকরের ভূমিকা এবং চিন্তাধারা ছিল প্রধানত মধ্যপন্থী। এজন্য সংবাদপ্রভাকর কোন গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেনি—আবেদন নিবেদন স্তুতি মিনতির দ্বারাই রাজপুরুষদের মন জয় করতে চেয়েছে। সরকারী প্রযত্নের উপর নির্ভরশীলতা ('কারণ সে দিবসে মেডাক সাহেব দেশীয় ভাষা উজ্জ্বল করণার্থ বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাহাতেই আমারদিগের যথেষ্ট ভরসা হইয়াছে, রাজপুরুষেরা এতদ্বিষয়ে সম্যক প্রকারে যত্নশূন্য হয়েন নাই',[১৫]), ইংরেজ রাজশক্তির অকারণ স্তুতি ('যখন ভূপতি প্রজার প্রতি সদয় হইয়াছেন, প্রজার দুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তখন আর প্রজার দুঃখ কি।'[১৬] অথবা বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা অতিশয় রাজানুগত, প্রভুভক্ত ও কার্যক্ষম, মৃত মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের নির্ণীত সুনিয়মানুসারে যে সকল বাঙ্গালির প্রতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি ও ডেপুটি কালেক্টরি অথবা মুনসেফি কিংবা সদর আমীনি ইত্যাদি যে যে কার্যের ভার অর্পিত হইয়াছে তত্তাবতেই তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন……[১৭]) যেমন সংবাদপ্রভাকর প্রকাশ করেছে তেমনি বাংলা ভাষা বা দেশীয় ভাষার সম্প্রসারণে ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ('কিন্তু আশ্চর্য এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অঙ্গরাগ অভাবে নিস্তেজঃ হয়, অথচ রাজপুরুষেরা তাহাতে মনোযোগি হয়েন না, ইহাই পরম দুঃখের বিষয়, তাঁহারদিগের আছে বিচারালয়ে বঙ্গভাষা চলিত হইবে, কিন্তু কোথায় বঙ্গভাষা চলিতেছে, তাঁহারদিগের নিয়ম আছে স্থানে স্থানে বঙ্গভাষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক এবং তাহাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি পাঠ নিয়মমিত হয়? এবং যাঁহারদিগের প্রতি পাঠশালা সকলের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছেন তাঁহারা কি কখনো বাঙ্গালা পাঠশালা চক্ষে দেখিয়াছেন? কিন্তু রাজপুরুষদিগের রাজত্বের নিয়মের কোন অংশ নিস্তেজঃ হইলে তাঁহারা কি এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন?'[১৮]), সরকারী কর্মচারীদের বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে মৃদু কটাক্ষ কখনো বা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপও সংবাদপ্রভাকরের পাতায় পাওয়া যায়।

বৃহত্তর জাতীয় সমস্যা, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্নে সংবাদপ্রভাকরের ভূমিকাকে হয়ত সমর্থন করা যায় না। কিন্তু মাতৃভাষার প্রশ্নে গুপ্ত কবির আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত ('যেহেতু জাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষাদান করিলে যেরূপ উপকার হয় পর-জাতীয় ভাষা শিক্ষায় কখন তদ্রূপ হইতে পারে না, আর একজাতির ভাষা বিলোপ করিয়া অন্যদেশের ভাষা প্রচলিত করতে প্রায় সাধ্যাধীন হয় না'[১৯]) এবং তাঁকে আধুনিক কালের কাছাকাছি বলে মনে হয়। মধ্যযুগে সংস্কৃত ও ফারশির চাপে বাংলাভাষার ঈপ্সিত সমৃদ্ধি ঘটেনি। আধুনিককালে ইংরেজীর অপর্যাপ্ত প্রাধান্যকে অস্বীকার করা দুঃসাধ্য। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্যে ইংরেজীকে প্রধান ভাষা মাধ্যমরূপে গ্রহণের ফাঁদে আমরা ধরা দিয়েছিলাম হয়তঃ নিজেদের অজান্তে। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ আর ইংরেজী ভাষা মাধ্যম গ্রহণ যে সমার্থক নয় সে সম্পর্কে অনেকের ধারণাই সেদিন স্বচ্ছ ছিল না। সুতরাং আত্মখণ্ডনের বেদনা ও পরাজয় পদে পদে আমাদের সঙ্কুচিত করেছে—জাতীয় জাগরণের পালা রয়েছে অসমাপ্ত। আত্মপ্রকাশ ও মানবচেতনার সম্যক্ উন্মোচনের জন্যে মাতৃভাষাকে একান্ত স্বাভাবিক ভাষা বাহনরূপে গণ্য করা হয়।

১৫. তদেব, পৃঃ ৩০৩
১৬. তদেব, পৃঃ ৩১৫ (বিশ্ববিদ্যালয় নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধ ১৮. ৭. ১৮৫৪)
১৭. তদেব, পৃঃ ৩২৪ (সম্পাদকীয়, ২০. ৭. ১৮৫৪)
১৮. তদেব, পৃঃ ৩০২
১৯. তদেব, পৃঃ ৩২৩-২৪

CENTRAL LIBRARY

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই চেতনার বিকাশ চাপা পড়ে থাকে। মাতৃভাষা আধুনিককালেই স্বাধিকারে অধিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন,[২০] 'ভাষা বিষয়ে আসল কথাটা এই যে কোনো পরভাষার আধিপত্য—সেই পরভাষা মাতৃভাষার তুলনায় অনেক উন্নত হলেও—মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না : এত যে বলশালী সংস্কৃত ভাষা তাকেও হার মানতে হ'লো বিভিন্ন অপরিণত কথ্য ভাষার কাছে ; লাতিন ভাষার আদি ভূমি ইটালিতে মধ্যযুগীয় য়োরোপের প্রথম 'ভার্ণাকুলর'-সাহিত্যের প্রোজ্জ্বল অভ্যুদয় ঘটলো ; ইংরেজ সাহিত্যের গরীয়ান এলিজাবেথীয় যুগ, আর গ্যেটের যুগে জর্মান সাহিত্যের উত্থান—এ-দুয়েরই পটভূমিতে আছে বাইবেলের জেমসীয় ও লুথারীয় অনুবাদ—অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে লাতিন থেকে মুক্তি প্রাপ্তি ; এবং উনিশ শতকে রুশ সাহিত্যের আকস্মিক ও আশ্চর্য আবির্ভাবের একটি কারণ এই যে রাশিয়া, আদি চার্চের অধীন বলে, প্রথম থেকেই মাতৃভাষাকে ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেছে। আর উনিশ-শতকী বাংলাদেশে—ইংরেজী শিক্ষা সত্ত্বেও বা তারই ফলে—স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুগান্তরকারী জাগরণ ঘটলো, যার পরিণতি 'স্বদেশী' আন্দোলনে। বাংলার সেই নবজন্মক্ষণেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, একথা ভারতবর্ষীয় সকলেই জানেন, যদিও অনেকে আজকাল স্বীকার করতে চান না।' ফলে মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আধুনিককালের একটি গাঢ় আকাঙ্ক্ষা। মাতৃভাষার স্বয়ং-স্বতন্ত্র মর্যাদার সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি আধুনিকতারই বিজয়ী ভূমিকা রচনা করে। সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় মাতৃভাষা-চর্চা এবং শিক্ষামাধ্যম নির্বাচনের সূত্রে আধুনিকতার জয়কেতন উড্ডীন হয়েছিল একথা গভীরভাবে মনে রাখার বিষয়।

২০. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, পৃঃ ২৫১-৫৬

CENTRAL LIBRARY

নব্যভারতীয় আর্যভাষায় বাংলা ও হিন্দী

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি দশম-একাদশ শতাব্দী নাগাদ অপভ্রংশের নির্মোক থেকে মুক্ত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর নিজ নিজ অঞ্চলে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সার্থক হয়ে উঠতে থাকে। এই নবকলেবরধারী ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ও হিন্দীভাষার রূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দরূপের যে প্রকৃতি ও নিয়ম ছিল নতুন ভাষাগুলিতে তা আর থাকল না। তবে বাংলায় যে-ভাবে এই শব্দরূপ চিহ্ন বা কারকবিভক্তির চিহ্ন একেবারে লোপ পেয়ে গেল, হিন্দীতে ঠিক সেরকম হয়নি। তার কারণ এই দুটি ভাষার বচনভেদের রূপ পৃথক্। সংস্কৃতে বিভক্তিযোগেই বচনভেদ প্রকাশ করা হয় এবং শব্দরূপ থেকে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু বাংলায় তা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। সংস্কৃতে কর্তায় নরঃ, নরৌ, নরাঃ এবং অন্যান্য কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কিন্তু বাংলায় নতুন শব্দ বা শব্দাংশ যোগে এই বচনভেদ দেখানো হয়েছে, যেমন—ছেলে, ছেলেদুটি, ছেলেরা বা ছেলেগুলি ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দীতে বহুবচনে বিভক্তি-প্রয়োগও আছে, যেমন, মুখ্যকারকে—লড়কা, লড়কে, লড়কী, লড়কিয়ঁ। এবং তির্যক কারকে লড়কেকো, লড়কোঁকো, লড়কীকো, লড়কিয়োঁকো ইত্যাদি। তির্যক্ কারকে বাংলার মত (-কে) হিন্দীতেও—কো (<কৃত), কা ইত্যাদির প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু বচন-চিহ্নের বিভক্তিও সঙ্গে যুক্ত আছে। সুতরাং এদিক দিয়ে বাংলার সঙ্গে হিন্দীর একটি প্রকৃতি-গত প্রভেদ লক্ষণীয়। অর্থাৎ হিন্দীতে শব্দরূপের চেহারা বদলালেও প্রকৃতি-গত প্রবণতা একেবারে লোপ পায়নি। বাংলাভাষার এই বৈশিষ্ট্য চর্যার ভাষাতেও লক্ষণীয়।

সম্বন্ধপদে বাংলা এবং হিন্দীর বর্তমানরূপ ও প্রকৃতি বিশেষ ভিন্ন ধরণের। আধুনিক বাংলায় সম্বন্ধপদে বিশেষণের প্রকৃতি দেখা যায় না যদিও প্রাচীন বাংলায় তা কতকটা ছিল। হিন্দীতে সম্বন্ধপদ একেবারে বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়, যা সংস্কৃতে সাধারণতঃ দেখা যায় না—যেমন, সং. মম পিতা, মম মাতা; যদিও সং. মামক, অস্মদীয় প্রভৃতি সম্বন্ধ রূপগুলি বিশেষণের মত প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আধুনিক হিন্দীতে—মেরা পিতা, মেরী মাতা,; অর্থাৎ মাতা স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় সম্বন্ধ পদটিও বিশেষণের মত স্ত্রীলিঙ্গ হল। আধুনিক বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় এরকম হয় না। তবে প্রাচীন বাংলায় ছিল যেমন, কাহেরি শঙ্কা (চর্যা), হাড়েরী মালী (চর্যা)। হিন্দী সকর্মক ক্রিয়ার প্রয়োগে সমাপিকা ক্রিয়াতেও লিঙ্গ পরিবর্তন দেখা যায়। তার কারণ অবশ্য এখানে কর্তার বিভক্তি তৃতীয়ার রূপজাত,—যেমন, মৈনে (<*ময়েন = ময়া) ভাত খায়া, কিন্তু মৈনে রোটী খায়ী। বাংলায় তা হয় না। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কেবল কৃদন্ত অতীতকালে তা দেখা যায়—যেমন, লাগেলি আগি, সোনে ভরিতী করুণা নাবী (চর্যা); উজরলী হরিলী রাহী, না ভুলিলী আইহনের দাসী (শ্রী কী.)। অতএব এই চর্যার প্রয়োগগুলিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

চর্যাপদের কারক বিভক্তিগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এর কিছু কিছু আধুনিক বাংলার সঙ্গেই সুস্পষ্ট-ভাবে সম্পৃক্ত—যেমন, অনুক্ত কর্তায়—এ, এঁ (<এন)—সুন্ডীরে খাঅ, চোরে নিল ইত্যাদি। তৃতীয়ার—তেঁ, (-তে), এ, এঁ—সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই, আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা, সাণে দিঠা, বেগেঁ ইত্যাদি। তৃতীয়ার

CENTRAL LIBRARY

অনুসর্গ—যেমন, দিআঁ চঞ্চালী, কুল লই, বিহে সম, দুজন সাঙ্গে, তোএ সম ইত্যাদি। গৌণকর্মে বা চতুর্থীতে—রে, রেঁ,—কাহেরে, করিণিরেঁ, রস রসানেরে ইত্যাদি। চতুর্থীর অনুসর্গও দেখা যায়,—যেমন,—তোহোর অন্তরে। অপাদানে-এ, -এঁ—জামে কাম কি কামে জাম, কুলেঁ কুল, ইত্যাদি (তুঃ আধুনিক বাংলা—মেঘে বৃষ্টি হয়)। চর্যায় বিশেষ্যের সম্বন্ধ পদের বহু প্রয়োগ একেবারে আধুনিক বাংলার মত, যেমন—রুখের, হরিণির, ডোম্বীএর (সঙ্গে), জাহের (=যার), ইত্যাদি। অধিকরণে-ত,-তে (-তেঁ),-এ—সাম্প্রমত হাড়ীত, বাটত, চীএ, গঅণ মাঝেঁ ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রয়োগ একেবারে বাংলার মত।

বস্তুতঃ আধুনিক বাংলায় এই ধরণের প্রয়োগই সর্বত্র দেখা যায়। এখানেও অনুক্ত কর্তায় -এ, যেমন: কুমীরে খায়, লোকে বলে, চোরে নিল ইত্যাদি। তৃতীয়ায় চর্যার মতই -এ, তে—সুখদুঃখেতে মরতে হবে, লাঠিতে মারা যায়, চোখে দেখলাম, বেগে যায়, হাতে মাথা কাটে ইত্যাদি। তৃতীয়ায় অনুসর্গের প্রয়োগগুলিও লক্ষণীয়—অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে, সিংহের সঙ্গে, তোর সম ইত্যাদি। গৌণকর্ম বা চতুর্থীতে দেখা যায়,-রে, যেমন—শত্রুরে কাটিল অরে, কাহারে কহিয়া যাব ইত্যাদি। চতুর্থীতে অনুসর্গের প্রয়োগও প্রচুর আছে, যেমন,-তোর তরে, কাজের জন্যইত্যাদি। অপাদানে -এ, যেমন—মেঘে বৃষ্টি হয়, গুরুর মুখে শুনেছি ইত্যাদি। সম্বন্ধপদ ও অধিকরণে আধুনিক বিভক্তি প্রয়োগেও অনেকক্ষেত্রেই চর্যার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—বৃক্ষের, হরিণীর ইত্যাদি এবং সাঁকোতে, হাঁড়িতে, চিত্তে, গগনমাঝে ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় স্ত্রীলোকের বেলায় 'ওলো' শব্দের প্রয়োগ খুবই সাধারণ। চর্যাতেও অনুরূপ প্রয়োগ আছে, যেমন,—আলো ডোম্বি, অলো সহি (=ওলো সই), ইত্যাদি।

চর্যার ভাষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার তুলনা করলে যে-ধরণের সাদৃশ্য চোখে পড়ে তার থেকে বলা যেতে পারে যে চর্যার ভাষা হিন্দী অপেক্ষা বাংলারই অধিকতর অনুকূল। এই দুই গ্রন্থ থেকে অল্পস্বল্প আলোচনা এখানে করা হল। বিভক্তি-প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক বাংলার সঙ্গেই যখন যথেষ্ট মিল দেখা যায় তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে যে প্রচুর মিল পাওয়া যাবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রায় সমস্ত কারক-বিভক্তির মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন:—১) করণে: এ,-এঁ—কুঠারেঁ, হাথেঁ, বেগেঁ, ইত্যাদি (চর্যা); নেহাএঁ, মাথাএ, সরুপেঁ, ইত্যাদি (শ্রী. কী.)। ২) গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে:-ক,-রে,—ঠাকুরক, নাশক, তোহোরে, রসানেরে, ইত্যাদি (চর্যা); মথুরাক, কংশেরে ইত্যাদি (শ্রী কী)। ১৩) অপাদানে:—ত -ডোম্বীত আগলী (চর্যা). ইত্যাদি; ঘরত বাহির (শ্রী. কী.) ইত্যাদি। ৪) সম্বন্ধপদে আর,-এর,-র—ডোম্বীএর, রুখের, মুসার, হরিণীর, তোহোর, ইত্যাদি (চর্যা); তিরীর, কাণের, তোহোর ইত্যাদি (শ্রী. কী.)। এ ছাড়া, চর্যায় ষষ্ঠীতে—ক-বিভক্তির প্রয়োগও আছে, যেমন,—ছান্দক, করণক, ইত্যাদি। সাধারণ দৃষ্টিতে এটিকে হিন্দীর অনুকূল বলা যেতে পারে। কারণ আধুনিক হিন্দীতে ষষ্ঠীতে -কা,-কী,-কে বিভক্তির প্রয়োগই সর্বাধিক, যেমন,—রামকা, উনকে, উনকী ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দু'একস্থানে ষষ্ঠীতে—ক বিভক্তির প্রয়োগ আছে, যেমন,—যমুনাক তীরে, আহ্মক প্রতি ইত্যাদি।

চর্যায় প্রযুক্ত অনুসর্গের দৃষ্টান্তও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রচুর আছে, যেমন,—চর্যায়—তোহোর অন্তরে, তোএ সম, ডোম্বীএর সঙ্গে, দিয়া চঞ্চালী ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখি—তোমার অন্তরে, তা সমে, বড়ায়ির সঙ্গে, হাথ দিআঁ, ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদেও বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—মধ্যম পুরুষে: চর্যায়—পুচ্ছসি, বুঝবি, অইসসি, জাসি, ইত্যাদি; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—করসি, বুঝসি, বাসসি, যাসি, ইত্যাদি। অনুজ্ঞায়: (চর্যা)—করউ, দেউ, জাইউ, জাউ

CENTRAL LIBRARY

ইত্যাদি ; (শ্রী. কী.)—করউ, দেউ, জাইউ, জাউ, ইত্যাদি। অনুজ্ঞায় এমনরূপও আছে যা একেবারে আধুনিক বাংলা,-যেমন—ছাড়ো। কোথাও হিন্দীর মত 'ছোড়ো-'নেই। অতীতকালে ইল এবং ভবিষ্যৎকালে-ইব : চর্যায়—দেখিল, আইলা, গেলা, করিব, জাইবে, ইত্যাদি ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—দেখিল, আইলা, গেলা, করিব, জাইবে, ইত্যাদি। অকর্মক ক্রিয়ায় অতীতকালে স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগ : চর্যায়—রাতি পোহাইলী ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—হাসিলী চন্দ্রাবলী, উত্তরলী হরিলী রাহী, ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়াপদে -ইলে,-ইতে ; চর্যায়—জীবন্তে মইলেঁ, সাঙ্কমত চড়িলেঁ, অচ্ছন্তেঁ, ইত্যাদি ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—মইলেঁ মুকুতি, সঙ্কাই চড়িলেঁ, করিতেঁ, জায়িতেঁ ইত্যাদি। আধুনিক বাংলাতেও এই প্রয়োগই প্রচলিত। হিন্দীতে অনুরূপ প্রয়োগ হয় না।

ক্রিয়াপদের রূপে বচনভেদের লক্ষণ চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দুই গ্রন্থেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন, চর্যায়—ভণন্তি, বিলসন্তি, চাহন্তি, নাচন্তি, গান্তি, ইত্যাদি ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—চাহেন্ত, কহন্তি, কান্দন্তি, কহিলান্ত ইত্যাদি। অধুনালুপ্ত বাংলা ক্রিয়ার প্রয়োগও এই দুই গ্রন্থেই কিছু কিছু পাওয়া যায় ;—যেমন,—√লড়্। চর্যায় পাই—লোড়িব কইসে ; আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই—লড়িউ সিনানে।

সর্বনাম পদে চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বোধকরি সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল : চর্যা—অপণা, অপণে, এ, এত, এত (-কাল), এথা, এবেঁ, এহু, এহু, কা, কি, কিণ, কিব (কীষ, কীস), কে, কেহো, জইসনে, জথা, জবে, জবেঁ, জা, জে, জাহের, জেণ, তবেঁ, তহি, তহি, তই, তা, তু, তুম্হে, তে, তো, তোএ, তোরা, তোরেঁ, তোহার, তোহোর, তোহোরি (স্ত্রীং), তোহোরে, ম, মই মো, মোএ, মোহোর, যে, সে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত সর্বনাম পদগুলির মধ্যে চর্যার মত অনেকগুলি রূপই পাওয়া যায়, যেমন—অপণ, আপণা আপণে, এ, এত, এথা, এথা, এবেঁ, এসি, এহা, কা, কি, কিনা, কিস (-কর্ত্তে,), কে, কেহো,, যথা, জবে, যা জাহার জে, জেন, যেন, জৈসাণে, তবেঁ, তহু, তহি, তে, তা, তুহ্মি, তোএ, তোরেঁ, তোঞ, তোহোর, তোহোরে, মোএঁ, মোঞ্ঞ, মো, মোহোর, যে, সে, ইত্যাদি।

বাক্যাংশ ও প্রবাদের তুলনা করলেও চর্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সাদৃশ্য স্বীকার করতে হয়। যেমন—

চর্যায় : আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে : আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।
অবশ্য কবি প্রসিদ্ধিরূপে এই প্রবাদটি অন্য ভাষাতেও দেখা যায়।

চর্যায় : আইস সংবোহেঁ কো পতিআই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে : তা সুনি কে বা পাতিআএ! শ>স
(ঈদৃশ সংবোধে কে প্রত্যয় করে) (তা শুনে কে প্রত্যয় করে!)

চর্যায় : ধরণ ন জাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে : ধরণ না জাএ।

চর্যায় : গহণ গম্ভীর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে : গহীন গম্ভীর।

এতদ্ব্যতীত চর্যায় এমন কতকগুলি বাক্যাংশের রীতি লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি আধুনিক বাংলার সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে জড়িত এবং ঠিক যেরূপ হিন্দীতে একেবারেই নেই যেমন—

থির করী (তুঃ স্থির করি বা করিয়া)। আখি বুজি অ (তুঃ চোখ বুজে)। কহণ ন জাই। হাড়ীত ভাত নাহি। দিঢ় করিঅ, গুণিআ লেহঁ ইত্যাদি।

ধাতু ও ক্রিয়ারূপের প্রয়োগেও চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নানাধরণের সাদৃশ্য আছে। যেমন,—

√আছ্ (<√অচ্ছ্ <অস্)

CENTRAL LIBRARY

চর্যায় : অচ্ছই, অচ্ছহ, অচ্ছন্তে, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে : আছোঁ, আছহ, আছেন্ত ইত্যাদি।

√আছ্ ধাতুর প্রয়োগ হিন্দীতে প্রায় নেই বললেই হয়। চর্যায় অন্যান্য কতকগুলি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ এখানে দেওয়া হল—

করিঅ, করিঅই (<* কর্যতে = ক্রিয়তে), করিব, করেই, করন্তি, করিহ, কান্দই, খাই, খাঅ, খাইব, খেলই, গঢ়ই, গাইতু, গান্তি, গুণন্তি, ঘোলুই, চলিল, চালি, চাহঅ, চাহি, চাহিঅই, চুম্বী, ছাইলি, ছাড়, ছাড়ই, ছাড়ি, ছাড়িল, (কোথাও হিন্দী √ছাড় রূপ নেই), জাঅ, জাই, জাইউ, জাইব, জাইবেঁ, জাউ, জাগঅ, জাণ, জাণমি, জাণী, জানমি, জানহ, জাসি, জাহী, জাহ, জিতা, জিতেল, জীবন্তে, জীবমি, জোড়িঅ, টালিউ, থাকিউ, থাকিব (√থাক্ ধাতু হিন্দীতে অজ্ঞাত), দেউ, দেখইআ, দেখি, দেখিল, দেত, ধরিঅ, নাচঅ, নাহি, পইসঅ, পড়অ, পড়িআঁ, লেঁ, পড়িলা, পরিহাই, পিবই, পীবমি, পুছমি, পুছন্তু, পুচ্ছিঅ, পোহাঅ, পোহাই, পোহাইলী, ফাড়িঅ (তুঃ বাং. ফাড়িয়া), বট্টই, বহিআ, বহুড়ই, বাহুড়ই, বহুড়ী, বাজঅ, বাজই, বান্ধি, বাসমি (<√বাস্), বাহিঅ, বিকণঅ, বিকসউ, বিলসই, বিহরএ (তুঃ বাং. বিহরে = বিহার করে), বুজিঅ (তুঃ বাং. চোখ বুজিয়া), বুঝ,—ঝি,—সি, বুঝি (অ), বোলই, ভইল (1), ভইলী, ভইলে, ভাঅ, ভাবিঅই, (তুঃ বাং ভাবিয়া), ভুঞ্জই, মউলিল (<মুকুলিল), মারমি, মারি, মারিল, মোড়িঅ, যাইসি, যাই, রহই, লই, লইঅ (1), লাগেলী, লোড়িব (চলা অর্থে), লুড়িউ (<√লুঠ্), বামায়, যোহই, সিঞ্চহ, হুতেলি, হুন, হুনি, হুনিআ, সোহই, হই, হোই, হোইব, হোহিসি ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত কতকগুলি ক্রিয়ারূপের সঙ্গে চর্যার উপরোক্ত ক্রিয়ারূপগুলির তুলনা করা যেতে পারে। যেমন—

করিআঁ, করিএ (<* কর্যতে = ক্রিয়তে), করিব, করিবাক (তুঃ চর্যা : বাহিবাক), করিহ, কহন্তি, কান্দএ, খাই, খাইব, খেলাএ, গঢ়াইবোঁ, গাএ, গুণিলান্ত, ঘোলে, চলিল, চালিআঁ, চাহে, চাহিতেঁ, চাহি, চুম্বী, ছাইল, ছাড়, ছাড়এ, ছাড়ি, ছাড়িল, জাঅ, জাই, জাইএ, জাইব, জাইবেঁ, জাউ, জাউ, জাহা, জাগাএ, জাণ, জাণী, জানওঁ, জাণহ, জানহ, জাণসি, জাহ, জাহা, জিআ, জীয়ন্ত, জীবোঁ, জুড়িএ, জুড়ী, টালিআঁ, থাকু, থাকিএ, থাকিব, দেউ, দেউ, দেখিআঁ, দেখি, দেখিল, দেন্ত, ধরিআঁ, নাচএ, নাহি পইসওঁ, পইসে, পড়এ, পড়িআঁ, পড়িলেঁ, পড়িলা, পড়িহাসে পিআ, পুছ, পুছন্তি, পুছিউ, পুছিআঁ, পোহাওঁ, পোহাইল, বটে (<বট্টই), বহিআঁ, বাহুড়াএ, বাহুড়িআঁ, বাজাএ, বান্ধি, বাস (∠√বাস্), বাহিআঁ, বিকণিআঁ, বিকন্ত, বিলসিল, বুঝ, বুঝসি, বুঝিআঁ, বোলএ, ভইল, ভইলী, ভাএ, ভুঞ্জে (ভুঞ্জই), মুকুলিল, মারি, মারিল, মোড়িআঁ, যাসি, যাই, রহাই, রহাএ, রহে (∠রহই), লই, লইআঁ, লাগিলী, লুড়িআঁ, (<√লুঠ্), লড়িউ (চলা অর্থে), সামায়, সামায়, সোঅ (সোহই), সিঞ্চউ, হুতিলী, হুণহ, হুণি, হুণিআঁ, শোষে, হই, হোই, হইব, হওসি ইত্যাদি।

চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দুইয়ে-ই ছন্দে যে পয়ারের আদিরূপ সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে তা অনেকেই বলেছেন। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে প্রাচীন হিন্দী কাব্যে এই ধরণের পয়ারের রূপ তেমন দেখা যায় না। তা সে যাই হোক, চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে ভাষাগত তুলনা করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে চর্যার ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষারই আদি এবং আরও কিঞ্চিৎ স্থূলতর রূপ। বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয়ের প্রয়োগ থেকেও এই মতই সমর্থিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

ভারতের ভাষাগোষ্ঠী ও বাংলা

কৃষ্ণপদ গোস্বামী

বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীর সমন্বয়ে গঠিত ভারতের ভাষাগুলিকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) আর্য-শাখা, (২) দ্রাবিড় শাখা, (৩) অস্ট্রিক শাখা বা কোল শাখা, (৪) ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী শাখা। দ্রাবিড় শাখার মুখ্য ভাষাগুলি তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালাম্ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। ভারতের প্রায় এক পঞ্চমাংশ লোক তাহাদের মাতৃভাষারূপে দ্রাবিড় শাখার ভাষাগুলি ব্যবহার করে। ভারতে আর্য শাখার ভাষাগুলির পরেই সাহিত্যগৌরবে দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি সমৃদ্ধ। অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হইতেছে সাঁওতালী, শবর, ভূমিজ, কোরকু, হো, গর্দা প্রভৃতি। মধ্যভারত ও ছোটনাগপুরের প্রায় এক কোটি আদিম অধিবাসী এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে। সুপ্রাচীন কাল হইতে এই ভাষাগুলি উত্তর-ভারতে প্রচলিত থাকিলেও ইহাদের বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। ভোট-বর্মী শাখার প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে মণিপুরী, মেইতেই, কোণ্ডা, টিপুর, গারো, লুশে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৭৫ লক্ষ লোক এই শাখার শতাধিক ভাষা ও উপভাষা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে। কিন্তু এই ভাষাগুলিরও কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। সুতরাং ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ইহাদের প্রভাব একেবারেই নগণ্য। তবে সম্প্রতি অরুণাচল, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সব পার্বত্য রাজ্যের অন্-আর্য ভাষাগুলি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অন্যান্য উন্নত ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর যে শাখা ভারতে আর্য ভাষারূপে প্রচলিত, সেই শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হইতেছে পূর্ব অঞ্চলের বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মধ্যদেশের হিন্দী (ও উর্দু); উত্তর অঞ্চলের কাশ্মীরী; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাবী; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গুজরাটী ও মারাঠী। ভারতের সংবিধানে আর্য শাখার প্রধান নয়টি ভাষা—বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, মারাঠী ও গুজরাটী; দ্রাবিড় শাখার প্রধান চারিটি ভাষা—তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালাম্, এই তেরটি আঞ্চলিক ভাষা, তৎসহ ইংরেজী ও সংস্কৃত মোট এই পনেরটি ভাষা প্রশাসনিক কাজের জন্য ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য এবং আন্তঃপ্রাদেশিক সরকারী কাজের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন। এইহেতু ভারতীয় সংবিধানে সংযোগকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে (Lingua franca) হিন্দীর দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে আন্তঃপ্রাদেশিক সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করিবার অনুকূলে মত দিয়াছেন। কিন্তু অ-হিন্দী অঞ্চলের অধিবাসিগণের তীব্র আন্দোলনের ফলে এই সিদ্ধান্ত এখনও কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ভাষা কমিশনের দুইজন বিশিষ্ট সদস্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুব্বারায়ন তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় হিন্দীকে 'রাষ্ট্রভাষা' রূপে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মর্তব্য। বর্তমানে ইংরেজী ভাষাই হইল পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ

CENTRAL LIBRARY

ভাষা। সহসা যদি ইংরেজীর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ছেদ করি, তাহা হইলে একদিকে যেমন আমরা অন্য দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইব, অন্যদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে।

যতদিন পর্যন্ত ভারতের কোন আঞ্চলিক ভাষা সর্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা অর্জন না করিবে, ততদিন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন দিতে হইবে।

এই সঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে সেই ভাষার শক্তি ও সম্পদ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাই একটি ভাষা 'রাষ্ট্র-ভাষা' হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, তামিল ও মারাঠী সাহিত্য গৌরবে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের সঙ্গে তুলনায় হিন্দী ভাষার দৈন্য সুস্পষ্ট। আবার ভাষার সম্পদ এবং প্রাণশক্তির দিক হইতে চিন্তা করিলে সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান সর্বপ্রথম। ভারতে মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পরেই বাংলার স্থান। ভারতের আর্য ও অন্-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর যতগুলি উন্নত প্রাদেশিক ভাষা আছে, তন্মধ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, বিহার এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাঙ্গালীকে ধরিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২ কোটি। পৃথিবীর ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে সংখ্যার দিক হইতে ইহার স্থান হইল তৃতীয়। চীনা ও ইংরেজীর পরেই আমরা সগর্বে বাংলার নাম করিতে পারি।

আজ পূর্ব দিগন্তে নব সূর্য উদ্ভাসিত। পাকিস্তানের কবলমুক্ত হইয়া বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের দেশবিভাগজনিত অদূরদর্শিতার ফলে উভয় বঙ্গের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটিল। পাক শাসকবর্গ বাংলা-দেশের জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার হীন ষড়যন্ত্র জনগণ-মন-অধিনায়ক শেখ মুজিবের তীব্র আন্দোলনের ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা আত্মাহুতিও দিয়াছেন। অতঃপর বাংলাদেশের বুদ্ধি-জীবী, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ বাংলাভাষার সার্বিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা ও ভাবসাধনা কাব্যে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে এককথায় সাহিত্যের সর্বস্তরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বাংলা পরি-ভাষা রচনার কাজেও তাঁহাদের গভীর নিষ্ঠার পরিচয় মিলে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের পরিভাষা কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিভাষা রচনার কাজ এখনও পুরাদমে চলিতেছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের কাজে বাংলা আকাদামির ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রাচীন লোকসঙ্গীত, জারিগান, বাউলগান, কবিগান, ভাদুগান, গাথা, রূপকথা, বারমাস্যা ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নহে। অল্পস্বল্প শিশুসাহিত্য ও নাটক প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গঠিত নূতন সরকার প্রথমেই বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়াছেন। বাংলার আকাশ বাতাস আজ রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ দাশের সঙ্গীতে মুখর। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হইল —রবীন্দ্রনাথের, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি। এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। বাংলাদেশে গণ-আন্দোলনের সময় হইতেই এই গানটি জাতীয়তাবোধের প্রতীকরূপে নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করিয়াছে—'বাংলা ভাষার একটি অক্ষর বাঙ্গালীর জীবন।' বাংলাদেশের আবির্ভাব আমাদের সামনে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। দুই বাংলার মধ্যেকার প্রাচীর অপসারিত

CENTRAL LIBRARY

হইয়াছে। ওপার বাংলার আদর্শে এপার বাংলার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে উভয় বঙ্গের বাঙ্গালীই এক। বিগত ২৪ বৎসরে বাংলা দেশের সাহিত্য ও শিল্পে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আবার পশ্চিমবাংলার সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যাহাতে বাংলাদেশের অধিবাসিগণের ঔৎসুক্য জন্মে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ফলে দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজে বাংলাভাষা এখনও অপাংক্তেয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভাষাতত্ত্বগত প্রশ্নগুলি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে করা হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। বাংলাদেশে 'বাংলা' সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করায় ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। ওপারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যদি এপারেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সুষ্ঠু অনুশীলন ও গবেষণা হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে উহা সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

CENTRAL LIBRARY

প্রাচীন বাংলায় বহুবচনের ব্যবহার

সুধাংশু তুঙ্গ

আধুনিক বাংলায় নানাভাবে বহুত্ব জ্ঞাপন করা হয়। মধ্য বাংলার সঙ্গে এই দিক দিয়ে আধুনিক বাংলার তেমন কোন গুরুতর পার্থক্য নেই, তার মানে মধ্য বাংলায়ও আধুনিক বাংলার মত নানা উপায়েই বহুত্ব প্রকাশ করা হত, অন্তত মধ্য বাংলার অন্তঃস্তরে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার বহুত্ব জ্ঞাপক স্বল্প কয়েকটি মাত্র উদাহরণের সন্ধান পাই।

৪৭টি পদে রচিত চর্যাপদের মোট শব্দ সংখ্যা ২,৩৯১টি। এর ভেতরে মোট ১৫৫টি শব্দে বা শব্দগুচ্ছে কোন না কোন রকমের বহুত্ববাচকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে সবশুদ্ধ ৭টি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এইগুলি হল : (১) সংখ্যাশব্দ, (২) বহুত্ববাচক বা শ্রেণীবাচক শব্দ, (৩) শব্দদ্বিত্ব, (৪) বহুবচনের ক্রিয়ারূপ, (৫) বহুবচন প্রত্যয়, (৬) একবচনের পদ ব্যবহার এবং (৭) শব্দ যুগল।

সংখ্যা শব্দ ॥ পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভাষায় বহুত্ব জ্ঞাপনের সবচেয়ে সহজতম ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল সংখ্যা শব্দের ব্যবহার। চর্যাপদে মোট ৪৭টি ক্ষেত্রে এইরূপ সংখ্যা শব্দের ব্যবহার আছে। সংখ্যাগত ক্রম অনুসারে এগুলি হল :

দুই : দু, যেমন দু আন্তে (৫) ও দুখোলেঁ (১৩)
দুআ, যেমন কীটউ দুআ'(১২)
দুই, যেমন দুই ঘরে (৩), দুই চকা (১৪), দুই মাগ (১৪) ও দুই আর ন দিশ অ (২৬)
দো, যেমন দো বাটা, 'দুই পথ' (১৫)
বেণি, যেমন ধমণচমণ বেণি (১), বেণি পখা, 'দুই পাখা' (৪), বেণি সিকল (১৬), বেণি মারি (সঙ্গীতের 'দুই স্বর') (১৭), বেণি করণ্ড 'দুই ঢাক' (১৯), বেণি পাখেঁ 'দুই পাখায়' (৪৬)

তিন : তি, যেমন তি অস 'ত্রিদশ' (২২), তিশরন (১৩), তিহুঅন (১৬) ও তিহুবণ (৩৬)
তিঅ, যেমন তিঅধাউ (২৮), তিঅধাএ 'ত্রিধামে' (৩৩)
তিনা „ তিনা মাঝেঁ (৩৩)
তিনি „ তে তিনি 'তারা তিনজন'(৭,তিনবার ব্যবহৃত), তিনি ভুবন (১৮) ও তিনি হো ভিন্না (৭)
তিনিএঁ, যেমন তিনিএঁ পাটেঁ (১৬)

চার : চউ, যেমন চউখন (৪৪) ও চউদিস (৮)
চৌস „ চৌদীস (৬)

পাঁচ : পঞ্চ „ পঞ্চজনা (২৩), পঞ্চ তথাগত (১৩), পঞ্চপাটন (৪৯), পঞ্চবিসঅ (১৬) ও পঞ্চ বি ডাল (১)
পাঞ্চ, যেমন পাঞ্চ, কেড়ুআল 'পাঁচ (টি) দাঁড়' (১৪), পাঞ্চজনা (১২) ও পাঞ্চ নালেঁ 'পাঁচ (টি) নালায়' (৪৭)

ছয় : ছড়, যেমন ছড়গই 'ষড়গতি' (৯)

আট : অট, „ অটমহাসিদ্ধি (১৫)

CENTRAL LIBRARY

নয় : নব যেমন নবগুণ (৪৭)

দশ : দশ „ দশবলরঅণ (৯) দস যেমন দসদিসেঁ (৯) দহ যেমন দহদিহ (৩৫) ও দহদিহেঁ (৫০)

বারো : দ্বাদশ „ দ্বাদশ ভূঅণেঁ (৩৪)

বত্রিশ : বতিশ „ বতিশ তান্তিবনি (১৭)

বতিস „ বতিস জোইনী (২৭)

চৌষট্টি : চউশঠী „ চউশঠী ঘড়িএ, চৌষট্টি কলসীতে (৩)

চউষঠ্‌ঠি, যেমন চউষঠ্‌ঠি কোঠা (১২)

চৌষঠ্‌ঠী „ চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী 'চৌষট্টি পাপড়ি' (১০)

কোটী : কোড়ি, যেমন কোড়ি মঝেঁ (২)

চার কোটী : চউকোড়ি যেমন চউকোড়ি ভাণ্ডার (৪৯)

চৌকোটি „ চৌকোটি বিমুক্কা 'চার কোটি বিমুক্ত' (৩৭)

এই সব সংখ্যা শব্দ বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। চর্যাপদে ব্যবহৃত বেশির ভাগ সংখ্যা শব্দই বিশেষণ। বিশেষণ হলে এরা কোন শব্দ বিভক্তি গ্রহণ করে না। মধ্য ভারতীয় আর্য যুগ থেকে বিশেষণ পদে বিশেষ্যের অনুরূপ কারক বিভক্তির ব্যবহার কমে গিয়েছিল, নব্য ভারতীয় আর্য যুগে একেবারেই দূরীভূত হল, যেমন আধুনিক যুগে হয়েছে। চর্যাপদে অবশ্য এ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম আছে দেখা যাচ্ছে। এটি হল 'তিনিএঁ' (১৬), এতে তৃতীয়া বিভক্তির সংযোগ হয়েছে। এ ছাড়া একটি সন্দেহজনক দৃষ্টান্তও আছে, যেমন মাঝেঁ' (৩০), এখানেও তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখি। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে সংখ্যা শব্দ অবশ্য সমস্ত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কারক বিভক্তি গ্রহণ করে থাকে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত কারকবিভক্তির সন্ধান পাই : কোড়ি মাঝে (২), তে তিনি (৭, তিনবার), দুই আর ন দিশঅ (২৬)।

বানানের তারতম্য নতুন কিছু নয়, চর্যাপদে যেমন তেমনি ব্যাপকভাবেই সমস্ত মধ্য ভারতীয় আর্য সাহিত্যে বানানের প্রচুর হেরফের দেখা যায়। এজন্যে অন্য কিছু মনে করবার কারণ নেই।

শ্রেণী কিংবা বহুত্ববাচক শব্দ। বিশেষ্য পদের পূর্বে কিংবা পরে শ্রেণী কিংবা বহুত্ববাচক শব্দের ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় আর্য যুগ থেকে প্রচলিত। এইরকম শব্দ ব্যবহারের বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত চর্যাপদে পাওয়া যায়, যেমন—এত, দঙ্গাল, নানা, বহু, বিবিহ, সকল এবং সর্ব।

[এত], যেমন এতকাল (৩৫) ; এতকাল শব্দটি অবশ্য একবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন ইংরেজী *great, long, much* ইত্যাদিতে হয়ে থাকে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে 'এতকাল' সম্পূর্ণভাবেই কালের ব্যাপকতা অর্থাৎ বহুত্ব নির্দেশ করছে।

[দঙ্গাল] মানে অনেক। চর্যাপদে শব্দটির একবার মাত্রই ব্যবহার হয়েছে। তা হল 'অদঅ দঙ্গালে* দেশ লুড়িউ' (৪৯)।

[নানা] মানে অনেক, একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'নানা তরুবর' (২৮)।

[বহু] 'নানা' একবার ব্যবহৃত, যথা 'বহুবিহ খেড়া' (৪১)।

* প্রামাণিক সংস্করণে 'বঙ্গাল' আছে। 'দঙ্গাল' মূলতঃ ফার্সী শব্দ 'দংগল'। চর্যার যুগে ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।—সম্পাদক

CENTRAL LIBRARY

[বিবিহ] 'অনেক' একবার মাত্র ব্যবহৃত, যেমন 'বিবিহ বানধন' (৯)।

চর্যাপদে বহুলভাবে ব্যবহৃত বহুত্ববাচক শব্দ হল [সকল]। বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয়পদেই মোট দশটি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয়েছে। অবশ্য [সকল] এই রূপের কেবল একবার মাত্র ব্যবহার পাই ; শব্দটির বিকল্প [সঅল] ও [সএল] বাকি ৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সংখ্যা শব্দের মত বহুত্ববাচক এইসব শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে কারকবিভক্তি প্রযুক্ত হয় না। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে অবশ্য যথানিয়মে কারকবিভক্তি পরিগ্রহ করে। চর্যাপদে উভয় রূপের সমান সমান ব্যবহারই দেখি। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত : সকল, যেমন 'সকল স(মা)হিঅ' (১), সঅল, যেমন 'সঅলধাম' (৪৪), 'বিমঅ মণ্ডল সঅল' (১৬) ও সঅল সহাবে' (৯) এবং সএল, যথা 'তিহুঅন সএল' (১৬)। বিশেষ্যপদ রূপে ব্যবহৃত : সঅল, যথা সঅল বিটালিউ' (১৮), সঅল বিআপিউ (১৭) সঅল সুফল করি' (৩৬) এবং বিকল্পরূপ সঅলা, যথা 'সঅলা অইস সহাব' (৪১) ও 'সঅলা অহারী' (৩৬)। এক্ষেত্রে শব্দান্ত / -আ / নিঃসন্দেহে বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি।

[সর্ব] কেবলমাত্র একবারই পাই, যেমন, 'সর্ব বিছুরিল' (৪৪)।

শ্রেণী নির্দেশক শব্দগুলি সর্বদাই বিশেষ্য। তারা প্রায়ই একবচনের মত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তারা যখন অন্য শব্দের সহিত বিভক্তির মত যুক্ত হয়ে অনুগামীরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তারা বহুবচনের নির্দেশ করে। চর্যাপদে এই ধরণের দুইটিমাত্র শব্দের সন্ধান পাই, [জন] এবং [লোক]। [জন] একবারই দেখি, যেমন 'বিহুজন' (৪৫) ; [লোক] পাই 'তুম্হে লোঅ' (৫), 'পারগামি লোঅ' (১৫), 'বিহুজন লোঅ' (১৮) এবং 'মিছে লোঅ' (২২) প্রভৃতি চারটি ক্ষেত্রে। হিন্দীতে [লোক] বহুবচনের বিভক্তি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত, যেমন, তুমলোগ 'তোমরা', বচ্চে লোগ 'বাচ্চা ছেলেরা' ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় বহুবচনের বিভক্তি হিসাবে [জন] কিংবা [লোক] এর ব্যবহার বজায় নেই। উভয় শব্দই কেবল 'মানুষ' বা ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়, এমনকি যখন ট্যাগ ওয়ার্ড বা পশ্চাৎগামী শব্দরূপে গৃহীত হয় তখনও এর ব্যতিক্রম নেই। এইরকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চর্যাপদে একজায়গায় মাত্র পাওয়া যায় : 'কুলিনজন' (১৮)। এক্ষেত্রে [জন] 'ব্যক্তি' বা 'মানুষ' হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে আরও অন্যরকম আভাস কোথাও নেই। অবশ্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় পদটিকে বহুবচনের অর্থেই গ্রহণ করেছেন।[১]

শব্দদ্বিত্ব ॥ শব্দ-দ্বিত্ব বা শব্দের পুনরাবৃত্তি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দু প্রকারের পুনরাবৃত্তি আছে : এক, অসার বা শব্দ-কিংবা ধাতু-মূলের পুনরাবৃত্তি ও দুই, শব্দের পুনরাবৃত্তি। শব্দের পুনরাবৃত্তি হলে তবেই তাকে শব্দ-দ্বিত্ব বলা যায়। বৈদিক ও সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন যুগের ভাষাগুলিতে প্রথমটি অর্থাৎ অক্ষর শব্দ কিংবা ধাতুমূলের পুনরাবৃত্তি সচরাচর দেখা যায়। বৈদিক প্রভৃতি ভাষায় দ্বিতীয় প্রকারের পুনরাবৃত্তি যে একেবারে নেই তা নয়, আছে, তবে ব্যবহার বেশ সীমাবদ্ধ। ঋগ্‌বেদে এই ধরণের মোট ১৪০ বার ব্যবহার পাওয়া যায়।[২] মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ও এই ধরণের পুনরাবৃত্তির ব্যবহার আছে, তবে মধ্যভারতীয় আর্য সাহিত্যের বিরাট পরিমাণের তুলনায় তা খুবই কম।

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *Origin and Developmant of Bengli Language* (London, 1970), Vol. II, & 488 এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায় : *The Old Bengali Language and Text* (Cacutta, 1963), পৃ. ২৩

২. Macdonell. A. A. : *A Vedic Grammar for Students* (Oxford University Press, 1966), 189C ম্যাকেডোনেল অবশ্য Itrative Compound নামে এইসব পুনরাবৃত্তিকে অভিহিত করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

চর্যাপদের প্রসঙ্গ আমাদের কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ শব্দের পুনরাবৃত্তি নিয়েই প্রয়োজন। নব্যভারতীয় আর্য-ভাষার বর্তমান স্তরগুলিতে এই ধরণের পুনরাবৃত্তির ব্যবহারগত সীমা পরিসীমা নেই। বিশেষ্য, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়াপদ প্রভৃতি সমস্ত পদেই এইপ্রকার পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত আছে। চর্যাপদে গ্রন্থটি আয়তনে বিরাট নয়, এজন্যে এতে সমস্তপ্রকার পুনরাবৃত্তি বা শব্দ-দ্বিত্ব আশা করা অন্যায়। তবুও এতে শব্দ-দ্বিত্বের যে সব দৃষ্টান্ত আছে তাদের বৈচিত্র্য কম নয়।

শব্দ-দ্বিত্বের কাজ দু প্রকারের: এর দ্বারা শব্দের অর্থকে জোরদার করা হয়; এবং যে সব শব্দ সাধারণভাবে একবচনের অর্থনির্দেশক, পুনরাবৃত্তির ফলে সে সব শব্দও বহুবচনাত্মক হয়ে পড়ে। এবং এই দ্বিতীয়টিই শব্দ-দ্বিত্বের বৃহত্তর কাজ। নব্যভারতীয় আর্য ভাষাসমূহে এই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকট। চর্যাপদে উভয়প্রকারের দৃষ্টান্তই বর্তমান।

এইগুলি হল বহুত্বজ্ঞাপক পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত:

ক. বিশেষ্যপদের শব্দ-দ্বিত্ব: আস্থ রে আস্থ (২৬), কুলে কুল (১৪), কুলেঁ কুলঁ (১৫) এবং গঅণত গঅণত (৫০)।

খ. সর্বনাম পদের শব্দ-দ্বিত্ব: কেহো কেহো (১৮), জে জে 'যারা', আক্ষরিক 'যারা যারা' (৭ এবং ১৫) এবং তে তে 'তারা', আক্ষরিক 'তারা তারা' (৭)।

গ. বিশেষণ পদের শব্দ-দ্বিত্ব: চর্যাপদে এইধরণের কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্তই আছে, উঁচা, উঁচা, 'উঁচু, আক্ষরিক 'উঁচু উঁচু' অর্থাৎ অনেকগুলি উঁচু (পর্বত)।

ঘ. বিশেষণের বিশেষণ পদের শব্দ-দ্বিত্ব: নিতে নিতে 'নিত্য নিত্য' (৩৩) এবং বলি বলি 'বার বার' (৪৬)।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে যে বহুবচনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এ সম্পর্কে বস্তুতঃ কোন সন্দেহ নেই। যখন ক্রিয়াপদে পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হয় তখন বহুত্বজ্ঞাপকতার বদলে একপ্রকারের পুনরাবৃত্তিগত অর্থ জ্ঞোতিত হয়। ক্রিয়াপদগত শব্দ-দ্বিত্ব আবার দু প্রকারের হতে পারে, সমাপিকা ক্রিয়াপদের শব্দ-দ্বিত্ব ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদের শব্দ-দ্বিত্ব। চর্যাপদে প্রাপ্ত সমস্ত ক্রিয়াপদগত শব্দ-দ্বিত্বই অসমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি, সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির ব্যবহার নেই। দৃষ্টান্ত এইগুলি:

ছোই ছোই (১০) 'ছুঁয়ে ছুঁয়ে',
ধুনি ধনি (২৬) '(তুলো) ধুনে ধুনে',
মিলি মিলি (৮) মিলে মিলে;
রচি রচি (২২) 'রচে রচে', 'তিরি করে করে'।

এ ছাড়া চর্যাপদে আর এক প্রকারের শব্দ-দ্বিত্ব আছে, একে বলা যেতে পারে অব্যয়ের শব্দ-দ্বিত্ব, এ সম্পর্কে আগেই কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এইশ্রেণীর শব্দ-দ্বিত্বে ক্রিয়াপদের শব্দ-দ্বিত্বের মত পৌনঃপুনিকতার অর্থ প্রকাশ পায়। চর্যাপদে কেবলমাত্র এই দুইটি দৃষ্টান্ত আছে: তিম তিম, তেমন,' আক্ষরিক 'তেমন তেমন' এবং যিম যিম, 'যেমন,' আক্ষরিক 'যেমন যেমন'। দুটি দৃষ্টান্তই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং এরা একটি পদে, (২) এ ব্যবহৃত হয়েছে।

বহুবচনের ক্রিয়ারূপ। ব্যাকরণের প্রয়োজনবশত বহুবচনের কর্তৃপদ বহুবচন প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়া এবং একবচনের কর্তৃপদ একবচন প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়া ব্যবহার করে। এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কর্তা-ক্রিয়ার এই বচন-

CENTRAL LIBRARY

গত অন্বয় যে সবসময় মেনে চলা হয় তা নয়, অন্তত আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এর বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যায়, প্রাচীনযুগের ভাষাগুলিতেও ক্ষেত্রবিশেষে একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। এর মানে এই যে ওইসব ভাষাতে কখনো কখনো একবচনের কর্তৃপদ বহুবচনের ক্রিয়া গ্রহণ করেছে এবং বহুবচনের কর্তৃপদে একবচনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। একে নিশ্চয়ই নিয়মের বহির্ভূত ঘটনা বলে গণ্য করতে হয়। চর্যাপদে কর্তা-ক্রিয়ার অন্বয়-বহির্ভূত দুরকম বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, কাহ্নু বিমন ভইলা (৭) ও পারগামি লোঅ নিভর তরই—এই বাক্য দুটি। (৭) এ [ভইলা] ক্রিয়া এবং বহুবচন, কিন্তু কর্তা [কাহ্নু] একবচন ; অনুরূপভাবে (৫) এ [পার-গামিলোঅ] কর্তা এবং বহুবচন, কিন্তু এর ক্রিয়া [এরই] একবচন। অবশ্য [পারগোমিলোঅ] একবচনের পদ রূপেও গৃহীত হতে পারে, কেননা এর বহুত্ববাচকতার সপক্ষে কোথাও কোন নিশ্চিত নিদর্শন নেই। সেক্ষেত্রে বাক্যটিতে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে পরিপূর্ণ অন্বয় আছে বলতে হবে। কিন্তু চর্যাপদে ব্যবহৃত বহুবাক্যেই কর্তাক্রিয়ার একবচনত্ব বা বহুবচনত্ব প্রমাণে কোন তর্কের অবকাশ নেই।

পুংলিঙ্গ বিশেষ্যপদের বহুত্বজ্ঞাপন সবচেয়ে সাধারণ প্রত্যয় হচ্ছে -আ।। প্রাচীন ভারতীয় আর্যযুগের পরে এই -আ সর্বনাম ও বিশেষ্যপদের অন্যান্য লিঙ্গেও সমানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এরকম ব্যবহার অজ্ঞতা বা ভুলবশত হয়ে থাকবে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সর্বনাম ও বিশেষ্যপদে এরকম ভুল ব্যবহারের পরিমাণ খুবই বেশি। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অবশ্য এই প্রত্যয়টি ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয় নি।

চর্যাপদে প্রথম পুরুষ অতীতকালের ক্রিয়ায় ব্যবহৃত -আ নিঃসন্দেহে এইরকম ভুলেরই ফল। এবং এই -আ। হয় বিশেষ্য পুংলিঙ্গের বহুবচন, এর অন্য কোন উৎস থেকে এসে থাকবে। জে জে আইলা, তে তে গেলা (৭) বাহকা [জে জে] এবং [তে তে] বহুবচন ; ক্রিয়া [আইলা] এবং [গেলা]-ও বহুবচন, এদের একবচনের যথাক্রমে রূপ হবে [আইল] এবং [গেল]। এই বাক্যে অন্বয় আছে, কিন্তু এরকম সর্বদা দেখা যায় না। এমনকি প্রাচীন সংস্কৃতে ও বচনগত অন্বয়ের অভাব বহুক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

চর্যাপদে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে বচনগত অন্বয় বজায় আছে :

ক. জে জে আইলা তে তে গেলা। (৭),

খ. জে জে উজুবাটা গেলা অনাবাটা ভইলা সেই। (২৫)

গ. জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি। (২২),

ঘ. কঙ্গুচিনা পাকিলা রে শবরাশবরি মাতেলা। (৫০)।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে ক্রিয়া বহুবচন, কিন্তু কর্তৃপদ আপাত একবচন বলে অন্বয়ের বিষয়টি কিছু সন্দেহজনক :

বাট রুন্ধেলা (৭)। [বাট]-এর বহুবচনাত্মক রূপ হল [বাটা], যেমন—অনাবাটা, উজুবাটা এবং দোবাটা (সবগুলি ২৫)।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে অন্বয় অনুপস্থিত :

ক. আকাশ ফুলিলা (৪১),

খ. উজুবাট ভইলা (৩২),

গ. কপাস্থ ফুটিলা (৫০),

ঘ. খাত পড়িলা (২৮),

CENTRAL LIBRARY

ঙ. চারিবাসেঁ গড়িলা রেঁ দিঙ্গী চঞ্চালী। (৫০),

চ. জো রথে চড়িলা (১৪),

ছ. নানা তরুবর মৌলিল রে (২৮)

জ. ভর নিদ গেলা (৩৬),

ঝ. সঅল সফল করি সুহে সুতেলা। (৩৬),

ঞ. সে সবরো নিরেবণ ভইলা। (৫০)।

সব কটি বাক্যেই ক্রিয়া বহুবচন কিন্তু কর্তা একবচন, কেবল একটি মাত্র বাক্য ছাড়া। এটি হচ্ছে [নানা তরুবর মৌলিল রে] (২৮)। এতে ক্রিয়া একবচন কিন্তু কর্তৃপদ বহুবচন। বহুবচনের কর্তৃপদের সহিত অনেকগুলি বাক্যে অবশ্য নিত্য বর্তমান ক্রিয়ার একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :—

ক. কান্দই সগুনশিআলী। (৫০)

খ. কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই। (১৮)

গ. ছেবই বিদুজন (৪৫)

ঘ. জামমরণ ভব কইসন হোই। (২২)

ঙ. তবে লুটই অবণাগবণা। (৩৬)

চ. দাঢ়ই হরিহর বাম্ভ ভড়ারা। (৪৭)।

এরকম ভ্রমাত্মক পদ ব্যবহারের কারণ সহজেই বোধগম্য ; প্রাচীন বাংলায় বচন সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সম্ভবত একবচন কর্তার সহিত অন্বিত অতীত কালের ক্রিয়ায় / আ / সম্মানার্থেই ব্যবহৃত। সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার সংস্কৃত প্রাকৃত ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যথেষ্টই পাওয়া যায়। একবচনের কর্তা যদি সম্মানিত ব্যক্তি হন তাহলে বাচনিকতার দিক দিয়ে তার সঙ্গে বহুবচনের যোগ সাধন করে তাঁকে সাধারণ ব্যক্তির সহিত পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়। অন্তত এই রকমই প্রাচীনদের ধারণা ছিল। আশ্চর্যের কথা যে আধুনিক বাংলায় উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্তও এই রকম সম্ভ্রম জনিত / আ /-এর ব্যবহার ছিল, যেমন ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের [আইলা, উদিলা, গেলা, কহিলা, বলিলা, মুদিলা, রহিলা, রোপিলা] প্রভৃতি। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের যে কোন অংশের দশ বিশ ছত্র একসঙ্গে পড়লেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতীত হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এইরকম ব্যবহারের মূল চর্যাপদ থেকেই চলে এসেছে। আধুনিক ওড়িয়াতে অতীত কালের প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায় এই / আ / বজায় আছে। অসমীয়া ও বাংলার উপভাষা বিশেষে অন্যান্য কালেও / আ /-এর ব্যবহার হয়।

বাংলা এবং ওড়িয়ায় আরো একপ্রকারের সম্ভ্রমসূচক পদ ব্যবহার আছে এবং সেটি এই / আ /-র চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে ঘটমান ও নিত্য বর্তমানের প্রাচীন / ন্ত / প্রত্যয় যা মূলে কেবল বহুবচনেই ব্যবহৃত হত। চর্যাপদের বহু ক্ষেত্রেই এই / ন্ত / একবচন এবং বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—'যে সচরাচর তিঅস ভমন্তি'। তে এবং [-হোন্তি] শব্দ দুটিতে অবশ্য গৌরব বা সম্ভ্রমের কিছুই নেই, কেননা কর্তা এবং ক্রিয়া উভয়েই এখানে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করছে। কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে বস্তুতই গৌরবার্থের সূচনা হয়েছে :—

ক. নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।(১৭)

খ. ভণন্তি মহিন্তা (১৬),

গ. মহাসুহে বিলসন্তি শবরো, (৫০),

CENTRAL LIBRARY

ঘ. সরহ ভণন্তি (৩৯)

প্রত্যেকটিতেই কর্তা একবচন কিন্তু ক্রিয়া বহুবচন। এরূপ ব্যবহার নিঃসন্দেহেই সম্ভ্রমসূচক, কেননা বাহিল, দেবী, মহিন্তা, শবর ও সরহ প্রভৃতি সকলেই বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। এই একই / ন্ত / ওড়িয়ায় একবচন বহুবচন নির্বিশেষে সমস্ত প্রকার বর্তমান ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাংলায় / ন্ত / শুধুমাত্র বর্তমানে সীমাবদ্ধ থাকে নি, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেও সঞ্চারিত হয়েছে। তবে বাংলায় কেবল সম্মানিত কর্তার সহিত এরকম ব্যবহার সম্ভব, অসম্মানিত বা সাধারণ ব্যক্তির জন্য পৃথক রূপের ব্যবস্থা আছে। যেমন, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে [করিবেন-করেন, যাবেন-যান, যাবেন-যান] এবং অতীতে [করলেন-করিলেন, করতেন-করিতেন, করছিলেন-করিয়াছিলেন, গিয়াছিলেন-গেলেন] ইত্যাদি। সংস্কৃত কিংবা প্রাচীন বাংলার / ন্ত / আধুনিক বাংলায় শুধু / ন / হয়েছে, এই যা তফাত। আশ্চর্যের ব্যাপার যে আধুনিক অসমীয়াতে এরকম কোন সম্ভ্রমসূচক পদ ব্যবহার নেই, প্রথম পুরুষ একবচনের রূপটির দ্বারা সম্মানিত অসম্মানিত নির্বিশেষে সকলের কাজ চলে যায়।

বহুবচনাত্মক প্রত্যয়॥ প্রাচীনতর ভাষা হতে প্রাপ্ত এমন কয়েকটি বহুবচনাত্মক প্রত্যয় চর্যাপদে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে /-আ / এবং /-এ / এই দুটিই প্রধান। /-আ / বিশেষ্য ও সর্বনাম এবং /-এ / কেবলমাত্র সর্বনামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দৃষ্টান্ত :—

/-আ / : কদুচিনা (৫০), চকা (১৪), তিনা (৩৩) দুআ (১২), দোবাটা (১৫), পঞ্চজনা (৩৩), পাঞ্চজনা (১২), পোইআ (১৪), সঅলা (৩৬ ও ৪১)। এদের মধ্যে পোইআ 'পুত্রগণ' এবং দোবাটা 'দুইপথ' বাস্তবিকই খাঁটি বহুবচন। অন্যান্যরা তাদের প্রকৃতিতেই বহুবচন, বহুবচনের প্রত্যয় ছাড়াই তাদের বহুত্ব অবিকৃত থাকে। [চকা] এবং [থালবিঅলা] বস্তুতপক্ষে একবচন, কেননা ক্ষতিপূরণবাচক দীর্ঘতার স্থান পরিবর্তনের দ্বারাও অন্ত /-আ / ব্যাখ্যাত হতে পারে। সত্যিই যে অন্ত /-আ / এই দীর্ঘতার স্থান পরিবর্তন এবং তা বহুত্ববাচক প্রত্যয় নয় এ সম্পর্কে একটা মস্তবড় প্রমাণ এই যে সংখ্যাশব্দের সহযোগে বা জোড়ে ব্যবহৃত শব্দ প্রাচীন বাংলার বহুবচনাত্মক প্রত্যয় গ্রহণ করে না। অবশ্য এ নিয়মেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে ; চর্যাপদে দুবার ব্যবহৃত 'পাঞ্চজনা' শব্দের /-আ / বাহুত বহুবচনাত্মক বলেই মনে হয়।

কেবলমাত্র নিম্নলিখিত সর্বনামগুলিই /-এ / প্রত্যয়ে গঠিত : অম্হে (২২), আম্হে (১), তুম্হে (৫) তে (তিনবার ৭ এবং ২২), জে (৭, ১৫ এবং ২২) সে [<সেই] (১৫)।

এই /-এ / বস্তুত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ব্যবহৃত প্রত্যয় /-আস্ / এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই / আস্ / সবচেয়ে বহুল প্রচলিত বহুবচনাত্মক পুংলিঙ্গ বিভক্তি। নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহে ব্যবহৃত এইটিই একমাত্র বহুবচনাত্মক প্রাচীন বিভক্তির নিদর্শন। বাংলা [তোমরা সকলে এসো] এবং বাংলা ও ওড়িয়া [শুন সাধুজনে] ওড়িয়া [বলদ মানে], হিন্দী [লড়কে], হিন্দী-পাঞ্জাবী [পতে] 'ঠিকানাগুলি', [বেটে] ইত্যাদিতে যে /-এ / পাই তা বস্তুত এই প্রাচীন /-আস্ / ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩] চর্যাপদে ব্যবহৃত [তে] অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার্য। ব্যক্তিবাচক সর্বনামের প্রথম পুরুষ পুংলিঙ্গ বহুবচনের রূপ প্রাচীন ভাষায় [তে]। এই [তে] পুরাতন ভাষা থেকে নতুন করে সৃষ্ট অথবা সরাসরি প্রাচীন ভাষা থেকে গৃহীত তা জানা যাচ্ছে না। সরাসরি গৃহীত হবার

৩ Beams, John : *A Comparative Grammar of the Modern Indo-Aryan Languages* (London, 1872-79) Vol. II. P. 69

CENTRAL LIBRARY

অধিক সম্ভাবনা। বিম্‌স্ অবশ্য বলেন [তে] এসেছে ৬ষ্ঠী [তস্য-তাস-তাস্য] থেকে।[৪] চর্যাপদে [তাস্য-তাস]-এর ব্যবহার আছে। [সে] প্রকৃত প্রস্তাবে একবচন, প্রাচীন [সঃ] হতে জন্মলাভ করেছে। মাগধী প্রাকৃতে /-অস্ / >/-এ / হয়। [তে]-র সাদৃশ্যে [সে] চর্যাপদে বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। [জে] এসেছে [যম্] থেকে, ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণে কোন কোন প্রাকৃতে / য /> / জ / হয় / [সঃ] থেকে যেমন [সে] ঠিক তেমনিভাবেই [যঃ] থেকে [জে]। বহুবচন হিসাবে [জে] হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী ও বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলাতে [জে], লিখিতরূপে [যে], কেবল একবচনেই ব্যবহৃত হয়, এর বহুবচনের প্রচলিত রূপ [যারা]।

বহুবচনের স্থলে একবচনের ব্যবহার। চর্যাপদে বহুক্ষেত্রেই বহুবচনের স্থলে একবচনের ব্যবহার হয়েছে দেখা যায়। যেমন, আসাবহল পাত বাহা-র [আসা] (৪৫), কপাস্থ ফুটিলা-র [কপাস্থ] (৫০), খুর ন দীসই-র [খুর] (৬), পরম মোখ লবএ মুত্তিহার-র [মুত্তিহার] (১১), কুলে কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা-র [মূঢ়া] (১৫) এবং হনবিণু মাসেঁ ভুসুকু পঙ্খবন পইসহিনি-র [হণ] (২০)। স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে যে নির্দিষ্ট শব্দগুলির দ্বারা বহুবচনের অর্থই প্রকাশমান। 'খুর ন দীসই' ব্যাকরণের দিক দিয়ে যথার্থ, কেননা কর্তা ও ক্রিয়া উভয়েই একবচন। কিন্তু একটি ছুটন্ত হরিণের কেবল একটি খুরই দেখা যাচ্ছে না, অন্য তিনটি দেখা যাচ্ছে—এরূপ কল্পনা অবান্তর। হয় চারটি খুরই দেখা যাচ্ছে না, কেননা হরিণটি দ্রুতবেগে ছুটছে, নয়ত তার সবগুলি খুরই দেখা যাচ্ছে—এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক, [মূঢ়া] আপাতত বহুবচন বলে মনে হয়, কেননা এতে স্পষ্ট বহুবচনের প্রত্যয় /-আ / আছে, [হণ] অতীতকালের ক্রিয়াগত বিশেষণ, এজন্যে এর অর্থ বহুবচনে উদ্দিষ্ট হওয়াই সম্ভব। [আসা] একেবারেই একবচন, বহুত্ববাচক [বহল]-এর সহিত একত্রে উপবিষ্ট, এই কারণে এর বহুবচনের প্রয়োজনই নেই। [কপাস্থ] বহুবচন হতে পারে, কিন্তু শব্দটির আকৃতি দেখে মনে হয় ওটি একবচন।

আধুনিক বাংলাতে যেখানে বহুবচনের প্রয়োজন সেখানে দেখা যায় যে প্রায়ই একবচন ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাতে বেশ স্বচ্ছন্দে কাজও চলে যাচ্ছে। এর ফলে বহুবচনের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে এবং এজন্যে অনেকসময় বহুবচনের প্রয়োজনই হয় না। আধুনিক বাংলার এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই চর্যাপদের যুগ থেকে চলে আসছে। ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই একই নিয়ম বর্তমান, তবে তা বাংলার মত এই দুভাষায় এত কর্মক্ষম নয়।

যুগলশব্দ। চর্যাপদে বহু যুগল শব্দের ব্যবহার পাই। এই যুগলশব্দগুলি কেবল একবচনের রূপেই উপস্থিত, প্রত্যয় ইত্যাদি কোথাও নেই। কিন্তু এদের কোনক্রমেই একবচন বলা চলে না, কেননা এদের দ্বারা যে অর্থ সূচিত হয়েছে তা সর্বদাই বহুবচনের ইঙ্গিত দেয়। চর্যাপদে নিম্নলিখিত এই ৩৩টি দৃষ্টান্ত আছে : অজরামর (৩), অবনাগবণ (৫৬), অবণাগবণা (২১ ও ৪৬), অবণাগবণে (৭), আলিকালি (১১ ও ১৭), আলাজালা (৪০), খালবিখলা (৩২), গঙ্গাজউনা (১৪), চন্দসুজ্জ (১৪), চান্দসুজ (৪[১]), জামমরণ (২২ ও ৪৩), দমণচমণ (১), নরঅ নারী (৪[১]), পড়হমাদলা (১৯), পাপপুণ্য (১৬), বাওতুরও (৩৭), বামদাহিণ (৮, ১৫ ও ৩২), ভাবাভাব (৯, ৩০ ও ৪৩), রবিশশী (১১[১]), শবরাশবরি (৫০), সগুণশিআলী (৫০), সুখদুখেতেঁ (১), সুভাসুভ (৪৫), সোণরুআ (৪৫), স্বপরাপর (৩৪) এবং হরিহর (৪৭)।

তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। শব্দগুলি সমাসের প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং প্রকৃতপক্ষে তাই। বৈদিক এবং সংস্কৃতের মত প্রাচীন ভাষাতে প্রাকৃতিক জোড় বিশিষ্ট শব্দ সকল একত্রে বসত এবং দ্বিবচনের রূপ পরিগ্রহ করত। যেমন,

৪ ঐ P. ৬৭

CENTRAL LIBRARY

মাতাপিতরৌ, রামলক্ষ্মণৌ ইত্যাদি। খুব ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত অথবা হুবহু একই প্রকৃতি বিশিষ্ট শব্দ বা সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী শব্দও একই সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ধরণের যুগলশব্দ দ্বন্দ্ব সমাস নামে পরিচিত, প্রাচীন ভাষাতে সাধারণত দ্বিবচনে প্রকাশিত। অবশ্য কখনো কখনো বহুবচনের ব্যবহারও যথেষ্ট দেখা গেছে। যথা, মাতাপিতরা, দ্যাবঃ (ত্রিজগৎ—স্বর্গ, পৃথিবী ও বায়ু), উষাসা (উষা এবং রাত্রি) ইত্যাদি। দ্বিবচন প্রাচীন ভাষাতে অন্যান্য বচনের মত বহুল ব্যবহৃত নয়। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় দ্বিবচন বলতে গেলে একেবারেই লুপ্ত। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় এর কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না।[১] উদ্ধৃত সমাসগুলিতে বহুবচনেরও কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের বহুবচনত্ব তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এইভাবে গঠনরীতিতে একবচন কিন্তু অর্থে বহুবচন—এইরকমের ব্যবহার আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে যথেষ্টই আছে। এবং এই লক্ষণটি কোনক্রমেই শুধুমাত্র নামপদের মধ্যে আবদ্ধ নেই, অন্যান্য পদেও এর প্রয়োগ যথেষ্ট।

আধুনিক বাংলার নামপদের বহুত্ব কতকগুলি বহুত্ববাচক প্রত্যয়ের সাহায্যে জ্ঞাপিত হয়। এইগুলি হল : [গণ,-গুলা-গুলি-গুলো,-দিগের-দের, রা] ইত্যাদি। এরা সবই সংস্কৃত প্রাকৃত ও ফারসী প্রভৃতি ভাষার পুরাতন মালমশলা থেকে নতুন করে গঠিত প্রত্যয়। এরা সম্পূর্ণ রূপেই বাংলা প্রত্যয়, এদের ব্যবহার অন্য ভাষাতে নেই।[২] বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই সব প্রত্যয় চর্যাপদে আগাগোড়াই অনুপস্থিত।

১. কেবল জানাঙ্গাতে /-পন্/ পাই। প্রত্যয়টি বাংলার মত সংস্কৃত [বৃন্দ] থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকবে।

CENTRAL LIBRARY

বাংলা যৌগিক ক্রিয়া প্রসঙ্গে

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

ইংরাজীতে যা Compound Verb বাংলায় তার নাম যৌগিক ক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য Compound শব্দটির অনুবাদ 'যৌগিক'—যেমন Compound Sentence-এর বাংলা নাম 'যৌগিক বাক্য'। কিন্তু 'সমাস'—তার নাম যে ইংরাজীতে Compound। তাহলে Compound Verbকে 'সমাস ক্রিয়া' নাম দেওয়া চলে কি না দেখা যাক। যাকে আমরা 'সমাস' বলি, ইংরাজী ভাষাবিজ্ঞানে তার আসলে নাম হচ্ছে Nominal Compound—আর Compound Verbকে অনেক সময় বলা হয় Verb Compound। সেই অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়া কি হবে 'ক্রিয়া সমাস' আর প্রচলিত সমাসকে কি বলব 'নাম সমাস'?—সমাস সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে, দুই বা ততোধিক শব্দের পরস্পর আসত্তি বা নৈকট্য ও তাদের সংযোগের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা থাকা চাই। 'যৌগিক' শব্দটির ব্যবহারেও তো তাই থাকে;—দুই বা তার বেশী শব্দ জুড়ে একটি এককে (unit) পরিণতি ও তার ফলে দুই বা দুই-এর বেশী শব্দের নিজস্বতার কিছু বিসর্জন এবং কখনও কখনও কিছু অতিরিক্ততার সংযোজন। সংস্কৃত ছিল প্রায় পুরোপুরি সংশ্লেষাত্মক (Synthetic)। কাজেই বাংলায় সংস্কৃত সমাসের অনেক নিয়মের প্রয়োজন নেই। (/পাণি-পাদম্/সংস্কৃতে, বাংলায়/হাত-পা/-, সূর্যাচন্দ্রমসৌ/আর/চাঁদসূর্য্যি : অন্নিতপ্তম্/আর/আগুনে সেঁকা/ ইত্যাদি। সাপেক্ষ গমক সমাস সংস্কৃতেও কিছু আছে বটে, কিন্তু বাংলায় এর বহুল ব্যবহার।) মোট কথা বাংলা ব্যাকরণে সমাসের নাম যৌগিক পদ দেওয়া চলে। এদের মোট অর্থ অনুযায়ী যৌগিক পদ হবে বিশেষ্য জাতীয়, বিশেষণ জাতীয়, ক্রিয়া-বিশেষণ জাতীয় বা ক্রিয়া জাতীয়। Nominal Compound-এর যেমন শ্রেণীবিভাগ, সমস্ত যৌগিকপদ এবং যৌগিক ক্রিয়ারও তেমনই শ্রেণীবিভাগ করা চলে।

'সমাস' বা যৌগিক নামপদের সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়াপদের (Compound Verb) শ্রেণীসাদৃশ্য নির্ণয় করার আগে কয়েকটি আলোচনা দরকার। *Bulletin of the Calcutta Philological Society*-র আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-পূজাঞ্জলি সংখ্যায় 'বাংলা যৌগিক ক্রিয়াপদ যার একটি উপাদান 'যাওয়া সূচক ক্রিয়া'—তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। যৌগিক ক্রিয়াপদ সম্পর্কে আরও দু'একটি আলোচনা এখানে করা হচ্ছে।

২. *Origin and Development of Bengali Language*-এ (প্রসঙ্গ. 717) বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতে উপসর্গ-যোগে ধাত্বর্থ যে ভাবে বদলে যেত কালক্রমে সে রীতি বজায় থাকেনি। যৌগিক ক্রিয়াপদের দ্বারা এখন সেই কাজ চলছে। তা ছাড়া ভাব (Mood) এবং কালের (Tense) বৈচিত্র্য বোঝাতে তখন যে সব বিভিন্ন প্রত্যয় (Affix) প্রযুক্ত হত তাদের ব্যবহার চলে গিয়ে যৌগিক ক্রিয়াপদই এখন নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভাবকাল ও ধাত্বর্থের বৈচিত্র্য বোঝাতেই নয়, সংস্কৃতের আরও বহুরূপ বৈচিত্র্যবোধক প্রত্যয়ের স্থলে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের যৌগিক ক্রিয়াপদ। সংস্কৃতে ইচ্ছার্থ বোঝাতে সন্, অত্যাস্থার্থ ও পৌনঃপুনিকার্থ বোঝাতে যঙ্, প্রযোজকার্থে ণিচ্ এবং কর্মভাববাচ্যের বিশেষ প্রত্যয়যুক্ত ব্যবহার হয়—সে জায়গায় বাংলায় বিভিন্ন প্রকারের যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায় যেমন/আমি দেখতে চাই/জলে পুড়ে ছাই/নেচে নেচে আয়/মা ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছেন/ধরা পড়েছে/মারা গেছে প্রভৃতি।

CENTRAL LIBRARY

৩. সুনীতিবাবু তাঁর ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে যৌগিক ক্রিয়ার দুটি ভেদ দেখিয়েছেন—ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ যোগে এবং—ইয়া প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ যোগে এবং তাদের বিভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। ODBL (প্র.779)-এ প্রথমটিকে Nominals ও দ্বিতীয়টিকে Verbals এর অন্তর্গত বলেছেন। কিন্তু শেষেরটির মধ্যে আর এক প্রকার যৌগিক ক্রিয়াপদ উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, সে হল—ইলে যুক্ত ক্রিয়া পদের সঙ্গে হ-ধাতুর ব্যবহার; যেমন/দিলে হয়/, /গেলে হত/। (ঐ গ্রন্থে প্র.736এ তিনি/দিলে হয়/উদাহরণ দিয়ে একে alsolute clause তৈরী করার কথা বলেছেন)। সুনীতিবাবুর শ্রেণীবিভাগ রূপ ও অর্থ অনুযায়ী। ডঃ সুকুমার সেন (ভাষার ইতিবৃত্ত) রূপ অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়াপদের পাঁচটি বিভাগ করেছেন—(১) সমাপিকা ক্রিয়া+সমাপিকা ক্রিয়া (২) সমাপিকা+অসমাপিকা (৩) সমাপিকা+অসমাপিকা+সমাপিকা (৪) অসমাপিকা+সমাপিকা এবং (৫) নাম+সমাপিকা ক্রিয়া। সুনীতিবাবু উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে দেখিয়েছেন অনুমতি বা অনুমোদনবোধক (Permissive), সামর্থ্য বোধক (Acquisitive) শক্যতাবোধক (Potential) প্রভৃতি ভাব (Mood) ও প্রারম্ভিকতা (Inceptive), নিরন্তরতা (Continuation) পূর্ণতা (Completion), স্থায়িত্ব (Statical) ইত্যাদি কতকগুলি ক্রিয়াবস্থা (Aspect) বোঝাতে বাংলায় যৌগিক ক্রিয়াপদ কেমন ব্যবহার হয়। তার সঙ্গে আরও দুই একটি ভাব বা ক্রিয়াবস্থার নামকরা যেতে পারে। যেমন ইচ্ছার্থক ভাব (Optative mood) (/গেলে হয়/), সম্পন্নার্থ (Completive) (/করে ফেলেছি/), পরিণতার্থ (Resultative) ক্রিয়াবস্থা (/বেঁচে গেছি/) ইত্যাদি বোঝাতেও যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখানো চলে।

৪. কত রকমের যে সূক্ষ্ম অর্থভেদ জড়িত থাকে ঐ সব বিভিন্ন শ্রেণীর যৌগিক ক্রিয়াপদে তার বিশেষত্বগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় যদি কোন বিশেষ ধরণের যৌগিক ক্রিয়াপদের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। আমি গমনার্থক (Allative) শব্দযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদের আলোচনায় সেই চেষ্টা করেছি। যা ধাতু-আ-যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়ারূপে এসে নিরন্তরতা বোঝায়, শক্যতা বোঝায়-তার সঙ্গে দেখানো হয়েছে ভাববাচ্যও (কর্মবাচ্য নয়) যুক্ত রয়েছে। চল্ ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারেও ভাববাচ্য কর্মবাচ্য যোগ আসে। আবার কখনও আত্মনেপদ/পরস্মৈপদের মত বক্তার স্বার্থ বা স্বার্থাভাবও প্রকাশিত হয়। যেমন/দেখুক গে/কথায় বক্তার স্বার্থ নেই কিন্তু /দেখে যাক/ কথায় বক্তার স্বার্থ রয়েছে।

৫. যৌগিক ক্রিয়াপদের সঙ্গে ইডিয়ম একদিকে, অন্যদিকে অসংলগ্ন ক্রিয়াযোগের পার্থক্য বোঝা দরকার। /সে এলাহাবাদ হয়ে এসেছে/বা/আমি ওখানে একটু হয়ে আসছি/এগুলি অসংলগ্ন ক্রিয়া সংযোগের উদাহরণ। কিন্তু /কাজটা হয়ে এসেছে//আমরা ক্রমশ বুড়ো হয়ে আসছি/যৌগিক ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত। কিন্তু/এবার ও ছেলের হয়ে এসেছে/হল ইডিয়ম। অসংলগ্ন ক্রিয়াসংযোগে দুটি উপাদানের অর্থ আলাদা বজায় থাকে। যৌগিক ক্রিয়াপদে দুই-এর যৌগিক অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু ইডিয়মে হ-ধাতুর অর্থ একটু অসাধারণ হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়াপদে আস্-ধাতু সহায়ক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত—যা কার্য সম্পাদনের দিকে ক্রমগতিই সূচিত করে। এর সঙ্গে অবশ্য অন্য সূক্ষ্ম অর্থও যুক্ত থাকে। সহায়ক ক্রিয়ার রূপভেদ যে অর্থ সূচিত করে তাও অনেক সময়ে যৌগিক ক্রিয়াপদের অর্থে যুক্ত হয়। যেমন/দিয়ে আসছি/এর মধ্যে নিরন্তরতা অর্থ পাওয়া যায়/আসছি/শব্দের জন্য/আর/দিয়ে আসতাম/এর মধ্যে অভ্যাস অর্থ পাওয়া যায়/আসতাম/ক্রিয়াপদরূপের জন্য। যৌগিক ক্রিয়ার উপাদানগুলির বিশেষার্থ সংশ্লিষ্ট হবে—কিন্তু ইডিয়মের মত উপাদানগুলির নিজস্ব অর্থ বিশেষত্বলাভ করে না।

৬. যৌগিক ক্রিয়াপদের সংশ্লিষ্ট অর্থ উপাদানগুলির মধ্যে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা যায়। সহায়ক ক্রিয়া কর্—(বিশেষ্যের সঙ্গে), হ-(বিশেষণের সঙ্গে,-আ-যুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সঙ্গে ও -ইলে যুক্ত ক্রিয়াবাচক

CENTRAL LIBRARY

ক্রিয়াবিশেষণের সঙ্গে), ফেল্-, মার্-, দে-, নে-, বস্-, উঠ্, দাঁড়া-, যা-, আস্-, চল্, রাখ্, (-ইয়া যুক্ত অথবা -ইতে যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে) আর লাগ্-, পা-, পার্-, রহ্- (-ইতে যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে) সাধারণত বাংলায় দেখা যায়। -ইয়া যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে বস্-, ফেল্-, উঠ্-, পড়্- প্রভৃতি ক্রিয়ার ব্যবহারে অনেক সময় সহসা-অর্থ আসে কিন্তু 'ইয়া বস্'-এ অধিকন্তু কর্তার ফল সম্বন্ধে অনবধানতা বুঝিয়ে থাকে যেমন/বলে বস্‌ল/করে বস্‌ল/ইত্যাদি। -ইয়া-যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে দে- ও নে- সহায়ক ক্রিয়া দুইই কার্য সম্পাদন বুঝিয়ে থাকে কিন্তু প্রথমটির দ্বারা সেই সঙ্গে বক্তার স্বার্থ বোঝায় আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বক্তার নিঃস্পৃহতা বোঝায়। যেমন/করে দাও/ ও /করে নাও/প্রথমটির কার্যফল বক্তার দিকে, দ্বিতীয়টির কার্যফল ক্রিয়ার কর্তার দিকে প্রধাবিত। /বুঝিয়ে দেওয়া/আর/বুঝে নেওয়া/ঠিক, কিন্তু/বুঝে দেওয়া/ আর/বুঝিয়ে নেওয়া/বড় একটা হয় না।

৭. এইবার যৌগিক নামপদের (**Nominal Compound** বা সমাস) সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়াপদের শ্রেণীসারূপ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। উপাদানের প্রাধান্য ধরে সমাসের চারটি শ্রেণীভেদ করা হয়—(১) পূর্ব পদার্থ-প্রধান (২) উত্তর পদার্থ-প্রধান (৩) উভয় পদার্থ-প্রধান এবং (৪) অন্য পদার্থ-প্রধান। যৌগিক ক্রিয়াপদকে অনুরূপ শ্রেণীভেদ করতে গেলে—দুই-এর অধিক উপাদানের যৌগিক ক্রিয়াপদ কি ভাবে বিশ্লিষ্ট করতে হবে তা বোঝা দরকার। /নিয়ে আস্‌গে যা/ বা /করি গে যাই/ইত্যাদির মধ্যে সহায়ক ক্রিয়াগুলোকে সম্পর্কিত শব্দগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে ধরতে হবে অর্থাৎ/নিয়ে/একটা অংশ আর/আসগে যা/অন্য অংশ,/করি/একটা অংশ আর/গে যাই/অন্য অংশ। অনেক সময়ে ঐ সব সম্পর্কিত শব্দগুলির বিশেষার্থ খুবই অল্প থাকে। সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়াপদই পূর্বে বসে, কিন্তু/দেখি গে/ কর সে/ইত্যাদি প্রয়োগে এর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও আছে। এই উদাহরণ গুলি যেমন 'পূর্ব পদার্থ-প্রধান', তেমনই নাম ধাতুগুলি, যেমন /মন দেওয়া/ মনে করা প্রভৃতি, /করা হল/দেখা যাক/প্রভৃতি কর্মভাববাচ্যের যৌগিক ক্রিয়াপদ, /খেয়ে দেখ/করতে লাগল/করে ফেলি বসতে দিলুম/ঘুমোতে রইল/ ইত্যাদি পরীক্ষার্থক, প্রারম্ভার্থক, সমাপনার্থক, অনুমোদনার্থক, চলমানার্থক প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে পূর্বপদেরই অধিকতর প্রাধান্য। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যৌগিক ক্রিয়াপদে উত্তর পদার্থের প্রাধান্য ধরা যায়—যেমন ইচ্ছার্থক/গেলে হয়/, ক্রমগত্যর্থক /ভোর হয়ে এল/, উদ্যতার্থক /দিতে আসছিলাম/, অভ্যাসার্থক/জেগে থাকত/ইত্যাদির মধ্যে। সাধারণত সমরূপ উপাদানগুলির যৌগিক ক্রিয়াপদকেই 'উভয় পদার্থপ্রধান' বলা যায় যার দুটির অর্থই সমান প্রধান তবে তাদের যৌগিক অর্থটি ধর্তব্য। যেমন/খাবি দাবি/দেখব শুনব/জলে পুড়ে পুড়ে ছাই/ আসে যায়/। কয়েকটি যৌগিক ক্রিয়াপদ 'অন্য পদার্থপ্রধান', যেমন /দেখতে শুনতে ভালো/এতে আমার কিছু আসে যায় না/প্রভৃতি। 'যৌগিক ক্রিয়া'র অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট রূপ যৌগিক কালে'র ক্রিয়াপদকেও নিত্যসমাসের সঙ্গে তুলনা করা চলে—যার উপাদান বিশ্লেষণ করা চলে না অথবা অন্য শব্দ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়।

CENTRAL LIBRARY

কামরূপী উপভাষা : ধ্বনি ও রূপ-বিচার

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের উপভাষাকে বলা হয় কামরূপী উপভাষা। বাংলাদেশের উত্তর-উত্তরপূর্বাঞ্চলে রংপুর দিনাজপুর কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলায় এই উপভাষা প্রচলিত। 'কামরূপী' এই সাধারণীকৃত নামকরণের আড়ালে এই অঞ্চলের ভাষা-গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ এই অঞ্চলের ভাষা-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যেমন বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী আছে তেমনি পার্বত্য সীমান্ত জুড়ে ভোটবর্মী ভাষা-সম্প্রদায়ও আছে। অনেকেই দুটি ভাষা ব্যবহার করে, ফলে এই অঞ্চলের বাংলা উপভাষায় প্রতিবেশী ভোটবর্মী ভাষার নানা প্রভাব পড়েছে। তথাপি উত্তরবঙ্গের মুখের ভাষাকে 'কামরূপী উপভাষা' নামে অভিহিত করলে আলোচনার সুবিধা হয়।

কামরূপী উপভাষায় ধ্বনি ও রূপ-বিচার নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। রাঢ়ী বরেন্দ্রী বঙ্গালী উপভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক বিচার করলে এর প্রাচীনতর লক্ষণ স্পষ্ট হয়। যেমন, অপিনিহিতি বঙ্গালীর এক সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য কিন্তু কামরূপী উপভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ, সেই স্থানে শব্দের অপিনিহিত রূপের অব্যবহিত প্রাচীনতর রূপটিই ব্যবহৃত। উদাহরণ—আইজ (বঙ্গালী), আজি (কামরূপী) কইর‍্যা (বঙ্গালী), করিয়া (কামরূপী)।

কামরূপী উপভাষার আলোচনা একটি কারণে বিশেষ প্রয়োজন। পুরনো বাংলাভাষার অনেক লক্ষণ কামরূপীতে টিকে আছে। যেমন, আদি-মধ্য বাংলাভাষায় আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ায় আদ্য অ > আ (অসুখ > আসুখ, অনল > আনল : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। কামরূপী ভাষাতেও তা ঘটে, আদ্য অ > (প্রায়শঃ) আ (অবস্থা > আবস্থা, অতি > আতি, কথা > কাথা, হতে > হাতে)।

ভাষা ভেঙে উপভাষার সৃষ্টি, আবার উপভাষা ভেঙেও নতুন উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, 'একদা উত্তর-পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা হইতে কামরূপীয় উপভাষার সৃষ্টি এবং তাহার অসমীয়া ভাষায় উন্নয়ন হইয়াছে।'[১]

কামরূপী উপভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত রক্ষণশীলতা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। এই রক্ষণশীলতার সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে এই অঞ্চল মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব বা সুলতান হুসেন শাহের প্রভাবকে অস্বীকার করেছে। গৌড়ের সুলতানী শাসন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাইরে কামতা বা কোচবিহার-রাজা নরনারায়ণের (১৫৫৫-৮৭) ছত্রছায়ায় এখানে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনধারা প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যবঙ্গ নিম্নবঙ্গ যেসব অনুকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রগতির পথে এগিয়েছে উত্তরবঙ্গের ভাগ্যে তা জোটে নি বলেই অনেক ব্যাপারের মতোই ভাষার ব্যাপারেও এ অঞ্চলে মধ্যযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।[২]

একথা অবশ্যস্বীকার্য, কামরূপী উপভাষা আখ্যা দিয়েই কোচবিহার রংপুর জলপাইগুড়ি দিনাজপুর জেলার

১. ভারতকোষ ১ম খণ্ড, পৃ ৬৪

২. দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের দুটি প্রবন্ধ : 'প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা, (সাহিত্যবাতায়ন, ১৯৭০); 'কামরূপী উপভাষা, বাংলা বঙ্গভাষা' (সাহিত্যসন্ধান, ১৯৭১)

CENTRAL LIBRARY

আদি অধিবাসীদের ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা যায় না। আর্যভাষার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের আকর্ষণে এই অঞ্চলের মানুষ আর্যভাষাকে স্বীকার করলেও তাদের উচ্চারণভঙ্গির আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি ভাবপ্রকাশের অব্যর্থ উপকরণ হিসাবে পুরনো ভাষাগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারের একটি অংশ, পদপ্রয়োগের সিদ্ধরীতি—এগুলি একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি। অস্ট্রিকপ্রভাবিত ভোটচীন উপাদান কামরূপী উপভাষায় এখনো আছে এবং সে সূত্রেই তা বাংলাভাষার সম্পদ। বিভিন্ন বৃত্তিধারী অনুন্নত শ্রেণীর কর্মজীবীদের ভাষায়, গ্রাম ও নদীর নামে, গ্রাম্য নারীর ভাষায় এই আর্যেতর উপাদান প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। বস্তুতঃ এই উপভাষা একদিকে আধুনিক বাংলাভাষাকে, অপরদিকে প্রাচীন ভোটচীন ভাষাগোষ্ঠীকে ধরে রেখেছে।

এইসব কথা মনে রেখেই কামরূপী উপভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

ধ্বনিবিচার

ক। প্রাচীন ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ (Retention of old phonetic peculiarities)

রাত্রি > রাতি > রাইত্ (বঙ্গালী) > আতি (কামরূপী)

অদ্য > আজি > আইজ্ (বঙ্গালী) > আজি (কামরূপী) (তুঃ চর্যাপদ—আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি)

রাখিয়া > রাইখ্যা (বঙ্গালী) > আখিয়া, আখি (কামরূপী)

জালুয়া > জাউল্যা (বঙ্গালী) > জালুয়া (কামরূপী)

খ। আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত ও প্রায়শঃ আদ্য স্বরবর্ণের দীর্ঘত্ব (Stress accent on the first syllable following occasional lengthening of the initial vowel)

আদ্য অ > অ

অসুখ > আসুখ, অনল > আনল (তুঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), কথা > কাথা, গলা > গালা, ঘড়া > ঘারা।

বিপরীত দিকে, আদি দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বত্ব (Shortening of the initial vowel)

মাসি > মোসি (হিন্দী মৌসী) পাখি > পোখি, গাছ > গছ (তুঃ প্রাচীন বাংলা—নালিচা গচ্ছ, মোইলি মচ্ছ)

গ। তালব্যধ্বনির উষ্মীভবন (palatal sound becomes dental affricated) চ, ছ, জ > ৎস, স, জ

ঘ। আদি র-ধ্বনির বর্জন ও স্বরবর্ণের সংরক্ষণ (Initial 'r' sound is dropped but the vowel is retained)

রাজা > আজা, রাতি > আতি

কিন্তু শব্দ মধ্যস্থ র-ধ্বনির সংরক্ষণ ('r'sound is retained when it is placed within a word)

তাম্‌রা (= তোমরা), ইম্‌রাক্ (একে, ইহাকে)

ঙ। ল>ন লাঙ্গল, লাঙল>নাঙল। লাল>নাল, লাউ>নাউ

এবং ইহার বিপরীত বিষমীভবন জননী>জলনী, স্নান>সিনান>সিলান

চ। আদ্য ব্যঞ্জনে প্রায়শঃ মহাপ্রাণতা (Occasional aspiration of initial consonent) বেশ>ভেশ, জন>ঝন, বাসা>ভাসা

ছ। ধ্বনির বিস্ফারণ (Expansion) গান >গাহান, তোর>তোহর

জ। স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis) লক্ষ্মী>নখমি, গ্রাম>গারাম, গেরাম বৃষ্টি>বিরিষ্টি

CENTRAL LIBRARY

ঙ। আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত হেতু পদমধ্যস্থ ধ্বনির বিবিধ পরিবর্তন : পরবর্তী ঘোষবৎ ধ্বনির অঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তর (Voiced > Voiceless), জীব > জিপ, ভোগ > ভোক

চ। মধ্যস্বরধ্বনি লোপ, ফলে দ্বিমাত্রিকতা (Syncope and consequent bimorism)
কোটকা > কোট্‌কা (কৃপণ), অগ্রহায়ণ > অগনা (অগ্রহায়ণ মাসে যার জন্ম), মানুষ > মান্‌ষি

ট। ই-বা-উ-পরবর্তী অন্ত্য আ-ধ্বনি > অ্যা (final ā preceded by i or u becomes ae) প্রতিমা > প্রতিম্যা, পতিম্যা, উমা > উম্যা

ঠ। শ, ষ, স > শ (Retention of only ʃ sound)

ড। ড়, ঢ় > র (ṛ, ṛd > r) বড় > বর, শাড়ি > শারি, আষাঢ় > আশার (আশারু = যার, জন্ম আষাঢ় মাসে)

রূপবিচার

কামরূপী উপভাষার রূপ বিচার করতে গিয়েও এর রক্ষণশীল চরিত্রের কথা মনে রাখতে হয়। নানা কারণে এই উপভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় নি, যেমন হয়েছে রাঢ়ী উপভাষার। বাংলাভাষার মধ্যস্তরের নিদর্শন এখানেও পাওয়া যায়।

ক। বিশেষ্য : শব্দরূপ (Nominal Declension)

কর্তা (১মা)—শূন্য বিভক্তি

কর্ম, সম্প্রদান (২য়া, ৪র্থী)—ক্ (তোর বাপক্ ডাকায় = তোর বাপকে ডাকে ;
রামক্ কাপোরখান দিছে = রামকে কাপড়খানা দিয়েছে)

করণ (৩য়া) – শূন্য বিভক্তি (ঘর্ দিয়া)
কখনো ত (হাতত্ = হাত দিয়ে)
অনুসর্গ : দিয়া
(যেমন, মোক্ ভুলালু কপার থাক দিয়া =
আমাকে কপার থাড়ু দিয়ে ভুলালি)

অপাদান (৫মী) থাকি (ঘর থাকি)

সম্বন্ধ (৬ষ্ঠী)—র্ (ঘরর্, গছর্)

অধিকরণ (৭মী)—ৎ (মাও জলৎ যায় = মা জলকে যায়)

ঘর্ ও গছ শব্দের রূপ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	ঘর	ঘরগুলা	১মা	গছ	গছগুলা
২য়া	ঘরক্	ঘরগুলো	২য়া	গছক্	গছগুলাক্
৩য়া	ঘর দিয়া	ঘরগুলা দিয়া	৩য়া	গছ দিয়া	গছগুলা দিয়া
৪র্থী	ঘরক্	ঘরগুলাক্	৪র্থী	গছক	গছগুলাক্
৫মী	ঘর থাকি	ঘরগুলা থাকি	৫মী	গছ থাকি	গছগুলা থাকি
৬ষ্ঠী	ঘরর্	ঘরগুলার্	৬ষ্ঠী	গছর	গছগুলার
৭মী	ঘরৎ	ঘরগুলাৎ	৭মী	গছৎ	গছগুলাৎ

CENTRAL LIBRARY

আদর্শ চল্‌তি বাংলায় আমরা স্বরলোপে সিদ্ধ। রামঃ রামো কিছু বলি না। লিখি রাম, বলি রাম্‌। উত্তরবঙ্গে স্বরলোপ আরও বেশি হয়। 'গাছ' শব্দের আ-কার পূর্বেই লুপ্ত। তার সঙ্গে বিভক্তি চিহ্ন 'কে' 'তে' 'এর' স্বরলোপ ঘটেছে। কাজেই 'গাছের' বদলে পাই 'গছর্‌'।

ঘর্‌ শব্দের ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির রূপটি প্রণিধানযোগ্য।

কার্য্য, কারইঅ>কাইর>কের, কর, কার

ঘর>এর, অর।

হস্ত+অন্ত>হথ-অন্ত>হাথত।

গৃহ+অন্ত>ঘর+অন্ত>ঘরত>ঘরৎ, ঘর'ৎ।

অন্তধি ঃ ঘরতাহি>ঘরতে

গৃহধি ঃ ঘরহি>ঘরে+অন্ত+হি>ঘরেতে।

খ ঃ সর্বনাম : শব্দরূপ (Pronominal Declension)

উত্তরবঙ্গে তদ্‌ শব্দ পাই না। অথচ 'তাম্‌রা' তাহারা অর্থে আছে। 'শেলা' (that time) শব্দে 'সে' পাচ্ছি, কিন্তু 'সে' পাচ্ছি না সর্বনামে। উত্তম পুরুষ 'মুই', মধ্যম পুরুষ 'তুই', প্রথম পুরুষ 'ইঁয়া' (this person) ও 'উঁয়া' (that person)। এই চার সর্বনামের শব্দরূপ এই রকম :

মুই (First Person)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	মুই	আম্‌রা
২য়া	মোক্‌	আমাক্‌গুলাক্‌
৩য়া	মোক্‌ দিয়া	আমাক্‌গুলাক্‌ দিয়া
৪র্থী	মোক্‌	আমাক্‌গুলাক্‌
৫মী	মোর্‌ থাকি	আমার্‌গুলাক্‌ থাকি
৬ষ্ঠী	মোর্‌	আমার্‌গুলার্‌
৭মী	মোতে, মোর্‌টে	আমার্‌গুলার্‌টে

তুই (Second Person)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	তুই	তোম্‌রা
২য়া	তোক্‌, তোমাক্‌	তোমার্‌গুলাক্‌
৩য়া	তোক্‌ দিয়া, তোমাক্‌ দিয়া	তোমাক্‌গুলাক্‌
৪র্থী	তোক্‌, তোমাক্‌	তোমার্‌গুলাক্‌
৫মী	তোর্‌ থাকি, তোমার থাকি	তোমার্‌গুলাক্‌ থাকি
৬ষ্ঠী	তোর্‌, তোমার্‌	তোমার্‌গুলার্‌
৭মী	তোৎ, তোমাৎ, তোর্‌টে	তোমার্‌গুলাৎ, তোমার্‌গুলার্‌টে

CENTRAL LIBRARY

ইয়া (This Person, Third Person)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	ইয়ায়	ইম্‌রা
২য়া	ইয়াক্	ইমাক্‌গুলাক
৩য়া	ইয়াক্ দিয়া	ইমাক্‌গুলাক্ দিয়া
৪র্থী	ইয়াক্	ইমাক্‌গুলাক
৫মী	ইয়ার থাকি	ইমাক্‌গুলাক্ থাকি
৬ষ্ঠী	ইয়ার	ইমারগুলার্
৭মী	ইয়াৎ, ইয়ারটে	ইমারগুলারটে

উয়া (That Person, Third Person)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	উয়ায়	উমরায়
২য়া	উয়াক্	উমাকগুলাক্
৩য়া	উয়ার দিয়া	উমাকগুলাক্ দিয়া
৪র্থী	উয়াক্	উমাক্‌গুলাক
৫মী	উয়ার থাকি	উমাক্‌গুলালাক্ থাকি
ষষ্ঠী	উয়ার	উমারগুলার্
৭মী	উয়াৎ, উলারটে	উমারগুলার্‌টে

'সব' শব্দের ব্যবহার পাই নি। all অর্থে—সগ্‌গল, সগায়<সকল শব্দ আছে। বঙ্গালী উপভাষায় (দক্ষিণ-বঙ্গে) সগ্‌গল>হগ্‌গল, হগল। 'সবাই' কামরূপী উপভাষায় 'সগায়', 'করিতেছি' হয়ে যায় 'করিবছি'।

কামরূপী উপভাষায় তথা উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষায় 'আপনি' শব্দ নাই। 'আপনি' অর্থে সবসময় বহুবচনান্ত (গৌরবে) 'তুমি' ব্যবহৃত হয়। যেমন, আপনি যাবেন ? = তোম্‌রা যাইবেন ? ; আপনাদের বাড়িতে যাব = তোমার্‌গুলার্ বাড়িৎ যাইম্।

'ইহা' শব্দ নাই। অপ্রাণীবাচক 'ইহা' 'উহা' বোঝাতে সানুনাসিক 'ইয়া' 'উয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাও প্রথমা বিভক্তিতে হয় না। বোধ হয় কর্তা সে অপ্রাণীবাচক থাকে না। আদর্শ বাংলায় বলি 'ইহা হইবে'। উত্তরবঙ্গে 'ইয়ায় হইবে' পাই না। বলতে হলে 'ইয়ায় হইবে' বলতে হবে। Yonder persons অর্থে আদর্শ বাংলায় 'তাঁহারা' আছে, কামরূপী উপভাষায় 'তাম্‌রা' আছে। আদর্শ বাংলায় আছে 'ইনি' 'উনি', তা উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষায় অনুপস্থিত। Who অর্থে 'কায়' আছে কিন্তু তার বহুবচন ও বিভক্তি ভেদ পাই না, অন্ততঃ শুনি নাই। 'কোন্' শব্দ যোগে who অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, কোন্ মানষিক্, কোন্ মান্‌ষিগুলাক্।

গ। অব্যয় ক্রিয়াবিশেষণ

কামরূপী উপভাষায় অব্যয় ক্রিয়াবিশেষণ আদর্শ বাংলা কথ্যভাষার থেকে স্বতন্ত্র। উত্তরবঙ্গের জনজীবনে অনুকার অব্যয়ের ব্যবহার অবিরল। now = এলা, then = সেলা, here = এইটে, এটে, there = সেইটে, সেটে,

CENTRAL LIBRARY

where = কোটে, why = কেনে, if = যেহু। এলা, সেলা, কেনে-র প্রথম এ-কার উচ্চারণে হয়ে যায় অ্যা। অনুকার অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগের দুয়েকটি নিদর্শন : চিড়িৎ করি, থালুথালু করি, শিঙরি (standing on toes)।

ঘ। নেতিবাচক শব্দ

কামরূপী উপভাষায় 'না'-এর ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য আছে। 'না' সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের আগে আসে। না জাও, না করিও, না লেখিম্। Emphasis বোঝাতে হয়ে যায় 'নাই'। যথা, না দেখ, নাই দেখ, দেখে নাই। 'না কদাচিৎ কর্মবাচক বিশেষ্যে যুক্ত হয়।

যেই 'না-বাড়ি যাবার কচুং সেই-না বাড়ি গেলু-রে। (The house where I asked you not to go you went to that very house).

আরও লক্ষণীয়, 'না-বাড়ি'তে 'না' negative particle। 'সেই-না'তে 'মাত্র' অর্থে ব্যবহৃত। 'না'-এর এই প্রয়োগ আরও আছে, যেমন—এক-না = only one, তুই-না কলু = It was you who said ; উম্‌রা-না কইলেক = ওরাই-না বলল।

বাংলায় 'না'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

না>না, negative : তুমি যাবে না।

নাম>না, অবধারণে, indeed : তুমি না যাবে ?

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোণ জণা

(কো নাম বংশীং বাদয়তে • বড়ায়িকে, সো নাম কঃ পুত্রঃ জনঃ)

ঙ। অসমাপিকা ক্রিয়া

কামরূপী উপভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার বিশিষ্টরূপে 'য়' যোগ হয় না। যেমন, করি (করিয়া), যাই (যাইয়া), পাই (পাইয়া), দেখি (দেখিয়া), দেখেয়া (দেখাইয়া), শুনি (শুনিয়া)।

বিশিষ্ট প্রয়োগ—

ইম্‌রা আসিল্ কালে (এরা এলে), আশ্ দেখিব্ (রাস দেখতে), কাপি মাথাত দিয়া (কাপি মাথায় দিয়ে)।

কামরূপী উপভাষার অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের প্রাচীন নিদর্শন : গলে বুরি মারী লাগে (জলে ডুবে মরা লাগে)।

চ। বিশিষ্টার্থক ধাতু

ধাতুর মধ্যে বিশিষ্টার্থক ধাতু হিসাবে উত্তরবঙ্গের মুখের ভাষায় 'খা' (খোয়া<খাওয়া) ধাতুর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সংস্কৃত 'কৃ' ধাতুর মতোই এর ব্যবহার প্রায় সর্বাত্মক, বিশেষ্য কিংবা Verbal Nounএর সহযোগে এই ধাতুটি বিভিন্ন অর্থবোধক ক্রিয়ামূল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আগ খোয়া = রাগ করা, হতাশ বা আটাশ খোয়া = সন্ত্রস্ত হওয়া, ঠ্যালা খোয়া = শাস্তি পাওয়া, যাওয়া খোয়া = যেতে বাধ্য হওয়া (যোর্ জাওয়া যায়), মনত্ খোয়া = মনে লাগা, কইন্যা বেচি খোয়া = মেয়ের বিয়ে দেওয়া।

ছ। বিশেষণ

প্রাচীন বাংলার মতো -ইল,-ইব প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ কামরূপী উপভাষার বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখিলা মান্‌ষি = দেখা মানুষ, আসিবা দিন = আগামী দিন, দেখিলাম বান্দি = দেখা বা জানাশোনা ঘরের মেয়ে, বাঁদী, আগদেখিলার গীত্‌তানি = অপরিচিত ঘরের মেয়ে, তিন দিনিয়া বাসিয়া ভোগা (ভাত রাঁধার পাত্র)।

CENTRAL LIBRARY

জ। লিঙ্গ

প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করে নি বলে কামরূপী উপভাষায় লিঙ্গরূপের সম্পূর্ণতা সাধিত হয় নি। কিছু নিদর্শন—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপা	মাও	ঠাকুরবাবা (পিতামহ)	ঠাকুরমা (পিতামহী)
দাদা	দিদি	জেঠ পোইত (বড় নন্দাই)	নোনদী (বড় ননদ)
সোহুর (শ্বশুর)	সাহুরী (শাশুড়ী)	শাল পোইত (ছোট নন্দাই)	—
আজু (মাতামহ)	আবো (মাতামহী)	চুয়ারী ঠাকুর (পুরুষ অপদেবতা)	প্যাত্তানী (স্ত্রী অপদেবতা)

ঝ। ধাতুরূপ (Conjugation)

কামরূপী উপভাষার ধাতুরূপ দেখাবার জন্য একটি নিদর্শন— কর্ ধাতু— গ্রহণ করছি। মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো অবস্থাতেই 'ক'-র উচ্চারণ 'কো' হয় না।

নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)

এক। বর্তমানকাল

	নিত্যবর্তমান Present Indefinite		ঘটমান বর্তমান Present Continuous	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	করঙ্	করোঁ	করিধর্ক্	করিধচ্চি
মধ্যম পুরুষ	করিস্	করেন্	করিধচ্চিস্	করিধচ্চেন্
প্রথম পুরুষ	করে	করে	করিধচ্চে	করিধচ্চে

পুরাঘটিত বর্তমান Present Perfect

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	করচুঁ	করচি
মধ্যম পুরুষ	করলু	করলেন্
প্রথম পুরুষ	করিলে, করিলেক্	করিল

দুই। অতীতকাল

	নিত্য অতীত Past Indefinite		ঘটমান অতীত Past Continuous	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	করিচুঁ, করিলু	করিচি	করিধচ্চিহুঙ্	করিধচ্চিলাম্
মধ্যম পুরুষ	করচিস্	করচেন্	করিধচ্চিলু	করিধচ্চিলেন্
প্রথম পুরুষ	করচে	করচে	করিধচ্চিল	করিধচ্চিল

তিন। ভবিষ্যৎকাল

CENTRAL LIBRARY

	নিত্য ভবিষ্যৎ Future Indefinite		ঘটমান ভবিষ্যৎ Future Continuous	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	করিম	করম্	করিথাকিম্	করিথাক্‌মো
মধ্যম পুরুষ	করবু	করবেন	করিথাক্‌বু	করিথাক্‌বেন্
প্রথম পুরুষ	করবে, করবেক্	করবে	করিথাকবে	করিথাক্‌বে

দ্রষ্টব্য : ঘটমানকাল বোঝাতে আদর্শ বাংলায় করিতেছি, কামরূপী উপভাষায় করিথাকি, নেপালী ভাষায় গরদইছি।

অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)

একবচনে তুই কর্ / করেক্, বহুবচনে তোম্‌রা কর্ / করেন্।

কামরূপী উপভাষায় অনুজ্ঞাভাবে রাজদরবারের ভাষার বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ আছে। যেমন, মহারাজা, এটে বইসা যাউক = Maharaja, may you please sit here। বাবা রাজা, এটে দিয়া যাওয়া যাউক = Prince, please go by this way.

সম্ভাবনাসূচক ভাব (Subjunctive Mood)

এই ভাবের ব্যবহার বোধ হয় চিন্তার জটিলতার উপর নির্ভর করে। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে যেদু (if) প্রভৃতি অব্যয় ও নির্দেশক ভাবের ভবিষ্যৎকাল (indicative future tense) ব্যবহার করে কাজ সারা হয়। যথা : যেদু বৃষ্টি আইসে খেলা হইবে না।

অন্তরকম বাখিদিও আছে। ইয়ার গেইলে কালে উয়ার গান ধরি দিলেক—When this (person) went there that (person) started singing। এক্ না কাথা কন্ বেলা কাপি উঠিল সিপাই সেলা = No sooner I uttered a word the policeman jumped up লাগি দিলেক জোতার ধুরধুরি = started beating up with the shoes কি করিনু জান হারানু করিয়া চোরি = what have I done ! I have lost my life by stealing.

উপসংহারে কামরূপী উপভাষার ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি গ্রাম্য ছড়া উদ্ধার করি।

মাও যশোদা জলং যায় । গোপাল যায় সাথে ॥
আমার সাথে না যান্ বাবা । হাঁউ আছে পথে ॥
সগ্‌গোল জীউ সিজানু মুই । হাঁউ সিজ্যাইল্ কে ॥
তোর সাথে যাঁও মা মুই । হাঁউ দেখেয়া দে ॥

মাও (mother), জলং (to the river for water ; বাংলায় জল্‌কে), গোপাল (Lord Krisna) না যান্ (does not go), হাঁউ (nameless fear), সগ্‌গোল (all), জীউ (beings), সিজানু (I created), সিজ্যাইল্ কে (who created), দেখেয়া দে (show)।

কামরূপী বা উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী বা পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের উপভাষার ধ্বনিগত সাদৃশ্য কিছু কিছু আছে। কামরূপী উপভাষার রক্ষণশীলতা সবচেয়ে বেশি। আদি মধ্যবাংলা ভাষার ধ্বনিগত রূপগত বৈশিষ্ট্য অনেকটাই কামরূপী উপভাষায় বজায় আছে। আর্যেতর উপাদানে সমৃদ্ধ এই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিচার গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

CENTRAL LIBRARY

কাব্যিক ভাষার সমস্যা

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

কাব্যিক ভাষা বলতে বোঝাতে চাইছি কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা বা কবিতার ভাষা। একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতার ভাষায় কাব্যপ্রসাদ থাকতে পারে, কিংবা কোন অধ্যাপকের ক্লাস-লেকচার কাব্যগুণান্বিত হতে পারে, অথবা কোন লেখকের গদ্যের ভাষাও কাব্যগুণান্বিত হতে বাধা নেই, চাই কি আবেগঘন মুহূর্তে কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কাব্যসম্মত ভাষায় অনুরাগ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এই ধরণের কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ কোন ভাষাই আমার আলোচ্য বিষয় নয়; কাব্যরসঘন হলেও এ ভাষাকে কাব্যিক ভাষা বলছি না। বিশেষভাবে যে ভাষা কবিতায় ব্যবহৃত বা কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাঁদের কাব্যে আমি সেই কাব্যিক ভাষার কথাই বলতে চাইছি।

এবং এই কাব্যিক ভাষার দিকে তাকালে স্বভাবতই মনে পড়ে—যে কোন কাব্যিক ভাষা সমস্যাপূর্ণ এবং প্রায় সর্বস্তরের কবিকেই এই ভাষাগত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শেলী বলছিলেন, কবিরা ঠিকমতো তাঁদের অনুভূতিকে রূপ দিতে পারেন না, অনুভূত ভাবই যখন তাঁরা রূপায়িত করতে চান কবিতায়, তখন দেখা যায় মূলে যে ভাবটি বা অনুভূতি তাঁদের মনে জেগেছিল, তার অতি অল্প অংশ মাত্র ব্যক্ত করতে পেরেছেন। শেলীর এই মন্তব্যের সঙ্গে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলি—কবিরা শুধু তাঁদের হৃদয়ভাবের যথাযথ রূপে প্রকাশ করতে অক্ষম নন, সেই অনেকটা-হারিয়ে যাওয়া ভাবটিকে রূপায়িত করতে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় আর একটি সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়, তাহচ্ছে: তাঁদেরকে ভাবতে হয়—কেমন ক'রে বলবেন বা কোন্ ভাষায় তা' প্রকাশ করবেন। প্রায় সব কবিকেই ভাবতে হয়—যে কথাটি বলতে চাইছি, তা' ঠিক মতো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। অথবা যা বলতে চেয়েছিলাম, তা নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা গেল না। বলা বাহুল্য, প্রকাশগত এই অক্ষমতা ভাষা বা শব্দ নিয়ে কেননা ভাষা বা শব্দই কবির ভাবপ্রকাশের মূল বাহন। বস্তুত, কাব্যিক ভাষার এই সমস্যায় সব কবিকেই পড়তে হয়। ফলে, উপযুক্ত ভাষার অভাবে অধিকাংশ কাব্যই হয় কৃত্রিম, নয়তো অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, শিল্পের বিচারে।

কাব্যিক ভাষার এই সমস্যা অবশ্য দু'রকম। এক, কবির দিক থেকে, দুই পাঠকের তরফ থেকে। কবির দিক থেকে সমস্যাটি হল, কবিরা অনেক সময় তাঁদের ভাবের উপযোগী উপযুক্ত ভাষা বা শব্দ খুঁজে পান না। ফলে, কোথাও কৃত্রিমতা, কোথাও অস্পষ্টতা, কোথাও বা দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। আর পাঠকের পক্ষ থেকে সমস্যা হল—কাব্যিক ভাষার যথাযথ অনুধাবন না করার ফলে তাঁরা কবি-উদ্দিষ্ট ভাষা বা শব্দের এমন এক অর্থ করেন, যা' হয়ত কবির অভিষ্ট নয়। এই দ্বিতীয় সমস্যাটি I. A. Richardsএর ভাষায় Vehicle ও Tenorএর সমস্যা। বলাবাহুল্য, কবি ও পাঠকের সমস্যা পৃথক হলেও এর মূল উৎস একই অর্থাৎ কাব্যিক ভাষা। কাব্য যেহেতু মূলত বাক্-শিল্প, সেইজন্যই কাব্যের ক্ষেত্রে বাক্ বা ভাষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। বস্তুত, শিল্প হিসেবে কাব্যিক ভাষার এই দুটি মৌল সমস্যা কাব্যকে পরিপূর্ণতা দেবার পথে প্রধান অন্তরায়। আবার, কাব্যের ভাষার উপাদান যেহেতু শব্দ, মালার্মের মন্তব্য স্মরণীয়, সেইজন্যই কাব্যিক ভাষার সমস্যা মূলত শব্দব্যবহার বা শব্দনির্বাচনের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ যখন বিস্ময়কর তাৎপর্যের সঙ্গে বলেন, 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য', তখন 'ধন্য' শব্দটির ধাতুগত অর্থ স্বভাবতই পাঠকের

CENTRAL LIBRARY

অভ্যস্ত অর্থবোধকে পীড়িত করে। Keats যখন বলেন, 'Rich to die', তখন 'Rich' শব্দটির ব্যবহারও অভ্যস্ত-কানের কাছে কেমন যেন বেসুরো মনে হয়, যেমন অকারণ পুলকে, এমন আলো, ইত্যাদিতে। অথচ এইসব বিশেষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ডঃ জনসনের মতো সমালোচক শেক্সপীয়রের 'Dunnest Smoke' শব্দটির ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। বস্তুত, খুঁটিয়ে দেখলে কাব্যিক ভাষার সমস্যাটি বিশেষ আলোচনার বিষয়, সন্দেহ নেই।

বাংলা কাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয়েছে সন্ধ্যা ভাষা। শব্দটির ব্যাখ্যা করা নিশ্চয়ই দরকার নেই। এই পদগুলির ভাষা কতটা পরিমাণে খাঁটি বাংলা তা অন্য আলোচনার বিষয়। শুধু বলা যায়, আসলে সেযুগে যথার্থ কাব্যভাষাই গড়ে ওঠেনি, ওঠেনি বলেই সিদ্ধাচার্যেরা নিজেদের চেনা-জানা ভাষায় কোনমতে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। আমার গভীর বিশ্বাস, একালের বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পাঠ্য সংস্করণে এইসব পদের যেভাবে অর্থ করেছেন, হয়ত তা' পদকর্তাদের আদৌ অভীষ্ট ছিল না। বাংলা কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, বাংলা কাব্যের জন্মলগ্নেই কাব্যিক ভাষা-সমস্যার সূত্রপাত।

পরবর্তীকালে, মধ্যযুগে বৈষ্ণব কাব্যের এক বিশিষ্ট কবিসমাজ ব্রজবুলিতে কাব্য চর্চা করেছেন। এর কারণ কি মূলত এই নয় যে, এঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সমকালীন বাংলা ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে কাব্যিক নয়? এঁদের সামনে চণ্ডীদাসের কাব্যকৃতির দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও এঁরা যে ব্রজবুলিতে কাব্য চর্চা করলেন, তার প্রধান কারণ এই, এঁরা বাংলা ভাষাকে আদর্শ কাব্যিক ভাষা মনে করেননি। অর্থাৎ এঁদের বাংলা ভাষার দৌড় এতই দীন ছিল যে, সেই ভাষায় 'যথাযথ আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য ছিল না।* অথচ, যে ভাষার আশ্রয় নিলেন এই কবিসমাজ, সেটা হয়ত তাঁদের আত্মপ্রকাশেরই ভাষা কিন্তু পাঠকের দিক থেকে তা শুধু দুরূহ ছিল না, কৃত্রিমও বটে। যে সাংগীতিক প্রসাদগুণ ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য, তা যদি সমকালীন বাংলা ভাষায় তাঁরা পেতেন, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এঁরা ব্রজবুলির আশ্রয় নিতেন না। অথচ এ ভাষা যে কাব্যিক ভাষা হিসেবে সর্বাংশেই কৃত্রিম ভাষা, কবি ও পাঠকের দিক থেকে, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? কিন্তু আমরা এই কৃত্রিমতাকেই কাব্যগুণ মনে করি। তাহলে কি বলতে হবে, কৃত্রিম ভাষাই কবিত্বের নামান্তর? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর লিরিক্যাল ব্যালাডের মুখবন্ধে কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'Poetic diction'কে কৃত্রিম ভাষার মধ্যে ফেলেছেন (তাঁর মতে কবিতার ভাষা হওয়া উচিত 'Language of the Common People')। বস্তুত কাব্যিক ভাষার দিক থেকে বিচার করলে, এই Poetic diction-এর উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ব্রজবুলি-ঘেঁষা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা।

এই মধ্যযুগেরই আর একজন মঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরামের কথা মনে পড়ছে। মুকুন্দরামের প্রাণবন্ত ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করাহ উজ্জ্বল।' বাক্‌শৈলীর বিচারে, আমি বলব, মুরারি শীলের মৌখিক ভাষা হিসেবে এই অংশ অত্যন্ত দুর্বল রচনা, কৃত্রিমও বটে। মুকুন্দরামের লক্ষ্য মৌখিক রীতিকে রূপ দেওয়া। প্রথম চরণে ব্যবহৃত 'বেঙ্গা' শব্দটি তার অনুকূল। কিন্তু যে ব্যক্তি পিতলের বিশেষণ বা epithet হিসেবে 'বেঙ্গা' ব্যবহার করে, অব্যবহিত পরেই তার মুখ দিয়ে তৎসম 'উজ্জ্বল' শব্দটি একেবারেই অস্বাভাবিক। সম্ভবত, 'বেঙ্গা পিতল' বলতে মধ্যযুগে বিশেষ এক ধরণের পিতলকে বুঝান হ'ত। জানি না, মধ্যযুগে 'চকচকে' শব্দের সমর্থক কী শব্দ ব্যবহৃত ছিল। যদি তা মুকুন্দরামের শব্দসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হ'তো, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তা' ব্যবহার করতেন। আসলে, দেখা যাবে, তিনিও প্রায়শই উপযুক্ত ভাষা বা

* ইহা লেখকের নিজস্ব অভিমত। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁহার মতামত ও মন্তব্য সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ আছে।—সম্পাদক

CENTRAL LIBRARY

শব্দের অভাবে সমস্যায় পড়েছেন এবং শিথিল শব্দ বা ভাষা ব্যবহার ক'রে কোন মতে ভাবপ্রকাশের দায় সেরেছেন।

এদিক থেকে এই পর্বের ও ধারার শেষ স্মরণীয় কবি ভারতচন্দ্রকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি সর্বপ্রথম সচেতনভাবে কাব্যিক ভাষার সমস্যার কথা অনুভব করে বলেছিলেন: 'না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।/ অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।' একথা ভারতচন্দ্র বলেছিলেন কেন? নিঃসন্দেহে তার কারণ দুটি: এক, পূর্বতন কবিদের ভাষাগত গোঁড়ামি দূর ক'রে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের বা রসের উপযোগী ভাষার উদ্ভাবনের প্রয়াস। দুই, সমকালীন ভাষায় অভ্যস্ত পাঠকদের ভাষারুচির সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা। ভারতচন্দ্র অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই, তবু দেখা যাবে তাঁর ভাষাও প্রায়শই, যাকে বলে Laboured Language. অবিশ্যি, এ না হয়েও উপায় ছিল না, কেননা, ভারতচন্দ্রকে একটা নতুন ভাষার আদর্শ নিজের চেষ্টায় গড়ে নিতে হয়েছিল। যেমন ধরা যাক, ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি: আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। এই উক্তিটি প্রায় প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে। এই উক্তির সন্তান শব্দটি, যা এতোকাল প্রশংসিত হয়ে এসেছে, আমার ধারণা, বাক্‌শৈলীর বিচারে অসার্থক। ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ধরণের শব্দনির্বাচনের শৈথিল্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

ভারতচন্দ্রের ভক্ত-শিষ্য, আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তকে এতোকাল অনেকেই minor poet বা গৌণ কবি হিসেবে তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু যাকে বলে সচেতন ভাষাশিল্পী, তিনি তাই। ভারতচন্দ্রের মত তিনিও বুঝেছিলেন, কবি ও পাঠকের বা কাব্য ও পাঠকের মধ্যে একটা সমমর্মিতা আনতে গেলে অনুরূপ ভাষার আশ্রয় নেওয়া দরকার। সম্ভবত এই কারণেই, বিশেষ এক ধরণের কবিতায় তিনি যে এলোপাথাড়ি ভাষা ব্যবহার করলেন, তাতে কাব্যিক ভাষার আর একটা নতুন আদল দেখা গেল। এবং যথার্থই, তাঁরই হাতে যে আধুনিক বাংলা কাব্যের নতুন ভাষা গড়ে উঠল, একথা আমরা অনেকেই লক্ষ্য করিনি। তবে কিনা, তিনি যথার্থ শিক্ষিত ছিলেন না তো, অর্থাৎ ইংরেজি জানতেন না। সুতরাং, ভাষাশিল্পীর উপযুক্ত মর্যাদা তাঁর ভাগ্যে জুটল না। বস্তুত, ঈশ্বর গুপ্ত কাব্য ভাষার সমস্যার কথা ভেবেই নির্বিচারে সামান্য অসামান্য শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর ভাষার এই মাহাত্ম্য সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন। তবু যে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক কবিসমাজে ত্রাত্য থেকে গেলেন, তার প্রধান কারণ হয়ত এই যে, তাঁর অভিপ্রেত বক্তব্য ও ভাষা একালের পাঠকের কাছে বরণীয় নয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে বাধা এসেছে পাঠকের দিক থেকে।

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বৈশ্বর্য স্বীকার করেও বলতে হয়, যতই তিনি বলুন না কেন, 'Words that I never thought I knew', মূলত এই কাব্যের ভাষাই কাব্যটির পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে পাঠকের কাছে এখনো দুস্তর বাধা এবং সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই, এ ভাষাও সর্বৈব অকৃত্রিম নয়। বস্তুত, বাংলা ভাষাচর্চায়, বিশেষত বাংলা কাব্যের ভাষার সঙ্গে পরিচয়ে অনভ্যস্ত মধুসূদনের পক্ষে অকৃত্রিম ভাব প্রকাশের উপযোগী অকৃত্রিম ভাষায় কাব্য রচনা করা সম্ভব ছিল না। আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের জন্য যে কাব্যটি দুর্বোধ্যতা আদৌ নয়, বরং, archaic বা প্রত্ন শব্দ ব্যবহার এমন কিছু বেশী নয়; আসল কারণ হচ্ছে, সমগ্র কাব্যটি একটা অস্বাভাবিক কৃত্রিম বাক্‌শৈলীতে রচিত। মধুসূদন নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন, (অনেক ক্ষেত্রে তা বিস্ময়করভাবে সার্থক। বাধা সেখানে নয়, বরং তা তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়। আসল সমস্যা হচ্ছে—এ কাব্যের ভাষাও মূলত laboured language. এই কাব্যে অলংকার বা উৎপ্রেক্ষারূপে অসংখ্য Parenthesis রয়েছে। এগুলি কি নিছক মিলটনের অনুকরণ মাত্র? না, বস্তুত তা নয়। এগুলি আসলে পূর্ববর্তী চরণের পরিপূরক অর্থাৎ উপযুক্ত ভাষায় ভাবকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতেনা পেরে একটা কৃত্রিম উপায়ে পাঠকের কাছে বক্তব্যকে অলংকারের

CENTRAL LIBRARY

সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করবার ব্যাকুল প্রয়াসের নিদর্শন এগুলি। আর বিহারীলাল? কাব্যিক ভাষা-সমস্যায় সবচেয়ে বেশী ভুগেছেন তিনি সমগ্র বাংলা কাব্যে। তাঁর সমস্যা অবিশ্যি দুটি নয়, তিনটি। প্রথমত, তিনি কী বলতে চান, তা তিনি জানেন না। দ্বিতীয়ত, যেটুকু বোঝেন, তার প্রকাশের ভাষা খুঁজে পান না। তৃতীয়ত, যে ভাষা খুঁজে পান, তা পাঠকের কাছে অর্থবোধ্য হয় না। 'কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে'—এর চেয়ে বিশ্বস্ত স্বীকারোক্তি, আর কিছু হ'তে পারে না। কাব্য-ভাষা সমস্যার সবচেয়ে বড় victim কবি বিহারীলাল।

স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। তাঁর সম্পর্কে যে কথাটা প্রথমেই মনে আসে, তা হ'চ্ছে – তিনি বড় বেশি লিখেছেন। হয়ত তাঁর পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ; হয়ত বা না লিখেও উপায় ছিল না। তিনি প্রতিনিয়ত নিজের লেখা, বিশেষভাবে কবিতা, কাটাকুটি করেছেন। শব্দ বদলেছেন, বাক্য বদলেছেন, এমন কি স্তবকও। এই বিপুল পরিমাণ রবীন্দ্র কাব্যের পাঠান্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর মতো শক্তিমান কবিও গভীর ভাবে কাব্যিক ভাষা-সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, সারা জীবন ধরেই। অন্যদিকে, পাঠক-সমাজও তাঁর অভীষ্ট অর্থভেদ করতে না পেরে আর এক দফা সমস্যায় পড়েছে। তাছাড়া, তিনি এমন সব বিশেষণ, বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন, যেগুলি পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সমস্যার দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। শুধু বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যিক ভাষা সমস্যার মূলে আছে তাঁর একটি সচেতন শিল্পবোধ, কাব্যকে উৎকর্ষ-মণ্ডিত করার প্রয়াস। তবে, সর্বত্রই যে সার্থক হয়েছেন, তা বলা যায় না। Geoffrey N. Leech যাকে Register বলেছেন, সেদিক থেকে বিচার করলে, রবীন্দ্রকাব্য ভাষার এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, বলা উচিত মহিমা—যার সমবায়ে বাংলা কাব্যের একটি ভিন্ন জগত রচিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-বিরোধিতার মূলে আছে এই রাবীন্দ্রিক 'Register'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা তার প্রতি পরবর্তী কবিসমাজের গভীর অনীহা। দেখা যাবে, বস্তুত তাঁরা, পরবর্তী কবিসমাজ, একটা নতুন কাব্য-ভাষার আদল গড়তে চেয়েছিলেন। এই আদল, নতুন ছাঁচ গড়তে গিয়ে অবিশ্যি যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, আজো তার পালা শেষ হয়নি। এঁদের অনেকেই কাব্যিক ভাষা-সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত নজরুল ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতা, যা এতোকাল প্রশংসা লাভ ক'রে আসছে। বস্তুত, এত শিথিল শব্দবিন্যাস ও শব্দ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে বাংলা কাব্যে। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে', তখন স্বভাবতই 'খুঁড়ে' শব্দটির কাছে এসে পাঠকের অভ্যস্ত কাব্যরুচি হোঁচট খায়। অথচ, শব্দটি বিস্ময়করভাবে অর্থবহ, সার্থক। তেমনি, 'সামান্য' শব্দের মত 'অসংখ্য' শব্দ ব্যবহার সহসা পাঠকের অভ্যস্ত বোধকে পীড়িত করে তোলে। আবার, কাব্যের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়তা বা mysticism যাকে বলি, দেখা যাবে, আসলে তা' যতটা ভাবগত, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাষাগত বা শব্দগত। সব সময় কবিরা সত্যিই যে একটা অতীন্দ্রিয় ভাবের অনুভূতি থেকে এসব বলেন তা নাও হতে পারে। আসলে হয়ত দেখা যাবে, উপযুক্ত ভাষা ব্যবহারের অভাবেই কাব্যটি বা কাব্যাংশ অতীন্দ্রিয় বা mystic বলে মনে হচ্ছে। তবু, জীবনানন্দ, সুধীন দত্তের কবিতা কবিতাই, সমস্যা যাই থাক। অতি সাম্প্রতিক কালের কবিযশঃপ্রার্থীদের, কবিতা-লেখকদের অনেকের ক্ষেত্রেই কাব্যিক ভাষার সমস্যাই 'দুর্বোধ্যতা' বলে গণ্য, আসলে, এঁদের অনেকের অবস্থা বিহারীলালের চেয়েও শোচনীয়। এঁদের শব্দ-ভাণ্ডারে বক্তব্যের অনুকূলে প্রকাশক্ষম ভাষা, শব্দ প্রায়শই থাকে না, স্বভাবতই পাঠকের পক্ষে তা বোঝবার প্রশ্নই ওঠে না। বিহারীলাল তবু অন্তত নিজের হৃদয়ে দেখতেন, এইসব কবিযশঃপ্রার্থীরা সম্ভবত নিজেদের হৃদয়েও কিছু দেখেন না, স্বভাবতই আমাদের মত অজ্ঞ পাঠককে কিছু 'দেখাইতে'ও পারেন না।

CENTRAL LIBRARY

কেরলে বাংলা শিক্ষা

নিলীনা আব্রাহাম

প্রথমে যখন কেরলে আসি তখন একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল। বাংলায় এম. এ. পাশ করেছি কিন্তু এমন একটা জায়গায় এসে পড়লাম যেখানে বাংলার সঙ্গে এতটুকু সম্পর্ক নেই। বুথাই হল আমার অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করা, তারপর এম. এ. পাস করা। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয় কিছুই কি বলা যায়? হাতে তখন আমার অঢেল সময়, কি করি কি করি, কাছেই দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচার সভা। মনে হল কলকাতায় থাকতে হিন্দীতে দুটো পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আর একটু জ্ঞান বাড়ালে ক্ষতি কি? বসেই তো রয়েছি। হিন্দী প্রচার সভায় হিন্দী পড়ার জন্য যোগদান করলাম। সেখানে আমার একজন হিন্দী শিক্ষক বললেন—আচ্ছা আপনি তো আমাদের বাংলা শেখাতে পারেন।

—বাংলা আপনারা শিখবেন কেন?

—টাগোরের ভাষা শেখার বড় ইচ্ছে আমাদের।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'য়ে গেলাম। হিন্দী পড়ছি আর বাংলা ক্লাস নিচ্ছি। একদিন পড়ছিলাম পঞ্চানন-বাবুর 'অন্ধকারের দেশে'। বইটা পড়ে খুব ভালো লাগলো। ভাবলাম মালয়ালমে অনুবাদ করলে কেমন হয়? চিঠি দিলাম পঞ্চানন বাবুকে বই অনুবাদ করার অনুমতি চেয়ে। অনুমতি পেলাম আর তার সঙ্গে খোঁজ পেলাম 'নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি'র' শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের। তিনি পঞ্চাননবাবুর কাছে আমার খোঁজ পেয়ে তাঁর সমিতির তরফ থেকে বাংলা ক্লাস নেবার কথা আমাকে লিখেছেন। আমি সানন্দে রাজী হ'য়ে গেলাম। এই হল কেরলে বাংলা ভাষা শিক্ষার গোড়াপত্তন। একদিন স্থানীয় সরকারী কলেজ মহারাজার কলেজ থেকে রবীন্দ্রনাথের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটি আমন্ত্রণ এলো। বক্তৃতা অবশ্য ইংরাজীতে। কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক মিঃ অ্যান্টনি এমনি কথায় কথায় বল্লেন,—দেখুন হয়তো একদিন এই কলেজেই আপনি বাংলা পড়াবেন।

তাঁর কথা শুনে একটু হাসলাম কারণ কথাটা অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির ক্লাস নিচ্ছি, অদ্ভুতভাবে লোকে সাড়া দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা জানার জন্য কি আগ্রহ সকলের। তখন মনে হল বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ যখন এদের এত তখন কলেজে বাংলা একটা ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে পড়ানোর ব্যাপারটা অসম্ভবই বা হবে কেন? কিন্তু বাধা অনেক। প্রথমে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে একটা পাঠ্যবিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তার জন্য দরকার সিণ্ডিকেট থেকে একটা প্রস্তাব আনা এবং সে প্রস্তাব পাস করানো। তখন গেলাম কেরলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি শ্রী জি. শঙ্কর কুরুপের কাছে। এর্ণাকুলমে আসার পরেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। বাংলা ভাষা আর রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভক্ত তিনি। তিনি তখন ছিলেন সিণ্ডিকেটের সদস্য। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানোর প্রস্তাবটি পাস হল, প্রস্তাব তো পাস হল কিন্তু কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারী কলেজ হ'লে হবে না, সরকারী কলেজ হ'তে হবে। তাই সরকারী কলেজ মহারাজার কলেজ থেকে ছাত্রদের সই সংগ্রহ করার কাজ শুরু হলো। এতে আমাকে

CENTRAL LIBRARY

সাহায্য করলেন কেরলের আর এক বিখ্যাত কবি ও কলেজের মালয়ালম্ ভাষার অধ্যাপক শ্রী ও. এন. ভি. কুরুপ। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অভূতপূর্ব সাড়া পেলাম। সেই আবেদন পত্র পাঠানো হল শিক্ষাবিষয়ক সেক্রেটারী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। পাঠানো তো হল কিন্তু কোন উত্তর নেই। তখন কেরলে প্রথম কম্যুনিস্ট সরকার গঠিত হয়েছে, ভেবেছিলাম তাঁরা হয়তো বাংলা পড়ানোয় উৎসাহ দেখাবেন কিন্তু কিছুই হল না। কিছুদিন পরে কম্যুনিস্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে গেল। নির্বাচনের পর যে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলো তার অর্থমন্ত্রী হলেন আর. শতিকর। তাঁর সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে বুঝিয়ে মহারাজার কলেজে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্যে একটা পদের প্রবর্তন করা হল। ১৯৬০ সালের জুনমাসে যথারীতি পাবলিক্ সার্ভিস কমিসনের ইন্টারভিউ দিয়ে সে পদে আমি নিযুক্ত হ'লাম।

আজ বারো বছর বাংলা পড়াচ্ছি। কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী নেই, সব স্কুল ফাইন্যাল। তারপর তাদের একবছর প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়তে হ'তো, তারপর বি. এ., বি. এস-সি। যে-সব ছাত্ররা ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পক্ষপাতী তারাই বেশী সংখ্যায় বাংলা পড়তে আসতো। তারা বাংলা নিতো এই ভেবে যে অ, আ, ক, খ থেকে যখন বাংলা পড়ানো হচ্ছে তখন তা খুব সোজাই হবে এবং তাতে অনেক নম্বরও পাওয়া যাবে আর বেশী নম্বর পেলে তাদের প্রথম বিভাগে পাশ করার সুবিধে হবে। তাহলে তাদের কলেজে আসন পেতে বা প্রফেসনাল লাইনে যেতে অসুবিধে হবে না। এই ভেবে যেসব ছাত্রছাত্রীরা বাংলা নিতো তার সকলেই খুব মেধাবী ছাত্র হ'ত। কিছু ছাত্র অবশ্যই থাকত যারা না পড়ে পাস করতে চাইত। নম্বর বেশী পাব বলে যে সব মেধাবী ছাত্র বাংলা নিত তারা নম্বর বেশী পেতো কিন্তু তা তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী পড়ার পক্ষে কোনো সাহায্যই করতে পারত না, কারণ তখন দেখা হ'ত ইংরাজী, বিজ্ঞান বা অঙ্কের নম্বর, দেশীয় কোনো ভাষার নয়। যাহোক আজ আমার অনেক ছাত্রই ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার। বাংলা কতটুকু তারা জানে জানি না কিন্তু তারা যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তাইতেই আমার আনন্দ।

এখন কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশনের পর দুবছর প্রি-ডিগ্রী এবং তারপর তিনবছর বি. এ., বি. এস. সি পড়তে হয়। প্রি-ডিগ্রী দুবছরের কোর্স বলে বাংলা এখন ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ ভালোই শিখছে। এসব ছাত্রছাত্রীদের বাংলা পড়া কোন্ কাজে লাগবে জানি না। এক অনুবাদ করা ছাড়া আমি তো আর কিছুই ভাবতে পারছি না কিন্তু তবু যে এরা তাদের মাতৃভাষা মালয়ালম্ অথবা রাষ্ট্রভাষা হিন্দী না শিখে বাংলা শিখছে তাতে আমি সত্যিই গৌরব বোধ করি। প্রায় দেড়শো ছাত্রছাত্রী এখন আমার কলেজে বাংলা পড়ছে। কলকাতার কোনও একটি কলেজে দেড়শো ছাত্রছাত্রী মালয়ালম্ পড়ছে একথা কি কল্পনা করা যায়? বাংলাদেশ থেকে দেড়হাজার মাইল দূরে ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে সুদূর কেরলে কতকগুলি অবাঙালী ছেলেমেয়ে বাংলাভাষা শিখছে সেটাও কি একটা কম কথা? আপনি যখন চারিটি প্রদেশ পেরিয়ে পঞ্চম প্রদেশ অর্থাৎ কেরলে পা দিলেন তখন আপনি দেখলেন যে আপনি এমন এক দেশে এসেছেন যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন না, না ভাষায়—না খাওয়া-দাওয়ায়। মনে হচ্ছে আপনার এ কোন্ দেশে এলাম। এমন একটি দেশে একটি কলেজে বাংলা পড়ানো হচ্ছে শুনে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আর যখন এই সুদূরপ্রদেশে কয়েকটি অবাঙালী ছেলেমেয়ের হাতে বাংলা বই দেখবেন তখন কি আরও একটু বেশী অবাক হবেন না?

বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা তো হলো কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্য কোন পুরস্কার অথবা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নেই। মনটা খচ্‌খচ্ করছে। প্রত্যেকটি পাঠ্য বিষয়ে মহারাজার কলেজে হয় বৃত্তি, নয় মেডেল বা অন্য কোনও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে, শুধু বাংলাতেই নেই। কি করা যায়? অনেক ভেবেচিন্তে বাংলার কয়েকজন

CENTRAL LIBRARY

নামকরা সাহিত্যিক যাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল তাঁদের এ বিষয়ে কিছু করার জন্য লিখলাম কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। তখন 'যুগান্তরে' একটা আবেদন জানালাম কিন্তু তাতেও কোন সাড়া মিলল না। এমন সময় একদিন কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-বক্তৃতা করতে এলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়। আমার কলেজে, তাঁকে অনুরোধ করলাম বাংলার জন্য একটা এন্‌ভাউমেন্ট করিয়ে দিতে। উনি কথা দিলেন যে কলকাতায় গিয়ে এ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করবেন। ডাঃ রায় তাঁর কথা রাখলেন। বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানোর উৎসাহের জন্য ৪০০০ হাজার টাকার একটা এনভাউমেন্ট করিয়ে দেওয়া হ'লো। ঐ টাকার সুদে আশুতোষ মুখার্জি স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লো। সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছিল এই ব্যবস্থায়, তবে আনন্দ হঠাৎ কানায় কানায় পূর্ণ হল। একদিন কলেজে গিয়ে দেখি কেরল বিশ্ববিদ্যালয় একটি চিঠির কপি কলেজে পাঠিয়েছেন। চিঠিটি এসেছে সর্বভারতীয় জীবনবীমা কর্মচারী সমিতির কলকাতা শাখা থেকে। তাঁরা কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানোর উৎসাহ দেবার জন্য একবছরের জন্য ১৮ টাকার একটি বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বি. এ., বি. এস-সি পরীক্ষায় বাংলায় যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে সে এই বৃত্তির অধিকারী হবে। কারা এই বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের আমি জানিনা কিন্তু এই অজানা দাতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ইচ্ছা আছে বাংলা শুধুমাত্র ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে না পড়িয়ে প্রধান ভাষারূপে পড়াই যাতে এরা বেশ ভালো করেই বাংলা শেখে। সেই চেষ্টা করছি। কতখানি সফল হব জানি না। তবে ভারতবর্ষের এক সুদূর প্রান্তে বাংলাভাষার যে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছি তা সহজে নিভে যাবে না বলেই আশা করি।

CENTRAL LIBRARY

সামাজিক নৃ-বিদ্যার বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

তুষারকান্তি নিয়োগী

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে আজ আর কোন শিক্ষিতের মনে দ্বিধা নেই এবং থাকাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। যে কারণেই হোক বাংলা তথা ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার বাহন কিন্তু আজও পর্যন্ত ইংরাজীই রয়ে গেছে। উত্তর-ভারতের কোন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হয়েছে তবু সমগ্র ভারতের বিচারে তাতে উৎসাহের কিছু দেখা যায় না। বিশেষতঃ বিজ্ঞান অর্থনীতি ও কারিগরীবিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যাপারে ইংরাজী ভাষার কিছুটা যে সুবিধা আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু একথা বলা অন্যায় বা অযৌক্তিক হবে না যে, আজ ভারতীয় ভাষাগুলির সার্বিক উন্নতি করতে গেলে তাদের দ্বারা শুধুমাত্র 'সুকুমার সাহিত্য' সৃষ্টি করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞান-শাস্ত্রকে ও ঐ ঐ ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে; শিক্ষার সর্বস্তরে বাহন করতে হবে মাতৃভাষাকে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা ইংরাজীকে বা অতি-প্রচার-রত হিন্দীকে হেয় করা নয়—কারণ দেখা গেছে যে, যে যে দেশে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা সেখানে যাঁরা ইংরাজী বা প্রতিবেশী রাজ্যের ভাষার চর্চা করেন তাঁদের জ্ঞান আমাদের ইংরাজী জ্ঞানের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি-ই।

ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার ধারা অনুসরণ করে আজ যদি দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহলে প্রয়োজনে ইংরাজীকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। যেখানে যেখানে ইংরাজীর একান্ত অপরিহার্যতা রয়েছে সেখানে তাকে রাখতে হবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে গেলেও ইংরাজীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। সুনীতিবাবুর সেই উক্তিটি—বাঙালীকে বিজ্ঞান শিখতে হবে ইংরাজী ও বাংলা মিলিয়ে—বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শাস্ত্র পড়তে ও লিখতে গেলে অসুবিধা হয়—বিশেষ করে পরিভাষার ক্ষেত্রে। সুষ্ঠু পরিভাষা না থাকলে ওইসব বিষয়ের গূঢ়ার্থ ঠিক ঠিক প্রকাশ ও উপলব্ধি করা যায় না। ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিতে দেখা যায় যে পরিভাষা নির্মাণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওঁরা বিশেষ উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। লেখকরা যেখানে দেখেছেন যে সুষ্ঠু প্রকাশের প্রয়োজনে মূলভাষা বা শব্দ অবিকৃত ও অননূদিত রাখা দরকার সেখানে তাই রেখেছেন—এবং এইভাবে তাঁদের ভাষায় সহজে ও স্বাভাবিকভাবে অনেক বিদেশী শব্দ এসে গেছে। এটা হল ভাষার আত্মসাৎ করার ক্ষমতা যা কি না ভাষার পুষ্টির লক্ষণ। অবশ্য এ ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ও বিবেচনা করে করতে হয়, না হলে ভাষার নিজস্ব অঙ্গ-হানির সম্ভাবনা থাকে।

বিজ্ঞানের শাখাগুলির ভিতর নৃ-বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত তরুণ হলেও আজকের পৃথিবীতে এর ব্যাপক পঠন-পাঠন চলেছে। বাংলা ভাষায় নৃ-বিজ্ঞানের উপর কিছু কিছু পুস্তক রচিত হয়েছে। নৃ-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তাও সহজেই উপলব্ধি করা যায়, কারণ পাঠ্যপুস্তকগুলি-ই ঐ শাস্ত্রের বুনিয়াদি শিক্ষার স্তরকে সৌষ্ঠব দান করবে। বাংলা ভাষায় নৃ-তত্ত্বের পুস্তক ও পুস্তিকাবলী রচনা করতে গেলে সুগঠিত পরিভাষার প্রয়োজন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা সংকলনে দুর্ভাগ্যক্রমে নৃ-বিদ্যার অধ্যায়টি বাদ পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ শেষ করে ভারত সরকারের নৃ-তত্ত্ববিভাগে কর্মজীবন শুরু

CENTRAL LIBRARY

করি। দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে নৃ-তত্ত্ব সম্পর্কে, বিশেষতঃ সামাজিক নৃ-বিদ্যা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একখানি সাধারণ পুস্তক রচনার প্রয়োজন অনুভব করি। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে প্রথমেই পরিভাষার ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হই। তখন নৃ-বিদ্যা সম্পর্কিত বাংলা পরিভাষা রচনায় মনোনিবেশ করি। এই সূত্রে বিভিন্ন নৃ-বিদ্যা সম্পর্কিত ইংরাজী পুস্তকাবলীর সাহায্যে ন্যূনাধিক ২৫০০ শত পরিভাষা সংগ্রহ করেছি। আমার এই সংগ্রহ আমি 'গ্রন্থাগার'-নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছি। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমার কাজের সামান্য অংশ উপস্থিত করছি। নিতান্ত প্রয়োজন ও প্রসক্তির তাগিদে আমি এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছি। যে বিষয় নিয়ে আমি কাজ করেছি সে বিষয়ে আমার জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও সৃজনশীল উপদেশ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।

পারিভাষিক শব্দাবলীর অর্থনিরূপণের ব্যাপারে স্থানে স্থানে নৃ-তাত্ত্বিক বিশেষ অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

A

১. Aborigines—আদিবাসী।

২. Adaptation—অভিযোজন।

৩. Adoption—(ক) পোষ্যগ্রহণ।

(খ) নবাহরিত সম্পর্ক। নৃ-তত্ত্বে এই কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা গোত্র বা সম্পূর্ণ গোষ্ঠী একটি নতুন সম্পর্কে প্রবেশ করে বা জড়িত হয় অপর ব্যক্তি বা পরিবার বা গোত্র বা গোষ্ঠীর সঙ্গে। এই সম্পর্ক নতুন হলেও বিজাতীয় কিছু নয়, এবং সময় সময় এই নতুন আত্মীয়তা স্বাভাবিক অবস্থারও কিছু বেশি হয় অর্থাৎ সম্পর্কের নৈকট্য সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। বাপ-মায়ের মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাসস্থানিক বিপর্যয়, বংশ লোপ, মহামারী এবং যুদ্ধ প্রভৃতি কারণের জন্য নতুন সম্পর্ক স্থাপন তথা আহরণের প্রশ্ন ওঠে।

৪. Adultery—ব্যভিচার, দুষ্ট যৌনাচার।

৫. Afforestation—অরণ্যীকরণ। কোন স্থানকে অরণ্য বা শিকার ভূমিতে পরিণত করা।

৬. Anthropologist—নৃ-বিদ্যাবিদ, মানব-বিজ্ঞানী।

৭. Anthropology—নৃ-বিদ্যা, মানববিজ্ঞান।

৮. Anthropology, Cultural—সাংস্কৃতিক নৃ-বিদ্যা।

৯. Anthropology, Social—সামাজিক নৃ-বিদ্যা।

১০. Anthropomorphism—নরত্ব-আরোপ।

১১. Autochthon—প্রাচীনতম অধিবাসী, ভূমিজ। কোনস্থানের আদিমতম বাসিন্দাকে নৃ-তত্ত্বের ভাষায় 'ভূমিজ' বলা যেতে পারে।

১২. Avoidance—পরিহার।

১৩. ,, Avuncular—মাতুলসম্পর্ক পরিহার।

১৪. Avunculate—মাতুল সম্পত্তাধিকারী।

B

১৫. Blood Feud পুরুষানুক্রমিক বিবাদ।

১৬. Blood Money—হত্যামূল্য। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হত্যাঘটিত ব্যাপার যখন অর্থের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ করা হয় তখন সেই অর্থকে 'হত্যামূল্য' বলা হয়।

১৭. Bride Price—কন্যাপণ।

১৮. Bride Purchase—কন্যাক্রয়।

১৯. Buffoonery—ভাঁড়ামি, মস্করা।

C

২০. Cannibalism—নরমাংসভোজন। নরমাংস ভোজন ব্যাপার সংকেতধর্মী অথবা সাধারণ হতে পারে। অতৃপ্ত ক্ষুধা, হিংসা, ধর্মানুষঙ্গ, বাৎসল্য, অনুরাগ এবং গোষ্ঠীবিচার পদ্ধতির নির্দেশ ইত্যাদির কারণে নরমাংস ভোজন প্রথার

CENTRAL LIBRARY

প্রচলন দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনেও নরমাংস ভক্ষণ প্রথা চালু থাকতে পারে—এ ক্ষেত্রে সেটি নিতান্ত আদিম ধর্মাচারসংক্রান্ত ব্যাপার। নরমাংস ভোজীরা কুকুরও খেয়ে থাকে।

২১. Cannibalism, burial—মৃতমাংস ভোজন। মৃতমাংস ভোজনের পশ্চাতে আছে মৃতের আত্মাকে আত্মস্থ করার ইঙ্গিত—অষ্ট্রেলিয়ার লিভারপুল নদীতীরের অধিবাসীরা এই আচার পালন করে।

২২. Caste—বর্ণ।

২৩. Caste system—বর্ণাশ্রম প্রথা।

২৪. Celebacy—চিরকৌমার্য।

২৫. Ceramics Primitive—আদিম মৃৎশিল্প।

২৬. Ceremony—অনুষ্ঠান।

২৭. Ceremony, farewell—বিদায় অনুষ্ঠান।

২৮. ,, funeral—শবানুষ্ঠান।

২৯. ,, nubility—বিবাহযোগ্যতা অনুষ্ঠান। প্রায় সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে, শুধু আদিবাসী কেন, বহু সভ্যজাতির মধ্যেও, মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৩০. Chief—গোষ্ঠীপতি, সর্দার, মোড়ল, প্রধান।

৩১. Civilisation—সভ্যতা।

৩২. Clan—গোত্র।

৩৩. Clan Organisation—গোত্র সংগঠন।

৩৪. Class—শ্রেণী।

৩৫. Class system—শ্রেণী ব্যবস্থা।

৩৬. Classificatory system—শ্রেণী নির্দেশক প্রথা।

৩৭. Classificatory kinship—শ্রেণী নির্দেশক। আত্মীয় সম্পর্ক।

৩৮. Commensal—সহভোজী।

৩৯. Communal house—গোষ্ঠী নিবাস।

৪০. Communism Primitive—আদিম সাম্যবাদ।

৪১. Community endogamous—অন্তর্বিবাহকারী সম্প্রদায়।

৪২. Connubial Status—বৈবাহিক মর্যাদা।

৪৩. Consanguinous Family—রক্ত সম্বন্ধযুক্ত-পরিবার।

৪৪. Cross Cousin—মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন।

৪৫. Parallel Cousin—খুড়তুতো-মাসতুতো ভাই-বোন।

৪৬. Creation Story—সৃষ্টিতত্ত্ব।

৪৭. Cult Fertility - উর্বরতা বিধায়ক ধর্মমত।

৪৮. Culture—সংস্কৃতি, জীবনায়ন।

D

৪৯. Dance—নৃত্য।

৫০. Dance, Astronomic—সৌরনৃত্য।
সৌরনৃত্য একটি প্রাচীন মিশরীয় নৃত্য। এই নাচের মাধ্যমে সৌরমণ্ডলের একটি সাংকেতিক রূপ ফুটিয়ে তোলা হত। সৌরনৃত্যের সহযোগী ছিল বাঁশী ও বীণা। সূর্যদেবতা Raকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচা হ'ত।

৫১. Dance, Baison—বাইসন নৃত্য।
মিসৌরী অঞ্চলে একটি আদিবাসী সম্প্রদায় এই নাচ নাচে। দলের আটজন পুরুষ বাইসনের চামড়ায় দেহ ঢেকে এবং তার ওপর লাল কালো সাদা ইত্যাদি বাবতীয় রঙে রঞ্জিত হয়ে বাইসনকে নকল করে দেহভঙ্গীতে নৃত্য ফুটিয়ে তোলে।

৫২. Dance, Candle—দীপ নৃত্য।

৫৩. Dance, Corn—শস্য নৃত্য।
এই নৃত্যের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত দৈবী শক্তিগুলিকে বন্দনা ও তুষ্ট করা হয়।

CENTRAL LIBRARY

৫৪. Dance, Couple—জোড় নৃত্য।

এই নৃত্যের মাধ্যমে একজন পুরুষের প্রণয় আবেদন ফুটিয়ে তোলা হয়। স্পেনের 'বোলেরো'-রা এই নাচের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত উর্বরতা বিধায়ক চেতনা থেকে এই নাচের উদ্ভব হয়ে থাকবে।

৫৫. Dance, Courtship—প্রণয় নৃত্য।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এই নাচের বিশেষ প্রচলন। অংশগ্রহণকারী পুরুষ মেয়েরা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। নাচের মাধ্যমে পুরুষরা তাদের বল-বীর্য, চাতুর্য, অস্ত্রধারণ নৈপুণ্য শৌর্য ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে এবং এই নাচের সভাতেই মেয়েরা নিজেদের স্বামী নির্বাচন করে। প্রণয়নৃত্য যৌন স্বভাবকে উত্তেজিত ও আবেদনকে প্রকাশ করে।

৫৬. Dance, Death—শোক নৃত্য।

মৃতের উদ্দেশ্যে বা মৃত্যুকে সাংকেতিকরূপে প্রকাশ করার জন্য এই নাচের মহড়া হয়। নাচের মাধ্যমে অভিশপ্ত আত্মাকে তুষ্ট করা হয়, মৃত পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

৫৭. Dance, Fish—মীন নৃত্য।

নাচের মধ্যে মৎস্য স্বভাবকে অনুকরণ করা হয়।

৫৮. Dance, Flok—লোকনৃত্য।

৫৯. Dance, Goat—ছাগ নৃত্য।

এই নৃত্যে একটি ছাগকে বাক্তিত্ব দান করা হয়। মূলতঃ এই নাচ লাম্পট্য ও হীন স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডির উদ্ভব হয়েছিল এই জাতীয় নাচ থেকে।

৬০. Dance, Puberty—বয়ঃসন্ধি নৃত্য।

বয়ঃসন্ধি অনুষ্ঠানকে নৃত্যোৎসবের মাধ্যমে ভরিয়ে তোলা হয়।

৬১. Dance, Snake—সর্প নৃত্য।

সাপকে হাতে নিয়ে অথবা সাপের গতিবিধি অনুকরণ করে নাচা হয়। সাপ সাধারণতঃ ফলনশক্তি বৃদ্ধির প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের আদি-সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীর সঙ্গে সর্পসংশ্লেষ রয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিকথা ও পুরাকাহিনীতেও সাপের বিশেষ স্থান রয়েছে। সর্প নৃত্য 'হোপি ইণ্ডিয়ান'-দের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়।

৬২. Dance Solstice—অয়ন নৃত্য।

সূর্যের গতি পরিবর্তনের রূপকাভাস হল এই অয়ন নৃত্য। বিশেষতঃ অয়নক্রান্তি লগ্নে, শীতের বিদায় পর্বে সূর্যের পূর্ণ বিকাশের শুভক্ষণে এই নৃত্যের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৬৩. Dance, Stick—শিশ্ন নৃত্য।

এই নৃত্যে বংশদণ্ড বা কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করা হয়। দণ্ডটি শিশ্ন রূপকের কাজ করে।

৬৪. Dance, Turtee—কূর্ম নৃত্য।

এই নৃত্যের সঙ্গে ফলন শক্তির যোগ রয়েছে।

৬৫. Dance, War—যুদ্ধ নৃত্য।

৬৬. Diffusion—প্রসারণ।

৬৭. Distribution—বণ্টন।

৬৮. Diversity of Origin—উৎপত্তি বৈচিত্র্য।

৬৯. Dormitory—শয়নাবাস।

৭০. Dowry—পণ।

E.

৭১. Endogamous—অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহকারী।

৭২. Endogamy—অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ।

৭৩. Exogamy—বহির্গোষ্ঠী বিবাহ।

৭৪. Ethnology নৃ-কুল বিদ্যা।

৭৫. Expiatory—প্রায়শ্চিত্তমূলক।

F

৭৬. Family—পরিবার।

৭৭. Family, Consanguine—রক্ত সম্পর্কের পরিবার।

CENTRAL LIBRARY

৭৮. Family, Escutheon—কুলচিহ্নাঙ্কিত ঢাল।

৭৯. Family Extended—সম্প্রসারিত পরিবার। পুত্র-পুত্রবধূ বা কন্যা জামাতা সম্বলিত পরিবার।

৮০ Family Nuclear—কেন্দ্রী পরিবার।

৮১. Folk-Lore—লোকযান।

G H & I

৮২. God—ঈশ্বর, ভগবান।

৮৩. Group Marriage—যূথবিবাহ।

৮৪. Graded Organisation—স্তরবিন্যস্ত সংগঠন।

৮৫. Historic Genesis—ঐতিহাসিক উৎপত্তি।

৮৬. Homicide—নরহন্তা।

৮৭. Hypergamy—উচ্চবর্ণে কন্যাদান।

৮৮. Incest—অগম্যা সম্ভোগ, গোত্রগমন।

৮৯. Infanticide—নবজাতক হত্যা।

৯০. Inheritance—উত্তরাধিকার।

K L & M etc.

৯১. Kinship System—আত্মীয় সম্পর্ক।

৯২. Kinship, Bilateral—দ্বিপার্শ্ব সম্পর্ক।

৯৩. Kinship, Colateral—জ্ঞাতি সম্পর্ক।

৯৪. Kinship, Blood—রক্তাত্মীয় সম্পর্ক।

৯৫. Levirate—ভ্রাতৃজায়া বিবাহ।

৯৬ Levirate Junior—দেবর বিবাহ।

৯৭. Lineage—বংশ, কুল।

৯৮. Marriage—বিবাহ।

৯৯. Marriage, Avunculate—ভাগ্নীবিবাহ।

১০০. Sororate—শ্যালিকা বিবাহ।

নৃ-তাত্ত্বিক পরিভাষার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এখানে একশত শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই স্বল্পসংখ্যক শব্দ উপস্থিত করে নৃ-বিদ্যাসংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দাবলী সম্পর্কে আমি কিভাবে চিন্তা করেছি তার একটা নমুনা রাখলাম।

CENTRAL LIBRARY

কথকতার পুঁথি

হরিপদ চক্রবর্তী

ক

কথা হইতে কথক শব্দ এবং কথক হইতে কথকতা। কথা শব্দটি কথকতার পূর্বরূপ হিসাবে—ভাগবতী কথা এই অর্থে রূঢ়। সাধারণ অর্থে কথক শব্দটির প্রয়োগ খুব একটা দেখা যায় না। 'মেয়েটি বড় কথকী'— এই ধরণের প্রয়োগ পাওয়া যায়, আদরার্থে বাক্-পটুত্বের ঘোষণায়। পাঠক শব্দটি এখন 'যে পাঠ করে' এই সাধারণ অর্থে সমধিক প্রচলিত হইলেও, আগে কিন্তু পাঠক বলিতে পুরাণ বা ভাগবত পাঠকারীকেই বুঝাইত। তাহা হইতেই 'পাঠক' এই পদবীর উদ্ভব।

কথক শব্দটির অভিধান-ধৃত অর্থ 'পুরাণাদির পাঠক।' আসলে কিন্তু কথকতা ও পাঠকতা দুইটি আলাদা বস্তু। কোন বিশেষ সংকল্প গ্রহণ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে—বিশেষ করিয়া ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে—পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতাদি সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পাঠ করা হইত। এখনও ক্বচিৎ হয়। এই ভাগবত পাঠ হইত সকালে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাঠ করিতেন। ধারক থাকিতেন একজন ব্রাহ্মণ—যাঁহার কাজ ছিল কোনদিক হইতেই পাঠ যাহাতে অশুদ্ধ না হয়, তাহা লক্ষ্য রাখা। আর থাকিতেন একজন শ্রাবক। গৃহকর্তা হয়ত শুনিতেন নিজে কিন্তু একজন করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রোতা রাখিতে হইত। পাঠক-ধারক-শ্রাবক—আনুষ্ঠানিক ভাগবত পাঠে এই তিনজনের আবশ্যক হইত। পূর্বানুষ্ঠিত এই ভাগবত পাঠে—কেবল গ্রন্থখানি পড়া হইত—কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হইত না।

আর এক ধরণের ভাগবত পাঠ ছিল ব্যাখ্যান। অর্থাৎ ভাগবত পাঠ করিয়া ভাষাতে কিনা বাংলাতে নানাদিক হইতে তাহা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হইত। এইটি সান্ধ্য অনুষ্ঠান। হয়ত সেন আমল হইতেই ইহার প্রচলন হইয়া আসিবে। মহাপ্রভুর সময় ও পরবর্তীকালে ইহার গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই ব্যাখ্যানমূলক সান্ধ্য ভাগবত পাঠ হইতেই এককালে—খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতকে—বর্তমান কথকতার উদ্ভব হইয়াছিল। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস' গ্রন্থে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রচলিত বাংলা দৃশ্যকাব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে আছে—

পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর ॥
কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর ॥

দাশরথি যেমন প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী সংস্কার করিয়া নূতন ঢং-এ পাঁচালী বাঁধিয়াছিলেন, হয়ত তেমনি কোন ভাগবত পাঠক—ভাগবত কাহিনী ব্যাখ্যার সঙ্গে গান ছড়া, আবৃত্তি প্রমুখ নানা জনচিত্তরঞ্জক কাহিনী ও ঢং-এর মিশ্রণ ঘটাইয়া কথকতার প্রচলন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে।

বিশ্বকোষ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করা যাক—'এখন বাংলায় যেরূপ কথকতা চলিত আছে, তাহা বেশিদিনের কথা নয়, বড়জোর শতাধিক বৎসর হইতে পারে। এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়া থাকে দুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্তক, সেই দুইজনের নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্ধমান জেলায় সোনামুখী গ্রামে বাস করিতেন। রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য। সকলেই প্রায় তাঁহার

CENTRAL LIBRARY

রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করিয়া থাকেন। রামধন গোবরডাঙ্গা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ·····কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী স্থানের কথকেরা রামধনের সাট অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।

'কথকতার সাটকে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবশ্যকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা—ভী-উ = ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে তাহাকে চূর্ণক কহে। চূর্ণী ছাড়া কথককে রাত্রি বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা, গ্রীষ্ম বর্ণনা, বসন্ত বর্ণনা, দেশ বর্ণনা, বেশ্যা বর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়; বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বর-ই অধিক। কথকতা কালে আবশ্যকমত বর্ণনা প্রয়োগ করিতে হয়।' [বিশ্বকোষ, পৃঃ ৫০]।

কথকতার উৎস, আঙ্গিকাদি সম্বন্ধে ভারতকোষ গ্রন্থে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে কথকতার পশ্চাদ্‌ভূমিটির উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত হইয়াছে।

কথকতার মধ্যে মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় আখ্যান গ্রহণ করা হইত প্রথম দিকে, তারপর ক্রমশঃ মহাভারত ও রামায়ণের আখ্যান গৃহীত হইতে থাকে। কোন্ কোন্ পালাগুলি জনপ্রিয় ছিল তাঁহার একটা চমৎকার নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক কালের পাঁচালী যাত্রা [এবং শেষের দিকের পৌরাণিক নাটকের] বিষয়বস্তুগুলির তালিকা দেখিলে। কালপ্রবাহে জনজীবনের অন্যতর সাহিত্য-শিল্প হিসাবে যাত্রাগানের বিষয়বস্তু আহরণে ও প্রয়োগপদ্ধতিতে যে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে—জনসাহিত্য শাখার (কবিগান তর্জা, মালসহের গম্ভীরা, আলকাপ ইত্যাদি লোকসাহিত্য বাদে) পাঁচালী বা অন্য কোন ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। কথকতাতে এই পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা কম। আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বেশভূষা, আচার-আচরণ, ঘটনাবলীর প্রতি কথক তির্যক দৃষ্টিপাত করেন বটে, কিন্তু কাহিনীর অঙ্গ হিসাবে নয়।

বিশ্বকোষের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে কতগুলি নির্বাচিত শ্লোক বা অংশ কথককে মুখস্থ রাখিতে হইত। এই গুলি সাট বা সংলাপ লেখন। কোন বিশেষ ব্যাখ্যার জন্য গোছানো লেখাকে বলে চূর্ণী অর্থাৎ টীকা। এইগুলির জন্য—'বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথি থাকে।' কোন পণ্ডিত কথক হয়ত এইগুলি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিতেন বা রচনা করিতেন। পুঁথিতে সমাদৃত এই লেখা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে প্রচারিত হইত। নানা প্রকারের ও বিচিত্র বিষয়ের এই পুঁথিগুলি দুর্লভ না হইলেও ইহার সংগ্রহ এবং প্রকাশ প্রচেষ্টা বেশি হয় নাই।

সব পুঁথির নকলেই ভ্রমপ্রমাদ থাকে। এইসব ক্ষেত্রেও তাহা আছে। বর্ণাশুদ্ধি ছাড়া-ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ তৎসম পদের মিছিলের মধ্যে, এক আধটা শব্দ খণ্ডিত বা অতিরিক্ত হইলে—দ্রুত আবৃত্তির পক্ষে যতিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকে। বস্তুতঃ কথকতার সাটগুলি পড়িবার নানা ঢং আছে, সুর আছে, বিশেষ একপ্রকার নাটকীয় ভঙ্গী আছে। সেটি আয়ত্ত না করিতে পারিলে—আঠারো হাত দক্ষিণী শাড়ী বাঙ্গালী ভঙ্গীতে পরিধান করিতে গেলে পদে পদে স্খলন ও হোঁচটের সম্ভাবনা। এইসব পুঁথির মধ্যে বিভিন্ন সুরতাল বিশিষ্ট প্রাচীন কিছু কিছু সংস্কৃত ও বাংলা গান পাওয়া সম্ভব। যাহোক এই কথকতার বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বেশি বিলম্ব হইলে সুযোগ সুলভ নাও হইতে পারে।

খ

কথকতার পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানিনা। চোখে পড়ে নাই। তবে পুঁথি অনেক পাওয়া যাইতে

CENTRAL LIBRARY

পারে। এমন একখানি পুঁথি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। সেই পুঁথিখানি হইতেই কথকতার বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করিতেছি।

পুঁথিখানি আমাকে দিয়াছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক ও গবেষক স্বর্গত অধ্যাপক ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য নিজস্ব সংগ্রহ ভাণ্ডার হইতে। বৈদিক সংস্কৃতের গবেষক বিমানচন্দ্রের এই বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। পুঁথিখানিতে কোন নাম নাই বা পরিচয়বাচক স্থানকালের কোন উল্লেখ নাই। বিমানচন্দ্র কৃষ্ণনগরবাসী ছিলেন। আমার ধারণা গ্রন্থখানি কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ অঞ্চল অর্থাৎ নদীয়া জেলা হইতে সংগৃহীত।

পুঁথিখানির আয়তন ১২ ইঞ্চি×২ ইঞ্চি। কাঠ নির্মিত মলাট। তুলোট কাগজে লেখা। নানা রকমের কালি আছে। একাধিক হস্তাক্ষর থাকিলেও মূল পুঁথি মোটামুটি একহাতের লেখা। সুস্পষ্ট সুবোধ্য হস্তাক্ষর দৃষ্টে অনুমান উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিপি করা হইয়াছে। মধ্যে চিরকুট আছে দুইতিনটি নানা কাগজে ও কালিতে এবং একাধিক ব্যক্তির হস্তাক্ষরে। দুইটির নিদর্শন দেওয়া যাক। একটিতে টাকার হিসাব। অপরপৃষ্ঠে এই শ্লোক

বিঘ্ন বিনাশন তারয় কৃপনং
বারয় ২ যমপুর গমনং
ভবভয় ভঞ্জন নরক নিবারণ
দরশয় ২ নবঘন বরণং ॥

অপরটিতে এই বাক্য—'পরম ধার্ম্মিক ইষ্টনিষ্ঠ প্রকৃতির্দয়ালুর্দানশীলান্তঃকরণ সরলমতিশয় শুদ্ধবুদ্ধি ধীরবীর গুরুস্তাবক প্রবল কুলোদ্ভব দোর্দণ্ডগণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্পাজ্জলদঙ্গারোপম'—

একটি সূচিপত্র আছে—দুই দিকটা ছেঁড়া। অনুমান ১২৩ খানি পাতা ছিল মূল পুঁথিতে। কিন্তু ১২, ৪০, ৪১, ৫০, ৭০, ৭৮, ৮৯, ৯০, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০—পাতায় মোট ১৭ খানি পাতা পাওয়া যায় না। কিন্তু অতিরিক্ত পত্র আছে ২৭ খানি, কোনটি বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কের ক্রোড়পত্র লেখা (৮৬ ও ৯২ পৃষ্ঠাতে দুইখানি করিয়া ক্রোড়পত্র) কোনটি বা একান্তভাবে বর্জিত। এই ২৭ খানি পত্রের বেশির ভাগের কাগজ-কালি আলাদা এবং লেখাও অন্যান্য হাতের। কিছু পুনরুক্তি আছে। আবার হয়ত হারানো পত্রগুলির বিষয়বস্তু নূতন করিয়া লেখা হইয়া থাকিবে কোথাও।

সূচীপত্রের বিবরণ এইপ্রকার। একটি পত্রের দুই পৃষ্ঠে লেখা। প্রথম পৃষ্ঠাতে আটটি বিভাগ, বিপরীত পৃষ্ঠে সাতটি। সুরুতে বামদিকের প্রথম বিভাগটি অর্ধ ছিন্ন এবং উপরের দিক-ও খানিকটা ছেঁড়া। দ্বিতীয় বিভাগ: কালীবর্ণনা সমাপ্ত—১৫; মহাবিদ্যা বর্ণনা—১৬; দুর্গার স্তবারম্ভ—১৭; দুর্গার স্তব সমাপ্ত—১৮; কৃষ্ণবর্ণনা—১৯। তৃতীয় বিভাগ: শ্রীরামবর্ণনা সমাপ্ত—২২; শ্রীরামের স্তবারম্ভ—২৩; শ্রীরামের স্তব সমাপ্ত—২৪; লক্ষ্মণের বর্ণনা—২৫; সীতা বর্ণনা—২৬। চতুর্থ বিভাগ: রাবণ বর্ণনা—২৭; বেশ্যা বর্ণনা—২৮। বেশ্যা বর্ণনা সমাপ্ত—৩১; পরিক্ষিতের বর্ণনা আরম্ভ—৩২; পরিক্ষিতের বর্ণনা সমাপ্ত—৩৩। পঞ্চম বিভাগ: নারদ বর্ণনা সমাপ্ত—৩৮; পুষ্পোদ্যানের বর্ণনা—৩৯; বনবর্ণনারম্ভ—৪০; বনবর্ণনা সমাপ্ত—৪১; পুষ্পবর্ণনা ও পক্ষীর নাম ও জন্তুবর্ণনা—৪১/৫। ষষ্ঠ বিভাগ: প্রভাত বর্ণনা ও রবি মহাশয়ের যাত্রা—৪৩, পুনঃ প্রভাত বর্ণনা আরম্ভ—৪৪; প্রভাত বর্ণনা সমাপ্ত—৪৫; মধ্যাহ্নকাল বর্ণনা—৪৬; সায়ংকাল বর্ণনা আরম্ভ ও সমাপ্ত ৪৭-৪৮/সপ্তম বিভাগ: পূর্ণিমা রাত্রি বর্ণনা—৪৮; অন্ধকার রাত্রি বর্ণনা—৪৮; ইন্দ্রপুরী বর্ণনা—৪৯; পুরী বর্ণনারম্ভ—৫০; পুরীবর্ণনা সমাপ্ত—৫৩; পুর বর্ণনা—৫৪।

CENTRAL LIBRARY

অষ্টম বিভাগ: অস্পষ্ট ও ছিন্ন: যজ্ঞবর্ণনা ও দেশবর্ণনা—৬০; দেশ বর্ণনারম্ভ—৬১; দেশবর্ণনা ও দ্রব্যের আয়োজন ৬২; সন্দেশের নাম—৬৩। বিপরীত পৃষ্ঠার প্রথম বিভাগ: খণ্ডিত ও অস্পষ্ট ৬৪-৭০। দ্বিতীয় বিভাগ: যুদ্ধ সজ্জা ও যুদ্ধ সজ্জা সমাপ্ত—৭২; রণস্থল ও যুদ্ধবর্ণনা—৭৩; শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনারম্ভ—৭৪, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা সমাপ্ত—৮৩; শ্রীকৃষ্ণের স্তবারম্ভ—৮৫; শ্রীকৃষ্ণের স্তব সমাপ্ত—৮৬। তৃতীয় বিভাগ: শ্রীহরিস্তবারম্ভ—৮৭; শ্রীহরিস্তব সমাপ্ত—৮৮; গোপালস্তব—৮৯; নারদকৃত কৃষ্ণের স্তব—৯০; শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু স্তব—৯১; নন্দসুতাষ্টকং—৯২; অস্পষ্ট। চতুর্থ বিভাগ: শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা কল্পবৃক্ষ স্তব—৯২; শ্রীরাধা বর্ণনা—৯৩; যশোদা বর্ণনা, যশোদার সখির নাম—৯৪; দ্বাদশ গোপালের নাম—৯৪; বলরাম বর্ণনারম্ভ ৯৫; বলরাম বর্ণনা ও স্তব - ৯৫। পঞ্চম বিভাগ: নৃসিংহ বর্ণনা—৯৬; বামন বর্ণনারম্ভ ৯৭; বামনবর্ণনা সমাপ্ত—৯৮; নারায়ণ বর্ণনা—৯৯, ঋষিদিগের বর্ণনারম্ভ—১০০; ঋষিবর্ণনা সমাপ্ত—১০১। ষষ্ঠ বিভাগ: শুকদেব বর্ণনা—১০২; গৌরাঙ্গ বর্ণনা - ১০৩; তীর্থের নাম বর্ণনা—১০৪; মেঘ বর্ণনা—১০৫; পুনঃ পুর বর্ণনা ও সরোবর ও পুষ্প ও বাদ্য অস্পষ্ট—১০৬। সপ্তম বিভাগ: মুখবন্দনা বর্ণন আরম্ভ—১০৭; মুখবর্ণন সমাপ্ত—১০৮; মহাদেব ও নারায়ণের যুগলস্তব -১০৯, গীতাবলী—১১০; মুখবন্দনা—১১৬; অস্পষ্ট।

বিষয়ানুসারে ভাগ করিলে—মুখবন্দনা, শিব-দুর্গা; রাম-লক্ষণ-সীতা-হনুমান-রাবণ; শ্রীকৃষ্ণ-রাধা-যশোদা-বলরাম; নারায়ণ-নৃসিংহ-বামন; পরীক্ষিত-নারদ-শুকদেব-গৌরাঙ্গ; নাম (ঋষি, ভূত, দেশ ইত্যাদি); নারী (বেশ্যা, মোহিনী ইত্যাদি); কাল (প্রভাত মধ্যাহ্ন ইত্যাদি); প্রকৃতি (বন পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি); পুর-সভা; রথ, যুদ্ধসজ্জা-রণস্থল; বাদ্যদ্রব্য; সন্দেশাদি; মনঃশিক্ষা ও গান—মোটামুটি এই পনরটি শিরোনামাতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। পুঁথির বিষয় সমূহের যথার্থ পরিচয় দিতে হইলে কি কি আছে ইহার মধ্যে কেবল তাহার তালিকা দিলেই হইবে না এবং যেহেতু কথকতার কোন পুঁথি মুদ্রিত নাই (—বা থাকিলেও তাহা একান্ত বিরল -) সেইহেতু বিষয়গুলির যথাযথ পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন অংশের ব্যাপকতর উদ্ধার বাঞ্ছনীয়।

মুখবন্দনা। প্রতি পালা ভাগবতপাঠের পূর্বে যে মাঙ্গলিক সংস্কৃত শ্লোকাদি দ্বারা ঈশ্বরাদির স্মরণ করা হয় তাহার নাম মুখবন্দনা। বিভিন্ন স্থান হইতে শ্লোক চয়ন করিয়া মুখবন্দনা রচিত। আলোচ্য পুঁথিতে দুইটি মুখবন্দনা আছে। হয়ত একই মুখবন্দনা রোজ আবৃত্তি করিলে একঘেয়ে হইতে পারে এই আশঙ্কায় অথবা আসর তথা শ্রোতৃমণ্ডলী লক্ষ্য করিয়া মুখবন্দনার সংযোজন-বিয়োজন পরিবর্তন করা হইত।

আলোচ্য মুখবন্দনা দুইটিতে তিনটি শ্লোক এক। প্রথমটিতে (১০৭ পৃষ্ঠা) যে ১৪টি সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে ৮ হইতে ১৪ পর্যন্ত ৮টি শ্লোক শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীকৃত ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা নামক টীকার উপোদ্ঘাত। দ্বিতীয়টির (১০৮ পৃঃ) শ্লোকসংখ্যা ২০। তাহাতে এই উপোদ্ঘাত বর্জিত ও প্রথমটির তিনটি শ্লোক যুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টির প্রথম চারিটি শ্লোক যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং আবার শ্রীচৈতন্য বন্দনা। প্রথমটি বিদগ্ধ মাধবের (১/২) অনর্পিত চরীং ইত্যাদি এবং তৃতীয়টি চৈতন্যচরিতামৃতের 'অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত ইত্যাদি (১/১৩) শ্লোক অর্থাৎ অতি পরিচিত সংগ্রহ। তারপর গণেশ, শ্রীহরি, তুলসী, শ্রীকৃষ্ণ (বর্হাপীড়াভি রামং ইত্যাদি) বন্দনা, ভাগবতাদির নাম স্মরণ—

'প্রহ্লাদ নারদ পরাশর পুণ্ডরীক ব্যাসাম্বরীষ শুকশৌনক ভীষ্মাদ্যান।
রুক্মাঙ্গদোদ্ধব-বিভীষণ-ফাল্গুণাদীন্ পুণ্যানিমান্ পরম ভাগবতান্ নমামি॥

তারপর ব্যাসদেব, শুকদেব, গঙ্গা, তুলসী, ভাগবত মহিমা, বাঞ্ছা কল্পতরু ইত্যাদি শ্লোক, 'নমো ধর্মায় বেধসে'—ইত্যাদি

CENTRAL LIBRARY

শ্লোক, নারায়ণং নমস্কৃত্যাদি শ্লোক, সরস্বতী প্রণাম, হরিভক্তিপরায়ণ শ্লোক—'হরিভক্তি পরা যে চ হরিভক্তি পরায়ণাঃ। দুরুজ্ঞাবপি সম্বৃত্তা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

এবার প্রতি পর্যায়ের পরিচয় দেওয়া যাক। গণেশ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শিব সম্বন্ধে মোট সংগ্রহ আছে ১৮টি। গদ্য-পদ্য ছাড়া সংস্কৃত স্তবস্তুতি-ও আছে—শিবাষ্টক, নীলকণ্ঠ স্তব, দক্ষোক্ত স্তব, প্রসূতিকৃত স্তব, নন্দীকৃত স্তব। ছুট্ সংস্কৃত পদযুক্ত বর্ণনা-ও সুন্দর। শিববর্ণনা—[পৃঃ ১-২]

শৈল রজত কলেবর সুললিত চরণ-নূপুর রণ-রণ রব জঘন দ্বীপচর্মাম্বরোত্তরীয় সরসীরুহদল নিন্দিত বদন সুশোভন সুরগণবন্দিত ধারাধরমিব জটাকলাপ পারিজাত পরিপূজিত নীরদ স্মরহর চরণ-বিনিন্দিত গঙ্গা ডিমির ডিণ্ডিমধর ভয়ংকর ভূতনাথ হে।

তপোরূপং তপোবীজং তপসাং ফলদং শিবং
ত্রিশূল পট্টিশধরং ত্রিনেত্রং করুণার্ণবং।
ব্যাঘ্র চর্মাম্বরং ধরং বৃষভস্থং দিগম্বরং
নাগোপবীতং জটিলং দেবদেবং জগদ্গুরুং
গঙ্গাধরং দদর্শাগ্রে নীলকণ্ঠং বৃষধ্বজং।

কিবা রজতশৈল কলেবর সুললিত মরকত নিন্দিত নখর নিশাকর নিন্দিত বর জঘন বিরাজিত ব্যাঘ্রচর্ম পরিধায়ী কিবা মস্তকে জটাভার তাতে গঙ্গা ত্রিভঙ্গা তরলতরঙ্গা কুল কুল ধ্বনি করিতেছেন।

ভগবতীর বর্ণনা আছে দুইটি। একই ঢং—গদ্য। একটি (পৃঃ ১১)—

স্থলদলকোমল চারুচরণতল স্তাক্ তারুণ কিরণোপরি পূর্ণচন্দ্র জিক্ নখচন্দ্র চরাচর কোশীকৃত চন্দ্রিকা চুম্বনার্চক জনচিত্ত চকোরোপরি নূপুরাদ্যাভরণ রুচির স্বর্ণকরিকরোপ মিতোরুদেশ শোভাতিশয় বিপুল নিবিড় নিতম্ব লম্বীকৃত কিঙ্কিণী কুলীকৃত শোভা দেবীবিম্ব বিড়ম্বিত ক্ষীণ-মধ্যদেশ ত্রিবলী বিরাজিত রোমাবলী স্থল মৃণালোপরি বিধি রচিত মহারজতারবিন্দ স্তনজুগ্ম কুটালোপরি দোদুল্যমানা বনমাল্য পঙ্কবিড়াম্বিতোষ্ঠাধরাম্বর দন্তপাতি মৃদু মধুর মন্দহাস্যযুক্ত মুখ পঙ্কজ ভ্রমৎ ভ্রমরগণ কোলাহল কম্পিত কুন্তল কর্ণাবধি চক্ষুর্দ্বয়ান্তর্বর্তি নাসিকাগ্রে গজমৌক্তিকাবলম্বিতোষ্ঠাধর ভালে নেত্রাগ্নি চন্দ্রাদধনু বিনিন্দিত ভ্রূভঙ্গী ভালবর্তি লোচনোপরি সিন্দুরবিন্দু তদুপরি কনকপত্রিকা তদুপরি কেশপাশ তাহে বন্ধ পারিজাত মল্লিকা একে জন্ম হিরন্ময়ী তাতে পট্য দুকূলবসনী অমরগণ পূজ্য ত্রিভুবন পূজ্য জগদুদয় স্থিতিলয়কারিণী ভবানী ভবভয়ভঞ্জিনী গণেশজননী বসে আছেন।

কালী বর্ণনা আছে দুইটি। একটি গদ্য, অপরটি পদ্য। গদ্যটির রচনাভঙ্গী শব্দযোজনা ও পদবিন্যাস ভগবতীর বর্ণনার অনুরূপ। পদ্যটি (পৃঃ ১৫) উল্লেখযোগ্য।

রক্তোৎপলদল নিন্দিত পদতল নববরবি নিন্দিত আভা। স্বর্ণবিনির্মিত নূপুর রঞ্জিত ওড্র ফুলে কত শোভা॥
রম্ভাস্তম্ভকৃত জানু সুশোভিত অতিশয় নিবিড় নিতম্বা। করাম্বাম্বর বরকর স্বরবরমাত্র কৃতা জগদম্বা।
মধ্য সুবঙ্কিম ক্ষীণকেশরিসম ত্রিবলী জঠর ত্রিভঙ্গ। পীনপয়োধর শঙ্কর মনহর অঞ্জন নিন্দিত অঙ্গ॥
মস্তক শত শত দৈত্যবিনাশিত সুন্দর শব শিরহারা। অসুর বিখণ্ডিত তুণ্ড বিঘারিত অসিবরধারিণী তারা॥
কর কর পঙ্কজ অভয় করাম্বুজ মুখ দ্বিজ নিন্দিত আভা। দন্ত ভয়ঙ্কর রসনাড়ম্বর চর্বিত শোষিত শোভা॥
তিল ফুল পরিমিত নাসাশোভিত মর্কটবিহিত ত্রিনেত্র। গ্রন্থি বিমোচিত চিকুর পদানত শোভিত অঙ্কিত গাত্র॥

CENTRAL LIBRARY

ত্রিভুবন পাবিত সুরগণ বন্দিত দর্শিত চরণ মাহাত্ম্য। পদযুগ পর্শিত কত কত শত শত শব সব প্রাপ্ত শিবত্ব॥

মহাবিদ্যা বর্ণনা (পৃঃ ১৬), দুর্গাস্তব (পৃঃ ১৭), ভবাস্তষ্টকের অংশ (পৃঃ ১৮) আছে। ভগবতী পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্রমের প্রথম দুইটি শ্লোক আছে (পৃঃ ১৮) কিছু পাঠান্তরিত। প্রথম শ্লোকটি এই রকম—

অয়ি গিরি নন্দিনি নন্দিত মেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দিসুতে।
গিরিবর বালিকে ত্রিভুবন পালিকে বিশ্ব নিবাসিনি জিষ্ণু সুতে।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ কুটুম্বিনি ভূরি কুটুম্বিনি ভূরিকৃতে
জয় ২ হে মহিষাসুর মর্দ্দিনি রম্য কপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥

সংস্কৃত মিশ্র বাংলা শব্দে ও ছন্দে পনরটি শ্লোকে রচিত হরগৌরী বর্ণনাটি (পৃঃ ১৯) উপভোগ্য। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক উদ্ধার করি :

কিবার্দ্ধঙ্গ শ্বেতঃ কিবার্দ্ধঙ্গ পীত।
পদৌ রক্তপদ্মৌ জবাপুষ্প ভীত॥১
কিবা ব্যাঘ্র চর্মঃ কিবা রক্তবস্ত্রঃ।
দৃষ্ট্বা শশির্মাল ভয়ে যাতিরস্ত॥২

* * *

ততো দক্ষনেত্রে পতীতাশ্রু ধারা।
প্রমানন্দ যুক্ত দদর্শে সগীরা॥৯

* * *

হরগৌরী বামে জয়া মাল্য হস্তা।
সমীপে চ নন্দী জবাপুষ্প হস্ত॥১৫

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান ও রাবণ—এই পাঁচটি চরিত্রের বর্ণনা আছে রামায়ণ কাহিনী থেকে। বাংলা গদ্যে রামের বর্ণনা আছে মোট চারটি, তাহার মধ্যে দুইটি পুনরুক্ত। সংস্কৃত স্তব আছে তিনটি—একটি পুনরুক্ত। বাংলা গদ্য (পৃঃ ২০)—নবনীলকমলদল সজ্জিত চরণারবিন্দদ্বন্দ্বে দীপশিখাবদুজ্জ্বল মণি-মাণিক্যাদি যুক্ত নূপুর ধ্বনি করিতেছে'—ইত্যাদি চালে লিখিত। বিখ্যাত শিবাষ্টক স্তোত্রের অনুকরণে রচিত সংস্কৃত রামাষ্টক স্তোত্রটি চমৎকার :

রঘুবংশ সরোরুহ চন্দ্রকরং করসংধৃত ভূষণ চাপ ধরং।
সুর বন্দিত সুন্দর পাদযুগং প্রণমামি সদা রঘুরাজ সুতং॥

লক্ষ্মণ বর্ণনা দুইটি দুই হাতে ও দুই কালিতে লেখা হইলেও অবিকল এক। জানকী বর্ণনা দুইটিও পুনরুক্ত। লক্ষ্মণ বর্ণনার (পৃঃ ২৫) মধ্যে কথকতার সুদীর্ঘ সমাসযুক্ত বিলম্বিত ভঙ্গী ছাড়াও বলরামের উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ লক্ষ্মণ যে পরজন্মে বলরাম হইয়াছিলেন এমন ধারণা সুস্পষ্ট। যথা—'সম্তপ্ত কনকপুঞ্জ সজ্জিত রূপ লক্ষ্মণ····· মুক্তা ফল বিনিন্দিত দন্তাবলি বিম্ববিড়ম্বিত ওষ্ঠাধরান্ত বিকশিত স্মিত সুন্দর বর কলেবর সুদীর্ঘ কর কার্ম্মুক প্রখরতর শরধারী নীলাম্বর পরিধান নীলাম্বর নিবদ্ধ মধ্যদেশাবলম্বিত হলীব ভবপদ নির্ভর কম্পিত হত তলাতল সুতল মহাবল পরাক্রান্তান্ত লক্ষ্মণ।'

হনুমান বর্ণনা দুইটিও পুনরুক্ত। রাবণ বর্ণনা একটি গদ্যাংশে (পৃঃ ২৭) লিখিত। 'নীল পর্বতাকার ঘোর

CENTRAL LIBRARY

ভয়ানক দশ মুখ বিংশ ভুজ বিংশতি চক্ষু ওষ্ঠ কলিকের ঘূর্ণায়মান গর্ব্বৈশ্বর্য মদমত্ত মহাবল পরাক্রান্তাস্তান্তক দর্প দলন দোর্দ্দণ্ড খণ্ড চণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত পঞ্চানন ভক্ত……ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পদ সর্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় ২৭।২৮টি। তাহার মধ্যে ১৭।১৮টি সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রের সংকলন। শ্রীকৃষ্ণরূপ বাল্য কৈশোরাদির বর্ণনা বাংলা গদ্যে। বাংলা গদ্যে ও সংস্কৃত তড়িদ্গতি ছন্দে রচিত একটি রূপ বর্ণনা আছে। নমুনা বাংলার—

ধ্বজ বজ্রাংকুশ চিহ্নিত চরণ। গজগতি গর্হিত সুন্দর গমন॥

চরণ রণন্মণি নূপুর যুক্ত। সর্ব্বজনাশ্রয় কর্ম্মবিমুক্ত।—প্রভৃতি সাতটি শ্লোক।

তড়িদ্গতি ছন্দে পঞ্চ শ্লোকাত্মক সংস্কৃত কবিতায় কৃষ্ণরূপ বর্ণনার নমুনা—

অভিনব ঘন ঘন চিক্কণ বরণ দর্শন নিন্দি বিশেষং

কিবা দলিতাঞ্জন ত্রিভুবনমোহন অপরূপ মোহিত বেশং॥ ইত্যাদি

নারায়ণের রূপ বর্ণনা একটি বাংলা গদ্যে এবং নৃসিংহ বিষয়ক দুইটি—একটি সংস্কৃতে ও একটি বাংলা গদ্যে সংকলিত হইয়াছে। বামন সম্বন্ধে দুইটি-ই বাংলা গদ্য। বলরাম সম্বন্ধে তিনটি অংশ আছে, একটি সংস্কৃত স্তব আর দুইটি বাংলা গদ্য। যশোদা ও রাধার বর্ণনা এক একটি করিয়া বাংলা গদ্যে। রাধা বর্ণনার প্রথমাংশ প্রচলিত রূপ বর্ণনা—শেষাংশ মহিমাজ্ঞাপক। যথা (পৃঃ ৯৩)—'রক্তোৎপলদল চারুচরণতলনিন্দিতচম্পককলিকের পাদাঙ্গুলীর শোভা……ব্রজজনমনোহারিনী কৃষ্ণ ভক্তিদায়িনী নবরত রতি রঙ্গিনী মুরহর মনরঞ্জিনী শমনগমনবারিনী দাস্য ভক্তি-দায়িনী কাল যাপনা করিতেছেন।

ভাগবতী কথার মূল শ্রোতা পরীক্ষিৎ। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের পাঁচটি (পৃঃ ৩২-৩৪) বর্ণনা আছে। বাংলা গদ্যে রচিত, মোটামুটি একই ধরণের। একটির নমুনা দেওয়া গেল। এই গদ্যাংশ আবৃত্তির পর বোধ হয় কথক গভীর আর্তিসূচক গান গাহিতেন।

রাজা পরিক্ষিৎ দারুন ব্রহ্মশাপ ভয়ভীতাঙ্ক হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশী মুনিচয়েতে বেষ্টিত শুক মুখোদ্গলিত হরিকথা পানোন্মত্ত চিত্ত রাজা শুকচরণারবিন্দদ্বন্দ্ব হস্তদ্বয়ে ধারণ করি সজল নয়নে ম্লান বদনে বাষ্পকুলাক্ষরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রভো আমি পাণ্ডবের চন্দন বনে কণ্টক দ্রুম জন্মিয়াছি আমার পূর্ব পিতামহ অর্জুন ব্রাহ্মণ বাক্যে সম্বৎসর বনবাসি আমি সেই বংশে কুলাঙ্গার জনমিয়াছি অদ্যাপি পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কি বস্তু তা জানিলাম না অজ্ঞান প্রযুক্ত বিবিধ শাস্ত্রবাদী সমিক মণি তাঁর কণ্ঠদেশে নিরপরাধে ধনুকাগ্রভাগে করি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছি সেই মণিবর তনয় স্বস্থির অভিশম্পাত গ্রস্ত হইয়া সপ্তাহ মধ্যে যমভয় দরশন করিব আর কাল নাই আমায় পবিত্র কর।

ভাগবতের বক্তা শুকদেব সম্বন্ধে দুইটি বাংলা গদ্য বর্ণনা এবং একটি গদ্য বর্ণনা (১০২ পৃঃ) আছে। ক্রোড়পত্রে শুকদেবোক্ত একটি কৃষ্ণ স্তব আছে (পৃঃ ১১৮)। শুকদেব বর্ণনা (পৃঃ ১০২)—'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য মণিবর দিগম্বর শিরসি অমল জটাধর শত শত মধ্যাহ্ন সূর্যরক্ত কলেবর সর্বেন্দ্রিয় জয় পুরস্বর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত সত্য স্বভাব বাহুদ্বয় মূলে শঙ্খ চক্রাঙ্কিত বাহ্যজ্ঞান রহিত উন্মত্ত ইব ব্যাসনন্দন শুকদেবো জয়তি।

নারদ সম্বন্ধে পাঁচটি বাংলা গদ্য ও সংস্কৃত দুইটি বর্ণনা আছে। বাংলা গদ্যের মধ্যে আসলে দুইটি পুনরুক্ত, কাজেই গদ্য তিনটি। তিনটির সঙ্গেই সংস্কৃত গীত সংযুক্ত আছে। একটি সংস্কৃত গদ্য অপরটি সংস্কৃত বর্ণনা। গদ্য সংস্কৃতটির শেষাংশ সংস্কৃত গান। একটি বাংলা বর্ণনার নমুনা (পৃঃ ৩৭)।—

CENTRAL LIBRARY

সূর্যচণ্ডঃ প্রতাপৈঃ কবলিত দশদিগেত্যাদি সময়ে নারদ গোস্বামী স্বর্গ গঙ্গাতে গঙ্গাস্নানাবগাহন করে বাম হস্তে ত্রীতন্ত্রী বীণা হরি গুণ-গানে অতি শুতান পুলকবিরাজিত গাত্র নিশ্চিত নেত্র ছল ছল নয়ন যুগলে প্রেম জল অতি নির্মল পড়িতেছে আর কথেছেন বীণা একবার জদুনাথের গুণ গা রে তখন বীণা কথেতেছে আমি যন্ত্র আপনি জন্ত্রী জেমং আজ্ঞা করিবেন আমি আজ্ঞানুকারী আছি বলি কতেছেন। ভজে ব্রজেশবালকং গলাভিলম্বিতমালকং মখাম্বুজ ব্রজাঙ্গনা বিলোল তুলি জালকং।.....

সংস্কৃত পদ্য বর্ণনা আটটি শ্লোকে। নমুনা—

শুক্ল বর্ণ তনু পিঙ্গল জটিলং
উর্দ্ধ পুণ্ড যুতমলকা কুটিলং ॥১
সুললিত রাজিত চন্দন তিলকং
তেজোময় রবি মণ্ডল সদৃশং ॥২

নামপর্যায়ের মধ্যে ঋষিগণের নামের তালিকা আছে তিনটি। দুইটি বাংলা গদ্য, অপরটি সংস্কৃত পদ্যের তেরটি চরণ। বাংলা গদ্যের একটি (পৃঃ ১০০) বার তেরটি বর্ণের অনুপ্রাসের মালা। যথা—

বাল্মীকি বটু বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব বিভাণ্ডক বৌধায়ন বীতিহোব্য বৃহস্পতি বার্হস্পত্য বাদরায়ণ। অত্রি অগস্ত্যারিষ্টনেমি অশিত অঙ্গিরা অষ্টাবক্র। পুলহ পঞ্চশিখ পর্বত পিপ্পলাদিক পুলস্ত বীতিহোত্র ধীত হারীত ত্রিত ত্রিগুণ তামস ধৌম্য উপধৌম্য ভরদ্বাজ ভৃগুর্ভার্গব গর্গগৌতম গার্গ্যায়ণ গালব। মার্কণ্ডেয় মাণ্ডক্য মাণ্ডব্য মরীচি মৈত্রেয় কুল্য লাগুল্য কশ্যপ কপিল কুশাস্ত্র ক্রতু কনাদ কাত্যায়ন চন্দ্র চাক্ষুষ শাণ্ডিল্য সরভঙ্গ সাবর্ণি সম্বর্ত সংখ সৌরভিরি সুকালি শতানন্দ সাগর নারদ নাট্যায়ন জহ্নু যাজ্ঞবল্ক জাবালি ইত্যাদি।

বৃক্ষ বর্ণনা আছে দুইটি বাংলা গদ্যে। দুইটি দেশের নাম তালিকা, একটি করিয়া তীর্থের নাম ও ভূতের নামের তালিকা। দেশবর্ণনা যদিও ৫৫ পৃষ্ঠা ও ৬১ হইতে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চারটি আছে, কিন্তু কমবেশি পুনরুক্ত বলিয়া দুইটি গণনা করা যায়। একটির উল্লেখ করিতেছি—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ মাগধ মৎস্য পঞ্চাল মাহিষ্ট্র সৌরাষ্ট্র দ্রাবীড় অবন্তী হস্তিনা কান্যকুব্জ ত্রৈলঙ্গ শূরশেন কামাখ্যা কাবল কান্ধার বিদর্ভ নিষেধ মাড়োআর কাশী নাগপুর চিন মাণপুর প্রমিলা মথুরা মোলতান সুতান আরব আজম রুম সাম তোরুক গুজরাট অযোধ্যা প্রয়াগ দেশ নেপাল কাশ্মীর কাঞ্চী গৌড় ওড্রীয় পাশ্চাত্য কৈদার্য্য ইত্যাদি নানা দিগ্দেশীয় রাজন্যবর্গ মন্ত্রিবর্গ সকলেতে আগমন করিতেছেন।

নারীরূপের বর্ণনা আছে কয়েকটি। ১২ পৃষ্ঠাটি নাই, ১৩ পৃষ্ঠার বর্ণনা খণ্ডিত। ১৮-৩১ পৃষ্ঠাতে বেশ্যা, কামিনী বর্ণনা দুইটি, একটি মোহিনী ও একটি নায়িকা বর্ণনা আছে। প্রায় একই ধরণের বিন্যাস। নারীরূপের প্রথাসিদ্ধ উপমানগুলির অনুপ্রাশিত সমাবেশ। বেশ্যা বর্ণনাটি এই—

কৃতসিত চরণার্পিত সিঞ্জন মনিময় নূপুরাদ্যাভরণাতিশয় বিপুল নিবিড় নিতম্ব ক্ষীণ-মধ্যদেশার্পিত কাঞ্চী ঘন জঘন লগ্ন মগ্ন বাতান্দোলায়মানারুণ কিরণ দেদীপ্যমান কঠিন করিকুম্ভ কুচ জুগলাবলম্বিত মণিময় হার ভারাতপ্ত কাঞ্চন কুঙ্কুম চন্দন হরিদ্রাদ্য শিরীশ কোমল মৃণালায়ত বাহুযুগল শোভিত স্বর্ণকণ্ঠ লৌহ বলয়াঙ্গুরী-অকাদি শোভিত কুঞ্চিত কুন্দ কুশম বস্ত্রস্থবতি মধুকরনিকরবৎ কৃষ্ণবর্ণ দন্তশ্রেণী পক্ক বিম্ববিড়ম্বিতোষ্ঠাধর তিলকুশমনাসিকান্দোলায়মান স্বর্ণশলাকাদীধিতি বিদ্যোতি তদিগ মখমণ্ডল বালকুরঙ্গ চপললোচনা প্রান্ত-ভাগবতি কন্দর্পকোদণ্ড ভ্রুভঙ্গাবিরত জাতী ফল দাড়িমশর্করা গুবাক এলাখদির স্বর্ণপর্ণাল্লযুক্ত মখ ললাট লুটীত

CENTRAL LIBRARY

রাহুচন্দ্র সূর্যবৎ কজ্জল সিন্দুর বিন্দুরমনী চিকুর বেষ্টিত মল্লিকামাল্যভূষণা গজেন্দ্রগমনা কোকিল-বচনা।

কালবর্ণনা পর্যায়ে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা ও অন্ধকার রাত্রির বর্ণনা আছে। পুনরুক্তি বাদ দিয়া প্রভাত বর্ণনা আছে তিনটি, সংস্কৃত (পৃঃ ৪৩), সংস্কৃত-মিশ্র-বাংলা (পৃঃ ৪৩) এবং বাংলা গদ্য (পৃঃ ৪৪-৪৫)। সংস্কৃত একটি পদ্যশ্লোক, বাংলাটি খুব বড়। সংস্কৃত মিশ্র বাংলা মাঝারি। এইটি উল্লেখ করা গেল ও মধ্যাহ্ন বর্ণনা আছে তিনটি। একটি সংস্কৃত শ্লোক এবং দুইটি বাংলা বর্ণনা (পৃঃ ৪৬)। সায়ং বর্ণনা সংস্কৃত তিনটি শ্লোক— তাহার মধ্যে একটি পুনরুক্ত ও বাংলা একটি (পৃঃ ৪৭-৪৮)। পূর্ণিমা রাত্রি একটি সংস্কৃত শ্লোক কিন্তু অন্ধকার রাত্রির বর্ণনাটি ছয়টি সংস্কৃত মিশ্র বাংলা শ্লোক গ্রথিত (পৃঃ ৪৮)। নমুনা দেওয়া গেল।

প্রভাতকাল বর্ণনা :

কিবা ত্রিজামাবশানে শারীশুকপিক কপোত কলবিঙ্ক শিখীমথ শকুন্ত নিকরম্ভ-সংকোচিত প্রবোধিত নিখিল জগৎ প্রাণাধিক চক্রমপাগতা চক্রী চঞ্চুপরিনিহিত চঞ্চু চরণ-লিখিতা ভূভাগা নিজানন্দ প্রকাশয়ন্তি সুচিচীতি শান্তি স্মেরাননা নবাঙ্গনা শয়ন পার্শ্বস্থ পতিসয়নাবলোকন খিন্নমনা ললনা কুঞ্জ প্রোষিত প্রিয়া-পয়োবিনন্দন ম্লানীক্ষণ ম্লানমণী কুমুদ্বতী পতিধ্যান পরা সতীর পদ্মিনী দৃষ্টুকাম গদগদ রাগরঞ্জিত দিঙ্মণ্ডলোদ্য দিনকর কুঙ্কুমারুণ-কর পস্পর্শ প্রমোদ বিগত বিন্দনী কিবা ব্রহ্মচারী গৃহমেধী বাণপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণ প্রাতঃকৃত্যাদিসমাপন পূর্বকাবগাহনার্থী সরিৎ সরোবরে অনিরে যাতি অতিথি-স্থিত বাসং ত্যজতি জনস্তকলদবস্তকল সকল বালক স্তন্যাদিকামো দেহিদেহীত্যাস্ফুট গদগদং রৌতি।

অন্ধকার রাত্রি বর্ণনা :

নিশীথস্তমিশ্রা নিবীড়াতি ঘোরা। ভয়ানকা জন্তুযুতা গভীরা॥
ঝাঁ ঝাঁম্বিতা ঝিল্লিরব মধুরা। চক্রং বিনা চক্রী হতাশ কারা॥ ইত্যাদি

বন, উদ্যান, সরোবর, সরোবরতীরে পুষ্পোদ্যান বর্ণনা আছে কয়েকটি কিন্তু ৪০-৪১ পৃষ্ঠা না থাকাতে অনেকখানি খণ্ডিত। অন্য হস্তাক্ষরে অতিরিক্ত পত্রে বন বর্ণনা আছে বাংলাতে একটি। সরোবর বর্ণনা ও সরোবরতীরে পুষ্পবর্ণনা একটি সংস্কৃতে আর দুইটি বাংলা গদ্যে (পৃঃ ১০৬)। এই বর্ণনা আসলে কোথাও ফুলের, কোথাও বৃক্ষের, কোথাও পাখীর দীর্ঘ তালিকা মাত্র এবং আবৃত্তির সুবিধার জন্য অনুপ্রাস অলংকারে শোভিত। যথা উদ্যান বর্ণনা (পৃঃ ৪২)—

উদ্যানের শোভার পরিসীমা নাই দীর্ঘেপ্রস্থে চতুর্থ চতুর্থ ক্রোশ চতুর্ভীতে বঞ্চুল কত্রীক মঞ্জুল হইয়াছে স্থানে ২ কচারি পরিসোধিত বিবিধ বিটপী স্থানে ২ সরোবর জলস্থাদি নির্মিত নানা জাতীয় পাদপ ফলবান পুষ্পবান এবং ফলকুসুম শূন্য রশাল তাল তমাল শাল বড়াল হিন্তাল প্রিয়শাল পিয়াল সুজাল নেবাল শ্রীফল বকুল সরল কুরল গরল হিজোল পাঁদুল শতসার অশার মন্দার কর্ণিকার কোবিদার অর্জুন খর্জুন রক্তচন্দন চন্দন হারীশ কীশঙ্কুশ নিরীশ গুম্বর ডুম্বর নাকুর কদম্বকেলি কদম্ব নিম্ব সিংশপা বিপনা তিলক পিচুক গুবাক নাক বিভীতক দাতক আম্রাতক অশ্বত্থ কপিত্থ ধব সাধব সাকোট বট নাকোট আমলকী কেকী হরিতকী মল্লিকা কাষ্ঠমল্লিকা লতামল্লিকা চন্দ্রমল্লিকা ঝুমকা সেফালিকা পাটল দুলাল দেশদুলাল ধস্তুর কনকধস্তুর আকুন্দ কুন্দ মচকুন্দ কেশর নাগকেশর নাগেশ্বর রজনীগন্ধ সুগন্ধ যোজনগন্ধ গন্ধরাজ ভীমরাজ আবন্তী জয়ন্তী জুগান্তী নন্দাবর্ত করবীর যুথিকা সোগন্ধিকা গুড় বজ্রজবা বক বাসক অর্ক অশোক কিংশুক বল্লীক দন্তিক শত-পুত্রক জাতীজুতী মালতী সেউতী পীউলি বাস্তুতি সীতা অপরাজিতা তরুলতা লবঙ্গলতা মাধবীলতা ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY

কথকতা ভাগবতী কথা। মূলতঃ কৃষ্ণভক্তির তথা ঈশ্বরের দিকে চিত্ত আকর্ষণ করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সব প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা প্রসঙ্গে কিভাবে কথক ভক্তির দিকে বর্ণনাকে প্রবাহিত করেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

নদী কূলস্থ বৃক্ষশাখা পল্লবাদিযুত প্রচণ্ড বায়ু বেগেতে ইতস্তত ভ্রমণেতে যেমত অস্থায়ীরসং সংসারীয় লোকসকল প্রতিনিয়ত চিন্তা সমুদ্র কল্লোলে ঘূর্ণিতমনা হয়্যা করস্থ অমূল্যরত্ন তুল্য গোবিন্দ নামাবলী স্মরণ ত্যাগ করা আত্মীয় স্ত্রী পুত্র ভ্রাতৃসন্তান সন্দোহেতে বন্ধুবান্ধব কুটুম্ব স্বজন ভরণ-পোষণেতে মোহিত হয়্যা পূর্ব্বপশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিগ্বিদিক ভ্রমেতে বিশীর্ণ কলেবরেতে কচিৎ ঘট্ব-পট্ব জ্ঞান জনিতাহঙ্কারেতে পূর্ণ হয়্যা কেচিৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় কল্পনা বিচারেতে লোকসকল প্রতারণা করা আপনারা স্ব স্ব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু শ্রীনন্দনন্দন যমভয় ভঞ্জন বিঘ্নবিনাশন কমলনয়ন গজেন্দ্রমোচন সজ্জন মনরঞ্জন মুরলীধর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ লক্ষিত অরুর [অমর] সেবিত অরুণকিরণাসিত চরণ-জুগলোৎপলে সচন্দন শ্রীতুলসীমঞ্জরী দুর্ব্বাঙ্কুর প্রদানকে না করে অতি। ঘোরতর ভয়ানক সঙ্গমনীনাথ দূতেরে বিস্মৃত হয়্যা বৃথাকাল ক্ষেপন করিতেছেন। (পৃঃ ৪৯)

ইন্দ্রপুরী (পৃঃ ৪৯), পুর বর্ণনা (পৃঃ ৫১-৫৩)আছে—সুদীর্ঘ। সভা বর্ণনা আছে—দুইটি বাংলা গদ্য এবং দুইটি সংস্কৃত পদ্য। পুর বর্ণনার সঙ্গে একসঙ্গে মিশানো। যজ্ঞ বর্ণনা (পৃঃ ৬০) একটি, রথ বর্ণনা দুইটি (পৃঃ ৬৭-৬৮), রথসজ্জা বর্ণনা (পৃঃ ৭৯) আছে একটি। সবই বাংলা গদ্য। যুদ্ধ বর্ণনা, যুদ্ধসজ্জা ও রণস্থল বর্ণনা সূচি-পত্রানুসারে ৭০-৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত থাকার কথা, কিন্তু ৭০, ৭৪, ৭৬ পৃষ্ঠা নাই। কাজেই বর্ণনা খণ্ডিত। ৭০-৭২ পৃষ্ঠাতে হয়ত একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা ছিল কিন্তু ৭০ পৃষ্ঠা না থাকাতে বুঝা গেল না। যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা ছিল ৭৪ পৃষ্ঠা হইতে কিন্তু ৭৪ ও ৭৬ পৃষ্ঠা না থাকায় এই সুদীর্ঘ (—একাধিক বর্ণনা ছিল কিনা কে জানে ?) বর্ণনা খণ্ডিত। ৭৩ পৃষ্ঠাতে দুইটি যুদ্ধের বর্ণনা আছে, একটি সংস্কৃত অপরটি সংস্কৃত মিশ্র বাংলা গদ্যে। মধ্যে বাংলা গদ্য এবং আদিতে ও অন্তে সংস্কৃত যুক্ত একটি কৌতুককর বর্ণনার অংশ (পৃঃ ৭৩) উল্লেখ করিতেছি—

সজ্জতাং বীরশার্দুলা সন্নদ্ধাশ্বা সবাহনা। রিপুসৈন্য বিনাশায় জয়াকাঙ্ক্ষী নৃপোঽবদৎ।

বলিবা মাত্রতো, অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপরি পদব্রজে। আগচ্ছাগচ্ছ শব্দেন ভূতা সজীব বভূবতু। বিমানোপরি নানাশস্ত্রাস্ত্র পাণয়ঃ হস্তিঘোটক রথ পদাতিক সুরবীর সারথী রথি মহারথি ভীমরথি অতিরথি অত্যতিরথি অর্দ্ধরথি অপূর্ব উষ্ণীশ মস্তকে দিব্যকুণ্ডল কর্ণে আন্দোলামান দিব্যকঞ্চুক নানাবর্ম পরিধান সেনাগণ কোলাহল নানা সিংহধ্বনি জেন গগন মণ্ডলে দুন্দুভিবাদ্যের ন্যায় শব্দ হতেছে। * * * তদগ্রে শত ২ পবনতুল্য গমন ঘোটক স্বর্ণাভরণোতি শোভিত হার জিঞ্জীর রক্তসূত্রেতে বিরচিত সজ্জিত চিত্রবিচিত্র গাত্রপবিত্র সূত্র সন্নদ্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত অপূর্ব চর্মাবনিমিত পৃষ্ঠাসন প্রকাশান্বিত এবম্ভূত শত সহস্র অশ্বসকলে জাত্রা করে উভয় পার্শ্বে শ্রেণীভূতা শ্বেতপীত নীললোহিত রক্ত কৃষ্ণাদিবর্ণের পতাকা বায়ুচালনে ফর ২ শব্দে উড্ডীয়মানানন্দে সৈন্যগণ সকলে বলে ওরে—

ছেদয়ধ্বং ঘাতয়ধ্বং মারয়ধ্বং পুনঃ পুনঃ
মোহয়ধ্বং ক্ষোভয়ধ্বং নাশয়ধ্বং তমা পরে।
এবমেব পাদধূলিরন্ধকারং কুর্বন যযৌ॥

দ্রব্যের আয়োজন, বাদ্য বর্ণনা, সন্দেশ বর্ণনাংশ কৌতুককর। দ্রব্যের আয়োজন দুইটি (পৃঃ ৬২)—একটি

CENTRAL LIBRARY

সংস্কৃত পদ্য, অপরটি বাংলা গদ্য। সন্দেশ বর্ণনা আছে মোট চারটি (পৃঃ ৬৩ ও পৃষ্ঠাঙ্কহীন পত্র) কিন্তু দুইটি পুনরুক্ত অর্থাৎ থাকিল দুইটি মাত্র। দুইটিই বাংলা পদ্য। বাদ্য বর্ণনা মোট পাঁচটি (পৃঃ ৬৪-৬৬ ও পৃঃ ১০৬)। একটি পুনরুক্ত। কাজেই দুইটি বাংলা গদ্য ও একটি সংস্কৃত পদ্য। অপরটি সংস্কৃত আকারে বাংলা পদ্য। কয়েকটির কিয়দংশের নমুনা দেওয়া গেল।

দ্রব্যের আয়োজন :

ঘৃতকুল্যা সহস্রঞ্চ মধুকুল্যা শতং শতং।
দুগ্ধে হ্রদং [দুগ্ধ হ্রদং ?] পঞ্চশতং দধিঘাত স্তথৈব চ॥
গুড় খাত সহস্রঞ্চ তৈলদ্রোণী দ্বিলক্ষকং।
শর্করাণাং রাশি শতং মিষ্টান্নানাং চতুর্গুণাং
যব গোধূম চূর্ণানাং পিষ্ট রাশি শতং শতং॥

সন্দেশ বর্ণনা :

গোণ্ডা গোণ্ডা চ মোণ্ডা মধু মনোহরা শুভ্রতক্তি জিলাপী।
গোল্লা খাজা চ খণ্ডা নিখুতি চ বরফী ক্ষীর তক্তি মতিচুর।
ঘুর্মা ছাবা চ পেড়া রসযুত গেঁদড়ী স্বর্ণপাত্রে কচুরী।
সর্বে ক্ষীরান্নভুক্তা রসকর বুঁদিয়া হেমপাত্রে চ বাবী।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ নীত্বা নিজনিজ বসনে ভূরিভারং স্বপুত্রে।
দত্বা নীত্বা চ পাত্রং দধাপি গৃহীতং দেহি দেহীত্যু বাচে॥

বাদ্য বর্ণনা :

ঢক্কা জয়ঢক্কা টকারা টিকোরা নাগোরা টন্টনিটিমাট মিতুরি ভেরী ঝাঁঝরী কড়কড়ি কড়মড়ী চড়চড়ী চড়মড়ী কাড়া দগোড়া ঘটতাল দ্বিতাল রণতাল শারঙ্গ শারঙ্গী শোনারা দামামা তাঁসা মোরকা মোচঙ্গ ভোরঙ্গ রুদ্র-সীঙ্গা রামসীঙ্গা রণসীঙ্গা মন্দিরা বীণ-বীণা বাঁশী মরলী দারা সমক খড়খড়ী সাড়া খাড়া দগোড়া ভেউড়ি রামগণ্ডী ঝাঁজি শঙ্খ ঘণ্টা জয়ঘণ্টা ডিমডিমী তুম্বর ডম্ফ ডামর তবলা পাখোয়াজ জোড়খাই ধামসা করতাল করনান রবাব মোহরী পিনাশ সোহানী বেহালা সেতারা একতারা দ্বিতারা ত্রিতারা সপ্তস্বরা মকমকী পিনাক কুবকুবী গোড়ী খঞ্জরী বাগীন্ আরগীন্ তুম্বুম পাদোড়ী তুমড়ী শানীকানী জুভানী টানী রোনস চোকী খপাটী কর্ণজালা মহাকালা ঢোলক মৃদঙ্গ মর্দ্দল কাশী শ্রুতিনাশী মহীকম্প জগকম্প শতশরা কর্ণপুরা ফেরকা চড়ে। পড়েরা কাটতাল খটখটী সুরতরঙ্গতাল তরঙ্গ মলতরঙ্গ সুরঙ্গ জলতরঙ্গ ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হতেছে।

বাদ্য বর্ণনা :

কাড়া টং টং টিকাড়া দগড় গড়গড়ং না হু হু নু বিপঞ্চী।
ধাঁ ধাঁ ধো ধো দমামা তাকড় কড় কড় মড়ম্ফ ঝম্পোন ফেরী।
জগঝম্ফ ডম্ফ রবার শরভঙ্গ চেমকা কর লাল বেণুবীণা
শঙ্খ মঙ্গ ডিডিমিল্লা ঘণ্টা ঠনঠনায় মানা॥
প্রণবতি বিপুলং দগ দগ দগড়ী ধী ধি ধীধি মৃদঙ্গ।

CENTRAL LIBRARY

উচ্চৈ র্ধা ধা দমামা গড় গড় গড়ং ঝাঁতি ঝাঁতি ঝিঝোড়।
তাঁসা চরচর তিতথা ধিগিতি দিক ধিত্যো ধীয়ো মৃদঙ্গো।
ভেরী তূরীন ভেরী তবল কল কলোর্বাদ্য শব্দং বিশালং।
বীন বীণা চতুমড়ী কড়ার ঝাঝরী পীনাক সপ্তস্বরা।
পিউ পিউ পিউ পিউ মচঙ্গ স্থগিত সবজনা ভেরু ভেরু রবাবৈ।
নানা বাদ্যৈ বিশালৈ শ্রবণগত বধীরা মর্ত্যলোকা ভবন্তি।

সূচী পত্রানুসারে ১১০ পৃষ্ঠা হইতে ১১৫ পর্যন্ত গীতাবলী প্রত্যাশিত। কিন্তু গ্রন্থে ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৫ পত্র নাই। কেবল ১১৩ ও ১১৮ পাতা দুইটি আছে। এই দুই পাতাতে মোট ১৯টি গান আছে। এই হিসাবে মনে হয় পাতাগুলি থাকিলে আরও অন্ততঃ ৪০টি গান পাওয়া যাইত। ইহা ছাড়া শুকদেবের উক্তি আছে একটি (পৃঃ ১১০ ক্রোড়পত্র) সংস্কৃতে পদাবলী—একটি অষ্টক, নারদের বর্ণনাতেও সংস্কৃত গান আছে চারটি। যাহোক এই পত্রটির অপর পৃষ্ঠাতে কথকের গীত ভূমিকা আছে একটি গদ্যে। এই গদ্যটি সুরতাল যোগ আবৃত্তি করিয়া কথক গান আরম্ভ করেন। ভূমিকাটী এই :

ভজন সাধন যজন জাজন পরম দেবতারাধন শম দম
যম নিয়মন্যাসাদি ধর্ম কর্ম পরিত্যাগ করে
মিথ্যা নিত্য মমত্বাবৃত ভ্রান্ত চকলাকল জরাদি
ব্যাধিজীর্ণ কলেবর লয়ে বদ্ধ হলিরে, অরে
দুর্নিবার ভয়ংকর কটু কঠোরাস্তর্জন-গর্জনাদি ঘোর
দুর্দম যমভয় তরিবে তবে একবার সেই অশরণ শরণ
সকলজনতারণ সকরুণান্তঃকরণ দয়াপূর্ণ লোচন
ভব ভয়ভঞ্জন অশেষ গুণধাম শ্রীরামনামামৃত পান
কররে—বৃথা দিন গেলরে।

গীতগুলি ছোট সংস্কৃত, দুইটি বা চারটি চরণে সম্পূর্ণ। গানের নির্দিষ্ট সময় ও রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে। যথা (পৃঃ ১৪৪) রাগিণী ঝিজট রাত্রি দুই দণ্ডান্তরে—

রাস রসিকবর তারয় কৃপানং।
বারয় বারয় জমপুর গমনং।
অন্তক প্রেরিত পাশ নিবারক
দেহি কৃপাময় চরণে স্থানং॥

চারটি গানকে বাংলা ধরা যায়। মনে হয় একটিতে ভণিতা-ও আছে। (পৃঃ ১৩) রাং ইমনকল্যাণ—

মদন মনোমথন মধুসূদন পাহি মুরারে।
মথরীত মরারে মামতি দীনং হীনং দুরিত দমন দনুজারে।
গন্ধর্বানন চন্দ্রচকোরে চন্দ্রাচ্যুত মোহন চতুরা,
রাস রসিকবর করুণা সাগর বিতর করুণামনু রামধন দাসেরে॥

আর একটি বাংলা গান (পৃঃ ১১৪) :

CENTRAL LIBRARY

প্রজহি বিশয় সুখ বালিশ বারণ মন। সদত চিন্তয় মন কমলা লালিত ধন।
সুর নর বাঞ্ছিত মণিগণ সেবিত অমৃত সম্পদ পদ কর আরাধন।

একটি রূপক বাংলা গান (পৃঃ ১১৪)। রাং বেহাগ অর্দ্ধরাত্র সময়ে—

কর তত্ত্ব যোগযাগ মানস জ্ঞানাগ্নি ঘৃতে। কাম ক্রোধ লোভেন্ধনে জলে অগ্নি বিধীমতে।
জিবাত্মারে কর হোতা তন্ত্রধারণ মন্ত্রদাতা পরাত্মা ব্রহ্মা তথা শিবকে সদস্য রেখে॥

পুঁথির পরিচয় মোটামুটি এই পর্যন্ত। প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি আছে পুঁথিতে। উদ্ধার কার্যে নিজে সংশোধন করি নাই—যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছি। আর-ও কিছু কৌতুকজনক অংশের উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বিরত হইলাম।

গ

এই প্রবন্ধে কথকতার কথা অংশের সাহিত্যিক মূল্য (অবশ্য যদি কিছু থাকে) বিচার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ কম। কারণ যথাসম্ভব পূর্ণ পরিচয়সহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করাই পুঁথি পরিচয়ের প্রচলিত বিধি ও প্রথা। এই প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াও অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা না করিলে এই পরিচিতিটির প্রতি অবিচারের আশঙ্কা আছে।

কথকতা জন-সাহিত্যের শাখা। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য জন-শিক্ষা বিস্তার। এইক্ষেত্রে মুখ্যতঃ ভগবদ্ভক্তির প্রতি চিত্তাকর্ষণ। কিন্তু কথাটিকে সরস ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য নানা বিষয়ের বিচিত্র সংকলন ও সংযোজন করিতে হয়। কেবল আবৃত্তি ও সঙ্গীতের উপর (এবং তাহাও কোন যন্ত্রসঙ্গীতের সহায়তা ব্যতীত কেবল কণ্ঠসর্বস্ব সুরজাল সৃষ্টির উপর) নির্ভর করিতে হয় কথককে। কাজেই পুরাটাই শ্রুতি-নির্ভর। কথকতার শিল্পকৌশল ও কলাচাতুর্য শব্দবিন্যাসের এবং তাহার সু-আবৃত্তির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এইজন্যই অনুপ্রাস দরকার এবং সেই সঙ্গে দরকার এমন শব্দ-যোজনা যাহাতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতের মত কণ্ঠস্বরের চড়াই উতরাই সহজসাধ্য হয়। তালিকাগুলির দ্রুত উচ্চারণের ফলে এক ধরণের বিস্ময় বিস্ফারিত হয় অনুস্বার সংযোগ ও সংস্কৃত পদের সংযোজনা তাহার চমৎকারিত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে বর্ণনার ভঙ্গী, শব্দ সম্পদ, অলংকার প্রয়োগ পদ্ধতি, বাগ্‌বিন্যাসের রীতি সব-ই সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসারী। ফলে উনবিংশ শতকের জন-সাহিত্য শাখা—কবি পাঁচালী-টপ্‌-যাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে তো বটেই—শিষ্ট সাহিত্য শাখার গদ্য-পদ্য রচনার সহিতও কথকতার ভাষা ও সাহিত্যরীতির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।

ইহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নানা-বিষয়ের তালিকার মালা। অবশ্য এই গুরুত্ব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার দিক হইতে। আর-ও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক এই যে এখনও কথকতা—খুব একটা জনপ্রিয়তা না লাভ করিলেও অপ্রচলিত হয় নাই। কিন্তু এই কথকতার মধ্যেও একই ধরণের শব্দবিন্যাস, তালিকার মালার সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিছু কিছু নূতনত্বের চেষ্টা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার স্থান অতি নগণ্য। প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে আধুনিক যাত্রাগানের তুলনার কথা ছাড়িয়া দিলাম, এমন কি প্রাচীন কবি-পাঁচালীর সঙ্গে সাম্প্রতিক কবি-পাঁচালীর যতখানি পার্থক্য—প্রাচীন কথকতার সহিত আধুনিক কথকতার পার্থক্য তাহার তুলনায় এত কম যে ইহাকে একটি অপরিবর্তিত শিল্প ধারা বলিলেও বোধহয় মিথ্যা বলা হয় না। ইহার কারণ অবশ্যই অনুসন্ধানযোগ্য।

CENTRAL LIBRARY

'ভক্তমালা'-পুঁথির পরম্পরায় জয়দেব-পদ্মাবতী-কথা

পঞ্চানন মণ্ডল

বিশ্বভারতীর বাংলা-পুঁথিবিভাগে একখানি পুঁথি আছে। গ্রন্থটির নাম 'ভক্তমালা'। গ্রন্থকার দ্বিজ মোহনদাস। ইনি সম্ভবতঃ জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। জাহ্নবা দেবী নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। নিত্যানন্দ প্রভুর নিবাস ছিল বর্তমান বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে অবস্থিত 'একচক্রা' গ্রামে। এই 'একচক্রা'র অবস্থান সম্পর্কে বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় অবস্থিত 'একচাকা' গ্রামের দাবীও সম্প্রতি সোচ্চার। যাই হোক, আলোচ্য পুঁথিখানি সংগৃহীত হয়েছে কাটোয়ার কাছাকাছি দাঁইহাট অঞ্চল থেকে।

পুঁথিখানির (সংখ্যা ৫৬১৯) আকার ১২" × ৬" ; অতি জীর্ণ তুলোট কাগজ ; খণ্ডিত ; পত্রসংখ্যা ২৪০ ; মধ্যাংশের ১০৫ খানি পাতা তির্যকাকারে প্রায় অর্ধাংশে কীটদষ্ট ; পোক্ত ছাঁদের হস্তাক্ষর ; কালো কালির বাংলা হরফ। আনুমানিক দুইশত বৎসর পূর্বের প্রতিলিপি। এই গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি রয়েছে আরও সাতখানি। পুঁথিগুলি খণ্ডিত হওয়ায় সম্ভাবিত পাঠ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উদ্ধার ক'রে দেওয়া গেল। মূল গ্রন্থখানি বিশ্বভারতীর তরফ থেকে সম্পাদনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই 'ভক্তমালা' গ্রন্থের রচয়িতা দ্বিজ মোহনদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বৈষ্ণ মোহনদাস থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এঁর ভণিতা এইরকম :

১. কহয়ে মোহনদাস/ঐ চরণে মোর আশ/সেবি জেন জনম জনম ॥ —২৭ খ]

২. এ দ্বিজ মোহন কয়/মো সম পাষাণ নয়/তবো হিয়া বিদরিয়ে চায় ॥ ২৮ খ]

দ্বিজ মোহনদাসের এই গ্রন্থ দ্বাদশ 'মালা' বা অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। ষষ্ঠ 'মালা'য় লীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রমুখ 'ভক্ত-মালা' বা ভাগবতসাধকবৃন্দের পঙ্‌ক্তিতে জয়দেব-পদ্মাবতীর কাহিনীটি গ্রথিত রয়েছে। এই কাহিনী ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদে সংকলিত। কিন্তু কাহিনীটির পরম্পরা যে প্রাচীনতর সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। পুঁথির ভাষায় স্থানে স্থানে 'চৈতন্যভাগবতের' ভাষার প্রতিফলন রয়েছে। পক্ষান্তরে, জনপ্রিয়তা অর্জনের ফলে, কাহিনীটির পুরাতন আধারের উপর পরবর্তিকালের বিদগ্ধ লিপিকরের হস্তাবলেপের নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়।

'ভক্তমালা', 'ভক্তচরিতামৃত', 'জয়দেবচরিত্র' ইত্যাদি গ্রন্থে উপস্থাপিত কাহিনীর তুলনায় দ্বিজ মোহনদাস তাঁর এই গ্রন্থে কাহিনীর উপস্থাপনায় যথেষ্ট মৌলিকত্ব প্রদর্শন করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেবের 'অভিনব-গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ-রচনার রহস্য প্রকাশ, এবং নাথযোগ-ধর্মের সঙ্গে জয়দেবের যোগাযোগের ঘটনা সম্পর্কে অভিনব বিবরণ। বাস্তবভিত্তিক অন্য তথ্যসমূহ প্রসঙ্গক্রমে যথাস্থানে আলোচনা করা গেল।

সমগ্র কাহিনীটি সংক্ষেপে বলছি।

কেন্দুবিল্বি গ্রাম আছে অজয় কিনারে। জয়দেবের বাস সে [খা গ্রামের বা] হিরে ॥

জয়দেব রাখেন করয়া কোপিন। বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসীন ॥

CENTRAL LIBRARY

—'অজয়-কেন্দুবিল্লি' অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের বিভাজক অজয় নদের তীরবর্তী বর্তমান 'কেন্দুলি' বা 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামের উপান্তবাসী উদাসীন কবি ও সাধক জয়দেব।

ওদিকে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার কন্যা পদ্মাবতী। যৌবন-সমাগমে তার বিবাহকাল উপস্থিত। দরিদ্র পিতা চিন্তিত। কিন্তু, কন্যা আশৈশব কৃষ্ণভক্ত।—কৃষ্ণনাম করে কন্যা শিশুকাল হৈতে।

ফলে, পিতা স্থির করলেন, তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়ে যোগ্য-পাত্র প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন, কারণ,

[জগন্না]থের যোগ্য এই মোর কন্যা হয়। জগন্নাথকে কন্যা দিলে মঙ্গল আছয়॥

একদিন সুপ্রভাতে বিষ্ণুশর্মা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শুভযাত্রা করলেন, এবং চতুর্দশ দিবসে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে—

বিষ্ণুশর্মা জগন্নাথের চরণ বন্দিলা।

এবং কন্যাকে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রভুর আদেশ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু, প্রভু জগন্নাথ স্বয়ং গ্রহণ না করে, ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার অন্য পন্থা নির্দেশ করলেন :

[কেন্দুবিল্লি গ্রামেতে জয়দেব] আছয়। পদ্মারে লইয়া তথা জাহ মহাশয়।
মোর প্রতিনি [ধি] হৈয়া তথাতে যাইবে। জাহ সেথা কন্যা লৈ]য়া দেহ জয়দেবে॥

অতঃপর,

[কন্যা]রে সঙ্গেতে করি গেলা পক্ষ দিনে। পহুছিলা বিষ্ণুশর্মা [কেন্দুবিল্লি গ্রামে॥]

অর্থাৎ তিনি কন্যা পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে, পনেরো দিন পদব্রজে যাত্রা ক'রে, পুরীধাম থেকে অজয়-কেন্দুবিল্লি, বা বর্তমান বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরবর্তী 'কেন্দুলি' গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

কেন্দুলিতে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুশর্মা ধ্যানমগ্ন জয়দেবের সাক্ষাৎ পেলেন ; এবং তাঁকে প্রভু জগন্নাথের আদেশের বার্তা জ্ঞাপন করলেন :

তোমায় কন্যা দিব কৃষ্ণ [আদেশিলা মোরে।]

কিন্তু, জয়দেব সম্মত হলেন না।—

শুনি জয়দেব কহে আমি কান [থা]রি। [তোমার কন্যারে আমি লইতে না পা]রি॥

তখন বিষ্ণুশর্মা অনন্যোপায় হয়ে তাকে 'বিনা ধনেন সংসার' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য আলোচনা ক'রে বিধিমতে বোঝাতে লাগলেন।

কিন্তু বিমুখ হয়ে,

জয়দেব কহে শুন দ্বিজ চূড়ামণি। জগন্নাথ রাখে [কন্যা তাহা আমি শুনি।
তবে ক]ন্যা লহ তথা জগন্নাথে দেহ। কন্যা সুখে থাকিবেক বচন শুনহ॥

কিন্তু, ব্রাহ্মণ জেদ ধরে জয়দেবকে বললেন,—এই আদেশ অলঙ্ঘ্য।—

দ্বি[জ কহে কহিলা জগন্না]থ আপনে। কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে॥

এবং কন্যাকে বলেন—

বাছা পদ্মাবতী তু[মি থাকহ এখানে। জয়দেব] তোমার পতি বিধির লিখনে॥

অবশেষে, জয়দেবের উদ্দেশ্যে কন্যা-সমর্পণ ক'রে বিষ্ণুশর্মা গৃহপ্রত্যাবর্তন করলেন।

CENTRAL LIBRARY

জয়দেবে কন্যা দিয়া দ্বিজ গৃহে গেলা। [বৃক্ষ তলে পদ্মাবতী] বসিয়া রহিলা॥
ধ্যান করে জয়দেব মুদিং নয়নে। বসিয়া শ্রবণ করে পদ্মা [এক মনে॥]

কিছুক্ষণ পরে জয়দেবের ধ্যানভঙ্গ হলো :

জয় [দেবের ধ্যান ভ] ঙ্গ ভেল কতক্ষণে।

চেয়ে দেখলেন, বৃক্ষতলে পদ্মাবতী বসে আছেন :

সমুখে আছেন পদ্মা নিরখে নয়নে॥

জয়দেবের কবি-মানসে যুবতী কন্যার প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি জাগ্রত হলো :

[জন] নী কোলে পদ্মা আজনম আছিলা। বৃক্ষতলে কৃষ্ণচন্দ্র তারে বাস দিলা।

কিন্তু, তথাপি 'উদাসীন' জয়দেব বিবাহে অনিচ্ছুক। অতঃপর, প্রসঙ্গতঃ জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর সুখ-দুঃখের উৎস হেতু, প্রকৃত ধন-নির্ধন তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত শাস্ত্র আলোচনা হলো এইভাবে,—

পদ্মারে শ্রীজয়দে [বে বলেন বচন।] মোর এক কান্থা বিনা নাহি গৃহধন॥
পদ্মা কহে শুন গোসাঞি নিবেদি তোমারে। [আছুক জতে] ক ধন দুখি কহি তারে॥

বিদুষী যুবতী পদ্মাবতী 'উদাসীন' কবি জয়দেবের নিকট পার্থিব ধনের অসারতা এবং কৃষ্ণ সেবার সারবত্তা সম্পর্কে নানা যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে বললেন,—

জাহার [ঘরেতে ধন কৃষ্ণ না রহয়। পু] থু বিভ্রময়ে জদি তভো না মিলয়।
অতয়েব হরি ভজন কেন তেজিয়া। ধনে [র লাগিয়া কেনে মরে বিভ্রমিয়া॥]

ছলনায় জয়দেবের উত্তর,—

দ্বিজ কহে শুন পদ্মা ধন জার ঘরে। জগৎ সংসার লোক সুখী কহে তারে॥

পদ্মাবতীর জবাবও বিশদ ; প্রবীণা বিদগ্ধা বাঙ্গালী গৃহিণীর অনুরূপ,—

প [দ্মা কহে ধন কৌড়ি লক্ষেক আছ] য়। মনের সন্তোষ বিনা সুখ নাহি হয়।
বৃক্ষতলে থাকে করে অজাচিৎ ভোজন। স [ংসারে একেক সুখী হয় সেই] জন।
না করয়ে ত্রিন আর প্রবাসে না যায়। শাকন্ন নিতি ভোজন জে করে সন্ধ্যায়।
তা [ন সম সুখী নাই] জগত ভিতরে। জেই জন পর ধনের আশা নাহি করে॥
কপিন করয়া রাখে কৃষ্ণে ধরে মন। [শ্রেষ্ঠ সুখী সংসার] ভিতরে সেই জন॥

পদ্মাবতী একটু ঘুরিয়ে আরও বললেন, বোধ হয় নারীজাতির অন্তরের কথা :

পদ্মা কহে তুমি রাখ কপিন কাঠারি। ইহা বিনা আমি নাহি চাহি স্বর্গ [পুরী।]

এবং শেষ কথা বললেন—জয়দেবকে স্বামী ও গুরুরূপে বরণ ক'রে,—

[পদ্মাবতী] জয়দেবের অগ্রেতে কহয়। পিতা মোরে করিয়াছে তোমার আশ্রয়।
জাথে ভাল [হয় গোসাঞি করহ এখনে। পতি] হইয়াছ তুমি বিধির লিখনে।
ভবার্ণবে পড়িয়াছি তরিতে না জানি। ভক্তি দিয়া [মোরে পার করহ আপনি।]

এইভাবে বাক্যাবাক্যের পরে, অবশেষে পরাজয় হলো জয়দেবেরই। দৃঢ়চিত্ত পদ্মাবতীর তত্ত্বকথায় মুগ্ধ হয়ে, এবং তাঁর এই আত্মনিবেদন অনুভব ক'রে, অবশেষে সমাপ্তি ঘটলো মধুরে।—

জয়দেব পদ্মার মুখে সুজ্ঞান শুনিয়া। মুখেতে চুম্বন দিলা কোলেতে করিয়া॥

CENTRAL LIBRARY

অবশ্যম্ভাবী ফল হলো মিলনাত্মক। উভয়ের অনুরাগে গন্ধর্বমতে মালাবদল ক'রে,—

পুষ্পের বিভা দোঁহার হইলা।

জয়দেব ও পদ্মাবতী সংসার পাতলেন।

কালক্রমে, জয়দেবের সংকল্প অনুসারে—

[দেউ] লি হইল কৃষ্ণ সেবার কারণ। কহেন শ্রীমূর্তি সেবা করিব স্থাপন॥

কেন্দুলিতে প্রথম স্থাপিত এই মন্দিরে জয়দেব তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর পূজিত ইষ্টদেবের—

শ্রীরাধামাধব নাম বিখ্যাত হইলা।

জয়দেবের এই আদি মন্দির ও শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দ্বিজ মোহনদাস করছেন ষোড়শ শতাব্দের শেষ পাদে। তাঁর এই উক্তি কেন্দুলিতে বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় শত বর্ষ পূর্বেকার। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দের জননী রাণী ব্রজকিশোরী কেন্দুলির বর্তমান মন্দির এবং 'শ্রীরাধাবিনোদের' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গৃহী কবি জয়দেবের প্রথম জীবনেই 'গীতগোবিন্দ'-রচনা সম্পূর্ণ হয়। ইষ্টদেবতার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' শ্লোকাংশ রচনার অলৌকিক কাহিনীটি মোহনদাসের ভাষায় এই :

জয়দেব মহাকবিরাজ মহাশয়। [গীতগোবিন্দ তিহোঁ পূরণ] না করয়॥
পুন কহে এই কথা কেমনে লেখিব। রাধাপদে কৃষ্ণে [হস্ত কেমনে রাখিব॥
বিপরীত জয়দে] বে না করে বর্ণন। কৃষ্ণ রাধার পদ ধরে এ বড় বিষম॥

—এই 'বিষম' বা উল্টারীতির সাধনা ভারতীয় নাথযোগধর্মের সুদীর্ঘ কালের ধারাবাহিত একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক। যাই হোক,—

মনের বিয়োগে [তিহোঁ গেলা গঙ্গাস্নানে। কৃষ্ণে ভাবে আ] মি গিয়া লেখিব এখনে॥
জয়দেবের মন কৃষ্ণ জানিতে পারিলা। [ভক্তের সমিস্তা তিহোঁ পূরণ করিলা॥]

ওদিকে গৃহেতে,—

পদ্মাবতী কৃষ্ণ লাগি করেন রন্ধন। সেকালেতে কৃষ্ণ গিয়া দিলা [দরশন॥
পদ্মা কহে তুমি গঙ্গাস্নানে] গিয়াছিলা। তুরিতেতে স্নান করি কেমনে আইলা॥
কৃষ্ণ কহে এক [শ্লোক মনে রচিবার। পুস্তক বাহি] র করি দেহ একবার॥
তৈল অঙ্গে আছে মোর ভিতরে না জাব। এক চরণ [লেখিয়া গমন করিব॥]
পদ্মাবতী পুস্তক লইয়া স্থপিলা। পদ্মাবতী ভিতরে কৃষ্ণ লেখিতে লাগিলা॥
[পুস্তকেতে কৃষ্ণ তথি লেখি] লা আপনে। বাহির করিলা রাধার মান জেইখানে॥
কৃষ্ণ কহে রাধে তোমার [মান মুকুহ।] আমা পানে কর সুন্দরি [চরণ দেহ॥]
॥ গীতগোবিন্দে॥ রাধে দেহি পদপল্লবমুদারং॥
[এই চরণ লিখিলা 'গীত গোবি] ন্দেতে। রাধার মানের কথা শুনাব পশ্চাতে॥
পুস্তকে লেখিয়া কৃষ্ণ পদ্মারে স্থপিলা। [পদ্মাবতী এবে] জাই কহি চলিলা॥
বহু স্তুতি রাধার লেখিলা জনার্দন। পতি স্থানে গেলা পদ্মা বি [ধির বিধান॥
অষ্টা] দশ ক্রোশ গঙ্গা কেন্দুলি হইতে। জয়দেব নিতি স্নান করেন গঙ্গাতে॥

CENTRAL LIBRARY

কেন্দুলি থেকে গঙ্গা-ভাগীরথী কাটোয়ার দিকে অজয়-মোহনায়, সোজা পূর্বমুখে প্রকৃতই আঠারো ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থেও অনুরূপ দূরত্বের কথা বলা হয়েছে।

পদ্মা জানেন লো [টায়া পুন স্না] নে গেলা। আসিয়াছিলেন কৃষ্ণ চিন্তে না পারিলা॥
সেকালে জয়দেব আইলা স্নান ক [রি। আসি] য়া পূজিলেন রাধামাধব হরি॥
পুস্তক লয়া লেখিতে বসিলা মহাশয়। জে লাগি ভাবিত ছিলা সে [কেমনে হয়॥]
লেখা দেখি জয়দেব পদ্মারে পুছিলা। পদ্মা কহে লেখি এবে তুমি স্নানে গেলা॥
আসি [য়া মোরে কহি] লে জাইব পশ্চাতে। এক পয়ার লেখি পুন জাইব স্নানেতে॥
জয়দেব কহে এই লিখন মো [র নয়। বিষম] এই লিখন তোমার নিশ্চয়॥
ফিরা আসি মোর কাছে পুস্তক মাগিলা। এক চরণ লেখি [য়া পুন স্নানে] গেলা॥
শুনিয়া শ্রীজয়দেবের চিন্তিত হৃদয়। আকাশবাণীতে কৃষ্ণ সেকালে [কহয়॥
আমি আসি লেখি] লাম তোমার বাড়িতে। শ্রীরাধার স্তুতি লিখিয়াছি পুস্তকেতে॥
কহে কৃষ্ণ [পুথি আমি লিখিয়াছি ছলে। জ] য়দেব মূর্ছা হয়া পড়ে ভূমিতলে॥
উঠিয়া পদ্মারে পুন পরিক্রমা দিলা। [কৃষ্ণের শ্রীহস্তাক্ষর চাহিয়া] দেখিলা॥
দেখ পদ্মা কৃষ্ণের হস্তের এ লিখন। পাইয়াছ অদ্য তুমি কৃ [ষ্ণ দরশন॥
লিখন দেখিয়া প [দ্মা কান্দিতে লাগিলা। দোঁহাকার অশ্রুপ্রেম বহিয়া চলিলা॥
পদ্মারে [আদর করি বলেন বচন। শ্রীগীত] গোবিন্দে আছে সে সব কথন॥

'দেহিপদপল্লবমুদারম্'-রচনার প্রখ্যাত এই দৈব ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা করার পরে মোহনদাস মন্তব্য করেছেন,—

জয়দেবের ভক্তি প্রেম কে কহিতে পারে।

দ্বাদশ শতাব্দে রাঢ়দেশে জয়দেব-লীলার তিন শত বৎসর পরে, সর্বত্র 'শ্রীগীতগোবিন্দের' অসামান্য খ্যাতি শ্রবণে বিভ্রান্ত হয়ে, এবং পুরীর মন্দিরেও তার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য ক'রে, জয়দেবের প্রতিস্পর্ধিরূপে,—

নিলাচলে রাজা এক পুস্তক বর্ণিলা। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ [প্রকাশ হইলা॥]

কিন্তু নীলাচলে,

[পুস্তক রচিলা রা] জা পণ্ডিতে না মানে। না চলিবে দুই পুস্তক কহে সর্বজনে॥

তখন, এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নীলাচলে,—

[দো] পুস্তক জগন্নাথের অগ্রে ধরিলা। পণ্ডিত সকলে রাজার অগ্রে [তে রহিলা॥]

সেখানে সকলে বললেন, প্রভু যাঁর পুস্তক মান্য বা অনুমোদন করবেন,

মানিবে সেই পুস্তক জগতসংসারে।

প্রভুর নিকটে এইভাবে সত্যপাঠ ক'রে, রাজা অপেক্ষায় রইলেন প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায়। কিন্তু, রাজার দুর্ভাগ্য,

জয়দেবের গ্রন্থ কৃষ্ণ সৈকার করিলা।

প্রভু জগন্নাথের এই আদেশ লাভ করে সকলেই আনন্দিত হলেন; এবং—

রাজার পুস্তক কেহ গ্রহণ না করে।

ফলে, রাজা মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন উপায়ান্তর না-দেখে, সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে, প্রভুকে দিয়ে বলানো হলো,—

CENTRAL LIBRARY

.....তোর পুস্তক চালাইব শুন হে রাজন।

শুন রাজা তোর বর্ণন [গ্রহণ করিব। জয়দেবের গ্রন্থে আমি] বার শোলক দিব। এবং—

পণ্ডিত অন্তরীক্ষে জগন্নাথ কহিলা। কৃষ্ণ আজ্ঞা [কেহ লঙ্ঘিতে নারিলা।

জ] য়দেবের পুস্তকে দ্বাদশ সর্গেতে। রাজার দ্বাদশ শোলক লেখি [লা] তাহাতে।

[ইহা হৈতে হৃষ্টচিত্ত হইলা] রাজন। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ বিখ্যাত ভুবন।

—এই হলো পঞ্চদশ শতাব্দে (১৪৬৭-১৪৯৭) উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেবের 'অভিনব গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ-রচনারহস্যের পরম্পরাবাহী ঐতিহাসিক পটভূমি। অবশ্য, রাজাকে 'খুশি' করবার উদ্দেশ্যে, তাঁর 'অভিনব গীত-গোবিন্দ'-গ্রন্থের বারোটি শ্লোক, জয়দেবের মূল 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করার চেষ্টা সফল হয়নি। মারাঠী 'কবি-চরিত'-গ্রন্থে উল্লিখিত রাজা পুরুষোত্তম এবং এই পুরুষোত্তমদেব অভিন্ন ব্যক্তি। মোহনদাসের এই বিবরণ, জয়দেবকে ওড়িয়া প্রতিপন্ন করার দাবী নিরসনের একটি বিশেষ ভূমিকা।

দ্বিজ মোহনদাসের গ্রন্থে এর পরে রয়েছে গীতগোবিন্দ-গানের মাহাত্ম্যব্যাপক সুলোচনা মালিনীর কাহিনী।—মালিনী সুলোচনা নীলাচলে গ্রামের বাহিরে 'ক্ষেত' করে। ক্ষেত থেকে সে 'বার্তকী' তোলে, আর পথে-প্রান্তরে গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে' গান গায়। সুলোচনার গান শুনে প্রভু প্রসন্ন হন। একদিন গান গেয়ে ক্ষেতের 'বার্তকী' তুলতে গিয়ে সুলোচনার—

বস্ত্র বস্ত্র কণ্টকে ছিণ্ডিল।

এদিকে, ভোগ-নিবেদনের সময় দেখা গেল, কী আশ্চর্য, প্রভুর অঙ্গে—

সেই ছিণ্ডা বস্ত্র এবং চরণে রক্তধারা।

অনুরূপ 'বার্তকী' তোলার বিবরণ ঘনরাম চক্রবর্তীর আত্মকাহিনীর মধ্যে রয়েছে। ঘনরামও রাম-সীতা দর্শনের উদ্দেশ্যে পুরীযাত্রা করেছিলেন। যাই হোক্, এখন এই দৃশ্য দেখে রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি 'পণ্ডা'গণকে বন্ধন ক'রে মুণ্ড নিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতি লক্ষ্য ক'রে, অবশেষে প্রভু স্বয়ং প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করলেন। ফলে 'পণ্ডা'গণ অব্যাহতি পেলেন।

সুলোচনা মালিনীর কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ ক'রে প্রভু তাকে আদেশ দিলেন,—

শ্রীগীতগোবিন্দ গান নিতুই করহ।

এবং সেবকগণকে জানালেন,—

তার গানে প্রেমে আমি রহিতে না পারি।।

প্রভুরই আদেশে মালিনী সুলোচনাকে শিবিকাযোগে শ্রীমন্দিরে নিয়ে আসা হলো। মালিনীকে রাজা মন্দিরেই বাস করতে বললেন। তদবধি মালিনী—'মহাপ্রসাদ' রন্ধন কারণ, জগন্নাথের পুরীতে রহিলা।

আরও আদেশ হলো,

গীতগোবিন্দ গান জেন পদেতে না করে।

সুলোচনার সঙ্গীতে মোহিত হয়ে বিধর্মী মোগল পর্যন্ত গীতগোবিন্দ গান গাইতে লাগলো। এবং—

গানের কালে মগল প্রেমে ভাসি জায়।

অতঃপর, দ্বিজ মোহনদাস বলছেন, নাভাজীর মতে, সেই থেকে নিষেধ হলো,

CENTRAL LIBRARY

পথে না করিবে গীতগোবিন্দ কীর্তন।

পুনরায় জয়দেবের কথা আরম্ভ। কেন্দুলি গ্রামে বাস ক'রে, ইষ্টদেবতা রাধামাধবের মন্দিরে গীতগোবিন্দের কীর্তন-করা জয়দেবের নিত্যকর্ম। সঙ্গীত শ্রবণ ক'রে ঠাকুর প্রেমে পুলকিত হন। জয়দেবের ভক্ত শিষ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।—

জয়দেবের ভক্তি দেখি ভেট সবে আনে। রাধামাধবের ভাণ্ডার পূর্ণ হয় ধনে।]

জয়দেব থাকেন অজয়-কিনারে; ভ্রমণ করেন কিনারের কাননে কাননে,—গ্রামে-গ্রামান্তরে। রাধামাধবের সেবার কারণ 'মিষ্টাদিক', 'ভোগবস্তু' 'সামগ্রী আনিতে' একদিন জয়দেব দ্রুতপদে বনপথে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঞ্চয় ছিল তাঁর কয়েকটি মোহর। সহসা তাঁর সাক্ষাৎ হলো একজন গণৎকারের সঙ্গে। জয়দেবকে বনপথে যেতে দেখে, এবং তাঁর কাছে সঞ্চিত দু'টি মোহর আছে, গোপনে গণনা ক'রে গণৎকার জিজ্ঞাসা করায়,

জয়দেব কহে যাব কাননপারেতে।

বনে দস্যুর উপদ্রব। গণৎকার তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু, জয়দেব নিষেধ মানলেন না। তাঁর কাছে সত্যই দু'টি মোহর ছিল। ফলে,

[চারি দস্যু জয়দেবে পথে আগলিলা]।

দস্যুদলের সঙ্গে কথোপকথনের পরে জয়দেব চিন্তা করলেন,

দস্যুরে মোহর দিলে প্রাণরক্ষা হয়।

তাদের বললেন, মোহর দু'টি নাও। নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও। মোহর নিয়ে দস্যুরা চিন্তা করলে,—'এ বৈষ্ণব দাগাবাজ' বটে। আমাদের 'কয়েদ' করিয়ে ছাড়বে। বলাবলি করতে লাগলো,—

মোহর স্বপিলা দ্বিজ মনে ভয় পায়া। নিশ্চয় গ্রামেতে কথা দিবে জানাইয়া।

সুতরাং, তারা ফাঁকা কথায় প্রতারিত না হয়ে,

কহে দ্বিজের মস্তক নেহ এইখেনে। কেহ কহে হস্ত কাট না মার পরাণে।

অবশেষে, চারি দস্যু মিলে জয়দেবকে বেঁধে ফেলে, তাঁর হাতপা কেটে,

দ্বিজেরে পথের বামে গর্তে পেলি দিলা।

গভীর জঙ্গলে জয়দেব সেইভাবে পড়ে রইলেন।

এদিকে, দেশের রাজা শিকারে বের হয়েছেন। একজন তিলকধারী দ্বিজের এই অবস্থা দেখে তাঁকে ধ'রে ওঠানো হলো। তাঁর হাত-পা কাটা কেন, 'নির্বাক্য' অর্থাৎ বাক্‌রহিত জয়দেবের কাছ থেকে রাজা জানতে চাইলেন। জয়দেব বললেন, তাঁর জন্মান্তরের পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত। রাজা সেদিনের শিকার ছেড়ে, ভুবনবিদিত শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেবকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। 'বৈদ্য' ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন। দ্বিজের সেবায় 'দূত' নিয়োগ করলেন। জয়দেবের উপদেশে রাজা কল্যাণকর বৈষ্ণবসেবা প্রবর্তন করে দিলেন। রাজা বৈষ্ণবদের ধন এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করেন। রাজার বৈষ্ণবসেবার খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। প্রশ্ন হতে পারে, এই রাজা যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন, তাহলে তিনি কে? স্থান-কালের পারম্পর্যে এই রাজাকে, তৎকালে সেনপাহাড়ীর গড়নিবাসী লক্ষ্মণ সেন বলেই মনে করি।

এখন, সেই চারি দস্যুর ইচ্ছা হলো, রাজবাড়িতে সেবা নিতে যাবে। তারা চারজন রাজার ধর্মশালায় গিয়ে সেবা গ্রহণ করতে লাগলো। এদিকে, জয়দেব তাদের দেখা মাত্র চিনতে পারলেন। তাদের চিনতে পেরে,—

CENTRAL LIBRARY

কহে মোরে চৌরংঙ্গী করিলা এই চারি।

আমি রাজাকে ব'লে এদের আরও ধনদৌলত দেওয়াব। কারণ, এরা আমার অত্যন্ত উপকার করেছে। নতুবা,

মুর্ত অন্তে এই দণ্ড দিথ মোরে জম॥

সুতরাং, ধন দেয়াব চোরকে রাজার কাছেতে॥

দ্বিজ জয়দেবের নিকট রাজা আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করার পরে —

দ্বিজের বাক্যে রাজা তারে আদর করিলা।

রাজবাড়িতে মিষ্টান্ন ভোজন করার পরে,

পালঙ্কেতে শয়ন করিলা চারিজন॥

এবং রাজার কাছে জয়দেব এদের প্রশংসা ক'রে বললেন,—

এ বৈষ্ণব চারিজন বড় উবগারি॥

কিন্তু, জয়দেবের মুখে এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসা-বচন শুনে,

চোর বৈষ্ণবের [বড়] ভয় হৈল মনে।

ভাবলে, সেই দ্বিজ যাকে বনপথে পেয়ে,

চৌরংঙ্গি করিল জারে মোরা চারিজন। রাজগৃহে আইল কেমনে সে ব্রাহ্মণ॥

সুতরাং, যদি এখন এই ব্রাহ্মণ রাজার নিকট প্রকৃত ঘটনা ফাঁস ক'রে দেয়! অতএব সরে পড়াই নিরাপদ। তারা রাজার সামনে গিয়ে বললে, আমরা তিন দিন রইলুম, এইবার যাই। রাজা ধনরত্ন দিয়ে সসম্মানে তাদের বিদায় দিলেন। সঙ্গে তাদের 'পুটুলি' বয়ে নিয়ে চললো চারজন 'চাকর' বা 'রাজদূত'।

এদিকে, চোরের মন উসখুস করছে। রাজদূতদের নিকট তারা তাদের চৌর্য-কাহিনী কবুল ক'রে দিলে। এবং মিথ্যা ক'রে আরও বললে, জয়দেবই তাদের দলের সর্দার ছিল। সে আগে ধরা পড়ে রাজসাক্ষী হতে এসেছে। সেইজন্যেই আমরা,

করিলম চৌরংঙ্গি তারে না মারিলম প্রাণে॥

চোর চারজন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, জয়দেবকে 'দাগাবাজ' বললে; 'সাধু জয়দেবের' নিন্দা করলে। ফলে, শাস্তিস্বরূপে সহসা—

ধরনী ভিতরে প্রবেশিল চারিজন॥

—অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হলো। সম্ভবতঃ পাতাল-প্রবেশের রূপকে নারকীয় মৃত্যু।

জয়দেবকে চোর চারজনের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হলো। এই সংবাদ শুনে জয়দেব মূর্ছিত হয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তাঁর প্রতি নির্যাতনকারী চোর চারজন রাজবাড়িতে এলো; জয়দেব তাদের চিনতে পেরেও প্রতিশোধ না নিয়ে, তাদের ধন দেওয়ালেন,—

সেই পুণ্যে জয়দেবের হস্তপদ হয়।

এই কাহিনীর নির্গলিতার্থ হলো এই,—উদাসীন বৈষ্ণবজনের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ ক'রে, দস্যুদল জয়দেবকে 'যোগী চৌরঙ্গি-র অনুরূপ নিঃসম্বল ক'রে দিয়েছিল। তিনি 'উদাসীন' হওয়া সত্ত্বেও, মোহর সঞ্চয় ক'রে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন। সুতরাং, সঞ্চয়ী বৈষ্ণবকে মোহমুক্ত 'যোগী চৌরঙ্গি' করার ফলে, পুরস্কারস্বরূপে চোরেরা রাজসেবা এবং ধনরত্ন লাভ করেছিল। কিন্তু, মহাপ্রাণ সাধকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষাচারের ফলে, তাদের অপমৃত্যু

CENTRAL LIBRARY

ঘটলো। পক্ষান্তরে, চরম নির্যাতনকারীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের ফলে জয়দেবের কায়া স্বাভাবিক হয়ে উঠল। —এই হল দ্বিজ মোহনদাসের কথা।

ওদিকে আমরা জানি, সিদ্ধ যোগী গাম্ভুর-চৌরঙ্গির জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। বাংলা দেশের নাথ-সাহিত্যের সেই কাহিনী পাঞ্জাবে পাওয়া গিয়েছে—পূর্বী মাগধী বা প্রাচীন বাংলা ভাষাতে। গ্রন্থসাহেবে জয়দেবের রচিত নাথ যোগমার্গের যে-দুটি পদ সংকলিত হয়েছে সে-দুটি যে গীতগোবিন্দকারেরই রচনা—এই কাহিনী থেকে তার বলবৎ প্রমাণ পাওয়া গেল।

দ্বিজ মোহনদাসের রচনার এই অংশে নাভাজীর উল্লেখ ক'রে, অতঃপর রত্নাকর দস্যুর কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—জয়দেব হলেন ত্রেতা যুগের রত্নাকর।—

ত্রেতার শেষ পাপ রত্নাকরের ছিলা। জয়দেব হয়া কলিযুগে [জনমিলা॥
রাধাকৃষ্ণলীলা সেহ করিলা] বর্ণন। হস্তপত হৈল পুন পাইল মোচন॥
ত্রেতাযুগে বাল্মীক জয় [হৈলা জেমতে। রত্নাকর মুক্ত হৈলা] রামের কৃপাতে॥
ত্রিতাযুগেতে রত্নাকরের উদ্ধার। জয়দেব দ্বিজ পু [ন হৈলা অবতার॥]

—এই বিষয় অবগত হয়ে, রাজা পুনরায় জয়দেবের পাদবন্দনা ক'রে, তাঁকে গীতগোবিন্দের একটি পালা গান করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। জয়দেবের নিকট তাঁর গুণবতী স্ত্রীর পরিচয় লাভ ক'রে পদ্মাবতীকে কেন্দুলি থেকে শিবিকারোহণে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসা হলো। রাজসভায় জয়দেব-পদ্মাবতীর মিলন ঘটলো।

নৃত্যগীতে পদ্মাবতীর নৈপুণ্যের কথা রাজবাড়ির গোচরে এলো। রাজারাণী উভয়েই হৃষ্ট হলেন। পদ্মাবতীকে দর্শনের উদ্দেশ্যেও লোক সমাগম হয়। সকলে ভেট এনে জয়দেবের পদতলে উৎসর্গ করে। জয়দেব বাস করেন রাজার বাহির মহলে এবং পদ্মাবতী থাকেন প্রাসাদের অন্দরে। দিন যায়।

একদিন রাণীর বাসনা হলো, নটী পদ্মাবতীর সতীত্ব পরীক্ষা করবেন। এর মধ্যে রাণীর ভ্রাতার মৃত্যু হলো। স্বামীর মৃত্যুতে রাণীর 'ভাউজ' অর্থাৎ ভ্রাতৃজায়া তাঁর পিতৃগৃহে অবস্থান কালে সহমৃতা হয়েছিলেন। সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রে রাণী পদ্মাবতীকে বললেন,—

রাণী কহে হেন সতী নাহি জগতেতে। হেন পতিব্রতা সতী হয় তোমা হৈতে॥

—রাণীর এই বক্র ইঙ্গিতে পদ্মাবতী স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু রাণী তাঁর অভিসন্ধি রাজাকে জ্ঞাপন করলেন, এবং রাজার সহযোগে পদ্মাবতীর সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু জয়দেবের 'চৌরঙ্গি' হওয়ার ঘটনা স্মরণ ক'রে, অমঙ্গল আশঙ্কায় এবং অধর্ম ভয়ে ভীত হয়ে, রাজা অসম্মত হলেন। রাণীকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—

জয়দেবে চারিদন্ত চৌরঙ্গি করিলা। তথাচ চোরেরে তেহ ধন [দেয়াইলা॥
চারি চোরে] জয়দেব মুখে না কহিলা। দ্বিজের মনকোপে চারি দন্ত মরি গেলা॥

কিন্তু, রাণী জেদ ধরায়, অবশেষে, ধর্মসাক্ষী ক'রে, রাণীর বশ নৃপবরকে সম্মত হতেই হলো। জয়দেবকে সঙ্গে নিয়ে রাজা প্রাসাদ-উদ্যানে গমন করলেন। অন্দরমহলে রাণী তাঁর দাসীকে শিখিয়ে দিলেন, উদ্যান থেকে মিথ্যা সংবাদ এনে তাঁকে জানাবে—জয়দেবের মৃত্যু হয়েছে। রাণীর সঙ্কেতমতো দাসী বললে।—

বাগানে মরিল জয়দেব মহাশয়॥

রাণী এই সংবাদটি সাত-তাড়াতাড়ি পদ্মাদেবীকে শুনিয়ে দিলেন।

জয়দেবের মৃত্যু পদ্মা করিয়া শ্রবণ। রাধা[মাধব বলিয়া ছাড়িলা জীবন॥]

CENTRAL LIBRARY

উদ্যানে রাজার নিকট রাণী সংবাদ পাঠালেন, পদ্মাবতী মারা গেছেন। পদ্মার মৃতদেহ চাদর ঢাকা দিয়ে রাখা হলো।

জয়দেব ত্বরিতে মহল-ভিতরে গেলেন। গিয়েই—

আরম্ভিলা গীতগোবিন্দ কীর্তন। গান শুনি পদ্মাবতী পাইলা [জীবন ॥]

গীতগোবিন্দ-কীর্তন কর্ণকুহরে প্রবেশ করার ফলে, পদ্মাবতীর মৃত-কায়ায় কেবলমাত্র যে জীবন্যাস ঘটলো, তাই নয়। পদ্মাবতী সানন্দে,

জয়দেবের বামে বসি গাহিতে লাগিলা ॥

এই অভাবিত দৃশ্য অবলোকন ক'রে, রাজা রাণী উভয়েই তাঁদের পদপ্রান্তে নিপতিত হলেন। এবং অনুতাপে,

রাণী কহে হেন কর্ম না করিব আর।

নিয়ম প্রবর্তিত হলো, পদ্মাবতী জয়দেবের সহযোগে গীতগোবিন্দ-কীর্তন করবেন। এইভাবে দিন অতিক্রান্ত হতে লাগলো। পালা-কীর্তন সম্পূর্ণ ক'রে উভয়ে কেন্দুলিতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধব ভিতরে ভিতরে ওঁদের আকর্ষণ করছেন।—

রাজা কহে এক [মাস থাক মোর পুরী। মোর] বাক্য রাখ গোসাঁই চরণে ধরি।

দ্বিজ কহে কৃষ্ণ সেবা আছেন গৃহেতে। [আর না রহিতে পারি তোমা] র বাক্যেতে ॥

তথাপি,

রাজা রাণীর প্রেমে দোঁহে মাসেক রহিলা।

অতঃপর, জয়দেব ও পদ্মাবতী উভয়ে রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায় বেলায় রাজা কবি দম্পতিকে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে প্রভূত ধনরত্ন উপঢৌকন দিলেন। রাজার শিবিকারোহণে উভয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এবং সহাগত 'রাজদূত'গণকে বিদায় দিলেন।

দিন যায়, বৎসর যায়। জয়দেব নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন এবং গীতগোবিন্দ-কীর্তন অহরহ তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। অজয়-কেন্দুলি থেকে গঙ্গা অনেক দূরের পথ।—

[অষ্টা] দশ ক্রোশ গঙ্গা কেন্দুলি হইতে। জয়দেব নিতি স্নান করেন গঙ্গাতে ॥

—নিত্য গঙ্গাস্নানের তাঁর এই নিয়ম চলে আসছে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' রচনার পূর্ব থেকে। তখনকার যুবক জয়দেব এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তবুও পদব্রজে অতোখানি পথ অতিক্রম ক'রে গঙ্গায় তাঁর নিত্য আনাগোনা। তাঁর এই পথক্লেশ অনুভব ক'রে, একদিন মা গঙ্গা তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন,—

শুন জয়দেব আর এথা না আসিবা। বৃদ্ধ তুমি গৃহে বসি মোর ধ্যান করিবা ॥

জয়দেব উত্তরে বললেন,—নিত্য গঙ্গাস্নান না করলে আমার স্বস্তি হবে না। বিশেষতঃ, আমার কায়ার এই অন্তকালে। উত্তর শুনে গঙ্গাদেবী বললেন,—তোমার অজয়-কেন্দুলির স্বস্থানেই আমার দর্শন পাবে। জয়দেব বললেন, সে কেমন ক'রে হবে।—

দর্শন দিবে তোমায় চিনিব কেমনে।

তখন,

গঙ্গা কহে [আবির্ভাব হইবে] আমার। সেইদিন অজয়েতে হইবে জুয়ার ॥

সেদিন অজয়ে হবে কমলের বন। নিশ্চয় জা [নিবে তথি আমা] র গমন ॥

CENTRAL LIBRARY

পৌষ মাসের শেষ সংক্রান্তি দিনে। মকরের দিন সেই জগজনে [জানে।]

জয়দেব সাগ্রহে অপেক্ষায় রইলেন। এবং তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হলো।—

কথ দিন পরে মকর সংক্রান্তি আইলা॥

এবং এক দুর্লভ মুহূর্তে সাধক কবি জয়দেব সবিস্ময়ে—

প্রভাতে দেখেন দ্বিজ কম [লের বন। গঙ্গাদেবী আবির্ভাব দে] খে সর্বজন॥

—অর্থাৎ উপস্থিত সকলেই তা প্রত্যক্ষ করলেন। অকালে অজয়ে জোয়ার ও অলৌকিক কমল-কানন দর্শন ক'রে—

পদ্মাসহ জয়দেব গঙ্গাস্নান করিলা। অদ্যাবধি আছে সেই [আগমের লীলা।]

অজয়ের জোয়ার-জলে কমল-কাননে গঙ্গাস্নান ক'রে নাথযোগ-তন্ত্রমতে জয়দেবের সিদ্ধিলাভ ঘটলো। এবং জয়দেব-কেন্দুলির তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হলো। মোহনদাস বলেন,—তদবধি, মকর সংক্রান্তিযোগে অজয়ের এই কেন্দুলি-তীর্থে স্নান করলে,

অবশ্য মিলে তারে গঙ্গাস্নানের ফল॥

দিন যায়। জয়দেব ও পদ্মাবতীর দিন একই ভাবে চলে না। ওঁদের জীবনে মহাপ্রস্থান-পর্ব এগিয়ে এলো। একদিন—

রাত্রে পদ্মা কৃষ্ণের মন্দিরে জাই [গেলা। কৃষ্ণের পাদপদ্মেতে জীবন ত্যা] গিলা॥

পদ্মাবতীর দেহত্যাগের পরে, 'উদাসীন' জয়দেবের ভববন্ধন টুটে গেল। মন অশান্ত হয়ে উঠলো। ভাবলেন, কেন্দুলি ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে যাবেন।—

জয়দেবে কহেন দেশে আর কি কারণ। মরিলেন পদ্মা এথ [ন বৃথা এ জীবন।]

ইষ্টদেব রাধামাধব স্বপ্নযোগে তাঁকে বললেন,—জয়দেব,

তোমার সঙ্গেতে আমি জাব ব্রজপুরে॥

কিন্তু, রাধামাধবকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি ভাবে? রাঢ়দেশে তখন বিধর্মীর অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবে, তার গোপন পন্থা স্বয়ং রাধামাধবই স্থির ক'রে দিলেন।—

থাকিব তোমার কলমদানের ভিতরে। পথে তণ্ডুল ভিক্ষা করি [খাওাইবা মোরে।]

স্নান সমাপন ক'রে জয়দেব মন্দিরে প্রবেশ করলেন। নিত্য সেবার পরে,

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জো [জনা শ্রীপাদে করিলা। রাধামাধবে] রে কলমদানে রাখিলা॥

কলমদান বস্ত্রে বান্ধি করিলা [কান্ধেতে। রাধামাধবে লয়্যা চলিলা আন] দেতে॥

অজয়-কেন্দুলি থেকে বৃন্দাবন পৌঁছতে বৃদ্ধ জয়দেবের পদব্রজে দু'মাস সময় লাগলো।—

দ্বিতীয় মাসেতে পহুঁছিলা বৃন্দাবন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে 'ব্রজপুরী'তে উপস্থিত হয়ে শ্রীজয়দেব স্বরচিত সেই 'ধীর সমীরে' সঙ্গীতসুধায় যমুনাপুলিন মধুময় ক'রে তোলেন। তাঁর আত্মার আত্মীয়া পদ্মাবতীর বিয়োগবিধুর অশান্ত মন শান্ত হয়ে ওঠে। তিনি বসতি স্থাপন করলেন বৃক্ষতলে। দিবস যামিনী অতিক্রান্ত হয় কৃষ্ণ ভজনে। ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবকে 'কলমদান' থেকে উদ্ধার ক'রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ব্রজপুরে।

দ্বিজ মোহনদাসের মতে, এই হলো,—

সংক্ষেপেতে জয়দেবের কিঞ্চিৎ কথন। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ জ [গত বন্দন।]

CENTRAL LIBRARY

দ্বিজ মোহনদাসের 'ভক্তমালা'—গ্রন্থের ষষ্ঠ মালায় অজয় 'কেন্দুবিল্বি'র জয়দেব কথার এইখানেই ইতি। বলা বাহুল্য, চক্রদত্তের রচিত সংস্কৃত 'ভক্তমাল' এবং নাভাজীর (খ্রীঃ ১৫৭০—১৬৪০) ব্রজ ভাষায় বা প্রাচীন হিন্দীতে রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের মতো, দ্বিজ মোহনদাসের এই 'ভক্তমালা' গ্রন্থখানিও ইতিহাস নয়, কিন্তু, ইতিহাসের উপক্রমণিকা। বনমালীদাসের 'জয়দেব চরিত্র' যদি প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়, তাহলে সে এরই পরবর্তী প্রকারভেদ। কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে, জগন্নাথদাসের 'ভক্তচরিতামৃতে'ও জয়দেবের বিচিত্র জীবনকথা সংকলিত হয়েছে। আধুনিককালে পুরাণ রচিত হয়েছে 'লীলা ও নিত্যভাবে শ্রীজয়দেব-পদ্মাবতী উপাখ্যান।' লেখক অধরচাঁদ চক্রবর্তী। তাঁর রচনার অবলম্বন সনাতন গোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রেম-ভক্তি-কল্পবৃক্ষ'। এ ছাড়া, মথুরলাল মিশ্রের 'অজয় নদীর মাহাত্ম্যম্/জয়দেব-পদ্মাবতীর বিবরণ' এবং সম্প্রতি-প্রকাশিত মদনমোহন চট্টরাজের 'জয়দেব-পদ্মাবতী লীলাসুধা' গ্রন্থদ্বয়ও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, দ্বিজ মোহনদাসের অবতারিত এই কাহিনীটির নানা দিক্ থেকে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অজয়-কেন্দুলি জয়দেবের জন্মভূমি এবং লীলাস্থল—এই দাবী সম্পর্কে বর্তমান বাঙ্গালীর অবস্থা সেই ছেলেভুলানো ছড়ার খুকুমণির মতন,—মাছ ধরতে গিয়ে, যার ছিপ নিয়ে গিয়েছিল কোলা-ব্যাং-এ, আর মাছ নিয়েছিল চিলে। বাঙ্গালী বিদ্বানেরা রাঢ়দেশে অজয়-কেন্দুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান; এবং জয়দেবকে ওড়িয়া পণ্ডিতগণ উড়িষ্যায় নিয়ে চলে গেছেন। এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে ষোড়শ শতাব্দের পূর্বেকার পরম্পরাবাহী আলোচিত এই কাহিনীটি একটি পাথুরে প্রতিবাদ বলে গণ্য হতে পারে।

উত্তর রাঢ়ে অজয়-উপত্যকায় অবস্থিত 'সেনভূমি'র কেন্দ্রস্থলে, কর্ণাটী ভাষায় 'কেন্দুবিল্বি' নামে একটি গ্রাম অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দে বর্তমান ছিল। এবং এখনও আছে। মূল 'কেন্দুবিল্বি' শব্দটিরই তৎসমরূপ 'কেন্দুবিল্ব,' আর দেশিকে 'কেন্দুলি'। এই 'কেন্দুবিল্বি'র অদূরেই অজয়ের ওপারে 'সেনপাহাড়ী গড়' রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রথম বয়সের আবাসরূপে চিহ্নিত। কর্ণাটী কন্যা পদ্মাবতী জয়দেবের বৈধ স্ত্রী। জয়দেব প্রথম যৌবনেই গীতগোবিন্দ-রচনা সমাপ্ত করেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থের প্রতিস্পর্ধী 'অভিনব গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু, তার ফলে, পুরীর মন্দিরে গীতগোবিন্দ-গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা খর্ব হয়নি। ধর্মমতে জয়দেব সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ছিলেন না। নাথযোগমার্গে স্বগ্রামেই তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। এবং এই কারণবশতঃ অজয়-কেন্দুলি গ্রামটি তদবধি তীর্থগৌরব লাভ করে। শেষ বয়সে, পদ্মাবতীর দেহত্যাগের পরে, অজয়-কেন্দুলি ছেড়ে, জয়দেব শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন নি; শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।—এই সকল তথ্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনা বৃহত্তর কাজের অপেক্ষায় আপাততঃ মুলতবী রাখা গেল।

CENTRAL LIBRARY

দুর্গাবরী বাংলা রামায়ণ

তরণীকান্ত ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের কেহই বোধ হয়, দুর্গাদাস রচিত বাংলা রামায়ণের সন্ধান পান নাই। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা রামায়ণের উপর একখানা পৃথক গ্রন্থ লিখিলেও দুর্গাবরের রামায়ণ সম্পর্কে নীরব; তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়' নামক গ্রন্থেও দুর্গাবরের কোন উদ্দেশ মিলিতেছে না। ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে দুর্গাবরী রামায়ণ সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনিও দুর্গাবরের বাংলা রামায়ণের কোন সন্ধান পান নাই। আর সেইজন্যই, কামতা-কামরূপের মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের অন্যতম দুর্গাবরের গ্রন্থের আলোচনাকালে কতকটা কবির নাম প্রসঙ্গেই তিনি লিখিয়াছেন, 'দুর্গাবরের ভণিতায় রামায়ণ-কাব্যও অসমিয়া ভাষায় পাওয়া গিয়াছে।' কিন্তু বাংলাভাষায় দুর্গাবর-রচিত রামায়ণের কোন সন্ধান তাঁহার গ্রন্থেও পাইতেছি না।

অসমিয়া সাহিত্যের একখানা ইতিহাসেও দেখিতেছি লেখক দুর্গাবরকে অসমিয়া সাহিত্যের কবিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার এই প্রতিপাদনের মূলে আছে অসমিয়া ভাষায় রচিত দুর্গাবরের সেই গীতিরামায়ণ যাহার আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডের সাক্ষাৎ তিনি পান নাই; তবে মহিলা কবি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর নিকট হইতে অযোধ্যা কাণ্ডের চারিটিমাত্র শ্লোক তিনি পাইয়াছেন।

সম্প্রতি দুর্গাবর দাস-রচিত অরণ্যকাণ্ডের বত্রিশ পত্রের একটি পুঁথি দেখিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি।[১] পুঁথিটি এককালের কামতা-কামরূপ রাজ্যের অংশবিশেষ বর্তমান কুচবিহার জিলার একজন কৃষকের গৃহ হইতে পাওয়া বলিয়া শুনিয়াছি। পুঁথিতে সংস্কৃত ক্রিয়াপদ 'বদতি'-র বহুল ব্যবহার দেখা যাইতেছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ সেন দুর্গাবরের মনসামঙ্গল হইতে যে উদ্ধৃতি দুইটি তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন তাহাতেও দেখিতেছি এই বিশেষ সংস্কৃত ক্রিয়াপদটির ব্যবহার রহিয়াছে। আমাদের হাতে যে পুঁথিখানি আসিয়াছে তাহা ১২৫৫ সালের (অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের) একখানা প্রতিলিপি। সুতরাং এখন হইতে পৌনাশত বৎসর পূর্বে এই পুঁথিটি সাকিন কানামলি নিবাসী শ্রীপিতালু দাস কর্তৃক অন্য কোন পুঁথি হইতে নকল করা।[২]

সম্ভবত এই লিপিকর শ্রীপিতালু দাসের কথ্যভাষা ছিল বাংলাভাষারই অন্যতম উপভাষা কামরূপী বা রাজবংশী। পুঁথিপ্রমাণে মনে হইতেছে লিপিকর খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না এবং লোকসমাজে সাধারণত প্রচলিত তৎসম শব্দের যে বিকৃত উচ্চারণ তাহাই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে 'শূর্পণখা'র যে কায়িক বিকৃতিই লক্ষ্মণের হাত দিয়া বাল্মীকি মুনি করিয়া থাকুন; লিপিকর কিন্তু তাহাকে 'সর্পরেক্ষা' না করিয়া ছাড়েন নাই। অনুরূপ বিকৃতি আরও অনেকস্থলেই পুঁথিতে মিলিতেছে। এইসঙ্গে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে

১. কুচবিহারের পাক্ষিক-পত্র 'বল্লীক'-এর সম্পাদক শ্রীযোগেশ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে এই সুযোগটি মিলিয়াছে।

২. পুঁথির পুষ্পিকা এইরূপ: 'ইতি পুস্তক সমাপত। অর্থাৎ[illegible] তথালিতা সেন্দুরের দোসাদি। হস্তাক্ষর শ্রীপিতালু দাস সাকিনম্ কানামলি। স...১২৫৫ সন বিক্রাদীক ১৮ হরাদ রোজ বুধবার উজানী বেলা...পহর।'

CENTRAL LIBRARY

এইরূপ উচ্চারণানুগ বানানবিন্যাসে বর্তমান লিপিকরেরই বা কতটা দায়িত্ব এবং তিনি যে লিপিকরের পুঁথিদৃষ্টে নকল করিয়াছেন তাহারই বা কতটা দায়িত্ব তাহা নির্ণয় করা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। তবে এই দায়িত্ব মূল কবিকে না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত; তাহার পরবর্তীকালের পুরুষানুক্রমিক লিপিকরসমূহের অযত্ন-বিন্যাস বা উদাসীনতা অথবা তাহাদের লোকসঙ্গীত গায়কদের উচ্চারণের অনুগামী হইয়া চলার অতিরিক্ত প্রবণতাই খুব সম্ভব এই বিকৃতির জন্য দায়ী। কবিকে যে এই দোষ দেওয়া যায় না তাহা স্থানে স্থানে যে পদবিন্যাস রহিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অবশ্য লিপিকরদের প্রমাদ এই সমস্ত স্থানেও হানা দিয়াছে। একটি উদাহরণ দিতেছি:

চিত্রের পুত্তলি যেন চিত্রপটে লিখিতেন
নবনিবলিত সমদেহা।
পরম সুস্তির গতি গুহরি জিনিয়া হে
জন্মবিরহিত মোর নেহা॥

অংশটির অন্তর্গত 'সুস্তির' এবং 'গুহরি' কবির কলমে 'সুস্থির' ও 'কুঞ্জর'রূপে বাহির হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক। এতৎসত্ত্বেও লিপিকর পিতালু দাসের নিকট বাংলা সাহিত্য এখনও ঋণী—বাঙালী সমাজ কৃতজ্ঞ।

আমাদের হাতে যে পুঁথিখানা আসিয়াছে তাহা পড়িয়া মনে হয় দুর্গাবর বাংলা ভাষাভাষী কবি এবং বাংলা ভাষায়ই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তারপর জনপ্রিয়তা ও আঞ্চলিকপ্রভাবে ক্রমে তাঁহার কাব্য রূপান্তরিত হইয়া অসমিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাংলা মনসামঙ্গলের অন্যতম বিখ্যাত কবি নারায়ণদেবের বেলায়ও ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছে। আমাদের এই পুঁথিখানাকে অসমিয়া বলার কোন কারণ নাই। অসমিয়া যখন (আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) বাংলাভাষা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে তখন হইতে তাহার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে থাকে যে বৈশিষ্ট্য আমাদের পুঁথিতে মিলিতেছে না। সুতরাং দুর্গাবরের রামায়ণকে অন্তত এই একটি কাণ্ডের ভিত্তিতে বাংলাকাব্যের অনুবাদ শাখাভুক্ত না করার যুক্তি আমরা পাই না। যে অনুলিপি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে করা হইয়াছে তাহার ভাষাকে মূল অসমিয়া রামায়ণের বঙ্গীকৃত রূপ বলার মত কোন প্রমাণও আমাদের জানা নাই।

আলোচ্য পুঁথিটির বত্রিশটি পত্রই তুলট কাগজের। ইহার মাপ ১৬" × ৪" ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮/৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। বত্রিশটি পত্রের মধ্যে ১ম ও ৩২শ সংখ্যক পত্রে এক এক পৃষ্ঠায় লেখা এবং অন্যান্য পত্রে উভয় পৃষ্ঠায়ই লেখা। পুঁথির মধ্যে শ্লোকসংখ্যাজ্ঞাপক ক্রমিক অঙ্কপাত করা নাই। আমরা পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি তৈয়ার করিয়া ক্রমিক অঙ্কপাত করিয়া দেখিতেছি ইহাতে ৭১১টি পূর্ণ শ্লোক আছে এবং ২১টি আছে শ্লোকার্ধ। সম্ভবত এই ২১টি ক্ষেত্রে পূর্ণশ্লোকই কবি লিখিয়াছিলেন। তাহা হইলে মোট অন্তত ৭৬২টি শ্লোক এই পুঁথিটির মূলে ছিল। কাহিনীধারার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য ২১টি ক্ষেত্রে না হইলেও অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে পূর্ণ একটি বা একাধিক শ্লোক থাকার কথা।

পুঁথিতে ব্যবহৃত ছন্দের প্রধান অংশ স্বাভাবিকভাবেই পয়ারের (পদ) প্রাপ্য; তারপর নাচারি। কিছু আছে 'দীর্ঘছন্দ' নামে। নাচারীর সঙ্গে রাগরাগিণীর উল্লেখ এইরূপ পাওয়া যাইতেছে 'রাগ গুহরি', 'রাগ রামগিরি', 'রাগ সুরারী', 'রাগ যহির' এবং 'রাগ বরারি'। নাচারী আছে কিন্তু রাগের উল্লেখ নাই এমন ক্ষেত্র পাইতেছি ছয়টি। শ্লোকসংখ্যাজ্ঞাপক ক্রমিক অঙ্কপাত ইহাতে না থাকিলেও কয়েকটি স্থানে কিছু কিছু অঙ্কপাত দেখা যাইতেছে; কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

এইরূপ অঙ্কপাতের কোন সার্থকতা আমরা বুঝিতেছি না। আমাদের করা প্রতিলিপিতে প্রদত্ত যে ক্রমিক সংখ্যাস্থানে পিতালুদাসের হাতে যে অঙ্কপাত করা আছে তাহা এইরূপ :

আমাদের করা প্রতিলিপি	পিতালু দাসের মূল পুঁথি
১৫০	১৪।৪৪
২৬৬	১৪।৪৪
২৬৮	১৪।৪৪
৪৬১	১৪।৪৪।৫
৫২১	১৪।৪৪
৫৫০	১৪।৫৪
৫৭৫	৫৪৪৩
৬৮৫	৪১৭
৬৮৬	৪।৪
৬৮৮	৪।৪১
৬৮৯	৫।৪৭
৬৯১	৮৪।৪

পুঁথিটির নানাস্থান কীটদষ্ট এবং এই দষ্ট অংশগুলি প্রায়ই উপরে-নীচে প্রসারিত ডাইনে-বামে নহে। সুতরাং কীটদংশন পাঠ উদ্ধারে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবে কোন কোন পত্রে উপর ও নিম্নপ্রান্তে ১" হইতে ২" ইঞ্চি পর্যন্ত অংশ খসিয়া যাওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণ পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যায় নাই। হস্তাক্ষর খুব কাঁচা; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তথা উ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনের লেখন-পদ্ধতি পুরাতন ধরণের। পুঁথিপাঠে অসুবিধা বোধ হইয়াছে শ, ষ, স ও প-বর্গের তথা ন, ণ এবং ল-এর পাঠে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান আশ্রয় করিতে হইয়াছে। কারণ, এই দুই গুচ্ছের অক্ষরের আকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন—পার্থক্য নির্ধারণে আঞ্চলিক ভাষায় অভিজ্ঞ সুধী ব্যক্তির সহায়তা এখনও অপেক্ষিত।

লিপিকরের প্রমাদবশতঃ কোন কোন স্থলে যেমন একটি অক্ষর বাদ পড়িয়াছে (না কান্ধ ২ **সি** হে তেজ হনুমান) তেমনি এক একটি অক্ষর কোথাও কোথাও অতিরিক্ত লেখা হইয়াছে (লক্ষণের বাক্য **বাক্ষ** স্থনি ক্রুদ্ধিত গোসানি); কোথাও বা একটি অক্ষর লিখিতে অন্যটি আসিয়া গিয়াছে (দেক্ষি দশরথ আইগ স্বর্গপরিহরি / সংসার স্থাপাল রাম তিতি লোকেশ্বর)। পয়ার ও ত্রিপদীর অন্ত্যমিল সম্পর্কেও লিপিকর উদাসীন। প্রায় প্রতি শ্লোকেই অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণিত, মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণিত, ঘোষবৎ ধ্বনি অঘোষ এবং অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আছে একক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বকৃত উচ্চারণসম্বত বানান। এই লক্ষণটি অবহট্‌ঠ ভাষার পক্ষেই স্বাভাবিক; তবে হয়তো বাংলাভাষার অন্যান্য উপভাষা হইতে কামরূপী উপভাষা বেশী রক্ষণশীল বলিয়া এই বৈশিষ্ট্যটি পুঁথিতে বজায় রহিয়াছে।

পুঁথিটির ভাষায় একক অসমিয়ার কোন সাক্ষ্য মিলিতেছে না। অসমিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অকারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের চিহ্ন শুধু 'র' যেখানে বাংলাভাষায় অনুরূপ ক্ষেত্রের চিহ্নটি প্রায়শ 'এর'। আলোচ্য পুঁথিতে

CENTRAL LIBRARY

যত প্রয়োগ আছে তাহাদের মধ্যে একটিমাত্র স্থান ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই 'এর' পাইতেছি। যেমন, 'কোপে কথা পুছে দশরথের কুমার / হরণাকাণ্ডের কথা সুন সর্বজনে / শিশুরূপে ফেলি ফেলে জগতের আই / গয়াপিণ্ড লইয়া চল স্বর্গের উপর / উপরত হৈক গো-মানুষের ছক্কার / রামের চরণ বন্দি কহে দুর্গাবর। যে ব্যতিক্রমের কথা বলিয়াছি তাহা হইল; 'রাঘবর শিবিরের উপর'। ইহার কারণ কামরূপী উপভাষার অঞ্চলে গায়কদের উচ্চারণের প্রভাব; আর এই কাণ্ডটি যে সুরসংযোগে গীত হইত তাহা রাগরাগিণীর উল্লেখ হইতেই অনুমেয়। এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় পরবর্তী (শিবিরের) শব্দটিতেই 'এর' বিভক্তির প্রয়োগ; তাহা ছাড়া লিপিকর প্রমাদও ইহার কারণ হইতে পারে।

অসমিয়া ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য 'বোর', 'বিলাক' 'ইত' 'মথা' 'জাক' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া বহুবচনের পদ গঠন করা। আলোচ্য পুঁথিখানিতে ইহাদের চিহ্নমাত্র আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। বহুত্ব-বোধক পদ বা পদগুচ্ছের কিছু উদাহরণ দিতেছি,—সবারে সরিলে / পুছিয়েক তা সন্তাক / ছত্র জন /সভারে সরিলে/ সব ভাটে / বন্ধুগণ / যামাড়া তিন / নানা পরকারে / বাণগণ / সর্বগুণে / জত কাজ / তিনি বির / যক্ত ২ সব / কেশ ভার / জতেক কথা / রাটগোটা / রাখোয়াল সবে / সাত পাছ গোরাক্ষিয়া। দ্বিবচনের দুইটিমাত্র ক্ষেত্র লক্ষ্যগোচর হইয়াছে যথা—'চাক্ষু জুগলে' এবং 'বগজোড়েনে'। এইগুলি এবং এইজাতীয় ভিন্ন আর কোন প্রত্যয় বা পদের যোগ বহুবচন বা দ্বিবচনবোধকরূপে পাওয়া যায় নাই।

অসমিয়া ভাষার অপর একটি বৈশিষ্ট্য তুমর্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার পদগঠনে 'বলৈ', 'ইবলৈ' প্রত্যয়ের যোগ। পক্ষান্তরে সেইরূপ পদগঠনে বাংলায় প্রযুক্ত হয় 'ইতে' প্রত্যয়। আলোচ্য পুঁথিতে অসমিয়া প্রত্যয়নিষ্পন্ন একটি পদও আমরা দেখিতেছি না; যাহা পাইতেছি তাহার সবগুলিই 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য,—বিলম্ব করিতে / সহিতে নারি / নামাইতে না জুয়ায়ে / পিণ্ড লইতে / ঘুসিতে লাগিল / বর্ণাইতে না পারি / জুদ্ধ করিতে/ দেখিতে সুবেস / সিতাক ছলিতে জাও / এড়াইতে না পারি / সুমরিতে হৃদয়ে বিদরে / ধরিতে না পারে / দিতে চাহে / ছোড়াইতে লাগে তাক ইত্যাদি।

পুঁথিটিতে এমন কয়েকটি পদের প্রয়োগ রহিয়াছে যাহা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দেখি নাই; এমন একটি পদ হইল 'পাব' ইহার প্রয়োগগত অর্থ হইল 'পা' (foot); অবশ্য ইহার কাছাকাছি পদের ব্যবহার বঙ্গালী উপভাষায় 'পাও'-রূপে চলিত আছে। দুইটি শব্দই তৎসম 'পাদ' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। 'পাব' পদটি লিখিতে আকাঙ্ক্ষিত অন্তঃস্থ 'ব', যে 'ব' লিখিতে অসমীয়া লিপিতে-'ৱ' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়; পুঁথিতে কিন্তুর পাইতেছিনা; বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর যে অভিন্নরূপ বাংলালিপিতে প্রচলিত এখানে তাহাই পাইতেছি। অন্যান্য পদগুলি এই:—দুনাই (= পুনরায়) হয়া (= অবতীর্ণ হইয়া?) অতি বিপরীত (intensely), গোসানি (= দেবী), মটক্ষেলা ও মটকরি।

পুঁথিটির কারকবোধক বিভক্তিগুলির সবই বাংলা ভাষার অন্য মধ্যযুগোচিত; কিছুটা আদি মধ্যযুগোচিত। অপাদান কারকে 'ত', 'হন্তে' ও 'হইতে'-র প্রয়োগ আছে। অসমিয়াতে এই কারকে সাধারণত 'পরা' বা 'রপরা' প্রযুক্ত হয়। করণেও 'ত' আছে এবং সম্বন্ধে আছে 'ক'। অধিকরণেও 'ক' পাইতেছি। অসমিয়ার করণে 'ৱ' ও 'এরে' হয়। পুঁথির কারকগুলি অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে অন্যরূপেও ব্যাখ্যাগম্য।

পুরুষবাচক সর্বনাম পদ এই পুঁথিতে যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা এইরূপ—

প্রথমপুরুষ—তাঞ, তাঞের, সে, তাক, তার, তাহাক, তাহার, তঙ্গু (= তছু?)।

মধ্যমপুরুষ—তুমি, তোমাক, তোমার, তোকে, তোর।

CENTRAL LIBRARY

উত্তমপুরুষ—য়ামি, য়ামা, য়ামাক, য়ামার মুঞি, মোক, মোর, মোহোর।

'আপন' শব্দের বহুলপ্রয়োগ এই পুঁথিতে থাকিলেও কোথাও গৌরবে মধ্যমপুরুষবাচিরূপে ব্যবহৃত হয় নাই—'নিজ' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে সম্ভ্রমার্থে বা গৌরবার্থে প্রযুক্ত মধ্যমপুরুষবাচী কোন সর্বনাম শব্দ কামরূপী উপভাষায় এখনও প্রচলিত নাই। অথচ ক্রিয়াপদে সম্ভ্রমার্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনকে বুঝাইতেও বহুবচনের পদ প্রযুক্ত হয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার 'কাকা' আপনি কোথায় যাচ্ছেন' স্থলে কামরূপী উপভাষায় এইরূপ দাঁড়ায়—'কাকা, তোমরা কোঠে জাছেন/তম্‌হা কুন্‌টি জাছেন/তোমরা কোঠে জাবার লাগচেন/তোমরা কুন্‌তি জাবার ধচ্চেন/তোমরা কুন্‌তি জান্‌। শেষের উদাহরণটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, সামান্য বর্তমানের সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়াপদ ঘটমান বর্তমানের অর্থও প্রকাশ করিতেছে। বঙ্গালী উপভাষাতেও ইহাই অন্যতম রীতি।

সমগ্র পুঁথিটির কোনস্থানেই নিত্যবৃত্ত অতীতের কোন পদই পাওয়া যায় নাই। তবে উহার অর্থপ্রকাশ পাইয়াছে কিছুটা ভিন্নরূপের মাধ্যমে যথা,

'সে পাপি সহিতে জদি লয়া আইস সিতা।
তবে ত তোমার জস রৈল হয়ে পুতা॥' ৪০৪

অথবা

'সিতার নিমিত্তে তবে রহিলন্ত প্রাণ।
নহে ত করিলু হয়ে সমুদ্রে নির্জ্জন॥'৩৭৯

'আমি হৈলে লাজতে তেজিলামু হয়ে প্রাণে।'৫৪০

কথ্য কামরূপীতে আজও নিত্যবৃত্ত অতীতের পদ না থাকায় কতকটা এইভাবে উহার অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে :—যদি বৃষ্টি হইত তবে ফসল ভাল হইত—এই বাক্যটির অর্থ কামরূপীতে প্রকাশ করিতে গেলে দাঁড়াইবে—'যদি দেওয়ার জল পড়লেক হয়, তা হোলে আবাদ ভালো হোলেক্‌ হয়।' শত্রন্ত পদে সপ্তমী বিভক্তির 'এ' যোগ করিয়া প্রাচীন বাংলা হইতে যে পদ গঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা একটি শ্লোকে লক্ষ্য করা গিয়াছে (জিয়ন্তে মৃত্যুক হইল)। এইরূপ আরও একটি প্রাচীন পদ গবন (=গমন) কয়েকবারই এই পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। আদি মধ্য বাংলার অন্যতম লক্ষণ পদের অন্তস্থিত একক ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত আকারের উচ্চারণ এই পুঁথিতেও বর্তমান। অবশ্য ইহারই জন্য পুঁথিটিকে আদি মধ্য বাংলারও বলা চলে না—ইহার প্রধান কারণ কামরূপী উপভাষার রক্ষণশীলতা। তাছাড়া অন্ত্য মধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'ইল' ও 'ইব' দিয়া যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ এখানে রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলাভাষায় সংযোজক প্রকার (Subjunctive mood) বুঝাইবার জন্য ধাতুর সহিত যে প্রত্যয় যোগ করা হইতে পারিত তাহার কিছুই প্রচলিত নাই; সেইজন্য সাধারণতঃ বলা হয়, বাংলায় সংযোজক প্রকার নাই। কিন্তু সংযোজক প্রকারের অর্থ অন্য প্রকার (নির্দেশক বা অনুজ্ঞা) দ্বারা তথা বিশেষ বিশেষ শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করার রীতি আছে। যেমন, সে যদি আসে/আসিত তবে আমি যাই/যাইতাম। অনুরূপ রীতি আলোচ্য পুঁথিটিতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

'যদি বা মরিল সিতা মনের সন্তাপে।
তার জিব রক্ষিতে না পারে জমের বাপে॥' ৫১৯

CENTRAL LIBRARY

'জাহাকে পুছি জদি কার্য্যমান দেক্ষি।' ৪৮৮
'যদি সিতা ভজিয়াছে আপোন মনুমানে।
তবে তাক মারিবো রাবণের সনে॥' ৬১০

যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের নিদর্শনও পুঁথিটিতে পাওয়া যাইতেছে, যদিও সংখ্যায় খুব কম। যেমন,

যৌগিক ক্রিয়া— 'কি কারণে ভাবি যাছ হেট করি মাথা।'
'দুই চক্ষু মেলি যাছে দেক্ষি লাগে ভয়।'
'উত্তর সিয়রে পক্ষি যাছেন পড়িয়া।'

যৌগিক কাল— 'যদি মোর সিতা হরি **নিছে** কোন জনা।'
'হারাইছে গোসানি।'
'কি কারণে **হইবেক** তোর যেতেক (য) বন্তা।'
'সাত পাছ গোরাক্ষিয়া **হৈছে** একেঠাই।'

কতকগুলি পদ আসলে সমাসবদ্ধ হইলেও রূপের দিক হইতে কিছুটা অদ্ভুতভাবে ব্যস্ত বলিয়া মনে হয়। যেমন, রাজ্যেরশ্বর (রাজ্যেশ্বর), সহুরাজ (শত্তররাজ), প্রাণের স্বরি (প্রাণেশ্বরী), মধুর সোধোন (মধুসূদন), মনের স্তাপ (মনস্তাপ) প্রভৃতি।

পুঁথিটিতে এমন একটি পদ পাইতেছি যাহার ব্যাখ্যা কর্তৃবাচ্যে না করিয়া কর্মভাববাচ্যে করাই যুক্তিসঙ্গত। পদটি পাইতেছি এই শ্লোকে—

না **জানিয়া** কথা হৈতে যাইল যেকজন।
যবস্তে করিব তাক সবংশে ছেদন॥ ৪৮৩

ইহার প্রথম পঙ্‌ক্তির সংস্কৃত প্রতিরূপ 'ন জানিতকং (=জ্ঞাতং) কুত আয়াত একো জনঃ। ইংরেজীতে রূপান্তর করিলে দাঁড়াইবে—'It is not known whence has a person arrived'। প্রয়োগটি সম্ভবত প্রাচীন বাংলা হইতে আগত এবং দৈবাৎ কালের স্বাভাবিক পরিবর্তনধারার তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অটুট রহিয়া গিয়াছে এবং রক্ষণশীল কামরূপী উপভাষার কবিকৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তদ্ভব ও তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে প্রয়োগও এই পুঁথিতে অজ্ঞাত নয়। যেমন, বাইরাই / উভারিয়া / ছঙ্করিল / গুঞ্জরে / বধিব / বিলাপয়ে / জোগাইবে / বারাইন্থ ইত্যাদি। বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার সবগুলি রূপই পুঁথিখানিতে বর্তমান—ই, -ইয়া, -ইলে, -ইতে-অন্ত রূপের মধ্যে; আর আছে ইবা-অন্তক ক্রিয়াবাচী বিশেষ্যের উত্তর র-প্রত্যয়ের যোগে তুমর্থক ক্রিয়ার ভাবপ্রকাশ। যথা করি, পাইয়া, স্তুনিলে, এরাইতে এবং জানাইবার। ইহা ছাড়া পাইতেছি 'হয়া' 'জায়া' 'লয়া' 'পায়া' প্রভৃতি রূপের অসমাপিকা ক্রিয়াপদ যাহা বরেন্দ্রী উপভাষাস্থলভ।

সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ—বদতি, বোলে, আছেন, থাকো, নাহিকে, জানিস, জানাহোঁ, পুছহোঁ, ডাক, চিন্ত; কান্দন্ত, জান্ত, গুণন্ত, পান্ত প্রভৃতি শত্রন্ত নিত্যবৃত্ত বর্তমান। সম্বন্ধার্থক ইল-অন্ত অতীতকালের পদও আছে। যেমন, দিলন্ত, আসিলন্ত, চিন্তিলন্ত প্রভৃতি। ইহা ছাড়া আছে ভৈলা, করিল, মারিলেক দেখিলু, করিলা, দিলা পাইলাম প্রভৃতি পদ। বর্তমান অনুজ্ঞার উদাহরণ—পুস্থক, হৈক, হউক, কহিয়, করিয় স্তুনহ, জাও জানা, শুনা, বোলা, রাক্ষোহো কর, বলিয়ক, শুনিয়ক ইত্যাদি। ভবিষ্যতকালের পদ যথা—করিব, ছুইবা, খণ্ডিবেক, জামু, ক্ষামু, রহিবেক, জোগাবো ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY

ভণিতা পাইতেছি আঠাশটি স্থানে। তিনটি স্থানে অতিরিক্ত তিনটি ভণিতা থাকিতে পারিত কিন্তু কার্যত নাই। কবির পরিচয়—তিনি 'রামের' / 'হরির' 'দাস' বা 'কিঙ্কর'—নাম 'দুর্গাবর' / 'দুর্গাবর দাস'; তিনি 'কবি'; তাঁহার মন 'কথাশুদ্ধ'; তিনি কখনও 'ভণে' কখনও 'কহে'-ন, কখনও বা 'কয়ে'-ন এবং কখনও আবার 'বোলে'-ন। গ্রন্থের নাম 'অরণ্যকাণ্ড'; গ্রন্থের শ্রেণী 'কবিগীত' / 'প্রবন্ধবচন' / 'শ্রীরাম পাঞ্চালী'; ইহা তাঁহার 'মধুময় কৃত্য' / 'পুণ্যকথা'।

কাব্যকাহিনী (সংক্ষিপ্ত)—বনবাসকালে রামচন্দ্র চিত্রকূটে থাকিতে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ গয়াগমন করেন—উদ্দেশ্য পিতৃপিণ্ড দেওয়া। গয়ায় রামলক্ষ্মণের ক্ষণিক অনুপস্থিতির অবসরে দশরথ স্বর্গ হইতে আসিয়া সীতার নিকট হইতে বালির পিণ্ড চাহিয়া নেন। পরে রামলক্ষ্মণ যথারীতি পিণ্ডদান করিয়া দণ্ডকারণ্যে আসেন। সেখানে বিশ্বকর্মানির্মিত মঠে বাসকালে একদা রামের মনে অযোধ্যার স্মৃতি জাগে এবং তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। সীতা মায়া-অযোধ্যা সৃষ্টি করিয়া রামকে সান্ত্বনা দেন। একদিন শূর্পণখার প্রেম নিবেদনের ফলে মারীচের সহায়তায় রাবণের সীতাহরণ সম্পন্ন হয়। রাম 'আকাশী বাণী'র নির্দেশে সীতার খোঁজে দক্ষিণে যাইতে যাইতে 'চাকোয়া' পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে রামের বীরত্বে উপহাস করে। রাম তাহাকে অভিশাপ দিয়া অগ্রসর হইলে বকের সহিত দেখা হয়। বকের নিকট সীতাহরণের বিষয় জানিয়া রাম তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত বর দেন এবং লঙ্কা আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া মৃতপ্রায় জটায়ুর নিকট সীতাহরণ বৃত্তান্ত শোনেন এবং ক্ষণপরে মৃত জটায়ুর শেষকৃত্য সমাধা করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের একগ্রামে পৌঁছেন। এদিকে রাবণ জটায়ুর হাত হইতে মুক্তি পাইয়া পুনঃ সম্পাতিপুত্র সুপার্শ্বের হাতে পড়ে এবং ঘোর যুদ্ধের পর রাবণ অনুনয়ের সহিত সুপার্শ্বকে উপহার দিয়া তুষ্ট করিয়া বিমানে লঙ্কায় পৌঁছেন এবং ভগ্নী ত্রিজটার রক্ষণাবেক্ষণে সীতাকে অশোকবনে রাখেন। রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার গ্রামে এক বৃক্ষতলে লক্ষ্মণের উরুতে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যান। সেই বৃক্ষেরই ডালে বসিয়া ক্রন্দনরত সুগ্রীবের অশ্রু রামের শরীরে পড়িলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি লক্ষ্মণের অশ্রুসন্দেহে তাহাকে তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের তুলনায় আমাদের পুঁথিটি দৈর্ঘ্যে কমই হইবে। কৃত্তিবাসে সবই পয়ারে গাঁথা। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির বাতাপী-ইল্বলের কাহিনী আমাদের কাণ্ডে নাই। দূষণ এখানে হইয়াছে 'দুস্বর'। শবরী ও কবন্ধের কাহিনীও আমাদের পুঁথিতে নাই। কিন্তু সীতার বালির পিণ্ডদান এবং রামের চাকোয়া ও বকের সহিত মিলন আমাদের পুঁথিতে নূতন। অবশ্য কৃত্তিবাসের কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে সীতার বালির পিণ্ডের কথা আছে। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি কবন্ধের হস্তের যে দৈর্ঘ্য দিয়াছেন আমাদের পুঁথিতে সেইরূপ দৈর্ঘ্য পাইতেছি রামের বরে প্রাপ্ত বকের গলায়। দুর্গাবরে জনস্থান, পঞ্চবটী বা গোদাবরী নাই;—আছে দণ্ডকারণ্য ও চন্দ্রভাগা নদী। কৃত্তিবাস ও দুর্গাবরে সুপার্শ্বের অনুগ্রহলাভে রাবণের মুক্তি একরূপ। তবে দুর্গাবরে অতিরিক্ত আছে রাবণের ষোলটি হস্তী উপহার এবং পুত্র সুপার্শ্বকে সম্পাতির নিন্দা। নাককাটার পরই দুর্গাবর শূর্পণখাকে রাবণের নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস ও বাল্মীকিতে আছে খরদূষণের হত্যার পর শূর্পণখার লঙ্কাগমন। কৃত্তিবাসের শরভঙ্গ ও অত্রিমুনির আশ্রমের কথা দুর্গাবরে নাই। চিত্রকূট ত্যাগের কারণ দুর্গাবরে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া কিন্তু কৃত্তিবাসে পাই—রাক্ষসদের উৎপাতেই রাম ও মুনিগণ চিত্রকূট ত্যাগ করেন।

বাল্মীকি রামায়ণের বিরাধবধ এবং সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্য নামক দুই ঋষির সহিত রামের সাক্ষাৎকার দুর্গাবরে নাই। বাল্মীকিতে আছে লক্ষ্মণকর্তৃক গোদাবরী তীরে পর্ণশালা নির্মাণের কথা; কিন্তু দুর্গাবরে পাইতেছি বিশ্বকর্মা

CENTRAL LIBRARY

কর্তৃক মঠনির্মাণের কথা। বাল্মীকির রাবণ অকম্পনের মুখে খর, দূষণ ও ত্রিশিরাবধের সংবাদ এবং সীতার পরিচয় প্রথম পায়; সীতাহরণের প্রস্তাবও অকম্পনই প্রথম উত্থাপন করে। সীতার লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি সর্বত্রই আছে। অলৌকিকতার স্পর্শও সর্বত্রই বিদ্যমান; এই কাব্যত্রয়ের সমসাময়িক শ্রোতৃবর্গ অবাধবিশ্বাসের ভিত্তিতে কাব্যরস উপভোগ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন—তাই কাব্যে অলৌকিকতার মাত্রা সম্পর্কে তাহাদের মনে কোন প্রশ্নও জাগে নাই।

দুর্গাবরের সীতা রাবণের নিকট যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি মন্দোদরীর গর্ভজাত। এই অংশে অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব স্বীকার করা যায়। এখানেই রাবণের ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনায় তাহার মৃত্যুর দ্বার উন্মোচিত; কারণ রাবণের স্বীকৃতি ছিল কন্যাতে রতিকাম হইলেই তাহার মৃত্যু, অন্যথা সে অমর থাকিবে।

CENTRAL LIBRARY

বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনে দক্ষিণ ভারত

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) দক্ষিণ ভারতে যে ব্যাপক পরিভ্রমণ করেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে নীলাচলে সার্বভৌম পণ্ডিতকে উদ্ধার করবার পরে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ পর্যটনের জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে কবি প্রথমেই প্রভুর মুখে এই উক্তি দিয়েছেন যে বিশ্বরূপকে সন্ধান করাই তাঁর 'দক্ষিণ গমনের মূল উদ্দেশ্য—

বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব। একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥ (চৈ. চ., ২।৭)

কবি এখানেই ক্ষান্ত হননি। মহাপ্রভুর মহিমা প্রদর্শনের জন্য কবিকে একথাও বলতে হল যে লোকান্তরিত বিশ্বরূপের সন্ধান প্রভুর ছলনা মাত্র। আসলে দক্ষিণ দেশের উদ্ধার সাধনই মহাপ্রভুর মূল অভিপ্রায়—

বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল। দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করে এই ছল॥

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে। সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে॥ (চৈ. চ., ২।৭)

দুটি পরিচ্ছেদ পরেই কবি আমাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দক্ষিণ ভারতে যে 'সহস্র সহস্র তীর্থ' রয়েছে, মহাপ্রভু

সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল। সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥ (চৈ. চ., ২।৯)

আমাদের মনে হয় ভক্ত কবির বর্ণনায় কিছুটা অতিরঞ্জনের স্পর্শ লেগেছে। প্রভুর পর্যটন যে কেবল 'দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে' তা মনে হয় না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল, বোধ করি, ভক্তিতীর্থ-পরিক্রমা, ভক্তজনের সঙ্গলাভ ও ভক্তি-সাহিত্যের অনুসন্ধান। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : **Sri Chaitanya undertook a long tour exchanging views with the local Vaishnava saints, impressing them with his own views and being in turn impressed by their views.....**[১]

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণীয় গোদাবরী তীরে ভক্ত পণ্ডিত রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার ও আলোচনার বিবরণ। দ্বিতীয়ত, মধ্বাচার্যের (১২৮৮-১৩১৭) জন্মস্থান দক্ষিণ কানারা জিলার সমুদ্রতীরবর্তী উড্ডুপি-তে 'তত্ত্ববাদী আচার্য' ব্যাসরায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

মধ্বাচার্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী। উড্ডুপ কৃষ্ণ দেখি হৈল প্রেমোন্মাদী॥

তত্ত্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ। তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥ (চৈ. চ., ২।৯)

উল্লিখিত 'তত্ত্ববাদী আচার্যে'র নাম যে ব্যাসরায়, এ কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্ট ক'রে বলেন নি, কিন্তু অন্য একটি সূত্র[২] থেকে জানা যায় যে মহাপ্রভু যখন কর্ণাটকে আসেন, তখন মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন শ্রীব্যাসরায় এবং এই দুই ভক্তপ্রবরের সাক্ষাৎ ঘটে উড্ডুপিতে।

১. Aspects of Indian Religious Thoughts, P. 192

২. কন্নড সাহিত্য পরিষত্—কর্ণাটক হরিদাস সাহিত্য, পৃ. ২০

CENTRAL LIBRARY

ব্যাসরায়ের কাছে মহাপ্রভুর শিক্ষালাভের কথাও বলা হয়েছে কোথাও কোথাও।[৩] এই সাক্ষাৎকারের সময়ে চৈতন্যদেব যুবক,, ব্যাসরায়ের বয়স ষাট অতিক্রান্ত। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসু চিত্ত যদি এই তত্ত্ববাদী প্রবীণ আচার্যের কাছ থেকে কিছু শিক্ষালাভ ক'রে থাকে, তাতে অমর্যাদার কিছু নেই। 'তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন'—কবিরাজ গোস্বামীর এই ইঙ্গিতও উক্ত মতের পরিপোষক।

তৃতীয়ত, বিঠ্ঠল বা বিঠল বা বিঠোবা-র মাহাত্ম্য-মণ্ডিত পাণ্ডুপুরে বা পঢ়রপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাতের যে মনোরম বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামী দিয়েছেন, চৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক তা ভুলতে পারেন না।

তীর্থ-পরিক্রমা ও ভক্তজনের সাহচর্যে ইষ্টগোষ্ঠী ছাড়া ভক্তি-সাহিত্যের প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষায় যে ক'খানি ভক্তি গ্রন্থ রচিত হয়, সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি কুলশেখর রচিত 'মুকুন্দমালা', লীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' এবং সর্বোপরি 'শ্রীমদ্‌ভাগবতম্'।

বিশেষজ্ঞদের মতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভক্তিমূলক গেয়-কাব্যের মধ্যে 'মুকুন্দমালা' প্রাচীনতম (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর রচনা)।[৪] পরবর্তী কালের প্রাদেশিক ভক্তি-সাহিত্যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে ব্যাকুল হৃদয়-ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে তার অন্যতম উৎস এই মুকুন্দমালা। কাব্যগুণের দিক থেকেও মুকুন্দমালা ভক্তিগীতপুষ্পমালো সর্বাগ্রে গ্রথিত হওয়ার যোগ্য।

কেরলীয় সাহিত্যের ইতিহাসে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রণীত কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-এর রচনাকাল ধরা হয় আনুমানিক নবম শতাব্দী। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-এর রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নয়।[৫] বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের প্রথম প্রচার হয়, বোধ করি, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাপ্রভুর অনুগ্রহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন স্থলে কৃষ্ণকর্ণামৃতের উল্লেখ করেছেন।[৬] মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার নিত্যসঙ্গী ছিল এই গ্রন্থখানি। স্বরূপ দামোদরের সুকণ্ঠে যখন কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধুছন্দা শ্লোকগুলি সুমধুর গীতরূপ লাভ করত, তখন মহাপ্রভু যে কতটা আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়তেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়—কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায়। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে আরও জানা যায় যে মহাপ্রভু কৃষ্ণকর্ণামৃতের পাঠ শুনেছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ পঢ়রপুর তীর্থে কৃষ্ণবেণ্ব নদীর তীরে। পরবর্তী অংশ এই—

> কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল। আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥
> কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে। যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে।
> সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি। সে জানে যে কৃষ্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ (চৈ. চ., ২।৯)

অনুপম ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত রচিত হয় দশম শতকে অথবা তার সামান্য কিছু পূর্বে। অন্যদিকে ভগবদ্‌গীতার রচনাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে—It is definitely a work of the Pre-christian era.[৭] গীতা ও

৩. (ক) A. P. Karmakar - Mystic Teaching of the Haridas of Karnataka, P. 10
(খ) T. V. Subba Rao—Karnataka Composers—The Journal of the Music Academy (Madras), Vol. XI, P. 35

৪. K. Rama Pisharoti—Mukundamala (Annamalai University Series), Introduction.

৫. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১২১।

৬. মধ্যলীলার প্রথম, দ্বিতীয় ও নবম পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

৭. S. Radhakrishnan– The Bhagavadgita, P. 14

CENTRAL LIBRARY

ভাগবতের মধ্যে প্রায় হাজার বছরের ব্যবধান। গীতায় কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলা হলেও ভক্তদের মতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই গীতার লক্ষ্য। অর্থাৎ গীতাও ভক্তিগ্রন্থ। কিন্তু গীতায় যে ধীর, প্রশান্ত ও মহিমান্বিত ভক্তিসাধনার কথা বলা হয়েছে, ভাগবতের যুগে তা নৃত্যগীতবহুল ভাবোন্মাদমত্ততায় পরিণত হয়।[৮] বৈষ্ণবধর্মের এই যে দু'টি দিক—একদিকে ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ ঋষিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব, আর একদিকে অনার্য গোপ-জাতির লোকপ্রচলিত—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সে কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

এখন, গীতা ও ভাগবতের মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষের যে একটিমাত্র অঞ্চলে প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী একটা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা হল দক্ষিণতম প্রদেশ (যার বর্তমান নাম তামিলনাড়ু)। ষষ্ঠ থেকে নবম শতক পর্যন্ত এই আন্দোলন কেবল প্রাদেশিক ভাষা তামিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই যুগে বিশেষ একটি অঞ্চলে ভক্তি-আন্দোলন গড়ে ওঠা-র ঐতিহাসিক কারণের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে আমরা কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে আবেগমূলক ভক্তিধর্ম প্রচারের প্রধান বাহক ছিল সঙ্গীত। আজ পর্যন্ত যে চার হাজার বৈষ্ণব পদের সংকলন প্রচলিত, তামিল ভাষায় তার নাম হল 'নালায়িরা দিব্যপ্রবন্ধম্'[৯] এবং যে বারোজন সাধক কবির রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তাঁরা 'আলবার্' (আড়বার বা আলোয়ার)[১০] নামে প্রসিদ্ধ।

ভাগবতে যে ভক্তির কথা বলা হয়েছে তা ঠিক তামিল বৈষ্ণব সাধকদের ভক্তিতত্ত্বের অনুরূপ—সেই কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণগুণকীর্তন, কৃষ্ণরূপদর্শনে বিহ্বলতা। কবিরা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কখনও হাসেন, নৃত্য করেন, গান করেন। আবার বিরহ-দশায় কখনও কাঁদেন, কখনও বা প্রেমরোষে অভিশাপ দেন। তাঁদের এই অবস্থার সঙ্গে সর্বত্র কৃষ্ণদর্শী শ্রীচৈতন্যের তুলনা করা যায়। এই সমস্ত কারণে নিশ্চিন্তভাবে বলা চলে যে ভাগবতের রচয়িতা তামিল বৈষ্ণবসাহিত্য ও সাধনার মধ্যেই বর্ধিত হয়েছিলেন।

উপরে যে বৈষ্ণব সাধকদের কথা বলা হল, মূল ভাগবত গ্রন্থেই তাঁদের পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মানুষ আবার কলিযুগে জন্মগ্রহণে অভিলাষী হবেন কারণ কলিযুগে অনেক বিষ্ণুভক্তের আবির্ভাব ঘটবে। অন্যত্র এঁদের সংখ্যা বেশি হবে না, কিন্তু দ্রাবিড় দেশ তাঁদের জন্মলাভে ধন্য হবে। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী প্রভৃতি নদীজল পান ক'রে সেখানকার অধিবাসীরা ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হবেন।[১১] এখানে স্পষ্টই তামিলনাড়ের ভক্তি আন্দোলন এবং

৮. With the youthful Krishna at the centre, the Bhagavata weaves its peculiar theory and practice intensely personal and passionate Bhakti, which is somewhat different from the speculative Bhakti of the Bhagavadgita. S. K. De—Early History of the Vaishnava faith and movement in Bengal, P. 5

৯. নালু (=চার) আয়িরা (=হাজার) দিব্য প্রবন্ধম্ (=দিব্যগীতের সংগ্রহ)। এই সংগ্রহগ্রন্থখানির কোনো কোনো সংস্করণে পদসংখ্যা ৩৭৭৬।

১০. আল (আড় বা আল= নিমগ্ন+আর্ (=সম্মানসূচক বা বহুবচনাত্মক প্রত্যয়) = আল্‌বার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেমানন্দ সাগরে নিমগ্ন যাঁরা।

১১. কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥

CENTRAL LIBRARY

আলোয়া সাধককবিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভগবানের শরণাপন্ন ভক্তগণ অন্য কিছুই কামনা করেন না, আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে তাঁরা ঈশ্বরের বিচিত্র মঙ্গলকথা কীর্তন করেন।[১২] মূল শ্লোকের 'আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ' কথাটি বস্তুত তামিল 'আড়বার কথার-ই সংস্কৃত অনুবাদ (আল্ বা আড়= নিমগ্ন, সাগরে নিমগ্ন, আর্=সম্ভ্রমসূচক বা বহুবচনাত্মক প্রত্যয়)।

প্রাসঙ্গিকবোধে তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের একমাত্র মহিলা কবি আণ্ডাল-বিরচিত 'তিরুপ্পাবৈ' (=শ্রীব্রত) নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা যাচ্ছে এখানে। মাত্র তিরিশটি পদে সম্পূর্ণ এই কাব্যখানির বিষয়বস্তু এইরূপ— মার্গলি (=অগ্রহায়ণ) মাসের পূর্ণিমার দিনে অতি প্রত্যূষে উঠে গোপপল্লীর কুমারী মেয়েরা চলেছে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙাতে। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের প্রার্থনা পূরণ করা হবে। একমাসব্যাপী চলে এই ব্রতের অনুষ্ঠান। এই ব্রতানুষ্ঠানের শেষে গোপীরা তাদের প্রার্থিত বস্তুসমেত ফিরে আসে। কাব্যখানির উনতিরিশ সংখ্যক পদে কৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীদের উক্তি থেকে তাদের ব্রত ও প্রার্থিত বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায়—'হে গোবিন্দ! প্রতি জন্মে জন্মে যেন তোমার বন্ধু হয়ে আমরা তোমার সেবা করবার অধিকার পাই। তুমি আমাদের অন্য সমস্ত কামনা থেকে নিবৃত্ত কর। এই আমাদের ব্রত।' এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ব্রজকুমারীদের কথা যারা 'হেমন্তে প্রথমে মাসি' কৃষ্ণার্পিতচিত্তে একমাস যাবৎ ব্রতাচরণ করে এবং নিজ নিজ নামে আহূত হয়ে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ক'রে পরস্পরের বাহু ধরে কৃষ্ণ গুণগান করতে করতে যমুনার জলে স্নান করতে যায়। ভাগবতের এই কাত্যায়নী ব্রত আর আণ্ডাল কবির শ্রীব্রত পরস্পরের অনুরূপ।

এইভাবে তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য ভাগবত রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে কখনো ভাগবতের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য প্রাদেশিক ভক্তি-সাহিত্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। মনে হয় ভক্তি-ধর্মের এই উদ্ভব ও পরিণতির কথা মনে রেখেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে 'ভক্তি-নারদ-সমাগম' নামক অধ্যায়ে ভক্তি-দেবীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে 'উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহম্' ইত্যাদি শ্লোকাবলী।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দ্রাবিড় দেশে যে বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্মের প্রবল আন্দোলন দেখা দেয় তা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। নানা ঐতিহাসিক সংঘাত ও সামঞ্জস্যের যে নিদর্শন প্রাচীন তামিল সাহিত্যে পাওয়া যায়, অনেকগুলি শতাব্দীর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তা পরবর্তী ভক্তি-আন্দোলন ও ভক্তি-সাহিত্যের অভ্যুদয় সূচিত করে।

কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥ (৪৮-৪০)

১২. একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ —শ্রীমদ্ভাগবতম্ (৮।৩।২০)

CENTRAL LIBRARY

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী

মহেশ্বর দাস

পৃথিবীর যে কোনও জাতির সাহিত্য সৃষ্টিবিষয়ে প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও কর্মকৃতির প্রারম্ভই ধর্মাশ্রিত। দেখা যায় সাহিত্য সৃষ্টির আদি পর্যায়ের মূলে রহিয়াছে ধর্মপ্রেরণা কারণ মানসজগতের যে অন্তরতম প্রদেশকে মন্থন করিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি, ধর্মপ্রেরণাই সেই অধ্যাত্মজীবনের ধারক, বাহক ও পরিপোষক। অজানাকে জানার জন্য, অপাওয়াকে পাওয়ার জন্য যে শ্রম, জীবনধারণের স্পৃহাকে অতিক্রম করিয়া যে এক অব্যক্ত, অননুভূতপূর্ব অবস্থাকে বরণ করার জন্য আকুল আগ্রহ, যাহাকে পাইলে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'-র ভাব মনে প্রবল হইয়া উঠে; 'যং লব্ধ্বা চাপরং জ্ঞানং মন্যতে নাধিকং ততঃ' অর্থাৎ যাহাকে পাইলে অপর কোনও প্রাপ্তব্য অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয় না, সেই আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ সত্যই সাহিত্যের উৎপত্তির উৎস।

'The first important assertion is that no *culture* has appeared or developed except together with a religion : according to the point of view of the observer, the culture will appear to be the product of religion'—Definition of Culture by T. S. Eliot.

'In every period of history and in every human society, there exists an understanding of the meaning of life which represents the highest level to which men of that society have attained—an understanding indicating the highest good at which the society aims This understanding in *the religious perception* and its corresponding expression always exists in every society.....And it is by the standard of this religious perception that the feelings by Art has always been appraised'—What is Art by Tolstoy—p. 232

অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক মানবসমাজে মানবজীবনবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ, মানবকল্যাণের যে সুউচ্চ মাপকাঠি রহিয়াছে তাহাই ধর্মবোধ, তাহাই সেই সেই সমাজের অস্তিত্বের চরম পরিচায়ক। সেই ধর্মবোধ প্রকাশ-লাভ করে সেই সেই সমাজের আর্ট বা সাহিত্যের মধ্য দিয়া—সুতরাং জাতির সেই ধর্মবোধ জাতির সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন করাইয়া দেয়।

আবার যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা মানুষকে নিঃশ্রেয়সের পথে লইয়া গিয়া 'রসো বৈ সঃ'—সেই আনন্দময় পরমাত্মরূপের উপলব্ধি করাইয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়—সেই ধর্মপ্রেরণারও একই উৎস। সেই ধর্মপ্রেরণার মূল অবলম্বন ঈশ্বরবোধ। অধ্যাত্মপ্রেরণা ও সাহিত্যপ্রেরণার উৎসমূল এক—একই বৃন্তের দুইটী ফুল—একই প্রস্রবণের দুইটী স্রোতস্বিনী ধারা। এই দুই ধারা যে একই উৎসমূলের প্রকাশ—তাহার ইঙ্গিত করিয়া ধ্বন্যালোক-কার আনন্দ-বর্ধন বলিয়াছেন—

> যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎকবীনাং নবা
> দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
> তে দ্বে অপ্যবলম্ব্যবিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
> শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমাত্মশয়ন স্বদ্‌ভক্তিতুল্যং সুখম্।—ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ হে জলবিশয়ন! কবিদের যে নবীন দৃষ্টি বিশ্বজগৎকে রসের দৃষ্টিতে রসান্বিত করিয়া ব্যাপৃত থাকে এবং দার্শনিকদের যে দৃষ্টি সুনিশ্চয় প্রমাণিত বিষয়ের রহস্য-উন্মেষণে নিয়োজিত—এই দুটিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিঃশেষে আলোচনা করিতে করিতে আমরা শ্রান্ত,—তাই তোমার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিতুল্য অন্য কোন সুখ নাই—অর্থাৎ তোমাতেই এই দুইটী অন্বেষণ-পথ সংলগ্ন—তোমাতে একনিষ্ঠ হইতে পারিলেই এই দুইটীতে ইষ্ট-সিদ্ধির পথ সুপরিষ্কৃত থাকে।

সুতরাং ঈশ্বরবোধই মূল প্রেরণা—ইহা হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও সাহিত্য প্রেরণার প্রকাশ—কাজেই দুই-এর মধ্যে অন্তর্নিহিত সাজাত্য স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যের মূলে যে অচিন্তনীয় শক্তির খেলা মানবমনকে বিস্ময়স্তব্ধ করিয়া তাহার মূলানুসন্ধানের জন্য যেমন দার্শনিক চিত্তকে অধ্যাত্মচিন্তার পথে লইয়া যায়, তেমনি বহির্জগতে পরি-দৃশ্যমান সৃষ্টিবৈচিত্র্যের লীলাতরঙ্গ-দর্শনে আনন্দোদ্বেল হইয়া উঠে মানবমন—তাহাই সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস। বিশ্বে সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগের মূলে রহিয়াছে এই ধর্মপ্রেরণা—কাজেই ঈশ্বর-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য প্রেরণার মূল অবলম্বন দেবদেবী।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির আদি পর্যায়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধর্মাশ্রিত। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের সৃষ্টি হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্র রূপায়ণে—অধ্যাত্ম জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভের পথে যে অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরনুসন্ধান তাহারই মূলে ফুটিয়া উঠিয়াছে চর্যাপদের সাহিত্যিক রূপ। চর্যাপদের সাধকগণের সাহিত্যসৃষ্টির প্রত্যক্ষ এবং মুখ্য প্রয়োজন ও প্রয়াস না থাকিলেও আধ্যাত্মিক সাধনার চরমোৎকর্ষের মাধ্যমে ঘুণাক্ষরন্যায়ে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে এক উপভোগ্য রসসাহিত্য। অধ্যাত্ম-প্রেরণা ও সাহিত্য প্রেরণা যে একই উৎসের দুইটি ধারা এবং পরস্পরের পরিপূরক তাহা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আগেই বলা হইয়াছে—এই দুই ধারার মূল উৎস সেই ঈশ্বরবোধ এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া মানবমনের যাবতীয় জটিল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। অতি পরবর্তী অর্বাচীন সাহিত্যের মধ্যে মুখ্যতঃ এই আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ নিদর্শন না দেখা গেলেও নানা কৃত্রিম উপায়ে বিশোধিত স্বচ্ছ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সহিত সমস্ত জলরাশির মূল উৎস সমুদ্রের বারিরাশির সম্বন্ধের ন্যায় অর্বাচীন সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন ধারা সেই মূল প্রেরণার সুদূরপ্রসারী ফল ছাড়া আর কিছুই নয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রারম্ভে মঙ্গলকাব্যের যে সৃষ্টি, তাহার মূলে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যাসজনিত অনিশ্চয়তাভাবের সমাধানের জন্য মানবমনের আকুল প্রচেষ্টা। ঐহিক রাজশক্তি যখন কর্তব্য পালনে অক্ষম এবং মনুকথিত 'মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি' (ম. সং), সেই নররূপী দেবতা রাজা যখন আশ্রিত প্রজার রক্ষণে অসমর্থ এবং অকৃতকার্য, তখন স্বভাবতঃই প্রকৃত দেবতার আনুকূল্যের অনুসন্ধানের মূলে প্রধানতঃ এই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। তাই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর আবির্ভাব এবং বিভিন্নভাবে তাঁহাদের মহিমা প্রচারে মঙ্গলকাব্যের কাব্য-শরীর পরিপুষ্ট। ঐহিক রাজসামর্থ্যে আস্থাহীন এবং ঐহিক সুখসম্পত্তির অভিলাষে উৎসুক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যে আকুল আকৃতি, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতে—তাহাই মঙ্গল সাহিত্যের বীজ এবং তাহাই ক্রমে ফলপুষ্পশালী মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন তাঁহারা ধর্মদেবতার; শক্তি উপাসক কালী, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি শক্তি-দেবতার; যাঁহারা শৈব তাঁহারা শিবকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন সেই সমস্ত মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত। সর্বত্রই উদ্দেশ্য এক—মঙ্গল প্রাপ্তি। মঙ্গল শব্দটি মানসিক এক চিত্তবৃত্তির নামান্তর। মঙ্গল শব্দের প্রকৃত অর্থ উন্মোচন করিয়া কালিদাস তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বলিয়াছেন—

CENTRAL LIBRARY

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলম্
নিষেব্যতে ভূতি সমুৎসুকেন বা ।—কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ

অর্থাৎ যাঁহারা বিপন্ন তাঁহারা বিপৎপ্রতীকারের জন্য এবং যাঁহারা বিষয়সুখাভিলাষী তাঁহারা সম্পদ্ লাভের জন্য যে মনোবৃত্তি সাধন করেন তদনুকূল কার্যাবলীর নাম মঙ্গল। মঙ্গলকাব্যের নামকরণের মূলে এই তথ্যই বিদ্যমান। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য তাহাই মঙ্গল সাহিত্য। কিন্তু আসলে মঙ্গলকাব্যের সমস্ত দেবদেবী যে ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির পরিকল্পিত, দেবতা সৃষ্টির মূল ধারার অন্তর্ভুক্ত তাহা পরবর্তী আলোচনায়ই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ভ্রান্তিবশতঃ এই সমস্ত দেবতার সৃষ্টি এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পরিবেশন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ও তদনুসারী এদেশীয় সমালোচকগণ যেভাবে দেবতার স্বরূপ উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা হইতে এই দেবদেবীগণকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে যাহা দেখিয়া মনে এই দেশের চিরাগত বৈদিক-সংস্কৃতির সহিত ইঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই এইরূপ ধারণা জন্মে। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত নহেন। শক্তিদেবতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'দেবতা নিষ্ঠুর, ও ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন করে, ধর্মকে অস্বীকার করে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।' —বাংলাভাষা পরিচয়, ১৩৪১

* * * *

'কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা, পূজার দ্বারা, শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।' —শক্তিপূজা, কালান্তর

* * * *

'একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, 'পশুবলি' বা নিজের রক্তপাত, এমন-কি, 'নরবলি' স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জাতিশত্রুর বিনাশ-কামনা পর্যন্ত সকল-প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচার-হীন ফলকামনা, এই দুয়ের যোগ যে পূজায় আছে তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না।' —শক্তিপূজা, কালান্তর

এছাড়া অন্যান্য বহু জায়গায় শক্তিদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্যস্থানে করা যাইতেছে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যগুলির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—

'মধ্যযুগ হইতেই বাঙ্গালী কবিগণ মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার শৌর্য-বীর্য এবং পৌরুষের যে জয়গান গাহিয়া আসিতেছেন, সেভাবে দেবতার জয়গান গাহেন নাই ;···সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ মানুষ হইয়াও অমানুষ—দেবতা ত নহেনই।' —বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪১৪-৪১৫

CENTRAL LIBRARY

এই প্রকার উক্তি যে যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন নয়, পরন্তু বিভ্রান্তিকর তাহা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিব যে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবতার প্রতি উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই। এই সমস্ত ভ্রান্তিমূলক ধারণার প্রধানতঃ তিনটি দিক্—

(১) এই সমস্ত দেবতা অনার্যদের সৃষ্টি।

(২) এই সমস্ত দেবদেবী লৌকিক দেবতা।

(৩) এই সমস্ত দেবদেবীর আচরণ ও কার্যকলাপ মানুষের কার্যাবলীর উর্ধ্বে নয়,—অর্থাৎ মানুষের ন্যায় ইহাদের কার্যাবলী ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ অথবা মনুষ্য চরিত্র হইতে আরও নিকৃষ্টতর।

এই সমস্ত ভ্রান্তিমূলক স্বকপোলকল্পিত ধারণাগুলির নিরাকরণের আগে ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতিতে দেবতা সৃষ্টির পরিকল্পনার মূলে যে চিন্তাধারা সুদূর বৈদিক যুগ হইতে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া উক্ত সমালোচক পণ্ডিতগণের কল্পিত মতবাদ যে একান্ত ভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তিমূলক তাহা প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আগেই বলা হইয়াছে যেকোন জাতির সাহিত্য সৃষ্টির আদি পর্যায়ের মূলে রহিয়াছে ধর্মপ্রেরণা। সমস্ত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ধারক, বাহক ও পরিপোষক হইতেছে বেদ। তাই মনু বলিয়াছেন 'বেদোঽখিলং ধর্মমূলম্'—অর্থাৎ বেদই সমস্ত ধর্মপ্রেরণার মূল উৎস। সেই বেদের মধ্যেই দেব-দেবীর সৃষ্টিপরিকল্পনার মূল রহস্য বিদ্যমান। যদিও মীমাংসকগণ বেদে মূর্তিপূজার অভাব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে উদ্দেশ্য ছিল কর্মকাণ্ডকে বড় করিয়া দেখানো। কিন্তু বাস্তবতঃ বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতার কার্যকলাপের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে মূর্তিযুক্ত দেবতার রূপ স্পষ্টই প্রতিফলিত হয়। আগেই বলা হইয়াছে সৃষ্টির বহুমুখী লীলা-বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানবমনের মধ্যে ঈশ্বরবোধ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া—তাহাই দেবদেবী পরিকল্পনার মূল উৎস। বেদের মধ্যে বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও মূলতঃ তাহা যে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরবোধের বিভিন্ন প্রকাশ তাহার উল্লেখও বেদের মধ্যে দেখা যায়। যথা—

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে

অর্থাৎ মায়ার সাহায্যে ইন্দ্র অর্থাৎ সর্বশক্তিশালী ঈশ্বর অনেক রূপ ধারণ করেন। আরও উল্লেখ আছে—

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
মায়াঃ কৃণানস্তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রিরদ্দিবঃ পরিমুহূর্তমাগাৎ
বৈর্মৈরনৃতুপা ঋতাবা।—ঋ. সং., ৩।৩।৩০

অর্থাৎ শক্তিশালী ইন্দ্র নিজের শক্তির প্রভাবে নিজের দেহকে বহুরূপে মায়ার সাহায্যে পরিবর্তিত করিয়া অর্থাৎ নানা রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকাশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুনরায় বলা হইয়াছে—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্ত্যগ্নিং-যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥—ঋ. সং. ২।২।১২

অর্থাৎ একই সেই সর্বশক্তিশালী পরম সত্তাকে পণ্ডিতগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম, বায়ু প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে এই দেখা গেল বেদের মধ্যে একই সর্বব্যাপী সত্তা বহুরূপে বিশ্লেষিত হইয়া বিভিন্ন দেবদেবীর

CENTRAL LIBRARY

রূপ ও নাম গ্রহণ করিয়াছে। বেদের সর্বপ্রাচীন ভাষ্যপ্রণেতা নিরুক্তকার যাস্ক (4000 B. C.) একই চৈতন্যরূপী-আত্মসত্তা হইতে বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি ও পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

মাহাভাগ্যাৎ দেবতায়া একাত্মা বহুধা স্তূয়তে।—দৈবতকাণ্ডম্, নিরুক্ত

অর্থাৎ মহাশক্তিশালী এই চৈতন্যরূপী আত্মা এক হইয়াও নানা দেবতারূপে স্তুতি ও পূজার বিষয় হইয়া থাকেন। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন—

একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।—দৈবতকাণ্ডম্, নিরুক্ত

অর্থাৎ বিভিন্ন দেবদেবীরূপে যাঁহাদিগকে আমরা কল্পনা করিয়া থাকি তাঁহারা সকলেই একই আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

আত্মৈবৈষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বঃ, আত্মাঽয়ুধম্,
আত্মৈবৈষাং, আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য।—দৈবতকাণ্ডম্, নিরুক্ত

অর্থাৎ জড়, অজড়, অশ্ব, রথ, অস্ত্রাদি যাহা কিছু দেবতার উপকরণ সমস্তই সেই আত্মার বিবর্তিত রূপ—তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

এমনকি অচেতন প্রস্তরখণ্ডকে যে দেবতারূপে পূজা করা হইয়া থাকে তাহাও চৈতন্যরূপী আত্মার বিবর্তিত-রূপ ও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বব্যাপিত্ব। আমরা গ্রামাঞ্চলের বহুস্থানে শিলা স্থাপন করিয়া চণ্ডী, বাসুলী, মৌসুনী (মেদিনীপুর) প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতে দেখি। তাহার মূলে রহিয়াছে সর্বচৈতন্যময় আত্মা—আত্মারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই সমস্ত শিলাখণ্ড তাঁহা হইতে অভিন্ন। ইহাই নিরুক্তকারের অভিমত। যুক্তির দিক হইতে বলা যায় চৈতন্য হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাদের জ্ঞান সম্ভবপর নয়, তাই ইহারা চৈতন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইহাই প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির ফলশ্রুতি। তাই 'পঞ্চতন্ত্র'কারও বলিয়াছেন—

অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতম্।

অর্থাৎ মহাপুরুষগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতি শিলাখণ্ডও দেবতারূপে পরিগণিত ও পূজিত হন। সুতরাং এইরূপ প্রস্তরখণ্ডের দেবতারূপে উপাসনা অনার্যসভ্যতাসম্ভূত—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন—'হিন্দুরা জড়-উপাসক নহে, চেতনাবিহীন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্যপদার্থ। আজকাল যাহাকে জড়-পদার্থ বলা হয়, যেমন অগ্নি, বায়ু নদীপর্বত ইত্যাদি ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যমনের চেতনাযুক্ত পদার্থ।'

তাহার পরে দেবদেবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও বৈদিক সংস্কৃতির অনুরণন মাত্র। তন্ত্র বেদ হইতে পৃথক্ নহে কারণ তন্ত্র বৈদিক অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক রূপ। তন্ত্র যে বেদ হইতে অভিন্ন সেই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা—বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।—কুল্লুকভট্ট

শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক এবং তান্ত্রিক। সেই তন্ত্রে দেবতাসৃষ্টি সম্পর্কে প্রতিধ্বনি করিয়া বলা হইয়াছে—

একাহি শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপে তু কালী সমরে তু দুর্গা।

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ চৈতন্যরূপী পরমেশ্বরের একমাত্র পরমাশক্তি বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কালী দুর্গা ভবানী প্রভৃতি রূপে পরিকল্পিত। আরও বলা হইয়াছে—

নিত্যং নির্দোষগন্ধং নিরতিশয়সুখং ব্রহ্মচৈতন্যমেতম্
ধর্মোধর্মীতি ভেদদ্বিতয়মিতি পৃথগ্‌ভূয়ঃ মায়াবশেন।
ধর্মস্তত্রানুভূতিঃ সকল বিষয়িণী সর্ব্বকার্যানুকূলা
শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপা ভবতিগুণগণঃ শ্রেয়স্ত্বেকএব ॥—রত্নপরীক্ষা-দীক্ষিত

অর্থাৎ নিত্য, নির্গুণ অনন্ত সুখরূপ ব্রহ্মচৈতন্য মায়া দ্বারা ধর্ম এবং ধর্মী (শক্তি এবং শক্তিমান) এই দুই রূপে বিভক্ত হন। তার মধ্যে ইচ্ছাদিরূপ শক্তি সর্বকার্য নিষ্পত্তিতে আনুকূল্য করেন। এই শক্তি ছাড়া কোন কিছু কার্য চলিতে পারে না। লোকেও প্রচলিত আছে—

ভক্তানামিষ্ট সিদ্ধার্থং দেবানাং রূপকল্পনা

অর্থাৎ ভক্তদিগের ইষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতার বিভিন্ন রূপ পরিকল্পিত হয়।

ইহার পরে ধর্মশাস্ত্রকার মনু তাঁহার প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা গ্রন্থের উপসংহারে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমস্তই পূর্বোল্লিখিত বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী। তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়ে জাতিভেদ, বিভিন্ন জাতির কর্তব্যাদি বিষয়ে নানাপ্রকার ঐহিক সমস্যার সমাধানের পর শেষ অধ্যায়ে সমস্ত কিছুরই পরিণতি যে সেই সর্বব্যাপী আত্মা এবং তাহা হইতেই যে সমস্ত দেবতার সৃষ্টি, তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন—

আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ সর্বমাত্মন্যবস্থিতম্ ।—মনুসংহিতা, ১২শ অধ্যায়।

অর্থাৎ যাহাকে আমরা দেবতা বলি, সে সমস্তই আত্মার বিপরিণত রূপ। আত্মা হইতে ইহাদের স্থিতি ও অস্তিত্ব পৃথক্ নয়।

ঈশ্বররূপী আত্মারই যে সমস্ত কিছু পরিণতি সে বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক Hegel-এর চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া জনৈক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বলিয়াছেন—

'It is by reason of his being spirit that man is man and from man as spirit, proceed all many developments of Science and Arts, the interests of political life and all those conditions which have references to man's freedom and will·····all that has worth, dignity for man, all wherein he seeks his happiness, his glory, his pride, finds its ultimate centre in religion and feeling of God—thus God is the beginning of all things and end of all things. As all things proceed from this point so all back return to it again. He is the centre which gives life and animates and preserves in existence all various forms of beings.

—Hegel's Philosophy of Religion by E. B. Spiers and B. Saunder—p. 1-2.

সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে মানবজীবনের মধ্যে যাহা কিছু বৈচিত্র্য—তাহাদের কেন্দ্রস্থল হইল আত্মস্বরূপ ঈশ্বর। তাহাতেই আরম্ভ তাহাতেই শেষ।

দেবতাসৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টই দেখা যায় যে দেবদেবী সৃষ্টি ও তাঁহাদের পুজোপাসনা প্রভৃতিতে অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাবের যে মতবাদ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। যাঁহারা এই তথাকথিত অনার্য সভ্যতা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করা উচিত যে

CENTRAL LIBRARY

অনার্য সংস্কৃতিকে আর্য চিন্তাধারা ও আর্যদের বিশাল সংস্কৃতির মূল উৎসরূপে চিন্তা করা হয়, সেই অনার্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দূরে থাকুক, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে—যখন মানুষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সভ্যতার বিস্তৃতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—তখন ঐ অনার্য জাতিগুলির সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থা দূরে থাকুক, চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। তাহা ছাড়া যাহাদিগকে অনার্য বলা হয়, আর্য শাস্ত্রকার মনু প্রভৃতির মতে তাহারা আর্য বংশধরই—আচারভ্রষ্ট হইয়া আর্যগোষ্ঠী হইতে চ্যুত হওয়ার ফলে অনার্য নামে অভিহিত হইয়াছে—ইহা মনু, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে—ইহা আমি পূর্ব প্রকাশিত 'শিব কি অনার্য দেবতা' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই যুক্তিতেই সিন্ধুসভ্যতা যে অনার্যসভ্যতা নয়, তাহাকে অনার্যসভ্যতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কুকল্পনা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সেখানকার শিব-শক্তি প্রভৃতি দেবদেবী যে বৈদিক সংস্কৃতিসম্ভূত, অনার্য কৃষ্টি প্রসূত নয়, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।

বরাহমিহির প্রভৃতির উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সিন্ধুসভ্যতার বহু পূর্ব হইতেই বৈদিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন ধারার আলোকে সমুদ্ভাসিত ছিল এই দেশের যাবতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য গবেষকগণের ভ্রান্তপথ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা আর্যদিগকে বহিরাগত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তমতের উপর প্রতিষ্ঠিত 'সোনার পাথরবাটীর ন্যায়' এই অনার্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা অলীক আকাশকুসুমের ন্যায় যাহার কোনও ভিত্তি নাই। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অনার্যত্ব কল্পনা তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইহার পরে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণকে লৌকিকদেবতা বলিয়া অভিহিত ও প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিমূলক। লৌকিক দেবতা বলিতে মূল বৈদিক দেবতা হইতে এই দেবদেবীগণ যে সম্পূর্ণ পৃথক্ এই বিভ্রান্তি মানুষের মনে আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু মূল বৈদিক দেবতা হইতে এই সমস্ত তথাকথিত লৌকিক দেবতা পৃথক্ নয়—মূলদেবতার আংশিক প্রকাশ মাত্র। লৌকিক আখ্যা দেওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। লৌকিক দেবতা অর্থে তাঁহারা ইহাই সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন—দেবদেবীগণের উপাসনার উপর আঞ্চলিক প্রভাব পড়িয়া তাঁহাদের এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হইয়াছে—যাহার ফলে এই দেবদেবীগণকে লৌকিক সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা যেমন একদিকে ভ্রান্তিমূলক, অন্যদিকে সেই ধারণা সাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও কারক। উদাহরণস্বরূপ মঙ্গলকাব্যের শিবকে শিবায়ন গ্রন্থসমূহে এরূপ বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে যাহাতে তাঁহাকে অর্থাৎ শিবকে লৌকিক দেবতা বলিয়া মনে হয় এবং তাহা হইতেই শিব সম্বন্ধে লৌকিক সৃষ্টির ভ্রান্ত ধারণা হয়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বৈদিক শিবের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিবের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শিবকে যে কৃষিকার্যের পর্যায়ে নামাইয়া আনা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বেদসম্মত। বেদের রুদ্রাধ্যায়ে (১০৮টী খণ্ডে) সর্বাত্মক রুদ্র বা শিবকে কৃষির অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—

কৃষীণাং পতয়ে নমঃ।—শুক্ল যজুর্বেদ, ৬০ অধ্যায়

তুমি রুদ্র, কৃষির অধিপতি—তোমাকে আমাদের নমস্কার। তাহা ছাড়া শিবের দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করিয়া শিবায়ন কাব্যের কবিগণ শিবের যে রূপ উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাও বেদসম্মত—যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যে পার্বতীর মুখ দিয়া উক্তি করিয়াছেন—

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাম্
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।—কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ সেই শিব অকিঞ্চন অর্থাৎ তাঁহার কোনও ধনসম্পদ্ না থাকিলেও তিনি জগতের সমস্ত সম্পদের উৎস বা উৎপত্তি স্থান। তিনি ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়াও শ্মশানবাসী ইত্যাদি। বেদে শিবকে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর (Absolute) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং সেই Absolute-এর মধ্যে ভালমন্দ, মঙ্গলামঙ্গল, বিষ-অমৃত, শুভাশুভ প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় দেখা যায়। জার্মান দার্শনিক Hegel-এর মতে তিনিই সর্বাতীত Absolute বা ঈশ্বর, যাঁহার মধ্যে সমস্ত Thesis এবং Antithesis-এর সমন্বয় হয়। শিবের মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে—তাঁহার দেহে অপবিত্র চিতাভস্ম এবং পবিত্র গঙ্গাজলের, কণ্ঠস্থিত বিষ এবং মস্তকস্থিত চন্দ্রের অমৃতের সমন্বয়। তাই কালিদাস বলিয়াছেন —

ন বিশ্বমূর্তেরবধার্যতে বপুঃ।—কুমারসম্ভব

অর্থাৎ বিশ্বকে যাঁহার দেহরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহাকে কোনও বিশেষরূপে চিহ্নিত করা যায় না। বিশ্বব্যাপী অনন্ত বলিয়া সমস্ত দিক্‌পরিমিত মাপের বস্ত্র তাঁহার দেহকে আচ্ছাদিত করিতে পারেনা। তাই তিনি দিগম্বর (দিক্ হইয়াছে অম্বর যাহার)। সুতরাং চিতাভস্মপ্রলিপ্ত সর্পভূষিত দিগম্বর মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে কেহ যদি অনার্য নামাঙ্কিত করেন তাহা হইলে অনভিজ্ঞ বাতুলের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেননা তাঁহার দেহে এই সমস্ত অনার্যের চিহ্ন ছাড়া চন্দ্র, গঙ্গাজল প্রভৃতি আর্য চিহ্ন রহিয়াছে—সেগুলি দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত সমালোচকদের মতে আংশিক আর্য আংশিক অনার্য বলিতে হয়। সুতরাং বৈদিক দেবতা শিব সম্বন্ধে এই সমস্ত উক্তি নিছক স্বকপোলকল্পিত কুকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইহা ছাড়া কাব্য শিবায়নে শিবকে কোচ জাতির দেবতা বলিয়া লৌকিক এবং অনার্য দেবতা বলিয়া চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদের রুদ্রসূক্ত বা রুদ্রাধ্যায় (১০০ মন্ত্র) পড়িলে এই ভ্রান্ত ধারণা ও কুকল্পনার আর অবসর থাকে না। বেদের রুদ্রাধ্যায়ে সর্বাত্মক ঈশ্বররূপে এবং উচ্চনীচ সমস্ত জাতির প্রতীকরূপে শিবকে উপস্থাপিত করিয়া বলা হইয়াছে—

নমস্তক্ষেভ্যো রথকারেভ্যশ্চ নমোনমঃ।
কুলালেভ্যঃ কর্মকারেভ্যশ্চবো নমোনমঃ॥
নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চবো নমোনমঃ।
শ্বনিভ্যঃ মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমোনমঃ॥—ইত্যাদি—শুক্ল যজুর্বেদ, ৬০ অধ্যায়

অর্থাৎ যাঁহারা সূত্রধর, রথকার, কর্মকার, কুম্ভকার, নিষাদ অর্থাৎ চণ্ডাল, পুঞ্জিষ্ঠ বা একপ্রকার নীচজাতি—তাঁহারা সকলে সেই শিব, সর্বজাতির প্রতীক সেই রুদ্রকে আমরা নমস্কার করি। সুতরাং —

'এদেশে আর্য সভ্যতা বিস্তারের পূর্বে উত্তরবঙ্গে কোচ নামক এক জাতি বাস করিত, কৃষিকার্যই ইহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল···কোচ কৃষকের সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়'—(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৭৯-৮০) ইত্যাদি শিবকে লৌকিক দেবতা প্রতিপাদনে এই উক্তি যে সর্বথা যুক্তিহীন তাহা উক্ত বৈদিক মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে। উচ্চ-নীচ সব জাতির সর্বাত্মক দেবতারূপে শিবকে কোচ-প্রধান উত্তরবঙ্গের কোচ-রমণীরা মাধুর্যভাবে উপাসনার ফলে শিব যে আর্যেতর দেবতারূপে প্রতিপন্ন হইলেন এই উক্তি আদৌ যুক্তিসহ নয়। গোপপ্রধান অঞ্চলে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎরূপে মাধুর্যভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিয়া ঐশ্বর্যপ্রধানা রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতির যে রূপ ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন সেইরূপ মাধুর্যভাবপরায়ণা কোচ-রমণীর মধুর রসে উপাসিত শিব

CENTRAL LIBRARY

বিক্রম ও ঐশ্বর্য শক্তির প্রতীক পার্বতীর যে উমাভাজন হইবেন তাহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই। প্রাগার্য বহিরাগত লৌকিক দেবতারূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার কোন অবকাশ নাই। তাহা ছাড়া ভাগবতে বর্ণিত নীচজাতীয়া কুব্জার প্রেমে যদি শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণে বর্ণিত শবরীর পবিত্র প্রেমে রামচন্দ্র যদি অনার্য না হইয়া থাকেন তাহা হইলে মাধুর্য-রসাপ্লুতা কোচ-রমণীর প্রেমে শিবকে অনার্য বা লৌকিক দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যুক্তির অগোচর।

ইহা ছাড়া শিবকে রুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া ধ্যানী বুদ্ধদেবের অনুকরণে পরিকল্পিত দেবতারূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার দ্বারাও মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলিয়াছেন—

'বৈদিক রুদ্রদেবতার মধ্যেই অনার্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়..... পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাঁহার এক শান্ত সমাহিত শিবমূর্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল' (পৃঃ ১৭৭)। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন।

রুদ্র হইতে পৃথক্ শিবমূর্তির পরিকল্পনা নিছক ভ্রান্ত ধারণা। বেদের রুদ্রাধ্যায়ের মধ্যেই রুদ্র এবং শিব যে একই সত্তা তাহা স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যথা—

যাতে রুদ্রশিবাতনুরঘোরাঽপাপকাশিনী—শুক্ল যজুর্বেদ, ৬০ অধ্যায়

—হে রুদ্র তোমার ভয়ঙ্কর মূর্তি ছাড়া আর একটি শান্তমূর্তি রহিয়াছে যাহাকে শিব বলা হয়, যাহা ভয়ঙ্কর নয়, পরন্তু পুণ্য প্রকাশক। ইহা হইতে শিবরুদ্র যে একই সত্তা তাহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বেদের সৃষ্টি—এমন কি মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শীলমোহরগুলিতে যে শিবমূর্তি ও তাহার বাহন বৃষকে দেখা যায় তাহা এই বৈদিক মন্ত্রের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। মোটের উপর বেদের রুদ্রাধ্যায়ে প্রতিপাদিত শিব রুদ্র বিষয়টি প্রণিধানের সহিত দেখিলে উক্ত সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলির আর অবকাশ থাকে না। তাহা ছাড়া লৌকিক জীবনেও একই ব্যক্তিতে শিবত্ব এবং রুদ্রত্বের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কর্মব্যপদেশে যে ব্যক্তি রুদ্ররূপ সেই ব্যক্তি আবার স্ত্রীপুত্রসন্নিধানে শান্ত মূর্তি—সুতরাং এই শিবত্ব, রুদ্রত্ব পরস্পর বিরোধী নহে—ভেদ ঔপাধিক মাত্র। অতএব শিবসম্বন্ধে উক্ত সমূহ আলোচনা হইতে ইহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে শিব প্রাগার্য, অনার্য, বহিরাগত, লৌকিক দেবতা নহেন এবং মঙ্গলকাব্যে যে ইহাকে লৌকিক দেবতা অর্থাৎ লোকসৃষ্ট আঞ্চলিক দেবতা বলিয়া মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পরন্তু সর্বাত্মক শিবকে খণ্ড করিয়া দেখার ফলে যে অকল্যাণ তাহারই পরিণতি ইহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং শিব যে সর্বাত্মক দেবতা (Cosmopolitan God) এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে তাঁহার অবস্থিতি তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিলের বিদেশীয় বিচারকগণও মন্দিরপ্রবেশ সংক্রান্ত কোন এক মামলার বিচারে শিবকে সর্বজাতির দেবতা (Cosmopolitan God) বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের শিব লৌকিক বা লোকসৃষ্ট দেবতা নহেন পরন্তু মঙ্গলকাব্যে শিবের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেই সমস্ত পুরাপুরি বেদসম্মত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আকাশের একই বৃষ্টিজল বিভিন্নব্যক্তির জলাধারে বিভিন্ন-ভাবে রক্ষিত হওয়ার ফলে যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তাহাতে জলের পৃথক্ সৃষ্টি বোঝায় না। একই বৃষ্টির জল রক্ষণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। মঙ্গলকাব্যের দেবতা সম্বন্ধেও সেইরূপ একই বৈদিক দেবতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে অর্চিত হওয়ার ফলে আপাততঃ মূলদেবতা হইতে ভিন্ন এবং লোকসৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

CENTRAL LIBRARY

তারপরে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী, বাসলি, শীতলা প্রভৃতি শক্তিদেবতার কথা। এই শক্তিদেবতাগুলির মধ্যে চণ্ডীর প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। ইনি চণ্ডবিক্রমা, শত্রু-নিধনে ইঁহার অপরাজেয় ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কিন্তু পরম ক্ষোভের বিষয় ইঁহাকে অনার্যসভ্যতাপ্রসূত অনার্য দেবীরূপে সমালোচকগণ চিত্রিত করিয়া ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন 'চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তী সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে।...রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ নাই।' আরও বলা হইয়াছে ওরাওঁরা চাণ্ডীর অর্চনা করে, তাহা হইতেই পরবর্তীকালে চণ্ডী দেবতার পূজোপাসনার উদ্ভব ইত্যাদি নানা ভ্রমাত্মক কল্পনা চণ্ডীদেবতা সম্বন্ধে করা হইয়া থাকে। কিন্তু সুপ্রাচীন পুরাণ মহাভারতের মধ্যেই চণ্ডীশব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। মহাভারতে ভীষ্ম পর্বে বর্ণিত আছে যে, কৌরবপক্ষের বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে সমাবিষ্ট দেখিয়া অর্জুন ভীত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র সমর্থা শক্তিদেবী দুর্গার স্তব পাঠ করিতে উপদেশ দিলেন।

শ্রীভগবান উবাচ—
শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়॥—ভীষ্মপর্ব ২৩শ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহাবাহো অর্জুন! যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুচি হইয়া শত্রুর পরাজয়ের জন্য দুর্গার স্তব কর।

তখন কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জুন দুর্গার স্তব আরম্ভ করিয়া দুর্গাকে চণ্ডীরূপে স্তব করিতে গিয়া বলিলেন—

অর্জুন উবাচ—
ওঁ নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে
ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি। ইত্যাদি—ভীষ্মপর্ব ২৩শ অধ্যায় ৪।৫।৬

সুতরাং মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধে বিজয়দাত্রী দুর্গাকে চণ্ডীর সহিত এক করা হইয়াছে। এই চণ্ডীই মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণিতা দেবী যাবতীয় অসুরের নিধনকারিণীরূপে উপস্থাপিতা হইয়াছেন। দুর্গার সহিত চণ্ডীর একত্ব মহাভারত সিদ্ধ। আবার দুর্গা কেনোপনিষদে 'উমা হৈমবতী' বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

তাহা হইলে উপনিষদের মধ্যেও দুর্গা তথা চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বিদ্যমান থাকায় বৈদিক সাহিত্যেও এই শক্তিদেবতার পরিকল্পনার অভাব আছে বলিয়া কোন কোনও সমালোচক বলিয়াছেন তাহা সর্বৈব স্বকপোলপ্রসূত কল্পনা। তাহা ছাড়া দুর্গা গায়ত্রী ও উপনিষদের মধ্যে দেখা যায় যে প্রাচীন পুরাণ-মহাভারতে দুর্গা-তথা চণ্ডীর উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ববর্তী রচিত মহাভারতে বর্ণিত দশাবতারের তালিকায় বুদ্ধদেবের নাম নাই। তাহা ছাড়া মহাভারতের আদি পর্বে মহাভারত রচনার যে তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাতে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্যাসকর্তৃক মহাভারত সৃষ্টি এবং তখনই যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল নির্ণয় করিতে গিয়া গণিতবিশারদ বরাহমিহির (৪র্থ শতাব্দী) তাঁহার 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে খ্রীস্টপূর্ব ২৬২৫ সালকেই যুধিষ্ঠিরের শাসনকাল স্থির করিয়াছেন। তাহার বহুপূর্বে উপনিষদ্ এবং বৈদিক সাহিত্য।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—'বৈদিক সংহিতায় চণ্ডীর নাম নাই'—তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে বৈদিক

CENTRAL LIBRARY

সংহিতায় মুখ্যভাবে চণ্ডীর নাম না থাকিলেও বৈদিক সাহিত্য উপনিষদে দুর্গা তথা চণ্ডীর নাম রহিয়াছে। বেদ কেবল বৈদিক সংহিতা লইয়া নহে,—বৈদিক সংহিতা বেদের একটা অংশ মাত্র। কারণ 'মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ' লইয়া বেদ—মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদঃ। প্রাচীন অংশে আরণ্যক ও শেষাংশে উপনিষদ। সেই উপনিষদে দুর্গা তথা চণ্ডীর নাম যখন রহিয়াছে, তাহা হইলে এই শক্তি দেবতার নাম যে বেদের অন্তর্ভুক্ত তাহা অবিসংবাদিত।

তাহা ছাড়া বৈদিক সংহিতায় চণ্ডীর নাম নাই যে বলা হইয়াছে, সাক্ষাৎ চণ্ডী শব্দটি না থাকিলেও চণ্ডীর যাবতীয় কার্যাবলী ও চরিত্র যাহা পরবর্তী পুরাণাদিতে উৎসারিত রহিয়াছে, তাহা বেদের প্রতিধ্বনি মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্‌বেদোক্ত দেবীসূক্তের মধ্যে দেবীর সর্বাত্মিকা ও সর্বব্যাপিনী শক্তি সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে পরবর্তী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে। নিশুম্ভ দৈত্যবধের পর তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শুম্ভ মহামায়া চণ্ডীকে অপরের সহায়তায় যুদ্ধজয়ের অভিযোগ করিলে দেবী তাহার উত্তরে বলিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌-বিভূতয়ঃ।—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ১০ম অধ্যায়

অর্থাৎ রে দুষ্ট দৈত্য আমি এইজগতে একমাত্র শক্তি। যেগুলিকে অন্য শক্তি বলিয়া ভাবিতেছ, সেগুলি আমারই বিভূতি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এইসমস্ত উক্তি ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তের প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেখানে দেবী বলিতেছেন—

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।—ইত্যাদি

আমিই রুদ্র, বসু, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনী সমস্ত যাহা কিছু ইত্যাদি। সুতরাং বেদের সংহিতাভাগের এই মন্ত্রগুলির অর্থ করিয়া পরবর্তী পুরাণবর্ণিত চণ্ডীচরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য করিলে চণ্ডী যে বৈদিক দেবতা নয়, অনার্যদেবতা এই সমস্ত ভ্রান্তি ও কুকল্পনার তখনই অবসান হইবে।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে এইসমস্ত শক্তিদেবতা বেদ প্রতিপাদিত চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের বিবিধাভক্তি মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নানাভাবে পরিকল্পিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একই পরমসত্তার বিবিধপ্রকার শক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।—শ্বেঃ উঃ

এই ঈশ্বরের পরমাশক্তি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধরূপে কল্পনা করা হইয়াছে—ইহাই শ্রুতি বা বেদের মত। তন্ত্রেও উল্লেখ আছে—

একাহি শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপে তু কালী সমরে তু দুর্গা॥

অর্থাৎ ঈশ্বরের একই সর্বাত্মিকা শক্তি নানাপ্রকারের ভবানী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি রূপে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই পরিকল্পিত হইয়া উপাসনার বিষয়ীভূত হয়। যথা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন স্বয়ং

CENTRAL LIBRARY

যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নির্দেশ মত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দ্বারা শক্তির ভয়ঙ্করীরূপে দুর্গা চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের সপ্তশতী গ্রন্থে দুর্গাকে 'চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা' রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বৈদিক যুগ হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় আগত এই চণ্ডী উপাসনার মধ্যে অনার্য-প্রভাব বা অনার্য সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? ইহাকে শুধু বিভ্রান্তিকর ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তারপরে ওরাঁও প্রভৃতি অনার্যদের মধ্যে চাণ্ডীদেবতা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা বৈদিক দেবতা চণ্ডীর অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়।

ইহা ছাড়া সমালোচকগণ যে চণ্ডীদেবতাকে অনার্যকথিত চণ্ডীর সহিত এক করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা চণ্ডী শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র চাণ্ডী হইতে চণ্ডীর আগমন—এই প্রাপ্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু চণ্ডী শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ইহা পাণিনির গণ পাঠের চড়ি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। চড়ি ধাতুর অর্থ কোপ প্রকাশ করা। এই ধাতুর রূপ পাণিনি মতে চণ্ডতি, চণ্ডতঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি কোপন স্বভাবা দেবী তিনিই চণ্ডী। কোষ গ্রন্থে বলা হইয়াছে 'চণ্ডী তু অত্যন্তকোপনা।' যিনি অতি কোপনস্বভাবা তাঁহাকে চণ্ডী বলা যায়। চণ্ডী শব্দের নির্বচন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ষোড়শ শতাব্দীর তান্ত্রিক দার্শনিক সর্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীভাস্কর রায় তাঁহার প্রসিদ্ধ সপ্তশতী চণ্ডীর 'গুপ্তবতী' নামক টীকায় চণ্ডী শব্দের নির্বচন করিয়া বলিয়াছেন—

চড়িকোপে চড় ঋতো নিষ্পন্নত্বাৎ চণ্ডী পরম কোপনা স্ত্রীদেবতা।
ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ॥
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।—তৈ. উ. ৮।১
ইত্যাদি শ্রুত্যা বায়ুাদিভয়জনক কোপস্যাপি পরব্রহ্ম
লিঙ্গত্বমক্ষতমেব। অতএব মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।—ইতি শ্রুতে

চড়িকোপে এই অর্থযুক্ত চড় ধাতু হইতে চণ্ডী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরম প্রধানা ভক্তি ভীষণা এই চণ্ডী।

যে শক্তির প্রভাবে ও ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য ভয়ে উদিত হইতেছে; অগ্নি যম প্রভৃতি যাহার ভয়ে নিজ নিজ কার্য করিয়া সৃষ্টি রক্ষার সাহায্য করিতেছে পরমেশ্বরের সেই ভয়ঙ্করী শক্তির নাম চণ্ডী। ইহা বেদেই উক্ত আছে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। সুতরাং সেই চণ্ডীকে ভীষণা প্রকৃতির দেবী বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমাদের আশঙ্কা বেশী ভাবিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে কিংবা অপ্রিয় নামটি এড়াইবার জন্য মঙ্গলচণ্ডী নাম দেওয়া হইয়াছে—কোন কোন সমালোচকের এই উক্তি দেবতার উপর অকারণ অধিক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির হন দুর্বৃত্তদের প্রতি—তাই সপ্তশতী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলম্।

অর্থাৎ হে দেবী চণ্ডী! দুর্বৃত্তদের প্রশান্ত করাই তোমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—ইহার তুলনা অন্য দেবতাতে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে কৃপাময়ী নন, সর্বদা অনিষ্টকারিণী এই উক্তিও যথার্থ নয় কেননা সপ্তশতী গ্রন্থে ইহাও উক্ত আছে—

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা

তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ঠুরস্বভাবা হইলেও তোমার চিত্তে যে কৃপা রহিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। তাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে সপ্তশতী গ্রন্থে দেবীর স্তুতিতে দেবতাগণ বলিতেছেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

CENTRAL LIBRARY

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি জীবের জননীরূপে এবং দয়ারূপে বিদ্যমানা তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। সুতরাং তিনি জগন্মাতারূপে বিশ্বের শান্তির জন্য দুর্বৃত্তদের শাসনকর্ত্রী এবং ভক্তগণের সিদ্ধি ও অভয়দাত্রীরূপে পূজিতা—অকারণ অমঙ্গল করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে তাহা অলীক কল্পনা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। কলিঙ্গরাজের মাতৃপূজায় অবহেলা প্রভৃতি নানা দুষ্কৃতির ফলে তাহাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছিল এবং নীচ ব্যাধজাতি হইলেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট কালকেতু ও ফুল্লরার ঐকান্তিক ভক্তিতে তাহাদিগকে রাজপদে উন্নীত করিয়াছিলেন—এই ভাঙ্গাগড়া উত্থান-পতন প্রভৃতি মানবজীবনে নিজ নিজ কর্মানুযায়ী সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার জন্য দেবতা দায়ী থাকেন না। গ্রীক দার্শনিক Plotinus বলিয়াছেন—God is not in fault, fault is in the chooser—অর্থাৎ দেবতা কখনও দোষী হইতে পারে না, দোষী মানুষ—যে নিজের কর্ম বাছিয়া লয়।

অতএব চণ্ডী যে বৈদিক যুগ হইতে ধারাবাহিকভাবে দেবী—ইনি লৌকিক বা লোকসৃষ্ট নহেন তাহা উল্লিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইল।

চণ্ডীর পরে বাসলী, বাসলী বা বাশুলীর প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে বাশুলীও অনুরূপভাবে লৌকিক দেবতা নহেন। বাশুলীর পূজা গ্রামাঞ্চলে বহু ব্যাপকভাবে দেখা যায় কোথাও শিলাখণ্ডে, কোথাও বা মূর্তিতে ইহার উপাসনা হইয়া থাকে। বাশুলী কথাটি বাগীশ্বরী হইতে আসিয়াছে। ভুলক্রমে অনেকে ইহা বিশালাক্ষীর অপভ্রষ্ট শব্দ বলিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে বাগীশ্বরী>বাইস্সরী>বাইশ্শলী (মাগধী প্রাকৃত)> বাশুলী শব্দের আগম। বিশালাক্ষী হইতে নিষ্পন্ন হওয়া যুক্তিসহ নয়। বাস্তবক্ষেত্রে কবিগণ এই দেবতার উপাসনা করিয়া কবিত্ব লাভ করিয়াছেন দেখা যায়। চণ্ডীদাস বাশুলীর উপাসনা করিয়া কবিত্ব লাভ করিয়াছেন—

বাশুলী আদেশে গাহিল চণ্ডীদাসে।

উড়িষ্যার কটক জেলার ঝঙ্কড় গ্রামের সারলা দেবী নামে বাশুলীর বরে কবি সারলাদাস ওড়িয়াভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যাদেবী বাগীশ্বরীই বাশুলী নামে অভিহিতা হইয়া পরমেশ্বরের অন্যতমা শক্তিরূপে লোকসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। বেদের সরস্বতীসূক্তে বামকেশ্বর তন্ত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাগ্‌দেবীর উপাসনা বাশুলীর মধ্য দিয়া হইয়া আসিতেছে। বিশ্বদ্বরেণ্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে বাশুলীর যে ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বামকেশ্বর তন্ত্রান্তর্গত নিত্যষোড়শিকার্ণব গ্রন্থে বাগীশ্বরীর রূপ বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যায়। উক্ত তন্ত্রগ্রন্থে বাগীশ্বরীর রূপ বর্ণনা—

ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণারুণাম্
জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমী কুসুমোপমাম্॥
... ...
রক্তবস্ত্র পরীধানাং পাশঙ্কুশকরোদ্যতাম্
রক্তপুষ্পনিবিষ্টাং তাং রক্তাভরণ ভূষিতাম্
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং পঞ্চবাণ ধনুর্ধরাম্॥—ইত্যাদি

যাহা হউক এই বাগীশ্বরী বা বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডী ইহারা একই পরাশক্তির বিবিধরূপ। 'পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে'—ঈশ্বরের সেই পরাশক্তি বিবিধশক্তিরূপে উপাসিত হইতেছে ইহাই বেদের মত। সুতরাং এই

CENTRAL LIBRARY

সমস্ত দেবী লৌকিক হইলেন কিরূপে ? ইঁহারা সেই একই উৎসের বিভিন্ন ধারা।

ইহার পরে পরমশক্তিশালিনী সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা—যাঁহার আবির্ভাব, চরিত্র ও কার্যাবলী সমালোচকগণের পরম বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় এবং এই দেবতার আবির্ভাব নাকি অনার্য সভ্যতা হইতে, ইঁহার কার্যাবলী নাকি অতি নিষ্ঠুর—চাঁদসদাগর প্রভৃতির নিপীড়নের মূলে এই দেবীর ভূমিকা নাকি অতি ভয়ঙ্কর। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ নাকি দেবতার এইরূপ যথেচ্ছাচারের বিষয় ভুলিয়া স্তবস্তুতির দ্বারা সন্তোষবিধানের জন্য মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। দেব-দেবী সম্বন্ধে এইরূপ অনুদার মত পোষণ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও অংশভাগী ছিলেন এবং তাহাতে যে তিনি স্ববিরোধী মতবাদ পোষণ করিয়াছেন তাহা ইহার পরে আলোচনা করিব। মোটের উপর সমালোচকগণ দেবী মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি শক্তিদেবতাকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করাইয়া তাঁহাদের কার্যের কৈফিয়ৎ তলবের সুরে এলোপাতাড়ি সমালোচনা করিয়াছেন সেগুলি তলাইয়া দেখিলে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ চিরাগত দেবতা উপাসনার ধারায় মূল উৎসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু মূল উৎস সম্বন্ধে ভ্রান্তিমূলক ধারণা থাকায় সমালোচনাগুলি 'উলটা বুঝিলি রাম' হইয়া গিয়াছে। মনসাকেই পুনরায় গতানুগতিক ন্যায়ে অনার্য সংস্কৃতিসম্ভবা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—যেহেতু তিনি সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবী বেদে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বেদের ভারতীয় সংস্কৃতি সভ্যতা বিষয়ে সর্বাধিকর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণভাবে অদ্যাপি বর্তমান। ভারতের যাবতীয় ধর্মপ্রেরণার মূলই বেদ। যাহা বেদে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে নাই তাহা ভারতে চলিতে পারে না। তাই মহাভারতের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে—

সর্বং বিদুর্বেদবিদো বেদে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
বেদেহি নিষ্ঠা সর্বস্য যদ্‌যদ্ অস্তি চ নাস্তি চ॥

অর্থাৎ যাঁহারা বেদের রহস্যবিদ্ তাঁহারা সমস্তই জানেন—বেদের মধ্যে সমস্তই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বিধৃত রহিয়াছে। যেগুলি অস্পষ্ট, সেগুলির ইঙ্গিত রহিয়াছে—সেগুলি স্পষ্টভাবে পুরাণাদির মধ্য দিয়া উৎসারিত করা হইয়াছে। তাই মহাভারতে বলা হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ—আদিপর্ব

সুতরাং বেদের অতি সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট অস্পষ্ট বিষয়গুলি সকলের জ্ঞাতার্থে পুরাণাদির মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কারণ বেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষিপ্ত এবং রহস্যময়। উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা গুরুপরম্পরাগত ব্যাখ্যাতা ছাড়া বেদের রহস্য চায়ের টেবিলে বসিয়া বোঝা যায় না, বা তাহার মূলে সমালোচনা করা যায় না। মহাভারতে বলা হইয়াছে—

ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্।—আদিপর্ব

অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ই প্রথমে সংক্ষেপে (সমাস) পরে বিস্তারিত ভাবে (ব্যাস) বলাই বিদ্বৎসমাজের অভিপ্রেত।

তাই বেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও রহস্যময়। ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির দ্বারাই পরে উৎসারিত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র রচনার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—তিনি যে অর্থশাস্ত্র রচনা করিতেছেন তাহার মূল বেদ। বেদের নির্দেশেই লৌকিক সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে—

'ত্রয্যা হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি।—অর্থশাস্ত্র

অর্থাৎ ত্রয়ী অর্থাৎ বেদের দ্বারাই সমস্ত লোকসৃষ্টি রক্ষিত হইয়াছে। বেদের প্রভাবেই লোকসৃষ্টিতে বিপর্যাস দেখা যায় না। সর্বত্রই সুশৃঙ্খলা বিরাজমান করে।

CENTRAL LIBRARY

সুতরাং লোকস্থিতির যাবতীয় উপদেশ বেদের মধ্যেই অতি সংক্ষিপ্তভাবেই রহিয়াছে, তাহার বিস্তৃত রূপ দেখা যায় সুপরিপুষ্ট, সুপ্রসারিত দণ্ডনীতিশাস্ত্র এবং পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে। ঐরূপ গণিত শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বেদপরবর্তী শাস্ত্রের প্রবর্তয়িতাগণ বেদকেই সমস্ত মানবগণের আদিম উৎস বলিয়া স্ব স্ব গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীকার করিয়াছেন। এই সমস্ত লিখিত প্রমাণসত্ত্বেও প্রাগ্‌বৈদিক অনার্য সভ্যতা, আর্যরা বহিরাগত ইত্যাদি উক্তি আজগুবি উদ্ভট কল্পনা ছাড়া কি হইতে পারে? আর্য সভ্যতা সংস্কৃতি বিষয়ে লিখিত রাশি রাশি গ্রন্থগুলির উপাদান যে অনার্যরা যোগাইয়াছে বলিয়া বলা হয় সেই অনার্যদের এ যাবৎ কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, তাহা সত্ত্বেও অনার্য সভ্যতার বেদ-পূর্ববর্তী স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রচার যাঁহারা করেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'চিকাগো' বক্তৃতায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বেদ যে সর্বপ্রাচীন এবং ইহা যে বিশ্বমনের (cosmic mind) প্রকাশ (revealation) এবং সুদূরপ্রসারী যে ইহার ক্রিয়া তৎসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার দিকে তথাকথিত অনার্য সভ্যতার সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

'The Hindus have received their religion through revealation, the Vedas. They hold that the Vedas are without beginning and without end—. But by the Vedas no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times. Just the law of gravitation existed before its discovery and would exist, if all humanity forgot it, so is it with the laws that govern the spiritual world.'

—Chicago Address.

এখন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ধারাবাহিকভাবে আগত এই প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির অন্যতম ফলশ্রুতি। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখন মনসামঙ্গলের কথা ধরা যাক। সর্পাধিষ্ঠাত্রী-দেবী মনসাকে লৌকিক দেবতা আখ্যা দিবার কোন নির্দিষ্ট কারণ নাই। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বেদে সর্পের উল্লেখ আছে বলিয়া ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে দেখাইয়াছেন—

যৎতে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।—ঋ. ১০. ১৬. ৬

তবে তিনি যে বলিয়াছেন বেদে সর্প পূজার উল্লেখ নাই ইহা ঠিক নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ বৈদিক মন্ত্রে দেখা যায় সর্পপূজার বিধান রহিয়াছে, যথা—

নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমো নমঃ।

— শুক্ল যজুর্বেদ, ১৩ অধ্যায়

অর্থাৎ যে সমস্ত সর্প পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, দশদিকে রহিয়াছে, তাহাদিগকে নমস্কার করি। এই সমস্ত মন্ত্রে সর্পকে দেবতা বলিয়া প্রণাম করা হইতেছে। সুতরাং সর্পপূজা বেদসম্মত, তাহা ছাড়া আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে গৃহীদিগকে সর্প পূজার বিধি সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া আছে তাহার মূল উৎস এই সমস্ত বেদমন্ত্রসমূহ। কিন্তু এই সর্পপূজা বাহির হইতে আসিয়াছে এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। বেদে সর্প কেন, ভেক, ঘুঘু প্রভৃতি প্রাকৃতিক জীবজন্তুর সৃষ্টি কার্যে উপকারিতা অপকারিতা লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত মন্ত্র বিদ্যমান সেগুলির উৎস বহিরাগত বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

CENTRAL LIBRARY

বেদের সৃষ্টি এইদেশে, বাহিরের কোনও প্রভাব ইহার উপর পড়িবার কোনও কারণ নাই—তাহা সুসিদ্ধান্ত মত। বেদে সর্পরাজ্ঞীর যে উল্লেখ আছে—তিনিই মনসা-কশ্যপের মানস কন্যা। মন্ত্রাত্মিকা দেবতা। যে সমস্ত বেদমন্ত্রে সর্পভীতি নিবারিত হয়, মনসা সেই সমস্ত বেদমন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ। মন্ত্র শব্দের অর্থ মননাৎ মন্ত্র উচ্যতে। যাহা মনন করা হয় তাহাই মন্ত্র। সুতরাং বেদে মনসা শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও সর্প মন্ত্রগুলির বিগ্রহাত্মিকা দেবীরূপের ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং তাহাই মনসা কাহিনীরূপে মহাভারত ও অন্যান্য পরবর্তী পুরাণের মধ্য দিয়া উৎসারিত হইয়াছে। সর্পসঙ্কুল ভারতবর্ষে এই ভয়ঙ্কর জীবটির ভীতি এবং সর্পবিষের উপকারিতা প্রভৃতির জন্য ইহারাও বৈদিক ঋষিগণের অন্তর্দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। তাই সর্পপূজা বৈদিক যুগ হইতে নানা সূত্রের মধ্য দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে আজও সাড়ম্বরে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত অন্যান্য সভ্যতা, বাহিরের প্রভাব প্রভৃতির সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। আমাদের বাস্তু যাগ প্রভৃতি বৃহৎ অনুষ্ঠানে অষ্ট নাগের পূজা আছে—বেদমন্ত্রে দেখা গিয়াছে—পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, আকাশে সমস্ত জায়গায় নাগগুলিকে নমস্কার জানান হইয়াছে। নাগ শব্দের অর্থ চঞ্চল গতিসম্পন্ন। ন+অগ=নাগ। অগ শব্দের অর্থ যাহা গমন করে না—স্থির। যে স্থাবর নয় অথচ দ্রুত গতিসম্পন্ন তাহাকেই নাগ বলা হইয়াছে। শব্দটির মধ্যে দুইবার নিষেধার্থক অব্যয়ের ব্যবহারের ফলে গতির তীব্রত্ব বুঝাইতেছে।

সুতরাং সর্পপূজা বৈদিক, তদধিষ্ঠাত্রী সর্পরাজ্ঞী মনসাও বৈদিক—তাঁহাকে লৌকিক বলিবার কোন কারণ নাই। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ শক্তিময়ী এই দেবতাকে ঠিকভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন—ভ্রান্ত, একদেশদর্শী ধারণার ফলে আমরা তাঁহার উপর নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারিণী দেবী বলিয়া অভিযোগ করি। আরও উল্লেখযোগ্য যে এই বৈদিকদেবী সর্পরাজ্ঞী মনসা দক্ষিণ ভারতে মঙ্কাম্মা অর্থাৎ মনসা মাতা নামে অভিহিতা—সমানভাবে বৈদিকযুগ হইতে অর্চিতা হইয়া আসিতেছেন। যে স্নুহীবৃক্ষ মনসা দেবীর প্রতীকরূপে পূজিত হয়, তাহার ঔষধিগুণের সহিত বিষনাশেরও শক্তি রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত নাগরাজ্ঞী মনসা জাগুলি বা জাঙ্গুলী বলিয়া মহাযান বৌদ্ধগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন। 'মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে জাঙ্গুলী দেবী অতি প্রাচীনা এমন কি, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই দেবীর পূজার গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে।'—বলিয়া ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন। এই সর্পদেবীর পূজা যে বেদসম্মত এবং এই সর্পদেবীর উল্লেখ যে অথর্ববেদে আছে তাহাও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য স্বীকার করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সর্পপূজার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেই সংক্ষিপ্ত সর্পদেবী পূজার বিস্তৃত ব্যাখ্যানে মনসা নাম করা হইয়াছে। উল্লিখিত নিয়মে—'ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'। অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণাদির মাধ্যমে বেদের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে বিস্তৃত আকারে উৎসারিত করিতে হইবে—ইহা মহাভারতকারের নির্দেশ। মহাযান বৌদ্ধদের নিকট মনসা জাঙ্গুলী নামে অভিহিতা, উক্ত জাঙ্গুলী শব্দ জঙ্গল হইতে আসিয়াছে কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। জাঙ্গুল শব্দের অর্থ সর্প। ইহা গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কুটিলভাবে যাহারা গমন করে সেই অর্থে গম্ ধাতু+যঙ্‌লুক+ডুল (পাণিনি)=জাঙ্গুল অর্থাৎ সর্প। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাঙ্গুলি বা জাগুলি। মনসামঙ্গল প্রণেতা বিপ্রদাস পিপলাই মনসাকে 'জাগুলি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জাগুলি শব্দ যে জাঙ্গুলী হইতে আসিয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। বিষবৈদ্যকেও জাঙ্গুলীক বলা হয়। 'জাঙ্গুলীঃ বিষবৈদ্যেসাং'—অমরকোষ।

CENTRAL LIBRARY

সুতরাং উক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে মনসা পরবর্তীকালের লৌকিক বা লোকসৃষ্ট দেবতা নহেন। ইনি বৈদিক দেবতা। ইনি অনার্য দেবীও নন। অনার্যদের মধ্যে এইরূপ পূজার প্রচলন থাকিলে তাহা ওঁরাওদের চণ্ডীর ন্যায় হিন্দু অনুষ্ঠানের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রলয়ের দেবতা কালীকেও ঠিক সমানভাবে অনার্য দেবতা বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—'তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে যে কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র।··· নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ হইতেই কালিকাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে—তাহা তাঁহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করেন·····বহির্বাংলার কোন অনার্য সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই দেবী ক্রমে তন্ত্র ও পুরাণের ভিতর দিয়াই বাংলার সমাজে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছেন··· ইত্যাদি ইত্যাদি'—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পৃঃ ৭৫৭।

অনার্য সংস্কৃতিমূলক এইসমস্ত উক্তি যে ঠিক নয়, তাহা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। কালীও বৈদিক দেবতা—বেদে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইঁহাকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে অন্যতম জিহ্বারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

কালীকরালী চ মনোজবাচ
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী লেলায়মানাঃ ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।

মহাভারতের মধ্যে দুর্গা, কালী ও চণ্ডীর একত্ব করা হইয়াছে—একই শক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন বিকাশ। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন দুর্গাস্তোত্র পাঠ করার সময় বলিয়াছেন—

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্যে মন্দরবাসিনী
কুমারি কালি কপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে।—ভীষ্ম পর্ব, ২৩শ অধ্যায়

লক্ষণীয় এই যে এখানে দেবীকে আর্যে বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, অনার্যা বলা হয় নাই।

সুতরাং সমালোচকেরা তাঁহাকে অনার্যকৃষ্টিসম্ভূতা কি করিয়া বলিলেন—তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যুক্তিহীন ভক্তির উপর বলিবার নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন কালীর রূপের মধ্যে অনার্যের চিহ্ন রহিয়াছে—শিবের বেলাও তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন—তাহার প্রত্যুত্তর আগেই দেওয়া হইয়াছে। অর্জুন যে সমস্ত নাম ব্যবহার করিয়া দুর্গার স্তব করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি সার্থক শব্দ—পরমেশ্বরের একই শক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে যে বিভিন্ন-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই শব্দগুলির মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। কালীশব্দের ব্যাখ্যা করিয়া প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন। কালী—কালশক্তি। কালের কার্য যেমন ক্রমিক সৃষ্টি ও তাহার প্রলয়—কালীও কালের প্রতীকরূপে সৃষ্টি এবং লয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা, একহাতে নরমুণ্ড অন্যহাতে অস্ত্র এবং বরাভয়। দেবতার যে ভীমকান্ত গুণ অর্থাৎ একই সত্তায় উগ্র ও কোমলভাব—'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা'—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—অর্থাৎ জগজ্জননীরূপে চিত্তে দয়ার ভাব কিন্তু সমরক্ষেত্রে নিষ্ঠুরভাব এই দুইএর অপূর্ব সন্নিবেশ দেবীমূর্তিকে মহিমময়ী করিয়া তুলিয়াছে। দেবীর ভীমকান্ত গুণ সম্বন্ধে সপ্তশতী চণ্ডীতে আরও উক্ত আছে—

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তিতে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈরক্ষাস্মান্ তথাভুবম্॥

অর্থাৎ হে জননী! তোমার সে শান্ত রূপগুলি সমস্ত বিশ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তোমার যে ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি দুর্বৃত্ত প্রশমনের জন্য সর্বত্র সঞ্চরশীল—এই উভয়প্রকার রূপের দ্বারা আমাদিগকে তথা এই জগৎকে রক্ষা কর। এই

CENTRAL LIBRARY

প্রার্থনার মধ্যে কি কোনও অনার্যআকৃতি রহিয়াছে সমালোচকগণ বলিতে পারেন। কালীর গলায় যে মুণ্ডমালা সেগুলি অসুরের মুণ্ড—অসুরগুলি নিশ্চয়ই অনার্য—অনার্যা দেবী তাঁহার স্বজাতির মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন কি করিয়া? অনার্যভাবাপন্ন ব্যক্তি যদি বিশ্বের শৃঙ্খলার জন্য ছেদনযোগ্য হয়, তাহা হইলে আর্যরা কি অনার্য বধে অক্ষম? শ্রীকৃষ্ণ এতগুলি অসুর বধ করিয়াছিলেন—তিনি কি তাহলে অনার্য? সুতরাং এইসমস্ত ভ্রান্ত ধারণা যত শীঘ্র অপসারিত হয়, তাহাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ কালীর গলায় মুণ্ডমালা—কালী যে সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা তাহারই প্রতীক। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি তান্ত্রিকগণ এই মুণ্ডমালাগুলিকে মাতৃকারূপে বর্ণনা করিয়া এই মুণ্ডের সংখ্যা ৫০ বা ৫১ স্থির করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে কালী প্রলয়ের দেবতা অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব সূক্ষ্মভাবে ইঁহাতে প্রলীন থাকে। বিশ্বের প্রতীক, এই পঞ্চাশদ্ বর্ণাত্মিকা মুণ্ডমালা উপনিষদে সমস্ত বিশ্বকে নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতং জগৎ অর্থাৎ সৃষ্টিবিশ্বের সমস্ত যাহা কিছু সমস্তই নাম ও রূপের মাধ্যমে প্রকটিত। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর নাম ও রূপ রহিয়াছে—আগে নাম পরে রূপ। যে কোন নাম এই পঞ্চাশটি বর্ণের অতিরিক্ত নয় ইহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ৫০টি মাতৃকাবর্ণের মধ্যে সমস্ত সৃষ্ট বিশ্ব সংক্ষিপ্তরূপে বিদ্যমান—তাই মুণ্ডমালা সেই শক্তিদেবতার আভরণ-বিশেষ। ইহা অনার্যসভ্যতার চিহ্ন নহে। তাহা ছাড়া কোনও আর্যজাতির মধ্যে অতীতে বা বর্তমানে শক্তির এই মূর্তির পূজা দেখা যায় না। সুতরাং কালী অনার্যদেবতা বা লোকসৃষ্ট দেবতা নহেন। ইনি বৈদিকদেবতা—একই শক্তির বিভিন্ন কার্যাবলীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্নরূপ প্রদান করা হইয়াছে।

ইহার পরে রোগনাশিনী দেবতা শীতলার বিষয় আলোচনা করা যাক্। শীতলা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শীতং লাতি দদাতি ইতি শীতলা—অর্থাৎ যিনি বসন্ত প্রভৃতি উগ্র দাহাত্মক রোগগুলিকে শৈত্য প্রদান করেন।

বিস্ফোটকাদ্যুগ্রতাপপ্রশমনকারী শীতলাং তাং ভজামি।—পিচ্ছিলাতন্ত্র। ইঁহাকেও লৌকিকদেবতা বলিয়া মঙ্গলকাব্যের সমালোচকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও যে পূর্ববৎ ভ্রান্তিমূলক ধারণা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বকালের। যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া রোগনাশের প্রার্থনা করা হয় সেই শক্তি শীতলা সর্বকালের—বৈদিক যুগ হইতে যে ইঁহার অস্তিত্ব বিদ্যমান তাহা আয়ুর্বেদের বিষচিকিৎসাপ্রকরণ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। আয়ুর্বেদ অতিপ্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ—মহাভারতে উক্ত আছে কৃষ্ণাত্রেয়াং চিকিৎসিতম্। কৃষ্ণাত্রেয় ঋষি বেদের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া যে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার নাম আয়ুর্বেদ—ইহাকে বেদেরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে—শুধু মাধুর্যের জন্য কেবল চিকিৎসাগ্রন্থ রচিত হয় নাই। গবায়ুর্বেদ, হস্ত্যায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ প্রভৃতি প্রাণিহিতকর চিকিৎসাশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল—এইগুলিকে বেদ নামে অভিহিত করিবার তাৎপর্য এই যে এইগুলির রহস্য বেদের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং রোগজননী শীতলার আবির্ভাবকে লৌকিক বলিয়া বলিলে তাহার প্রাচীনত্বের অপলাপ করা হয়। মহাযানী বৌদ্ধগণ শীতলাকে হারীতী দেবীরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন চিরাগত বেদসম্মত এই দেবীর রোগনাশকত্বরূপকে কেন্দ্র করিয়া। বৌদ্ধরা ক্ষণভঙ্গবাদী—স্থায়ী দেবতার রূপ পরিকল্পনা তাঁহাদের নীতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও রোগাক্রমণের তীব্রতার সত্যকে তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা চিরপরম্পরাগত রোগজননী শীতলাকে হারীতীরূপে খ্রীস্টপূর্ব বহু শতাব্দী হইতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার যে ধ্যান রহিয়াছে, তাহা দেবীর স্বরূপের উদ্ঘাটক—

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগবিলসৎ মার্জনপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জন্তী পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্।

CENTRAL LIBRARY

দিব্যবস্ত্রা মৃদ্বি-স্বর্ণাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রম্
বিস্ফোটকাদ্যুগ্রতাপপ্রশমনকারী শীতলাং ভজামি।

অর্থাৎ তিনি শ্বেতাঙ্গী—শ্বেতবর্ণ সর্বপ্রকার ক্লেশকলুষ শান্তির দ্যোতক। তাঁহার বাহন গর্দভ। গর্দভের দুগ্ধ বসন্তাদি রোগের প্রতিষেধক—ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত। তাই রোগনাশে সহায়ক সেই প্রাণীকে তাঁহার বাহনরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার হাতে সম্মার্জনী অর্থাৎ যে আবর্জনা জঞ্জাল সমস্ত রোগের উৎপত্তির কারণ সেইগুলির পরিষ্কারক সম্মার্জনী তাঁহার হস্তে। রোগজনিত দাহাদির প্রশমনের জন্য অমৃত জলপূর্ণ কলস তাঁহার কক্ষে। সর্বব্যাপিনী শক্তি বলিয়া তাঁহাকে দিগ্‌বস্ত্রা বা দিগম্বরী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইত্যাদি ভাবে রোগনাশনের সমস্ত উপকরণযুক্তা করিয়া পরমেশ্বরের সেই একই মহাশক্তিকে শীতলারূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন আর্য ঋষিগণ। সুতরাং 'প্রকৃত পক্ষে ইহা লৌকিকদেবী, পরবর্তীকালে হিন্দু পৌরাণিক আভিজাত্য লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র'—মঙ্গলকাব্য সমালোচকগণের শীতলা সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণ যে যুক্তিহীন তাহা উক্ত প্রমাণ পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা যায়। অতএব শীতলা লৌকিক দেবতা নহে; ইনি সর্বকালীন বেদানুমোদিতা মহাশক্তি রোগনাশিনী দেবতারূপে পরিকল্পিতা।

সংক্ষেপে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মদেবতা সম্বন্ধে ইহাই যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় যে ধর্মদেবতা লৌকিক নহেন—ইনি বৈদিক দেবতা। ধর্মশব্দের অর্থ ধারণাদ্ ধর্ম উচ্যতে অর্থাৎ যাহার দ্বারা সমস্ত কিছু বিধৃত হয় বা রক্ষিত হয়। আত্মাই সমস্ত বিশ্বজগতের বিধৃতির মূল কারণ। সূর্যকে বেদে বলা হইয়াছে—সূর্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ। স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই আত্মা হচ্ছেন সূর্য। সেই সূর্যকেই ধর্মরূপ, শূন্যরূপকে বর্তুলাকৃতিরূপে পূজা করা হইয়া থাকে। তাই ধর্মঠাকুরের বন্দনায় বলা হইয়াছে—

মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহম্ মহাবলম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥

ধ্যানের মধ্যে যে সমস্ত গুণের কথা বলা হইয়াছে সমস্তই সূর্য অর্থে বোঝায়। সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের আত্মাস্বরূপ বেদবিঘোষিত সূর্য পরবর্তীকালে ধর্মদেবতারূপে সকলশ্রেণীর বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা ধর্মঠাকুররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্ম শব্দটি যে অষ্ট্রিকজাতীয় শব্দ বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসহ নহে কারণ অষ্ট্রিক ভাষা ও শব্দ সোনার পাথরবাটির ন্যায় অস্তিত্ববিহীন। সুতরাং ধর্মদেবতাও লৌকিক দেবতা নহেন—বেদানুমোদিত সূর্যই ধর্মদেবতারূপে আপামর জনসাধারণের পূজ্য দেবতা।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণের অনার্য সংস্কার-সম্ভূতি এবং তাঁহাদের লৌকিক সৃষ্টির ভ্রান্ত ধারণা নিরাকরণ করিয়া তৃতীয় দফায় এই সমস্ত দেবদেবীর আচরণ ও কার্যকলাপ মানুষের কার্যাবলীর ঊর্ধ্বে নয় অর্থাৎ মানুষের ন্যায় ইহাদের কার্যাবলী ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ অথবা মনুষ্যচরিত্র হইতে আরও নিকৃষ্টতর—ইত্যাদি ধারণা যে অসমীচীন, অযৌক্তিক ও স্বকপোলকল্পিত তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে। এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য কল্পিত ভ্রান্ত ধারণা হইতে আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মুক্ত নহেন, আমাদের দেবদেবী সম্বন্ধে তাঁহার যে বিরূপ ধারণা ও অনুদার মত শাস্ত্রীয় যুক্তির মাধ্যমে নিরাকরণ যোগ্য বলিয়া মনে করি। তিনি তাঁহার কালান্তর গ্রন্থে শক্তিপূজা নামক অধ্যায়ে বলিয়াছেন, 'আমাদের শিব ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তাহার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক ও আর একটিকে লৌকিক বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী, লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখিতে পাই।' বেদের রুদ্রাধ্যায়ে শিবের যে স্বরূপ আগেই তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ

CENTRAL LIBRARY

করিয়াছি। এবার শিব রুদ্র একই সত্তা, ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন প্রকাশ।

'যাতে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাপাপকাশিনী।'—রুদ্রাধ্যায়

হে রুদ্র তোমার উগ্রমূর্তি ব্যতীত অন্য একটি শিব বা শান্ত মূর্তি আছে। ইহার দ্বারা একই সত্তার যে দুইটি বিভিন্ন সত্তা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাহাদের প্রকাশ ইহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে যে শিবের রূপ তাহা বেদসম্মত—মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাকে বেদোক্ত কৃষির দেবতারূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি যে কৃষির অধিপতি, এবং ক্ষেত্রের অধিপতি তাহার উল্লেখ বেদমন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। লৌকিক শিবকে রবীন্দ্রনাথ যে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে, তাঁহার সর্বাত্মক রূপ সর্বভাবে অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন ভাবে উৎসারিত হইয়াছে, তাহা আগেই আলোচনা করিয়াছি। শাস্ত্রের শিব সমাধিমগ্ন যতি হইলেও প্রয়োজনবশে রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্য শৃঙ্খলারক্ষার জন্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বেদে শিবের রূপ যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তদনুসারেই নিজ নিজ কাব্যের মধ্যে সমকালীন পাঠকের রুচিসম্মত করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। কৃষিকার্য, দারিদ্র্যনিপীড়িত জীবন, কোচরমণীর সহিত প্রণয় ব্যাপার প্রভৃতি যাহা কিছু—মঙ্গলকাব্যে শিবচরিত্রের মধ্যে দেখা যায় সমস্তই বেদসম্মত তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত শিববিষয়ক গীতটি লৌকিক ভাষায় লৌকিক ভাবে রচিত হইলেও তন্মধ্যে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সমস্তই রুদ্রাধ্যায়ের মধ্যে উল্লিখিত আছে।

বেরি বেরি অরে শিব মোঞে তোকে বোলঞি
বিরিমি করিয় মনলাই।
বিহু সময়ে হর ভিক্ষিয় পত্র মাগিয়
গুণগৌরব দূরে জাই॥
নিরধন জনবোলি সবে উপহসএ
নাহি আদর অনুকম্পা
তোহেঁ শিব পাওল আক ধুতুর ফুল
হরি পাওল ফুল চম্পা। ইত্যাদি

অর্থাৎ দেব, আমি তোমাকে বারবার বলিতেছি তুমি কৃষিকার্য কর, হে হর, তুমি নির্লজ্জ হইয়া ভিক্ষা মাগ, তাহাতে তোমার গুণগৌরব দূর হয়—নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে আদর কিংবা অনুকম্পা প্রদর্শন করেনা, হে শিব, তুমি আকন্দ ও ধুতুরা ফল পাইলে এবং হরি পাইল চম্পা ফুল ইত্যাদি যে অঙ্কিত শিব চরিত্র বেদের রুদ্রাধ্যায়ের দ্বারা অনুমোদিত। যথা—

নমোবজ্রশায় ব্যাধিনেহন্নানাং পতয়ে নমো
নমোভবস্য হেতৌ জগতাং পতয়ে নমঃ।
নমোরুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমঃ।—শুক্ল যজুর্বেদ, ৬০ অধ্যায়

অর্থাৎ যিনি অন্নের অধিপতি, ক্ষেত্রের অধিপতি, জগতের অধিপতি সেই রুদ্র বা শিবকে নমস্কার করি।

অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়া ঈশ্বরী পাটনীর নিকট ছন্দভাষায় যাহা বলিয়াছেন সে সমস্তই বেদের রুদ্রাধ্যায়ের মধ্যে নিহিত, কেবল লোকরুচিকে অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী লৌকিক ভাষায় উচ্চারিত। ঈশ্বরী পাটনীর নিকট অন্নদা আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

CENTRAL LIBRARY

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।—ইত্যাদি

সুতরাং লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আদৌ যুক্তি বা প্রমাণসহ নহে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ শিবকে ঠিক বৈদিক রীতিতে উপলব্ধি করিয়া শিবচরিত্র অনুরূপভাবে উৎসারিত করিয়াছেন।

বেদের রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত আছে—

নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ
বর্ষীয়সে চ নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ
নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ।—ইত্যাদি

অর্থাৎ তুমি হ্রস্ব, তুমি বামন, তুমি বৃহৎ, তুমি বৃদ্ধ ইত্যাদি।

এইভাবে মঙ্গলকাব্যে শিব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে সে সমস্ত সুবিন্যস্ত রহিয়াছে বেদের রুদ্র-সূক্তের মধ্যে।

সর্বাত্মক দেবতারূপে শিবের প্রতি সমস্তই প্রযোজ্য। ইহার মধ্যে লৌকিক সৃষ্টি বা অনার্য সৃষ্টির কথা অবান্তর। রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা অনুরূপভাবে নিরাকরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ কালান্তর গ্রন্থের শক্তিপূজা অধ্যায়ে আমাদের শাস্ত্রীয় দেবতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'আমার বিশ্বাস অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্য-ভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসঙ্গতি একেবারে দূর হতে পারে নি। তাদের মধ্যে আজও আর্য-অনার্য দুই-ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্য-ধারারই প্রবলতা অধিক।'—শক্তিপূজা।

উক্তিটি যেরূপ অবান্তর এবং অযৌক্তিক তেমনি ভ্রান্ত অনুমানমূলক। এই উক্তির মূলে যেমন কোনও লিখিত বা অন্য কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, ইহার অনুমানটিও তেমন ভ্রান্তিমূলক। ন্যায়ের যুক্তিতে যে কোনও অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। দূর পর্বতে ধূম দেখিয়া সেখানে বহ্নির অস্তিত্বের অনুমান, রান্নাশাল প্রভৃতিতে ধূমের সহিত অগ্নির প্রত্যক্ষ সংযোগ পর্বতে বহ্নির অনুমানের পরিপোষক। এস্থলে ভারতীয় আর্যদের বেদানুমোদিত উপাস্য পূজিত দেবতাসমূহ অনার্যদের আছে বা ছিল, সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। কোনও অনার্যকে বর্তমান মনসা, শীতলা, শিব প্রভৃতি উপাসনা করিতে দেখা যায় না—সুতরাং আর্য দেবদেবীগণের মধ্যে দুটি সমান্তরাল ধারার অস্তিত্ববোধ নিছক কপোলকল্পিত—কবিগুরুর এই উক্তি পাশ্চাত্ত্য ভ্রান্তমতের নির্বিচার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইহার পরে শক্তিদেবতার চরিত্র ও কার্যকলাপের কথা। শক্তিদেবতার আবির্ভাবের ইতিহাস, তাঁহাদের চরিত্র ও কার্যাবলীকে অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত অনুদার, প্রমাণবিরহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি কেবল ভ্রমাত্মক নয়, ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুউচ্চ শীর্ষকে অনেক পরিমাণে আনত করিয়া দিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মনসামঙ্গলের সমালোচকগণ চাঁদসদাগরের ট্র্যাজেডির জন্য দেবী মনসার হিংসাত্মক-ভাব, পূজাপ্রাপ্তির আশায় স্বার্থপূর্ণ মানসিক বৃত্তি ও দেবভাবের অনুচিত প্রভুশক্তিকেই দায়ী করিয়াছেন। ইহারা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিচার করিতে চাহিয়া মহান্ অপরাধীরূপে প্রতিপন্ন করিতে চলিয়াছেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহার নানাগ্রন্থে শক্তিদেবতার

CENTRAL LIBRARY

বিরুদ্ধে যে সমস্ত অনুদার ও প্রমাণশূন্য উক্তি সেগুলির প্রতিবাদ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি কালান্তর গ্রন্থের শক্তিপূজা নামক অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী সম্বন্ধে এই উক্তি করিয়াছেন: 'সংসারে যারা পীড়িত, পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনও ধর্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।'

ইহা যে নিছক ভ্রান্তিমূলক ধারণা এবং দেবতা যে মানুষের অত্যাচার নিপীড়নের জন্য দায়ী নহেন, মানুষের আত্মার সহিত দেবতার অভিন্নতা সম্বন্ধে আগেই শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখান হইয়াছে। এই বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক Plotinus যাহা বলিয়াছেন, তাহা লক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

'Every self-moving principle is Soul...Soul is the self determining principle in nature and that which is self determined can be *affected by external things only indirectly*,—through its own will. If it is in a fallen state here, that must be because it has chosen to make for itself an unworthy environment, suited to its own disposition. God is not in fault; the fault is in the chooser—It is impossible to believe that the union of the immortal soul with the corruptible body which only takes place, because the soul has lost its wings'—The Philosophy of Plotinus by Inge—p. 9

সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক আত্মা যখন অবিশুদ্ধ দেহের সহিত এক হইয়া নানা প্রকার বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই মানুষের অধঃপতন হয়। দেবতা অপরাধী নহেন, যাহারা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া বিভ্রান্ত হয়, সেই নিজেই নিজের কর্মের জন্য অপরাধী হইয়া নানাপ্রকার দুঃখযন্ত্রণার সম্মুখবর্তী হয়। কবিগুরু এই উক্তির সত্যতা তাঁহার কাব্যনাটকে অস্বীকার করিয়াও হিন্দু দেবদেবী সম্বন্ধে অনুদার ও অশাস্ত্রীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার দুঃখকষ্টের জন্য তিনি সুদর্শনাকেই দায়ী করিয়াকেন, সর্বব্যাপী রাজাকে দায়ী করেন নাই। অখণ্ড, সর্বব্যাপী রাজ-সত্তাকে সুদর্শনা খণ্ডিতরূপে উপলব্ধি করিতে গিয়া, দেখিতে গিয়া এবং সর্বশেষ পাইতে গিয়া নিজের যাবতীয় বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়দুষ্ট দেহকে লইয়া বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে মানবের যে অধোগতি তাহার জন্য সে নিজে দায়ী—দেবতা নহেন—Plotinus-এর এই উক্তি সর্বকালে সর্বদেশে এক বিরাট সত্য। খেয়া কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলিয়াছেন—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে
তোমায় নাহি ডরিব হে
যেথায় ব্যথা তোমায় সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।—খেয়া

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুদর্শনার দুঃসময়কে দায়ী করিয়া নিজেই লিখিয়াছেন—

'রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, রূপের মোহে মুগ্ধ, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।—আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে, তাতে পদে পদে বাধা। কিন্তু তাকেই যদি

CENTRAL LIBRARY

ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হলো না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য।—আমার ধর্ম, প্রবাসী ১৩২৪ পৌষ, পৃঃ ২৯৭

এখন মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের কথা ধরা যাক্। চাঁদসদাগর শিবের উপাসক ছিলেন, শক্তি উপাসনা তার কার্য নয়। কিন্তু তন্ত্রের মধ্যে ও বেদের মধ্যে স্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'। শক্তিকে ছাড়া শক্তিমানের নামধাম নাই—দুইটী একই সত্তা। সেই পূর্ণসত্তার উপলব্ধিতে চাঁদসদাগরের যে বিপুলভ্রান্তি তাহা রাজা নাটকের সুদর্শনার খণ্ডোপলব্ধির প্রাপ্তির মত। খণ্ডোপলব্ধি জনিত যে পাপ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাহার যত দুঃখকষ্ট, যত কিছু দুর্ভোগ। পুনরায় তাহার সেই প্রাপ্তি দূরীভূত হইবার পর সমস্ত ক্লেশের অবসান। মনুর মতে ও নিরুক্তকার যাস্কের মতে আত্মাই যদি দেবতা হয়, সেই আত্মার খণ্ডোপলব্ধি আত্মবিড়ম্বনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আত্মবিড়ম্বনা পাপ—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাঁদসদাগরকে করিতে হইয়াছে—। সুতরাং গ্রীক্ দার্শনিক Plotinus যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য; চাঁদসদাগরের Tragedy-র জন্য চাঁদসদাগর নিজেই দায়ী। মনসা নহেন। কবিগুরু স্বয়ং অন্যত্র এই সত্য উপলব্ধি করিয়া হিন্দু দেবদেবীর ক্ষেত্রে যে অনুদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্ববিরুদ্ধ।

তাহাছাড়া কবিগুরু তাঁহার কাব্য 'বাল্মিকী প্রতিভা,' 'বিসর্জন নাটক' প্রভৃতিতে শক্তি দেবতা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়াছেন, তাহাও ভ্রান্তিমুক্ত নয়। তিনি বলিয়াছেন—'দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, চণ্ডীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি।—পশুবলি বা নিজের রক্তপাত; এমন কি নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তি পূজায় প্রচলিত।.....একদিকে দেব চরিত্রের হিংস্রতা, অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারবিহীন ফল কামনা। এই দুই-এর যোগ যে কুপায় আছে; তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোন বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কিনা ...।'—কালান্তর, শক্তিপূজা।

কবিগুরুর এই সমস্ত উক্তির মধ্যে অনাদি কাল হইতে প্রচলিত শক্তিপূজার রহস্য উপেক্ষিত হইয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে আত্মাস্বরূপ হইতে দেবতার পরিকল্পনা; মানুষ স্ব স্ব পরিবেশের মধ্যে যে যেভাবে দেবতার উপাসনা করিতে চায় দেবতা সেইরূপেই তাঁহার নিকট ধরা দেন। গীতায় ভগবানের উক্তি হইতে ইহা আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

অর্থাৎ যে মানুষ যে ভাবে আমাতে ভজনা করে, আমি তাহার নিকট সেইভাবেই ধরা দিই। সুতরাং অর্জুন! মানুষ নির্দেশিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে—তাই মানুষ স্ব স্ব কর্মফলের দ্বারাই চালিত হয়।

সুতরাং দস্যুই হউক, ঠগীই হউক, কাপালিকই হউক আপন আপন কর্মপন্থা বাছিয়া লইয়া নিজ কর্মের ফল ভোগ করে। তাই Plotinus বলিয়াছেন—God is not in fault ; fault is in the Chooser। সুতরাং যে যেভাবে কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া যে পরিবেশের মধ্যে যেরূপ কার্য করিবে, তাহার জন্য সেই নিজে দায়ী হইবে—দেবতা নহে। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শক্তিপূজার বলিদান ও রক্তপাতাদির উল্লেখ করিয়া শক্তিপূজার নিন্দা করিয়াছেন—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার বিসর্জন নাটক—তাহাও সমর্থনযোগ্য নয়। যে সভ্যতা সংস্কৃতির ধারা অবলম্বন করিয়া বৈদিক যুগ হইতে শক্তিপূজার প্রচলন সেই ধারার মধ্যে বলিদান প্রভৃতি বেদানুমোদিত। বহুকাল পূর্ব হইতে এক শ্রেণীর লোক বলিদানের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া আসিলেও শাস্ত্রসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকায় তাহা চলিয়া আসিতেছে অব্যাহতভাবে। বেদান্ত ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে এই বিষয়ে আপত্তি তুলিয়া বলিদানকে

CENTRAL LIBRARY

বেদানুমোদিত বলিয়া সমর্থন করা হইয়াছে—এমন কি বলির একান্ত বিরোধী বৈষ্ণবদিগকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। সূত্রটি প্রশ্নাকারে নিবদ্ধ করিয়া বাদরায়ণ ব্যাস বলিয়াছেন—

'অশুদ্ধমিতিচেৎ ন শব্দাৎ'।

অর্থাৎ বলিদানাদি পশুহিংসাকর্ম কি পাপজনক নয়? সূত্রের মধ্যে তাহারই উত্তর দিয়া বলা হইয়াছে—'না, বলিদানাদি আপাতভাবে হিংসাত্মক কার্য বলিয়া মনে হইলেও, তাহা নিষিদ্ধ নয়; কেননা 'শব্দাৎ'—অর্থাৎ বেদের মধ্যেই ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া বলিদানের আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তিনটি দিক আছে যাহা হইতে পশুবলি একান্তভাবে সমর্থন করা যায়। সংক্ষেপে ইহার আধিদৈবিক দিক্ হচ্ছে -পশু ছাগ প্রভৃতি মানবসমাজের অন্যতম সম্পদ্। ইহাকে নির্বিচারে উদরভরণের জন্য বধ করিলে ইহার সমূহ উচ্ছেদের সম্ভাবনা—তাহা ছাড়া বলি ছাড়া পশু বধ করা চলিবে না—এই নিষেধাজ্ঞা পশুর যাগের অর্থশক্তির দিক দিয়া সমাজের পক্ষে উপকারী। হয়তঃ ইহার আধ্যাত্মিক দিক এই যে দেবতাই যদি পূর্বোক্ত যুক্তিতে আত্মস্বরূপ হয়, তাহা হইলে উপনিষদের ভাষায় বলা যায়—প্রাণস্যান্নমিদং সর্বম্—সমস্তই প্রাণস্বরূপ আত্মার অন্ন অর্থাৎ খাদ্য। সমস্ত আত্মস্বরূপ দেবতাতে লীন হয়। তৃতীয়তঃ আধিদৈবিক রূপ এই যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে পশু বলি দেওয়া হয়, সূক্ষ্মস্বরূপ সেই দেবতার সেই পশু স্থূল রূপ। যে রূপ শক্তি দেবতা আগ্নেয়, এবং ছাগ প্রভৃতি বলিদান যোগ্য পশুগুলিও আগ্নেয়। এইভাবে শাস্ত্রকারগণ বেদকে আশ্রয় করিয়া বলিদানের একান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

উহা ব্যতীত জাতীয় জীবনে শক্তিপূজা ও তৎসহকৃত বলিদান প্রভৃতিতে জাতির মধ্যে কোমলভাব—যাহা জাতিকে দুর্বল ও বিলাসী করিয়া তুলে—সেই কোমলভাবকে দূরীভূত করিয়া উজ্জীবিত করে এক অনুপম মানসিক শক্তি ও স্থৈর্য যাহার ফলে জাতি হইয়া উঠে নির্ভীক, কাপুরুষতা দূরে চলিয়া যায়, জাতি হইয়া উঠে এক প্রচণ্ড শক্তির উৎস।

ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জীবনে শক্তিপূজা ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ভৈরবনাদে গাহিয়া গিয়াছেন—

'ছাড়ি হিম শশাঙ্কছটায় কেবা বল চায় মধ্যাহ্ন তপনজ্বালা
প্রাণ যার চণ্ড-দিবাকর, স্নিগ্ধ-শশধর-সেও তবু লাগে ভালো।
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা,
* * * * *
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশ
উল্কাধার-রুধির-উদ্গার-ভীম তরবার-ঝলাইয়া দেয় বাঁশী।
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালা তোমার মায়ার ছায়া
করালিনি কর মর্মচ্ছেদ, হোক্ মায়াভেদ; সুখস্বপ্ন-দেহে দয়া।
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমার ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস বলে মা দানবজয়ী।
* * * * *

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ যেমন সত্য স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ যেরূপ তাহার ছায়ামাত্র, রুদ্রভাবই

CENTRAL LIBRARY

যথার্থ সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, আর কোমলভাব (সুখবনমালা) সেই রুদ্রভাবের ছায়ামাত্র। এই কোমলভাব নানাপ্রকার বিলাসভাবের উদ্দীপক—তাহাই যত প্রকার দুর্বলতার কারণ। এইসকল আপাতমধুর কোমলভাব জাতীয়জীবনের উদ্দীপক ও বলদায়ক হইতে পারে না। তাহা হইতে আসে কাপুরুষতা, হীনতা ও দীনতা—আন্তরিকভাবে শক্তি উপাসনায় জাতীয় জীবনে এই সমস্ত দোষ দূরীভূত হয়। তাই তিনি আরও গাহিয়াছেন—

ছাগকণ্ঠে রুধিরের ধার ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার মর্মকথা বলি কাকে?
ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান মহা আকর্ষণ দূর কর নারীমায়া,
আগুয়ান সিন্ধুরোলে গান অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ ধারা,
জাগো বীর! ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে-শমন ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এ-ভব ঈশ্বর মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে,
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় না ডরাক্ তোমা
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধগান হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা।

—বীরবাণী, স্বামী বিবেকানন্দ

যাঁহারা হিন্দু দেবদেবীগণের সম্বন্ধে গবেষণার নামে বিকৃত তথ্য ও অসত্য ধারণা সৃষ্টি করিয়া অনাদিকালের এই দেশের বৈদিক সভ্যতা সংস্কৃতিকে অবনমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বামীজীর দুর্বনাদপূর্ণ এই উক্তি তাঁহাদের যোগ্য প্রত্যুত্তর। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার আনন্দমঠ উপন্যাসে জাতীয়জীবনে শক্তিপূজার একান্ত প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া জাতিকে মনুষ্যত্বমানের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য শক্তিপূজার যে অপরিহার্যতা তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

'এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুদল বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।' সন্তানদলের অন্যতম নেতা মহেন্দ্রকে বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রহ্মচারী কালীমূর্তি দেখাইয়া বলিতেছেন—

'দেখ মা যা হইয়াছেন।' মহেন্দ্র সভয়ে বলিল 'কালী।'

ব্রহ্মচারী—কালী অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্র শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিবকে আপনার পদতলে দলিতেছেন।'—আনন্দমঠ

এইভাবে দুর্বল অসাড়জাতির জীবনে প্রাণের নবজাগরণ, শৌর্য, বীর্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে এইপ্রকার ধর্মের ও তদানুষঙ্গিক শক্তিপূজাদির অনুষ্ঠান যে অপরিহার্য, যেগুলি কেবল প্রেমের দ্বারা লাভ করা যায় না, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতির মধ্যে আত্মসংযম ও ধর্মানুশীলনের ফলে মানবচিত্ত ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈতিক সোপানে উঠিতে থাকে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—ইহাই ভারতের অনাদিকাল হইতে ক্রমাববাহী ধারা যাহা ব্যতীত ভারতবর্ষ অন্য যাহাই হউক ভারতবর্ষ থাকিবে না। এই ধারার বিরুদ্ধাচরণে, নির্বিচার দোষত্রুটি প্রদর্শনে মানুষের মনে বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টির প্রয়াস ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শক্তিপূজার বিরুদ্ধতার মৃদু সমালোচনা করিয়া ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন—'শক্তিধর্ম এই প্রকার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ছলনামাত্র নহে, এই ধর্মেও বিশ্বাস করিয়া, ইহার সংস্কার ও

CENTRAL LIBRARY

আচারগুলি পালন করিয়া নিষ্ঠাবান সাধকগণ তাঁহাদের নিজেদের দিক থেকে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।'—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭

ইহা ব্যতীত কবিগুরুর হিন্দুদেবদেবী সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা যাহা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নানাভাবে পরিবেশিত হইয়াছে তাহার প্রতিধ্বনি হইয়াছে অনেকটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে। শক্তিপূজা বিষয়ে কবিগুরুর 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতিতে যে সমস্ত ভিত্তিহীন উক্তি করা হইয়াছে তাহার আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিকৃত ধারণার চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায় 'বিসর্জন' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে রঘুপতির মুখ দিয়া দেবীপ্রতিমার প্রতি যে সমস্ত অসম্মানসূচক মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা কেবল মর্মন্তুদ নহে, তাহা আমাদের চিরাগত সংস্কৃতির ধারার উপর অধিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। অথচ আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ নির্বিচারে তাহার রস উপভোগ করি। নিম্নে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

রঘুপতি—দেখো দেখো, কি করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির, তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙ্গিছে আছাড়ি। হা হা হা হা!
... ...
মা বলিয়া ডাকে যত জীব হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
... ...
থাক্ তুই চিরকাল
এইমতো, মন্দিরের সিংহাসনে—এই,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস।—ইত্যাদি, ইত্যাদি।
রঘুপতি—কোথাও সে নাই, ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই,
কোথাও সে নাই, কোথাও সে ছিলনা কখনো। ইত্যাদি ইত্যাদি।—বিসর্জন নাটক ৫ম অঙ্ক

অনাদিকাল হইতে উপাসিত হিন্দুর দেবমূর্তিকে জড়, অচেতন প্রভৃতি বলিয়া যে অপমানসূচক উক্তি কবিগুরু তাঁহার নাটকের মাধ্যমে করিয়াছেন, তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর এই যে তাঁহারই সমসাময়িককালে দক্ষিণেশ্বরের ঋষিপ্রতিম যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহারই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় নবজীবনপ্রাপ্ত এককালে নাস্তিক নরেন্দ্র দত্ত ও পরে স্বনামধন্য স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভালোকে সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশ ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আজও সমুজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত সেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক বাণীবহনক্ষম স্বামিজী দক্ষিণেশ্বরের প্রস্তরময়ী দেবীপ্রতিমার মধ্যে চিন্ময়রূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন তাহা সর্বজনবিদিত। জীবিকার্জনে হতমান জীবনযুদ্ধে পরাস্ত নাস্তিক নরেন্দ্র দত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়া নিজের দুঃখের কথা বলিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে বলিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—'তুই মায়ের কাছে গিয়া সব কথা বল তোর সব দুঃখ দূর হইয়া যাইবে——ইহা শুনিয়া স্বামীজী দেবমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে গেলে

CENTRAL LIBRARY

হতবাক্ হইয়া দেখিলেন মাতৃমূর্তির সমুজ্জ্বল রূপ—তিনি ভুলিয়া গিয়া ঠাকুরের নিকট ব্যক্ত করিলেন—এ পাষাণ মূর্তি নয়, ঠাকুর, এ যে চিন্ময়ীমূর্তি—যাহার কাছে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বা ব্যক্তিগত দুঃখের কথা ভুলিয়া যাওয়া যায়।—ইত্যাদি

'আজকাল ইচ্ছা ও রুচি চলিত কথায় দাঁড়াইয়াছে, আর সকলে বিনা আপত্তিতে এটী স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দেখিয়া আমিও একসময়ে এইরূপ ভাবিতাম আর উহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল যিনি পুতুলপূজা হইতেই সব পাইয়াছিলেন।'—বিবেকানন্দ

·····অগাধ বিশ্বাস লইয়া তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, 'মহাশয়! যাহাতে আমার ভ্রাতা ও ভাই ভগিনীদের দুটি খাওয়ার একটু উপায় হয়, সে সম্বন্ধে আপনার মাকে অনুরোধ করিতে হইবে। ঠাকুর বলিলেন, ওরে, আমি কোনদিন মার কাছে কিছু চাই নাই, তবে তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, সেজন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস্ না, তাই মা তোর কথায় কান দেয় না।

কঠোর নিরাকারবাদী নরেন্দ্রের সাকারে বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। মূর্তিপূজাবিরোধী নরেন্দ্রনাথ কি করিবেন? অবিশ্বাস? সেদিন চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস! বিনা প্রমাণে? কেমন করিয়া সম্ভব? নরেন্দ্রনাথ নত-মস্তকে রহিলেন।

·····নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা' চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন।'

বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, ঠাকুরের প্রস্তরময়ী জগন্মাতাটি কি পদার্থ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। নরেন্দ্রনাথ সংশয় দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে 'কালীঘর' অভিমুখে চলিলেন। আজ ঠাকুরের কৃপায় সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হইবে, উৎকণ্ঠিত উল্লাসে তাঁর বক্ষ ভরিয়া উঠিল।

তিনি দেখিলেন, জগদম্বার ভুবনমোহনরূপে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তরমূর্তি নয়, 'মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী প্রতিমা' বরাভয় কর বিস্তার করিয়া অসীম অনুকম্পাভরে স্নেহকরুণ হাস্য করিতেছেন। তারপর কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আর জানেন তাঁহার অদ্ভুত গুরু পরমহংসদেব।—বিবেকানন্দ চরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অষ্টম সংস্করণ, ১৩৬১, পৃঃ ৬৮-৬৯।

'শাক্তধর্ম এই প্রকার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ছলনা মাত্র নহে; এই ধর্মেও বিশ্বাস করিয়া, ইহার সংস্কার ও আচারগুলি পালন করিয়া নিষ্ঠাবান সাধকগণ তাঁহাদের নিজেদের দিক হইতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।'

'ইহার সংস্কার কুসংস্কার হইলেও, ইহার প্রথা কুপ্রথা হইলেও, এই ধর্মের প্রকৃত সেবকের নিকট তাহা প্রাণ দিয়াও রক্ষণীয়।'—বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭

ইত্যাদি প্রকারে চিরাচরিত ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনাদিকাল হইতে উপাসিত এই সমস্ত দেবমূর্তির মধ্যে কেবল জড়তা, মূকতা প্রভৃতি রহিয়াছে বলিয়া যে কবিগুরু প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সর্বৈব অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন এবং এই ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা আজও যে উক্ত বিসর্জন নাটকের রসানুভব করি, তাহা আমাদের শোচনীয় মানসিক দৈন্য ও মানসিক জড়তা ছাড়া অন্য কিছু নহে।

তবে এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অসামর্থ্যের ফলে যদি কোনও

CENTRAL LIBRARY

নিত্যবস্তুর সত্যতা অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অসমীচীন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি দেখিতে পাই না বা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া অপরে কেহ দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না ইহা নিতান্তই অসঙ্গত যুক্তি।

যাহা হউক কবিগুরুর এই প্রকার উক্তির প্রভাবেও মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেখকগণ হিন্দু দেবদেবী সম্বন্ধে অনুদার ও ভ্রান্ত মত প্রচার করিবার প্রেরণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভ করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিকগণ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণকে লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ভ্রান্ত মত অবলম্বনে চিরাচরিত বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আর বিরূপভাবে উপস্থিত করিলে জাতির সুউচ্চ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক আদর্শ অবনমিত হইবে এবং সর্বোপরি জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্রবৃন্দ যে বিপথে পরিচালিত হইবে সেদিকে লক্ষ্য করিয়া এই ভ্রান্ত পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। আশা করি, মঙ্গলকাব্যের সমালোচক, গবেষক ও ইতিহাস-লেখকগণ সমস্ত জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া আর্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে উন্নতশিরে ভারতের চিরাগত সভ্যতার সংস্কৃতির মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত তদনুসারী প্রাচ্য পণ্ডিতগণের বহুকালের বস্তাপচা ভ্রান্ত মতবাদগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যথাযথ বেদশাস্ত্রাদি পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাদি কার্য অনুসরণ করিবেন।

CENTRAL LIBRARY

চর্যাগীতির সন্ধ্যাভাষা

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

প্রাচীনতম বাংলাভাষায় লেখা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের চর্যাগান ও তাহার টীকা আবিষ্কৃত হইবার পরে 'সন্ধ্যা' শব্দের বানান, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লইয়া বিস্তর বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও মহাযান বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও ভাষ্যে উহা সর্বত্রই 'সন্ধ্যা' বানানে লিখিত, তথাপি শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, ওই বানানটি লিপিকর-প্রমাদ-জাত। তিনি 'সম্-ধ্যৈ' ধাতুর পরিবর্তে, 'সম্-ধা' হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ফলে, তাঁহার মতে শব্দটি 'সন্ধ্যা' নহে, 'সন্ধা'। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু শব্দটির সঙ্গে যে 'ধ্যৈ' বা ধ্যানের একটি সম্পর্ক আছে, তাহাও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। 'সন্ধ্যা' বানানটি লিখিতে সকল লিপিকরই প্রমাদগ্রস্ত হইবেন বা অন্ধভাবে গড্ডলিকাপ্রবাহে একে অন্যের অনুসরণ করিবেন, তাহাও বিচারসহ নহে। কাজেই অনেকে আবার 'সন্ধ্যা' শব্দটির বানান যেরূপ আছে, সেই রূপটি রক্ষা করারই পক্ষপাতী।

অর্থের দিক হইতেও সন্ধ্যার্থ বিতর্কিত। সন্ধ্যা শব্দের বাচ্যার্থ বাচ্য নহে। সাধক-সম্প্রদায়ে অক্ষরার্থ বা প্রত্যক্ষ অর্থ অগ্রাহ্য। গ্রাহ্য অর্থ কোথায়ও পরোক্ষ, কোথায়ও বা অতিপরোক্ষ। কাজেই অনেকেই মনে করেন, সন্ধ্যাভাষা রহস্যময় হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর Burnouf সাহেব তাই সন্ধ্যাভাষাকে বলিয়াছেন, 'Language Enigmatique'—ভাষা প্রহেলী।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থের আবিষ্কারক আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও প্রায় অনুরূপ অর্থেই এই ভাষাকে বলিয়াছেন, 'আলোআঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' 'আলোআঁধারি' কথাটি ব্যবহার করায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতকে উপেক্ষা করিবার হেতু নাই। তিনি সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে শব্দার্থ বিচার করিয়াছেন। 'সন্ধ্যাভাষায় যে 'অন্তর্ভাবের কথাও আছে', 'যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন'—ইহা তিনি জানিতেন এবং এই উক্তির ভিতর তিনি সন্ধ্যাভাষার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক H. Kern তাঁহার অনুবাদের পাদটীকায় 'সন্ধ্যাভাষিত'কে মন্ত্রের সগোত্র মনে করিয়াছেন। মন্ত্র যেমন গূঢ়ভাবের ব্যঞ্জনা বহন করে, সন্ধ্যাভাষাতেও তেমনই 'Secrecy is implied though not expressed'.—কিন্তু এইপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনার দিক হইতে মন্ত্রের সঙ্গে সন্ধ্যাভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও, 'সন্ধ্যা ভাষা' মন্ত্র নহে। মন্ত্রের মোহময় আবেশ ও 'অপূর্ব' উৎপাদনের ক্ষমতা সন্ধ্যাভাষার নাই।

আচার্য Kern-এর ওই পাদটীকা হইতেই জানা যায়, হাজার বছর পূর্বেকার জ্ঞানতাপস হিউয়েন সাঙ্ও সন্ধ্যাভাষার ভিতর একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ ('Hidden sense') লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাভাষা নিঃসন্দেহে নিহিতার্থক ভাষা। এই নিহিতার্থ বিশেষ অভিপ্রায়প্রসূত। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী 'সম্-ধা' হইতে 'সন্ধা' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে গিয়া এই নিহিতার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন, সন্ধ্যাভাষা আভিপ্রায়িক ভাষা : 'Abhiprayika means that it is intended to imply or suggest something different from what is expressed by the words'.

চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের আবিষ্কারক ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীও জানাইয়াছেন, 'The Tibetan trans-

CENTRAL LIBRARY

lation...now amply confirms that the meaning of the term is *intentional speech.*' তিনি আরও বলিয়াছেন,

'The term Sandhā here stands for *abhisandhi* 'implied sense' or simple *Sandhi* 'Union', because it points out the meaning intended or it is an union of two meanings ordinary as well as intended in one word.' (Studies in Tantras, part I)

শব্দটির বানান 'সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' যাহাই হউক না কেন, উহাতে যে একটি অর্থসন্ধি আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সংস্কৃত অভিধানে (শব্দকল্পদ্রুম) 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ভিন্ন দেখানো হইলেও একটি আর একটির প্রতিশব্দ রূপেই গৃহীত হইয়াছে। 'সন্ধি' শব্দের সঙ্গে উভয়েরই যোগ। 'সন্ধি' মানে শ্লেষ বা মিলন। 'সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' ভাষার ভিতরেও তেমনই তন্ত্রের যামল বা যুগনদ্ধ তত্ত্বের মত দুইটি অর্থের শ্লেষ আছে। তাঁহাদের একটি অর্থ আভিধানিক, আর একটি আভিপ্রায়িক। বাহিরের দিক হইতে শব্দগুলি আভিধানিক অর্থই প্রকাশ করে, কিন্তু লক্ষ্যার্থে উহা প্রকাশ করে আভিপ্রায়িক কোন অর্থ। সে অর্থ 'বিরলে বুঝই' অল্প লোকেই বোঝে ; সে অর্থ 'কোডি মাঝেঁ একু হিঅহি সমাইড়'—কোটির মধ্যে গুটিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, আর সে অর্থ গুরুবচনপ্রসাদে ('গুরুসম্প্রদায়াৎ') স্ফুরিত হয়। কাজেই উহার গূঢ়ার্থটি গুরুর উপদেশে অনুসন্ধান করিয়া ('অভিসন্ধ্যা') বুঝিতে হয়। 'সন্ধ্যা' বা 'সন্ধা' শব্দের অপর অর্থ 'সন্ধানম্'। অতএব যে শব্দ শ্লিষ্ট এবং যাহার এক অর্থ 'গুরুসম্প্রদায়াৎ' 'অভিসন্ধা'— সন্ধান করিয়া বুঝিতে হয়, তাহাই সন্ধ্যা শব্দ। কিন্তু সন্ধ্যাভাষা ও সন্ধ্যা শব্দ সম্পর্কে এই সংজ্ঞার্থও চূড়ান্ত নহে।

সন্ধি, আভিপ্রায়িক, অভিসন্ধি—কোনটিই সন্ধ্যা ভাষার সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না। ডঃ বাগচী জানাইয়াছেন, তিব্বতী অনুবাদে 'ব্যাজ' ও 'উৎপ্রেক্ষা'কেও 'Intentional Language' বলা হইয়াছে। 'ব্যাজ' ও 'উৎপ্রেক্ষা'র মধ্যে ভাবগোপনের সঙ্কেত থাকিলেও, উহারা সন্ধ্যা শব্দ নহে, শব্দ-শক্ত্যাশ্রিত অলঙ্কার। ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা যে সন্ধ্যা শব্দের প্রতিশব্দ নহে, একটি চর্যাটীকাতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 'সোনে ভরিতী করুণা নাবী' (৮) গানটির টীকায় টীকাকার বলিতেছেন,

'করুণা ব্যাজেন তমেবার্থং স্তোতয়ন্ত আহঃ সোণেত্যাদি। করুণেতি সন্ধ্যা ভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং নাবীতি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যং।

এখানে একই সঙ্গে 'ব্যাজ', 'সন্ধ্যাভাষা' ও 'উৎপ্রেক্ষা' শব্দ তিনটির উল্লেখ আছে। কিন্তু অর্থ কি এক? স্পষ্টই বলা হইয়াছে সন্ধ্যা 'ভাষা'-বিশেষ, আর উৎপ্রেক্ষা 'অলঙ্কার' এবং ব্যাজ ভিন্নার্থ স্তোতনার একটি কৌশল।

আভিপ্রায়িক অর্থবিশিষ্ট শব্দ মাত্রই সন্ধ্যা শব্দ বা সন্ধ্যাভাষা নহে। বাংলা চর্যাগীতি গূঢ়ার্থবোধক। এখানে সন্ধ্যাজাতীয় বহু কূটার্থভাষিত স্থান লাভ করিয়াছে। সেগুলি সিঁদুরে মেঘের মত বজ্রের সঙ্কেতবহ। গানগুলির তত্ত্ব 'মহাসুখ' বা সহজানন্দ। সে তত্ত্ব 'স্বসংবেদ্য', 'অচিন্ত্য', ও 'বাক্‌পথাতীত।' সে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় 'মহারাগ-নয়' বা 'অদ্বয়ের যোগ'। তাহা বহিরঙ্গ জনের নিকট 'বিসরিঅ' (বিসদৃশ) এবং 'দুলবভ' (দুর্লভ)। কাজেই 'অচিন্ত্য' যোগিগণ এই সকল তত্ত্বকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্কেতময় শব্দে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু কুক্কুরীপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ নহেন, সকল সিদ্ধাচার্যেরই এক চেষ্টা—ভাব-উপগূহন। তাই চর্যাগীতিতে পদে পদে বক্রভাষণ, ব্যাজ, রূপক, উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি। এই বাগ্‌বিন্যাসের প্রধান উপকরণ দ্ব্যর্থক বা উভয়ার্থ প্রতিপাদক আভিপ্রায়িক শব্দরত্নাবলী।

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু চর্যাগীতির টীকাকার এই দ্ব্যর্থক আভিপ্রায়িক শব্দের সবগুলিকেই সন্ধ্যা নামে চিহ্নিত করেন নাই। উৎস, বিষয়, ব্যুৎপত্তি ও অর্থসংক্রান্তির দিক হইতে এই উভয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া দেখানো যাইতেছে এবং কোন্ শব্দগুলিকে আচার্য মুনিদত্ত সন্ধ্যা নামে মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা দ্বারা সন্ধ্যাভাষার আসল প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হইবে।

॥ এক ॥ চর্যাগীতির কতকগুলি শব্দ প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু তাহাদের অর্থ চর্যায় পরিবর্তিত। যথা—

বোধি (৫)—প্রাচীন অর্থ জ্ঞান, চর্যার্থ, 'মহামুদ্রাসিদ্ধি'। **জিনপুর** (৭)—পালিসাহিত্যে জিন বুদ্ধদেব, অতএব জিনপুর বলিতে বুঝাইত বুদ্ধপুর, চর্যায় উহার অর্থ 'মহাসুখপুর'; তেমনই **জিনরঅণ** (৪০)—প্রাচীন অর্থ বুদ্ধরত্ন বা নির্বাণ, কিন্তু চর্যার্থ 'চতুর্থানন্দ' বা সহজানন্দ ('জিনরত্নং রতিমনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং'—টীকা)। **মাজ** (৮)—প্রাচীন অর্থে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চর্যার্থ 'বিরমানন্দ অবধূতী মার্গ'। **নিবাণ** (৫, ২৭)—দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ, চর্যার্থ 'প্রভাস্বর'। **দশবল** (৯)—প্রাচীন অর্থে স্বয়ং বুদ্ধ, চর্যায় উহার অর্থ বুদ্ধের বৈশারদ্যাদি গুণ; (গুণ-গুণী সম্পর্কে) লক্ষণায় অর্থ পরিবর্তিত। **তিশরণ** (১৩)—বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ, চর্যার্থ 'কায়-বাক্-চিত্ত'। **তথাগত** (১৩)—প্রাচীন অর্থে স্বয়ং বুদ্ধ, চর্যায় অংশ-অংশী সম্পর্কে অর্থ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ। **বুদ্ধ**—(১৭), **বুধ**(২৭)—চর্যার্থ 'ভগবান্ বজ্রধরঃ' (টীকা)।

॥ দুই ॥ চর্যাগানের অনেকগুলি শব্দ হিন্দু যোগতন্ত্র এবং বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্গত মাধ্যমিক দর্শন, যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ), বজ্রযান বা তন্ত্রযান শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। প্রাচীন অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি থাকিলেও চর্যাগীতিতে উহারা আভিপ্রায়িক অর্থেই প্রযুক্ত। যথা—

(i) **হিন্দু যোগ-তন্ত্রের শব্দ :—চন্দ্র-সূর্য** (৩)—হঠযোগ প্রদীপিকা মতে 'কালং রাত্রিদিবাত্মকম্' এবং উহা যথাক্রমে বামগা ও দক্ষিণা নাড়ীর প্রতীক, চর্যায় এই অর্থ রক্ষিত হইলেও আভিপ্রায়িক অর্থ 'গ্রাহ্য গ্রাহক বিকল্প'। **নাদ-বিন্দু** (২২, ৪৪)—হিন্দুতন্ত্র অনুসারে 'নাদবিন্দু' শক্তিস্পন্দনের প্রকারভেদ (তুলনীয়—'সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দু সমুদ্ভবঃ—' শারদাতিলক), চর্যায় উহা প্রজ্ঞা-উপায় বা গ্রাহ্য-গ্রাহক বিকল্প জ্ঞানের প্রতীক ('উপায় গ্রাহক জ্ঞানবিকল্পং বিন্দুরিতি, প্রজ্ঞা গ্রাহ্যজ্ঞান বিকল্পং নাদঃ' ৪৪ নং চর্যাটীকা)। **দশমি দুয়ার** (৩)—পাদ্দ্বার, চর্যার্থ 'বৈরোচনদ্বার'। **মণিমুল** (৩) তন্ত্রার্থ নাভিস্থিতকমল মণিপুর, চর্যার্থ 'বজ্রমণি শিখর শুবির'। **ওড়িয়ান** (৩)∠ওড্ডিয়ান—হঠযোগমতে 'বন্ধবিশেষ', বৌদ্ধতন্ত্রমতে কামরূপাদি চারিটি মহাপীঠের একটি, কিন্তু চর্যাটীকা মতে 'মহাসুখচক্র'। **বীর** (৩)—হিন্দুতন্ত্রমতে বীরাচারী সাধক, চর্যা মতে 'ক্লেশারিমর্দনাদ্ বীরঃ।' **অণহা** (১১, ১৬)—হিন্দুতন্ত্রমতে মধ্যমা নাদ অনাহত, চর্যামতে 'প্রভাস্বর শূন্যতা ধ্বনি'।

(ii) **মাধ্যমিক ও যোগাচার শাস্ত্রের শব্দ :—গগণ** (১৬, ২১)—মাধ্যমিক শাস্ত্রমতে গগন শূন্যতার প্রতীক, চর্যায় এই শূন্যতার চারিটি প্রকারভেদ—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য; সর্বশূন্যই সহজশূন্য বা প্রভাস্বরশূন্য বা 'মহাসুখচক্র কমলবন'। **দ্বাদশ ভুঅণ** (৩৪)—যোগাচার মতে বোধিসত্ত্বের প্রমুদিতা প্রমুখ দশটি ভূমি; তন্ত্রমতে পীঠ-উপপীঠ, ক্ষেত্র-উপক্ষেত্র, ছন্দোহ-উপছন্দোহ, মেলাপক-উপমেলাপক, পীলব-উপপীলব এবং শ্মশান-উপশ্মশান এই বারটি মেলাপক ক্ষেত্র; চর্যাটীকার সঙ্কেতও এই দ্বাদশভূমির প্রতি—

CENTRAL LIBRARY

'দ্বাদশভূমিনো জিনসমাঃ'। **বিণান** (৩৯)—বিজ্ঞান ; প্রাচীন বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধের একটি স্কন্ধ—C. Humphreys-এর মতে 'consciousness', H. B. Bhattacharya-এর মতে 'discrimination, intellection or reason' ; বিজ্ঞানবাদে এই 'বিজ্ঞান' বিশিষ্ট তত্ত্ব—উহার তিনটি অবস্থা আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তি মাত্রা (pure consciousness), পরতন্ত্র জ্ঞান এবং পরিকল্পিত জ্ঞান ; সহজমতে শেষের দুইটি জ্ঞান নিঃস্বভাব ও ভ্রান্ত—প্রভাস্বরে প্রবিষ্ট চিত্তে অবিদ্যাদোষদুষ্ট বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। **অন্তরালে** (৪৬)—এই শব্দটিও যোগাচারের 'অন্তরাভব বিজ্ঞান'-এর প্রতীক, সহজচিত্তে উহা স্বপ্নে প্রতিভাস ও দর্পণে প্রতিবিম্ব তুল্য।

(iii) **তথতাবাদের শব্দ :—তথতা** (৩৬, ৪৪, ৪৬)—শব্দটি প্রাচীন হইলেও আচার্য অশ্বঘোষ হইতে 'তথতা' বাদের প্রবর্তন ; ধর্মশূন্যতা ও তথতা একার্থক ; কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থ দাঁড়ায় অদ্বয়জ্ঞান বা সমতাজ্ঞান ('Thatness', 'Sameness') ; তন্ত্রমতে তথতা জ্ঞান চিত্তবিশোধনের হেতু—'সর্বেষাং খলু বস্তুনাং বিশুদ্ধিস্তথতা মতঃ—হেবজ্রতন্ত্র ১।৯ বিশুদ্ধিপটল ; চর্যাতেও এই অর্থ গৃহীত—প্রজ্ঞাপারমিতার্থমহারসেন চিত্তবাসনা দোষবিশোধনং····· তথতা বিশুদ্ধোহি যঃ স তথাপরং ভবতি।'

(iv) **বৌদ্ধতন্ত্রের শব্দ :—কমলকুলিশ** (৪, ৪৭)—তন্ত্রার্থ পদ্ম-বজ্র, চর্যার্থ প্রজ্ঞোপায়। **জোইণি** (৪, ১৮)—তন্ত্রমতে যোগিনী, চর্যামতে 'নৈরাত্মা' বা 'জ্ঞানমুদ্রা'। **ধমণ-চমণ** (১)—প্রাচীনমতে শ্বাস প্রশ্বাস, চর্যামতে আলিকালি। **কামরু** (২)—তন্ত্রমতে পীঠস্থান ('পীঠং পূর্ণগিরিশ্চৈব কামরূপং তথৈব চ' —হেবজ্র ১।৭), চর্যায় 'মহাসুখচক্র'। **সসহর** (১৮, ২৭)—তন্ত্রমতে উষ্ণীষ কমলস্থ চন্দ্র, চর্যায় 'বোধিচিত্ত চন্দ্র' ('সংবৃত্তি বোধিচিত্তং প্রভাস্বর হেতুভূতং'—চর্যাটীকা ১৮)। **এবংকার** (৯)—তন্ত্রমতে ভগলিঙ্গ ('একারং ভগমিত্যুক্তং বংকারং কুলিশং স্মৃতং'—হেবজ্র ১।১) ; চর্যাটীকামতে এ চন্দ্রাভাস বং সূর্যাভাস অর্থাৎ দিবারাত্রি জ্ঞান। **আলিকালি** (৭, ১১)—যোগরত্ন মালামতে 'অকারাদি ষোড়শ স্বরা আলিঃ। ককারাদি চতুস্ত্রিংশদ্ ব্যঞ্জনানি কালিঃ' ; চর্যায় আলিকালি যথাক্রমে আলোকজ্ঞান ও আলোকভাস অথবা চন্দ্রসূর্য। **হু-ভব** (৩৯)— তন্ত্রমতে প্রজ্ঞোপায়যোগে উৎপন্ন বোধিচিত্ত, চর্যার্থও প্রায় একরূপ—'হুঙ্কার বীজোদ্ভব চিত্তরাজ অর্থাৎ সংবৃত্তি বোধিচিত্ত। **মহামুদ্রা** (৩৭)—সর্বধর্মশূন্যা প্রজ্ঞা, চর্যায় ইনি নৈরাত্মা, সহজসুন্দরী। **মহারস** (১৬)—উষ্ণীষ কমলক্ষরিত রস, চর্যায় ভাবাভাবের ঐক্য।

[এক, দুই সংখ্যক তালিকায় ধৃত শব্দগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন 'পারিভাষিক শব্দ'। গূঢ়ার্থ বিচারে শব্দগুলি স্বার্থক ও আভিপ্রায়িক। গূঢ়ার্থ গুরুবচনদ্বারেই বোধগম্য। চর্যাটীকায় এগুলিকে সন্ধ্যা শব্দ বলা হয় নাই]

॥ তিন ॥ চর্যাগীতিতে আর এক শ্রেণীর স্বার্থক শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি পরিচিত সংসার ও লৌকিক জীবনের পরিবেশ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু লোকার্থ হইতে তাহাদের অভিপ্রায়গত অর্থ ভিন্ন। টীকাকার এগুলিকেও সন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই। অথচ চর্যাকার যে নিহিতার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন চর্যাটীকা হইতে তাহা বোঝা যায়। নিম্নে লৌকিক বাগর্থের পাশে সঙ্কেতিত অর্থসহ তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল—

ডণ্ডিনি (৩)—মদ্য ব্যবসায়িনী শুঁড়িনী : অবধূতিকা। **গ্রাহক** (৩)—ক্রেতা : গন্ধর্বসত্ত্ব। **ঘড়ুলী** (৩)—সরুমুখা ঘট : সূক্ষ্মরূপা শুক্রনাড়িকা। **তিঅড্ডা** (৪)—ত্রিবৃৎ : ললনা-রসনা-অবধূতী নাড়ী। **বিআলী** (৪)—বৈকালিক ক্রিয়া : কালরহিতা। **কমলরস** (৪)—পদ্মমধু : পরমার্থ বোধিচিত্ত।

CENTRAL LIBRARY

কোঞ্চাতাল (৪)—চাবীতালা : মণিমূলদ্বারের সম্পুটীকরণ। **সাঙ্কম** (৫)—সাঁকো : সংবৃত্তি-পরমার্থ বা স্বাধিষ্ঠান-প্রভাস্বরের ঐক্য। **রূপা** (৮)—রৌপ্য : রূপাদি বিষয়। **খুন্টি** (৮)—খুঁটি : আভাষ দোষ। **কাচ্ছি** (৮)—রজ্জু : অবিদ্যাসূত্র। **কেড়ুয়াল** (৮) নৌকার হাল বা দাঁড় : সদ্‌গুরু বচন। **বাখোড়** (৯)—বন্ধনস্তম্ভ : দিবারাত্রি বিকল্প জ্ঞান। **আসব** (৯)—মদ্য : আস্রবদোষ। **নগর** (১০)—পুরী : রূপাদি বিষয়সমূহ। **ব্রাহ্ম** (১০)—ব্রাহ্মণ : 'চঞ্চল চিত্তবৃত্তি'। **তান্তি** (১০)—বাঁশের তন্ত্রী : ভগ বা পদ্মস্থান বা অবিদ্যা। **চঙ্গড়া** (১০)—চাঙ্গাড়ি : 'বিষয়াভাস'। **নড়পেড়া** (১০ বাগচীর পাঠ)—নটপেটক : 'সংসার পেটক'। **শাসু** (১১) শ্বশুর বা শাশুড়ী : 'শ্বাস'। **মাঅ** (১১)—মাতা : 'মায়ারূপা অবিদ্যা'। **নঅবল** (১২)—দাবা : 'মন্ত্র নয় রহস্য'। **গঅবর** (১২)—দাবাখেলার গজ : তথতাচিত্ত। **মতি** (১২) দাবার মন্ত্রী : 'প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি'। **ঠাকুর** (১২)—দাবার রাজা : 'অবিদ্যা চিত্ত'। **দায়** (১২) : দাবার দান বা চাল : 'আশয়াভিপ্রায়'। **কপ্পহার** (১৩)—কাণ্ডার : 'প্রভাস্বর চিত্ত'। **বুড়িলী মাতঙ্গী** (১৪)—বুড়ী মতঙ্গকন্যা : 'সহজযান প্রমত্তাঙ্গী নৈরাত্মা'। **পঞ্চ কেড়ুআল** (১৪)—পাঁচ দাঁড় : 'পঞ্চক্রমোপদেশ'। **দুখোল** (১৪)—জল সেঁচিবার ডুবী (ডোঙ্গা) : 'অভিষেক' (সেক)। **সিকল** (১৬) শৃঙ্খল : 'সংসারপাশ'। **খম্ভা** (১৬)—থাম বা স্তম্ভ : 'অবিদ্যা'। **খর রবিকিরণ** (১৬)—প্রচণ্ড সূর্যতাপ : মহাসুখরাগানল। **বিসমা** (১৭)—বিষম : বিশিষ্টাধিমাত্র সত্ত্বের 'সম' বা নির্বাণ। **কণ্ঠ** (১৮)—গ্রীবাদেশ : 'সম্ভোগচক্র'। **বিবাহ** (১৯)—পরিণয় : বায়ুরূপ গমনদ্বারের বাধাভঙ্গ ('বাহবভঙ্গ')। **রএণি** (১৯) রাত্রি : 'ক্লেশান্ধকার'। **নিরাসী** (২০)—নিরাশ : 'আসঙ্গরহিতা'। **বাপুড়া** (২০)—হতভাগ্য : 'বাসনাহীন'। **তুলা** (২৪)—কার্পাস : 'তুলনযোগ্য ত্রৈলোক্য'। **কমলিনী** (২৭)—পদ্মিনী : 'পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা'। **সবর-সবরী** (২৮)—সবরজাতীয় নরনারী : 'বজ্রধর ও জ্ঞানমুদ্রা'। **গুঞ্জামালী** (২৮)—গুঞ্জামালা : 'গুহ্যমন্ত্র'। **দারী** (২৮)—পত্নী : ক্লেশহরণ করে যে এমন 'পইরামণি'। **তিঅধাউ** (২৮)—ত্রিধাতু স্বর্ণরৌপ্যতাম্র : ত্রৈধাতুক কায়বাক্‌চিত্ত। **বঙ্গ** (৩২)—বঙ্গদেশ : অদ্বয়জ্ঞান। **গোহাল** (৩৯)—গোশালা : ইন্দ্রিয়ের আলম্বন স্বকায় ('গো ইতি ইন্দ্রিয়ং। তস্য আলম্বনং স্বকায়ং'—টীকা)। **বঙ্গাল** (৪৯) —বঙ্গদেশবাসী : অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানী। **পঞ্চপাটন** (৪৯)—পঞ্চপত্তন : পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত 'অহংকারমমকারাদি'। **চৌকড়ি ভণ্ডার** (৪৯)—চারকোটি মুদ্রার ভাণ্ডার : 'সন্নাসন্ন সদসদ্ ন ন চাপি উভয়াত্মকং' এইরূপ চতুষ্কোটি বিচার। **জোহ্নবাটিকা** (৫০)—জ্যোৎস্নাবাড়ী : 'জ্ঞানেন্দুমণ্ডল'।

॥ চার ॥ চর্যাগীতিতে আর একধরনের দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আছে, যেগুলির নিহিতার্থ কোন একটি বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থকে আশ্রয় করিয়া গঠিত। হিন্দুতন্ত্রে প্রত্যেকটি বর্ণ বিশেষার্থবোধক। কামধেনু তন্ত্রে তাহাদের আকৃতিসহ অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তান্ত্রিক বীজমন্ত্রগুলি যে সেই বর্ণার্থেই বিশেষ অর্থবহ 'বীজনিঘণ্টু' হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, বৌদ্ধতন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ বহন করিত। ডাকার্ণবে বলা হইয়াছে—'একৈকস্য তু মাহাত্ম্যমক্ষরস্য হি ভূরয়ঃ' (দ্বিতীয় পটল)। হেবজ্রতন্ত্রের 'এবং ময়া শ্রুতম্' মহাবাক্যটির অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের অর্থ যোগরত্নমালায় করা হইয়াছে, তাহাতে এ=পৃথিবী, কর্মমুদ্রালোচনা ; বং=জল, ধর্মমুদ্রা মামকী ; ম=বহ্নি, মহামুদ্রা পাণ্ডরা, য়া=মারুত, সমযমুদ্রা তারিণী। যোগরত্নমালায় এ=ভগ, বং=বজ্র অর্থও ধরা হইয়াছে। চর্যাগানেও এইরূপ সঙ্কেতিত বর্ণার্থ-

CENTRAL LIBRARY

মূলক যে শব্দগুলি পাওয়া যায়, চর্যাটীকায় তাহাদের আভিপ্রায়িক অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার সেগুলিকে সন্ধ্যা শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। যথা,—

আলি (৭, ১১)—অকারাদি স্বরবর্ণমালা, চর্যার্থ 'আলোকজ্ঞান' (৭), কিংবা 'চন্দ্র' (১১)।

কালি (৭, ১১)—ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণমালা, চর্যার্থ 'আলোকভাস' (৭), কিংবা 'সূর্য' (১১)।

সারি (১৭)—বাহ্যার্থ গীতবিশেষ ; নিহিতার্থ অ-অক্ষরের স্বরূপবোধক গান। আলি-কালি বর্ণমালার ভিতর সার অক্ষর অ-কার ('আলি-কালি বর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং' টীকা)। কারণ, সকল ধর্ম যে আদৌ অনুৎপন্ন নঞর্থক আদিবর্ণ অ-কার তাহারই দ্যোতক ('অ'-কারো মুখং সর্বধর্মাণাম্ আদ্যনুৎপন্নত্বাৎ'—৪১ নং চর্যাটীকায় উদ্ধৃত আগমবচন)। কাজেই 'সারি' গান হইল অ-কার বা শূন্যতার স্বরূপবোধক গান।

এবংকার (৯)—এ চন্দ্রাভাস, বং সূর্য অর্থাৎ 'দিবারাত্রি জ্ঞান' ; এই জ্ঞান বৈকল্পিক।

কপাস (৫০)—বাহ্যার্থ কাপাস, চর্যার্থ 'ক-কারস্য পার্শ্ববর্তী খ-কারঃ চতুর্থ শূন্যং' (টীকা) ; সরহপাদের দোহাটীকা হইতে জানা যায় 'ক' সংবৃতি সুখ, 'খ' পারমার্থিক শূন্যতা সুখ। অতএব 'কপাস'—ক-এর পার্শ্ববর্তী খ অর্থাৎ শূন্যতা সুখ।

কপালী (১০) **বা করালী** (১১)—সাধারণ অর্থে কাপালিক, চর্যার্থে 'কং সুখং পালয়িতুং সমর্থঃ' (টীকা)—অর্থাৎ করুণ সংবৃতি সুখ পালনে সমর্থ চর্যাধর।

কহ্নচিনা (৫০)—অক্ষরার্থ চিনা শস্য, নিহিতার্থ করুণ সুখ যাহার অঙ্গচিহ্ন অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত।

কুল (১৪, ১৫, ৩৮)—বাহ্যার্থ বংশ, চর্যাটীকায় 'কু'-এর অর্থ কোথাও ধরা হইয়াছে শরীর, কোথাও কুমার্গ। ৩৮ সংখ্যক গানে 'কুল' অর্থ প্রকৃতিপরিশুদ্ধা অবধূতিকা, যেখানে কুমার্গ চন্দ্রসূর্যাদি লয়প্রাপ্ত—'কুমার্গচন্দ্রাদিকং যস্মিন্ অবধূত্যাং লয়ং গচ্ছতি সা প্রকৃতি পরিশুদ্ধাবধূতিকা কুলশব্দেন বোদ্ধব্যা' (টীকা)।

কুলীন (১৮)—বংশমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ; চর্যার্থ কু=শরীর, অতএব কুলীন='কৌ শরীরে লীনং যৎ প্রভাস্বরং' (টীকা)

খ-মণ ভতারী (২০)—সাধারণ অর্থ খ্যামনা বা ঢ্যামনা স্বামী যাহার ; চর্যার্থ খ=সর্বশূন্য, অতএব খমণভাতারী—'সর্বশূন্যং মনঃস্বামী' (টীকা) অর্থাৎ নৈরাত্মা।

খট্ট (১১), **খাট** (২৮) বাহ্যার্থ খাট, চর্যার্থ খ শূন্যতা ট টালিত অর্থাৎ নাড়ীশক্তি যথায় প্রভাস্বর কর্তৃক স্পৃষ্ট (১১) অথবা ত্রৈধাতুক কায়বাক্‌চিত্ত যথায় খ অর্থাৎ শূন্যতা সুখপ্রভাস্বরে বিনষ্ট ('টালিত')।

টাল (৩৩) ট=অসদ্রূপ অর্থাৎ কায়বাক্‌চিত্তের ১৬ প্রকার প্রকৃতিদোষ। সেই 'টমালমসদ্রূপং' যেখানে লয়প্রাপ্ত, তাহাই টাল অর্থাৎ মহাসুখচক্র। এই অর্থেই ৩৫ সংখ্যক গানের 'টলিয়া' শব্দটিও বিচার্য।

সবর (২৮)—শবর, কিন্তু চর্যার্থ স-পর>সবর=হ অর্থাৎ স-কারের পরবর্তী বর্ণ হ-কার ('সকার পরো হ')। হ=বজ্রধর ('স এব পরিধরঃ')। কাহ্নপাদের ২৪ নং দোহাটীকা হইতে জানা যায়, সবর=প্রাণবায়ু। ব্যাকরণমতে হ প্রাণবর্ণ। অতএব, সবর=হ=মহাসুখাধারের প্রাণবায়ু=বজ্রধর।

CENTRAL LIBRARY

সবরী (২৮)—শবরী ; চর্যার্থ শবরের গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা। নৈরাত্মা ঔকারজা ('তস্য গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা ঔকারজা' টীকা)। অ-কার সর্বশূন্যতার প্রতীক, অতএব অ-কারজা সবরী নৈরাত্মা কাজেই দেখা যাইতেছে, আলি-কালি বর্ণমালার প্রায় প্রতিটি বর্ণই আভিপ্রায়িক অর্থবোধক। অ = আদৌ অনুৎপন্নতার প্রতীক, এ = চন্দ্রাভাস, ক = সংবৃতি সুখ, খ = সর্বশূন্য পারমার্থিক সুখ, ট = অসদ্রূপ, বং = সুখ, র = রতি = অনন্তঅনুত্তরসুখ। এই সঙ্কেতিত বর্ণার্থ লইয়াই চর্যাগীতির উপরি-উক্ত শব্দগুলি প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক হইয়া উঠিয়াছে। টীকাকার এগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই বটে, কিন্তু শব্দপ্রকৃতিতে ও গূঢ়ার্থ দ্যোতনায় এগুলি আভিপ্রায়িক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

। পাঁচ ।। টীকাকার মুনিদত্ত 'সন্ধ্যা' শব্দটির উল্লেখে অত্যন্ত সতর্ক। কারণ, চর্যাগানে আরও কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি হেবজ্রতন্ত্র যোগরত্নমালা, বা সরহপাদের দোহাটীকা মতে সন্ধ্যা শব্দ। কিন্তু চর্যার টীকাকার তাহাদিগকে সন্ধ্যা শব্দ বলেন নাই। চর্যাগানে কোথায়ও মূল সন্ধ্যাশব্দ, কোথায়ও বা অর্থটিই মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

কুন্দুরু (৪)—দ্বীন্দ্রিয় যোগ ; চর্যাটীকাতেও উহাকে বলা হইয়াছে 'দ্বীন্দ্রিয় সমাপত্তি যোগ'। তুঃ 'মলয়জ কুন্দুরু বটই'—হেবজ্রতন্ত্র ২।৪।

হাড়েরি মালী (১০)—টীকামতে 'নিরংশুচর্যা' ; 'নিরংশু' সন্ধ্যাশব্দ, অর্থ অস্থি-আভরণ ('অস্থ্যাভরণং নিরংশুকম্'-হেবজ্র)। এখানে হাড়ের মালা অস্থ্যাভরণ। অর্থই মূল শব্দরূপে গৃহীত।

ডমরু (১১)—'কৃপীটং ডমরুকং মতং'—হেবজ্র'। এখানেও মূল শব্দের পরিবর্তে অর্থটিকেই মূল শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

কুল (১৪, ১৫)—হেবজ্রতন্ত্রের সন্ধ্যাশব্দের তালিকায় 'কুলং পঞ্চবিধং খ্যাতং বর্ণভেদেন ভেদিতং।' বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত, রত্ন—এই পঞ্চকুল। পঞ্চ স্কন্ধরূপ পঞ্চভূতের কুলকে যাহা দ্বারা গণনা করা হয়, তাহাই কুল—'কুলাতে গণ্যতেঽনেন কুলমিত্যভিধীয়তে।' কিন্তু ৩৮নং চর্যায় কুলমুদ্রাকেই 'কুল' বলা হইয়াছে ; সেখানে কুল = পরিশুদ্ধা অবধূতিকা।

কুলিণ-(১৮) – যে প্রভাস্বর কৌ (শরীরে) লীন, তিনিই কুলীন অর্থাৎ কৌলিক ; হেবজ্রতন্ত্রমতে পঞ্চ তথাগত বুদ্ধই পঞ্চ কৌলিক —'বুদ্ধাশ্চ পঞ্চ কৌলিকাঃ'।

মন-পবন (১৯)—বিকল্পজ্ঞান ; সরহপাদের দোহাটীকা মতে মন-পবন সন্ধ্যাশব্দ। পবন = চঞ্চল সংবৃতি বোধচিত্ত, মন = সেই সংবৃতি চিত্তের সুখরূপ অমৃত।

কর্ণকুণ্ডল বজ্র (২৮)—'কুণ্ডলাদি পঞ্চমুদ্রা নিরংশুকালঙ্কারং' (টীকা) ; এখানে সন্ধ্যা অর্থই মূল শব্দরূপে গৃহীত।

কাপুর (২৮) – কর্পূর ; 'শুক্রং কর্পূরকং মতং'—হেবজ্র ; চর্যাটীকায় উহাকে বলা হইয়াছে যুগনদ্ধ হেতুফল।

হরিনী (২৮)—জ্ঞানমুদ্রা, দোহাটীকামতে সন্ধ্যাশব্দ।

ডমরুলি (৩১)—পূর্বোক্ত 'ডমরু' শব্দ দ্রষ্টব্য।

রবিশশী (৩২)—অদ্বয়বজ্রের টীকা মতে রবি, শশী সন্ধ্যাভাষা, অর্থ রাগ-বিরাগাদি কল্পিত সহজ।

বলদ (৩৩)—হেবজ্রমতে 'বল' মাংস অর্থে সন্ধ্যাশব্দ—'বলং মাংসং' ; চর্যাটীকামতে বলদ = বলং মাংসাদ্ দেহবিগ্রহং দদাতীতি বলদঃ, অর্থ বোধিচিত্ত। ৩৯ নং চর্যাটীকায় বলদ শব্দের নির্বচন—'দুষ্ট

CENTRAL LIBRARY

বিষয়ং বলং দদাতি ইতি দুষ্টবলদ চিত্তরাজো বোদ্ধব্যঃ'।

বাজুল (৩৫) বজ্রকুল ; হেবজ্রতন্ত্র মতে বজ্রকুল সন্ধ্যাভাষা।

চণ্ডালী (৪৭)—হেবজ্রতন্ত্রমতে চণ্ডালী রত্নকুলের মুদ্রা, শ্বপচীর সমার্থক। অন্যত্র 'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় যোগরত্নমালাকার বলেন, 'চণ্ডা প্রজ্ঞা অংকারঃ। আলির্বজ্রসত্ত্বো হুঙ্কারঃ। অঙ্কার-হুঙ্কারৌ চণ্ডালী।' ৪৭ নং চর্যায় এই শেষোক্ত ভাবটিকেই রূপক আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাজ (৪৯)—বজ্র ; হেবজ্রমতে 'বোল' সন্ধ্যাশব্দের অর্থ বজ্র'—'বজ্রং বোলম্ ইতি খ্যাতম্।'

পউমা (৪৯)—পদ্ম ; হেবজ্রমতে সন্ধ্যাশব্দ কল্লোল-এর অর্থ—'পদ্মং কল্লোলকং মতম্'

সবর সবরী (২৮, ৫০)—দোহাটীকা মতে সন্ধ্যাশব্দ, অর্থ যথাক্রমে পবিত্র ও নৈরাত্মা।

॥ ছয় ॥ চর্যাগীতিতে মুনিদত্ত-চিহ্নিত সন্ধ্যাশব্দাবলীর তালিকা প্রকাশের পূর্বে এই গীতিকোষের অন্তর্গত ২নং ও ৩৩নং গানের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দুইটি চর্যা দ্ব্যর্থক শব্দে ভরা। শুধু তাহাই নহে, এই দুইটি গানের টীকার সূচনায় টীকাকার গান দুইটি যে সন্ধ্যাভাষায় রচিত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন—

> 'তমেব মহাসুখ রাজানং···স্বানন্দাসবপানপ্রমোদমনসা কুক্কুরীপাদাঃ **সন্ধ্যাভাষয়া** প্রকটয়িতুমাহঃ' (২নং চর্যাটীকা)
>
> 'তমেবার্থং পরমানন্দসন্দোহমুদিত চেতসো হি সিদ্ধাচার্যঃ **সন্ধ্যাভাষয়া** প্রতিপাদয়তি' (৩৩নং চর্যাটীকা)

২ সংখ্যক গানের টীকায় এইরূপ সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনার কথা বলিয়াও মুনিদত্ত 'দুলি' ও 'বহুড়ী' শব্দ দুইটিকে পৃথকভাবে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু ৩৩ সংখ্যক গানের টীকায় কোন বিশেষ শব্দকে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। টীকাকারের উদ্দেশ্য কি ? তিনি কি বলিতে চান, এই দুইটি গানে সমগ্র গানই সন্ধ্যা অর্থে গ্রহণ-যোগ্য ? তাহা হইলে 'দুলি' ও 'বহুড়ী' শব্দ দুইটিকে পৃথকভাবে সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত করিবার তাৎপর্য কি ? দুইটি গানেই স্বরূপার্থকে গোপন করিয়া বাহিরে অন্য একটি অর্থকে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দ্ব্যর্থক শব্দের আধিকারিক প্রয়োগ অন্যান্য চর্যাতেও দুর্লভ নহে (যথা ৩, ৪, ২০, ২৮, ৫০ সংখ্যক চর্যা)। তবে এই দুইটি গানের অপর বিশেষত্ব—বক্রভাষণ দ্বারা বিরোধাভাস সৃষ্টি। বিসদৃশ উক্তি দ্বারা বিরোধ সৃষ্টি করাই কি সন্ধ্যাভাষার লক্ষণ ? তাহা হইলে—

> মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী।
> মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥ (১১)
> নব জৌবণ মোর ভইলেসি পুরা।
> মূল নখলি বাপ সংঘারা॥ (২০)
> জইসো জাম মরণ বি তইসো।
> জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো॥ (২২)

—প্রভৃতি উক্তিকেও সন্ধ্যাভাষা বলা উচিত ছিল। কারণ যাহাই হউক, ২ ও ৩৩ সংখ্যক গান সন্ধ্যাভাষায় রচিত বলা হইলেও তদন্তর্গত এই দ্ব্যর্থক ও গূঢ়ার্থবোধক শব্দগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। এখানে উভয়ার্থসহ শব্দগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল—

CENTRAL LIBRARY

২নং চর্যা :—**পিঠা**—পাত্র, বজ্রমণি ; রুখ—বৃক্ষ, যোগীন্দ্রের কায় ; **তেন্তলি**—চিঞ্চাফল, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ; **কুম্ভীর**—জলজন্তু, কুম্ভক সমাধি ; **ঘর**—গৃহ, অবধূতী-গৃহ ; **অঙ্গন**—আঙ্গিনা, ব্যুত্থানবাত ; **বিয়াতী**—দুশ্চরিত্রা নারী, পরিশুদ্ধাবধূতী ; **কানেট**—কর্ণভূষা, প্রবেশাদিবাত, **চৌর**—অপহরণকারী, সহজানন্দ ; **অধরাতি**—মধ্যরাত্রি, চতুর্থী সন্ধ্যা ; **সসুর**—শ্বশ্রূ, ত্বরিতাদিশ্বাস ; কামরু—কামসঙ্কেত স্থান, নির্বিকল্প মহাসুখচক্র।

৩৩নং চর্যা :—**টাল**—টিলা, মহাসুখচক্র ; **পড়বেষী**—প্রতিবেশী, পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্য, **হাড়ী**—ভাণ্ড, স্বকায়াধার ; **ভাত**—ভক্ত, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ; **ব্যঙ্গ**—অঙ্গহীন, প্রভাস্বর ; **দুহিল দুধু**—দোহাদুধ, কর্মমুদ্রাপ্রসঙ্গে বজ্রাগার হইতে উৎপন্ন বোধিচিত্ত ; **বেণ্ট**—বাঁট, মূলমহাসুখচক্র ; **বলদ**– বৃষ, সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ; **গাবী**—গাভী, নৈরাত্মা ; **চোর**—সংবৃত্তি চিত্তরাজ ; **দুঃসাধী**—রাত্রির প্রহরী; পরমার্থচিত্ত, **শৃগাল**—শিয়াল, সংসারচিত্ত ; **সিংহ**—যুগনদ্ধ পরমার্থচিত্ত।

॥ সাত ॥ 'নির্মল গিরা' টীকায় চর্যার গুহ্য সাধনার অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া টীকাকার মুনিদত্ত অতি অল্পসংখ্যক শব্দকেই স্পষ্টতঃ সন্ধ্যাশব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দটি উল্লেখ করিয়া অমুক শব্দ 'সন্ধ্যাভাষয়া' (৮) বা 'সন্ধ্যাবচনেন' (৩) বা 'সন্ধ্যাজ্ঞানেন' (৩৬) বা 'সন্ধ্যয়া' (৫, ১৪) অমুক অর্থে বোদ্ধব্য—এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। যথা, 'বারুণীতি সন্ধ্যাবচনেন তদেব সংবৃত্তি বোধিচিত্তং বোদ্ধব্যং (৩), 'করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং (৮), 'গঙ্গাযমুনেতি সন্ধ্যয়া চন্দ্রাভাস সূর্যাভাসৌ গ্রাহ্য গ্রাহকৌ (১৪), 'মূষকঃ সন্ধ্যাবচনে চিত্ত পবনঃ বোদ্ধব্যঃ' ইত্যাদি। টীকাকারের নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পার্শ্বলিখিত দ্বিতীয় অর্থে সন্ধ্যাশব্দ, প্রথম অর্থটি বাহ্য বা অক্ষরার্থ :

দুলি (২)—দুরা (কমঠ) 'মহাসুখকমল' ; **বহুড়ী** (২)—বউড়ী, অবধূতী>(অ) বধূতী>বধূটী> বহুড়ী = 'পরিশুদ্ধাবধূতী' ; **বারুণী** (৩)—মদ্য, 'সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।' **নই** (৫)—নদী, 'ললনা-রসনাদিআভাসত্রয়' ; **হরিণা** (৬)—মৃগ, 'চিত্ত' ; **হরিণী** (৬) মৃগী, 'জ্ঞানমুদ্রা' **করুণা** (৮)—মৈত্রী, 'বোধিচিত্ত' ; **গজেন্দ্র** (৯) গজবর, 'চিত্ত' ; **ডোম্বী** (১০)—ডোমনী, 'পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা' **বড়িকা** (১২)—দাবাখেলার গুটি বড়ে, 'ষষ্টুত্তরশত প্রকৃতি' ; **গাবী** (১৩)—নৌকা, 'মহাসুখকায় ; **গঙ্গাযমুনা** (১৪)—স্বনামখ্যাত নদীদ্বয়, 'চন্দ্রাভাস সূর্যাভাস গ্রাহ্য গ্রাহক' ; **নাঈ** (১৪)—নৌ, শুক্রনাড়িকার মধ্যে অবস্থিত 'বোধিচিত্ত' ; **পুলিন্দা** (১৪)—কাপড়ের পোটলা বা পাল, 'নপুংসক' ; **গঅন্দা** (১৬)—গজেন্দ্র, 'চিত্ত' ; **সুণতান্তি ধনি** (১৭)—শূন্যতা ধ্বনি, 'প্রভাস্বর অনাহত' ; **ডোম্বী** (১৮)—ডোমনারী, 'পরিশুদ্ধাবধূতিকা' ; **মুসা** (২১)—মূষক, 'চিত্তপবন' ; **বেমকটবণা** (২৫)—মূল গানটি পাতা না থাকায় লুপ্ত, তবে টীকার শেষাংশ হইতে জানা যায়, উহা সন্ধ্যাশব্দ ; শব্দটির বাহ্য অর্থ অস্পষ্ট, সন্ধ্যার্থ 'প্রাণাপান প্রজোপায়াত্মক বাতদ্বয়' ; **সুণ** (৩৬)—শূন্যম্, 'বাসনাগার' ; **বাহ্ম** (৪৭)—ব্রহ্মা, 'বিটনাড়িকা' ; **হরি** (৪৭)—বিষ্ণু, 'মূল নাড়ী' ; **হর** (৪৭)—শিব, 'শুক্রনাড়ী' ; **তইলা বাড়ী** (৫০)—তৃতীয় বাটিকা, 'তৃতীয় মহাশূন্য' ; **চারি** (৫০)—চতুর্থ, 'চতুরানন্দ'।

লুপ্তাংশ বাদে চর্যাটীকায় মোট ২৫টি সন্ধ্যাশব্দ রহিয়াছে। তন্মধ্যে নাঈ—২ বার এবং ডোম্বী ২ বার সন্ধ্যা শব্দরূপে পুনরুক্ত হইয়াছে। এই দ্বিরুক্তি বাদ দিলে মোট ২২টি শব্দকে টীকাকার স্পষ্টভাবে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

চর্যাগুত বিভিন্ন পর্যায়ের দ্ব্যর্থক আভিপ্রায়িক শব্দগুলি বিচার করিলে 'সন্ধ্যাভাষা' 'আভিপ্রায়িক ভাষা' বা 'Intentional Speech'—এই নির্বচন অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ সন্ধ্যা শব্দগুলি কেবল দ্ব্যর্থক আভিপ্রায়িক শব্দ নহে, উহাতে নিশ্চয় অন্য একটি লক্ষণ আছে, যাহার ফলে সন্ধ্যাভাষা অন্যান্য দ্ব্যর্থক শব্দ হইতে স্বতন্ত্র। সে লক্ষণটি কি ?

মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে এবং তাহাদের টীকা-ভাষ্যে 'সন্ধ্যাভাষা', 'সন্ধ্যাভাষিত' বা 'সন্ধ্যাবচন' প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও কোথাও স্পষ্টভাবে সন্ধ্যাশব্দের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা হয় নাই। কেবল হেবজ্রতন্ত্রের দ্বিতীয় কল্প 'সন্ধ্যাভাষা নাম' তৃতীয় পটলে স্পর্শগ্রহণের মত দিয়াত্র স্পর্শ করিয়া সন্ধ্যাভাষার মর্মার্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে, 'সন্ধ্যাভাষং মহাভাষং সময়সঙ্কেত বিস্তরম্' : সন্ধ্যাভাষা মহাভাষা, উহা 'সময়সঙ্কেত' প্রকাশের ভাষা।

'সময়-সঙ্কেত বলিতে কি বোঝায় ? মহাযান শাস্ত্রে 'সময়' প্রাচীন 'ধর্ম' শব্দটির সমার্থক। কিন্তু পারমিতা যানে এই শব্দটি আরও বিশেষার্থবোধক হইয়া উঠে। পারমিতানয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে উহা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন-বাচক শব্দে পরিণত হয়। এই প্রজ্ঞা 'বুদ্ধ ধর্মকরণ্ডক', ইহাই 'তথাগতগর্ভ—ইহার সহিত 'অভিষঙ্গে'ই সাধকের সর্বার্থসিদ্ধি। এই 'অভিষঙ্গ'ই 'সময়'। কালক্রমে নর-নারীর মিলনের সহিত যুক্ত হওয়ায় উহা গুহ্যাতিগুহ্য আচরণে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রে 'সময়' যোগী ও যোগিনীর মিলনের রহস্যময় প্রতীক। এই মিলনের বাহ্য ও অধ্যাত্ম দুই প্রকার অর্থ থাকিলেও, নির্মাণকায়ে কর্মমুদ্রার সহিত মিলন এবং সম্ভোগকায়ে সময়মুদ্রার সহিত সম্ভোগের ইঙ্গিত অস্পষ্ট নহে। এইজন্যই এই গুহ্য সাধনপ্রণালী সঙ্কেতিত শব্দে অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় আবৃত। উদ্দেশ্য ভব্য সত্ত্বের নিকট সময়ের সুগুপ্ত তত্ত্বকে প্রকাশ করা এবং অভব্য সত্ত্বের নিকট হইতে উহাকে কৌশলক্রমে গুপ্ত রাখা—'ভব্য সত্ত্বেষু ব্যক্তং অভব্য সত্ত্বেষু গুপ্তমিতি'—(সরহপাদের দোহা টীকা)।

হেবজ্রতন্ত্রে গূঢ়ার্থসহ সন্ধ্যাশব্দাবলীর একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তালিকাটি এইরূপ—

মদন—মদ্য, **বল**—মাংস, **মলয়জ**—মীলন, **ঘেট**—গতি, **শ্রাব**—শব, **নিরংশুক**—অস্থ্যাভরণ, **প্রেষ্ণণ**—আগতি, **কপীট**—ডমরুক, **দুর্দুর**—অভব্য, **কালঞ্জর**—ভব্য, **ডিণ্ডিম**—অস্পষ্ট, **পদ্মভাজন** (Lotus vase—Dr. Bagchi)—কপাল, **তৃপ্তিকর**—ভক্ত (শালায়), **মালতীক্ষন**—ব্যঞ্জন, **চতুঃসম**—গূথ (বিষ্ঠা), **কস্তুরিকা**—মূত্র, **সিহ্লক**—স্বয়ম্ (স্ত্রীরজঃ), **কর্পূরক**—শুক্র, **আলিজ** মহামাংস (নরমাংস), **কুন্দুরু**—বীর্যিত্বযোগ, **বোল**—বজ্র, **কল্লোল**—পদ্ম, **পঞ্চকুল**—পঞ্চবর্ণ (Five classes differentiated by colour'—Dr. Bagchi), (এই পঞ্চকুলের মুদ্রা যথাক্রমে)—**ডোম্বী**—বজ্রকুলী, **নটী**—পদ্মকুলী, **শ্বপচী** (চণ্ডালী)—রত্নকুলী, **দ্বিজা** (ব্রাহ্মণী)—তাথাগতী, **রজকী**—কর্মকুলী।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সন্ধ্যা শব্দগুলির গূঢ়ার্থ বা সঙ্কেতিত অর্থ নরনারীর বাহ্য মিলন-সম্ভোগেরই সঙ্কেতবহ। সহজ সাধনার সাধন পদ্ধতি 'মহারাগময়'। এই মহারাগেরই অন্য পারিভাষিক নাম 'সময়'। সময়াচারের ক্রিয়াগুলি নরনারীর মিলনক্রিয়া। কোন মেলাপক স্থানে যোগী ও যোগিনীর সাক্ষাৎ, সঙ্কেতময় বাচনিক সংলাপ ('ছোমা'), গুরুর উপদেশে মুদ্রাগ্রহণ, প্রজ্ঞোপায় যোগ, অভ্যাসপ্রকর্ষ প্রভৃতি বাহ্য মিলনেরই কথা। বিশেষতঃ গুহ্য অভিষেক এবং এই অভিষেকের সময়, সময়মুদ্রা ও সময়াভিষেক প্রভৃতিও রহস্যময়। কণ্ঠ বা সম্ভোগচক্রে সময়মুদ্রার সহিত সাধকের পরমানন্দ সম্ভোগ। এই প্রসঙ্গগুলি বিসদৃশ এবং একান্ত গুহ্য। তাই প্রকাশের দিক হইতে ইহার ভাষাও স্বতন্ত্র। সময়-সঙ্কেতের বিশিষ্ট ভাষা তাই অভিসন্ধিমূলক সন্ধ্যাভাষা। সে ভাষা বাহিরের দিক হইতে এক

CENTRAL LIBRARY

অর্থ বহন করে, কিন্তু সংকেতিত অর্থ ভিন্ন। সে অর্থ 'গুরুসম্প্রদায়'—অর্থাৎ গুরুপরম্পরা প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে বুঝিতে হয়। তাই হেবজ্রতন্ত্রে অতি সংক্ষেপে এই মূল রহস্যটির ইঙ্গিত দিয়া বলা হইয়াছে, 'সন্ধ্যাভাষং মহৎভাষং সময়সঙ্কেত বিস্তরম্।'

হেবজ্রতন্ত্রের দ্বিতীয় কল্প তৃতীয় পটলে সম্বর ও অভিষেক প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাভাষার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই কল্পেরই চতুর্থ পটলে যোগী ও যোগিনীর গীত-নাট্য কি, তাহার উত্তরে সন্ধ্যাভাষায় যে চিত্রটি অঙ্কন করা হইয়াছে সন্ধ্যার্থে তাহা নরনারীর মিলনচিত্র :

কোলই রে ঠিম বোলা মুম্মুনিরে **কক্কোলা**।
ঘন **কিবিড** হো বাজই **করুণে** কি অইন রোলা॥
তহি **বল** খজ্জই গাঢ়ে **মঅণা** পিজিঅই।
হলে **কালিঞ্জর** পণিঅই **দুন্দুরু** বজ্জিঅই॥
চউসম কস্তুরি সিহ্লা কর্পূর লাইঅই।
মালই ইন্ধন সালিতহি ভক্ষ খাইঅই॥
প্রেষ্ঠাণ খেট করন্তে শুদ্ধাশুদ্ধ ন মানিঅই।
মলয়জ কুন্দুরু বটই ডিণ্ডিম তহি ণ বজ্জিঅই॥

বাহিরের দিক হইতে ইহার অভিধেয় অর্থ একপ্রকার, কিন্তু সন্ধ্যাভাষার অর্থ অনুসারে উহার গূঢ়ার্থ বা সম্প্রদায়ার্থ এইরূপ—

> কোলগিরিতে আছে বজ্র (লিঙ্গ) এবং মুম্মুনি ক্ষেত্রে পদ্ম (ভগ)। উচ্চরবে বাজে ডমরু, সংবৃত বোধিচিত্তের (শুক্ররূপী) এইরূপ কোলাহল। সেখানে মাংস খাওয়া হয়, মদ্য পান করা হয়, ভব্য জনকে প্রবেশ করানো হয়, অভব্য জনকে বর্জন করা হয়। বিষ্ঠা, মূত্র, রজঃ ও শুক্র লইয়া অন্নব্যঞ্জনসহ ভোজন করা হয়। গতাগতিতে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বিচার করা হয় না; মিলন ও দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগে অস্পৃশ্যকেও দূরে বর্জন করা হয় না।

ঠিক এই ভাবেরই একটি আগম-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ১৮ নং চর্যাটীকায়—

কক্কোল প্রিয় বোল মেলকতয়া আনন্দস্ফুরৎ কুন্দুরাঃ।
সদ্যঃ শোধিত শালি লালিতকরাঃ কালিঞ্জরশ্চক্রিণঃ॥
ভ্রমাদ্ দিব্যসরোজ পাত্র মদনব্যালুপ্ত দম্বচ্ছদাঃ।
প্রেতাবাসনিবাস নিত্যরসিকাঃ কেচিৎ ক্বচিৎ যোগিনঃ॥

এখানেও সন্ধ্যাবচনের সঙ্কেতে ভগলিঙ্গ যোগে রসিক যোগীর মিলনের আনন্দ-স্ফূর্তি, শাল্যন্ন ভক্ষণ, পদ্মপাত্রে মদ্যপান ও শ্মশানচারিতার কথা বলা হইয়াছে।

চর্যাগীতিতেও একাধিক স্থলে সন্ধ্যাশব্দে নরনারীর মিলনযোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

(i) ৪ সংখ্যক গানে 'শ্রীহেরুকচর্যা'য় **'কুন্দুরু'** বা দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগের চিত্র। ভাবক ও যোগিনীর 'কুলিশাব্জ সংযোগ' এখানে সন্ধ্যা ভাষাতেই বর্ণিত। সন্ধ্যার্থে উহা যৌন-যোগ হইতে ভিন্ন নহে :

তিয়ড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী।

CENTRAL LIBRARY

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি॥

—ত্রিবৃৎ (ত্রিভুজাকৃতি ভগ) চাপিয়া আলিঙ্গনপটু যোগিনী আলিঙ্গন দেয়। ভাবককে বলে, ভগলিঙ্গ যোগে বৈকালিক ক্রিয়া কর। ভাবক বলে, যোগিনি, তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচি না, তোমার মুখচুম্বন করিয়া আমি পদ্মমধু পান করি।

(ii) ১৯ সংখ্যক গানে ডোম্বী-বিবাহ ও মিলনের চিত্র। এখানে 'বিবাহ' শব্দটিই গূঢ় তাৎপর্যবোধক, সঙ্কেতার্থে বিবাহ গমনদ্বারের বাহ্যবভঙ্গ। উপরন্তু এখানে রহিয়াছে রাত্রিব্যাপী সুরতাভিষঙ্গের তৃপ্তি:

অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ।

(iii) ২৮ সংখ্যক গানেও রতিক্রীড়াসুখ প্রবাহের চিত্র:

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেঅ রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥

—(সোনারূপা তামায় গড়া) তিন ধাতুর খাট পাতা হইল। সবর মহানন্দে শয্যা বিছাইল। সবর কামকুশল নায়ক, সবরী কামনায়িকা। মনের সুখে তাম্বুল-কর্পূর ভক্ষণ করিয়া, সোনার নৈরামণিকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরমানন্দে রাত্রি ভোর করিল।

এ সকল স্থানে সন্ধ্যার্থ যৌনবাসনা, দেহসম্ভোগ ও ভোগবিলাসের সঙ্কেতবহ। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, প্রাচীন তন্ত্রাদিতে সন্ধ্যা শব্দগুলিকেই ব্যবহার করা হইয়াছে, সন্ধ্যা অর্থটি গোপন রাখা হইয়াছে। চর্যাগানে শব্দের পরিবর্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্কেতিত অর্থটি গ্রহণ করায় বাহ্য সুরতলীলা ব্যাপারটি বাহিরে সুপ্রকট হইয়াছে। সন্ধ্যাভাষা যে সময়-সঙ্কেতরই ভাষা, বিষয়ানুসারে চর্যাগীতির বিন্যাসপ্রণালীও সে সাক্ষ্য বহন করে। আবিষ্কৃত চর্যাগীতিতে ৫০টি গীতের সংখ্যা থাকিলেও কয়েকটি পাতা না থাকায় উহাতে মোট পূর্ণাঙ্গ গীতের সংখ্যা ৪৬। তন্মধ্যে প্রথম ২১টি গানে টীকাকার যে পরিমাণ সন্ধ্যাশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, শেষাংশে সে পরিমাণে সন্ধ্যা শব্দের উল্লেখ অনেক কম। এ সম্পর্কে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় *The old Bengali Language and Text* গ্রন্থে কয়েকটি সংশয়িত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি: 'It may be possible that a historical stage is marked by the absence of *Sandhya-Sabda* and the preponderance of simple statements····· Does it imply that the authors whose songs fall in the latter half of the Text are comparatively younger?

কালানুক্রমিকতার দিক হইতে শেষের গানগুলি পরবর্তীকালের লেখকদের রচনা এই মন্তব্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। প্রথম গানের আদি সিদ্ধাচার্য লুই শেষাংশেও আছেন (২৯)। প্রাচীন সাধক সরহপাদকে শেষের দিকেই (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক গানে) বিশেষ করিয়া পাওয়া যাইতেছে। ২ ও ৫০ সংখ্যক গীতের রচয়িতা কুক্কুরীপাদ যে ৪৮ সংখ্যক গানের প্রণেতা (পাতা না থাকায় মূল গানটি লুপ্ত), তাহা মুনিদত্তের টীকা হইতেই জানা

CENTRAL LIBRARY

যাইতেছে। ১৫ সংখ্যক গানের শান্তিপাদ (ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'প্রাচীনতর পদকর্তা') ২৬ সংখ্যক গানেরও রচয়িতা। শবরপাদও প্রাচীন কবি, তিনি ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানের কবি। কাহ্নপাদের ভনিতায় অনেকগুলি গান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৩৬ সংখ্যক গানের রচয়িতা কাহ্নপাদ জালন্ধরীপাদের শিষ্য। তিনিও অপ্রাচীন নহেন। ৩৪ সংখ্যক গানের কবি দারিক আদি সিদ্ধাচার্য লুইয়ের শিষ্য। কাজেই চর্যাগীতিশেষের শেষার্ধের গানগুলি অবরকালের রচনা, একথা বলা চলে না। বরং চর্যাগীতির শেষার্ধে সন্ধ্যাশব্দের স্বল্পপ্রয়োগ সম্পর্কে ডঃ মুখোপাধ্যায় যে অপর কারণটি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য : **'It is possible that the latter part of the text contained those songs which do not justify the inclusion of *Sandhya-sabda.***

চর্যাগীতির সঙ্কলনে একটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকের গানগুলিতে পাওয়া যায় চর্যা, ক্রিয়া অর্থাৎ মহারাগনয়ের পদ্ধতি। শেষাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে সহজতত্ত্বমূলক বা সহজপ্রাপ্তির আনন্দানুভবমূলক গান। অবশ্য এই ভাগ সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। অনেক গানেই সাধন ও সাধ্য একাধারে মিশ্রিত হইয়া আছে। তবু শেষাংশের গানগুলিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দই বিশেষভাবে প্রকাশিত। এখানে লুই 'জ্ঞানানন্দ সুন্দর' (২৯), শান্তি 'জ্ঞানানন্দ প্রমোদভরস্তিমিত হৃদয়' (২৬), ঢেণ্ঢণপাদ 'পরমানন্দসন্দোহমুদিত' (৩৩), ভদ্রপাদ 'জ্ঞানানন্দ-প্রমোদযুক্ত' (৩৫), কৃষ্ণাচার্য 'সহজানন্দ সুন্দর' (৩৬) বা 'জ্ঞানামৃত পরিতুষ্ট' (৪২)। আর ভুসুকু?—বিচিত্র তাঁহার সহজানন্দের অনুভব। তাই কখনও তিনি 'সহজানন্দ রসপূর্ণ' (২৭), কখনও বা 'অমৃত পরিস্রপিত' (৪৯)। এই সহজানন্দ 'স্বসংবেদ্য' এবং সে সংবেদন 'বাক্‌পথাতীত'। সেইজন্যই হয়তো ডঃ মুখোপাধ্যায় মনে করিয়াছেন, চর্যাগীতিশেষে সন্ধ্যাশব্দ প্রয়োগের সুযোগ অল্প।

কিন্তু বিষয়টি অন্যভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দ প্রকাশে আভিপ্রায়িক ভাষা প্রয়োগের সুযোগ অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাতে সন্ধ্যাশব্দ ব্যবহৃত নাও হইতে পারে। আভিপ্রায়িক শব্দ হইলেই তাহা সন্ধ্যাশব্দ হয় না। সন্ধ্যাভাষা সময়-সঙ্কেতমূলক আভিপ্রায়িক ভাষা। তাহার প্রকাশের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ।

মিস্টিক তত্ত্ব অনুভবের প্রকাশে যে সঙ্কেত, রূপক বিপরীত ভাষণ বা পল্লবিত ভাষণের প্রয়োজন আছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা স্বীকার করেন। Underhill বলেন, 'Under a variety of images, by a deliberate exploitation of the musical and suggestive qualities of words—often too, by the help of desparate paradoxes, those unfailing stimulants of man's intuitive power—he tries to tell others somewhat of that veritable country which 'eye hath not seen'. (Mysticism). কাজেই সহজানন্দ 'আবচকত্বাৎ' অনির্বচনীয় হইলেও, সাধকগণ তাহাকে বাক্‌প্রতীতির নানা কৌশল অবলম্বনে প্রকাশ করিয়া থাকেন। চর্যাগানেও সহজতত্ত্ব প্রকাশের ব্যাপারে আভিপ্রায়িক স্বার্থক শব্দের প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। কমলিনী, শশধর (২৭), গুঞ্জা (২৮), নিরাল = নিরাবলম্বন (৩১), হুঁভব, গোহাল (৩৯), বঙ্গাল, পঞ্চপাটন, সোণরুখ (৪৯) এবং কপাস, কঙ্গুচিনা, জোহ্নবাটি (৫০) প্রভৃতি সন্ধ্যাশব্দ না হইলেও স্বার্থক ও আভিপ্রায়িক।

শেষের দিকের গানগুলিতে যে সন্ধ্যাশব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই, তাহা বলা চলে না। কারণ চর্যাগানে অবিমিশ্র সহজতত্ত্বের অনুভবের কথা অল্প গানেই আছে। সর্বত্রই সাধনতত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আনন্দ মিশ্রিত হইয়া আছে। কাজেই যে-সকল স্থলে সাধন-প্রসঙ্গে গুহ্যমেলন প্রক্রিয়ার কথা আছে, সেখানে সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ আছেই। যেমন ৪৭ সংখ্যক গীত 'কমলকুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী'। এই গানটি 'হেবজ্রতন্ত্রের 'চণ্ডালী অলিতা নাড়ৌ' শ্লোকটির ভাবছায়ায় রচিত। উহাতে সন্ধ্যাভাষার উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

এইপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সাধন-সংক্রান্ত কতকগুলি গানে পরিচিত ও প্রচলিত সন্ধ্যাশব্দ বা সন্ধ্যার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করা হইলেও, মুনিদত্ত তাহাদিগকে সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত করেন নাই। ২৮ সংখ্যক গানের 'সবর-সবরী', 'কর্ণকুণ্ডল বজ্র' (নিরংশুক), 'কাপুর' (কর্পূর), ৩১ সংখ্যক গানের 'মনপবন', 'ডমরু', ৩২ সংখ্যক গানের 'রবি-শশি', ৩৪ সংখ্যক গানের 'বাজুল' (বজ্রফুল), ৩৭ সংখ্যক গানের 'ফুল', ৩৯ সংখ্যক গানের 'বলদ', ৪৯ সংখ্যক গানের 'ধরণী' ও 'চণ্ডালী' এবং ৫০ সংখ্যক গানের 'শবরা-শবরী' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত মতে সন্ধ্যাশব্দ। কিন্তু আচার্য মুনিদত্তের টীকায় উহাদিগকে সন্ধ্যাভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। উপরন্তু প্রথমদিকের গানগুলির টীকায় যেগুলিকে সন্ধ্যাশব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষের দিকের গানে সেই একই অর্থে প্রয়োগ করা হইলেও, মুনিদত্ত সেগুলিকে সন্ধ্যা শব্দ বলেন নাই। যথা ৮ সংখ্যক গানে 'করুণা' সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ৩০, ৩১ সংখ্যক গীতে একই অর্থে প্রযুক্ত হইলেও সেখানে 'করুণা'কে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। ১০ সংখ্যক গানের 'ডোম্বী' সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ১৪ নং গানের 'সহজযান প্রমত্তাম্বী' ডোম্বী, বা ১৯ সংখ্যক গানের ডোম্বী সন্ধ্যাশব্দ নহে। ৪৭ সংখ্যক গানের ডোম্বী' পরিশুদ্ধাবধূতী'—অথচ তাহাকে সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। ১৫সংখ্যক গানের'নৌ', কায় অর্থে সন্ধ্যাশব্দ, কিন্তু ৩৮ সংখ্যক গানের 'গাব' একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও সন্ধ্যাশব্দে চিহ্নিত নহে। মনে হয়, টীকাকার পূর্বে যে শব্দটিকে একবার সন্ধ্যাশব্দ বলিয়াছেন, পুনরুল্লেখ হইবে মনে করিয়া শেষের দিকে সেটিকে আর সন্ধ্যাশব্দ বলেন নাই। এমন কি তন্ত্রে বা দোহাটীকায় যে শব্দগুলিকে সন্ধ্যাবচন বলা হইয়াছে, সে শব্দগুলিকেও টীকামধ্যে পুনরায় সন্ধ্যাশব্দ বলা হয় নাই। এসকল ক্ষেত্রে দ্বিরুক্তি বা পুনরুক্তি পরিহার করাই সম্ভবতঃ আচার্য মুনিদত্তের উদ্দেশ্য।

মোটের উপর সন্ধ্যাভাষা গুহ্যসাধনসংক্রান্ত আভিপ্রায়িক ভাষা। গুহ্যসাধনের ক্ষেত্রেই উহার প্রয়োজন। সহজানন্দ বাক্‌পথাতীত হইলেও গুহ্য বা গোপ্য নহে। কিন্তু সহজে প্রতিষ্ঠার উপায় যে বজ্রজাপ, তাহা সর্বথা গুহ্য ও গোপনীয়। তাহার চর্যা ও ক্রিয়াও বিসদৃশ ও রহস্যময়। সহজ সাধনার পঞ্চক্রম, পঞ্চবর্ণবিহার, সপ্রপঞ্চ চর্যা, কপালচর্যা প্রভৃতি শুধু দুরবগাহ নহে, বিষম। আর এই চর্যা ও ক্রিয়াগুলিই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে চর্যাগীতি-কোষের প্রথমাংশের গানগুলিতে। ২ নং চর্যায় 'নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা', ১০ নং গানে 'সপ্রপঞ্চ চর্যা', ১১ নং গানে 'কপাল চর্যা', ১২ সংখ্যক গীতিতে 'মন্ত্রনয়রহস্য', ১৪ নং গীতিতে 'অভ্যাসপ্রকর্ষ', ১৭ নং গানে বিষম 'বজ্রপদ নৃত্য' ও 'সম্বাদন মন্ত্র' প্রভৃতির নির্দেশ রহিয়াছে। ওইসকল গানেই সন্ধ্যাসঙ্কেত প্রয়োগের উপযোগিতা অধিক এবং করাও হইয়াছে তাহাই। সাধন-সংক্রান্ত গানগুলিতে একদিকে রহিয়াছে ভাবগোপনের তাগিদ, অপরদিকে ভাবপ্রকাশের দায়িত্ব। কারণ, বৌদ্ধসঙ্ঘের বাহিরে ও ভিতরে রহিয়াছে সম্প্রদায় বাহ্য বুদ্ধতীর্থিক, আছে মৃদুইন্দ্রিয় 'বিতথ জ্ঞানাভিনিবিষ্ট' বালযোগী। তাহারা এক বুঝিতে আর বুঝিতে পারে। আবার সম্প্রদায়ান্তর্গত ভাবককে গূঢ় তাৎপর্য বুঝাইতেও হইবে। তাই প্রয়োজন অভিসন্ধিমূলক সন্ধ্যাভাষা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন কুশলী সুরঙ্গিকার মত সেই সন্ধিচ্ছেদের কৌশল। গুহ্য সাধনের সে সন্ধি ছেদ করিতে পারে 'গুরুসম্প্রদায়' অর্থাৎ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ। এই উপদেশের উপাদান সময়সঙ্কেতদ্যোতক সন্ধ্যাভাষা।

সময়সঙ্কেতের দিক হইতে সন্ধ্যাভাষার প্রকৃতি বিচার করিতে গিয়া কেহ কেহ (Mercia Eliade) ইহাকে 'Obscene language' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বজ্রযান শাখার সমস্ত ক্রিয়া, চর্যা ও ভাষাকে নীতিবিগর্হিত বলিয়া সাধনমালার ভূমিকায় অভিযুক্ত করিয়াছেন : **'Vajrayānists went beyond due limits in their spite against strict rules of morality, and they violated all of them and plunged head long into the worst immorality and sin.'**

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু এইপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য, গুহ্যসাধনার ভাষাসঙ্কেতও গুহ্য। আচার্য অদ্বয়বজ্র সরহপাদের দোহা-টীকায় এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। যোগিনীদের আচার-আচরণ কুৎসিত, রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল। তাঁহারা ঘরপতিকে ভক্ষণ করে, পরপতিকে গ্রহণ করে, বারাঙ্গনার মত ছলাকলাপূর্ণ রতিবিলাসে মত্ত হয়: 'তস্মাদ্ বিসদৃশং সর্বশাস্ত্রেষু লোকব্যবহারে বা যোগিনীনামাচারঃ'। অথচ এই যোগিনীরা তন্ত্রের ও সহজ সাধকদের বর্ণনীয় বিষয়। চর্যাকার বলেন, ডোম্বী কুলীনেরও সেবা করে, কাপালিকেরও সেবা করে: 'ডোম্বি ত আঅলি নাহি ছিণালী'—ডোম্বী ছাড়া এরূপ ছিন্ননাসা নির্লজ্জা আর কেহ নাই। অথচ বিদ্বজ্জন এই যোগিনীকে ত্যাগ করে না, কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া রজনী প্রভাত করে। ডোম্বীর 'ভাভরি আলী' অসদ্বৃত্তিই কি সম্প্রদায়ের বক্তব্য? তেমনই যোগিনীর সমাজবিগর্হিত আচারই কি সহজসাধকদের লক্ষ্য?—তাহা নহে। অদ্বয়বজ্র বলেন, 'যোগিন্যা চ ন মারিতং ন ভক্ষিতং। অপি সহজময়ঃ সহজাত্মকং সহজে নিলীনং কৃতমিতি ভাবং।' সহজের এই তথতাবোধ বা অদ্বয় ভাবটিই বিসদৃশ আচারের ভিতর প্রতিফলিত এবং উহাই যোগিনী-নয়ের গূঢ়ার্থ। এইজন্যই সরহপাদ বলেন, 'অইসে বিষম সান্ধি কো পইসই'—বাক্যটির ব্যাখ্যায় অদ্বয়বজ্র বলেন, 'ইতীদৃশা উক্ত লক্ষণায়াং বিষম সন্ধিবচনেষু কঃ পুরুষঃ প্রবেশং করোতি?'—গুরুপ্রসাদেই সন্ধিবচনের তাৎপর্য স্ফুরিত হয়। সন্ধার্থ সর্বথা 'গুরুসম্প্রদায়াদ্ বোদ্ধব্যঃ'। সম্প্রদায়বাহ্য বালযোগীর মত উহাকে 'Obscene language' না বলাই সঙ্গত। আর নিরুত্তর যোগের মূলকথা 'অনালম্বন যোগ' (তুঃ 'আজদেব নিরালে রাজই' ৩১—'আর্যদেবপাদাঃ নিরালম্বেন সর্বধর্মানুপলম্ভযোগেন রাজতে শোভতে—টীকা)। সেখানে অশ্লীলতার স্থান কোথায়?

তাহা ছাড়া, হেবজ্রতন্ত্রে বা চর্যাগীতিতে যে-সকল শব্দ সন্ধ্যা শব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই বাহিরের দিক হইতে অশ্লীল নহে। হেবজ্রতন্ত্রের মলয়জ, পদ্মভাজন, কুন্দুরু, কর্পূর, কস্তুরী, বোল, কক্কোল ও চতুঃসম প্রভৃতি শব্দ এবং চর্যাগানের হরিণী, গজেন্দ্র, নদী, নৌকা প্রভৃতি শব্দ অশ্লীল তো নহেই, বরং উচ্চারণ-সৌকর্যে, অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে এবং লাক্ষিত্যে সেগুলি রুচির ও রুচিকর। এমন কি, তাহাদের অভিধেয় অর্থগুলিও মনোহর। মলয়জ-চন্দন, পদ্মভাজন-কমলপাত্র, কে না জানে কর্পূর-কস্তুরী গন্ধদ্রব্য? কুন্দুরুও সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ, বোল-কক্কোলও অভিধেয় অর্থে 'গন্ধদ্রব্যবিশেষ' এবং চতুঃসম—'মিলিতচন্দনাগুরুকস্তুরীকুঙ্কুমরূপম্' (হেমচন্দ্র, দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম)।

প্রকৃতপক্ষে যিনি যাহাই বলুন, চর্যাদর বা সিদ্ধাচার্যদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঙ্গে ছিল আশ্চর্যসুন্দর কবিদৃষ্টি। যাঁহারা নিজে 'সহজানন্দরসপূর্ণ' বা 'জ্ঞানানন্দসুন্দর', তাঁহারা গীত রচনা করিতে গিয়া প্রজ্ঞা, আনন্দ ও সুন্দরেরই যুক্তবেণী রচনা করিয়াছেন। সহজ সাধকেরা ছিলেন একদিক হইতে জীবনপ্রেমিক ও সৌন্দর্যরসিক। মর্তজীবনের পঞ্চবর্ণ বিহারে তাঁহারা এক অনাসক্ত আসক্তির পরিচয় দিয়াছেন, মহারাগ আস্বাদনে তাঁহারা পার্থিব রাগকে অস্বীকার করেন নাই। এ যেন 'ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙ্গা'র অনুসন্ধান বা 'রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান।' 'সিদ্ধ সাধকদের ভাষাভঙ্গীও কাব্যত্বের প্রতিকূল নহে। সন্ধ্যাশব্দের নির্বাচনে ও বিন্যাসে তাঁহারা কাব্যশোভাকর অনুকূল পরিবেশই রচনা করিয়াছেন। চর্যাধরেরা নিজে যোগিকালঙ্কারে (নিরুত্তরা) ভূষিত হইয়াছেন, সোনার নৈরামণিকে ময়ূরপিচ্ছে ও গুঞ্জামালায় সজ্জিত করিয়াছেন। এই অলঙ্কারপ্রিয়তা কাব্যের মণ্ডনকলারও সহায়ক হইয়াছে, তাই সাধনসঙ্গীতে আসিয়াছে বিবিধ কাব্যালঙ্কার—শ্লেষ, ব্যাজ, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি। এই অলঙ্কার সজ্জার প্রধান উপকরণ অর্থশ্লিষ্ট সন্ধ্যাশব্দ। সন্ধ্যাভাষার প্রকৃতি বিচারে শব্দের এই শক্তি ও বৃত্তি কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে।

সন্ধ্যা শব্দের সৌন্দর্য বিচার করিবার পূর্বে ইহার নিহিতার্থগুলি কিভাবে স্থির করা হইয়াছে, তাহা বিচার

CENTRAL LIBRARY

করা কর্তব্য। সন্ধ্যাশব্দের নিহিতার্থ আভিপ্রায়িক হইলেও স্বকপোলকল্পিত নহে। পূর্বপ্রচলিত ধারা অনুসরণ করিয়াই শব্দগুলির গূঢ়ার্থ বিচার করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বৈদিক শব্দের নির্বচনকার নিরুক্তবাদীদের সহিত সহজ আচার্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল রহিয়াছে। বেদের অনেক শব্দকে কেহ কেহ নিরর্থক বলিয়াছেন। কিন্তু নিরুক্তকারেরা বলেন, কোন বেদমন্ত্রই নিরর্থক নহে। অন্ধ ব্যক্তি যে স্থাণু (খুঁটি) দেখিতে পায় না, তাহা স্থাণুর দোষ নহে, পুরুষের অন্ধত্বই তাহার কারণ (নিরুক্ত ১. ৩. ৫)। যাস্কমুনির মতে প্রত্যেকটি বেদমন্ত্র অর্থবহ। তবে শব্দগুলি অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অর্থের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ প্রকাশ করে। মানুষের পরোক্ষপ্রিয়তার ফলেই ভাষা প্রত্যক্ষ ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেক্ষেত্রে শব্দের অন্তর্লীন ক্রিয়া বিচার করিয়া বা অন্য কোন ক্রিয়ার অর্থ বা স্বর-ব্যঞ্জনের সমানতা ধরিয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিরূপণ করিতে হয়। তাহা হইলেই সঙ্গত অর্থটি পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবচনের নির্বচনে বা অর্থ নিরূপণে তন্ত্রকার বা ভাষ্যকারবৃন্দ এই প্রাচীন নৈরুক্ত পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। নিরূঢ় ক্রিয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা সন্ধ্যাবচনের ব্যুৎপত্তি ও গূঢ়ার্থ বিচার করিয়াছেন। এখানে চর্যাগানে ব্যবহৃত এবং ভাষ্যকার মুনিদত্ত কর্তৃক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত সন্ধ্যাশব্দগুলির ব্যুৎপত্তিসহ অর্থ দেখানো যাইতেছে :

(i) প্রথমত কতকগুলি এমন সন্ধ্যাবচন পাওয়া যাইতেছে, যাহাদের অর্থ প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইলেও আভিধানিক অর্থ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

দুলি (২)—সন্ধ্যার্থ 'মহাসুখকমল'। এখানে লয়ার্থক ধাতু 'লী' কে অবলম্বন করিয়া ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, 'দ্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং'। নূতনত্ব আসিয়াছে 'দু' কে 'দ্বয়'-এর সমার্থক ধরায়। দু বা দ্বয় বা দ্বৈতবোধ যেখানে লয়প্রাপ্ত, তাহাই 'দুলি'। প্রচলিত অর্থে দুলী বা দুরীর অর্থ 'মাদী কচ্ছপ'। কমঠের সর্বসঙ্কোচন বৃত্তিই এখানে লক্ষ্যার্থে আরোপিত। মহাসুখও সমস্ত দ্বৈতবোধের অতীত।

বহুড়ী (২)—পরিশুদ্ধাবধূতী ; তৎসম 'বধূটী' শব্দ হইতে তদ্ভব 'বহুড়ী' শব্দ নিষ্পন্ন ; কিন্তু চর্যাটীকায় আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া 'অবধূতী' শব্দ হইতে আদ্যস্বর লোপে বধূতী বা বধূটী শব্দটি নিষ্পন্ন দেখানো হইয়াছে। অনাদি ভববিকল্প ধৌত করেন যিনি, তিনি পরিশুদ্ধাবধূতী। এইদিক হইতে অবধূতী-ই বহুড়ী। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক।

হরিণী (৬)—জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা ; 'হরতি খণ্ডয়তি হরিণী'—যে হরণ করে বা খণ্ডন করে সেই হরিণী। অভিধানেও 'হৃ' ধাতু হইতেই হরিণ শব্দ নিষ্পন্ন। কিন্তু জ্ঞানমুদ্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?—জ্ঞানমুদ্রা 'বিষপান ভব গ্রহান্ হরতি'। চর্যার হরিণীও অনাদি অবিদ্যাদোষে মোহগ্রস্ত মৃত্যুভীত হরিণার মোহভাব হরণ করেন। তাই লক্ষ্যার্থে 'হরিণী' জ্ঞানমুদ্রা।

হরিণা (৬)—সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ; হরিণা হরণ করে বা গ্রহণ করে অবিদ্যাদোষ, ধারণ করে 'মাংস'। প্রকৃতিদোষে সে চঞ্চল। সংবৃত্তি চিত্তও স্পন্দনশীল, তাহার গতি সংসারের দিকে। অতএব লক্ষ্যার্থে হরিণা সংবৃত্তি বোধিচিত্ত।

মুসা (২১)—চিত্তপবন ; 'মুষ্ণাতীতি মূষকঃ'—এখানে হরণার্থক 'মুষ্' ধাতু হইতেই শব্দটি নিষ্পন্ন। মূষিক মিষ্টদ্রব্য আহার করে, ঘরে গর্ত খনন করে, চঞ্চল ভাবে গমনাগমন করে। এই মূষিকবৃত্তিই চঞ্চল চোর সংবৃত্তি চিত্তপবনের বৃত্তি। তাই নিহিতার্থে 'মুসা' চিত্তপবন।

(ii) কতকগুলি সন্ধ্যা শব্দের গূঢ়ার্থ স্পষ্টতঃ লক্ষণা শব্দশক্তিবলে সিদ্ধ। যথা—

CENTRAL LIBRARY

বারুণী (৩)—সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ; টীকা মতে 'বারুণীতি সুখপ্রমোদত্বাৎ বোধিচিত্তং'। বারুণী বা মদ প্রমোদকর, সংবৃত্তি বোধিচিত্তও বিষয় সুখে প্রমাদগ্রস্ত।

নই (**নদী**) (৫)—ললনারসনাদি আভাষত্রয় ; নদী জলবহা, নাড়ীগুলিও বোধিচিত্তবহা। নদী মাঝখানে গহন, গভীর, কিনারায় পঙ্কিল—তেমনই মধ্যনাড়ী অতল, পার্শ্বনাড়ী প্রকৃতিদোষদুষ্ট। কাজেই 'ললনারসনাদ্যাভাষত্রয়ং পারাবার গম্ভীরত্বেন নদী সদ্ভ্যা বোদ্ধব্যং' (টীকা)।

গজেন্দ্র (৯, ১৬)—চিত্ত ; মদমত্ত গজেন্দ্র স্তম্ভ ভাঙ্গে, শৃঙ্খল ছিন্ন করে, মদবর্ষণ করে, গর্জন করে ও কমলবনে ক্রীড়া করে। জ্ঞানপানপ্রমত্ত চিত্তও সংসারপাশ ছিন্ন করে এবং মহাসুখকমল সরোবরে প্রবেশ করিয়া নিবৃত্ত হয়।

ডোম্বী (১০)—পরিশুদ্ধাবধূতী ; টীকাকার বলেন 'অস্পৃশ যোগত্বাৎ ডোম্বী'। অস্পৃশ্য বলিয়া ডোমনী নগরের উপান্তে বাস করে, ব্রাহ্মণ তাহাকে স্পর্শ করে না। পরিশুদ্ধাবধূতিকার আগারও রূপাদি বিষয় সমূহের বহির্ভাগে, তাহা সংবৃত্তি বোধিচিত্তের অস্পৃশ্য। অতএব গুণ লক্ষণায় ডোম্বী পরিশুদ্ধা অবধূতী।

নাঈ (১৪)—শুক্রনাড়িকায় প্রবাহিত বোধিচিত্ত ; নৌ বা নৌকা নদী সন্তরণ বা পারে গমনের উপায়, উহা নদীর বাহন ; তেমনই পারগামীর আশ্রয় বোধিচিত্ত, উহা অবধূতিকা মার্গে সন্তরণ করে। নৌকা অর্ণবতরণে তরণী, বোধিচিত্ত ও 'ভবার্ণব তরণে নৌকা'।

গঙ্গা যমুনা (১৪)—চন্দ্রাভাস সূর্যাভাস গ্রাহ্য গ্রাহক ; অবধূতিকা নাড়ীর পার্শ্বস্থ বামগা নাড়ী চন্দ্র বা গ্রাহ্য। দক্ষিণা নাড়ী সূর্য বা গ্রাহক। নিরুক্ত মতে গঙ্গা বিশিষ্টভাবে গমনশীলা, কিন্তু যমুনা অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া গমনশীলা ; একটি স্বতন্ত্রা, অপরটি অন্যনির্ভর। সরহপাদের দোহাটীকাতেও বলা হইয়াছে, 'যমুনা সর্বযানতদাশ্রয়া,' 'গঙ্গা তৎপরি গমনশীলা'। কাজেই লক্ষণায় যমুনা গ্রাহক, গঙ্গা গ্রাহ্য। চন্দ্রসূর্য ও গঙ্গাযমুনার সঙ্গে দেহস্থ নাড়ীর তুলনার পদ্ধতিটি সুপ্রাচীন।

শূন্যতাধ্বনি (১৭)—প্রভাস্বর অনাহত ধ্বনি ; শূন্যের প্রতীক আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ, সে শব্দ অশ্রুত, অনাহত ধ্বনিও অশ্রুত নাদ।

(iii) কতকগুলি সন্ধ্যাশব্দের স্পষ্ট ব্যুৎপত্তি চর্যাটীকায় নাই, অর্থ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে সে অর্থগুলিও রূঢ়িলক্ষণায় সিদ্ধ। যথা—

করুণা (৮)—বোধিচিত্ত ; মহাযান মতে করুণা ও পুদ্গল শূন্যতা একার্থক ; হেবজ্র তন্ত্র মতে 'শূন্যতা করুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্'। অতএব বোধিচিত্তের সঙ্গে করুণার যোগ শাস্ত্রসম্মত।

বড়িক (১২)—ষষ্ট্যুত্তরশত প্রকৃতি অর্থাৎ ১৬০ প্রকার দোষযুক্ত প্রকৃতি। বেষ্টনার্থক 'বট্' ধাতু হইতে বড়িক শব্দের উৎপত্তি, উহা দাবার ছকে অনেকটা স্থান বেষ্টন করিয়া থাকে। প্রকৃতিদোষও বহুব্যাপক।

পুলিন্দা (১৪)—শব্দটির ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট নহে, অর্থ নপুংসক। চন্দ্রসূর্য প্রসঙ্গেই পুলিন্দার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মধ্য নাড়ী অবধূতী।—নপুংসকের প্রজনন ক্ষমতা নাই—স্বরূপতঃ পরিশুদ্ধা অবধূতী নৈরাত্মাও বন্ধ্যা। তুঃ 'গবিআ বাঁঝে' (৩৩ নং চর্যা)।

CENTRAL LIBRARY

হরিহর ব্রহ্মা (৪৭)—যথাক্রমে মূত্র, শুক্র, ও বিট্ নাড়ী। বিবিধ প্রকারে স্থিত বলিয়া বি-স্থা = বিষ্ঠা বা বিট্। ব্রহ্মাও বিবিধ রূপের স্রষ্টা, তাই ব্রহ্মা বিট্ নাড়ী। হরি বা নারায়ণের শয়ন-শয্যা জল, তাই দ্রবাকার মূত্রের প্রতীক। আর হর যে বজ্র বা শুক্রধারী, শৈবতন্ত্রে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। হেবজ্র-তন্ত্রমতে পঞ্চস্কন্ধের দেবতাদের মত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তত্ত্ব :

ব্রহ্মা নিবৃত্তিতো বুদ্ধঃ বিষ্ণাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে। শিবঃ সদা সুকল্যাণাৎ সর্বঃ সর্বাত্মনি স্থিতঃ।

নাভিতে চণ্ডালী প্রজ্বলিত হইলে এই তত্ত্বগুলি দগ্ধ হয়—ইহাই ৪৭ সংখ্যক গানের বক্তব্য।

সন্ধ্যাবচনের গূঢ়ার্থ বিচারে দেখা যাইতেছে, অর্থপ্রকাশের দিক হইতে ইহা শ্লিষ্ট বা দ্ব্যর্থক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। একটি মাত্র শব্দ দ্বারা যেখানে দুইটি অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া হয়, তাহাই শ্লিষ্ট শব্দ। শব্দের সৌন্দর্যবিচারে এইখানেই আসে শব্দশক্তির প্রসঙ্গ। বৈয়াকরণদের মতে শব্দের শক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার—অভিধা ও লক্ষণা। যে শক্তি বলে একটি শব্দ প্রত্যক্ষ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই শব্দের অভিধা শক্তি। শব্দের এই শক্তি বাচ্যার্থকে সুস্পষ্ট প্রকাশ করে এবং শব্দের সৌন্দর্যবিধায়ক নানারূপ অলঙ্কারও সৃষ্টি করিয়া থাকে। সন্ধ্যা-শব্দের বাহ্যার্থ বা অক্ষরার্থ এই অভিধাশক্তিরই প্রকাশ। কিন্তু অভিধেয় অর্থদ্বারা যেখানে শব্দার্থ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়, সেখানে যে শক্তিবলে শব্দটি মুখ্যার্থের সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ প্রকাশ করে, তাহা শব্দের লক্ষণাশক্তি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সন্ধ্যাশব্দের নিহিতার্থ প্রায়শঃ লক্ষণায় সিদ্ধ। লক্ষ্যার্থের পরিধি বহুব্যাপক। রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণা বহু প্রকারের হইতে পারে। আচার্য বিশ্বনাথ 'অশীতি প্রকারা লক্ষণা'র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (সাহিত্যদর্পণ : ২/২৩)। অভিধেয় অর্থের সহিত সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য ও ক্রিয়াযোগের সম্পর্কে পাঁচপ্রকার লক্ষ্যার্থ পঞ্চীকৃত হইয়া বহুপ্রকার হইতে পারে। অভিনবগুপ্ত বলেন, 'অনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধয়া বিশ্বমেব ব্যাপ্তম্' (লোচনটীকা ১/১৮)।

শব্দের এই লক্ষণাবৃত্তি অনেকগুলি বাচ্যালঙ্কারের মূল ভিত্তি। প্রজ্ঞাপ্রবীণ কবি সৌন্দর্যসৃষ্টির গূঢ় অভিপ্রায়ে এই লক্ষ্যার্থকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কাব্যশোভাকর অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। চর্যাগানেও দ্ব্যর্থবোধক সন্ধ্যাশব্দগুলি এই কারণেই কবিতার সৌন্দর্য-বিধায়ক অলঙ্কারের উপচার হইয়া উঠিয়াছে।

'নির্মলগিরা' টীকায় আচার্য মুনিদত্ত অনেকস্থলে 'ব্যাজ' ও উৎপ্রেক্ষা' অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা ভিন্নধর্মী অলঙ্কার হইলেও ১ নং চর্যাটীকায় ব্যাজ যেন উৎপ্রেক্ষারই সগোত্র হইয়া উঠিয়াছে—উভয়ই যেন সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের পর্যায়ভুক্ত। আবার দুইটি যে এক নহে, টীকাকার সে সম্পর্কেও সচেতন (দ্রঃ ৮নং চর্যাটীকা)।

'ব্যাজ' শব্দের অভিধেয় অর্থ ছল। স্বরূপ আচ্ছাদন বা অভিপ্রায় গোপন করাই উহার স্বরূপ লক্ষণ। অলঙ্কার শাস্ত্রে অবশ্য 'ব্যাজ' নামে কোন অলঙ্কার নাই। আছে ব্যাজোক্তি, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলঙ্কার। 'ব্যাজ' সেই সমস্ত অলঙ্কারের অনুগ্রাহক। ব্যাজের সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে শ্লেষ অলঙ্কারের। এই শ্লেষ শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষ দুই ভাগে বিভক্ত। শব্দশ্লেষ শব্দালঙ্কারের পর্যায়ভুক্ত। অর্থশ্লেষ অর্থালঙ্কারের বিষয়। এই অর্থশ্লেষই প্রকৃতপক্ষে 'ব্যাজ'। এই অর্থশ্লেষ সম্পর্কেই ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—একই শব্দদ্বারা শব্দশক্তিবলে দুইটি বস্তু প্রকাশিত হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়—'বস্তুদ্বয়ে চ শব্দশক্ত্যা প্রকাশমানে স শ্লেষঃ' (ধ্বন্যালোক ২।২২)। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন, এক বৃন্তে দুইটি ফলের ন্যায়, একই শব্দের বোঁটায় দুইটি অর্থের সমাবেশই শ্লেষ—'শব্দাভেদাদর্থয়োরেকবৃন্তফলন্যায়েন শ্লেষঃ' (সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৬৪ কারিকা)। ব্যাজে বাচ্যার্থটি প্রকাশ পায় শব্দের অভিধাশক্তি বলে, অপর অর্থটি প্রকাশ পায় লক্ষণাশক্তি বলে। সন্ধ্যা ভাষার অর্থ প্রকটনে এইখানেই ব্যাজের সার্থকতা। অভিধেয় অর্থটির আবরণে ব্যাজ লক্ষ্যার্থের ইঙ্গিত করে। এইদিক হইতে চর্যাটীকায় ব্যবহৃত 'ধ্যান' শব্দটির সঙ্গে 'ব্যাজ' এর সাদৃশ্য

CENTRAL LIBRARY

আছে। যেমন ১২নং 'করুণাপিহাড়ি খেলই নয়বল' গানের টীকায় টীকাকার বলিয়াছেন, 'দ্যূতক্রীড়া ধ্যানেন প্রকথয়ন্তি'। এখানে 'ধ্যান'-এর পরিবর্তে অনায়াসে 'ব্যাজ' ব্যবহার করা চলে।

আমরা অর্থশ্লেষকে ব্যাজ বলিয়াছি। শ্লেষের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাহা যেমন স্বতন্ত্রভাবে শ্লিষ্টাত্মক সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে, তেমনই আবার অন্য অলঙ্কারের অঙ্গীভূত হইয়া তাহাকে চারুত্ব দান করিতে পারে। উপমা, রূপক প্রভৃতি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারে অনেক স্থলে শ্লেষ গুণীভূত হইয়া উপমা রূপককেই প্রাধান্য দেয়—ফলে শ্লেষোপমা, রূপকশ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ভব হয়। এইরূপে স্বার্থবাচক ব্যাজ অনেক ক্ষেত্রেই উপমা-রূপকের সহযোগী হইয়া উঠে। চর্যাগানেও এইরূপে ব্যাজ রূপকের সহকারিতা করিয়াছে। ১নং গানের 'কাঅতরু' ও ৩৮ সংখ্যক গানের 'কাঅনৌকা' প্রকৃতপক্ষে ব্যাজাশ্রিত রূপক। সর্বত্রই ব্যাজের আসল উদ্দেশ্য, বাচ্য অর্থের আড়ালে সন্ধ্যার্থ বা আভিপ্রায়িক অর্থের দ্যোতনা করা।

গূঢ়ার্থের দ্যোতনায় ব্যাজ অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে 'গঙ্গাজউনা মাঝেরে বহই নাঈ' (১৪) গানটিতে। এখানে 'নৌকাপ্রবাহ'-ব্যাজে বা ছলে শুক্রনাড়িকার অন্তর্গত বোধিচিত্তকে মহাসুখপুরের উদ্দেশ্যে বাহিয়া লইয়া যাওয়ার সঙ্কেত। সঙ্কেতটিই অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা গোপন করা হইয়াছে নৌকা বাওয়ার অপদেশে ('নৌকা-প্রবাহ ব্যাজেন'):

> গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা বহিয়া চলে। সেখানে বুড়ী মতঙ্গকন্যা পারাপার করে। (পারার্থী বলে), ওলো ডোমের মেয়ে, বেলা পড়িয়া আসিল, তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া চল। গুরুর কৃপায় আনন্দলোকে যাইব। পাঁচ দাঁড় পড়িতেছে, কাছিটি নৌকার পিঠে বাঁধা। সেঁউতি দিয়া জল সেঁচিয়া ফেল, যাহাতে ছিদ্র পথে জল না ঢোকে। চন্দ্র সূর্যের চাকা আর পুলিন্দা (পাল)—এই তিনই বিনষ্টির হেতু। ডাইনে বাঁয়ে না তাকাইয়া সোজা মাঝ সোতায় নৌকা চালাও। ডোমের মেয়ে কড়ি-বুড়ী নেয় না, অথচ অবহেলায় পার করে। যে এই নৌকায় উঠিয়া বাহিতে জানে না, সে কূলে কূলে ডুবিয়া যায়।

এখানে সমগ্র নৌবাহন ক্রিয়াটিই ব্যাজ। গঙ্গা, যমুনা, নৌ এইগুলি সন্ধ্যা শব্দ, গূঢ়ার্থে অন্য ভাবের প্রকাশক। সেই অন্তর্নিহিত ভাবটিকে সাবধানে গোপন করিবার জন্যই এই সুন্দর অলঙ্কার। সন্ধ্যা শব্দগুলিই সেই অলঙ্কারের মূলীভূত উপাদান।

চর্যাটীকায় সন্ধ্যা শব্দের প্রসঙ্গে কয়েকবার উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

> 'নাবীতি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরং বোদ্ধব্যং' (৮); 'কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ চিত্তগজেন্দ্র সন্ধ্যাভাষয়া তমেবার্থং উৎপ্রেক্ষয়ন্ত আহুঃ' (৯); 'অনাদি ভববাসনা পল্লবাশ্রয়ত্বাৎ ·····স্বচিত্তং তত্ত্বেন উৎপ্রেক্ষিতং' (৪৫)।

উৎপ্রেক্ষা শব্দটির সাধারণ অর্থ অনবধান বা অন্যমনস্কতা—অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়টিকে না ভাবিয়া অন্য বিষয়ের ভাবনা। আচার্য দণ্ডী এই অর্থেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, চেতন বা অচেতন বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিকে অন্য প্রকারে ভাবনা করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় (কাব্যদর্শ ২।২১৮)। ইহা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যাপক নির্বচন। উৎপ্রেক্ষা সাদৃশ্যমূল অলঙ্কার। উহা উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতির সগোত্র। কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্যও অল্প নহে। উপমেয় ও উপমানের প্রতিযোগিতা লইয়াই সাদৃশ্যধর্মী অলঙ্কার গড়িয়া উঠে। উৎপ্রেক্ষায় সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয়কে অধঃকরণ না করিয়া উপমান পক্ষে একটি সংশয়াত্মক অভেদ কল্পনা ('সম্ভাবনা') করা হয় ('ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনঃ'—সাহিত্যদর্পণ ১০.৭০৭)। এই কল্পনায় থাকে অবাস্তব চমৎকারিত্ব যাহাতে বিস্ময়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইতে হয়। উৎপ্রেক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাহাই—উৎ = ঊর্ধ্ব, প্রেক্ষা = দৃষ্টি। অবশ্য

CENTRAL LIBRARY

উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার হইতে উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য উপমেয়-উপমানের ভেদাভেদ কল্পনার পার্থক্যে। উপমায় উপমেয় ও উপমান সমানধর্মা, তুলনায় উপমেয়ের প্রাধান্য। রূপকে উপমেয়ে উপমানের আরোপ হেতু উভয়ে তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভিন্নাত্ম; কিন্তু একাত্ম হইলেও রূপক উপমানপ্রধান। অতিশয়োক্তিতে উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলে, উপমেয়ের উল্লেখই থাকে না; অতিশয়োক্তি সর্বথা উপমানসর্বস্ব। উৎপ্রেক্ষা রূপক ও অতিশয়োক্তির মধ্যবর্তী। উৎপ্রেক্ষায় উপমান উপমেয়কে অতিশয়োক্তির মত 'নীর্ণ' (গ্রাস) করে না, আবার রূপকের মত উপমেয়ের সহিত অভেদাত্মও হয় না। বরং উপমেয় হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক থাকিয়া প্রবল সাদৃশ্যহেতু একটি অবাস্তব সংশয় বা সম্ভাব্য তাদাত্ম্য কল্পনা করে। দর্শন শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া বলা চলে, উপমায় দ্বৈতবাদ, অতিশয়োক্তিতে কেবলাদ্বৈতবাদ, রূপকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং উৎপ্রেক্ষায় ভেদাভেদবাদ। কিঞ্চিৎ ভেদ এবং সংশয়াত্মক অভেদ কল্পনাই ('সম্ভাবনা') উৎপ্রেক্ষার মূলীভূত বিষয়। চর্যার টীকাকারও উৎপ্রেক্ষার এই দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন। 'কাআ তরুবর' পদটির ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, 'কায় তরুবরত্বেন গৃহীতঃ'। পরক্ষণেই প্রশ্ন করিতেছেন, কায় চেতন বস্তু, তরু অচেতন, 'নন্থ অচেতনত্বাৎ কথং কায়স্তরুবরঃ'? তৎপরেই আবার তিনিই উত্তর দিতেছেন, 'নৈষ দোষঃ'। কারণ, অলঙ্কারশাস্ত্রকারেরাও 'উৎপ্রেক্ষালঙ্কারপরৈঃ কিঞ্চিদ্ ভেদাধিষ্ঠানং হি সাদৃশ্যমুদীরিতং'—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে কিঞ্চিৎ ভেদ সত্ত্বেও সাদৃশ্যের কথা বলিয়া থাকেন।

এই অর্থেই চর্যা গানে আসিয়াছে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ৯ সংখ্যক গানে 'চিত্তগজেন্দ্রে'র উৎপ্রেক্ষা। এখানে পদকর্তা স্বয়ং চিত্তগজেন্দ্রের স্থান অধিকার করায় গজেন্দ্রের উৎপ্রেক্ষা কোন স্থলে বাধিত হইয়াছে, কোন স্থলে উপমান উপমেয় চিত্তের ধর্মে অধিবাসিত হওয়ায় তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'মণতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা' (৪৫) গানটিতে 'স্বচিত্তং তরুত্বেন উৎপ্রেক্ষিতং'। কিন্তু এ গানটিতেও 'মণতরু' উৎপ্রেক্ষার পরিবর্তে রূপক-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি মনের অঙ্গ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আশা, যথাক্রমে তরুর অঙ্গ শাখা, পত্র ও ফলের রূপণায় সাঙ্গরূপকের আকার ধারণ করিয়াছে। চর্যার উৎপ্রেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকাশ্রিত।

উৎপ্রেক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বিশেষরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে 'সোণে ভরিতী করুণা নাবী' (৮) গীতটিতে। এখানে 'করুণা' সন্ধ্যাশব্দটি 'নাবী' (নৌকা) রূপে উৎপ্রেক্ষিত। 'করুণা' উপমেয়; 'নাবী' উপমান। উভয়ের তাদাত্ম্য থাকিলেও করুণা ও নৌকা অভিন্ন হইয়া যায় নাই, বরং একাত্মতা সম্পর্কেই উপমান নৌকা বাস্তব নৌকা হইতে পৃথক হইয়া অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়াছে। বিশ্লেষণ মুখে দেখা যায়—

> নৌকা সোনায় ভরা। রূপা রাখিবার স্থান নাই। এই নৌকা গগন-সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বাহিতে হইবে। খুঁটি উপড়াইয়া কাছি খোলা হইল। পথে চলিতে চারিদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেড়ুয়াল ছাড়া নৌকা বাওয়া যায় না। বাম দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া মধ্য সোতায় নৌকা চালনা করিতেই পথে মহাসুখের সঙ্গ পাওয়া গেল।

এখানে উপমেয় 'করুণা'কে নিশ্চিত গ্রাস না করিয়াও উপমান নৌকার সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত। 'করুণা'র সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য হেতু নৌকা বিষয়ে অসম্ভব কল্পনার দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। বাস্তব নৌকা সোনায় ভরা থাকে না, এ নৌকা সোনায় ভরা; বাস্তব নৌকা গগনের উদ্দেশ্যেও ছোটে না, এ নৌকা গগন সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেয়। উপরন্তু ঠিক মত বাহিতে পারিলে এই নৌকা জন্মান্তর নিরোধক মহাসুখের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেয়।

এইখানেই উৎপ্রেক্ষার চমৎকারিত্ব ও সার্থকতা। আর এই চমৎকারিত্ব সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে সন্ধ্যা শব্দের গূঢ়ার্থ দ্যোতনার শক্তি।

CENTRAL LIBRARY

শুধু ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা নহে, চর্যাগীতিতে সন্ধ্যা শব্দের লক্ষণা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া চমৎকার রূপক, অতিশয়োক্তি ও বিরোধ অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে—

(i) **রূপক :** চর্যাগানে সন্ধ্যা শব্দের গুণবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া রূপক অলঙ্কার গঠন করা হইয়াছে। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে রূপকাশ্রয়েই অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে। 'করুণা নাবী' (৮), 'মুসা পবণা' (২১)—এগুলি প্রকৃত পক্ষে রূপক। বিশ্বনাথ বলেন, বিষয়কে (উপমেয়কে) অধঃকরণ না করিয়া ('অনির্ণীর্ণ') যেখানে বিষয়ী (উপমান) দ্বারা আরোপ প্রথায় বিষয়-বিষয়ীর তাদাত্ম্য প্রতীতি হয়, তাহা সারোপা লক্ষণা। এই সারোপা লক্ষণা রূপক অলঙ্কারের বীজ ('ইয়মেব রূপকালঙ্কারস্য বীজম্'—সাহিত্যদর্পণ, ১০. ২৮)। চর্যাগীতিতে সাঙ্গরূপক, পরম্পরিত রূপক এবং রূপকের আধিকারিক প্রয়োগের বিবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'কাঅ-পাবড়ি-খাণ্ট মণ কেড়ুয়াল' (৩৮)—সাঙ্গরূপকের, 'সুণবাহ তথতা পহারী' (৩৬) পরম্পরিত রূপকের দৃষ্টান্ত। চর্যায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে রূপকের আধিকারিক প্রয়োগে। এইদিক হইতে—'তিনি এঁ পাটে লাগেলিরে অণহা' (১৬) গানটিতে 'চীঅ-গঅন্দা'—চিত্ত-গজেন্দ্রের রূপকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গজেন্দ্রের গুণবৃত্তি মদমত্ততা এবং তাহার ফলে স্তম্ভমর্দন, শৃঙ্খলভঙ্গ, এবং নির্বাণ-সরোবরে প্রবেশপূর্বক 'মহারস' পানের রূপক প্রতিমাটি সমগ্র গানে চিত্তপ্রমোদকর সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছে। এইদিক হইতে কৃষ্ণাচার্য-পাদের 'এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ' গানটিও (৯) উল্লেখযোগ্য। এখানে 'চিত্তগজেন্দ্র' সন্ধ্যাভাষা। সিদ্ধাচার্য কাহ্নুই এখানে চিত্ত-গজেন্দ্রের রূপকে রূপিত। গজেন্দ্রের ধর্ম 'আসবমত্ততা' এখানে কৃষ্ণাচার্যের চিত্তে আরোপিত। এইভাবে সন্ধ্যাশব্দের সারোপা লক্ষণা বৃত্তি গানগুলির অঙ্গে সত্যই অপূর্ব সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়াছে।

(ii) **অতিশয়োক্তি :** চর্যাগীতির অপর অলঙ্কার রূপকাতিশয়োক্তি। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করিয়া ফেলে। এখানে উপমানই উপস্থিত থাকে, উপমেয় অনুপস্থিত। উপমান যে লক্ষণাশক্তি বলে এই ব্যাপারটি ঘটায়, তাহাকে বলা হয় 'সাধ্যবসানা লক্ষণা'। সাধ্যবসানা = স অধ্যবসানা। বিষয়কে নির্গীর্ণ (অধঃকরণ বা গ্রাস) করিয়া বিষয়ী দ্বারা (উপমান দ্বারা) যে অভেদ প্রতীতি—তাহাকে বলে অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায় যেখানে সিদ্ধ, তাহা সাধ্যবসানা। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বীজ এই ধরণের লক্ষণা। চর্যাগীতির—'কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস' (৬) গানটিতে 'হরিণা' ও 'হরিণী' সন্ধ্যাশব্দ দুইটি দিয়া সিদ্ধ অধ্যবসায়ের পথে চমৎকার অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে। চর্যাটির বহিরঙ্গ অর্থ এইরূপ—

কি লইয়া, কি ছাড়িয়া, কেমন করিয়া আছ? চারিদিকে বেড়া হাক-ডাক। নিজের মাংসে হরিণা নিজের শত্রু। ভুসুকু ব্যাধ হরিণাকে ছাড়ে না। হরিণা তৃণ ভক্ষণ করে না, জল পান করে না। হরিণীর নিলয় কোথায়, তাহাও জানে না। (এমন সময়) হরিণী (নিজেই আসিয়া) বলিল, হরিণা শোন, এ বন ছাড়িয়া পলায়ন কর। (এই কথা শুনিয়া) হরিণা ত্রস্ত-ব্যস্তে এমনভাবে ছুটিল যে তাহার খুর দেখা যায় না।

এখানে হরিণা ও হরিণী উপমান, উপমেয় যথাক্রমে সংবৃত্তি বোধিচিত্ত ও জ্ঞানমুদ্রা সম্পূর্ণ প্রস্ত। কিন্তু হরিণার মোহ, দেহমাংসের প্রতি মায়া, ব্যাধের আক্রমণজনিত ভীতি, অজ্ঞানতা এবং হরিণীর আবির্ভাবে ভ্রান্তির নিরসন

CENTRAL LIBRARY

প্রভৃতি লক্ষ্যার্থ দ্বারা উপমেয় সংবৃত্তি চিত্তের সঙ্গে অভেদপ্রতীতি অতি স্পষ্ট। সন্ধ্যাশব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাই এই কাব্যশোভাকর সৌন্দর্য পতন করা হইয়াছে।

(iii) **বিরোধ :** সন্ধ্যাশব্দের অর্থ শ্লেষ দ্বারা চর্যাগানে অপর যে অলঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বিরোধ বা বিরোধাভাস। সন্ধ্যাভাষায় রচিত ২ এবং ৩৩ সংখ্যক গীতিতে বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কারের বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সুকুমার সেন ২ সংখ্যক চর্যাকে বলিয়াছেন, অসম্ভব ঘটনামূলক 'প্রহেলিকা দ্বারা রচিত' নিষ্প্রপঞ্চচর্যা এবং ৩৩ সংখ্যক চর্যাকে বলিয়াছেন, 'বিশুদ্ধ প্রহেলিকা চর্যা'। প্রহেলিকায় অসম্ভব সংঘটনা থাকিলেও উহার প্রস্তুতাঙ্গে থাকে একটি প্রশ্ন। ধর্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডন গ্রন্থেও প্রহেলিকার এই 'প্রশ্নের' উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমেও প্রহেলিকাকে বলা হইয়াছে 'দুর্বিজ্ঞানার্থঃ প্রশ্নঃ'। প্রশ্ন প্রহেলিকার প্রধান অঙ্গ। প্রস্তুত প্রশ্নের অপ্রস্তুত উত্তরটি বুদ্ধি দ্বারা নিরূপণ করিতে হয়। ২ বা ৩৩ সংখ্যক চর্যায় কোন প্রশ্ন নাই, আছে অসম্ভব বিরুদ্ধ উক্তির বিন্যাস। উহাকে প্রহেলিকা না বলিয়া, বিরোধ বা বিরোধাভাস বলাই যুক্তিসঙ্গত।

জাতি দ্রব্যগুণ ক্রিয়ার পরস্পর বিরোধী সমাবেশ দ্বারা যেখানে আপাতবিরোধের ঈষৎ ভাসন ঘটে, তাহাই বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কার। আচার্য দণ্ডীর মতে বিরোধসাধনের উদ্দেশ্যে যেখানে বিরুদ্ধ পদার্থের সংসর্গ দেখানো হয়, তাহা বিরোধ (কাব্যাদর্শ ২/৩৩০)। বিরোধটি আপাত, শ্লিষ্টার্থ বিচারে বিরোধের সমাধান হয়। আচার্য সুধীরকুমার বলেন, 'ইহা এক প্রকার ছল আঘাত, অকস্মাৎ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া ঘনীভূত রূপের প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' (কাব্যশ্রী)। বস্তুতঃ বিরোধে থাকে বৈপরীত্যের আঘাত, লক্ষ্যার্থে উহার অবসান ঘটে।

চর্যার এই উক্তিগুলি বিরোধাভাসের সুন্দর উদাহরণ :

(ক) 'দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই' (২)

—দুরা (কচ্ছপ) দোহন করিয়া, দোহনজাত দুগ্ধ পাত্রে ধরে না।—এখানে দ্রব্যের সহিত জাতির বিরোধ। দুগ্ধই হয় না। কিন্তু 'দুলি' এখানে 'মহাসুখকমল', উৎপত্তিক্রমে সেই কমল হইতে প্রাতিভাসিক বোধিচিত্তের উৎপন্ন হয়। বালযোগিরা সে বোধিচিত্তকে ধারণ করিতে পারে না। এই তাৎপর্যার্থে বিরোধের সমাধান।

(খ) দিবসই বহুড়ী কাগডরে ভায়।
রাতি ভইলে কামরু জায়॥ (২)

— দিনের বেলায় বধূটি কাগের ভয়ে ভীত, রাত্রিতে সে কামরূপ যায়। দিনের বেলায় ভীরু বধূ রাত্রিতে দুঃসাহসিকা। এখানে গুণ ও ক্রিয়ার বিরোধ। কিন্তু এই বধূ সামান্য বধূ নহে। ইনি পরিশুদ্ধাবধূতিকা। ইনি একদিকে নিজেই সংবৃত্তি সত্য উৎপন্ন করিয়া কালপুরুষের ভয়ে ভীতা হন। আবার প্রজ্ঞাজ্ঞানে সেই সেই বিকল্পকে ধ্বংস করিয়া নির্বিকল্প মহাসুখস্থানে গমন করেন। অবধূতিকার এই মহিমা স্মরণে বিরোধের অবসান।

৩৩ সংখ্যক গানের 'বেগ সংসার বড়ইল জাঅ', 'বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে', 'জো যো চোর সো দুধাঁ', 'নিতি নিতি বিআলা ঘিঁহে বম জুঝঅ'—উক্তিগুলিও বিরোধাভাসের আপাত বিস্ময় এবং শ্লিষ্টার্থেবিস্ময়ের সমাধানে চিত্ত চমৎকারী। তাই বলিতেছিলাম, সন্ধ্যাশব্দগুলি অশ্লীল নহে, ইহাদের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যাহাকে বীজরূপে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানানন্দসুন্দর সিদ্ধ সাধকগণ সহৃদয়ের আহ্লাদকর কাব্যালঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যের ইতিহাসের স্বরূপ

জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রত্যেক বিষয়েরই দুটো দিক আছে—একটা তার তত্ত্বের দিক বা তার 'ফিলসফি', আর একটা তার তথ্যের দিক—তার 'হিস্টরি'। এই 'ফিলসফি' ও 'হিস্টরি' দুটিই বিজ্ঞান। আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি পরস্পর বিরোধী মনে হলেও বস্তুত তা নয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই যুগে এই দুটি বিজ্ঞান যে গুরুত্ব লাভ করেছে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এইজন্যেই দেখি সব বিষয়েরই যেমন ফিলসফি তেমনি 'হিস্টরি' আলোচনার প্রয়াস। বিষয়বিশেষের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। যে আলোচনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত তা কখনো সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ হতে পারে না এবং তা ব্যক্তিগত মত, ভ্রান্ত ধারণা ও অনুমানের ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে না।[১] এই কারণেই যেমন দর্শনের ইতিহাস তেমনি ইতিহাসেরও দার্শনিক আলোচনার আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছে। ইতিহাসের তত্ত্বালোচনার (ফিলসফি) স্বরূপ নির্দেশের প্রয়াস বিশ্বসাহিত্যের বর্তমান শতকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

দেশ-বিদেশে দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। তার সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নেই। কিন্তু ইতিহাসেরও দর্শন? কোন কোন প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিক হয়ত তেমন সহজে একে স্বীকার করে নিতে পারেন না। এমন কি ইতিহাস দর্শনের আলোচনা তাঁদের কাছে ছেলেখেলা বলে মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু দার্শনিক মতবাদগুলিকে যখন যুক্তির সাহায্যে সুবিন্যস্ত করে তার ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছে, ইতিহাসের বিষয়কেও তেমনি যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে তার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব, আর তা-ই হচ্ছে ইতিহাসের দর্শন—তার ফিলসফি।

ইতিহাসের দার্শনিক আলোচনার, তার স্বরূপ নির্দেশের সার্থকতা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আমরা অবহিত ছিলাম না। তার অনিবার্য পরিণামস্বরূপ ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা কত অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত ছিল তা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ইতিহাস সম্পর্কে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে এর মুখ্য উপজীব্য একমাত্র রাজনীতি। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস দীর্ঘকাল তার উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি এবং তার ফলস্বরূপ রাজনীতি ব্যতীত অন্য বিষয়ের ইতিহাস আলোচনার উৎসাহও প্রকাশিত হয়নি। আজ আর আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে ইতিহাস সব বিষয়েরই হতে পারে এবং বিষয়বিশেষের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্যে তা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাধারার ইতিহাস অষ্টাদশ শতকের অন্যতম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তে প্রকৃত ইতিহাস চেতনার আবির্ভাব। ইতিহাস সম্পর্কে এই নবতম চিন্তাধারার প্রভাব বাংলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছে শতাব্দীকাল পরে—উনিশ শতকে।

ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ ধারণার অভাবজনিত আর একটি পরিণাম এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। দীর্ঘকাল ইতিহাস এমনভাবে আলোচিত হয়ে এসেছে যেন নীতিশিক্ষাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘটনাপুঞ্জ ও

১. Philosophy is a Science, dealing with the nature of things in general, and where there is no serious philosophy, where philosophy is not the main interest, there is likely to be a reign of anarchy, of mere of opinion, guesses at truth and a great chance of false Rhetoric.

W. P. Ker—*On Modern Literature*, Oxford, 1955, P 272

CENTRAL LIBRARY

দৃষ্টান্তসমষ্টির সাহায্যে তা থেকে ইতিহাস যেন শিক্ষণীয় দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং অতীতে মানুষ যে মুখ্যত ঐ উদ্দেশ্যেই রাজনীতিক ইতিহাস চর্চায় উৎসাহিত হোত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাস পাঠ করবো কেন? এর উত্তর সেকালের পাঠকদের কাছে অতি সহজ। সেই উত্তরই প্রতিফলিত হয়েছে মহাজ্ঞানী সলোমনের বাণীতে—জলে যেমন মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি একজনের হৃদয়ও আরেকজনের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ ইতিহাসের নানাজনের দোষগুণের আলোচনার দ্বারা শিক্ষপ্রাপ্ত হয়ে আমরা নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। কিন্তু এই যদি ইতিহাস হয় তাহলে স্পষ্টতই এর কোন মূল নেই—এ একরকম পরগাছা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের চিত্তে এ জাতীয় ইতিহাসচর্চা জাগিয়ে তুলেছে বিতৃষ্ণা। ডক্টর জনসন বলেছিলেন,—প্রকৃত ইতিহাস—সত্যিকারের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা আমরা কত অল্প পেয়েছি তা ভেবে দেখা উচিত। ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হলেই তা ইতিহাস হয়ে ওঠে না। তার জন্যে আবশ্যক বিষয়বিশেষের গভীরে প্রবেশক্ষম অন্তর্দৃষ্টি। কারণ, ইতিহাসতো শুধুই পরিবর্তনধারার বিবৃতি নয়। সেই বিবরণ হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান। তাই যেখানে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত তা কখনোই যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

সাহিত্যের ইতিহাস ও রাজনীতিক ইতিহাসের বিবরণ সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। সাহিত্যের ইতিহাসে তা অপরিহার্য নয়। কারণ সাহিত্যের ইতিহাস অনেকটা প্রদর্শনশালার মতো। প্রদর্শনশালার বস্তুগুলি সুবিন্যস্ত না হলেও তার দ্বারা লাভবান হওয়া সম্ভব। কারণ বস্তুগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবেই পরীক্ষা করা যায়। ঠিক তেমনই সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত না হলেও তার দ্বারা কোন লাভ হয় না এমন কথা বলা চলে না।[৩]

সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসের সার্থকতা সম্বন্ধে রাজনীতিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো যথেষ্ট আস্থাবান নন। তাঁদের মতে রাজনীতিক ইতিহাসই মুখ্য, আর সব ইতিহাস গৌণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সাহিত্য বা শিল্পকলার বিষয়বস্তুও যে বুদ্ধিজাত এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ফলে ঐসব ইতিহাসে যে সব পরিবর্তনের উল্লেখ থাকে, তা-ও কোন বুদ্ধিজাত নিয়মেই আবদ্ধ বলে মনে করা যেতে পারে। ফলে সাহিত্যিক বা শিল্পকলাবিষয়ক পরিবর্তন সমকালীন রাজনীতিক পরিবর্তনের যদি অনুরূপ হয় তাহলে রাজনীতিক পরিবর্তনগুলি অর্থাৎ সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তুগুলি নিশ্চয়, অন্তত কিছু পরিমাণে বুদ্ধিজাত ও সেই একই নিয়মের অধীন।[৪] কাজেই রাজনীতিক ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যের ইতিহাসের সার্থকতা কিছুমাত্র আবদ্ধ নয়। রাজনীতির ইতিহাসে সাহিত্যের ইতিহাসেরও অনেক উপাদান থাকে।

২. History of this sort is parasitic with no proper root of its own.

W. P. Ker—*Collected Essays*, Vol, II, London 1925, P 293

৩. Literary History is like a museum, and a museum may be of use even if ill arrranged; the separate specimens may be studied themselves.

W. P. Ker—*On Modern Literature*, Oxford, 1955, P 265

৪. .....as there matter itself is intellectual, so the changes they record (One would suppose) must be under some laws of intelligence, and if the changes, of literary or artistic fashion correspond to political changes, then the political changes—the matter of ordinary history—must be to some extent under the same intellectual law.

W. P. Ker—*Collected Essays*, Vol, II, London, 1925, PP 300-301

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসেও কি রাজনীতিক ইতিহাসের উপাদান থাকে না? কাজেই দুটিই অনেকক্ষেত্রে পরস্পরের মর্যাদা দান না করার পক্ষে কোন যুক্তি।

রাজনীতিক ইতিহাসের যেমন, সাহিত্যেরও তেমনি একটা তত্ত্বের (Philosophy) দিক আছে, দীর্ঘকাল এ বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম না। সাহিত্যতত্ত্ব (Poetics বা Theory of Literature) বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে দীর্ঘকাল থেকে রচিত হয়ে এসেছে। এর সার্থকতাও যথোচিত স্বীকৃতিলাভ করেছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসেরও যে একটা তত্ত্বের দিক থাকা সম্ভব তা বুঝতে আমাদের অনেকদিন লেগেছে। তার কারণ মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে সাহিত্যের ইতিহাসের আবির্ভাব দীর্ঘ-বিলম্বিত। যার অস্তিত্বই নেই, তার তত্ত্বজিজ্ঞাসা সম্ভব নয়। এর অনিবার্য পরিণামস্বরূপ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না, আর সেই কারণেই সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলে এ বিষয়ে যে সব মত ও ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা কম কৌতূহলজনক নয়।

সাহিত্যের ইতিহাসের আবশ্যকতা কি? সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার সার্থকতা যদি থাকে তা হলে সাহিত্যের ইতিহাসও অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা সম্ভব নয়। আবার সাহিত্যের ইতিহাসেও বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও মূল্যায়নে সাহিত্যিক বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। তাই সাহিত্যের ইতিহাস থেকে সমালোচনাকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। সমালোচনা ব্যতীত শুধু সাহিত্যের ইতিহাসই নয়, সাহিত্য-তত্ত্বেরও উদ্ভব সম্ভব নয়। ভাষা যেমন ভাষাতত্ত্বেরও অবলম্বন, সাহিত্যও তেমনি সাহিত্যতত্ত্বের অবলম্বন। সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ মূল্যায়নের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সাহিত্যতত্ত্ব। তাই সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের ইতিহাস—এই তিনের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এদের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সাহিত্যসমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাস পরস্পর নিরপেক্ষ। কারণ এই দুইয়ের উদ্দেশ্য, আলোচনা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সাহিত্যের ইতিহাসের বিচার তার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগ-সম্পর্কের বিচার, আর সমালোচনার বিচার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার। আর একদিক দিয়েও এই দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

সাহিত্যের ইতিহাসে সমালোচনা থাকলেও সে সমালোচনার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সে সমালোচনা লেখকের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ নয়—বিভিন্ন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যবিশেষকে দেখতে হয় তার সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নাহলে তার প্রতি ঐতিহাসিক সুবিচার করা হয় না। কথাটা যুক্তিসম্মত সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যত তা কতদূর সম্ভব তা বিচার্য।[১] কারণ, অতীত বিষয়বস্তুর সমালোচনা-কালে বিশ শতকের আমরা কি এক কথায় বিগত সেই যুগে চলে যেতে পারি? অতীতের সাহিত্য আলোচনাকালেও তাই একালের ভাষা, একালের ভাব-ভাবনা ও তার প্রভাব থেকে আমাদের সমালোচনাকে মুক্ত রাখা সম্ভব নয়। অতএব সার্থক সমালোচনায় সেকালের ও একালের উভয়কালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য। শুধু তাই নয় রচনাবিশেষের সমালোচনাকালে তার কাল ও বর্তমান কালের অতিরিক্ত আরো কোনো কালের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা যদি সম্ভব হয় তাহলে আরো ভালো, কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্যের ইতিহাসকে সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট করে দেখবার স্বপক্ষে যে সব কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলির মূলে যথেষ্ট যুক্তি নেই। কোনো সাহিত্যের এমন কোন

১. Rene Wellek and Austin Warren—*The Theory of Literature*, London, 1961, P 34.

CENTRAL LIBRARY

ইতিহাসও এ পর্যন্ত লেখা হয়নি যাতে বিষয়বস্তু নির্বাচনের কোনো নীতি নেই বা সাহিত্য বিশেষের স্বরূপ নির্দেশ বা মূল্যায়ন করা হয় নি।

অপরপক্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত কোনো সমালোচনাই সার্থক হোতে পারে না।[৬] স্বীকার করতেই হয় এক্ষেত্রে যেন একটা যৌক্তিক বৃত্ত রচিত হয়েছে—ইতিহাসের ধারাকে বিচার করতে হবে সাহিত্যিক মূল্যায়নের দ্বারা অথচ সেই মূল্যায়নের মানদণ্ডের উদ্ভব সাহিত্যের ইতিহাস থেকেই।

একাধিক কারণে সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। প্রথমত, রাজনীতিক ইতিহাসের উপাদানের মতো সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে অতীতের বস্তু নয় সেগুলি একালেও বর্তমান। রাজনীতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে অতীতের বস্তু। সেগুলি একালের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়। ফলে সেগুলির সম্বন্ধে দলিল, সাক্ষ্য, প্রমাণ, অনুমানেই সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন উপায় নেই। কিন্তু সাহিত্যের বিষয়বস্তু তা নয়। অতীতের রচনাবলী একালেও বিদ্যমান এবং সেই কারণে একালেও সেগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, দেখা সম্ভব। এইজন্যেই পাশ্চাত্যসাহিত্যের সমালোচকবিশেষ মন্তব্য করেছেন—রাজনীতিক ইতিহাসের সঙ্গে যে শিল্পকলার ইতিহাসের মৌলিক পার্থক্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।[৭] যা ঐতিহাসিক ও অতীত তার সঙ্গে যা ঐতিহাসিক অথচ এখনো বর্তমান, তার পার্থক্য আছে। এবিষয়ে সচেতন না হলে সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কখনোই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, কবিবিশেষের রচনার মূল্যায়নে ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভার যথোপযুক্ত গুরুত্ব দান করা। কবিমাত্রই একটা ঐতিহ্যের অধিকারী।[৮] কোন শিল্পকলায় কোন শিল্পীই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু স্বনির্ভর না হলেও সার্থক শিল্পীমাত্রেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কবি-বিশেষের রচনার স্বরূপ বিশ্লেষণের ব্যাপারে এই দুই পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যের কোনটির উপর কতখানি গুরুত্ব দান করা আবশ্যক তা নির্ণয় করাই সাহিত্যের ইতিহাসের একটা দুরূহ সাধনা।[৯]

সাহিত্যের ইতিহাসের আরেকটা সমস্যা এর পর্ববিভাগ। আলোচনার সুবিধার জন্য ইতিহাসের বিষয়টিকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিতেই হয়। কিন্তু কোন নীতি অনুসারে এই বিভাগ আবশ্যক। সেই নীতিটি কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এক, শতক বা দশক হিসাবে কালবিভাগ করে—যেমন ষোড়শ শতক বা সপ্তদশ শতক ইত্যাদি। দুই, রাজনীতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে—যেমন চৈতন্যযুগ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ ইত্যাদি। তিন, সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে—যেমন অনুবাদ শাখা, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কোনটি সর্বাধিক সন্তোষজনক ও অবলম্বনযোগ্য? এবিষয়ে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সাহিত্যের ইতিহাসই

৬. ঐ পৃঃ ১৯৯

৭. ঐ পৃঃ ১৯৯

৮. T. S. Eliot—*Selected Prose*, Penguin Books, 1955, P 23.

৯. The great difficulty in the history of Literature is to give the proper amount of attention to the fashion, tradition, the school, on the one hand, and to the other on the writer himself. No writer is self-supporting, but every writer is individual in his work, and each of the works is individual if of any value at all. And one the things that make the study of literature a serious thing worth doing, is just this contradiction between the individual and the general.

W. P. Ker—*Form and Style in Poetry*, ed. by
R. W. Chambers, London, 1946, P 145.

CENTRAL LIBRARY

আমাদের মুখ্যত আলোচ্য। কাজেই সাহিত্য-বিশেষের ইতিহাস আলোচনাকালে তার ক্রমাভিব্যক্ত রূপটির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উল্লিখিত যে কোনো পদ্ধতিতে পর্ববিভাগ করা যেতে পারে। ষোড়শ শতক বা উনিশ শতকের সাহিত্য নামে সাহিত্য-বিশেষকে চিহ্নিত করতে কোনো বাধা নেই যদি সেইকালের স্বরূপ-প্রকাশক তা হয়। অর্থাৎ এইরকম বিভাগ যদি সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়। রাজনীতিক বা সাহিত্যিক দিক দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয় বিভাগ সম্পর্কেও সেই একই কথা।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার অসুবিধা অনেক। তবু একথাও সত্য যে তা থেকে বিরত থাকা একালে আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বুদ্ধিবৃত্তির বিস্ময়কর বিকাশের এই যুগে মানুষের মনে দেখা দিয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার বহু পরিমাণে নিবৃত্তি হতে পারে বিভিন্ন বিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা। তাই সব বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা এযুগের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। বস্তুত এযুগ ইতিহাস-সচেতনতার যুগ। এই যুগচেতনার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যত দুরূহই হোক সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় সব দেশের সাহিত্যেই অপরিসীম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্রনাথ : খ্যাতির বিড়ম্বনা

জীবেন্দ্র সিংহরায়

সপ্ততিতম জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের 'খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহরের' কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই খ্যাতিহীনতার দিনে তিনি প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনছায়ায় নিজের আনন্দে আকাশকুসুমের মালা গাঁথবার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি।' রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি একদিন যে মিঠেকড়া সমালোচনার মুখোমুখী হয়েছিলো, যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হলাহল জমিয়ে তুলেছিলো তা নিয়ে কবির অনেক দুঃখ ছিলো একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রেমিক পাঠক সাধারণের স্নেহের অত্যাচার যে মাঝে মাঝে তাঁর জীবনে দুর্বিষহ হয়ে উঠতো সেকথা আমরা সাধারণতঃ মনে রাখি না। সেই অত্যাচার বিরোধীদের অসম্মাননার চেয়ে কম বিড়ম্বনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে সৃষ্টি করে নি।

রবীন্দ্রনাথ ১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' লেখেন। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, এ রচনার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ছিলো। কৌতুক-নক্সাটির নায়ক উকিল দুকড়ি দত্ত এক চাদর-ওয়ালার ষড়যন্ত্রে হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত খ্যাতির টানে তার গলার চাদর নিয়ে টানাটানি পড়েছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বয়ং বিধাতাপুরুষ—তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন তিনটি দুর্লভ সম্পদ। কবি দীনেশশরণ বসুর মতো অনেকে কবিকে প্রথম ভালোবেসেছিলেন তাঁর দেবকান্তি চেহারা দেখে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাঙালীর দুর্নিবার আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তাঁর অতুলনীয় হস্তাক্ষর। শুনেছি রবীন্দ্রানুরাগী এক প্রখ্যাত হেডমাষ্টার কবির হস্তাক্ষর নকল করতে ছাত্রদের শেখাতেন। আর তার ফলে বিভ্রান্তিরও যে সৃষ্টি হতো না এমন নয়। একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সব ছাত্রের একই রবীন্দ্র-ছাঁদের হস্তাক্ষর দেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ করে রাখা সেকালে একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ লেখনীর সর্বব্যাপী প্রভাব তো ছিলোই—রবীন্দ্রনাথের মতো লিখবো এটা একসময়ে বাংলাদেশের কবিযশঃপ্রার্থীদের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ফলে ভালো-মন্দ নানাধরণের লেখাই দেখে দেওয়ার অনুরোধ আসতো রবীন্দ্রনাথের কাছে। এবং তা নিয়ে কবির অনবসর জীবনে অযাচিত যন্ত্রণার অন্ত ছিলো না।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তেমন অবারিত ছিলো না। কিন্তু যেদিন সুইডিস একাডেমীর বার্তা বাংলাদেশে এসে পৌঁছলো তিনি সেদিন দেশবাসীর কাছে হয়ে উঠলেন সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। তার আগেও অবশ্য কোনো কোনো মহলে তিনি সাংস্কৃতিক অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে টেনে একেবারে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলো। বালবিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে কোনও অভিভাবক হয়তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—তিনি কি আর করেন, হলেন রবীন্দ্রনাথের

CENTRAL LIBRARY

শরণাপন্ন। দুর্বিনীত পুত্রকে নিয়ে কোনও পিতা হয়তো বিড়ম্বিত, তিনি ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে তুলে দিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে। কোনও স্বল্পশিক্ষিতা বিধবা হয়তো শোকের প্রাবল্যে ভাঙা-চোরা ছন্দে লিখলেন কাব্য—তার সংশোধনের দায়িত্বও কবিকে নিতে হয়েছে। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের উপর দাবী যেন সকলের এবং সে দাবী এড়িয়ে যাওয়ার অধিকার যেন তাঁর নেই!

এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু গ্লানিবোধ করেছেন। কখনও সানন্দে এ জাতীয় দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি একথা বলছি না, তবে অনেকসময় শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি তিনি স্পষ্টতঃই অনুভব করেছেন। খ্যাতির বিড়ম্বনায় দুকড়ি দত্ত মামার বাড়ী পালিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু দীর্ঘজীবী রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ছাড়া পালাবার কোনও পথ ছিলো না। মৃত্যুর দুবছর আগে যখন তিনি জরাজীর্ণ তখনও নিত্য তাঁকে অনুরাগীদের ভালোবাসার অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তার একটি প্রমাণ পাই উত্তরা সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী মশাইকে লেখা এবং এযাবৎ অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে। চিঠিটি হুবহু উদ্ধৃত করছি—

৬

'UTTARAYAN'
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

দাবীর ফর্দ :

১ পোলিটিক্যাল মীটিঙে উপস্থিতি কিম্বা আশীর্বাণী
২ তরুণচালিত পত্রিকার জন্য কবিতা
৩ শ্লোকসম্বলিত অটোগ্রাফ
৪ জন্মান্তর আছে কিনা সে সম্পর্কে মত প্রার্থনা
৫ সুপারিস পত্র
৬ পাগল আমাকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করেছে, তার পরিবর্তে রেজেষ্ট্রি রসিদ প্রার্থনীয়
৭ শরীর কেমন আছে অবিলম্বে জানানো
৭ নবজাতার নামকরণ
৮ নবদম্পতির পরিণয়মঙ্গল
৯ আমার কাব্যের দুরূহ অংশবিশেষের ব্যাখ্যা
১০ আমার সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হতে পারে তার তারিখ জ্ঞাপন
১১ কবিতা সংশোধন
১২ কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত
১৩ ২২০০ টাকা ঋণের অত্যাবশ্যকতা ইত্যাদি ইত্যাদি—এর পরেও আমার শতায়ু কামনা।

ইতি
১১।৬।৩৯

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

CENTRAL LIBRARY

এ চিঠিতে জনসাধারণের দাবীর যে ফর্দ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তা খুবই কৌতূহলজনক। দাবীর বোঝা একজন বৃদ্ধ মানুষকে মারবার পক্ষে যথেষ্ট, অথচ দাবীদাররা কবির শত্যু কামনা করতেও দ্বিধা করেনি। এটা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ৬ নং দাবীটি লক্ষণীয়। এক পাগল রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে প্রায়ই বলতো সে তার সমস্ত সম্পত্তি কবিকে দান করে দিয়েছে কিন্তু কবির কাছে তার রেজিষ্ট্রি রসিদ পাওনা আছে। সুস্থ মানুষের অত্যাচার কবির জীবনে তো ছিলোই, এমন কি পাগলের অত্যাচার থেকেও তিনি রেহাই পান নি। ১৩ নং দাবীতে দেখছি ধনী রবীন্দ্রনাথের কাছে ২২০০ টাকা ঋণ পাওয়ার দাবী। আর সে দাবী তিনি পূরণ করবেনই বা না কেন, তিনি যে রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন!

এতে রবীন্দ্রনাথের মন কতখানি বিরক্ত ও বিচলিত হতো তা অনুমান করা অসাধ্য নয়। সেই মানসিক বিরক্তিতেই তিনি ৭নং দাবী দুবার উল্লেখ করেছেন। শেষবয়সে যদি তিনি নতুন করে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' লিখতেন তবে রচনাটি আরও বিষতিক্ত হয়ে উঠতো নিশ্চয়ই।

CENTRAL LIBRARY

অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব

সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা

অসমীয়া সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তারা যেন ঠিক দুটি বোনের মতো। আর এই কারণেই তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই সাহিত্যিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। 'চর্যাপদ'—নামে বহুল-পরিচিত সহজিয়া বৌদ্ধদের মরমিয়া গীতিমালায় বাংলা ও অসমীয়া উভয় ভাষারই আদিতম রূপ বিধৃত। এমন কি তাতে এমন কিছু কিছু রূপ পাই যাকে বলা যেতে পারে, পূর্ব ভারতের ভাষা-বিবর্তনের প্রাক্-বাংলা ও প্রাক্-অসমীয়া স্তরের প্রতিভূ। পাঁচালী বা পাঁচালী কাব্যের ঐতিহ্য, সাধারণ ছন্দ হিসেবে পয়ার ও ত্রিপদীর প্রয়োগ, বৈষ্ণবীয় গান ও গীতিকবিতার বাহন হিসেবে ব্রজবুলির আশ্রয়গ্রহণ, মনসা-পূজা ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের বহুল প্রচলন, এগুলি হল উভয় ভাষার সাধারণ উত্তরাধিকার। চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলন পূর্বভারতের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, আসাম ও উড়িষ্যাতেও ঢুকে পড়েছিল। প্রাচীন অসমীয়া জীবনীমূলক বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ধর্মগুরুদের জীবনীমূলক সাহিত্যের একাংশে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরবর্গের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। বস্তুত তাঁদের প্রেম ও ভক্তির তত্ত্ব পশ্চিম আসামে অনেক অনুগামীকেই খুঁজে পেয়েছিল। কুসান গান এবং ভারিগানের মতো উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম আসামের কিছু কিছু জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব ও নাট্যানুষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে নিকট সাদৃশ্য রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের আগে অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রায় কোনো প্রভাবই পড়ে নি। কিন্তু তারপর থেকেই অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাঙালী কবি ও ঔপন্যাসিকদের প্রভূত প্রভাব পড়তে শুরু করে। এই সূত্রে গত শতাব্দীর শেষ দিকে ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনুভূত হবার আগেই বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন একজন সমর্থক খুঁজে পেয়েছিল গুণভিরাম বড়ুয়ার মধ্যে। গুণভিরাম বড়ুয়া ১৮৫৭-র সমাজে ব্রাহ্মণ বিধবার সমস্যা নিয়ে অসমীয়া ভাষায় প্রথম ট্র্যাজিক নাটক 'রাম-নবমী' প্রণয়ন করেন। এই নাটকে বিদ্যাসাগর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়ে বিধবা বিবাহের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আসামে যেহেতু কোনো কলেজ বা উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না, তাই উচ্চতর শিক্ষাভিলাষী অসমীয়া যুবকদের অধিকাংশই তখন কলকাতায় পড়তে আসতেন। এখানে তাঁরা শুধু বিকচোন্মুখ বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শেই এলেন না, ইয়ং বেঙ্গল এবং অন্যান্যদের নানা সংস্কার-আন্দোলন প্রত্যক্ষও করলেন। এইসব আন্দোলনের উর্বরক্ষেত্র ছিল প্রাণচঞ্চল, গতি-কল্লোলিত তদানীন্তন কলকাতা নগরী। কলকাতা ঐ সব অসমীয়া যুবকদের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করল, তাঁদের সাহিত্য-জীবন গঠন করে তুলতে লাগল। তাঁরা বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সান্নিধ্যে এলেন। ঐ সব লেখকদের সৃষ্টি ও স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা তাঁদের কল্পনাকে জাগিয়ে দিল। এইভাবেই তাঁদের উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র কলকাতা অসমীয়া সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্ভবক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল, যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের দিকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করেছিল।

নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বাঙালী লেখক যিনি তরুণ অসমীয়া লেখকদের এক মুগ্ধতার জালে

CENTRAL LIBRARY

জড়ালেন। প্রথানুগত পয়ারের বদলে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও মেঘনাদ-বধ কাব্যে তাঁর পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মৌলিক রূপায়ণ আসামের উদীয়মান কবিদের বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল। ভোলানাথ দাস ও রমাকান্ত চৌধুরী, যাঁরা গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যথাক্রমে 'সীতাহরণ কাব্য' ও 'অভিমন্যু বধ কাব্য' রচনা করেছিলেন, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের কাব্য দুটির কিছু কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতিকেও মধুসূদনের কাব্যের অনুরূপ ঘটনা ও পরিস্থিতির আদলে গড়ে তুললেন। ভোলানাথ দাস তাঁর সীতাহরণ কাব্যের প্রস্তাবনায় ঐ বিখ্যাত বাঙালীকবির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করলেন এইভাবে—

সেই রামায়ণ গীত,
গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় আকিঞ্চন
অমিত্র-অক্ষর ছন্দে, হে মাতঃ বাগ্দেবী!
যি ছন্দে গাইলা বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে অতি প্রিয়পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি।

ভোলানাথ দাসের সমসাময়িক কবি রমাকান্ত চৌধুরীও মধুসূদনের কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত তাঁর অভিমন্যুবধ কাব্যে তিনি অভিমন্যু ও উত্তরার চরিত্রাঙ্কনে মেঘনাদ ও প্রমীলা চরিত্রের কাঠামোকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন।

চন্দ্রধর বড়ুয়ার দুটি পৌরাণিক নাটক, মেঘনাদবধ ও তিলোত্তমাসম্ভবকে মধুসূদনের দুটি কাব্যের নাট্যরূপান্তর বলা যেতে পারে। চন্দ্রধর বড়ুয়া তাঁর নাট্যপরিকল্পনা-অনুযায়ী আখ্যানবস্তুকে রূপায়িত করার অভিপ্রায়ে মূল কাব্যদুটির অনেক ঘটনা ও দৃশ্য যদিচ বর্জন করেছেন তবু মধুসূদনের রচনার সামগ্রিক প্রভাব তাঁর নাটকদুটিতে খুবই প্রকট। চন্দ্রধর বড়ুয়া মধুসূদনের কাছে কতটা ঋণী তা স্পষ্ট হবে যদি নাটক ও মহাকাব্যের প্রমীলার উক্তি পাশাপাশি রাখা যায়:

কি কোরা বাসন্তী,
সাগরত পরো বুলি
ওলাই যেতিয়া নদী পর্বত বিদারি
কার সাধা রোধে তার গতি?
রক্ষর রোরাবী মই, দানবজীয়াবী
মেঘনাদ স্বামী মোর বারণ শহর
মইনো করোনে ভয় ভিক্ষুক বামক?
—চন্দ্রধর বড়ুয়া

কি কহিলি, বাসন্তি! পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি রক্ষ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি; ভিখারী রাঘবে?
—মধুসূদন

মধুসূদনের কাব্য থেকে আখ্যানবস্তু, ঘটনা ও চরিত্র গ্রহণ করলেও চন্দ্রধর বড়ুয়া কিন্তু তাঁর নাটকে মধুসূদনের চৌদ্দ অক্ষরের অমিত্রাক্ষর ছন্দ গ্রহণ করেন নি। গৈরিশ ছন্দের মতো একপ্রকার ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের প্রভাব ক্রমশ ক্ষয় পেতে শুরু করল। বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া কবি ও নাট্যকারদের রচনায় মধুসূদনের প্রভাব প্রায় অদৃশ্য।

CENTRAL LIBRARY

মধুসূদনের পরে অসমীয়া লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন বঙ্কিমচন্দ্র। আসামের পথিকৃৎ-ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলই তাঁর আত্মজীবন-কাহিনীতে স্বীকার করেছেন যে তিনি যখন কলকাতায় বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন, তখন একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ও ওয়াল্টার স্কটের মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে তাঁর মাতৃভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করবেন। সাতটি ঐতিহাসিক ও একটি সামাজিক উপন্যাস লিখে রজনীকান্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন। ১৯০১-এ লেখা তাঁর 'মনোমতী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রভাব বেশ স্পষ্ট। রজনীকান্তের ১৮৯৪তে লেখা 'মিরি-জীয়ারী' উপন্যাসে মিরি-উপজাতির সমাজ-জীবনের নানা অন্যায়-অবিচার চিত্রিত হয়েছে। মিরিদের সমাজে প্রেমিক-প্রেমিকার পথ সবসময়ই সামাজিক বিধিনিষেধ ও অনড় প্রথার বিরোধিতায় বিঘ্নসঙ্কুল। রজনীকান্ত 'মিরি-জীয়ারী' লেখেন সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস-পাঠে অনুপ্রেরিত হয়ে। 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের যে ভাবাদর্শ প্রকাশ পেয়েছে তারই অবিকল প্রতিধ্বনি শুনি 'মিরি-জীয়ারী'র শেষে :

> আমার হতভাগিনী মিরিজীয়রীর দুখলগা কাহিনী খতম করিলোঁ। আশা করোঁ ইয়াতে এতিয়াবপরা মিরির ঘরে ঘরে সুফল ফলিব।
>
> —এর সঙ্গে মেলানো যাক বিষবৃক্ষের গ্রন্থসমাপ্তি : আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী তরুণ অসমীয়া লেখকদের অন্তরে দেশপ্রেমের অনুভূতি পরোক্ষভাবে সঞ্চারিত করেছিল। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ যে হিউমারবোধের প্রকাশ দেখা যায় তা-ই স্বর্গত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়াকে সমসাময়িক জীবনের সামাজিক অনাচার, ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি ও উৎকেন্দ্রিকতা উদ্ঘাটন করে এক কৌতুকাশ্রিত প্রবন্ধমালা লিখতে পরোক্ষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের ভূমিকার কথা এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিরর্থক। এইপ্রসঙ্গে শুধু বলতে পারি যে যদিচ সমস্ত শিক্ষিত অসমীয়া ব্যক্তিই বাংলা ভাষা ভালোভাবে বোঝেন, তবু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনাই অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অসমীয়া নাট্যকারদের উপর গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। ঐ দুই নাট্যকারের কয়েকটি নাটক কিছু পরিবর্তনসহ অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। উপরন্তু তাঁদের অঙ্ক ও দৃশ্য-বিন্যাসসহ উপস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত অসমীয়া নাট্যকারদের কয়েকজনের কাছে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটক এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক নাটক-রচনার আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্মাদনা, স্বদেশপ্রেম, ভাবাবেগের আতিশয্য, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা, কাকতালীয় অতিপ্রাকৃতিকতা—যা কিছু বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার কয়েকটি দশকের অসমীয়া নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য ছিল, সবই একদিকে এলিজাবেথীয় নাটক ও অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা নাটকের উত্তরাধিকার। সম্প্রতিকালে আসামের ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার ও যাত্রাসম্প্রদায়গুলি আসামের নাট্যামোদী জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে শচীন সেনগুপ্ত ও মহেন্দ্র গুপ্তের কয়েকটি নাটককে ভাষান্তরিত করে নিয়েছে।

অসমীয়া কবি ও নাট্যকারদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সূক্ষ্ম ও গভীর। সাহিত্য একাদেমী ও অন্যান্য প্রকাশন সংস্থার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি ইতোমধ্যে অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রভাব এতই ব্যাপক যে এমন একজন শিক্ষিত অসমীয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া শক্ত যে মহাকবির লেখার অন্ততঃ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে শোনাতে না পারে। উপন্যাসিক হিসেবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কারও উপরই

CENTRAL LIBRARY

পড়ে নি। তাঁর নাটকের অনুরক্ত পাঠকসংখ্যাও সীমিত। তাঁর নৃত্যনাট্য সম্ভবত কীর্তিনাথ বরদলই ও মুক্তিনাথ বরদলইকে 'বাসন্তীর অভিষেক', 'স্বরবিজয়' এবং 'মেঘাবলি'র মতো নৃত্যনাট্যরচনায় অনুপ্রেরিত করেছে। পার্বতী-প্রসাদ বড়ুয়ার 'সোনার সোলেং'-এর মতো সাঙ্গেতিক নাটকের পেছনেও রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্গেতিক নাটকের প্রবর্তনা নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার ক্ষুদ্র কবিতার সঙ্কলন 'রেণুকা' এবং পদ্মনাথ গোহাঁই বড়ুয়ার 'জুরনি'র কয়েকটি কবিতার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' ও 'ক্ষণিকার' ক্ষুদ্র কবিতানিচয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গি যারা বহুলভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন কবি রত্নকান্ত বরকাকতি। তিনি শুধু অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কতিপয় সুপরিচিত কবিতার অনুবাদই করেন নি, অসমীয়াভাষায় রাবীন্দ্রিক ছন্দ নিয়েও সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাব, প্রকাশরীতি, চিত্রকল্প এবং এমন কি শব্দ-সম্ভারের প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। নলিনীবালা দেবীর 'সন্ধ্যার সুর' ও 'স্বপোনর সুর' কাব্যদুটিতে যে মরমিয়া অনুভূতি অভিব্যক্ত এবং তাঁর কবিতায় যে ললিতমধুর ভাষাবিন্যাস তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়ই সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মরমিয়া উপলব্ধি ও স্বকীয় উপস্থাপন-পদ্ধতি দিব্যপ্রভা ভরলির কবিতার উপরও কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। তাঁর 'মালঞ্চ' ও 'অপর্ণা' এই দুটি কবিতা-সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম প্রভাব অনুভব করা যায়।

আধুনিক অসমীয়া কবিতার রোমান্টিক যুগ প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল এবং যুদ্ধের বছরগুলিতে ও তার পরবর্তী কিছুকাল অসমীয়া কবিতার ক্ষেত্রে বিরাজ করতে লাগল এক অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিগত প্রবণতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক নতুন অসমীয়া কবিগোষ্ঠী দেখা দিলেন যাঁরা পুরোনো রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর স্থান অধিকার করে নিলেন। এই নতুন কবিগোষ্ঠী প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন একদিকে টি. এস. এলিঅট, ডব্লু. এইচ অডেন, সি. ডে. লুইস প্রভৃতির মতো ইংরেজ কবিদের কাছ থেকে, অন্যদিকে বাংলা কবিতার রাজ্যে যাঁরা নবযুগ এনেছিলেন, সেই জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির কাছ থেকে।

বাংলা সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের একমুখী গতি এখনও অব্যাহত। আসামের অধিবাসীদের এক বৃহদংশ বাংলা ভাষাভাষী, কিন্তু অসমীয়া-সাহিত্য তাদের মনের উপর কোনো ছাপই ফেলতে পারে নি।

মূলে এই প্রবন্ধটি ইংরেজীতে লেখা, বাংলায় ভাষান্তর করেছেন অরুণকুমার ঘোষ।

CENTRAL LIBRARY

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা ও তাঁর উপন্যাসের প্লট

জ্যোতির্ময় ঘোষ

১

মাধবাচার্য কহিলেন, 'মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ'।

—মৃণালিনী, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে অর্থাৎ জ্যোতিষ সম্বন্ধে কোনো নূতন বা পুরাতন তত্ত্ব বা সূত্রের ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অতিশয় সূক্ষ্ম, জটিল ও গভীর। তদুপরি বহুলাংশে বিতর্কাধীন। জ্যোতিষিগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতপার্থক্যও লক্ষণীয়। সুতরাং এইরকম একটি বিষয়ে পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তারাজির বিচার অথবা নূতন চিন্তার অবতারণা প্রবীণ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সৌখীন অনুরাগিগণের সাধ্যাতীত। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও, যিনি অসামান্য মনীষার অধিকারী ও উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুখ্য চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিক কর্তৃক 'উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মানব'রূপে পরিকীর্তিত, জ্যোতিষ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র, বিস্তৃত একটিও প্রবন্ধ রচনা করেন নি। জ্ঞান ও রসবোধের বিচিত্র ক্ষেত্রসমূহে যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ ও আত্মবিশ্বাসী সঞ্চরণ, তিনিও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসার পরিচয়টুকু উপস্থাপিত করেই নিরস্ত হয়েছেন, সে সম্বন্ধে মৌলিক পর্যালোচনার অবতারণা করেন নি। 'আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয়' বঙ্কিমচন্দ্র করতেন না, সে স্বভাব ঐতিহ্যের শিকড়হীন পল্লবগ্রাহী তথাকথিত অত্যাধুনিকতার।

কোনো কোনো প্রবন্ধজাতীয় রচনায় ইতস্তত কিছু-কিঞ্চিৎ উল্লেখ ব্যতীত জ্যোতিষ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় ভাবনাভঙ্গির পরিচয় তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যেই প্রাপ্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে এতদ্‌বিষয়ক অনুসন্ধানের প্রারম্ভে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরদান কর্তব্য। জ্যোতিষ সম্বন্ধে কৌতূহল কার নেই? প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদিগণের প্রায় সকলেই জ্যোতিষ সম্বন্ধে কৌতূহলী, অনেকেই বিশ্বাসী। বরং যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যেই অনেকে মাঝে-মধ্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতে বাধ্য হন। এখন প্রশ্ন এই, প্রায় সকলেই যদি জ্যোতিষ বিষয়ে কৌতূহলী, সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেই বিশেষভাবে এতদ্‌বিষয়ক অনুসন্ধানের তাৎপর্য কী?

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে ব্যবসায়ী মধুসূদন ঘোষালের চরিত্রচিত্রণে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যদিও জ্যোতিষে অবিশ্বাসী ছিলেন না, তবু এই উপন্যাসে জ্যোতিষপ্রসঙ্গের উপস্থাপনা ব্যঙ্গাত্মক। মধুসূদন বিচক্ষণ হ'লেও ব্যবসায়ী যে! তাই সহজেই তার ভ্রাতা, সুরসিক ও সহৃদয় নবীন জ্যোতিষীর সহায়তায় জাঁদরেল দাদাকে ঘায়েল করার কথা ভেবেছিল; মধুসূদন-কুমুদিনীর ফাটল-ধরা দাম্পত্য-সম্বন্ধকে মেরামত করার আর কোনো পথ বেচারী নবীনের জানা ছিল না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মুখ্য, অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ আকস্মিক, স্বল্প বা তাৎপর্যহীন নয়।

CENTRAL LIBRARY

একটি সার্থক উপন্যাসের কাছে আমাদের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা, তাতে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের পরিচয় থাকবে। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। গল্পরসের সহায়তায় জীবন-রস-রসিকতার পরিচয়প্রদানের জন্য উপন্যাসে একটি প্লটের প্রয়োজন। গল্পরস কম-বেশি হতে পারে, এমন কি আধুনিককালে তথাকথিত 'প্লট'বিহীন কথাসাহিত্য রচনার অত্যুৎসাহের কথা মনে রেখেও বলা যায়, 'প্লট'কে উপেক্ষা করার জন্যও আধুনিক ঔপন্যাসিকের একটি নিজস্ব 'ছাঁদ' [প্লট ?] বানিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ বাইরের খোলসটা অতিব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে বলে রুচিবদলের জন্য সেটার পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠেছে। জীবনের বহিঃপ্রাঙ্গণ থেকে জীবনরহস্যের অন্তঃপুরযাত্রার ইতিহাসই উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাস। অথচ তরল পদার্থ যেমন বিশিষ্ট আধারহীন অবস্থায় যথার্থ পর্যবেক্ষণ এবং আস্বাদনের যোগ্যই নয়, তেমনই জীবনের সূক্ষ্মতম, গভীরতম, মহত্তম বাণীটিকেও উপন্যাসশিল্পের আধারে পরিবেষণ না করলে সে-বস্তু 'নীরব কবিত্বে'র মতোই একটা অর্থহীন কল্পনামাত্র। যে কাঠ জ্বলে নি, তাকে যেমন আগুন বলা যায় না; তেমনই যে-রচনা কাহিনী-ছাঁদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল না, তাকে নিশ্চয়ই উপন্যাস বলা যাবে না। বস্তুতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীতে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে উপন্যাসের ফর্ম, তাই প্লটের গুরুত্ব নিয়ে নানা মতও দেখা দিয়েছে। কিন্তু উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে, সব ভাষার ক্ষেত্রেই, সমস্যা হয় 'প্লট' নিয়ে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আর কেউ যে সার্থক উপন্যাস-রচয়িতারূপে গৌরব দাবি করতে পারেন না, তার প্রথম ও প্রধান কারণই কি এই নয় যে, প্লট-রচনার নৈপুণ্য ছিল সেই লেখকদের আয়ত্তের অতীত ?

মনে রাখা ভালো যে, প্লট কেবল 'কৌশল'জাত নয়, প্রথম শ্রেণীর রসোত্তীর্ণ উপন্যাসের প্লট লেখকের সৃজন-প্রতিভাসম্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক, তার প্রধান কারণ, তাঁর হাতেই প্রথম বাংলা উপন্যাসের প্লট দেখা দিয়েছিল।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্যা তাঁর পরবর্তী ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের পাঠক-সমালোচকদের পক্ষে অনুভব করাও শক্ত। কারণ, দ্বিবিধ। প্রথমত, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির সঙ্গে একালের অধিকাংশ পাঠকের প্রত্যক্ষ ও ধারাবাহিক সম্বন্ধের অভাব; দ্বিতীয়ত, ইতিহাসবোধবর্জিত আবেগপ্রবণ বাঙালিস্বভাব। বিদ্যায়তন সমূহের বাইরে বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের সম্বন্ধ যেমন নিবিড় নয়, তেমনই আবার দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হ'য়ে এ কালের পটভূমিতে একশো বছর আগের লেখা ও লেখককে প্রতিপদে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা বর্তমান। তা-ও আবার স্বকালের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের মোহ ও অতীত সম্বন্ধে বিচারহীন অশ্রদ্ধা-সহ।

তা ই যদি না হত, তাহলে আজ বাঙালি লেখক-পাঠকদের একটি বড়ো অংশ [বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে এঁদের অনেকেরই কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে কি না সন্দেহ] প্লটপ্রধান উপন্যাস রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নির্বিচার ঔদাসীন্যের লক্ষ্যরূপে নির্বাচন করতেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেকালে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনও বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস দেখা দেয়নি এবং উপন্যাস রচনার প্রাথমিক ও অনিবার্য শর্তই হ'ল 'প্লট' ভাবনা।

বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই সর্বপ্রথম প্লট রচনার দিকেই মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। প্লট সৃষ্টি করতে গেলে অনন্ত জীবনপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট অংশকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে, পরিমিতভাবে নির্বাচন ও পরিবেষণ করতে হয়। সেইজন্যই জীবনসম্পর্কিত একটি দর্শন অনতিসচেতনভাবে হলেও লেখকের গড়ে ওঠা প্রয়োজন। জীবনটা এলোমেলো, বহুধাখণ্ডিত, বহুবিচিত্র হতে পারে কিন্তু সাহিত্যে তথা উপন্যাসে যখন জীবনের একটি রূপনির্মিতির প্রয়োজন হয় তখন নির্বাচন ও বর্জনের প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে।

CENTRAL LIBRARY

ঔপন্যাসিক তাই জীবন-ভাবুক, জীবনের রূপকার। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই জীবন-জিজ্ঞাসা অতিতরুণ বয়স থেকেই দেখা দিয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায়:

> 'অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি; তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।'
>
> —ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়: ঈশ্বরে ভক্তি

উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে স্বীকার করতে হবে, তাঁর জীবন-ভাবনায় ছিল 'high seriousness' - 'নিষ্ঠা, সততা ও গভীরতায় তা' ছিল পূর্ণ। কোনো ফাঁক, ফাঁকি, ভাবালুতা বা জনচিত্তজয়ী সাময়িক কলা-কৌশলের স্থান সেখানে ছিল না। জীবনের রূপকার হিসাবে 'চলতি হাতিয়ার পন্থী' তিনি ছিলেন না আদৌ। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে জ্যোতিষ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা তাঁর অতি গভীর জীবন-জিজ্ঞাসারই একটি অপরিহার্য দিক।

উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলির জীবনের প্রধান অংশের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার কথা বিবৃত ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচ্য জীবনপরিধির একটা নির্দিষ্টতা প্রয়োজন। জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তায় মানুষের আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটি সমগ্র জীবনের মূল 'ছক' বা 'প্যাটার্ন'টিকেই আমরা জানতে পারি। জ্যোতিষগণনার সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে, সংশয় ও বিতর্কের অবকাশকেও নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না, তবু জন্মপত্রিকা বা ঠিকুজি-কোষ্ঠী তৈরির প্রচলন এবং তার বিচার আলোচনা আধুনিক যুগেরও অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

ব্যক্তিবিশেষের জন্মকুণ্ডলী দেখে একজন মোটামুটি দক্ষ জ্যোতিষীও, তাঁর জীবনের অনেক কথাই সঠিকভাবে বলে দিতে পারেন। মানুষ তার তনু, ধন, আয়ু, বন্ধু, [বিদ্যা, জননী], পুত্র, শত্রু, জায়া, নিধন, ভাগ্য [পিতা, ধর্ম] কর্ম, আয় [লাভ] ও ব্যয় এই বারোটি বিষয়ের কথা জানতে পারলেই তার সমগ্র জীবনের কথাই জানা হয়ে যায়। আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে তথা চারিপাশের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ও তার স্বরূপ জানার জন্যও এই জন্মকুণ্ডলী বিচার্য। আর, যে কোনো উপন্যাস, হোক্ সে পূর্ববর্তী কালের, হোক্ সে আধুনিক জীবনের আলেখ্য—মানুষের সঙ্গে মানুষের দেহ ও মনের সম্বন্ধকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বজটিল জীবনালেখ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এক কথায়, জীবন জ্যোতিষনির্ভর—এ কথাটা যাঁরা মানেন না, তাঁরাও বস্তুগতভাবেই স্বীকার করবেন: জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু জীবননির্ভর।

মানুষের জীবনকে নিয়েই জ্যোতিষের কারবার। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, কর্মোন্নতি—এই সব সূত্রেই সাধারণত মানুষ জ্যোতিষের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বমোট বারোটি ভাব বা দিক থেকে জ্যোতিষ মানুষের জীবনকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট।

সেইজন্য, একজন নিষ্ঠাবান ও তত্ত্বজ্ঞ জ্যোতিষী মানবজীবনেরই ভাষ্যকার। একজন ঔপন্যাসিকও কি মূলত তাই নন? জ্যোতিষীর মানবজীবনভাষ্য তত্ত্বদৃষ্টিপ্রসূত। ঔপন্যাসিকের মানবজীবনভাষ্য রসদৃষ্টিপ্রসূত। এই ব্যবধানটুকু জানি এবং মানিও। কিন্তু মহৎ ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য কি তত্ত্বদৃষ্টি ও রসদৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্যসৃষ্টির প্রয়াস নয়?

CENTRAL LIBRARY

জীবন কি তত্ত্বসর্বস্ব? অথবা, রসসর্বস্ব? দু'ই নিয়েই জীবন। দু'টি দিক থেকেই অর্থাৎ সামগ্রিকভাবেই ঔপন্যাসিক জীবনের পাঠগ্রহণ ও বিশ্লেষণে নিমগ্নচিত্ত।

বলাই বাহুল্য, এ সব কথার অর্থ নয়, ঔপন্যাসিককে হ'তে হবে দক্ষ জ্যোতিষী অথবা জ্যোতিষীকে লিখতে হবে সার্থক একটি উপন্যাস। আলোচিত অংশের তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, ঔপন্যাসিক ও জ্যোতিষী উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে মানবজীবনের দ্বন্দ্বরহস্যেরই ভাষ্যকার। সমগ্র মানবজীবনের গভীর অধ্যয়নই তাঁদের লক্ষ্য।

পদ্ধতি যতই স্বতন্ত্র হোক্, দু'জনকেই মেনে চলতে হয় নিজের নিজের যুক্তিশাস্ত্র। মেনে চলতে হয়, ভিতর মহলেই বেশি ক'রে। বিতর্কের অধীন দু'পক্ষই। কারণ, দু'পক্ষের সামনেই প্রসারিত একাধিক মত ও পথ। কিন্তু লজিকের এ্যাকসিয়মের মতো ঔপন্যাসিক ও জ্যোতিষীকেও অনুসৃত পথের ঠিকানা ধরেই চলতে হবে। না হলে দাঁড়াবে গোঁজামিল। সে গোঁজামিল জ্যোতিষগণনাতেও দুর্লক্ষ্য নয়, উপন্যাসেও পর্যাপ্ত।

২

কৃত্রিম মনে হ'চ্ছে—এই বিশ্লেষণ? অথবা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অটুট, নিবিড় প্লট-বন্ধনের অসামান্যতায় স্বস্তিহীন অতি আধুনিক পাঠক-সমালোচক ভাবছেন: জ্যোতিষ উৎসাহী না হ'লে ক্ষতি কী হ'তো বঙ্কিম-উপন্যাসের? জ্যোতিষকে মেলাতে গিয়েই তো তাঁর উপন্যাসগুলি হ'য়ে উঠেছে বহুলাংশে কৃত্রিম? তা-ই মনে হবে তাঁদের, জ্যোতিষকে যাঁরা জীবনবহির্ভূত, কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পছন্দ করবেন। কুসংস্কার অথবা জীবনবহির্ভূত নয় বলেই, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনভাবনা জ্যোতিষভাবনায় সমুজ্জ্বল।

কেবল উপন্যাসাশ্রয়ী জীবনভাবনা নয়, বিশ্বজীবনের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল যুক্তিবিজ্ঞানী-সুলভ। অর্থাৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় আধুনিক। তার প্রমাণও বঙ্কিমসাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যসৃষ্টির মূলেও বঙ্কিমচন্দ্র কোনো আকস্মিকতাকে স্বীকার করেন নি। কারণ, তাঁর মতে বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। আকস্মিকতা বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা রহস্য হয়েই আছে। তবু, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক প্রখ্যাত প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সুনির্দিষ্ট অভিমত:

> 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।...সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন, সেই সব নিয়ম জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। তবু, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

অতএব, জ্যোতিষপ্রসঙ্গও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনিমন্ত্রিত অতিথির মতো আকস্মিক নয় আদৌ। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশকাল ও প্রাসঙ্গিক জীবনভাবনার সূত্রেই তাঁর উপন্যাসে জ্যোতিষভাবনার অবতারণা।

উপন্যাস নামক সাহিত্যশিল্পরূপটি সর্বাধিক বাস্তবচেতনাসমৃদ্ধ। প্রত্যহের অতীত কল্পনার বৈদ্যুতিক লীলা উপন্যাসের প্রাত্যহিক বস্তুশিলাখণ্ডটিকে প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিত করে বটে, কিন্তু উপন্যাসে বস্তুভার সর্বতোভাবেই অনুভবগম্য। 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'—এই সূত্র গীতিকবিতা এবং সমধর্মী ছোটোগল্পের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অবাধ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব-কল্পনায় সমৃদ্ধ হলেও, তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপ এতই নিখুঁত যে, তা যেন দেবশিল্পীর ঈর্ষাস্থল। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁর উপন্যাসের প্লট 'নির্মাণ' করেন নি, যেন তা সৃষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত: অথচ মুহূর্তের জন্য আমাদের 'বাস্তববোধ'-কে তা আঘাত করে না। সেই শিল্পরূপই তত অসামান্য, যার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যত অননুভূত।

CENTRAL LIBRARY

তখনও বাংলায় একটিও সার্থক উপন্যাস লিখিত হয় নি, উপন্যাসরূপে চিহ্নিত গ্রন্থগুলি শিল্পসুষমাবর্জিত : কলম ধরেই প্রথম প্রয়াসেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ফেলতে পারলেন উপন্যাস : অর্থাৎ 'রচনা' করতে পারলেন 'প্লট' ; বাংলা সাহিত্যে যেহেতু প্রথম, তাই 'রচনা' না ব'লে বলা উচিত : সৃষ্টি। যা ছিলো না, তাই হ'ল। যদিও ট্রাজেডি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তবু অ্যারিস্টটলের সেই অতি পরিচিত মন্তব্য এই প্রসঙ্গেও স্মরণ করা যায়। ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের তুলনায় প্লটের গুরুত্ব ও প্রাধান্যের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। 'We maintain, therefore, that the first essential, the life and soul, so to speak of Tragedy is the Plot ; and that the Characters come second……' সার্থক প্লট রচনার নৈপুণ্যও শক্তিমান ও পরিণত লেখকের পক্ষেই সম্ভব, এই সূত্রটিও স্পষ্ট করেছিলেন :

'A further proof is in the fact that beginners succeed earlier with the Diction and Characters than with the construction of a story…'

এই মন্তব্য দুটির পরিপ্রেক্ষিতে, লেখনী ধারণমাত্র প্লটসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য সিদ্ধিলাভ আমাদের চূড়ান্ত বিস্ময় উৎপাদন করে। 'প্রতিভায় কী না সম্ভব ?—এই সম্ভাব্য উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নিশ্চয়ই গ্রহণ করতেন না। কেননা, তাঁর নিজস্ব সূত্রানুসারে : 'সকলই নিয়মের ফল'। আমাদের ধারণা, প্লটসৃষ্টিতে এই চমকপ্রদ সাফল্যের কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকার এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে লব্ধ সমগ্র মানবজীবনের 'ছাঁদ' বা 'প্যাটার্ণ'টিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস। সহজ কথায়, মানবজীবনের অংশবিশেষ উপন্যাসে তুলে ধরতে গিয়ে, জ্যোতিষ-অনুশীলনকালে লব্ধ মানবজীবনভাগ্য সম্বন্ধে তাঁর যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা—তাকেই তিনি যথোচিত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। সমগ্র জীবনের মধ্যে, সাধারণ নরনারীর অজ্ঞাত একটি 'প্যাটার্ণ' বা 'ছাঁদ'কে যিনি ধরতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে উপন্যাসের 'মূল ছকটিকে অনুভব করা অর্থাৎ সুষম প্লট রচনা করা খুব কঠিন নয়। জীবনের কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ আছে কিনা, এই তর্ক এখানে অবান্তর। জীবনের প্যাটার্ণ থাক্ বা না থাক্, উপন্যাসে চিত্রিত জীবনকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনে ধরতেই হবে আর সেইজন্যই অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উপন্যাসপ্রসঙ্গেও প্রযোজ্য অর্থাৎ প্লটই হলো উপন্যাসের 'the first essential, the life and soul.

৩

জ্যোতিষপ্রসঙ্গ বঙ্কিম উপন্যাসে স্বল্প তো নয়ই, পরন্তু বিস্ময়করভাবে পর্যাপ্ত। প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান নিম্নোক্ত-রূপে বিশ্লেষণযোগ্য। ইংরেজিতে লেখা 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' এবং অসম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস 'রাজমোহনের স্ত্রী' ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দখানি। ক্ষুদ্রায়তন 'ইন্দিরা' [১৮৭৩], 'রাধারাণী' [১৮৭৭] ও 'রাজসিংহ' [১৮৮২]-এর পরিবর্তে বৃহত্তর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের 'রাধারাণী' [১৮৯০], 'ইন্দিরা' [১৮৯৩] ও 'রাজসিংহ' [১৮৯৩] ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালানুক্রমিক বিন্যাস এই রকম—১। দুর্গেশনন্দিনী [১৮৬৫], ২। কপালকুণ্ডলা [১৮৬৬], ৩। মৃণালিনী [১৮৬৯], ৪। বিষবৃক্ষ [১৮৭৩], ৫। যুগলাঙ্গুরীয় [১৮৭৪], ৬। চন্দ্রশেখর [১৮৭৫], ৭। রজনী [১৮৭৭], ৮। কৃষ্ণকান্তের উইল [১৮৭৮], ৯। আনন্দমঠ [১৮৮৪], ১০। দেবী চৌধুরাণী [১৮৮৪], ১১। সীতারাম [১৮৮৭], ১২। রাধারাণী [১৮৮৬], ১৩। ইন্দিরা [১৮৯৩], ১৪। রাজসিংহ [১৮৯৩]।

এই চৌদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে আটটিতে প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। বাকি ছ'খানি গ্রন্থের দু'টিতে জ্যোতিষপ্রসঙ্গ সরাসরি উত্থাপিত না হলেও জ্যোতিষের পরোক্ষ প্রণোদন স্পষ্টগ্রাহ্য। বঙ্কিমের উপন্যাসে

CENTRAL LIBRARY

জ্যোতিষপ্রসঙ্গ আকস্মিক নয়, স্বল্পও নয় এবং এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মনে করি, এই কথাগুলি এতক্ষণে পরিস্ফুট হয়েছে আশা করা যায়। কিন্তু জ্যোতিষপ্রসঙ্গ কীভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্লটভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের প্লটকে অসামান্যতা দান করেছে, সেই বিষয়ে আরো কিছু আলোকপাত অনাবশ্যক নয়।

বঙ্কিম-পূর্ববর্তী উপন্যাস নামে চিহ্নিত গ্রন্থগুলি ঘটনা-চরিত্র, সংলাপ বর্ণনা এবং রচয়িতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। সমস্ত জড়িয়ে গল্পরস দানা-বাঁধার মতো বস্তু-কাঠামো খুঁজে পায় নি। জীবনের টুকরো টুকরো ছবি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বিশেষভাবেই লভ্য, কিন্তু একটি জীবনপরিধির সামগ্রিক রসাবেদন সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বাংলায় লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র ত্রুটী অন্বেষণের জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সেকালে এ-গ্রন্থের এত জয়-জয়কার—দুটোই বাস্তব সত্য, অস্বীকার করার উপায় নেই। পরবর্তীকালে 'বিষবৃক্ষ' থেকে অন্য একটি পর্বের সূচনা বাংলা উপন্যাসের ধারায়। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে ছিল না এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পূর্ণ হ'ল উপন্যাসের একটি অবশ্য পূরণীয় শর্ত, আগেই বলেছি—'দুর্গেশনন্দিনী'তে প্লট এল। আর এইজন্য, ইতিহাসের কঙ্কাল ছাড়া আরো যে উপাদানগুলি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করলেন, তার মধ্যে সন্ন্যাসী, স্বপ্ন, চিঠি এবং সর্বোপরি জ্যোতিষের প্রসঙ্গ। স্বপ্ন ও চিঠির ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, আমাদের মনে হয়, মনোবিশ্লেষণের বিকল্প হিসাবেও কাজে এসেছে। প্লট-নির্মাণের ক্ষেত্রেও চিঠির উল্লেখযোগ্য ব্যবহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসে লক্ষণীয়, স্বপ্নের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবহার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্লটনির্মাণে।

জ্যোতিষ ও সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ দু'টি পরস্পরের হাত-ধরাধরি ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বারবার দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে যেমন 'রাজা', বঙ্কিমসাহিত্যে তেমনই 'সন্ন্যাসী'। 'রাজা'র বিবর্তনের বিষয়টি 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম-পর্যায়' নামে আমার গবেষণাগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, বঙ্কিমসাহিত্যে সন্ন্যাসীচরিত্রেরও ধারাবাহিক একটি বিবর্তন ইতিহাস গবেষণার বিষয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, সন্ন্যাসীজাতীয় চরিত্রের এক কোটিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী—যাঁর প্রথম জীবন কলঙ্কিত, পরবর্তীকালে সেই চরিত্রের উর্ধ্বায়ন ঘটেছে; অপর কোটিতে 'আনন্দমঠ' এর মহাপুরুষ। মধ্যবর্তী পথের ইতিহাসই সন্ন্যাসীজাতীয় চরিত্রের বিবর্তন-ইতিহাস।

যে মানব-নিয়তিকে গ্রীকনাট্যকারগণ থেকে শেক্‌স্‌পীয়র এবং পরবর্তীকাল পর্যন্ত অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাঁরা কতদূর প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল, আধুনিক বা অনাধুনিক, রসজ্ঞ সাহিত্যপাঠকের কাছে সে প্রশ্ন অবান্তর। তাঁরা সর্বজনের ও সর্বকালের। বাংলা সাহিত্যের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রও তাই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড: তৃতীয় পরিচ্ছেদে জ্যোতিষী চন্দ্রশেখরের স্বগতোক্তি:

> 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে। যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।'

—বিশেষ পরিস্থিতিতে উপন্যাসের একটি চরিত্র চন্দ্রশেখরের উক্তি হ'লেও এই ক্ষুদ্র উদ্ধৃতির সহায়তায় বঙ্কিমমানসে'র কিঞ্চিৎ পরিচয় অলভ্য নয়। ভবিতব্য ও পুরুষকারের মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধানের অপর নামই বঙ্কিমসাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যেকালে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত থাকলে

CENTRAL LIBRARY

এবং বঙ্কিম-মানসের পরিচয় গ্রহণ করলে, বঙ্কিমচন্দ্র কেন ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য উতলা হয়েছিলেন, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপন্যাসে কেন প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এসব প্রশ্নের যেমন উত্তর পাওয়া যায়, তেমনই নিখুঁত প্লট রচনায় তাঁর আত্যন্তিক যত্নের কারণও উপলব্ধ হয়।

উপন্যাসে বর্ণনীয় জীবনের প্লট বা বৃত্ত রচনা করতে গিয়ে জ্যোতিষ-জিজ্ঞাসু বঙ্কিমচন্দ্র জন্মপত্রিকার বৃত্তটিকে অন্ধবিশ্বাসের বশে নয়, জীবনশিল্পীর অসামান্য নিপুণতায় কাজে লাগিয়েছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর বিশ্বাস পুরুষকারে বিশ্বাসের অভাবপ্রসূত নয়, এলোমেলো আপাত-অসংলগ্ন জীবনের মধ্যে একটি লজিকের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের পথেই উদ্ভূত।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বনে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন করতে পারি। প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই শুরু করা যেতে পারে। উপন্যাসটির প্রথম দিকে অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষগণনার সূত্র ধরেই বীরেন্দ্রসিংহ পাঠান সেনাপতির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হলেন। তারপর উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনাজটিলতার সূত্রপাত। করিম বক্স নামে যে সৈন্যটির তৎপরতায় তিলোত্তমা ও বিমলা ধরা পড়েছিল, তাকে ঠাট্টা করেই 'মোগল-সেনাপতি' বলা হতো। বস্তুত, অভিরাম স্বামী গণনা করে দেখেছিলেন, মোগল-সেনাপতির মাধ্যমে তিলোত্তমার অমঙ্গল। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে মোগল-সেনাপতি হলেন জগৎসিংহ। তিলোত্তমার সাক্ষাৎ অভিলাষী জগৎসিংহকে দুর্গমধ্যে আনতে গিয়েই বিমলার অসতর্কতায় বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রান্ত হয় এবং তিলোত্তমাসহ দুর্গের সকলেরই অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু পরিণামে তিলোত্তমার যে সুখসৌভাগ্য দেখা গেল, তার মূলেও ঐ মোগল সেনাপতি অর্থাৎ জগৎসিংহ। —এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষগণনা অংশত ফলেছে। অভিরাম স্বামীর অসম্পূর্ণ গণনাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু জ্যোতিষের সত্যাসত্য যাচাই না করেও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রথম বাংলা উপন্যাসেই প্লট ভাবনার সূত্রে জ্যোতিষের প্রসঙ্গটিকে কাজে লাগিয়েছেন। বিমলার সুদীর্ঘ চিঠিতেও অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষ গণনায় নিপুণতার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন লেখক। অভিরাম স্বামীর নির্দেশ অমান্য করে বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর অভিপ্রায় মতো যদি পাঠানপক্ষেই যোগ দিতেন, তাহলে উপন্যাসের ঘটনার গতিপ্রকৃতি অন্যরূপ হতে পারতো। কিন্তু রাজায় রাজায় লড়াই হ'লে বীরেন্দ্র-সিংহের ন্যায় ভূস্বামীদের পরিণতির বড়ো ইতরবিশেষ হতো না। অর্থাৎ, জ্যোতিষগণনা উপন্যাসের বৃত্ত-রচনায় সহায়ক হয়েও জীবনসত্যকে লঙ্ঘন করল না।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড-এর প্রথম পরিচ্ছেদেই 'মাধবাচার্য বলিতে লাগিলেন, 'কয় মাস পর্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি, গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।' আমরা সকলেই জানি, মাধবাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর অভিপ্রেত আক্ষরিক অর্থে ফলে নি, ফলতে পারেও না, কেননা তাহলে তা হতো ইতিহাস অর্থাৎ বাস্তব সত্যবিরোধী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ গণনার প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করলেন কেন? জ্যোতিষ গণনা যে মাঝে মাঝে ভুল হয়, হ'তে পারে, এই কি তাঁর আনুষঙ্গিক প্রতিপাদ্য? বস্তুত, এই সিদ্ধান্ত ভুল হবে। 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' শ্রীর প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপভাবে জ্যোতিষবচনকে আক্ষরিক ও অভিপ্রেত অর্থে ফলবান হতে দেন নি। বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্রই জ্যোতিষবচনকে চূড়ান্ত নির্ণায়ক রূপেই দেখিয়েছেন কিন্তু জ্যোতিষবচনের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য করতে গিয়ে জ্যোতিষীরাও যে বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণে উপন্যাসের চরিত্রসমূহ জ্যোতিষবচনের আক্ষরিক অর্থ ও অভিপ্রেত ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে জীবন-বিড়ম্বনা ভোগ করেন; এই বাস্তব সত্যটিকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। এতে লাভ কী হয়েছে? লাভ হয়েছে উপন্যাসের, অর্থাৎ প্লটটা দাঁড়িয়ে গেছে, দানা বেঁধেছে। কাহিনী ত্বরিত গতিতে পরিণামমুখী হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

এতেই প্রমাণিত হয়, জ্যোতিষশাস্ত্রের খাতিরে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষের অবতারণা করেন নি, প্লট রচনার সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, তাঁর জ্যোতিষ-সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে। 'মৃণালিনী'তেই দেখি, মনোরমা-পশুপতি উপাখ্যানের ক্ষেত্রে জ্যোতিষ-বচন বর্ণে বর্ণে ফলেছিল। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের শেষাংশে মাধবাচার্যের গণনা-ভাষ্য যখন আক্ষরিক ও তাঁর অভিপ্রেত অর্থে সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল না, তখনও :

মাধবাচার্য কহিলেন, 'বৎস! দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে।

—চতুর্থ খণ্ড : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পরামর্শ

এবং—মাধবাচার্য কহিলেন, জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে ; অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে…'।—চতুর্থ খণ্ড : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পরামর্শ

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতেও 'জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে'—অবশ্য ভাষ্য রচনায় 'ভ্রম' হতেই পারে।—এইভাবে উপন্যাসের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিচিত্র ঘটনারাজি জ্যোতিষ-গণনা ও তার ভাষ্যসূত্রে গ্রথিত। ঠাসবুনানি এর প্লট। জীবনসত্যকে লঙ্ঘন না করেও প্লটগঠনে জ্যোতিষকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আরো বিস্ময়কর এই যে, এরই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য দেশাত্মবোধের সার্থক সূচনা হয়েছে।

সমগ্র 'যুগলাঙ্গুরীয়' দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষচক্রের ভিত্তিতে তথা একটি চিঠিকে অবলম্বন করে। লিখেছিলেন আনন্দস্বামী : হিরণ্ময়ীর পিতাকে—'জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্তব্য নহে। হিরণ্ময়ীতুল্য সোনার পুত্তলিকাকে কখনও চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ। তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর পর্যন্ত পরস্পরে যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি হইতে পারে তাহার বিধান আমি করিতে পারি।'

উপন্যাস হিসাবে 'যুগলাঙ্গুরীয়'-এর মূল্য এমন কিছুই নয় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা ও তাঁর উপন্যাসের প্লট, এই উভয়ের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ উপলব্ধির জন্য উপন্যাসটির উল্লেখ করতো হ'ল।

ইতিহাসের তথ্য ও মানবজীবনের সত্যকে মিলিয়ে দিয়ে প্লট ও চরিত্রসৃষ্টিকে বিশ্বাসযোগ্য ও সার্থক করে তোলায় বঙ্কিমচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। 'সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাশেম খাঁ' ও তাঁর প্রিয়তমা দলনী বেগমের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে মুরশিদাবাদের অনতিদূরের বেদগ্রামের চন্দ্রশেখর ও তাঁর পত্নী শৈবলিনীর জীবনসমস্যা এক সূত্রে গ্রথিত করার জন্যও বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষকে অবিশ্বাস্য কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। একাধিক উপাখ্যানকে উপন্যাসে ব্যবহার করতে গেলে প্লটগঠনে যথার্থ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। সে নৈপুণ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমের প্লটগঠনশক্তির অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তস্থল। স্বল্পপরিসরে অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে উদ্ধৃতির সাহায্যে এবার বিষয়টি বহুলাংশে পরিস্ফুট হ'তে পারে :

'দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন ; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?'

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, 'তবে কলমদান দাও।'

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখিলেন?'

CENTRAL LIBRARY

মীরকাসেম বলিলেন, 'যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।'

এইপর্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। বড়ো জোর তৈরী হ'ল: সাসপেন্স। এর পরেই কুশলী কথাকার, অসামান্য প্লটরচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। পাঠক এতক্ষণ গল্পরসেই মগ্ন ছিলেন। দলনী-মীরকাসেম বৃত্তান্তে পাঠক যখন মগ্নচিত্ত, সেই অবকাশে গল্প ছড়িয়ে যাবে এবার ভিন্ন দিগন্তে: মিলে-মিশে একস্রোতে অতঃপর বাহিত হবে দুটি আপাত-বিচ্ছিন্ন উপাখ্যানধারা—

'নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্সিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, 'মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?'

মীরমুন্সি তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।'

চন্দ্রশেখর কী করিলেন?

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্মচারীকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।'

রাজকর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন মহাশয়?'

চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।'

চন্দ্রশেখরের কথাগুলি সত্যও নয়, অসত্যও নয়। জ্যোতিষে তিনি পারদর্শী কিন্তু মনুষ্য সর্বজ্ঞ নয়। জ্যোতিষগণনার জন্য মীরকাসেমের আহ্বানে তিনি বেদগ্রাম ত্যাগ না করলে হয়তো শৈবলিনীকে এত দ্রুত হারাতেন না। আবার অন্যদিকে কাহিনীতে জটিলতাসৃষ্টির জন্য শৈবলিনীর বেদগ্রাম-পরিত্যাগ প্রয়োজন ছিল। আবার সে-জন্য আবশ্যক ছিল চন্দ্রশেখরের সাময়িক অনুপস্থিতির। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষগণনার উপলক্ষ্যে চন্দ্রশেখরকে বেদগ্রাম থেকে সরিয়ে এনে একযোগে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।

এইভাবে 'রজনী', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসেও জ্যোতিষপ্রসঙ্গের অবতারণা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্লটভাবনা যে সমসূত্রে বিধৃত, সেকথা উল্লিখিত প্রত্যেকটি উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক অংশসমূহের উদ্ধৃতি ও সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি উপন্যাস অবলম্বনে এই বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ হয় আর নেই। অতঃপর আমরা কেবল 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম' থেকে দু'একটি সূত্রের উল্লেখ ও আলোচনা করেই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করতে চাই।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনামই হ'ল: 'অদৃষ্টগণনা'। সেই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম জানিয়েছেন, দিল্লির চাঁদনীচকে জনতার সবচেয়ে বেশি ভিড় জ্যোতিষীদের কাছে। দরিয়ার চাপে প'ড়ে মবারক জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্যগণনা করিয়ে যা' জেনেছিল, ঘটনাচক্রে তা' যেমন সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনই আবার এই ভাগ্য গণনারই সূত্র ধরে উপন্যাসের অপর উপাখ্যানটিকেও ক্রমাগ্রসর হতে দেখি। আবার, পঞ্চম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে জ্যোতিষী গণনাপূর্বক নির্মলকুমারীকে যা' জানিয়েছিল, তারই সূত্র ধরে উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাসমূহের বিস্তার।

আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য: 'সীতারাম'। এই উপন্যাসেরও প্লট সম্পূর্ণত জ্যোতিষনির্ভর। পরিত্যক্তা পত্নী

CENTRAL LIBRARY

শ্রী যখন ভ্রাতার প্রাণবধের আশঙ্কায় বিপন্ন হয়ে সীতারামের সাহায্যপ্রার্থিনী হ'ল, 'তখন শ্রী মুখের ঘোমটা খুলিল' সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!' —এই রূপজ মোহ থেকেই সীতারামের সাময়িক উত্থান এবং পরবর্তীকালে চূড়ান্ত পতন। বরাবর একসঙ্গে বাস করা সম্ভব হলে রূপজ মোহ কেটে গিয়ে একদিন সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারতো শ্রীর সঙ্গে। বিবাহকালে শ্রীর কোষ্ঠী পাওয়া যায়নি। তবু বিবাহ হয়েছিল সীতারামের মায়ের ইচ্ছায়, শ্রী পরমাসুন্দরী ব'লে। বিবাহের মাসখানেক পরে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ শ্রীর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী পরিত্যক্তা হয়েছিল। শ্রীর প্রশ্নের উত্তরে সীতারাম জানিয়েছে—

'তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।'
—প্রথম খণ্ড : সপ্তম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের এই অংশে প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন এবং সীতারামের মাধ্যমে শ্রী ও পাঠক জানতে পারে—'যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে স্ত্রীলোকের 'প্রিয়' বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা।'—প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পুনরায় প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি এবং শ্রীর হস্তরেখার পাঠ ও ভাগ্য গণনার সূত্রে জ্যোতিষ সম্পর্কিত নানা কথার উল্লেখ পাই। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রের এই একটি প্রধান উপন্যাসের অংশবিশেষের পাঠ ও রসগ্রহণের জন্য, জ্যোতিষ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অংশটি দীর্ঘ বলে উদ্ধৃতি দিলাম না। তৃতীয় খণ্ডের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে 'শ্রী বলিল, 'মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।'

বিধিলিপি যাই হোক্, যেভাবেই তা' ফলবতী হোক্, জ্যোতিষ গণনাকে নির্ভর করেই এই বিশিষ্ট উপন্যাসখানিতে আখ্যানের অবতারণা, জ্যোতিষ গণনার সূত্রেই কাহিনীর বিকাশ ও অগ্রগতি এবং পরিশেষে একই সূত্রে মূল কাহিনীর উপসংহার। অর্থাৎ 'সীতারাম' উপন্যাসের প্লট জীবনসমৃদ্ধ হয়েও জ্যোতিষকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করে তাই আমাদের সিদ্ধান্ত : তাঁর উপন্যাসে প্লটনির্মাণের যে অসামান্যতা দেখা যায়, তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষভাবনা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত। এর ফলে প্লট যে কোথাও যান্ত্রিক হ'য়ে ওঠে নি, তা নয়। এই জাতীয় যান্ত্রিক প্লটের নিদর্শন হিসাবে 'যুগলাঙ্গুরীয়' গ্রন্থটির নাম করা চলে। এই তুচ্ছ ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, জ্যোতিষভাবনা যেমন প্লটরচনার সূত্রে তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবন ও শিল্পচেতনারও অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকার্য।

CENTRAL LIBRARY

পথ-পরিচায়ক রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদিরাম দাশ

রবীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী বিপুল সাহিত্য রচনার মৌল উপাদান দুটি—নিসর্গ এবং মানব-সমাজ। তাঁর মননধর্মী রচনার অর্থাৎ সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-রাষ্ট্র চিন্তার উপাদান একটিমাত্র—ঐ মানব-সমাজ। নৈসর্গিক উপাদান মোটামুটি স্থির অথচ মানব-সমাজ সদাচঞ্চল, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তমান। সামাজিক মানুষ রবীন্দ্রনাথও অনুভব, ধারণা, মত নিয়ে কালে কালে পরিবর্তিত। তাঁর পক্ষে বিশেষ এই যে, তিনি নিসর্গের মধ্যেও পরিবর্তন-প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন, ঋতুর পালাবদলের মধ্যে নবীনের অশ্রান্ত পদক্ষেপ, নিজ বিকাশের মধ্যেও রূপ-রূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তর। নিসর্গই হোক, মানুষই হোক আর আত্মনিরীক্ষাই হোক, কবির সবিস্ময় অনুভব তাঁর প্রৌঢ় রচনায় একটিমাত্র ভাবকে কেন্দ্র ক'রে-আবর্তিত, তা হ'ল চলার পথের যাত্রী নিসর্গসহ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী হলেও অস্তিত্ববাদী এবং সেইসঙ্গে আশাবাদীও। কিন্তু তাঁর আত্মনিরীক্ষণমূলক নিতান্ত সাব্‌জেকটিভ কবিতাগুলির সমাজ-সম্পর্ক নির্ধারণও করা যেতে পারে নানাভাবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, অর্থাৎ এমন কবি যাঁর আত্মপ্রকাশের মধ্যে মানবসমাজের আত্মকথাও তাঁর অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সাধারণ কবিদের মত যিনি ঠিক সাময়িকতার অনুবর্তন করেন নি, যাঁর রচনার মধ্যে 'আর একজন কে রচনাকারী আছেন যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।' ফলে সাময়িকতা চিরন্তনতায় এবং ব্যক্তিসমাজে মিশে এক দ্বান্দ্বিক সমাশ্রয় লাভ করেছে। তাঁর নিজের কথা কেমন ক'রে তাঁর অগোচরে মানবসমাজের মর্মকথা হয়ে পড়েছে এ বিষয়ে কবি 'অন্তর্যামী' কবিতায় বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলেছেন—

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এর ব্যাখ্যায় 'আত্মপরিচয়ে' তিনি বলেছেন—'সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠে।' ফলতঃ একথা সমীচীনভাবে মনে করতেই হয় যে, আত্মভাবণশীল গীতিকবি হলেও রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় সমাজের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ এই কবিকে উপলক্ষ্য ক'রে নিজেকে প্রকাশ করেছে কবির বিশিষ্ট ভাষারীতির মধ্য দিয়ে।

কবির সমাজ-সচেতনতা যে-কালে বহিরঙ্গে খুব পরিস্ফুট নয়, এমন সময়কার দু-একটি দৃষ্টান্তে কবির অজ্ঞাতে কবিমানসে সামাজিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাক। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। বাঁধভাঙার অতিপ্রবল আগ্রহ এবং

CENTRAL LIBRARY

সীমাতিরিক্ত আবেগ-উচ্ছ্বাসে কবিতাটি আদ্যন্ত দোলায়িত। এর কাব্যার্থ নির্ণয়কল্পে সমালোচক বলেছেন,—হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ, অন্ধকার থেকে আলোকে আসার উৎসাহ প্রভৃতি। এ ব্যাখ্যা কবিতাটি থেকে স্পষ্টতর কিছু নয়। প্রশ্ন হতে পারে কিসের অরণ্য, কাকে বলি অন্ধকার, কাকেই বা আলোক? দ্বন্দ্ববিমথিত কবিচিত্তের যথার্থ স্বরূপ কী? বলাবাহুল্য তরুণ কবির ব্যক্তিগত জীবন থেকে তাঁর বহুবর্ণিত অবরুদ্ধতার এবং অন্ধকারের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়েই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে সমাজ-ইতিহাসের দিকে। সেখানে প্রথমত দেখি, উনিশ শতকের ব্যক্তিক-ভাবনাদীপ্তিহীন নির্দিষ্ট ধারায় বহমান ক্ল্যাসিকতাধর্মী সাহিত্যের প্রাধান্য। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, এমনকি নবীনচন্দ্রও একই পথের পথিক। এঁদের সৃষ্টিতে নির্বাচিত বিষয়েরই প্রাধান্য, ভাষাভঙ্গিতে প্রাধান্য পরিস্ফুট সীমিত অর্থের। তারও পূর্বে ভারতচন্দ্রাদিতে রীতিসিদ্ধ দাঁড়া কবির গীত মাত্র। আত্মবিস্তারপ্রবণ, কল্পনার সর্বগ্রাসী কবিমানসের পক্ষে এই অবরুদ্ধতা দুঃসহ, তাই বিদ্রোহ। 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া' অথবা 'শিখর হইতে শিখরে ছুটিব' প্রভৃতির মধ্যে আবেগ মুক্তির সাঙ্কেতিক চিত্র। কিন্তু সংহত সীমিত ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য ভঙ্গিমাই গীতিকবির এত প্রবল অন্তঃসংঘাতের কারণ হতে পারে না। এর মূল নিঃসন্দেহে আরও গভীরে, অর্থাৎ সমগ্র সামাজিকতার মর্মে নিহিত যে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক স্থাবর প্রথায় জীর্ণ, জড়, গতিহীন, নির্জীব। বৈদেশিক সংস্কৃতির ও জীবনধারার সংস্পর্শে তার মধ্যে মাত্র স্পন্দন শুরু হয়েছে, কোনো জাগরণ ও ব্যাপক শুদ্ধি ঘটে নি। কবির মাধ্যমে সমাজের অবরুদ্ধতা মোচনের এই আগ্রহ। উনিশ শতকের পুরাতন ও নূতনের সন্ধিলগ্নে বুদ্ধি ও বিবেকবিচারের জাগরণকে আধুনিক বিশ্লেষণে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী বিপ্লবও বলা যায়। কিন্তু জাতির নবজন্ম বলা সমীচীন হবে না। কারণ, কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত মানুষের বিবেকমুক্তি রেনেসাঁসের পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন সেকালের শিক্ষিত তেমনি ভাবিকালের সামাজিক স্বাধীনতাকামী সমস্ত মানুষের হয়েই সামন্তযুগের অমানবীয় স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা; আঘাতে আঘাত কর্'। এইভাবের পরিপুষ্টি এবং পরিণাম কবির পরবর্তী অসংখ্য কবিতায়। অনুরূপ আবেগ উচ্ছ্বাসের এবং কবির প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রকাশের দ্বারা চিহ্নিত কবিতা হ'ল 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'ঝুলন' কবিতা বহিরঙ্গে তেমনই অস্পষ্ট, ফলে অধিকতর অস্পষ্ট কথায় ব্যাখ্যাত। অথচ কবিতাটিতে একটি স্পষ্টভাষণ যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে তা একটু অনুধাবন করলেই ধরা পড়ে। সে হ'ল কবির ব্যক্তিক কল্পসুখদুঃখনিলীন একাকিত্বের বন্ধন অতিক্রম করার তীব্র ব্যাকুলতা। কবি হিসেবে শুধু নিসর্গ নিয়ে আপন মনে যে সব কল্পনার জাল গ্রন্থন করেছেন তার পরিচয় একালের আত্মকথায় সর্বত্র রয়েছে, যেমন 'কড়ি ও কোমলে'—

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জর।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।

অথবা—

কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসি করি আমি কল্পনামধু পান;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী॥

CENTRAL LIBRARY

যেমন 'মানসী' কাব্যে—

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরুমর্মর পবনে,
সেই মুকুল—আকুলবকুলকুঞ্জভবনে,

এই স্বার্থনিষ্ঠ জড় কল্পনার কবি হ'ল 'সোনারতরী' কাব্যের 'খাঁচার পাখি'। 'দুই পাখি' কবিতায় আত্মনিলীনতা এবং সমাজমুখিতার দ্বন্দ্ব। এই আত্মকল্পনাবিলাসে রুদ্ধ অবস্থা থেকে কবি মানব-সমাজমুখীনতার মধ্যে মুক্তি চেয়েছেন 'ঝুলন' কবিতায়। এই মুক্তি পেয়েছেন অবশ্য 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার স্তরে। ভাবের দিক থেকে ঐ দুটি কবিতার সাজাত্য আক্ষরিক ভাবেও অনুভব করা যায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সংরুদ্ধ কল্পলোক থেকে মুক্তির পরিস্ফুট আগ্রহ—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

'ঝুলন' কবিতায় অত পরিস্ফুট না হলেও আত্মগ্লানির একই কথা—

এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন 'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম-থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে।

এই 'তারে' বলতে কবি কল্পনাবিলাসী অন্তরীণ নিজ সত্তাকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বাস্তবসমাজবোধের জাগরণের ফলে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যেমন—'ওরে তুই উঠ আজি।' এবং—

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।

'ঝুলন' কবিতাতেও তেমনি প্রেম ও নিসর্গরম্যতার স্বার্থময় বিশ্ববিমুখ অবস্থা থেকে নিষ্ক্রমণের পরিচয়—

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা,
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া মারিবে ঠেলা—

CENTRAL LIBRARY

এবং—

ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা,
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা।

এই কবিতায় আবরণমুক্ত 'পরাণ-বধূ' ব'লে যাকে প্রিয়ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সে হ'ল কবির বহু-অভিলষিত এই নবজীবন, এই মানুষ-সমাজের আহ্বানে জাগরিত কবিসত্তা।

এ আহ্বান মহাকবি বারেবারেই অনুভব করেছেন তাঁর নিসর্গ-প্রেম-সৌন্দর্যনিষ্ঠার মধ্যে এবং যেমন নিজে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তেমনি আমাদেরও রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু কবির মর্ত্যপ্রীতি, সৌন্দর্যাসক্তি প্রভৃতিও কার্যকারণসূত্রে বাঙলার বৃহত্তর সামাজিক প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। কবি তাঁর অজ্ঞাতে নানাভাবে আমাদের পরিচিত অথবা অর্ধ-পরিচিত বাসনারাজিকেই ভাবামূর্তি দিয়েছেন। তবু একথা ঠিক যে মানবনিষ্ঠা এবং 'সমাজ-সচেতনতাই' মহাকবিত্বের প্রধানতম লক্ষণ এবং তা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একালের সমস্ত ভাবুকদের থেকে অগ্রগামীও, যেহেতু তিনি সংগ্রাম এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শোষিত সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বলাভের স্বপ্ন দেখেছেন সাহিত্যে, আর কার্যকর পথ নির্দেশের প্রয়াস করেছেন প্রবন্ধে, ভাষণে, এমনকি কর্মীর ভূমিকাতেও। এই বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই প্রবন্ধ লিখনের প্রয়াস। যে কোনো কারণেই হোক আমরা আমাদের জাতীয় মহাকবি ও চিন্তানায়কের বিপ্লবী সমাজবাদী প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকে গেছি, তাঁর নিসর্গপ্রীতি ও প্রণয়-ভাবনার কবিতাবলীকে কিছু মানমর্যাদা দিয়ে বহুমান করেছি তাঁর তথাকথিত এবং আমাদের খুবই মনঃপূত ঈশ্বর-ভাবুকতাকে, আর তাঁর দেশাত্মবোধ মানবতাবোধ বিষয়ে লিখিত কাব্যগুলির গভীরে না গিয়ে তাঁকে কখনো প্রাচীন-ধর্মী জাতীয়তাবাদী, কখনো বা ভাবাত্মক বিশ্বপ্রেমিক ব'লে চিহ্নিত করেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কোনো ধর্মীয় ধারণার অনুগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর অরূপ বা অসীম এমন একটা সত্তা যার নিসর্গে এবং মানব-সমাজে সক্রিয় পদক্ষেপ। মানুষের প্রগতির মধ্যেই এই ঈশ্বরের বিশেষ অনুভব-গম্য প্রকাশ, তাই তাঁরই কথামত, তাঁর কাব্যের ধারা নিসর্গ থেকে ক্রমশঃ মানুষে এসে পরিণাম পেয়েছে। প্রকারান্তরে বলতে গেলে সৃষ্টির এবং মনুষ্যত্বের মধ্যে ছাড়া এক অঙ্গুলি ঊর্ধ্বেও তিনি ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারেন না। 'সীমার মধ্যে অসীম' মানেই এই। নিসর্গ এবং মানুষকে তিনি এত চরম ক'রে দেখেছেন যে তার বিশেষ রূপ ঈশ্বরের রূপ ব'লে কল্পিত হয়েছে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বরে ভক্তির কবি না ব'লে নিসর্গপ্রীতির এবং মানবানুরাগের কবি বলাই সমীচীন। এসব বিষয় নিয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি,* তার পুনরুক্তি করতে এখন আর ইচ্ছে হয় না। সমানধর্মা হয়ে সহৃদয়তাসহকারে কবিকে ধরতে পারলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যরসব্রহ্মের কথা বলেছেন, অনুভব করেছেন নিসর্গসৌন্দর্য ব্রহ্মকে, পরিবর্তন বা গতিব্রহ্মকে, নমস্কার জানিয়েছেন মানবব্রহ্মকে। চতুর্ভুজ দ্বিভুজ, সিংহারূঢ় রথারূঢ়, তান্ত্রিক বা অহিংস ঈশ্বরভক্তির এই দেশে এই ধরণের ঈশ্বরবাদ বৈপ্লবিক নিঃসন্দেহে। তবু রবীন্দ্রনাথকে নিরীশ্বর বলা যায় না। যায় না এই কারণে তিনি মানবসমাজে (তথা নিসর্গে) সক্রিয় একটি সত্তা বা ঐতিহাসিক শক্তিকে অনুভব করেছেন। আর এই সত্তা জ্ঞানগম্য নয়। কল্পনাদীপ্ত বোধ বা প্রজ্ঞানের সাহায্যে অনুভবনীয় এমন মনোভাবও হয়ত বা প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত সংস্কারাবৃত ধর্মবোধের

* 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' ও 'বৈষ্ণব রসপ্রকাশ' গ্রন্থ

CENTRAL LIBRARY

পরিচয়, রবীন্দ্র-সমকালীনদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে যে পরিমাণে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথে তার অংশের অংশও নেই। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রগতিশীল ব'লে স্বীকৃত টল্‌স্টয়ে প্রচলিত ধর্মের এমনকি ধর্মতত্ত্বের প্রতি বিশেষ আনুগত্য পাঠকদের পরিচিত। এরকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ মানুষ-চরমতাবাদ তাঁকে একালের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল সাহিত্যিক ব'লেই চিহ্নিত করবে।

প্রবন্ধে ও ভাষণে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল সামাজিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। বিশ শতকের, বিশেষতঃ তাঁর যুদ্ধোত্তর কাব্যনাটকেও প্রায় সেইরকমই তর্কাতীত। এজন্য ভূমিকা করতে গিয়ে আমরা কবির সেই শ্রেণীর দুটি কবিতাকেই বেছে নিয়েছি যা তাঁর প্রথম জীবনের রচনা যার মধ্যে সমাজবোধ অপরিস্ফুট এবং পাঠকচক্ষে সন্দিগ্ধও বটে। আর একটু অগ্রবর্তী হয়ে আমরা একথাও বলতে পারি যে কাব্যনাটকে কবির যে বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব নিজকে অবারিত করতে চেয়েছে তারই বিস্তৃত মননধর্মী প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধাদিতে। কাব্যের ভাবুকতা এবং প্রবন্ধের মননধারা পরস্পরের পরিপূরক সহায়ক হিসেবেই অবস্থান করছে। নানান্ ভঙ্গিতে প্রকাশমান রবীন্দ্রচিত্ত বিচিত্র, কিন্তু বিভক্ত এবং পরস্পর-বিরোধী নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রগতি ভাবনায় কাব্যার্থের সঙ্গে গদ্যার্থের সমন্বয় দর্শনও এ আলোচনার অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু তার পূর্বে কবি-মনীষীর যে ক'টি ভাবনা ও আদর্শবিষয়ে তাঁর রক্ষণশীলতা অনুমিত হতে পারে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করছি।

রবীন্দ্রনাথ এককালে সংস্কারমুক্ত বৈদিক ভারতের (মধ্যযুগের ভারতের নয়) পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন। সে হ'ল 'চৈতালি-কল্পনা-নৈবেদ্য' কাব্য রচনার যুগে। ঐ সময় 'স্বদেশ' পুস্তকের প্রবন্ধাবলী এবং 'ধর্ম' ও 'শান্তি-নিকেতন' ভাষণ। মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কবির প্রাচীন জীবন ও সাহিত্যের দিকে ফিরে তাকানোর সময়। এই দশকের প্রারম্ভেই শান্তিনিকেতনে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথ প্রায় নিঃশেষে জাতীয়তাবাদী, কারণ, শুধু বেদ-উপনিষদের তাত্ত্বিক আদর্শই তিনি প্রচার করছেন না, বর্ণাশ্রমের অনুগত জীবনকে বরণ করার উৎসাহও তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিত্তে সাময়িকভাবে প্রাচীনের উপর এই অনুরাগ কয়েকটি কারণে জন্মেছিল। মুখ্য কারণ কাব্যিক, রোম্যান্টিক। অবক্ষয়িত সমাজে 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' থেকে মুক্তির আশায় এই কাল্পনিক স্বর্গের আশ্রয় চেয়েছেন কবি। প্রাচীন তপোবন-জীবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাও কালিদাসের কাব্য এবং উপনিষদের কাহিনীর উপর তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের অনুরঞ্জন। চৈতালি, কল্পনা এবং নৈবেদ্যে কবি কল্পনায় যে প্রাচীন ভারতকে দেখেছিলেন, তারই বাস্তব রূপ দেওয়ার লীলাময় প্রকাশ হ'ল তাঁর ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় এবং পরবর্তী শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারা। এ তাঁর কাব্যকল্পনারই কর্মরূপ, 'কর্মরূপে সেও কাব্য'। বলা যায়, যে পলাতক মন নিয়ে কবি প্রাচীনে প্রয়াণ করেছিলেন 'চৈতালি' 'কল্পনা' কাব্যে, তাই স্থায়ী আদর্শরূপ পেয়েছিল শান্তিনিকেতনে। কাব্যের মত একেও কবির রচনা বলা যেতে পারে। ক্রমে আদর্শের সঙ্গে প্রচলিত বাস্তবের সামঞ্জস্য স্থাপন কবিকে করতে হয়েছে। 'বিশ্বভারতী' সেও আদর্শ এবং বাস্তবের মিশ্রণ। আদর্শরূপ অপসৃত হতে হতে ক্রমে এখন হয়ত এটি মামুলি শিক্ষায়তনে পরিণত হতে চলেছে। সে যাই হোক, কবির প্রিয় কাব্যাদর্শের সন্তান ব'লে এই শিক্ষায়তনের উপর স্নেহান্ধ মমত্ব এত বেশি ছিল যে তিনি 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' স্বভাবের এবং বিপ্লবী পথিক মনোভাবের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও শান্তিনিকেতনকে বাইরের চলমান জনজীবনের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তবু অসহযোগ এবং চরকা-খদ্দরের উচ্ছ্বাস কি ছাত্র কি অধ্যাপক সকল আশ্রমিককেই একদা স্পর্শ করেছিল, গান্ধী-সুভাষ মত-সংঘর্ষেও আশ্রমিকদের চিত্ত কম

CENTRAL LIBRARY

আন্দোলিত হয়নি। এসব নিয়ে কবি উদ্বিগ্ন হ'লেও প্রবল প্রতিবাদ কখনোই কিন্তু করেন নি, তার কারণ তিনি একনায়কতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না, আর তিনি নিজে দলীয় রাজনীতিতে যোগ না দিলেও দেশের, এমন কি বিদেশেরও সমস্ত রাজনীতিক ঘটনার সঙ্গে পূর্ণসংযোগ রেখে চলতেন, ভাষণে এবং লিখনে প্রতিবাদে অথবা কদাচিৎ সমর্থনে তিনি যথেষ্ট সোচ্চার ছিলেন। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে স্নেহদুর্বলতার অধীন হ'লেও অবশ্য তিনি একে দ্বিতীয় অচলায়তন বা তাসের দেশও করে তুলতে চান নি এবং এর জন্মকাল থেকে এর সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব সংশয় শঙ্কা ভোগ করেই এসেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাইরে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল সে বিষয়ে অবহিত হয়ে কবি একসময় বলেছিলেন—'শান্তিনিকেতনকে কেউ কেউ মনে করে পৌরাণিক যুগের জিনিস, তপোবনের বল্কলে আগাগোড়া ঢাকা। হায়রে দুরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চলে যায়, যারা তরুণ তারা আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়।' (পথে ও পথের প্রান্তে)। অতএব, শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক ভাবকল্পনা ও চিন্তাধারার বিরোধী ব'লে কেউ অনুভব করলে তাঁকে এই ব'লেই নিরস্ত করতে হবে যে, এ আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কলাবিদের কলাকর্মসামঞ্জস্যের এক আশ্চর্য বহিঃপ্রকাশ এবং সেই অর্থে তা নিতান্ত সহনযোগ্য। তা ছাড়া দেখতে হবে নৃত্য গীত নিসর্গসৌন্দর্যের মধ্যস্থতায় কিশোরমনের বিকাশের যে আয়োজন, তাও একহিসেবে বৈপ্লবিক এবং স্বভাবের পথে শিক্ষণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের দিশারী হওয়ার গৌরব এদেশে রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য।

প্রগতিপথিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্দেহের অবকাশ হ'ল তাঁর প্রবন্ধে এবং ভাষণে বারংবার উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধার। এ বিষয়েও আমাদের সুচিন্তিত অভিমত আমরা অন্যত্র বিচারপূর্বক ব্যক্ত করেছি। পুনরুক্তির সংক্ষেপ ক'রে এইমাত্র বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর প্রগতিমূলক ধারণার অনুকূলে তিনি উপনিষদ্ মন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে আধুনিক রাষ্ট্রনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও উপনিষদ্ বচন উদ্ধার করে নিজ বক্তব্যকে সমর্থন করতে তাঁর কোনো দ্বিধাই হয় নি। এ বিষয়ে দু-তিনটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি, সর্বত্র একই ব্যাপার বুঝতে হবে। (১) 'কিন্তু যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'—এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেল টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্রমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্গীর্ণ হইতেছে, কিন্তু মন্দকে তাহারা কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদের নির্ভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী বরলাভ করিয়াছে' (পথের সঞ্চয়)। (২) 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। তোমরা যে ধামে রয়েছে, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক? ···তোমরা দিব্যলোকে বাস করছ, অমৃতলোকে বাস করছ ·····সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে? তমসঃ পরস্তাৎ।·····সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে আসছে ··· বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর কোনো উপায় মানুষের নেই।··· ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র ক'রে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই।····· এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ ক'রে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে

CENTRAL LIBRARY

ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি।.....সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্মগ্রহণ করে, সে ধর্ম—যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র। সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে।.....ইতিহাস-বিধাতা তাই বললেন—নতুন হতে হবে।' ইত্যাদি (শান্তিনিকেতন)। (৩) '...অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ' অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্য বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এত বড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না; জ্ঞানের অভাব, অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই; মানুষের ঘরে যে কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।'.....(কালান্তর)। এই হ'ল তাঁর উপনিষদের তত্ত্বকে কালোপযোগী ভাবনা দিয়ে নূতন ক'রে অনুভব ও প্রচার করা। উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যদ্যপি ছিল, উপনিষদকে তিনি নিতান্ত স্বকীয় এবং আধুনিক অর্থ দিয়ে নবীন ক'রে তবেই তাকে গ্রহণ করেছেন। অমৃত, ভূমা, তপস্যা প্রভৃতি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করলেও ঐ শব্দগুলিকে মানুষের দুঃখবরণ, সংগ্রাম, অভিব্যক্তির ধারায় জয়যাত্রা প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ফলতঃ উপনিষদের উপরেই রবীন্দ্রচিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদ নয়।

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক এবং মধ্যযুগীয় চিন্তায় বিন্দুমাত্র আস্থাবান্ ছিলেন না, কারণ, কুসংস্কার, আচার-প্রথার দাসত্ব এবং জাতীয় জীবনের জড়ত্ব সামন্ততান্ত্রিকতাসহায় পৌরাণিক ব্যবস্থা থেকেই প্রসার লাভ করেছে। উপনিষদের যুগকে তিনি জীর্ণতামুক্ত স্বাধীন চিন্তার যুগ ব'লেই মনে করতেন, এমনকি ঐকালের রাজাদেরও তিনি শ্রেণীস্বার্থমুক্ত ও মানবতার রক্ষক ব'লে বিবেচনা করতেন। তাঁর এই ধারণার সঙ্গে অবশ্য কবিসুলভ স্বপ্ন মিশ্রিত ছিল সেকথা পূর্বেই বলেছি। ফলতঃ এরকম অভিলাষ পোষণ করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল যে—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।

বৈশ্য ধনতন্ত্রপ্রধান এবং উপকরণবহুল আধুনিক যান্ত্রিক ও কৃত্রিম জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেয়ে তিনি প্রাগৈতিহাসিক জনপদ-জীবনকে কখনো কখনো শ্রেয় বলে মনে করেছেন, যেমন—দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' প্রভৃতি। কিন্তু কবির একালের, মহাযুদ্ধ-পূর্বেকার এই মনোভাব অবশ্যই কাব্যিক, পলাতক, মানবসমাজদর্শনের দ্বারা এ মনোভাব এখনও পরিপুষ্ট নয়। এই মনোভাবেরই উচ্চতম অবস্থা নৈবেদ্য কাব্যে। এখানেও লক্ষণীয় উপনিষদের উপর কবির কল্পনার অনুরঞ্জন। তপোবনের জীবনের আদর্শ কোনো ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় না, তিনি নিয়েছেন কবির অর্থাৎ কালিদাসের কাব্য থেকে। একথা তিনি নিজেই বলেছেন কয়েক জায়গায়। যেমন—

'আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে

CENTRAL LIBRARY

পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি।' (আত্মপরিচয়)

'প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।' (শিক্ষা)

'কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পল্লীবক্ষে সাহিত্য সাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন একসময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ রচনায় প্রবৃত্ত করে এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।'

অতএব 'নৈবেদ্য' রচনা এবং শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী গঠনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করলে তাঁকে একেবারেই ভুল বোঝা হবে। দেখতে হবে, তিনি কী চেয়েছেন, তাঁর প্রাচীনানুরাগময় কাব্য এবং শান্তিনিকেতনের যথার্থ স্বরূপ কী। তিনি কি পৌরাণিক এবং প্রাক্-পৌরাণিক জীবনধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, না, মানব-মূল্যহীন আধুনিক যান্ত্রিকতার এবং উপনিবেশবাদী শিক্ষার প্রতিবাদে সজীব এবং বেগবান্ প্রাণমনবুদ্ধিকে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন। বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠনের যে পরিকল্পনা তার সঙ্গে আমাদের পুরোপুরি মতের মিল যদি নাও হয়, এর সংগঠনের মধ্যে যদি কিছু অসঙ্গতি থেকেও থাকে, তবু অভিপ্রায়ের দিক থেকে বিচার ক'রে একে মৌলিকভাবে প্রগতিশীল ব'লে মনে করতেই হয়। অবশ্য আমরা রবীন্দ্রকালের প্রসঙ্গ বিচার ক'রেই একথা বলছি, একালের প্রসঙ্গ নয়। গতিশীল জীবন এবং মনের সঙ্গে বিদ্যার যোগ, ছাত্রের চিত্ত ও বুদ্ধির স্বাধীনতা, প্রকৃতির অবারিত সাহচর্যে আনন্দের সঙ্গে বিদ্যালাভ, য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্য কলা ও তত্ত্ববিদ্যার সমন্বয়, আন্তর্জাতিক ভাববিনিময় আদর্শ কেন্দ্র ক'রে প্রয়োজনের সঙ্গে এর যথাসাধ্য সামঞ্জস্য এইসব হ'ল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর মৌলিকতা এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষণ-পদ্ধতি থেকে এর পার্থক্য। সাংসারিক বিরুদ্ধতা, বাইরের বাধা এবং দুঃসহ আর্থিক অনটন ক্লেশের মধ্যে দিয়েই কবিকে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়েছে। তা ছাড়া এও বোঝা কঠিন নয় যে, পরাধীনতার মধ্যে একে রক্ষা করতে গিয়ে কবিকে কদাচিৎ আত্মপ্রকাশে ও কার্যে অনভিপ্রেত সংযমও রক্ষা করতে হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কবির পরীক্ষামূলক পদক্ষেপের সময়, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের রূপে আবির্ভাব কালে, এ বিদ্যায়তন যদিচ প্রাচীনের অনুগত ছিল (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং রেবাচাঁদ তাঁকে এই আদর্শে উদ্বোধিত ক'রে থাকতেও পারেন), কুড়ি বছরের মধ্যে এর প্রাচীন কঞ্চুক অপসৃত হয়ে দেখা দিয়েছে একান্ত নিজস্ব এবং নবীন রূপ। সুতরাং কি কাব্যে কি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আদর্শের তথা সামন্ততান্ত্রিক ধারার অনুসরণ করেছেন এরকম অভিমত শ্রদ্ধেয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ কেবল শান্তি এবং অহিংসার বাণী প্রচার ক'রে গেছেন, সাধারণ্যে এরকম ভুল ধারণাও যে প্রচলিত না রয়েছে এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তং শিবমদ্বৈতমের কথা বলেছেন এবং বুদ্ধির

CENTRAL LIBRARY

উৎকর্ষে, সৌন্দর্যবোধে এবং সমাজবোধে উদ্দীপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতিষ্ঠায় মঙ্গল নির্দেশ করেছেন, তবু পথ হিসেবে নির্জলা শান্তিকে দেখেন নি, এবং বাস্তব ও ইতিহাসানুগত দৃষ্টির অধীন ছিলেন বলে তা চানও নি। তিনি পুনঃপুনঃ এই ধারণা প্রকাশ করেছেন যে বিরোধ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শান্তং শিবমদ্বৈতম্ লভ্য, বাস্তব দ্বন্দ্বসংঘাতকে অগ্রগামী জীবনের দুঃসাহসিকতাকে পরিহার ক'রে নয়। তাঁর কাব্য-কবিতায় যদিচ এই ভাবুকতার বিশেষ প্রকাশ (এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করছি), প্রবন্ধে এবং ভাষণেও নানাস্থানে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর উপলব্ধি জানিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থিতাবস্থাকেই কোনোদিন চরম ব'লে মনে করেন নি। যেমন ব্যক্তি, তেমনি সমাজ ও জাতির পক্ষে গতিশীলতাকেই যথার্থ জীবন এবং সীমালঙ্ঘন ক'রে অসীমের দিকে যাত্রা ব'লে তিনি অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগীয় প্রথা এবং শাস্ত্রের বন্ধনে জর্জর, বিবেকহীন জাতিবর্ণ বিভাগে শক্তিহীন ভারতবর্ষকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি পদে পদে। অনেক সময় বৈদেশিক পরাধীনতার চেয়ে স্বাদেশিক পরাধীনতাই তাঁর কাছে বেশি পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে-দেশ ভুয়ো শাস্ত্র এবং প্রথা তৈরি ক'রে নিজের মানুষকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে ছোট ক'রে রেখেছে তার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পাবার নৈতিক অধিকার নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং সবক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিযানকে তিনি নমস্কার জানিয়েছেন এবং স্বাদেশিক জড়ত্বের জন্য বেদনা বোধ করেছেন। পথের সঞ্চয়, কালান্তর, রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতির আলোচনা, এমন কি 'মানুষের ধর্ম'ও এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই আধুনিক জাতীয় প্রগতিকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি 'জাপানযাত্রী'র একজায়গায় বলেছেন—

> 'মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কূলত্যাগিনী তারাই এগচ্ছে ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো ক'রে কূল আঁকড়ে বসে রইল, তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্যলীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

এরকম উপলব্ধি অনুসারে তিনি 'বারে বারে নূতন, ফিরে ফিরে নূতন' সৃষ্টির উপাসক হয়েছেন এবং পুরাতনের পথিকদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে তিনি রক্ষণশীলদের এইভাবে সমালোচনা করেছেন—

> পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে থাকে। মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না।'

প্রবন্ধে এবং ভাষণে প্রকাশিত কবির এই মনোভাবের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে তাঁর কাব্য নাটকে প্রায় সর্বত্রই এবং বিশেষভাবে বলাকা, গীতালি, মহুয়া, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ প্রভৃতিতে।

পুরাতন এবং নূতন, রক্ষণশীল এবং বিপ্লবী—জীবনধারার এ দুই বিপরীত কোটির মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ক্রমাগত নূতনের জয় এটি রবীন্দ্র-উপলব্ধির একটি স্থায়ী সম্পদ, যা তিনি আমাদের দান ক'রে গেছেন, এবং তাঁর পূর্বে আর কেউ এমনভাবে আমাদের দিতে পারেন নি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেগেল এবং তাঁর অনুবর্তীরা দুই বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত এবং অহরহ নূতনের অভ্যুদয়ের বিষয়টি নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রে যে নূতন জীবনদর্শনের সূত্রপাত করেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-উপলব্ধির সাদৃশ্য অথচ অধিকতর বাস্তবতা ও গভীরতা লক্ষণীয়। এই বিরোধ বিপ্লবকে ঢাকা দিয়ে সুবিধাবাদী 'বুর্জোয়া' মনোভাবের শান্তিজল রবীন্দ্রনাথ বর্ষণ করেন নি। কবি হিসেবে তিনি স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করলেও মানুষ, সমাজ এবং জাতির জীবনের তাৎপর্যকে তাঁর কাব্যে আশাতীত মর্যাদা

CENTRAL LIBRARY

দিয়েছেন। এজন্য তিনি শুধু কবি নন, মহাকবি। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন এবং শান্তির ললিতবাণী শুনিয়েছেন এমন ধরণের অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে একদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর সম্বন্ধে এরকম ধারণা যথার্থ দর্শনের পরিচায়ক নয়। ঐ প্রবন্ধেই তিনি এত বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দ্বন্দ্ববিরোধী তরল অবিমিশ্র শান্তি সৃষ্টির বা মানবজীবনের পক্ষে কল্যাণকর সত্য নয়। তিনি বলছেন—

> 'সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ ক'রে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান ক'রে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট দেওয়া সত্য এবং ঘর গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরও বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।···যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় এবার ফিরাও মোরে কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ· অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে···তার পরে আমার রচনায় বারে বারে এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব। খেয়াতে 'আগমন' ব'লে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ ক'রে শান্তিতে ঘুমিয়েছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।'

কবির এই আত্মসমীক্ষা প্রথম-মহাযুদ্ধকালের। যদিও তিনি তাঁর যুদ্ধপূর্বকালের এমন কি বঙ্গভঙ্গ ঘটনার পূর্বেকার রচনাতেই তাঁর জীবনসংঘাত-সচেতনতা লক্ষ্য করেছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যে ১৯০৪ খ্রীঃ লেখা 'পাগল' ব'লে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিরোধমৃত্যু বরণের যে উল্লেখযোগ্য কাব্যিক প্রবন্ধটি রয়েছে তাও তিনি এ প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্যে এনেছেন। বস্তুতঃ ঐ সময় থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রকাব্যে অশান্তি বিরোধময় বাস্তব জীবনের দিকে আগ্রহ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে এবং কবি উত্তরোত্তর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ গতিচালিত নবীন জীবনের খুব বেশি পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। গীতাঞ্জলির 'অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান' এবং গীতালির 'সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত সে ভালো' থেকে প্রান্তিকের 'শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' পর্যন্ত সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আহ্বান জীবনসত্যে প্রতিষ্ঠিত কবির কণ্ঠে মুহুর্মুহু উচ্চারিত হয়েছে।

উল্লিখিত বিচার-বিবেচনা অনুসরণে স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক অহিংসার পূজারী ছিলেন না, অন্ততঃ গান্ধীজি যেভাবে অহিংসা সত্যে আস্থাবান্ ছিলেন সে ভাবে নয়। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সত্যাগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দুঃখসহন তপস্যাকে মর্যাদা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মনীতির আশ্রয়ে অহিংসা পালনকে পরিহার করেছেন। অমানবিক অন্যায় আচরণকেই তিনি হিংসা ব'লে মনে করেছেন, কিন্তু বাহুবলে

CENTRAL LIBRARY

এর সক্রিয় প্রতিরোধকে তিনি উৎসাহিতই করেছেন। আত্মতপস্যার দৃষ্টান্তে গান্ধীজির এই সরল বিশ্বাস জন্মেছিল যে সমাজের কোটিপতি ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ ক'রে নিরন্ন ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই নিঃশেষ সৎ হয়ে উঠেছে বা শেষপর্যন্ত হয়ে উঠবে, আর রুলের গুঁতো এবং বুলেটের মুখে বুক ফুলিয়ে জীবন দান ক'রে নীতিবলে বলীয়ান্ ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। এরকম সংস্কার তাঁর এতই প্রবল ছিল যে চৌরিচৌরা থেকে আরম্ভ করে আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত তাঁর ধারণার পুনঃ পুনঃ বিপর্যয় অনুভব ক'রেও তিনি নিজ মত ও পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আন্দোলনের ডাক দিয়েই না, এ বোধহয় ঠিক হচ্ছে না মনে ক'রে আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রেও নিয়েছেন বারংবার এবং এ ব্যাপারে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের মতপার্থক্যের বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য ব'লেও তিনি মনে করেন নি। নিজ মতে আস্থা তাঁর এতই সুদৃঢ় ছিল। অথচ এও ঠিক যে চরিত্রমহিমার জন্যই হোক, বা অসহযোগ পন্থার জন্যই হোক গান্ধীজিই আধুনিক ভারতের জনজাগরণের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামগ্রিক রাজনীতি-সমাজনীতিক চিন্তায় এরকম কোনো স্থির ও পূর্বনির্দিষ্ট পথের পথিক ছিলেন না। ধর্মবোধচালিত কঠোর আত্মপ্রত্যয় তাঁর ছিল না এবং এ ধারণাও তিনি পোষণ করতেন না যে কঠোর ব্যক্তিগত তপস্যা ও আধা-ধর্মীয় আধা-রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে আমরা স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করব। কর্মের মধ্য দিয়ে দেশের মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে এবং মধ্যযুগীয় প্রথা বর্জন ক'রে একমানবতা অর্জনের দ্বারা বাস্তব আত্মশক্তিতেই আমরা স্বাধীনতা পাব এমন ধারণাই রবীন্দ্রনাথ সুচিন্তিতভাবে পোষণ করতেন। নতুবা ইংরেজ চলে গেলেও আমাদের স্বাধীনতা নামে স্বাধীনতা মাত্র হবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চেয়ে অধিকতর বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন এবং যুক্তিনির্ভর ছিলেন। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন ব'লে গান্ধীজীর অসহযোগ এবং বয়কটকে না-ধর্মী সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য মনে করেছিলেন। একথাও ঠিক নয়। 'কালান্তর' এর একটি প্রবন্ধে তিনি অসহযোগ (পরে অবশ্য যথার্থ অসহযোগের তিনি সমর্থনও কিছুটা জানিয়েছেন) এবং বিলাতি বস্ত্র বর্জনকে তিনি না-ধর্মী আন্দোলন বলেছেন ঠিকই কিন্তু সে ঐ গঠনমূলক কর্মের অভাবের দিক থেকেই, তা তাঁর আলোচনার স্বরূপ অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনার মধ্যে তিনি বিদেশি বর্জনকে স্থান দিয়েছেন। চরখা বিষয়ে তাঁর দুটি দিক থেকে আপত্তি ছিল, এক, প্রথাপীড়িত দেশে এ আর একটা যান্ত্রিক অন্ধপ্রথার সৃষ্টি, দুই, মিলে বোনা বস্ত্রে বহুগুণ অর্থনীতিক সুবিধা। য়ুরোপীয় বিজ্ঞাননির্ভর জীবনবাদকে গান্ধীজী অভ্যর্থনা জানাতে পারেন নি, অথচ রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সমর্থন করেছেন, যদিও অমানবীয় যান্ত্রিকতায় তিনি আহত হয়েছেন। পরিণত সমাজবোধে রবীন্দ্রনাথের এই বাস্তব প্রগতিশীলতা লক্ষ্য ক'রে তাঁর পূর্বেকার 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর' প্রভৃতি মনোভাবকে রোমান্টিক্ পলায়নকারিতা বলতেই হবে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের শোষিত শূদ্র জনতার যেভাবে প্রবল সপক্ষতা করেছিলেন এবং তাদের মনুষ্যত্বে উন্নয়নের জন্য যে আন্তরিক উদ্যম প্রকাশ করেছিলেন তা এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যেও ততদূর দেখা যায় কিনা সন্দেহ। আবার তিনি প্রথাসিদ্ধ হিন্দুয়ানির বিরোধিতা ক'রে দরিদ্রের উন্নয়নমূলক সেবাকেই একমাত্র ধর্ম ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। প্রচলিত আবেদন নিবেদনমূলক রাজনীতির সঙ্গে (রবীন্দ্রনাথের মতই) কোনো যোগ রক্ষা করা তিনি অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করতেন। ফলতঃ পরবর্তী স্বাদেশিকদের এবং রবীন্দ্রনাথের উপরও তিনি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমাদের ধারণা, ১৮৯৪ খ্রীঃ-এর প্রথমের দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় আকস্মিক বাস্তব জীবনে পথ-পরিবর্তনের

CENTRAL LIBRARY

উৎসাহ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য বেদনাবোধ স্বামীজীর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতার ও প্রকাশিত পত্রাদির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়েছিল। আবার কবির 'স্বদেশ' গ্রন্থের প্রাচীন ভারতের জীবনধারার সমর্থনমূলক প্রবন্ধগুলি পরোক্ষভাবে স্বামীজীর হিন্দুসংস্কৃতির গৌরব কীর্তন দ্বারা উদ্বোধিত হতে পারে। অবশ্য স্বামীজীর স্বদেশের সমাজতত্ত্ববাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ একালে প্রভাবিত হন নি। লক্ষ্য করতে হবে, তখনকার বিপ্লবী স্বাদেশিকতার সঙ্গে ধর্মাচরণের যোগ স্বল্প ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা এর পথ দেখিয়েছিলেন, আর নিবেদিতা যে স্বামীজীর ভাবাদর্শেই কায়বাক্‌চিত্ত অর্পণ করেছিলেন এ সকলেরই জানা। কিন্তু তবু এতদূর মানবিক হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজী যে পরবর্তী প্রগতিমূলক স্বদেশচিন্তায় স্থান পেলেন না, তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, মুখ্যতঃ স্বামীজীর জীবনবোধ অধ্যাত্মবোধে বিশেষভাবে নিহিত ছিল ব'লে এবং ধর্মাচরণের নূতন ব্যাখ্যা দিলেও প্রথা ও সংস্কার সমন্বিত ধর্মাচরণে সম্প্রদায়সহ নিজে নিতান্ত মনোযোগী ছিলেন ব'লে পরবর্তীকালে গুরুসহ তিনিও ধর্মরাজ্যের পথিক বলেই জনমানসে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনও তাঁর বৈপ্লবিক জীবনবাদের বিলুপ্তিতে হয়ত সহায়তাই করেছে। লক্ষ্য করতে হবে এই সন্ন্যাসী ভাবরাজ্যের সমুদ্রে উঠে ভারতের শূদ্রশ্রেণীর জন্য অশ্রুমোচন করলেও জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা-মোচনের কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপনে অনাগ্রহী ছিলেন। পুরাতন ধর্মতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব নিয়ে স্বামীজী দ্বিধায় আন্দোলিত ছিলেন ব'লেই মনে হয়। অথচ পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় হিন্দুসংস্কারের জড় প্রথাপুঞ্জের রবীন্দ্রনাথ কত স্পষ্টভাবেই না বিরোধী। স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলনের পূর্বে স্বগৃহে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ আবেদন করেছেন। আমাদের শক্তির এই স্বকৃত অপচয় রবীন্দ্রনাথকে যৌক্তিকভাবেই পীড়া দিয়েছিল। তাই তিনি আমাদের স্বাধীনতা-চেষ্টায়, এই স্ববিরোধের ব্যাপারটি দেখিয়ে আমাদের চৈতন্যের উদ্বোধ ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইখানে সুদূর পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ধর্মতত্ত্বহীন উদার হিন্দুধর্ম বা মানবধর্মের উদ্গাতা, স্বামীজী ধর্মতত্ত্বকে পরিত্যাগ করতে চান নি। তাঁর ধারণা ছিল এই যে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সন্ন্যাসের আদর্শ পরিব্যাপ্ত হ'লে সমাজের এসব ত্রুটি আপনা থেকেই চলে যাবে। প্রথমে জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার নিয়ে যুদ্ধে নামলে কলহটের সৃষ্টি হবে, আদর্শবিস্তারে বাধা পড়বে। স্বামীজী শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানে আশাতীতভাবে আগ্রহী হ'লেও এবং অশিক্ষা ও দারিদ্র্য মোচনে যত্নবান্ হ'লেও বিষয়টিকে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির দিক দিয়ে বিবেচনা করেন নি। তিনি ত্যাগীর সেবাধর্মের উপরেই এবিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে কবি হয়েও সমাজচিন্তায় বাস্তববাদী আর বিবেকানন্দ স্বভাবে যোগী এবং সন্ন্যাসী হয়ে বাস্তবকে আদর্শায়িত করতে চেয়েছিলেন। ত্যাগ এবং সেবার আদর্শ প্রচারিত হ'লে নরনারায়ণ বোধও সাধারণ্যে অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হবে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং এইভাবে হয়ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরভক্তি এবং আধুনিক মানবতাবাদের একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রপক্ষে বিশেষত্ব হ'ল তিনি সমাজ-সংস্কারকে ধর্মীয় বা দার্শনিক কোনো ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। কাব্য-কবিতায় তিনি মানুষ সত্তার সঙ্গে ভাব ও কল্পনার সংস্পর্শ যদি বা রক্ষা করেছেন, প্রবন্ধেও চিন্তায় ভাবলেশ পরিহার করারই প্রয়াস করেছেন। স্বপক্ষ স্থাপন করার জন্য তিনি কদাচিৎ উপনিষদ্ আহরণ করলেও তা দিয়ে নিজ বক্তব্যেরই সমর্থন করতে চেয়েছেন। আর তাঁর এই সব প্রবন্ধের স্টাইলে কাব্যগুণ বা আলংকারিকতা থাকলেও যুক্তির সমাবেশই প্রধানভাবে লক্ষণীয়। অথচ স্বামীজীর বক্তব্যে আলংকারিকতা নাই থাক, ভাবপ্রাধান্য যথেষ্ট। আমাদের আরও মনে হয়, ১৯০০-এর পর থেকে স্বামীজীর ধর্মনীতিক স্বাদেশিকতার

CENTRAL LIBRARY

প্রভাব যে বুদ্ধিজীবী তরুণদের চিত্তে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল তার একটা কারণ, তাঁর আমেরিকার মত ধনসাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রের অধীন ধনিক সহায়তা লাভ বিষয়ে জনমতের একাংশের প্রবল বিতৃষ্ণা। স্বামীজীর স্বাদেশিকতার মধ্যে নিঃসন্দেহে কোনো খাদ ছিল না, তিনি স্বদেশে তাঁর অভিলষিত শিক্ষাবিস্তার এবং দরিদ্র অনুন্নতের জাগরণের জন্যেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর সঙ্গে পরিবর্তনশীল দেশাত্মবোধক চিন্তাধারার তেমন সামঞ্জস্য রইল না, তাছাড়া সকলে দেখলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশন দরিদ্রনারায়ণের বাস্তব সাধন থেকে এবং তাঁর অভীপ্সিত শূদ্ররাজকতা থেকে বহুদূরে সরে গেছে। স্বামীজীর সাত্ত্বার প্রয়াস প্রচলিত হিন্দুয়ানির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংসক্ত হওয়ায় মুসলমানেরা এই স্বাদেশিকতার বাইরেই থেকে গেলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমাজ সচেতনতায় কোন ধর্মীয় পক্ষ না থাকায়, হিন্দুয়ানির তীব্র বিরোধিতা এবং উদার মানবীয়তার জন্য নানান ক্ষেত্রে তাঁর মুসলিম সপক্ষতা থাকায় বর্তমান ভারতের মত স্বরাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের অধিকারী হয়েও প্রগতিমূলক স্বাদেশিক চিন্তায় স্বামীজীর স্থান রইল না, অথচ রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী হয়ে থাকলেন।

ভারতবর্ষ হিন্দুর মত মুসলমানেরও স্বদেশ এ বোধ জাগতে স্বাদেশিকদের বেশ কিছু বিলম্ব হয়ে গেছে। ইংরেজের দেওয়া আঘাতে এবং একদেশে মুসলিম লীগের অভ্যুদয়ে চৈতন্যের উদয় যখন হ'ল তখন মনের মিল ঘটতে বিলম্ব হয়ে গেছে। মহাত্মাজী খিলাফৎ আন্দোলনের উপর নির্ভর ক'রে অসাধ্য সাধন করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সাময়িক ভাবে হয়ত সফলও হয়েছিলেন, কিন্তু তার পর যে বিভেদের সৃষ্টি হ'ল তা একেবারে বাস্তব এবং স্পষ্ট, লীগের দুই জাতি তত্ত্বে এবং রাষ্ট্রবিভাগে তার সমাপ্তি। সম্প্রতি বাঙালি মুসলমান ভ্রাতারা অসহ নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রক্তের মূল্যে এর প্রায়শ্চিত্ত করলেন, কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রচেতনার এবং জীবনের নব মূল্যবোধের উত্তরোত্তর অভ্যুদয়ের জন্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভাবনা নিতান্ত মন্দীভূত হওয়ার ফলেই এটি ঘটেছে। সন্দেহ নেই পশ্চিমা মুসলমানদের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবই স্বাদেশিকতার কালে দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যাশিত মিলনের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু এও সত্য যে হিন্দুধর্মের দার্শনিক উদারতার সঙ্গে নিতান্ত অন্ধ প্রথা আচারসর্বস্বতা মিশ্রিত ছিল ব'লেই মুসলমানকে মানবীয়তার দিক থেকে আপন ব'লে হিন্দুর অনুভব না করতে পারা পঙ্কিলতাকে আরও ঘোলা ক'রে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছিলেন যে একদিকে ধর্মের গোঁড়ামি, অন্যদিকে অন্ধ কুসংস্কার এই দুইয়ে মিলে বাধা অলঙ্ঘনীয় ক'রে তুলেছে। কিন্তু তিনি এই বিষবৃক্ষের গোড়া ঘেঁষে কোপ বসাতে চেয়েছিলেন গ্রামসংগঠনের বিধান দিয়ে। এতে হিন্দুর মধ্যেকার উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ পার্থক্যও শিথিল হয়ে পড়ত এবং কম্যুনাল এওয়ার্ডের বিভেদ-প্রয়াসও আপনা থেকেই খর্ব হয়ে পড়ত। বস্তুতঃ দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজের দ্বিমুখী আঘাতে যেমন বিদেশি শাসনকে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন, তেমনি নিজসমাজের স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। সাধনার বন্ধুর পথ ছেড়ে কর্মহীন আন্দোলনের সহজ রাস্তা ধরায় আমাদের হাল কি হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এ সমাজের ভুক্তভোগী আমরাই। আজ বেদনার সঙ্গে আমাদেরই স্বীকার করতে হচ্ছে যে দেশগঠনের উপযোগী জাতীয় চরিত্র আমাদের সংগঠিত হয় নি।

রবীন্দ্র-আদর্শে সাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের অভাব, চির-নূতনের উপাসনা, সামন্ততান্ত্রিক ও পৌরাণিক প্রথার তীব্র বিরোধিতা, জাতীয়তার সঙ্গে মানবিকতার সংমিশ্রণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশ শতকের প্রগতিভাবুক মনীষীদের পুরোবর্তী করে তুলেছে। অবশ্য তিনি জড়বাদী ছিলেন না, ভাব-জীবনকেই যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু এজন্য বস্তুজীবনের মূল্যকে তিনি লঘু করে দেখেন নি। যেখানে দারিদ্র্যে অনাহারে অশিক্ষায় মানুষের জীবনেই সংশয়, সেখানে নীতিকে ঘৃণা ক'রে তিনি সংগ্রামেরই আহ্বান জানিয়েছেন।

CENTRAL LIBRARY

এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাধারণভাবে মিল এবং জড়বাদনির্ভর সাম্যধর্মী মানবিকতার সঙ্গেও। জড়বাদ ভাববাদের মূলে যে পার্থক্যই থাক ব্যবহারিক মানবিকতার ক্ষেত্রে পার্থক্য সামান্যই। অবশ্য বিকৃত ভাষ্য রচনা ক'রে ভাববাদকে মানবীয়তার পরিপন্থী ক'রে তোলা যেমন সহজ, তেমন জড়বাদকে নয়, তা ছাড়া ভাববাদে জীবনসংগ্রামের আত্যন্তিকতার বিষয় যথার্থই অবহেলিত হয়েছে। অথচ 'ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে' এমন নীতিকথা যেমন জড়বাদমূলক সমাজবাদের তেমনি ভাববাদেরও। রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামে আস্থাশীল নন, অথচ আধুনিক সমাজ জীবনে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শোষণ সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন তারও প্রমাণ রয়েছে তাঁর জীবনের শেষ দশকের ভাষণগুলিতে। মুনাফাখোর কারখানা মালিকদের বিষয়ে তাঁর বিক্ষোভ আরও পূর্বেকার। একথা ঠিক যে পণ্যের উৎপাদন কর্তৃত্বের জাতীয়করণ বিষয়ে, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অধিকার বিলোপ নিয়ে কবিকে সুসমঞ্জস কোনো অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায় না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারকে মেনে নেওয়ার দিকেই তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং সাময়িকভাবে জমিদারি-প্রথা রক্ষণের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি, তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্যও অসমীচীন হবে না, তবু সেক্ষেত্রেও স্বদেশের এবং সেকালের বিশিষ্ট পরিস্থিতির দিক বিবেচনা ক'রেই কবির কঠোর সমালোচনা থেকে নিবৃত্ত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধোত্তর পরাধীন ভারতবর্ষ অল্পস্বল্প কল-কারখানার মুখ দেখতে থাকলেও কৃষি এবং কৃষিজীবনই তখনকার সমাজচিন্তার মুখ্য বিষয়, শ্রমিক সমস্যা নয়। চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিকতার সংস্কারে অবলুপ্ত নিষ্প্রাণ কৃষকদের সম্পর্কে কবির সমবেদনা এবং পথনির্দেশ বিখ্যাত এবং কালোপযোগীও বটে। বিদেশি শাসনের অধীন স্বদেশে অন্তত এতটা চিন্তা এবং কর্মের উদ্যোগ আর কারুরই ছিল না। আপাততঃ জমিদারি ব্যবস্থা সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর অভিমতকেও এই বিশিষ্ট পরিস্থিতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কার্যতঃ এবং সর্বতোভাবে সামন্ততন্ত্রেরই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, এমন কথা অশ্রদ্ধেয় হবে, যেমন হবে তাঁর সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য যে তাঁর জাতীয়তাবোধ বিশ্বপ্রেমে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কবিচিত্তে কল্পনা-ধর্মী প্রাচ্য জাতীয়তাবোধের প্রথম উচ্ছ্বাসের পরই প্রতীচ্য জীবনধর্মের দিকে পক্ষপাত ('পথের সঞ্চয়' দ্রষ্টব্য) একটি লক্ষণীয় ঘটনা। এখন থেকে জাতীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দুঃসাহসিক জীবনবরণের উৎসাহ। য়ুরোপের মনীষার সঙ্গে সহানুভূতিমূলক পরিচয়ে পূর্ব-পশ্চিমের ভাবসম্মিলন কামনা।

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিষয়েই কোনো দৃঢ় প্রত্যয় বা পূর্বসংস্কার নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন নি। আশাতীত মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে কালে কালে কল্পনা ও অভিজ্ঞতায় যা সঞ্চয় করেছিলেন, স্বাধীন বুদ্ধি নিয়ে বিচার করে যা বুঝেছিলেন, তারই অধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন। এই বুদ্ধির মুক্তির দিক থেকে তাঁর উপর যদি কারও প্রভাব প'ড়ে থাকে তা রামমোহনের, কিছুটা বিদ্যাসাগরেরও হওয়া সম্ভব। তাঁর লেখায় পূর্বাপর মিলিয়ে যদি কোনো অসঙ্গতি চোখে পড়ে তাহ'লে সেই অসঙ্গতিকেই বড় ক'রে না দেখে কোন সিদ্ধান্ত তাঁর অভিপ্রেত তা তাঁর বিশেষ স্বভাব এবং পরিবর্তনশীল মানসিকতা মিলিয়ে ধরতে হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থান কাল পরিবেশের অধীনতার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

আধুনিক বাংলা গল্পে কালের তিক্ততা

হরপ্রসাদ মিত্র

বর্তমানে বাংলা ছোটোগল্পের প্রবাহে সূচনা-পরিণতি-উপসংহার-চিহ্নিত গল্পের জন্যেই গল্প লেখবার রেওয়াজ কম। মনোভঙ্গিগত নানাবিধ অসংলগ্নতার চর্চা,—এবং অবসাদ, বিরক্তি, নৈরাশ্য ফুটিয়ে তোলবার মেজাজই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। একালে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে, লেখকের সংখ্যাও বেড়েছে। আগেকার তুলনায় লেখকদের চেষ্টা বেড়েছে। এই চেষ্টার পেছনে খ্যাতির প্রতি সনাতন আকর্ষণ তো বটেই, পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু অর্থপ্রাপ্তির সুযোগবৃদ্ধি এবং শিল্পীর যথার্থ আত্মপ্রকাশের তাগিদ—এসবও ধর্তব্য। প্রমথ চৌধুরীর 'ঘোষালে'র গল্পগুলির প্রধান গুণ ছিল স্ফূর্তি, সে-কথা তিনি তাঁর 'বীণাবাই'-এর সূচনাতে নিজেই জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী—এঁরা কেউই বছর বছর ভূরিপরিমাণে গল্প লেখেন নি। ১৩১৮ সালের পৌষের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' ছাপা হয়, তারপর রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায়—'দুই বৎসরের মধ্যে ছোটগল্প একটিও লেখেন নাই।' 'সবুজপত্র' বেরুলো যখন, তখন বারো মাসে বারোটি গল্প লেখেন। জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, বনফুল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি লেখকরা অনেক গল্প লিখেছেন, কিন্তু এঁদের এবং এঁদের সমকালবর্তী প্রসিদ্ধ অন্যান্য লেখক-লেখিকার গল্পে লেখক-মনের বিরক্তির চিহ্ন ছিলনা। সব ফসল সম-পরিমাণে স্বাদু হয় না, পরিপুষ্টও হয় না বটে, কিন্তু সেকালে গল্পের ফসলে 'গল্পহীনতা' ঘটেনি। একালের অনেক গল্পের প্রসঙ্গেই 'গল্পহীন', 'প্রবন্ধধর্মী', 'কবিতা-কবিতা ভাব' ইত্যাদি কথা ব্যবহারের ইচ্ছে হয়। গল্পে মানসিক অস্থিরতা, অবসাদ, নিঃসঙ্গতার তিক্ততা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যস্ত ধারণার বিরোধী এক ধরনের গল্পহীনতার মেজাজ দেখা দিয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনঃস্রোতের অনুসরণ মাত্র, কোথাও বা স্ত্রী-পুরুষের দেহলালসার প্রতি অতি মনোযোগ, কোথাও প্রাণশক্তির দুরারোগ্য জড়তার ছবি ফুটে উঠছে। গল্পের পাত্রে যাঁরা উদ্দীপনাময়, ইতিবাচক ও সুখকর কোনো বিশ্বাস,—কোনো ভ্রমণের সুখ বা চিত্তের বিনোদন পরিবেশনের প্রয়াসী, তাঁরা যেন সাম্প্রতিক বর্তমানের লেখক নন, এইরকম ধারণাই জনমত হয়ে উঠবে কি? বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যময় রসবোধ,—কৌতুক, পরিহাস, কল্পনার সুখ, এসব কি এখন পুরোনো আমলের ছাপমারা, বর্তমানের আসরে অচল বলে গণ্য হবে? জীবনে যন্ত্রণা বেড়েছে, লোকসংখ্যার চাপ তুচ্ছ নয়, কিন্তু নেতি নেতি ক'রে প্রাণ যে বাঁচেনা!

১৯৫১ সালে বুদ্ধদেব বসু 'চাই-আনন্দের সাহিত্য' নামে তাঁর একটি নিবন্ধে বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিমী সাহিত্যের বিষাদব্যাধির কথা প্রসঙ্গে লেখেন—'এই সাহিত্যের তাৎপর্য নঞর্থক, এর বাণী বলতে প্রকাণ্ড একটা 'না' ভিন্ন কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না—শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিতৃষ্ণা, মানুষের মূঢ়তায় 'savage indignation' নয়, মানুষের পতন-প্রবণতায় এক ফোঁটা করুণাও নয়—শুধু প্রত্যাখ্যান, তিক্ততা নয়তো বাঁকা ঠোঁটে দুর্বলের ব্যঙ্গ, আর

CENTRAL LIBRARY

নয়তো কোনো অন্ধ বিশ্বাসের পায়ে নিশ্চিন্ত অসহায় আত্মসমর্পণ।' আমাদের হাল আমলের বাংলা গল্পে কতকটা এই অবস্থা অনুভব করা যাচ্ছে।

প্রভাতকুমার-রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্প থেকে শুরু ক'রে প্রমথচৌধুরীর আমল পেরিয়ে 'কল্লোল' পর্বে লেখকদের ধরে, আরো পরবর্তীকাল পর্যন্ত—অর্থাৎ শতাব্দীর মধ্য-পর্ব পর্যন্ত ঘরোয়া, বৈঠকী, আড়ম্বরময় যে-কোনো রীতিতেই হোক্, ঘটনা, আখ্যান, মনোভঙ্গির রূপায়ণ ইত্যাদি ব্যাপার গল্পের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে, সেই ধারণার সঙ্গে একালের গল্পের প্রকৃতিগত পার্থক্য ঘটে গেছে। সাধারণভাবে একথা বললে অসঙ্গত হবে না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'নিষিদ্ধ ফল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (মৃত্যু ১৯৩১) 'আমি সুখী কেন', মণীন্দ্রলাল বসুর (জন্ম ১৮৯৭) 'মালতী' তিনটিই প্রেমের গল্প, কিন্তু তিনটির রীতি তিন রকম। তিনটিরই ভাষারীতি সাধু, তিনটিতেই পরিচ্ছেদ-বিভাগ আছে এবং তিনটিই কাহিনী-প্রধান। প্রথম চৌধুরীর গল্পে ভাষা ও ভঙ্গি দুই-ই বদলে গিয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পাঠকের মনে গল্পরসের প্রত্যাশা পীড়িত তো হয়ইনি, বরং আরো বেশি উৎসাহিত হয়েছে। ১৩০৫ সালের কার্তিকের 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবাস-স্মৃতি' নামে লেখাটিতে অক্সফোর্ডে বসন্ত-সমাগমে পার্কে ভ্রমণরত ইংরেজ প্রণয়ী-যুগলের সঙ্গে কৌতুকজনক ও বিপজ্জনক এক বাদানুবাদের পরিস্থিতি ছিল প্রসঙ্গ, কিন্তু মুদ্রিত মাত্র পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠার সেই গল্পে যে সুখপাঠ্যের আবেদন ছিল, সে সরসতা প্রমথ চৌধুরীরই নিজস্ব কীর্তি,—যেমন পরশুরামের নিজস্ব এক পৃথক ভঙ্গি—'বনফুল' বা শিবরাম চক্রবর্তীর বা সেকালের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলাদা আলাদা ভঙ্গির স্বাদ ভাবা যায় যেমন।

মকদমপুরের জমিদার রায়মশায় ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর 'ফরমায়েসি গল্পের' ফরমাসের মালিক। তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করে সিকিভরি অহিফেন সেবন করে রাত এক প্রহরে বৈঠকখানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে বলেছিলেন—'ঘোষাল, গল্প বল'। সে আবহাওয়া আর নেই। সেইসব গল্পের কথক, শ্রোতা, সমালোচক, টিপ্পনীকার ইত্যাদি সকলেই অন্তর্হিত। রসিকতা, হেঁয়ালি, প্রলাপ—সেসব গল্পে যা-কিছু ঘটেছে, সবই ছিল গল্পরসের আশ্রিত। অসংবদ্ধ অসংলগ্ন যা-কিছু ঘটেছে সেসব ক্ষেত্রে, সবই ছিল মনের স্ফূর্তির সুতোয় বাঁধা। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনায় প্রধানত এই পরিবর্তনটাই চোখে পড়ে যে, এখনকার বাংলা গল্পে প্রতীক, সঙ্কেত ইত্যাদির দিকে,—এইসবের মধ্য দিয়ে একরকম দার্শনিকতা অথবা জীবন সম্বন্ধে গম্ভীর মেজাজ বা দুর্ভরতাবোধের অভিব্যক্তির দিকেই লেখকদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তার মানে এ নয় যে, গল্পরস পুরোপুরিই অন্তর্হিত হয়েছে অথবা সকলেই একযোগে গম্ভীর বা অবসন্ন হয়ে গেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি লেখকদের মধ্য দিয়ে সাঙ্কেতিকতার একটি ধারা অনুভব করা যাচ্ছে। বিমল করের 'রাতপাখির ডাক', 'প্রথম কান্না', 'অশ্বত্থ' ইত্যাদি গল্পে ('মহুয়া' ১৩৮৩ দ্রষ্টব্য) যে স্বাদ পাওয়া যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি'-তে যে স্বাদ, সেসব ক্ষেত্রে গল্পত্বের হানি ঘটেনি বা প্রত্যাশা ব্যাহত হয়নি—অথচ 'গিরগিটি' যে ভিন্ন দৃষ্টির দৃষ্টান্ত, তাতে সন্দেহ নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু সমকালীন; কিন্তু গল্পের প্রকৃতিতে দুজনের ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুভব করা যায়। বুদ্ধদেব তাঁর 'জ্বর', 'মেজাজ' ইত্যাদি গল্পে যেমন রেখাচিত্র এঁকেছিলেন, তাঁর সব গল্পেই যে সেরকম ঘটেছে, তা বলা বাহুল্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মনোভঙ্গিগত পার্থক্য এক নজরেই চোখে পড়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বতন্ত্র গল্পকার হিসেবে চিনে রেখেছেন পাঠকমাত্রেই। সরোজকুমার রায়চৌধুরী এবং সমরেশ বসু দুজনের দুটি গল্পের নাম ছিল একই—'অকাল বসন্ত', প্রসঙ্গও মোটামুটি অভিন্ন, কিন্তু দুটিই পৃথক পৃথক লেখকের সার্থক গল্পময় গল্প। প্রমথ চৌধুরীর পূর্বোক্ত 'প্রবাস-

CENTRAL LIBRARY

স্মৃতি'র সমকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'অধ্যাপক' (১৩০৫) গল্পে কিরণমালা সম্পর্কে গল্পের কথক ও নায়ক মহীন্দ্রকুমারের অনুরাগ প্রসঙ্গে দেখা গিয়েছিল—

> 'আমি দেখিলাম বারান্দায় বসিয়া পিচুড়ি রাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবুগাছে ঘন সবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবুফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না—আপনি যে-কথা মুখে আসে, আপনি যে-হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে এবং গাছ হইতে যতটুকু ছাপ পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস; আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পক্ষে কোনো বাধা দেখিতে পাই না।'

মহীন্দ্রকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর কাছে মহীন্দ্রকুমারের পরাজয়ের মূঢ়তা এ গল্পের পরিচিত উপসংহার; কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত অংশের সুখস্বাদ এবং নিম্নোদ্ধৃত পরিসমাপ্তির নিশ্চয়তা, দুটির কোনোটিতেই বিরক্তি বা অবসাদের চিহ্ন নেই। এই মেজাজের জগৎ থেকে আমরা স্খলিত হয়ে পড়েছি। মহীন্দ্রকুমারের এই প্রণয়-পরিসমাপ্তির বিবরণ—

> 'এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরমোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছল্‌ছল্‌ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।
>
> গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।'

শতাব্দ-সন্ধির সেই সুদূরবর্তী আবহাওয়া থেকে অনেক দশক পেরিয়ে এসে আরো নিকটকালের—'কল্লোল'-পর্বের লেখকদের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি প্রেমের গল্পের নমুনায় এ-যুগের আবহাওয়া যে কী রকম বদলে গেছে, তা দেখা যেতে পারে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯০৩) তাঁর 'বিন্দু' গল্পটিতে দেখিয়েছেন মানুষের জীবন বিন্দুবৎ ক্ষণস্থায়ী—তাতে যন্ত্রণা অপরিসীম,—দুই সংসারের দুটি মানুষ অনীকেন্দ্র আর শুক্তি যতোই প্রণয়াবদ্ধ হয়ে দাম্পত্যের জন্যে প্রস্তুত হোক, তবু মনে মনে শুক্তি জানে বিয়ের পরে পুরুষ গৌণ,—'নন-এনটিটি'—নিঃসত্ত্ব,—এবং শুক্তির দিদি মুক্তি প্রণয়বশে অসবর্ণ বিবাহ করেছে বটে, কিন্তু শাশুড়ী-ননদকে সহ্য করতে পারে না মুক্তি। বাপের বাড়িতে বসে স্বামী নবেন্দুর সঙ্গে তার ঝগড়া করতে বাধে না,—স্বামীর গুষ্টিবর্গকে গালাগাল দেয় সে এবং সোজাসুজি বলে—'তুমিই তো আমার টাকা রোজগারের যন্ত্র'। নবেন্দুও কম যায় না। শুক্তির বাড়িতে বসেই অনীকের শ্রুতিগোচর হয় এসব,—এবং অনীকের বাড়িতে গিয়ে শুক্তিও শুনে আসে অনীকের বড়ো ভাই প্রাণকুমার তার স্ত্রীর এক প্রণয়ীর চিঠি পড়ে ফেলার জন্যে সেই স্ত্রী তনিমা স্বামীকে বলেছে—'যে একবার প্রেম করে সে বারে বারে প্রেম করে—নইলে তোমার মত একটা কুকলাশেই সারাজীবন আকৃষ্ট হয়ে থাকব না কি?' অনীক বলে—'জানো, বৌদির মা পাগল ছিল। ওর রক্তে আছে ইনস্যানিটির ছোঁয়া'; শুক্তি বলে—'তেমনি আবার সন্দেহ-রোগটাও শুনেছি বংশানুক্রমিক।' কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের মিলনের পরিচিত জায়গা এক আইসক্রীমের দোকানে গিয়ে অনীক শুক্তিকে বলে—'আজকে আইসক্রীম নয়, আজ চলো, কিছু তপ্ততর

CENTRAL LIBRARY

উত্তেজনা'—সটান ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে চলে যায় তারা। শুক্তি বললে—'চারিদিকে কী দুর্যোগ তার চেহারাটা দেখেছ?' অনীক বলে—'দেখেছি। এই দুর্যোগের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে।'

দুজনে রাস্তায় নামল, শুক্তি বললে, 'সংসারে যন্ত্রণাই ধ্রুব। আর এই যন্ত্রণাকেই ধ্রুব জেনে ডুব দিতে হবে।

হক সাময়িক, হক ক্ষণস্থায়ী, আনন্দদীপ্ত মুখে অনীক বললে, 'এই সময়টুকু এই ক্ষণটুকুই বা কম কিসে! এই-বা আমাদের কে দেয়!'

বিহ্বলচোখে তাকাল শুক্তি। তন্ময়ের মত বললে, 'আর বলতে গেলে এ জীবনটাও তো শুধু একটাই মাত্র মুহূর্ত।

'একটা আশ্চর্যবিন্দু।' শুক্তির হাত ধরল অনীক।

জীবন-বিন্দুর উদ্দীপনাময় এই উপভোগের মেজাজও খুব সাম্প্রতিক বাংলা গল্প-রচয়িতাদের মন থেকে বিদায় নিয়েছে। উপভোগের ক্ষণবাদের ওপর কোনো কোনো লেখক জোর দিচ্ছেন বটে, কিন্তু ঠিক এভাবে নয়; যন্ত্রণা-সমুদ্র থেকে শারীরিক সুখের উত্তেজনা ছিনিয়ে নেবার বেশ তিক্ত জোর সেসব।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের (জন্ম ১৯০৪) 'নিকট ও দূর' নামে লেখাটি ছিল নায়কের সুদূর স্মৃতিচারণার গল্প। গল্পের সূচনাবাক্যেই বিষাদ-ইঙ্গিত—'এইরকম এক সন্ধ্যায় মনে হয় যেন কালের গতি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, যেন শুধু আমি আছি, আমার সন্ধ্যা আছে, আর আছে মানসলোকের চিত্রপটে একরঙা জীবনের ছবি—শুধু স্থির ছবি।' মেয়েটির নাম চিত্রা,—নায়ক এক ধনী পরিবারের সন্তান, স্বরূপ। এই চিত্রার শৈশবে এই পরিবারটি তাদের (নায়ক-পরিবারের) ভাড়াটে ছিল—'ছেলেবেলা খেলা করতে করতে ঝগড়া করলে মা বলতেন, 'ছি, ঝগড়া করতে নেই, তোমার সঙ্গে যে চিত্রার বিয়ে দেব।' চিত্রা সেই বালিকা-বয়সেই একটা রঙিন কাপড় জড়িয়ে এসে বলতো 'মাসিমা এসেছি।' কিন্তু একদিন হঠাৎ সে এমন করে সেজে আসতে অস্বীকার করেছিল। হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, 'আমি তো তোমাদের কেউ হব না।' গরিব ভাড়াটে আর ধনী বাড়িওলা, এই দুই স্তরের দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে চিত্রা তখন সচেতন হয়েছে। আরো পরে জিতেন নামে চিত্রার দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভাই তাদের পরিবারে আসা-যাওয়া করতো। চিত্রা তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। একদিন চল্লিশটা টাকা চেয়েছে চিত্রা। তার হাতে একটা পেপারওয়েট। নায়ক জিজ্ঞেস করে—'এখনি এত টাকা দিয়ে কি হবে চিত্রা?'—'হঠাৎ আমার মুখে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে চিত্রা বললে, 'এত বেশি টাকা হল কি? গরু ঘোড়ারও তো দাম এর চেয়ে বেশি!'—বলেছে—

'ও, তুমি তো আরও অনেক ঘুষ দিয়েছ বটে। বাবাকে ঘোড়দৌড়ের জন্যে ধার দিয়েছ, দু'মাসের ভাড়া নিজের পকেট থেকে বাড়িতে দিয়েছ, মাসের বাজার করে দিয়ে টাকা নিতে ভুলে গেছ—আজকাল তোমার বিশেষ অনুগ্রহ এ বাড়ির উপর। তুমি বড়লোক, তুমি অমায়িক, তুমি মুক্তহস্ত। তোমার টাকা তোমার অমায়িকতায় মা ভুলে গেছেন, তুমি অসন্তুষ্ট হও বলে জিতেনদার এ বাড়িতে আসা নিষেধ হয়ে গেছে। তার তোমার মতো টাকা নেই, তোমার মতো রূপ নেই, তার বাপ তার জন্যে লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে যাবেন না!'

রুক্ষ কণ্ঠে চিত্রা বলেছে—'আটঘাট বেঁধে চার ফেলতে কিছু গিয়েই থাকে অমন, এই শেষ চল্লিশ টাকা দিয়ে নারীর ভালোবাসা কিনে নিতে পারলে বিশেষ লোকসান হবে কি তোমার? ভালোবাসা কেনার জন্যে নানারকম ঘুষ

CENTRAL LIBRARY

দেবার ফন্দি খুঁজে হয়রান হচ্ছিলে দেখে নিজেই টাকাগুলো একেবারে চেয়ে তোমার কি সুবিধা করে দিলাম না ?'

নায়কের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—'তোমায় আমি ভালোবেসেছি এই কথাটি অবিশ্বাস কোরো না'—কিন্তু তখন শিরায় শিরায় আদিম প্রপিতামহের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল।' চিত্রাকে সে কঠোর অপমানের কথা বলে এবং চিত্রা উন্মত্তের মতো চিৎকার করে সীসের পেপার-ওয়েট ছুঁড়ে মারে—চশমার কাঁচ ভেঙে নায়কের একটা চোখ চিরদিনের মতো জখম হয়ে যায়।

আরো অনেকদিন পরে বিহারের এক গ্রামে চলে গেছে তারা। মাসিমা বিধবা হয়েছেন তখন,—চিত্রার কথা মন থেকে মোছেনি,—সেই গ্রামে গিয়ে চিত্রাদের বাড়িতে উঠেছিল নায়ক—মাসিমাকে বলেছে—'ডানচোখটা কিন্তু জন্মের মত নষ্ট হয়ে গেছে মাসিমা, কেটে বার করে ফেলে পাথরের চোখ বসিয়ে দিতে হল।' সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির লাগোয়া বাগানে চাপা কান্না শুনে কাছে গিয়ে চিত্রাকে দেখতে পেয়েছে সে। বাঁধানো ইঁদারার পাশে মুখ নিচু করে কাঁদছিল চিত্রা। নায়কের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু তার মাথায় হাত রাখতেই সবেগে পা ছেড়ে উঠে পড়েছে। পরদিন ভোর না হতেই ঘরে এসে তাকে অবিলম্বে চলে যেতে বলেছে। গত রজনীর পা জড়িয়ে কান্নাটা ছিল জিতেনবাবু ব'লে ভুল করে কান্না! বলেছে—'আমার ভাবী স্বামীর বাড়িতে বসে আমাদের অপমান করবার অধিকার তোমার নেই, এই সোজা কথাটা তোমার জানা দরকার। তুমি আজই যাও এখান থেকে।'

দশ বছর পরে সেই মেয়েটি চিঠি লিখেছে—'এতদিন নিজেকে ভুল সান্ত্বনা দিয়েছ, তোমার সান্ত্বনা অসার মিথ্যা ; হৃদয়ের কোনোখানে একটি আঁচড়ও তুমি রেখে যেতে পারনি—তোমার অসহ্য দর্প এখনো হয়তো এই সান্ত্বনা আশ্রয় করে খাড়া হয়ে আছে ভেবেই এতদিন বাদে এইটুকু লিখলুম।'

বিশদভাবে এটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু দেখে নেওয়া যে, সমাজে অর্থনৈতিক বিভেদের বোধ এ-গল্পের স্পর্শকাতর নায়িকাকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। প্রেমে অপ্রেমে বিষাদের যন্ত্রণা 'কল্লোল' পর্বের লেখকদের গল্পেও কোনো কোনো দৃষ্টান্তে এইভাবে নিহিত দেখা যায়। সুকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'নির্বাচিত প্রেমের গল্প' (দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ : প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১) থেকে এই দুটি গল্পই উল্লেখ করা হোলো। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল (জ. ১৮৯৯) শৈলজানন্দ (জ. ১৯০১), সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০২-৭১), মণীশ ঘটক (জ. ১৯০২), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জ. ১৯০৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র (জ. ১৯০৪), প্রবোধকুমার সান্যাল (জ. ১৯০৭), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬), আশাপূর্ণা দেবী (জ. ১৯০৯), সুবোধ ঘোষ (জ. ১৯০৯), বিমল মিত্র (জ. ১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (জ. ১৯১২), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (জ. ১৯১৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), বাণী রায় (জ. ১৯১৯), সন্তোষকুমার ঘোষ (জ. ১৯২০), ননী ভৌমিক (জ. ১৯২১), সমরেশ বসু (জ. ১৯২১), বিমল কর (জ. ১৯২১) ও রমাপদ চৌধুরীর (জ ১৯২২) মোট চব্বিশটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে এই সংগ্রহে। বাংলা গল্পের প্রধান বিষয় নর-নারীর প্রেম যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতো অবস্থা-পরিবর্তন মানতে বাধ্য হয়েছে, সেটা অনুভব করা যায় এইসব গল্পের নমুনা থেকে। চল্লিশের দশকে সুবোধ ঘোষের অভ্যুদয় ঘটে। মনে পড়ে তাঁর 'সুন্দরম্'-এর কৈলাস ডাক্তারকে—তাঁর ছেলে সুকুমারকে। সুকুমারের ছিল ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক,—তার জন্যে পাত্রী নির্বাচন এবং ইতিমধ্যে তুলসী নামে স্বাস্থ্যবতী একটি ভিখিরি মেয়ের সঙ্গে সুকুমারের সঙ্গম,—মেয়েটির ময়না-পরীক্ষায় সেই কৈলাস ডাক্তারেরই নিপুণ ছুরির ছোঁয়ায় মৃতদেহের স্তরে স্তরে অনুসন্ধান—রক্তিম পর্তুকা,

CENTRAL LIBRARY

মজ্জাস্থি, মুকুট ধমনি, লসিকার বুদ্বুদ, ক্লোমরসে মাখা সন্দেশ-পাঁউরুটি-বেলেডোনা ইত্যাদি শব্দব্যবচ্ছেদ-প্রাসঙ্গিক শব্দমালা এবং পরিশেষে সেই আশ্চর্য ছত্রগুলি যা কবিতার মতো গভীর—

> 'হঠাৎ ছট্‌ফট্ করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদন করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে খুলে ধরলেন—পরিশুদ্ধ ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধারিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্টকুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।'

গল্পে নাট্যগুণ, কবিত্ব, দার্শনিকতা সবই থাকতে পারে,—সবই ঘটুক। কিন্তু গল্প গল্পরসে সার্থক হোক্, পাঠকের এই কামনা আমাদের লেখকরা যথাসাধ্য পরিতৃপ্ত করেছিলেন—যেমন 'কল্লোল'-পরবর্তী বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,—তেমনি সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতিও। গল্পে এবং উপন্যাসে বিমল মিত্র একসময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন, আরো পরবর্তী পর্বে যেমন হয়েছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—এবং আরো কেউ কেউ। এঁদের রচনাতেও গল্পরসই প্রধান কথা। 'বনফুল' বিশেষভাবে এক ধরনের গল্প-কণিকায় যেমন সিদ্ধহস্ত, অপেক্ষাকৃত বড়ো আয়তনের গল্পেও তেমনি। প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কেউই গল্পে গল্পরস পরিহার করেন নি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। উভয়েই প্রিয় লেখক, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত জীবনের বেদনা সূক্ষ্ম সরসভাবে রূপায়িত করেছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবণতা ছিল কতকটা অন্য ধরনের। নারায়ণ তারাশঙ্করের পথে এগুবার চেষ্টা করতেন অনেক ক্ষেত্রেই। অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও সমরেশ বসুকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার সেইরকম মনে হয়েছে,—যেমন সন্তোষকুমার ঘোষের অবিস্মরণীয় মাধুর্য ও গল্পের পরিসমাপ্তির বিস্ময় দেখে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রীতির কথা মনে আসে। নরেন্দ্রনাথের 'ছাত্রী' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ'—এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকেই দুজনের প্রকৃতির পার্থক্য বোঝা যায়। নরেন্দ্রনাথের মনের গতি কোমল, মন্থর, অনুভূতিনিষ্ঠ,—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নামী গল্পগুলিতে একটু চড়া সুরের প্রয়াসী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল মিত্র দুজনেই ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের জাতক, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের অনুভূতিতে এবং শিল্পক্রিয়ায় যে স্বাতন্ত্র্য, বিমল মিত্রের অনায়াস কথনের ভঙ্গি থেকে তার পার্থক্য চোখে পড়তে দেরি হবে কেন? বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, নারায়ণ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্তোষকুমার ঘোষ,- এঁদের অনেকের অনেক প্রিয় গল্পের সারসংক্ষেপ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিকটিকি' বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'রূপালি মাছ'-এর 'সামারি' করতে গেলে পুরো রচনার বিন্দুমাত্রও স্বাদ রাখা যায়না। জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর অনেক গল্পেই ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে মনোভঙ্গির অধীনস্থ করে দেখান, বিশেষ মানসিকতার প্রক্ষেপ ঘটে যায় তাঁর রচনার বিভিন্ন অনুচ্ছেদবন্ধের প্রবাহে। সেসব এক ধরনের সাঙ্কেতিক চিত্রণ যেন,—যেন আমাদের স্বপ্নলব্ধ আত্মাবিষ্কারের গদ্যরচনা। বিমল করের কোনো কোনো রচনার সঙ্গে এ-রীতির মিল অনুভব করা যায়, আবার বিমল করের অন্য ভঙ্গিও স্বীকার্য। আরো তরুণ যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও এই সাংকেতিকতা সংক্রামিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যেও শক্তির লক্ষণ আছে। আবার সমরেশ বসুর মতো বক্তব্যময় শক্তিশালী লেখকের সাঙ্কেতিকতা ঠিক এরকম নয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আমার মেয়ের পুতুল' গল্পের কথক হলেন তিনি নিজে—পিতার ভূমিকায়; কন্যা

CENTRAL LIBRARY

শান্তা অসুস্থ ; দুজনে ট্রেনে চলেছেন। কার্সিয়াং-এর পথে রঙ্‌টঙ্‌ স্টেশন পেরিয়ে গেল। সতেরো বছরের অসুস্থ মেয়ে শান্তা বাপের সঙ্গে কিছুক্ষণ লুডো খেললে ; রজতশুভ্র নামে তার প্রেমাস্পদকে সে নিরন্তর ভোলবার চেষ্টা করছে এবং পিতাও সে-কথাটা ভোলবার চেষ্টা করছেন। সে-প্রসঙ্গ উঠেছে। পিতার আত্মগত উক্তি থেকে পাঠক তা জানতে পারেন। লুডো খেলা বন্ধ করে শান্তা গল্প করতে চায়,—তার 'বুকের ভিতরটা পাক খাচ্ছে'—ডাক্তার সেনকে সে বলতে শুনেছে যে সে আর বাঁচবে না। কলকাতায় তাদের পাশের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে সুকুমারী, যার বিয়ে হয়েছে রানাঘাটে, সে যে বেশ মোটাসোটা একটি ছেলের মা, পুতুলের মতো সেই ছেলেটিকে আদর করতে পারে না বলে শান্তার মনে কষ্ট আছে এবং কোনো এক জন্মদিনে বাপের দেওয়া উপহার একটি পুতুলকে আদর ক'রে সে যে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছে নিজে নিজে, সেসব কথাও অনুল্লিখিত থাকেনি। ট্রেন চলেছে, পাহাড়গুলো মাথা নিচু করে আছে,—কালো মেঘে আকাশ ঢাকা—ধূসর সমতলটা বিষণ্ণ,—আর ট্রেনের কামরায় এই পিতা-পুত্রীর কথাবার্তায় ব্যক্ত তাদের গভীর মমতা—তাদের গভীর বিষাদই এ-গল্পের আবেদন। পিতা বলেছেন—

> 'শান্তা, তোর নিজেকে ঘিরে একটা অদৃশ্য বৃত্ত আছে। সেই বৃত্তের পরিসরে তার দুঃখটা তোকে ঘিরে ঘিরে পাখির মতো ওড়ে। তুই নিজের দুঃখে কাঁদিস, তুই নিজের সুখে হাসিস। রজতশুভ্র, সুকুমারী, আমি, আমরা সবাই রঙচঙে পুতুলের মতো সেই অদৃশ্য বৃত্তটার বাইরে থেকে তোকে দেখি। আমাদের জন্যে তোর ক্রোধ, ঘৃণা, প্রেম, স্নেহ কিছুই নেই। আমরা পুতুলের মতো মিথ্যে।'

মনে মনে বলেছেন—'শান্তু, তোর শেষ কথাটা শোনবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। তুই কি কাঁদতে ভুলে গেছিস?' কার্সিয়াং যখন প্রায় এসে গেল তখনো বাপ অনুমান করেছেন—

> 'ও বলবে, বাবা আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। রজতশুভ্র আমার ভালবাসাটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল। সুকুমারীকে আমি ঘৃণা করি সেই কারণেই। অথচ ওর কী দোষ। রজতশুভ্র মরে গেল, আমি রইলাম। সুকুমারীও বেঁচে রইলো অথচ ওর কিছুই হারালো না। ওর ছেলেটা মোটা-সোটা, সুন্দর—ওর মুখের মতো সুন্দর, ওর ভবিষ্যতের মতো সুন্দর। সুকুমারীর সবটুকু দেখবার জন্য আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এই তীব্র ইচ্ছাশক্তি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে।'

গল্পের উপান্ত অনুচ্ছেদে আবার তাঁকে বলতে শোনা যায়—

> 'শান্তু তোকে একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। জানলার ঠাণ্ডা কাঁচে গালটা চেপে তুই বাইরের দিকে তাকিয়ে আছিস। তোর চোখে গাম্ভীর্যের গভীরতা। গল্পটা তুই শুনবি না। আমার ইচ্ছে করছে, তবু আমি কোনোদিন তোকে গল্পটা বলব না। শুধু মনে মনে ভাবব, শান্তু তুই বড় হয়ে গেছিস। মস্ত বড়। একপাল ছেলে-মেয়ে ; ঘরভর্তি। সংসারটা উপচে পড়ছে সম্পদের আধিক্যে।'

বিশদভাবে এই উদাহরণ দেওয়া হোল। এ-গল্পের বক্তব্য আছে, বিন্যাসক্রম আছে—বিশেষ এক শিল্পরীতিও স্পষ্ট, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের 'রূপালী মাছ'-এর রীতি আরো প্রতীকী,—আরো আত্মগত যেন। রজতশুভ্র আর শান্তার পরিণয় যদি সন্তানসন্ততিময় পারিবারিক পূর্ণতায় পৌঁছোতো, তাহলে শান্তা বড়ো সুখী হোতো,—আহা, তা ঘটলো না! এই হোলো এখানকার বিষাদ। বিষাদ আমাদের জীবনের মূলে। কিন্তু সেই তীব্রতর বিষাদবোধ বোধ হয় এর আরো নিচেকার ভূমি কিংবা আরো ওপরের সিঁড়ি! শীর্ষেন্দু সে শুভনাস্তিকতা পর্যন্ত যাননি এ গল্পে। এও কালের তিক্ততা বটে,—এবং তিক্ততার দর্শনই একালের এই ধরনের গল্পের উপজীব্য।

CENTRAL LIBRARY

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'দশ বছর পর একদিন' আধুনিক জীবনের বিষাদের আর এক উদাহরণ। ইস্কুলের বন্ধু দুলালের সঙ্গে অবিবাহিত প্রিয়রঞ্জনের হঠাৎ দেখা হয়ে যায় হাওড়া স্টেশানে। দুলাল বিয়ে করেছে উত্তরপাড়ার একটি মেয়েকে,—নাম মণিমালা,—তাদের কয়েকটি ছেলে-মেয়েও হয়েছে। দুলালের আমন্ত্রণে প্রিয়রঞ্জন কলকাতায় তাদের বাড়িতে গিয়ে মণিমালাকে দেখল। বসবার ঘরে কটা শিমুলফুল; মণিমালার জন্মদিনের গাছ সেটা; সেই ফুল এনেছে উত্তরপাড়া থেকে। লেখক এখানে ছোট দুটি বাক্য ব্যবহার করেছেন—স্মৃতি বড় কম নয়। স্মৃতির চেয়ে বড় এক আকাশ। এইটুকুই প্রিয়রঞ্জনের আত্মচিন্তার সঙ্কেত।

তার মনে পড়েছে বছর পাঁচেক আগে একবার নিজের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়েছিল সে—এই মণিমালাকেই; মণিমালার তাকে পছন্দ হয়নি। তাদের বাড়ির বাগানে শিমুল গাছ ছিল,—ঘরে তবলা, ঘুঙুর, সেতার ছিল। কিন্তু—'গায়িকা হয়ে একজন যুবককে সে বলতে পেরেছিল, জানে না সেতার, বাজায় তার বোন, কী ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান মণিমালা তাকে করেছিল!' এই অপমানবোধ—মানুষের নিঃসঙ্গতার দুর্দৈব এ-গল্পের পরিণতিকে ঘনীভূত করেছে।

সে তার বন্ধু বাদলের কথা ভাবল—সেটা নিতান্তই উট্‌কো ভাবনা বটে, কিন্তু অবান্তর নয়; প্রাসঙ্গিক ভাবনা একটি পিঁপড়েকে ঘিরে—দেওয়াল থেকে নেমে পিঁপড়েটা টেবিল পার হচ্ছিল,—গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে পিঁপড়েটার চতুর্দিকে সে জলের বৃত্ত এঁকে দিয়ে তাকে আরো অসহায় করে দেয়। তবু পিঁপড়েটা উদগ্র উদ্যমে সে বাধা জয় করে। প্রিয়রঞ্জন তখন সেটার একটা পা ছিঁড়ে দিল। লেংচাতে লেংচাতে সেটা তখনো বাঁচবার নেশায় টেবিলটা কোণাকুণিভাবে পার হয়ে যাচ্ছে দেখা গেল।

এইখানে আহত পিঁপড়েটাই প্রিয়রঞ্জনের সত্তার প্রতীক ও তার জীবনদর্শনের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। লেখকের কথায়—

> ওর স্পৃহা কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, তা ওর চাহনি দেখে সে বুঝেছে, যতদিন যাবে ছোট পিঁপড়েটার হিংসা বাড়বে, বাড়বে অবর্ণনীয় বেদনার বোধ, বাড়ুক, আত্মহনন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ওর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে না কোনোদিন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওর সবই মনে থাকবে, ওরা কোনদিনই সেরে ওঠে না, মানুষের মত সে কিছুই ভুলে যেতে পারবে না।

এই হোলো এ-গল্পের বিষাদ। কিন্তু এর নাম 'দশ বছর পর একদিন' কেন? এর ইঙ্গিত আছে গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে।

> ঝুঁকে পড়ে সেদিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল, দশ বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সে একবার সিংভূমে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একজন লোককে সে বহুসময় ধরে নিচের উপত্যকাটা দেখতে দেখেছিল। একা বলেই লোকটি সে-দিন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আজ বুঝতে পারল প্রিয়রঞ্জন।'

এই ব্যাপারটি হৃদয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা—

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে যুরুক দেখুক থাকুক
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।

আধুনিক বাংলা গল্পের যন্ত্রণা কিন্তু কবি-হৃদয়ের এরকম মার্জনাবোধ মাত্র নয়,—সহিষ্ণুতার সম্মতি মাত্র

CENTRAL LIBRARY

নয়,—পিপড়ের প্রসঙ্গ ধরে সে এক অবয়বহানির বোধ,—এক ক্ষতবিক্ষত ভাব,—এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদও,—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এই গল্পে যেমন দেখা গেল।

আমাদের এখনকার বাংলা গল্পের চর্চায় বিশেষ এক ভাবে কবিতার অনুপ্রবেশ যে ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। গল্পের মধ্যে কবিতার মেজাজ অবশ্য আগেও দেখা গেছে, তবে একালে তা আর একভাবে দেখা দিচ্ছে। প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনার দরকার। নৈরাশ্য, বেদনা, জটিলতা, আত্মবিদ্রূপ'—এসব লক্ষণ বিমল করই দেখিয়েছেন ১৯৬০ সালে (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭) প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প' নামে ষোলোজন লেখকের ষোলোটি গল্পের সঙ্কলনে। সে সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশের মধ্যে দাঙ্গা, স্বাধীনতা-লাভ ইত্যাদি থামবার এবং ঘটবার পরে—সে যুগের উত্তেজনা শান্ত, ক্লেশ বিস্মৃত, বেদনা অপসৃত। কিন্তু শুধু কি তাই? আরো নতুন বেদনার কারণ কি ঘটেনি? তিনি নিজে যখন লেখা শুরু করেন, সেই সব সময়ের সঙ্গে তুলনায় তাঁর এইরকম ধারণা দেখা দিয়েছে এবং প্রসঙ্গটি বোঝাবার জন্যে একটি দুটি গল্পের উদাহরণও তিনি দেখিয়েছেন। সে সব উদাহরণ দেখা দরকার। তার আগে তাঁর নিজের বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি জানিয়েছেন—

> একদা আগুন লাগার কালে আমরা যতটা হতচেতন হয়েছিলাম এখন সে প্রলয়-সময় কেটে গেলে অনেকটা স্থির হয়েছি, সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে অতঃপর আশ্রয় কোথায়, এই ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে কাজে লাগানোর মতন কি বা নেওয়া যায়। এই দশকের লেখকেরা (তার মানে পঞ্চাশের দশক বুঝতে হবে,—এবং বলা বাহুল্য ষাটের দশকেও তাঁদের চর্চা অব্যাহত,—পরেও তাঁরা অনেকেই লিখেছেন, লিখবেনও) সম্ভবত এই কথাটি ভাবছেন। তাঁদের রচনার চরিত্র বিচার করতে বসে আমার অন্তত সে-রকমই মনে হয়েছে। যে জ্বালায় আমরা পুড়েছিলুম এঁরা সেই জ্বালার তাৎক্ষণিক ক্লেশ থেকে মুক্ত, সুতরাং পোড়া চেহারার রূপটি অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের প্রাথমিক আপং থেকে মুক্ত বলে এরা আরও ব্যাপক জগৎকে দেখায় ব্রতী। নয়ত এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত 'পিঞ্জর' গল্পটি কেমন করে লেখা হতে পারে জানি না।

অতঃপর রতন ভট্টাচার্যে (জন্ম ১৯২৯) লেখা। 'পিঞ্জর' গল্পটির বিষয়বস্তু দেখা যাক। শেয়ালদা স্টেশনে গেছেন প্রকাশ আর কাজল। স্টেশনে গেলেই কাজল মেয়েটির কীরকম যেন ভাব হয়। কলকাতা শহরে পূর্ববঙ্গ থেকে আরো হাজার হাজার পরিবারের সঙ্গে সেও এসে পড়েছে। প্রকাশের সঙ্গে এক বছরের পরিচয় তার। একই অফিসে কাজ করে দু'জনে। প্রতি শনিবার বেশ অনেকটা সময় একসঙ্গে থাকে দুজনে। দুজনের মিলনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সেদিন প্রকাশ কাজলকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে বলেছিল।—'সত্যি আজ প্রকাশের জীবনের সব চেয়ে সুন্দরতম দিন। এখনই বাড়ি ফিরবে প্রকাশ। কাজলকে দেখে মা অবাক হয়ে যাবেন। খুশি হবেন নিশ্চয়।' কিন্তু কাজলের মন পড়ে থাকে তার গ্রামের দিকে—তার স্বজন-সম্পর্কিতদের দিকে। স্টেশনের রেস্তরাঁ থেকে প্রকাশকে নিয়ে সে প্রথমে গেল বউবাজার স্ট্রীটের পুরানো একটা বাড়িতে যেখানে কতকটা অংশ মেস, কতকটায় কাজলের চেনাশোনা আরো অনেকে বাস করে। সেই বাড়ি থেকে প্রকাশের সঙ্গেই কাজল আবার ফিরলো শেয়ালদা স্টেশনে এবং পরিচিত এক ছোট বৌদিকে পাকিস্তান মেলের কামরায় দেখতে পেয়ে তার ছোটো মেয়েটির জন্যে একটা পুতুল কিনে সেই ট্রেনেই সে চলে গেল—ব্যারাকপুরে নেমে আবার অন্য

CENTRAL LIBRARY

গাড়িতে ফিরে আসবে সে! গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রকাশ ম্লানমুখে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলো। শেষ কয়েক ছত্রে দেখা যায়—

> 'এই স্টেশন, লোক জন, বিচিত্র বিকট শব্দ কি রকম নিষ্প্রভ অর্থহীন মনে হল প্রকাশের। যেন কোথায়, কত দূরে একটা উৎসব সেজে-গুজেও শেষ হল না! না! মুক্তির হাওয়া লেগে সব ভুলে সেই উন্মনা পাখি উড়ে গেছে।'

ভালবাসার সনাতনী ধারাতেই এইসব নায়ক-নায়িকাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে কাজল প্রথম যেদিন প্রকাশের বাড়িতে যাবে বলে কথা ছিল, সেই বিশেষ দিনটিরও কোনো মহিমাবোধ তার মনে জাগা পায়নি! সে এক 'উন্মনা পাখি' যার হৃদয় পড়ে আছে অভ্যস্ত স্বজন-সম্পর্কিতদের মধ্যে,—ফেলে-আসা গাছপালা-মাটি-জলের স্মৃতিতে। কলকাতা শহরটাই তার পিঞ্জর,—প্রকাশের সঙ্গে এক বছরের অন্তরঙ্গ আলাপের পরেও রোমাঞ্চহীন পিঞ্জর! একথা ভাবতে কষ্ট হয়। মানুষের মনের এরকম ফিক্সেশন বা সংবন্ধন,—প্রেমের চেয়ে কঠিন এই স্বজনাসক্তি আর যাই হোক্, প্রথম প্রেমের উন্মাদনা নয়। কাজল একটি সংবদ্ধ মন, প্রকাশ একজন হতভাগা নায়ক।

একালের বাংলা গল্পের প্রকৃতি এইসব দৃষ্টান্ত থেকে অনুভব করা যায়। অমলেন্দু চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯৩৪) 'কোনো এক লেখক বন্ধুকে' নামে গল্পটি পত্র-রীতিতে রচিত। চৈত্রের বিকেলে কলকাতার ময়দানে মানুষের দুঃসহ ভিড়ের প্রসঙ্গ দিয়ে এই চিঠি শুরু হয়েছে এবং—'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' বহুশ্রুত এই কবিতার লাইন দেখা দিয়েছে প্রথম কয়েক ছত্রের মধ্যেই। পত্রলেখকের ভূমিকায় আছেন লেখক নিজেই। এই অজস্র মানুষের ভিড়, জীবনের ক্ষিপ্র গতি ইত্যাদি বোধের মধ্যেই আধুনিক মানবমনের প্রসঙ্গ আছে—

> 'আপনি তো আধুনিক মানুষ, 'মডার্ণ ম্যান'। আপনি বুঝবেন। কাল রাতে মা মারা গেছেন ব'লে আজ পথ হাঁটতে হাঁটতে আমার পার্শ্ববর্তিনী সুন্দরী যুবতীর নরম ননীর শরীরটার দিকে একবার কি ফিরে তাকাবো না!'

মানুষ এইরকম পতঙ্গ হয়ে গেছে।

গল্পে জীবনানন্দের লাইন ব্যবহারের প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও লাইন আছে—'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত।

রাস্তায় ছোটো ফুটফুটে একটি ছেলে এক মোটরগাড়িতে চাপা পড়লো। পত্রলেখক লিখেছেন—

> 'ছেলেটার কান্না শুনতে পাইনি। চারদিকের মানুষ ছুটে এসে ছেঁকে ধরল ড্রাইভারকে। জানেন, আমার তখন হাসি পেল। ····· ঈশ্বরের পৃথিবীতে কি ভীষণ প্রাণের অপচয়। সেদিন আমার এক বন্ধু আত্মহত্যা করেছিল। কেন জানেন? আমি জানি না। বোধ হয়, ও নিজেও জানত না। ·· এক শেয়ালদা লাইনেই বছরে সাড়ে সাত শ' আত্মমৃত্যু। আপনার কি মনে হয়না আমাদের পিতৃপুরুষের ফুলের চাষ ব্যর্থ হয়নি আজও।'

উদ্দিষ্ট লেখক-বন্ধুকে অনুরোধ করা হয়েছে –

> 'একটা উপন্যাস লিখুন। দীর্ঘ উপন্যাস। দুঃখ যন্ত্রণা কান্না আর হাহাকার, ক্লীবত্ব অসহায়ত্ব পঙ্গুতা, সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস, দুর্নিবার স্বর্ণমোহ, লোভের উন্মত্ততা, প্রতিকারহীন অবিচার এ পৃথিবীর ব্যাধি। আপনার রচনায় সে পৃথিবী নায়ক হোক। নায়িকা নয়, নায়ক। 'মাতা ধরিত্রী' নয়,

CENTRAL LIBRARY

পৃথিবী বীর ক্ষত্রিয় হোক্ আপনার কলমে। প্রতিবাদে বলিষ্ঠ হোক। সূর্যদেবকে ধন্যবাদ। তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল দিয়ে গড়েছেন এপৃথিবী। মাত্র এক-চতুর্থাংশ এই মাটি। এই ক্ষুদ্রতাই আমাদের কল্যাণ।'

একালের গল্পে এইভাবে কবিতার অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে ক্ষণে ক্ষণে।

লোক-সংখ্যা ও জীবন-সমস্যা দুয়েরই বুদ্ধিজনিত বিষাদের অন্ত নেই। বেকার স্ত্রী-পুরুষের গ্লানি, আদর্শহীন যৌবনের লক্ষ্যহীন চঞ্চলতা, উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান ব্যর্থতাবোধ, একালের নতুন ধরনের বাবুবিলাস ও বিবিবিলাস—এসবও লক্ষণীয়।

'বাসনাহীন রমণীসম্ভোগ' বলতে কী বোঝায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ তা বলবার চেষ্টা করেছেন বা করে থাকেন। সেই সূত্রে দেখা দেয় পাপবোধ। তাঁর 'যুবক-যুবতীরা' (চৈত্র, ১৩৭৩) বই হয়ে প্রকাশিত হবার দশ বছর আগেই সুনীলের সেই কাহিনীগুলি লেখা শুরু হয়। ভূমিকায় তিনি এই কথা জানিয়ে আরো লিখেছেন—

> 'এই উপন্যাসে বর্ণিত জীবন কাল্পনিক নয়, কিন্তু চরিত্রগুলি সবকটি মনগড়া। উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীন ভাবে আমি কয়েকজন সরল যুবক-যুবতীর নিষ্পাপ জীবনের কথা ফোটাতে চেয়েছি। এই বইয়ের কয়েকটি চরিত্র আমার 'আত্মপ্রকাশ' নামের উপন্যাসেও উপস্থিত হয়েছে।'

অবিনাশ, বিমলেন্দু, ছায়া, অনিমেষ, পরীক্ষিৎ—এই কটি পৃথক পৃথক কাহিনীতে প্রবাহিত এই গল্পসংগ্রহের প্রথম চরিত্র অবিনাশ মিত্রের বয়স উনত্রিশ—সে অকৃতদার, তার বন্ধু অনিমেষের কর্মস্থল জব্বলপুরে তারই বাসস্থানে একদিন দুপুরে অনিমেষ যখন কাজে বেরিয়ে গেছে, পরীক্ষিৎ তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রী ছিল পাশের ঘরে; চুপচাপ বসে ছিল অবিনাশ,—সেই দুপুরের দৃশ্যের কথা ভাবলে,—অবিনাশ বলে—

> 'কেমন যেন ঝন্‌ঝন্ করা শব্দ শুনতে পাই, জামার মধ্যে হঠাৎ কোনো পোকা ঢুকে যাওয়ার মত অস্বস্তি বোধ করি। আমি জীবনে কোনো পাপ করি নি। আমার শাস্তি পাবার ভয় নেই। মাথার ওপর সবসময় দণ্ডাজ্ঞার ছায়া রয়েছে এমন মনে হয় না। জীবনে কারুর ক্ষতি করিনি সজ্ঞানে, চোখ মেলে পৃথিবীকে যে-রকম দেখা যায়, আমার কাছে পৃথিবী ঠিক সেইরকমই, আর কিছু না, না স্বপ্ন, না আয়না। আমি কোনোরকম বাসনাকে বন্দী করতে চাইনি কখনো, মৃত্যুর চেয়ে জঘন্য মানুষের অতৃপ্ত বাসনা ভেবেছি। জব্বলপুরে আমি কি করেছিলাম, সে কি পাপ? গতবছর শেষ শীতে, সেই জব্বলপুরের দুপুরে?'

অবিনাশের এই পাপবোধ,—পরীক্ষিতের উগ্র বিবাহ-বিদ্বেষ তথা সুখে অবিশ্বাস,—জীবনানুরাগের প্রতি কটাক্ষ,—অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রীকে বিনা ভূমিকায় এবং তারও আপত্তি ব্যতিরেকে অবিনাশ এক দুপুরে ভোগ করে এবং তার মনে পড়ে তাপস নামে আর একজনের কথা,—যে বলেছিল—'স্ত্রীলোকমাত্রই সুলভ, ওরা ভালোবাসা চায় না, ওরা গোপনতা চায়। ওদের জন্য ভালোবাসা খরচ করার দরকার নেই। ওরা চায় গোপনে অত্যাচারিত হতে।'—ইত্যাদি।

একদিন এই বন্ধুসম্মিলনের মধ্যে সেই তাপসও এসে যোগ দেয়,—তারা প্রত্যেকেই সাধারণ যুবাধর্ম অনুসারে রমণীতে আগ্রহী। তাপস গল্পলেখক,—অনিমেষ কবি,—কলকাতা থেকে কবি সুধীন দত্তের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আসে তাপস এবং অনিমেষ বলে—'একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিস, সুধীন দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ এদের কারুরই মৃত্যু

CENTRAL LIBRARY

স্বাভাবিক নয়। অসুখে ভুগে ভুগে মরলে এদের যেন মানাতো না।' পরীক্ষিৎ নাটক লেখে (পৃঃ ৪২) কিন্তু সমকাল কেমন যেন নিষ্ফলা,—সেও লিখতে পারছে না,—সে বলে 'কার জন্যে লিখবো?' কথায় কথায় অশ্লীল কথা বলা এদের স্বভাব,—লেখক বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে লেখেন—'ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য'। এইসব ঘটনা, পরিস্থিতি, মন্তব্য থেকে এ-কাহিনীর আবহাওয়ার ধারণা পাওয়া যাবে। পরীক্ষিৎ বলে—'আমার নাটকটার জন্য কাঁচা মাল দরকার। আমার অনিমেষকে চাই।' অনিমেষ-গায়ত্রী দম্পতির সুখ সহ্য হচ্ছে না এদের। পরীক্ষিৎ দেখে ফেলেছিল ব্যাপারটা। অনিমেষের মনে অবিনাশ-গায়ত্রী ঘটিত সেই দুপুরের ঘটনাটা সে পৌঁছে দিতে চায়। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীর তীরে চার বন্ধু এবং ঐ বন্ধুপত্নীর ভ্রমণের মধ্যে—একটা বেড়ার ওপর বসে পরীক্ষিৎ অনিমেষের নাম ধরে ডাকতেই, অবিনাশ এগিয়ে এসে, সিগারেটের জন্যে আগুন চাইবার ছল ক'রে 'ডান হাত দিয়ে ওর পেটে একটা আলতো ধাক্কা দিতেই হাত দুটো ওপরে তুলে বাতাস ধরার চেষ্টা করে পরীক্ষিৎ উল্টে পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই বিষম অনুশোচনায় অবিনাশের মন ভরে গেল। এই অনুশোচনাও বিকার!—'ছি, কেন পরীক্ষিৎকে আমি জলে ফেলে দিলুম। খুবই বোকার মতন কাজ হলো এটা। কোনো মানে হয় না। ও খুবই ভালো সাঁতার জানে,—নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। এর বদলে ওকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।' ছাপা চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার প্রথম পর্ব অবিনাশ-প্রসঙ্গ এখানে শেষ হয়েছে।

বিমলেন্দু-কাহিনীটি আরো আলগা ধরনের। এক বিকেলে তাপস, অবিনাশ, হেমকান্তি—তিনজনে ব্রিজ খেলছিল চারজনের তাশ বিছিয়ে। সেই সময়ে বিমলেন্দু এলো। জুতো খুলে পাশের ঘরে গিয়ে সে প্রসাধনরতা মায়াকে দেখতে পায়। মায়ার দিদি ছায়া বিমলেন্দুকে ভালবাসে। কিন্তু তার লিউকোমিয়া হয়েছে,—এবং সে সেকথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু তার অসুখের কথা উচ্চারিত হবার আগেই ছাদে ওঠার পথে দাঁড়িয়ে বিমলেন্দু বলেছে—'পৃথিবীর দিন এসে গেলেও—একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি, একথা বলায় কোনো আধুনিকতা নেই।' এদিকে অবিনাশ মায়াকে নিয়ে সিনেমা দেখতে চলে গেছে। অন্যান্য যুবকদের মধ্যে পরীক্ষিৎও এসেছে,—তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—ইত্যাদি দৃশ্য ও ঘটনার মধ্য দিয়ে এই কাহিনী এগিয়েছে। একটা কড়া উত্তেজনার রস জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন সুনীল। হঠাৎ একালের এইসব গল্পের সঙ্গে তিরিশের দশকের নিরুত্তাপ ইস্কুল-মাষ্টারের জীবনের একটি খুবই মামুলি দাম্পত্য প্রেমের গল্প—বুদ্ধদেব বসু রচিত 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, সে যুগেও গল্পে বিষাদ ছিল, কবিত্বও ছিল—এবং রবীন্দ্রনাথের কোনো গান বা কবিতা বা অন্য কোনো সূক্তির মধ্য দিয়ে কঠোর বাস্তব সেক্ষেত্রে স্বপ্নময় বলে প্রতিভাত হোতো। আর, একালে দুঃস্বপ্নই প্রধান। নিকট বর্তমানে প্রেমের জৈব দিকটির ওপর ঝোঁক বেড়েছে, বিশুদ্ধ দৈবভাবটি এখন আর লেখকদের মনে ধরে না। অচিন্ত্যকুমার, যুবনাশ্ব, বুদ্ধদেব,—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁরা জৈব দিকটি উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করে গেছেন,—একালের লেখকরা, অনেকক্ষেত্রেই সে-দিকটির ওপর আরো স্থূলভাবে জোর দিচ্ছেন। সমরেশ বসু তাঁর বিভিন্ন গল্পে কোথাও শহরতলীর কোনো এক রেলষ্টেশনে বৃষ্টি আর অন্ধকার গুমোটের রাত্রে ভিখিরির শুভবিবাহের ('শুভবিবাহ') দৃশ্য দেখিয়েছেন, কোথাও বা সাইকেলরিকশার মালিক রতনের সঙ্গে তার রিকশাচালকদের দ্বন্দ্ববিরোধের ('কটিচার') ঘটনা,—কোথাও সমাজের নিচের স্তরের আরো নানা ঘটনা, দৃশ্য, পরিস্থিতি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রভৃতিও কখনো কখনো তেমনি করেছেন, কিন্তু শুধু প্রসঙ্গগত সাদৃশ্যটাই বিবেচ্য নয়—বিবেচ্য এঁদের পৃথক পৃথক ভঙ্গির প্রবণতা। প্রায় সব গল্পেরই বিষয়বস্তু বর্তমান সমাজ; কিন্তু এঁদের দৃষ্টি নানাবিধ।

CENTRAL LIBRARY

সন্তোষকুমার ঘোষেরও বিষয়বস্তু—একালেরই মানবজীবন; ১৩৬০ সালে তাঁর 'পারাবত' গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়; 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য বই সুপরিচিত—'পারাবতের' ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন যে 'পারাবত' ও 'স্বয়ম্বরা' গল্প দুটিতে বিদেশী প্রভাবও আছে। কিন্তু আমাদের লেখকদের কোন্ বিশেষ গল্পে কোন্ বিদেশী লেখকের কোন্ রচনাসূত্রে কী প্রভাব এসেছে, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান অন্য গবেষণার কাজ। এ-প্রবন্ধের লক্ষ্য তা নয়। সন্তোষকুমার জীবন সম্বন্ধে এক করুণ দার্শনিকতাবোধের মানুষ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর বাচনভঙ্গি ও চিন্তার কতকটা মিল অনুভব করা যায়, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। যা জৈব যা পার্থিব, যা মানুষের দেহ-মনের চেতনার বিষয়,—সেদিকেই তাঁর শিল্পিমনের লক্ষ্য।

বিষয়ের দিক থেকে এখনকার বাংলা গল্প-লেখকদের দৃষ্টিগত সাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য এবং রীতির বিচিত্রতাও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। গল্পের সূচনার কায়দা, গঠনের শিল্প, উপসংহারের ভঙ্গি ইত্যাদি বিবেচ্য। কিন্তু সেসবও গৌণ ব্যাপার। প্রধানতঃ সামগ্রিক আবেদনটাই মনে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অমোঘ', সন্তোষকুমারের 'শোক', বিমল করের 'জননী' বা 'সোপান,'—ভিন্ন ভিন্ন পর্বের এইসব লেখকের এইসব গল্পের আবেদন পাঠকের রসানুভূতিতে আশ্রয় পায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—সময়ের দিক থেকে এবং খ্যাতির দিক থেকে বেশ সুদূর-ব্যবহিত দুটি নাম, কিন্তু রসানুভূতির কষ্টিতে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন,—অন্তত একটি গল্পে সন্দীপনকেও আমার সেইরকম উত্তীর্ণ একজন লেখক বলে মনে হয়। প্রবোধকুমার সান্যালের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর দৃশ্যক্ষেত্রের পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এঁদের বিশেষ বিশেষ গল্প আবেদনে সমান স্মরণীয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুশল পাহাড়ী' গল্পের প্রকৃতি-বর্ণনা দেখে, কখনো বনফুলের শক্তি কখনো বা অন্য কারও সামর্থ্যের কথা মনে পড়তে পারে, কিন্তু আবেদন শুধু বর্ণনা বা বক্তব্যগত নয়, সব রচনার ক্ষেত্রেই আবেদন হোলো পাঠক-মনের এক সামগ্রিক স্পন্দন। 'কুশল পাহাড়ী'র আবেদনার্থক সেই স্পন্দনের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি'-র স্পন্দনে বিষয়গত বা উপকরণগত যতোই ভেদ থাক, ভাবগত অনৈক্য আছে বলে মনে হওয়া সম্ভব কি? দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—এই দুজনের মধ্যে রীতিগত পার্থক্য বিশেষভাবে মনে পড়ে। গৌরকিশোর ঘোষ আর মতি নন্দী সমসাময়িক,—কিন্তু পৃথক রীতির লেখক। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানে পাঠকের চেতনায় বিশেষ এক আবেদন—যা সমকালীন তারাশঙ্কর বা অন্য কোনো প্রিয় প্রসিদ্ধ লেখকের সাদৃশ্যচিহ্নিত নয়।

বিষয় কোন্ ছাঁচে ঢালাই হয়েছে, আবেদন-ব্যাপারটি বোধ হয় অনেকাংশে তার ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ রূপ বা ফর্ম-এর চিন্তা এইসূত্রে বিশেষভাবে দেখা দেয়। কিন্তু রূপের প্রতি আগ্রহের বাড়াবাড়ি,—তথাকথিত মনঃস্রোত অনুসরণের ভঙ্গি, উদ্ভট অসংলগ্ন বাক্যস্রোত চলতে দেওয়া, এসব লক্ষণও এখনকার গল্পে ঘটছে। সাঙ্কেতিকতা বা প্রতীকী রীতি শুধু রীতির জন্যেই প্রধান হয়ে উঠলে তা মনোহারী হয় না। ছোটোগল্পের আয়তনও যেমন সুনির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না, রূপ বা ফর্মও তেমনি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা যায় না। বক্তব্য নিজেই নিজের ভঙ্গি ও আয়তন নির্বাচন করে নেয়।

১৯৫০-এর দশকের সূচনাতেই গল্পলেখক হিসেবে বিমল কর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্পের' (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫) ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ 'দ্বন্দ্ব' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'পিয়ারীলাল বার্জ' ও 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইঁদুর' গল্পের উল্লেখ করেন। সেই ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে, শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের (রূপদর্শী) সঙ্গে তিনি প্রথম দেশ-পত্রিকার আপিশে এসেছিলেন

CENTRAL LIBRARY

১৯৫২ সালের নভেম্বরে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর গল্প 'বরক সাহেবের মেয়ে' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬২, মোটামুটি এই দশ বছরের মধ্যে লেখা বারোটি গল্প তাঁর এই শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্কলনে জায়গা পেয়েছে। 'মানবপুত্র', 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'উদ্ভিদ', 'আত্মজা', 'পলাশ', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'আঙুরলতা,' 'যযাতি', 'শূন্য', 'সুধাময়', 'অপেক্ষা' 'জননী'—সঙ্কলনের এই গল্পগুলিতে তাঁর অন্যান্য গল্পের মতোই ছোটোগল্পের নাট্যগুণ আছে,—চিত্রণসৌকর্য,—কোথাও বা সাঙ্কেতিকতা,—এবং সর্বত্রই তাঁর স্বকীয়তা। জীবনের কঠোর দুঃখ—যা অনেকটাই বাস্তব শারীরিক যন্ত্রণা,—যেমন ক্ষুধার্তের কষ্ট,—আবার মানসিক অভাববোধ, যেমন মিলনের অনিশ্চিত প্রতীক্ষা,—নিঃসঙ্গতার দংশন—বিমল করের গল্পে এই দুরকম যন্ত্রণাই প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ একরকম সাঙ্কেতিকতায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'মানবপুত্র' গল্পে শালবনীর মেলায় কার্তিক পূর্ণিমার কুয়াশা-ভেজা জ্যোৎস্নায় ভিখারিণী গঙ্গামণিকে দেখে চায়ের দোকানের সতেরো-আঠারো বছরের কিশোর চাকর কেষ্ট প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি, পরে মনে পড়েছে প্রথম দর্শনের স্মৃতি—চাঁচুরিয়াতে দেখা দুর্ভিক্ষের দিনের নোংরাতে প্রকাশ্য ব্যভিচারের মধ্যে দেখা পুরোনো গঙ্গামণিকে—'সেই চিল চোখ, হাড়াতে, হ্যাংলা, লোভী, দস্যি মেয়েটাকে।' সেই চাঁচুরিয়াতেও কেষ্ট একটা রেষ্টুরেন্টে কাজ করতো,—গঙ্গামণি ক্ষুধার তাড়নায় এসে জুটেছিল সেখানে। মানুষের যন্ত্রণা দেখতে দেখতে—একদিকে ঐশ্বর্য অন্যদিকে অশেষ দরিদ্র্য—এই বৈষম্যে পীড়িত হতে হতে,—ছেলেবেলায় মিশনারিদের মালীর কাজ করতে গিয়ে পাওয়া 'সুসমাচার পড়তে বসে কেষ্ট। কুপির আলোয় যীশুর ছবি দেখে সে—'মাথায় কাঁটার মুকুট, কপালে রক্তবিন্দু—করুণনেত্র যীশু চেয়ে আছেন ঊর্ধ্বপানে।' গঙ্গামণি কেষ্টর পাশাপাশি গ্রামের মেয়ে। আহারের 'লোভের আভায় গঙ্গামণির চোখ দগদগে ঘায়ের মত জ্বলত।' সেই গঙ্গামণি এক বাবুর বাড়িতে কাজ পেয়েছিল—'সেই হারামজাদা শয়তান মিনশেটা ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাতের লোভ দেখিয়ে তাকে শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। হেথায় হোথায় করে কাটল কিছুদিন। তারপর একদিন পালিয়ে গেল।' তারপর গঙ্গামণি এসে ওঠে আর এক জায়গায়, – সেখান থেকে এসেছিল শালবনীর মেলায়। কেষ্টকে সে বলেছে—'আর লারি কিষ্ট। ব্যাধি হল শরীলে, বল নাই। এ জ্বলন সামলাতে লারি। তুই সাথে লিয়ে চল আমায়।' রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে কেষ্টর রেস্টুরেন্টে খাবার নিতে আসতো গঙ্গামণি। এদিকে রেস্টুরেন্টের কারিগরের সঙ্গে কেষ্টর তখন রেষারেষি চলছিল। সেই কারিগর নটবর দোকানের মালিক মদনবাবুর কাছে কেষ্টর বিরুদ্ধে নানা কথা লাগায়। তারপর আসে প্রলয়রাত্রি! মালিক মদনবাবু ভুলে তাঁর টাকা ফেলে গিয়েছিলেন দোকানে,—কেষ্টকে চোর সন্দেহ করে গভীর রাত্রে মালিক ফিরে এসে দেখেন গঙ্গামণি বসে বসে খাচ্ছে! দরজায় লাথি মেরে ঘরে ঢুকে কেষ্টকে প্রহার ক'রে গঙ্গামণির পেটে এক লাথি মারেন—তারপর—রক্তের স্রোত,—গঙ্গামণির কাপড়ে, উরুতে, মেঝেতে! পাংশু মুখে মদনবাবু চোখ ফিরিয়ে নেন। বলেন—'এখানে এই সমস্ত হচ্ছে? পেট খসানো! আচ্ছা—দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি তোমার। যাচ্ছি থানায়।' বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে মদনবাবু বেরিয়ে যান। গল্পের শেষ তিন পৃষ্ঠায় আর্ত মাতৃদেহ থেকে সন্তান জন্মের দৃশ্য। যীশুর ছবি চোখে পড়ে কেষ্টর—

> 'কী এক অদ্ভুত তীব্র অনুভূতিতে বেদনায় আকুল হয়ে কেষ্ট তাকাল নীচে, রসুন-পিয়াজ, মাংস-মশলা এঁটো-কাঁটা ছড়ানো ধোঁয়া-কয়লার কটু বাষ্পভরা রেস্টুরেন্টের আধো-অন্ধকার মাটির দিকে গঙ্গামণির রক্ত আলপনার পাত্রে সাজানো মাংসপিণ্ডটা যেখানে ককিয়ে উঠছে থেকে থেকে।'

বিমূঢ়, বিচলিত, বিহ্বল কেষ্ট সেখানে কি যেন দেখছে, কি যেন খুঁজছে।

অনাহারে ক্লিষ্ট, হাড়-হাভাতে কালো একটি রমণী-শরীরে কোন্ অপরিচিত জন্মদাতা সন্তানের বীজ রেখে

CENTRAL LIBRARY

নিরুদ্দেশ,—দয়ামায়াহীন ব্যবসায়ী মদনবাবুর পদাঘাত,—নিরপরাধ অসহায় কেষ্ট,—দেয়ালে যীশুর ছবিতে উনুনের আঁচের আভা! পুলিস নিয়ে অতঃপর মদনবাবু ফিরবেন বোধ হয়,—এই দৃশ্যেই গল্প শেষ হয়েছে। নাটকের দৃশ্য-সূচনার মতো এ-গল্পের সূচনা, নাটকের সমাপ্তির মতোই এ-কাহিনীর সমাপ্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', মনে পড়ে যায় হঠাৎ। রীতি আলাদা বটে, কিন্তু দুটির মধ্যে মিল আছে।

'পার্ক রোডের সেই বাড়ি' গল্পটিতে বার্নপুরের পার্ক রোডের বেশ সম্পন্ন ছিমছাম পরিবারে চন্দনা বলে একটি মেয়ের নিঃসঙ্গতাই মূল কথা। মাসির বাড়িতে শিক্ষা, শান্তি, সচ্ছলতা সবই আছে; চন্দনার বিয়ের পাত্র সন্ধান চলছে,—রোজই কিছু কিছু চিঠি আসে, মাসি চন্দনাকে চিঠি দেখতে দেন, পাত্রের নির্বাচনেও তার সম্মতি চাওয়া হয়,—কিন্তু মাসির পছন্দর সঙ্গেই তাকে সম্মত হতে হয়। অবিবাহিতা মেয়েটির ভীরু, মমতা-সন্ধানী মনোভাবের ওপরেই এ গল্পের প্রধান মনোযোগ। মনের প্রতি এই মনোযোগ বুদ্ধদেব বসুর রীতির স্মারক।

'উদ্ভিদ' এক বিশেষ পরিস্থিতির কাহিনী যা প্রেমেরই পরিস্থিতি বলা যায়। এতে নায়কের অনুভূতি আছে, অথচ মিলনে প্রত্যাশিত সক্রিয়তার স্বল্পতা। রানী সুবর্ণসুন্দরী একটি কলেজ খুললেন; উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তাতে বলেন—'আসল আলোয়, দিনের আলোয় এই জগৎকে আমি দেখতে জানি।'—'রাজ-পরিবারের ক'পুরুষের বিলাসব্যসনের গোপনতীর্থ এই বাগানবাড়ির কলুষিত অন্তরকে ভেঙে চুরমার করে সর্বজনের বিদ্যার তীর্থে পরিণত করলাম, তুলে দিলাম আপনাদের হাতে।'—এবং—'মনে রাখতে হবে আমরা অ্যানিমল—হায়ার অ্যানিমাল। আমরা রেসপন্‌ড্‌ করতে পারি, রি-অ্যাক্ট করতে জানি। বাইরের ডাকে সাড়া দিতে এবং আঘাতে নিষ্ক্রিয় না থাকার ধর্মই আমাদের, অ্যানিমালদের। আমরা ভেতর থেকে দিনে দিনে বাড়ি, নিজেকে প্রসারিত করি। এগিয়ে চলেছি আমরা। তাই শিক্ষা।' এই বক্তৃতাটুকুই নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা ঘটার গভীর সঙ্কেত। উদ্ভিদবিদ্যার তরুণ অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশের ক্লাসে রাজকুমারী চন্দ্রাও অন্যতমা ছাত্রী। উভয়ের মধ্যে আকর্ষণও ঘটলো। কিন্তু পূর্ণেন্দুবিকাশ যেন উদ্ভিদের মতোই নিষ্ক্রিয়। তাকে 'প্ল্যান্ট-প্রফেসর' বলে ঠাট্টা করতো ছাত্রদল। চন্দ্রার বিয়ে হোলো অন্য যোগ্য পাত্রের সঙ্গে। পাঠককে ভাবতে হয়—পূর্ণেন্দুবিকাশ কি সত্যিই তথাকথিত নিষ্ক্রিয় উদ্ভিদের মতো, নাকি সত্যিই 'হায়ার অ্যানিমাল' বলে দ্বিধা এসেছিল তার মনে? বিত্তগত বংশগত ব্যবধান কি যথার্থ বিবেচনাশীল নায়কের মনে না জাগবার কথা? আবেগসর্বস্ব নায়ক যাতে প্রবলভাবে সক্রিয় হতে পারে,—হায়ার অ্যানিমালের বিচার ও অনুভূতির দ্বন্দ্বই হয়তো পূর্ণেন্দুবিকাশকে সেরকম হতে দেয়নি।

এইসব চিন্তা, সঙ্কেত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মকথার ভঙ্গি এ পর্বে অনেকেই দেখাচ্ছেন। তবে সত্যি দীর্ঘস্মরণযোগ্য সার্থক রচনা বিরল। অনেক লেখক এখন! সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। একটু নমুনা মাত্র দেখা যেতে পারে। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আজকের গল্প' প্রকাশিত হয়। তাতে মোট সাতাশটি গল্প সঙ্কলিত হয়। অজয় গুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চন্দ (জ. ১৯৩৮), অরুণেশ ঘোষ (জ. ১৩৪৮), অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত (জ. ১৩৪৬), আশিষ ঘোষ (জ. ১৯৩৯), উদয়ন ঘোষ, কবিতা সিংহ (জ. ১৯৩৪), কল্যাণ সেন (জ. ১৯৪১), কালিদাস রক্ষিত (জ. ১৯৩৮), তুষার রায়, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১৯৪২), নিখিলচন্দ্র সরকার (জ. ১৯৩৫), প্রলয় সেন (জ. ১৯৩৪), বলরাম বসাক (জ. ১৯৪৩), বুদ্ধদেব গুহ (জ. ১৯৩৬), মিহির মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী (জ. ১৯৩৪), রবীন্দ্র দত্ত (জ. ১৯৩৯), রমানাথ রায় (জ. ১৯৩৯), শুদ্ধশীল বসু (জ. ১৯৪৫), শেখর বসু (জ. ১৩৪৬), সত্যেন্দ্র আচার্য (জ. ১৯৩৪), সমীর রায়চৌধুরী, সুব্রত সেনগুপ্ত (জ. ১৯৪২), সুভাষ সিংহ (জ. ১৯৩৮), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—এই সাতাশ জন লেখকের সাতাশটি

CENTRAL LIBRARY

গল্পসংগ্রহের সম্পাদক এটিকে বিমল কর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প' সঙ্কলনের পরিপূরক হিসেবে সূচিত করেছেন। 'পরিপূরক' কথাটির ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন—'পরিপূরক অর্থে দ্বিতীয় খণ্ড নয়, সময় বা বয়েসের পরবর্তী স্তর হিসেবেও নয়। আমি বিশ্বাস করিনা পাঁচ কিংবা দশ বছরেই আধুনিকতার ধারা পাল্টে যায়, রীতির বিবর্তন হয়। নতুন লেখকদল যে প্রবীণের বাধা ভেদ করে নিজেদের রচনা নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন পরে তাঁরাই যে আবার নতুন তরুণদলকে প্রবেশে বাধা দেন সম্পাদক মশাই সে-কথা উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক, এই নতুন দলের লক্ষণ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—'ইদানীংকালের আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাংরি জেনারেশান—যাঁদের মূল বক্তব্য সমস্ত মূল্যবোধের বিনাশ; এবং 'এই দশক' যাঁরা 'শাস্ত্রবিরোধী' রচনার প্রয়াসী।' এই দলের মধ্যে বিনাশী শক্তি ব্যক্ত বলে যাঁরা মনে করেন, সম্পাদক তাঁদের জানিয়েছেন—'যে-কোনো ধ্বংস বা দক্ষযজ্ঞের কথাতেই সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং নিশ্চিত কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়।..... যিনি পোড়খাওয়া পাঠক তিনি কোনো সাহিত্য আন্দোলন দেখেই বিচলিত হন না, তিনি জানেন, কোনো সাহিত্য-আন্দোলনই পাঁচদশ বছরের বেশি টেঁকে না, এবং এর থেকে কয়েকজন লেখক ঠিকই বেরিয়ে আসবেন।' তিনি আরো লিখেছেন—'কল্লোলযুগের পুরোধা লেখকদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম ও যশোরের গ্রাম থেকে এগিয়ে এসেছিলেন তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ,—কিন্তু এঁরাও কল্লোল আন্দোলনের সুফল ভোগ করেছিলেন, ওঁদের জন্যই এঁদের সাহস ও সীমানা যে আরও বিস্তৃত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' অতঃপর আলোচ্য সঙ্কলনের গল্প-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি পাওয়া যায়—'এক সময় নিঃসঙ্গতা ও দুঃখবোধের যে প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে—তার থেকে স্পষ্ট তফাৎ দেখা যায় এইসব রচনায়, দুঃখ সম্পর্কে এসেছে পরিশীলিত নির্লিপ্ততা,—নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে কৌতুকবোধ। বিশুদ্ধ গল্প তৈরী করার ব্যাপারে এ পর্বে প্রায় কারুরই কোনো আগ্রহ নেই, গল্প যেন জীবনের ধারাবাহিকতার এক একটি টুকরো, প্রায় সব গল্পেরই নায়ক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে লেখক নিজে। সেই হিসেবে যে-কোনো রচনাই স্বীকারোক্তিমূলক। অনেক লেখক সম্পূর্ণ বাস্তবভাবে-দৃশ্য রচনায় চরম দক্ষতা দেখিয়েছেন যেমন তেমনি সম্পূর্ণ বিমূর্ত দৃশ্য রচনাতেও অনেকে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, কেউ কেউ বা এই দুইকে সূক্ষ্মভাবে মেলাতে পেরেছেন। শেষোক্ত আঙ্গিকটির এতকাল অভাব ছিল বাংলাদেশে।'

নিঃসঙ্গতার দুঃখ যদি কৌতুকে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে স্থূলভাবে বেঁচে থাকবার সাময়িক সহায় হিসেবে তা উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু নিঃসঙ্গতাকে স্থানচ্যুত করে স্বাস্থ্যকর সঙ্ঘবোধ আসুক,—এইটেই বোধহয় শ্রেয়তর প্রার্থনা। দ্বিতীয়ত গল্প অতঃপর আর সূচনা-পরিণতি-উপসংহারময় সুবিন্যস্ত, সুগ্রথিত ব্যাপার না হয়ে গল্পকারের আত্মনিরীক্ষার খণ্ডমাত্র হয়ে উঠছে। বিমূর্ত দৃশ্যকে সূক্ষ্মভাবে মিলিয়ে দেবার ঘটনা এ-পর্বের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। সম্পাদকের সূত্রনির্ণয় থেকে সাম্প্রতিক বাংলা গল্প-প্রকৃতির এই লক্ষণগুলি এই সঙ্কলন-প্রসাদে একে একে বোঝা গেল।

সঙ্কলিত গল্পগুলির মধ্যে অজয় গুপ্তের 'একজন দ্বাররক্ষীর স্বপ্ন' কিঞ্চিৎ ঘটনাশ্রিত ও লেখকের বাল্যস্মৃতি কথনের ভঙ্গিতে রচিত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নাম 'বৃষ্টির আগে' (অশ্লীল গল্প)'। নাম থেকেই লেখকের বিশেষ অভিমুখিতার ইশারা পাওয়া যায়; সম্পাদক যাকে বলেছেন বাস্তব আর বিমূর্ত দৃশ্য মেলাবার চেষ্টা, মনে হয় সে প্রয়াস এই রচনাটিতে কতকটা বিদ্যমান। সমাজে প্রতিপত্তিশালী প্রৌঢ়, সম্পন্ন দেবীবাবুর মেয়ে কিশোরী করুণা আর তাঁর বালক-ভায়ে অংশু—বাড়ির গৃহিণী বিধবা অন্নদা,—সেই অন্নদার সঙ্গে দেবীবাবুর দৈহিক-মানসিক

CENTRAL LIBRARY

অবলম্বনের সম্পর্ক,—প্রচণ্ড খরায় ভূমির তৃষ্ণা এবং অতিক্রান্তবসন্ত দেবীবাবুর মনে অন্নদা-ঘটিত তৃষ্ণা,—জন্মনিরোধের উপায় 'লুপ',—'লুপ' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আশুর কৌতূহল ও কৌতুকজনক অপব্যাখ্যার দ্বারা দেবীবাবুর তথ্য-সংগোপনের চেষ্টা,—দীন-দরিদ্র চাষীর দুঃখ, ভোটে জয়লাভের জন্যে দেবীবাবুর অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার—এইসব উপাদানের যোগে এ গল্পে গল্পরস আর কবিতার রস জায়গায় জায়গায় যেন বেশ মিশে গেছে।

অমল চন্দের 'সন্ধিক্ষণ' গল্পটি প্রত্যক্ষতঃ জন্তু নামে একটি বালকের প্রথম একা চূর্ণী নদীর একটি বাঁকো পেরোবার দ্বিধা-ভয়-সঙ্কল্পের অভিজ্ঞতা। আবার বাবা বা অন্য কোনো অভিভাবকের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনের পথে একা হাঁটবার, বিপদের নদী একা পার হবার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবেও এর ব্যঞ্জনা আছে। অরুণেশ ঘোষের 'খাবা' এক ধরনের কল্পচিত্র বা ফ্যানট্যাসি যাতে গল্পের কথক পমি নামে নায়িকার শরীর সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আসক্তির ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন,—কোনো রোমান্টিক মাধুরী নয়,—ক্ষুধার বিকারের ছবি এটি। সেইসঙ্গে ঘরের রেডিও, আয়না, বাথরুমের লাল বালতি—এরাও কথা বলেছে। অশোকরঞ্জন সেনগুপ্তের 'আয়ুধ' চল্লিশ বছরের নিঃসঙ্গ মানুষ—যাঁকে 'আবছায়া অন্ধকারে খোলা মাঠে খুব শীর্ণ নিঃসঙ্গ অর্ধমৃত কোনো গাছের ছবি বলে মনে হয়, তাঁর একটি বন্দুক কেনা এবং লক্ষ্যবেধের বিচিত্র প্রয়াসের তলে তলে নিহিত বালক-সঙ্গী পল্টুর মা রেবার প্রতি তাঁর আকর্ষণ,—তাঁর নিজের জীবনের শূন্যতা, এবং সার্থকতার লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে তাঁর ব্যর্থতা বন্দুকধারী দ্বিজেন্দ্রলালের মিস্-ফায়ার ঘটিত অভিজ্ঞতায় সঙ্কেতিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সম্পাদক মশাই যাই বলুন,—এ নিঃসঙ্গতাও কৌতুক নয়,—বিরক্তির তিক্ততা এর ছত্রে ছত্রে। আশিস ঘোষের 'যদি' আর একটি সাঙ্কেতিক গদ্য রচনা যাতে কথক তাঁর নিজের ঘরেই আবদ্ধ আছেন,—এবং পাঁচ পৃষ্ঠার এই ছাপা রচনার শেষ তিন ছত্রে তাঁর যন্ত্রণা কবিতার অন্তিম আঘাতের ভঙ্গিতে শুধু এই দীর্ঘশ্বাসে ব্যক্ত—

যদি, একবার এই দেওয়ালটা পেরুতে পারি!
যদি, একবার ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি!!
যদি, একবার বাইরে যেতে পারি!!!

রমানাথ রায়ের 'কোকো' একটি দ্বৈত সংলাপময় রচনা যাতে কোকো আর কিকি এই অদ্ভুত নামের দুই নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমালার মধ্য দিয়ে স্মৃতি ও সত্তার অবলুপ্তির কথা ফুটেছে। মনের যন্ত্রণার রূপায়ণ এইসব গল্পের একটি সাধারণ সূত্র বললে অত্যুক্তি হবে না,—সহজ স্ফূর্তির পরিবর্তে ক্ষণে ক্ষণে স্নায়ুপীড়ার অভিজ্ঞতা দেখা দিয়ে যায়। উপমা রূপক ইত্যাদির প্রয়োগেও সে যন্ত্রণা ধরা পড়ে—যেমন এই সঙ্কলনে কবিতা সিংহের 'সব হিসেবের বাইরে' নামে লেখাটিতে সত্যেন নামে ডাক্তার নায়কের 'ব্যাটারিডাউন মেজাজ'-অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার মনের 'সুইচ বোর্ডে গোলমাল হয়ে গেছে'—'হাসপাতালের একনাগাড় শুয়োর-মাংস আবহাওয়া' ইত্যাদি! কাহিনীর আদি-অন্ত-পরিণামঘন বর্তুলতার পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তি-জগতের বহির্ভূত এক ধরনের ফ্যানট্যাসির অদ্ভুত পরিমণ্ডল,—শিথিল-সংযুক্ত কতকগুলি কল্পনাচিত্রের ধারা দেখা দেয়—যেমন বলরাম বসাকের 'নাগরদোলা'-তে। বুদ্ধদেব গুহর 'ইচ্ছার দাম' অথবা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মাটি' ইত্যাদি এরকম ফ্যানট্যাসিধর্মী রচনা নয়। এসব গল্পে গল্প আছে, কিন্তু সেও যন্ত্রণার স্বাদময়,—কেউ কারও ইচ্ছার দাম দেয় না জগতে—'কোনো নির্জন দুপুরের ফিরিওয়ালার মত মনের ডালিতে তার সমস্ত সুগন্ধি ইচ্ছার ফুলগুলি সাজিয়ে রাজা কতদিন ফিরি করে ফিরেছে। কেউ তার ইচ্ছার কোনো দাম দেয়নি। তার সব ইচ্ছার ফুল রোদের তাপে এক এক করে শুকিয়ে

CENTRAL LIBRARY

গেছে। তবুও তার কাছে সকলে ইচ্ছার দাম দাবী করে এসেছে।' এ সবই অনুভূতির ক্লিষ্ট অন্ধকার। একালের বাংলা গল্পের এইসব উদাহরণ থেকে এইবার একটু সরে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়।

প্রমথ চৌধুরীর 'বড়বাবুর বড়দিন' ১৩২৩ সালের গল্প। তাঁর 'একটি সাদা গল্প' তারই কয়েক মাস পরের রচনা। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগেকার এইসব গল্পে দেশের অন্য মেজাজ ব্যক্ত হয়েছিল। সে মেজাজে পরিহাস, আবেগের সঙ্গে বুদ্ধি-বিচারের সংঘর্ষ, ব্যক্তি ও সমাজ-মনের পরিচয় সবই ছিল, কিন্তু সর্বাধিক যা গুণ সে ছিল তিক্ততা নয়, বিমুখতা নয়,—জীবনের প্রতি আকর্ষণের স্বাদ। জীবনের প্রতি আকর্ষণ, বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রতি অনুরাগ এমন ভাবে ঘটেছিল যাতে গল্প যেসব ক্ষেত্রে কতকটা প্রবন্ধের মতো হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রেও যথার্থ জীবনানুরাগ আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। স্নায়ুপীড়িতের রোগশয্যা হয়নি গল্প। তাঁর 'ছোট গল্প' ১৯২৫ সালের রচনা। সেকালেও লেখকদের মনে ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা ছিল। পূর্বোক্ত 'ছোটগল্পে'র সূচনাতেই সুপ্রসন্ন বীরবলের ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিয়ে উত্তেজিত হয়েছিলেন—'ছোটগল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই'—এই সূত্র থেকে পাঁচ বন্ধুর তর্কের মধ্যে শোনা গিয়েছিল—'ছোট' শব্দের নিজের কোনও অর্থ নেই, ও হচ্ছে একটা আপেক্ষিক শব্দ, অন্য কিছুর সঙ্গে মেপে না নিলে ওর মানে পাওয়া যায় না'—এবং এইসব পূর্বালোচনার পর প্রফেসর বলেছিলেন Mr. Day সম্পর্কিত সেই আশ্চর্য কাহিনী যার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগের কথা ছিল, রোমান্সের স্বপ্ন ছিল, ভ্রান্তির যন্ত্রণা ছিল এবং পরিশেষে প্রফেসারের প্রতিপাদ্য এই বিষয়টি ফুটেছিল যে, জীবন ট্র্যাজিকও নয়, বিশুদ্ধ কমেডিও নয়—ট্র্যাজি-কমেডি! নরনারী-সম্পর্কে নেশার অনুরাগ যে খোঁয়ারির রাগে পরিণত হয়, এরকম ইঙ্গিতও ছিল, কিন্তু তাতে স্নায়ুর উৎকট যন্ত্রণা ঘটেনি। তাঁর গল্পেও রীতিগত বৈচিত্র্যের স্বল্পতা ঘটেনি। তাঁর 'রাম ও শ্যাম' 'চার-ইয়ারী কথা' অথবা 'নীললোহিত-পর্যায়ের' গল্পমালা মোটেই এক রীতির গল্প নয়। রীতি প্রত্যেক রচনাতেই পৃথক, কিন্তু সে যুগে রীতিরও আবেদন ছিল রসতীর্থাভিমুখী। অপর পক্ষে, একালের তিক্ততা একালের বাংলা গল্পে প্রধানতঃ এক স্নায়ুপীড়ার স্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ তিক্ততা দুঃসহ। এই তিক্ততার পাশাপাশি যদি সত্যিকার রসোত্তীর্ণ গোয়েন্দা-গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্পের ধারাগুলিও সমান বহতা থাকতো, তাহতে চিত্তবিনোদনের যৎকিঞ্চিৎ পথ পাওয়া যেতো। কিন্তু কালের গতিতে আমাদের গল্পলেখকদের মতি এপর্বে সে-অর্থে বহুমুখী নয়,—শোচনীয়ভাবে একমুখী।

CENTRAL LIBRARY

টলস্টয়, ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ

ভবানীগোপাল সান্যাল

কলাসৃষ্টির সার্থকতার দিক থেকে যে আপত্তি টলস্টয় তাঁর *What is Art* (১৮৯৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে তুলেছেন তা আমাদের মনে প্লেটোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্লেটো কবির সৃষ্টিকে অনুকরণের অতিরিক্ত মূল্য দেননি। মৌলিকতার দিক থেকে কবির সৃষ্টি সত্যের দূরবর্তী। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি নাটক দর্শক চিত্তকে দুর্বল করে ও মনের ভারসাম্য বিচলিত করে। সাধারণতঃ মানুষ তার হৃদয়ের দুর্বল বৃত্তিসমূহকে সংযত রাখবার প্রয়াস করে থাকে। কিন্তু ট্র্যাজেডি দর্শনে তাদের মন শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়।

টলস্টয়ের বিরোধিতা প্রায় অনুরূপ। তাঁর মতে কয়েকটি ব্যতীত এ যুগের উপন্যাস, চিত্র ও ভাস্কর্য পাপের পঙ্কিলতায় পূর্ণ। বর্তমানে আর্ট নামে যা প্রচলিত তা মানব-সমাজের উন্নতির সহায়ক না হয়ে সৎ-প্রবৃত্তিসমূহের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ এই সাহিত্যকে সমর্থন করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। খ্রীস্টীয় জগতে আর্ট নামে যা সমাদৃত তাকে রক্ষণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর, টলস্টয়ের মতো প্লেটো বহুপূর্বে দিয়েছেন। যে আর্ট জীবনকে কলুষিত করে চলেছে তা নিন্দনীয়।[১]

ভবিষ্যতে যে নূতন আর্ট গড়ে উঠবে তা জাতির সীমাবদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হবে। যাঁদের মধ্যে থাকবে সৃষ্টির প্রবণতা বা ক্ষমতা তাঁরা শিল্পসৃষ্টিতে ব্যাপৃত হবেন। নূতন সৃষ্টিতে ব্যক্ত হবে স্পষ্টতা, সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা। আর্টের রসগ্রহণ করবেন সকল শ্রেণীর মানুষ। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ ও আলস্যময় জীবন আর্ট সৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই ভ্রমাত্মক ধারণা তিরোহিত হবে। শিল্পীরা যাপন করবেন সাধারণ মানুষদের মত জীবন। তাঁদেরও পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। যে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তাঁরা সৃষ্টি করবেন তা সকল মানুষকে আনন্দ দান করবে। এই উপলব্ধি ও সার্থকতা শিল্পীদের পক্ষে হবে পুরস্কার।

টলস্টয় সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রচলিত উপন্যাস সমূহে বর্ণিত প্রেমের কাহিনীকে তিনি নিন্দা করেছেন। সৎ সাহিত্যের, যাকে তিনি ক্রিশ্চিয়ান আর্ট বলেছেন, উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরাভিমুখীনতা ও মানবজাতির জন্য সৌভ্রাত্রবোধের সৃষ্টি। যাকে তিনি বলেছেন অখ্রীস্টীয় আর্ট তা স্বাদেশিক প্রেরণায় রচিত বা তা ধর্মের নামে বিশেষ মতবাদের শিক্ষা দেয়। এর ফলে ঐক্যবোধের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়ে থাকে। সত্যকার আর্টের তাৎপর্য হলো যে তা সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে।

দু'প্রকারের অনুভূতির কথা টলস্টয় বলেছেন। এই অনুভূতি মানুষকে মিলিত করে। প্রথমটি হলো ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও দ্বিতীয়টি হলো সাধারণ অনুভূতির বন্ধন যথা আনন্দ, দয়া, প্রশান্তি প্রভৃতি। এই দু'প্রকারের অনুভূতি সার্থক আর্টের বিষয়বস্তু হতে পারে।

প্রথমটির দৃষ্টান্তরূপে তিনি হুগোর লে মিজারেবলস্, ডিকেন্সের গল্প উপন্যাস, আঙ্কল টমস্ কেবিন, ডস্টয়ভস্কির সাহিত্য, জর্জ এলিয়টের আডাম বিডের কথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য যার মধ্যে সুন্দর অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে আছে সময় ও স্থানের অতি

১. 'Rather let there be no art at all than continue the depraving art or simulation of art, which now exists' (*What is Art* p. 262)

CENTRAL LIBRARY

শয়িত বর্ণনা, চিরন্তন প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় তার বিষয়বস্তুর দৈন্য স্বীকার্য। এই শ্রেণীর মধ্যে ডন কুইকজোট, মলেয়ারের কমেডি, ডিকেন্সের পিকউইক পেপার্স, পুসকিনের ও গোগোলের গল্প এবং কিছুটা মোঁপাসার সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

টলস্টয় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এতে করে, তাঁর বিচারে, তাঁর নিজের সাহিত্যও নিন্দিত হয়েছে। তিনি সমর্থন জানিয়েছেন চিরন্তন বিশ্বজনীন সাহিত্যকে। এ-যুগে অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বজনীনতার দাবী করতে পারে না। বিশ্বজনীন সাহিত্যের মূলে আছে ধর্মবোধ যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য হলো 'মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙ্গাগড়া করিতেছে।'

টলস্টয়ের মতে অতীতে যা ছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—যথা বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্ব, আইজাক, জোসেফ ও জ্যাকবের কাহিনী, ইলিয়াড ও অডেসি তা সকল মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে যে অনুভূতি তা সকল মানুষের নিকটে সত্য ও সার্থক। কিন্তু বর্তমানকালে সমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীগণের সৃষ্ট সাহিত্য জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে না। শিল্পীদের বক্তব্য হলো যে তাঁরা সৃষ্টি করেন ও যারা তার রস গ্রহণ করতে চায় তাদের তা নিজের দায়ে করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় শ্রেণীগত অহমিকাবোধ, যৌন আকর্ষণ ও জীবন সম্পর্কে ক্লান্তি। আধুনিক সাহিত্য তাই ভঙ্গী-সর্বস্ব।

এই ক্লান্তিবোধ জীবনে এনেছে বিষণ্ণতার সুর। ফরাসী সমালোচক ডুমিক বলেছেন যে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ হলো জীবন সম্পর্কে হতাশা ও ক্লান্তি, বর্তমান সম্পর্কে অনীহা ও বিদ্বেষ এবং অতীতযুগ সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন মনোভাব ও দুঃখবোধ।

সাধারণ মানুষের নিকটে তাই এই সাহিত্য অর্থহীন, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়।

আধুনিক কাব্যে দুর্বোধ্যতা একটি বড় লক্ষণ। এটি সমর্থনযোগ্য নয়। মালার্মের মতে, যেখানে অর্থ অনুমান করে নিতে হয়, সেই কবিতা সুন্দর। কবিতা যেখানে স্পষ্ট সেখানে তার তিন-চতুর্থাংশ আনন্দ বিনষ্ট হয়ে থাকে। টলস্টয় ডুমিকের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এই দুর্বোধ্যতার অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

সত্যকার শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হলো জীবনবোধের গভীরতা ও তাকে সাহিত্যে সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা ও রূপসৃষ্টির প্রতিভা। বাস্তব পরিচয়ে চিহ্নিত সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এই সাহিত্য হয়ে পড়েছে জীবনের অনুকরণ-ধর্মী।

যে সঞ্চার-ধর্মিতার উপরে টলস্টয় গুরুত্ব অর্পণ করেছেন তা তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। প্রথমটি হলো অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্য, দ্বিতীয়টি প্রকাশের স্পষ্টতা ও তৃতীয়টি শিল্পীর আন্তরিকতা। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য যে পরিমাণে প্রকাশিত হবে তা সেই পরিমাণে পাঠকমনকে উদ্বুদ্ধ করবে। শিল্পীর মনের সঙ্গে পাঠকের সহধর্মিতা স্থাপিত হয়ে সে আনন্দ লাভ করবে। শিল্পীর আন্তরিকতা হলো বড় কথা। এর ফলে তিনি তাঁর অনুভূতির অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করবেন।

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে এই কথা স্বীকৃত হলেও বলা হয় যে রসগ্রহণের জন্য সামাজিক মনের সংস্কার বা

*. C'est la lassitude de vivre, le mé'pris de l'epoque pré'sent, le' regret d'un autre temps apercu a travers l'eliusionde l'ar, t (*What is Art* p. 153)

CENTRAL LIBRARY

বাসনা প্রয়োজন। কাব্যরস গ্রহণের জন্য যদি পাঠক-মনে যদি রত্যাদি বাসনা না থাকে তবে রসগ্রহণ সম্ভব নয়। রসচর্বণার জন্য যে কারণসমূহ আছে তাদের প্রতীতি সম্ভবয় চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ কথাটিকে অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। 'সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চির-পুরাতন বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত' (সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ২৫)। কিন্তু এই স্বাদ পাবার জন্য মানুষকে যত্ন করে শিক্ষা করতে হবে। রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা রসিকের অপেক্ষা রাখে। 'রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।' (সাহিত্যের পথে, পৃ. ১৭)

টলস্টয় আপত্তি উত্থাপন করবেন যে মেঘদূত যদি সর্বমানুষের চিত্তে আনন্দ দিতে না পারে তবে তা প্রশংসার যোগ্য নয়। জনসাধারণ যদি বাইবেলের কাহিনী, সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা ও লোকগীতি সমূহের আনন্দ গ্রহণ করতে পেরে থাকে তবে খাঁটি সাহিত্যরসও গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কঠিন নয়। তাঁর মতে 'Great works of art are only great because they are accessible and comprehensible to every one.'

এই হেতু তাঁর বিশ্বাস হলো যে ভবিষ্যতের শিল্পী অনুধাবন করবেন যে উপন্যাস রচনা বা চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা রূপকথা রচনা, ঘুমপাড়ানি গান, চিত্তাকর্ষক ধাঁধা প্রভৃতি রচনা করবার মূল্য অনেক বেশী। টলস্টয় যুগ-ভাবনাকে স্বীকৃতি দেননি।

প্রকাশের স্পষ্টতা সম্বন্ধে টলস্টয় বলেছেন যে স্পষ্টতা হেতু পাঠকমন সহজে ভাবকে গ্রহণ করতে পারে। যে অনুভূতি তার মনে আছে তাকে সে ভাষায় ব্যক্ত হতে দেখে আনন্দলাভ করে। শিল্পীর আন্তরিকতা পাঠকমনে সাড়া জাগায়। শিল্পীর মানসিক অবস্থা তাকে প্রভাবিত করে থাকে।

সর্বোপরি কথা হলো যে শিল্পী অন্তরের তাগিদে প্রকাশ করবেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতি পাঠকের নিজস্ব বলে মনে হবে। ভাব যত বিশিষ্ট হবে, যত গভীর ভাবে শিল্পী অনুভব করবেন, ততই তিনি গভীর প্রেরণায় তাকে পরিস্ফুট করতে পারবেন।

শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সঞ্চারধর্মিতা। শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে মানবজাতি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।[৩]

রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। রামায়ণ সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্‌বোধিত করেছে।

টলস্টয়ের মতে যে সাহিত্যসৃষ্টি 'must result from the author's need to solve an inner doubt', এ হলো প্রকৃতপক্ষে প্রকাশের বেদনা।

রবীন্দ্রনাথের মতে কবি অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ থেকে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেন। তাদের সংশ্রবে যা তিনি অনুভব করেন তা হয়ে ওঠে সত্য ও বাস্তব। 'বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরস একেবারে অব্যবহিতভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার জোর'। কবি সৃষ্টি করেন অন্তরের তাগিদে। তাঁর অন্তরের ধ্রুব আদর্শ আনন্দময়, সুতরাং তা অনির্বচনীয়।[৪]

৩. 'The importance, the value of art consists in widening man's outlook in increasing the spiritual wealth that is humanity's capital', (*What is Art*, p. 54.)

৪. 'সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে, আবর্তিত হয়ে চলেছে। সৃষ্টির এই আকুতি মানব চিত্তকে উদ্বেল করে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল করে তোলে। এই ব্যাকুলতা হলো অন্তরবাসী একের বেদনা'। (দ্রষ্টব্য : তথ্য ও সত্য)

CENTRAL LIBRARY

টলস্টয়ের মতে সাহিত্যে তিনটি ধারা আছে। একটি হলো বিষয়গত। এই বিষয় হবে প্রয়োজনীয়, নৈতিক ও হিতকর।

দ্বিতীয় ধারাটি হলো নন্দন-তত্ত্বের। এ ক্ষেত্রে বিষয় শিল্পের সৌন্দর্য-রীতির উপরে নির্ভর করে।

তৃতীয়টি হলো বাস্তব। এখানে প্রয়োজন বাস্তবের যথাযথ পরিচয় দান।

শিল্পসৃষ্টি হলো মানসিক প্রক্রিয়া। শিল্পী মানবমনের অস্পষ্ট অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে 'এমন উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করেন যাতে তা লোকমনে সঞ্চারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে।' রসবোধে আমরা আমাদের জানি ও সেই জানাতে আনন্দ পাই। রসবোধের মধ্যে বস্তুর অতীত এমন এক ঐক্যবোধ আছে যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হয়। 'এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।' তিনি বলেছেন যে রস-সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রস-সাহিত্যে।

টলস্টয় বলেছেন যে কবি হয়তো কোন কিছু অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছেন, এমন অনুভূতি, যা তাঁর কাছে নূতন বা অভিনব। তিনি যদি তা অপরের নিকটে ব্যক্ত করেন তা শ্রোতা বা পাঠকের মনে অনুরূপ ভাবোদ্রেক করবে না। প্রত্যয়বান হয়ে যদি তিনি তাঁর অনুভূত উপলব্ধিকে রূপদান করেন তা পাঠকচিত্তে সানন্দে গৃহীত হবে। যা পূর্বে ছিল অস্পষ্ট তা বিশ্বাসের গুণে ও আন্তরিকতা হেতু অপরের মনে সঞ্চারিত হয়। পাঠক তা গ্রহণ করে আনন্দিত হন। এই আনন্দ উভয়বিধ। গভীর অনুভূতির প্রকাশ শিল্পীর নিকটে আনন্দের বিষয় এবং পাঠকও সেই অনুভূতি গ্রহণ করে, শিল্পীর অভিজ্ঞতা লাভ করে আনন্দ পেয়ে থাকেন। একে রবীন্দ্রনাথ নৈকট্য বা সম্মিলন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

সুতরাং টলস্টয়ের মতে আনন্দ ফলশ্রুতি হলেও, তা আর্টের উদ্দেশ্য নয়। সৌন্দর্য আনন্দ দান করে, কিন্তু তা আর্টের লক্ষ্য নয়। সৌন্দর্যতত্ত্বকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা তার উদ্দেশ্য হলো আনন্দ দান। আর্টের প্রকৃত নির্দেশক হবে আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে টলস্টয় সাহিত্যের পরিণামগত ফলকে আনন্দ বলে মেনে নিলেও সৌন্দর্যের ফল যে আনন্দ, সেই সৌন্দর্যতত্ত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে 'In the same way beauty, or that which pleases us, can in no sense serve as a basis for the definiton of art'.

আলঙ্কারিকগণ আনন্দকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ক্রৌঞ্চীর শোক বাল্মীকির মনে শোকভাব উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁর শোক লৌকিক শোক থেকে ভিন্ন, কেননা তা তাঁর চিত্তবৃত্তির আস্বাদন-রূপ করুণ রসে পরিণত হয়েছে। পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে যেমন জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে করুণ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোক রূপে উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে রসসৃষ্টি হয় ভাবের উচ্ছলতা থেকে, স্বচ্ছলতা থেকে নয়। এই রস চৈতন্যের আবরণ ভগ্ন করে বলে তা আনন্দ দান করে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হলো 'আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।' পুনর্বার তিনি বলেছেন যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে আর তাই হলো সাহিত্যের সামগ্রী। সুন্দর প্রমাণিত হয় নিবিড় বোধের আলোকে। গোলাপের আছে পাপড়ি, বোঁটা ও সবুজ পাতা। এই সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব। এই ঐক্য আমাদের অন্তরতম ঐক্যকে, ব্যক্তিপুরুষকে উদ্ঘাটিত করে বলে

CENTRAL LIBRARY

মন তাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করে। এই সৌন্দর্য আনন্দকে ব্যক্ত করে। পরিণামে তাই সৌন্দর্য ও আনন্দ সমার্থক। যেখানে বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ সেখানে অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করে আনন্দ পাই। 'অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দ রূপ আত্মারূপী একের আত্মীয়তার কথা বলা হলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনা সামঞ্জস্যকে পেতে ও প্রকাশ করতে চায় সেখানে কাব্য রচিত হয়।

ক্রোচের মত ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক কেরিট বলেছেন, যে বস্তুর মধ্যে আমরা আমাদের অনুভূতির পরিচয় পাই তাই হলো সুন্দর।

ক্রোচের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল আছে। তাঁর মতেও সৌন্দর্য ঐক্যের প্রকাশ আর অসুন্দরের মধ্যে থাকে বিক্ষিপ্ততা। উপরন্তু সৌন্দর্য বস্তুগত সত্য নয়, তা হলো মানুষের উপলব্ধি।[৫]

টলস্টয়ের মতে সাহিত্যের সৌন্দর্য হলো যা স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও বিশিষ্ট রূপে ব্যক্ত। বাস্তবতা প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো 'the reality not so much of what exists, as of what goes on in the soul of the artist'.

রবীন্দ্রনাথের মতে, নিখিলের সংস্রবে এসে কবি যা অনুভব করেন তাই হলো বাস্তব। 'কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, বিশ্বের মধ্যে সেই প্রমাণ আছে।' অন্যত্র তিনি বলেছেন যেখানে রূপ সৃষ্ট হয় তার প্রতি মনের ঔৎসুক্য ব্যক্ত হয় ও তা যদি মনের শূন্যতা দূর করে তবে তাই হলো বাস্তব। 'যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।'

সাহিত্যের তিনটি উপাদানের কথা টলস্টয় বলেছেন। যে বিষয়বস্তু সকল মানুষের নিকটে তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তা হলো নৈতিক। যেখানে প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ ও স্পষ্ট তা হলো সুন্দর। যেখানে শিল্পীর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক বিশ্বস্ত ও আন্তরিক তা হলো সত্য।[৬] সুতরাং শিল্পীর চিত্ত হবে আলোকিত ও তিনি আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করবেন না। শিল্পসৃষ্টি হলো জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। তাঁর মতে শিল্প হলো 'one of the means of intercourse between man and man'. রবীন্দ্রনাথও এই অর্থে সাহিত্যকে সহিতত্ব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের, কালের সঙ্গে অন্যকালের, দেশের সঙ্গে অন্যদেশের মিলন সাধন করে।

টলস্টয়ের মতে লৌকিক জীবনে ভাষার মাধ্যমে মানুষ তাঁর চিন্তাধারাকে প্রকাশ করে থাকে। শিল্পে সে সঞ্চারিত করে অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি অপরের মনে সার্থকভাবে সঞ্চারিত হয় সেখানে শিল্পের সাফল্য প্রমাণিত হয়। একটি বালক যদি এক নেকড়ের সংস্পর্শে এসে ভীত হয়, এমনকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও কল্পিত ভীতি তাকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার বর্ণনা যদি অপরের মনে অনুরূপ ভাব জাগিয়ে তোলে, তখন তাকে বলা যাবে শিল্প-সৃষ্টি।

রাজা দুষ্মন্তকে দেখে আশ্রম মৃগের ভীতি-বিহ্বলতা ও পলায়ন কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করে আমরা ভয়ানক রস উপলব্ধি করি। নিছক বর্ণনায় তা সম্ভব হয় না। শব্দে সমর্পিত হয়ে বিভাবাদির সহযোগে তা রসে পরিণত হয়। সেই রস আমরা উপভোগ করে থাকি।

৫. 'For the beautiful is not a physical fact; it does not belong to things, but to the activity of man, to spiritual energy. (*Aesthetic*, Croce p. 97)

৬. হেগেল সত্য ও সৌন্দর্যকে ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে উভয়ে সমার্থক। পার্থক্য হলো যে সত্য ভাব বা idea. এই idea যখন বাইরে রূপে প্রকাশিত হয় তখন তা অনুভূতির নিকটে হয় সুন্দর। সৌন্দর্য সত্যকে প্রতিফলিত করে।

CENTRAL LIBRARY

নন্দনতত্ত্বে ক্রোচে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন, বলে বলা হয়ে থাকে। এ কথা স্বীকার্য যে তিনি আর্টে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, এর আদর্শীভূত সত্যকে গ্রহণ করেছেন ও সর্বোপরি বিষয় (concept) ও রূপের (form) মধ্যে যে ঐক্য বর্তমান তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সংবেদনসমূহ ভাবানুভূতির ফলে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। দর্শনের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্যএই নয় যে দর্শন বা বিজ্ঞান যুক্তিভিত্তিক এই হেতু, গতিশীল ও কাব্য কল্পনাপ্রধান বলে স্থিতিশীল। প্রকৃত পার্থক্য হলো যে কাব্যে গ্রহণ করা হয় আবেগপ্রধান প্রতীক। আবেগের নিবিড়তা হেতু এক পরমাশ্চর্য জীবনী-শক্তি কাব্যদেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

শিল্পীর আছে স্বপ্নদৃষ্টি বা প্রতিভান (Intuition)। তিনি যে ছবি মনে কল্পনা করেন, তাই কাব্যে রূপলাভ করে থাকে। শিল্পের জন্ম শিল্পীর মনে।

কলাসৃষ্টি বস্তুগত সত্য নয়। শব্দ ছন্দ প্রভৃতির দ্বারা এর সৌন্দর্য নিরূপণ করা যায় না। বিশ্লেষণী শক্তির দ্বারা কাব্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে' সত্যকে পাওয়া যায় না। 'বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই। সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে'। ক্রোচের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য হলো যে প্রকাশ হলো চাতুরী, তা হলো সৃষ্টি।

আর্ট, ক্রোচের মতে হলো প্রতিভান। এর তাৎপর্য হলো ধ্যান, ইতালীয় ভাষায় teoria. সুতরাং এর সঙ্গে হিতবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানের ন্যায় আর্ট প্রয়োজনীয় নয়, তার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই।[৭]

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য'।

তাঁর মতে লোকহিতের দায়িত্ব সাহিত্যের নয়। সাহিত্যে বড় কথা হলো প্রকাশ ও শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। এখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হয়ে যায়। ক্রোচের বক্তব্য হলো 'great artists are said to reveal us to ourselves.' শিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের উপলব্ধি করে থাকি।

প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ শিল্পীকে প্রভাবিত করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ক্রোচের বক্তব্য হলো যে উক্ত মূল্যবোধ জ্ঞানাত্মক ধারণার বিষয় (concept) ও এই ধারণা প্রতিভানে ও প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে না। তথাপি প্রতিভান যে জ্ঞানাত্মক ধারণা নিরপেক্ষ তা বলা কঠিন, কেননা তা বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

শিল্প ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট হয় না। সৎ ইচ্ছা মানুষকে সৎ করতে পারে, কিন্তু তা সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক নয়। এই হেতু নীতির সঙ্গে শিল্পের কোন সম্পর্ক নেই। দান্তের ফ্রানচেস্কা কলঙ্কিনী ও শেকস্পীয়রের কর্ডেলিয়া আদর্শ নারী, এইজাতীয় নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচার যথাযথ নয়।

রবীন্দ্রনাথও এই প্রশ্নটি বিচার করেছেন। 'সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব-নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কিনা, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে'। এর ফলে 'যোগাযোগের' কুমুদিনী মানব-সমাজে নারীজাতির প্রতিনিধি কিনা, তার মধ্যে নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা, এই জাতীয় অসঙ্গত প্রশ্ন দেখা দেয়। 'সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু বলেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে নয়'।

৭. নীতির সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক না থাকলেও সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী নীতির অধীন। সুতরাং আর্টের পক্ষে সম্পূর্ণ নীতি নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে ক্রোচের মতে শিল্পীকে পুরোহিতের ন্যায় তাঁর কর্তব্য করতে হবে। (*Philosophies of Beauty* : (Carritt, p. 237)

CENTRAL LIBRARY

পূর্বোক্ত নৈতিক বোধের পরিপূরকরূপে প্রশ্ন ওঠে যে পাপের প্রতি অনীহাবোধ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাদান শিল্পীর ধর্ম কিনা। নীতিবিদ্‌রা শিল্পের আনন্দকে স্বীকার করেন বটে, যদি সেই আনন্দ নৈতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

শিল্পে সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্নটি নিরর্থক। ক্রোচের মতে যার প্রকাশ সুন্দর নয় তাই হলো অসুন্দর। সৌন্দর্যের মধ্যে আছে ঐক্য, আর অসুন্দরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্লিষ্টতা। যাকে বলা হয় সুন্দর তার মধ্যে আছে সমগ্রতার পরিচয়। তাঁর মতে 'Life circulates in the whole organism : it is not withdrawn into the several parts.' অংশসমূহ বিশ্লিষ্টরূপে সুন্দর নয়। সমগ্রের সঙ্গে সমন্বিত হলে তা হয়ে ওঠে সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথেরও মতে সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে সুন্দর। ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হলো 'গোলাপের মধ্যে সুনিহিত, সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য'। এই হেতু নিখিল ফুলের সুষমাকে আপন বলে গ্রহণ করে। যখন ফুলকে অনুভব করি তখন আমরা নিজেকে বিশেষভাবে অনুভব করি। 'গোলাপ আমারই আত্মবোধকে আনন্দ-দ্বারা নিবিড় করে তোলে, তাতে আমারই সত্তার বিকাশ'।

তবে অংশ ও সমগ্রের কথায় বলা চলে যে অংশসমূহেরও সৌন্দর্য আছে। নচেৎ তাদের সমবায়ে সমগ্ররূপ প্রকাশিত হতে পারতো না।

ক্রোচের মতে শিল্পের বড় কথা হলো প্রকাশ।[৮] এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বাস্তব জীবনের শোকদুঃখ প্রকাশিত হলে তাকে শিল্পসৃষ্টি বলা যাবে কিনা। তাঁর মতে শিল্প আমাদের মনে বিচিত্র আনন্দবেদনা সৃষ্টি করে থাকে। আমরা নাটকের চরিত্রসমূহের সঙ্গে হাসি ও কাঁদি। কিন্তু বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী থেকে ঠিক এই জাতীয় অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয় না। লৌকিক জীবনের সুখদুঃখ আমাদের বিচলিত করে, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তারা গভীর ও সুন্দর।[৯]

ক্রোচের মতে শিল্পসৃষ্টিকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। অনুভূতি, প্রকাশ, সৌন্দর্যের আনন্দ ও বস্তুরূপ, যার প্রকাশ গন্ধে, সুরে, রঙে ও রেখায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্তর হলো প্রকাশ ও তা রূপে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

যাকে বলা হয় রূপ তার বৈশিষ্ট্য হলো স্বাতন্ত্র্য ও স্পষ্টতা। শিল্পসৃষ্টির পরিচয় হলো তার বিশিষ্ট রূপে। ডন কুইকজোট দীপ্যমান চরিত্র, কেননা তার গুণরাজি নিয়ে সে বিশিষ্ট। আর্টের যে স্পষ্টতা তা আদর্শ সৃষ্টির পরিচয় দেয়। বস্তুজগতে আমাদের কোন বিষয়ের ধারণা দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি চিরন্তন কেননা তা দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। শিল্প তাই আদর্শসৃষ্টি।

ক্রোচে প্রতিভান ও ধারণাত্মক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। প্রতিভান কল্পনাত্মক, তার নিকটে বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্য নেই। ধারণাত্মক জ্ঞান (concept) পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে। প্রতিভান হলো 'dream of the contemplative life whose waking is philosophy.' প্রতিভান রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে ও এই রূপের আছে ঐক্য। বহু বিচিত্র এখানে এক অখণ্ড রূপ লাভ করে থাকে। তাই তাঁর বক্তব্য হলো 'Expression is a synthesis of the various or multiple in the one'.

৮. 'Every true intuition or representation is expression'. (p. 8) 'To intuite is to express' (P. 11)—*Aesthetic*, Croce.

৯. 'And it is natural that they (অনুভূতি) do not trouble and afflict us as passionately as those of real life because those were matter, these are form and activity'. (*Aesthetic*, Croce. p. 81)

CENTRAL LIBRARY

কীট্‌স রচনা করেছেন *Ode to Autumn* নামক এক রূপবান কবিতা। এখানে নানা চিত্র ভাবগত ঐক্য লাভ করে রূপসৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে।

শরৎ ঋতুর শারীর-সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক রূপ ও তার বিচিত্র সঙ্গীত সব মিলিত হয়ে যে রূপ সৃষ্টি করেছে তা অখণ্ড ও সুন্দর। ক্রোচের তাই মত হলো 'Every expression is a single expression.'

প্রতিভানের প্রকাশের পশ্চাতে যে গভীর অনুভূতির পরিচয় আছে তা ধারণাত্মক জ্ঞানের মধ্যে থাকে না কেননা তার কার্যকারিতা বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[১০]

প্রতিভান অনুভূতি নির্ভর ও এই অনুভূতি প্রকাশে সহায়তা করে থাকে। প্রকাশ রূপে ব্যক্ত হয়।[১১] কলাসৃষ্টিতে আমরা বরণ করে নিই রূপকে, কেননা তার মধ্যে কল্পনা নিজেকে ব্যক্ত করে। তাই কেরিট বলেছেন 'Artistic imagination is always embodied but has no excrescences.'

ক্রোচের তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি বলেছেন 'বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক না কেন, যতক্ষণ সে কোনো একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না।' রূপ অর্থে কতকগুলি গুণের সমাবেশও বোঝায়। এই গুণগুলি যখন রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয় ভাব যখন রূপে ব্যক্ত হয় তা হয়ে ওঠে সার্থক। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও টমসনের কবিতায় নিসর্গসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হলেও ভাবের প্রগাঢ়তা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে বেশী। আর এই প্রগাঢ়তা রূপসৃষ্টির অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে।'

ক্রোচে বিশুদ্ধ প্রতিভানের কথা বলেছেন যেমন চিত্রকর অঙ্কিত জ্যোৎস্নালোকিত কোন দৃশ্য অথবা গীতিকবিতার আত্মনিষ্ঠ আবেগ। তথাপি তাঁর মতে প্রতিভানের জন্য ধারণাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই জ্ঞান শিল্পের বিষয়বস্তু নয়, বরং তা অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং পরিশেষে তা রূপে ব্যক্ত হয়।

তাই তাঁর মতে 'the aesthetic fact, therefore, is form and nothing but form.' (*Aesthetic*, P. 16)

প্রতিভান উপাদান ব্যবহার করে। কিন্তু এই উপাদানসমূহ যদি নিছক ধারণাত্মক জ্ঞান হয় তবে তার সঙ্গে আর্টের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তা যদি আবেগপ্রধান হয় তবে তা হয়ে ওঠে রূপের (form) অঙ্গ।

ধারণাত্মক জ্ঞান আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে ও তা আবার স্থায়ী বা প্রধান আবেগকে জাগায়। এই আবেগ হলো শিল্পের বিষয়। 'The impressions reappear as it were in expression like water put into a filter which reappears the same and yet different on the otherside'. (*Aesthetic*, P. 15)

ক্রোচে বিষয়কে মূল্য না দিলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে তা রূপসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে থাকে। তিনিও একথা মেনে নিয়েছেন যে, বিষয়ের জন্য প্রতিভানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শেকস্‌পীয়রের *Othello* ও

১০. 'It (Intuition) is the essence of life that it vibrates concretely: concepts can never snatch and render a vital impulse, because they achieve generality at the cost of concreteness.' (*Towards a Theory of Imagination*: S. C. Sengupta p 73)

১১. 'Art is an ideal within the four corners of an image, Here the aspiration and the imagery exist in and for each other'. (*Philosophies of Beauty*; Carritt, p. 241)

CENTRAL LIBRARY

বার্ণার্ড শ'র *How he lied to her husband*, উভয়ই প্রেম ও ঈর্ষা নিয়ে রচিত হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হেতু একটি হয়েছে ট্রাজেডি ও অন্যটি উপভোগ্য কমেডি। বিষয়ের স্বতন্ত্র মূল্য নেই, কিন্তু তা রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একাত্ম।

আর্ট বাস্তবের অনুকরণ নয়। রঙীন মোমের মূর্তি জীবনের প্রতিরূপ হতে পারে। তা দেখে আমরা বিস্ময়বোধ করলেও অভিভূত হই না। ফোটোগ্রাফী আর্ট নয়, কেন না তা বস্তুরূপকে প্রতিফলিত করে। এর মধ্যে জীবনের প্রকাশ নেই। আর্টের লক্ষণ হলো তার জীবনীশক্তি; তার স্বর, জীবনের প্রকাশ, ফোটোগ্রাফে তা থাকে না।

ক্রোচের মতে শিল্পীর মধ্যে থাকে আবেগ (passion) ও প্রশান্তি (serenity). আবেগ হলো বস্তুর ধর্ম যা শিল্পী গ্রহণ করে থাকেন, আর প্রশান্তি হলো রূপ (form) যার সাহায্যে তিনি সংবেদন ও আবেগকে সংযত করেন।

ক্রোচে বস্তু বা বিষয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু মন তাকে কি ভাবে গ্রহণ করে, কি ভাবে তা প্রতিভান হয়ে ওঠে তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানব সংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক সক্রিয়।

দুঃশাসনের হাতে কৌরব সভায় দ্রৌপদীর অপমানের ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তবে তাকে 'আমরা মানব-ভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো করে দেখতে পারিনে।' কিন্তু মহাভারতের খাণ্ডবদাহের ঘটনা বাস্তবতার নৈকট্য থেকে দূরে যাওয়ায় সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পায়।

মানবজীবনে ঘটনাসমূহ সুসংলগ্ন ভাবে হয় না। এখানে কল্পনাদৃষ্টির প্রয়োজন। 'আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমত'। উপরন্তু, যা আছে দূরে তাকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে নৈকট্য দিতে হবে। এই নৈকট্য ঘটায় বলে সাহিত্যকে সাহিত্য বলা হয়ে থাকে।

CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্রসাহিত্যে অহং-তত্ত্ব

উমা রায়

১৩২১ সালে রচিত 'সঞ্চয়'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেইদিকেই দেশকাল; সেইদিকেই রূপ-রস-গন্ধ; সেইদিকেই বহু। সেইদিকেই তাঁর প্রকাশ।...

অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি।...যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির লীলা।'

১৩১৪ সালে রচিত শ্যামলী গ্রন্থের 'আমি' কবিতায় তিনি ইতিপূর্বেই বলেছেন—

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।...
...এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
'সেই 'আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সঙ্গম
রেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।'

CENTRAL LIBRARY

কাব্যে প্রকাশিত এই অহং-তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়, ধর্ম, মানুষের ধর্ম ও মানবসত্য প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন বহু সমালোচনা গ্রন্থেও।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজনা অংশ 'মানবসত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানবের এই 'অহং'-এর নিকষেই বিশ্বজগতের সত্যতা ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। 'আমি' যেখানে নেই সেখানে এই বিশ্ব এমন কি বিশ্বেশ্বরও নেই। তাঁর মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তা হচ্ছে আপনাকে ত্যাগ না করেও সেই বিরাট পুরুষকে উপলব্ধি করা। নিখিল মানবাত্মাকে উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্তো উপনীত হওয়া সম্ভব নয় একেবারেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয় আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি তা মানবচিত্ত কখনই ছাড়াতে পারে না।'—মানুষের ধর্ম।

এর বাইরে যদি কিছু থাকে তাহ'লে তা থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। কাজেই 'আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রকাশিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবচৈতন্যে প্রমাণিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা।'—মানুষের ধর্ম।

সব জড়িয়ে দেখাই সকলকে দেখা, নিজেকেও দেখা। কারণ—'মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ 'আমি'।'—মানুষের ধর্ম।

উপরে উদ্ধৃত একটি অংশে দু'টি শব্দ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একটি 'অমানব', অন্যটি 'অতিমানব'। 'অমানব' শব্দের অর্থ যা চৈতন্যের প্রকাশে মানব-পর্যায়ে এসে পৌঁছয়নি। 'অতিমানব' শব্দের অর্থ যা আপনাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 'অতিমানব' শব্দটি ব্যবহারের বা প্রয়োগ করবার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই অংশে দিয়েছেন—'তার বাইরে কিছু থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান।'

সহজ কথা – রবীন্দ্রনাথের মতে আধারকে উপেক্ষা করে আধারের সত্যতা উপলব্ধি করা যায় না। এই জগৎ ইন্দ্রিয়ের পথে চিত্তে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে—হয়ে উঠছে জ্ঞানাত্মক, হয়ে উঠছে ভাবাত্মক। আমার চিত্তের একদিকে আছে জ্ঞাতা 'আমি', অন্যদিকে আছে জ্ঞেয় 'জগৎ'। সেই আমাকে বাদ দিয়ে জগতের অস্তিত্ব নেই, জগতাতীতেরও অস্তিত্ব নেই। মানবের 'আমি' সমুদ্রে স্নান করেই সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইই প্রতি মুহূর্তে নবনবায়মান হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানবের এই আমির দু'টি দিক আছে। একটি দিকে আছে—'সঞ্চয়', অন্যদিকে 'দান'। দানের দ্বারাই তার সঞ্চয় সার্থক। যেমন প্রদীপের শলিতা আর শিখা। শিখা জ্বলে না যদি সলতে নিজেকে না পুড়িয়ে দিতে পারে। ঐ পুড়ে যাওয়াতেই তার সার্থকতা—তার অস্তিত্বের অর্থ। ক্ষুদ্র 'অহং'-এরও প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন বৈচিত্র্যের আয়োজন। কারণ আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় যে দু'টি নাম আছে তার একটি 'অহং' অন্যটি 'আত্মা'। সেই আত্মার সম্পর্কেই 'অহং' তৃপ্ত। অন্যথা তা শিখাহীন সলতে। অবশ্য সূত্রসর্বস্ব সলতেরও একটি বাজারদর আছে। আছে প্রদীপ আধারেরও, কেননা—'আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর—কোনোটির দর মাটির'—মানুষের ধর্ম। বৃহৎ-অহং-এর উদ্দীপনায় ক্ষুদ্র অহং চরিতার্থ—অর্চির ঔজ্জ্বল্যে যেমন দীপের চরিতার্থতা। সেই বৃহৎ অহং আত্মারই নামান্তর।

CENTRAL LIBRARY

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই 'আত্মা' নিষ্কল নির্গুণ নিরুপাধি নির্বিশেষ 'আত্মা' নয়। এ আত্মা সোপাধি কেননা ক্ষুদ্র 'অহং'-এর সঞ্চয় যখন বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে বৃহৎ অহংতায় পরিণত হয় তখনই 'জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা।'—মানুষের ধর্ম।

সাহিত্যে শিল্পে সেই ব্যাপ্ত 'আমি'র রূপটি বিশেষ ভাবেই দেখা যায়। সাহিত্যে যে অহংসত্তার প্রকাশ, সে অহং-এর সঙ্গে বিশ্বসত্তার কোনো বিরোধ নেই। স্বচ্ছ কাচ যেমন বহির্বস্তুকে দেখার পক্ষে কোনো বাধা জন্মায় না তেমনি সাহিত্যে পরিস্রুত অহং-এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকে অনুভব করার কোনো বাধকতা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যে ভোগ মানুষের যোগ্য, তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় তার সংসারযাত্রায় তার হৃদয় আতিথ্যে।'—মানুষের ধর্ম।

কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে নিজেকেই লাভ করবার চেষ্টা করছেন। সেই ভিতরকার আপনাকেই তিনি যত লাভ করেন ততই তাঁর কাব্য অমর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'শিল্পসাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।.....শিল্প-সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।'—সঞ্চয়।

আর এই অধিকার—সাহিত্যশিল্পে আপন ব্যক্তি অহংকে বিশ্ব-অহংএ ব্যাপ্ত করে দেবার এই দুর্লভ অধিকার একমাত্র মানবেরই—'সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে সোঽহম্।' —মানুষের ধর্ম।

'ধর্ম'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'অহং'-এর এই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। অহং-এর বীজ স্বাতন্ত্র্য। মানবে এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। জীবজগতে তেমন নয়, উদ্ভিদ-জগতে আরো কম। এই স্বাতন্ত্র্য মানুষকে যেমন এনে দিয়েছে আকাশের উন্মুক্ত বিস্তার—তেমনি এনে দিয়েছে পাতাল-গহ্বরের ভয়ঙ্কর অন্ধকার। আমাদের ক্ষুদ্র অহং প্রত্যেককে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে রেখেছে—এই অবস্থায় মিলনের চেষ্টা মানে প্রচণ্ড সংঘাত। কিন্তু ক্ষুদ্র অহংকারের খুদও বৃহতের ভোগের কাজে উৎসৃষ্ট হলে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

এই সত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানব যদি আপন অহং-এর ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে তবে তার মুক্তি কোন পথে? স্বাতন্ত্র্যালোপে মানবের মুক্তি নয়। বিধাতা স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যের এই জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন মানবললাটে। 'আমি'-র এই স্বাতন্ত্র্য চিরদীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'এই যে আমি, অতি ক্ষুদ্র আমি, এত বড় জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারিদিকে কত তেজ, কত বেগ, কত বস্তু, কত ভাব, তাহার আর সীমা নাই; কিন্তু আমার অহংকারকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারেন নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র।'

মানুষের এই অহং যখন সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করে তখন সে রূপ হয় যেমন সুন্দর তেমনি কঠিন। সুন্দর—ভাবের দিক দিয়ে, কঠিন—বাগ্‌বন্ধনের দিক দিয়ে। সুন্দর অর্থাৎ অভিব্যক্তির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট। কঠিন অর্থাৎ শব্দপরিবর্তনে অসহমান।

'বাগ্‌বন্ধনের দিক দিয়ে কঠিন' এই কথাটি একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কবি যে সব শব্দ ব্যবহার করেন সে সব শব্দের আভিধানিক অর্থ পূর্বনির্ধারিত। কবি যে ভাবকে প্রকাশ করতে চান সে ভাব তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থাৎ অহংযুক্ত। এই বিশিষ্ট অহং-এর সঙ্গে যখন বিশেষ অর্থযুক্ত শব্দাবলীর অহং-পরিমণ্ডলের সংঘাত বাধে তখন

CENTRAL LIBRARY

যে সঙ্কট দেখা দেয় সে সঙ্কট হচ্ছে ভাবের স্বাতন্ত্র্য ও ভাবপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্যের সংঘাত। এই দুই-এর মিলন ঘটাতে পারে সৌন্দর্য। এমন কি কবির অশক্তির ব্যাঘাত ও ব্যুৎপত্তির অভাবও সেই সৌন্দর্যমায়ায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ তাই কবিপ্রতিভার এই আশ্চর্য একীকরণশক্তির—দুই অহংকে সমসূত্রে গ্রন্থনের সামর্থ্যকে উল্লেখ করে বলেছেন 'ধর্ম' গ্রন্থে—

'যাহা একদিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক পরিণয়সূত্রে গাঁথিয়া দেয়'—তাই হচ্ছে কবিত্ব। তাই কবির কাজ বড়ো কঠিন—

'কবি যে ভাষায় কবিত্ব প্রকাশ করিতে চায় সে ভাষাতো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে ভাবটি যেমনভাবে ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাখ মানে না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে; বলে ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্য রক্ষা করিতে পারেন তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা, সেটা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না—কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।'—ধর্ম।

সৌন্দর্যের শতদল যে বৃন্তকে আশ্রয় করে পূর্ণ পুষ্প হয়ে ওঠে সেই বৃন্তটিই 'অহং'-এর বৃন্ত। প্রকৃতির মধ্যে যেমন পার্থক্য নির্দেশ করে নিয়মের সীমা, আত্মার মধ্যে তেমনি পার্থক্য নির্দেশ করে 'অহং'-এর সীমা। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। জীবাত্মার অহংকারের মধ্যে পরমাত্মার লীলার আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন -'জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন, নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।'—শান্তিনিকেতন।

এই উপলব্ধিই গানে রূপ নিয়েছে—

'তাই তোমার আনন্দ, আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

এই সুন্দর রহস্য জীবনে এক আশ্চর্যরূপ ধারণ করেছে। ঈশ্বরের আনন্দ তাঁর দিব্য স্বরূপে সম্পূর্ণ, কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

সেই আনন্দের দিব্যরূপটি—পূর্ণ রূপটি এই মৃত্তিকারই—এই অপূর্ণের মধ্যেই বিচিত্রলীলায় সহস্রধা। আনন্দ মানেই মুক্তি কারণ তা প্রয়োজন-বন্ধনের অতীত। মুক্তি আসে প্রেমে। প্রেম আবার বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে। বৃন্তের বন্ধন যেমন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে পুষ্পপর্ণালি। বৃন্ত অহং-এর উপমা। পর্ণ—আনন্দের। আনন্দের বিকাশ নেই অহং-কে বাদ দিয়ে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে—'স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদ্ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ।' দুই যেখানে আছে—সেখানেই 'আমি' আছি। সুতরাং আনন্দের জন্য সৃষ্টির দ্বৈতলীলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও বলছেন—

'পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখসুখ বিচ্ছেদ-মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে কত আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে, কত বিস্তারের মধ্য দিয়ে, ছোটো-বড়ো কত আসক্তি-অনুরক্তিতে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমুদ্রের দিকে গিয়ে মিশেছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হ'তে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হ'তে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।'—শান্তিনিকেতন।

এবং এই বিকাশের বাঙ্ময় রূপই ধরা পড়েছে সাহিত্যশিল্পে।

'অহং'-চৈতন্য আনন্দচৈতন্য হয়ে ওঠে কখন? যখন সে নিজেকে দান করতে পারে। যখন সে নিজেকে দান করতে পারে তখনই সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়। যখন পারে না তখন সে বিশ্ব থেকে লুপ্ত। জাগতিক বস্তুকে মানসিক করা পর্যন্ত অহং-এর একটি ক্ষুদ্ররূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়। মানসিক বস্তু যখন বিশ্বে সমর্পিত হয় তখন সে বিশ্বজাগতিক হয়ে আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে। কবির সার্থকতা এইখানেই। 'অহং' পরিত্যক্ত না হয়েও এখানে তা বিশুদ্ধ সত্তায় উদ্ভাসিত। এই 'অহং'-ই স্রষ্টা। সাহিত্যে এই অহং-এরই পরিস্রুত প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন—'অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া' (শান্তিনিকেতন), তখন তিনি 'অহং' বলতে ক্ষুদ্র অহং-এর কথাই বলেছেন এবং 'আত্মা' বলতে বৃহৎ অহং-এর কথাই মনে করেছেন। সাহিত্যে এই বৃহৎ অহংতা প্রাচীনেরা শব্দের ভোজকত্ব শক্তিবশত সাধারণী কৃতিরূপেই উল্লেখ করেছেন। রসাংশে যা দেশকালপাত্রাতীত, বিভাবাদি-অংশে তাই হচ্ছে দেশকালপাত্রগত। সব মিলিয়ে অলৌকিক চমৎকারকারী সেই সাহিত্যবস্তু—প্রত্যক্ষও বটে, অপ্রত্যক্ষও বটে। সাহিত্যকর্মে ক্ষুদ্র অহং বর্জনীয়।

অহং-এর ক্ষুদ্রতা মানেই যে 'আমি' ধুলোয়-কাদায় জড়িয়ে আছি, তুচ্ছ নিয়ে মত্ত আছি এবং আজ আছি তো কাল নেই। কিন্তু যে আমি 'চিরকালের আমি' সে 'আমি'-র তো বিলয় নেই। এই আমিই সাহিত্যে এক অচিন্ত্যভেদাভেদ 'আমি—না-আমি'-র রূপ ধারণ করে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব।'—(শান্তিনিকেতন)।

কিন্তু তাই বলে তাকে বর্জনও করবেন না। কারণ—

'নদীর জল নদীতে থাকে, তাকে ঘরে আনি ঘড়ায় করে, সেই জলে তৃষার্তের তৃষা হয় দূর—তেমনি জাগতিক বস্তুকে করি মানসিক তারপর তাকে তুলে দিই রসিকের হাতে, তার যোগ্য করে—তবে তার রসতৃষ্ণা হয় দূর। সে ঘড়া আমারি ঘড়া। অন্যের নয়, কিন্তু তার জল সকলের তৃষার। বিশ্ব অহং যদিচ সকল সৃষ্টির শেষ কথা, কিন্তু সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা এই 'আমি' অহং।

CENTRAL LIBRARY

প্রাচীন কোনো কোনো দর্শন-প্রস্থানে বলে বিশুদ্ধ 'অহং'-এর বিলয় নেই। কল্পে তো বটেই, কল্পান্তেও তার বীজরূপ অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ এই মতের পথিক। তিনি বলছেন—

'অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে।' —শান্তিনিকেতন।

এর কাজ পরমাত্মার পরমরূপ পরম ঐশ্বর্য ও পরম মাধুর্যকে প্রকাশ করা। এর লক্ষ্য বিচিত্রের বহুলতার রহস্যকে নানাভাবে প্রকাশ করা। এই প্রকাশেরই চরম সীমা শিল্প ও সাহিত্য। তাই শিল্প ও সাহিত্যে কবির অহং সত্তা অনিবার্যরূপে উপস্থিত ক্রিয়াশীল ও অভীপ্সিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অহংই আমার সীমা, আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে। এই 'অহং'-উপকূলের নানা ঘাত প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ, তার সঙ্গীত।'—শান্তিনিকেতন।

'তার তরঙ্গ' অর্থাৎ জীবনলীলা। 'তার সঙ্গীত' অর্থাৎ সাহিত্যশিল্প। এই কথাই প্রাচীনেরা অন্য ভাষায় বলেছেন—'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী অনন্যপরতন্ত্রা নবরসরুচিরা'।—জীবনের সমস্ত নিয়ম যেখানে আর অনিবার্য নয়, যেখানে উঠছে আনন্দ রহিত হয়েছে পরবশতা এবং রুচি আছে নূতন নূতন রসে।

অহং এবং বিশ্ব—দুয়ের মধ্যে একটা আপাত বৈষম্য আছে, একটা বৈপরীত্য আছে কিন্তু এই বৈপরীত্যের সমাধান অন্তরতম সামঞ্জস্যবোধে। যেমন আলো-ছায়ার বৈপরীত্য সামঞ্জস্য লাভ করে চিত্রে। যেমন বিভিন্ন স্বরের বৈষম্য সামঞ্জস্য লাভ করে রাগবিস্তারে। যেমন সঞ্চারী ভাবাবলীর বৈপরীত্য সামঞ্জস্য লাভ করে রসে।

আত্মা দান করবে বলেই 'অহং' সংগ্রহ করছে—এইখানেই দুয়ের সামঞ্জস্য। রবীন্দ্রনাথ বলছে—

'অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। ধন-মান-বিদ্যাকে যখন 'অহং'-এর দ্বারা প্রকাশ করি তখন শুধু অহংকেই প্রকাশ করি—'আত্মা'কে প্রকাশ করি না। আত্মাকে যখন প্রকাশ করি—তখন তা হয় রসের প্রকাশ —'রসো বৈ সঃ'—আত্মাই তো রস। তখন ধন-মান মানব-প্রেমরসে অন্যরূপ ধারণ করে। বিদ্যা হয়ে ওঠে শিল্প-সাহিত্য। তখন মানব হয় মহামানী মহাধনী নয়—'মহাত্মা'—তখন মানব হয় কবি রসিক শিল্পী।'—শান্তিনিকেতন।

জীবনবীণা বাজে—রসিকের হাতে—রূপে, রসে, সুরে। জীবনরাগিণী ধ্বনিত হয়—মিলিত হয় তানের পরে তান—নানা কবির ভাষায়, চিত্রকরের তুলিতে, সুরকারের কণ্ঠে—বাজে রসিকের প্রাণে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কেবল আমার একেলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে, কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে—বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে সুখ-দুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে সেই অনন্ত আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে আমারও সবটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই 'আমি'-টুকুর তান সকল 'আমির' গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মীড়ের পর মীড় টেনে চলেছে। এই 'আমি'-টুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠেছে; সকল 'আমি'র বিশ্বব্যাপী বিরাট বীণায় এই 'আমি' এবং আমার মতো এমন কত 'আমি'র তার আকাশে আকাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর 'আমি'! কী মহৎ 'আমি'! কী সার্থক 'আমি'।—শান্তিনিকেতন।

CENTRAL LIBRARY

অথচ—'আমাদের এই 'আমি' সেই পরম 'আমি'র মুখোমুখি হয়ে বলতে না পারলে কখনোই তাঁর প্রেম চরিতার্থ হবে না।'—কেননা 'কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই।'—শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্রদর্শনের তত্ত্বগত এই 'অহং'—যা শুধুমাত্র মনীষার বিষয় না হয়ে রসোপলব্ধির বিষয়ও হয়ে উঠেছে—তার সাহিত্য শাস্ত্রগত আলোচনাও তাঁর সমালোচনা গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সাহিত্য-গ্রন্থে 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি একস্থানে বলছেন—'যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি আমি তাহাকেই চাই।' —শান্তিনিকেতন।

পারিবারিক জীবনে আমার 'আমি' পুত্রের মধ্যে অধিকতর সত্য বলেই পুত্র প্রিয়তর হয়ে ওঠে। সাহিত্যের মধ্যে আমার সেই 'আমি' আপনাকে অধিকতর প্রত্যক্ষ ক'রে, সকলের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত ক'রে সত্যতর হয়ে ওঠে। সাহিত্যের মধ্যে মানুষ নিজের প্রকাশ সর্বাধিক করতে পেরেছে বলেই সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার গৌরব সর্বাধিক—'এই জন্যই দেশে এবং কালে যে মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ।'—শান্তিনিকেতন।

এবং এটি সত্য কথা—সাহিত্যসৃষ্টির গোড়ার কথা—যে 'অহং' নিজস্ব ও পরস্ব অভিজ্ঞতার সম্পদে যত বেশী ধনী, সেই 'অহং'-ই সাহিত্যে-শিল্পে নিজেকে তত বেশী প্রকাশ ক'রে চরিতার্থ হয়। কারণ অতীতের ভাবগত অভিজ্ঞতার নিদর্শন যে সাহিত্য ও শিল্পকর্মে আছে, তার সঙ্গে সে যেমন সুপরিচিত থাকে, তেমনি থাকে বুদ্ধিগত অভিজ্ঞতার যে নিদর্শন বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে—তার সঙ্গেও সুপরিচিত। এইজন্যই তার অহংসত্তা জীবনবোধে পূর্ণ ও সমঞ্জস হয়ে ওঠে।

এবং এই সঙ্গে যুক্ত হয় তার নিজস্ব হৃদয় ও মনীষার উদ্দীপ্তি ও গাম্ভীর্য—ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতার পথে। এই কথাটাই মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশে কাব্যহেতুনির্ণয়প্রসঙ্গে একটি শ্লোকে আশ্চর্য সংক্ষিপ্তির আশ্রয়ে বলেছেন—'নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।' এই 'অহং'-কেই আধুনিক ভাষায় আমরা বলে থাকি 'কবির ব্যক্তিসত্তা।' ব্যক্তিসত্তা যে লেখকের নেই—সে লেখকই নয়—লেখকাভাস মাত্র। চিত্রকাব্যের মতো সেও চিত্রকবি!

'অহং'-এর এই সাহিত্যসৃষ্টি ক্ষমতাকে স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'হৃদয়বৃত্তির জাগরকরস'। 'অহং' যার মধ্যে জাগ্রত, সে সৌভাগ্যবান্। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে—'এমন সৌভাগ্যবান্ লোক আছেন যাঁহাদের বিস্ময় প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ, লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।' —শান্তিনিকেতন।

পূর্বেই বলেছি—বিশেষ অভিজ্ঞতাজনিত জীবনবোধ 'অহং'-এর বিশিষ্ট গুণ। অভিজ্ঞতা যত ব্যাপক ও গভীর গুণও তত উজ্জ্বল ও প্রসারী। এই অহংসত্তা একটি বিশেষ সংস্কার থেকে উৎপন্ন। এ সংস্কার সকলের সমান থাকে না। থাকলেও শিক্ষার দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা, তদুচিত রুচি ও পরিশীলন সকলের সমান ভাবে প্রকাশ পায় না। ভোজদেব তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে যে বস্তুকে বলেছেন 'জন্মান্তরানুভবনির্মিত বাসনোত্থা', মম্মট সেই বস্তুকেই বলেছেন কাব্যজ্ঞশিক্ষাভ্যাস এবং রূপগোস্বামী তাকে উল্লেখ করেছেন 'রুচিবিশিষ্টত্বমাস্থণ্যকৃৎ' ব'লে।

আত্মস্বরূপ এই 'অহং' সুকৃতিবিশেষ। অহং প্রকাশ করে ব্যক্তিসত্তাকে, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে তার সমস্ত চরিত্রকে এবং চরিত্র প্রকাশ করে শৈলকে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক 'Style is the man' বলতে যা প্রকাশ করতে

CENTRAL LIBRARY

চান ভোজদেব তাকেই প্রকাশ করেছেন সাহিত্যকর্মে প্রকাশিত অহংসত্তারূপে বা কবির গোটা ব্যক্তিত্বস্বরূপে। এই 'অহং' 'egotism' নয়, এ হচ্ছে 'Ego' বা 'I'। এই অহং যদি না থাকে তবে জীবনে তথা কাব্যে আর যত সম্পদই থাকুক—আসলে তা কিছুই না থাকার মতো। তাই ভোজদেব বলেন—'মনো নাস্তি চেৎ নাস্তি কিঞ্চিৎ।' কবি যদি তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত থাকেন, তবে আর তাঁর কাব্যে কীই বা রইল! সাহিত্য সেই অহংপুরুষকেই প্রকাশ করে—তাই বিষয়বস্তু, কাহিনী বা রসের দিক দিয়ে অভিনবত্ব না থাকলেও, কবির ব্যক্তিত্বের ধারক যদি তা হয়—তাহ'লেই আসে চরিতার্থতা। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ প্রকাশ যাতে তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

লেখকের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তরতম সত্তায় মিলিত হয়ে ঐকাত্ম্যলাভ করলে সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে, অন্যথা নয়। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-গ্রন্থে 'আলোচনা'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'যখন কোনো একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে করে তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য বলে মনে হয়, তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, তখনই সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়।...আমাদের মনোরাজ্যে তাদের আর প্রবাসী ভাবে থাকতে হয় না।'

'আপনার জন্মভূমির পরিচয়'—এর অর্থ লেখকের 'অহংসত্তা'র পরিচয়। এই সত্তার উৎস থেকেই উৎসারিত হয় সাহিত্য কর্মের ধারাপ্রপাত।

অবশ্যই এই অহং ক্ষুদ্র অহং নয় যাকে জৈবিক সত্তা বলা হয়। জৈবিক সত্তার কার্য নয় বিধাতার প্রতিস্পর্ধী সৃষ্টি করা। এ অহং 'বৃহৎ অহং'—যার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে বিশ্বসত্তা। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে লোকনাথ পালিতের পত্রের উত্তরে একটি প্রবন্ধে—'সাহিত্য'—(পত্রোত্তর)—

'লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানব-প্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানব-প্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে, প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।'

এইকথাই আরো স্পষ্ট করে বলেছেন 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সভাপতির ভাষণ' প্রবন্ধে—

'মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য সকলের সত্য সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়। অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই কী ব্যক্তিবিশেষের কী সমূহ-বিশেষের যথার্থ পরিচয়।'

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়ারের উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁদের মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিত্ব (যার নামান্তর 'অহং') ধরা পড়েছে বলেই তা এমন চিরকালের জীবন্ত সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, 'অহং' শব্দটির অর্থ ইংরেজি ভাষার 'Egotism' নয়। এর অর্থ 'Ego' যা একটি বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। ভোজের মতে এই 'অহং' বা 'Ego' প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে—কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 'আমি' বা 'I' একটি বিশিষ্ট চেতনা। রসিকসত্তার এই অহংতত্ত্বটি সর্বমানবসাধারণ—যদিও তা

CENTRAL LIBRARY

সকলের মধ্যে সমানভাবে প্রকাশ পায় না। 'সর্বাত্মনাম্ অমলজন্মবিশেষজন্মা' এই 'অহং'-বস্তুটি 'সন্ এব আবির্ভবতি, ন তু অসন্ উৎপদ্যতে।'

রসিকের অহং-সত্তা তার চরিত্র ও শীলগত বৈশিষ্ট্য সূচনা করে। চরিত্র হচ্ছে অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। শীল—বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট হ'লেও জগৎ থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়। জগতের সববস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রসিকের এই 'অহং'-সত্তার সর্বাত্মকতার কথা চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য'-গ্রন্থে 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে বলেছেন—

'সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণামসত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।'

কারণ, একটা পূর্ণ মানুষ বলতে বুঝি সেই মানুষকে যে জগতের সঙ্গে যুক্ত হয় তার ইন্দ্রিয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ও মন দিয়ে। যুক্ত হওয়াটা যত গভীর ও ব্যাপক হয় ততই রসিকের অহংসত্তা দীপ্যমান থেকে দীপ্যমত্তর হতে থাকে। সাহিত্যবিচারে তাই এটাই আসলে দেখবার কথা যে লেখক নিজের সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে কতখানি প্রকাশ করতে পেরেছেন—তাঁর ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে।

সমগ্র ব্যক্তিসত্তার এই অকুণ্ঠ প্রকাশকে ভোজদেব তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে অহং-শৃঙ্গারের উদ্দীপ্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে কাব্যে যদি এই অহং-শৃঙ্গার মূর্ত না হয়ে ওঠে তাহ'লে তা কাব্যই নয়—

'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব চেদ্ অশৃঙ্গারী নীরসং সর্বমেব তৎ॥'

বলা বাহুল্য, এই শৃঙ্গার কামকলার শৃঙ্গার নয়। এ হচ্ছে 'অহং শৃঙ্গার'—যা থাকলে জগৎ রসময়। বা সুষম ব্যক্তিসত্তা। যা থেকে বিচ্ছুরিত হয় সংস্কারের উজ্জ্বল আলোক। যা থাকলে সম্ভব হয় সংস্কৃতির অত্যুজ্জ্বল বর্ণসংঘটনা। যা সার্বভৌম আত্মপ্রেম—সর্বাবিরোধী ভাবপ্রকর্ষ।

পঞ্চভূতে 'অখণ্ডতা'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তঃকরণের দুটি অংশের কথা বলেছেন। একটি অংশ বৃহৎ গুপ্ত অচেতন এবং নিশ্চেষ্ট এবং অন্য অংশটি সচেতন সক্রিয় চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। এবং—

'আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে, ফেলিতেছে, সেই সমস্ত সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস-আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তরপর্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন না। উপর হইতে যাহা দৃশ্যমান হইয়া উঠে অথবা আকস্মিক ভূমিকম্প বেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাই আমরা দেখিতে পাই।'

'এই মহাদেশেই শস্য পুষ্প ফল সৌন্দর্য ও জীবন অতি সহজে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। ইহা দৃশ্যত স্থির ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ইহার ভিতরে একটি আয়াস নৈপুণ্য, একটি গোপন জীবনী শক্তি নিগূঢ়ভাবে কাজ করিতেছে।'

এই উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র ও মহাদেশের রূপকগ্রহণে মানবচিত্তের যে দু'টি দিক নির্দেশ করেছেন তার একটি দিক হচ্ছে সংস্কার, অন্য দিক তার বিকাশ। একটি দিক তার শক্তি, অন্য দিক তার বিলাস। একটি দিক উপাদান সংগ্রহ, অন্য দিক নির্মিতি কৌশল। একটি সংস্কার-স্মৃতি অভ্যাস-জনিত স্থায়ী অংশ—যাকে ভোজ নির্দেশ করেছেন 'জন্মান্তরানুভবনিমিত্তবাসনোত্থ' ব'লে। শুধু পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার নয়—যা কিছুই স্থির হ'য়ে থেকে যায়—যেমন স্মৃতি, যা কিছু দৃঢ় হ'য়ে উঠে রয়ে যায়—যেমন অভ্যাস—সে সমস্তকেই তিনি এক 'উৎপন্নতীব্রসংস্কারত্ব'-গুণে অন্বিত দেখে স্থায়িভাবরূপে অহংকেই নির্দেশ করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন—যা কিছু স্থির হ'য়ে আছে, গোপন হয়ে আছে 'সংস্কার-স্মৃতি অভ্যাস আকারে।' মনের যে দিকটিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাকে

CENTRAL LIBRARY

মহাদেশের মতো শস্য-ফুল-ফল-সৌন্দর্যময় বলে উল্লেখ করেছেন—সেটিকে স্বচ্ছন্দে ভোজের 'অহংশৃঙ্গারের' সেই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় যেখানে তা রূঢ়াহংকারতার প্রথমা কোটি উত্তীর্ণ হয়ে মধ্যমাবস্থার দ্বিতীয়া কোটিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়া কোটিতে ভাব থেকে ভাবান্তরের সৌন্দর্যবিলাস শতশিখ অর্চির মতন ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। এবং এসে পৌঁচেছে সেই তৃতীয়া কোটিতে যেখানে পরম বেদনা ও পরম আনন্দ এক হ'য়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় প্রেমরসে।

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় অতি সুস্পষ্টভাবে এই অহংতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবিতাটি শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের 'আমি'।

অবশ্য তারও বহু পূর্বে সন্ধ্যাসঙ্গীতে 'আমি-হারা' কবিতায় তিনি সেই 'আমির'-র জন্য বিলাপ করেছেন—ভোজদেব যে আমিকে বলবেন 'অহংশৃঙ্গার'। আক্ষেপ করছেন কিশোর কবি—

'হায় হায়—জীবনের তরুণ বেলায়
কে দিল রে হৃদয়-মাঝারে
দুলিত যে অরুণ দোলায়!
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি—
সে আমার সুকুমার আমি।...
কিছুই যে জানি না গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়!...
হারায়েছি আমার আমারে,
আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে।'

স্মরণ করুন ভোজদেবের উক্তি—আমি' চেতনাই হচ্ছে—'এক এব শৃঙ্গারো রসঃ' এবং এর অভাবে 'নীরসং সর্বমেব তৎ'। এই 'আমি' হচ্ছে 'রূঢ়াহংকারতা' যা সর্ববিধ সুখের মূলে বীজরূপে অবস্থিত। এর পরে যে দ্বিতীয় কোটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তা, হচ্ছে প্রকাশবৈচিত্র্য প্রভাত-সঙ্গীতের 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' নামক কবিতায় যার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি—

'জগতের আত্মা কহে কাঁদি
আমারে নূতন দেহ দাও—
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।'

গীতিমালোও দেখতে পাচ্ছি সেই 'আমি'-র বিলাস-ঐশ্বর্য—

'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।—

CENTRAL LIBRARY

আমাকে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের হাটে হাটে,
আপনা নিয়ে করব যতই বেচা-কেনা।'…

নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই জানা যায় না। এমন কি, জগৎ-প্রকৃতিকে জানাও নিজেকে জানা, মানব-প্রকৃতিকে জানাও নিজেকে জানা। মানবপ্রকৃতি ও জগৎ-প্রকৃতির মধ্যে মানুষ আপনারই আত্মসম্প্রসারণের আনন্দ উপলব্ধি করে সৌন্দর্যে ও প্রেমে। এই কথাটাই পঞ্চভূত গ্রন্থে 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তাবন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে।……ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি, সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।'

বলাকা কাব্যের ২৯ সংখ্যক কবিতায় 'আমি'-র আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে। উপনিষদে আছে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম 'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।' অর্থাৎ আনন্দ একে নেই, আছে অন্-একে। কবি যখন একা থাকেন তখন তিনি আপনার মধ্যে আপন আনন্দকে খুঁজে পান না, যখন 'সর্বভূতান্তরাত্মা'-রূপে সৃষ্ট বস্তুতে নিজেকে নূতন নূতন রূপে অনুভব করেন—যখন তিনি নিজেকে 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' রূপে অনুভব করেন, তখনই তিনি বিচরণ করেন আনন্দলোকে। এই আনন্দ কিন্তু অভাবপূরণজনিত ক্ষুদ্র সুখ নয়। এ আনন্দ হচ্ছে সত্তার আনন্দ—কিছু একটা হয়ে ওঠার আনন্দ—'আমি'-সত্তাকে বিকশিত করে তোলার আনন্দ—'আমিত্বের' বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার আনন্দ। বলাকার ২৯ সংখ্যক কবিতায় দ্বৈত সত্তার এই আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে—

'আমি এলেম ভাঙলো তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমি এলেম—কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম—এল তোমার সুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুন-ভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ তুফান তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম—তাইতো তুমি এলে ··
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্য তারা সকলি নিষ্ফল।'

'আমি' না থাকলে সূর্য-তারার নিষ্ফলতার কথা পলাতকায় বলেছেন—

'আমি' নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যা তারা ওঠা,
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।'

এই 'আমি' বা অহংকারের তিনটি অবস্থা—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তার প্রথম অবস্থাটি যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় হয় তাহ'লে তার বৈচিত্র্যময় দ্বিতীয় অবস্থাটি শত-শিখা-সমুজ্জ্বল অগ্নির উপমা, তৃতীয়টি একটি বিশেষ পরিণতিতে সংহত। ভাববীজের রসপরিণতিকে লক্ষ্য করে রূঢ়াহংকারের প্রেমরসপরিণতির কথাই ভোজদেব বলে গেছেন তাঁর শৃঙ্গারপ্রকাশে। পূর্ণপরিণতির এই স্পৃহাকে কামারূপে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষসপ্তকের ৯ সংখ্যক কবিতায়—

CENTRAL LIBRARY

'এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,—
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।'

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 'অহং-তত্ত্ব'টি স্পষ্টরূপ পেয়েছে তাঁর শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের 'আমি'-শীর্ষক কবিতায়। স্পষ্টতই তিনি এখানে বলেছেন—এই 'আমি' না থাকলে বিশ্বজগতে না আছে সৌন্দর্য, না আছে প্রেম। 'আমি' যেদিন থাকবে না, সেদিন—

'মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিন রাতের জমা-খরচ।
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনদিনই
'তুমি সুন্দর'
'আমি ভালবাসি'।

সৌন্দর্য ও ভালবাসা—আনন্দের স্বরূপ। আনন্দ মানুষের সত্তার ধর্ম—যে সত্তার নির্বিশেষ রূপ পরমাত্মা। নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মার বিশেষ রূপই হচ্ছে জীবাত্মা। সুখ-দুঃখ তাতেই সমারোপিত। যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনিই জীবরূপে প্রকাশ পেলেন, জগৎরূপে প্রকাশ পেলেন—এমন কথা দর্শনে বলে। কেননা—'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদ্ একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ।' এলো দ্বিতীয় জীবজগৎরূপে। চৈতন্যময় সত্তার আনন্দস্বরূপ অভিব্যক্তি হলো সৃষ্টিতে—পান্না হলো স্নিগ্ধ সবুজের ছোঁয়ায়, চুনি হলো চমক-লাগা আবেগের রক্তিমায়। যে দিকে দৃষ্টি পড়লো—অপ্রকাশের পর্দা গেল সরে—জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে। পুষ্পের পর্যন্তাসে এলো সুষমা—হলো সে সুন্দর। আর এই অসীম যখন এইভাবে সীমায় সীমায় মূর্ত হ'য়ে উঠলেন তখনই জেগে উঠল রূপ, জেগে উঠল গান, জেগে উঠল প্রেম—ভরে উঠল রস—অর্থাৎ সেই মহান্ 'অহং' 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।'

তত্ত্বজ্ঞানী ডুববেন গভীরে। বিশেষিত বিশেষ্য থেকে তিনি যাবেন আর এক বিশিষ্ট চেতনায়। এমনি করে করে নেতির পথে এসে পৌঁছবেন 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র মুখোমুখি। কিন্তু সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যিনি একাকী 'ন রেমে', নেমে এলেন সৃষ্টির বহুত্বে—প্রকাশ পেলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষের মধ্যে—

'অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই 'আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সঙ্গম
দেখা দিল রূপ—জেগে উঠল রস।

CENTRAL LIBRARY

'না' কখন ফুটে উঠে হলো 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—এই 'আমি', 'ছোটো আমি' নয়, এ হচ্ছে 'বড় আমি'—যাকে লক্ষ্য করে ভোজদেব বলেছেন—'সর্বাত্মসম্পদুদয়াতিশয়ৈকহেতুর্জাগর্তি কোঽপি হৃদি মানময়ো বিকারঃ।'

রবীন্দ্রনাথও বলছেন—

'আমি বলব, এ সত্য
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।'

'কান্ত ছাড়া গীত নেই' যেমন, তেমনি আমি ছাড়া জগৎ বা সাহিত্য-শিল্প কিছুই নেই। সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবই হয় না যদি এই আমি না থাকে। ভাববস্তু সর্বসাধারণ। শব্দসম্ভারও সর্বসাধারণ। তাকে বিশেষ করে তোলে কবির ব্যক্তিসত্তা বা অহংসত্তা। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'ছাত্র বহুদিন বহু প্রয়াসে অক্ষর শিখল, বানান শিখল, ব্যাকরণ শিখল, অনেক কাগজে অনেক আঁকাবাঁকা অসম্পূর্ণ নিরর্থক লেখা শিখল, উপকরণ ব্যবহার করল ও বর্জন করল বিস্তর—অবশেষে কবিরূপে যে মুহূর্তে সে তার প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরেছে সেই মুহূর্তেই সেই একটি লেখায় এতদিনকার পুঞ্জপুঞ্জ বাক্যহীন উপকরণের প্রথম অর্থটুকু দেখা দিল।'

কেননা সেই কবিতায় সে নিজেকেই প্রথম প্রকাশ করতে পারলো বলেই নিজেকে সে চিনলো। চিনতে পারলো বলেই নিজেকে সে বেশি ভালোবাসলো। নিজেকে ভালবাসতে পারলো বলেই মানুষকে ভালবাসলো—প্রকৃতিকে ভালবাসলো। তখন তার রূপ হলো আরো উজ্জ্বল, রস হলো আরো গভীর।

রবীন্দ্রনাথ এই 'আমি'-চেতনার আমি ব্যাপ্তিকে লক্ষ্য করে তাঁর সঞ্চয় গ্রন্থে 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে বলেছেন—'আমি আমার চলা-ফেরা কথাবার্তায় প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি, তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করে আছি।'

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করছেন আলোচনামুখে—'এই 'আমি' কোথা থেকে আসে?' নিজেই উত্তর দিচ্ছেন আলোচনা প্রসঙ্গে—'অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার—সোঽহমস্মি।'

'অহমস্মি—আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হলো সেখানেই 'আমি'র পালা। 'আমি আছি' এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির মন্ত্র।'

প্রলয়ে সেই 'আমি'র প্রকাশ লুপ্ত। লীলাময় তখন লীলাহারা—তাই সৃষ্টির সাধনায় বসবেন—

'প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন—
'কথা কও, কথা কও
বলবেন—'বলো, 'তুমি সুন্দর'
বলবেন—'বলো, আমি ভালবাসি।'

সৃষ্টির মূল রহস্য এই শতধা বিভক্ত 'অহং' বা আমি—পরস্পরের যোগে যা প্রেম যা সৌন্দর্য। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 'আমি' পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত বা বিযুক্ত হচ্ছে এক 'বিশ্ব আমি'র আধারে। আমার এই 'বিশেষ আমি'ই যে

CENTRAL LIBRARY

পরিণতি চাইছে সেই অনন্ত 'বিশ্ব-আমি'তে—তা নয়। যেমন এক নদীপ্রবাহে কোটি কোটি তরঙ্গ-লীলা, একটি তরঙ্গে লক্ষ লক্ষ বীচিভঙ্গ একই গতিবেগে ব'য়ে চলেছে, তেমনি এই বিশ্বপ্রাণ প্রবাহে সেই 'বিশ্ব-আমি'র সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়েই চলেছে এই কোটি কোটি 'বিশেষ আমি'। রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয় গ্রন্থের শেষের দিকে তাই বলেছেন—

'সেই এক 'আমি-আছি'ই লক্ষ লক্ষ 'আমি-আছি'তে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার 'আমি-আছি' সেই মহা 'আমি আছি'র প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলেনা যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার 'আমি-আছি'র মধ্যেও যেমন আছেন, তেমনি আমার 'আমি-আছি'কে অতিক্রম ক'রেও আছেন। সেই জন্য অগণ্য 'আমি-আছি'র মধ্যে যোগের পথ আছে।'

জগতের রূপ এই 'আমি'র বহিরঙ্গ প্রকাশ, জগতের রস এই 'আমি'র অন্তরঙ্গ আস্বাদন। দুই মিলিয়ে এক অখণ্ড লীলা। রূপ আশ্চর্য—রস মনোহর। নিরাকারের হৃদয় থেকে আকারের ফোয়ারা নিত্য-উৎসারিত। সেই রূপ ও রসের সৃষ্টি যে 'অহং' থেকে সেই, 'অহং' থেকেই তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন তাঁর 'সঞ্চয়' গ্রন্থে—'আমি এই দেখেছি, যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়—সেদিন সমস্ত জগতে সুর আর তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মনে করিয়ে দেয় ভোজদেবের উক্তি—'মনো নাস্তি চেৎ নাস্তি কিঞ্চিৎ।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি যখন বর্ষার গান গেয়েছেন তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার বেদনা নতুন ভাষায় এবং অপূর্ব রস-ব্যঞ্জনায় ভরে উঠেছে। চিত্রকরের চিত্রে নতুন বর্ণসম্পাত ঘটেছে। কবির কাব্যে রহস্য ভাস্বর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এর থেকেই তিনি জেনেছেন—'এই জগতের জল-স্থল-আকাশ আমার হৃদয়ের তন্ত্র দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না, গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হ'য়ে থাকত, আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা ক'রে রাখত।'

রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই যে কবির কাজই হচ্ছে মানুষের অহং-চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা—

'কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে জগৎটা 'আমি, জগৎটা 'আমার', ওটা রেডিও-চাঞ্চল্যমাত্র নয়।.....আমার হৃদয়-মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন, সেই তো বিশ্ব-সঙ্গীত, নইলে কিছুই বাজত না।'

সৃষ্টির 'অহং-চৈতন্য' অর্থক্রিয়াকারী বলেই একটা সৃষ্টি এই জগতে আর একটা সৃষ্টির মতো কিছুতেই সম্ভব হয় না।

প্রতিভার 'অহংচৈতন্য'-ও অনুরূপ বলে একটা সাহিত্য বা শিল্পনির্মিতি কিছুতেই আর একটির মতন হয় না। এই 'অহং-প্রজ্ঞা'ই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ—কী জগতে—কী শিল্পে-সাহিত্যে। এত প্রকাশ—এত ব্যঞ্জনা—এই কারণেই। মানবের হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়, ষড়রিপুর ষড়যন্ত্রও নয়। এ হচ্ছে আধারে আধারে চির-নবীন কালে কালে তার নবরসরুচিরা নির্মিতি। সে আপন বাসের জন্য সৃষ্টি করেছে এক নূতন জগৎ 'অহং-চৈতন্যে'র আলোকে আলোকময়।

CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন—'এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি। এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মনে পড়িয়ে দেয় ছান্দোগ্যোপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশখণ্ডের কথা—যেখানে উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে এই 'অহং-চৈতন্যে'র—

'অথাতোঽহংকারাদেশ এব। অহমেব অধস্তাৎ। অহম্ উপরিষ্টাৎ। অহং পশ্চাৎ। অহং পুরস্তাৎ। অহং দক্ষিণতঃ। অহম্ উত্তরতঃ। অহমেব ইদং সর্বম্ ইতি।'

এই 'অহং' কে। এই অহংই আত্মা। সোঽহম্। আমি নিচে আমি উপরে। আমি পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে। আমি দক্ষিণে, আমিই উত্তরে। কারণ, যা কিছুই আছে—সে সবই আমি! তার কারণ—এই অহংই আত্মা।—'অথাত আত্মাদেশ এব। আত্মৈব অধস্তাৎ। আত্মা উপরিষ্টাৎ। আত্মা পশ্চাৎ। আত্মা পুরস্তাৎ। আত্মা দক্ষিণতঃ। আত্মা উত্তরতঃ। আত্মৈব ইদং সর্বম্ ইতি।'

CENTRAL LIBRARY

পাশ্চাত্ত্য শিল্প-চিন্তা-আন্দোলন ও বাংলা কবিতা

দীপ্তি ত্রিপাঠী

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্প-চিন্তা-আন্দোলনগুলি কতটা বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করেছে বাংলা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তীর (১৯৭২) বছরে তার একটা খতিয়ান করা দরকার।

বাংলা সাহিত্যের গোড়া থেকেই দেখি চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে মিস্টিক ধারা—রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে ক্লাসিক ধারা—মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রিয়ালিস্টিক ধারা বর্তমান। যদিও সে যুগের সাহিত্যিকেরা এটা সচেতন ভাবে জানতেন না। তাঁরা দেবতা বা দেবোপম চরিত্রের প্রচার নিয়েই মগ্ন থাকতেন। ভারতচন্দ্র কখনোই বোধহয় স্পষ্ট করে বোঝেন নি তিনি অলক্ষ্যে একটি পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো তৈরী করেছেন তাঁর অন্নদামঙ্গলে। এই রিয়ালিজ্‌মের ধারা উনিশ শতকের কবিওয়ালাদের গান এবং ঈশ্বর গুপ্তেও চলেছিল। এমন সময় মধুসূদন এসে সচেতনভাবে নিও-ক্লাসিক ধারার উদ্বোধন করলেন। তাঁর উত্তরসূরী হলেন হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখ কবিরা। নিও-ক্লাসিক ধারার উদ্বোধন হওয়া বিচিত্র নয়, জার্মানিতেও গোটে এমন এক ক্লাসিক ধারার প্রবর্তন করেন উনিশ শতকে। যাই হোক মধুসূদনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অসামান্য হওয়া সত্ত্বেও বলতে হবে যুগটা ছিল রোম্যান্টিকদের। ১৭৮৯ খৃঃ ফরাসী বিদ্রোহের সঙ্গে একটা দৃষ্টিবদল ঘটে গিয়েছিল। রোম্যান্টিকদের সৌন্দর্য সন্ধান, মানুষে বিশ্বাস, অতিলৌকিকে যাত্রা, রহস্যবোধ, আবেগ-প্রাবল্য, শৃঙ্খলাহীনতা, প্রথা-বিরোধিতা, ঈশ্বর- নিরপেক্ষতা বিষণ্ণতাবোধ, সুদূরের পিপাসা, প্রকৃতিমুখিতা শিল্পক্ষেত্রে সত্যিই আনল বিপ্লব। ১৭৯৮ খৃঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজের 'লিরিক্যাল ব্যালাড' প্রকাশিত হোল। এই হ'ল রোম্যান্টিক কবিতার জন্মকাল। এঁদের মতে শিল্পীর প্রধান গুণ—কল্পনা যা যুক্তির স্থান অধিকার করে আছে—সেই জীবন ও প্রকৃতির সব রহস্যের সমাধান করে দেবে। কবির প্রয়োজন তাই এত বেশী। কবিই পথপ্রদর্শক—ভবিষ্যৎ প্রবক্তা। বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্তে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর আশী বছরের জীবনে। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'দুটো মহাযুদ্ধ সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে—তারি ফলে সুরু হোল নতুন শিল্প-চিন্তার আন্দোলন—নব নব দিগন্তের সন্ধান।

আজকের কবিতা আর হ্লাদৈকময়ী নয়। তবে নবরসরুচিরা বটে। শিল্পসৃষ্টির বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্য নতুন সীমান্ত আবিষ্কার। বাস্তব অর্থাৎ রিয়ালিটিকে এমন ভাবে দেখা যা কখনো আগে দেখা হয়নি। সৎ ও অসৎ-এর দ্বন্দ্ব নয়, আজকের শিল্পীর সমস্যা হোল বাস্তবের সমস্যা। কারণ, ধর্ম ও অভিজাত সমাজের বাঁধন কাটবার সঙ্গে পুরাণ ও ইতিহাস ইত্যাদির প্রভাব আর নেই। প্রকৃতি ও জীবনের সৌন্দর্য, প্রেম, আবেগ নিয়ে রোম্যান্টিকেরা অনেক হৈচৈ করে যাবার পর কবিদের বিষয় হিসেবে পড়ে রইল কি ? বাস্তব।

কিন্তু যা চোখে দেখি তাই কি বাস্তব ?* বহিরঙ্গ দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন রিয়ালিস্টরা এক সময়ে। কিন্তু এখনকার কবিরা বাস্তবের আরো ভেতরের সত্যিকার অর্থ খুঁজতে চাইলেন।

*১৮৩০ খ্রীঃ বাস্তববোধ সচেতন আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৮২০-৮০ খ্রীঃ অঙ্কে খুবই প্রবল হয়। বালজাক, থ্যাকারে, ইবসেন এই ধারার সাহিত্যিক। কোঁতে দার্শনিক। মাদাম বোভারি উপন্যাস রিয়ালিস্ট সাহিত্যের একটি সার্থক উদাহরণ। ১৮৩৯ খ্রীঃ অঙ্কে ফটোগ্রাফী আবিষ্কার এই আন্দোলনকে প্রেরণা দিয়েছিল।

CENTRAL LIBRARY

যা দেখি তা অনেক সময় অর্ধ সত্য। এমন অনেক বীজাণু আছে যা মাইক্রোস্কোপ ভিন্ন দেখা যায় না। অথচ মন দিয়ে অনেক অনুমান বা সন্দেহ করা যায়। তাই শুধু চোখে দেখায় বিশ্বাস টলে গেল। বোদলেয়র বোধহয় সর্বপ্রথম আমাদের এ বিষয়ে সচেতন করেন। সাদা চোখে দেখলে হবে না। চোখের পিছনে চাই মন। কারণ, শিল্পের কাজ নয় পুনঃপুনঃ উৎপাদন—তার কাজ 'দেখানো'।

অতএব ইম্প্রেসনিজ্‌মের জন্ম হোল। তাঁরা বস্তুর 'বস্তুত্বে'র মূল্য দিতেন না। মন্ময় দৃষ্টিকেও নষ্ট করে দিলেন। বস্তু নয়, বস্তুর সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা থাকে তার রূপ দিলেন। আলো, রং, ইন্দ্রিয়ঘনত্ব এই ছিল তাঁদের উপাদান।

বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের পরে ইম্প্রেসনিস্ট জীবনানন্দ এসে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দে 'বনলতা সেন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে ইম্প্রেসনিজ্‌মের যুগ শুরু হোল। ইয়োরোপে ফরাসী চিত্রকর মানে ছিলেন এর নেতা। ১৮৭৪ খ্রীঃ তাঁরা একটি প্রদর্শনী করেন। সেখানে মানে অঙ্কিত ইম্প্রেসন—'সানরাইজ' ছবিটি থেকে ইম্প্রেসনিজ্‌ম নামটি নেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যে কিন্তু তার প্রায় ৫৮ বছর পরে এ আন্দোলন ঢেউ তুলল। মোটের উপর 'বনলতা সেন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার একটা বিশেষ বাঁক বদল হোল। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' এবং জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যাবে পার্থক্য কোথায়?

আসল কথা, রোম্যান্টিকেরা যেমন একটা স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করতে পারতেন, ইম্প্রেসনিস্টরাও পারতেন তেমনি একটা নেশাধরানো সুখময় ইন্দ্রিয়াবেশ রচনা করতে। কি করে? এটাই আসল কৌশল। তাঁরা রোম্যান্টিকদের মন্ময়ত্ব চূর্ণ করলেও রেখেছিলেন তাঁদের ইন্দ্রিয়ঘনত্ব তথা আবিষ্ট করবার মায়াবী শক্তি। যেমন,—

১. দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের ডালালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে;

(মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

২. সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;

(বনলতা সেন)

৩. বালির উপরে জোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্ততঃ
বিচূর্ণ ধানের মতো; এশিরিয় দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

(হাজার বছর শুধু খেলা করে, মহাপৃথিবী)

এখানে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের ভোজ বসে গেছে। এমন একটা ইন্দ্রিয়াবেশের মাদকতা কবি রচনা করেছেন যাতে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে যাই। রোম্যান্টিকদের স্বপ্নাবেশের তুল্য ইম্প্রেসনিস্টের ইন্দ্রিয়াবেশ। ফলে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের প্রভাব এত বেশী ধীমান সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে। অনুজ কবিদের উপর, বিশেষ করে পঞ্চাশের কবি বলে যাঁরা চিহ্নিত, তাঁদের উপর তাঁর প্রভাব প্রগাঢ়। যথা,—

CENTRAL LIBRARY

১. হলুদ পাখীর চোখ তোমার নয়নে কেন ?

('হলুদ পাখী', আলোক সরকার)

২. শুধু জোৎস্নার ফুল ফুটে ঝরে গেল

('একটি প্রেমের কবিতা', প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)

৩. দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝরে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিমিকি মাছের মতন মনে হয়

('অনন্ত কুয়োর জলে চাঁদ পড়ে আছে', শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

পূর্বেই বলেছি ইম্প্রেসনিস্ট আন্দোলন ইয়োরোপে সুরু হয় ১৮৬২-৬৩ সালে। আমাদের দেশে এর ঢেউ পৌঁছয় প্রায় ৭০ - ৮০ বছর পরে। ইতিমধ্যে সেখানে আরো অনেকগুলি শিল্প-আন্দোলন হয়ে গেছে। যথা ফবিজ্‌ম (১৯০৫-৬), কিউবিজ্‌ম (১৯০৭-১৪), ফিউচারিজ্‌ম (১৯০৯), এক্সপ্রেশনিজ্‌ম (১৯১২-১৩), ডাডাইজ্‌ম (১৯১৬) সুররিয়ালিজ্‌ম (১৯২৪), কম্যুনিজ্‌ম (১৯২৫), এক্সিসটেনশিয়ালিজ্‌ম (১৯৪৩-৪৪)।

বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনগুলি কিন্তু ঠিক এভাবে পরপর আসেনি। এসেছে উল্টোপাল্টা ভাবে। যেমন জীবনানন্দ যদিও বাংলা সাহিত্যে ইম্প্রেসনিজ্‌মের জনক তবু তাঁর মধ্যে ফবিস্ট ও সুররিয়ালিস্ট স্পর্শ আছে। সুধীন্দ্রনাথ যদিও সিম্বলিস্টদের গুরু বলে মানতেন কিন্তু তিনি এক্সিসটেনসিয়ালিস্টও বটে। দ্বিতীয়ত, সব আন্দোলন গুলিই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেনি। অনেক ক্ষেত্রে *tour de force* হয়েছে। আবার কতকগুলি, যেমন ইম্প্রেসনিজ্‌ম, কম্যুনিজ্‌ম, বা সুররিয়ালিজ্‌ম, প্রচুর রসসৃষ্টির প্রেরণা হয়েছে। যাই হোক, এলোমেলো ভাবে এলেও পারম্পর্য রেখেই আলোচনা করছি।

ইয়োরোপে ইম্প্রেসনিজ্‌মের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলো ১৮৮০-৯০ খ্রীঃ অব্দে। তাঁরা বললেন passive records of senses দিয়ে পূর্ণ সত্যকে ধরা যায় না। ইন্দ্রিয়ঘনত্ব ধীশক্তিকে গ্রাস করে। সত্যকে পেতে গেলে বুদ্ধিকে বাদ দেওয়া অনুচিত।

১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে সেজান ইম্প্রেসনিস্ট গোষ্ঠী ত্যাগ করে বললেন—পৃথিবীকে তন্নিষ্ঠ চোখে দেখতে হবে। চাই জ্যামিতির আইন। গভীরের অদৃশ্য সত্যকে দেখবার নতুন চেষ্টা শুরু হোল। বৈচিত্র্যে, রূপান্তরে, বিকারে, পরিবর্তনে সত্যকে দেখতে চাইলেন তাঁরা। হয় তো তা মিথ্যে কিন্তু তা সত্যের চেয়েও সত্য। কারণ শিল্পীর কাছে তা বাস্তব—একান্তভাবে বাস্তব। আবেগের প্রাবল্যেই তা প্রমাণিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইম্প্রেসনিস্ট-বিরোধী চারটি আন্দোলন হয় (১) ফরাসী ফবিজম, (২) স্প্যানিশ কিউবিজম, (৩) ইতালিয়ান ফিউচারিজম, (৪) জার্মান এক্সপ্রেসনিজ্‌ম।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পচিন্তা রূপ নেয় ডাডাইজমে। ডাডাইজ্‌ম থেকে দুটি চিন্তাধারার সুরু। (১) সুররিয়ালিজম, (২) কম্যুনিজম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একটি মাত্র শিল্পচিন্তা—এক্সিসটেনসিয়ালিজ্‌ম। বিট্‌স্ বা হিপিদের আন্দোলন কোন সার্থক সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয় না।

এখন দেখা যাক এই চিন্তা আন্দোলনগুলি বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথম, ফবিজম। ফবিজমের প্রধান পাণ্ডা মাতিস। 'ল ফব' ফরাসী এই শব্দটির অর্থ বন্যজন্তু—এদের অপমানের উদ্দেশ্যে সমালোচকেরা শব্দটি ব্যবহার করতেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে সমালোচক লুই ভক্সেলেস কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন। এক হিসেবে এঁদের

CENTRAL LIBRARY

এক্সপ্রেসনিস্ট বলা যায়। কারণ, জার্মান আন্দোলন এক্সপ্রেসনিজ্‌ম ও ফ্রেঞ্চ আন্দোলন ফবিজমে যথেষ্ট মিল আছে। এঁদের মতে, বাস্তবকে আবেগ দিয়ে দেখতে হবে। ইম্প্রেসনিস্টরা যেমন Poetry of the Sightকে রূপ দিতেন—তা নয়; কিউবিস্টরা যেমন মনে করতেন Reality governed by reason—তা নয়। ইন্দ্রিয়াবেশ নয়, যুক্তিপ্রাধান্য নয় চাই আবেগ-প্রাবল্য। নতুন জীবন চাই শিল্পে।

বিষম ও পাশবিক রংয়ে অঘটন ঘটিয়ে এক উদ্দাম গতিবান বাস্তবকে রূপ দিতে চাইলেন এঁরা। রংই যেখানে হয়ে উঠবে নাটক, গতি, কাব্যময় বাক্য। রংই ধরে রাখবে সত্যকে। তা কেবল শিল্পীর বক্তব্যের রেকর্ড হয়ে থাকবে না। মাতিসের মতে—Exactitude is not truth। সেদিক থেকে বিচারে এঁরা রিয়ালিজ্‌মের বিরোধী। রেনোয়া প্রমুখ ইম্প্রেসনিস্টদের মিষ্টি রং মিষ্টি আলো এঁদের মতে প্রাণহীন জোলো। তাই কিউবিস্টরা যেমন রং ছেড়ে দিয়ে গঠনে মন দিলেন—ফবিস্ট এবং এক্সপ্রেসানিস্টরা তেমনি চড়া রংকেই প্রাধান্য দিলেন। ফবিস্টরা চাইলেন রং দিয়ে বলিষ্ঠতা এবং প্রাণাবেগ প্রকাশ করতে।

ফবিস্টদের আদর্শ এই,—

আমি তো রক্তেই যাবো রক্ত হবে ফুটন্ত শোণিত
হৃদয় কিনিক ফোটে রং ওঠে শ্বেত নীল পীত
স্নায়ু-টায়ু ছিঁড়ে যায় রং নামে জলদ লোহিত
এই রক্ত এই রং আগুন শিকড়ে নাড়ে ভিত।
কোন অন্ধকার নয়, ছায়া সব রোদ করে জালো
তুলি না, মশালে জালো, জলে না রক্তে গোলা রং

(ফবিজম, সহজ সুন্দরী, কবিতা সিংহ)

মাতিস নীল, নীল-সবুজ, সবুজ-হলুদ খুবই ব্যবহার করতেন। জীবনানন্দের রচনার মধ্যেও এই ফবিস্ট স্পর্শ আছে। যেমন,—

১. আকাশের রং ঘাসফড়িংয়ের দেহের মতো কোমল নীল
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।

(শিকার, মহাপৃথিবী)

২. সকালের আলোয় টলমল শিশিরের চারিদিকে বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

(ঐ)

এই প্রভাব দেখি তারাপদ রায়ের কবিতায়,—

.....রঙিনতা, দিদিমার বোনা
নরম কাঁথার গায়ে নীলপদ্ম সবুজ গোলাপ।

(সবুজ গোলাপ, ছিলাম ভালবাসার পতাকাতলে)

সবুজ গোলাপ হয় না। কিন্তু গোলাপকে সবুজ রংয়ে দেখার মধ্যে 'গোলাপত্ব'কে নতুন করে চেনা গেল। যেমন বিখ্যাত চিত্র 'নীলঘোড়া'। চিত্রশিল্পী কেন ঘোড়াকে নীল করলেন? তার কারণ 'অশ্বত্ব'কে আমাদের মধ্যে নতুন আবেগে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। রং শুধু সত্য নয়—প্রাণাবেগে গতিময় হয়ে উঠতে পারে,—

CENTRAL LIBRARY

সবুজ জামা ছাদে শুকোয়, হলুদ জামা গায়
বৃষ্টি এলে পড়শিনীর রূপোর ঘুঙুর পায়
ঝুমঝুমিয়ে কেঁপে ওঠে, ঝুমঝুমিয়ে বেজে
বৃষ্টি এলে, সবুজ জামা, হলুদ জামা ভেজে।
সারা দুপুর সবুজ হলুদ হাওয়ায় যায় উড়ে
রূপোর ঘুঙুর ওঠে নামে ঘোরান সিঁড়ি ঘুরে।
ছাদে সবুজ গায়ে হলুদ বৃষ্টি পায় পায়
পড়শিনীর রূপোর ঘুঙুর হাওয়ায় উড়ে যায়।
বৃষ্টি এল ঝুমঝুমিয়ে ঝুমঝুমিয়ে বেজে
সবুজ জামা গায়ে শুকোয়, হলুদ জামা ভেজে।

(ছাদে সবুজ গায়ে হলুদ, তারাপদ রায়)

সবুজ ও হলুদ রং যেন গতি পেয়ে নৃত্য করে উঠেছে এই কবিতায়। মাতিস তো এই চেয়েছিলেন রংকে হতে হবে dynamic।

উৎপল বসুর 'ময়ূর' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে একটি সার্থক ফবিস্ট কবিতা।

ময়ূর বুঝিবা কোন সূর্যাস্তে জন্মেছ
এবং মেঘের তলে উল্লাসে নতুন ডানাটিকে মেলে ধরে
যখন প্রথম খেলা শুরু হবে—সেই স্থির পরকালে
আমি প্রথম তোমার দেখা পেয়েছি ময়ূর
সমুদ্র সৈকত ধরে এতদূর এত গাঢ় স্তব্ধতার কাছে এসে
তোমার প্রবল দৌড় দেখা গেল, যেন
আরো শব্দহীনতার প্রতি—অন্ধকার ঝাউবনে—অস্তিত্ব জটিল
আমাদের আর্তরবে ডেকেছ সহসা।
যেন বনের শেষে নির্বসনে যৌবনের চোখে
বিদ্যুৎচমক বলে মনে হল তোমার প্রতিভা
মনে হল নবীন নবীনতমা সৃষ্টির ক্ষমতাও বুঝি
এইভাবে ক্রমাগত অন্তহীনতার বুকে মিশে যায়।
ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফান
'অস্তিত্ব'কে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথারের বুকে
আমি তার ভেঙে পড়া দেখেছি গর্জনে। দেখেছি আছাড়
ডুবন্ত জাহাজ থেকে ভেঙে নেয় পাটাতন, জয়ের মাস্তুল
তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষে অন্ধকার বনে
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকা রব

CENTRAL LIBRARY

বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার আকাশে মেলেছ বিশাল
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ?

(ময়ূর, পুরীসিরিজ, উৎপল বসু)

এখানে ময়ূর, সূর্যাস্তে সমুদ্র, নক্ষত্রে সাজানো ডানা রংয়ের অপূর্ব উল্লাস ফুটিয়েছে নাকি? ময়ূরের আর্ত কেকারব, সমুদ্রের গর্জন, বৃষ্টির তলায় অন্ধকার স্কাউবন কবিতাটিকে দিয়েছে harshness ও solidity—বলিষ্ঠ এক প্রাণাবেগ।

কবি স্পষ্টই প্রার্থনা করেছেন 'অস্তিত্ব'কে ফিরে দাও। এ তো মাতিসও চেয়েছিলেন। রংকে হতে হবে বন্যার মতো—রং মানবসত্তাকে স্পর্শ করবে ধর্মবোধের মতো। সে হিসেবে ময়ূর কবিতাটি সার্থক।

একই রং কি করে ইম্প্রেসনিস্টও হতে পারে, ফবিস্টও হতে পারে সেটা বলি। যেমন জীবনানন্দে,—

.....তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে—

(কুড়ি বছর পরে, বনলতা সেন)

এখানে হলুদ শব্দটি ইম্প্রেসনিস্ট। অপরাহ্ণের আলোয় নদীর রং হলুদ এখন দেখাচ্ছে বটে পরে বদলে যাবে। রংটি এখানে হাল্কা, মিষ্টি, ফুরফুরে। আলোর স্পর্শে ইম্প্রেসনিস্ট। কিন্তু কবি যখন বলেন,—

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে,

(দুজন, ঐ)

তখন হলুদ শব্দটি ফবিস্ট। 'হলুদ কঠিন ঠ্যাং' শব্দটি কঠিন কর্কশ। ফবিস্টরা তাই চাইতেন। জীবনানন্দের রচনায় মাতিসের মতই সবুজ ও হলুদের সমারোহ দেখি। দেখি ফবিস্টদের মত রংয়ের বন্যা তাঁর 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায়।

রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূর পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়

* * *

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাশে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

ফবিজমের পর এল কিউবিজম। কিউবিষ্টরা বললেন, 'The senses distort, only the mind gives form.' সেজানের জিওমেট্রির প্রাধান্যকে তাঁরা আদর্শ করলেন। ইন্দ্রিয়োপলব্ধি ইম্প্রেসনিজ্‌মের সামগ্রী—কিন্তু কিউবিস্টদের মতে ইন্দ্রিয় আমাদের দৃষ্টিকে গুলিয়ে দেয়। স্ট্রাকচার বা গঠনই হোল বড় কথা। বাস্তবের সত্য চিত্র আঁকতে গেলে তাকে যুক্তি দিয়ে রূপ দিতে হবে। শিল্প হবে বুদ্ধিবাদী, যুক্তিবাদী। Reality governed by reason—এই ছিল তাঁদের মত। ইন্দ্রিয়াবেশ নয়—হতে হবে গণিতের মত নিয়মানুগ, যথাযথ। methodical—এমন কি mathematical।

কিউবিজমের এই গঠনপ্রীতি ও নিয়মবদ্ধতা আমাদের ক্লাসিক রীতির কথা স্মরণ করায়। বাস্তবিক কিউবিস্ট মেজাজ ক্ল্যাসিক,—ইম্প্রেসনিস্ট মেজাজ রোম্যান্টিক। এজন্য কিউবিস্টদের কাছে গঠনই মুখ্য—রং গৌণ।

CENTRAL LIBRARY

ইম্প্রেসনিস্টরা পৃথিবী দেখতে চেয়েছেন বিচিত্র আলোয়, বিচিত্র রংয়ে—সকাল, দুপুর বিকেলের আলোয় চাঁদ, তারা, প্রদীপের আলোয়। কিউবিস্টরা এই বাইরের চাকচিক্য তথা অবিরত পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গের অন্তরালে, শাশ্বত রূপ দেখতে চাইলেন। একমুখী আবিষ্ট দৃষ্টি ত্যাগ করে বস্তুকে দেখলেন উপর, নীচ, ভেতর, বাহ্য, সামনে, পিছনে—সব দিক থেকে। অর্থাৎ সত্যকে দেখতে হবে সম্পূর্ণভাবে। অর্থাৎ বাইরের চালটাই বড় কথা নয়। বড় কথা অন্তরের নির্যাস—'not its appearence but essence...'। কারণ, বাইরের ঠাটে খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারিতা থাকতে পারে। কিউবিস্টরা তাই বলছেন—'a given object is viewed from all round from above and below from the side from behind'. গগনেন্দ্রনাথের 'সাতভাই চম্পা' বা 'প্রার্থনার আহ্বান' এর সুন্দর উদাহরণ। উদাহরণ পিকাসোর চিত্রাবলী। সাহিত্যে কিউবিজ্‌মের প্রভাব অল্প—বাংলা সাহিত্যে আরো কম। তবু মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটির কথা—যেখানে পিতা ও পুত্রের দেহের বদল ঘটে কি অঘটনই সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চাশের কবিরা কিউবিজমকে বাংলা কবিতায় আনবার চেষ্টা করেছেন; যেমন 'জুয়া' কবিতায় সুনীল গাঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন তিনি নিখিলেশ নামক বন্ধুর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন বদলেছেন।

…আমি অর্থাৎ পুরোন সুনীল,
নিখিলেশ এখন,
তোর অর্থাৎ পুরোন নিখিল অর্থাৎ নতুন সুনীলের সিংহাসন
এবং হৃৎপিণ্ড ও শোণিত
পেতে চাই ……

(জুয়া, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

কিউবিস্টরা প্রথাসিদ্ধ গড়ন ভেঙে সত্যকে দেখবার জন্য যেমন ছোট ছোট জ্যামিতিক ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি দিয়ে এঁকেছিলেন—কিউবিস্ট কবিও তাই করেছেন—'আমি অর্থাৎ পুরোন সুনীল, তোর অর্থাৎ পুরোন নিখিলেশ'—ছোট ছোট বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে আত্মসত্তাকে ভেঙে টুকরো করে দেখতে চাইছেন। আবার সমগ্র সত্যকে দেখবার জন্য চাইছেন অন্য সত্তায় প্রবেশ করতে।

কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে,
সুখ, সুখ নয়, পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না,
মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো, ও আমি, আমি নয়,
এক জীবন দৌড়োতে দৌড়োতে

(জুয়া, ঐ)

সমীর রায় চৌধুরীর 'অমানুষ' বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক কিউবিস্ট কবিতা।

আপিসে গিয়ে সিংহ হবো,
বেলা, ফিরে এসে তোমার পোষা কুকুর—
কিম্বা চলো নদীর তীরে ফিরতি পথের ট্রিয়া,
কাল আবার জেব্রা হতে হবে মলয়ের একান্ত অনুরোধে
আপাতত সুনীলের নিরীহ মহিষ

CENTRAL LIBRARY

মেষপালকের সঙ্গে চলে যাবে হরিৎ প্রান্তরে
কেন না জীবনানন্দ এসে খেয়ে গেছে যাবতীয় ঘাস
ক্রমশঃ উড়িয়া যায় হৃদয়ের হাঁস—
পুলিশের মুখোমুখি
অকস্মাৎ টের পাই সাবলীল কেঁচো…

(অমানুষ, আমার ভিয়েৎনাম)

একই সত্তার বিভিন্ন অংশ কখনো সে জন্তু, কখনো পাখী, কখনো কীট। পিকাসো যেমন মানুষের দেহকে নানাভাবে ভেঙে দেখাতেন সঙ্গীতের তানের মত। কখনো বা নারী দেহে বসিয়েছেন বেড়ালের মাথা তার স্বভাবের প্রকৃত স্বরূপ ফোটাবার জন্য।

ব্যর্থ প্রেমের শূন্যতা যে আসলে একটা গোল এটা ফুটিয়েছেন শরৎ মুখোপাধ্যায় কিউবিস্ট পদ্ধতিতে অথচ তাতে আবেগ ও মমতা যুক্ত করেছেন পিকাসোর মতোই,—

যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে, কোলাহল, বুকের পশ্চিমে
তার কাছে
সোনার কৌটায় নীল মখমলের সিংহাসন জুড়ে
হৃদয় থাকার কথা ছিল
হৃদয় থাকার কথা ছিল ;
কেউ তুলে নিয়ে গেছে বলে নীল খন্দ দেখা যায়
চায়ের দাগের গোল শূন্যের মতন—

(শূন্যতা সম্পর্কে, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

কিন্তু পিকাসো যেমন কিউবিজমে মাস্টারপিস রচনা করেছেন বা গগন ঠাকুর যে অপূর্ব রসোত্তীর্ণ ছবি এঁকেছেন (যেমন গগনেন্দ্রনাথের 'সাতভাই চম্পা' বা পিকাসোর 'এভিগননের মেয়েরা') তেমন রসোত্তীর্ণ রূপ সাহিত্যে দেখি না। অথচ এটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আন্দোলন।

সাহিত্যে না হলেও কিউবিজমের প্রভাব স্থাপত্য ও কারুশিল্পকে রূপান্তরিত করে দিল। আজো তা সক্রিয়। কিন্তু কেন জানি না এটা এক হিসেবে চিত্রশিল্পীদের আন্দোলন থেকে গেল—সাহিত্যিকদের নাড়া দিল না। বোধহয় এর অন্যতম কারণ কিউবিজমে সত্যকে দেখা গেল ঠিক বিজ্ঞানের মত। এর গঠন-প্রধান চরিত্র স্বপ্নকে ধরে রাখে না। তা হয়ে যায় নিছক নিয়ম—শুষ্ক পদ্ধতি। এতটা তন্নিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী বিমূর্ত রূপ সাহিত্যে ফোটানো সম্ভব নয়।

কিন্তু কিউবিজম মহত্ত্বকে স্পর্শ করতে পারে। বিমূর্ত হলেও মনোহরণ করতে পারে—যথা গগন ঠাকুরের ছবি। নন্দনতত্ত্বের অভূতপূর্ব সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং সমাধানের চেষ্টা করে। সংক্ষেপে সুগভীর ব্যঞ্জনা দিতে পারে—বাস্তবকে সারল্য দিয়ে নতুন করে দেখাতে পারে। যদিও জ্যামিতি-প্রধান, তবু পিকাসো এতে প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ঘনতা যুক্ত করেছিলেন। অদ্ভুতরস, হাস্যরস, ভয়ঙ্কর রস এবং রহস্যময়তাও এতে ফোটানো যায়।

কিন্তু চোখে যা দেখি সেই প্রথাসিদ্ধ দৃষ্টির ঐক্য এতে ভেঙে যায়। ফলে মনে মনে আবার সেই ভাঙা অংশ জোড়া লাগাতে হয়। বল বাহুল্য তাতে সৌষম্যবোধ বিনষ্ট হয়। 'প্রথম জ্ঞানের সারল্য' নষ্ট হয়। মন হয়ে

CENTRAL LIBRARY

ওঠে অশান্ত। ৪ঠা আগস্ট প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়।

কিউবিজম চেষ্টা করছে আমাদের মনে বহিরঙ্গ প্রকাশের অপূর্ণতা সম্বন্ধে অনুভূতির প্রতিক্রিয়া দূর করতে। কারণ, বিমূর্ত আকার সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। কিন্তু কেন নই? ইসলামিক শিল্পে তো মিনার, গম্বুজ ইত্যাদি জ্যামিতির বিমূর্ত রূপকেই প্রকাশ করে। মুসলমান শিল্পীদের খেয়াল বা সরোদের সুরেও তো সঙ্গীতের বিমূর্ত রূপ ফলিত। যাই হোক বেঠোফেন যেমন তাঁর পাস্টোরাল সুরে কোকিলের ডাক মিশিয়েছেন তেমনি সাধারণ গড়ন বা আকৃতির মধ্যেই মিশে আছে বিমূর্ত রূপ, এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন পিকাসো—অর্থাৎ মূর্তির মধ্যেই বিমূর্ত বর্তমান। তবে কিউবিস্টরা মোটেই মনে করেন না এটাই শিল্পের একমাত্র পথ। তাঁদের মতে শিল্পীর তূণে এটা একটা নতুন অস্ত্র মাত্র।

ইম্প্রেসনিস্টদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আন্দোলন করেন ইতালিয়ান কবি ফিলিপ্পো টমাসো মারিনেত্তি। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি এক ম্যানিফেস্টো লেখেন—এই হোল ফিউচারিস্ট আন্দোলনের শুরু। তাতে বলা হোল সব পুরোনকে বাতিল কর। নতুন মৌলিকতার সম্মান দাও। সুষমা ও সুরুচির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। আধুনিক যুগের ঘৃণিকে অর্থাৎ লৌহ সভ্যতা, যুগজ্বর ও গতির যুগকে রূপ দাও।.....**"all things move and run, change rapidly and this universal dynamism is what the artist should strive to represent."**

মুভমেন্ট ছিল ইম্প্রেসনিস্টদের লক্ষ্য—এঁরা চাইলেন মোশন। অর্থাৎ শুধু চলন নয়—বেগবান দ্রুতগতি। তাঁদের বিষয় হোল মোটর রেস, মিছিল, ট্রাম বাসভর্তি পথের বর্ণনা, বিপজ্জনক লাফ, খেলোয়াড়ের দৌড়, বজ্রের রেখা, এরোপ্লেনের নেমে আসা বা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা। চলন ও গতির ওপর জোর দিতেন ইম্প্রেসনিস্টরাও। কিন্তু ফিউচারিস্টরা চাইলেন প্রচণ্ড ধাবন। যেমন একটা ঘোড়া টগবগ করে যাচ্ছে—তাতে চারটে পা থাকবে না, আঁকো কুড়িটা পা। তাতে প্রচণ্ড অশ্বশক্তি দ্যোতিত হবে। ঘোড়া যাবে সোজাসুজি নয়—ত্রিকোণ গতিতে (দাবা খেলার আড়াই চালের)। বলা বাহুল্য এটা সাহিত্যে রূপ দেওয়া হাস্যকর। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাংলা সাহিত্যে ফিউচারিস্ট কয়েকটি কবিতা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠেছে। প্রথমেই স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'। নিট্‌সে এবং বের্গ্‌সঁ প্রভাবিত এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। রোম্যান্টিক বলেই রবীন্দ্রনাথ গতিরও সুন্দর রূপ দিলেন,—'চঞ্চলা'য় নদীর প্রবাহে; 'বলাকা'য়—উড়ন্ত পাখীদের রূপে। প্রচণ্ড ধাবনকে 'চঞ্চলা'য় কি সুন্দর ফুটিয়েছেন,—

শুধু ধাও শুধু ধাও শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

(চঞ্চলা)

এই গতি যে সব কিছুর মধ্যে, জড়ে চৈতন্যে—এ গতি যে স্তব্ধ করে মুগ্ধ করে তা ফুটেছে বলাকায়—

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে

CENTRAL LIBRARY

বেগের আবেগ
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।
(বলাকা)

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—ফিউচারিস্ট সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ চিত্রকল্প সংযুক্ত করেছে।

ফিউচারিজমের প্রভাব জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত' কবিতাটিতে লক্ষণীয়।

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
* * *
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানলার ভিতর দিয়ে সাঁই সাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরে অজস্র জেব্রার মতো,
* * * *
আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মত গেল উড়ে।
(হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী)

উৎকেন্দ্রিক অঙ্কের কসরৎ ও অর্থহীন শব্দের ধ্বনিও তাঁরা যুক্ত করতেন। কারণ, তাঁদের আদর্শ ছিল 'শব্দের স্বাধীনতা চাই।' যুক্তিকে কোন মূল্য তাঁরা দিতেন না। যেমন,

তিনটি X এর সঙ্গে পাঁচটি Y যোগ দিলে
কত হয়? সমীকরণের ধাঁধা ভীষণ কঠিন।
ভীষণ কঠিন ধাঁধা; X, Y দুইজন লোক,
যে কোন দুইজন লোক X, Y গ্রাফের খাঁচায়
কখনো পাঁচ ঘর ওঠে, কখনো তিন ঘর নেমে যায়।
(X, Y বিষয়ে কবিতা, তারাপদ রায়, ছিলাম ভালবাসার নীল পতাকা তলে স্বাধীন)

ফিউচারিজম আসলে প্রতীকধর্মী, এক ধরণের সিম্বলিজম। কিন্তু শিল্পের শুরু অনুভবে। তারপর সে উপকরণ খোঁজে। এবং প্রয়োজন হলে সিম্বল হয়ে যায়। আধুনিক সভ্যতার নিহিলিস্ট ভঙ্গী ও দায়িত্বহীনতাকে তাঁরা হয়তো এইভাবে সমালোচনা করতেন। পরবর্তী ডাডাইজমে অর্থহীন শব্দ ব্যবহারের চূড়ান্ত রূপ দেখি।

ফিউচারিস্টরা যুদ্ধকে চেয়েছিলেন আত্মার ওষুধ বলে। ফ্যাসিজম এর উপরে গড়ে ওঠে। খুব আশ্চর্যের কথা রুশ সাহিত্যে এই আন্দোলন সর্বাধিক সমর্থন পায়। সেখানে এর নাম ছিল কিউবো-ফিউচারিজম। ১৯১২ খ্রীঃ রুশ লেখক মায়াকোভস্কি এক ম্যানিফেস্টো লেখেন—'A slap in the face of public taste'। কিন্তু ১৯১৭তে রুশ বিপ্লবের পর তিনি মত বদলান। যাই হোক ফিউচারিজম বেশীদিন আন্দোলন চালাতে পারে নি। তা হয়ে

CENTRAL LIBRARY

উঠেছিল গতির প্রতীক—কিন্তু গতিকে রূপ দিতে পারল না।

কিউচারিজমের পাশে পাশে জার্মান এক্সপ্রেশনিজম চলেছিল। ১৯০১ খ্রীঃ ফরাসী চিত্রকর হারডে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ মতিস এক প্রবন্ধে লেখেন—'What I am after above all is expression'—এই কথাটির থেকে নাকি expressionnism নামটির জন্ম। ১৯১৪ খ্রীঃ হারমেন বার শব্দটি সাহিত্যে প্রয়োগ করেন।

এক্সপ্রেশনিস্টরা কি করলেন?—(১) গঠনের বিকৃতি (২) রঙের আতিশয্য। কিউবিস্টরা গঠন ভাঙলেন—কিউচারিস্টরা ভাঙলেন বেগ—এক্সপ্রেশনিস্টরা বাস্তবকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিলেন। distortion এবং exaggeration এ দুটি এঁদের লক্ষণ। আকারের বিকার ও রংয়ের উদ্দামতায় প্রকাশ পেল সেই সত্য—যা নাটকীয়, বিস্ফোরক, শ্বাসরুদ্ধকর।

যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের বুদ্ধি ও মনীষায় যে ক্ষয় ও নিশ্চেষ্টতা এনেছিল সেটাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছিল এক্সপ্রেশনিজম্ ঠিক রোমান্টিক, ইম্প্রেসনিষ্ট ও কিউচারিস্টদের মত। বাস্তবকে ভেঙে, যুক্তি ও বহিরঙ্গ অতিক্রম করে, পরাবাস্তবকে দেখতে চাইলেন তাঁরাও। এটাও রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ তাঁদের মতে কিছুই নয়—আভ্যন্তরীণ জীবনের মর্মোদ্ঘাটনই বড় কথা—'to explore the deeper meaning of reality'। বের্গসঁর Elan Vital, ডস্টয়ভস্কির আত্মার সন্ধান, ফ্রয়েডের অবচেতন মনের প্রতীক গ্রহণ, ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব এঁদের প্রেরণা যোগাল। দেখা গেল দুটি লক্ষণ—(১) নতুনের প্রতি শ্রদ্ধা (২) প্রথার প্রতি অবজ্ঞা। একঘেয়েমি থেকে শিল্পকে মৌলিকতার পথে নিয়ে যেতে হবে—এই ছিল তাঁদের সংকল্প। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চাই—বার্ণাড শ, গলস্‌ওয়ার্দি, নিট্‌শে সবাই এ বিষয়ে সোচ্চার হলেন। নিট্‌শে তো 'সুপারম্যানে'র প্রশংসা করলেন—কারণ, সে পারে তার ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করতে। এক্সপ্রেশনিস্টদের শৈলী তাই হয়ে উঠলো বিস্ফোরণধর্মী—বিশৃঙ্খল গতিশীল—ভাবাবিষ্ট স্বেচ্ছাচারী। বিষ্ণু দের 'ক্রেসিডা' কবিতায় এই লক্ষণ দেখা যায়। যেমন,

জানি জানি এই অলাতচক্রে চংক্রমণ।
সোৎপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ

সোনালি হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়।
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকা হাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?
এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই? (ক্রেসিডা, চোরাবালি)

বিশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতা এখানে সুন্দর ফুটে উঠেছে। আধুনিক ট্রয়লাস জানে জীবন অলাত-চক্রে আবর্তনের মত দুঃসহ, তবু প্রজাপতির মত সে সৌন্দর্য-ব্যাকুল। 'প্রজাপতি' কথাটির ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়।

CENTRAL LIBRARY

ট্রয়লাসের নিষ্ঠাহীন প্রণয়িনী ক্রেসিডার সম্বন্ধে তার বিচিত্র স্মৃতি বিস্মৃতি অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এক্সপ্রেশনিস্ট কবিতার পূর্ণ রূপ দেখা যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'পুনর্বিবেচনা'য়। সেখানে বিষয়বস্তুতে বাস্তব ও অতিবাস্তব মিশে গেছে, অদ্ভুত বিকৃতি বাস্তবকে আরো ফলপ্রসূ করেছে। এলোমেলো বিশৃঙ্খলা ও বিকারকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন শক্তি। যেমন,

গাছের চেয়েও আমি গাছেদের ভাষা জানি বেশী
তোমার মতন আমি সাবান মাখি নি কোনো দিনও
হরলিকস বুঝেছি পরে বারুদ বা গিরিমাটি নয়।

(পুনর্বিবেচনা, সোনার মাছি খুন করেছি)

কিউবিস্টরা ভাঙলেন আকৃতি; এক্সপ্রেশনিস্টরা নিলেন বিকৃতি। মোটের উপর এঁরা সকলেই চাইলেন কাঠিন্য ও কর্কশতাকে—কারণ, লঘুত্ব ও ফুরফুরে রমণীয়ত্ব ইম্প্রেসেনিজমের গুণ।

কিন্তু এক্সপ্রেশনিস্টরা বিকার চাইলেন কেন? মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী এক সুবর্ণ অধ্যায়ে তাঁদের আন্দোলন সুরু হলেও অন্তরালে সংকট বুঝি ঘনাচ্ছিল। বিকৃতি আসলে সেই অস্বস্তিরই প্রকাশ যা প্রকৃতির সান্নিধ্যে অনেক সময় বুঝি—যেমন বন্যা, ঝড়,—যা শত্রুবৎ অমানবিক। এইজন্যই তাঁদের রচনায় অসুস্থ কল্পনা দেখা গেল। জীবনের কোন স্বাভাবিক সমাধান নেই। সবটাই অস্বাভাবিক। দৃশ্যমান বহিরঙ্গের পেছনে আছে ক্যারিকেচার, grotesque বা স্থূল বস্তু, অদ্ভুত ভৌতিক কিছু।

(১) ক্যারিকেচার—

মনীষার ভালোবাসা মাহুতের মতো ছিল উঁচু। (পুনর্বিবেচনা, ঐ)

'মাহুতের মতো' কথাটি অর্থহীন। কিন্তু কবি বলতে চাইছেন হাতীর মতো উঁচু। ভালোবাসাকে হাতীর সঙ্গে তুলনা হাস্যকর নয় কি?

(২) স্থূল grotesque রূপ—

বিছানায় আজই তুমি পেয়েছো কাছিম।—ঐ।

'কাছিম' শব্দটি প্রয়োগে স্থূল বিকার ফুটেছে। কেনই বা বিছানায় কাছিম পাওয়া যাবে? সেটা কি বালিশের বিকৃত রূপ? কিন্তু কেন এই স্বেচ্ছাচারিতা? আর কোনো চিত্রকল্প কি দেওয়া যেত না? কিন্তু এক্সপ্রেশনিষ্টরা তো যথেচ্ছাচারিতাই করতে চেয়েছেন। আবার এই যদৃচ্ছাচারের মধ্যে সৌন্দর্যও উঁকি দেয়,—

তুমি কেন বনানীর ভিতরের হ্রদে দেখেছিলে একাগ্রটি পদ্মফুল
তুমি কেন বার বার টেলিগ্রাফ তারের ভিতর দিয়ে দেখেছিলে
মেঘ আমি জানি।

(পুনর্বিবেচনা, ঐ)

কখনো কখনো তা ভৌতিক—স্থূপার ন্যাচারাল,—

মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে নিবন্ত ডুমের আলো
তারার আলো
মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির—আকাশ-পাতাল
এন্তোল বেন্তোল

CENTRAL LIBRARY

মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটছে নিমতলা-পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—

(সে বড়ো সুখের সময় নয়, সোনার মাছি খুন করেছি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

এক্সপ্রেশনিজমে ক্ল্যাসিকাল আর্টের প্রশান্তি আশা করা বৃথা। মিস্টিকদের মত এরা বহিরঙ্গের পশ্চাতে সত্যকে দেখতে চান বটে, কিন্তু মিস্টিকেরা দেখতে চান ঊর্ধ্বসত্তার আনন্দ—পরম বাস্তব, আর এঁরা দেখতে চান অশান্ত বিমূর্ত রূপ। এ বোধহয় তৎকালীন জার্মান জীবন-দর্শনে ছিল। ১৯১০ খ্রীঃ মিউনিকে এই আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এঁদের দলে ছিলেন জাওলেনস্কি, তিনি ছিলেন মেটাফিজিক্যাল শিল্পী—কান্দিনেস্কি, তিনি ছিলেন মিস্টিক—নোলদে—তিনি ছিলেন ধার্মিক। বাস্তবের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্কে স্বপ্ন নষ্ট হয় বলে তাঁরা যা বলেছেন তা স্বপ্নের ভাষার মত কুহেলী মেশা।

যেমন :

তারপর ঘাসের জঙ্গলে পড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্ত দিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল শার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকতো।
সজলের বৌ আর মেয়েটি থাকতো। ওরা ধান কল পার হয়ে চলে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসবে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদাম পাহাড়ে
আমার ব্যক্তিগত লিখন ভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।

(শেষ কবিতা, পুরী সিরিজ, উৎপলকুমার বসু)

বেনেদেত্তো ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব এঁদের ভিত্তি ছিল। লেখক, চিত্রকর, নাট্যকার, এমন কি, নর্তকেরাও, এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যেমন নাট্যকার পিরেনদেল্লো, ঔপন্যাসিক কাফকা, রুশ কবি মায়াকোভস্কি। মায়কোভস্কির কথা পূর্বেও বলেছি। তিনি যে ম্যানিফেস্টো লেখেন—'জনগণের মুখে এক চড়'—সেটা এক্স-প্রেশনিস্টদেরও বক্তব্য। তাঁরা দর্শক বা পাঠকদের বোধগম্য হবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টাও করতেন না। 'এই আমার জগৎ—নাও অথবা নিয়ো না'—এই হোল তাঁদের কথা।

ক্রোচের মতে, জ্ঞানলাভের দুই উপায় (১) প্রজ্ঞা (২) যুক্তি। প্রজ্ঞায় পাওয়া যায় ধ্যান, চিত্রকল্প, প্রতীক। বুদ্ধিতে পাওয়া যায় চিন্তা, ধারণা। ক্রোচের মতে প্রজ্ঞাই এক্সপ্রেশন। নির্মাণ, গড়ন, প্রকাশ—হয় প্রজ্ঞায়। এই সৃষ্টি প্রবাহের ভূমিকা হোল মুক্তিদাতার। তা আবেগের প্রচণ্ড তরঙ্গ ও তুফানকে শমিত করে, সংহত করে, শাসন করে। শিল্পী তখন মন্ময় ভাবকে তন্ময় রূপ দিয়ে মুক্ত হন।

মন সর্বদা প্রজ্ঞালব্ধ বস্তুকে গড়ছে বা আধখানা গড়ছে—কখনো বুদ্ধিলব্ধ চিন্তায় ফিরে যাচ্ছে, কখনো আবেগে ডুবছে। যখন আত্মা প্রকাশের ক্রিয়ার উপর জোর দেয়, তখনি প্রজ্ঞার রূপান্তর হয় শিল্পে। জীবনের সত্য ও সাহিত্যের সত্য পৃথক নয়—ক্রোচের মতে অবশ্য। বিষয় বস্তু তাই মহৎ বা অশ্লীল হতে পারে। (সমরেশ বসুর 'বিবর' কি এই জন্যই লেখা ?—বিস্ফোরণ ঘটানোই ছিল উদ্দেশ্য ?)। কারণ, ক্রোচের মতে পৃথিবীতে যা আছে তা প্রকাশিত হবেই। এজন্য শিল্পীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। শিল্পসৃষ্টির সবটাই অন্তর্মুখী ঘটনা। যখন শিল্পী সেটা

CENTRAL LIBRARY

বাইরে রূপ দেয়—তখন যদি পাঁপড়িগুলি ঠিক মতো ফুটে উঠে—লোকে বলে সুন্দর। শিল্পকে বহির্মুখী করবার ব্যাপারে Creative Process-এর কোন যোগ নেই। শিল্পের মজা সেইখানে যেখানে প্রকাশ ঘটে সার্থক রূপায়ণে। সেই শিল্প ব্যর্থ যেখানে প্রকাশ কুণ্ঠিত। যেমন চেঁচালেই গান হয় না। পিয়ানোর ওপর হাত বোলালেই সুর হয় না। গান বাজে মনে। সুর ঢেউ তোলে হৃদয়ে। রঙীন ছবি, মর্মর মূর্তি – সবই মনের স্বপ্ন স্মৃতি। শিল্পী তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছা দিয়ে ধরে রাখেন পলাতকা কল্পনাকে, মিলিয়ে যাওয়া স্বপ্নকে।

ক্রোচে কিন্তু একটা বিষয় এড়িয়ে গেছেন,—যদি মনের মধ্যে যা ঘটে তাই শিল্প, তাহলে কি উন্মাদ বা নেশাগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত মনের রূপও শিল্প? না। তা হতে পারে না। আসলে ক্রোচে সে যুগের রক্ষণশীল মনোভাবের সমালোচকদের উদ্দেশ্যে একথা বলেছেন। তাই বলে শিল্পীকে যদৃচ্ছা করতে বলেন নি। শিল্পীকে নিশ্চয় এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে যা জীবনের নৈতিক তথা অর্থনৈতিক রূপের অনুগামী হয়। যা ইচ্ছে তিনি দেখতে পারেন,—কিন্তু যা ইচ্ছে লিখতে পারেন না। যে মুহূর্তে তাঁর রচনা শেষ হোল—তার উপর শিল্পীর অধিকার চলে গেল। (অর্থাৎ ক্রোচের মতে তেমন লেখার জন্য মুসোলিনি লেখককে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করতে পারেন।)

ক্রোচের আর একটি ত্রুটি, তিনি শিল্পীকে সম্বোধনের দায়িত্ব দেন নি। সাহিত্যের কাজ আনন্দ দান, পরোক্ষ শিক্ষা দান, মহত্ত্বে উন্নয়ন। স্বগত উক্তি তাঁর কাজ নয়। (যদিও সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধাবলীর নাম 'স্বগত' রেখেছিলেন, তবু নিশ্চয় চেয়েছিলেন পাঠকেরা পড়বে।) কবি ও পাঠকের মধ্যে সেতু—ভাষা, ছন্দ, প্রতীক, অলংকার, বিষয় ইত্যাদি। তা না হলে শিল্পী কেন মাধ্যম নিয়ে মাথা ঘামান? কেন কঠিন বাধা বোধ করেন আবেগের জন্য আধার খুঁজতে?

কিন্তু সাহিত্যে উৎকেন্দ্রিকতার শেষ এখানেই হোল না। এরপর এল ডাডা গোষ্ঠী। যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে প্যারিস, মিউনিক, মিলানের শিল্প-গোষ্ঠী ভেঙে গিয়েছিল তবুও ১৯১৫তে নিরপেক্ষ শহর জুরিখে শিল্পীরা মিলিত হলেন। রুমানিয়ার ত্রিস্তান ৎসারা, ফ্রান্সের হান্স আর্প, জার্মাণির হিউগো বল প্রভৃতি কাফে ভলতেয়ারে বসে এক ইন্টারন্যাশনাল কাবারে করবার কথা ঠিক করলেন। হিউগো বল হলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

১৯১৬, ৫ই ফেব্রুয়ারী, একটি ঘর ভাড়া করা হোল এক ডাচ নাবিকের কাছ থেকে। সেখানে ফরাসী ও ডাচ সঙ্গীত হোল। রুশ সুর বাজালেন বালালাইকা অর্কেস্ট্রা। নিগ্রো সুরও বাজল। কবিতা আবৃত্তি হোল। চিত্র প্রদর্শনী হোল। এই আন্দোলনের কি নাম হবে? জার্মাণ-ফ্রেঞ্চ অভিধান দেখা হতে লাগল। একজন প্রশ্ন করলেন 'chantevse' শব্দের প্রতিশব্দ কি? মাদাম লে রয় সহসা বলে উঠলেন 'ডাডা'। সুরু হোল ডাডাইজম। ডাডার অর্থ শিশুর অবোলা বাণী। ফরাসী ভাষায় অর্থ Hobby Horse—খেলার ঘোড়া। এদের লক্ষণ ছিল—Infantilism—শিশুসুলভ আদুরে অর্থহীন শব্দের ধ্বনিতে কবিতা রচনা। কখনো বা টেলিগ্রাফের ভাষার মত সংক্ষেপে বলা—বা তোৎলামি। (বেবি টক তো আধুনিক সোসাইটি লেডীদের কথা বলার অন্যতম ফ্যাশান।) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহারাজ, আমি তোমার' বাংলা সাহিত্যে একটি সার্থক 'ডাডা' কবিতা। যেমন,—

বিলিবিলি থাঙাগুলু, বুম চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা দিন্ না উহুমুহু সাকিনা ঘিনা

মহারাজ, মনে পড়ে না?

এই অর্থহীন শব্দাবলী ফিউচারিজমের অঙ্কের ফর্মুলা ব্যবহারের চূড়ান্ত রূপ। কিন্তু এর মধ্যে একেবারে

CENTRAL LIBRARY

কোন অর্থ নেই তা নয়। মহারাজ অর্থাৎ কবিতাধীশ। কবি এখানে তাকে আদুরে ছেলের মত দেখছেন—তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কবিতা লেখা কত কঠিন।

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরাতন বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না। তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু'হাত নীচে পা শূন্যে—আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না? মহারাজ, মনে পড়ে না? মহারাজ,
চাঁদের আলোয়?

এখানে আধুনিক কবির কঠিন দায়িত্বকে হিউমার ও ট্র্যাজেডীর মিশ্রণে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বলবার ভঙ্গীটি আদুরে ছেলেকে বোঝাবার মত,—

হইকুটুম টাক ডুমাডুম, মহারাজ কাঁদে না, ছিঃ!
(মহারাজ আমি তোমার, আমি কী রকম ভাবে
বেঁচে আছি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

এক্সপ্রেশনিজম বা ফিউচারিজমের চূড়ান্ত রূপ ডাডাইজম। কারণ, অর্থহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, যুক্তিহীনতা এ সবই পূর্ব অধ্যায়ে ছিল—কিন্তু এখন এল এই শিশুসুলভ বাচনভঙ্গী। এঁরা বুর্জোয়া স্বভাবের ঐতিহ্যগত নন্দনতত্ত্ব ও নৈতিক বোধকে পরিহাস করলেন। তাঁদের এই আধ আধ বুলি বর্তমান জগতের রূপকে প্রকাশ করছে বলে দাবী জানালেন। অর্থাৎ পৃথিবীর মনের বয়স এখনো অপরিণত। যুক্তিহীন ঘটনা পারম্পর্য, অর্থহীন সহাবস্থানকে তাঁরা এভাবে ফোটালেন। প্রথম থেকেই ডাডাইস্টরা ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। যদিও এঁরা ফিউচারিস্টদের মনে করতেন বেশী বাস্তববাদী এবং বেশী কার্যসূচী ঘেঁষা, তবু তাদের কাছ থেকে চিন্তাধারা ধার করতে দ্বিধা করতেন না। একই সঙ্গে বিভিন্ন কবিতা পড়ে একটা গোলমেলে শব্দ সঙ্গীত রচনা করতে হবে। (পরবর্তীকালে বিটল্‌দের অর্থহীন সঙ্গীতে কি এরই ফলশ্রুতি?।) 'ট্রা লা লা লা' যদি সঙ্গীত হয় তবে সে বস্তু তো আমাদের দেশেও তেলেনা সঙ্গীতে আছে। অর্থহীন 'তুম তা না না না তেলে না'—তো সুন্দরভাবে সঙ্গীতের সুর ও তাল অংশকে প্রকাশ করে।

যাই হোক ১৯১৮র মধ্যে জুরিখ গোষ্ঠী 'ডাডা' বিষয়ক তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করে। কোলোন, হ্যানোভার প্যারিস সর্বত্র এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আন্দ্রে ব্রেঁত, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ, জঁ কোকতু ইত্যাদি বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকেরা এতে যোগ দেন। ১৯২০খ্রীঃ জুনে বার্লিনে ডাডা মেলা হয়। এপ্রিলে মেলা বসে কোলোনে। কিন্তু কোলোনের মেলা পুলিশ বন্ধ করে দেয়। কারণ, তাদের মনে হয়েছিল এরা বিপ্লবী নিহিলিস্ট গোষ্ঠী, শিল্প আন্দোলনের সদস্য নন। পুলিশকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তখনো যুদ্ধশেষের অশান্তি চলেছিল। নৈরাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ বা হয়েছেন ফ্যাসিস্ট। ডাডাইজম এদিকে বাকুনিনের শ্লোগান আওড়াচ্ছেন—'ধ্বংসও সৃষ্টি।' শক্তি চট্টোপাধ্যায় কি এইজন্যই লিখেছেন 'বিশৃঙ্খলার মাঝেও কবিতা লেখা হয়?' (আমার পথ থেকে পথে, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান।)

ফিউচারিস্ট মারিনেত্তির অনুসরণে ডাডাইস্টরা বলতে থাকেন—'পুরোনকে বাতিল কর।' পরিচিত সত্যকে তাঁরা পরিহাস করেন। দৈবাৎকে অধিক মূল্য দেন—সত্য ও যুক্তির চেয়ে। শালীনতাবোধকে উল্টে ফেলতে চান। তাঁরা লজ্জাজনক বস্তু নিয়ে লিখতে লাগলেন। যেমন, গোঁফওয়ালা মোনালিসা বা মূত্র ফেলার পাত্র। সুনীল

CENTRAL LIBRARY

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বারভাঙ্গা জেলার রমণী' (বন্দী জেগে আছো)—এই ধারার একটি ভালো কবিতা। ডাডাইজমের স্পর্শ দেখি—, 'ভিজিয়ে গেলাম শাদা পাতা কলমের নীল মূত্রপাতে।' (আজি হতে শত বর্ষ পরে, জ্যোতিদত্ত)। 'শিল্পের প্রস্রাববসে পাকে গণ্ড, পাকে মজ্জা কেশ।' (নিয়তি হে প্রেম হে নৈঃশব্দ—শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

সব প্রথাকে ভাঙ্গাই হোল সংকল্প। 'শিল্পকে প্রহার করি, ভেঙ্গে চুরে নষ্ট করি, লাথি মেরে নরকে পাঠাই'—(চোখ বাঁধা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

কিউবিজম চোখে দেখার নিয়ম ভঙ্গ করল। ডাডাইজম ভঙ্গ করল রুচি। (অশিষ্ট, অমার্জিত, বর্বর কবিতা যে তাঁরা লিখলেন—এই bruitism নাকি আসলে তাঁরা চান নি। চেয়েছিলেন অশান্ত আত্মাকে শান্ত করতে—অসংখ্য lullaby অর্থাৎ ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে।) মুক্তির এই শেষ অঙ্ক। গুলতির মতো একে ছুঁড়ে দেওয়া হোল নতুন শিল্পীদের কাছে যাঁরা এখনো খুঁজছে আধুনিক জটিল জীবনকে প্রকাশের পন্থা—'a life of steel, fever pride and headlong speed।'

১৯২২ খ্রীঃ ডাডা আন্দোলন শেষ হয়। কারণ, ক্রমেই তাঁরা অদ্ভুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন বিরক্ত, ক্লান্ত, নিজেদের বিজ্ঞাপনে ব্যস্ত এবং সব কিছুর, এমন কি নিজেদেরও, বিরোধী।

১৯২৪ খ্রীঃ আন্দ্রে ব্রেঁত কয়েকজন নির্ভরযোগ্য সদস্য নিয়ে প্রথম সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাক্স আর্নেস্ট, পল এলুয়ার ইত্যাদি। সুররিয়ালিস্টরা ডাডাইস্টদের মতই ছিলেন সক্রিয় এবং অসংলগ্ন; কিন্তু এদের সংগঠক ব্রেঁত ছিলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনিই প্রথম নৈরাজ্য ডাডা অধ্যায় থেকে শিল্প আন্দোলনকে সুররিয়ালিস্ট অধ্যায়ে নিয়ে আসেন। না ধর্মী শিল্পকে হাঁ ধর্মী করবার চেষ্টা করেন। ডাডাইজমের নেতা ত্রিস্তান ৎসারার উক্তি ছিল—'সব রকম নিয়মের অভাবও একটা নিয়ম, সেটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম।'—কোন উদ্দেশ্য থাকবে না, কোন অর্থ না, কোন কারণ না—সম্পূর্ণ নৈরাজ্য। ডাডাইস্টদের এই আদর্শ সাহিত্য-প্রেমিক ফরাসীদের বেশী দিন ভাল লাগবে কেন?

সুরু হোল নতুন ম্যাজিক। সুররিয়ালিস্টদের প্রথম পত্রিকা 'লিটারেচার' প্রকাশিত হোল ১৯১৯, মার্চ। সেখানেই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়—সুররিয়লিজম—সুপিরিয়র রিয়ালিটি—এক উন্নত ধরণের বাস্তব। সম্পাদনায় ছিলেন ব্রেঁত, আরাগঁ ইত্যাদি। ১৯২০-২২র মধ্যে ত্রিস্তান ৎসারা কলহ করে এঁদের থেকে আলাদা হলেন। ব্রেঁতে বললেন, ডাডাইজমের পথে সৃষ্টি চলতে পারে না। কারণ, তারা চায় Reality beyond reason। ডাডাইস্টদের ধ্বংসাত্মক না-ধর্মী দৃষ্টি অন্ধগলিতে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি চাইলেন সাহিত্য আবার সৃষ্টিশীল হয়ে উঠুক। শিক্ষায় ব্রেঁত মনোবিজ্ঞানী ছিলেন বলে ফ্রয়েডের তথ্যে ঝুঁকলেন। তিনি চেয়েছিলেন মনোবিকলনে যেমন স্বপ্নের মধ্যে প্রতীকগুলি ভেসে ওঠে কবিতার মধ্যেও তেমনি স্বপ্ন বিশ্লেষণকে আনতে হবে। ১) স্বয়ংক্রিয় লেখা ২) স্বপ্নবিশ্লেষণ—এ দুটি চাই। স্বপ্নের বা মগ্নচৈতন্যের প্রতীকগুলি স্বয়ংক্রিয় স্বতঃস্ফূর্তির স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করতে হবে। কবিকে হতে হবে দ্রষ্টা—সে শুধু ভবিষ্যৎ দেখবে না—দেখবে নিজের অন্তঃকরণকে, মগ্নচৈতন্যের স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, তার যুক্তি-হীনতাকে। অটোমেটিক লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেই স্মৃতি—সেই উচ্চতর বাস্তবকে—যুক্তির বাইরে যে সত্য আছে তাকে। এই প্রথম সায়েন্টিফিক স্পিরিট আনা হোল কবিতার রাজ্যে। রিয়ালিজমকে অবশ্য ফটোগ্রাফী প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ফটোগ্রাফী তো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়—টেকনকলজি। ফিউচারিস্টরা চেয়েছিলেন গতির যুগকে প্রকাশ করতে। সুররিয়ালিস্টরা চাইলেন মনের গতিকে প্রকাশ করতে। এর সংজ্ঞা কি?

CENTRAL LIBRARY

Pure psychic automalism, by which it is intended to express, ····the real process of thought. ..... free from any control by the reason.

(Herbert Read, 'A Concise History of Modern Painting')

এঁদের কাছে বস্তুর চেয়ে চিন্তা বড়। শিল্প মানুষের অবচেতনার ফসল। প্রকৃতির শক্তিতে বস্তু পরিবর্তিত হয়, যেমন, জল কর্কশ পাথরকে গোল করে দিতে পারে; বাতাস বরফের পাহাড়কে নাড়া দিতে পারে। সত্যকে তাঁরা দেখতে চাইলেন স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায়। অর্থাৎ অবচেতন লোকে। এঁদের নিয়ম নিষ্ঠাকে ডাডাইস্টরা ভয় পেতেন। কারণ তাঁরা ছিলেন দৈবাৎ সুযোগে বিশ্বাসী, নৈরাজ্য ও নিয়মহীনতায় বিশ্বাসী। ডাডাইস্টরা কেউ ছিলেন নিহিলিস্ট কেউ ছিলেন প্রোটো ফ্যাসিস্ট আর সুররিয়ালিস্টরা সায়েন্টিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মনোবিকলনে। মন অবশ্য এলোমেলো, উদ্দাম। কিন্তু বিকলন তো চলে বিজ্ঞানের সূত্র ধরে। তাই সুররিয়ালিজমের মধ্যে আছে,—১) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ২) ডাডাইজমের অসংলগ্নতা। ডাডাইজমের 'দৈবাৎ' এবং সুররিয়ালিজমের 'স্বয়ংক্রিয়তা' দুইই কিন্তু চায় ছন্দের ঐক্য।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের মধ্যে প্রথম সুররিয়ালিজমের স্পর্শ দেখা যায়। যেমন,

(১) মনে পড়ে কবেকার অরুণিমা সান্ধ্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

(বুনো হাঁস, বনলতা সেন)

(২) লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন; নীল লাল রূপালি নীরব। (শব, মহাপৃথিবী)

মৃত্যুর আগে, বনলতা সেন, নগ্ন নির্জন হাত, আট বছর আগের একদিন—এই বিখ্যাত কবিতাগুলিতে কখনো ইম্প্রেস্‌নিজমের সঙ্গে মিশেছে সুররিয়ালিজম। বিশুদ্ধ সুররিয়লিস্ট কবিতাও তিনি লিখেছেন—যেখানে আছে সেই স্বপ্ন ও বাস্তবের গোধূলি সন্ধি।

আমরা যাইনি মরে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়,
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন এখন ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়,
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে ন'ড়ে গেল ওপাশের পাইস রেস্তোঁরাতে,
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে

CENTRAL LIBRARY

সময়ের প্রশান্তির ছুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ—স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

(ঘোড়া, সাতটি তারার তিমির)

ঘোড়া ও প্রস্তর যুগের ঘোড়া, চায়ের পেয়ালাকে বেড়ালছানা মনে করা ইত্যাদির মধ্যে যে অসংলগ্নতা ও জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যে যে বাস্তব অবাস্তবের একাকার ভাব আছে সব মিলিয়ে আমাদের মগ্ন চৈতন্যকে নাড়া দেয় না কি ? মগ্ন চৈতন্যের মধ্যেই আছে প্রতীক, নাটক, স্বপ্নের অসংলগ্নতা, বিকার, স্বেচ্ছাচারিতা। এই কবিতায় সবগুলিই ফুটে উঠেছে। এমনি আর একটা কবিতা,—

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা ; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
হীরের প্রদীপ জেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—
বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।
বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

অবশ্য এ কবিতায় স্বররিয়ালিজমের সঙ্গে ইম্প্রেসনিজমের মিশ্রণ হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, ইম্প্রেসনিজম ও স্বররিয়ালিজমের মধ্যে অনেকগুলি আন্দোলন হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এগুলি এসেছে উল্টো-পাল্টাভাবে। তার ফলে জীবনানন্দের ইম্প্রেসনিজম অনেক ক্ষেত্রে অনুজ কবিদের স্বররিয়ালিজমের প্রেরণা হয়েছে। যেমন,—

জীবনানন্দ লিখেছেন—

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

(মৃত্যুর আগে ; ধূসর পাণ্ডুলিপি)

উৎপলকুমার লিখেছেন,—

কথা ছিল পুকুরের কাছাকাছি খেলা শুরু হবে
সেদিন ঢেউয়ের নীচে, কচুরিপানার জালে নিস্তব্ধ সবুজে
যতদূর ডুবে যায় পিতলের থালা বাটি, বুদ্বুদ সাবান
তারো চেয়ে অন্ধকারে

CENTRAL LIBRARY

সূর্যহীন, শব্দহীন বিস্ফোরণের মতো আমি অলৌকিক খেলাঘর বেঁধে দেব
(খেলাঘর, বাংলা কবিতা : সম্পাদক শান্তি লাহিড়ী)

জীবনানন্দ লিখেছেন,—

……নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
(শব, মহাপৃথিবী)

মানস রায়চৌধুরী লিখেছেন,—

খোঁপা খুলে দাঁড়িয়েছো অন্ধকারে তুমি কি বাসনা ?
শুনেছি তোমার কথা বহুমুখে। মনে ছিল অন্য এক ছবি।
ঘোর লাল বেনারসী, জামরঙা শাড়ীর আঁচলা—
সব ভিন্ন মনে হলো। চোখে লাগে শুধু একাকার
বনের স্তম্ভিত শোভা, মাঝরাতে নক্ষত্র বাগান।
বুকে এস একবার। ছুঁয়ে দেখি কেমন অচেনা
হাসো কিংবা কথা বলো, চার পাশে জ্বলুক আগুন।
'রয়েছি রক্তের নীচে। তাইতো মাঝে মাঝে হও অমন উন্মাদ।'
এই কথা বলে তুমি মিলালে দৃশ্যের নিরাকারে।
(অমাবস্যা, অনিন্দ্য গোলাপ)

জীবনানন্দের 'অন্ধকার' কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'জরাসন্ধ' কবিতার প্রেরণা বলে মনে হয়। 'জরাসন্ধ' সার্থক সুররিয়ালিস্ট কবিতা।

জীবনানন্দ লিখেছেন,—

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,

* * *

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি
হে হিম হাওয়া—
আমাকে জাগাতে চাও কেন।
আর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে
উঠব না আর ;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরিণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।

CENTRAL LIBRARY

ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—
পউষের রাতে—
কোনদিন জাগব না জেনে—
কোনদিন জাগব না আমি—কোনদিন আর।

(অন্ধকার, বনলতা সেন)

এখানে কবি মায়ের গর্ভে আবার চলে যেতে চাইছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় রোমান্টিক—এমন কি, এসকেপিস্ট। শক্তি তাঁর 'জরাসন্ধে' সেই ভ্রূণের মুখ দিয়ে কথা বলিয়েছেন—

আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে।
যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মতো, কৃপণ করুণ, তাকে
তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায়
বিঁধে কাতর হ'লো পা। সে বলে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে
তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।
পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশ গন্ধ সব
আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি সারি তোর ভাঁড়ারের নুন মশলার পাত্র
হলো মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন
তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি
কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।—
কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন
বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে
নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে।
তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি,
অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।
আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

(জরাসন্ধ, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

কবির বক্তব্য ইম্প্রেসনিস্টের কৌশলগুলিও জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে। অথচ সৃষ্টিমাতৃকা তাঁকে কবিতা লিখতে বাধ্য করছেন। এখন মগ্নচৈতন্যে অবতরণ করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হবে—'নামলে সমুদ্র সরে যাবে।' 'শীতল' অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব শেষ হবে। 'মৃত্যু' অর্থাৎ সৃষ্টিহীনতা শেষ হবে। কিন্তু সুররিয়ালিজম দিয়ে কি সত্যি Creativity আবার পাওয়া যাবে? ১৯২৪এ যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল ১৯৬০এ তার অনেক বিস্তার দেখা গেছে বলেই বোধ হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখছেন সুররিয়ালিজমে পথ মিলবে না।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে।
অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

কিন্তু বাংলা কবিতায় কিছু কিছু চরণে সুররিয়ালিস্ট স্পর্শ অপরূপ হয়ে আছে। যথা,—

CENTRAL LIBRARY

(১) 'স্বপ্নের সমুদ্র সে কি ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন' (হঠাৎ নীরার জন্য, আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

(২) জোৎস্না এখানে নেই। তাকে কাল হাই-ইস্কুলের পোড়ো বারান্দার পাশে দেখা গেছে। সে তার পুরনো আধোনীল শাড়িটি বিছিয়ে ঐখানে শুয়েছিলো।
(গত পূর্ণিমায়, চৈত্রে রচিত কবিতা—উৎপল বসু)

(৩) ……শুধিয়ে, কাঁদতে বসলো ডুমুর
তার ডালপালা আমার চৈতন্যে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।
(তার ডালপালা আমার চৈতন্যে, সোনার মাছি খুন করেছি—শক্তি চট্টোপাধ্যায়)।

(৪) কাদের বাড়ির পাখি, কাদের বনের পাখি, কাদের খাঁচায়,
চিরকাল থেকে যায়, চিরকাল স্বপ্নের ভিতরে।
(ভোরবেলা, তারাপদ রায়)

কোন সন্দেহ নেই, ইম্প্রেসনিস্টের পরেই বাংলা সাহিত্যকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল স্যুর-রিয়ালিজম। বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্প-চিন্তা একে বলা যেতে পারে। কিন্তু এ আন্দোলন যে শেষ পর্যন্ত সফল হোল না তার কারণ অবচেতনা থেকে শিল্পীরা জোর করে প্রতীক চিত্রকল্প, স্বপ্ন, নাটক এগুলি আদায় করছিলেন। যা আমার কথা স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে, সেটা জোর করে বার করতে গিয়ে রহস্য আর রহস্য থাকলো না।

দ্বিতীয়ত, যে অটল বিশ্বাসে মিস্টিকেরা পরাবাস্তবের অন্বেষণ করেন সেই বিশ্বাস তাঁদের ছিল না।

তৃতীয়ত, স্বয়ংক্রিয় লেখা লিখতে গিয়ে তা অনেকসময় উন্মাদ উচ্ছ্বলার সৃষ্টি করলো।

সুতরাং স্যুররিয়ালিস্টরা যা চেয়েছিলেন—জীবনানন্দের ভাষায় যাকে বলা যায়—'যেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের'—সেই ম্লান হয়ে যাওয়া সত্যকে আবার নবরূপে উজ্জ্বল করে পাওয়া গেল না। জীবনানন্দেরই ভাষায় বলা যায়,

গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।
(সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী)

স্যুররিয়ালিজমকে বড় জোর বলা যেতে পারে বিংশ শতকের রোম্যান্টিক আন্দোলন। রোম্যান্টিকদের মতই তাঁরা বাস্তবকে অতিক্রম করে এক নতুন সত্যকে চেয়েছিলেন—রোম্যান্টিকতার মধ্যে যে যুক্তিহীন আবেগের, আন্তরিক অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ থাকে এখানেও তেমনি। স্বচ্ছন্দ কল্পনা উভয়েরই গুণ। তবে সুপাররিয়ালিজমে সুন্দরের একমাত্র চর্চা নেই—বীভৎস, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত রসেরও সমাবেশ হয়ে থাকে।

১৯২৫ খ্রীঃ কম্যুনিজমের সঙ্গে স্যুররিয়ালিজমের মিলন হোল। ১৯১৭ খ্রীঃ রুশবিপ্লব হয়ে গিয়েছিল। স্যুররিয়ালিস্টরা এতদিন ছিলেন বোধিবাদী। এখন যুক্তিবাদী একটি ধারাও মিশল। এতদিন স্যুররিয়ালিস্টরা বলতেন—'বস্তুর চেয়ে চিন্তা বড়'। চিন্তাই চালক, যুক্তি চালক নয়। কিন্তু সাম্যবাদ নিয়ে এল সামাজিক সমস্যাকে। এতদিন স্যুররিয়ালিস্টদের প্রেরণা ছিলেন ফ্রয়েড। এখন হলেন মার্কস। এল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। তাঁরা বললেন আত্মাকে মুক্তি দিতে গেলে আগে অর্থনৈতিক দাসত্ব ঘোচাতে হবে। তার জন্য চাই সর্বহারার বিপ্লব। এতদিন

CENTRAL LIBRARY

স্যুররিয়ালিস্টরা চেয়েছিলেন চিন্তার প্রবাহের মুক্তি। এঁরা চাইলেন অর্থ নৈতিক মুক্তি। ১৯৩০ খ্রীঃ এক প্যামফ্লেট বেরোল—'বিপ্লবের সেবায় স্যুররিয়ালিজম'। বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলন প্রসারিত হোল। ডাডাইজমের মত হয়ে উঠলো আন্তর্জাতিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যপথে স্যুররিয়ালিজমের সমাপ্তি।

স্যুররিয়ালিজমের তুলনায় কম্যুনিজম বাংলা সাহিত্যকে বেশী প্রভাবিত করেছে। কবি, চিত্রকর, নাট্যকার, ঐতিহাসিক—অনেক বুদ্ধিবাদীই এ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার করেন। কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য অনেক অকম্যুনিস্টকেও প্রেরণা জুগিয়েছেন।—বিপ্লবকে বিষ্ণু দে স্মরণীয়রূপ দিয়েছেন,—

(১) জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয় আমার চড়া
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

(ঘোড়সওয়ার, চোরাবালি)

(২) পথে পথে চলে অসহায় চোখ
মরামুখে জলে শাদা কালো চোখ
নিভন্ত চোখ, জীবন্ত মুখে জ্বালা ভরা চোখ, মরীয়ার চোখ
স্বপ্নের চোখ, স্রষ্টার চোখ,
ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
ঘরহারাদের, কারখানা ছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।

(অবিচ্ছিন্ন কাব্য, অন্বিষ্ট)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বিপ্লবের সুন্দর কাব্যময় রূপ দিয়েছেন,—

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদে সেঁকে চামড়া।
চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

* * *

শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা

CENTRAL LIBRARY

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

(সেদিনের কবিতা, পদাতিক)

(২) মারা অত সহজ নয়
একটি আছে
আরেকটির জোড়ে।
ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।
তোমাদের রাজাগুলো সামলাও হে
নইলে
এই কিস্তিতেই মাত যে!
ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

(ঘোড়ার চাল, বত দূরেই যাই)

(৩) আগুন মুখে করে
একটা দড়ি
বেড়ার গায়ে ঝুলছিল
সিগারেট ধরাতে গিয়ে
দেয়ালের গায়ে
চোখ পড়ল
ঠিক আমারই পাশে দাঁড়িয়ে
আমাকে অবিকল নকল করছে
আমার ছায়া

* *

(৪) আমি লক্ষ্য করলাম
আগুনের জায়গাটা
ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেল

* * *

আমার সেই ছায়া
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে
অনেক চেষ্টা করেও
আমি তাকে ছাড়াতে পারলাম না
তখন আমি এই বলে তাকে শাসালাম—
শয়তান
এবার আমি আগুনের মধ্যে যাব।

(আগুনের ছায়া, কাল মধুমাস)

CENTRAL LIBRARY

শয়তান এই সমাজের কাছ থেকে পরিত্রাণের পথ—বিপ্লবের আগুন। সুভাষের রচনা এখানে বেশী ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। এই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা তরুণ সান্যালের 'প্রতিহারীর বিলাপে'ও দেখি। কবি সেখানে নিজেকে মনে করেছেন খোজা প্রতিহারী—জীবনের রূপ রস গন্ধ ভোগ করছে শুধু অভিজাত সমাজ। তিনি শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে বঞ্চিত বুভুক্ষু দ্বারী।

আমি অন্তরালে আছি গুপ্ত ঘাতকের মনে, দ্বারী
কে যায় মহলে ঐ, ফুলে ফলে গন্ধে নারী।

(প্রতিহারীর বিলাপ, তরুণ সান্যাল—
একালের প্রেমের কবিতা সংগ্রহ)

কিন্তু সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যে কম্যুনিস্ট কবিতা প্রসাদগুণ ও আদর্শের আবেগে দীপ্ত।—যেমন,—

(১) নতুন চাঁদের বাঁকা কালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে।

(কাস্তে, দিনেশ দাশ)

(২) আমার প্রিয় রং লাল
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।
লাল গোলাপের জন্যে
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের লড়াই।

(লাল গোলাপের জন্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কাল মধুমাস)

কিন্তু শিল্পী মাত্রেই বিপ্লবী। এবং বিপ্লবী মাত্রেই রোম্যান্টিক। এদিকে কম্যুনিজমে রোম্যান্টিকতার স্থান সামান্য। এজন্য রাশিয়ায় বিপ্লবের সময় যেসব লেখকেরা এসে যোগ দিয়েছেন বিপ্লব শেষে অবিলম্বেই তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। ১৯২৮ থেকে স্টালিনের জবরদস্ত শাসনের শুরু। ১৯৪৯ সালে জ্দানভ লাইন নেওয়া হোল। একমাত্র রাষ্ট্রশাসিত 'সোভিয়েট লেখক সমিতি'র অনুমোদন ভিন্ন কিছুই হবার যো ছিল না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ছাপ না থাকলে সে লেখা বাজেয়াপ্ত হোত। ইতিমধ্যে বেধে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানুষের বিশ্বাস, নীতি, আশা, মমতাবোধ দ্বিতীয়বার বিপন্ন হোল ধ্বংসের কাছে। এই নৈরাশ্যবোধের মধ্যে জন্ম নিল (১৯৪০-৪৩ খ্রীঃ) এক্সিসটেনশিয়ালিজম আন্দোলন। এঁর নেতা জাঁ পল সার্ত্র একদা কম্যুনিস্ট ছিলেন। ব্রেঁত যেমন ডাডা অধ্যায় থেকে কবিতাকে স্যুররিয়ালিস্ট তথা কম্যুনিস্ট অধ্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন,—সার্ত্র তেমনি কবিতাকে কম্যুনিস্ট অধ্যায় থেকে এক্সিসটেনশিয়ালিম অধ্যায়ে নিয়ে এলেন। ব্রেঁত ছিলেন মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। সার্ত্র ছিলেন দর্শনের ছাত্র।

এক্সিসটেনশিয়ালিজমের মধ্যে দুটি ধারা দেখা গেল। (১) ভগবৎ বিশ্বাসী—কিয়েকগার্ড যার নেতা। (২) ভগবানে অবিশ্বাসী—সার্ত্র যার নেতা। রিয়ালিজম, মিস্টিসিজম, আইডিলিয়াজিমের বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্রোহ। এঁদের মতে সত্য মন্ময়। মানুষের অস্তিত্ব মানুষের প্রকৃতির পূর্বগামী। সে প্রথমে হয়—তারপর নিজেকে ব্যাখ্যা

CENTRAL LIBRARY

করে। অস্তিত্ববাদীরা চাইলেন মন্ময়তার পুনরুজ্জীবন। দ্বিতীয়ত, অস্তিত্বের সঙ্গে আসে দায়িত্ব। সার্ত্র একে বলেছেন Commitment। মানুষ তার কাজের জন্য সমাজের কাছে দায়ী। এঁদের পন্থী হাইডেগার বলেছেন মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন। সমস্ত উদ্বিগ্নতার পেছনে রয়েছে মৃত্যুভয়। কারণ, মৃত্যুই অস্তিত্বকে নাশ করে। কিন্তু কোন মতেই আমরা জানতে পারি না কেন জন্ম? বস্তু কি? সত্তা কি? কোন দর্শনেই ব্যাখ্যা হয় না এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতার আকস্মিকতা, অযৌক্তিকতা, অর্থহীনতা। এক বিরাট অজ্ঞেয়তার মধ্যে আমরা পরিত্যক্ত। অন্তর্জীবনে তাই আমরা নিঃসঙ্গ। এদিকে অস্তিত্ব আছে বলে দায়িত্ব আছে। অজ্ঞতা ও অসহায়তার টানাপোড়েনে উদ্বেগ বেড়েই যায়। সার্ত্র বলেছেন, মানুষের চৈতন্যই যদি একমাত্র আশ্রয়, তাহলে ভগবানে বিশ্বাসের দরকার নেই। কোন শাশ্বত মূল্যবোধ বা তন্ময়তার এই কারণেই দরকার নেই। মানুষই সব কিছুর স্রষ্টা। এই দায়িত্বে যে উদ্বেগ জন্মায়, তার থেকে নিস্তার নেই। সেইজন্য মানুষ চির বিষণ্ণ। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এই কথাই বার বার শুনি,—

নাস্তিতে নেতি স্বতঃ সিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই।

* * *

অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

(প্রতীক্ষা, দশমী)

যদিও বাংলা সাহিত্যে সব আন্দোলনগুলির প্রভাব সমান গভীর নয়, তবু স্বীকার করতে হবে বাঙালী কবিরা দায়িত্বের সঙ্গে পৃথিবীর চিন্তা আন্দোলনগুলিকে আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছেন। এবং ফলতঃ না হলেও ধ্যানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী—বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যুগের ছবিটি ধরে রেখেছেন। যাঁরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

বিশ্বপরিক্রমায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

এই কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন, গবেষণা কিংবা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উন্নতির যে স্তরেই পৌঁছুক, তাহার সীমা কেবলমাত্র এই দেশের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলার বাহিরে ভারতের আর যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন হইয়া থাকে, সেখানে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্যই তাহার একমাত্র কারণ; বাংলা ভাষা কিংবা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাহার কারণ নহে। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। যদিও মূলতঃ তাহাই উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি কোথাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক বাংলাভাষা কিংবা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কেহই নিযুক্ত হন নাই বরং তাহার পরিবর্তে নানা প্রাদেশিক ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় অধ্যাপনা করিবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপকের পদে লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সর্বভারতীয় অনুশীলনের যে পরিকল্পন গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাও সার্থক হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ দুইটি জাতীয় সঙ্গীত (এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় সঙ্গীত) বাংলাভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাভাষা যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, তখন ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছু সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে এই কথা সত্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বিদেশের যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা হইত, তাহাতে এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই বিষয়ে বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক তাঁহাদের পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা দ্বারা এই বিষয়ের সকল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজ ও বিদ্বজ্জন সভায় তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ফল উপহার দিতে সক্ষম হইয়াছেন। বাংলাদেশ এবং বাংলাভাষা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের সুধীসমাজে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কোনও বাধা হয় নাই। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং গবেষকদিগের মধ্যে যে হীনমন্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইতে ইঁহারা তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা ভাষা এবং বাংলার সংস্কৃতি লইয়া গবেষণা করিলেও সে বিশ্বের সমাজে সম্মানিত আসন লাভ করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ে অভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। মৌলিক গবেষণার বিষয় বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বদাই সঞ্চিত হইতেছে, ভাষা তাহার কোনও বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না; এই বিশ্বাস লইয়া যদি গবেষণার কর্মে কেহ আত্মনিয়োগ করেন, তবে তিনি একদিন বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেন; ইহাই আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষকদিগের এক আশার বিষয় হইতে পারিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের কয়েকজন অধ্যক্ষ ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আমন্ত্রণ লাভ করিয়া সেখানে গিয়া ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয় প্রচার

CENTRAL LIBRARY

করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই কৃতিত্বের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সম্পর্কে তিনজন বিভাগীয় প্রধানের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকদ্বয় রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক। কিন্তু পরলোকগত অধ্যাপক দুইজন তাঁহাদের বিদেশের কার্যাবলীর বিস্তৃত কোনও বিবরণ কোথাও লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, এখন তাহা অন্য কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করা যেমন নির্ভরযোগ্য নহে, তেমনই সম্ভবও নহে। সেইজন্য তাঁহাদের এই বিষয়ক বিবরণী নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবেই এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে। তবে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের সেই বিষয়ে অসুবিধা নাই বলিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ অপেক্ষাকৃত একটু বিস্তৃতভাবেই এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে।

নরওয়ে

রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন, তখন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইউরোপের নরওয়েতে এক আন্তর্জাতিক ভাষাতাত্ত্বিক মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তিনি তাহাতে যোগদান করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য যে কেবলমাত্র সাহিত্য, দর্শন এবং সঙ্গীতচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত সমাজের সম্মুখে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

ফিলিপাইন্‌স্

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কলিকাতার রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি ইহার সভা-সমিতিতে ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করিতেন। তাঁহার আলোচনা সমূহ ইনষ্টিটিউটের বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্রই প্রচার লাভ করিত। এই সূত্রে ভারতীয় ধর্মচিন্তা সম্পর্কে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী সহর ম্যানিলাতে 'ইউয়েনেস্কো'র প্রযোজনায় এক বিশ্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে আমন্ত্রণ লাভ করিয়া ডক্টর দাশগুপ্ত ম্যানিলা যান এবং ভারতীয় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি স্বরূপ হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটি পরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

যুক্তরাজ্য

১৯৩৬ সনে ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তখন যুক্তরাজ্যের কেম্ব্রিজ সহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সেই সময়কার আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যক্ষ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সেই সম্মিলনীতে যোগদান করেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নানা সমস্যা লইয়া তিনি সেখানে আলোচনা করেন। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দিক দিয়াই নহে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিষয়েও যে তাঁহার দক্ষতা ছিল, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

১৯৬৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত যুক্তরাজ্যের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিদ্যা বিভাগ হইতে আমন্ত্রণ লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি বক্তৃতা দিবার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। সেখানে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তখন সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের অধ্যাপক আর্নল্ড্ বাকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং অধ্যাপক বাকে তাঁহা কর্তৃক নেপালে সংগৃহীত কতকগুলি লোকসঙ্গীতের 'টেপ' তাঁহাকে বাজাইয়া শুনা'ন। ইঁহাদের মধ্যে ডঃ দাশগুপ্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'র কিছু কিছু পদের সন্ধান পান, তাহা হইতেই এই বিষয়ে তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠেন এবং এই বিষয়ে গভীরতর অনুসন্ধান করিবার জন্য পরবর্তী কালে নেপাল যাত্রা করেন। সে কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের লোক-সাহিত্য বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদিগের সহযোগিতায় ১৯৬১ সনে পুরুলিয়া জিলার গ্রাম হইতে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ ছৌ-নৃত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের অবজ্ঞায়, অবহেলায় এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল; কিন্তু ইহার উজ্জ্বল সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ইহাকে পুনরুদ্ধার করিয়া সাংস্কৃতিক জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার কার্যে অগ্রসর হইয়া যাই। অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হই এবং দিল্লীতে ইহার কয়েকবার প্রদর্শনী হইবার পর ১৯৭২ সনে ইউরোপ হইতেও ইহার আমন্ত্রণ আসে। ১৯৭২ সনে যখন ফরাসী সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের নাট্যবিভাগ কর্তৃক প্যারিসের আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ আসে, তখন লণ্ডনের বিশিষ্ট নাট্যানুরাগী এবং ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যনাট্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মিঃ রিচার্ড গ্রেহাম সেই সময় লণ্ডন যাইবারও আমন্ত্রণ জানান। এমন কি, তিনি প্যারিস যাইবার পূর্বেই লণ্ডন যাইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং লণ্ডন হইতে যথাসময়ে প্যারিসে পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হ'ন। সেই অনুযায়ী আমি ১৯৭২ সনের মে মাসে পশ্চিম বাংলার নৃত্যনাট্য ছৌ নৃত্যের গ্রাম্য শিল্পীর ২০ জনের একটি দল লইয়া লণ্ডন যাত্রা করি। বলা বাহুল্য, পশ্চিম বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ইহাই সর্বপ্রথম ইউরোপ যাত্রা।

লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার সংবাদদাতাগণ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণী পরের দিনের প্রায় সকল পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়। ২২শে মে, ১৯৭২, তারিখের লণ্ডনের প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা *The Guardian* এই সাক্ষাৎকারের যে দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রথমাংশ এই—

'Professor Asutosh Bhattacharyya of Calcutta University was harmlessly wandering round Bengal in the holidays collecting, as was his wont, the odd folk-songs or riddles (he has published ten volumes of indigeneous folk-songs). Some one suggested he might find something of interest in Purulia. It was an isolated village, fifty miles from the nearest railway station. Undaunted the professor set off on a series of country buses. When he got to Purulia he was amazed. He had stumbled upon a fragment of dance-drama that had been forgotton about in the cosmopolitan world of Calcutta., (*The Guardian*, London, 22. 5. 72).

CENTRAL LIBRARY

লণ্ডনের রোসবেরি এভিন্যুস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'স্যাড্‌লার্স ওয়েলস্ থিয়েটারে' আমাদের পরিচালনায় পুরুলিয়ার ছৌনৃত্যের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। প্রদর্শনীর পূর্বেই লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে ইহার সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হইবার ফলে প্রথম দিন হইতেই ইহাতে বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত হইতে থাকে। প্রথম দিনই বুঝিতে পারা গেল যে এই দর্শক কেবলমাত্র উৎসব-বিলাসী আমোদ-প্রমোদপ্রিয় লঘু-প্রকৃতির দর্শক নহে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বিদগ্ধ শিল্পরসিক এবং এই বিষয়ে তাঁহারা কেবলমাত্র চোখে দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে না, অনন্ত জিজ্ঞাসা লইয়া প্রথম দিন হইতেই তাঁহারা আমার সম্মুখীন হইতে লাগিল। অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলেও আমাকে প্রতিদিন প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ব্যাপিয়া দর্শকদিগের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হইত।

অবশেষে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ 'কমনওয়েল্‌থ হলে' এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হইল, তাহাতে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজের নিকট বাংলার লোক-নৃত্য বিশেষতঃ ছৌনৃত্যের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, পটভূমিকা, তাৎপর্য, পৃষ্ঠপোষকতা এবং নানা বৈশিষ্ট্য লইয়া এক তুলীণ আলোচনা করা গেল। সেই আলোচনার বিবরণীও পরের দিন বহু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। তারপর লণ্ডনের বি. বি. সি (ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন) হইতেও আমাকে এই বিষয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইল। সেই অনুযায়ী লণ্ডনের বি. বি. সির বুল হাউস স্টুডিও হইতে ২৭. ৫. ৭২ তারিখ 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে নজরুল' এবং ৩. ৬. ৭২ তারিখে 'পশ্চিম বাংলার লোক-নৃত্যে ছৌ' সম্পর্কে দুইটি সাক্ষাৎকার বেতারে প্রচার করা হয়।

বি. বি. সির টেলিভিসন হইতেও আমন্ত্রণ আসিল। সেই অনুযায়ী ২৫শে মে বাংলার লোক-নৃত্যে ছৌ সম্পর্কে একটি আলোচনার মাধ্যমে বি. বি সির টেলিভিসন যন্ত্রে ছৌনৃত্যের অনুষ্ঠানটি গৃহীত হয়। সেদিনই ৬'৪৫ মিনিটের সময় ১০ মিনিট ব্যাপী বি. বি. সির টেলিভিসনে তাহা প্রচার করা হইল। এইভাবে সংবাদপত্রে, বেতারে, বক্তৃতায়, টেলিভিসনে প্রচার করিবার ফলে কয়েকদিনের মধ্যে সমগ্র লণ্ডন এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাঙ্গালার সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট রূপটি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলের মধ্যে এক অভাবনীয় সাড়া পড়িয়া গেল। 'স্যাড্‌লার ওয়েল্‌স্ থিয়েটারে' প্রতিদিন দর্শকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের একজন বয়স্ক অধ্যাপক একদিন অনুষ্ঠান শেষে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং পরের দিন অনুষ্ঠান শেষে আমাকে এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তিনি পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি ১১টা। কিন্তু জিজ্ঞাসু এবং কৌতূহলী দর্শকের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল।

তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া অসহায়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, একবার মাত্র কথার ফাঁকে আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, সকলে হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, এই নৈশভোজ কেবলমাত্র আমাকে লইয়া নহে, ইহাতে তাঁহার বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক এবং গবেষণাকারী ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকিবেন; কারণ, আমার মনে হইল, তিনি সেই রকম কথাই আগে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি নিরুপায়ের মত এক একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসু জনতার নানা প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইতে লাগিলাম।

রাত্রি যখন ১টা হইবে, থিয়েটারের আলোগুলি সবই নিভাইয়া দেওয়া হইল, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসু জনতা অন্তর্হিত হইয়া গেল, পরে আবার সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া দুই একজনে জানাইয়া দিয়া গেল।

CENTRAL LIBRARY

তখন নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপকের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার গাড়ীতে চড়িয়া যেখানে নৈশভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে সেখানকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথঘাট প্রায় জনহীন হইয়া আসিয়াছিল।

অধ্যাপক বলিলেন, আপনার নৈশ ভোজের জন্য একটি ভারতীয় হোটেলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আশাকরি সেখানকার খাদ্য আপনার পছন্দ হইবে।

আমি বলিলাম, আমি পাশ্চাত্ত্য খাদ্য খাইতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, আমার জন্য ভারতীয় খাদ্য না হইলেও চলিত।

যাই হোক, হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, হোটেলে বসিবার স্থান নাই, সকল আসনই পূর্ণ। অধ্যাপক মহাশয় আমাকে লইয়া কক্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই টেবিলের চারিপার্শ্বে ১৪।১৫ জন নানা বয়সী বিদেশী নরনারী বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি সামনে উপস্থিত হইবা মাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন. সম্মানিত আসনটি আমাকে দেখাইয়া দিয়া আমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বিলম্বে উপস্থিত হইবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা দুই-ঘণ্টাকাল আমার জন্য টেবিলে বসিয়া অপেক্ষা করিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই খাদ্য পরিবেশন আরম্ভ হইল এবং খাদ্য মুখে তুলিবার আগেই চারিদিক হইতে আমার উপর প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি সকলের সঙ্গে ভোজনে যোগ দিয়া প্রশ্নগুলির জবাব দিয়া যাইতে লাগিলাম।

ইঁহাদের প্রশ্ন প্রধানতঃ নৃতত্ত্ব-বিষয়ক এবং আমি 'কমনওয়েলথ হলে'র সভায় বক্তৃতায় যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহাদের কিছু কিছু বিশ্লেষণ-মূলক। আমি বুঝিতে পারিলাম, ঐ বক্তৃতায় এখানকার প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের অদিবাসীদের জীবন ও ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে ইঁহাদের জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি আমার 'কমনওয়েল্থ হলে'র সভার বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে মূলতঃ মুণ্ডা উপজাতিই ছৌনৃত্যের অংশ গ্রহণকারী ছিল, পরে অন্যান্য জাতি তাহাদের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছে। এক প্রকার সকলেই আমার এই উক্তিটি বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেন আমি সাঁওতাল কিংবা অন্য কোনো অদিবাসীর সঙ্গে এই নৃত্যের কোনও যোগ আছে কিংবা যোগ ছিল বলিয়া মনে করি না, সে কথা বিস্তৃতভাবে আমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইল। আমি আট বছরের অধিককাল ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের ডক্টর ভেরিয়র এলউইনের অধীনে প্রথমতঃ গবেষণা-সহযোগী এবং পরে সহকারী সামাজিক নৃতত্ত্ববিদের কাজ করিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে ভারতীয় বিভিন্ন উপজাতির সঙ্গে আমার পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল; সুতরাং এই বিষয়ে আমার জ্ঞান কেবলমাত্র পুথিপাঠ্য ছিল না, বরং প্রত্যক্ষক্ষেত্র হইতে অভিজ্ঞতা-লব্ধ ছিল। আমি আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাস হইতেই এই কথা বলিয়াছিলাম; সুতরাং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে আমার কিছু মাত্র বেগ পাইতে হইল না।

আমি যখন আমার বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিলাম, তখন লক্ষ্য করিলাম, কিছু কিছু তরুণ-বয়স্কা ছাত্রী তাহা খাতায় লিখিয়া লইতেছে; বুঝিলাম, স্ত্রীচরিত্র সর্বত্রই সমান; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আমাদের ক্লাসের 'বক্তৃতা' ছাত্রীরা মাটিতে পড়িতে দেয় না; সবই টুকিয়া লয়।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া বলিতে হইল। কারণ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ ইঁহাদের মধ্যে যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য আছে, তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বাহির হইতে সবই একাকার বলিয়া মনে হয়।

CENTRAL LIBRARY

এই রকম আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, আমি ধীরে ধীরে সকল প্রশ্নেরই জবাব দিলাম, আমার বিদ্যা এবং বুদ্ধির বা'হরে কোনও প্রশ্ন ছিল না বলিয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম।

রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় সেই প্রবীণ অধ্যাপক গাড়ী করিয়া আমার রাসেল স্কোয়ার-স্থিত 'ইম্পেরিয়াল হোটেলে' পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। সেদিন বেশি রাত্রি হইয়াছে বলিয়া আমাকে আর প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতে চাহিলেন না, আর একদিন আমার সঙ্গে 'ডিনারে' মিলিত হইয়া অবশিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন স্থির হইল। প্রশ্নগুলি আগে হইতে তাঁহারা ভাবিয়া আসিবেন।

আমি বুঝিতে পারিলাম, 'কমন্‌ওয়েল্‌থ হলে' আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহা সকলের মধ্যেই এই বিষয়ে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে, বক্তৃতায় অনেক কথা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় নাই, সেইজন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনেকেই আমার নিকট হইতে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর জানিয়া লইতে চাহিলেন। আমি ইঁহাদের এই বিষয়ক আগ্রহের গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। কারণ, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অধ্যাপকের মধ্যে—তিনি নৃতত্ত্ব বিভাগেরই হউন, কিংবা চারুশিল্প বিভাগেরই হউন, বিদেশাগত কোনও নৃত্যশিল্প সম্পর্কে অনুরূপ আগ্রহ দেখাইবার নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

৩০শে মে তারিখ ভোর বেলায় হোটেলের বিছানা ছাড়িয়া ঘুম হইতে উঠিবার আগেই শিয়রে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, একজন মহিলা আমার দর্শনপ্রার্থিনী, তিনি নিজেকে একজন নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) বলিয়া পরিচয় দিলেন, নাম শ্রীমতী স্থ্য জেনিংস্, তিনি Drama Therapist and anthropologist—এই বলিয়া নিজের একটি 'কার্ড' পাঠাইয়া দিলেন। Drama Therapist কি জিনিস বুঝিতে পারিলাম না, শুধু anthropologist কথাটি বুঝিলাম। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

যথাসময়ে তিনি আসিয়া আমার কক্ষে দেখা দিলেন। তিনিও আমার 'কমন্‌ওয়েল্‌থ হলে'র বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন, অনেক কথা তাঁহার জিজ্ঞাস্য থাকিলেও সেখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। তিনি আমাকে সেদিন 'ডিনারে' নিমন্ত্রণ করিলেন, বলিলেন, সেখানে আপনার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ লাভ করা যাইবে।

তিনি তাঁহার আর একটি নূতন পরিচয় দিলেন যে তিনি London School of Economics-এর গবেষণা বিভাগের ছাত্রী। তিনি জানাইলেন, তাঁহার বিভাগীয় প্রধান, যাঁহার অধীনে তিনি গবেষণা করিতেছেন, তিনিও 'কমন্‌ওয়েল্‌থ হলে'র সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সেদিনকার নৈশ ভোজসভায় আমার সঙ্গে মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রীমতী স্থ্য জেনিংস্ আমাকে স্যাডলার ওয়েলস্ থিয়েটার হইতে ডিনারের জন্য লইয়া যাইবেন, নৈশভোজে তাঁহার অধ্যাপকও উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহারও কিছু প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

আমি তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রীমতী জেনিংস্ বিদায় হইলেন না, আমাকে তখন হইতেই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি নৃত্যনাট্য লইয়াও কাজ করেন, সুতরাং ছৌ নৃত্য আদিম নৃত্যনাট্যের কোনও রূপ কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে চাহেন।

আমি তাঁহার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি School of Economics-এর গবেষণা বিভাগের ছাত্রী, তাহার উপর Drama Therapist এবং Anthropologist এবং নৃত্যনাট্যের গবেষক, অতএব তিনি কি ন'হেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে বিষয়টিকে আমরা আমাদের দেশে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিয়া আসিয়াছি, তাহার মধ্যে যে এত জানিবার এবং কৌতূহল প্রকাশ করিবার বিষয়

CENTRAL LIBRARY

আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে বুঝিতে পারিয়া আমি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম। তিনি তখনই আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে ক্লান্ত হইয়া না পড়িলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্ত হইলেন না।

সেদিন অনুষ্ঠানের শেষে তিনি এবং তাঁহার অধ্যাপক উভয়ই থিয়েটারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, আমরা আপনাকে ডিনারে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। তখন আমি প্রায় ১০০ শত দর্শক কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছৌ-নৃত্যের নানা বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছি।

আমি একবার মাত্র বলিলাম, আপনাদের একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

তাঁহারা বলিলেন তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি, আমরা অপেক্ষা করিতেছি।

সেদিনও রাত্রি একটার আগে নিষ্কৃতি পাইলাম না। সকলের প্রশ্নের জবাব দিয়া যখন তাঁহাদের নিকট আসিয়া বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাহিলাম, তখন তাঁহারা উভয়েই প্রসন্নমুখে আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অধ্যাপক নিজেই গাড়ী চালাইয়া চলিলেন।

কিছুদূর গিয়া সকলে মিলিয়া একটি হোটেলে প্রবেশ করিলাম। অধ্যাপক বলিলেন, হোটেলটি ভারতীয় খাদ্য পরিবেশন করে, সেইজন্য এইখানেই আমি ডিনারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছি।

নির্দিষ্ট টেবিলে বসিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ছৌ-নৃত্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন আরম্ভ হইল। আমি একে একে প্রশ্নের জবাব দিয়া চলিলাম। তবে সেখানে দুইজনই শ্রোতা এবং আমি একমাত্র বক্তা। গত রাত্রের anthropopogist-দের তুলনায় ইহাদের প্রশ্নের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, স্বভাবতই কতকটা অর্থনীতি-ঘেঁষা, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীরা অর্থনৈতিক অবস্থার যে কোন্ স্তরে বর্তমান আছে, তাহা সম্যক্ প্রকাশ করিয়া বলিলেও ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, ইহাদের দারিদ্র্যের কথা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত।

ইনি London School of Economics এর একজন পদস্থ অধ্যাপক। তাঁহার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার একটা সুনির্দিষ্ট বিষয় এবং ধারা আছে। তিনি যে বিষয়ের প্রতি এখানে এতখানি অনুরাগ দেখাইতেছেন, তাহা তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়ের বহির্ভূত। অথচ ইহা জানিবার জন্য তিনি আমার 'কমনওয়েলথ হলে'র সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার একজন ছাত্রীকে পাঠাইয়া আমি তাঁহার 'ডিনারে'র আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কি না, জানিতে চাহিয়াছেন, তারপর গভীর রাত্রে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবার পর আমাকে লইয়া হোটেলে আসিয়া ডিনারের টেবিলে বসিয়া এই বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল দূর করিতেছেন। আমি তাঁহার চরিত্রের কথা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমাদের দেশেরও আমি বড় বড় অধ্যাপক দেখিয়াছি, নিজে বড় অধ্যাপক না হইলেও একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় বিভাগের প্রধান হইয়া বসিয়াছি, আমাদের মধ্যে ইহার চরিত্রের কণামাত্র গুণের অস্তিত্বও আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। একটা জাতি কিসে বড় হইয়াছে, এইখানেই তাহার যথার্থ পরিচয় পাইলাম।

সেদিনও অনেক রাত্রে অধ্যাপক নিজেই তাঁহার গাড়ী করিয়া আমাকে আমার রাসেল স্কোয়ারের 'ইম্পেরিয়াল হোটেলে' পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন, তিনি বিদায় লইবার সময় আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার বেশি যদি কিছু থাকে আমি মনে মনে তাহাই তাঁহাকে জানাইলাম। একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হইয়াও নিজেকে ইহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল। অথচ আমাদের অহঙ্কার এবং অভিমানের সীমা নাই।

২রা জুন সকালের দিকে ২।৩ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা

CENTRAL LIBRARY

বলিলেন, আজ লণ্ডনের বেঙ্গলী ইন্‌ষ্টিটিউট নামক প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হইবে, তাহাতে আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কারণ, আমাকে সেখানে একটি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। উদ্যোক্তারা যথাসময়ে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন।

শ্রীঅমিত চন্দ কর্মসচিব স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আমার হাতে দেওয়া হইল; তাহাতে দেখিতে পাইলাম, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভায় ভাষণ এবং সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকিবে।

সন্ধ্যা ছয়টার আগেই ৮৪, ইয়র্ক ষ্ট্রীটে অবস্থিত লণ্ডনের 'The Bengali Institute'-এ আমাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। যথাসময়ে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত হইলেন। বিচিত্র পোষাক পরিহিত নানা বয়সী বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ সভায় সমবেত হইতে লাগিলেন। সভার প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাক্তার মুখার্জি ইংরেজিতে বক্তৃতা করিলেন, তারপর তুষারকান্তি বাবুর বাংলায় বক্তৃতা হইল। তারপর আমারও বাংলায় ভাষণ হইল। আমার প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসিনী শ্রীমতী তৃপ্তি দাস কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করিল। জলপানের পর সভাভঙ্গ হইল।

স্যাডলার ওয়েল্‌স্ থিয়েটারে ছৌনৃত্যের প্রদর্শনী প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ণ হইয়া আসিতে চলিল, দিনের পর দিন দর্শনার্থীর ভীড় বাড়িতে লাগিল। প্রতিরাত্রেই অনুষ্ঠান শেষে আমার উপর দর্শনার্থীর জিজ্ঞাসাও বাড়িতে লাগিল। আমাকেও যেন কি একটা নেশায় পাইয়া বসিল, প্রতি রাত্রেই অনুষ্ঠান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে বহু দর্শক সাক্ষাৎ করিতে আসেন, আমাকে অভিনন্দন জানান, আমার সঙ্গে করমর্দন করিতে পারিলে নিজেদেরে কৃতার্থ মনে করেন। বাংলার এই অবহেলিত শিল্পকলার এই অভাবনীয় সম্বর্ধনার কথা মনে করিয়া সে দিন আমার বুক আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

৩রা জুন শনিবার। সেদিন লণ্ডনে আমাদের শেষ অনুষ্ঠান। শনিবার বলিয়া দুইবার অনুষ্ঠান হইবে, একবার ৫-৩০ টায়, আর একবার রাত্রি ৮টায় আরম্ভ। বৈকাল ৪টার সময় হইতেই এক বিশাল জনতা থিয়েটারের সামনে উপস্থিত হইয়াছে, টিকিট ঘরের সামনে এক সুদীর্ঘ সারি বাঁধিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। সারি ভিতর হইতে বাহিরের রাস্তার ফুটপাতের একপাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নানা বয়সী বিদেশী স্ত্রীপুরুষ 'রেন কোট' ও টুপি মাথায় দিয়া বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পুরুলিয়ার পর্বত এবং অরণ্যের অন্ধকারে দীর্ঘকাল যাহা অজ্ঞাতবাস করিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহরে প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্তেই এক অভিজাত সমাজের সামনে এই জনপ্রিয়তা লাভ করিল দেখিয়া আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রথম দর্শনেই লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজ যে বাংলার উপেক্ষিত নিরক্ষর আদিবাসীর সাংস্কৃতিক রূপটি এতখানি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিবে, তাহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। আমি বুঝিতে পারিলাম না, মাত্র দশবছর আগে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরে সঙ্গে লইয়া গিয়া গ্রামাঞ্চলে যে একটি নৃত্য দেখিয়াছিলাম, তাহা এই ভাবে এই কয় বছরের মধ্যেই বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি কি ভাবে আকর্ষণ করিল।

নেপাল

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিদ্যাবিভাগ কর্তৃক আমন্ত্রণ লাভ করিয়া লণ্ডন গিয়াছিলেন, তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক আর্নলড বাকে তাঁহাকে কতকগুলি টেপ রেকর্ড বাজাইয়া শুনান। লোক-সঙ্গীত-প্রেমিক অধ্যাপক বাকে গানগুলি নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি

CENTRAL LIBRARY

ইহাদের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ডক্টর দাশগুপ্ত গানগুলি শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং 'হাজার বছরের বাংলা গান' বলিয়া প্রচারিত 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র সম্পূর্ণ অনুরূপ। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের সাধন সঙ্গীতগুলি আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই, নেপাল এবং তিব্বতে এখন পর্যন্ত তাহা বৌদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীদিগের মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে।

আর্লনল্ড বাকে সংগৃহীত গানগুলি ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার নিকট হইতে টেপ করিয়া লইলেন এবং দেশে ফিরিয়াই স্বয়ং নেপাল গিয়া এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ, যে কালব্যাধিতে তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হইলেন, সেই ব্যাধির তখনই সূচনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি নিরস্ত হইলেন না, তিনি নেপাল যাত্রা করিলেন এবং সেখান হইতে সন্ন্যাসী ও অন্যান্য গায়কদিগের মুখ হইতে আরও দুইশত গান সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবার পূর্বেই সেই কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়া

১৯৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে এক চিঠি পাই। তাহাতে জানিতে পারি যে, ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক চুক্তি বিনিময় অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য কয়েক সপ্তাহের জন্য সোভিয়েত দেশে যাইবার আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। যদিও লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিভাগের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আমার সঙ্গে পত্রে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তথাপি কোন-দিনই তিনি ঘুণাক্ষরেও এমন আভাস আমাকে দেন নাই, যে আমাকে কোন সময় তাঁহার দেশে যাইতে হইবে। তথাপি আমি বুঝিতে পারিলাম, এই আমন্ত্রণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই সুপারিশের ফলে সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের উত্তরে সোভিয়েত দেশে যাইতে স্বীকৃত হইয়া প্রথমেই তাঁহার নিকট চিঠি লিখিলাম এবং কি কি বিষয়ে আমাকে বক্তৃতা দিতে হইবে, তাহা আমাকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রে আমাকে লোক-সাহিত্যের উপরে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। ডঃ ভেরা নভিকোভা আমার পত্রের উত্তরে জানাইলেন যে অনেকদিন হইতেই তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দেশে যাইবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন, এতদিন পর যে আমার যাওয়া চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়াছে, সেই-জন্য তিনি আনন্দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও লিখিলেন যে লোক-সাহিত্য ব্যতীত বাংলা নাটকের উপরও আমার কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হইবে।

মার্চ মাসের প্রথম দিকেই আমি সোভিয়েত দেশে যাত্রা করিলাম। প্রথমতঃ তাসখন্দ হইয়া মস্কোতে যাইয়া পৌঁছিলাম, সেখানে Ministry of Higher Education-এর পক্ষ হইতে আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানান হইল। তাহারই ব্যবস্থাপনায় মস্কো শহরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা, প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি ইত্যাদি পরিদর্শন করিবার পর আমার মূল গন্তব্যস্থল লেনিনগ্রাদ যাওয়া স্থির করা হইল।

মস্কো হইতে লেনিনগ্রাদ ট্রেনে একরাত্রির পথ। একরাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন ভোর বেলায় লেনিনগ্রাদ স্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে ডঃ ভেরা নভিকোভা ও তাঁহার সহকর্মিগণ আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। লেনিনগ্রাদ রেল স্টেশনের নিকটেই একটি বিশাল হোটেলে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

CENTRAL LIBRARY

হোটেলের নাম 'হোটেল মস্কো', রুশ ভাষায় Moskovskaya। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে এই হোটেলের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। কারণ, রুশ বিপ্লবের সময় বিপ্লবের নেতা ভি. আই. লেনিন দুইদিন এই হোটেলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। হোটেলের সেই কক্ষটি এখনও বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। যাই হোক, সেইখানেই একটি মনোরম কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর শ্রীমতী নভিকোভার সঙ্গে আমার বক্তৃতার বিষয়ে আলোচনা হইল। আমি কতকগুলি বক্তৃতা কলিকাতা হইতে তৈয়ারী করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। শ্রীমতী নভিকোভা তাহাদের মধ্যে একটিও গ্রহণ করিলেন না, বরং নতুন কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, লোকশ্রুতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তৃতা দিলে তাঁহার ছাত্রছাত্রীদিগের উপকার হইবে, যথা বাংলার লোকশ্রুতির সাধারণ পরিক্রমা (survey), বাংলার সর্পশ্রুতি (Serpent lore), লৌকিক দেবদেবী, মঙ্গলকাব্য, যাত্রা, নাটকের মধ্যে বাংলা নাটকের উদ্ভব ও সাম্প্রতিক বাংলা নাটক। বক্তৃতাগুলি ইংরাজীতে দিতে হইবে, প্রয়োজন মত তাঁহারা তাহা রুশভাষায় অনুবাদ করিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের কোনও বিষয়ে কোনও বক্তৃতাই আমি পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতে পারি নাই। অথচ প্রত্যেকটি বক্তৃতাই লিখিতভাবে উপস্থিত করিবার কথা। সুতরাং আমি স্থির করিলাম, বক্তৃতাগুলি রাত্রি জাগিয়া সেখানেই লিখিয়া লইব। কারণ, দিনের বেলায় প্রথমতঃ নানা দ্রষ্টব্য স্থান আমাকে দেখিয়া বেড়াইতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ বিকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া এক একটি বক্তৃতা দিতে হইবে। সুতরাং রাত্রি জাগরণ ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। প্রতি রাত্রে এক একটি করিয়া বক্তৃতা লিখিব, পরের দিন সেই বক্তৃতাটি উপস্থিত করিব। কিন্তু বক্তৃতাগুলি এত দ্রুত লিখিবার প্রধান অন্তরায় হইল ইহাদের সম্পর্কিত কোন গ্রন্থই আমার সামনে ছিল না। তথাপি দীর্ঘকাল যাবত অধ্যাপনা করিবার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমি এই দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইলাম।

একদিন মাত্র একটি বক্তৃতা আমাকে বাংলাভাষায় দিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ইহার একটি বিশেষ কারণ ছিল, শ্রীযুক্তা নভিকোভা তাহা আমাকে খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার বিভাগে তিনটি চীন দেশীয় ছাত্র আছে, তাহারা ইংরাজী জানে না। তাহারা বাংলা খুব দ্রুত বলিতে পারে না সত্য, কিন্তু বাংলা বই পড়িলে বুঝিতে পারে এবং বাংলাভাষায় বক্তৃতাও অনুসরণ করিতে পারে। তাহারা একদিন আমার মুখে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা শুনিতে চায়। সেইজন্যই শ্রীযুক্তা নভিকোভা আমাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন। আমি স্বীকৃত হইলাম এবং কোন্ বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা দিব তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, মঙ্গলকাব্য বিষয়ক বক্তৃতাটি আপনি বাংলাভাষায় দিন। কারণ, আপনার 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' বইটি ইহাদের পাঠ্য। সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলিলে তাহাদের উপকার হইবে।

১৯শে মার্চ ১৯৬৪ সাল আমার বক্তৃতা দিবার প্রথম দিন। আগের দিন সারারাত জাগিয়া বক্তৃতাটি লিখিয়াছি। বক্তৃতার বিষয় - বাংলার লোকশ্রুতি পরিক্রমা। বক্তৃতার সময় ১টা। বক্তৃতার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগের সভাগৃহ।

সাড়ে বারোটার সময় আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী আসিল। আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। লিখিত বক্তৃতাটি হাতে লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় শ্রীমতী নভিকোভা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, বক্তৃতা দিবার পূর্বে আমাদের ডীনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া যান। বলিয়া ডীনের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

CENTRAL LIBRARY

ডীনের নাম মিখাইল বাগালুবভ্—তাঁহার পরিচয় Dean of the Faculty of Oriental Studies. তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিবার পর তিনি উঠিয়া করমর্দন করিলেন এবং আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় সেদিন আমার বক্তৃতার পর চারিটার সময় তাঁহাদের একটি thesis-এর review সভায় উপস্থিত থাকিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন।

অধ্যাপক মিখাইল বাগালুবভ্ ইরানীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় গবেষণা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশের অনধিক। সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ। নাৎসী আক্রমণের সময় যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার কথাও বলিলেন।

ডঃ নভিকোভার সঙ্গে আমি আমার সেদিনকার বক্তৃতা দিবার জন্য নির্দিষ্ট সভাগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেখানে প্রায় একশত নরনারী উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে দশবারো জন ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে পাঁচ জন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীরা সকলেই শিক্ষানবিশ ইঞ্জিনীয়ার। হৃষীকেশের Heavy Engineering Corporation এর কর্মী। রুশ বেতারে আমার আগমনবার্তা এবং বক্তৃতার কথা শুনিয়া তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই লেলিনগ্রাদের বিভিন্ন সংগ্রহশালা এবং গবেষণাগারের ইংরেজী-জানা কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রছাত্রী।

সভা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ ভেরা নভিকোভা রুশভাষায় আমার বিস্তৃত পরিচয় দিলেন। আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু বুঝিলাম, কিছু অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমার সোভিয়েত দেশে গিয়া বক্তৃতা দিবার ফলে রুশভারত মৈত্রী যে দৃঢ়তর হইবে এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন।

তারপর আমি আমার বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। গতকাল সারারাত্রি জাগিয়া যে বক্তৃতাটি লিখিয়াছিলাম, তাহা সম্মুখে রাখিয়া লৌকিক ধর্ম, সাহিত্য, নাট্য, আচার বিশ্বাস, শিল্প, উৎসব ও যাদুবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে মৌখিক ভাষণ দিলাম। কারণ, আমি বুঝিতে পারিলাম, লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলে বিষয়টি অত্যন্ত নীরস হইয়া উঠিবে। মৌখিক বক্তৃতায় নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া আমি বক্তৃতাটি যথাসম্ভব আকর্ষক করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলাম। এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিবার পর আমি বক্তৃতা শেষ করিয়া শ্রোতাদের মধ্য হইতে কাহারও প্রশ্ন করিবার থাকিলে তাহা আহ্বান করিলাম। অনেকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর দিতে দিতে আরও একঘণ্টা কাটিয়া গেল। বাংলার লোকজীবন সম্পর্কে রাশিয়ার বিদগ্ধ সমাজের এই কৌতূহল দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। চারিটার সময় আমাদের thesis review সভায় যাইবার নিমন্ত্রণ আছে, সেকথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ডঃ ভেরা নভিকোভা যথাসময়ে আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা ডক্টরেট ডিগ্রী পান এবং যাঁহারা গবেষণাপত্র পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উভয়ের জন্যই এই Review-এর বৃত্তান্তটি একটু বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

Review-এর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম ইতিমধ্যেই সেখানে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কলাবিভাগের উপাচার্য, ডীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী নভিকোভা আমাকে বলিলেন, যে-বিষয়ের গবেষণাপত্রের Review হইবে, সেই বিষয়ে সারা সোভিয়েত দেশে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত, তাঁহাদের সকলেই সেই সভায় আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দুইজন অধ্যাপক মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও কয়েকজন অন্যান্য স্থান হইতেও আসিয়াছেন। দুইজন চীনদেশীয় অধ্যাপককেও সেই সভায় উপস্থিত দেখিতে পাইলাম। সভাগৃহের একদিকে একটি

CENTRAL LIBRARY

আদালতের কাঠগড়া (Dock), তাহা তখনও শূন্য। মনে হইল, সকলেই যেন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি প্রবেশ করিবামাত্র সেখানকার উপস্থিত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের মত ব্যক্তি সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া আমাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর উপাচার্য মহোদয় আমাকে তাঁহার পাশের আসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডঃ ভেরা নভিকোভা আমার দোভাষিণীর (Interpreter) কাজ করিতেছিলেন; সেইজন্য তিনি আমার পাশের আসনে আসিয়া বসিলেন।

সভার প্রারম্ভেই কলাবিভাগের ডীন অধ্যাপক মিখাইল বাগালুবভ্ দাঁড়াইয়া উঠিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া রুশভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। এই ভাষণের মর্ম পরে আমাকে শ্রীমতী ভেরা নভিকোভা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা মোটামুটি এই প্রকার—আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক কলিকাতার ডঃ ভট্টাচার্য (শব্দটি উচ্চারণ করিতে তাঁহার কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল, তথাপি ইহার তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারেন নাই) আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন। আজই তাঁহার বক্তৃতা শুরু হইয়াছে। তিনি লোক-সাহিত্য বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা আমাদের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক এবং সাধারণ শ্রোতা যে পরম উপকৃত হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই কথা বলিবামাত্র প্রবল করতালি ধ্বনিতে সভা উচ্চকিত হইয়া উঠিল। সকলের দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত হইল। আমি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এইবার Review আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ গবেষক আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া প্রথমেই তাঁহার গবেষণাকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কবে গবেষণার জন্য তাঁহার নাম পঞ্জীভুক্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতেই তিনি কি ভাবে পড়াশুনা এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তথ্যসংগ্রহের জন্য সোভিয়েত দেশের কোন কোন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছেন, গবেষণাকর্মের দুরূহতা এবং বিষয়বস্তুর মৌলিকতা কোথায় ইত্যাদি বিষয় প্রায় আধঘণ্টাব্যাপী মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় কোনো আঞ্চলিক ভাষা; মনে হইল, ইহা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা। গবেষণা-পত্রের (thesis) দুই তিনটি টাইপ করা বাঁধাই 'কপি' আমাদের সামনে টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল। অনেকেই তাহা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতেছিলেন। গবেষকের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী নহে; মনে হইল, কোনো গবেষণা-বিভাগের কর্মী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতে পারেন। তিনি অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতির ব্যক্তি এবং তাঁহার ভাষণের মধ্যে কোন বাহুল্য কিংবা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় নাই। তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া কাঠগড়া হইতে নামিয়া নিজের আসনে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা-পত্রের একজন পরীক্ষক তাঁহার রিপোর্ট লইয়া কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রুশভাষায় তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্যটি পাঠ করিয়া গেলেন। শ্রীমতী নভিকোভা নিম্নস্বরে আমাকে বলিলেন যে ইনি গবেষণাপত্রটি অনুমোদন করিয়াছেন, তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে কতকগুলি দোষও দেখাইয়াছেন। দোষগুলি মারাত্মক কিছু নয় বলিয়া ডিগ্রী দিতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তাঁহার রিপোর্টটি পাঠ করিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগিল। প্রতিটি বিষয় তিনি খুঁটিনাটি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। গবেষকের মন্তব্যগুলি একটি একটি করিয়া বিচার করিলেন, তারপর সর্বশেষে তাঁহার নিজের বক্তব্য বলিলেন। শুনিলাম, তিনি মস্কো হইতে এই উপলক্ষেই এইখানে আসিয়াছেন।

এইবার দ্বিতীয় পরীক্ষক আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। তিনি স্থানীয় কোন গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। বয়সে বেশ প্রবীণ। মনে হইল, আশী বৎসরের কাছাকাছি হইবে। তিনিও প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার রিপোর্ট

CENTRAL LIBRARY

পাঠ করিলেন। তাঁহারও বিচার অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তথ্যনির্ভর। শ্রীযুক্তা নভিকোভা আমাকে জানাইলেন যে ইনিও গবেষণাপত্রটি অনুমোদন করিতেছেন। গবেষক এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া রিপোর্টগুলি শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখের উপর একটু যেন আশার আলো প্রকাশ পাইল। দ্বিতীয় পরীক্ষকও তাঁহার রিপোর্ট শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এইবার তৃতীয় পরীক্ষক আসিয়া তাঁহার রিপোর্ট লইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার মুখে একটি বিরক্তির ভাব দেখা গেল। তিনি স্থূলকায় বেঁটেখাটো লোক। প্রথম হইতেই তিনি একটির পর একটি যুক্তি দিয়া গবেষণা-পত্রটিকে বাতিল করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। গবেষক তাঁহার আসনে বসিয়া প্রশ্নগুলি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকগুলি প্রশ্ন করিবার পর তৃতীয় পরীক্ষক আসিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীমতী ভেরা নভিকোভা আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ইনি গবেষণাপত্রটি অনুমোদন করিতেছেন না। সুতরাং এখন ভোট গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ভোটগ্রহণ করিবার পূর্বে তৃতীয় পরীক্ষক যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছেন, গবেষককে তাহাদের উত্তর দিতে হইবে।

এইবার ডীন অধ্যাপক মিখাইল বাগালুবভ্ (তিনিই প্রকৃতপক্ষে সেই সভার সভাপতিত্ব করিতেছিলেন) দাঁড়াইয়া আর কাহারও কোন বক্তব্য আছে কিনা তাহা জানিতে চাহিলেন। আর কাহারও কোন বক্তব্য নাই জানিয়া এইবার তিনি গবেষককে তৃতীয় পরীক্ষকের প্রশ্নগুলির জবাব দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। গবেষক কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই জবাব দিলেন। কোনও প্রশ্নেরই জবাব শুনিয়া তৃতীয় পরীক্ষক সন্তুষ্ট হইলেন না। বরং গবেষকের জবাব দিবার মধ্যে মধ্যেই তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার প্রতিবাদের সুর একটু উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ দুইটি হাতও ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল। এমন কি, কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে যেন কাঠগড়ার দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বাগালুবভ্ হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন এবং নিজের আসনে বসিতে বাধ্য করিলেন। তথাপি তিনি আসনে বসিয়াও তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক বাগালুবভ্ তাঁহাকে শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তথাপি তিনি নিম্নস্বরে নিজের মনেই কি বকিয়া যাইতে লাগিলেন। গবেষক প্রশ্নগুলির জবাব দিবার পর যখন আসিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন, তখন তৃতীয় পরীক্ষক অগ্রসর হইয়া গিয়া কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতেই খুব উত্তপ্ত ভাষায় একবার পরীক্ষক দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া এবং আর একবার গবেষকের দিকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ তুলিয়া আবার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। তাঁহার সকল বক্তব্য শেষ করিয়া তিনি নিজে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

তিনজন পরীক্ষক যখন একমত হইলেন না, তখন এইবার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভোটগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ভোট হাত তুলিয়া নহে, গোপনীয়ভাবে ভোটপত্রের (ballot) সহায়তায় গ্রহণ করিবার আয়োজন করা হইল।

প্রত্যেকে এক একটি ভোটপত্র লইয়া তাহাতে 'yes' কিংবা 'no' লিখিয়া একটি বাক্সে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। মোট একত্রিশ জন ইহাতে অংশগ্রহণ করিলেন। তাহার পর ব্যালট বাক্স খুলিয়া দেখা গেল, একজন ব্যতীত বাকি ত্রিশজনই গবেষককে ডিগ্রী দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফল ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল শব্দে করতালি বাজিয়া উঠিল। কক্ষগৃহের বারান্দায় একটি ক্ষুদ্র জনতা অপেক্ষা করিতেছিল। ঘরের দরজা খুলিয়া দিবার

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই একজন মহিলা একতোড়া তাজা ফুল এবং কয়েকটি বই একটি প্যাকেটে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়া গবেষকের হাতে দিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। করতালি এবং হর্ষধ্বনিতে ক্ষুদ্র কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহার পর করমর্দনের পালা শুরু হইল। উপস্থিত সকলেই একে একে তাঁহার সঙ্গে করমর্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। আমিও উঠিয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে করমর্দন করিলাম সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল হর্ষধ্বনিতে কক্ষটি আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গবেষকের সঙ্গে আমি কোনও বাক্যবিনিময় করিতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু আমার মনে হইল, একজন বিশেষ অতিথি হিসাবে আমি তাঁহাকে সেদিন অভিনন্দিত করিবার জন্য তিনি যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। প্রায় সন্ধ্যা সাতটার সময় Review সভা ভঙ্গ হইল। আমি যখন বাহিরে আসিলাম তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, বাহিরে তখন বরফ পড়িতেছিল।

২৩শে মার্চ ১৯৬৬ সাল, সেদিন আমার 'বাংলার সর্পশ্রুতি' (Serpent lore of Bengal) বিষয়ে বক্তৃতা দিবার কথা। ইতিপূর্বেই রুশসাহিত্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Institute of Russian literature) পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটি যে একটি বিশাল প্রাসাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম 'পুস্কিন ভবন'। সেদিন বক্তৃতার সময় ছিল তিন ঘটিকা। সুতরাং স্থির করিলাম, বক্তৃতা দিবার পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া আসিব।

বেলা ১১টার সময় একজন দোভাষিণীর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। তারপর প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগ যথা আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য বিভাগ ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া যথাসময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম।

লেনিনগ্রাদের প্রাচ্যবিদ্যাভবনে ভারতীয় বিভাগটি পরিদর্শন করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল সেই বিভাগটিও পরিদর্শন করা হইল। সেখানকার মহাভারত অনুবাদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীকলিয়ানভ্ প্রতিদিনই আমার বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি আমাকে সেইখানে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তাঁহার বিভাগের সমস্ত গবেষকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সেইখানে কতকগুলি বাংলা পুঁথি সংগৃহীত দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা আমাকে দিয়া সেই পুঁথিগুলির কিছু কিছু বিবরণ লিখাইয়া লইলেন। তার পর যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিনকার নির্ধারিত বক্তৃতা দিলাম।

জাতিতত্ত্ব-গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার ভারতীয় বিভাগের গবেষক এম কে. কেদ্রিয়াভৎসেভ্ আমার বক্তৃতায় প্রত্যহ উপস্থিত থাকেন দেখিতে পাই। তিনি প্রথমদিনই আমার বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার সময় আমাকে তাঁহার সংগ্রহশালা দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। একদিন তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেইখানে এক জায়গায় ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত সামান্য কিছু উপকরণ সংরক্ষিত আছে দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশ হইতে সংগৃহীত একটি মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমা এবং কয়েকটি বৃষকাষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা আমার নিকট ইহাদের তাৎপর্য কি, তাহা জানিতে চাহিলেন। আমি যাহা বুঝাইয়া বলিলাম, তাহা তাঁহারা রুশভাষায় লিখিয়া লইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় শ্রীযুক্ত কেদ্রিয়াভৎসেভ্ এবং তাঁহার একজন সহকর্মিণী শ্রীমতী বার্থা তাঁহাদের রুশভাষায় রচিত কয়েকখানি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ (Reprint) আমাকে উপহার দিলেন।

সেই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত People of India নামক একটি বিরাট এবং বহুমূল্যবান গ্রন্থ আমাকে উপহার দেওয়া হইল।

Гость из Калькутты

НЕДАВНО преподаватели и студенты кафедры индийской филологии встречали долгожданного гостя — профессора Калькуттского университета Ашутоша Бхаттачария.

Автор ряда интересных работ по истории бенгальской литературы, участник многих этнографических экспедиций, профессор Бхаттачария недавно опубликовал сборник рассказов из жизни шахтеров и крестьян Индии.

На кафедре индийской филологии профессор А. Бхаттачария прочел цикл лекций о бенгальском фольклоре и драматургии.

26 марта профессор принял участие в городском индологическом семинаре. Он выступил с интересным сообщением, в котором коснулся вопроса происхождения бенгальской драмы и определил ее характерные черты. После доклада профессор прокомментировал сделанные им самим магнитофонные записи бенгальских народных песен.

Перед своим отъездом Ашутош Бхаттачария посетил индийский сектор Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР.

С большим интересом профессор ознакомился с богатой коллекцией манускриптов, хранящихся в рукописном отделе института, и оказал большую помощь сотрудникам индийского сектора в датировке нескольких бенгальских рукописей.

Е. БРОСАЛИНА,
секретарь кафедры индийской филологии

НА СНИМКЕ: профессор Калькуттского университета Ашутош Бхаттачария читает доклад о бенгальском фольклоре на кафедре индийской филологии.

Фото А. ЛУБЕГИНА

CENTRAL LIBRARY

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগটি পরিদর্শন করিবার জন্যও আমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলাম। শুনিলাম সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত তাঁহার স্বরচিত দুইখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে।

৩রা এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষ বক্তৃতার দিন সময় করিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইয়া বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন। সেখানে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজীতে স্বাক্ষরিত একখানি 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং আর একখানি 'রাধারাণী' উপন্যাস দেখিতে পাইলাম। রুশদেশে ভারতবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইভান নিনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র বই দুইখানি উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহাতে উপহার-প্রাপকের কোনও নাম লেখা ছিল না।

ভারতবিদ্যা বিভাগের পুঁথিশালাটি (Manuscript Section)ও পরিদর্শন করিলাম। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণের (preservation) যে ব্যবস্থা সেখানে দেখা গেল, তাহা আমাদের দেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি বিভাগেই অনুসরণ করা হয় না। অথচ পুঁথি সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদেরই সব চাইতে বেশি।

লেনিনগ্রাদ অবস্থানকালে দুইটি তরুণী আমাকে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করিতেন। একজনের নাম এলেনা রেসেলিনা, সংক্ষেপে লীনা বলিয়া পরিচিতা, আর একজনের নাম টি. খেতোভিচোভা; ডাক নাম ইরা। উভয়েই চমৎকার বাংলা জানিতেন। একজন রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' এবং আর একজন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুর্বোধ্য বাংলা শব্দগুলি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভেই আমি লেনিনগ্রাদ পরিত্যাগ করিলাম। সেখানকার 'লেনিনগ্রাড ইউনিভার্সিটি' পত্রিকায় রুশভাষায় আমার সম্পর্কে যে সচিত্র বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

কলিকাতার অতিথি

কয়েকদিন আগে ভারতীয় ভাষাশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীগণ বহুদিনের প্রত্যাশিত অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা, তদুপরি তিনি কয়েকটি জাতিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ববিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক ভট্টাচার্য কয়লাখাদের শ্রমিক এবং ভারতীয় কৃষক-জীবন ভিত্তি করিয়া একখানি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাশিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলার লোক-শ্রুতি ও নাটক সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২৬শে মার্চ তারিখে অধ্যাপক ভট্টাচার্য এই শহরের ভারতবিদ্যা বিভাগের এক আলোচনা সভায় (Seminar) অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাহাতে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলা নাটকের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর তিনি তাঁহার টেপ রেকর্ডে গৃহীত কতকগুলি বাংলার লোকসঙ্গীত বাজাইয়া শোনান এবং তাহাদের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। যাইবার আগে তিনি গভীর আগ্রহ লইয়া সোভিয়েত যুক্ত সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের অন্তর্ভুক্ত লেনিনগ্রাদে অবস্থিত প্রাচ্য বিদ্যাভবন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে প্রাচীন যে পুঁথির বিরাট সংগ্রহ

CENTRAL LIBRARY

আছে, তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি সেখানে সংরক্ষিত কয়েকটি পুঁথির পরিচয় বলিয়া দিয়া সেখানকার গবেষকদের প্রভূত উপকার সাধন করেন।

লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটি
১০ই এপ্রিল, ১৯৬৪

বিবরণ প্রদানকারিণী
ই. ব্রেসেলিনা
ভারতীয় ভাষাবিভাগের সম্পাদিকা।

চিত্রে : ভারতীয় ভাষাবিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকশ্রুতি (folklore) বিষয়ে ভাষণ দিতেছেন।

আলোকচিত্র : এ. লুবেজিন।

চেকোশ্লোভাকিয়া

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডুসান জাভিতেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতন এবং কলিকাতায় আসিয়া বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। তাহার পর 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উৎপত্তিস্থল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত মৈমনসিংহ জিলার পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামগুলিতে প্রায় দেড়বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি 'Bengali Folk-ballads from Mymensingh and the Problem of their Authenticity' নামক পুস্তক রচনা করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিলে ১৯৬১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরম আগ্রহের সঙ্গে বইখানি প্রকাশ করেন। এই বইখানির নিরপেক্ষ আলোচনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সম্পর্কে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উপর তিনটি বক্তৃতা দেন। তাঁহারই যত্ন এবং প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সনে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠান আমাকে চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়া ভারতীয় লোকসাহিত্য সম্পর্কে দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য এই আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন—

Dear Professor,

Oriental Institute of the Czechoslav Academy of Sciences, Prague, has the pleasure to invite you to spend a week in Prague during your return journey from U. S. S. R. in March 1964 and to deliver two lectures about Indian folk literature in our Institute. Naturally we shall be glad to pay the usual fee for your lectures. Their subject will be specified by Dr. D. Zbavitel in a separate letter.

To avoid any difficulties, we beg you to contact our Consulate General in Calcutta and apply for the Visa as soon as possible.

Sincerly Yours
Sd/A. Palat
Vice—Director'

CENTRAL LIBRARY

প্রধানতঃ ডঃ ডুসান জাবিতেলের উৎসাহে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধি পায়, কিছুদিন পর তাঁহার একটি ছাত্রীও বাংলা লোক-সাহিত্য এবং লোকসঙ্গীত অনুশীলন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১৯৬৩ সালে ১৩ই নভেম্বর মার্কিন দেশের ব্লুমিংটনের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত Folklore Institute-এর Chairman আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকশ্রুতিবিদ অধ্যাপক রিচার্ড এম. ডরসন (M. Dorson) এক পত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার নূতন প্রতিষ্ঠিত Society for Asian Folklore-এর কার্যকরী সমিতির অন্যতম ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করেন। তারপর ১৯৬৬ সনে এই সমিতি যখন পুনর্গঠিত হয়, তখনও আমি তাহার সদস্য পুনর্নির্বাচিত হই। আজ পর্যন্ত আমি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সদস্য রহিয়াছি।

এই সোসাইটির পক্ষ হইতে ১৯৬৬ সালের ২১শে জুন হইতে ২৫শে জুন পর্যন্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আমাকে যথারীতি আমন্ত্রণ জানানো হয়। শুধু তাহাই নহে, আমি যাহাতে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে পারি, সেইজন্য আমার যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিম্নলিখিত পত্রটিও প্রেরণ করেন—

Society for Asian Folklore

February 17, 1966

To The Ministers and Departments Concerned.

Dear Sirs,

This is to inform you that Dr Asutosh Bhattacharya has been invited to participate in the Asian Folklore Conference to be held at Indiana University, Bloomington, Indiana, U. S. A. June 21—5. 1966, under the sponsorship of the Society for Asian Folklore, and the Folklore Institute of Indiana University.

Dr Bhattacharya has been requested to read a paper on an aspect of Indian Folklore of his choice, and to participate in panel discussions on The Asian Folklorist and Western Scholarship' and 'Folk Religion in India and Pakistan.'

If you have available funds, we should very much appreciate your considering the possibility of granting a travel allowance to facilitate Dr. Bhattacharya's attendance at Conference.

This is the first general conference on Asian folklore to be held in the United States. The Conference is being organised to promote co-operation between Western and Asian folklorists. We are inviting folklorists from all the Asian countries in which folklore is recognized to be an important field of national interest. As one of the leading folklorists of India, Dr Bhattacharya's participation will make a valuable contribution to the success of the Conference. Any assistance you may be able to provide will do much to promote understanding of Indian folklore and culture among the peoples of both East and West.

Yours Sincerely

Sd/-Robert J. Adams

Society for Asian Folkore

Executive Assitant.

CENTRAL LIBRARY

SOCIETY FOR ASIAN FOLKLORE

EXECUTIVE BOARD

INDIA

Asutosh Bhattacharyya
Calcutta University
Calcutta

Kanjabihari Das
Ravenshaw College
Orissa

Prabhudatta Dhawan
Gauhati University
Assam

Kalikpadma Upadhyaya
Allahabad, U.P.

JAPAN

Ichiro Hori
University of Tokyo
Tokyo

Tsuki Makoto
Tokyo Metropolitan University
Tokyo

Takehiko Ono
Keio University
Tokyo

Kogo Noma
Kyoto Shimbunsha, Shinpoto
Tokyo

KOREA

Seung Chul
Yonsei College
Seoul

PAKISTAN

Mahmud Husain
Karachi University
Karachi

PHILIPPINES

E. Arsenio Manuel
University of the Philippines
Quezon City

UNITED STATES

Wolfram Eberhard
University of California
Berkeley, California

Edwin C. Kirkland
University of Florida
Gainesville, Florida

Chairman ex-officio
Richard M. Dorson
Executive Secretary
Robert J. Adams
Indiana University
Folklore Institute, 504 E. 6th St.
Bloomington, Indiana

ASIAN FOLKLORE STUDIES

EDITOR

Matthias Eder
St. Albert Home, Musashino-shi
Kichijoji 303, Tokyo, Japan

February 17, 1966

Dr. Asutosh Bhattacharyya
Bengali Department
University of Calcutta
Calcutta 12, India

Dear Dr. Bhattacharyya:

Thank you very much for your recent letter accepting our invitation to the Asian Folklore Conference to be held at Indiana University on June 21-25, under the sponsorship of the Society forAsian Folklore and the Folklore Institute.

I have written to Mr. A. A. Ghosh, Secretary, Ministry of Education, New Delhi, advising him that we are inviting you and other Indian folklorists to the conference. I am asking him to do whatever he can in helping to arrange for travel grants. You may know of other agencies or ministeries who might be interested in considering awarding travel allowances. For this purpose, I am enclosing four copies of a statement showing that you have been invited to the conference and requesting that assistance be given in receiving a travel grant.

We hope very much that you will be able to get a travel allowance from some sources, and that you will find it possible to participate in the conference. May I point out that the Reports on Research in Progress in Asian Folklore (Section C of the Tentative Program) is designed to encourage on other topics than the ones mentioned there, since doctoral candidates now at the Folklore Institute will be reporting on these topics. We would like to ask you to choose a topic connected with your interests, but it need not be closely related to the ones given here, although it may be. Please feel free to choose anything from your own research.

We hope that yourefforts to attend the conference will be successful. Please let us know how things progress, and should there be anything we can do to help, please let us know.

Yours sincerely,

Robert J. Adams
Executive Assistant

RJA:s
Encl.

CENTRAL LIBRARY

১৯৬৯ সালে ব্লুমিংটনের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সোসাইটি (Society for Asian Folklore) কর্তৃক East West নামে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে আমাকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে আমার রচিত 'Britishers in the folklore of Bengal' নামক আলোচনাটি পঠিত এবং আলোচিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র বর্তমান লেখকের প্রবন্ধটি প্রকৃত প্রসঙ্গ অনুযায়ী রচিত হইয়াছিল বলিয়া আলোচনা-চক্রের সরকারী কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

মার্কিন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতে আসিয়া বর্তমান লেখকের অধীনে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সম্প্রতি ডঃ একস অস্টর (Dr. Akos Ostor) নামক একজন ছাত্র বাংলাদেশের গাজন সম্পর্কে এবং তাঁহার স্ত্রী বাংলার মেয়েলী ব্রত সম্পর্কে গবেষণা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে যাঁহারা গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সাহিত্য তাঁহাদেরও বিষয় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডেভিড ডেরিয়ন গঙ্গানদীর লোকশ্রুতি (Folklore on the Ganga) সম্পর্কে গবেষণায় বর্তমান লেখকের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশীয় যে সকল গবেষক জাতীয় আকাদেমির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁহাদিগকেও বর্তমান লেখককে সাহায্য করিবার জন্য বলা হয়। সম্প্রতি মার্কিন অধ্যাপক মেল হেল্‌স্টিয়েন ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির সম্পাদক নিম্নলিখিত পত্রখানি বর্তমান লেখকের নিকট প্রেরণ করেন—

D. O. No. 31—2 (1)/73/9240 November 26th 1973.

Dear Friend,

Prof. Mel Helstien, Professor and the Chairman of the Department of Theatre Arts, University of California, U. S. A. is currently visiting our country to study the traditional puppet theatre of India. Prof. Helstien is a great authority on this subject and also deeply interested in Indian traditional puppet theatre. He will be visiting various regions to see the performances, meet the experts and learn techniques of manipulations and performances. I have planned his programme and given him suitable contacts.

I am writing to you to request to kindly give possible help and guidance to Prof. Helstien in his study project. He will be directly writing to you, seeking your advice to finalise his programme of visit to your region.

With kind regards,

Yours Sincerely

Sd/ Suresh Awasthi

Secretary.

Dr. Asutosh Bhattacharya

CENTRAL LIBRARY

জাপান

১৯৬৬ সালের মে মাসে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিভাগে বাংলার লোকশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য আমি এই আমন্ত্রণ লাভ করি ;—

University of Tokyo
Department of Cultural Anthropology
Bunka Jinruigaku kenkyushitsu
Akamon—iru, Motofuji-cho, Bunkyo-ku
Tokyo, Japan.

May 23, 1966

Dear Dr Bhattacharya,

On behalf of Professor S. Izumi, the Chairman of our Department, who is currently in Andes Expedition, I have a pleasure to invite you to our Department asking for series of lectures on Bengalee Folklore.

I understand that you are going to attend the Asian Folklore Conference at Bloomington, U. S. A. June 21—26. If you could accept our invitation on your way to U. S and spare a couple of days for us, we would be delighted.

With best wishes.

Yours Sincerely
Sd/ Chie Nakane
Associate Professor.

ইন্দোনেশিয়া—জাভাদ্বীপ

১৯৭১ সালে জুন মাসে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় হইতে এই পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে ১৯৭১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ায় যে আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হইবে, ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আমাকে তাহাতে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

*Dr. (Smt.) K. Vatsyayan,
Dy. Educational Adviser

D. O. No. F. 11-32/ 9-CII (2)
Ministry of Education
& Social Welfare
India
New Delhi
July 2, 1971

Dear Dr Bhattacharyya,

You may be aware that the First International Ramayana Festival is being held by Indonesia from 29th August, 1971, to 9th September, 1971, in collaboration with UNESCO. On this occassion a Seminar on Ramayana is also being convened from 1st to 4th September, 1971. In the Seminar Section there will be two sub-sections both being held simultaneously,

CENTRAL LIBRARY

in the mornings and afternoons leaving the evenings free for delegates to attend the Festival performances. The details of the Seminar on the two topics namely, 'Dissemination of Traditional Culture of South-East Asia through mass-dedia' and 'The Artistic Performance of the Ramayana' are given in the notes enclosed.

I have great pleasure in requesting you on behalf of the Government of India to participate in this Seminar. The papers for the Seminar are expected by the Indonesian Govt. well in advance as they have to be translated, printed and circulated to all the participants ahead of the Seminar. Could you let me know which of the two subjects you would be interested in submitting a paper. The text of the paper should reach us by 10th July latest.

Indonesia has indicated that the participants will read only summaries of their papers, leaving the maximum time for discussions and intellectual exchange.

In connection with your participation on the Seminar the Government of India will bear the expenditure on the return economy air fare India-Djakarta-India. While in Indonesia you will be the guest of the Indonesian Government who will bear all expenditure on local hospitality.

I shall be grateful if you can kindly confirm immediately that this invitation is acceptable to you and that you are free to attend the Seminar.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd/- Kapila Vatsyayan

আলোচনাচক্রে দুইটি বিষয় নির্ধারিত হইয়াছিল। প্রথম বিষয়টি—'Dissemination of traditional Culture of South-East Asia through mass-media' এবং দ্বিতীয় বিষয়টি—'The Artistic Performance of the Ramayana'. এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে আলোচনার জন্য আমাকে একটি বিষয় নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। আমি দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ The Artistic Performance of the Ramayana বিষয়টি নির্বাচন করিয়া লইলাম। ভারতবর্ষ হইতে আর একজন মাত্র পণ্ডিত ব্যক্তি এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর ডঃ লোকেশচন্দ্র। শুনিলাম, তিনি প্রথম বিষয়টি আলোচনার জন্য স্থির করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিষয়টি নির্বাচিত করা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

রামায়ণ বিষয়ে এই প্রকার আন্তর্জাতিক উৎসব এবং আলোচনাচক্র এই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সরকারের সঙ্গে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক বিভাগের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কেবলমাত্র পৃথিবীর যে সব দেশে রামায়ণের কাহিনী জনসাধারণের জীবনের মধ্যে সক্রিয় প্রভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল—জাতির সাহিত্যে, শিল্পে, সামাজিক প্রথায়, আচারে ব্যবহারে যাহাদের মধ্যে এখনও নানাভাবে রামায়ণের ধ্যান-ধারণা এবং আদর্শ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে, সেইসব দেশই এই আন্তর্জাতিক উৎসব এবং আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিল। দেশগুলির নাম ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, সিংহল, ভারতবর্ষ, লাওস, মালয়েশিয়া, নেপাল, থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনস্। এইসব দেশই উৎসব এবং আলোচনা-চক্রে যোগদান

CENTRAL LIBRARY

করিবার অধিকারী ছিল ; তাহা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশেরই প্রতিনিধি তাহাতে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনও দেশ যদি রামায়ণ বিষয়ক শিল্পে বিশেষতঃ নৃত্যে এবং নাট্যে দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, তাহাদেরও এই উৎসব এবং আলোচনা-চক্রে যোগদান করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

আমি আমার আলোচ্য বিষয়রূপে ভারতীয় ছৌ-নৃত্যে রামায়ণ (The Ramayana in Indian Chhau Dance) বিষয়টি নির্বাচিত করিয়া লইলাম। কারণ, কিছুকাল যাবতই পুরুলিয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছৌ নৃত্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছিলাম এবং তাহার ফলে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে সেই অঞ্চলের নিরক্ষর আদিবাসী এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে ছৌ নৃত্যনাট্যের ভিতর দিয়া আনুপূর্বিক রামায়ণের কাহিনী প্রচারিত হইতেছিল। তাহা জনসাধারণের মধ্যে এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া রামায়ণের কাহিনী যে আপামর জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে এত ব্যাপক প্রচারলাভ করিয়াছে, এইখানে সেই রহস্যের কতকটা সন্ধান পাইলাম। এই বিষয়ে আমি নৃত্যের কিছু আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং বাদ্যেরও টেপ-রেকর্ড গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে নানাপ্রবন্ধ আমার নানা ইংরেজি এবং বাংলা কাগজে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বিষয়টি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ছিল বলিয়া এই বিষয়ে আমি কিছু বলিবার বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই 'The Ramayana in Indian Chhau Dance' নামক একটি সচিত্র পুস্তিকা কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অভিজাত মুদ্রাযন্ত্রে সুদৃশ্যভাবে মুদ্রিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আলোচনা-চক্রে যে দুইটি বিষয় নির্বাচিত হইয়াছিল, এই বিষয়টি তাহাদের একটির সম্পূর্ণ উপযোগী হইল। উৎসব কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি আমার মুদ্রিত গ্রন্থখানি পূর্বেই তাঁহাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিলাম।

আমি ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ব্যাংকক এবং সিঙ্গাপুর হইয়া পরের দিনই ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা (পূর্ব নাম বাটাভিয়া) পৌঁছিলাম। আমার পূর্বে ধারণা ছিল যে, উৎসবটি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু সেইখানে যাইয়া জানিতে পারিলাম, তাহা সেখানকার পরিবর্তে পূর্ব জাভার রাজধানী সুরাবই-এর পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পাণ্ডান নামক একটি স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। কারণ, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় পাণ্ডানেই বৃহত্তম উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল এবং এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান সেইখান ব্যতীত অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হইবার মত স্থান ছিল না।

অগত্যা জাকার্তা হইতে প্লেনে করিয়া সুরাবই-এ পৌঁছান গেল। সুরাবই বিমানবন্দর হইতে সরকারী অভ্যর্থনায় পাণ্ডানের নিকটবর্তী ত্রেতেস নামক একটি শৈলনগরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সমতলভূমিতে তখন সম্ভবতঃ তাপমাত্রা ১২০° কিন্তু ত্রেতেস শৈলনগরে ইহার মাত্রা ৩০° ডিগ্রীর অধিক হইবে না। সেইজন্য যাঁহারা বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন দেশ হইতে অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ত্রেতেস্ শৈলনগরের বিভিন্ন প্রথমশ্রেণীর হোটেলে বাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি যে হোটেলটিতে স্থানলাভ করিয়াছিলাম, তাহাই ছিল সর্বাপেক্ষা মনোরম এবং সর্বোচ্চ শৈলশিখরে অবস্থিত। ওঠা নামায় কষ্ট হইত, কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ সকল কষ্ট দূর করিয়া দিত। হোটেলের নাম 'হোটেল দীঘাদু'। এই কথা হয়ত অনেকেই জানেন যে ইন্দোনেশিয়ায় আজও সমগ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নামই সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়।

৩১শে আগষ্ট ১৯৭১ সন পূর্ব জাভার অন্তর্গত পাণ্ডান নামক একটি ক্ষুদ্র সহরে প্রতিষ্ঠিত ইন্দোনেশিয়ার

CENTRAL LIBRARY

বৃহত্তম উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জেনারেল সুহর্তো রামায়ণ উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের কথা উল্লেখ করিয়া এই সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া যে এক সংস্কৃতির ঐক্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া পরস্পর আরও নিকটবর্তী হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই যে এই আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাও ঘোষণা করিলেন। সেই উদ্বোধন সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি সহ প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চ বা amphitheatre-এর অনুকরণে পাহাড়ের ঢালুতে নির্মিত বসিবার আসনে প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শকেরই বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার পর হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত সেই মুক্তাঙ্গনে প্রতিরাত্রেই দুইটি করিয়া দেশের রামায়ণ নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক দেশ হইতেই একটি করিয়া নৃত্যের দল আসিয়াছিল, কেবলমাত্র ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ বলিয়া তাহা হইতে দুইটি দল গিয়াছিল—একটি গোয়ালিয়রের রঙ্গশ্রী লিট্‌ল্ ব্যালে সম্প্রদায় (Rangasree Little Ballet Troupe) এবং আর একটি কেরলের নাট্যসঙ্গম্ (P. S. V. Natya Sangam); একটি রামায়ণের পুতুল নাচ প্রদর্শন করিয়াছিল, আর একটি কথাকলি ও ময়ূরভঞ্জের ছৌনৃত্যের কয়েকটি রামায়ণের দৃশ্যের অভিনয় করিয়াছিল।

১লা সেপ্টেম্বর সকালেই পাণ্ডানেরই একটি সভাকক্ষে আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন হয়। তারপর হইতে প্রতিদিন সকাল এবং দুপুরে আলোচনা-চক্রের প্রতি বিষয়ের দুইটি করিয়া অধিবেশন হইতে লাগিল। রাত্রে কোনও অধিবেশনের ব্যবস্থা রাখা হইল না, সেই সময় প্রতিনিধিদিগকে রামায়ণ উৎসবে যোগদান করিবার সুযোগ দেওয়া হইল।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমহাশূরী আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করিতে গিয়া ইংরেজিতে এক লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন,

'We are all aware of the existence of linkages between the cultural concepts of countries in Asia, particularly in South East Asia; the Ramayana epic appears to be one of the linkages. This makes us conscious of the need to pay more attention to traditional art of Asia, particularly in the South East Asian countries, and to promote them through scientific research.'

স্বাগত এবং উদ্বোধন ভাষণের পর প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। তারপর সেই দিনই তিনটার সময় আলোচনা-চক্রের প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার জন্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। ত্রেতেস হইতে পাণ্ডান ছয় মাইল পথ, পাহাড়ের উপর চড়াই ও ওতরাই বাহিয়া যাতায়াত করিতে হয়। প্রতিনিধিদিগের খাওয়া দাওয়ার জন্য ত্রেতেস যাইতে হয়, সুতরাং তাহাদের সুবিধার জন্য আলোচনা-চক্রের পরবর্তী অধিবেশনগুলি ত্রেতেসের একটি বড় হোটেলের প্রশস্ত হলঘরে অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল বিকাল আলোচনা-চক্রের অধিবেশনে যোগদান করিবার পর সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া নৃত্যানুষ্ঠান দেখিবার জন্য দিনে একবার মাত্র পাণ্ডান যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইল।

প্রত্যেক দেশের পক্ষ হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধি আলোচনা-চক্রে যোগদান করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ বলিয়া তাহাকে দুইজন প্রতিনিধি পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি প্রবন্ধই তাহাতে পাঠ এবং আলোচনার জন্য গৃহীত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমার প্রবন্ধ The Ramayana in Indian Chhau Dance পাঠ এবং আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট ছিল।

CENTRAL LIBRARY

আগেই বলিয়াছি, আমার প্রবন্ধটি আমি নিজ ব্যয়ে কলিকাতার একটি অভিজাত মুদ্রাযন্ত্রে নানা রঙিন এবং সাদা-কালো পূর্ণপৃষ্ঠা ছবিসহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহার অনেকগুলি সংখ্যা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, এই শ্রেণীর অনেক নিকৃষ্ট ছাপা কিছু কিছু বই খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমার হাতে আমার কয়েকটি বই দেখিয়া কয়েকজন বিদেশী এই বই কোথায় কতমূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম, এই বই যথাসময়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। বিনামূল্যে শুনিয়া তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিল। অন্ততঃ দুই ডলার ইহার মূল্য হইতে পারিত।

আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার প্রবন্ধটি পাঠ করিবার সময় উপস্থিত শ্রোতাদিগের মধ্যে আমার বইটি বিনামূল্যেই বিতরণ করিব।

প্রথম দিন হইতেই কয়েকটি খুব মূল্যবান প্রবন্ধ আলোচনাচক্রে পাঠ করা হইতে লাগিল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পাঠ হইবার পরই প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী ইহার সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে। এই আলোচনায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণই অংশগ্রহণ করেন। কেহ ফরাসী ভাষায়, কেহ ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। তবে ইংরেজী বক্তার সংখ্যাই বেশী।

মালয়েশিয়ার একজন অধ্যাপক আমিন সুইনি (Amin Sweeny) মালয়ের 'ছায়া নাটক' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আলোচনা-চক্রে প্রবন্ধ পাঠের উদ্বোধন করিলেন। তাহার বক্তব্যের মধ্যে একথাও বলিলেন যে মালয় দেশের ছায়ানাটক ভারতীয় সংস্কৃতির দান। কিন্তু সেখানে গিয়া তাহা একটি স্থানীয় রূপলাভ করিয়াছে। রামায়ণের বিষয়বস্তুটি সেখানে ছায়া-নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। আঞ্চলিক বহু কাহিনী ইহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রবন্ধটির ভিতর হইতে মালয়েশিয়ায় এখন পর্যন্ত যে নিতান্ত নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব রহিয়াছে, তাহা অনুভব করা গেল। অথচ একথা সকলেরই জানা আছে যে, মালয়দেশের শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী এখনও মুসলমান। প্রবন্ধের মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল যে, রামায়ণ কাহিনীর রামচরিত্রের পরিবর্তে মালয়েশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে রাবণ চরিত্রকেই রামায়ণের নায়করূপে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বলিয়াছিলেন—I despise Rama and his followers, but Ravana is a grand man', মালয়েশিয়ার রামায়ণ কাহিনীতে রাবণের সেই রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও রামায়ণ কাহিনীর উপর মালয়েশিয়ার রামায়ণ কাহিনীর যে প্রভাব আছে, তাহা উক্ত প্রবন্ধটি হইতে বুঝিতে পারা গেল।

ইন্দোনেশিয়ার একজন অধ্যাপক শ্রীসুদর্শন 'Rama, the ideal hero and manifestation of the good in the Indonesian theater' নামক একটি অত্যন্ত উপভোগ্য প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার ভিতর হইতে ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে রামায়ণের অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাবের বিষয় অনুভব করা গেল। খৃস্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নৃত্যনাট্য, ছায়ানাট্য ইত্যাদি রচিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহার প্রভাব জাতির সুগভীর স্তর পর্যন্ত গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ইতিহাসের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও অধ্যাপক শ্রীসুদর্শন অনুভব করিয়াছেন যে আজ পর্যন্ত 'The Indonesian puppet play and dance drama, consider Rama to be an incarnation of Vishnu, he is depicted as more human than godlike'।

রামায়ণের বিষয় অবলম্বন করিয়া ইন্দোনেশিয়ায় ছায়ানাটক, মুখোস নৃত্যনাট্য, গল্পনাটক, গীতাভিনয়

CENTRAL LIBRARY

বা অপেরা, মূকাভিনয়, মূক নৃত্যাভিনয়, মূক মুখোস নৃত্যাভিনয়, এমন কি, আধুনিক নাটক পর্যন্ত রচিত হইতেছে।

এইভাবে প্রত্যেক বেলায় একটি করিয়া প্রতিদিন দুইটি দেশের প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হইতে লাগিল। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১, ২টা হইতে ৫টার অধিবেশনে ত্রেতেসের 'তাঙ্গুং' হোটেলের সভাগৃহে ভারতবর্ষের একমাত্র আলোচনার বিষয় হিসাবে আমার 'The Ramayana in Indian Chhau dance' প্রবন্ধটি পঠিত এবং আলোচিত হইবার জন্য স্থির হইল। আমি আমার মুদ্রিত প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পরিবর্তে মৌখিকভাবে এই বিষয়ে কিছু বলিলাম; তার পর magic lantern এর সাহায্যে এই বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশটি রঙিন চিত্র পরিবেশন করিলাম। তারপর পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের পটভূমিকায় যে বাদ্যভাণ্ড বাজানো হইয়া থাকে, তাহা টেপ রেকর্ড হইতে বাজাইয়া শুনাইলাম। তাহার পূর্বেই আমার মুদ্রিত পুস্তিকাটি সমবেত দর্শকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। সুতরাং শ্রোতাদিগের পক্ষে এই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সুবিধা হইল। মালয়েশিয়ার একজন অধ্যাপক এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বাদ্যের আঙ্গিক সম্পর্কে কয়েকজন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এই বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল তাহা তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। আমার বক্তৃতার ভিতর দিয়া এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে পুরুলিয়ার ছৌ নামক মুখোসনৃত্যের সঙ্গে কোন না কোন দিক দিয়া কেরলের কথাকলি, সিংহলের কাণ্ডি, ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ, এমন কি, জাপানের কাবুকি নৃত্যেরও একটা সম্পর্ক আছে। বালিদ্বীপের রূপ নৃত্যে নৃত্যশিল্পীরা যে পোষাক (costume) ব্যবহার করিয়া থাকে, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যশিল্পীরাও অবিকল সেই পোষাকই ব্যবহার করে। চিত্রের সাহায্যে তাহা আমি বুঝাইয়া দিলাম। এই বিস্তৃত ভৌগোলিক ব্যবধানের মধ্যেও এই সাংস্কৃতিক ঐক্য সকলেরই ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিল। এই বিষয়েও অনেকে আমাকে কিছু কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিলেন।

থাইল্যাণ্ডের আলোচনা-চক্রের একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। প্রবন্ধটির লেখক থাইল্যাণ্ডের রাজকুমার ধনীনিবত। প্রবন্ধের বিষয় থাইল্যাণ্ডের রামকাহিনী। ইহার মধ্যে থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধপ্রভাব সত্ত্বেও রামায়ণের কাহিনী যে কি ভাবে সেখানে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার অত্যন্ত মনোজ্ঞ বর্ণনা ছিল।

আলোচনাচক্রে 'ব্রহ্মদেশে রামায়ণ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। লেখকের নাম উ থিন হান (U Thein Han)। সকলেই জানেন যে ব্রহ্মদেশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাহাতে হিন্দুদেবতা বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী যে কি রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা এই প্রবন্ধে লক্ষ্য করা গেল। লেখক এই কথা বলিলেন যে ব্রহ্মদেশে, বাংলাদেশের রামযাত্রার মত রামযাত্রা প্রচলিত ছিল। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী সেখানে প্রচলন ছিল। এমন কি, কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও কাহিনী সেখানে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ পূর্ববাংলার সঙ্গে সমুদ্রপথে সংযুক্ত এবং চট্টগ্রাম হইতে আরাকান পর্যন্ত সমুদ্রপথে সর্বদাই জনসাধারণের যাতায়াত হইয়াছে, এইসূত্রে বাংলাদেশ হইতে রামায়ণের কাহিনী নানাভাবে সেইখানে গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধপ্রভাবশতঃই রামায়ণ সেখানে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি লেখক স্বীকার করিয়াছেন—

'It is not only a literary treasure but also a source of ennobling influences on the relationships of men as parents and children, husbands and wives, brothers and sisters

CENTRAL LIBRARY

relations and friends, teachers and pupils and rulers and the ruled. Its influence further inspires and permeates Burmese dramatic performances and other arts and crafts.'

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাণ্ডান এবং ত্রেতেসে রামায়ণ উৎসব এবং আলোচনা-চক্রের সমাপ্তি হইল এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য বড় বড় শহরে এই উৎসব স্থানান্তরিত হইয়া গেল। তবে আলোচনা-চক্র এইখানেই শেষ হইল। আলোচনা-চক্রের অধিবেশনে যোগদানকারী দেশগুলিকে ইন্দোনেশিয়ার কতকগুলি জাতীয় প্রতীক চিহ্ন উপহার দেওয়া হয়। আলোচনা-চক্রে শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারী রূপে আমাকেও একটি উপহার দেওয়া হইল।

ইন্দোনেশিয়া—বালিদ্বীপ

বালিদ্বীপ হইতে রামায়ণ-নৃত্যের একটি সরকারী দল পাণ্ডানে আসিয়াছিল, তাহার অধিনায়ক ছিলেন ডঃ পল্লী। তিনি বালি গভর্ণমেণ্ট নৃত্য একাডেমীর সম্পাদক। তাঁহার সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাকে বালিদ্বীপে গিয়া তাঁহার নৃত্য একাডেমী পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। আমি সানন্দে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বালিদ্বীপ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কি ভাবে সেখানে যাইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সুরাবই হইতে বালিদ্বীপের প্রধান শহর দেনপাসারে যাইবার জন্য সপ্তাহে মাত্র একবার বিমান যোগাযোগ আছে। বহুদিন পূর্বে ব্যবস্থা না করিলে বিমানে আসন পাওয়া কঠিন। সেখানে কোনো ট্রেনের যোগাযোগ নাই। বিশেষতঃ বালিদ্বীপে যাইতে হইলে সমুদ্রপথে অন্ততঃ ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। বালিদ্বীপে যাইবার অন্যতম উপায় স্থলপথে একমাত্র বাস, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। লঞ্চে করিয়া যাত্রীশুদ্ধ বাস সমুদ্র পারাপার করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ব জাভা দ্বীপের রাজধানী সুরাবই হইতে যে বাস বালিদ্বীপের দেনপাসারে যায়, তাহা পৌঁছিতে প্রায় ১৪ ঘণ্টা সময় লাগে। যদিও দিনে এবং রাত্রে দুই সময়ই বাস পাওয়া যায়, তথাপি দিনের প্রচণ্ড রৌদ্রে সেই বাসযাত্রা দুঃসাধ্য বলিয়া আমি রাত্রের বাসে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় একদিন বাসে করিয়া জাভাদ্বীপের সুরবই হইতে বালিদ্বীপের দেনপাসার যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে পরিচিত কেহই ছিল না। বাসে মোট ১৮ জন যাত্রী। তাহাদের মধ্যে ৩।৪ জন মার্কিন দেশীয়, ২।৩ জন চীনদেশীয়, ২।৩ জন বোধহয় জাপানী এবং অবশিষ্ট ইন্দোনেশীয়।

সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। সুরাবইর শহর ছাড়াইয়া গ্রাম, গঞ্জ, মাঠ, বন, পাহাড় দুই পাশে রাখিয়া বাস ছুটিয়া চলিল। সব কিছুর উপর দিয়া জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে। পরের দিন সকাল প্রায় ৯টার সময় দেনপাসারে পৌঁছিলাম। রাত্রি ২॥ টার সময় আমাদের বাসটিকে সমুদ্র পার করিয়া জাভাদ্বীপ হইতে বালিদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

বালিদ্বীপে আসিয়া প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম, ভারতের অতীত ইতিহাসের হিন্দু যুগের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। কিছুক্ষণ যাবৎ সমুদ্র তীরবর্তী অরণ্য এবং পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আসিয়া যখন লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখনই দেখিলাম, চারিদিকে মন্দির ছাড়া আর কিছু নাই, প্রত্যেক গৃহেই এক একটি কিংবা একাধিক মন্দির। মন্দিরগুলি যে আকারে খুব বড়, তাহা নহে, বাসগৃহের মতই ইহাদের আয়তন, কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা চূড়াগুলির মধ্যেই মন্দিরের বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যায়। পথের পার্শ্বে যেখানে সেখানে, বিশেষ করিয়া পথের চৌমাথায় কোথাও পাথরে তৈরী বৃহৎ গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্তি, কোথাও অগস্ত্যের মূর্তি,

CENTRAL LIBRARY

কোথাও বীণাবাদক নারদের মূর্তি, কোথাও বা গণেশ মূর্তি ; তাহা ছাড়া আর বিশেষ কাহারও কোনও মূর্তি নাই। প্রস্তরমূর্তি সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা এই যে, ইহা অন্ততঃ হাজার বছরের প্রাচীন হইবে, কিন্তু বালিদ্বীপে এখনও যে সকল নূতন নূতন পথ কিংবা উদ্যান (park) নির্মিত হইতেছে, তাহাতেও নূতন নূতন তৈরী হিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন মূর্তি এই ভাবে স্থাপন করা হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র যেমন মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় গুরুদ্বারায় আখ্‌ড়ায় মিলিয়া উপাসনার স্থান রূপে একটি মিশ্র স্থাপত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, কিংবা কোনও বিশেষ সহরে যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির এই শ্রেণীর ধর্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে তাহা নাই—একমাত্র হিন্দুধর্মেরই সেখানে অবিমিশ্র রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়। কারণ, বালিদ্বীপে এক কোটি হিন্দু ব্যতীত আর কোন অধিবাসী নাই। সেইজন্য সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট রূপ সেখানে সুস্পষ্ট হইয়া আছে এবং তাহা হিন্দু সংস্কৃতি।

মন্দিরগুলি সকলই কাঠে তৈরী এবং তাহাদের গঠন-আকৃতি দেখিতে অনেকটা নেপালের হিন্দু-মন্দিরগুলির অনুরূপ। হিন্দু সংস্কৃতির অবিমিশ্র রূপ ভারতবর্ষে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা দেখিতে আমরা কোনদিন অভ্যস্তও নহি। সেইজন্য বালিদ্বীপে সেই রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা যেন আমার চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। এমন বিস্ময়কর দৃশ্যের আমি ইতিপূর্বে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই।

দেনপাসারে গিয়া পৌঁছিয়া জাতীয় নৃত্য আকাদেমির অধ্যক্ষ (সম্ভবতঃ ডিরেক্টর কিংবা ডিপুটি ডিরেক্টর) শ্রীযুক্ত পঞ্জীর নিকট আমার আগমন বার্তা জানাইলাম। কারণ, আগেই বলিয়াছি, তিনিই আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া স্থির হইল, পরের দিনই সকাল ৭টার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠান দেখিতে যাইব। যথাসময়ে তিনি একটি গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

আন্তর্জাতিক নৃত্যোৎসবে বালিদ্বীপের যে কয়টি রামায়ণ নৃত্য দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বালিদ্বীপের একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অতি সহজেই অনুভব করিয়াছিলাম। বিশেষত্বটি এই যে তাহাদের নৃত্যানুষ্ঠানটি যেন আগাগোড়া একটি গীতিকবিতার সুরে গাঁথা ; ইহার সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং রস অন্যান্য অঞ্চলের নৃত্যের তুলনায় স্বতন্ত্র। সুতরাং সেই নৃত্য কোথায় এবং কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নিজের চোখে দেখিবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহল হইয়াছিল।

বালিদ্বীপের জাতীয় নৃত্য একাডেমীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে একটি বিরাট তোরণের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণটি প্রস্তর নির্মিত এবং তাহাতে নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত, ভিতরে যে বিশাল ভবনটি রহিয়াছে বাহিরের দিক দিয়া তাহাতে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ। আমাদের একটি সংস্কার এই যে দেবদেবীর মূর্তি পাথরের উৎকীর্ণ দেখিলেই তাহা প্রাচীন হইবে তাহাই মনে হয়। সেইজন্য এই ভবনটি কোন্ খৃস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছে আমি ডঃ পঞ্জীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিলাম। ইহার স্থাপত্যকীর্তি তো প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিলেন, ৩।৪ বৎসর পূর্বে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন নহে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক।

ভারতবর্ষে কোন সরকারী শিক্ষাভবনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা যে কত অসম্ভব, তাহা সকলেই জানেন। যদিও ইন্দোনেশিয়ার ১১ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ১০ কোটিই মুসলমান, তথাপি সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথার্থ জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের নিদর্শন জাতীয় শিক্ষাভবনের মধ্যেও এমনি ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

ডঃ পঙ্গী আমাকে তাঁহার আপিসগৃহে লইয়া গিয়া বসাইলেন এবং শিক্ষাদানের সমস্ত প্রণালী আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। বিশাল ভবনটির কক্ষে কক্ষে তখন নৃত্য এবং নৃত্যসম্বলিত বাদ্যের বিভিন্ন ক্লাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। জানিতে পারিলাম, সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ক্লাস হয়। বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের কঠিন মত আসিয়া পড়িয়া যায়। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীও আছেন। এমন কি, অনেক সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারীও আছেন। প্রত্যেকেই নিজেদের সুযোগ এবং সময়মত নৃত্য শিক্ষালাভ করিবার জন্য সরকারী নৃত্য একাডেমীতে ভর্তি হইয়াছেন।

ডঃ পঙ্গী এইবার আমাকে ক্লাসগুলি ঘুরিয়া দেখাইবার জন্য লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীও আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি জানিয়া ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন এবং ভারতে নৃত্যশিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে, তাহা আমার কাছে শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ডঃ পঙ্গী স্থির করিলেন যে ক্লাসগুলি দেখিয়া আসিবার পর আমি এই বিষয়ে তাঁহাদেরে কিছু বলিব। ইহাদের সকলেই প্রায় কিছু কিছু ইংরাজী জানেন।

প্রথমে একটি ক্লাসে গিয়া ঢুকিলাম। তাহাতে ছায়ানাটক (Shadow Play) শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ক্লাসে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী। তাহারা বক্তৃতা কিছু কিছু খাতায় লিখিয়া লইতেছে। একজন তরুণ বয়স্ক শিক্ষক ছায়ানাটকের একটি ক্ষুদ্র মঞ্চের সামনে দাঁড়াইয়া কি ভাবে আলোর সামনে চামড়ার পুতুলগুলি নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকিবামাত্র আমাদের সম্মানার্থে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমিও তাহাদের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলাম, ডঃ পঙ্গী এবং তাঁহার সহকর্মিগণও আমার সঙ্গে বসিলেন। আবার শিক্ষাদান চলিতে লাগিল। ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষক মধ্যে মধ্যে কিছু বুঝাইতেছিলেন। ডঃ পঙ্গী তাহার সারমর্ম আমাকে কিছু কিছু বুঝাইয়া দিলেন। ছায়ানাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণ। ইহার পদ্ধতিটি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ এবং মালয়েশিয়ায় গিয়াছে। ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে আজ তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় তাহা পুরাপুরি রক্ষা পাইয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণ শিক্ষকের দুর্বোধ্য ইন্দোনেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান প্রণালী লক্ষ্য করিলাম। শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের যে আন্তরিকতা দেখিতে পাইলাম, তাহা আমাকে অভিভূত করিল। অথচ এইকথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে এই বিদ্যা লাভ করিয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের উপার্জনের কোন উপায় হইবে না। কেবলমাত্র দেশের একটি ঐতিহ্যকে তাহাদের জীবনের শিক্ষার মধ্য দিয়া গ্রহণ করিবার জন্যই তাহাদের এই আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

তাহার পর আর একটি ক্লাসে গিয়া প্রবেশ করিলাম, সেখানে বারং নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বারং একটি চতুষ্পদ ভীষণাকার কাল্পনিক জন্তু। ইহার একটি বিশাল মুখোস এবং পোষাক আছে। একজন ব্যক্তি ইহার পোষাকের ভিতর আত্মগোপন করিয়া মুখোসের দিকে দাঁড়াইয়া অভিনব কৌশলে সেই অতিকায় জন্তুর মুখটিকে একবার হাঁ করিতেছে, আর একবার বন্ধ করিতেছে। তাহাতে খট্ খট্ করিয়া এক প্রকার শব্দ হইতেছে। সেই শব্দে নৃত্যের তাল রক্ষা পাইতেছে। আর একটি ব্যক্তি তেমনি জন্তুটির পিছনের দিকে সর্বাঙ্গ পোষাকে গোপন করিয়া সম্মুখের ব্যক্তির সহিত তাল রক্ষা করিয়া এমন ভাবে নাচিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে বারং নামক সেই অতিকায় জন্তুটি বিকট মুখভঙ্গী করিয়া নাচিয়া নাচিয়া তাহার

CENTRAL LIBRARY

শত্রুকে আক্রমণ করিতেছে। এই বারং জন্তুটির সঙ্গে একটি বীরচরিত্রের সংগ্রামই এই নৃত্যের বিষয়। বীর চরিত্রটিকে সাধারণতঃ বলা হয় ভীম। ভীম হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন—মহাভারতে এরূপ কাহিনী আছে সত্য; কিন্তু বারং নামক কোন অতিকায় জন্তুকে বধ করিয়াছিলেন, মহাভারতে এমন কোন কথা নাই। সম্ভবতঃ হিড়িম্বই ইন্দোনেশিয়ায় গিয়া কোন স্থানীয় উপকথার সহিত সংমিশ্রণ লাভ করিয়া বারং নামক এক অতিকায় জন্তুতে পরিণত হইয়াছে। বারং এবং তাহার প্রাণনাশকারী ভীম উভয়ের নৃত্য বালিনৃত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মুখোস-শুদ্ধ বারংয়ের পরিচ্ছদটিও বালিদ্বীপের শিল্পকর্মের একটি অভাবনীয় নিদর্শন। বাদ্যের তালে তালে ইহার সুনিয়মিত পদক্ষেপ বালিনৃত্যের একটি বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।

ইহার পর যে ক্লাসে আসিয়া প্রবেশ করিলাম, তাহাতে গামেলিন বাদ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। গামেলিন বাদ্যযন্ত্রের অভিনবত্ব বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র রামায়ণ-নৃত্য একমাত্র ইহারই সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন বিদেশী, এমন কি, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রও তাহাতে ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে কোন তারযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। শুষির যন্ত্র এমন কি, একটিমাত্র ক্ষুদ্র ঢোল ব্যতীত আর কোন আনদ্ধ যন্ত্রও নাই। ইহাতে যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়, তাহা আমাদের দেশে ঘনযন্ত্র অর্থাৎ করতাল ঘটতাল মন্দিরা কাঁসী কাঁসর কিংবা ঘণ্টাও নহে। অথচ ইহার প্রত্যেকটি যন্ত্রই ধাতুনির্মিত। প্রধানতঃ কাঠির সাহায্যে ধাতুনির্মিত কতকগুলি বাটির উপরে আঘাত করিয়া ইহার সুমিষ্ট সুরটি সৃষ্টি করা হয়। ইহা শিক্ষা করিবার অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করিলাম। ইহাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সব চাইতে বেশী দেখিতে পাইলাম। প্রায় ১০০ জনের মত হইবে। শিক্ষকের নির্দেশে তাহারা টেবিলের উপর কাঠি দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া এই বাদ্য শিক্ষা করিতেছিল। কারণ, ১০০ জন ছাত্রের উপযোগী গামেলান বাদ্যসমষ্টি তাহাদের ছিল না। ইহাতে একটি কোন বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা বাদ্য সৃষ্টি হয় না। ইহাতে বিভিন্ন আকৃতি এবং প্রকৃতির যন্ত্রের উপর আঘাতের সমবায়ে একটি সুর সৃষ্টি হয়। সেই সুরটির মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একটি পবিত্রতার ভাব এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে, যাহা কেবলমাত্র মন্দিরের দেবপূজারই উপযোগী।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তবু অনেক ক্লাস দেখা বাকি রহিল। তাহার পর আপিস ঘরে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত একাডেমীর কর্মচারী এবং নৃত্যশিক্ষকদের সামনে বর্তমান ভারতীয় নৃত্যের অবস্থা সম্পর্কে আমার যাহা জ্ঞান, তাহা কিছু কিছু বলিলাম।

ডঃ পঞ্জী বালিদ্বীপের কতকগুলি গ্রাম্যমন্দিরে গিয়া আমার নৃত্য দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার ফলে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেনপাসার সহর হইতে ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত গ্রামের মন্দির-প্রাঙ্গণে যেদিন যে নৃত্য হইত, আগে হইতে তাহার সংবাদ লইয়া সেইখানে গিয়া অনেক রাত পর্যন্ত সেই নৃত্য দেখিতাম। বালিদ্বীপের গ্রামে মন্দির-প্রাঙ্গণে যে নৃত্য এখন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বালিদ্বীপের ঐতিহ্যমূলক নৃত্য। তাহার ধারা আজ পর্যন্ত সেখানে অবিচ্ছিন্ন আছে। সেই নৃত্যই জাতীয় নৃত্য আকাদেমিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে গ্রাম্য পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে যে নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ইহা হইতে স্বতন্ত্র।

ইন্দোনেশিয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন একখানি অভিনন্দন-পত্র এবং কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ কবিতায় একটি প্রশস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং হাওড়ার পণ্ডিত সমাজ আমাকে 'রামায়ণ বিশারদ' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

ফরাসী

১৯৬৩ সনে যখন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডনে যান, তখন ফরাসী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাহাকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্যারিসে উপস্থিত হইয়া বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই অনুযায়ী তিনি লণ্ডন হইতে ফিরিবার পথে প্যারিসে আসেন এবং সেখানে আয়োজিত একটি সভায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

তাহার পর ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত নাট্যবিভাগ (Theatre de Nations, Theatre de France)-এর অধিকর্তার নিকট হইতে আমি একটি পত্র পাই। মূল পত্রটি ফরাসী ভাষায় লিখিত, ইহার ইংরেজী অনুবাদ এই :

Theatre de Nations
Theatre de France
1. Place Paul Clandel/75
Paris—6

27. 7. 70

Dear Professor Bhattacharyya,

I took the liberty of sending you a copy of correspondence between ourselves and Mrs Kapila Vatsyayana concerning the Chhau Dance of Purulia.

Having known through Miss Milena Salvini the main role you played in the discovery of this form of art we desire that you will co-operate in our effort to popularise this form of art in the western world and in particular at the Theatre de Nations.

In the year 1971, on that account, we like to bring in and to put up in Paris some grand manifestations of the Theatres of the East to those who are less acquainted with them.

I pray to you, Professor, to accept the assurance of my best feelings.

Sd/-G. Giacomoni
L' Administrateur General.

CENTRAL LIBRARY

THÉATRE DES NATIONS
THÉATRE DE FRANCE
1, PLACE PAUL-CLAUDEL / 75 / PARIS / 6e
TÉL. : 326-58 11 / 033.48-09 / 033-48-25

Paris le 27 Juillet 1970

AG/fg/ml

Dr ASUTOSH BHATTACHARYYA
Research Institute of Folk-Culture
West Bengal
32 Becharam Chatterjee/Road
CALCUTTA - 34 (Indes)

Monsieur le Professeur,

Je me permets de vous transmettre copie de la correspondance que nous venons d'adresser à Madame Kapila VATSYAN concernant le CHHAU DANSE de PURULIA.

Sachant par Mademoiselle Milena SALVINI le rôle fondamental que vous avez joué dans la redécouverte de cette expression d'art, nous espérons que vous voudrez bien seconder nos efforts pour favoriser sa venue dans le monde occidental et en particulier au Théâtre des Nations.

L'année 1971 nous paraît importante à cet égard puisque nous souhaiterions présenter à Paris quelques grandes manifestations théâtrales de l'Orient parmi les moins connues.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

L'Administrateur Général

F. Giacomoni

CENTRAL LIBRARY

১৯৭১ সনে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব কার্যকর হয় নাই, কিন্তু ১৯৭২ সনে Theatre de Nations-এর নূতন অধিকর্তা বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা ও পরিচালক জন লুই ব্যার' (Jean-Louis Barralt) র উৎসাহে এই প্রস্তাব রূপ লাভ করে। তাহার ফলে আমরা ১৯৭২ সনের মে মাসে প্রথমত লণ্ডন এবং পরে সেখান হইতে জুন মাসে গিয়া প্যারিস পৌঁছাই। সেখানকার প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চ Theatre de la Tempete-এ ৭ই জুন হইতে ১৭ই জুন পর্যন্ত বর্তমান লেখকের পরিচালনায় পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। অভিনয় শেষে প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসু দর্শককে অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হইত। তবে যাঁহারা ইংরেজি জানিতেন, তাঁহারাই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ করিবার সুযোগ পাইতেন। দো-ভাষীর মধ্যস্থতায়ও অনেক সময় আমাকে আলোচনা চালাইতে হইত।

প্যারিসে কয়েকজন বাঙ্গালী উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যা কিংবা মানবিক বিষয়ে গবেষণা-কর্মী আছেন। তাঁহাদের একটি সভায় একদিন যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলাম। সেখানে বাঙ্গালীর কোনও প্রতিষ্ঠান নাই, বাঙ্গালীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প এবং বারোজন অধিবাসীর মধ্যে দশজনই ফরাসী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য বাঙ্গালীর সংস্কৃতি বলিতে সেখানে কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। একদিন বাঙ্গালী কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, তিনি প্যারিসে গবেষণা-কর্মে নিযুক্ত আছেন। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তিনি বাংলা কাব্যচর্চার পরিবর্তে ফরাসী কাব্যচর্চা করিতেছেন। তাঁহার ফরাসী স্ত্রী শান্তি-নিকেতনে কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন, চিত্রশিল্পে অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বর্তমানে ফরাসী দেশের অদ্বিতীয় প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক পণ্ডিত অধ্যাপক কিলিয়াজোর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আসন্ন প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে আমাকে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। সম্প্রতি তিনি বৈদিক সাহিত্য এবং ভাষা সম্পর্কে এক বিশাল গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছে। তিনি তাঁহার অধীনস্থ একজন গবেষণাকারিণীকে আমাকে প্রাচ্যবিদ্যা ভবনের ভারতীয় গ্রন্থসংগ্রহ বিভাগটি দেখাইয়া দিতে বলিলেন। কিছু কিছু বাংলা বইও সেখানে আছে দেখিতে পাইলাম। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্যারিসের Institut de Civilisation Indienne (Institute of Indian Civilisation) এর পক্ষ হইতে একটি রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ফরাসী সরকারের তদানীন্তন সাংস্কৃতিক বিষয়ের মন্ত্রী তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এবং মঁসিয়ে লুই রেনো ইহার সভাপতি ছিলেন; অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সমিতির পক্ষ হইতে Hommage de la France a Rabindranath Tag re (Hom ge of France to Rabindranath Tagore) নামে একখানি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কিলিয়াজো একখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন। ফরাসী পণ্ডিতদিগের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থখানিতে ভারতের প্রতি ফরাসী পণ্ডিত সমাজের সুগভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

একদিন আগে হইতে ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী দেশের বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর লেভি স্ট্রস্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হইল। তিনি College of France-এর নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ এবং সেখানেই তাঁহার সর্বাধুনিক সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপিত। যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্যগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তাহা তাঁহার গবেষণাগারে দেখা গেল। নৃতত্ত্ববিষয়ক অনুশীলনের দিক দিয়া ফরাসী দেশ যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ধারায় ডক্টর লেভি স্ট্রস

CENTRAL LIBRARY

এখন ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ্। এফ. বোয়াস (F. Boas)-এর পর ইঁহার মত পণ্ডিত এবং গবেষক ফরাসী দেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।

ফরাসী দেশের জাতিতত্ত্ব-সংগ্রহশালা (Ethnographic Museum)-র নাম L'Homme। তাহার ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষা একজন মধ্যবয়সী ফরাসী মহিলা। তিনি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞা। তিনি একদিন তাঁহার সংগ্রহশালার ভারতীয় বিভাগটি পরিদর্শন করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ফরাসী দেশের ইহাই বৃহত্তম জাতিতত্ত্ব সংগ্রহশালা বা Ethnographic Museum। দেখিলাম, এখানে ভারতীয় বিভাগে ভারতীয় উপকরণের সংগ্রহও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। এমন কি, অন্যান্য বিদেশী সংগ্রহশালায় যে পরিমাণ ভারতীয় উপকরণের সংগ্রহ দেখিয়াছি, তাহাদের তুলনায় ইহার সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যক্ষা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া সকল বিষয়গুলি দেখাইলেন; একবার বলিলেন, এইবার ছৌ নাচের মুখোস কিংবা পোষাক দেখিতে পাইলেন না, ভবিষ্যতে যখন প্যারিসে আসিবেন, তখন নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। প্রকৃতই তাঁহারা ইহাতে প্রদর্শনী করিবার জন্য ছৌ নাচের পোষাক ও কিছু মুখোস আমাদের নিকট হইতে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিভাগ ঘুরিয়া দেখিবার পর অধ্যক্ষা তাঁহার কক্ষে আমাকে লইয়া বসিলেন। ইংরেজীতে প্রকাশিত তাঁহাদের কয়েকটি 'বুলেটিন' আমাকে উপহার দিলেন। দুইটি 'বুলেটিনে' তাঁহার নিজের রচিত দুইটি প্রবন্ধ ছিল, একটির বিষয় 'বাঁকুড়ার দশাবতার তাস' এবং আর একটির বিষয় 'ভারতের সর্প পূজা'। উভয় প্রবন্ধই বহুচিত্র শোভিত। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে আমার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' বইটির নাম এক জায়গায় পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, আপনি পূর্ব হইতেই আমার নাম এবং আমার বইয়ের সঙ্গে পরিচিত আছেন দেখিতেছি।

তিনি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইলেন।

আমি বলিলাম, এই যে বইটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমারই একটি অকিঞ্চিৎকর রচনা, নামটি যে আমারই, তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছেন।

তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, How wonderful, how surprising, how nice বলিয়া তিনি একরকম আমাকে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিলেন; বোধ হয়, আমি পুরুষ বলিয়া তাহা করেন নাই।

তিনি বলিলেন, মার্কিন দেশের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ডিমক-এর একটি ইংরেজি রচনা হইতে তিনি এই উদ্ধৃতিটি দিয়াছেন, তিনি বাংলা জানেন না; সুতরাং আমার বই তিনি চোখেও দেখেন নাই।

আমি বলিলাম, যাই হোক, তাহার গ্রন্থকারকে আপনি চোখে দেখিলেন, গ্রন্থকারের ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

তিনি ইহা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

মনে মনে বলিলাম, তাহা হইলে দেখিতেছি, তোমাদের দেশেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় মূল বই না পড়িয়াও অন্যের উদ্ধৃতি হইতে উদ্ধৃতি দিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল, ইহা ভারতীয় নিজস্ব রীতি, পাশ্চাত্ত্য রীতি নহে।

CENTRAL LIBRARY

হল্যাণ্ড

প্যারিসের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া হল্যাণ্ডের জাতীয় উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ১৮ই জুন ১৯৭২, হল্যাণ্ডের রাজধানী সহর আম্‌স্টারডম বিমানবন্দরে সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমাদের থাকিবার জন্য আম্‌স্টারডাম হইতে বহুদূরে সমুদ্র তীরবর্তী একটি স্থান স্থির করা হইয়াছিল, স্থানটির নাম স্কেভেনইনজেন (Scheven'ngen), স্থানটি প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক শহর দি হাগের সংলগ্ন সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। আমাদের হোটেলের একেবারে সামনেই সমুদ্র। ইহা আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রেরই একটি অংশ। আম্‌স্টারডাম বিমানবন্দর হইতে অনেক দূরবর্তী সেই স্থান ভিলুক্স বাসে প্রায় ৫ ঘণ্টার পথ।

১৯শে জুন তারিখ আম্‌স্টারডামে স্টাদোস্বুর্গ (Stadosschouburg) থিয়েটারে আমাদের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেইদিন দুপুরবেলায় স্কেভেনইনজেন হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার আগেই আম্‌স্টারডামে পৌঁছিলাম। হল্যাণ্ডে তখন জাতীয় উৎসব চলিতেছিল। জাতীয় উৎসবের অর্থ এই যে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত কোন না কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিদিন উদ্‌যাপিত হয়। কোনও কোনও দেশে দেশের বিভিন্ন শহরের দর্শকদিগের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানেই এই অনুষ্ঠান হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একমাস কিংবা দেড়মাস ব্যাপী একই স্থানে ইহার অনুষ্ঠান হয়। এইভাবে জাপানের কাবুকি নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া আমেরিকার আধুনিকতম ব্যালে পর্যন্ত তাহাতে যোগদান করে। ইংল্যাণ্ড হইতে প্রতি বৎসরই শেকস্‌পীয়ারের কোনও না কোনও নাট্যসম্প্রদায় এই সব উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। এইভাবেই সেই বৎসর পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যও হল্যাণ্ডের জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠানলিপির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যে রঙ্গমঞ্চে আমাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহা আম্‌স্টারডাম সহরের বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চ। ইতিপূর্বেই হল্যাণ্ডের জাতীয় উৎসবের সমস্ত season টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সন্ধ্যা হইতেই থিয়েটারে টিকিট কেনাবেচার জন্য কোন ভিড় দেখা গেল না। রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার জন্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ৮ টার মধ্যেই বিশাল প্রেক্ষাগৃহটি দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমার মনে হইল, সেই প্রেক্ষাগৃহে অন্ততঃ ৫ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল।

অনুষ্ঠানের বিরাম বা ইনটারভ্যালের সময় আম্‌স্টারডাম বেতারের পক্ষ হইতে একজন সাংবাদিক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন। আমি তখন বিভিন্ন দর্শকের নানা প্রশ্নের জবাব দিতেছি বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। অনুষ্ঠান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দুইশত দর্শক রঙ্গমঞ্চের উপর উঠিয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলাম, ফরাসীদের অপেক্ষা ইঁহাদের ইংরাজীজ্ঞান বেশী। অতএব আমি ইংরাজীভাষায় তাহাদিগের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিলাম। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁহারা আমার বিভিন্ন জবাব লিখিয়া লইতেছিলেন। তাহাদের প্রশ্নের যেন শেষ নাই। ইতিপূর্বেই বুঝিয়াছিলাম যে অনুষ্ঠান ইঁহাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে; কারণ, পর্দা পড়িয়া যাইবার পরও প্রায় আধঘণ্টা ব্যাপী করতালি ও হর্ষধ্বনির বিরাম হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। অন্ততঃ পনের বার পর্দা তুলিয়া শিল্পীদিগকে দর্শকের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে Royal Tropical Institute (Koninkliyk Institunt voor de tropen) এর 'এথনোমিউজিকোলজি'র রিসার্চ ফেলো ডঃ এফ. ভন, ল্যাম্‌সওয়িরড (F. von Lamsweerde) আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে একটি ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু আম্‌স্টারডামে আমাদের একদিনই অনুষ্ঠানের কথা। অন্যান্য দিন

CENTRAL LIBRARY

হল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠান হইবে। সুতরাং আমার পক্ষে আম্‌স্টারডামে আসা সম্ভব নয় বলিয়া এই আমন্ত্রণ দুঃখের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিতে হইল।

সেদিন ভিড়ের মধ্যে হইতে একটি তরুণ আমার সামনে আসিয়া বলিল যে আম্‌স্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, সমাজতত্ত্বের কিংবা নৃতত্ত্বের আমার এখন ঠিক স্মরণ নাই, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছেন। ভিড়ের জন্য তিনি আমার নিকটে আসিতে পারিতেছেন না।

আমি তাহাকে বলিলাম, চলুন, তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব, বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

দেখিলাম রঙ্গমঞ্চের এককোণে এক দীর্ঘকায় প্রবীণবয়স্ক ভদ্রলোক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাতটি গলার সঙ্গে ঝোলানো। তিনি হাস্যমুখে আমাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ের জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে একটু আসিতে হইবে। আমার সহকর্মী অধ্যাপক এবং গবেষক ছাত্র-ছাত্রীগণ নিকটেই একটি হোটেলে আপনাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি আপনাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইব এবং আধঘণ্টার ভিতরে এখানে পৌঁছাইয়া দিব।

আমি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অন্য কোনদিক বিবেচনা না করিয়াই বলিলাম, চলুন, আপনার সঙ্গে যাইতেছি। বলিয়া তাহার সঙ্গে গিয়া একটি গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ী কিছুদূর গিয়া একটি বিশাল হোটেলের সামনে উপস্থিত হইল। হোটেলের একটি হলঘরে উপস্থিত হইয়া দেখি সেখানে কুড়ি পঁচিশজন নানাবয়সী স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত আছেন। গিয়া আসন গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পানীয় পরিবেশন করা হইল। বুঝিতে পারিলাম, পুরাপুরি ডিনারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। তারপর প্রশ্নোত্তরের পালা আরম্ভ হইল। প্রশ্নগুলি অধিকাংশই নৃতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্ব বিষয়ক। সামান্য কিছু প্রশ্ন নৃত্য এবং বাদ্যের আঙ্গিক সম্পর্কিত। আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী সকল প্রশ্নেরই ধীরে ধীরে জবাব দিতে লাগিলাম, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যও পরিবেশিত হইতে লাগিল; আমি কোনক্রমেই এই ডিনারে নিজেকে অনিমন্ত্রিত অতিথি বলিয়া গণ্য করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাতে আধঘণ্টার পরিবর্তে প্রায় একঘণ্টা সময় অতিক্রম হইবার উপক্রম হইল। তথাপি ইহাদের বিনয়-নম্র ভদ্র ব্যবহারে আমি সময়ের জন্য কোন তাগিদ করিতে পারিলাম না।

শুনিতে পাইলাম, আমস্টারডম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি ভারতীয় ভাষায় স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন হয়—একটি হিন্দী আর একটি বাংলা। তবে বুঝিতে পারিলাম, হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া এবং বাংলা সমৃদ্ধতম ভারতীয় ভাষা কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাষা বলিয়া নহে, বরং বাংলা দেশের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া এই মর্যাদা লাভ করিয়াছে। একজন শ্রীদুর্গাদাস সরকার সেখানে বাঙ্গালার অধ্যাপক, কিন্তু তিনি নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। একজন বলিলেন, তিনি ছুটিতে আছেন।

প্রায় দেড়ঘণ্টার পর তাঁহারা আমাকে যখন থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিলেন, তখনও গিয়া দেখিতে পাইলাম, সেই 'মিউজিকোলজি'র গবেষক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কারণ, তিনি ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। সেই অসময়েও তিনি আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং শেষ পর্যন্ত জেরা করিয়া এই সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য আমার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইলেন এবং তিনি জানাইলেন, তিনি হল্যাণ্ডের অন্যান্য স্থানেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অবশিষ্ট জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিয়া লইবেন। প্রকৃতপক্ষে রোটেরডামে যেদিন আমাদের অনুষ্ঠান হয়, সেদিনও তিনি উপস্থিত থাকিয়া আমাকে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল

CENTRAL LIBRARY

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি আরও কোনও স্থানে উপস্থিত ছিলেন। কারণ, তিনি নিজে গাড়ী চালাইয়া হল্যাণ্ডের যে কোন জায়গার অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকিতেন। এমন কি, আমি হল্যাণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার পরও তিনি আমস্টারডাম হইতে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, 'I once again would like to express my admiration for the fact that you have brought this particular group to the forum of the world and I hope to be able to one day visit you in your Institute in India'.

এইভাবে সাতদিনব্যাপী হল্যাণ্ডের বিভিন্ন সহরের বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের অনুষ্ঠান চলিল। দি হাগ হইতে প্রকাশিত 'হেৎ বিনেনহোফ' (Het Binnenhof) পত্রিকার ২৬শে জুন, ১৯৭২, এর সংখ্যায় এই ছৌনৃত্য সম্পর্কে লিখিয়াছে যে, 'perhaps it was the climax of the festival.'

স্পেন দেশ

২৪শে জুন ১৯৭২ আমি সদলবলে বিমানযোগে পুনরায় ফরাসীদেশ অতিক্রম করিয়া স্পেনের বিমানবন্দর মাদ্রিদে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু স্পেনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান পরের দিন সন্ধ্যায় মাদ্রিদে হইবার কথা ছিল না। বরং তাহার পরিবর্তে মাদ্রিদ হইতে প্রায় ২০০ শত মাইল দূরবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে সান সিবাস্টিয়ান (San Sebastian) সহরে অনুষ্ঠিত হইবার কথা। সেইজন্য মাদ্রিদ বিমানবন্দর হইতে ডিলুক্স বাসে করিয়া আমরা সান সিবাস্টিয়ান সহরের দিকে চলিলাম।

২৬শে জুন তারিখ যে থিয়েটারে নাচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার নাম টিয়েট্রো ভিক্টোরিয়া য়ুগেনিয়া (Teatro Victoria Eugenia), শহরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ; সমুদ্র তীরে জনবহুল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা খুব আশানুরূপ বোধ হইল না। অথচ স্পেন দেশে এই প্রথম অনুষ্ঠান। আমি জানিতাম, সমগ্র ইউরোপের মধ্যে স্পেন দেশ এখন পর্যন্ত লোকনৃত্য এবং লোকসঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ। পশ্চিম ইউরোপের অন্যত্র ইহাদের চিহ্ন যখন বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন স্পেনে ইহাদের সমাদর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে এদেশের উৎসাহই দেখিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হইয়া যাইবার পর একটি তরুণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন যে তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এত সুন্দর নাচ তিনি খুব অল্পই দেখিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাত্রছাত্রীরা কেহই ইহা দেখিবার সুযোগ পায় নাই। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকিবার সময় আমি যদি আসি তাহা হইলে সকলেই এই নাচ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবে। আরও কয়েকজন আসিয়া আমাকে প্রায় একই কথা বলিল। আপনাদের এত সুন্দর নাচ; কিন্তু এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি, এখন বিদেশী পর্যটকে সমগ্র দেশ ভর্তি। ইহার মর্ম তাহারা কি বুঝিবে?

একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, নাম পুরি পি. লুইস (Puri P. Luish) আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমি শাড়ী পরা শিখিতে চাই। আমাকে তুমি যদি একটু দেখাইয়া দাও তাহা হইলে আমার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হইতে পারে।

আমাদের একটি অনুষ্ঠানে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং দুর্গা শাড়ী পরিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীর এই ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইয়াছে। তবে আমি তাহাকে বলিলাম, আমি পুরুষ মানুষ, আমি শাড়ী পরিতে জানিনা। তবে যাহারা শাড়ী পরিয়া অভিনয় করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখাইয়া দিতে পারে। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া দিতেছি। এই বলিয়া আমার ৩ জন নৃত্যশিল্পীকে তাহাকে শাড়ী পরানো শিখাইয়া দি

CENTRAL LIBRARY

বলিলাম। তাহারা লক্ষ্মী সরস্বতীর শাড়ীগুলি তাহার গাউনের উপরই বারবার পরাইয়া দিয়া শাড়ী পরা শিখাইতে লাগিল; আধ ঘণ্টা এই রকম শিখাইবার পর আমি যখন বলিলাম যে এইবার আপনি নিজে পরুন, আমি দেখি ঠিক হইয়াছে কিনা, তখন তিনি যেভাবে শাড়ীটি পরিলেন, তাহাতে তাহার গায়ের রং সাদা না হইলে তাহাকে শাকচুন্নী ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতে পারিত না।

আমি বলিলাম, আপনি এই শাড়ীটা লইয়া বাড়ীতে গিয়া অভ্যাস করুন, অভ্যাস করিতে করিতেই একদিন শিখিতে পারিবেন। এখন তাড়াতাড়িতে কিছু হইবে না। আমাদের এইরকম শাড়ী আরও আছে।

তিনি মহানন্দে শাড়ীটা লইলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে ভবিষ্যতে আমরা যখন ঐ শহরে আবার আসিব, তখন তিনি শাড়ী পরিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সঙ্গে তিনি আমাদের যে পরিমাণ ধন্যবাদ দিলেন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ইহার পরের দুইদিন স্পেনদেশের রাজধানী মাদ্রিদ সহরে আমাদের অনুষ্ঠান হইবার কথা। ২৭শে জুন সকালের দিকেই মাদ্রিদ রওয়ানা হওয়া গেল। দ্বিপ্রহরের ভোজনের আগেই সেখানে পৌঁছিয়া একটি বড় রাস্তার উপরে বিরাট হোটেলে স্থান লাভ করিলাম। মাদ্রিদে দুইদিন যে থিয়েটারে আমাদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার নাম টিয়েট্রো দ্য লা জারজুয়েলা (**Teatro de la Zarzuela**)।

আগেই বলিয়াছি, স্পেনে লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্য এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। একথা সকলেই জানেন, স্পেনদেশ পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত হইলেও ইহা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের জীবনধারার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে নাই। মধ্যযুগীয় জীবন সংস্কারের প্রভাব এইদেশের অধিবাসীর মধ্যে এখনও অত্যন্ত প্রবল। সেইজন্যই লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্য সেখানে সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। মাদ্রিদে প্রথম রাত্রিতে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রিদের এক ব্যবসায়ী লোকনৃত্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আমাকে সেইরাত্রেই তাঁহাদের দেশের লোকনৃত্য দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। আমি আমার সঙ্গীদের হোটেলে যাইতে বলিয়া নিজে তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠান মাদ্রিদের এক অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ইহার বাহিরের জৌলুস কিছু নাই; কিন্তু যাঁহারা ইহার নৃত্য একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা কোনদিন ভুলিতে পারেন না।

যথার্থই তাঁহার প্রতিষ্ঠানটি আড়ম্বরহীন একটি প্রাচীন গৃহে অবস্থিত। দেওয়ালের গায়ে পূর্ববর্তী অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট নৃত্য এবং সঙ্গীত শিল্পীদিগের তৈলচিত্র, আসবাবপত্র জীর্ণ; কিন্তু ইতিমধ্যেই লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ভিতরে বসিবার স্থান নাই বলিয়া জনতা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। রাত্রির প্রথম প্রদর্শনী শেষ হইলে রাত্রির দ্বিতীয় প্রদর্শনী তাহারা দেখিবে, সেই জন্য তাহারা টিকিট কিনিয়াছে।

টিকিটের অত্যন্ত উচ্চমূল্য, ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে দর্শকদিগকে বিনামূল্যে বিশেষ একশ্রেণীর তৃপ্তিকর পানীয় (**drink**) বিতরণ করা হয়। এই পানীয় নাকি মাদ্রিদের আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমাকে সসম্মানে লইয়া গিয়া ভিতরে বসানো হইল। তিনি ইংরেজী অতি অল্পই জানেন। অতি কষ্টে তাঁহার সঙ্গে আমার ভাব-বিনিময় করিতে হইতেছিল। কক্ষের মধ্যে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রত্যেক দর্শকের আসনের সামনে একটি ক্ষুদ্র টেবিল। তাহাতে পানপাত্র; তাহা বারবার পূর্ণ করিয়া দিয়া যাইতেছে। কক্ষের একপার্শ্বে একটি উচ্চবেদীতে নৃত্য এবং সঙ্গীতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পর্যায়ক্রমে অবিরাম সেই বেদীর উপর লোকনৃত্য এবং লোকসঙ্গীত চলিতে লাগিল। নৃত্যে স্ত্রী এবং সঙ্গীতে প্রধানতঃ পুরুষই অংশগ্রহণ করিতেছিল।

CENTRAL LIBRARY

নৃত্য দেখিয়া মনে হইল, এমন নৃত্য কোথাও দেখি নাই। ইহার যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিব সে সাধ্যও নাই। অথচ তাহা যে লোকনৃত্য এই বিষয়েও কোন ভুল নাই। পুরুষের কণ্ঠে যে সঙ্গীত শুনিলাম, তাহার সুর আমার অনেকখানি পরিচিত বলিয়া মনে হইল। বাংলাদেশের ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে ইহার ঐক্য অনুভব করিলাম। নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলির সন্ধান যেমন অপরূপ রস এবং লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও জীবনের গভীরতম অনুভূতির অভিব্যক্তি শোনা যাইতেছে। লোকশিল্পের অনুশীলন যে এমন স্তরে উঠিতে পারে, তাহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। নৃত্যের মধ্যে সূক্ষ্মতা আছে, ব্যঞ্জনা আছে; কেবলমাত্র বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কিংবা অঙ্গসঞ্চালনই নাই। সঙ্গীতের মধ্যেও তেমনি বেদনা গভীর হইয়া বাজিয়াছে; কেবলমাত্র জীবনের উপরিস্তরে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সারারাত্র যে কি ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনুষ্ঠান শেষ হইলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ গাড়ী করিয়া আমাকে হোটেলে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মাদ্রিদে দুইদিন অনুষ্ঠানের পর আমরা পরপর তিন দিন বিলবাও (Bilbao), ভাল্লাদলিদ (Valladolid) এবং সারাগুচায় (Saragucha) অনুষ্ঠান করিবার পর স্পেনদেশ ত্যাগ করিলাম।

জুলাই মাস হইতেই পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। বন্ধ হইয়া গেলে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক কেহই সহরে থাকে না, সকলেই ছুটি উপভোগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরবর্তী অবসর-যাপন-কেন্দ্রগুলিতে ছুটিয়া যায়। স্পেনদেশে যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; ছাত্র কিংবা অধ্যাপক কোনও সহরেই প্রায় ছিল না; সেইজন্য সেখানে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হইতে পারে নাই। নতুবা অন্যত্র দেখিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গবেষক এবং অধ্যাপকগণই এই বিষয়ে সর্বাধিক কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি ইতালী যাইবারও নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রীষ্মের জন্য ছুটি হইয়া গিয়াছে জানিয়া এই বিষয়ে আমি আর কোনও উৎসাহ দেখাইলাম না; জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

পর্তুগাল

যে সকল দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক কারণে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও যে বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পর্তুগালের অধিবাসিনী বাংলার যাত্রা-বিষয়ের গবেষক শ্রীমতী নিকোলে জবলেস্‌কো। এমন কি, পর্তুগালের সঙ্গে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক কোনও সম্পর্ক বর্তমান নাই বলিয়া তিনি সরাসরি নিজের দেশ হইতে ভারতবর্ষে কোনও চিঠি লিখিতে পারেন না, ফরাসী দেশের মধ্যস্থতায় তাঁহাকে ভারতবর্ষে চিঠি লিখিতে হয়। তিনি ১১ই জুন ১৯৭০ সনের Principaute de Monaco হইতে লিখিত এক চিঠিতে আমাকে লিখিয়া জানান,—

'I am very interested in Indian Folk theatre, particularly in the Yatra. Since Fabruary I have been studying Bengali at the French National School of Oriental Languages of Paris.

Mrs Salvini has kindly given me a copy of your study in '*Sangeet Natak*' expounding the history, value, meaning and transformation on some points such as costume, make up, gestures properties or training of the actors.

CENTRAL LIBRARY

My problem is how to know where I can find more detailed information on the above questions, and photos or drawings.……

I am very sorry to disturb you, Sir, but knowing your vast science, your authority in Art and Folk Art, I felt I could not appeal to a better person.… ..

পত্র লেখিকার এই বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় পাইয়া পত্র দ্বারা তাঁহার প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার কার্যে সাহায্য করা হইতেছে।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কের একজন তরুণ অধ্যাপক শ্রীনীল্‌স্‌ আর সোরেনসেন (Neils R. Sorensen) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-নাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে গবেষণা এবং নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৭১ সনে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া আমার শরণাপন্ন হন। আমি তাঁহাকে বাংলার যাত্রা, পুতুলনাচ এবং ছৌনৃত্যনাট্য সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়া তাঁহার গবেষণার কার্যে সহায়তা করি। তিনি পরের বৎসরই এই বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়া ইহাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে আসেন এবং তাঁহাকে প্রত্যেক জায়গায় লইয়া গিয়া প্রত্যেকটি বিষয় দেখিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি এখান হইতে কিছু যাত্রা, পুতুল নাচ ও ছৌনাচের সবাক চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্র, পোষাক ও মুখোস এবং নিম্ন বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি দণ্ড পুতুল (rod puppet) সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া নিজের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে এক প্রদর্শনী করেন। প্রদর্শনীর আয়োজন যথাযথ হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য এবং এই সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি আমাকে ডেনমার্ক যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি ৫ই জুলাই তারিখ ডেনমার্কের বেদেভাজেন (Hve devangen) সহর হইতে এক পত্রে আমাকে এই সম্পর্কে লেখেন—

……The best suggestion is to invite you to come and see the films as well as the exhibition opening 2nd week of September 1973 and lasting six months. Will a visit to Denmark be possible for you ? If so I shall discuss this with the Head of the Ethnographic Department.

In the exhibition 15 West Bengal rod puppets will be presented in a stage built up in exhibition Hall after the model I have filmed. About 20 Purulia masks will be presented in a montre with pictures. Slides and films will be shown in a nearby Hall.

For further documentation I would very much like to have the entire paper you have written about the West Bengal Rod Puppets.

For background information I would like a translation of the story about the goddess Manasa from your book *Vangala Mangal Kavyer Itihas*

Will it be possible to have translation into English of some of the songs from the West Bengal puppet plays based on the Vaisnava legend on the birth and childhood of Lord

CENTRAL LIBRARY

Krisna and his love episode with Radha, which according to your letter is the most popular story ?.....

বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসু এই বিদেশী গবেষককে কেবল মাত্র উপরোক্ত তথ্যগুলিই নহে, তাহা ছাড়াও বহু তথ্য দিয়া সর্বদাই সাহায্য করা হইয়াছে। পত্র লেখক উপরে যে আমার 'West Bengal Rod Puppets' বিষয়ে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মার্কিন দেশের একটি গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পড়িয়া তিনি এই বিষয়ের প্রতি প্রথম আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন।

রুমানিয়া

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি লোক-সাহিত্য বিশেষতঃ লোক-সংস্কৃতির বিবিধ উপকরণ জাতীয় জীবনে সংরক্ষণ এবং অনুশীলন করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। আমি সোভিয়েট দেশ ভ্রমণের সময় তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

১৯৭১ সনের শেষভাগে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্টে স্থাপিত রুমানিয়া প্রজাতন্ত্রের জাতীয় লোকশ্রুতি ও জাতিতত্ত্ব গবেষণা পরিষদের অধ্যক্ষ (Cercetator principal la Inst. de Folclor si Etnografie al Academiei Republicii Socialiste Romania) কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমার টেপ-রেকর্ড করা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু কিছু লোক-সঙ্গীত তিনি টেপ করিয়া নেন এবং বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুর-বৈশিষ্ট্য লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করেন। গ্রামে লইয়া গিয়া গ্রাম্য গায়কের কণ্ঠে তাহাকে লোক-সঙ্গীত শুনাইবার ও টেপরেকর্ড করিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া আমাকে তাঁহার দেশে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার দেশের সরকারের নিকট আবেদন করেন।

১৯৭৩ সনের এপ্রিল মাসে আর একজন রুমানিয়ার খ্যাতনামা লোক-সংস্কৃতি গবেষক এবং লোক-নৃত্যশিল্পী শ্রীপিটার বোডে কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলা লোক-সংস্কৃতির পটভূমিকায় বাংলার লোক-নৃত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। তিনি আমাদের অনুষ্ঠিত পুরুলিয়ার বার্ষিক লোকনৃত্যোৎসব এবং আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন। এই আলোচনা-চক্রে পৃথিবীর অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশের লোক-সংস্কৃতি গবেষকও উপস্থিত ছিলেন। দেশে পৌঁছিয়া তাঁহাদের দেশে যাইবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা (Ceylon) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীতিলকসিরি (শ্রীতিলক শ্রী) 'এশিয়ার মুখোস' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে ভারত-শ্রীলঙ্কা সাংস্কৃতিক চুক্তি বিনিময় অনুযায়ী ১৯৭৩ সনের নভেম্বর মাসে দিল্লী হইয়া পরে কলিকাতায় আসেন। ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার মুখোস নৃত্যের বিষয় পৃথিবীর প্রায় সকলদেশেই প্রচারিত হইয়াছে, অথচ তাঁহার 'এশিয়ার মুখোস নৃত্য' গ্রন্থে তিনি এই বিষয়ে কোনও সংবাদ দিতে পারেন নাই। তিনি দিল্লী আসিয়াই পুরুলিয়ার মুখোস, মুখোস নৃত্য এবং সেই সম্পর্কে আমার নাম শুনিতে পান।

CENTRAL LIBRARY

তিনি দিল্লী হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের মুখোস নির্মাণের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁহাকে কেবলমাত্র মৌখিক আলোচনাই নহে, কিছু নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করাইয়া দিই। তিনি শ্রীলঙ্কার মুখোসের তুলনায় পশ্চিম বাংলার মুখোস যে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং শিল্পগুণসম্পন্ন তাহা লক্ষ্য করেন, অথচ এইবিষয়ে তাঁহার 'এশিয়ার মুখোস' গ্রন্থে যে কোনও উল্লেখ করিতে পারেন নাই, তাহার গ্রন্থের এই অসম্পূর্ণতা তিনি স্বীকার করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় গিয়া বাঙ্গালীর লোক-শিল্পের নানা নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং শ্রীলঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। মুখোস নৃত্যের ধারা যে ভারতবর্ষ হইতেই শ্রীলঙ্কায় গিয়াছে, অথচ সেখানে গিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা তিনি স্বীকার করেন।

CENTRAL LIBRARY

স্বামী বিবেকানন্দের ও সমকালীন ভারতের শিল্পচিন্তা*

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

একালে ভারতীয় কলাশিল্পের পথিকৃৎ-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী কিছুদিন আগে পালিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে সভাসমিতিতে এবং পত্রপত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতশিল্প (যা 'নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা' বা 'বেঙ্গল স্কুলের পেন্টিং' নামে সমধিক পরিচিত) সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে। ঐ সকল বক্তব্যে বা রচনায় অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকলেও যে-জাগরণের তিনি কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাপর চরিত্রগুলির ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা প্রায়ই দেখা যায় নি। তার ফলে এই শিল্প-আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা ঠিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারছি না। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো ব্যক্তির নাম আমরা শুনেছি, কিন্তু তাঁরা ঠিক কোন্ সময়ে কী করেছিলেন তা জানতে পারছি না, ফলে ভূমিকার গুরুত্বে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে—অনেক সময় পরবর্তীকালের গুরুত্বকে পূর্ববর্তীকালে আরোপ করছি, এবং এমন কোনো কোনো মানুষকে একেবারে ভুলে যাচ্ছি, যাঁরা ছাড়া এই আন্দোলন যে-সাফল্য পেয়েছে তা কদাপি পেতে পারত না। যেমন, স্পষ্টভাবে বলাই ভাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই আন্দোলন-প্রসঙ্গে ভুলে যাওয়ার তুল্য ঐতিহাসিক অকৃতজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না। এবং ভগিনী নিবেদিতার নামও যেভাবে উল্লেখ মাত্র করা হচ্ছে (ভয়স্মৃতি বা মন্দ উৎসাহের কারণে কখনো-বা তাও করা হচ্ছে না)—তা উক্ত মহিলার কৃতকার্যের যথেষ্ট সংকার নয়। বর্তমান লেখকের সন্ধানমত, ভগিনী নিবেদিতা এই আন্দোলনের উন্মেষপর্বে যে কাজ করেছিলেন, তার গুরুত্ব এতই বেশী যে, শুধু নামোচ্চারণের নগদ বিদায়ে, বা পরম পবিত্র সে-নাম কেবল অন্তরে ভক্তিপূতভাবে জপের যোগ্য, বাইরে কহতব্য নয়—এই নিরাকার শ্রদ্ধায় বিসর্জিত হবার ব্যাপার নয়, স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হবার যোগ্য।

শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতার উল্লেখ যদি-বা দেখতে পাওয়া যায়, স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ একেবারেই দেখা যায় না, আর তা আশাও করা যায় না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো বড় শিল্পীকে হাতে ধরে কাজ শেখান নি। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ বড় শিল্পী নন। জুবিলী আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে স্বামীজীর একদিনের শিল্পালোচনার বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু একদিনের আলোচনায় রণদাপ্রসাদ কতখানি পরিবর্তিত হয়েছিলেন, বলতে পারব না। 'রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী'—একথা আমরা জেনেছি; স্বামীজীর কথায়

---

* 'স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ও সমকালীন ভারতীয় শিল্পচিন্তা'—এই বিষয়ে যে 'পেপার' প্রস্তুত করেছি, তার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ এখানে প্রকাশিত হল। বর্জিত এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে আছে—স্বামীজীর ব্যক্তিগত শিল্পচেষ্টার বিবরণ এবং তিনি ভারতে ও পৃথিবীর অন্যস্থানে কী পরিমাণ শিল্পনিদর্শন দেখেছেন—তার খসড়া হিসাব। প্রভূত তথ্যাদির সাহায্যে শেষোক্ত অংশে আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি—সমগ্র পৃথিবীর শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর তুল্য ব্যাপক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর কালে আর কোনো ভারতীয়ের ছিল না।

CENTRAL LIBRARY

তিনি 'হৃদয়ে মহা উৎসাহ' পেয়েছিলেন, সে কথাও; স্বামীজীর প্রেরণাতেই তিনি স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' কবিতার ভাবকে চিত্ররূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; এবং স্বামীজীর শিল্পচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে বলেছিলেন, 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত; শিল্প-বিষয়ে আপনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন; শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ-জীবনে আর কখনো শুনিনি; আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম তা যেন কার্যে পরিণত করতে পারি।' রণদাপ্রসাদের এসকল কথার অবশ্যই দাম ছিল, কারণ, শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নগণ্য ব্যক্তি নন; হ্যাভেল-সাহেব আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতি বর্জনের সিদ্ধান্ত করলে যে-সব ছাত্ররা বিদ্রোহ ক'রে বেরিয়ে এসেছিলেন, রণদাপ্রসাদ তাদের নেতা ছিলেন; তিনি ১৮৯৭ সালে বৌবাজারে আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেন ও দুই দশক সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন।[১]

রণদাপ্রসাদের নিজস্ব শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনা হয়েছিল। রণদাপ্রসাদ সুস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যের বর্জন চাইতেন না, কিন্তু পুরো বিদেশী পদ্ধতিতে দেশীয় প্রাণ মন আত্মার শিল্পগত অভিব্যক্তি সম্ভব, নিশ্চয় একথাও বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার পরে রণদাপ্রসাদ নূতন পথ বা মিশ্র পথ ধরেছিলেন, ততক্ষণ ঐ ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হবে না। রণদাপ্রসাদের শিল্পরীতিতে যদি স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হয়ও, যেহেতু তিনি শিল্প-আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত বিরাট কোনো ভূমিকা নিতে পারেন নি, তাই স্বামীজীর প্রভাবের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হবে না। আমরা জানি, হ্যাভেল-নিবেদিতার চেষ্টায় এবং অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের প্রতিভায় শিল্প-আন্দোলন প্রাচ্য ধারাতেই চলেছিল কয়েক দশক ধরে। তা ছাড়া আরও বলতে হবে, স্বামীজী স্বয়ং শিল্পী নন; সেজন্য তাঁর আঁকা ছবি দেখে কারও পক্ষে প্রেরণা পাওয়াও সম্ভব নয়, যেমন পাওয়া সম্ভব ছিল, ধরা যাক, তাঁর গদ্যরচনা থেকে, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে তিনি উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে অন্যের মাধ্যমে—শিল্পতত্ত্বে যাঁদের তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের দ্বারা, কিংবা তাঁর স্বল্প পরিমাণ শিল্প-বিষয়ক রচনা থেকে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তেজে জ্বলন্ত।

সব জড়িয়ে আমাদের বলতে হবে, স্বামীজীর প্রভাব অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু তা, অবিকল্প বলছি, মোটেই সামান্য নয়। ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতা প্রচণ্ড এক প্রেরণা—সেই নিবেদিতার ভারত-শিল্পবোধ

---

১ যোগেশচন্দ্র বাগল বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন :

"The seceders under the leadership of Ranada Prasad Gupta, a student of the third year class, started in 1897 a new school of art at Bowbazar, Calcutta. 1897 being the Diamond Jubilee Year of the Queen Victoria, the School was named the Jubilee Art Academy. A real lover of art, Ranada Prasad, though a student, conducted the school with a great zeal and courage rarely to be found in young men of little or no experience. A section of the elite of the city came to his support from the very begining and we find the Municipality of Calcutta granting pecuniary aid to the institution from time to time. The School continued to exist for more than two decades and the personal contribution of Ranada Prasad Gupta cannot be over estimated."

(*History of the Govt. College of Art and Craft*)

যোগেশচন্দ্রের রচনা থেকে রণদাপ্রসাদের সাহসিক ভূমিকার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি বোঝা যায়, শিল্পের জাতীয়করণ করতে গিয়ে হ্যাভেল 'পরানুকরণপ্রিয়' ভারতীয়দের কতখানি চঞ্চল করেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

স্বামীজীই দান করেছেন, এবং ভারতশিল্পের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পী নন্দলাল বসু প্রথমে নিবেদিতার মধ্য দিয়ে, পরে সাক্ষাৎভাবে, স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও রচনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি স্বামীজীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

এই সঙ্গে আরও জানানো যায়, ভারতের শিল্প-আন্দোলনে যাঁর বিশেষ প্রভাব, সেই ওকাকুরার বিখ্যাত 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থের অংশবিশেষে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাবই আছে। এবং, পরবর্তী কালে ভারতশিল্প ও প্রাচ্যশিল্পের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামী অবশ্যই স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাও আমাদের জানা আছে। হ্যাভেল, উড্রফ প্রভৃতিও স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে সেইকালে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা এইসব সংবাদ উপযুক্তভাবে সংগ্রহ ক'রে রাখেন নি, তাই আজ আর সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

তথাপি শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর ভাব-নেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বীকৃতি একেবারে নেই তা নয়। এই পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী, ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'আমার ধারণা, স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল।' 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (১৩৪৬) ডাঃ কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধের নামই হল—'ভারতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ নিবেদিতা অধ্যায়।' ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে শিল্পসমালোচক রূপে স্বামীজীর ভূমিকার গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ঐ সকল রচনা মূল্যবান—কিন্তু স্বামীজীর ভূমিকার মূল্যের তুলনায় অপ্রচুর। আরও সন্ধান ক'রে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ জোগাড় করতে পেরেছি। সমস্ত মিলিয়ে আমাদের এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে—বিবেকানন্দ ভারতের শিল্প-জাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্তের ঋষি। সেই সকল তথ্য-প্রমাণ আমরা ক্রমে উপস্থিত করব, তার আগে বলে নিতে চাই, বিবেকানন্দ যদি প্রত্যক্ষভাবে শিল্পবিষয়ক কোনো বক্তব্য উপস্থিত নাও করতেন তবু এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবপুরুষ তিনিই হতেন, কারণ, একালে সামগ্রিক ভারতচেতনা প্রথম তিনিই এনেছেন, ভারত-শিল্পে যা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে আলিঙ্গন ক'রে উত্থিত হয়েছিলেন, আর ভারতশিল্পেও দেখি অজন্তা, মুঘল, রাজপুত কাংড়া রীতি মিলিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য এবং মুঘল স্থাপত্যের অলঙ্করণ। ভারত-শিল্পের মূল ধারার পাশে লোকশিল্প অবলম্বন ক'রে যে স্বতন্ত্র একটি ধারা গড়ে উঠেছে, তাও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহমর্মিতা করে। 'স্বামী বিবেকানন্দ'—ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—'এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। তিনি এর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও তার পূর্ণতার প্রতীক। সেই আত্মিক শক্তিই ভক্তের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়েছেন, বাণী দিয়েছেন।'

শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের সংকলন

স্বামীজীর শিল্পবক্তব্য কোন্ কোন্ সূত্র থেকে সংগৃহীত

স্বামীজী যে পরিমাণে শিল্প নিদর্শন দেখেছেন, ও ঘরোয়া ভাবে সে সব বিষয়ে বলেছেন, সেই পরিমাণে কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা লেখায় শিল্পপ্রসঙ্গ করেন নি। সেই কারণেই এতদিন স্বামীজীর মনোজীবন ও ভাবজীবনের এই

CENTRAL LIBRARY

দিকটির উপরে উপযুক্তভাবে আলোকসম্পাত করা হয়নি। তবু নানাসূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর শিল্পধারণার একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা লাভ করেছি। স্বামীজী ধর্মবেত্তা ও ধর্মপ্রচারক, তাই ধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত বিষয়েই তিনি প্রধানতঃ কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন। তাহলেও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যখন দিতে গেছেন, তখন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা না বলে পারেন নি। যেমন ধরা যাক, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মেমফিস্ শহরে 'ভারতের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের গৌরবের কথা তিনি বলেছিলেন। 'অ্যাপীল অ্যাভালেঞ্চ' পত্রিকার ২১ জানুয়ারীর (১৮৯৪) বিবরণের মধ্যে ছিল :

'His (Swamiji's) description of the ancient mausoleums and temples were beautiful beyond comparison, and goes to show that the ancients possessed scientific knowledge far superior to the most expert artisans of the present day.' (N. D[২] p-161)

খুবই দুঃখের বিষয়, প্রাচীন মন্দিরাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর ঐ 'অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা'র কোনো অংশই উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণে নেই।

ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে রমাবাঈ-গোষ্ঠীর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কুৎসার বিরুদ্ধে স্বামীজী যখন আমেরিকায় একা প্রাণপণ লড়াই করছেন, তখন অনেক সময়েই তাঁকে পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের দানের বিষয়ে বলতে হয়েছে। ঐ ধরনের একটি বক্তৃতার রিপোর্ট বেরিয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪-এর 'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন' পত্রিকায়। বক্তৃতার মধ্যে বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, এমন কি খেলাতে পর্যন্ত ভারতের দানের কথা তিনি বলেছিলেন—শিল্পদ্রব্যের কথাও অবশ্যই বলেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবল উল্লেখের অধিক কিছুই পাই না সংবাদপত্রের বিবরণে। (এন-ডি, পৃষ্ঠা—৫০৮-৯)

সান্‌ফ্রানসিসকোয় স্বামীজী 'ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান'—এই নামেই একটি বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু অতি সামান্য কয়েক লাইন রিপোর্টের অতিরিক্ত কিছু আমাদের ভাগ্যে এক্ষেত্রেও জোটেনি। যেটুকু পাচ্ছি তার মধ্যে আছে, স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার পর বলেছিলেন—এলিজাবেথের স্বর্ণযুগও সমকালীন ভারতের তুলনায় অন্ধকারযুগ, এবং ভারত একদিন সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করেছিল। বর্তমানে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় ভারতবাসীকে, তার জন্য তাদের শিল্প ও সাহিত্য নিছক অনুকরণের বেশী কিছু নয়। (ইং-রচনাবলী, ৪র্থ)

স্বামীজীর শিল্প-বিষয়ের বক্তব্য প্রধানতঃ পাই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর ডায়েরী, প্রিয়নাথ সিংহ, সিস্টার ক্রিস্টিন ও ও ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথা, স্বামীজীর কয়েকটি চিঠি এবং 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য থেকে। শিল্প সম্বন্ধে যখনই সুযোগ ঘটেছে তখনি স্বামীজী আলোচনা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বেও স্বামীজী কতখানি উৎসাহের সঙ্গে শিল্পালোচনায় যোগ দিতেন, তা 'কাশীধামে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়।[৩]

---

২ 'N. D.' বলতে মেরী লুই বার্ক প্রণীত *Swami Vivekananda in America : New Discoveries* বোঝাবে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করেছি।

৩ জীবনের একেবারে শেষ পর্বে, ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী কাশীতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে হরিনাথ ওদদোর (স্বামী সদাশিবানন্দ) তাঁকে যেভাবে দেখেছিলেন, তার বহু কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন। তার মধ্যে স্বামীজীর শিল্পানুরাগের বিষয়ও ছিল। কালিদাস মিত্র নামক এক শিল্পকলাবেত্তা স্বামীজীর সাক্ষাতে এসেছিলেন। তিনি আসা মাত্র স্বামীজী তাঁর সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হয়ে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক : শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পবোধ

স্বামীজীর শিল্প-বক্তব্য আলোচনার আগে এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য করবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলে, অন্ততঃ সে প্রশ্ন কেউ কেউ করেছেন। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে জনৈক ইউরোপীয়ান পরিষ্কার বলেছিলেন—স্বামীজীকে তিনি ছবি সম্বন্ধে কখনো সঠিক বিচার করতে দেখেন নি, কারণ ছবি ইন্দ্রিয়জগতের ব্যাপার, আর স্বামীজী অতীন্দ্রিয় জগতের মানুষ। উক্ত ইউরোপীয়ান অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত খুব ভাল বুঝতেন। প্রিয়নাথ সিংহ 'প্রবুদ্ধ ভারতে' এক প্রবন্ধে[৪] উক্ত ইউরোপীয়ানের মতের প্রতিবাদ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—স্বামীজী শিল্পে কতখানি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলেন নি—বিবেকানন্দের চিত্রবিচার সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের মনঃপূত হতে পারেনা, যেহেতু তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য বর্তমান। উক্ত ইউরোপীয়দের বক্তব্যের আর একটি অসম্পূর্ণতার কথাও প্রিয়নাথ সিংহ বলেন নি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিল্পের যতখানি বিরোধের কথা উক্ত ইউরোপীয় বলেছেন, ততখানি বিরোধ সত্যই ছিল না; তার প্রমাণ বৌদ্ধ মঠের ও সংঘারামের শিল্প নিদর্শন। ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর সেকথা ইউরোপের ক্ষেত্রেও কি বহুলাংশে সত্য নয়? গির্জাগুলির শিল্প-নিদর্শন কোন্ সাক্ষ্য দেয়?

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ বুঝতে বিবেকানন্দের পক্ষে ইতিহাসের মধ্যে পিছুহটার প্রয়োজন ছিল না। যাঁকে দেখে স্বামীজী সর্বোচ্চ ধর্ম কী, তা শিখেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুগভীর শিল্পানুভূতিতে সর্বদা স্পন্দিত হতেন না?

স্বামীজী বলেছিলেন, 'ওরে আমাদের আর্ট যে ধর্মের একটা অঙ্গ।... ঠাকুর নিজে কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই আর্টিস্ট ছিলেন, সে বিষয়ে 'শিল্প-দীপঙ্কর' নন্দলাল বসুর উক্তি অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য :

'ঠাকুর নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈরী করতেন। শুধু idealist নয়, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভুল হলে তা ঠিক ক'রে দিতে পারতেন। মথুরবাবু একবার তাঁর করা শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কালীমন্দিরে পরে মাকে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙ্গে গেলে অতি নিপুণতার সহিত তা জুড়ে দিয়েছিলেন।

'দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে থাকতেন, তার বারদিকের উত্তর দেওয়ালে দরজার দুপাশে কাঠকয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল—৮´×৪´ আন্দাজ বড়। আমি ও প্রিয়নাথ সিংহ উহা দেখেছি। ঢুকতে বাঁদিকে একটি জাহাজ, ডানদিকে একটি আতাগাছ আর তাতে টিয়াপাখি সব বসে। ঐ ছবি দুটি কাঁচ দিয়ে দেওয়ালে ফ্রেম ক'রে

'তিনি চিত্র, আলেখ্য, প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলিতে লাগিলেন। (মনে হইল) চিত্রকর যেন শিল্পসভায় গিয়া চিত্রের বিষয়ে লেকচার দিতেছেন, চিত্রই যেন তাঁহার একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু, তিনি যেন সমস্ত জীবনব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বর্ণ সংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল বক্রভাবে বা অন্যভাবে দাঁড়াইলে যে নানাপ্রকার ভাবব্যঞ্জক হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বহুপ্রকার কহিতে লাগিলেন।.....তাহার পর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন ও ভারতের..... নানা সময়ের চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন।'

৪ *Swami Vivekananda and Art* (P. B. Nov. 1906)

CENTRAL LIBRARY

দেবার জন্যে রামলাল দাদাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। পরে গিয়ে দেখি, উহার উপর চুণকাম ক'রে ঢেকে ফেলা হয়েছে।[৫] তাঁহার ছেলেবেলায় কামার পুকুর থাকার সময় ঐরূপ বহু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬] দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময়ে পোটোদের সর্বদা গাইড করতেন। তিনি প্রতিমার উপরে চালচিত্র আঁকার ভারও কখনও কখনও নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁহার ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন ক'রে দিতেন। তিনি একজন সহজ শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন? ছবি দেখতে বড় ভালবাসতেন, কাহারও ভাল ছবি থাকলে দেখবার জন্য ব্যগ্র হতেন।

'আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হল, তাঁর প্রথম সমাধি হয়েছিল বর্ষায় কাজল-কালো মেঘের কোলে সাদা বকের পাঁতি দেখে। তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গি হুবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর শিল্প-বিষয়ে যা জানা ও থাকা দরকার, তিনি সবই জানতেন। আমার মনে হয় স্বামীজী তাঁর নিকট প্রথমে শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁর প্রতিভার অন্ত ছিলনা। ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার স্বামীজীর observation-এ চাতক পাখি ও চামচিকের মধ্যে

---

৫ ছবি দুটিকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা নন্দলাল করেছেন। শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর 'শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল' গ্রন্থে নন্দলাল-কৃত উক্ত প্রতিলিপি দুটি রয়েছে।

৬ শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পপ্রতিভার সংবাদ স্বামী সারদানন্দের 'লীলা প্রসঙ্গে'র মধ্যে পাওয়া যায়। 'পূর্বকথা ও বাল্যজীবন' খণ্ডেই এ-সম্বন্ধে বেশী সংবাদ আছে। 'বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি' প্রসঙ্গে পাই, গদাধর গ্রামের কুমোরদের কাছ থেকে মূর্তি গড়া শিখে তাকে নিজের অন্যতম ক্রীড়াবস্তু করেছিলেন। তারপর 'পটব্যবসায়ী-গণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল।' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগড়া তাঁর অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতা স্বীকৃতও হয়েছিল। সংকীর্তন ও যাত্রাভিনয়ে ঝোঁক বেড়ে যাওয়ায় অবশ্য গদাধর চিত্রবিদ্যা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা হ্রাস পায়নি; তার দৃষ্টান্ত সারদানন্দ দিয়েছেন: 'গৌরহাটি গ্রামে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল, এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্পদিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর এইভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা ও তৎস্বামীর নিকট সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।'

'লীলা প্রসঙ্গ' থেকে জেনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পপ্রতিভা তাঁর জীবনে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্মিত শিবমূর্তির শিল্পসৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মথুরবাবু তাঁকে মন্দিরের পূজায় নিয়োগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের গোবিন্দর মূর্তির পা ভেঙে গেলে নিজে জুড়ে দিয়েছিলেন। ভক্তিভাবের দিক থেকে ঘটনাটির মূল্য যেমন, শিল্পের দিক থেকেও তা কম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নানা ছবি টাঙানো থাকত। ছবিগুলি অবশ্যই ভক্তিমূলক। বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু ধর্মাচার্য শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ছবি সেখানে ছিল, যীশুর ছবিও ছিল। ম্যাডোনামূর্তি তিনি ভালবাসতেন। ছবি দেখবার জন্য তিনি বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডে পাই, ১৮৮৫, ২৮ জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন পৌরাণিক ছবি দেখেছিলেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি 'ইংরেজি ছবি' না রেখে ঐ সব ছবি রাখার জন্য গৃহস্বামীর প্রশংসাও করেছিলেন। ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের

CENTRAL LIBRARY

তফাত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত।...স্বামীজী প্রথমে ঠাকুরের নিকট শিল্পবিষয়ে অনেক জেনেছেন। আর সিস্টার [নিবেদিতা] পরে স্বামীজীর কাছ থেকে সৌন্দর্যবোধ, রুচিবিজ্ঞানও শিখেছেন :

বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের শিল্পদৃষ্টির চমৎকার তুলনাও নন্দলাল করেছেন :

'শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মত, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics-পথের সাধন ও পূর্ণতা। আর ঠাকুরের ছিল aesthetics-এর পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ। দুজনারই ছিল aesthetics ও জ্ঞানের পূর্ণতা, কেবল পথ-চলার process ভিন্নরকম। আমার মনে হয়, ঠাকুরের অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশী উপযোগী। শিল্পীরা সব সময়েই ঐ পথে চলেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী, জ্ঞানের উপাসক নিরাকারবাদী। তবে অনুভবের পথে চলে, জ্ঞান না থাকলে শিল্পীর পতন হবার সম্ভাবনা। আবার জ্ঞানীর পক্ষে অনুভব রসের সাধনে পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। তবে প্রফেটদের কথা আলাদা। তাঁদের সবই দুর্জ্ঞেয়।'[৭]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু মন্তব্য

শিল্পালোচনায় স্বামীজীর মূল কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে আসার আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের উল্লেখ করতে পারি।

ইউরোপীয় শিল্পকলার ব্যাপারে স্বামীজী স্বভাবতঃই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করেছেন। পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কিন্তু ডাচ শিল্প তাঁকে খুশি করতে পারেনি। শেষোক্ত বিষয়ে যথেষ্ট অবহেলার সঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিলেন :

'ভিয়েনা শহরে চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর-কতক ধরে এক জুড়ি মাছ এঁকেছে; এক থাল মাংস; না হয় এক গ্লাস জল—সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমৎকারজনক। কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুম্ভিগির পালোয়ান।'

সুবিখ্যাত ডাচ-শিল্প এবং তার অধিকতর খ্যাতনাম্নী মাংসল মহিলাগণ সম্বন্ধে স্বামীজীর সাপট মন্তব্য অনেককেই ব্যস্ত করবে।

ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারে স্বামীজী, এককথায়, ফ্রান্সের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কোনো নির্দিষ্ট শিল্পসৃষ্টি নয়—সর্বাঙ্গীণ ফরাসী শিল্পসংস্কৃতির অত্যুচ্চ প্রশংসাই তিনি করেছেন। উল্টোপক্ষে জার্মানী বা ইংলণ্ড এইক্ষেত্রে তাঁর উচ্চহাস্য-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর তুলনা এইভাবে করেছেন—

'কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস—আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানীর স্থূল হস্তাবলেপ। প্যারিসের মত পাশ্চাত্ত্যজগতে আর নগরী নাই; সব

ভক্ত সুরেশ মিত্র যে নববিধানের ছবি করিয়েছিলেন, তা টাঙানো ছিল। ছবির বিষয়বস্তু 'পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন।'

৭ শ্রীঘরেন্দ্রনাথ নিয়োগী 'শিল্প জিজ্ঞাসার শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল' নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান বই লিখেছেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা সম্বন্ধে নন্দলালের অনেক বক্তব্য রয়েছে। সেখান থেকেই নন্দলালের কথাগুলি সংকলিত।

CENTRAL LIBRARY

প্যারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্মসৌন্দর্য—জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকাতে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানীর রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান-প্রতিভার মধুর হাস্যবিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসী সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তুরীর মত, এক মুহূর্তে উড়ে ঘরদোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারী, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মান, ফরাসীর নকলে বড় বড় অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি, অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন; কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, এ-বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে।' ('পরিব্রাজক')

ফ্রান্সের সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশের ভোগবিলাসের তুলনা ক'রে সালঙ্কার তীব্র পরিহাসের সঙ্গে স্বামীজী একবার যা বলেছিলেন, তা শিল্পসংস্কৃতির প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য:

'অন্যদেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ; প্যারিসের, সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া। বুনো শোরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখম-ধর নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।' ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য')

এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—তাঁর কাছে ইংরেজি শিল্প, যা সমস্ত ইউরোপের উপহাসের বস্তু—কোন্ চোখে ধরা পড়বে, তা না বললেও চলে। বিলেতী কলাশিল্প সম্বন্ধে অতীব অশ্রদ্ধার মন্তব্য তিনি করেছেন। ইংরেজ, জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাদের জীবনে যেটুকু সৌন্দর্যবোধ, তা এসেছে প্রাচ্যের সংশ্রবে। ইংরেজ-জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি, আর ভারতের আর্ট—স্বামীজী বলতে চেয়েছেন।

ভারতের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার মধ্যে মধ্যযুগের মুঘলশিল্পের প্রতি তাঁর সবিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কুড়ি বছর যিনি কার্যতঃ ভারতসম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই 'জগতের আলো' নূরজাহানের অপূর্ব আকর্ষক বর্ণনা দেবার সময়ে স্বামীজী তাঁর শিল্পপ্রীতির কথা জানাতে ভোলেন নি। 'নূরজাহানের রূপকে ধারণ ক'রে সোনার মূল্য গেছে বেড়ে'—নূরজাহানের মুখাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার উপরে জাহাঙ্গীর কথাগুলি লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন—সেই নূরজাহানের ও জাহাঙ্গীরের শিল্প-ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন:

'নূরজাহানের আধিপত্যকালের মধ্যেই স্থাপত্যের নব্যরীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। আকবরের লালপাথরের পুরুষোচিত বলিষ্ঠ সৌধের স্থান গ্রহণ করল রমণীয় স্থাপত্যরীতি—এলো শুভ্রমর্মর, তাতে খচিত হল নানামূল্যের প্রস্তর; অমসৃণ রক্ত প্রস্তরের স্থানে বহুমূল্য মাণিক্য-অলঙ্কৃত দেওয়াল; মধ্যএশিয়ায় মালভূমির বলবীর্যের পরিবর্তে পারস্যের সুচারুকোমল লাবণ্য। পরবর্তীকালের জন্য এই রীতির দান—তাজমহল এবং আগ্রা দিল্লী ও লাহোরের মর্মর প্রাসাদগুলি। যমুনার অপর পারে ইতমদউদ্দৌলা নামে যে চমৎকার সমাধিসৌধটি রয়েছে, তা নূরজাহান তাঁর পিতার স্মৃতিতে নির্মাণ করেছিলেন। নূতন স্থাপত্যরীতির প্রথম সৃষ্টিগুলির এক একটি। শোনা যায়, এর গায়ে পাথরগুলি বসিয়েছিল নূরজাহানের ক্রীতদাসেরা। এই প্রাথমিক অসম্পূর্ণ চেষ্টার সঙ্গে পরবর্তী তাজমহলের পূর্ণ নিখুঁতরূপের তুলনার ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক হবে। তাজমহলে একটি গোলাপের পাপড়ির চারু বর্ণরূপ ফোটাতে চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন ধরণের লালপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। নৈপুণ্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি।

CENTRAL LIBRARY

'আগ্রা প্রাসাদে সমনবুর্গ নামে নূরজাহানের নিজ মহলটি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে সজ্জিত করা হয়েছিল। শিল্পকলার তিনি যথার্থ পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন।' (ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা থেকে)

স্বামীজী স্বভাবতঃই মুঘলযুগে শিল্পপোষ্টারূপে অনতিক্রান্ত ভূমিকা যাঁর, সেই সাজাহানের মুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন। মুঘল রাজাদের শিল্পপ্রীতির সম্বন্ধে স্বামীজীর আবেগপূর্ণ প্রশংসার কিছু বিবরণ নিবেদিতা দিয়েছেন তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থের মধ্যে।—"হয়ত-বা তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের বা মোগল বংশের ইতিহাসের সারসঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম-ঋতুটিতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে 'একটি ক্ষীণালোক স্থান —তারপর একটি ক্ষীণালোক স্থান—তারপর একটি সমাধি'—এইরূপে বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, আহা তিনিই মোগলকুলের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যচেতনা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তিনি নিজেও আবার শিল্পী। আমি নিজে তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি—সেটি ভারতের অন্যতম শিল্পসম্পদ। কী প্রতিভা।"

তাজমহলের ভাবসত্যের কথা স্বামীজী অন্যত্রও বলেছেন, আমরা পরে উদ্ধৃত করব। আলোয়ারের স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধেও তাঁর সমাদরের পরিচয় পরে দেব।

হিন্দু ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দ

হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রেই আমরা স্বামীজীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাই। এক্ষেত্রেই স্বামীজী অংশতঃ পথিকৃতের মর্যাদা পাবার যোগ্য। স্বামীজীর নিজের চিন্তার মধ্যে কিছু বিবর্তনও ঘটেছিল। সাবধানে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

গোড়ায় হিন্দু ও গ্রীক—এই দুই শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী কী বলেছেন দেখে নেওয়া উচিত। তারও আগে জানাতে পারি, স্বামীজী নানা প্রসঙ্গে বহুবার হিন্দু ও গ্রীক, এই দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্তর্মুখী অধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দুসভ্যতায়, বহির্মুখী ঐহিক ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রীকসভ্যতায়। মাদ্রাজে ১৮৯৭, ফেব্রুয়ারী মাসে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতার সূচনায় হিন্দু ও গ্রীকসভ্যতার বিশেষ চরিত্রের পিছনে কোন্ নৈসর্গিক প্রভাব ছিল, তা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং সেইসঙ্গে কী ধরনের সৃষ্টি উভয় ভূমিতে ঘটেছিল তাও বলেছিলেন :

'পৃথিবীতে আশ্চর্য দুই জাতি দেখা গিয়েছে ; তারা একই উৎস থেকে উত্থিত হয়েও ভিন্ন পরিবেশে স্থাপিত হয়ে, ভিন্ন ঘটনাচক্রে নিজেদের জীবনসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে নিজস্ব বিভিন্ন পন্থায়। আমি এখানে প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথাই বলছি। উত্তরে তুষারশীর্ষ হিমালয়ের দ্বারা আবদ্ধ, প্রবহমাণ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত স্বচ্ছমলিন নদীধারার দ্বারা সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত, চারিদিকে অনন্ত অরণ্য, যেন পৃথিবীপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—এই পরিবেশে অবস্থিত থেকে ভারতীয় আর্যগণের মন অন্তর্মুখ হয়েছে ; তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং অতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্ক এই সুমহান প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বতঃই আত্মানুসন্ধানপ্রিয় হয়েছিল। নিজ মনের বিশ্লেষণই ছিল ভারতীয় আর্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে গ্রীকরা পৃথিবীর যে-অংশে উপনীত হয়েছিল, সেস্থানের নিসর্গপ্রকৃতি যতখানি না সুমহান, সুগম্ভীর, ততোধিক সুন্দর—দ্বীপপুঞ্জের মনোরম ভূখণ্ডগুলির সহজ অথচ বর্ণাঢ্যরূপ—সেই পরিবেশে স্বভাবতঃই বহির্মুখ হয়েছিল তাদের মন। তারা বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল বিশেষভাবে।'

CENTRAL LIBRARY

হিন্দুর অন্তর্মুখ মনঃস্বভাবকে তার সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে দেখা যায় এবং সমগ্র প্রাচ্যভূমে তার প্রভাব রয়েছে। অপরদিকে গ্রীসের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে। পূর্বোক্ত বক্তৃতাতেই স্বামীজী বলেছেন :

'ইংলণ্ড, শুধু ইংলণ্ড কেন সমগ্র ইউরোপ তার সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ইউরোপের সবকিছুর মধ্যেই গ্রীসের কণ্ঠস্বর। প্রতিটি সৌধ, তার আসবাবপত্র, সরঞ্জাম—সর্বত্রই গ্রীসের ছাপ। ইউরোপের কলাশিল্প ও বিজ্ঞান—সবই গ্রীসের ছায়ায় সৃষ্ট।'

গ্রীকশিল্প ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা স্বামীজী নিম্নোক্ত প্রকারে করেছেন :

'গ্রীক আর্টের মূল কথা প্রকৃতির হুবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল উদ্দেশ্য আদর্শকে প্রতিফলিত করা। গ্রীক শিল্পের শক্তি ব্যয়িত হয়, ধরা যাক, একখণ্ড মাংসের যথাযথ চিত্রণে; সে কাজে তার এমনই সাফল্য যে, একটি কুকুর পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে সেটিকে আসল মাংস বলে মনে করে এবং কামড়াতে যায়। কিন্তু প্রকৃতির এই নিছক অনুকরণে গৌরব কোথায়! কুকুরের সামনে একখণ্ড আসল মাংসই ছবির বদলে ফেলে দাও না কেন!

'অপরদিকে আদর্শকে—অতীন্দ্রিয়কে—পরিস্ফুটন ভারতের অভিপ্রায়। তার পরিণতি বিকট সব মূর্তি রচনায়। খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা মাটি থেকে ওঠে, সেখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকে, তবুও তার পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে। সুতরাং শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু, প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।' (ইংরাজী গ্রন্থাবলী, ৫ম)

শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজী বস্তুবাদী নন, আবার বিশুদ্ধ রসবাদী বা কলাকৈবল্যবাদীও নন—তিনি ভাববাদী। জীবনে থাকবে মহৎ উদ্দেশ্য; জীবনের অন্যতম প্রকাশক্ষেত্র শিল্পেও থাকবে তাই—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সুতরাং তাঁর মতে, 'স্থাপত্য ও বাড়ির মধ্যে তফাৎ হল, প্রথমটি একটি ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরটি নিছক একটি কাঠামো, প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী। কী পরিমাণে ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছে, তার উপরে কোনো জিনিসের মূল্য নির্ভর করে।'

স্বামীজী গ্রীক শিল্পের সমঝদার ছিলেন আমরা জানি, এবং গ্রীকস্থাপত্য যে ক্ষেত্রবিশেষে ভাবপ্রকাশক, এও তিনি নিশ্চয় স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, ভারতীয় স্থাপত্যে ঐ ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্য অধিকতর।[৮]

---

৮ পাশ্চাত্ত্যশিল্প ভাবপ্রকাশক নয়, এই ছিল স্বামীজীর বক্তব্য, এমন যেন কেউ মনে না করেন। নানাপ্রকার ভাব ও কল্পনা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্যশিল্প প্রকাশ করেছে এবং স্বামীজী তার কিছু কিছু নমুনার সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন, তবে তিনি সর্বোচ্চভাব অর্থাৎ সুগভীর আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্ত্যশিল্প যথেষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে, এমন মনে করতেন না। স্বামীজী এল গ্রেকোর ছবির সঙ্গে কতখানি পরিচিত ছিলেন জানিনা। যদি থাকেনও, এল গ্রেকোর লৌকিক ছন্দ-ভাঙা আধ্যাত্মিক ছাঁদকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শিল্প বলতে পারতেন না নিশ্চয়, কারণ, সেখানে মিষ্টিক রহস্যময়তা থাকলেও স্পিরিচুয়্যাল প্রশান্তি লাবণ্য ছিল না।

পাশ্চাত্ত্য-ভাস্কর্যের কল্পনামুখিতার তারিফ স্বামীজী কিভাবে করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত প্রিয়নাথ সিংহের *Swami Vivekananda and Art* (P. B. Nov. 1906) নামক রচনার মধ্যে পেয়েছি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্যারিস প্রদর্শনীতে বহু চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। প্রদর্শনীর সচিত্র রিপোর্টে মুদ্রিত একটি ভাস্কর্যের ছবি দেখিয়ে তার বিশেষ প্রশংসা স্বামীজী করেছিলেন। দুটি মূর্তি ছিল ঐ ভাস্কর্যে—একটি নারীর, অন্যটি

CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় শিল্প এবং গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না। ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সর্বব্যাপক পরিচয়ের অভাবে গোড়ার দিকে তাঁর ধারণা ছিল—মূর্তিশিল্পের দিকে দিকে ভারতের চেয়ে গ্রীস অগ্রসর। আগেই বলেছি, তিনি ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পীঠস্থান উড়িষ্যায় যান নি। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবজাত পূর্বোক্ত ধারণাকে তিনি পরে সংশোধন করেন। ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারী মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ভারত ও ইউরোপের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজী কিছু মন্তব্য করেছিলেন, তার অংশবিশেষ আমাদের আলোচনার পক্ষে খুবই দরকারী :

"পাশ্চাত্ত্যের অন্য সবকিছুর মধ্যে আমি রোমকে সর্বাধিক উপভোগ করেছি। পম্পেই দেখার পরে আমি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার বিষয়ে শ্রদ্ধা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি বাদ দিলে বাকি সবকিছুই তাদের ছিল—আর আধুনিকদের চেয়ে অনন্ত গুণ বেশী তাদের শিল্পবোধ এবং তাকে রূপায়িত করার ক্ষমতা।

"মিস লককে বলো, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম—'মানবমূর্তির ভাস্কর্যসৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি'—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যে সব গ্রন্থ এখন পড়ছি তাতে দেখছি, উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয় নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে-কোনো গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি সেখানে আছে—লোলচর্ম প্রকাণ্ড নারী-কঙ্কাল—যার অবয়বসংস্থানের নিদারুণ বাস্তবতা ভয়ঙ্কর ও পীড়াদায়ক। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন অলিন্দের একটি নারীমূর্তি একেবারে ভেনাস ডি মেডিচির মত। এইরকম আরও। অবশ্যই মনে রেখো, মূর্তিদ্বেষী মুসলমানেরা প্রায় সবকিছু ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। তবু যা আছে তা সমগ্র ইউরোপের ধ্বংসস্তূপ জুড়লে যা হয়, তারও চেয়ে বেশী। আমি আটবছর ভারতে ঘুরেছি, তবু অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিই দেখা হয়নি।

"ভগিনী লককে বলো, ভারতের অরণ্যের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে, ফার্গুসন সেটিকে এবং গ্রীসের

পুরুষের। পুরুষটি হল শিল্পীর প্রতিভূ, তার ডান হাতে শিল্পযন্ত্র, সে হাতটি রমণীমূর্তির হাঁটুর ওপরে আলতোভাবে পড়ে আছে—অন্য হাতে সে রমণীর অবগুণ্ঠন মোচন করছে—তা করার কালে যেটুকু দেখতে পেয়েছে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। ভাস্কর্যের তলায় নাম দেওয়া হয়েছে 'শিল্প এবং প্রকৃতি' ('Art et Nature')। "স্বামীজী মন্তব্য করলেন : ওখানে লেখা উচিত ছিল—'আর্ট উন্মোচন করছে প্রকৃতিকে'। শিল্পী অদীক্ষিত দর্শকের চোখের সামনে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুলে ধরে। মুখ একই—কিন্তু অন্তরের বিভিন্ন অনুভূতি যেমন তাতে বিভিন্ন আলোকসম্পাত করে, তেমনি একই নিসর্গপ্রকৃতি শিল্পীর কাছে নানা ভাবের আকর হয়, নানারূপে বিকশিত হয়। প্রকৃতি তার প্রিয় উপাসক শিল্পীর কাছে অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে দেয়। প্রকৃতির লজ্জাগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের দু'একটি ঝলক শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে—তাকেই স্থায়ীরূপ দেয় সে। এই হল শিল্পীর আসল কাজ। ঐ ভাস্কর্যটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর নয়নের আরাধনা-দৃষ্টি ; তার শরীরের আনতভঙ্গি, মাথার হেলানো ছন্দ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থানের রূপ—সবকিছুই শিল্পী ও তার দেবীর পবিত্র সম্পর্ককে প্রকাশ করছে। শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্কের পূর্ণরূপের ধারণা করবার পরেই ভাস্কর এই মাস্টারপিস সৃষ্টি করেছেন।"

রণদাপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে কথা বলার সময়েও প্যারিস প্রদর্শনীর ঐ ভাস্কর্যটির কথা স্বামীজী বলেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

পার্থিননকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পের চরম শিখর মনে করেন—একটি ভাবকল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যটি ঐ কল্পনার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি রূপের প্রকাশক। পরবর্তী মুঘল সৌধাবলী ইত্যাদি ভারত-সারাসেন স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কোনভাবেই তুলনায় দাঁড়াতে পারে না।"

এখানে সময়ের একটু হিসাব নেওয়া দরকার। ৮৯৭, ৩ জানুয়ারীতে স্বামীজী যখন ঐ চিঠি লিখছেন, তখন তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ শেষ ক'রে ভারতের পথে; এখনো দেশে পৌঁছন নি। সুতরাং নতুন ক'রে এদেশের শিল্পনিদর্শনগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ তাঁর হয় নি। তবু ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর মত বদলালো কি ক'রে—কি ক'রে সেগুলিকে তিনি গ্রীকমূর্তির সমতুল মনে করলেন? তা কি ফার্গুসনের গ্রন্থের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ের ফলে? ফার্গুসনের বই কি তিনি আগে পড়েন নি? ঐ চিঠিতে অন্য বিশেষজ্ঞদের কথাও তিনি বলেছেন—তাঁদের মধ্যে কি *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন? উড়িষ্যার শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে ঐ বিখ্যাত গ্রন্থও কি তিনি পড়েন নি? স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় কিন্তু দেখেছি, তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থ পড়তে দেখেছিলেন। আমাদের কি ধরে নিতে হবে—বিদেশের মিউজিয়ামে বিদেশীয় নিদর্শনের পাশাপাশি এদেশীয় শিল্প নিদর্শন দেখে (এবং তার বিষয়ে আরও অবহিত হয়ে) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল? স্পষ্ট উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।[৯]

হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গ্রীক-প্রভাব নিয়ে বিতর্ক—ফার্গুসন ও কানিংহামের সঙ্গে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতসংঘর্ষ।

এইবার একটি প্রশ্ন করা চলে—ভারতীয় শিল্পে গ্রীকপ্রভাবের অতিরঞ্জিত ইউরোপীয় থিয়োরীর বিরুদ্ধে স্বামীজীর অধুনাখ্যাত মনোভাব কখন গঠিত হয়েছিল? ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে ন্যূন নয়, এই ধারণার

---

৯ খুব বিস্ময়ের কথা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' স্বামীজী শিল্পবিষয়ে আলোচনাকালে শিল্প-ভাস্কর্যে পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় ভারতবর্ষের ন্যূনতার কথা বলেছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' উদ্বোধনে ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেরিয়েছিল। কিন্তু বইটি কখন লেখা হয়? বইটির রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয়, ধারাবাহিকভাবে বইয়ের সব অংশ লেখা হয়নি। যতদূর ধারণা, স্বামীজী এটি ১৮৯৭-১৮৯৯-এর মধ্যে লিখেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামীজীর নিয়ে উদ্ধৃত মন্তব্যের কালগত সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, যখন আমরা জানি, স্বামীজী ১৮৯৭-এর গোড়ায় মিস লককে লেখা চিঠিতে ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় গ্রীকভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব-ধারণা প্রত্যাহার করেছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে'র পরিশিষ্টে স্বামীজী লিখেছেন: 'ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্যবিদ্যা হতে আমাদের এখনো ঢের দেরী। ওছুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখ না—জগন্নাথেই মালুম।'

স্বামীজীর রচনার এই অংশ কি ১৮৯৭-এর আগে লেখা? সম্ভবতঃ তাই। ১৮৯৭-এর আগে পাশ্চাত্ত্যদেশে থাকা কালেই মনে হয় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনা বিচারের ঐ লেখাটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

উদ্ভবের কালেই কি তা জেগেছিল—যখন তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করেছিলেন? এই প্রশ্ন মীমাংসার প্রয়োজন আছে, কারণ, আমরা দেখব, পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের তত্ত্বভিত্তি যাঁরা নির্মাণ করতে চেয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্বামীজীর মতের অনুবর্তী হয়েছিলেন। কি ভাবে তা হয়েছিল ক্রমে তার পরিচয় দেব।

ভারতীয় পুরাকীর্তির আবিষ্কার এবং তার পরিচায়ক গ্রন্থাদি থেকেই শিক্ষিত সমাজে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, একথা স্বীকার্য। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাথমিক প্রয়াস শ্রদ্ধাযোগ্য। কিন্তু বিপুল পরিণাম ভারতীয় শিল্পনিদর্শন ইউরোপীয় সভ্যতার গর্বকে কিছু পরিমাণে আহত করেছিল এবং সাম্রাজ্যস্বার্থের ক্ষতির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল সেই সঙ্গে। নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি থেকে জাতীয়তার বৃদ্ধি ঘটে—পরাধীন ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদীরা পছন্দ করবেন, এমন আশা করা যায় না। তাই ভারতীয় পুরাকীর্তির পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানানোর প্রয়োজন হয়েছিল—এইসব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যেরই দীর্ঘ বিস্তারিত হস্ত, অর্থাৎ—ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু মিশ্র শিল্প, যার নাম গান্ধার শিল্প, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সুবিধা ক'রে দিয়েছিল। ইউরোপীয়রা একথা ব'লে এবং ভারতীয়রা একথা জেনে পুলকিত হয়েছিল যে, ভারতের দর্শন, কাব্য, নাটক, শিল্প সবই গ্রীসের ছায়াশরীর। ইউরোপীয়দের আনন্দের কারণ সহজেই বোধগম্য। ভারতীয়দের উল্লাসের হেতুও একেবারে দুর্বোধ্য হবে না যদি একবার সেকালের মনের চেহারাটা ভেবে নিই। কী কাণ্ড! আমরা ভারতীয়রা, ইউরোপের অন্যান্য অংশের মতই গ্রীসের দুলালী!![১০]

ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব খণ্ডনের চেষ্টাও ভারতীয়দের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ নাম—অসাধারণ এক মনস্বীর নাম—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[১১] রাজেন্দ্রলালই বোধহয় সর্বপ্রথম ভারতশিল্পের উপরে গ্রীক প্রভাব খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ নন (যেমন অনেকের ধারণা), এবং সে কাজ তিনি করেছিলেন—স্বামীজী যখন নিতান্তই বালক। তাঁকে এই কাজে নেমে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সে সংগ্রামে বিস্ময়কর সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন—শেষে বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে তিনি তাঁর বক্তব্যের পক্ষসমর্থন আদায় ক'রে নিতে পেরেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের দেশানুরাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লড়াইয়ের সময়ে ভাবাবেগ নয়, পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতাকেই অস্ত্র করেছিলেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে মহেনজোদড়ো-হরপ্পার আবিষ্কার-সিদ্ধান্ত পরিজ্ঞাত হবার অনেক আগেই, তৎকালে প্রাপ্ত নিদর্শনের উপর নির্ভর করেই, রাজেন্দ্রলাল হিন্দুস্থাপত্যের মূলে গ্রীকপ্রভাব তত্ত্বের নিরাকরণে সফল হয়েছিলেন। মহেনজোদড়ো আবিষ্কারের পরে ভারতশিল্পের উপর গ্রীকপ্রভাব সম্বন্ধে ফার্গুসন প্রভৃতির একগুঁয়ে থিয়োরী চরম হাস্যকর বলে বাতিল হয়ে গেছে।

---

১০ ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'বিশ্ববিবেক' (১৯৬৩) গ্রন্থভুক্ত 'শিল্পান্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব' নামক রচনায় প্রাচ্যপুরাকীর্তির সমৃদ্ধি দেখে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব কি রকম চমকিত হয়েছিল, সে বিষয়ে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করেছেন।

১১ এই বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। পরে দেখেছি, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন প্রিয়নাথ সিংহ।

CENTRAL LIBRARY

স্বামীজী এইক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আগেই দেখেছি, স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, তিনি কুড়ি-একুশ বছরের নরেন্দ্রনাথকে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' বইটি পড়তে দেখেছিলেন। এই বইয়ের মধ্যেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকটি বইয়ের মতই গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন।[১২]

রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যের রেখাবিন্যাস এখানে করার দরকার আছে। প্রথম কারণ, গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে স্বামীজী যেসব যুক্তি এনেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই না; রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য সেই শূন্য পূরণের কাজে আমাদের সাহায্য করবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে প্রাথমিক-ভাবে নিশ্চয়ই উপস্থিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আমরা এও দেখব, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। কোথায় তা করেছিলেন, তাও জানা দরকার।

৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ তারিখে লিখিত 'ইন্দো আরিয়ান্স' গ্রন্থের ভূমিকায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংক্ষেপে হিন্দু-স্থাপত্যের উৎস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ও তাকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্কের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার রচনাটি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরী করার কাজ হিন্দুরা গ্রীক-বিজেতাদের কাছ থেকেই প্রথম শিখেছিল, এই ধারণা তখন খুব প্রচলিত ছিল—তারই প্রতিবাদে ঐ রচনাটি লিখেছিলাম। মিঃ ফার্গুসন ১৮৭১ সালের 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়েরি'র পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্যের সমালোচনা করেন। পরে আমার 'অ্যান্টিকুইটিস অব উড়িষ্যা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমার বক্তব্য আবার বেরোয়। তার বিরুদ্ধে মিঃ ফার্গুসনের দ্বিতীয় সমালোচনা বেরোয় তাঁর 'হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ আর্কিটেক্চার' গ্রন্থের মধ্যে। আমার উত্তর বেরোয় আমার 'বুদ্ধ গয়া' গ্রন্থে।"

ইতিহাসের যুক্তিকে ইতিহাসের দ্বারা খণ্ডন করার চেষ্টা না ক'রে ফার্গুসন কিরকম অযথা নিন্দাভাষণের মধ্যে নেমে পড়েছিলেন, সেকথা রাজেন্দ্রলাল অতঃপর জানিয়েছেন।—রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামক 'বাবুটি' ইতিহাসকে অথরিটি না ক'রে নিজেকে অথরিটি করেছেন, সেজন্য তাঁর কথা মোটেই ধর্তব্যের নয়—ইত্যাদি কথা যথেষ্ট ঘৃণার সঙ্গে ফার্গুসন লিখেছিলেন। তাঁর ভাষাতেই তাঁর কথা কিছু শোনা যাক:

'By his (Rajendralal's) ambition to be considered an archaelogist of the European type, led him to neglect a task for which he was preeminently fitted, and to waste his time instead in inventing improbable myths to explain the sculptures in the caves'.

---

১২ স্বামীজীর উপরে রাজেন্দ্রলালের রচনাবলীর প্রভাবের কথা নিবেদিতাও লিখেছেন:

"আমাদের আচার্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, সেইসময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইসময়ে ইংরেজরাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার বৃহৎ মন্দিরের পুনরুদ্ধারকার্য সাধিত হইতেছিল, এবং বাঙালী পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐ কার্যে যোগদান করায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোক ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ মাতিয়া ওঠেন।...ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলী এবং [এডউইন আর্ণল্ডের] 'লাইট অব এশিয়া' পাঠ স্বামীজীর জীবনে ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র হয় নাই।" ['দি মাস্টার']

নিবেদিতা অবশ্য এখানে স্বামীজীর জীবনে বৌদ্ধপ্রভাবের দিকটির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের রচনার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় তাঁকে শিল্পক্ষেত্রেও কম উৎসাহিত করেনি, তা আমরা দেখতে পাই।

CENTRAL LIBRARY

এই সকল অভদ্র গালি-গালাজের প্রত্যেকটিকে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে ফার্গুসনকে প্রত্যাহার ক'রে নিতে হয়, কারণ তিনি রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল নির্মম ভদ্রতার সঙ্গে ফার্গুসনের গোঁড়ামি এবং অসংলগ্ন যুক্তির ভ্রান্তিকে খুলে ধরেছিলেন।

গ্রীকপ্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে ফার্গুসন প্রভৃতি কয়েকজনের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক।

ফার্গুসন বলেছিলেন :

'The Indian first learnt this art from the Backtrain Greeks.'

(*History of Architecture*)।[১৩]

'We are not surprised to find wooden forms copied in stone in the early cave of the Buddhists about the Christian era, because we know that no stone architecture existed in India till the Greeks taught them the use of the more durable material'.

(*Architecture at Beejapoor*)।[১৪]

'It may create a feeling of disappointment in some minds when they are told that there is no stone architecture in India older than two-and-a-half centuries before the Christian era.'

(*Eastern Architecture*)।[১৫]

ফার্গুসনের এই ধরনের আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে।

মিসেস ম্যানিং একই কথা পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন :

'Alexander the Great left Greek and other foriegn artists in India, about the year B. C. 326 ; and sculptures found in Kashmere, and coins struck in mints established on the Indus, give undoubted signs of Greek influence at dates somewhat earlier than our own era ; while no Buddhist monument claims to be earlier than about B. C. 247.'

(*Ancient and Mediaeval India*)।[১৬]

গ্রীকরা যদি ভারতীয়দের পাথরের বাড়ি তৈরী করতে শেখায়, তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ভারতের প্রাসাদগুলি কিসের তৈরী ছিল? সুস্পষ্ট সাহেবী উত্তর—সেগুলি খড়ের চালের প্রাসাদ ছাড়া কিছু নয়। হুইলার তাঁর 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া'তে বললেন, দশরথের প্রাসাদের চারধারে যে প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে, তা কাঁটাগাছের বেড়া ছাড়া কিছু নয়। মহাভারতের কালেও একই অবস্থা; হস্তিনাপুরের প্রাসাদ-দুর্গ সবই কাদা-মাটি-বাঁশের তৈরী।

ফার্গুসন প্রভৃতির খণ্ডনে রাজেন্দ্রলাল কী বলেছিলেন সংক্ষেপে দেখা যাক। যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ রাজেন্দ্রলাল নিজ বক্তব্যের সমর্থন করেছিলেন, স্বভাবতঃই আমার এই সারসংক্ষেপের মধ্যে তাদের উল্লেখ থাকবে না।

---

১৩ *The Antiquities of Orissa*, Vol I গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৪ ঐ

১৫ *Indo Aryans* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৬ *The Antiquities of Orissa*, vol I গ্রন্থে উদ্ধৃত।

CENTRAL LIBRARY

যে-কালের আলোচনার কথা বলছি, সেকালে তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় স্থাপত্যনিদর্শন খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অশোকস্তম্ভ। এই স্থাপত্যকালের সঙ্গে গ্রীকদের ভারতআক্রমণের কাল প্রায় এক ছিল—সে কারণেই উক্ত গ্রীকপ্রভাব-বিষয়ক ইউরোপীয় ধারণার উৎপত্তি—একথা রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন। হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট রীতিও উক্ত মত-উৎপত্তির পেছনে আছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম পারিবারিক, সামাজিক নয়,—তাই ভারতবর্ষে বৃহৎ মন্দির নির্মাণ ক'রে সর্বজনীন ধর্মানুষ্ঠান করা হত না। হিন্দুরা মৃতের সম্মানে বৃহৎ সৌধ নির্মাণেও ইচ্ছুক ছিল না। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন মানুষ প্রথমপর্বে কুটীরবাসী, ক্রমে তারা কাঠ-পাথরের অধিক স্থায়ী গৃহনির্মাণে উদ্যোগী, তারপর ধর্মীয় ব্যাপারে বা বিখ্যাত মৃতের স্মৃতিতে সৌধনির্মাণে ব্রতী এবং ক্রমে সেই সৌধগুলিকে অলঙ্কৃত করতে প্রয়াসী। ভারতবাসীর ক্ষেত্রে শেষোক্ত তাগিদটি না থাকায় তাদের স্থায়ী স্থাপত্য-উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছিল—এই হল ইউরোপীয় মত।

তা যদি সত্যি হয়ও, ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছেই বা ঋণী হবে কেন—প্রাচীন মিশরীয়দের কাছ থেকেও তো নিতে পারত, বিশেষতঃ মিশরের সঙ্গে যখন তার যোগ ছিল। না, গ্রীকদের কাছেই ঋণী হতে হবে, কারণ, রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দের যে, সদানন্দ ধারণা—স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্ব যেহেতু গ্রীসে, সেহেতু গ্রীকপ্রভাব অনিবার্য, বিশেষতঃ অশোকস্তম্ভের নির্মাণকালের কাছাকাছি সময়ে যখন ভারতে গ্রীক-অভ্যুদয়! ইউরোপীয় পণ্ডিতরা জন্মসূত্রে যে একটি ধারণা পেয়েই আছেন—ভারতীয় আর্যরা পাথরের বাড়ী তৈরী করতে মোটেই জানত না!!

না, সকল ইউরোপীয় উক্তপ্রকার সহজাত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং শেরিং প্রশ্ন করতে পারেন—যে-প্রাচীন ভারতীয়রা ভারতে গৌরবজনক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল, এমন সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল যা এশিয়ার অপর কোনো অংশের সভ্যতার চেয়ে ন্যূন ছিল না, বরং তাদের অতিক্রম করেছিল—সেই ভারতীয়রা এই সমস্ত সময়ে তাদের মহিমার লিপি কেবল নশ্বর জিনিসেই লিখে গেল, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্থায়ীভাবে নিজেদের শক্তির প্রমাণ রেখে যেতে চাইল না, যখন তারা মিশরের বিশাল স্থাপত্যের, অ্যাসিরিয়ার অপূর্ব প্রাসাদ-স্তম্ভ-সোপানের কথা শুনেছিল? ভারতবাসীর আর যারই অভাব থাক, প্রতিভার অভাব তো ছিল না![১৭]

রাজেন্দ্রলাল খুশি হয়েই শেরিং-এর প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন।

এইসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল যুক্তিতথ্যের দ্বারা ফার্গুসনের মত খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, কোন্ প্রমাণে বলা যায় যে, ভারতীয় আর্যরা প্রস্তরস্থাপত্য জানত না? নিদর্শনের অভাব কি অস্তিত্বের অভাব? বিশেষতঃ সকলেরই যখন জানা আছে যে, মুসলমানেরা পরবর্তীকালে হিন্দু-বৌদ্ধ সংক্রান্ত সব কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিতে

---

১৭ শেরিং-এর নিজের মন্তব্য রাজেন্দ্রলাল তাঁর *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন:

'Is it at all likely that the Aryan race existed in India for between one and two thousand years, that they attainted to greatness and glory, and wonderful progress in civilisation, equalling, if not surpassing, their contemporaries in other parts of Asia, and yet, that, during all this time, they were satisfied with only transitory symbols of greatness, and never conceived the idea of having behind them durable monuments of their power, which should hand down their name to many generations? They must have heard of the vast structures erected in Egypt, and of the splendid palaces, and stairs, and pillers, and other edifices, with which the Assyrian monarchs adorned their cities. They were not lacking in genius, or in the desire for knowledge; on the contrary, their mind investigated the highest subjects, and whatever was of interest to humanity in general, they regarded as of importance to themselves.'

CENTRAL LIBRARY

চেয়েছে! ভারতীয় স্থাপত্যের 'প্রথম' নিদর্শন অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করেই রাজেন্দ্রলাল সজোরে বলেছেন—এই স্তম্ভটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ—ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই প্রস্তরস্থাপত্যের কথা জানত অশোক হিন্দুরূপে জন্মেছেন ও বর্ধিত হয়েছেন। একটি ভারতীয় ধর্মে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন (যদি বৌদ্ধধর্মকে না হিন্দুধর্ম মনে করা হয়!). তিনি ভারতের বাইরে গেছেন, এমন প্রমাণ নেই। তাঁর আচার্যরা ভারতীয়ই ছিলেন। ভারতীয়রা ভ্রমণে মোটেই উৎসাহী নয়, এবং স্বভাবে রক্ষণশীল। যদি তাঁরা ভারতের বাইরে কখনোও যানও, তবু তাঁদের পক্ষে অশোকস্তম্ভে যে উচ্চ প্রস্তরশিল্পের নমুনা আছে, তা অবিলম্বে গড়ে তোলা সম্ভব ছিলনা। ৪২ ফুট উঁচু, যথেষ্ট বেড়যুক্ত ঐ স্তম্ভটি উচ্চশ্রেণীর স্থাপত্যকৌশলের পরিচায়ক। স্তম্ভের পাথর বহুদূর থেকে চেয়ে আনা হয়েছে, তাকে খাড়া করতে হয়েছে বিশেষ নৈপুণ্যে, অলঙ্করণ ও পালিশের অদ্ভুত কৃতিত্ব সেখানে সবকিছু হঠাৎ-লব্ধ কোনো শিক্ষকের নির্দেশে ঘটে গেল? রাজেন্দ্রলাল চমৎকার একটি সমসাময়িক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ইংরেজ বহুদিন ধরে ভারত অধিকার ক'রে আছে, নিজের সংস্কৃতি যথেষ্ট বিস্তার করেছে—কিন্তু কটা বিলেতী স্থাপত্যনিদর্শন ভারতে তৈরী হয়েছে? আর অশোক পরাধীন ছিলেন না। তাঁর অবস্থা, ধরা যাক, নেপালের শাসক স্যার জংবাহাদুরের মত। নেপালে বা সিকিমে বা ভুটানে একটিও পাশ্চাত্যরীতির স্থাপত্য গড়ে ওঠেনি, যদিও স্যার জংবাহাদুর পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন, অশোক যেখানে দেশের বাইরে পা দেননি। এবং কথাটা কী হাস্যকর ঠেকে, যখন শোনা যায়, যে-জাতির রাজারা মাটির কুটীরে বাস করত, কয়েকটা পাথরজুড়ে বসতবাড়ি পর্যন্ত তৈরী করতে পারতনা, তারা আগে নিজেদের থাকার বাড়ি না বানিয়ে (যা সাধারণ বুদ্ধি বা ঐতিহাসিকের বুদ্ধিতে অসম্ভব ব্যাপার) বিদেশীয় শিল্পীর প্রেরণায় এমন আশ্চর্য স্মারকস্তম্ভ বানিয়ে ফেলল, যা কোনো হিসেবেই এক রাজত্বকালে অর্জিত বিদ্যায় করা সম্ভব নয়, যদি না পিছনে দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকে। অশোক অবশ্য বাইরে থেকে শিল্পী আমদানী করতে পারতেন। কিন্তু পাতার কুটীরবাসী এক ব্যক্তি, জন্মে যিনি পাথরের বাড়ি দেখেন নি, তিনি পাথরের স্তম্ভ তৈরী করার ভাস্কর আনতে সুদূর বিদেশে লোক পাঠাবেন! কিন্তু ভাগ্যান্বেষী ভাস্কর তো অর্থ ও সম্মানলোভে অশোকের কাছে স্বয়ং আসতে পারে! পারে কি, যখন সে জানে ঐ রাজাটি কুটিরবাসী? কোনো কুটীরবাসী রাজাকে পাথরের বাড়ির মহিমা বুঝিয়ে কাজে লাগানোর মত ঝুঁকি অর্থলোভী বিদেশী ভাস্কর গ্রহণ করবে?

আর অশোক যদি শিল্পী এনেই থাকেন গ্রীস থেকে—সে শিল্পী কি তার পক্ষে সহজ যে-কাজ, তার চেনা জানা স্থাপত্যরীতিকেই হুবহু বলবৎ করবার চেষ্টা করবে না? কিন্তু অশোকস্তম্ভের মৌলিক স্থাপত্যরীতির সঙ্গে গ্রীক স্থাপত্যের ঐক্যই বা কোথায়?

ফার্গুসনের যুক্তিকে নানাদিক থেকে খণ্ড খণ্ড করার পরে রাজেন্দ্রলাল মিসেস ম্যানিংকে চ্যালেঞ্জ করেছেন—তিনি কোথা থেকে পেলেন, আলেকজাণ্ডার গ্রীকশিল্পী ভারতে রেখে গিয়েছিলেন? দিগ্বিজয়ী রাজা অভিযানের সময়ে স্থপতি বা ভাস্কর সঙ্গে নিয়ে যান বিজিত দেশে ছেড়ে আসার জন্য—অভিনব সংবাদ বটে। আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থানকাল মাত্র কয়েকমাস। ঐ সময়ে তিনি কেবলই ঘুরেছেন, এবং নিজের সামরিক কীর্তি দেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন। ঐ কয়েক মাসের মধ্যে তিনি রক্ষণশীল এবং গর্বিত হিন্দুদের সামনে গ্রীকসভ্যতার এমন মহিমা খুলে দেখালেন যে, তারা অভিভূত হয়ে অনুকরণ করতে আরম্ভ করে দিল!! আর আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা এমন পদার্থের ছিলেন না যে, তাঁরা অশোককে প্রভাবিত করতে পারবেন।

রাজেন্দ্রলালের যুক্তিতে যেসব আঙ্গিকগত বিচার ছিল, অপ্রয়োজনে সেগুলির উল্লেখ করলাম না। ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তির মূলে মিশর ও অ্যাসীরীয় প্রভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রে, এবং অ্যাসীরীয়

CENTRAL LIBRARY

রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির ঐক্য কিছুটা স্বীকার করেও তিনি শেষপর্যন্ত উক্ত দুই প্রভাবের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করেছেন।

রাজেন্দ্রলালের যুক্তিতর্ক ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রধান বিশেষজ্ঞ ফার্গুসনকে একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়েছিল। ফার্গুসনের প্রত্যুত্তরে যুক্তির স্থান নিয়েছিল কটূক্তি—তার কিছু নিদর্শন আগেই দিয়েছি। রাগে গরগর করেও কিন্তু নানা প্যাঁচালো কথার ফাঁকে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল—রাজেন্দ্রলালের মতই ঠিক, গ্রীক অভ্যুদয়ের আগেই ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য ছিল। ১৮৭৪ সালে রাজেন্দ্রলালের *Antiquities of Orissa* বেরুবার পরের বছরে ফার্গুসনের *History of India and Eastern Architecture* বেরোয়। এর মধ্যে তিনি বেশ খানিক নরম হন। অশোকের আগে ভারতে কাষ্ঠস্থাপত্যের অতিরিক্ত প্রস্তরস্থাপত্যের অস্তিত্ব না মানলেও তিনি মেনে নেন যে, বাড়ির ভিত্তিতৈরীর কাজে, ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে, প্রাচীর তোরণ সেতু প্রভৃতি তৈরীর কাজে পাথর ব্যবহার করা হত। এবং সেই প্রাচীরের উচ্চতা কখনো কখনো তিরিশ ফুটও হত—মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্য থেকে যা জানা যায়। রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক তথ্যযুক্তির ভাষা অতঃপর বিদ্রূপে ধারালো ছুরির মত হয়ে ফার্গুসনের অসংলগ্ন কথাগুলোকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল। রাজেন্দ্রলালের রচনা কিছু উদ্ধৃত করা যাক :

'The Admission that the Indian did employ stone in building foundations of houses and in city walls, gates, bridges, and embankments from long before Asoka's time, goes a great deal further than what its author wished it to go. It throws on the author the onus of proving that men, who could, and did, build stone walls, confined their talent to city-walls and embankments, but could not, or did not, extend it to the superstructure of their houses ; and having built a brick or stone foundation as high as the plinth, they encountered some obstacle, intellectual, material or artistic, to push it higher, and leaving it to the level of the ceiling, until taught to surmount it by Greek adventurers or their half caste descendants. The admission drives the reader to the inference that the men who, according to Megasthenes, had built walls 30 feet high, round Palibothra, could not feel the advantage of having a masonery wall for their king's residence, or for the protection of his treasury. Such an inference unjust to a nation whose inventive and intellectual faculties were second to those of no other race on earth, and which in the domain of philosophy attained an altitude which none has yet surpassed.' (Indo-Aryans)

ফার্গুসনের করুণ অবস্থা ক্রমেই দেখা গেছে এ ব্যাপারে। তথ্যের ও যুক্তির চাপে তিনি ক্রমেই রাজেন্দ্রলালের মত স্বীকার করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে নিজের গোঁ-নামক দুরন্ত শিশুটিকে সস্নেহে লালন ক'রে গেছেন। ফার্গুসনের দ্বিধাবিভক্ত রচনার নমুনা :

'It may of course, be disputed whether or not it was, in consequence of hints received from the Greeks that the Indians first adopted for architectural purposes ; but the concidence is certain, and in the present state of our knowledge may be looked upon as an established fact. At the same time though it is almost equally certain that stone was used in India as a

CENTRAL LIBRARY

building material for engineering purposes and for foundations, yet it is quite certain that nothing that can properly be called architecture is to be found there till considerably after Alexander's time.'

ফার্গুসন শেষপর্যন্ত রাজেন্দ্রলালের মত পুরোপুরিই মেনে নিয়েছিলেন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে 'ইনষ্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেকটস্' নামক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রীসের ক্লাসিক্যাল স্টাইল আফগানিস্থানের সীমাকে অতিক্রম ক'রে পূর্বদিকে আর একটুও অগ্রসর হতে পারেনি—কারণ সেখানে ছিল ভারতের নিজস্ব স্টাইল। সে স্টাইল তারা আমদানী করেনি—ভারতেই তা আবিষ্কৃত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত—সেই স্টাইল ভারত থেকে ছড়িয়েছিল সারা ইন্দোচীনে।[১৮]

ফার্গুসনের ঐ স্বীকারোক্তি পাবার পরে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন—আমি তো এতদিন ঐ কথাই বোঝাতে চেয়েছি—ভারতের স্থাপত্য 'self-evolved and self-sutsained.'

ফার্গুসন-রাজেন্দ্রলালের বিতর্ক ও তার পরিণতিকে এতখানি স্থান দিয়ে উপস্থিত করার কারণ ফার্গুসন ভারতীয় শিক্ষাসংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় গবেষণা ও গোঁড়ামির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, আর রাজেন্দ্রলাল দাঁড়িয়েছিলেন তথ্য-সত্য এবং তদুপরি নির্ভরশীল ভারতের প্রাপ্য মর্যাদার পক্ষে।

ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছেই প্রস্তরস্থাপত্য শিখেছিল—ফার্গুসন-প্রভৃতির এই দাবী একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবার পরে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য ইউরোপের মর্যাদারক্ষার শেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করল ভাস্কর্যকে। সুতরাং ভাস্কর্য-ব্যাপারটি ভারতীয়রা অবশ্যই গ্রীকদের কাছ থেকে শিখেছিল, বিশেষতঃ যখন গান্ধারশিল্প নামক শিল্পনমুনাগুলি রয়ে গেছে, যার মধ্যে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের কিছু স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। আর গান্ধারভূমি যখন শিল্পে গ্রীক-বীজ নিয়েছে, ভারতের বাকি অংশ অসংযত না হয়ে পারে! জেনারেল কানিংহাম স্থাপত্যের ব্যাপারে গ্রীকপ্রভাব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না, কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে দাবিও ছাড়লেন না। তিনি লিখলেন:

'I agree with Mr. Fergusan in thinking that the Indians in all probability derived the art of sculpture from the Greeks. In the Punjab this would have been introduced as early as 300. B.C and in a few years it would have found its way to the great capital of Palibothra. I speak now only of the sculptor's ar't, not of the masons trade, for I do not suppose that building with stone was unknown to the Indians at the time of Alexander's invasion'.[১৯]

(*Arch. Surv. Report III*)

---

১৮ ফার্গুসন বলেছিলেন:

'It is quite certain that the classical style with which it (Afgan style) is mixed, never penetrated—except sporodically—beyond the Indus. It was there met by a style with which we are perfectly familiar in the third century before Christ and from that time onwards. It is perfectly Indian and original, and if never carried westward out of India, it certainly never was imported. In was invented and perfected in India and spread eastward through the whole Indo-Chinese countries.' (quoted in *The Indo-Aryans*)

১৯ *The Indo-Aryans* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

CENTRAL LIBRARY

কানিংহাম আরও বেপরোয়া হয়ে বলেছেন : 'অশোকের যুগেই বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্যের আবির্ভাব হয়েছে—এই তথ্য, আমার মতে, অনুমাননির্ভর এই প্রবল প্রমাণের সৃষ্টি করেছে—ভারতীয়রা ভাস্কর্যশিল্প শিখেছে গ্রীকদের কাছ থেকেই। এই বিষয়টি প্রতিদিনই নূতন প্রমাণ লাভ করছে যে, ভাস্কর্য, উত্তম ভাস্কর্য তো নিশ্চয়ই, ঠিক সেইসময়ে অকস্মাৎ ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল, যখন গ্রীকরা কাবুলের অধীশ্বর ছিল। এবং এও দেখা যাচ্ছে, ভারতের ভাস্কর্য-শিল্প তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল ভারত-সিথিয়ান শাসনরূপ অর্ধ-গ্রীক শাসনকালে। তারপর যতই তা গ্রীকযুগ থেকে সরে যেতে থাকে ততই তার পতন ঘটতে থাকে, এবং সেই পতন চরমে পৌঁছয় ব্রহ্মণ্য মন্দিরগুলির দারুময় তুচ্ছতা ও পাশবিক অশ্লীলতার মধ্যে।'

ভারতীয় ভাস্কর্য-বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে ফার্গুসন কিন্তু কানিংহামের মত নিরেট সাহসী ছিলেন না। গ্রীকপ্রভাব সম্বন্ধে হৃদয়দৌর্বল্যের কথা বাদ দিলে, তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের নিজস্ব স্টাইলের অনুরাগীই ছিলেন। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাস্কর্যকে তাঁর এতই মৌলিক ও স্থানীয় বর্ণ-রস-সমন্বিত মনে হয়েছিল যে, পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সঙ্গে তার তুলনা করা কঠিন দেখেছিলেন। ভারতীয় ভাস্কর্য অবশ্যই গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে নিম্নস্তরের (গ্রীক আর্টের সর্বোচ্চতার ধারণা নিয়েই পাশ্চাত্ত্যবাসী ভূমিষ্ঠ হয়), কিন্তু ফার্গুসন তাকে মিশরীয় ভাস্কর্যের উপরে স্থাপন করেছিলেন, এবং অমরাবতীর ভাস্কর্যকে সমকালীন কনস্টানটানটাইনের অধীন রোমক ভাস্কর্যের সমতুল মনে করেছিলেন, কিংবা মনে করেছিলেন, তা ইতালীয় রেনেসাঁসের আদিপর্বের গিবার্টির (Ghiberti) সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। ভারতীয় ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শনকে ফার্গুসন সর্বোচ্চ শিল্পসৃষ্টি মনে করতেন, একথা মিস লককে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকে আগেই দেখে এসেছি।

এবং এখানে অবিকল্প স্বীকার্য, ভাস্কর্যের শিল্পমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল অপেক্ষা ফার্গুসন অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। রাজেন্দ্রলালের প্রত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্য যতখানি ছিল, শিল্পদৃষ্টি ততখানি উন্নত ছিল কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ তাঁর লেখায় তার যথেষ্ট পরিচয় নেই। ভাস্কর্যের বিচার যখন করেছেন তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি বিচারকে ছেড়ে সামগ্রিক সৃষ্টিসৌন্দর্যের মূল্যায়নে তিনি উঠতে পারেন নি। ভারতীয় স্থাপত্যের মতো ভারতীয় ভাস্কর্যেও গ্রীক প্রভাব নেই (যেমন উদয়গিরির বা ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্যে), এই কথা প্রমাণের চেষ্টাতেই তাঁর শক্তি নিয়োজিত ছিল; উল্টোপক্ষে তিনি ভারতীয় শিল্পের তুলনায় গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কথা অগ্রিম মেনেই নিয়েছিলেন। উদয়গিরির ভাস্কর্যে গ্রীকপ্রভাব নেই, তা প্রমাণ করতে তিনি গ্রীকভাস্কর্যের উৎকর্ষের তুলনায় উদয়গিরির ভাস্কর্যের আপেক্ষিক অপকর্ষকে অন্যতম কারণরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন।[২০]

স্বামীজী রাজেন্দ্রলালকে কোথায় গ্রহণ করেছেন এবং কোথায় আরও অগ্রসর হয়েছেন : স্বামীজী কর্তৃক হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা

রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়ে দিলেন, স্বামীজী সেখানেই এসে দাঁড়ালেন। হিন্দুস্থাপত্যের উদ্ভবে গ্রীক-প্রভাবতত্ত্বকে সাফল্যের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দূর করেছিলেন, এবং সেই সিদ্ধান্তকে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রীকভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে ইউরোপীয় ধারণাকে তিনি শেষ পর্যন্ত মান্য করায় তাঁর পক্ষে শেষোক্ত ক্ষেত্রে বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গ্রীসের আদি প্রভাবের কথা তখন বহু কণ্ঠে কথিত হচ্ছিলই। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে, রাজেন্দ্রলালের ঐ বীরত্বপূর্ণ ও

২০ *The Antiquities of Orissa*, Vol-II, Ch-I,

CENTRAL LIBRARY

পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রাম তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে প্রায় কোনো মূল্যই পায়নি, কারণ, প্রথমতঃ দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এইসব বিষয়ের চর্চা প্রায় ছিল না, দ্বিতীয়তঃ চর্চা যেখানে ছিল সেখানে শ্বেত পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতি ভক্তিও অটুট ছিল।[২১] এই পরিস্থিতিতেই স্বামীজী ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীক-প্রভাবতত্ত্বের খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সে-কাজ আদি কাজ না হলেও এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে অতীব প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছিল, এবং তারো বড় কথা, ঐ ধারণাটি তিনি এমন একজন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়ে দিতে পেরেছিলেন যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পআন্দোলনের সময়ে উক্ত ধারণার পক্ষসমর্থনে নেতৃত্ব করবেন। আমি ভগিনী নিবেদিতার কথাই বলছি।

এবং স্বামীজী আরও এগিয়েছিলেন। তিনি একেবারে উল্টোপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি গ্রীকশিল্পে প্রাচ্যপ্রভাব পর্যন্ত কল্পনা করছিলেন, দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুভাস্কর্যকে গ্রীকভাস্কর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলেছিলেন। এটা চাকার একেবারে উল্টোপাক, এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক বক্তব্য। প্রথমোক্ত বক্তব্যটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যের আংশিক স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। স্বামীজী যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ভাস্কর্যকে শ্রেষ্ঠতর বলেছেন, তাকে এখন অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।

স্বামীজী তাঁর শেষোক্ত ধারণাগঠনের সময়ে অনেককেই ত্যাগ করেছিলেন - তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালও ছিলেন। গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনযুদ্ধে ভারতপক্ষে মহার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি ভাবতে পেরেছিলেন—উল্টো দাবি করাও সম্ভবপর—ভারতের কাছেই গ্রীস ঋণী? ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৃপাপূর্ণ প্রশংসাজীবিত ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দাবি করবে এও কি তাঁর কল্পনায় এসেছিল? রাজেন্দ্রলাল নিজে অন্ততঃ শেষোক্ত দাবির পক্ষে ছিলেন না, এবং আমাদের অনুমান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের উপরে কিছুদিনের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবরূপে বর্তমান ছিল। আমরা আগে দেখেছি, গ্রীকভাস্কর্যের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা

---

২১ যথা, রমেশ দত্তের মনে ভারতীয় শিল্পের তুলনায় গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না। প্রবাসীর শ্রাবণ, ১৩ ৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের শিল্প'-এর মধ্যে পাই: 'নানাপ্রকার গৃহ মন্দির ও গুহানির্মাণে যে প্রাচীন আর্যদিগের বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্করগণ নিজ নিজ নৈপুণ্যের অনেক স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। **কিন্তু তাঁহারা এ-বিষয়ে কখনও গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। গ্রীকভাস্করেরা মানুষও দেবদেবীর মূর্তিতে সৌন্দর্যের যে-আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পিগণ তাহার নিকটে যাইতে পারেন না।**.....মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী এবং তাহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও এইসকল কথা খাটে। ইহা ফার্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকগণের মত। **শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দিয়াছেন।** তিনি বলেন, কপিল ও কালিদাসের দেশে প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্রমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায়, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলাগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? বার্ডউড্ সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের পৌরাণিক অনেক দেবদেবী এবং তাঁহাদের অবতারগণের মূর্তি অস্বাভাবিক। হিন্দু-শিল্পিগণ ধর্মভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের ভাস্কর্য ও চিত্রে অন্ধভাবে পুরাণোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন, সৌন্দর্য-সৃষ্টির চিন্তা তাঁহাদের মনে আসে নাই।' [স্থূললিপি লেখক নির্দেশে]

CENTRAL LIBRARY

স্বামীজীর মনে বহুদিন বজায় ছিল, যেকথা তিনি দুঃখের সঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত ৩ জানুয়ারী ১৮৯৭ তারিখে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন।

স্বামীজীর সর্বশেষ ধারণার প্রথম প্রকাশ কবে দেখা যায়? এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তদনুযায়ী ১৮৯৬-এর ২৮শে মে তারিখে ম্যাকসমূলারের সঙ্গে লণ্ডনে আলোচনাকালেই স্বামীজীকে তাঁর ঐ ধারণার কথা প্রথম বলতে দেখা গেছে। স্বামীজী তাঁর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার বিবরণ প্রিয়নাথ তাঁর 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র নভেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যার প্রবন্ধে দিয়েছেন। তারই কিছু অংশ:

"ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর (স্বামীজীর) কথোপকথনকালে ভারতীয় স্থাপত্য অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। অধ্যাপকের মত ছিল, বৌদ্ধস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীকসৃষ্টির কিছু ঐক্য আছে, এবং গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল—তাই বলা যায়, হয়তো ভারতবর্ষ গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামীজী তীক্ষ্ণ উত্তর দেন—"যদি গ্রীকদের ভারতে নিছক উপস্থিতিই ভারতীয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়, গ্রীকশিল্প ভারতের কাছে ঋণী। বৌদ্ধযুগের শিল্পের সঙ্গে গ্রীকশিল্পের কোনো সাদৃশ্য নেই। গ্রীকরা বহির্বস্তুর রূপায়ণে চরম পারদর্শী, আর ভারতীয় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকৃতির উদ্ঘাটনে ইচ্ছুক – তার জন্য বাস্তবতাকে বলি দিতেও প্রস্তুত। শারীর সংস্থানের খুঁটিনাটির রূপায়ণে গ্রীকরা অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোনো মূল্য না দিয়ে মানসিক অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী। ভারতে প্রাচীনকালে প্রতি ভাস্করই নিপুণ মিস্ত্রী; গয়া জেলায় তার সাক্ষ্য এখনো মিলবে। গয়ার কিছু মন্দির নির্মাণের সময়ে অযোধ্যা থেকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভাস্কর-মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, যাদের বংশধরেরা এখনো সেই জেলার গ্রামে বাস করে এবং একই বৃত্তিধারী হয়ে আছে। যদি গ্রীকরা আমাদের স্থাপত্য শিখিয়ে থাকে, তাহলে তারা আমাদের ভাস্কর্যের দোষগুলি সংশোধন করল না কেন, যখন দেখলে ভারতীয় স্থাপত্য ঢাকা পড়ে আছে মূর্তিতে? গ্রীকরা আসলে ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই, শিল্প বা বিজ্ঞান শেখাতে নয়। ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প গ্রীসের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের, কারণ ভারতীয় সৃষ্টি সব সময়েই একটা ভাবকে প্রকাশ করতে ব্রতী, গ্রীকস্থাপত্য যা করেনি।"

ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প কিভাবে ভাবপ্রকাশ ক'রে থাকে, সে-বিষয়ে স্বামীজী ঐসঙ্গে আরও যা বলেছিলেন প্রিয়নাথ সিংহের বিবরণে তার রূপ:

"ভারতে স্থপতি, মুসলমান স্থপতিও, কোনোও একটি ভাবপ্রকাশে বিরত নয় কখনো। রাজপুতানায় ভ্রমণকালে স্বামীজী আলোয়ারের একটি মিনারের ভাবপ্রকাশক অনবদ্য সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন। তাজমহল দেখে বলেছিলেন, এই মর্মরের যে-কোনো অংশ পেষণ করলেই রাজহৃদয়ের প্রেম ও যাতনা বিন্দু বিন্দু করে পড়বে। লোকে বলে, কলকাতা নাকি প্রাসাদনগরী। রাম কহো! বাড়িগুলো বাক্সের মত—একের পর এক সাজানো—ভাব বলে একটুও কিছু নেই। রাজপুতানায় এখনো খাঁটি হিন্দুস্থাপত্যের স্বাক্ষর মেলে। কোনো ধর্মশালার দিকে তাকালে মনে হবে, তা যেন হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে তার উদার আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য; মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হবে, তার ভিতর-বাহিরে দেবভাবে পূর্ণ। গ্রামের কুটীর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ করছে—গৃহস্বামীর মনটিকে সে যেন খুলে ধরেছে। এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য আর মাত্র দেখেছি ইতালিতে।"

প্রিয়নাথ সিংহ লিখেছেন, "ইতালীয় শিল্পের প্রতি স্বামীজীর গভীর অনুরাগ ছিল।"

CENTRAL LIBRARY

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে স্বামীজীর এই আলোচনা কবে হয়েছিল?—স্বামীজীর স্বদেশে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৮৯৭-৯৮-এর মধ্যে কিংবা দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৯০১-১৯০২-এর মধ্যে কোনো সময়ে? আলোচনাকালের উল্লেখ প্রিয়নাথ করেননি। কিন্তু প্রথম পর্বেও হতে পারে, যদিও দ্বিতীয় পর্বেই হওয়া সম্ভব, কারণ দ্বিতীয়বার বিদেশ-ভ্রমণের সময়েই তিনি গ্রীকস্থাপত্য-ভাস্কর্যকে কেবল মিউজিয়ামে নয়, একেবারে গ্রীসের ভূমিতে দাঁড়িয়েই দেখেছিলেন। কিন্তু তার আগেই যে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বদলাতে আরম্ভ করেছে, তা ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলোচনায়, ১৮৯৭-এর জানুয়ারীর গোড়ায় মিস লককে লেখা চিঠি থেকে দেখতে পাই।

ভারতশিল্প ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কিভাবে সর্বশেষ পরিণতি পেয়েছিল, তার কিছু পরিচয় ভগিনী নিবেদিতার রচনায় পাওয়া যায়। স্বামীজী ৫ নভেম্বর ১৮৯৭ লাহোরে পৌঁছে দশ-বারো দিন ছিলেন। এইকালের মধ্যে তিনি লাহোর মিউজিয়াম দেখেন—সেখানে গান্ধারশিল্প-নমুনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎপরিচয় ঘটে, এবং তার ফলেই স্বামীজী তাঁর সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন—ভারতের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে যে-সিদ্ধান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা ১৪ জুন ১৮৯৮-এর ডায়েরীতে পূর্ববৎসরে স্বামীজী পূর্বোক্ত বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে লিখেছেন—

"স্বামীজী আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন। সেগুলিকে তিনি নিশ্চয় পূর্ববৎসরে লাহোর মিউজিয়ামে দেখিয়াছিলেন। শিল্পবিষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোনোদিন গ্রীসের চরণতলে বসিয়াছিল এই ইউরোপীয় থিয়োরী খণ্ডন করিতে তিনি ঘৃণাপূর্ণ উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।" ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে')

স্বামীজীর মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট কালনির্দেশ উপরে পেলাম। এর সওয়া দু'বছর পরে স্বামীজী প্রকাশ্যে পণ্ডিতদের সভায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করবেন। তা করেছিলেন ১৯০০ সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় 'প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায়'।

প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায় স্বামীজী কোনো রচনা পাঠ করেননি, মৌখিক বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তিনি স্বয়ং লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাই এতদিন আমাদের অবলম্বন ছিল। সম্প্রতি স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ 'প্যারিসে বিবেকানন্দ' পর্যায়ে কিছু গবেষণা করেছেন, এবং ধর্মেতিহাস সভার মুদ্রিত বিবরণী থেকে স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ উদ্ধৃতও করেছেন, কিন্তু শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের ক্ষেত্রে সেখান থেকেও নতুন কিছু পাই না। অথচ শিল্পবিষয়ে উক্তসভায় কথিত স্বামীজীর বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। এক্ষেত্রে উপায়ান্তরহীন হয়ে স্বামীজীর পাঠানো বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ করতে হচ্ছে। স্বামীজী উক্তসভায় কেবল শিল্পের উপরে নয়, ভারতীয় সকল বিদ্যার উপরেই গ্রীকপ্রভাব আছে, এই তত্ত্বের নিরাকরণ করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, অনেক ভারততাত্ত্বিক ইউরোপীয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং স্বামীজী কার্যতঃ চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলেছিলেন। স্বামীজীর তীব্র মনোভাবের কারণ—তিনি ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোনো সংযমের লক্ষণ তো দেখেননি, উপরন্তু নূতন বিসদৃশ দাবি উপস্থিত করার প্রগল্‌ভতা দেখেছিলেন। যেমন, পূর্ববর্তী একটি সভায় ওপার্ট নামক জনৈক জার্মানপণ্ডিত শালগ্রাম সম্বন্ধে 'অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রাসঙ্গিক' যৌনব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, যার খণ্ডনও স্বামীজী করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কিভাবে ভারতের ঘাড়ে নির্বিচারে গ্রাসকে চাপাতে ব্যস্ত সে সম্বন্ধে স্বামীজী উক্ত 'পারি প্রদর্শনী' নামক রচনায় লিখেছিলেন:

CENTRAL LIBRARY

'কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীকজ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে—গ্রীকসহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতিসাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া !!'

যেসব যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় বিদ্যার উপরে গ্রীকপ্রভাব কল্পনা করেন, সেইসব যুক্তির ফাঁকি দেখিয়ে দেবার পরে স্বামীজী লিখেছেন :

"ঐ প্রকার কালিদাসাদি কবি-প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য-নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি (আপতিত ?) হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে আর্যনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কিনা ? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক রচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায় ? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে ঠিক তাহার বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্যনাটক আর এক।

"আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীকনাটকে আদৌ তো নাই, বরং শেক্সপীয়র-প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, শেক্সপীয়র সর্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

"শেষ—পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোনো হিন্দু কোনোকালে গ্রীকভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীকপ্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

"তদ্বৎ আর্যভাস্কর্যে গ্রীকপ্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।"

শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর রিপোর্ট মাত্র একলাইন থাকলেও স্বামীজী নিশ্চয় ব্যাপারটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন—কী বলেছিলেন তা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই, এবং অনুমানের ভিত্তি ইতিমধ্যেই আমরা রচনা ক'রে এসেছি—রাজেন্দ্রলালের যুক্তি ও স্বামীজীর অন্যত্র-প্রকাশিত মনোভাবের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে।

স্বামীজী যখন প্যারিসের ধর্মেতিহাস সভায় উপরিকথিত বিষয়ে বলছিলেন, ঠিক তারই কাছাকাছি সময়ে পুনশ্চ লুভারে গিয়ে গ্রীকশিল্পকলার নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করছিলেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ-সম্বন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোট দেওয়া আছে—খুবই দুঃখের বিষয়, ঐ নোটকে পূর্ণাঙ্গ রচনার আকার তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। এই ডায়েরী-নোটের মধ্যেই দেখা যায়, স্বামীজী গ্রীকশিল্পের একেবারে প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যপ্রভাব অনুমান করেছেন।

স্বামীজী উক্ত নোটে লিখেছেন : '(লুভার) মিউজিয়াম দেখে গ্রীক-কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম।' এই তিন অবস্থার প্রথম অবস্থার সময় হল প্রাচীন অজ্ঞাতকাল থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬ পর্যন্ত ; দ্বিতীয়পর্ব ৭৭৬ খ্রীস্টপূর্ব-কাল থেকে ১৪৬ খ্রীস্টপূর্বকাল পর্যন্ত ; তৃতীয়পর্ব ১৪৬ খ্রীস্টপূর্ব থেকে পরবর্তীকাল।

প্রথম পর্ব অর্থাৎ ৭৭৬ খ্রীস্টপূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের গ্রীকশিল্পকে 'মিসেনি' শিল্পের কাল বলা হয়। স্বামীজী বলতে চান—এই প্রথম পর্ব অর্থাৎ মিসেনিপর্বে গ্রীকশিল্প প্রাচ্যপ্রভাবে গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের 'আচেনি রাজা,

CENTRAL LIBRARY

সন্নিহিত রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেইসঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথম গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব।' স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, 'প্রধানতঃ এশিয়া-শিল্পের অনুকরণে ব্যাপৃত' ঐকালীন মিসেনিশিল্প খাঁটি গ্রীকশিল্প নয়।

খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬-১৪৬ পর্যন্ত সময়ের দ্বিতীয় পর্বকে স্বামীজী খাঁটি গ্রীকশিল্পের কাল বলেছেন। তা বলার কারণ, এইকালে গ্রীকশিল্প 'এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ ক'রে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা' আরম্ভ করেছিল। এশিয়া-শিল্প বাস্তবের অনুকরণ চেষ্টা করে না, আর গ্রীকশিল্পের লক্ষণ—'প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহের বর্ণনা।'

এই দ্বিতীয় অর্থাৎ হেলেনিক পর্ব আবার তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম, 'আর্কেইক গ্রীকশিল্প,' সময় ৭৭৬-৪৭৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের শিল্প-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য: 'এখনো মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। এ বিষয়ে ওগুলি ইজিপ্তের শিল্পীগঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু'পা সোজা ক'রে, খাড়া হয়ে (কাঠ হয়ে) দাঁড়িয়ে আছে। চুলদাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র-সমস্ত মূর্তির গায়ে জড়ানো, তালপাকানো পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।'

দ্বিতীয় ভাগের নাম, 'ক্লাসিক গ্রীকশিল্প'; সময় ৪৭৪-৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ 'এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরম্ভ হয়ে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত।' গ্রীকশিল্পের এইটাই গৌরবযুগ। এই গৌরবের স্বরূপ বোঝাতে স্বামীজী জনৈক ফরাসী শিল্পবেত্তার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'ক্লাসিক গ্রীকশিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোনোদেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই, বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে-কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রী. পূ. পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিষেধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীকশিল্প সজীব হইয়া ওঠে।'

এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্প গ্রীসের দুই রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ের বিভক্ত ছিল। প্রথম, আটিকা রাজ্যের সম্প্রদায় (এথেন্স যার প্রধান শহর), দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়ান রাজ্যের সম্প্রদায়।

আটিক সম্প্রদায়ের আবার দুই ভাব। একটি ভাব সৃষ্টি করেছিলেন 'মহাশিল্পী ফিডিয়াস', যাঁর বিষয়ে স্বামীজী জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধার করেছেন: 'অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব যাহা কোনোকালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না।' দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক স্কোপাস ও প্র্যাক্সিটেলেস। 'এই সম্প্রদায়ের কার্য শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত ক'রে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।'

ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের দ্বিতীয় সম্প্রদায়—পিলোপনেশিয়ান সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক দু'জন, পলিক্লেটাস (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) এবং লিসিপাস (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ)। এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরের গড়ন-পরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখার নিয়ম প্রবর্তিত করা।'

স্বামীজী বলেছেন, খ্রীঃ পূঃ ৩২৩—১৪৬ পর্যন্ত সময় ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের অবনতিকাল। এর আরম্ভে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু, শেষে রোমানদের দ্বারা আটিকা বিজয়। 'জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীকশিল্পে দেখতে পাওয়া যায়।'

গ্রীকশিল্পের তৃতীয় পর্যায় খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ থেকে পরবর্তীকাল। এই একেবারে পতনকাল সম্বন্ধে স্বামীজী অতি

CENTRAL LIBRARY

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন : 'রোমানদের গ্রীস অধিকার সময়ে গ্রীকশিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকলমাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে, হুবহু কোনো লোকের মুখ নকল করা।'

গ্রীকশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস যেভাবে স্বামীজীর ডায়েরী-নোটে পাচ্ছি, সন্দেহ নেই, তা করা হয়েছিল বিশেষজ্ঞরচিত শিল্পের ইতিহাসগ্রন্থেরই অনুসরণে। ঐ নোটের উপর নির্ভর করে স্বামীজী যদি প্রবন্ধ রচনা করতেন তাহলে বলাই বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যথেষ্ট পেতাম। তাহলেও, ঐ সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোটের ভিতর থেকেই, স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা পাই। গ্রীকশিল্পের আদিতে তিনি প্রাচ্যপ্রভাবের কথা বলেছেন বটে কিন্তু কদাপি তাকে গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কারণরূপে দাঁড় করাননি, বরং বলেছেন, ঐ প্রভাব ত্যাগ করার ফলেই গ্রীকশিল্প নিজ মহিমা লাভ করেছিল। স্বামীজী সবসময়েই স্বাধীন আত্মপ্রকাশের পক্ষে; বাইরের প্রভাব গ্রহণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সে প্রভাব যাতে জাতীয় প্রবণতাকে উৎপাটিত না করে, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। সুতরাং তিনি গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠ মহিমা তখনই দেখলেন যখন তা প্রাচ্যপ্রভাবমুক্ত। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীকশিল্প, 'বিধিনিষেধের বহির্ভূত' হয়ে সগৌরবে বিকশিত হয়েছিল। এইকালের শিল্পের মধ্যেই তিনি ভাববিকাশের চেষ্টা ও তার সাফল্য দেখেছিলেন (যেমন ফিডিয়াসের রচনার মধ্যে)। অপরদিকে যে-সব গ্রীকশিল্পী-সম্প্রদায় নিছক প্রকৃতির অনুকরণ করাকেই লক্ষ্য বলে ধরেছিল, তাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অধিক সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ অনুরাগহীন।

গ্রীকশিল্পের সামগ্রিক শক্তি ও সৌন্দর্যমহিমা স্বীকার করার পরেও আমরা দেখব, শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি ঐ শিল্পকে সর্বোচ্চ নমস্কার জানাতে পারেনি। তাঁর কাছে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্প, যা স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও সর্বাধিক ভাবপ্রকাশ করতে সমর্থ, এবং যেহেতু আধ্যাত্মিকতাই তাঁর কাছে ভাবের শিখর, তাই—আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে সমর্থ শিল্পই সর্বোচ্চ শিল্প। সুতরাং রণদাপ্রসাদ দ,সগুপ্তকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন :

"পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাহের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল, সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোনো একটা আইডিয়া express করার নামই আর্ট। যাতে আইডিয়ার expression নেই, তাতে রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাট্য থাকলেও তাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না। ..... যে জাতটা বড় মেটিরিয়ালিস্টিক, তারা নেচারটাকেই আইডিয়াল বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression-ই শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে-জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই আইডিয়াল বলে ধরে, সেটাকে সে নেচার-এর শক্তি সহায়ে শিল্পে express করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের নেচারই হচ্ছে primary basis of art, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। এইরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীতে প্রায় একই দাঁড়িয়েছে—উভয়েই আপন আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালের স্থাপত্যবিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক একটি মূর্তি এই জড়প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।"

CENTRAL LIBRARY

পাশ্চাত্যের তুলনায় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে ভারতীয় শিল্পের সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজী প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন :

'গ্রীকরা কখনই যীশুর অন্তর্জীবনের রহস্য অনুধাবন করেনি। তা যদি করত তাহলে কখনই তাঁকে অমন পেশীযুক্ত ক'রে দেখাতে পারত না। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের শরীর কখনই পেশল হয় না। এক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্তির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কোনো জাতির শিল্প পরীক্ষা করলেই তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকজাতি যে কখনো উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেছিল শিল্পে তার সামান্য পরিচয়ও নেই। অপর পক্ষে, ভারতীয় শিল্প শুধু আধ্যাত্মিক ভাবের অনুসরণ ক'রে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে অধঃপতিত হয়েছে।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পসংস্কৃতির পার্থক্য বিচারে স্বামীজীর প্রতিভার ঝলক বারে বারে দেখা গেছে। নিবেদিতার স্মৃতিকথা থেকে তেমনি একটি প্রদীপ্ত অথচ সুগভীর বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন :

'আমাদের অর্থাৎ খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রচলিত 'যন্ত্রণাপূজা'র সম্বন্ধে স্বামীজীর ঘৃণাপূর্ণ মনোভাবের ভিতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে ভারতীয়দের স্বচ্ছ চিন্তার রূপ। পাশ্চাত্যে অনেকে তাঁকে বলেছিলেন, বুদ্ধের মহিমার আবেদন অনেক বেশী হত যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে 'রোমক পাশবিকতা' বলে চিহ্নিত করতে তাঁর কোনো দ্বিধাই ছিলনা। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, চমকপ্রদ ঘটনার বা কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ঐ হল সর্বনিম্নস্তরের অতিজান্তব পক্ষপাত। ঐ জন্যই পৃথিবীর মানুষ এপিক কাব্যকে সর্বদা অত ভালবাসে। ভারতের সৌভাগ্য, সে 'খাড়া গভীর অন্ধ গহ্বরে হেঁটমুণ্ডে নিক্ষিপ্ত'-বিষয়ের কবি মিলটনকে কদাপি সৃষ্টি করেনি। ঐ গোটা কাব্যটার বদলে ব্রাউনিং-এর কয়েকটি লাইনও যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। স্বামীজীর মতে, খ্রীস্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ারূপ ঘটনার এপিক উগ্রশক্তিই রোমকদের মনকে নাড়া দিয়েছিল—রোমান জগতে খ্রীস্টধর্মকে ঐ ঘটনাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'ঠিক! ঠিক!' তিনি যোগ করে দিলেন, 'পাশ্চাত্যের লোক, তোমরা চাও অ্যাকশন্—তোমরা জীবনের প্রতিটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে যে কবিত্ব রয়েছে, তাকে বুঝতে চাও না! তরুণী-মাতা, তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে এসেছিলেন সেই ঘটনার থেকে বেশী সৌন্দর্য আর কোন ঘটনায় সম্ভব? কিংবা বুদ্ধ-কর্তৃক ছাগশিশুর জীবনরক্ষার ঘটনাটি। দেখো, বুদ্ধের সংসারত্যাগের বিরাট ঘটনাটি ভারতের কাছে কিছু অভিনব নয়। গৌতম ছোট একটি রাজ্যের রাজার ছেলে—অমন সম্পদ আগে অনেকবার অনেকে ত্যাগ ক'রে গেছেন। কিন্তু নির্বাণের পর?—কী কবিত্ব তখন—

'বর্ষণমুখর রাত্রি; এক গোপের কুটীরে এসে ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে তিনি [বুদ্ধ] দাঁড়িয়েছেন; অবিরল জল পড়ছে, ক্রমেই প্রবল হচ্ছে বায়ু।

'ভিতর থেকে গোপ জানালা দিয়ে চকিতে একটি মুখ দেখতে পেল; মনে মনে বলল, হাঃ হাঃ গেরুয়াধারী! বটে! ওখানেই থাকো তাহলে, তোমার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট ভাল ঠাঁই।' তারপর সেই গোপ গাইতে লাগল, 'আমার গোরু-বাছুর ঘরে উঠেছে; এখানে আগুন জ্বলছে ভালভাবে; আমার পত্নী নিরাপদ; সুখে ঘুমোচ্ছে বাচ্চারা। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পারো।'

'বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, মন আমার সংযত, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত, হৃদয় আমার দৃঢ়, সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পারো।'

'গোপ আবার গাইল, ক্ষেতের ফসল কাটা হয়েছে, খড়গুলি খামারে ভালভাবে রাখা আছে, নদীতে ভরা জল, পথগুলি বেশ শক্ত। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পারো।'

CENTRAL LIBRARY

"'এইভাবে চলতে লাগল। অবশেষে গোপ বিস্ময়ে ও অনুতাপে উঠে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব নিল।'"
('দি মাস্টার')

স্বামীজীর সমকালে ও কিছু পূর্বকালে কলকাতার শিল্পপ্রয়াস : বিভিন্ন আর্ট স্কুল

আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনকে স্বামীজী তার আত্মমর্যাদার ভিত্তি দিলেন, দেখতে পেলাম। তারও বড় কথা, এই শিল্পের প্রাণসত্তা উদ্‌ঘাটিত করলেন সেই সঙ্গে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সকল শিল্পের প্রাণসত্তাকেই। অতঃপর আমরা দেখব, স্বামীজীর খুলে-দেওয়া পথ দিয়েই নিবেদিতা, ওকাকুরা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অরবিন্দ, উড্‌রফ প্রভৃতি সকলেই চলেছেন। এঁরা যদি স্বামীজীর দ্বারা প্রত্যক্ষে চালিত নাও হন ক্ষতি নেই, আমাদের পক্ষে এটুকু সংবাদই প্রয়োজনীয়, স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত পথে এঁরা এগিয়েছিলেন।

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে-কাজ স্বামীজী করলেন তা হল—তিনি ভ্রান্ত আদর্শ নিবারণ করলেন; ভারতীয় শিল্পচেষ্টা তখন যে-পথে চলেছিল, কঠোরভাবে তার সমালোচনা করলেন। সেই সমালোচনা তৎকালীন পরিবেশে আকস্মিক, বিস্ময়কর এবং বোধহয় বিরক্তিকর ঠেকেছিল।

আমি স্বামীজী কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনার কথাই বলতে চাইছি।

কলকাতায় শিল্পচেষ্টা এইকালে ও কিছু পূর্বকালে কোন্ পথে চলেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ইতিহাস প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু সংবাদ রয়েছে।[২২] ২৯ জুন, ১৮৬৩ সালে সরকারী আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার আগেই কলকাতায় শিল্পচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। প্রধানতঃ ইউরেশিয়ান তরুণদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'দি মেকানিকস্ ইনস্টিটিউট', যেখানে 'মেকানিক্যাল'-শিল্পশিক্ষা দেওয়া হত। এই প্রতিষ্ঠান বেশীদিন বাঁচেনি। কিন্তু তারপর 'ইনডাসট্রিয়াল আর্ট'-এর উন্নতির জন্য ইউরোপীয় ও দেশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবর্তিত 'দি স্কুল অব ইনডাসট্রিয়াল আর্ট' নামক যে প্রতিষ্ঠান ১৬ আগস্ট, ১৮৫৪ তারিখে যাত্রারম্ভ করেছিল—সে প্রতিষ্ঠান নামান্তর গ্রহণ করে আজও জীবিত আছে। গরাণহাটার এই বেসরকারী ইনডাসট্রিয়াল আর্ট স্কুলটিতে স্বভাবতঃই ক্লে-মডেলিং এবং এনগ্রেভিং-এর উপর বেশী জোর দেওয়া হত। এখানকার ছাত্ররা এইসব কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ১৮৫৮, ৯ সেপ্টেম্বর এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার আর্থার ডবলিউ বুলার সবিশেষ প্রশংসা ক'রে যেকথা বলেছিলেন, তার মধ্যেই ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তৎকালীন বিদেশীয় সহানুভূতিশীলদের দৃষ্টিভঙ্গির ও ধারণার সংকীর্ণতা ধরা পড়ে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন, 'কিছু সুযোগ পেলেই এই স্কুলের ছাত্ররা শীঘ্রই চারু ও কারুশিল্প সম্বন্ধে তাদের স্বাভাবিক রুচি ও প্রীতির যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারবে, এবং কুতুবমিনার, তাজমহল ও মসলিনের দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে।'

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি ২৯ জুন, ১৮৬৩ সাল থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং মিঃ এইচ এইচ লকএর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লক এর প্রেরণাপূর্ণ নেতৃত্ব এবং কর্মক্ষমতা বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়েছিল। বাঙালী শিল্পীরা 'উত্তম নকলকারী' ছাড়া আর কিছু নয়—তৎকালীন ইউরোপীয় মহলে বলবৎ এই ধারণার বিপরীত ধারণা মিঃ লকের ছিল বলেই তিনি বহুভাবে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। স্কুলের ছাত্ররা নানা

২২ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল '*Centenary : Government College of Art and Craft, Calcutta*' নামক স্মারকগ্রন্থে '*History of the Govt. College of Art and Craft*' শিরোনামায় একটি তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন।

CENTRAL LIBRARY

প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ক'রে পুরস্কার পেয়েছিল। তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রয়োজনে নানা শিল্পকাজ করেছিল, যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ, সরকারী ভবনের বা গির্জার অভ্যন্তরভাগ অলঙ্করণের কাজ, উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চিত্রাঙ্কনের কাজ। এঁরা সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ চিত্রিতকরণের কাজও করেছিলেন।

ঐকালের শিল্পীদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। প্রিন্সিপ্যাল লক্ অন্নদাপ্রসাদের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। অন্যের প্রশংসারও অভাব কখনো হয়নি।[২৩]

এই সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে কিন্তু ভারতীয়তা বা মৌলিকতার পরিচয় একেবারেই ছিলনা। গোটা ব্যাপারটাই ছিল নকলনবিশি—হয় বিষয়ের, নয় রীতির। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যে শিল্পচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল তা ঐ প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে এবং পরাধীনের হীনমন্যতাকে কাটিয়ে সৃষ্টিশীলতার পথে অগ্রসর হতে পারেনি। আর্টগ্যালারির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৭৬, এপ্রিল মাসে। উদ্দেশ্য ছিল—ঐ গ্যালারিতে অতীত ও বর্তমানের ইউরোপের মানুষ ও বস্তুর ছবি ভারতীয়দের চোখের সামনে তুলে ধরা হবে, যাতে তারা ইউরোপীয় নকলপদ্ধতি শিখে নিয়ে নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মনুষ্যজীবন ও স্থাপত্যকীর্তিগুলিকে এঁকে তুলতে পারে। আসলে কিন্তু ভারতীয় কোনো

---

২৩ লক ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্টে অন্নদাপ্রসাদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

'Babu Annoda Prasad Bagchi ·····attained the position of being quite the best Bengali artist I have ever heard of'

স্যার রিচার্ড টেম্পল মার্চ, ১৮৭৩ সালে বলেছিলেন :

'The studies of heads of one of its pupils, Bagchi, show remarkable merit and originality, very creditable to Bengal and Bengalees.'

লক তাঁর ১৮৭৮-৭৯ সালের রিপোর্টে নবকুমার বিশ্বাস ও অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চীর বিষয়ে সংবাদপত্রের রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছিলেন :

"Of the two students Naba Kumar Biswas and Annoda Prasad Bagchi it was further said that, 'they can held their own lines against all comers,' and the architectural lithographs of the last mentioned student are excellent."

ইতালিয়ান শিল্পী এবং শিক্ষক ড'-গিলার্ডি ও অন্নদাপ্রসাদ বিষয়ে ১৮৮৫-৮৬-এর রিপোর্টে বলেছিলেন :

'I do not hesitate to place him first among Indian artists.'

একই রিপোর্টে পুনশ্চ :

'The Institution is largely indebted to him for various artistic productions which have contributed to raise the fame of the Calcutta School of Art.'

অন্নদাপ্রসাদ পোর্ট্রেট ও লাইফস্টাডিতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর দুটি অয়েলপেন্টিং আর্ট-স্কুলের আর্টগ্যালারির জন্য কেনা হয়েছিল।

'ভারতীয় চিত্রকরদের আঁকা ছবি বোধহয় এই প্রথম আর্টগ্যালারির জন্য কেনা হয়েছিল।'

শ্রীযুক্ত বাগলের রচনা থেকে উপরের উদ্ধৃতিগুলি সংগৃহীত।

CENTRAL LIBRARY

কিছু এই শিল্পশিক্ষার কাছাকাছি ছিল না। এবং পরে যখন ভারতীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হল, তখন শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্ত্য মোহাচ্ছন্নতার কারণে কিংবা আর্থিক-ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কায়, ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা দেখিয়েছিল। ১৮৮৫-৮৬-তে পাঠ্যসূচীর মধ্যে খাঁটি ভারতীয় আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে ফ্রেসকো আঁকা শেখানোর ব্যবস্থা করা হলে ছাত্রদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গিলাডি তাঁর ১৮৮৫-৮৬এর রিপোর্টে বলেছেন :

'The late Mr. Schaumburg pointed out to me the necessity of reinstating Indian decorative art in its original brilliancy, but both he and myself were fully aware that we should have been undertaking a task beyond our power for this reason that we should have found in the native students themselves the chief and the strongest opposition to our efforts. It is for this reason that our newly established fresco-painting class numbers only eight students.'

ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় পদ্ধতি শেখানো যখন গিলাডি ও স্কামবার্গ অসম্ভব কাজ মনে করেছিলেন, তখন তাকে 'সম্ভব' করতে অবশ্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দুর্ধর্ষ সাহসের প্রয়োজন ছিল—তা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পশিক্ষা-ইতিহাসের ঐতিহাসিক পুরুষ ই বি হ্যাভেল। হ্যাভেলের ছিল সহজাত শিল্পবোধ ; সন্ধান ও চর্চার ফলে তিনি লাভ করেছিলেন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বাসনাময় ভালবাসা ; আর উল্টোদিকে দেখেছিলেন, কলকাতার আর্ট স্কুলে অনুসৃত হচ্ছে 'ইংরেজদের প্রাদেশিক শিল্পের চল্লিশ বছরের পুরনো, জঘন্য এক ঐতিহ্যরীতি।' পরাধীন দেশের মানুষকে আত্মমর্যাদা ফিরে দিতে এবং শিল্প যে, জাতীয় সৌন্দর্যবোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, এই স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু অস্বীকৃত সত্যটিকে শেখাতে হ্যাভেলকে কঠিন হতে হয়েছিল—নির্মম হাতে পরিষ্কার করতে হয়েছিল ভ্রান্ত রীতি ও ভ্রান্ত নমুনার আবর্জনাকে –যে ধরনের বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই হয় রোগীর মতিচ্ছন্নতার সময়ে।

হ্যাভেলের সংস্কারচেষ্টার বেশ কিছু বছর আগেই কিন্তু ভারতীয় শিল্পজগতে নূতন তরঙ্গের উদয় হয়েছিল, এবং তা এসেছিল ভারতীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ নিয়েই ; ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠেছিল সেই পৌরাণিক নাটকের একালীন চিত্রাভিনয় দেখে ; রবিবর্মা অচিরে স্বীকৃত হয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলে। হাঁ, রবিবর্মাই নূতন আন্দোলন এনেছিলেন।

রবিবর্মার পৌরাণিক ছবিগুলি একদিন ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের ঘরে দুলেছিল এবং তিনি নবযুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, সুতরাং রবিবর্মার ভূমিকা ও তার সমকালীন স্বীকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানানো উচিত।

রবিবর্মা কর্তৃক চিত্রশিল্পে নূতন ধারা প্রবর্তন : রবিবর্মার আলোচনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবিবর্মার জন্ম ১৮৪৮, মে মাসে। তিনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্কিত। তাঁরা তিন ভাই ও এক বোন, সকলেই স্বভাবশিল্পী। তাঁদের মা ছিলেন কবি। বাল্যে রবিবর্মা সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন, রামায়ণ মহাভারতের ভাবে নিমগ্ন থাকতেন এবং দেবদেবীর ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। চিত্রাঙ্কন তখনকার দৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর মানুষের বৃত্তি না হলেও মামা রাজা রাজবর্মার উৎসাহে রবিবর্মা শিল্পশিক্ষার পথে এগিয়েছিলেন। গোড়ায় তিনি 'ওয়াটার কলার'-এ ছবি আঁকতে শেখেন, পরে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজশিল্পী 'থিওডার জানসেনের কাছে

CENTRAL LIBRARY

অয়েল পেন্টিং-এর পদ্ধতি শেখেন—এবং এই পথেই তাঁর সাফল্যের সূচনা হয়। ১৮৭৩ সালে মাদ্রাজে ললিতকলা প্রদর্শনীতে তাঁর একটি ছবি সুবর্ণপদক পায়, যার বিষয় ছিল 'একটি নেয়ার মহিলা মল্লিকা-ফুলের মালা দিয়ে কবরী-সজ্জা করছেন।' 'এই চিত্রটি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, কিছুদিন ধরিয়া শহরের যেখানে-সেখানে ইহার সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিয়াছিল।' ১৮৭৬ সালে যখন রবিবর্মার 'শকুন্তলার পত্রলিখন' ছবিটি মাদ্রাজে প্রদর্শিত হল, তখন চারদিকে উৎসাহের অবধি রইল না, কারণ 'তৎকাল পর্যন্ত কোনো ভারতবর্ষীয় শিল্পী প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত নায়ক, নায়িকা বা ঘটনাবলীর তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন নাই।'

রবিবর্মার শিল্পপ্রয়াস অতঃপর প্রধানতঃ দুই কাজে নিবদ্ধ রইল—তিনি রাজা, মহারাজা ও ইংরেজ রাজ-পুরুষদের পোর্ট্রেট আঁকতে লাগলেন, যার ফলে প্রচুর অর্থ পেলেন, সেই সঙ্গে পরিচিতিও, দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কাব্য-পুরাণের ছবি এঁকে চললেন, যা তাঁর খ্যাতিকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। প্রচুরসংখ্যায় এই জাতীয় ছবি তিনি এঁকেছিলেন, বিশেষতঃ দেশীয় রাজাদের ফরমায়েশে—এদের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল বরোদার মহারাজার অনুরোধে আঁকা ১৪টি রামায়ণ-মহাভারতের ছবি। '১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বড়োদায় চিত্রগুলি কয়েকদিনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয়। তাহা দেখিবার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকল দিক হইতে দলে দলে লোকের সমাগম হয়। কিছুদিন বড়োদায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় হইতে বিষয় নির্বাচন করিয়া এই সর্বপ্রথম ক্যাম্বিসের উপর এরূপ জীবিতবৎ ও হৃদয়স্পর্শী তৈলচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।'

উপরের বিবরণ প্রবাসী পত্রিকার প্রথম বর্ষের অষ্টম-নবম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ) প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রবিবর্মা' নামক রচনা থেকে সংকলিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইকালে রবিবর্মার বিশেষ অনুরাগী। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার প্রথম বর্ষেও (১৯০৭) তিনি রবিবর্মার উপরে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তাঁর লেখা রবিবর্মার জীবন ও শিল্পকথা গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল। প্রবাসীর প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, রবিবর্মার রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রের হাজার হাজার ফটোগ্রাফ' ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে বিক্রীত হয়েছিল। জনসাধারণের উৎসাহ দেখে রবিবর্মা বোম্বাইয়ে লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ক'রে নিজের ছবিগুলির বহুবর্ণ অনুলিপি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার দ্বারা, 'তিনি তাঁহার স্বজাতীয় লোকদিগের মনে শিল্পানুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন।.. আজ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্র গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রসকল সাদরে রক্ষিত হইতেছে এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভারতের শিল্পজাগরণের ইতিহাসে রবিবর্মার স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এইভাবে:

'ভারতে মহাকবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, স্থপতি, ও সঙ্গীতবিশারদ অনেক জন্মিয়াছেন, কিন্তু এই রত্নপ্রসূ পুণ্যভূমির উপযুক্ত একজন চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। রবিবর্মা এই অভাব পূরণ করিয়াছেন কিনা আমরা বলিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অধুনাতন যুগে চিত্রবিদ্যারূপ মহতী কলার এরূপ অবনতি ও দুর্গতি হইয়াছিল যে, ইহার পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত মন্থরভাবে সম্পাদিত হইত, যদি রবিবর্মা স্বকীয় প্রতিভাবলে ইহাকে সাধারণের সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়া না তুলিতেন। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখনো লিখিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।'

প্রবাসীর এই প্রবন্ধের সামান্য আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকার এক রচনায় জাতীয় ঐক্যবিধানে শিল্পের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন। শিল্পের ভাষা সর্বজনীন; ভারতবর্ষের মত বহুভাষার দেশে যেখানে প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত সাহিত্য অন্য ভাষাভাষীর কাছে পৌঁছতে অসমর্থ,

CENTRAL LIBRARY

সেখানে শিল্প তার নীরব অথচ অনস্বীকার্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়—এই সকল কথার সঙ্গে রামানন্দ কায়স্থ সমাচারের উক্ত রচনায় ভারতবর্ষে শিল্পের পুনরুত্থান-সম্ভাবনার অন্যতম কারণরূপে 'রাজা রবিবর্মার চিত্রাবলীর ব্যাপক ব্যবহারের' উল্লেখ করেছিলেন। 'পাঁচবছর আগেও ঐ চিত্রগুলি উত্তরভারতে প্রায় অপরিচিতই ছিল।' রবিবর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী বা উপযুক্ত অনুকারীর অভাবের জন্য দুঃখপ্রকাশ ক'রে রামানন্দ মারাঠি ভাস্কর স্বাত্রের শিল্পকর্মের সবিশেষ প্রশংসাও করেছিলেন।

রবিবর্মার দেহান্তের পরে ১৯০৭ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় 'রবিবর্মা' নামক রচনাতেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উক্ত শিল্পীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে অভিহিত করেছিলেন, যিনি ধর্মীয় ও পৌরাণিক চিত্রাবলীর অঙ্কনের ও বহুল প্রচারের দ্বারা 'অসচেতনভাবেই সম্ভবতঃ হিন্দুজাতিগঠনে সাহায্য করেছিলেন।'

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ১৯০৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশে শিল্পান্দোলন শুরু হয়ে গেছে, এবং তা হয়েছে জাতীয় ভাবভিত্তির উপর নির্ভর করেই। সুতরাং ৬ বছর আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেখানে রবিবর্মা সম্বন্ধে মুগ্ধ প্রশস্তি ভিন্ন আর কিছু করার কথা ভাবতে পারেন নি, সেখানে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁকে রবিবর্মার ছবিতে অনুসৃত বিদেশী রীতির কথা স্বীকার করতে হয়েছিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, রীতি বিদেশী হলেও রবিবর্মার ছবির বিষয় স্বদেশী। স্বদেশীয় কাব্যনাটকের 'সবচেয়ে সুন্দর, সকরুণ বা প্রাণোন্মাদিনী দৃশ্যগুলি' নির্বাচনের কৃতিত্বের জন্য তাঁর অঢেল প্রশংসা করার পরে আরও এগিয়ে গিয়ে রামানন্দ ইঙ্গিতে বলেছিলেন, রবিবর্মা তাঁর বাস্তববাদের দ্বারা ভারতীয় শিল্পের অবাস্তবতার ত্রুটি অনেকাংশে দূর করেছেন।—

"This is not the place to enquire why the Greek gods and goddesses were given human and natural shapes, whereas India's gods and goddesses had very often non-human and non-natural shapes. What we are here concerned with is to note that Ravi Varma's paintings represent to some extent, but not entirely, a return to nature in the creative function of art in the domain of mythology.'

বাংলায় চিত্রালোচনার প্রবর্তক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবর্মার প্রশংসায় বলেন্দ্রনাথ

বাংলাদেশে রবিবর্মার প্রথম আলোচক কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসীর ১৩০৮, অগ্রহায়ণ-পৌষের পূর্বোক্ত আলোচনার প্রায় আট বছর আগে 'সাধনা' পত্রিকার ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় [১৮৯৩] 'রবিবর্মা' প্রবন্ধে ২৩ বছরের বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বোধহয় প্রথম বাংলাদেশে রবিবর্মার বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলাসাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের একটি গৌরব চিরদিন স্বীকৃত হবে—তিনি বাংলাভাষায় চিত্র-সমালোচনার প্রবর্তক।[২৪] বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন দীর্ঘায়ত হয়নি (মাত্র ২৯ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়),

২৪ বলেন্দ্রনাথ বাংলায় চিত্রসমালোচনার প্রবর্তক, এই কথার পক্ষে সুবিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যায়। ১৩০০, অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহিত্যে' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র মধ্যে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের 'রবিবর্মা'র উল্লেখ ক'রে লেখা হয়: "শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবিবর্মা' অতি সুন্দর এবং ভাবুকতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক প্রবন্ধ। চিত্রসমালোচনা বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম। বলেন্দ্রবাবুর ভাষার গুণে চিত্রগুলি যেন নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। বলাবাহুল্য এইরূপ মৌলিক প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।'

CENTRAL LIBRARY

এবং তাঁর অধিকাংশ রচনায় রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি ও ভাবোচ্ছ্বাসের বাহুল্য, তাহলেও একটি লক্ষণ বিশেষভাবে দেখা গেছে—তার মন সহজেই রূপের ডাকে সাড়া দিত, এবং তিনি সাহিত্য-আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পঠিত বস্তুকে রূপচিত্রের আকারে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যিকদের 'চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' তাঁর

বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকার মন্তব্যটি আক্ষরিকভাবে সত্য নাও হতে পারে। বলেন্দ্রনাথের রচনার পূর্বেও হয়ত সাময়িক পত্রিকায় কোনো বিশেষ ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে যথার্থ সাহিত্যগুণান্বিত চিত্রালোচনা বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বলেন্দ্রনাথ সচেতনভাবে প্রস্তুত হয়ে চিত্রালোচনায় নেমেছিলেন—রাস্কিন-পদ্ধতিতে। এইকালে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রাস্কিনের ললিতকলাবিষয়ক রচনার ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জন রাস্কিনের দেহত্যাগের পরে তাঁর বিষয়ে প্রিয়নাথ সেন 'প্রদীপ' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩০৭ থেকে কয়েক সংখ্যায় চমৎকার এক আলোচনা করেছিলেন, দেখতে পাই।

কলাশিল্প সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সাধারণ আলোচনা কিন্তু বাংলায় বলেন্দ্রনাথের আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' নামে একটি প্রবন্ধ ছিল। সেটি শ্যামাচরণ শ্রীমানি-প্রণীত 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী' নামক গ্রন্থের উপরে আলোচনাসূত্রে লেখা হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা'র বিষয়ে পরিচ্ছন্ন আলোচনা করেছিলেন। এবং সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে 'ভাগ্যহীন বাঙালী'র 'বড়ই বিরোধ' নিয়ে খুব দুঃখ করেছিলেন। একদিকে অধিকাংশ বাঙালীর অবর্ণনীয় দারিদ্র্য যার জন্য শিল্পচর্চার কোনো সম্ভাবনাই তাদের জীবনে নেই, অন্যদিকে গ্রাম্য জমিদার ও ধনাঢ্য বাবুদের স্থূল রুচি এবং কদর্য অনুকরণস্পৃহা, যা বিলেতী চিত্র-ভাস্কর্যের শ্রীহীন স্থূলদৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত। সৌন্দর্যহীনতার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের দোষও ধরেছেন, যেখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতপার্থক্য ঘটবে। তিনি লিখেছেন, "কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ; যে ধর্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্মরপ্রস্তর হর্ম্যও গোময়লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুর্দশারই সম্ভাবনা।' ব্যথিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধশেষে পুনশ্চ লিখেছেন: 'সৌন্দর্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ বুঝি বিধাতা বাঙালির কপালে লিখেন নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র, সৌন্দর্যবিরোধী বলে যে বিশেষ হিন্দুধর্মের সমালোচনা করেছেন, সেই ধর্মভুক্ত হিন্দুরা অবশ্যই গোমাতৃনন্দন। কিন্তু সকল হিন্দুই তেমন নন, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়েই সচেতন ছিলেন বা পরে সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার ললিতগিরিতে ভগ্ন ও ভগ্নাবশিষ্ট স্থাপত্য-ভাস্কর্য স্বচক্ষে দর্শন করার অভিজ্ঞতা নিবেদন করেছেন:

"চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ছিল? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমালাভরণভূষিত, বিকচিতচেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা, চীরাম্বরা, তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা···স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু?" তারা অবশ্যই হিন্দু, কিন্তু 'অঙ্গহীন আধুনিক হিন্দু' নয়,—বঙ্কিমচন্দ্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন—যে-আধুনিক হিন্দুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখতে যায়, কুমারসম্ভব ছেড়ে সুইনবার্ন, গীতা ছেড়ে মিল পড়ে, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছেড়ে সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করে দেখে।

CENTRAL LIBRARY

বিশেষ অনুরাগের বিষয় ছিল, এবং তিনি সর্বদা 'রঙ ও ভাব' নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও তাঁর আগ্রহ ছিল, উড়িষ্যার উপরে লিখিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে (যথা 'কণারক', 'খণ্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা,' 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র') তার পরিচয় রয়েছে, এবং তিনি মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার অভিনিবিষ্ট দর্শক হতে পেরেছিলেন, 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' নামক প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ।

সেইসঙ্গে, বিস্ময়ের কথা, তিনি রবিবর্মার মুগ্ধ বন্দনাকারী হতে পেরেছিলেন। উড়িষ্যার প্রত্নমহিমায় যাঁর চিত্ত অভিভূত, মুঘল-রাজপুত চিত্রকলার সুদূর সৌন্দর্যে যিনি রসাতুর, যিনি শিল্পের ক্ষেত্রে অযথা সংকীর্ণতায় আক্রান্ত নন (যেমন, তিনি চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কালী-বিদ্বেষের উত্তরাধিকার পাননি)—তিনি কি ক'রে রবিবর্মাকে মুগ্ধস্তুতিতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তা সত্যই বিচিত্র মনে হয়।

রবিবর্মা সম্বন্ধে 'সাধনা'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে, এবং একই পত্রিকার মাঘ ১৩০০ সংখ্যায় 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধে তৎকালীন বাংলার চিত্রকলার দশায় কিছু পরিচয় পাই।

উভয় প্রবন্ধেই বলেন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্টুডিওগুলি থেকে যেসব পৌরাণিক চিত্র বেরিয়েছে, সেগুলির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ঐসব ছবির মধ্যে তিনি কোথাও ভাবের বিকাশ বা শরীরের গঠনপরিপাট্য দেখতে পাননি। সরস্বতীর মুখে কোনো প্রতিভার পরিচয় নেই ; আর্ট স্টুডিওর চিত্রকর বহু যত্নে সরস্বতীর মুখের সকল ভাব মুছে ফেলে 'একটি অতিনির্বোধবৎ নিষ্প্রভ মুখমণ্ডল রচনা' করেছেন। চৈতন্যের 'দারুণ পীতকান্তি' তাঁর যকৃতের পীড়ার সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং চোখের অবিরল জলধারার স্তূপ দেখলে মনে হয়, চোখ থেকে অবিরল ক্ষীর ঝরছে। কৃষ্ণ, সাহিত্যের বর্ণনায় বর্ণে কৃষ্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্গীয় চিত্রকর-অঙ্কিত কৃষ্ণ-চিত্র দেখে মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণ যুগ যুগ ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন।' মহাদেবকে ছবিতে দেখা যায় 'পেশীবিহীন-গঠন, বাবু-মুখশ্রী, তাম্বুলরাগরক্ত-অধর' এক ব্যক্তি। মহাদেবের ললাট থেকে তৃতীয় নয়নের আগুন বেরিয়ে মদনকে ভস্ম করেছিল, সুতরাং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, 'মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত কাঁটা' বেরিয়েছে। 'করালী কালিকার ভীষণ গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া মন কোথায় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে,' না আর্ট স্টুডিওর ছবিতে 'কুৎসিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার' ছবি দেখা যাচ্ছে, যার বর্ণগভীরতা আনতে রাণীগঞ্জের কালিমার বা আলকাতরার আমদানী করা হয়েছে। 'শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ন্যায় বলিলে সত্যসত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা, এমন বোঝায় না' —একথা বলার পরে লেখক প্রশ্ন করেছেন—'ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যক্ত হয় নাই! নারীহৃদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিতলালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ-দৃশ্য ভীষণ নহে? যে-বক্ষে সন্তান স্নেহপান করিয়া পরিপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়িয়া সহস্র নৃমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে—ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্তিই কি যথেষ্ট নহে?' লেখকের বক্তব্য, 'যে-চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত রঙ লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।'

শিল্পরসিক বলেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, 'একটি রাজনৈতিক অধিকারলাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য', এবং 'এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্যসমূহকে যে-চিত্রকর অক্ষুণ্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।'

বলেন্দ্রনাথের কাছে রবিবর্মা সেই মহাত্মা যিনি এদেশের চিত্রকলাকে 'আদিম রঙলেপা বর্বরতার অবস্থা' থেকে উদ্ধার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথ আরও চড়াও হয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশের আর্ট

CENTRAL LIBRARY

স্টুডিও ও কালীঘাটের পটের চতুঃসীমার মধ্যে বর্ধিত' যাঁরা, তাঁদের রবিবর্মাকে সমালোচনা করবার অধিকার নেই। বলেন্দ্রনাথ-কৃত রবিবর্মার কিছু পরিচয়-স্তুতি উদ্ধৃত করা যাক :

"দাক্ষিণাত্য···বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক তাহাই মিলিয়াছে—সভা নহে, সমিতি নহে, কোম্পানী নহে, কলিকাতার মত আর্ট স্টুডিও নহে—একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কাপি না করিয়া সৌন্দর্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে···সেই প্রতিভা রবিবর্মা। তিনি পৌরাণিক এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক অনেকগুলি চিত্র রচনা করিয়াছেন। এবং এই সকল চিত্রে তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ও রসগ্রাহিতার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্বাবয়বসম্পন্না নায়ার রূপসীর চিত্র, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সুডোল নিটোল গঠন, নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্, রামসীতার পরিণয় বা সুভদ্রার্জুনের প্রণয়দৃশ্য কাহার না চিত্তহরণ করে? তাঁহার শান্তনুর নিকট হইতে পুত্রসহ গঙ্গার পলায়ন, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থে প্রেরিত মেনকা, শান্তনুর প্রণয়জিজ্ঞাসায় সরলা সত্যবতীর সলজ্জ অথচ মুক্ত অকপট ভাব, কোনটি না সুন্দর! যশোদার গোদোহন ও হৃষ্টপুষ্ট গোপালের চিত্র, পূতনাবধান্তে মঙ্গলাচরণকালে শিশু নন্দদুলালের ভাবমাধুর্য এবং কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ হইতে গিয়া রাধিকাকে প্রেমভরে আক্রমণ, কোন্‌টিতে না আমাদের অন্তরে একটি পৌরাণিক আনন্দ সঞ্চার করিয়া দেয়? চিত্রগুলির মধ্যে যে একটু মনোহর ভাব আছে, সেই ভাবটুকু ভারতবর্ষের অন্তরতম হৃদয় মথিত করিয়া উঠিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দরভাবে এদেশে ইতিপূর্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবিবর্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।"

রবিবর্মার ছবি ধরে-ধরে বলেন্দ্রনাথ অতঃপর অনেক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেছেন, সমালোচকের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করবার জন্য দু'একটি ছবির ত্রুটিসন্ধানের চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু তাঁর লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়, রবিবর্মা তখন শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে কিভাবে গৃহীত হয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তরুণ বলেন্দ্রনাথ যে-সকল কাঁচা কথা বলেছেন, যেমন ভারতবর্ষীয় চিত্রের বর্ণাঢ্যতা সম্বন্ধে কটূক্তি ('আদিম রঙলেপ্য বর্বরতা')—সে-সব বিষয়ে মনে হয় তাঁর ধারণা পরে কিছু বদলেছিল, কিন্তু রবিবর্মার সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক ভাবাবেগ অব্যাহতই ছিল। 'প্রদীপ' পত্রিকায় তাঁর দেহান্তের পরে ১৩০৬, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'রবিবর্মা' নামে যে অসমাপ্ত প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, যার ভূমিকারূপে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, এইসব রচনার কালে বলেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন—তার মধ্যেও রবিবর্মার চিত্রগুলির রসনিবেদনের ভাবময় চেষ্টা রয়েছে, এবং বিস্ময়ের কথা, রবিবর্মার রচনার দেশী ভাবের উল্লেখও সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে যে, বিদেশীয় পটভূমিকা রয়েছে, তা স্বীকার করা হয়েছে, যথা, 'বিরহিণী যেখানে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একান্তমনে ধ্যান করিতেছেন, সেখানে তাঁহার পার্শ্বের আলিসাটি হয়ত নিতান্ত আধুনিক স্থাপত্যানুযায়ী ইতালীয় কলস-সজ্জিত।' এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বাংলাদেশে রবিবর্মার ব্যাপক প্রচারের উল্লেখও করেছিলেন।[২৫]

---

২৫ 'পাঁচ বৎসর পূর্বে সাধনার পৃষ্ঠায় রবিবর্মার সহিত আমাদের যখন প্রথম পরিচয় সাধিত হয়, তখন কলিকাতার বাজারে তাঁহার চিত্রাবলীর আমদানী হয় নাই; এবং বোম্বাইপ্রবাসী-ভিন্ন সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার নাম পর্যন্তও অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং সে সময় নামতঃ তাঁহার গুণগ্রহণ করিবার অবসর আমাদের সর্ব-সাধারণের ভাগ্যে জুটে নাই, এবং সাধনার সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদের কল্পনা বোধ করি তদানীন্তন আর্ট স্টুডিয়োকে লঙ্ঘন করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইবার অবসর পায় নাই। এই কয় বৎসরের মধ্যে রবিবর্মার চিত্রাবলীতে

CENTRAL LIBRARY

রবিবর্মা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের শেষ অসমাপ্ত রচনাটি প্রমাণ ক'রে দেয়, শিল্প-বিষয়ে ধ্রুব আদর্শবোধের অভাব সমালোচকের বিচারকে কতখানি দ্বিধান্বিত ক'রে রাখে। রবিবর্মা সম্বন্ধে ঐ শেষ প্রবন্ধ লেখার সময়েও বলেন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে অনুভব করতে এবং বলতে পারেন নি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে রীতির সঙ্গে ভাবের যোগ অবিচ্ছেদ্য, এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশের শিল্পরীতি তার জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিরূপেই গড়ে ওঠে। রবিবর্মার তৈলচিত্রগুলিতে যে, কল্পনার কোনো বিকাশ নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি যে, থিয়েটারের সুচিত্রিত দৃশ্যপট বা অভিনয়ের রঙিন স্থিরচিত্রের অতিরিক্ত কিছু নয়, একথা বলেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি, এবং রবিবর্মার উদ্দিষ্ট পৌরাণিক ভাবময়তাকে যে, পাশ্চাত্ত্য রীতিতে নয়, আমাদের ধারাবাহিক শিল্পরীতির উপর নির্ভর করেই (অবশ্যই কালোপযোগী পরিবর্তন-সহ) ফোটাতে হবে, এ বোধও তাঁর জাগেনি।

অথচ, বিস্ময়ের কথা, বলেন্দ্রনাথ ঐ ধারণায় সমর্থ ছিলেন—তার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁর রচনাতেই আছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির মোহ তাঁর মধ্যে এমনই প্রবল ছিল যে, তিনি ভারতীয় শিল্পরীতির পক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন নি।

রবিবর্মা সম্বন্ধে শেষ প্রবন্ধ প্রকাশের দেড়বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩০৫ সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ এবং আশ্চর্যজনক একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, যার নাম 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' যেটি আমার বিবেচনায় শিল্প-বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা তো বটেই, সমগ্র বাংলা শিল্প-সমালোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। রচনাটিতে বলেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সমাসবদ্ধ বাগ্‌বাহুল্য আছে, কিন্তু যেভাবে তাতে মুঘল চিত্রকলার রূপরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেভাবে ঐ রীতির সঙ্গে ভারতীয় ভাবধর্মের যোগ দেখান হয়েছে, সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের ও আত্মপ্রকাশ-রীতির সঙ্গে তার পার্থক্যকে—তা সবিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারে। দিল্লীর চিত্রশালিকায় ছবিগুলির বর্ণনা দেবার কালে বলেন্দ্রনাথ সতর্ক ক'রে বলেছেন, এইসব ছবি বাংলাদেশে নব্য শিক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে প্রহেলিকা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁরা তাঁর (বলেন্দ্রনাথের) মত 'কিছুদিন পশ্চিমদেশে যাপন করিয়াছেন, এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠী-চত্বরে অথবা জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে এই মনোহারিণী চিত্রবিদ্যার পরিচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন' তাঁরা ঐ ছবি বুঝতে পারবেন। একই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এইসব চিত্র (মুঘল ও রাজপুত) কেবল পুরাতন বলেই মনোহর নয়, তার রঙ ও রেখার নিপুণ সূক্ষ্ম বিন্যাসের জন্য তা শিল্পরূপে উৎকৃষ্ট। 'ইহার বিচিত্র সূক্ষ্ম রেখাপাত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাচ্য বর্ণবিন্যাসে যে-সুন্দর কারুকার্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লক্ষিত হয়।'

বলেন্দ্রনাথ আলোচ্য লেখায় স্থির আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার ভাবধর্ম ও রূপধর্মের পার্থক্য উন্মোচন করেছেন। উৎকৃষ্ট সে রচনা। অনবদ্যভাবে তিনি ভারতবর্ষীয় শিল্পকলার 'প্রায় নির্লিপ্তবৎ অনতি সচেতন রচনাকলার' উল্লেখ করেছেন, যা 'সকল চেষ্টার ভাব অপসারিত' ক'রে প্রশান্ত স্থৈর্য সঞ্চারিত ক'রে দেয়। প্রাচ্য চিত্রশিল্পের 'রঙের বর্বরতার' কী অপূর্ব সমর্থন অতঃপর বলেন্দ্রনাথের রচনায় :

'আমাদের নিকট ইহা স্বভাবতঃই রমণীয়—বিষয়গুণেও বটে, এবং আরো বিশেষতঃ ইহার রবিকরোদ্ভাসিত

দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এমনকি সুদূর পল্লীগ্রামের মেটেঘরের দেওয়ালেও দাক্ষিণাত্যের রূপসীগণ এলোচুলে কুঞ্চিত কুন্তলে স্মিতহাস্যে মালানিবদ্ধ কবরীবেষ্টনে গোলাপী ও বাসন্তী রঙের সার্টিকা ও বিচিত্ররঞ্জিত চোলিকায় মনোহারিণী মূর্তিতে শোভা পাইয়া থাকেন।'

CENTRAL LIBRARY

বর্ণাভাসে। সে ঔজ্জ্বল্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাইনা। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতঃই তদ্দেশেরই সূর্যালোক দীপ্তি পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্য-বিদ্যাশিক্ষিত নব্য আর্টস্কুলের ছাত্রের রচনারও আলোকসন্নিবেশ প্রায়ই বিলাতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদ্দেশীয় মৃদু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের পুরাতন সূর্যালোক অবহেলা-লাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই।'

পাশ্চাত্ত্য রীতি কি মারাত্মক প্রভাব ভারতীয় চিত্রকরদের উপরে বিস্তৃত করেছে, বলেন্দ্রনাথ তা অভ্রান্ত শক্তিকে উদ্‌ঘাটন করবার সময়ে কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন, সম দোষে দোষী রবিবর্মার কী প্রচণ্ড প্রশংসা তিনি এরপরেও করেছেন। 'প্রয়োগবিজ্ঞানে' ভারতীয় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিল্পকলার পার্থক্যের কথা বলেন্দ্রনাথ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য :

'এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব। এমনকি এই অশিক্ষিত পটুত্বে (!) শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য রুচি যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেখানেই তাহার বর্বর স্পর্শে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশিল্পী বর্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরন্তন শালের পাড়ে নেত্রঝলসী বর্ণে বিলাতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ন সূচিত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে প্যাটার্ন যতই স্বভাবানুরূপ হইয়া আসে, শিল্পে মনোহারিতা ততই দূর হইতে থাকে।

'চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে-কারণে গালিচার জমিতে ও শালের সূচীকার্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিষ্ফল হয়, ঠিক সেই কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা স্ফূর্তি পাইয়া উঠে না। গৃহভিত্তিমূলে যে-চিত্র অঙ্কিত হয়, ক্ষুদ্র গৃহাকাশের প্রস্তরনিবদ্ধ চতুষ্পার্শে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহস্র কারুকার্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতির স্বার্থেই খুঁটিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ।...

'নব্য পাশ্চাত্ত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতন্ত্র। শিল্পী সেখানে উচ্চভূমিপরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্মবিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালো রূপ চোখে পড়ে। এই জন্য ঐ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টিপথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রখানি একদৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মাত্র, এবং নিকটে কারুকার্যে চিত্তহারী।

'এত বিচিত্র সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস, এত অসংখ্য রঙের সমাবেশ ও তাহার এরূপ মনোহর সামঞ্জস্যবিধান, অন্যত্র এরূপ সুলভ নহে।'

দিল্লীর চিত্রশালিকায় ছবি দেখার পরে বলেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ভারতের সমগ্র প্রাচীন সভ্যতার সজীব ঐক্যের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, হারেমের প্রসাধনবিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প, সবকিছুর মনোহর মিলন—কিন্তু সেই ধারাকে বর্তমানকালে টেনে আনার কল্পনা যখন তিনি করেছেন, তখন, হায়, বলেন্দ্রনাথ রবিবর্মার স্থূল পৌরাণিক ছবিগুলির বেশী কিছু ভাবতে পারেন নি।

CENTRAL LIBRARY

বিবেকানন্দ কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনা

যে-কালের কথা আমরা বলছি, সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন রবিবর্মার ছবির স্থূলতার কথা আর কেউ ভেবেছিলেন বা বলেছিলেন কিনা আমরা এখনো জানি না। রবিবর্মা সম্বন্ধে স্বামীজীর অশ্রদ্ধাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিখ্যাত একটি উক্তি আছে – যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে দশ বছরের মধ্যে বাংলা বা ভারতের শিল্পালোচনা পূর্ণ হয়ে যাবে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের শেষভাগে স্বামীজী রবিবর্মা সম্বন্ধে সেকালের হিসাবে যে-দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন, তা এই :

'ওদের (পাশ্চাত্যের) নকল করে এক-আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভালো।'

নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উক্তি। তৎকালীন শিল্পধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন। পটচিত্র ও রাজপুতচিত্র তাঁর কাছে রবিবর্মার নকলনবিশির চেয়ে অনেক ভাল বলে মনে হয়েছিল, এবং দেশীয় ছবির বর্ণরাগের প্রশংসা পর্যন্ত তিনি করেছেন। বাংলার শিল্পান্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন —স্বামীজীর ধারণাকে কিছু পরিমাণে অঙ্গীকার করেই নূতন ধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

স্বামীজী রবিবর্মার মূল ছবির সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচিত ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের সভায়, যেমন ত্রিবাঙ্কুরে বা মহীশূরে রবিবর্মার ছবি দেখেছিলেন, অন্ততঃ বরোদায় যে রবিবর্মার পূর্বোক্ত বিখ্যাত রামায়ণ-মহাভারত সিরিজ দেখেছিলেন, তা জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে বরোদা থেকে লেখা ২৬ এপ্রিল, ১৮৯২-এর চিঠিতে দেখা যায় : 'আমি লাইব্রেরী ও রবিবর্মার ছবি দেখেছি ; এখানে দেখবার মতো এই তো আছে।'

রবিবর্মার ছবি 'দেখবার যোগ্য' এই কথার অর্থ নয় যে, তা সমর্থনের যোগ্য। এরই মধ্যে যে তিনি রবিবর্মার ছবির কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছেন, সে বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ডঃ দত্ত বৈকুণ্ঠলাল সান্যালের কাছ থেকে স্বয়ং শুনেছেন, মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন স্থানীয় এক ব্যারিস্টারের বাড়ীতে ছিলেন তখন তিনি রবিবর্মার ছবির ত্রুটির রূপ আলোচনা ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, তিনি অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর এই ধরনের কথা শুনে অবাক। ভারতবিখ্যাত শিল্পীর সমালোচনা করছেন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী! গৃহস্বামী অবশ্য উক্ত ব্যক্তিকে সমকে জানিয়েছিলেন—সন্ন্যাসী শিল্পতত্ত্বে কতখানি পারঙ্গম।

স্বামীজী কর্তৃক সমকালীন ভারতীয় শিল্পে পরানুকরণের সমালোচনা

শিল্পের ক্ষেত্রে 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষার' কঠোর সমালোচনা স্বামীজী বহুভাবে করেছেন। বিশেষ ক'রে যখন তিনি দেখেছিলেন, শিল্পশিক্ষার্থী ভারতীয়রা সেই দেশের ছবির নকল করতে চাইছে, যে-দেশ ইউরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পের দেশ বলে অবজ্ঞাত। স্বামীজীর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ যখন বলেছিলেন, 'সাহেবদের (ইংরেজদের) তো art বেশ', তখন স্বামীজী ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'দূর মূর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙটাকে সোনা দেখছে।' স্বামীজীর মতে, ইংরেজদের জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি। তাদের বাড়িঘর, পোষাক, সব রূপহীন। তিনি বলেছিলেন, 'সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট।' ইংরেজদের স্থাপত্যের এবং পোষাকের উল্লেখ ক'রে প্রশ্ন

CENTRAL LIBRARY

করেছিলেন, 'ওদের জলখাবার গ্লাস আর আমাদের ঘটি—কোনটায় আর্ট আছে?' দুঃখ করেছিলেন, 'ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি-ঘটি ফেলে এনামেলের গ্লাস এসেছে ঘরে।' কিন্তু যেহেতু এযুগে ইউটিলিটিকে বর্জন করা সম্ভব নয়, তাই বলেছিলেন, 'এখন চাই আর্ট এবং ইউটিলিটির সংযোগ, যেটা জাপান চট ক'রে করতে পেরেছে, এবং সেজন্যই দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে।' ('বাণী ও রচনা', নবম, পৃ ৪০৭)

জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল যে-ইংরেজ, তার শিল্পবোধ সম্বন্ধে রীতিমত কঠিন ভাষাতেই স্বামীজী কথা বলেছেন, যদিও তাদের কাব্য নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল:

'The Anglo-Saxon people have always been badly fitted for art. They have good poetry, for instance, How wonderful is the blank verse of Shakespeare!' (ইং রচনাবলী—চতুর্থ, পৃ ১৯৬)

ভারতীয় গণজীবনের শিল্প সম্বন্ধে এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আর একটি মূল্যবান অংশের উল্লেখ এখানে করে নিতে হয়, যার কথা ইংরেজ ও ভারতীয়ের শিল্পবোধের তুলনাপ্রসঙ্গে এসে গিয়েছিল। শিল্পকে স্বামীজী যেহেতু কেবল কতকগুলি মানুষের ব্যক্তিগত আকৃতির প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি, সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঐ শিল্পবোধের সম্পর্ক দেখতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার রূপচ্ছন্দের দিকে তাকিয়ে যথার্থ গৌরবের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতীয় বা এশিয়াবাসীর সভ্যতার এক বিশেষ মহিমা—শিল্প তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। জাপানের প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, 'ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে এশিয়াটিক। আমাদের দেখছিস না সব গেছে তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কতবড় শিল্পী ছিলেন!'

গণশিল্পের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণের পিছনে রয়েছে তাঁর এই মৌলপ্রত্যয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-শিল্প, অর্থসম্পদ কোনোকিছুই বিশেষ গোষ্ঠীর ভোগের বস্তু হওয়া উচিত নয়। কোনো সভ্যতার মহিমা কিছু-সংখ্যক সর্বোচ্চ-শ্রেণীর মানুষকে সৃষ্টি করার উপরে নির্ভর করে না, বহুসংখ্যক উন্নত মানুষ সৃষ্টি করার উপরই তা নির্ভরশীল। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সর্বপর্যায়ে না পারুক, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্পর্শ করতে ভারতবর্ষ পেরেছিল। ইংরাজ-আমলে স্বামীজী তথাকথিত গণতন্ত্রের আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু গোষ্ঠী-অধিকার কায়েম করার চেষ্টাই দেখেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে অনুস্যূত জাতীয় শিল্পচেতনার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে-ধরনের স্থূল ভোগের স্বার্থপরতা এনেছিল, স্বামীজী তা দেখে শিউরে উঠেছিলেন। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন:

'বিশেষ দুর্দশা হয়েছে (বাংলাদেশের) শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোরে আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্র-বিচিত্র করত, বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত - সেসব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরনোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরনো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসো গো! কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না! দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা!!'

('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

CENTRAL LIBRARY

মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ এর এক চিঠিতে গ্রামবাংলার একটি শিল্পসৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। গ্রামটি নিঃসন্দেহে আঁটপুর, যা ইদানীন্তনকালে শিল্পরসিক বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। স্বামীজী বলেছিলেন :

"আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মত ঘরগুলোরও নাম 'বাংলো।'

"প্রাচীনকালে কোনো ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী ক'রে দিতে পারতাম! তবে এখনো যে-কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও।"[২৬]

---

২৬ আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের গ্রাম। স্বামীজী বহুবার এখানে এসেছেন, এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন, এই গ্রামটির কতখানি ঐতিহাসিক মূল্য। এখানেই ১৮৮৬ ডিসেম্বর, বড়দিনের রাত্রে নরেন্দ্রনাথ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নেবার সিদ্ধান্ত করেন।

আঁটপুরের আটচালা এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। আঁটপুর নিয়ে আলোচনা আগে অনেকবার হলেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিশেষ মূল্য এইখানে—পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্বন্ধে এতখানি প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই আছে। 'সরেজমিনে পশ্চিমবাংলার কয়েকহাজার মন্দির-মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি পর্যবেক্ষণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য' তাঁর হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, আঁটপুরের 'বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দির ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপটি···পোড়ামাটির অলঙ্করণ ও কাঠখোদাইয়ের উৎকর্ষের দিক দিয়ে···পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহমাত্র নেই।' মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, 'টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের এ-জাতীয় দেবালয়ের মধ্যে (এটি) সর্বোচ্চ।' চণ্ডীমণ্ডপটি সম্বন্ধে বক্তব্য : 'চণ্ডীমণ্ডপটির কাঠের কারুকার্যও এত অপরূপ যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাঠ-খড় দিয়ে দেবগৃহ নির্মাণের এই বিশিষ্ট রীতিটির নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আঁটপুর এ-বিষয়েও প্রায় অনন্য।' চণ্ডীমণ্ডপটির গঠনশৈলী আলোচনা মধ্যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "চালের ভারবাহী গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গুলির মুখে আলাদা যেসব সহায়ক কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত। বরগা ও খুঁটিগুলির সর্বাঙ্গে ফুলকারি বা অনুরূপ নকাশি কাজ। এই উচ্চস্তরের কারুকৃতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশিল্পীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল, সেকথা বলাই বাহুল্য।···চণ্ডীমণ্ডপের দৃষ্টিকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের ভিতরের দিক ময়ূর-পালকের শাদা ডাঁটি অথবা রঙে ছাপানো শরকাটি বা বেতের চিলতে দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। রঙিন কাঠির টানা পোড়েনে নানারকম জ্যামিতিক বা ফুলকারি নকশার সৃষ্টি করা হত, যার নাম ছিল 'রূপসী কাজ।' এ-জাতীয় চারুশিল্পের অক্ষত নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কি না জানি না।" শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন, "বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেকালের 'সূত্রধর' পদবীর শিল্পীরা···একাধারে কাঠখোদাই ও টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ করতেন।' আলোচ্য চণ্ডীমণ্ডপটির ইতিহাস আলোচনা করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—চণ্ডীমণ্ডপটি ২৮৮ বৎসরের পুরাতন।

CENTRAL LIBRARY

পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর সংযোগের বিষয়ে আর একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং গোড়ায় বেলুড়মঠে স্বামীজীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন। চীন, জাপান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওকাকুরা ঐ সকলের উৎসভূমি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলেন, এবং সৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল উজ্জ্বল দৃষ্টির আলোকলাভ করেছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ আগেই দিয়ে এসেছি।[২৭] স্বামীজীর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে ওকাকুরা প্রথম ভারতের শিল্পতীর্থগুলি ঘুরে দেখেছিলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে ওকাকুরা অবশ্যই ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্মের কথা জেনেছিলেন, উল্টোপক্ষে স্বামীজীও নিশ্চয় ওকাকুরার মত বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জাপানের ও প্রাচ্যদেশের শিল্প কতখানি ভারতীয়, তা শুনে পুলকিত হয়েছিলেন। তার দ্বারা স্বামীজীর পুরাতন ধারণাই সমর্থিত হয়েছিল। শিল্পে এশিয়া এক—এই বক্তব্য যতখানি ওকাকুরার, ঠিক ততখানি বা ততোধিক পরিমাণে বিবেকানন্দের, সেই সঙ্গে নিবেদিতার। ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থের ভাষাতেই কেবল নয়, বক্তব্যেও যে নিবেদিতার প্রচুর হস্তক্ষেপ রয়েছে, তার পক্ষে বহু প্রমাণ আমরা আগে দিয়ে এসেছি।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ওকাকুরা বাংলার শিল্প-আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, একথা সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করেন।

ভারতশিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরাকে স্বামীজী কতখানি অবহিত করেছিলেন, তার অতি সামান্য সংবাদ এখন আমরা পেতে পারি। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর পূর্বে-উল্লিখিত ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২-এর চিঠি দেখিয়ে দেয়—স্বামীজীর শিল্প শিক্ষা কতখানি ব্যাপক ছিল :

'ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে।

'বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিল—গতকাল এই শহরে এসেছে। কলাশিল্প সম্বন্ধে সে বিশেষ আগ্রহী। লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার বিশেষ উদ্দেশ্যে সে অকাতরে অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাওয়ার মাত্র কয়েকঘণ্টা পরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এই যুবকই ওকাকুরাকে শিল্পভারত (যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার একেবারে ঠিক লোক। আর আমার বিশ্বাস সে ওকাকুরার কথা শুনে খুবই উপকৃত হবে। ওকাকুরা সদ্য এখানে ভৃত্যরা ব্যবহার করে, এমন একটি পোড়ামাটির জল-পাত্র দেখেছেন। সেটির আকার এবং তার উপরে খোদাই কাজ দেখে তিনি একেবারে চমৎকৃত। কিন্তু এটি সাধারণ মৃৎপাত্র—পথের ধকল সহ্য ক'রে টিকে থাকতে পারবে না। ওকাকুরা তাই এর একটি পিতলের নকল তৈরী করিয়ে দেবার অনুরোধ ক'রে গেছেন। কী করি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তার কয়েকঘণ্টা পরে যুবক-বন্ধুটি এসে হাজির। এই কাজের ভার নিতে সে যে কেবল রাজি তাই নয়, সেই সঙ্গে বলেছে, ওকাকুরার পছন্দের ঐ পোড়ামাটির কাজের চেয়ে হাজারগুণ ভালো কারুকার্য-করা শত শত পোড়ামাটির পাত্র সে দেখাতে পারে।

---

২৭ বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য সেই সংবাদগুলি নেই। সেগুলি আছে লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর মধ্যে।

CENTRAL LIBRARY

'সেই পুরাতন অপূর্ব শৈলীতে আঁকা পুরাতন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। পুরানো শৈলীতে এখনো আঁকতে পারে, এমন একটিমাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। ঐ পরিবারের একজন একটি মটরদানার উপরে গোটা মৃগয়ার দৃশ্য এঁকেছে—খুঁটিনাটি বিবরণ আর অ্যাকশনের নিখুঁত ছবি।

'আশা করি ওকাকুরা ভ্রমণ শেষ ক'রে শহরে ফিরে এই ভদ্রলোকের অতিথি হবেন, এবং অবশিষ্ট শিল্প-নিদর্শনগুলির কিছু নমুনা দেখে নেবেন।

'নিরঞ্জন মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে গিয়েছে। ওকাকুরা জাপানী বলে তাঁর কোনো মন্দিরে ঢোকায় আপত্তি করা হয়নি। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন। মন্দিরে ওকাকুরাকে শিবপ্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।'

স্বামীজীর এই চিঠিটি কয়েকটি কারণে মূল্যবান। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর শিল্পবিষয়ে বিনিময়ের সংবাদ তো এর মধ্যে আছেই, অধিকন্তু আছে, মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর মুগ্ধ মনোভাবের পরিচয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর যেসব বক্তব্য ইতিমধ্যে উপস্থিত করেছি, তার মধ্যে পাঠক লক্ষ্য করেছেন, চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তব্য প্রায় নেই—সবই প্রায় স্থাপত্য ভাস্কর্য নিয়ে। বিস্ময়ের কথা অজন্তা-চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর কোনো কথা পাই না। তা কি অপরিচয়ের জন্য, তিনি কি গ্রিফিথের বই দেখেননি (লেডি হ্যারিংহামের বই অবশ্য আরও প্রায় দশ বছর পরে জন্ম নেবে), তিনি কি অজন্তার ছবি দেখে খুশী হননি (তাকি সম্ভব?), কিংবা অপরপক্ষে অজন্তা সম্বন্ধে অনেক-কিছু বলেছিলেন, লিখিত হয়নি বলেই তার কথা আমরা জানি না? শেষোক্ত ধারণাই ঠিক বলে মনে হয়। আলোচ্য চিঠিতে কিন্তু মুঘল-রাজপুত চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচ্চ প্রশংসাবাণী পাচ্ছি।

ভারত-শিল্পের পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ : রিয়ালিজম্ ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয়ের প্রশ্ন : শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর যেসকল বক্তব্য তুলে ধরেছি, এবং পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছি, তার থেকে কেউ যেন একথা ধরে না নেন—বাংলাদেশের পরবর্তী শিল্পসৃষ্টির সবটুকু স্বামীজীর পছন্দের আকার ধরে গড়ে উঠেছিল। শিল্পে ভাবের প্রকাশ স্বামীজী চাইতেন, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার ভাব নিশ্চয় নয়। ভারতীয় শিল্প তার ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্যের জন্য পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি বলেছেন দেখে এসেছি, কিন্তু ঐ প্রয়াসের অনভিপ্রেত পরিণতির রূপও নির্মমভাবে জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। শিল্পের ক্ষেত্রে ভাব কখনো অশরীরী হতে পারে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনরূপকে একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না। স্বামীজী সবকিছুকে সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন, যদি মূল প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতীয় শিল্পের প্রাণহীন আলঙ্কারিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করতে চাইছি। ১৮৯৭-এর গোড়ায় মাদ্রাজে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতায় হিন্দু ও গ্রীক শিল্পসংস্কৃতির তুলনা করার পরে তিনি বলেছিলেন, কোনো জিনিসকে বহির্মুখভাবে দেখার জন্য গ্রীসের মধ্যে 'শ্রেণী বিভাগাত্মক বিজ্ঞান সমূহের (Sciences of Generalisation) এবং অন্তর্মুখভাবে দেখার জন্য ভারতে বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান সমূহে'র (Analytical Sciences) উদ্ভব হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির বাড়াবাড়িতে কি ফল হয়, তা স্বামীজী অতঃপর বলেছেন :

'তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল—মুসলমানদের ভারতবিজয়ের দু'এক শতাব্দী আগেই সম্ভবতঃ

CENTRAL LIBRARY

তা হয়েছিল—তখন ভারতের ঐ জাতিগত প্রবণতার এমন বাড়াবাড়ি প্রকাশ হতে লাগল যে, অবনতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল। ভারতের শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুতেই তার চিহ্ন দেখতে পাই। শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের বিশালতা, কল্পনার উদারতা রইল না, রচনাশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারিয়ে গেল—তার বদলে নিদারুণ আলঙ্কারিক বর্ণবহুল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল। গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী ভাব। আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত—এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের জগাখিচুড়ির মত—মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিমাত্র। সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন। অন্যান্য ভাবধারণার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সর্বত্র একই প্রকার আলঙ্কারিকতা এবং মৌলিকতার হানি। ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্র ধর্ম—সেখানেও দেখা গেল অধঃপতনের চিহ্ন।'

এই বক্তব্যই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি 'বাংলা ভাষা' নামক প্রবন্ধে কিছুদিনের মধ্যে লিখবেন। উপযুক্ত ভাবহীন অলঙ্কৃতি, তাঁর নিষ্ঠুর উপমায়—'হীরে-মোতির সাজপরানো-ঘোড়ার উপরে বাঁদর-বসানো'র মত কাণ্ড। দেশ উৎসন্ন গেলেই সমাস, শ্লেষ ও বিশেষণের বাড়াবাড়ি হয়। স্বামীজীর কথায় ওসব মড়ার লক্ষণ। 'যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু'একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।' স্বামীজী আরও বলেছেন :

'ওটি শুধু ভাষায় নয়। সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব না আছে ভঙ্গি। থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে। সে গয়নার লতা-পাতা, চিত্র-বিচিত্রর কী ধুম। গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কী ধুম! সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের ভিতর দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব।'

সুতরাং জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ চাই-ই, যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক। স্বামীজীর একটি মৌখিক চিত্র-সমালোচনার বিবরণ দিয়েছেন প্রিয়নাথ সিংহ। ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি পাশ্চাত্যযাত্রার ঠিক আগে স্বামীজী একদিন কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁর বন্ধু 'কৃষ্ণার্জুন সংবাদ'—এই বিষয়ের একটি ছবি আঁকিয়েছেন। ছবিতে কৃষ্ণ রথের ঘোড়ার লাগাম-হাতে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবির মালিক ছবির সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলে তিনি গোড়ায় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত বন্ধু 'দোষগুণ বিচার করে' বলতে জিদ্ করলে স্বামীজীকে অগত্যা বলতে হয়েছিল, 'কিছু হয়নি।' কেন কিছু হয়নি, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রথমতঃ বলেছিলেন, কৃষ্ণের রথ আজকালকার 'প্যাগোডা রথ' ছিলনা। প্রিয়নাথ সিংহও 'প্যাগোডা রথের' ধারণায় বাস করতেন। সুতরাং তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন সবিস্ময়ে—প্যাগোডা রথ নয় কেন? উত্তরে স্বামীজীকে বলতে হল : 'ওরে, দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না। রাজপুতনায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো। গ্রীসিয়ান মাইথোলজির ছবিতে যে-রথ আঁকা আছে—দু'চাকার, পিছন দিয়ে ওঠানামা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিষগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। ট্রুথ রিপ্রেজেন্ট করা চাই, নইলে কিছুই হয় না। যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে, যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় পেন্টিং শিখতে। তাদের

CENTRAL LIBRARY

দ্বারা কি কোনো ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা পারফেক্ট ড্রামা লেখা একই কথা।'[২৮]

স্বামীজী বলা বাহুল্য ছবিকে ড্রামাটিক শিল্প করবার কথা বলেননি, তিনি নাটকের সর্বাঙ্গীণ ভাববিকাশ চেষ্টার দিকে লক্ষ্য করেই ঐকথা বলেছিলেন। প্রিয়নাথ সিংহ প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত?—তাতে স্বামীজী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস্? —সমস্ত গীতাটা **personified**। যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন—তখন তার **central idea**-টি —তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।' শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্বামীজী এইসঙ্গে ভঙ্গি ক'রে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, (শ্রীকৃষ্ণ) 'এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া-দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা দুটো প্রায় হাঁটু-গাড়া গোছ, আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ, ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় **Action** খেলছে। তাঁর সখা ভুবনবিখ্যাত বীর, দুপক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন!! শ্রীকৃষ্ণ সেই রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক-হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেম-করুণামাখা বালকের মত মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে, স্থির-গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। সমস্ত শরীরে **intense action**, আর মুখ যেন নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর প্রশান্ত।'

---

২৮ শিল্পে বাস্তবতাই যখন অভিপ্রেত, তখন সে সম্বন্ধে স্বামীজী কতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, 'কাশীধামে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের মধ্যে তার একটি পরিচয় পাই। স্বামী সদাশিবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলেন: "স্বামীজী একবার ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে আমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গশালা ও এই চিত্রশিল্পী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বামীজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতেছিলেন। সহসা যবনিকায় দৃষ্টিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে, ইহা তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। অভিনয়শেষে তিনি কার্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীও স্বয়ং তথায় থাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ স্বামীজী বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামীজীকে বহু লোক সম্মান করিত। যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে-অংশটি অপরিস্ফুট বলিয়া স্বামীজী নির্দেশ করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, বাস্তবিকই সেই স্থানটিতে দোষ আছে—স্বামীজী যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য।"

উল্লিখিত ঘটনার সন তারিখ দেওয়া না থাকলেও ধরে নিতে পারি, স্বামীজী যখন 'প্যারিস কংগ্রেস' উপলক্ষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে গিয়েছিলেন, তখনই ঐ ব্যাপারটি ঘটেছিল। স্বামীজীকে রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি মিঃ লেগেট ছাড়া আর কেউ নন। এখানে আমাদের অনুমান করতে ইচ্ছা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল স্বামীজী যখন সারা বার্নহার্ড-অভিনীত 'হংসীল' দেখতে গিয়েছিলেন তখনই। হংসীল বুদ্ধজীবনী অবলম্বনে রচিত; নিউইয়র্কে ১৮৯৬ সালে স্বামীজী এটি প্রথম দেখেন, এবং তখনই সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসেও সম্ভবতঃ একই অভিনয় দেখতে স্বামীজী গিয়েছিলেন। স্বামীজী 'পরিব্রাজকে' লিখেছেন: "বার্নহার্ডের অনুরাগ বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ ত্রেজাসিএন, ত্রেসিভিলিজে—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে ছেলে পুরুষ সাধু নাগা বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে, 'আজি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা ঘাট, পরিচয় করেছি।' বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—সে মঁ র‍্যাভ - সে আমার জীবনস্বপ্ন।"

CENTRAL LIBRARY

ছবি সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি রূপই উপরের বিবরণের মধ্যে পেলাম। পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে তিনি কল্পনার স্বাধীনতার নামে অযথা তথ্যবিচ্যুতি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ তথ্যকে ভাব যদি ছাপিয়ে উঠতে না পারে, কোনো শিল্পই যে হয় না, সে বিষয়ে দ্বিধাহীন তাঁর বক্তব্য। স্বামীজী রণদাপ্রসাদকে নিজের অপরোক্ষ দর্শনজাত 'কালী দি মাদার' কবিতার বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে জানতেন, কত কঠিন ঐ চেষ্টা। ভাববিষয়কে, বিশেষতঃ অধ্যাত্ম বিষয়কে শিল্পায়িত করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প কিভাবে অতি-প্রতীকী উদ্ভট রূপ নিয়েছে, সে বিষয়ে নিবেদিতাকে তিনি ১৯০০, ১৫ জুলাই নিউইয়র্কে যেকথা বলেছিলেন, সেগুলি খুবই মূল্যবান। ঐ সম্বন্ধে নিবেদিতার সদ্য-রিপোর্ট :

"And he (Swamiji) suggested that Hindu painting and sculpture had been rendered grotesque by the national tendency to infuse psychic into physical conceptions. He said that he himself knew of his own experience that most physical and material things had psychic symbols, which were often to the material eye grotesquely unlike their physical counterparts." (Reminiscences : P203)

স্বামীজীর কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব এইখানে—তিনি একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলেছেন যে, বহির্গত বস্তু অতিমানসলোকে যখন প্রতীক-রূপ ধারণ করে, তখন প্রায়শঃ তা তার বাইরের রূপের তুলনায় উদ্ভটভাবে পৃথক হয়। আক্ষেপের বিষয়, কিভাবে তা হয়, তা দৃষ্টান্তযোগে নিবেদিতার বিবরণে ব্যাখ্যাত পাইনি। তবে স্বামীজী জড়বস্তুর মধ্যে কিভাবে অন্তর্নিহিত ছন্দ অনুভব করতেন তার উল্লেখ তাঁর জীবনীতে ভূরি ভূরি মেলে। গঙ্গাজলে স্বামীজী হর্ হর্ ধ্বনি শুনতেন, তা তাঁর লেখাতেই পাই। ১৮৯: সালে পরিব্রাজক অবস্থায় একদিন তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেছিলেন, আজ, গঙ্গা কেদার-রাগিণী গাইছে শুনেছি। পাখির কাকলি তিনি অনুধাবন করতেন এবং তাদের ঠিক সুরটি গেয়ে দেখাতেন। ঝর্ণার গান শুনেও তার সুর বলতেন। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, দেবপ্রতিমা মিথ্যে নয়, সাধকের দৃষ্ট-বস্তু তারা। এক্ষেত্রে স্বামীজীর চরম কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি, নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে যা তিনি বলেছিলেন—যার থেকে গম্ভীর মহান প্রকাশ অল্পই সম্ভব। স্বামীজী তখন কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হিমালয়কে সামনে রেখে, সেই সময়ে একজন ইউরোপীয় মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিমার সামনে ভক্তরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে কেন? "এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটিকে ফেলিয়া দিলেন, তারপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, একই কথা নয় কি।" ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে')

প্রতীকের ক্ষুদ্র আকার কোন্ বিরাট ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, তার অসাধারণ অভিব্যক্তি এখানে পাচ্ছি।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য স্বামীজী দেহ-মন প্রাণের অখণ্ড একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক মনে করতেন, যার দ্বারা অতিমানস চেতনায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। একজন কুস্তিগীরও ভারতবর্ষে তার সাধনার ক্ষেত্রে ঐ একাগ্রতা অর্জনের প্রয়াসী। ঐ জিনিস, স্বামীজীর মতে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। "যে-মানুষ স্বার্থসিদ্ধিতে বা মন্দকাজে নিজেকে ক্ষয় করেছে, সে কখনো কোনো মহান ম্যাডোনামূর্তি আঁকতে পারবে না, বা মাধ্যাকর্ষণ-নীতি আবিষ্কার করতে পারবে না।" নিবেদিতা স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে আরও বলেছেন ; "যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য বা হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলা মানুষকে প্রধানতঃ ভোগাধিকারযোগ্য শরীর

CENTRAL LIBRARY

বলে মনে করে এবং গৌণভাবে মাত্র তাকে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি-রূপ মন ও আত্মা বিবেচনা করে—স্বামীজীর সমাদর ঐ ধরনের সাহিত্য বা ললিতকলার ধারে-কাছে কখনো এগোত না। আমাদের পাশ্চাত্ত্য আইডিয়ালিজমের সবটা না হলেও অনেকটাই তাঁর কাছে ঐ শরীরভাবের দ্বারা গভীররূপে মণ্ডিত মনে হত এবং তাকে তিনি 'ফুলে ঢাকা মৃতদেহের' সঙ্গে তুলনা করতেন।" (দি মাস্টার ; 'সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য' অধ্যায়)

একদিকে স্থূল শারীরিকতা, অন্যদিকে জীবনীশক্তিহীন আধ্যাত্মিকতার অভিনয়—স্বামীজীর শিল্পাদর্শ এই দুই অতিরেককে অগ্রাহ্য ক'রে সুস্থ সামঞ্জস্যের পথে চলেছিল। সবশেষে তাঁর উদ্দীপ্ত কথাগুলি স্মরণ করতে পারি :

"যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনি আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, বাড়ি-ঘর-দোর সব প্রাণস্পন্দনে জগমগ করবে।"

অপূর্ব কথা—প্রাণের আগুনে জ্বলছে। শিল্পাচার্য নন্দলাল স্বামীজীর ভাবাদর্শের একালীন প্রধান শিল্পী যিনি, তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি···চলতি বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়াতে যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের সহজবোধ্য ও জোরালো হয়েছিল, স্বামীজীও ঐ পথে বাংলাভাষাকে চালিত করেছিলেন।···(তিনি) শিল্পে বহুদিনের জটিল ম্যানারিজম-কে কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগতকালের শিল্প তাঁর বাণী অনুসরণ ক'রে আবার সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে। শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর আইডিয়াল শিল্পের backbone-এর মত।" ('শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল')।

স্বামীজীর আদর্শ অন্ততঃ নন্দলালের শিল্পের 'মেরুদণ্ড' হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং একথাও সত্য, নন্দলাল ভিন্ন স্বামীজীর সরল মহান অথচ বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ গ্রহণ করবার মত সামর্থ্য আর কোনো আধুনিক চিত্র-শিল্পীর নেই। প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন কিভাবে গীতার কৃষ্ণকে আঁকতে হবে—সেই আদর্শে নন্দলাল অনেকগুলি 'পার্থসারথি' ছবি এঁকেছেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছেন। আলমোড়ায় একদিন উষাকালে দাঁড়িয়ে স্বামীজী হিমালয়ের চিরতুষারের উপরে অরুণোদয় দেখছিলেন ; তারপর অরুণরঞ্জিত পর্বতশিখরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বলেছিলেন—"ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি—ঐ হল শিব আর তাঁর উপরে যে-আলোকসম্পাত হয়েছে, তাই হল জগতের জননী।"

অরূপের সত্য কিভাবে রূপের সত্য হয়ে ওঠে, স্বামীজী মহান ভাষায় তারই কথা বলেছিলেন এবং মহান শিল্পীরা চিরদিন এই তত্ত্বেরই রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল তেমন একজন সার্থক রূপকার।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বিশ্বসাহিত্যে বাণীই প্রথম, রচনা দ্বিতীয়। বাণী ও রচনা—এ দুয়ের মধ্যে মিল ও অমিল দুইই আছে। মুখের কথা মাত্রেই বাণী নয়। যখন উপলব্ধির তাৎপর্য বা সত্যের পরম প্রকাশ আমাদের প্রতিদিনের ভাষাকেই এক নূতন ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করে, তখনই তা বাণী। সে বাণী মুখের কথা বা লেখার ভাষা—দুভাবেই দেখা দিতে পারে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি—সবই একদিন মুখে মুখে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বেদ উপনিষদেই আমাদের সভ্যতার প্রথম বাণীরূপ; রামায়ণ-মহাভারতে সমগ্র জীবনকাহিনীর ভিত্তিতে জাতির অন্তরতম বাণীর রূপায়ণ; প্রথমে এরা সব মুখে মুখে সৃষ্টি হলেও আজ তারা রচনাধর্মী। অবশেষে লিখিতরূপের কারিগরীতে মহাকাব্য, গাথাকাব্য, খণ্ডকাব্যে, পদ্যে এবং গদ্যে সাহিত্যের বহুধাবিস্তৃতি।

কথা আমরা সকলেই বলি, কিন্তু সে যখন আপন বৈশিষ্ট্যে, দীপ্তিতে ও গভীরতায় আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, তখন সে কথার সংগ্রহ রাখতে ইচ্ছে হয়। নিজেদের গোষ্ঠীর বা কালের অনুভূত সত্য ও আনন্দকে উত্তরকালে ছড়িয়ে দেওয়া এমন সংগ্রহের উদ্দেশ্য। সক্রেটিস, ডঃ জনসন, গ্যেটে, শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁদের কথোপকথন তাই যোগাজনের দ্বারা গ্রথিত হয়ে আজ বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার। সব সময় সব মহামানবের এমন সংগ্রহকারী অনুরাগী দেখা যায় না। ফলে বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের কথন সম্পদ পেয়েছি অতি সামান্য। কিন্তু ইতিহাসের অমর ব্যক্তিত্ব যে কয়জনার উক্তি সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে, তাও কম বিস্ময়কর নয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কথা থেকেই লেখা। অবশ্য এমন লেখকও সম্ভব যাঁর ব্যক্তিত্ব লেখনীমুখে যতটা প্রকাশিত, প্রতিদিনের আলাপচারীতে ততটা নয়। আবার এমন প্রতিভাও রয়েছেন যাঁদের কথনৈপুণ্যেই প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, লেখনী অবান্তর। প্রাচীন ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ এবং একালীন ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রমাণ। অধ্যাত্মজগতের এ দুই শ্রেষ্ঠ দিশারীই তাঁদের আদর্শ ও অনুভবের কথা বলেছেন সর্বজনের সহজবোধ্য ভাষায়। অথচ বোধ্য বলেই বক্তব্য তাঁদের সহজ নয়। সেই অসাধারণ বক্তব্যকে প্রকাশে সম্ভব করে তোলার ভাষাশিল্প তাঁরা মুখে মুখেই রচনা করেছেন। গৌতমবুদ্ধের ক্ষেত্রে তা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজনে। এই মুদ্রণের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর ছন্দায়িত রূপান্তর ততটা প্রয়োজন ছিল না। তাঁর আপন ভঙ্গীটির যথাসম্ভব সংরক্ষণেই অন্তর্নিহিত কাব্য গুণের স্বতঃপ্রকাশ। তবু অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুথি' আমাদের ঐতিহ্যগত পয়ারে রচিত জীবনচরিতের একটি সুন্দর উদাহরণ।

জাতি হিসাবে ভারতীয়রা নাকি ইতিহাসবিমুখ আর বাঙালী আত্মবিস্মৃত। এসব অতি পরিচিত মন্তব্যের গুরুত্ব ততটা না দিলেও জীবনীরচনায় আমাদের অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহ যে আমাদের ইতিহাস সচেতনতার অভাব কিছুটা প্রমাণ করে, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনীসাহিত্য ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। সেইকারণেই আত্মজীবনীর মূল্যও ইতিহাসে খুব বেশি রকম। মানুষ নিজের কথা যত সার্থকভাবে বলতে পারে, এমন অন্যের কথা নয়। অবশ্য সব মানুষই তা পারে না, এবং সব 'আত্মজীবন'ই জীবনী আকারে প্রকাশের যোগ্য নয়। তবু মনে হয়, ঘটনা ও ভাবনায় মিলে যে মানুষটি পূর্ণতা পেয়েছে, তার কথা সাধারণ জীবনীর একমাত্রিক অনুধাবনে

CENTRAL LIBRARY

কখনোই সবটা বলা হয় না। আমাদের দেশে তো জীবনী লেখা মানেই মহাপুরুষ তৈরী করার প্রচেষ্টা। ফলে, এদেশে আত্মজীবনীও সামগ্রিক সত্য নিয়ে দেখা দিতে পারে না। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও যে কটি আত্মচরিত বাংলা-সাহিত্যে দেখা যায়, তারা সাহিত্য ও ইতিহাস উভয় দিক থেকেই মূল্যবান। হয়তো সম্পূর্ণ নিরাভরণ ব্যক্তি সত্তাকে এ সব আত্মচরিতে মেলে না, কিন্তু যতটা মেলে তার পরিমাণও কম নয়।

আত্মচরিতের অপরিহার্য আর দুটি উপাদান—চিঠিপত্র এবং ডায়েরী। মধুসূদন, বিবেকানন্দ ব. রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানতাম, যদি তাঁদের পত্রাবলী সংরক্ষিত না হতো? ডায়েরী বা দিনলিপি অবশ্য এদেশে খুব বেশী প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু পূর্বোক্ত মনীষীদের পত্রগুলিই অনেক সময় তাঁদের দিনলিপির কাজ করেছে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কালানুক্রমিক প্রকাশ কখনো সম্ভব হলে হয়তো দেখা যাবে, তাঁর ডায়েরী না লেখার সঙ্কল্প ('পঞ্চভূত' স্মরণীয়) সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নি।

চিঠিপত্র ও ডায়েরীর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আলাপচারী বা কথোপকথন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তার সংলাপ যেমন চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, অসাধারণদের ক্ষেত্রেও তাঁদের সংলাপ তেমনি মানবমানসের দিগ্দর্শন। পৃথিবীর অনেক মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই আমরা তাঁদের কর্মে, সংগ্রামে, সাধনায় পাই, প্রতিদিনের আলাপচারীতে পাই না। তার ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্য আমাদের অপরিচিতই থেকে যায়। বাস্তবিক, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব আরো কতো উজ্জ্বল হতে পারতো যদি তাঁদের প্রতিদিনের (অন্ততঃ অল্প কয়েক বছরের) আলাপচারী কোনো উৎসাহী অনুরাগীরা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন! জীবনীকারেরা অতি সামান্যই তা পেরেছেন, কিন্তু যতটুকু পেরেছেন তার দ্বারা ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'ঘরোয়া'র কথা-সংগ্রহ বাংলা সাহিত্যে রাণী চন্দের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

মানবসাধনার ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব দেখা দেন, যাঁদের ধ্যানধারণা, উদ্যম ও কর্মকল উপদেশ ও আলোচনা সমগ্র মানবজাতির পথ-নির্দেশ। দেশ-বিদেশের এমন সব মহামানবের কথা কতো ভাষান্তরে আমরা পাঠ করে থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই সব বাণী আমাদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে। বিশেষ দেশে কালে বা ভাষায় তাঁদের আবির্ভাব; তবু তাঁদের বাণী সর্বকালের—তাই ভাষান্তরেও তারা মূল প্রাণসত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে মানবজীবনপ্রবাহকে গতিময় করে রাখে। এমন একটি মহাগ্রন্থ বাইবেল।

ওল্ড টেস্টামেন্টের (বাইবেলের প্রাচীন অংশের) কথা বলছি না, নিউ টেস্টামেন্টে (বাইবেলের আধুনিক বা যীশু-জীবন-সংক্রান্ত অংশে) বিধৃত যীশুর জীবন ও বাণীর কথাই মনে জাগছে। বাইবেল যে পাশ্চাত্যজগতে সবচেয়ে প্রচারিত ও বিক্রীত, তার মূল কারণ যীশুর বাণীর অপূর্ব সরলতা, প্রত্যক্ষ প্রাণবেগ ও অনুভূতিসঞ্জাত বাণী-সৌন্দর্য। অধ্যাত্ম-অনুভব স্বপ্রকাশ সূর্যের মতো বাইবেলের বাণীর দ্বারা আপনিই সঞ্চারিত হয়, কোনো তর্ক বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এই অনুভূতির অপরিমেয় ঐশ্বর্যই বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের ভাষাকে এতো সংহত সারল্য এনে দিয়েছে। অনুবাদক বা অনুবাদকমণ্ডলীর কৃতিত্বের কথা মনে রেখেই একথা বলা চলে। অনুভব ও প্রজ্ঞা—এরাই প্রকাশের তারতম্যে ভাষার প্রধান নিয়ামকশক্তি। একদা ইংরেজী বাইবেল তার সাহিত্য-সৌন্দর্যের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্য যত লাঞ্ছনাই এনে থাকুক, 'বাইবেল' তার শত অপরাধের নিশ্চিত মার্জনা।

CENTRAL LIBRARY

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মননগত জাগরণে এই বাইবেলের ভূমিকা যে কতো ব্যাপক, সেকথা আমাদের সবসময় মনে থাকে না। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—মনীষীচতুষ্টয়ের জীবনবেদে যীশুর বাণীর ত্যাগ, ক্ষমা, করুণা ও শান্তি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ বাইবেল ও বাইবেলের কেন্দ্রপুরুষ যীশুখ্রীষ্টকে নতুন করে আবিষ্কার করে জাতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্লীন করে নিয়েছে। সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনে তো বটেই, উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রায় সবকটিতেই খ্রীষ্টজীবন ও ধর্মাদর্শের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব।

বাইবেলে যীশুর উপদেশ যে ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ, বাংলায় মিশনরীরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনুবাদের মাধ্যমে সেই ভঙ্গিটি সঞ্চারিত করতে, কিন্তু এর ফল সব সময় ভালো হয়নি। মিশনরীদের বাংলার কৃত্রিমতা আজও হাস্যকর উদাহরণ সৃষ্টি করে থাকে। এদিক থেকে কেশবচন্দ্রের ভাষণ, উপদেশাবলী এবং তাঁর 'জীবনবেদ' নামে আত্মজীবন-মূলক গ্রন্থখানি স্মরণীয়। পরিমিত বাক্যবন্ধে ভাষাগত স্বচ্ছতার, সহজাত কবিত্বগুণে ও উপলব্ধিজাত প্রেরণাশক্তিতে বাংলা রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সে বৈশিষ্ট্যের মূলে বাইবেলের প্রভাব স্মরণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় দেশবিদেশের মনীষীদের সান্নিধ্যে কেশবচন্দ্রের পক্ষে যে পরিশীলিত মনন স্বাভাবিক, তা সবক্ষেত্রে আশা করা যায় না। তবু দেখি আমাদের সাহিত্যে, বিশেষতঃ গীতিময় কাব্যসাহিত্যে গভীর অনুভূতির সহজ প্রকাশের একটি ধারা বৈষ্ণবপদাবলী, সহজিয়া, দেহতত্ত্ব, বাউল বা মুর্শিদাগানে বহুযুগ থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। শাক্তপদ রচয়িতাদের মধ্যে রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের গান মূলতঃ সাধারণ মানুষের চলিত কথার সৌন্দর্য থেকেই সম্পদ আহরণ করেছে।

গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আমাদের গণসংস্কৃতির ধারায় যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, তর্জা প্রভৃতির মাধ্যমে বহুযুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রশক্তি ধর্মচেতনার একটি সক্রিয় সচেতন অস্তিত্ব এদেশে চিরকাল বজায় রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনন ও সাধনার পটভূমিতে এই লোক-সংস্কৃতির ধর্মচেতনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অবশ্য ভারতীয় বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের চিরায়ত ধারার সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগ ছিল। কিন্তু সে সব যোগাযোগই নানা মত ও পথের সাধকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফল। বইপড়া বিদ্যার জায়গায় তাঁর জীবনে জ্ঞানচর্চা এসেছে শ্রুতির পথ ধরে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি 'শুনেছেন' অনেক, আর এক হিসাবে এই 'শ্রুতি'পথে জ্ঞানই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রশস্ত পদ্ধতি।

অথচ একেবারে যে নিরক্ষর তিনি ছিলেন তা নয়। পাঠশালে শুভঙ্করী ধাঁধা লাগতো বটে, কিন্তু হাতের লেখাটি অতি নিপুণ। অর্থাৎ পড়াশুনোর যে কার্যকরী দিক—এ যুগের 'চাকুরীজীবী'-শিক্ষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'চালকলাবাঁধা বিদ্যা'—এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও, তাঁর নিজস্ব অন্বেষণের জগতে তিনি তত্ত্বজ্ঞ মনীষী। তাঁর কথাসংগ্রহ যে কেউ একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করবেন, তিনিই বুঝবেন ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন পন্থায় কী পরিমাণ অধিকার থাকলে তবে এ জাতীয় আলোচনার মর্মদেশে পৌঁছান যায়।

বহু যুগের সাধনায় এ জাতির সাধারণতম মানুষও অধ্যাত্মবিদ্যার মূল বক্তব্যের কিছু কিছু ধারণা রাখে—সেকথা এ দেশের দীন-দরিদ্র চাষী, মজুর, ভিখারী, বাউল প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেই বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চতম আদর্শের অধিকার তার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বর্তেছে। সংস্কৃতির এই আদান প্রদান সভ্যতার মর্মবিশ্লেষণে বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারায় এ দুই সংস্কৃতিরই গভীর মিলন ঘটেছিল। তারই ফলে নিতান্ত সাধারণ মানুষ থেকে জ্ঞানী গুণী অসাধারণ অবধি সব শ্রেণীর লোকের

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গেই তাঁর সহজ ও সমান সম্বন্ধ। মানুষকে তিনি অন্তরের সত্যে বড়ো করে দেখতেন, তার বিত্তে বা পদমর্যাদায় নয়। যে সব তরুণ সত্যান্বেষীরা তাঁর কাছে সমবেত হতো, তাদের অনেকেরই সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র অবস্থা। এই সব তরুণদের প্রতি তাঁর আহ্বানও সর্বস্বত্যাগের। পরম সত্যের জন্য এই ত্যাগের অগ্নিমন্ত্র তরুণ বাঙালীদের চিত্তে সঞ্চার করে তিনি ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শকে নবযুগের জীবনসত্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সে মহাসত্যের জীবন্ত প্রতীক তিনি নিজে, আর তাঁর বাণী। তাঁর কথায় তাঁর আপন জীবনটিও অনেক পরিমাণে প্রকাশিত। বস্তুতঃ 'কথামৃত' সঙ্কলনের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁরই কথায় তাঁর 'চরিতামৃত' প্রকাশ করা। সঙ্কলয়িতার অকালপ্রয়াণে 'কথামৃত' অসমাপ্ত থাকায় তা আর সম্ভব হয়নি।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচয়গত ঘনিষ্ঠতার সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। প্রথম প্রথম পত্র পত্রিকায় তাঁর বাণীপ্রকাশে কেশবচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। 'পরমহংসের উক্তি' নামে একটি বাণীসঙ্কলন কেশবচন্দ্রই প্রকাশ করেছিলেন ১৮৭৮ সালে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সুরেশচন্দ্র দত্ত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি, '১ম ভাগ' প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮৪ সালে। এছাড়া আর একজন অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করেন 'তত্ত্বসার' (১৮৮৫) এবং 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' (১ম খণ্ড—১৮৮৬)। এ কয়টি গ্রন্থ ছাড়া আর সবই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পরে প্রকাশিত। ঐতিহাসিক এই প্রকাশনগুলির উল্লেখের কারণ একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অতীতের মহাপুরুষদের সংলাপ ও রচনাবলী থেকে বাণীসঙ্কলন নানা দেশে নানাভাবে হয়েছে। কিন্তু জীবিতকালেই কোনো মহাপুরুষের বাণীসঙ্কলন প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণ একান্ত বিরল। বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে এবং আজ একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, নিজেদের অজান্তে কেশবচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র দত্ত এবং সেইসঙ্গে সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির প্রতিবেদকেরা এক নূতন ভাষা ও ভাবের জগতের সূচনা করছিলেন বাংলাসাহিত্যে আজ যে সাহিত্যকে আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য' নামে অভিহিত করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যা নিজস্ব সৃষ্টি, তাঁর কথার শিল্পগুণ, তাকেই আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য' বলতে চাই, যদিচ বিস্তৃত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক যাবতীয় সাহিত্যকীর্তিই এ অভিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতেই যদি আমরা সীমাবদ্ধ রাখি আমাদের আলোচনা, তাহলেই আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে বক্তব্য স্থাপনের আগে সাহিত্যে কথোপকথন বা শুধু কথনের নিজস্ব স্থান-সম্বন্ধে বিশ্বসাহিত্যের নজির স্মরণীয়। সক্রেটিসের বাণী বা কথন-সংগ্রহ করেছিলেন প্লেটো। ডঃ জনসনের কথাসংগ্রহ করে অমর বসওয়েল। গ্যেটের সঙ্গে এ্যাকারমেনের কথোপকথন এক মনীষী কবির সঙ্গলাভের সুযোগ এনে দেয়। বাংলাসাহিত্যে এ জাতীয় রচনা শ্রীম—বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র পাঁচটি খণ্ড এখন অধ্যাত্মরসের সাহিত্যরূপে বাংলাসাহিত্যে চিরায়ত সম্মানের অধিকারী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন—এঁদের আলাপচারী লিখে রাখার কথা সেকালের কোন অনুরাগীর মনে জাগে নি। হয়তো অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে। তবু আমাদের মনে হয়, সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর বাইবেলের প্রতি অনুরাগও এই বাণী-সংগ্রহের মূলে।

শ্রীম—বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। আর কেশবচন্দ্রের জীবনগ্রন্থে বাইবেলের প্রভাবই সর্বাতিশায়ী। প্রথম যুগে যখন ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিল '*Gospel of Sri Ramkrishna*' (১৮৯৭)। এ নামকরণেও বাইবেলী রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

CENTRAL LIBRARY

তবে বাইবেলের মতো 'Apostle' বা শিষ্যরা এখানে একাধিক ন'ন, একজন,—অনন্য একজন, যাঁর লেখনী স্মৃতিধর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত সব ধরণের টুকিটাকি কথা থেকে অদ্বৈত বেদান্ত প্রসঙ্গের চরম শিখর অবধি বিস্তৃত বাণীসম্ভার ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর কেউ তাঁর উপদেশ-সংগ্রহ করেন নি।[১] মহেন্দ্রনাথ যেমন বিস্তৃত-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী সংগ্রহ করেছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেভাবে না করলেও, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর যথাযথ রূপায়ণে তাঁর সযত্ন সতর্কতা লক্ষণীয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ লিখিত অমর জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে' (পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেশ কিছু মূল্যবান সংলাপ সংগৃহীত। এছাড়া তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর নানাজনের স্মৃতিচারণেই তাঁর সুভাষিতাবলীর কিছু কিছু মূল্যবান অংশ পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্বাচিত তাঁর ভাবধারার উত্তরাধিকারী চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিচারণের স্থান এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে।

বাইবেলের অনুরাগী মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণবাণী সংগ্রহের কালে যীশুখৃষ্টের-পার্ষদমণ্ডলীর স্মৃতিচারণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে নিজের ভূমিকা সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন রেখে তাঁর গুরুর জীবন ও বাণীকেই একান্তভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বাইবেলে যেমন ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণের অপেক্ষা যীশুর বাণীই প্রাধান্য লাভ করেছে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বকে বিধৃত করার প্রয়াস 'কথামৃতে'ও লক্ষণীয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক আলোচনার উচ্চগ্রামের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিহাসনিপুণ তীক্ষ্ণসন্ধানী মানবিক দৃষ্টি ও আচরণের বর্ণনাও কথামৃতের বৈশিষ্ট্য। মহাপুরুষের ব্যক্তিজীবনের এই নাট্যগুণান্বিত বাস্তব দিকটি আমরা বাইবেলে পাই না। যীশুর জীবন ও বাণীর সারাংশই বাইবেলের গস্পেল বা বাণীসংগ্রহচতুষ্টয়ের বিষয়বস্তু। মহেন্দ্রনাথ তাঁর দিনলিপির মাধ্যমে নানান দিনের চলমান জীবনপ্রবাহের চিত্রটি পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বিস্তৃততর পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাইবেলে যীশুর বাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নানা অনুবাদের মাধ্যমে, তাঁর মুখের কথার ভাষাটি (আরেমিক) জানলে তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ও বাক্যবন্ধের নিহিতার্থ আরো স্পষ্ট হতে পারতো। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহে 'কথামৃত'কার আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীভঙ্গীটি সার্থকভাবে তুলে ধরে অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অবশ্য আধুনিক টেপরেকর্ড-প্রথা এ বিষয়ে আরো সহায়ক হতে পারতো, কিন্তু মহেন্দ্রনাথ যা রেখে গেছেন তা টেপ-রেকর্ডের কৃতিত্বের সমতুল্য।

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর কিছু কিছু সঙ্কলন আগে থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থটিতে এ-জাতীয় বেশ কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম যুগের শ্রীরামকৃষ্ণবাণীসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে 'কথামৃত' অবধি শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সংগ্রহপদ্ধতি অবধি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম দিকে প্রচলিত সাধুভাষার পদ্ধতিতেই তাঁর বাণী সংগৃহীত। সুরেশ দত্ত ও রামচন্দ্র দত্তের সংগ্রহেও সাধুভাষায় রূপান্তর লক্ষণীয়।

১ আর এক গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে কাজ তাঁর নয় বলে রামকৃষ্ণদেবের নিষেধাজ্ঞায় আর অগ্রসর হন নি। 'কথামৃত' সঙ্কলয়িতা মহেন্দ্রনাথের সংগ্রহের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানতেন, কিন্তু তাঁকে তিনি বারণ করেন নি।

CENTRAL LIBRARY

মহেন্দ্রনাথই শ্রীরামকৃষ্ণের চলিত ভাষার উক্তিগুলিকে যথাযথ রেখে সে সব কথার নিজস্ব সৌন্দর্য, সজীবতা ও গহন আধ্যাত্মিকতাকে আপন মহিমায় প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, মহেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিবিধৃত বাণীসংগ্রহ কতটা গ্রহণযোগ্য? এ বিষয়ে বিশ্বসাহিত্যে প্লেটো, এ্যাকারম্যান, বসওয়েল প্রভৃতির সাক্ষ্য যদি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপত্তিরও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর দিনলিপিতে লিখে রাখতেন। পরবর্তীকালে নিজের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীবৃন্দের প্রয়োজনে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়গুলি অবলম্বনে স্মৃতি থেকে বিভিন্ন দিনের বাণীর বিস্তৃত আলোচনা করেন।

'কথামৃতে' উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই স্মৃতিসংগ্রহ প্রকাশকালে জীবিত। স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই ইংরেজীতে 'কথামৃতে'র দুটি ছোট আকারের খণ্ড এবং বাংলা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রথম ভাগ' প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদা দেবী সহ অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশই 'কথামৃতে'র পাঁচটি খণ্ড প্রকাশকালের মধ্যে জীবিত। অবশ্য শোনা যায়, মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং শশধর তর্কচূড়ামণি—তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের প্রতিবেদনের সবটুকু স্বীকার করেন নি। কিন্তু এ দু'জনের কথা বাদ দিলে এত অজস্র ব্যক্তির উপস্থিতি 'কথামৃতে' রয়েছে, যাঁদের অপ্রতিবাদও সমান গুরুত্বপূর্ণ। 'কথামৃত' ছাড়াই সেকালের পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর যে কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত, তাও 'কথামৃতে'র অনুকূল সাক্ষ্য। যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে অপূর্ব প্রকাশসৌন্দর্য ও আন্তরিক ঈশ্বরতন্ময়তা শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বৈশিষ্ট্য, তা ভক্তগোষ্ঠীর বাণীসংগ্রহের বাইরেও যথেষ্টই প্রমাণিত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও স্বামী সারদানন্দের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা ও বাণীর সঙ্কলনগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনপ্রসঙ্গে এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের অন্যতম। অবশ্য বিস্তৃততর গবেষণার দ্বারা এ সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভক্তির আতিশয্যে ব্যক্তিগত স্মৃতির অনুরঞ্জন এসে পড়তে পারে কি না? এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়, কোনো ঘটনাবিশেষের বর্ণনায় এ প্রশ্ন দেখা দিলেও, উক্তি-প্রসঙ্গে এ কথা সম্পূর্ণ অবান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সঙ্গে, সমপর্যায়ের কোনো ব্যক্তিই তাঁর মুখে বানানো কথা বসাতে পারে। অন্যথায় প্রসঙ্গের সামগ্রিকতা বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা সংযোজনার ক্ষমতা সেকালে বা একালের কোনো তথাকথিত পণ্ডিত বা ভক্তের নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বা তাঁর বাণীকে বড়ো করে দেখানোর জন্য কোনো প্রচারকের প্রয়োজন ছিল না, তাঁর জীবনই তাঁকে প্রচার করেছে এবং সেই প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ যাঁরা হতে পেরেছেন, তাঁরাই এর দ্বারা কৃতার্থ হয়েছেন। একথাও স্মরণীয় যে, ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার বিভিন্ন শাখায় শ্রীরামকৃষ্ণের মতো পারঙ্গমতা তাঁর কোনো ভক্তশিষ্যের ছিলো না—বিবেকানন্দ বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-সংগ্রহগুলি যাঁরা অনুধাবন করে দেখবেন তাঁরা সে বাণীর অন্তর্নিহিত ঐক্য, শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য এবং প্রকাশকুশলতার বিচারে এ উক্তিরাশিকে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক বলেই ধারণা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তুলনীয় আর একজন মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর কথা স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মনে জাগে—তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের হৃদয়দেবতা শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যদেবের কথোপকথনের ছন্দায়িত রূপ আমরা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট সাহিত্যসম্ভারই বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ দান। প্রায় পাঁচশোবছর পরে আজ সেই দানের পরিমাণ ও গভীরতা বিচার চলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে সে জাতীয় বিচারের সময় এখনও দেখা দেয় নি। তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবৎকালেই

CENTRAL LIBRARY

তাঁর বাণীসংগ্রহে কেশবচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেক লেখক ও মনীষীর ব্যাকুলতায় প্রমাণিত হয় যে শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, প্রকাশকলার দিক থেকেও তাঁর বাণী ও সংলাপের বিশেষ মূল্য রয়েছে।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহের সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।"[২] এই 'নূতন প্রতিভার ছাপ' আমরা বিবেকানন্দের রচনায়ই দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিবেকানন্দ এ কথাগুলি বলেছিলেন তাঁর সাধুগদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে। অপরপক্ষে তাঁর চলতি গদ্যের প্রকাশভঙ্গীরও আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ। এ দুই রীতির ক্ষেত্রেই যে নূতনত্বের চিন্তা স্বামীজীর মনে জেগেছিল তার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনার মৌলিকতা।

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সেই নিজস্ব ভঙ্গিমাটি আমাদের অন্বিষ্ট। বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর বাণীর সেই সাহিত্যগুণাবলী লক্ষ্য করতে পারি। বাংলা গদ্যে সাধু ও চলতিভাষার পার্থক্য নিয়ে যে দ্বন্দ্ব—তা সাধারণতঃ অন্য সাহিত্যে দেখা যায় না। এর মূল কারণ, সাধু গদ্যের পদ্ধতিটি সংস্কৃতনির্ভর। প্রথম সাহিত্যরূপ পাবার সময় থেকেই সাধু গদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা লালিত। অপরপক্ষে বাংলার লোকসাহিত্যে বহুকাল থেকে সাধারণের মুখের ভাষাই সাহিত্যিক বিচারে বেশ উন্নত মানের সৃষ্টি করে এসেছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যখন বাংলাসাহিত্য বিশেষভাবে গদ্যনির্ভর হয়ে উঠলো, তখন বিভিন্ন লেখকের মনে সাহিত্যের বাহন সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিলো। প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনেকটা এই মনোভাবেরই ফল। হুতোম প্যাঁচার বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বিশেষ বুলির (patois) মধ্যে আপন সার্থকতা আবিষ্কার করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তানদের রচনায় চলতি গদ্যের অনুপ্রেরণা দেখা দিতে থাকে।

সাহিত্যের এই লিখিতরূপের পাশাপাশি অধ্যাত্ম-অনুভবের অমেয় ভাণ্ডার নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই তাঁর বাণী বিতরণ করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, কোনো সাহিত্যিক আন্দোলন বা যশাকাঙ্ক্ষা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে মানবকল্যাণের প্রয়োজনে তিনি তাঁর অন্তরতম কথাগুলি উচ্চারণ করে গেছেন।

কেশবচন্দ্রের 'সুলভসমাচারে' প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহের একটি উদাহরণ "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্মকথা ও কীর্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে। বিগত শনিবার বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি গূঢ় গূঢ় ধর্মকথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই একটি কথা বলিলেন যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকটে রহিয়াছেন তথাচ জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সে কথা এইরূপে বুঝাইলেন যে রামচন্দ্র পরমাত্মাসদৃশ, সীতাদেবী মায়া ও লক্ষ্মণ জীবাত্মার প্রতিরূপ। জীবাত্মার প্রতিরূপ লক্ষ্মণ পরমাত্মার ঠিক পশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্তু কেবল মায়ারূপী সীতার ব্যবধানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না, যখনই সীতা

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩

CENTRAL LIBRARY

একটু পাশ দেন, তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি সুন্দরভাবে বুঝাইলেন; তিনি বলিলেন যে, পরমাত্মা চুম্বকসদৃশ, জীবাত্মা লৌহশলাকার ন্যায়। চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার গুণেই লৌহকে আকর্ষণ করে। কিন্তু লৌহে কাদা মাখান থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের কোন বল খাটে না। তদ্রূপ আত্মা কর্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহা পরমাত্মার নিকট যাইতে সফল হয় না। কিন্তু অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারা সেই পাপরূপ কর্দম ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপনা আপনিই পরমাত্মারূপ চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়।'[৩]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মূলতঃ চলতিভাষায় কথিত এই উপমাগুলি সাধুভাষায়ও এদের ভাবসৌন্দর্য বজায় রেখেছে। মহাপুরুষদের বাণীর ভাষা-নিরপেক্ষ এক আত্মিক সৌরভ থাকে—বুদ্ধ বা যীশুর বাণীর অনুবাদের দিকে লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। কিন্তু এই উপমাগুলিই 'কথামৃতে' যখন চলতিভাষায় পাই, তখন তাদের যথার্থ সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায়।

যেমন ধরা যাক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে মায়াপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা—'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।...আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে ব'লে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই।[৪]

চলতিভাষায় প্রকাশিত এ উপমা কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষার প্রায় কাছাকাছি। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শ্রুতি ও সাধনার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন, এ জাতীয় উপমা তার অন্যতম উদাহরণ। আবার উপমার সরলতম প্রয়োগে দুরূহ তত্ত্বকথাও কেমন স্বচ্ছ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, তার একটি উদাহরণ—দক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তদের একজন প্রশ্ন করেছিলেন—শ্যামা এ রূপটি হল কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ—'সে দূর ব'লে। কাছে গেলে কোন রঙই নাই। দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নাম রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা।'[৫]

বেদান্তের মায়াবাদ সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সহজভঙ্গিমা বাংলাভাষাকে কতটা নিগূঢ় সত্যের অধিকারী করেছে, তার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে একদিন নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হতে হতে বেদান্তবিচারের কথা উঠলো। শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিমাচরণ—বেদান্তবাদী। বিভিন্ন শ্রোতার প্রয়োজন অনুযায়ী ('যার পেটে যা সয়') বক্তব্য উপস্থাপনে লোকশিক্ষক আচার্যরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্টতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাধনার দ্বারা তিনি যেমন বিভিন্নধর্মের প্রাণসত্যকে অনুভব করেছেন, তেমনি মানবমনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী তাদের মহত্তর সত্যের পথে পরিচালিত করার শক্তিও লাভ করেছিলেন। কথামৃতে' বা তাঁর অন্যান্য বাণীসংগ্রহে বড়োরকম বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর আলাপচারীর বিবরণ বিধৃত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে ব্যক্তির যা ভাব, তা রক্ষা করেই তিনি বৃহত্তর উপলব্ধির পথে তাকে

৩ 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস': ২য় সংস্করণ পৃঃ ২৫
সুলভ সমাচার: ৩রা পৌষ, ১২৮৮, শনিবার: ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৮১

৪ কথামৃত: ১ম ভাগ: পৃঃ ৭০। ১৩৭৭ সংস্করণ, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি। স্থান—দক্ষিণেশ্বর।
সূঁচ ও চুম্বকপাথরের উপমাপ্রসঙ্গে চতুর্থ ভাগ, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি দ্রষ্টব্য।

৫ তদেব পৃঃ ৯৩: ২৬শে জুলাই, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি

CENTRAL LIBRARY

পরিচালিত করেছেন। মহিমাচরণকে উপলক্ষ্য করে বেদান্তের মূল বক্তব্য আমাদের প্রতিদিনের চলতিভাষায় এইভাবে প্রকাশিত—

'বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়,—স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ।···স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শুন। তোমার ভাবের—

'এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে – পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেকদিন পরে হয়েছে ; নাম হারু। ছেলেটার উপর বাপ মা দু'জনেরই ভালবাসা ; কেন না সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সবলোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করলে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো, কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে? তারপর আবার চাষবাস করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরো কাঁদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্ঠুর – ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না? চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি -আর আট ছেলের বাপ হয়েছি—খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহাভাবনায় পড়েছি—আমার সেই আটছেলের জন্য শোক করবো, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো?

'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখেছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা ; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।'[৬]

গল্প বা উদাহরণের দ্বারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বক্তব্য উপস্থাপনার রীতিতে বাইবেলে যীশুখৃষ্টের উপদেশাবলীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদ্ধতিগত মিল নিশ্চয় মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাইবেলে যীশুর বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, তাই তাঁর গল্পগুলিও সংখ্যায় খুবই কম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন অনেক বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত বলে এ জাতীয় অজস্র গল্পে 'কথামৃত' পরিপূর্ণ। এ গল্পগুলির উৎস বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, লোকসাহিত্য, জনশ্রুতি—এমনি নানা উপাদান। মনে হয় না যে, কোনোটিই রামকৃষ্ণদেব নিজে তৈরী করেছেন। কিন্তু কথননৈপুণ্যে ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে এই গল্পগুলি কাহিনী হিসাবেও অসামান্য সার্থকতার অধিকারী। রূপকধর্মী এই কাহিনীগুলিতে আধ্যাত্মিক বক্তব্যই প্রতিপাদ্য—কিন্তু মানবসংসারের অনেকদিক এই ছোট্ট কাহিনীগুলিতে উদ্ভাসিত যে দৃষ্টির চমক ও গভীরতা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

বেদান্তের সত্য প্রতিপাদনে চাষার গল্পটি অবশ্য সম্পূর্ণ অধ্যাত্মজগতেরই কথা। কিন্তু স্বপ্ন ও জাগরণে সমদৃষ্টির উদাহরণে এ গল্পে বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে প্রকাশিত তেমন উদাহরণ অন্যত্র দুর্লভ।

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যা আমরা মনে করতে পারি। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন, নানা কথাপ্রসঙ্গে বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় এলেন—"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কিনা, জীব জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।

"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করেছিলেন। বেলটি কত

৬ তদেব : পৃঃ ১৭৯ : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি

CENTRAL LIBRARY

ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে,—যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"[৭]

দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক থেকে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ এ দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা ভারতীয় চিন্তাধারার প্রধান দুটি সূত্র। সাধারণভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যার পার্থক্য যে গোষ্ঠীবদ্ধতার সৃষ্টি করে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যে তা হতে পারে নি, তার কারণ যুক্তির বিভিন্নতার মধ্যেও যে এক গুরুগত সংযোগ থাকে, এ দুই গুরু-শিষ্য তাঁদের জীবনে, সাধনায় ও দার্শনিকতায় তা প্রমাণ করেছেন। মননগত সিদ্ধান্তের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচয়বিশ্লেষণের যোগ্য অধিকারী দেখা দিলে প্রমাণিত হবে যে বাংলাসাহিত্যের দার্শনিক শাখাটি তাঁর দ্বারা এক অভাবনীয় সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে। একথাও স্মরণীয় যে, ভারতীয় দর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সমন্বিত একটি যথার্থ উচ্চমানের বাংলা গ্রন্থের এখনও যথেষ্ট অভাব। অথচ কথামৃত' এ বিষয়ে তত্ত্ব ও প্রকাশভঙ্গী—উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য নিয়ে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে যে বক্তৃতামালা দিয়েছিলেন, সেগুলি একই সঙ্গে সৃজন ও সমালোচনের সুন্দর উদাহরণ। 'কবি' শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সাধারণভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল কি না এ নিয়ে সে সময় কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। এখন' কেউ কেউ মনে করেন, যা মূলত ধর্মবিষয়ক তাকে সাহিত্য বলা কেন?

উপনিষদে 'কবি' শব্দটি মূলতঃ জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত। পরবর্তীকালে অনুভূতির রূপকার হিসাবেই শব্দটির তাৎপর্য গড়ে উঠেছে। এই দুই পথেই শ্রীরামকৃষ্ণ যে কবি, তাঁর অজস্র বাণীর সৌন্দর্যসম্ভারে তার সাক্ষ্য। তবু মনে হয়, কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। সাহিত্য কথাটির ব্যাপক অর্থের জন্য আমরা এই শব্দটিকে নিয়েই আমাদের প্রচলিত ধারণা যাচাই করে দেখতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যে অজস্র গ্রন্থ রয়েছে। তবু 'উপনিষদ' বিশেষভাবে কাব্যগুণান্বিত। পুরাণ অনেক, 'ভাগবতে'র মতো কবিত্বময় পুরাণ একটিই। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' অংশ কম বিস্ময়ের নয় (সলোমনের গানগুলির কবিত্ব স্মরণীয়), 'নিউ টেস্টামেন্টে'র কাব্যগুণ সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো বৈষ্ণবদর্শনের সারসংগ্রহ আদ্যন্ত কবিত্বমণ্ডিত।

সত্য যেখানে সুষমায় প্রকাশিত, সেখানেই সাহিত্য গুণের সম্ভাবনা। এবার অন্যদিক থেকে বিষয়টি বিচার করা যায়। যাঁরা ধর্ম ও সাহিত্যের পৃথকীকরণে আগ্রহী তাঁরা বৈষ্ণবপদাবলীর আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলে গতানুগতিক নায়ক-নায়িকা বর্ণনায় কতটুকু সাহিত্যসৌন্দর্য লাভ করবেন? রবীন্দ্রনাথের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি শুনে যিনি মুগ্ধ হ'ন, তিনি 'করুণাধারায় এসো' অথবা 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো'—জাতীয় অংশগুলি আধ্যাত্মিক ছাড়া আর কোন অর্থে গ্রহণ করতে পারেন? পুরী বা ভুবনেশ্বরে যখন মন্দিরশিল্পের অপরূপ সৌন্দর্যে কেউ মুগ্ধ হন, কেমন করে তিনি একথা মনে না করে পারেন যে, ওই শিল্প প্রেরণার মূলে রয়েছে বিশেষ ধর্মসাধনার ভক্তিময় অনুপ্রেরণা?

৭ তদেব: পৃঃ ২০১

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে অধ্যাত্ম-অনুভবের শত সহস্র রূপায়ণ যখন অতীত ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, তখন ধর্মের ছোঁয়া লেগেছে বলেই তা সাহিত্য নয়, এমন যুক্তির অর্থ কি? তবে যদি মনে হয় যে ধর্মানুভূতির প্রকাশ কেবল তত্ত্বকথার স্তরেই থেকে গেছে, প্রকাশের লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয় নি, তাহলেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই, কোনো রকম সাহিত্যসৃষ্টির সচেতনতা ছাড়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনালব্ধ সত্য বাংলাভাষার প্রকাশশক্তিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে, নূতন সৌন্দর্যে ও অনুপ্রেরণায় ভরে দিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ভাষাগত প্রকাশশক্তির কিছু কিছু উদাহরণ এখন উপস্থাপিত করা যাক। আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক থেকে বিশ্লেষণ আমাদের লক্ষ্য নয়, কারণ সেটি আমাদের অসাধ্য। কিন্তু বাংলাভাষার প্রয়োগের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর ভাষার সাহিত্যমূল্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হতে পারে।

(ক) ব্রহ্ম ও শক্তি—পরস্পর সম্বন্ধ—

'জল স্থির থাকলেও জল,—তরঙ্গ হলেও জল।

সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যকগতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ।

(খ) বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,—যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।[৮] নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের নিত্য ও লীলার সম্বন্ধ অথবা ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে সহজ অথচ যথাযথ উপমা আর কী হতে পারে?

রূপ থেকে অরূপে—

'যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভুজা। আরও এগিয়ে দেখলে ষড়ভুজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে দ্বিভুজ গোপাল! যত এগুচ্ছে, ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন করে—কোনও উপাধি নাই।

'একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র। সভাসুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজগোজ অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বিচার করতে গেলে কিছু টেঁকে না।

'ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে—খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে—ভয় নাই। তবু, ওরা আসতে চায় না—বলে বুক দুড় দুড় করছে। তখন ভুঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি'।[৯]

বিচারমূলক চর্চার দিক থেকে তিনটি উদাহরণ যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি নৈপুণ্য ঘরোয়া বাংলায় এদের পরিবেশনা।

(গ) পাণ্ডিত্যের অহংকার—

'একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির

৮ কথামৃত: ৪র্থ ভাগ: ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি: পৃ: ৩২; ১৩৭৭ সংস্করণ।

৯ কথামৃত: ৩য় ভাগ: ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি। স্থান—শ্যামপুকুর কলকাতা।

CENTRAL LIBRARY

পাহাড়ে একটা পিপড়ে গিছলো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব।'[১০]

মানবচরিত্রের এমন পরিহাসোজ্জ্বল চিত্ররূপ বক্তার অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ দুয়েরই সার্থক উদাহরণ।

(ঘ) সাধনার প্রয়োজন—

'সাধনার খুব দরকার, ফস্ করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয়?

'একজন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? তা মনে উঠলো, বললুম, বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা কর। হাতসুতো ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ আসবে। জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।

'মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন—করলে কি হবে? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে।'[১১]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, একটির পর একটি উপমা আপনিই উঠেছে এবং যথাযথ প্রকাশে বক্তব্যকে চিত্রময় করে তুলেছে।

(ঙ) ঈশ্বর ও বিদ্যাসাগর—

'পূজা হোম, যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার, যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

'তুমি যে সব কর্ম করছো, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।

'কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না। পাছে ছেলের কোন হানি হয়, এসবের কোন ব্যাঘাত হয়। তুমি যে সব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে। ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, যিনি মা, বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধুভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।

'অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।'[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের আলাপনের অংশটি দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর অসাধারণ আলাপচারীর অংশমাত্র। সমগ্র আলাপটি সংলাপ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। কিন্তু মূলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণই এখানে বক্তা, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ শ্রোতা।

১০ কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১২৮ : ১৩৭৭ সংস্করণ : ১লা অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি। কলকাতা, অধরসেনের বাড়ী।

১১ কথামৃত তদেব : পৃঃ ১৬০ : ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি। স্থান—দক্ষিণেশ্বর।

১২ কথামৃত তৃতীয় ভাগ পৃঃ ১৫; ১৩৭৭ সংস্করণ : ৪ই আগষ্ট, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি। স্থান—কলকাতা বিদ্যাসাগরের বাড়ী।

CENTRAL LIBRARY

আলাপ-আলোচনায় দু'জনেই দক্ষ পরিহাসরসিক এবং আপন আপন অধিকারে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আবার সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে একজন সাধুগদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী, আর একজন আপন অগোচরে চলতিভাষার মাধ্যমে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ও দর্শনের বক্তব্যরাশি সবচেয়ে সহজ ঘরোয়া ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে চলতি গদ্যের ভবিষ্যৎ সার্থকতা স্বতঃপ্রমাণিত করে চলেছেন।

(চ) উপমা শ্রীরামকৃষ্ণস্য'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আপন কবিসত্তা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমালোকটি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে এ জাতীয় উদাহরণের সমাবেশ পাঠকেরা দেখতে পাবেন। এ প্রবন্ধপ্রান্তে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমার অফুরান ভাণ্ডার থেকে একটি অংশমাত্র উপস্থাপিত করি। উপমেয় এখানে নরেন্দ্রনাথ—শ্রীরামকৃষ্ণদৃষ্টিতে সেই মানুষটি, যাকে পরবর্তীকালে কোনো বিদেশী অনুরাগী বলেছিলেন 'He was a king among men.' সেই কথাটি অনেক আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে আভাসিত সম্পূর্ণ বাঙালী জীবনের পরিচিত উপমা-পরম্পরায়—'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।'

'এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

'অন্যেরা কলসী, ঘটি এ সব হতে পারে; নরেন্দ্র জালা।

'ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।

'মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা কাঠি-বাটা এই সব।'

'খুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

'নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।'[১৩]

উপমা যদি অনিবার্য না হয়, তবে তার শিথিলতা আমাদের স্বভাবতঃই উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। আবার অতিকথনের বা অতি কাল্পনিকতার দ্বারাও উপমা বিক্ষিপ্ত হতে পারে। নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রসঙ্গে প্রত্যেকটি উপমা এখানে অর্থে ও চিত্রে সমান ভাস্বর। এই দৃষ্টিই সেই কবিদৃষ্টি যা বিশ্বচরাচরের বিভিন্ন উপাদানের অন্তর্নিহিত যোগটুকু মুহূর্তে ঘটাতে পারে।

অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কবি, তেমনি মনীষী, যেমন ভক্ত, তেমনি জ্ঞানী, যেমন তন্ময়, তেমনি রসিক—সব মিলিয়ে বিবেকানন্দের ভাষায় 'ভাবরাজ্যের রাজা।' তাঁর বক্তব্য, যা লেখায় নয়, কথায় প্রকাশিত, সেখানেও দেখি তিনি ভাষার সম্পদে রাজাধিরাজ। যে নির্ভূষণ সারল্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার শুদ্ধতম বিকাশ, সেই সারল্য আর অনুভবের সেই অতলতা তিনি এই বাংলাভাষায় রেখে গেছেন। তা অবহিত হওয়া আমাদেরই সৌভাগ্য।

১৩ কথামৃত : ৫ম ভাগ : পৃঃ ১৫৪ : ১৩৭৪ সংস্করণ : ১৮১৫, আষাঢ় সংক্রান্তি / স্থান—বলরামবসুর বাড়ি, বাগবাজার কলিকাতা

CENTRAL LIBRARY

গাথাসপ্তশতী ও কবি কালিদাস

নরেশচন্দ্র জানা

গাথাসপ্তশতী (প্রাকৃত 'গাহাসত্তসঈ') মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত একখানি কোশগ্রন্থ। সাতশো গাথার সঙ্কলন বলে এর নাম গাথাসপ্তশতী। সাতবাহন বংশীয় রাজা হাল এর সঙ্কলয়িতা। গাথাসপ্তশতীর কোন কোন গাথার সঙ্গে কবি কালিদাসের কাব্য নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন রচনাংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্য গাথাকার এবং কবি কালিদাসের মৌলিক ভাবনা ও কল্পনার আকস্মিক অন্তশ্চর সাদৃশ্য হেতু হতে পারে কিংবা একের অন্যের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলেও হতে পারে। তবে এক এক স্থলে ভাবসম্মিতির নিবিড়তা এত প্রগাঢ় যে এই সাধর্ম্যকে আকস্মিক বলে মনে করা চলে না। স্পষ্টই ধারণা হয়, এক কবি অন্য কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এ প্রশ্ন স্বতঃই এসে যায়। যিনি পূর্ববর্তী তাঁর দ্বারাই পরবর্তী জন প্রভাবিত হয়েছেন, নিঃসন্দেহে বলা চলে। এখন পূর্ববর্তী জন কে? পণ্ডিতদের মতে রাজা হালের আবির্ভাব খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে, আর কবি কালিদাসের আবির্ভাব খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে। সুতরাং কবি হাল নিঃসন্দেহে কালিদাসের পূর্ববর্তী এবং তা-ই হলে হাল-সঙ্কলিত গাথাসপ্তশতী দ্বারা কালিদাস প্রভাবিত হয়েছেন সহজেই বলা যায়। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন, গাথাসপ্তশতীর পুরোটাই হাল দ্বারা সঙ্কলিত হয়নি। এর সাতশো শ্লোক-সংগ্রহ বহু বছর ধরে চলে এসেছে এবং ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তা সম্পূর্ণতা পেয়েছে।[১] তা-ই যদি হয়, তাহলে গাথাসপ্তশতীর গাথার সঙ্গে কালিদাসের রচনাংশের যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তা গাথাকারের প্রভাব না হয়ে কালিদাসের প্রভাবের ফল বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। বিদগ্ধ পণ্ডিত ডঃ সুশীলকুমার দে মনে করেন যে, গাথাসপ্তশতীর পুরো সঙ্কলন কার্য যদি এককালে নাও হয়ে থাকে, অন্ততঃ কালিদাসের আগে তা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর মতে গাথাসপ্তশতীর সব কজন কবিরই কালিদাসের পূর্ববর্তী হবার সম্ভাবনা বেশী।[২] ডঃ দে-র অনুমানকে মেনে নিলে কালিদাস গাথাসপ্তশতীর গাথাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। আমাদেরও অনুমান যে, হাল-সঙ্কলিত গাথাগুলি খুব সম্ভব কালিদাসের পূর্বেই সঙ্কলিত হয়েছে এবং গাথাগুলির সঙ্গে কালিদাসের রচনাংশের সাদৃশ্যে কালিদাসই প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। এবংবিধ অনুমানের কারণ এই যে, গাথাগুলিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় সেগুলি যেন প্রকৃতির বাগানে অযত্নবর্ধিত, স্বভাবজাত বনলতা, যেন সেই লতাতে ধরেছে ভাবের অফোটা কুঁড়ি। কবি কালিদাস যেন সেই বনলতাকে তাঁর কবিমনের উদ্যানে রোপণ করে কল্পনার পরিচর্যায় অফোটা কুঁড়িকে করে তুলেছেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত। প্রকৃতপক্ষে, কালিদাসের রচনায় এক সযত্ন শিল্পকর্মের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়, যা গাথাগুলিতে অনুপস্থিত। খনি থেকে

১ পূর্ণতমরূপে যে সঙ্কলনটি আমরা পাইতেছি তা এককালে ঘটে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে যোগের পর যোগ হইয়া তবেই পরিবর্ধিতকায় হইয়াছে।...মোটামুটিভাবে বলা যায় যে গাথাসপ্তশতীর শ্লোকসংগ্রহ ৪০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।'—ডঃ সুকুমার সেন : ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সং, পৃঃ ৩৭৯।

২ 'Such is the case with earliest and most intersting collection of 700 stanzas which passes under the name of Hala Satvahan (circa 3rd century A. D) and which comprises the works of Prakrit-poets who are probably earlier even than Kalidasa.'—S.K. De : Ancient Indian Erotics and Erotic Literature, Ist ed., pp. 21-22.

CENTRAL LIBRARY

তোলা সোনাকে সুগঠিত অলঙ্কারের রূপ দেওয়া মণিকারের পক্ষে খুবই সম্ভব। কালিদাসের কল্পনাসুন্দর শিল্পকর্মের পটভূমিকায় এই সম্ভাবনাই বেশী করে জাগে। মনে করি, প্রতিভাধর শিল্পীই সামান্য ভাববীজকে নিয়ে অঙ্কুরিত, পল্লবিত করে তাতে বিকশিত শতদলের লাবণ্যমহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন।

গাথাসপ্তশতী চিরন্তন প্রেমের গাথা। গাথাকারেরা নরনারীর চিরন্তন প্রেমভাবনাকে বিচিত্র রঙে রেখায় রঞ্জিত করে তুলেছেন। নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ, অভিসারসঙ্কেত, মিলনের আর্তি ও বিরহের অনন্ত ক্রন্দন, অপূর্ণ প্রণয়ের বেদনা ও সম্ভোগের অনাবিল আনন্দ সহজসৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শাশ্বত প্রেমভাবনার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় গাথাগুলি অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কালিদাসও অবিমিশ্র প্রেমের কবি। প্রেমের বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল উদ্ভাসন তাঁর প্রতিটি রচনাতেই সংলক্ষ্য। নরনারীর বিরহবেদনাদিগ্ধ প্রেমের অনুভাবপ্রকাশে যেমন তিনি নিপুণ, মিলন ও সম্ভোগের রাগরক্তিম ছবি আঁকাতেও তেমন তিনি অনন্য। কবি কালিদাসের প্রেমচিত্র ও প্রেমভাবনায় বিশেষ করে সম্ভোগ ও মিলনের রক্তিম উল্লাস বর্ণনায় গাথাগুলির ভাবের সঙ্গে আশ্চর্য ঐক্য দেখা যাবে।

কালিদাসের রচনার বিতর্কিত অধ্যায় দিয়েই আরম্ভ করি। কুমারসম্ভব কালিদাসের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কাব্য। এই মহাকাব্যটি এখন মোট সতেরো সর্গে পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনাচলিত সব কটি সর্গই যে কালিদাসের রচনা নয়, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রায় একমত। অষ্টম সর্গ কালিদাসের রচনা এবং বাকী অংশ পরবর্তী যোজনা এই মতই বহুল স্বীকৃত। এর মধ্যে অষ্টম সর্গটিকে আবার কেউ কেউ কালিদাসের রচনা নয় বলে মনে করেন। কারণ এই সর্গে দেবদেবীর যে উন্মুক্ত সঙ্গমবিহারের ছবি আঁকা হয়েছে, তা অলঙ্কারশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাঁদের মতে কবি কালিদাসের পক্ষে এরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রবিরোধী কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু মল্লিনাথ এই অষ্টম সর্গ পর্যন্ত টীকা করেছেন, আনন্দবর্ধন এর উল্লেখ করেছেন। এ কারণে এটি কালিদাসের রচনা বলে অধিকাংশ পণ্ডিত স্বীকার করেন এবং আমরাও স্বীকার করি। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে দেবদেবীর মিলন ও সম্ভোগের শিল্পমণ্ডিত অপূর্ব সৌন্দর্যচিত্র আঁকা হয়েছে। পরিণয়-অন্তে পরম আরাধ্য দেবদেবী মিলনের নির্বাধ ক্রীড়ায় দিনগুলি উদ্বেলিত করে তুলেছেন। একটি শ্লোকে কালিদাস এই মিলনের একটি চমৎকার আলেখ্য সৃজন করেছেন। শ্লোকটি এই—

শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা সংনিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥—৮।৭

শম্ভু উমার বস্ত্রহরণ করে। নিরাবরণ দেহ উমার। শম্ভু তাকিয়ে থেকে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করে। স্বভাবলজ্জাতুরা উমা শম্ভুর এই দৃষ্টিক্ষুধা হতে আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়িতে শম্ভুর দুচোখ দুহাতে ঢেকে দেয়। কিন্তু শিবের তৃতীয় নয়ন, সেতো ঢাকা হয় না, কারণ উমার তো তৃতীয় হাত নেই। বিফল বেদনায় উমার দুচোখ ভরে কান্না আসে। আসামান্য সুন্দর এই কবিকল্পনা।

একটি গাথাতেও আশ্চর্যসুন্দর এই ভাবচিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে। গাথাটি এই—

রই কেলি-হিঅ-ণিঅংসণ-কর-কিসলঅ-রুদ্ধ-ণঅণ জুঅলস্স।
রুদ্দস তইঅ-ণঅণং পব্বই-পরিউম্বিঅং জঅই ॥—৫।৫৫ (অজ্ঞাত)

[যে রুদ্র রতিকেলি কালে (পার্বতীর) বস্ত্র হরণ করেছিলেন এবং যাঁর চোখ দুটি (পার্বতীর) করকিসলয় দ্বারা রুদ্ধ হয়েছিল—সেই রুদ্রের পার্বতীচুম্বিত তৃতীয় লোচনটী জয়যুক্ত হোক।]

প্রথম মিলনে নারীর মনে থাকে সহজ লজ্জা, শঙ্কা ও সঙ্কোচ। হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ভীরু দীপশিখার মত তার

CENTRAL LIBRARY

আচার-আচরণ। দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে, নম্র নেত্রপাতে নববধূ সলজ্জিত বাসরসজ্জায় প্রবেশ করে। মিলনলগ্নে শঙ্কা ও সঙ্কোচাতুরা নববধূ ও নবপ্রণয়িণীর লজ্জারক্তিম সৌন্দর্য কবি কালিদাস অপূর্ব নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হোল—

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥—৮।২ (কুমারসম্ভব)

[শঙ্কর কথা বলতে যান। (উমা) নিরুত্তর থাকেন। আঁচল টেনে ধরলে তা ছাড়িয়ে নেন। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। (উমার) প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও শঙ্কর তাতেই পরম প্রীতি পান।]

চুম্বনেষ্বধরদানবর্জিতং সন্নহস্তমদয়োপগূহনে।
স্তিমিতমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভো র্দুর্লভপ্রতিকৃতং বধূরতম্ ॥—৮৮ (ঐ)

[চুম্বনকালে (উমার) অধরদানে পরাঙ্মুখিতা, আলিঙ্গনকালে পাথরপ্রতিমার মত নিশ্চলতা মদনভাবের সাহায্য না করলেও তাতেই শঙ্করের পরমপ্রীতি।]

চুম্বনে বিপরিবর্তিতাধরং হস্তরোধি রশনা-বিঘট্টনে।
বিস্মিতেচ্ছমপি তস্য সর্বতো মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥—১৯।২৭ (রঘুবংশ)

[চুম্বনে উদ্যত হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, রশনা বিঘটন করতে গেলে হাত চেপে ধরে। এভাবে যত বাধা আসে, ততই রাজার মদনাগ্নি জ্বলে ওঠে।]

হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ
স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গমানা বলাৎ।
পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং
ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্বর্তয়ত্যেব মে ॥—৪র্থ অঙ্ক (মালবিকাগ্নিমিত্র)

গাথাসপ্তশতীর তিনটি গাথাতেও এই নববধূসঙ্গমের চমৎকার রূপটি মিতপরিসরে সহজ সৌন্দর্যে, অনুপম-লাবণ্যে ফুটে উঠেছে। গাথা তিনটি এই—

ণ অ দিট্ঠিং দেই মুহং ণ অ ছিবিউং দেই ণালবই কিংপি।
তহ বি হু কিং পি রহস্সং ণব-বহু-সঙ্গো পিও হোই ॥—৭।৪৫ (অজ্ঞাত)

[নববধূ স্বামীর মুখের দিকে তাকায় না, (নিজকে) স্পর্শ করতেও দেয় না, এবং কোন আলাপও করে না,—তথাপি নববধূসঙ্গ যে লোকের প্রিয় হয়—এ এক অপূর্ব রহস্য।]

অলিঅ-পসত্ত-বলন্তম্মি ণব-বরে ণব-বহূঅ বেবন্তো।
সংবেল্লিঅক্ক-সংজমিঅ-বথ-গণ্ঠিং গও হত্থো ॥—৭।৪৬ (অজ্ঞাত)

[নতুন বর ঘুমোবার ভাণে (বধূর দিকে) ফিরে শুলে, নববধূর হাত কাঁপতে কাঁপতে জোড়া উরুর ভাঁজে গোঁজা কাপড়ের দিকে এগোতে থাকে।]

পুচ্ছিজ্জন্তী ণ ভণই গহিআ পপ্‌ফুরই চুম্বিআ রুণ্ণই।
তুণ্‌হিক্কা ণব-বহূআ কআবরাহেণ উবউঢ়া ॥—৭।৪৭ (অজ্ঞাত)

[কৃতাপরাধ (নববর দ্বারা) আলিঙ্গিত হয়ে নির্বাক নববধূ জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর দেয় না, (হাত দ্বারা) গৃহীত হলে কাঁপতে বা নড়াচড়া করতে থাকে, এবং চুম্বিত হলে রোদন করে।]

CENTRAL LIBRARY

স্বামীসৌভাগ্যে কন্যা যদি ভাগ্যবতী হয়, পিতামাতার মনে অসীম তৃপ্তির আনন্দ ফুটে ওঠে। পরের হাতে আপন সন্তানকে সঁপে দেওয়ার বেদনাকে তখন তাঁরা ভুলতে পারেন। একটি শ্লোকে কবি কালিদাস মাতৃহৃদয়ের এই ভাবটিকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্লোকটি এই –

নীলকণ্ঠপরিভুক্তযৌবনাং তাং বিলোক্য জননী সমাশ্বসীৎ।
ভর্তৃবল্লভতয়া হি মানসীং মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ॥ ৮।১২ (কুমারসম্ভব)

[নীলকণ্ঠপরিভুক্তযৌবনা পার্বতীকে দেখে মা (মেনকা) আশ্বস্ত হন। মেয়ে স্বামীর প্রিয় হয়েছে জানলে মায়ের মনের বেদনা জুড়োয়।]

একটি গাথাতেও ঠিক এইভাবেরই পরিচয় দেখতে পাই। গাথাটি এই—

বাউল্লঅ-সিচয়-বিহাবিওক্ক-দিট্ঠেণ দন্ত-মগ্গেণ।
বহু-মাআ তোসিজ্জই নিহাণ-কলসস্স ব মুহেণ॥—৬।৭ (অজ্ঞাত)

[(মাটি খোঁড়ার কালে) নিধান-কলসের মুখ দেখা গেলে যেমন (কেউ) তুষ্ট হয়ে থাকে, নতুন বধূর মাও, আঁচল হাওয়ায় উড়ে যাওয়ায়, মেয়ের উরুতে (জামাতার) দাঁতের দাগ দেখে তেমন তুষ্ট হন।]

বিবাহের পর হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উমা-শঙ্কর। একদিন পাহাড়ের বুকে চন্দ্রোদয়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন শঙ্কর উমার কাছে এইভাবে—

অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্মলীকৃতসরোজলোচনং চুম্বতীব রজনীমুখং শশী॥—৮।৬৩ (কুমারসম্ভব)

কেশ আকর্ষণপূর্বক চুম্বনের এই রীতিচিত্র গাথাতেও পাই—

সকঅ-গ্গহ-রহস্সত্তাণিআণণা পিঅই পিঅ মুহ-বিইণ্ণং।
থোঅং থোঅং রোসোসহং ব উগ্ঘ মাণিণী মইরং॥—৬।৫০ (অজ্ঞাত)

[দেখ, (প্রিয়তম দ্বারা) কচ-গ্রহ সহকারে জোরপূর্বক উত্তোলিতবদনা মানিনী প্রিয়তমের স্বমুখ দ্বারা প্রদত্ত মদিরা রোষনিবারক ওষুধরূপে অল্প অল্প পান করছে।]

এখানে উল্লেখ্য যে, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-তেও কেশাকর্ষণপূর্বক চুম্বনের কথা আছে—

স কচগ্রহমুন্নম্য মুখং তস্য ততঃ পিবেৎ।
নিলীয়েত দশেচ্চৈব তত্র তত্র মদেরিতা॥—সাম্প্রয়োগাধিকরণম্, ৪র্থ অধ্যায়

কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গে অকালবসন্তবর্ণনার একটি চিত্র এরূপ—

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥—৩৬

[প্রেমালস কৃষ্ণসার ধীরে ধীরে শিং দিয়ে মৃগীর চোখ চুলকে দিচ্ছে আর পরম আবেশে মৃগীর চোখ দুটি আনন্দে বুঁজে আসছে।]

একটি গাথাতেও মনুষ্যেতর প্রাণীর এরূপ প্রণয়প্রকাশের চিত্র দেখতে পাই—

পাঅডিঅং সোহগ্গং তম্বাএ উঅহ গোট্ঠ-মজ্ঝম্মি।
ছট্ঠ-বসহস্স সিঙ্গে অক্খি-উঅং কণ্ডুঅন্তীএ॥—৫।৬০ (অজ্ঞাত)

[দেখ, গোষ্ঠে দুষ্ট বৃষের শিংয়ে (নিজ) চোখ চুলকাতে চুলকাতে গাভীটি সৌভাগ্য দেখাচ্ছে]

কুমারসম্ভবের একটি শ্লোকে উমার মুখসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর উড়ে আসছে, এরূপ বর্ণনা পাই—

CENTRAL LIBRARY

সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।—৫।৫৬

[একটি ভ্রমর তাঁর সুরভি নিঃশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে বিম্বফলতুল্য অধরের সন্নিধানে উড়ে বেড়াচ্ছিল।]

একটি গাথাতেও ঠিক অনুরূপ বর্ণনা পাই। গাথাটি এই—

অহিলেন্তি সুরহি-নীসসিঅ-পরিমলাবদ্ধ-মণ্ডলং ভমরা।

অমুণিঅ-চন্দ-পরিহরং অপুব্ব-কমলং মুহং তিস্সা॥—৪।৬৬

[অপূর্ব কমলসদৃশ তার (নায়িকার) যে মুখ কখনও চাঁদ থেকে কোন পরাভব পায়নি, ভ্রমরগণ সুরভি নিঃশ্বাসের পরিমললোভে দল বেঁধে সেই মুখের দিকে এগোচ্ছে।]

স্বয়ংবর-সভায় দ্বারপালিকা সুনন্দা ইন্দুমতীকে প্রতিটি রাজার পরিচয় জ্ঞাপন করছে। রাজা সুষেণের পরিচয় দান কালে সুনন্দা ইন্দুমতীকে বলছে—ইনি শূরসেন দেশের অধীশ্বর। এঁকে যদি মাল্য দাও, তাহলে গোবর্ধন গিরির গুহায় শিলাতলে বসে এঁর সঙ্গে পরম রমণীয় আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।

কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ধন-কন্দরাসু॥—৬।৫১ (রঘুবংশ)

[(এঁর সঙ্গে পরিণীতা হয়ে) গোবর্ধন গিরির গুহায় জলে ভেজা এবং সুরভি শিলাজতুর গন্ধে ভরপুর শিলাতে বসে বর্ষায় ময়ূরদের নাচ দেখ।]

উল্লেখ্য যে একটি গাথাতে গোবর্ধন কন্দরের উল্লেখ না থাকলেও গিরিগ্রামের যে মনোরম বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রায় কালিদাসের উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ। গাথাটি এই—

পপ্ফুল্ল-ঘণ-কলম্বা ণিচ্ছোঅ-সিলা-অলা মুইঅ-মোরা।

পসরন্তোঝর-মুহলা ওসাহন্তে গিরি-গ্গামা॥—৭।৩৬ (অজ্ঞাত)

[যে স্থানে কদম্বগাছগুলি ফুল ফোটাতে প্রোৎফুল্ল, শিলাতলগুলি জলে ধোওয়া, ময়ূরগুলি আনন্দিত এবং ঝর্ণার (শব্দে) মুখর, সেই গিরিগ্রামগুলি (বাসের জন্য) উৎসাহিত করছে।]

কুমার অজকে দেখে ইন্দুমতী অনুরক্ত। কিন্তু স্বভাবলজ্জায় এই অনুরাগ প্রথমে প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু শরীরের পুলক-রোমাঞ্চে তা প্রকাশিত হয়ে উঠেছে—

সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্।

রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ সা গাত্রযষ্টিং ভিত্ত্বা নিরাক্রামদরাল-কেশ্যাঃ॥—৬।৮১ (ঐ)

[(ইন্দুমতী) লজ্জাবশতঃ রাজপুত্রের প্রতি অনুরাগ বাক্যে প্রকাশ করতে পারলেন না। কিন্তু কুঞ্চিতকেশীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে তার হৃদয়নিহিত অনুরাগ প্রকাশ করে দিল।]

একটি গাথাতেও অনুরাগে শরীর রোমাঞ্চিত হবার কথা জানতে পারি—

গিজ্জন্তে মঙ্গল-গাইআহিঁ বর-গোত্ত-দিন্ন-অণ্ণাএ।

সোউং ব ণিগ্গও উঅহ হোন্ত-বহুআই রোমঞ্চো॥—৭।৪২ (অজ্ঞাত)

[দেখ, মঙ্গলগায়িকারা গান গাইতে থাকলে, বরের নামোল্লেখে কানপেতে-থাকা ভাবীবধূর (শরীরে) রোমাঞ্চ যেন নাম শোনার জন্যই হচ্ছে।]

প্রিয় উপেক্ষায় নারী অভিমানিনী হয়। কৃতাপরাধ প্রিয়ের সাদর অনুনয়বিনয়েও নারী সহসা মানবিসর্জন করতে চায়

CENTRAL LIBRARY

না। বসন্তের ব্যাকুল সৌরভ বাতাসে বিকীর্ণ। কোকিলেরা ডালে বসে কূজন করছে। মানিনী নারীকে মানের কঠিন দুর্গে নিশ্চল বসে থাকতে দেখে কোকিলেরা বলে ওঠে —

ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ।—৯।৪৭ (রঘুবংশ)

জীবন অল্প, যৌবন চঞ্চল। মধুলগ্ন ফিরে গেলে আর আসে না। সুতরাং মান ত্যাগ করে অনুনয়ী প্রিয়কে সাদর সম্ভাষণ কর।

মানিনী নারীকে মানত্যাগের জন্য প্রায় অবিকল এই ভাষাতেই সখীদের অনুরোধ করতে দেখি দুটি গাথায় —

ণই-উর-সচ্ছহে জোব্বণম্মি অই-পবসিএসু দিঅসেসু।
আণঅত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ॥—১।৪৫ (পবনরাজ)

[যৌবন নদীর স্রোতের ন্যায়, দিনগুলি চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে, রাত্রিও আর ফিরবে না, এ অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়ে আর কি হবে ?]

জীঅং অসাসঅং বিঅ ণ ণিঅত্তই জোব্বণং অইক্কন্তং।
দিঅহা দিঅহেহিঁ সমাণ হোন্তি কিং ণিট্ঠুরো লোও॥—৩।৪৭ (হাল)

[(মানুষের) জীবন অনিত্য, যৌবন চলে গেলে আর ফিরে আসে না ; (এক অবস্থার) দিন (অন্য অবস্থার) দিনের সমান নয় ; তবুও (প্রেমানুভবে) লোকেরা কেন যে নিষ্ঠুর হয়।]

মৃগয়ায় রত দশরথ লক্ষ্যীকৃত মৃগের উদ্দেশ্যে বাণ যোজনা করেছেন। বাণবেধোন্মুখ মৃগকে বাঁচাবার জন্য দয়িতা মৃগী তাড়াতাড়ি এসে প্রিয়ের শরীর আড়াল করে দাঁড়ায়। মৃগীর সজলকাতর চোখে ভেসে ওঠে আপন প্রিয়ার আয়ত-চোখের ছায়া। দশরথ আর বাণনিক্ষেপে সক্ষম হন না। ধনুর্গুণ শিথিল করে বাণ প্রতিসংহার করেন। দুটি শ্লোকে কালিদাস এই মনোরম আলেখ্য সহজ তুলির টানে বিরলরেখায় অনন্যসৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্লোকদুটি এই—

লক্ষ্যীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্।
আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসংজহার॥—৯।৫৭ (রঘুবংশ)
তস্যাপরেষ্বপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ কর্ণান্তমেত্য বিভিদে নিবিড়োঽসি মুষ্টিঃ
ত্রসাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ প্রৌঢ়প্রিয়ানয়ন-বিভ্রম-চেষ্টিতানি॥—৯।৫৮ (ঐ)

আশ্চর্য যে ঠিক অবিকল এই ভাবেরই প্রকাশ নিম্নোক্ত দুটি গাথাতে দেখা যাচ্ছে —

এক্কক্কম-পরিরক্খণ-পহার-সমূহে কুরঙ্গ-মিহুণম্মি।
বাহেণ মন্থ-বিঅলন্ত-বাহ ধোঅং ধনুং মুক্কং॥—৭।১ (অজ্ঞাত)

[মৃগমৃগীযুগলকে পরস্পরের রক্ষার জন্য প্রহারের সম্মুখীন হতে দেখে ব্যাধ করুণাবশে বিগলিত বাষ্পদ্বারা বিধৌত ধনু ত্যাগ করল।]

এক্কল-মও দিট্ঠীঅ মইঅ তহ পুলইও সঅণ্হাএ।
পিঅ-জাঅস্স জহ ধনুং পড়িঅং বাহস্স হত্থাও॥—৭।১৮ (অজ্ঞাত)

[(ব্যাধের বাণ উদ্যত হলে) মৃগী এমনভাবে সতৃষ্ণনয়নে একাকী মৃগের প্রতি তাকাল যে, তা দেখে স্বপত্নীতে অনুরক্ত-চিত্ত ব্যাধের হাত থেকে ধনুক খসে পড়ল।]

CENTRAL LIBRARY

একটি গাথাতে প্রায় অনুরূপপ্রসঙ্গে যে সহজ স্নিগ্ধ কাব্যসুষমা ফুটে উঠেছে, তাতে গাথাকারের কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। গাথাটি প্রেমভাবনার এক অত্যুজ্জ্বল রত্নখণ্ড। গাথাটি এই—

আ অন্না অডিঅ-পিসিঅ-ভল্ল-মগ্গহআই হরিণীএ।
অব্ভংসণো পিও হোহিই ত্তি বলিউং চিরং দিট্ঠো ॥—৬।৯৪ (অজ্ঞাত)

[(ব্যাধের) কানপর্যন্ত আকৃষ্ট তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা আহত হয়েও হরিণী (প্রেমবশতঃ) আমার প্রিয় দেখার অগোচর হবে, এরূপ ভেবে কাঁধ বেঁকিয়ে অনেকক্ষণ প্রিয়কে দেখতে লাগল।]

প্রিয়া-অবয়বসদৃশ বস্তুদর্শনে প্রবাসী পথিকের বিরহবিধুর হৃদয়ে যে আনন্দ উন্মাদনার সঞ্চার ঘটে, তার একটি মনোরম পরিচয় নিম্নোক্ত গাথাটিতে বিধৃত—

অগ্ঘাই ছিবই চুম্বই ঠেবই-হিঅঅম্মি জণিঅ-রোমঞ্চো।
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছহ পহিও মহুঅ-উপ্ফং ॥—৭।৩৯ (অজ্ঞাত)

[দেখ, পথিক জায়ার কপোলসদৃশ মধুক ফুলটিকে (পেয়ে)—(কখনও এর) আঘ্রাণ নিচ্ছে, (কখনও একে) স্পর্শ করছে, (কখনও একে) চুম্বন করছে, (আবার কখনও) রোমাঞ্চিত শরীরে (নিজ) বুকে রাখছে।]

অনুরূপ উন্মত্ততার প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু উতলা কলাপীর পুচ্ছ দেখে প্রিয়তমাদের রতিশ্রমস্খলিত কেশদামের কথা মৃগয়াবিহারী রাজা দশরথের স্মৃতিপথে জাগরূক হয়েছে দেখি—

অপি তুরগ সমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং ন স রুচিরকলাপং বাণলক্ষ্যীচকার।
সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে রতি-বিগলিত-বন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ ॥—৯।৬৭ (রঘুবংশ)

সরোবরের কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলকে প্রিয়ার মুখসদৃশ ভেবে পথিক আকুল আগ্রহে পান করছে, একটি গাথাতে এমন বর্ণনা আছে—

সরএ সরম্মি পহিআ জলাই কন্দোট্ট-সুরহি-গন্ধাইং।
ধবলচ্ছাই সমণ্হা পিঅন্তি দইআণ ব মুহাইং ॥—৭।২২ (অজ্ঞাত)

[শরৎকালে পথিকেরা সরোবরে নীলপদ্মের সুরভিগন্ধবিশিষ্ট ধবল ও স্বচ্ছজল, প্রিয়তমাগণের মুখসদৃশ মনে করে সতৃষ্ণ হয়ে পান করছে।]

ঋতুসংহারেও কবি কালিদাস প্রেয়সীবিরহকাতর পথিকদের নিসর্গের বিভিন্ন বস্তুতে প্রিয়ার অঙ্গসাদৃশ্য দেখে প্রিয়াস্মৃতিতে রোদনের কথা বর্ণনা করেছেন—

অসিত-নয়ন-লক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ ॥—৩।২৪

বিরলে প্রিয়তম-দত্ত নখক্ষত দেখে উপভুক্তা তরুণীর অবিমল আনন্দলাভের কথা ঋতুসংহারের একটি শ্লোকে কালিদাস বর্ণনা করেছেন—

নখপদচিতভাগান্ বীক্ষমাণাঃ স্তনাগ্রানধরকিসলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ।
অভিমতরসমেতং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥—৪।১৫

একটি গাথাতেও বিরলে নায়িকার স্তনপৃষ্ঠে নখক্ষত দর্শনের চিত্র পাওয়া যায়—

অজ্জাএ নব-গহ-কণ্অ-গিরীকৃণে গরুঅ-জোব্বণুত্তঙ্গং।
পঙিমাগঅ-ণিঅ-ণঅণুব্বলক্ষিঅং হোই থণ-বট্ঠং ॥—২।৫০ (নিষ্কলঙ্ক)

CENTRAL LIBRARY

[বরবর্ণীর অত্যন্ত গুরু ও যৌবনোত্তুঙ্গ স্তনপৃষ্ঠ, তার নতুন নখক্ষত দেখার কালে প্রতিবিম্বিত নয়নে অর্চিত হচ্ছে।]
'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল'—এরূপ তীব্র আর্তি, তৃষ্ণাবিধুরতা না ফুটে উঠলেও কালিদাসের নায়িকা বলে—দেখেও দেখার আশা মিটে না, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। সখীকে বলে—'সহি! সংভমদিট্টে ভট্টিণো ক্বে যহা ণ বিতিণ্হদ্ধি তহা অজ্জবি মএ ভাবিদো অবিতিণ্হদংসণো ভট্টা।'—৪র্থ অঙ্ক (মালবিকাগ্নিমিত্র)
গাথার নায়িকাও অবিকল এই কথা বলে—

অবিঅণ্হ-পেক্খণিজ্জেণ তক্খণং মামি তেণ দিট্ঠেণ।
সিবিণঅ-পীএণ ব পাণিএণ তণ্হ ঝিঅ ণ ফিট্টা॥—১।৯৩ (বজ্জ)

[হে মামি, স্বপ্নে পীত জল দ্বারা অনপনেয় তৃষ্ণার মত, অতৃপ্ত নয়নে দেখার যোগ্য সেইজনকে দেখে আমার তৃষ্ণা দূর হয় নাই।]
প্রিয়বিরহে বিরহিণী বেঁচে থাকতে পারে না। সূর্যের বিরহে নলিনী বাঁচতে পারে না। তবু তারা বাঁচে। আশার আশায় বাঁচে। বিরহের রাত্রি কেটে গিয়ে ভোরের সূর্য উঠবে, মিলন হবে—এই আশাতে কুসুমকোমলা নারী ও নলিনী বেঁচে থাকে। কবি তাই বলেন—

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি—১।১০ (মেঘদূত)

প্রিয়বিয়োগকাতরাকে সখীরাও তাই সান্ত্বনা দেয় এই বলে—

গরুঅং বি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেই।—৪র্থ অঙ্ক (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

একটি গাথাতেও নায়িকা বলছে, বিরহবেদনা আশাবন্ধে সহনীয়—

বিরহাণলো সহিজ্জই আসাবন্ধেণ বল্লহজণস্স—১।৪৩ (অমৃত)

মিলনে যে রজনী মনে হয়েছে ক্ষণমাত্র, বিরহে সেই রজনীই যেন অফুরন্ত। শয্যালীন প্রিয়ার কৃশছবিটি মেঘের কাছে তুলে ধরে যক্ষ তাই বলে—

নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা তামেবোর্ক্ষৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্।
—২।২৮ (মেঘদূত)

গাথাতেও সদৃশভাবের আভাস দেখা যায়—

এহিসি তুমং ত্তি ণিমিসং ব জগ্গিঅং জামিণীঅ পঢমদ্ধং।
সেসং সংতাব-পরব্বসাই বরিসং ব বোলীণং॥—৪।৮৫ (দুর্ধর)

['তুমি আসবে' এই মনে করে (রমণী) এক নিমেষের মত যামিনীর প্রথমার্ধ জেগে কাটিয়েছে; আবার (তুমি না আসাতে), শেষার্ধ বিরহে সন্তপ্ত হয়ে বছরের মত দীর্ঘ মনে করে কাটিয়েছে।]

চন্দমুহি চন্দ-ধবলা দীহা দীহচ্ছি তুহ বিওঅম্মি।
চউ-জামা সঅ-জাম ব্ব জামিণী কই বি বোলীণা॥—৩।৫২ (গর্গরাজ)

[হে চন্দ্রমুখি, দীর্ঘলোচনে! তোমার বিরহে চন্দ্রধবল, দীর্ঘ ও চতুর্যামবিশিষ্ট হলেও শতযামপরিমিত বলে প্রতিভাত যামিনী আমি কোনপ্রকারে অতিক্রম করেছি।]
প্রিয়াবিরহে উন্মদ যক্ষ প্রিয়াস্পর্শ পাবার জন্য আকুলব্যাকুল। কিন্তু প্রিয়াস্পর্শ তো দুর্লভ। কোথায় অলকা, আর কোথায় এই রামগিরি। তবুও প্রিয়াস্পর্শলাভের ব্যাকুলতর আকাঙ্ক্ষায় উত্তরে বাতাসকে (অলকা হিমালয়ে,

CENTRAL LIBRARY

বাতাসও আসছে হিমালয় থেকে) আলিঙ্গন করে এই ভেবে যে, প্রিয়ার অঙ্গস্পৃষ্ট এই বাতাসে প্রিয়ার অঙ্গসৌরভ লেগে আছে এবং তাই যক্ষ বলে—

আলিঙ্ক্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি। —

২।৪৬ (মেঘদূত)

বাসনার দুর্বারতার এরূপ সূক্ষ্ম কাব্যসুষমার পরিচয় নেই বটে তবে অনুরূপ ভাবধ্বনি নিম্নোক্ত গাথাদুটিতে মেলে—

তুজ্ঝঙ্গরাঅ-সেসেণ সামলী তহ ধরেণ সোমারা।

সা কির গোলা-উলে ণ্হাআ জম্বু-কসাএণ॥ ২।৮৯ (অমৃত)

[সুকুমারাঙ্গী সেই শ্যামলী নারী কিন্তু তোমার অঙ্গরাগাবশেষ তীক্ষ্ণ জম্বুকষায় দ্বারা গোদানদীর কূলে স্নাত হয়েছে]

গহ-বই-সুওচ্ছিএসু বি ফলহী-বেণ্টেসু উঅহ বহুআএ।

মোহং ভমই পুলইও বিলগ্গ-সেঅঙ্গুলী হত্থো॥—৪।৫৯ (হাল)

[তোমরা দেখ গৃহপতি-পুত্রদ্বারা (অর্থাৎ আমার পতিদ্বারা) তোলা কাপাসের বোঁটার দিকে বধূর ঘামে ভেজা আঙ্গুলযুক্ত হাতখানি পুলকিত হয়ে বৃথাই এগোচ্ছে।]

একটি গাথাতে বিরহের উৎকণ্ঠায় সখীকে নায়িকা বলছে—

দূরন্তরিএ বি পিএ কহ বি ণি অত্তাই মহ্ম ণঅণাই।

হিঅঅং উণ তেণ সমং অজ্জ বি অণিবারিঅং ভমই॥—৭।৫৮ (অজ্ঞাত)

[প্রিয়তম দূরে চলে গেলে আমি কোনও প্রকারে চোখ দুটি ফিরিয়েছি, কিন্তু (আমার) হৃদয় আজও অনিবারিত অবস্থায় তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে।]

সখীসহ শকুন্তলা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে রাজা দুষ্যন্তও অনুরূপভাবে বলছেন—

ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাদাত্মানং নিবর্তয়িতুম্। মম হি

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।—১ম অঙ্ক (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

অর্থাৎ শকুন্তলার বিষয় থেকে কোন রকমে মন ফিরাতে পারছিনা। সামনে চলেছি বটে কিন্তু মন পেছনের দিকে ছুটে চলেছে।

শকুন্তলার রূপে রাজা দুষ্যন্ত মুগ্ধ, অনুরক্ত। কিন্তু শকুন্তলাকে আপন করে পাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। বিদূষকের কাছে শকুন্তলার অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা করে তাই হতাশোক্তি করছেন, জানিনা কার ভাগ্যে অখণ্ড পুণ্যের ফল এই মহার্ঘ রত্ন লাভ হবে—

অখণ্ড পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ!

—১ম অঙ্ক (ঐ)

নিম্নোক্ত গাথাটিতেও ঠিক এইভাব, যদিও তা অত্যন্ত স্থূলভাবে, প্রকাশিত হয়েছে মনে হয়—

কস্স করো বহু-পুণ্ণ পুক্খলেক্ক-তরুণো তুহং বিসম্মিহই।

থণ-পরিণাহে মন্মহ-ণিহাণ-কলসে ব্ব পারোহঃ॥—৬।৭৫ (অজ্ঞাত)

[(জানিনা) বহু পুণ্যফলের একমাত্র তরুসদৃশ কোন (সুকৃতী) পুরুষের কর, কামদেবের নিধান কলসতুল্য তোমার বিশাল স্তনদুটির উপর নবপল্লবের ন্যায় স্থান লাভ করবে?]

মদনতাপে তাপিত ব্যক্তির কাছে চাঁদের কিরণ যেন অগ্নিবর্ষী, কুসুমে নির্মিত পঞ্চশরের আঘাত বজ্রতুল্য মনে হয়—

CENTRAL LIBRARY

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মন্মথেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥—৩য় অঙ্ক (ঐ)

দুটি গাথাতেও অনুরূপভাবে চাঁদের কিরণে উষ্ণতা ও কুসুমনির্মিত পঞ্চশরের আঘাতে তীক্ষ্ণ বেদনা মদনসন্তাপিত জন অনুভব করছেন দেখা যায়। গাথা দুটি এই—

অমঅমঅ গঅণ-সেহর রঅণী মুহ-তিলঅ চন্দ দে ছিবসু।
ছিত্তো জোই পিঅঅমো মমং পি তেহিং বিঅ করেহিং ॥—১।১৬ (হাল)

[হে চাঁদ, তুমি অমৃতময়, তুমি আকাশের শেখর ও তুমি রাত্রির মুখতিলকস্বরূপ—তুমি যে (শীতল) কররশ্মিদ্বারা আমার প্রিয়তমকে স্পর্শ করেছ, আমাকেও সেই (অনুরূপ) কররশ্মিদ্বারা স্পর্শ কর।]

কুসুমমআ বি অই-খরা অলদ্ধ-কংসা বি দুসহ-পআবা।
ভিন্দন্তা বি রইঅরা কামস্স সরা বহু-বিঅপ্পা ॥—৪।২৬ (মাধবসেন)

[কামদেবের বাণগুলি নানাপ্রকারের কারণ সেগুলি কুসুমময় হলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, স্পর্শ না করেও দুঃসহপ্রতাপ প্রকাশ করে এবং (হৃদয়) ভেদ করেও রতিসম্পাদক হয়।]

অঙ্গুরীয়ক দেখে শকুন্তলার স্মৃতি মনে পড়লে রাজা দুষ্মন্ত বিদূষকের কাছে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার করুণ মুখচ্ছবিটি স্মরণ করে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করছেন —

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুশঙ্কং ব্যবসিতা মুহুস্তিষ্ঠেত্যুক্ত্বৈবদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রসরকলুষামর্পিতবতী ময়ি ক্রূরে যৎতৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥—৬ষ্ঠ অঙ্ক (ঐ)

প্রত্যাখ্যাত নায়কের করুণ মুখচ্ছবি স্মরণ করে নায়িকা বেদনাতুর, এরূপ ভাব একটি গাথাতে ধ্বনিত দেখতে পাই —

জে সঁমুহাগঅ-বোলন্ত-বলিঅ-পিঅ-পেসিঅচ্ছি-বিচ্ছোহা।
অম্হং তে মঅণ-সরা জণস্স জে হোন্তি তে হোন্তু ॥—৩।১০ (বাহবরাজ)

[অন্যলোকের নিকট যেরূপ হয় হোক, আমাদের নিকট প্রথমে অনুনয়ার্থে আগত এবং পরে (অনুনয়প্রত্যাখ্যানে) ব্যতিক্রান্ত হবার সময়ে বিচলিত হয়ে যখন প্রিয়তম বিক্ষোভিত নয়নে তাকায়, তখন তা মদনশরের ন্যায় তীক্ষ্ণ মনে হয়।]

দুষ্মন্তের চিন্তায় তন্ময় শকুন্তলার বাহ্যজ্ঞানহীন রূপটি প্রিয়ংবদার ভাষণে এবংরূপ ফুটে উঠেছে। প্রিয়ংবদা সখী অনসূয়াকে ডেকে বলছে—'অণসূএ পেক্খ দাব বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ বিঅসহী ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বিণ এসা বিভাবেই কিং উণআ অন্তঅং।'—৪র্থ অঙ্ক (ঐ)

একটি গাথাতেও প্রোষিতপতিকা নায়িকা পতিবিরহে অনুরূপ চিত্রার্পিতবৎ ধ্যানলীন দেখতে পাই—

হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং চিত্তালিহিঅ ব্ব তুহ মুহে দিট্ঠী।
আলিঙ্গণ রহিআইং ণবরং খিজ্জন্তি অঙ্গাইং ॥—৪।৮৪ (অজ্ঞাত)

[(সখী তোমার) হৃদয়ে (তার) হৃদয় সংস্থাপিত রেখেছে, তোমার মুখে তার দৃষ্টি চিত্রাঙ্কিতার ন্যায় সংলগ্ন রয়েছে, কেবল আলিঙ্গনরহিত হয়ে তার অঙ্গগুলি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।]

একটি গাথাতে বলা হয়েছে, গৃহের সকলের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের বিচার করতে যারা জানে, সেই কুলবধূরাই মহিলাপদবাচ্যা, অন্যেরা জরাসদৃশী।

CENTRAL LIBRARY

সম্মসম্মং দুক্খং সুহং চ জাও ঘরস্স জাণন্তি।

তা পুত্তস্স মহিলাও সেসাও জরা মণুস্সাণং ॥—৬।১২ (অজ্ঞাত)

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের একটি শ্লোকে অনুরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥—৪র্থ অঙ্ক

উল্লেখ্য যে বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রম্' গ্রন্থে নির্দেশিত মহিলাদের আচরণবিধি হুবহু কণ্বের উপদেশের সমান। বাৎস্যায়ন মহিলাদের করণীয় সম্পর্কে বলেছেন –

'শ্বশ্রূশ্বশুরপরিচর্যা তৎপারতন্ত্র্যমনুত্তরবাদিতা পরিমিতা প্রচণ্ডালাপকরণমনুচ্চৈর্হাসঃ।

তৎপ্রিয়াপ্রিয়েষু স্বপ্রিয়প্রিয়েষ্বিব বৃত্তিঃ। ভোগেষ্বনুৎসেকঃ। পরিজনে দাক্ষিণ্যম্।'—৩য় অধিকরণ, ১ম অধ্যায়

[শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পরিচর্যা করবে, তাঁদের অধীন হয়ে থাকবে। তাঁদের কথায় উত্তর দেবে না, পরিমিত ও মৃদু আলাপ করবে এবং অনুচ্চ হাসবে। তাঁদের প্রিয়জনের প্রতি নিজ প্রিয়জনের ন্যায় এবং তাঁদের অপ্রিয়জনের প্রতি নিজ অপ্রিয়জনের ন্যায় ব্যবহার করবে। ভোগে গর্বপ্রকাশ করবে না। পরিজনে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করবে।]

দুষ্মন্তের অন্তঃপুরবাসিনী একদা প্রিয়সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিতা, বর্তমানে প্রিয়উপেক্ষিতা হংসপদিকার যে করুণ গানটি নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে সহৃদয় সামাজিকবর্গকে ভাবাকুল করে, সে গানটি এই -

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।

কমল বসইমেত্তণিব্বুও মহুঅর বিসুমরিঅোসি ণং কহং ॥

[অহে মধুকর। অভিনব মধুর লোভে আম্রমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় দেখিয়ে এখন কমলমধুপানে তৃপ্ত হয়ে ওকে একেবারে ভুললে কেন ?]

ঠিক অনুরূপ সুরে প্রিয়জনবঞ্চিত রমণীর হৃদয়বেদনার পরিচয় নিম্নোক্ত গাথাতে ফুটে উঠেছে—

তইআ কঅগ্ঘ মহুঅর ণ রমসি অন্নাসু পুপ্ফ-জাইসু।

বন্ধ-ফল-ভার-গরুইং মালই এণহিং পরিচ্চসি ॥—১।৯২ (বজ্জ)

[হে মধুকর, তখন তুমি মালতীর প্রতি আদরবশতঃ অন্যান্য কুসুমে অনুরাগযুক্ত হও নাই ; এখন বদ্ধফলভারে গুর্বী মালতীকে পরিত্যাগ করছ।]

দুর্বাসার শাপে অভিশপ্ত হয়ে নবপরিণীতা শকুন্তলাকে বিস্মৃত রাজা দুষ্মন্ত হংসপদিকার গান শুনে বলে ওঠেন—আমার তো কোন ইষ্টজন বিরহ নেই, তবে এ গান শুনে উৎকণ্ঠিত হলাম কেন ?—'কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি', (৫ম অঙ্ক)। শকুন্তলাকে বিস্মৃত হলেও একটা অস্পষ্ট ভাবস্মৃতিই এখানে ব্যঞ্জিত যা দুষ্মন্তের অনুভববেদ্য হয়েও স্মরণীভূত হচ্ছে না।

ঠিক অনুরূপভাবের আভাস ক্ষীণগতভাবে এই গাথাটিতে লক্ষণীয়। দূরগত কোন পথিকের বিরহবেদনা-ব্যাকুল গান শুনে প্রোষিতপতিকা রমণীও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে—

অজ্জ সহি কেণ গোসে কং পি মণে বল্লহং ভরন্তেণ।

অম্হং মঅণ সরাহঅ-হিঅঅ-ব্বণ-ফোডণং গীঅং ॥—৪।৮১ (কেশব)

[হে সখি, মনে হয় আজ প্রাতে কে যেন কোন প্রিয়তমকে স্মরণ করে এভাবে গান করছে যাতে আমাদের মদনবাণ দ্বারা আহত হৃদয়ের ব্রণ স্ফুটিত হচ্ছে।]

CENTRAL LIBRARY

মহৎ পুরুষেরা চিরকালই বিনীত থাকেন। সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করলেও কখনো তাঁরা উদ্ধত হন না।

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ নবাম্বুভির্দূর-বিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥[৩] —৫ম অঙ্ক (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

একটি গাথাতেও সুজন ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হয়েছে—

ফল-সংপত্তীঅ সমোণআই তুঙ্গাই ফল-বিপত্তীএ।
হিঅআই সু-পুরিসাণং মহা-তরুণং ব সিহরাণি ॥—৩।৮২ (কুবলয়)

[মহাতরুর শিখরের ন্যায়, সুপুরুষগণের হৃদয় ফলসম্পত্তিতে অত্যন্ত অবনত এবং ফলবিপত্তিতে উন্নত থাকে।]

আর একটি গাথাতেও সৎপুরুষের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে অনুরূপভাবে—

বসণম্মি অণুব্বিগ্গা বিহবম্মি অগব্বিআ ভএ ধীরা।
হোন্তি অহিঅ সহাবা সমেসু বিসমেসু সপ্পুরিসা ॥—৪।৮১ (প্রণাল)

[যারা সৎপুরুষ তারা বিপদে অনুদ্বিগ্ন, সম্পদে অগর্বিত ও ভয়ে ধীর থেকে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় অভিন্ন-স্বভাবই থাকে।]

স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়াকে দেখে বিরহবেদনা ভুলবার প্রয়াস পায় প্রণয়ীজন। কিন্তু বিরহে নিদ্রাই আসে না। স্বপ্নে প্রিয়াকে দেখার চেষ্টা বিফল হয়। তখন প্রণয়ীজন প্রিয়ার ছবিখানি আঁকতে বসে এই কারণে, ছবি দেখে যদি কথঞ্চিৎ হৃদয় বেদনা ভোলা যায়। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য চোখের জলে ছবি আঁকার সব শ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়, ছবি আঁকা হয় না। শকুন্তলার বিরহকাতর রাজা দুষ্মন্ত তাই বলে—

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ। বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥ - ৬ষ্ঠ অঙ্ক

উর্বশীর বিয়োগবিধুর পুরুরবাও ঠিক এই কথাই বলে—

হৃদয়মিদুভিঃ কামস্তাম্রঃ সশল্যমিদং সদা কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়ামসমাপ্যতং মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি ॥—২য় অঙ্ক

ঠিক এই ভাবেরই প্রকাশ দুটি গাথাতে আশ্চর্যসুন্দর ফুটে উঠেছে—

ধন্না তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি।
ণিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥ - ৪।৯৭ (মলয়শেখর)

[যারা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে তারা ধন্য। তার বিরহে আমার ঘুমই আসেনা; কে স্বপ্ন দেখবে?]

তুহ বিরহজ্জাগরও সিবিণে বিণ দেই দংসণ-সুহাইং।
বাহেণ জহালোঅণ-বিণোঅণং সে হঅং তং পি ॥—৫।৮৭ (অজ্ঞাত)

[তোমার বিরহহেতু (সদীর) জাগরণ স্বপ্নেও তাকে তোমার দর্শনসুখ দিচ্ছে না, যদিও বা একটু দূর হতে দেখা, চোখ জলে ভরে ওঠায় তাও হচ্ছে না।]

প্রবাসী প্রিয়ের জন্য নায়িকার দিনগণনার কথা কয়েকটি গাথাতে পাই—

৩ ভর্তৃহরির নীতিশতকে হুবহু এই শ্লোকটি দেখা যায়।

CENTRAL LIBRARY

অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ।
পরম ক্কিঅ দিঅহক্কে কুড্ডো রেহাহিঁ চিত্তলিও ॥—৩।৮ (প্রবরসেন)

[(প্রিয়তম) আজই গিয়েছে, আজই গিয়েছে, আজই গিয়েছে—এইরূপ গণনা করে প্রথম দিনার্ধেই (আমাদের সখী) গৃহভিত্তিকে রেখাপাতে ভরিয়ে তুলেছে।]

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলি গণণাই অই-গআ দিঅহা।
এণ্হিং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ॥—৪।৭ (পালিত)

[হাত পায়ের আঙ্গুল গুণে দিন কাটিয়েছি, এখন আর কি দিয়ে (দিন-গণনা) করব! এই বলে মুগ্ধা নারী রোদন করছে।]

কবি কালিদাস মেঘদূতে বিরহে যক্ষপ্রিয়ার দেহলীকুসুম গণনার কথা বলেছেন—

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।—২।২৬

বিরহে শরীরকৃশতা বোঝাবার জন্য হাতের বলয় খসে পড়ার কথা কয়েকটি গাথাতে আছে—

অবিহব-লক্খণ-বলঅং ঠাণং ণেন্তো পুণো পুণো গলিঅং।
সহি-সখো চ্চিঅ মাণং সিণীঅ বলআরও জাও ॥—৬।৩৯ (অজ্ঞাত)

[অবৈধব্যের লক্ষণচিহ্ন বলয় (বিরহকৃশতার জন্য) খসে পড়লে সখীরা বারবার তা যথাস্থানে পরিয়ে দেয় বলে তারা বলয়-পরিধাপক হয়েছে।]

অই-কোবণা বি সাসূ রুআবিআ গঅ-রঈঅ সোণ্হাএ।
পা অ-পডণো ণ্ণআএ দোসু বি গলি এসু বলএসু ॥—৫।৯৩ (অজ্ঞাত)

[প্রণামের জন্য নীচু হওয়া প্রোষিতভর্তৃকা পুত্রবধূর হাত থেকে বলয় খসে পড়ায় কোপনস্বভাবা শ্বশ্রূও কেঁদেছে।]

কালিদাসেও বিরহকৃশতার ফলে বলয়স্খলনের কথা বহুস্থানে উল্লিখিত আছে—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।—১।২ (মেঘদূত)

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।—৩য় অঙ্ক (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

নেত্রশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি বিরুদ্ধধর্মের আরোপ দ্বারা চমৎকৃতি সৃষ্টির উদাহরণ কালিদাসে বিরল নয়। চোখের ধর্ম দর্শন। কিন্তু কবি সেই চোখে রসনার আস্বাদনের ধর্ম আরোপিত করে চমৎকৃতি সৃষ্টি করেছেন। কালিদাসে এরূপ প্রয়োগ বহু। দিগ্‌দর্শনের জন্য কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হোল—

ঘূর্ণমান-নয়নং স্খলৎকথং স্বেদবিন্দু মদকারণস্মিতম্।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ।—৮।৮০ (কুমারসম্ভব)

[উমার আঘূর্ণিত নেত্র, বিজড়িত কথা, (মুক্তাতুল্য) স্বেদবিন্দু ও মৃদু হাসিভরা মুখখানি চোখ দিয়ে পান করলেন।]

বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনং তম্ আবর্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্ম-পংক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥—২।১৯ (রঘুবংশ)

[বন থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বশিষ্ঠধেনুর পশ্চাদাগত রাজা দিলীপকে (সুদক্ষিণা) নির্নিমেষনেত্রে তৃষাতুরার ন্যায় পান করতে লাগলেন।]

CENTRAL LIBRARY

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি। – ৭।১২ (ঐ)

[তারা কেবল রাঘবকে (অজকে) চোখ দিয়ে পান করতে লাগল, অন্য কোন বিষয়ে মন দিল না।]

একটি গাথাতেও ভাষার এই তির্যকরীতির প্রতি গাথাকারের অভিনিবেশ দেখতে পাই—

সো কো বি গুণাইসও ণ আণিমো মামি কুন্দ-লইআএ।

অচ্ছীহিং চ্চিঅ পাউং অহিলস্সই জেণ ভমরেহিং ॥—৬।৯১ (অজ্ঞাত)

[হে মামি, জানিনা কুন্দলতিকার সেই গুণোৎকর্ষ কতখানি, যে কারণে ভ্রমরেরা (মুখ দ্বারা নয়) কেবল চোখের দ্বারাই পান করতে অভিলাষী হয়েছে।]

অনুরূপভাবে শ্রুতিশক্তিতেও কবি কালিদাস ভিন্নধর্ম আরোপ করেছেন—

আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।—৭।৮৪ (কুমারসম্ভব)

[পুরোহিতের বাক্য যেন ভবানী কান দিয়ে পান করে নিতে লাগলেন]

একটি গাথাতে অনুরূপ ভাষারীতির পরিচয় পাই—

পিজ্জই কণ্ণঞ্জলিহিং জণ-রব-মিলিঅং বি তুজ্ঝ সংলাবং।

দুদ্ধং জল-সংমিলিঅং সা বালা রাঅ-হংসি ব্ব ॥—৭।৭৬ (অজ্ঞাত)

[রাজহংসী যেমন জলমেশানো দুধ হতে (দুধমাত্র) পান করে নেয়, তেমনি সেই কুমারীও অন্যলোকের কথার সঙ্গে মিশানো কেবল তোমার সংলাপটুকু কান দিয়ে পান করে নিচ্ছে।]

উল্লিখিত এই গাথাটির ভাবের সঙ্গে কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকটির ভাবের তুলনা করা চলে—

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষিষ্যতি দ্বিজম্।

হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ ॥—৬ষ্ঠ অঙ্ক (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

[হাঁস যেমন জলটুকু ফেলে দুধটুকু খায়, তেমনই রক্ষণীয় ব্রাহ্মণকে ছেড়ে বধ্য তোকে যে বধ করবে (সেরূপ বাণই জুড়লাম)।]

জল ও দুগ্ধের মিশ্রণ থেকে হংসের কেবলমাত্র দুগ্ধপান, এই ভাব পঞ্চতন্ত্রতেও পাওয়া যায়—

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ ॥

[শব্দশাস্ত্র অনন্ত কিন্তু আয়ু অল্প এবং বাধাবিঘ্নও অনেক। হাঁস যেরূপ জলটুকু এলে কেবল দুধ খায়, সেরূপ শাস্ত্রের সারাংশটুকুই গ্রহণীয়।]

হয়তো এটি প্রচলিত একটি কবিপ্রসিদ্ধি মাত্র। তাই এই সাধর্ম্য কিংবা ঐ দেরই কেউ প্রথমে প্রয়োগ করেছেন, পরে অন্যে তার আশ্রয়ে পুনঃ প্রয়োগ করেছেন।

গাথাসপ্তশতীর ভাব, ভাষা প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে কালিদাসের রচনাংশের সাধর্ম্য বিস্তারিত আলোচনাতে কিছুটা পরিস্ফুট করে তুলতে সক্ষম হয়েছি, আশা করি। এই সাধর্ম্য যে আকস্মিক নয় বরং একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলেই যে ঘটেছে, এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তবে কে কার দ্বারা প্রভাবিত তা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। উভয় কবির যথার্থ কালসীমা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা এবিষয়ে আমাদের অনুমান ও তার কারণ জানিয়েছি, বিদগ্ধ রসিক পাঠক তার যাথার্থ্য বিচার করবেন।

CENTRAL LIBRARY

রামচন্দ্র কবিভারতী ও 'ভক্তিশতকম্'

আশা দাস

রামচন্দ্র কবিভারতীর জন্ম এই বাংলার শ্যামল মাটিতে, গৌড়দেশের বারেন্দ্রভূমির অন্তর্গত বীরবতী গ্রামে। তিনি কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সন্তান। পিতার নাম গণপতি, মাতার নাম দেবী। আরো দুই ভ্রাতাও ছিলেন, নাম হলায়ুধ ও অঙ্গীরস। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ, শ্রুতি, মহাকাব্য, আগম, অলঙ্কার, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং নাটকে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

রামচন্দ্র কবিভারতী ১২২৫—৬০ খৃঃ সিংহলরাজ শ্রীবীর দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সিংহল দ্বীপে গমন করেন।[১] ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'রামচন্দ্র কবিভারতী (১৩শ শতকের মধ্যভাগ) বৌদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া সিংহল যাত্রা করিতে হইয়াছিল।'[২] আরো অনেকেই অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যরূপে এই মত গ্রহণ করার উপযোগী প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। কবি কেন স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। বিশেষতঃ কবি নিজেও এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। সিংহল এইসময়ে বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল। রামাই পণ্ডিত তাঁহার শূন্যপুরাণে সেই গৌরবের দিন স্মরণ করিয়াছেন।[৩] হয়ত কবি বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্যই সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সেইদেশেই তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। এইসময়ে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও অন্যান্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপ ও উপদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসাবাণিজ্য সূত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বণিক ও পণ্ডিতগণও তথায় যাতায়াত করিতেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি যাঁহারা বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তাঁহারা সন্নিকটবর্তী ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ অপেক্ষা সিংহলদ্বীপকেই বেশী প্রামাণ্য মনে করিতেন। এমন কি ব্রহ্মদেশেও যখন বৌদ্ধধর্মের কোনরূপ অবনতির সূচনা দেখা দিত তখন তাঁহারা সিংহলদ্বীপের শরণাপন্ন হইতেন। সিংহলের প্রতি এই অনুরাগ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি দেখা যায়। স্মরণাতীত কাল হইতেই যেন বাংলাদেশের সঙ্গে সিংহলের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। কবি রামচন্দ্রও বৌদ্ধধর্মে বিশেষ অনুরাগ-বশতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার জন্য এই বৌদ্ধতীর্থ সিংহলদ্বীপে আগমন করেন বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রবাসী কবির স্বদেশের প্রতি একান্ত অনুরাগ এই অনুমানকেই স্বীকৃতি জানাইতে সহায়তা করে। স্বদেশকে তিনি কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। নিজের গ্রন্থে তিনি 'গৌড়দেশীয়' কবি বলিয়া সগৌরবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কবি যদি তাঁহার বৌদ্ধধর্মানুরাগের জন্য হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত হইতেন তবে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আরকানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশে যাওয়াই তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর সিংহলে গমন করিবার প্রয়োজন কোথায়?

রামচন্দ্র যখন সিংহলে আগমন করেন তখন সিংহলের দম্বদেনিয়তে শ্রীবীর ২য় পরাক্রমবাহু অধিষ্ঠিত।

---

১ History of Bengal, D. U. p 687-88.

২ বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, ২য় সং, পৃ ২৪৭

৩ 'ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান'। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ ১০৬

CENTRAL LIBRARY

পরাক্রমবাহু ধার্মিক, প্রজারঞ্জক ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে 'কলিকাল সাহিত্য সর্বজ্ঞান পণ্ডিত' উপাধি দান করেন। দক্ষিণ ভারতের চোলদেশ হইতে ভিক্ষু আনয়ন করিয়া তিনি বুদ্ধশাসন রক্ষা করেন। তিনি কয়েকটি বিহার ও পরিবেণ প্রতিষ্ঠা করেন ও শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দান করেন। আরণ্যক মেঘঙ্করের পৌরোহিত্যে রাজা এক মহৎ সঙ্গীতিও আহ্বান করেন। সঙ্ঘকে প্রকৃত বুদ্ধশাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তিনি 'দম্বদেনি কতিকারত' নামে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। পালাবতগল-এ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বিহারে কেবল ধর্মপরায়ণ ও কৃচ্ছ্রতাব্রতী ভিক্ষুরাই বাস করিবার অধিকারী ছিলেন। রাজসভায় কবিভারতীকে লাভ করিয়া পরাক্রমবাহু প্রীত হইলেন এবং যথোচিত অতিথিসৎকারে তাঁহাকে রাজসভায় বরণ করিয়া লইলেন। গুপ্ত রাজসভায় মহাকবি কালিদাস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, শ্রীবীর পরাক্রমবাহুর রাজসভায় সেদিন ভারতীয় কবি রামচন্দ্রও অদ্বিতীয় রত্নের গৌরব অর্জন করেন। এইসময়ে সিংহলে শ্রীরাহুল নামে সর্বশাস্ত্রবিদ এক যতীন্দ্র ছিলেন। শ্রীরাহুল ছিলেন পণ্ডিতশিরোমণি ও গণাচার্য। ছয়টি ভাষায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। 'ষড়ভাষা পরমেশ্বর' ও 'ত্রিপিটক বাগীশ্বরাচার্য' উপাধি দ্বারা তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে বন্দনা করেন। পণ্ডিত রাহুল 'পঞ্জিকাপ্রদীপ', 'পদসাধন' ও 'বুদ্ধিপসাদনী' নামক ব্যাকরণ ও টীকা গ্রন্থ রচনা করেন।[১] সিংহলী ভাষায় তিনি 'কাব্যশেখর' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'সলেলিহিনী সন্দেশ' ও 'পারাপত সন্দেশ' তাঁহার অপর দু'খানি সিংহলী ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্যে পরাক্রমবাহু রাজার দুহিতা উলাকুডা কুমারীর মঙ্গলের জন্য শারিকাপক্ষীর সহায়তায় কল্যাণী নামক স্থানে স্থাপিত বিভীষণদেবের নিকট প্রার্থনামন্ত্র প্রেরণের বিবরণ আছে। কুমারী উলাকুডা দেবী নিষ্ঠাবতী উপাসিকা ছিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের জন্য বিহার নির্মাণ, অন্নদান, শীলরক্ষা ও উপোসথ পালনে তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল।[২]

সিংহলে রামচন্দ্র কবিভারতীর সঙ্গে শ্রীরাহুলের সাক্ষাৎকার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রামচন্দ্র শ্রীরাহুল সঙ্ঘরাজ মহাস্থবিরের জ্ঞান ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রামচন্দ্র অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কবির নিজস্ব চিন্তাধারা এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের অন্তরঙ্গ সাহচর্যের সুযোগে মার্জিত ও রূপান্তরিত হইয়াছিল। বুদ্ধের প্রতি, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল সেই অনুরাগ আরো প্রগাঢ় হইল। তিনি বৌদ্ধ উপাসক হইলেন।

সিংহলে কবিভারতী তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ তিনটির নাম (১) 'ভক্তিশতকম্', (২) 'বৃত্তমালা', (৩) বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা।' এইসময়ে বাঙালী মনীষা নূতন কোন স্বাক্ষর রাখিতে পারে নাই। মৌলিক কাব্য বা নাটক রচনার ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী বিশেষ আলোকপাত করে নাই। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি রামচন্দ্র কবিভারতীর 'ভক্তিশতকম্', 'বৃত্তমালা' এবং 'চতুর্ভুজের 'হর্ষচরিত।' মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রায় ৪০ বৎসর পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। বহু পুঁথি তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোন সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান লাভ করেন নাই, কেবল নকল করা ২। খানি পুঁথি দেখিয়াছেন মাত্র। এই যুগে বাঙালী সমাজ তুর্কী আক্রমণে আপন ঘর সামলাইতে ব্যস্ত, মৌলিক সৃষ্টি সম্ভব ছিল না।

---

১ 'পঞ্জিকাপ্রদীপ' মোগ্গল্লান পালি ব্যাকরণের অন্বয়, 'পদসাধন' মোগ্গল্লান ব্যাকরণের সংক্ষেপ এবং 'বুদ্ধিপসাদিনী' ঐ টীকাগ্রন্থ

২ বৌদ্ধবন্ধু, ১ম সংখ্যা, নবপর্যায়, ১৩২৩

CENTRAL LIBRARY

কবিভারতীর 'বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা' রচনা ১৭৯৯ বুদ্ধাব্দে বা ১২৪৫ খৃঃ সমাপ্ত হয়। সুব্রাহ্মণে নামক কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুরোধে ছন্দশাস্ত্র শিক্ষার্থীদের জন্য এই টীকা রচিত। কবির 'ভক্তিশতকম্'[১] নানা ছন্দে রচিত অষ্টোত্তরশত শ্লোকবিশিষ্ট ধর্ম ও ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি কবি রাজা পরাক্রমবাহুকে অর্পণ করেন। 'ভক্তিশতকম্' পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে রাজা কবিকে 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধিযুক্ত মণিমুক্তাদি সমালঙ্কৃত এক স্বর্ণপট দান করেন। পরে কবি রাজমন্ত্রীর পদেও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত ধর্ম ও ভক্তিমূলক শতশ্লোকে রচিত কাব্যধারায় 'ভক্তিশতক'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এইজাতীয় কবিতা ও কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহাতে কবিহৃদয়ের আকূতি ও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কামনা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা কোথাও চরম স্থান পায় নাই; পাইয়াছে মুক্তির বাণী ও আত্মনিবেদনের ভাবাবেগ। অনুরূপ কবিতার প্রাচীনতম উৎস বৈদিক সূক্ত। বৈদিক সূক্তে জাগতিক প্রেয়বস্তুর আকাঙ্ক্ষা—সমৃদ্ধি, সুখ ও দীর্ঘজীবন কামনা কবিহৃদয়কে মথিত করিয়াছে, মুক্তি কামনা সেখানে গৌণ বস্তু। পরবর্তীযুগে নূতনধরণের স্তোত্র কবিতা রচনার পদ্ধতি দেখা দেয়। মহাকাব্য, পুরাণ ও তন্ত্রে কবিত্বপূর্ণ প্রার্থনা বা স্তোত্র কবিতা পাওয়া যায় যাহার বিষয়বস্তু দেবদেবী বন্দনায় নিবদ্ধ। জৈন ও বৌদ্ধগণও প্রচুর ধর্মীয় স্তোত্র কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাদের দেবদেবী ও গুরুদের বন্দনা করেন। এই কবিতাগুলি কিছুটা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে সৃষ্ট; এইজন্য অধিকাংশই কাব্যরসবঞ্চিত গতানুগতিক রচনা। অবশ্য উচ্চতর কাব্যরসসমৃদ্ধ ও দার্শনিক চিন্তাপূর্ণ রচনাও রহিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত স্তোত্র কবিতার অন্তর্গত দেবদেবীগণ কর্তৃক চণ্ডীস্তব (শ্রীশ্রীচণ্ডী), অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থে বুদ্ধবন্দনা (XXII) কালিদাসের রঘুর (X 16—32) এবং কুমারের (III 4—15) বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্তোত্র এই রচনাসমূহ যেমন গভীর কবিত্বপূর্ণ ও স্বয়ংপ্রভ তেমনি বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল। বিমূর্ত ভাবচিন্তা হইতে স্তোত্র কবিতার উদ্ভব হইলেও কবিরা তাঁহাদের রচনায় শিল্পীমনের স্বাক্ষর রাখিতে পারেন নাই। পরবর্তীযুগে ভক্তিস্তোত্র রচনা সংস্কৃত কাব্যরীতিসিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় রচনায় কবিপ্রতিভার প্রৌঢ়ত্বের সূচনা করিয়াছে। অনুরূপ রচনায় সর্বাগ্রে কবি ভর্তৃহরির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি শতক[২] কাব্য রচনায় অদ্বিতীয় গৌরবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ভর্তৃহরি 'নীতিশতক', 'শৃঙ্গারশতক' ও বৈরাগ্যশতক' এই শতকত্রয়ের রচয়িতা।[৩] শতকত্রয় কবিহৃদয়ের নিগূঢ় গভীর

---

১ লঙ্কাদ্বীপের শ্রীশীলস্কন্ধ মহাস্থবির সম্পাদিত, 'ভক্তিশতকম্' ও 'মনোরমা' নামক তাহার টীকাগ্রন্থ ১৮৯৩ খৃঃ শরচ্চন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিষ্ট টেক্স্ট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভক্তিশতকমের প্রথম ইংরেজী অনুবাদক (J. B T S, i, 1893 PT.2, pp 21—43)। এই গ্রন্থে ও মহাস্থবির সম্পাদিত বৃত্তরত্নাকরের ভূমিকায় এবং অন্যান্য সিংহলী গ্রন্থে কবির জীবনী পাওয়া যায়। শ্রীমৎ আনন্দ কৌশল্যায়নজী 'ভক্তিশতকম্' কাব্যের হিন্দী ভাষানুবাদ করেন। ইহার প্রথম বঙ্গানুবাদক মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটির গদ্যানুবাদ করেন। (বৌদ্ধবন্ধু, ২য় সং, ১৩২৩—৫ম সং, ১৩২৩ ধারাবাহিক।)

২ সংস্কৃত শতক গ্রন্থের মধ্যে 'অমরুশতক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবিমিশ্র প্রেমই এই কাব্যের উপজীব্য। ইহা চূর্ণ কবিতা সমষ্টি।

৩ সুভাষিতে পাওয়া যায় কবি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত একটি ফল উপহার দিয়াছিলেন। কবি-পত্নী সেই ফল তাঁহার প্রণয়ীকে দান করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কবি শতক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন।

CENTRAL LIBRARY

ভাব ও চিন্তাকে ধারণ করিয়াছে। বাণ, ময়ূর ও অনেক বৌদ্ধ ও জৈন কবি এই একই ধরণের কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাববস্তু, বিষয় ও রচনাশৈলী পৃথক ছিল। ময়ূর জৈনকবি, বাণ কনৌজেশ্বর শ্রীহর্ষবর্ধনের রাজসভার কবি। ময়ূর 'ময়ূরাষ্টক' ও 'সূর্যশতক' রচনা করেন। ময়ূরাষ্টকের তিনটি শ্লোক স্রগ্ধরা ছন্দে এবং বাকী পাঁচটি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। 'সূর্যশতক' যদিও কাব্য হিসাবে উচ্চ পর্যায়ের নয় তথাপি বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কবি বাণ 'চণ্ডীশতক' নামে স্রগ্ধরা ছন্দে ১০২টি শ্লোকবিশিষ্ট মহিষমর্দিনী চণ্ডীর একটি স্তব রচনা করেন। এই কাব্যে কবি গৌড়ীয় রীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং শ্লেষের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু সূর্যশতকের তুলনায় গ্রন্থটি নিকৃষ্ট রচনা।[১] জৈন কবি মানতুঙ্গসূরী সংস্কৃতভাষায় 'ভক্তামরস্তোত্র' রচনা করেন।[২] স্তোত্রটি ৪২—৪৮টি শ্লোকে বসন্ততিলক ছন্দে রচিত জৈন ঋষভ বন্দনা। জৈন কবি সিদ্ধসেন দিবাকর রচিত 'কল্যাণমন্দিরও উল্লেখযোগ্য রচনা। এই প্রসঙ্গে মায়াবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্যের ভক্তিমূলক স্তোত্র কবিতা এবং রাজকবি হর্ষবর্ধনের ২৬টি শ্লোকে মালিনী ছন্দে রচিত 'সুপ্রভ' বা 'সুপ্রভাত' নামক প্রভাতকালীন বুদ্ধ-স্তোত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন কবিদের ভক্তিমূলক সংস্কৃত শতকজাতীয় রচনার ধারায় রামচন্দ্রের 'ভক্তিশতকম্' অনন্য স্থান অধিকার করিয়াছে। উল্লেখিত শতকজাতীয় গ্রন্থসমূহে আবেগ ও ভক্তির প্রাবল্য থাকিলেও প্রকাশভঙ্গীতে শিল্পীমনের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। কবিহৃদয়ের বৈরাগ্য ও আত্মনিবেদনের সুরটাই বেশী করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্য রীতিসিদ্ধ পথে গতানুগতিক ধারায় তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন ছন্দসচেতনতাও অত্যন্ত প্রখরভাবে ধরা পড়িয়াছে। অবশ্য ঐকান্তিক ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সুর সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে; আরাধ্য দেবতা বা দেবতুল্য গুরুর বন্দনার আবেগ উচ্ছ্বাসে কবিরা আত্মহারা হইয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের রচনায় কবি-হৃদয়ের আবেগউচ্ছলতা যুক্তিনিষ্ঠা ও সংযমের শীতল বারিতে সিঞ্চিত হইয়াছে। ভক্তিশতকে আত্মনিবেদন আছে, আরাধ্য দেবতার কাছে শরণাগতি আছে; কিন্তু সেই আত্মোৎসর্গ অপ্রমত্ত ও সংযত। ময়ূরের সূর্যশতকে এবং বাণের চণ্ডীশতকে শ্লেষ যমক ও অনুপ্রাসের অবিরল সৌন্দর্য ও চমৎকৃতি আছে, ছন্দের পারিপাট্য ও আড়ম্বর আছে, কবিহৃদয়ের অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যও আছে। তুলনামূলকভাবে রামচন্দ্রের রচনা ততটা সমৃদ্ধ না হইলেও কবিপ্রাণের স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের আলোয় স্বচ্ছ ও স্বয়ংপ্রভ। বুদ্ধভক্তি কবি জীবনের বৃহত্তর সত্তা হইতে অসংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য। তাঁহার বুদ্ধানুরাগ নিজেতেই নিজে বিকশিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ময়ূর, বাণ ও ভর্তৃহরির রচনা কাব্য হিসাবে উচ্চস্তরের কিন্তু ভাবের গভীরতায় ও অকৃত্রিমতায় 'ভক্তিশতকম্' অনন্যসাধারণ।

'ভক্তিশতকম্'-এ যতি ও মধ্যানুপ্রাসের সাহায্যে এক একটি পংক্তিকে স্পষ্টতঃ কখনও দুইভাগে কখনও তিনভাগে ভাগ করিয়া ছন্দে তরঙ্গবৈচিত্র্য আনয়ন করা হইয়াছে। ইহার এক একটি শ্লোক এক একটি পারিজাত

---

১ কিংবদন্তী বাণ ও ময়ূর শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কিত ছিলেন। 'ময়ূরাষ্টক' নামক কাব্যে কবি বাণপত্নীর রূপ বর্ণনা করেন। বাণ-পত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া ময়ূরকে অভিশাপ প্রদান করেন ও কবি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। তখন 'সূর্যশতক' নামক শতশ্লোকে সূর্যবন্দনা রচনা করিয়া কবি রোগমুক্ত হইলেন।

২ জৈনধর্মের মাহাত্ম্য মহারাজ হর্ষবর্ধনের গোচরীভূত করিবার জন্য জৈন আচার্যেরা মানতুঙ্গসূরীকে ৪২টি লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। মানতুঙ্গসূরী শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় 'ভক্তামরস্তোত্র' রচনা করেন এবং কবির দেহ হইতে লৌহ শৃঙ্খল স্খলিত হইয়া পড়ে।

CENTRAL LIBRARY

কুসুম। নিরাসক্তি ও প্রপত্তি, নির্বেদ ও দীনতা এবং ভোগবিরতি ও শরণাগতির কুসুমরাজি ভক্তিসূত্রে গাঁথিয়া তিনি এই অপূর্ব মাল্য রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধকে কবি ভাগবত সত্তার জ্যোতির্লোকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই কাব্যে বুদ্ধ তাঁহার মর্ত্যসীমার ঊর্ধ্বে দেবসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির লিখিয়াছেন—'অর্জুনের ভাসপক্ষীর অক্ষীদলতুল্য ভক্তিবশে তিনি বিশ্বে একমাত্র বুদ্ধকেই দেখিতে পাইয়াছেন, যিনি সর্বগুণে লোকোত্তর ছিলেন। তাঁহার গুণ কথনে তিনি দিগ্‌বিদিক্ দর্শন করেন নাই'।[১] এই উক্তি সর্বাংশে যথার্থ। প্রশ্ন আসে কবির এই অনন্যনিষ্ঠ ভক্তির বেদীমূল কি যুক্তির দ্বারা পরিশ্রুত ছিল ? প্রজ্ঞা ও ভক্তি এই দুই-এর মধ্যে কবি কোনটিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন ? কেবল প্রজ্ঞা মানুষকে শুষ্ক জ্ঞানের বা তত্ত্বালোচনার নীরসতায় নিমগ্ন রাখে, আর ভক্তি ভাবাবেগের কল্পলোকে উপনীত করায়; বিচার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেখানে স্তব্ধ। কেবল জ্ঞান বা কেবল ভক্তি কোনটিই শ্রেয় নয়। কবিভারতী প্রজ্ঞাশাসিত ভক্তির অধিকারী ছিলেন। ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম মিলিত হইলে তাহার ঐশ্বর্য ও গভীরতা কিরূপ বৃদ্ধি পায় তাহারই নিদর্শন কবি তাঁহার কাব্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ১৪ নং শ্লোকে আছে কবি অন্ধ বিশ্বাসে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেন নাই—

ত্রিভুবনমসকৃন্নিরূপ্য যুষ্মাং
পদসরসীরুহরেণুমাশ্রিতোঽহম্।

তিনি স্বর্গমর্ত্য পাতাল বহুবার পরীক্ষা করিয়া শ্রীবুদ্ধের শ্রীপাদরেণু আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার চোখে কোন মোহাঞ্জন ছিল না। ছিল বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন জিজ্ঞাসার সমাধান। কবির উক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট—

দেবঃ শম্ভুর্নবৈরী হরিরপি ন রিপু কেবলী নো সপত্নো।
নোঽদাসীনঃ স্বয়ম্ভূ ন চ পুনরপরে তে পরে বাসবাদ্যাঃ॥
শাস্তা বুদ্ধো ন বন্ধুর্জগতি ন জনকো নৈকগোত্রৈক জাতিঃ।
কিন্ত্বেষাং বীতরাগো ভবতি সকল বিদ্যঃ সুধীভিঃ সসেব্যঃ॥ [২নং]

দেবশম্ভু আমার বৈরী নহেন, হরিও রিপু নহেন, তীর্থঙ্করও শত্রু নহেন। স্বয়ম্ভুর প্রতি আমি উদাসীন নহি, বাসবাদির প্রতিও পর-ভাব নাই। আবার শাস্তা বুদ্ধও আমার বন্ধু নহেন। জনক, একগোত্র বা স্বজাতিও নহেন। যিনি বীতরাগ, যিনি সর্বজ্ঞ তিনিই সুধীজন সেব্য।

বুদ্ধজীবনী 'জাতকনিদানকথা', 'ললিতবিস্তর', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ইত্যাদির চরিত্রচিত্রণ, নির্মাণকৌশল ও ভাষাশিল্প অতি উজ্জ্বল। বুদ্ধ প্রতিমা এই জীবনীসমূহে ভাস্বর রূপ পাইয়াছে। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রচেষ্টা এই পথকে অনুসরণ করে নাই। 'ভক্তিশতকম্' কাব্যে কবি যেন বুদ্ধের একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহার প্রচ্ছদপট নিজে আঁকিয়া দিয়াছেন। ফলে মূল ফটোগ্রাফের ঔজ্জ্বল্য ও গুরুত্ব আরো বাড়িয়া গিয়াছে। কবি-সৃষ্ট এই প্রচ্ছদপটটি জ্ঞান ও ভক্তির, জিজ্ঞাসা ও প্রাপ্তির, প্রজ্ঞা ও আত্মনিবেদনের সামঞ্জস্যে রচিত।

কে তাঁহার আশ্রয়স্থল ? এই প্রসঙ্গে কবির ঋষিসুলভ জীবনবোধ কি অপরূপ আবেগ ও গভীরতার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে—

অনীয়োঽণোঃ ক্লেশাপ্রতিহতমনন্তঞ্চ মহতো।
মহীয়ো মাহাত্ম্যপ্রবিজিতজগদ্ ভূরিকরুণম্॥

১. ভক্তিশতকম্, বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, ১৯৪৫, জাপনী পৃ— /'

CENTRAL LIBRARY

দ্বিবাহুং নির্বাহুং দ্বিপদমপদং সত্রিবদনং।
দ্বিনেত্রং নির্নেত্রং সগুণমগুণং তত্ত্বশরণম্॥ [৬নং শ্লোক]

যিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, মহতো মহীয়ান, পবিত্র, অনন্ত, নিজ মাহাত্ম্যে অনভিহত ক্লেশ, বিজিত জগৎ, মহাকারুণিক, দ্বিবাহু, অবাহু, দ্বিপদ, অপদ, ত্রিবদন, দ্বিনেত্র, নির্নেত্র, সগুণ এবং নির্গুণ তিনিই আমার আশ্রয়। প্রসঙ্গক্রমে কবির উক্তি আরো গভীর অর্থবহ—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো।
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষোন মোহস্তথা॥
যস্যাঽহেতুরনন্তসত্ত্ব সুখদাঽনল্পা কৃপা মাধুরী।
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাং স্তস্মৈ নমস্তুর্মহে॥ [১ নং]

যাঁহার জ্ঞান সমস্ত বিষয়ে পরিব্যাপ্ত, বাক্য অনবদ্য, যাঁহার লোভ দ্বেষ ও মোহ নাই, যাঁহার কৃপামাধুরী অপ্রমেয়, অহেতুকী, সর্বপ্রাণীর সুখদায়িনী—তিনি বুদ্ধও হইতে পারেন, গিরিশও হইতে পারেন; তিনিই ভগবান - তাঁহাকে প্রণাম। এই বুদ্ধ ও উপনিষদের 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' (কঠ ১।২।২০) ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। যে মূলগত আনন্দের ঐশ্বর্যে এই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও শমতাপ্রাপ্তি[১] তাহাই উপনিষদকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, তিনি 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রস। রামচন্দ্রের বুদ্ধের স্বরূপ এই ঔপনিষদিক চিন্তার ঐশ্বর্যে অলঙ্কৃত। তাঁহার বুদ্ধও—

চিদাকারং সূক্ষ্মং বিভু বিশদমাকার রহিতং
নিরীহং নীরূপং নিরবধি কৃপাবীজমজরম্
সমস্তজ্ঞং সর্বোপাধিরহিত মৈশ্বাদমৃতদং॥
জিতানঙ্গৈঃ সেব্যং ভবতু মম তদ্ বস্তু শরণম্॥ [৫ নং]

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, বিশদ, নিরাকার, অতৃষ্ণ, অরূপ, অনন্ত, করুণানিদান, অজর, সমস্তজ্ঞ, সর্বোপাধি-রহিত, শ্রেষ্ঠত্বভূত, অমৃতপদ। যাহা অনঙ্গবিজয়ী বুদ্ধকর্তৃক সেব্য তাহা আমার আশ্রয় হউক।

ইহা আরাধ্য দেবতার প্রতি তদ্গত চিত্ত ঋষি কবির আত্মস্তুতি। 'ভক্তিশতকম্' কাব্যের বুদ্ধ অবয়বে একদিকে ব্রাহ্মণ্যদেবতা 'শিব' যিনি আশুতোষ, প্রসন্ন হাস্যে নিখিল ভয় হরণ, রাজরাজেশ্বর হইয়াও অনাসক্ত স্রষ্টা, যিনি উমাপতি অথচ শান্ত, সমাহিত, স্থিতধী এবং মহাযানীদের করুণাময় বুদ্ধ একীভূতরূপ লাভ করিয়াছে, অন্যদিকে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্ম ও থেরবাদীদের জিনশ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহের বাস্তবায়ন ঘটিয়াছে। যিনি নিত্য, যিনি সর্বগত, যিনি সর্বানুভূত ও সর্ববিভু সেই ব্রহ্মের সঙ্গে বুদ্ধের কোন তফাৎ নাই। আবার যিনি অপ্রমেয় মৈত্রী ও করুণায় বিশ্বের ব্যথাহত মানুষের দিকে অবনত আঁখিপল্লব সেই অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ[২] এবং নীলকণ্ঠ, জগৎ ভিখারী সদাশিব এই ত্রয়ীর বৈশিষ্ট্যে 'ভক্তিশতকম্' কাব্যের বুদ্ধ প্রতিমা বিভূষিত।

কবিভারতীর জীবনে বুদ্ধভক্তি দীপস্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় জ্যোতির্ময় ধ্রুব নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। ভক্তির জন্যই বুদ্ধচরণে তাঁহার আত্মনিবেদন। আত্মসমর্পণেই তাঁহার আত্মার মুক্তিস্নান। এই ভক্তি পরমবস্তু

---

১. আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।—ঐত ৩।৬

২. B. Bhattacharya, 'An Introduction to Buddhist Esoterism', 1932, p 29

CENTRAL LIBRARY

লাভের কৌশলমাত্র নয়, ইহা অন্তর্নিহিত সত্যের নির্ভীক নিশ্চল জ্যোতির্ময় দীপ্তি। এই দীপ্তি তাঁহার চরিত্রে, কাব্যে ও চিন্তায় প্রতিফলিত। 'ভক্তিশতকম্' কাব্যে কবি ভক্তি ও আত্মনিবেদনের স্রোতস্বতীকে পাঠকের হৃদয়ে প্রবাহিত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগে ভগীরথ স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্ত্যের দুয়ারে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মননশীলতার জগতে, অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা ও প্রতীত্যসমুৎপাদ-এর শুষ্ক তত্ত্বালোচনার ঊষর মরু অঞ্চলে নব ভগীরথ রামচন্দ্রও ভক্তিরসের কল্লোলিত প্রাণ-প্রবাহিণীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদের তিনিই প্রথম সার্থক উদ্গাতা—দ্বিতীয় ভগীরথ।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসে 'ভক্তিশতকম্' কাব্যে প্রতিফলিত ভক্তিধর্মের স্বরূপ কি? সংস্কৃত শাস্ত্রবিদেরা বলিয়াছেন—'পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ।' পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। ভক্তিরস ঐশ্বর্যবোধহীন, নির্বিশেষ। ইহাকে শুদ্ধা, কেবলা, অহেতুকীও বলা হইয়াছে। ভারতীয় ভক্তিধর্ম কোন যুগবিশেষের সৃষ্টি নয়। ইহা যুগপরম্পরায় ভারতীয় মনীষীদের অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও চিন্তার একটি ক্রমিক বিকাশের ফলশ্রুতি। ভক্তিধর্ম সম্পর্কে যাঁহারা দীর্ঘকাল পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মতে ইহার মূল আর্যসভ্যতার সুদূর অতীতলোকে প্রোথিত। দীর্ঘ কালপ্রবাহের জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়া ভক্তির ভাবানুভূতি ও চিন্তা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত—বৈদিকসাহিত্যে ভক্তি শব্দের উল্লেখ নাই। তাঁহারা ভক্তিধর্মকে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করেন। 'মুণ্ডক' উপনিষদে ভগবানের অনুগ্রহ লাভই ভক্তের পরম আশ্রয় বলা হইয়াছে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম (৩।২।১)।' সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, যাহাকে তিনি বরণ করেন। তাহার কাছেই এই আত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদে বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্ম—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (২।৭)।' তিনিই প্রেমময়। সে-ই প্রেমময়কে লাভ করিয়া সকলে আনন্দিত হয়। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদেই প্রচলিত অর্থে 'ভক্তি' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ (৬।২৩)।' 'ঔপনিষদিক অধ্যাত্ম চিন্তার পরবর্তী স্তরে দেখা দেয় বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত আসে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে নূতন পদ্ধতিতে নূতন পন্থায় স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সংঘবদ্ধ প্রয়াস দেখা দেয়। এই প্রয়াসের মধ্য দিয়া ভারতীয় ভক্তি ধর্ম সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে আরো দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। 'ভগবদ্গীতা' ভক্তিধর্মের এই সুদৃঢ় পদক্ষেপের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ভগবদ্গীতার কৃষ্ণবাসুদেব উপাসনার মধ্যে ভারতীয় ভক্তিধর্ম সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ লাভ করিয়াছে। গীতায় [১১শ অধ্যায়] কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পূর্ব মনোভাবে পরিবর্তন আসিল। সখ্যভাবের পরিবর্তে তাঁহার অন্তরে ভক্তিভাব জাগ্রত হইল। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা খুব অসমীচীন নয় যে—বেদে ভক্তিধর্মের অঙ্কুরোদ্গম, উপনিষদে ক্রমবিকাশ এবং শ্রীমদভগবদ্গীতায় কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণতা লাভ। আর এই ভক্তিরসসমুদ্রে প্রস্ফুটিত শতদল হইতেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

ভক্ত সাধকেরা বলেন ধন, সম্পদ, বিদ্যা, এমন কি স্বর্গ ও মোক্ষ কামনাও ভক্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্ম হইতেও ভক্তি উত্তম। গীতায় চারিশ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠস্থান পাইয়াছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভক্তির নবলক্ষণ সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

উপনিষদে, গীতায় ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যাখ্যাত ভক্তিরসধারা 'ভক্তিশতকম্' গ্রন্থকে কতখানি অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা বিচার্য। উপনিষদে একটা নির্বিশেষ ঈশ্বরপ্রীতি এবং নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপাসক এখানে ব্রহ্মের সঙ্গে অদ্বৈত সম্পর্কে যুক্ত—তিনি নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় আত্মস্থ। এই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'উপনিষদের ভক্তি বিশেষ কোনো নামধারী দেবতা বা দেবোপম মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় নাই। তাহা ছিল নির্বিশেষ ঈশ্বর প্রীতি, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা, তাহা ভক্ত ও আরাধ্য দেবতার কোনো বিশেষ সম্পর্ক নহে। ঔপনিষদিক ভক্তিকে তাই বলা যাইতে পারে অদ্বৈত ভক্তি বা নির্গুণবাদীর ভক্তি।'[১] শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও গীতায় দেবতা বা দেবোপম মনুষ্যের যুগ যুগ সম্ভাবনার[২] নিশ্চিত প্রত্যয় ঘোষিত হইয়াছে। 'ভক্তিশতকম্' কাব্যে কবি ভক্তির এই দ্বিমুখী ধারাকে একাই ধারণ করিয়াছেন। একদিকে উপনিষদের অদ্বৈত ভক্তি, অপরদিকে কৃষ্ণ-বাসুদেব ভক্তির পরম স্বীকৃতি—'যৎকরোষি যদশ্নাসি' এবং 'সর্বকর্মফল ত্যাগং ততঃ কুরু' রামচন্দ্রের কাব্যে পরম সমন্বিতরূপ লাভ করিয়াছে।

রামচন্দ্র একাধারে জ্ঞানী, দার্শনিক ও ভাবুক কবি ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের বিষয় তিনি গভীর একাগ্রতার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার অধীত বিষয় কেবল বুদ্ধির কোঠায় স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জে পর্যবসিত হয় নাই। পাণ্ডিত্যের উপাদানকে তিনি কবিত্বের জারক রসে রসায়িত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ দুইটি ব্যাকরণ ও টীকা, কিন্তু তৃতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তৃতীয় গ্রন্থ 'ভক্তিশতকম্'-এর কঙ্কালটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের, আর ইহার প্রাণসঞ্জীবনী মন্ত্র ভক্তির। এ যেন তত্ত্ব, কাব্য ও ভক্তির ত্রিমুখী সঙ্গম। তবে কাব্যে তিনি তাত্ত্বিক নহেন, তত্ত্বেও কবি। এই বিচিত্র কাব্যগ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যে এক বিস্ময়ের বস্তু। অপূর্ব লিপিকুশলতায় কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভক্তিমূলক সাহিত্যে নূতন চিন্তা, নূতন উপমার ধারা তিনি প্রবাহিত করিয়াছেন। বুদ্ধের দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনা যেন অপূর্ব উপমার একখানি মণিমালা—

সর্বজ্ঞ বক্ত্র সরসীরুহরাজহংসং
কুন্দেন্দুসুন্দররুচিং সুরবৃন্দবন্দ্যম্।
সদ্ধর্মচক্র সহজং জনপারিজাতং
শ্রীদন্তধাতুমমলং প্রণমামি ভক্ত্যা॥ (১৯ নং)

সর্বজ্ঞ বুদ্ধের মুখমণ্ডলে রাজহংসতুল্য চন্দ্রকিরণ-শুভ্র রুচির কুন্দ দন্তশোভা পাইত যাহা সুরবৃন্দ বন্দনীয়, জনসাধারণের কল্পবৃক্ষসদৃশ; সেই অমল দন্তধাতুকে প্রণাম।

অন্যত্র—।

মহেন্দ্রনবচাপবৎ কনকপর্বতে সর্বতঃ
সদা তব মনোহরং স্ফুরতি সুপ্রভামণ্ডলম্। [৯০ নং]

---

১. ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য, ১৯৬৪, পৃ ১৩।

২. পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

CENTRAL LIBRARY

কনকপর্বতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নব ইন্দ্রধনুর ন্যায় তোমার শরীরে সর্বদা মনোহর সুপ্রভামণ্ডল বিরাজমান।

বুদ্ধের রূপগুণ ও কর্মের প্রশংসা করা সামান্য কবির পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? কবির বর্ণনা এখানে কান্তমণির সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত করিয়াছে—

তব গুণ কথনে তু যঃ প্রসন্নঃ
তমনুবিশন্তি মুনে গুণাস্ত্বদীয়াঃ।
উদয়তি শশিনি প্রসন্নমিন্দু—
নলমিব তব কিরণাবলী তুষারঃ॥ [৭১ নং]

হে মুনে! আপনার গুণ কথনে যাহার প্রসন্নতা আসে সেই ব্যক্তিতে আপনার গুণ অনুপ্রবেশ করে, যেমন চন্দ্রোদয়ে প্রসন্নচন্দ্র কান্তমণিতে চন্দ্রকিরণ শিশিরবিন্দুরূপে ধৃত হয়।

স্থানে স্থানে ইন্দ্রিয়বেদনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও মনস্বিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে—

নির্মজত সুরসুন্দরীকুচচলন্নির্মন্দ মন্দাকিনী—
ফেনক্ষীরসমুদ্রকৈরবসখী সদকীর্তি লক্ষ্মীস্তব। [৯৭ নং]

জলক্রীড়ারত সুরসুন্দরীদের কুচ সঞ্চালনে সমুত্থিত আকাশ গঙ্গার ফেন, ক্ষীর সমুদ্র এবং কুমুদের সখী তোমার সৎকীর্তি লক্ষ্মী।

কল্পনার আনন্দ, রসের উচ্ছ্বাস এই বর্ণনাসমূহে অন্তহীন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। মন ও বুদ্ধি, কল্পনা ও অনুভূতি তাঁহার বর্ণনায়, উপমা চয়নে ও চিত্রকল্প গঠনে একযোগে সহায়তা করিয়াছে। এই বর্ণনায় কবি শিশুর ন্যায় সরলচিত্ত, অনাড়ম্বর ও বাহুল্য বর্জিত—

বিদধতি ভয়মিন্দ্রিয়ানি ভূয়ঃ।
বিষয়বিষ গ্রহণেষু দোষ দৃষ্ট্যা
নহি সুবিদিত ভাবিদাহ দোষঃ
শিশুরপি দীপশিখাগ্রসংগ্রহী স্যাৎ। [৮২ নং]

বিষয় বিষগ্রহণে দোষ দেখিয়া, আমার ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় ভীত হইয়াছে। পুনরপি দগ্ধ হইবার ভয়ে শিশুও প্রদীপ শিখা গ্রহণ করে না।

বুদ্ধদেবের লোচন লোভন রূপ, তাঁহার শ্রুতিসুখকর বাণী, সংসার দুঃখ বিমোচন করুণা, তাঁহার উপশান্ত বেশ, জগৎ প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞতা, সাম্রাজ্যভোগে অসীম বৈরাগ্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই বর্ণনায় কবির উপলব্ধি যত গভীর, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী ততই সহজ ও সরল—

রূপং লোচনলোভং শ্রবণয়োরানন্দসন্দোহদা
বাণীবিশ্ববিমোক্ষজ্ঞকৃত্তব কৃপা বেশোঽতি শান্তস্তব।
পাণ্ডিত্যং প্রথিতং জগৎসু ভগবন্ সর্বজ্ঞনাম্নৈব তে
সাম্রাজ্যস্য চ যৌবনে নিরসনে বৈরাগ্যসীমাস্ফুটম্॥ [৯৪ নং]

হে ভগবন! তোমার রূপ নয়ন লোভন, বাণী শ্রবণারামকর, শান্তিময় করুণা বিশ্ববিমোহন, তোমার সর্বজ্ঞ নাম জগতে তোমার পাণ্ডিত্য প্রচার করিতেছে এবং যৌবনে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ বৈরাগ্যের সীমা নির্দেশ করিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

মহাযান সাহিত্যে বর্ণিত বুদ্ধদেবের করুণাঘন বৈদ্যরাজরূপ রামচন্দ্রের কবি-প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। এই মহাপ্রেমিক পুরুষের অর্চনা কি কখনও কেবল নীরস তত্ত্বদ্বারা বা জ্ঞানের শুষ্ক কাঠিন্যের দ্বারা সম্ভব? কবি বিশ্বাস করেন—

জগদুপকৃতিরেব বুদ্ধপূজা
তবপকৃতিস্তব লোকনাথ পীড়া [৩০নং]

পরের উপকার করাই তাঁহার পূজা করা। সুতরাং যে ব্যক্তি পরের অপকারক, পরহিতৈষণা যাহার ব্রত নহে, তিনি তাঁহাকে পীড়া দান করে।

জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে
গদিতুমহং তব পাদপদ্মভক্তঃ [৩৩নং]

আমি জগতের অপকারক, এইজন্য আপনার চরণকমলের ভক্ত বলিতে লজ্জা বোধ করি।

উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে কবি যেন একটা শান্ত সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তিনি বৈষ্ণবদের মতই সমর্পিত প্রাণ।[১] আর সেই প্রাণও তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। আত্মসমর্পণে যে প্রশান্ত আনন্দ তাহার আকর্ষণ কবির কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত। সেই শান্ত রসাচ্ছাদিত ঐশ্বরিক প্রীতির স্থায়ী ভাবের মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও প্রায় একই ভাষায় তাঁহার বাঞ্ছিত দেবতার কাছে বলিয়াছেন—

গণইতে দোষ গুণলেস না পাওবি।
জব তুহুঁ করবি বিচার॥
তুহুঁ জগন্নাথ জগত কহায়সি।
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।[২]

রস ও ভাবের সঙ্গে ভক্তি ও শরণাগতির অপূর্ব সমন্বয়ে সঞ্জাত এক বিচিত্র সৌরভ সঞ্চার করিয়া কবি তাঁহার কাব্যকে চিরকালীন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষিত জীবন-দেবতার সঙ্গে কবি তাঁহার এক মুহূর্তের বিচ্ছেদও কল্পনা করিতে পারেন নাই। চিন্তায়-ভাবনায়, বাক্যে-কাজে, জাগরণে-নিদ্রায় সর্বসময় কবি তাঁহার আরাধ্য দেবতার একান্ত সাহচর্যের পুণ্য সৌরভের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রাখিতে চাহেন। কিন্তু নিদ্রার জগতে আছে বিস্মরণ। সেই বিস্মরণের মধ্যেও কবি জানেন পরম শ্রেয় ও প্রেয় তাঁহার একান্ত কাছেই আছেন—

স্বপিমি নিশি নিধায় যদ্বদি ত্বাং
ন মম বিরহস্তয়াত এব। [৪৬ নং]

নিশিতে শয়নকালে তোমাকে রাখিয়াই শয়ন করি। এই জন্য তোমার সঙ্গে আমার বিয়োগ কোথায়?

অন্যত্র—

মম তদিহ দিনং হি দুর্দিনং স্যা
দসিতঘন স্থগিতং ন দুর্দিনং মে।
যদমৃত-সম-বুদ্ধ-রত্ন-নাম
স্মৃতিরহিতং দিনমস্তু মা তদস্তু॥ [৪৭ নং]

---

১. ডঃ সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫৩, পৃ ৩৩-৩৪।

২. বিদ্যাপতি, মিত্র ও মজুমদার সম্পাদিত, ১৩৫৯, সং ৭৬৫, পৃ ৪৭৬

CENTRAL LIBRARY

কাল মেঘাবৃত দিবস আমার পক্ষে দুর্দিন নয়। যেদিন আমি অমৃততুল্য বুদ্ধরত্নের নামানুসরণ ত্যাগ করিব সেদিন আমার ঘোর দুর্দিন। আমার সে দিন না হউক।

এই পংক্তি কয়টি বুদ্ধানুগতো ক্ষমাস্থিত। ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ও দুর্মূল্যতায় তাহা চিরদিন সঞ্চয় করিয়া রাখিবার মত ঐশ্বর্য। বৈষ্ণব কবিও তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে মুহূর্তমাত্রের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন নাই। মহাকবি চণ্ডীদাস আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নির্ভরতা সমুচ্ছ্বসিত বন্দনাগীতি রচনা করিয়াছেন—

শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটি
সকলি করিবে ক্ষমা।[১]

জ্ঞানদাসও প্রায় একই ভাষায় মিনতি ভরা কণ্ঠে প্রাণের দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া জীবনে অনবদ্য সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছেন—

কি মোর ঘর দুয়ারের কাজ
লাজ করিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে লাখ পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি

* * *

সে রাঙ্গা চরণে আপনা বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া।[২]

বৈষ্ণব কবির প্রেমে আছে অতলস্পর্শ মহাসিন্ধুর দুর্নিবার প্লাবনের বিপুল জলোচ্ছ্বাস, আর কবিভারতীর আত্ম-নিবেদনে আছে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার প্রশান্তি।

রামচন্দ্র কোন কবিগোষ্ঠীর অন্তর্গত নহেন। তিনি একটি স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যায়। ভাষায় ও বক্তব্যে, উপমা ও চিত্রকল্পে এবং সর্বোপরি নিজস্ব দার্শনিকতায় রামচন্দ্র একক ও অনন্য। পরবর্তী বাঙালী কবি জয়দেবেও সমজাতীয় চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভক্তিশতকমে—

যত্র ছাগতুরঙ্গমারণবিধির্বেদে তং নিন্দসি
প্রেম্না প্রাণভৃতামতঃ সকরুণস্ত্বত্তো মহান্নাপরঃ। [৯৬ নং]

যে বেদে ছাগ অশ্বাদি হত্যার বিধি আছে তুমি সে বেদকে নিন্দা কর। তুমি অদ্বিতীয় করুণাময়। সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রী বশতঃ যে করুণা তুমি প্রদর্শন কর অপর কাহারো সেরূপ করুণা নাই।

---

১. বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃ ১৪৫।

২. ঐ ৩য়, পৃ ৫৩

CENTRAL LIBRARY

গীতগোবিন্দে—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্॥
কেশব, ধৃত বুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

মহাপরিনির্বাণের সার্ধসহস্রাধিক বর্ষকালের মধ্যে কোন অবৌদ্ধ কবি এমন বুদ্ধ-স্তোত্র রচনা করেন নাই।

'ভক্তিশতকম্' আরাধ্য দেবতার প্রতি তদ্গতচিত্ত কবির প্রশস্তি রচনা। ইহা বুদ্ধের জীবনী নয়, বৌদ্ধ তত্ত্বমূলক গ্রন্থও নয়—বুদ্ধ-বন্দনা। কবিচিত্তের আত্মনিবেদনের পটভূমিকায় ভক্তি ও অনুরাগের রঙে রঞ্জিত তুলির স্পর্শে রচিত একটি অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি। এই কাব্যে বুদ্ধের জীবনী ও তত্ত্বের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়াছে। কিন্তু রসোত্তীর্ণ কাব্যের অভ্যন্তরে বাস্তব চরিত্র বা তত্ত্ব কোনটিই প্রধান হইয়া উঠে নাই। বুদ্ধের ভাবঘন ধ্যানমূর্তিই প্রতিভাদীপ্ত কবিমানসে অনবদ্য শুভ্রতায় শতদলের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

কবিতার অনুবাদ

অরুণকুমার ঘোষ

ইয়োর্গে লুই বোর্হেসের কটাক্ষ-তির্যক 'পিয়ের মেনার্দ, কুইকসোটের রচয়িতা' কাহিনীটি মনে পড়ছে। সেখানে, লেখক পিয়ের মেনার্দের শ্লাঘনীয় অভিপ্রায় ছিল, এমন কয়েক পৃষ্ঠা লেখা—মিগুয়েল দা সেরভান্তিসের ডন কুইকসোটের সঙ্গে—প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি পংক্তিতে যা অভিন্ন হবে। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসে দাঁড়াল কি শেষ পর্যন্ত? বোর্হেসের সূক্ষ্ম দ্যোতনাময় বিবৃতিতে—"সেরভান্তিস এবং মেনার্দের রচনা শব্দগত দিক দিয়ে একেবারে অভিন্ন, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ (তাঁর নিন্দুকরা বলবেন, অধিকতর দ্ব্যর্থক কিন্তু দ্ব্যর্থকতাই সমৃদ্ধি)।" নিশ্চয়ই অসংগত হবে না যদি এই কাহিনীটি থেকে একটি অর্থ নিষ্কাশন করে নিই! কোনো সৃষ্টিমূলক রচনাকে প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি পংক্তি ধরে অনুসরণ করে গেলেও তার যথার্থ প্রতিকলন কখনই সম্ভব হয় না। আর তাই—সৃষ্টিমূলক রচনার অনুবাদমাত্রই কঠিন।

কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে এই কঠিনতা অনেক বেড়ে যায়, সেখানে বাধা আরও দুর্লঙ্ঘ্য, প্রয়াস আরও দুঃসাধ্য, ব্যর্থতার আশঙ্কা আরও প্রবল বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য, জেমস জয়েসের জটিল শব্দ-সঙ্গীতময় 'ইউলিসিস' বা ইওনেস্কোর গূঢ়ার্থদ্যোতক 'উদ্ভট' নাট্যসৃষ্টিকে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য করতে হবে। কখনও কখনও একটি ভাষার গহন মর্মস্থল থেকে যেন উঠে আসে একটি কবিতা। সেই ভাষার ধারণশক্তির গভীরতম তল যেন সে ছুঁয়ে যায়। কবির গভীর-সঞ্চারী, জটিল, রহস্যময়, ভাবনা-কল্পনার শব্দ-নৈঃশব্দ্য আলো-অন্ধকারকে ধারণ করে রূপ পায় বিচিত্র ধ্বনিময় ব্যঙ্গ্যার্থ-স্ফুরিত শব্দাবলী বা শব্দবন্ধসমূহ তথা একটি সমগ্র কবিতার ভাষা-প্রতিমা। 'সেভেন টাইপস অফ অ্যামবিগুইটি'র লেখক উইলিয়ম এম্পসন তো মনে করেন, সকল সার্থক কবিতাই অ্যামবিগুয়াস বা গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক। কবিতার একেবারে মূল উপাদানের মধ্যে রয়েছে এই অ্যামবিগুইটির কৌশল। এম্পসন অ্যামবিগুইটি কথাটাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে তার দ্বারা বুঝিয়েছেন, যে-কোনো শব্দগত সূক্ষ্মতার স্তরকে, তা সে যত সামান্যই হোক, যা একই ভাষারচিত অংশের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রতিক্রিয়ার অবকাশ রচনা করে। যে নামই দিই, এই সংগোপন দ্যোতনার জন্যই কবিতার অনুবাদককে ঝুঁকি নিতে হয় সবচেয়ে বেশী, যেহেতু খুব অল্পেই মূলের ভাবগভীরতার হানি, তাৎপর্যের বিকৃতি বা রূপসুষমার অপচয় ঘটে যাবার ভয় থাকে।

বাস্তবিক, কবিতার অনুবাদ যে দারুণ দুরূহ এমন কি অসম্ভব, অনুবাদ-প্রয়াসের পরে মূল কবিতাটি যে প্রায় অস্পৃষ্ট ও অসংক্রমিত থেকেই যায়—এ ধারণায় বহু প্রাজ্ঞ কণ্ঠ বহুকাল ধরেই মুখর হয়েছে। 'অনুবাদকরা বিশ্বাসঘাতক', 'রূপান্তরমাত্রই বিকৃতি'—এ ধরণের প্রবচন তো বহুশ্রুত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায়, শুরুতেই লেখেন—'আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব।' এই মতেরই অতিশয়িত অভিব্যক্তি দেখি ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকের ফরাসী কবি জ্যা বেলে আর একালের মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্টের চিন্তায়। তাঁরা কবিতার এই রকম নেতিবোধক সংজ্ঞাও ভেবেছেন—যা অনুবাদ্য নয় তাই কবিতা। ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার হতে প্রকাশিত এজরা পাউণ্ডের 'নির্বাচিত কবিতাবলী'-র ভূমিকায় এলিয়টও জানান: তাঁর অনুমান, প্রত্যেক যুগের অনুবাদ-সম্পর্কিত এই একই বিভ্রান্তি ছিল ও থাকবে যে,

CENTRAL LIBRARY

যখন একজন বিদেশী কবিকে আমাদের নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব কালের বাক্‌রীতিতে সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়, তখনই আমরা বিশ্বাস করে নিই যে এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রকৃতই আমরা মূলকে পেলাম এবং এলিঅট তাই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে আগামী তিনশো বছরের মধ্যে পাউণ্ডের 'ক্যাথে' ন্যায্যতাই অনুবাদের চেয়ে বরং বিংশ শতকীয় কবিতার একটি আশ্চর্য নমুনারূপেই কথিত হবে।

এ সত্য অনস্বীকার্য যে কবিতার অনুবাদ অসাধারণ প্রযত্ন ও ক্ষমতাসাধ্য। একথাও অবশ্যমান্য যে অনুবাদক নিজে যত বড়োই কবি হোন, অনুবাদে মূল কবিতার উৎকর্ষসাধনে হয়তো তিনি সক্ষম হবেন, কিন্তু মূল কবিতার সঠিক প্রতিবিম্ব তাঁর রচনায় কখনই ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। শ্রীঅরবিন্দ তাই মনে করেছেন যে সম্পূর্ণ সার্থক অনুবাদ সীমায়িত কালের মধ্যে অসীমতাকে বন্দী করার প্রয়াসের মতোই প্রতারক (লেটারস অফ শ্রীঅরবিন্দ অন পোয়েট্রি এ্যাণ্ড লিটারেচার—থার্ড সিরিজ)। ভাষান্তরের কাজে প্রথমেই যে বাধার কথা মনে আসে তা হল এক ভাষার অনেক শব্দেরই যথাযথ প্রতিশব্দ অপরভাষায় মেলে না। আবার অনেক সময়, প্রতিশব্দ যদি বা পাওয়া যায়, মূল ভাষার শব্দটির মতো তা উজ্জ্বল, বর্ণচ্ছুরিত বা প্রাণময় হয়তো হয় না। যেহেতু দুই ভিন্নভাষার শব্দের পেছনে দুই ভিন্ন জাতিগত অভিজ্ঞতা কাজ করে যায়, তাই পাঠকমনে তারা সমান আলোড়ন তুলতে বা একই ধরণের প্রতিক্রিয়া জাগাতেও পারে না। অবশ্য সবসময়েই যে এমনটি হয় তা নয়। কিন্তু তাতেও আশ্বস্ত হবার কোনোই কারণ নেই, যেহেতু কবিতার অনুবাদকার্যের দুরূহতা ও বিঘ্নসংকুলতার উৎপত্তি একেবারে কবিতার মৌল স্বভাব থেকেই। অনুবাদ করতে গেলেই মূল কবিতার ভাব ও রূপের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে, অথচ সার্থক কবিতা যেহেতু ভাব ও রূপ, বাক্ ও অর্থের অচ্ছেদ্যযোগে নিষ্পন্ন হয়, অনুবাদে তাই মূলের অখণ্ড রসাবেদন পুরোপুরি কখনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। কোলরিজের অনুধাবন স্মরণীয়—'শব্দসমূহের শ্রেষ্ঠ বিন্যাস গদ্য পদ-বাচ্য আর কাব্যের উদ্ভব শ্রেষ্ঠ শব্দাবলীর পরম সমন্বয়ে।' (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাবান্তর) যথার্থ কবিতার প্রতিটি শব্দই তাই ঈপ্সিত ভাব প্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য, সেখানে অর্থের বদল না ঘটিয়ে শব্দের বদল কখনই ঘটানো যায় না। এমন কি কোন শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করলেও মূলের রসাবেদন অভিন্ন থাকে না। একটি বিশেষ শব্দের সঙ্গে এই অর্থ ছাড়াও জড়িয়ে থাকে আরও কিছু, আবেগ-অনুভূতি, অভিপ্রায়, ধ্বনিস্পন্দন। একটি চরণ, একটি স্তবক, একটি কবিতার সামগ্রিক ভাবরূপ নির্মাণে প্রায়শই অপরিহার্য ভূমিকা থাকে এই একটি শব্দের। ধ্বনি অনুভূতি, অভিপ্রায়, চরণ, স্তবক বা সমগ্র কবিতার অখণ্ড ভাবরূপ থেকে বিচ্যুত একটি শব্দ তাই ভাষান্তরে মূলের মতো স্পন্দন জাগাতে পারে না। একটি কবিতার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে থাকে কবির মানসগঠনের স্বাতন্ত্র্য, তাঁর অবাবহিত দেশকালের আবেষ্টন, তাঁর জাতিগত জীবনপ্রবাহ, সংস্কার, সংস্কৃতি, যে ভাষায় কবি কবিতা রচেছেন তার বিশেষ স্বভাব, বাগ্‌ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। অনুবাদ্য কবিতার এইসব বৈশিষ্ট্য ভাষান্তরে স্বভাবতই অটুট থাকতে পারে না, কমবেশী তা হারিয়ে যায়ই। আর একটা কথা, একটি বিশেষ ব্যক্তিমনের চিন্তা ও আবেগ আর একটি ভিন্ন ব্যক্তিমনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে তা যে প্রায় নতুন জন্ম পরিগ্রহ করবে, সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্লীন প্রকৃতির পক্ষে এটাই তো সঙ্গত ও স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত 'ভূমিকায়' তাই এলিঅট লেখেন যে পাউণ্ডের 'ক্যাথে'র মতো ভালো অনুবাদ নিছক অনুবাদ নয়, কারণ অনুবাদক সেখানে মূলকে নিজের মধ্য দিয়ে ধরে দিচ্ছেন এবং মূলের মধ্য দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করছেন।

সমস্ত প্রকার কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রেই কিন্তু অনুবাদককে একইপ্রকার বা সমপরিমাণ অসুবিধা বা ব্যাঘাতের সম্মুখীন হতে হয় না। এলিঅট তাঁর 'কবিতার তিনটি স্বর' নিবন্ধে কবিতার যে তিনটি স্বতন্ত্র স্বরের কথা

CENTRAL LIBRARY

জানিয়েছেন, অনুবাদে তার প্রথমটির ক্ষেত্রেই সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনিষ্ট সম্ভাবনা সে তুলনায় অনেক কম। গীতিকবিতা—যেখানে কবির আত্মগত আবেগ-অনুভূতির উচ্চারণ গাঢ় রক্ত রেখা এঁকে দিয়ে যায়, তার দ্যোতনা সাধারণভাবে যেহেতু—আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, নীতিমূলক বা প্রচারধর্মী কবিতা, অথবা ব্রাউনীং-এর 'ক্যালিবান আপন্ সেটিবস'-এর মতো নাটকীয় মনোকথন, যাতে একটি নির্দিষ্ট কা'হনী-সূত্র বা চরিত্রের রেখাংকন বা সুস্পষ্ট বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় এবং কাব্যনাট্য, যাতে কবিতাকে রচয়িতার ব্যক্তিগত আবেগের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে সরিয়ে এনে স্থাপন করতে হয় চরিত্র ও ঘটনার ক্রিয়াচঞ্চল দ্বন্দ্বমুখর বস্তুময়তার মধ্যে—এদের চেয়ে সংগোপিত, ইশারাময়, অনচ্ছ ও গহন, তাই তার অনুবাদে হারিয়ে যায় মূলের অনেক বেশী ঐশ্বর্য। বলা বাহুল্য 'গীতিকবিতা' কথাটাকে এখানে খুব বিস্তৃত অর্থেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর আধুনিক কবিতা সাধারণভাবেই যেহেতু ক্রমশ অধিক ব্যক্তিগত ও নানা ব্যাখ্যা সম্ভব হয়ে উঠছে, তাতে ব্যাকরণগত অর্থ, অভ্যস্ত অন্বয় ক্রমশই অধিকপরিমাণে অতিক্রান্ত হচ্ছে, দেখা দিচ্ছে কবির ব্যক্তিজীবনের নানা গূঢ় অনুষঙ্গ ও উল্লেখ, অবচেতন বা স্বপ্নলোকের আলো আঁধারি, তাই তার অনুবাদে নিজস্ব ভাষ্য বা ব্যাখ্যার ওপর অধিক নির্ভর করে অনুবাদককে অনেক বেশী অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে হচ্ছে। তাতে কাব্যানুবাদের পথ ক্রমশই হয়ে উঠছে বিঘ্নসংকুল ও দুর্গম—কোনো একটি অনুবাদের সাফল্য-অসাফল্য বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এ সব প্রতিবন্ধ বা দুরূহতা সত্ত্বেও কাব্যানুবাদের উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তাতে ভাবনার নূতন চিন্তাপদ্ধতি সংযোজনে এবং তার দ্যোতনাময়তা ও প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাব্যানুবাদ বিশেষ সহায়ক হতে পারে। আর অনুবাদক যদি 'নজে হন সৃষ্টিক্ষম সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কবি তাহলে অনুবাদচর্চার মধ্য দিয়ে কবিতার ভাববস্তু ও রূপকল্প সম্পর্কে স্বকীয় চৈতন্যের ঋদ্ধিসাধনে, আপন কাব্যধারায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণের অভিনব বৈচিত্র্য সংযোজনে তিনি সফল হতে পারেন। 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাই স্বীকার করেন "এমন ভাবা ভুল যে উদ্ভাবনাশক্তির অভাববশতই আমি এই পরকীয় লেখাগুলোর পিছনে এত সময় কাটাতে পেরেছি। কারণ উক্ত পরিশ্রম আসলে অপচয় নয়; এবং অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থাক না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। অন্ততপক্ষে আমাকে অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে সুযোগ দিয়েছে, নিজের বক্তব্যে তার অর্ধেকও মেলে নি; এবং সেই জন্যে যে উদ্যমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে।" এই সূত্রে বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তিও মনে পড়ে যায়—"আমি অন্তত অনুবাদকে দুধের বদলে ঘোল ব'লে ভাবতে পারি না; আমার মনে হয় সেটাও একটা সৃষ্টিকর্ম;...তাতেও আছে সেই আনন্দ যা সত্যিকার নিজস্ব কিছু লেখার সময় প্রাপ্ত হই আমরা; (কবিতা ও আমার জীবন—নৈর্ঋতী, প্রথম সংখ্যা, প্রথম বর্ষ ১৯৭৬)। কাব্যানুবাদের উপযোগিতা এ ছাড়া আর এক দিক থেকেও অবশ্য প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। নেতির মধ্য দিয়েই তা মূলের মহিমাকে উদ্ভাসিত করে, মূলের যে বৈশিষ্ট্য অনুবাদে হারিয়ে যায়, বোঝা যায় সেটুকুর মধ্যেই মূল কবিতাটির আবেদনের অনন্যতা প্রধানতঃ নিহিত। জর্জ স্টেইনারের কথায়—"একটি মহৎ কাব্যানুবাদ—হোল্ডালিনের সফোক্লিস, ভালেরির ভার্জিলের এক্লগ্‌সের পুনর্বিবৃতি, রবার্ট লোয়েলের ওসিপ মাণ্ডেলষ্টামের কবিতার রূপান্তর—উচ্চতম পর্যায়ের সমালোচনা। এরা মূল সৃষ্টিকে অনায়ত্ত তাৎপর্যের এক বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ধরে যার মধ্যেই ঐ সৃষ্টির অনন্ত প্রাণশক্তি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। (পোয়েম ইন্‌টু পোয়েম; ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি ইন মডার্ণ ভার্স ট্র্যানস্লেশান, জর্জ ষ্টেইনার সম্পাদিত—ভূমিকা) কোনো সমালোচনাই সমালোচিত সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্যকে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত করে তুলতে পারে

CENTRAL LIBRARY

না। তবে যথার্থ সমালোচনা, সমালোচনা ও সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যবধান থেকে যায়, তার মধ্য দিয়েই সমালোচিত সৃষ্টির মহিমাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে। ঐ একই কাজ করে থাকেন কবিতার অনুবাদক, তবে তিনি প্রবেশ করেন আরও গভীরে। ষ্টেইনারের পূর্বোক্ত লেখা থেকে আবার উদ্ধার করি—"রয় ক্যাম্পবেলের বোদলেয়ারের কবিতার রূপান্তরে আমরা লক্ষ্য করি একই সঙ্গে তিন প্রকারের ক্রিয়া ও চূড়ান্ত সততা : বোদলেয়ারের কবিতার পুনরুপস্থাপন ; অনুবাদের অপূর্ণতা দ্বারাই এই কবিতাগুলির অসামান্যতার সূক্ষ্মবিচারী অনুভব এবং ক্যাম্পবেলের নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিতে যা মার্জিত ও নিপুণ ও যা অমার্জিত নিকৃষ্ট তারই প্রয়োজনীয় উদ্‌ঘাটন।"

কাব্যানুবাদের আদর্শ সম্বন্ধে প্রচুর ও প্রবল মতপার্থক্যের সাক্ষাৎ মেলে। এ সম্পর্কে সকল বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে একটি জিজ্ঞাসাই— কবিতার অনুবাদে অনুবাদক কতখানি স্বাধীনতা নিতে পারবেন। এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আলোচকরা প্রায়শই মূল কবিতার প্রতি আনুগত্য এবং অনুবাদকের স্বাধীনতা এই দুই বিপ্রতীপ প্রান্তের একদিকে খুব বেশী ঝুঁকে পড়েন। এই দুই বিরোধী প্রবণতা এবং তজ্জনিত মতবৈষম্যের নিদর্শন হিসেবে আমি এজরা পাউণ্ড ও রবার্ট লোয়েল—এই দুজন অগ্রণী কবি-অনুবাদক যাঁরা কাব্যানুবাদে প্রভূত স্বাধীনতা নিয়েছেন—তাঁদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য এখানে পরপর সংকলন করে দিচ্ছি। এজরা পাউণ্ডের 'হোমেজ টু সেক্সটাস প্রপার্টিয়ুস' সম্বন্ধে রবার্ট গ্রেভ্‌স মন্তব্য করেছেন—"মিঃ পাউণ্ডের অনুবাদ নির্ভর করে আছে লাতিনের প্রায় নিখুঁত অজ্ঞতা ও নিকটতম ইংরেজী প্রতিশব্দ থেকে প্রপার্টিয়ুসের রচনার অর্থ অনুমান করে নেওয়ার ওপর।" (মরাল প্রিন্সিপিল্‌স ইন্ ট্র্যানস্লেশান, এনকাউন্টার এপ্রিল ১৯৬৫) গ্রেভ্‌স প্রায় বিদ্রূপের তির্যক মেজাজে একই সঙ্গে এ সংবাদটুকুও পরিবেশন করেছেন যে "সম্প্রতি এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল একথা বলেও রবার্ট গ্রেভ্‌সের মতো স্বল্প সংখ্যক পাণ্ডিত্যাভিমানী ছাড়া এই অনুবাদ কর্ম....." ইত্যাদি। এই একই গ্রন্থকে কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে স্মরণীয় বিভাজন-রেখারূপে দুর্লভ স্বীকৃতি দিয়ে পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধে জর্জ ষ্টেইনার লেখেন যে—"যদি আমাদের কাব্যানুবাদের যুগ গোল্‌ডিং, গ্যাভিন ডগ্‌লাস এবং চ্যাপমানের যুগের সঙ্গে পাল্লা দেয়, তার কারণ এজরা পাউণ্ডের শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। ... যেমন পাউণ্ডের কবিতা আধুনিক ইংরেজী ও মার্কিন কাব্যতত্ত্বকে নবীকৃত বা বিপর্যস্ত করেছে, তেমনই তারা (পাউণ্ডের অনুবাদসমূহ) বিশশতকে কাব্যানুবাদের সংজ্ঞা ও আদর্শকে বদলে দিয়েছে। প্রায় যে কোনো কাব্যানুবাদের দিকে এক নজর চাইলেই যথেষ্ট বোঝা যায় যে এই রচনা 'হোমেজ টু সেক্সটাস প্রপার্টিয়ুসে'র আগে এসেছে না পরে (১৯১৭/১৯৩৪)। কিন্তু অনুবাদের 'নবীকরণ' ইতঃপূর্বেই ঘটে গেছে পার্সোনায় (১৯১২) এবং প্রভেন্সায় (১৯১০)। "দি রিভার মার্চেন্টস ওয়াইফ" (১৯১৫) -এর পর অনুবাদ শিল্প তার আধুনিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল।.....তিনি (পাউণ্ড) বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন অনুবাদের প্রকাশরীতিতে, অনুবাদ কি, মূলের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, সে সম্পর্কিত ধারণায়।.....পাউণ্ডের পর প্রপদী কাব্যের সমকালীন অনুবাদক এবং এমন কি পাঠকও আসেন যেমন কিউবিজ্‌মের পর আসেন আধুনিক চিত্রকর। অনিবার্য ভাবেই সমকালীন অনুবাদের অনেকাংশেই পাউণ্ড শব্দটির অর্থের পরিধিকে যে প্রসারিত করেছেন তাকেই সূচিত করে আর তারই ফলে তাদের সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল।" ১৯৬৭-'৬৮ শীতের হাডসন রিভিউ, বিংশতি খণ্ড চতুর্থ সংখ্যায়, জন সাইমন 'অ্যাবিউজ অফ্ প্রিভিলেজ : লোয়েল অ্যাজ ট্র্যানস্লেটার' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে লোয়েলের অনুবাদকৃতির বিস্তৃত পর্যালোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে পাউণ্ড ও তাঁর প্রপার্টিয়ুস-অনুবাদের কথা রয়েছে। সাইমন লোয়েলের কাব্যানুবাদের সংকলন 'ইমিটেশান্‌স' থেকে রিল্‌কে, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, মন্‌তালে প্রভৃতি কবির কবিতা-অনুবাদের নিদর্শন উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে লোয়েল মূল কবিতার তাৎপর্য ও

CENTRAL LIBRARY

শব্দশরীরকে যথেচ্ছ ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত করে অনুবাদকের অধিকারের চরম অপব্যবহার করেছেন। সাইমন লিখেছেন—"লোয়েলের ইমিটেশান্‌স-এর জনক যে পাউণ্ড এবং বিশেষভাবে প্রপার্টিয়স অনুবাদের পাউণ্ড তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু যদিও আমি পাউণ্ডের প্রপার্টিয়সের বিশেষ গুণমুগ্ধ নই,.....তা বলে প্রপার্টিয়সের পাউণ্ড সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রপার্টিয়স পাউণ্ডের যে কবিত্বশক্তিকে প্রকটিত করেছে, তার সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকতে পারি না। কিন্তু এরকমটি যে হয়েছে তার প্রকৃত কারণ পাউণ্ড তার মূলকে অত্যন্ত মহিমান্বিতভাবে উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজে খুবই বড়ো কবি আর তাই সেন্সটাশ প্রপার্টিয়সের পক্ষে যা ক্ষতি তাই হয়ে উঠেছে এজরা পাউণ্ড ও ইংরেজী মুক্ত ছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। লোয়েল কিন্তু তাঁর অনুবাদে মূল রচনাগুলির নিয়ন্ত্রণ থেকে তেমন মুক্ত নন, তাঁর মুক্তছন্দেরও নেই পাউণ্ডের মুক্তছন্দের মতো শক্তি ও বৈচিত্র্য।" জন সাইমন পাউণ্ডের কবিত্বশক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ হলেও মূল কবিতার প্রতি পাউণ্ডের অনীহাকে অবশ্যই কাব্যানুবাদের আদর্শ বলে মনে করেন না। তিনি শুধু বলতে চান যে পাউণ্ডের কাব্যানুবাদ স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে অন্ততঃ সমাদরণীয়, কিন্তু লোয়েলের কাব্যানুবাদ অনুবাদ হিসেবে যেমন বিকৃত, তেমনই কবিতা হিসেবেও অতৃপ্তিকর। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুদূরবর্তী একালের একজন অগ্রণী বাঙালী কবি কিন্তু লোয়েলের অনুবাদের বিশেষ অনুরক্ত পাঠক। তিনি তাই লেখেন—"রবার্ট লোয়েল আজকের মার্কিন কবিশ্রেষ্ঠ,.....। .....চিরদিনের বোরিস প্যাস্টারনাক এর কবিতা লোয়েলের তর্জমায় এই প্রথম মৌলিক দীপ্তি পেয়েছে; বলা যায় এই অনুবাদে (যাকে লোয়েল বিনীতভাবে বলেছেন 'অনুকরণ') রাশিয়ান কবি অন্যদেশে যথার্থ অবতার্ণ হলেন। রিল্কে এবং ফরাসী সিম্বলিস্ট ইমেজিস্ট কবিদের লেখাও লোয়েলের ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে চেনা যায়।" (অমিয় চক্রবর্তী, রূপকল্প প্রসঙ্গে—সম্পাদককে লেখা চিঠি—কবি ও কবিতা তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বাইশে শ্রাবণ : ১৩৭৪)

এজরা পাউণ্ড-কৃত কবিতার অনুবাদ পড়ে স্পষ্টই মনে হয় যে তিনি অনুবাদ্য কবিতাগুলি থেকে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ছেঁকে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর অনুবাদে মূল কবিরা বর্তমানেরই অংশ হয়ে গেছেন, আধুনিক কবিতার লয়, স্বরভঙ্গিমা ও বাক্‌পদ্ধতিগত ঝোঁকের আধারে তিনি ধরতে চেয়েছেন পুরোনো কবিদের। এজরা পাউণ্ডের অনুসারী রবার্ট লোয়েল নিজেই জ্ঞাপন করেছেন যে তিনি র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' অনুবাদ করতে গিয়ে তার এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়েছেন—তাঁর ভাষায় এই প্রক্রিয়ার নাম 'আনক্লটিং'। রিল্কের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে লোয়েল আবার তাদের সঙ্গে স্বরচিত কবিতার স্তবক জুড়ে দিয়েছেন। 'ইমিটেশান্‌স' এর মুখবন্ধে অনুবাদক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য বিবৃত করতে গিয়ে লোয়েল বলেছেন যে—"আমি আক্ষরিক অর্থের ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়েছি এবং স্বরপ্রকৃতিটি আয়ত্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছি।.....আমি চেষ্টা করেছি জীবন্ত ইংরেজী লিখতে এবং আমার মূল রচয়িতারা এখন আমেরিকায় বসে তাঁদের কবিতাগুলি লিখলে সম্ভবতঃ যা করতেন আমি তাই করেছি।" একই লেখায় লোয়েল আরও লিখেছেন—"এই বইটি অংশতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও এর উৎসগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রথমে একটি পরম্পরা হিসেবে পঠনীয়, অনেক ব্যক্তিত্ব, বৈপরীত্য এবং পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে একটিই স্বর প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।" লোয়েলের এই সব উক্তি থেকে তাঁর অনুবাদের সচেতন অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছু সূত্র আমরা বের করে নিতে পারি। মূলের আক্ষরিক আনুগত্যে অনীহ থেকে তিনি অনুবাদ্য কবিতার সামগ্রিক স্বরপ্রকৃতির প্রতিই অভিনিবিষ্ট হয়েছেন, যদিও স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, একটি কবিতার আক্ষরিক অর্থের ভাষান্তরের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিলে কিভাবে তার সামগ্রিক স্বরপ্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ থাকে? যে কালের যে কবির যে কবিতাই অনুবাদ করুন লোয়েল, তাঁর অনুবাদের ভাষা ইংরেজীর সমকালীন বাক্‌রীতিকেই তিনি একমাত্র প্রকাশমাধ্যম

CENTRAL LIBRARY

হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও একটি সংশয় দেখা দেয়। এর ফলে, যে সব কবির কবিতা লোয়েল অনুবাদ করেছেন, অনুবাদে তাঁদের মানসতা ও সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য অনেক ক্ষীণ হয়ে আসাই কি স্বাভাবিক নয়? অবশ্য লোয়েলের সমর্থনেও বলা যায় যে, সমকালীন ইংরেজী বাক্‌রীতিই তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক প্রকাশমাধ্যম। কোনো প্রাচীন কবির কবিতা-অনুবাদেও কোনো প্রত্ন ইংরেজী ভাষাভঙ্গি প্রয়োগ করলে সেটাই কি তাঁর পক্ষে জোর-করা কৃত্রিম একটা ব্যাপার হয়ে উঠত না? লোয়েল তাঁর অনুবাদে মূলকে বেশ কিছুটা অতিক্রম করে গেছেন এবং তিনি একজন সৃষ্টিশীল কবি বলেই মুখ্যতঃ লক্ষ্য রেখেছেন যাতে তাঁরই নিজস্বতা-চিহ্নিত একটি মৌলিক কবিতারূপে তাঁর অনুবাদ উপলব্ধি ও উপভোগ করা যেতে পারে।

অনুবাদক তাঁর অনুবাদে, মূলের প্রতি আনুগত্য ও নিজস্ব স্বাধীনতা গ্রহণ, এ দুয়ের মধ্যে কোনও একটির আতিশয্য, পরিহার করে চলবেন এইটাই অভিলষিত। কবিতার নির্ভুল বা নিখুঁত অনুবাদের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা অবশ্য বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে সংযোগবিরহিত, স্বরচিত এক মূর্খের কল্পস্বর্গেই বাস করে থাকেন। 'নির্ভুল' ও 'নিখুঁত', এই বিশেষণদুটিই বিভ্রমাত্মক, যেহেতু 'নির্ভুল' বা 'নিখুঁত' অনুবাদ বলে বাস্তবে কোনো কিছুর অস্তিত্বই অসম্ভব। এই কারণেই এ কালের এক বাঙালী কবির ঈদৃশ উক্তি আমাদের কাছে রীতিমত কৌতুককর বলে বোধ হয়: "কবিতা-অনুবাদ করার প্রথম শর্ত নিরাসক্তি। কবিতা অনুবাদকের ভূমিকা, এক ভাষার বক্তব্যকে, একজন কবির ব্যক্তিত্বকে অপর ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করাতেই তার সার্থকতা।" এবং "অনুবাদক যখন বলেন, ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য অপর ভাষার কবিতার যথাযথ উপস্থাপন সম্ভব নয় তখন ধ'রে নিতে হবে অপর ভাষার কবিতাটির সম্যক্ অনুধাবনে তিনি অক্ষম, যে কোনো কারণেই হোক অপর ভাষার কবিতাটিকে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ভাবে তিনি বুঝতে পারেন নি।" (কবিতার অনুবাদ—আলোক সরকার, মহারাজ—শারদ সংকলন ১৩৮০) মজার ব্যাপার একই প্রবন্ধে, অন্যত্র লেখক কিন্তু স্বীকার করে নেন—"প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বিন্যাস আছে, অপর ভাষায় সেই বিন্যাস আনার প্রচেষ্টা হাস্যকর।" অবশ্য এই উপলব্ধি লেখকের আকাশকুসুম চয়নে কোনো বিঘ্ন ঘটায় না। ফলতঃ কবিতা-অনুবাদের সার্থকতা বিচারে প্রাতিস্বিক উপলব্ধি ও বিচারবোধের ভূমিকা কিছুটা থেকেই যায়। একালে অনেক কবিতারই অর্থ ঠিক সুস্পষ্টভাবে নিষ্পাদন করে নেওয়া যায় না, অন্ততঃ তাদের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব বলে গ্রহণ করতে হয়। স্বভাবতই অনুবাদককে সেখানে স্বকীয় অনুভূতি, অনুপ্রবেশসামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে অনুবাদ্য কবিতার এবং সেই সূত্রেই একটি স্তবক, একটি পঙ্‌ক্তি, একটি শব্দবন্ধ বা শব্দের স্বকীয় অর্থ বা ব্যাখ্যা স্থির করে নিতে হয় অর্থাৎ সম্ভাবিত একাধিক তাৎপর্যের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। এটুকু স্বাধীনতা অবশ্যই তাঁর ন্যায্য পাওনা। যাকে আমরা আক্ষরিক অনুবাদ বলে জানি, তাতে মূলের প্রতি উপলব্ধিহীন, যান্ত্রিক আনুগত্যে অনেকসময়ই মূল কবিতাটির স্বকীয় ঐশ্বর্য, বিশেষ আবেদন একেবারে লোপ পায়, একটি সজীব কবিত্বঋদ্ধ সৃষ্টির বিনিময়ে সেখানে পাওয়া যায় বর্ণহীন, প্রায়-মৃত, এক স্বাতন্ত্র্য-রিক্ত লিখন। অনুবাদে মূল কবিতার শব্দের অন্তর্লীন রণন, ও অভিপ্রায়কে ঠিক ঠিক ধরতে গেলে, ঐ শব্দ যে বাক্য বা পঙ্‌ক্তির অন্তর্ভূত তার মিলিত তাৎপর্যকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে হলে, মূলের প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের স্বারূপ্য যথাসম্ভব অনুবাদে আনতে হলে, মূল কবিতার বিন্যাসের কিছু অদল বদল করতেই হয়, বিভিন্ন শব্দের অবস্থানে কিছুটা বিপর্যাস ঘটাতেই হয়, প্রয়োজন হয় কমবেশী বর্জন ও সংযোজনের। কখনও কখনও বিশেষ করে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে নতুন শব্দ অনুবাদে জুড়তে হয়। অবশ্য সেখানে সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই যেন মূল কবিতার স্রষ্টার মানসতা ও উপস্থাপনরীতির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না হয়। অর্থাৎ কবিতার অনুবাদক যেমন আক্ষরিক অনুবাদের বিভ্রান্তিকর মোহে

CENTRAL LIBRARY

মূল কবিতার শব্দদাসে পরিণত হবেন না, তেমনই যথেচ্ছ, অযৌক্তিক স্বাধীনতা গ্রহণে মূলকে একেবারে বিকৃত বা বিনাশ করবেন না।

অনুবাদকের স্বাধীনতা গ্রহণ অনেক সময়ে অপরিহার্য হয়ে পড়ে মূল কবিতার ভাষা ও অনুবাদের ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির প্রকট বৈষম্যের জন্য। ইংরেজী ভাষায় অনেক সময় খুব সাদাসিধে সহজ উচ্চারণও কবিতার জাদুতে ভরে ওঠে, কিন্তু বাংলায় তার একেবারে অনুগত রূপান্তর পর্যবসিত হয় কেমন নীরস, নীরক্ত, গদ্য-বিবৃতিমাত্রে! সেখানে অনুবাদে তাই একটু তির্যকতা আনতে হয়, অপরিহার্য হয়ে পড়ে ঈষৎ অলংকরণ। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী-কৃত, ডব্লিউ. বি. ইয়েটসের 'এ কোট' নামক সুপরিচিত কবিতার অনুবাদটি এর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রথমে উপস্থিত করি :

A COAT

I MADE my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From heel to throat,
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As though they'd wrought it.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.

আঙরাখা

গানকে আমার আঙরাখা বানালুম
আগুল্ফ লম্বিত
আগাগোড়া তার পুরাণ কাহিনী-ঢাকা
আকণ্ঠ সজ্জিত
যত মূর্খই লুফে নিল আগ্রহে
যেন এই জামা তাদেরই বিনির্মিত
লোকচক্ষেও পরিধান করে তাকে
তাদের করেই করলুম অর্পিত।
ওগো গান, শোনো, দুঃসাহসের দ্যুতি
নগ্ন হাঁটায় আরও বেশী ছন্দিত। —এক্ষণ চতুর্থ বর্ষ : পঞ্চম ও ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা শারদীয় ১৩৭৩

CENTRAL LIBRARY

'এ কোট' কবিতাটি ইএটসের কাব্যপ্রবাহের এক সন্ধিলগ্নের সূচক 'রেস্‌পন্‌সিবিলিটিস্‌' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যে সময়ে এই বইয়ের নতুন কবিতাগুলি ইএটস লিখেছিলেন সে সময়ে তাঁর কবিতা একটা নতুন দিক নিচ্ছিল। 'এ কোট' কবিতায়—সহজ, কথ্যরীতি—আশ্রয়ী ভাষায় স্বচ্ছ, কঠিন, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কবিতা রচনার যে আদর্শ ইমেজিস্ট ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছিল, তার প্রতিফলন—ইএটসের তদানীন্তন সাহিত্যিক সচিব এজরা পাউণ্ডের সান্নিধ্যের কথা মনে রেখে স্বভাবতই আমরা মনে করি। কিন্তু নরেশ গুহ তাঁর উদ্দীপক ও আকর্ষক নিবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ : ইমেজিজম্‌ : ইয়েট্‌স্‌'-এ (কবি ও কবিতা প্রথম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা : শারদীয়া) তাঁর এই তথ্যভিত্তিক অনুমান জ্ঞাপন করেছেন যে ইএটসের এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ১২৫ সংখ্যক—ঐশী প্রেমের, সরল ভক্তিনত সমর্পণের গান—'আমার এ গান ছেড়েছে তার/সকল অলংকার'-এর ইংরেজী অনুবাদ দ্বারা প্রেরিত। ইএটস তাঁর এই কবিতায় বিচিত্র পৌরাণিক সূচীকর্মে মণ্ডিত পুরোনো কাব্যরীতির জমকালো পরিচ্ছদ মূর্খ অনুকারকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য, নতুন কাব্যরীতির নগ্নতাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই কবিতার সহজ, সরল, ঋজু, অনলংকৃত ভাষা এবং উপস্থাপনরীতি এর ভাববস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সমঞ্জস এবং কবি তা সচেতন ভাবেই প্রয়োগ করেছেন। এর অনুবাদে বাঙালী কবি-অনুবাদক শব্দ ও পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে বদল ঘটিয়েছেন, 'From heel to throat' কথাটিকে ভেঙে 'আগুল্ফ' এবং 'আকণ্ঠ' করে নিয়ে দুটি পৃথক পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়েছেন, 'Covered' শব্দটিকেও পৃথক দুই পঙ্‌ক্তিতে 'লম্বিত' ও 'সজ্জিত' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে ভাষান্তরিত করেছেন' 'Caught it'এর অনুবাদে লিখেছেন 'লুফে নিল আগ্রহে', সর্বোপরি 'For there's more enterprise/In walking naked' এই ঋজু প্রত্যক্ষ বাচনকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এমন আবেগস্পন্দিত, অলংকৃত কাব্যোচ্চারণে—'ওগো গান, শোনো, দুঃসাহসের দ্যুতি/নগ্ন হাঁটায় আরও বেশী ছন্দিত।' লক্ষণীয় 'In walking naked' এর ভাষান্তর 'নগ্ন হাঁটায়'তে মূলের সহজ সারল্য প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। For there's more enterprise' এমন অতি সাধারণ আটপৌরে বিবৃতিটির অনুবাদ, দুটি পঙ্‌ক্তিতে ছড়ানো, 'দুঃসাহসের দ্যুতি···আরও বেশী ছন্দিত'তেই অলংকারমণ্ডিত ও প্রসাধিক কাব্যময়তার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, গোটা কবিতাটিতেই লম্বিত, সজ্জিত, বিনির্মিত, অর্পিত, ছন্দিত এই ধরণের তির্যক ও পোশাকী সাধু শব্দ একটু বেশীমাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও কিন্তু আমরা আলোচ্য অনুবাদটিকে অনুত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করতে পারি না, বলতে পারি না যে, মূল কবিতার ভাববস্তু এবং মেজাজ বা বিশেষ রসাবেদনটুকু এই রূপান্তরে উল্লেখ্যভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এলিঅটের 'দি লাভ্‌ সং অফ্‌ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক'এর বিষ্ণু দে কৃত অনুবাদ 'অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগান'-এও এই আবশ্যক ও সংগত পরিবর্তন, সংযোজন বা প্রসাধনের একাধিক নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করি। মূলের :

And seeing that it was a soft October night,
Curled once about the house, and fell asleep.

অনুবাদে হয়েছে :

শেষে যবে দেখে রাত, স্নিগ্ধ মৃদু অক্টোবর রাত,
তখন বাড়িটা ঘিরে ধ'রে ফের কুঁকড়ে লাগায় এক ঘুম।

মূলের :

Do I dare
Disturb the universe ?

CENTRAL LIBRARY

অনুবাদে হয়েছে :

সাহসে দুর্বার
আলোড়িত করে দেব সমস্ত নিখিল ?

মূলের :

When I am pinned and wriggling on the wall,
Then how should I begin

অনুবাদে হয়েছে :

যখন কাঁটায় বিঁধে দেয়ালে লটকিয়ে করি ছটফট মুক্তির প্রত্যাশে
তখন কেমন ক'রে মুখ থেকে খুলে দিই খিল

তৃতীয় বা শেষ দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে মূলের অতি সহজ সাধারণ জিজ্ঞাসাটি অনুবাদে কেমন অলংকৃত তির্যকতা পেয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সমগ্র অনুবাদটিতে মূল কবিতার কবির স্বতন্ত্র মানসিকতা ও মূল কবিতাটির বিশিষ্ট মেজাজ যে যথাযথভাবে বাহিত হতে পেরেছে তা অনস্বীকার্য।

'হে বিদেশী ফুল'-এর (বাক্ : প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৩) প্রারম্ভিক বাচনে বিষ্ণু দে লিখেছেন—"যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে।" আর 'হেল্ডার্লিন এর কবিতা'র (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড : প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪, পৃ ২৭) 'অনুবাদকের বক্তব্য'-এ বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন—"..... মূলের পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ও স্তবকবিন্যাস সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছি, আশা করি চিত্রকল্পগুলি অনাহত আছে, আর কবিতার সারবস্তুও বিকৃত হয় নি। অন্য একটি বিষয়েও আমি নিরন্তর মনোযোগী ছিলাম—যাতে বাংলা ভাষার কবিতা হিশেবে অনুবাদগুলি পাঠযোগ্য হয়, কেননা আমার বিশ্বাস যে কবিতার অনুবাদের পক্ষে কবিতা হ'য়ে ওঠাই সবচেয়ে জরুরি দরকার।" এই দুটি উক্তি মিলিয়ে পড়লে অনুবাদকের লক্ষ্য ও কৃত্য সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা মোটের ওপর প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। মূল কবিতাটির প্রতি আনুগত্যের দিক হতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পরিপূর্ণ একাত্মতায় সমগ্র কবিতাটিতে পরিব্যাপ্ত যে মেজাজ এবং কবির সৃজন-মানসতা তাকে অনুবাদে আয়ত্ত করার প্রয়াস। তারপর গুরুত্বপূর্ণ মূল কবিতার ভাববস্তু বা তাতে রূপায়িত জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার এবং চিত্রকল্প, ছন্দ, ধ্বনিস্পন্দন, মিলক্রম ও স্তবকবিন্যাস অর্থাৎ সমগ্র রূপকল্পের এবং মূল কবিতার কবির দেশ ও কালের বিশেষ আবহটির যথাসম্ভব সুস্পষ্ট আভাস অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা। আর অনুবাদের শিল্পমূল্যের দিক হতে জরুরী—রচনাটিকে স্বকীয় কাব্যমূল্যে ঋদ্ধ করে তোলা; লক্ষ্য রাখা যাতে করে যে ভাষায় অনুবাদক অনুবাদ করছেন সেই ভাষার, নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি, কাব্যসৃষ্টির নিজস্ব স্বভাবধর্ম যেন বিপর্যস্ত না হয়, সেই ভাষার স্বতন্ত্র একটি কবিতা হিসেবেও অনুবাদকর্মটি যেন উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। তত্ত্বের দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, উপর্যুক্ত দু দিকের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলার ওপরই অনুবাদকের সিদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দুয়ের প্রতি অনুবাদকের সমান অভিনিবেশ অসম্ভব—এক দিকের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ পাবেই। আর একথা বললেও নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন অনুমানের আশ্রয় নেওয়া হবে না যে অনুবাদক স্বয়ং প্রকৃত সৃষ্টিশীল কবি হলে তিনি তাঁর অনুবাদের স্বতন্ত্র শিল্পমূল্যের প্রতিই প্রধানতঃ মনোযোগী হবেন। এর প্রমাণ বুদ্ধদেব বসুর 'হেল্ডার্লিন এর কবিতা'র 'অনুবাদকের বক্তব্য' থেকে পূর্বোদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় বাক্যটিতেই তো আমরা পেয়েছি। অনুবাদের এই স্বকীয় কাব্যমূল্যের প্রতি প্রায় সমস্ত ঝোঁকটা দিলে কিন্তু বিভ্রান্তির পথে

CENTRAL LIBRARY

কাব্যানুবাদকের পদক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ কবিতার অনুবাদের, অনুবাদ হিসেবে চরিতার্থতার অভিপ্রায় তখন বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। বস্তুতঃ মূল কবিতা থেকে অনুবাদক যদি এতটাই সরে আসেন যে তাঁর অনুবাদে মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা চিত্রকল্প তো অবিকৃত থাকেই না, সারবস্তু এবং মেজাজও হারিয়ে যায়, মূল কবিতা-রচয়িতার স্বকীয় কবিব্যক্তিত্ব এবং রচনারীতির বিরোধী সব উপাদান ও অনুষঙ্গ এসে হাজির হয়, তখন অনিবার্য-ভাবে মূলগত একটি প্রশ্ন দেখা দেবে যে অনুবাদে মূল কবিতাটির এবং তার কবির কোনো বিশিষ্টতাই যদি না পাওয়া গেল, তাহলে অন্য কবির কবিতা-অনুবাদের এই পণ্ডশ্রম করতে যাওয়াই বা কেন? অনুবাদের কোনো সার্থকতাই যে তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সূত্রে এজরা পাউণ্ডের 'Ballad For Gloom' কবিতাটির বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদ 'বিষাদ-গাথা'র (শ্রেষ্ঠ কবিতা) উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুবাদটিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেই গণ্য করব, যেহেতু এতে মূল কবিতার মানসিকতা, ভাববৈশিষ্ট্য এবং চলন কমবেশী বিপর্যস্ত; মূলের শব্দার্থ প্রায়শই লুপ্ত বা বিকৃত। মূল কবিতায় God শব্দটি বহুবার আবৃত্ত, অনুবাদে কোথাও এর যথাযথ বাংলা রূপ নেই, সর্বত্র বিশেষ্যের জায়গা নিয়েছে প্রথম পুরুষ-বোধক সর্বনাম। এতে মূলের বক্তব্যের জোর অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অন্যত্রও ভাষান্তরে অনুবাদক যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূলের—

For God, our God is a gallant foe
That playeth behind the veil,

অনুবাদে হয়েছে—

শত্রু, সে যে শত্রু, তার এই-তো খেলা
আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায়।

মূলের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে God দুবার উচ্চারিত, অনুবাদে তার কোনো ভাষান্তরই নেই, foe এর বাংলা রূপ শত্রু দুবার আবৃত্ত। মূলের gallant বিশেষণটিকে 'যুদ্ধ চালায়'-এর মধ্য দিয়ে ধরতে গিয়ে অনুবাদক মূলের ভাবগরিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। মূলের—

I have loved my God as a child at heart
That seeketh deep bosoms for rest,
I have loved my God as a maid to man—

ভাষান্তরে দাঁড়িয়েছে—

আমার প্রাণ একলা শুয়ে ডাকলো কত
শিশু যেমন ঘুমের সময়,
আমার হাত খুঁজলো তারে সমস্ত রাত—
প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়।

মূলের তিন পঙ্‌ক্তি অনুবাদে হয়েছে চার পঙ্‌ক্তি। 'as a chiid at heart', 'that seeketh deep bosoms for rest', 'I have loved my God as a maid to man'—এ সবের অর্থ অনুবাদে প্রায় আভাসিতই হয় নি, 'একলা শুয়ে ডাকলো কত', 'প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়'—এসব শব্দবন্ধকে মূলে অপ্রাপ্য নতুন ভাব ও ভাবনার আরোপ বলেই গণ্য করতে হয়। মূলে যেখানে রয়েছে—

I have played with God for a woman,

CENTRAL LIBRARY

I have staked with my God for truth,
I have lost to my God as a man, clear-eyed—
His dice be not of ruth.

অনুবাদে সেখানে পড়ি—

প্রেমের খেলা খেলেছি কত বার,
ছুঁড়েছি পাশা সত্য ক'রে পণ,
স্বচ্ছ চোখে হেরেছি তার কাছে
ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন।

মূলের প্রথম পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য শব্দবর্জনে ও শব্দপ্রয়োগের ত্রুটিতে, অনুবাদে একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। আর 'His dice be not of ruth'-এর ভাবান্তর বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ কোনও দিক দিয়েই তার ধারে-কাছে পৌঁছোয় নি। বস্তুতঃ 'ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন' কে সম্পূর্ণরূপে অনুবাদকের স্বযোজিত পঙ্‌ক্তি বলেই ধরে নিতে হয়। মূলের 'For I am made as a raked blade' অনুবাদে হয়েছে 'বাকি কিছুই নেই তো আর, লাফিয়ে উঠি নগ্ন ধার' এবং 'I have drawn my blade where the lightuings meet' এর ভাবান্তর করেছেন অনুবাদক 'বিদ্যুতের পাল আগুন ছুঁড়েও দেখি'। এখানেও দেখি সেই স্ব-যোজিত শব্দের অপপ্রবেশ, মূলের অর্থের নিছক বিকৃতি।

কাব্যানুবাদের স্বরূপ ও তার নানা সমস্যার ওপর বেশ কিছুটা আলো পড়বে যদি একই কবিতার দুটি ভিন্ন ভাবান্তর আমরা মিলিয়ে দেখি। এ ক্ষেত্রে এলিঅটের একটি কবিতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিষ্ণু দে'র করা অনুবাদ দুটির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। টমাস্ স্টার্নস্ এলিঅট-এর 'জার্নি অফ্ দি মেজাই'এর অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তীর্থযাত্রী' নামে। এই অনুবাদের কৌতূহলোৎপাদক ইতিহাস বিবৃত করেছেন বিষ্ণু দে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'য়। ১৯৩০-৩১ নাগাদ এলিঅটের 'এরিয়েল পোয়েম্‌স' কলকাতায় এসে পৌঁছোয়। তারপরে 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেরোল 'আধুনিক কাব্য' ('সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে পরে সংকলিত)। সেই বিরোধী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের প্রথমদিককার কবিতা ব্যবহার করেছিলেন। বিষ্ণু দে তাতে ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর নিজের করা 'এরিয়েল পোয়েম্‌স'এর ৮ সংখ্যক কবিতা 'জার্নি অফ্ দি মেজাই'এর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। সে-সময়ে তিনি জিজ্ঞাসু ছিলেন রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দ বিষয়েও। তিনি তাই অনুরোধ করেন, রবীন্দ্রনাথ যদি এলিঅটের কবিতাটিকে তাঁর তৎকালীন গদ্য কবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে ঐ ছন্দের স্বরূপটা তিনি ধরতে পারবেন। কয়েক দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যছন্দ-অনুযায়ী লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান। বিষ্ণু দে-র বন্ধু পরিচয়-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একদিন রবীন্দ্রনাথকে বললেন, আপনাকে অমুক এই সুযোগে এলিঅটের সম্প্রতিকার কবিতা পড়াল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাই বুঝি, তা তোমাদের এলিঅট তো ভালো লেখে, তার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, তুমি এই কবিতাটার অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছাপো। তারপরে তিনি সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নিয়ে মূল ইংরেজী কবিতাটি ও অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেন। আর এই হল ১৩৩৯ সালের এলিঅট অনুবাদ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতেও এই অনুবাদটির প্রসঙ্গ উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন: ইতিমধ্যে শ্রীবিষ্ণু দে "পুনশ্চ"-এর নকলে এলিয়ট-এর একটা তর্জমা পাঠিয়েছিল, পড়ে দেখলুম। কমুনি ছোড়তি নেই—গদ্যর ঘাড়ে পদ্য কামড়ে ধরেচে। একদা যে খাদে জলধারা বইত সেখানে নৌকো চলত, জল নেমে গেলে নৌকোও অচল এদিকে হেঁটে পার হতেও পাকে পা বসে যায়, অর্থাৎ

CENTRAL LIBRARY

জলস্থল দুইয়ের ধার। আমাকে শোধন করতে অনুরোধ করেছিল। সে প্রক্রিয়ায় তার দেহান্তর ঘটল। পুনর্জন্মের দুঃখ আছে সে দুঃখটা আমারি লেখনী বহন করলে। (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০, পৃঃ ২২, পত্র সংখ্যা ১০) স্পষ্টতই বিষ্ণু দের বিবৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতির তথ্যগত বিভেদ কিছুটা দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত পত্রাংশটি আমাদের মনে একাধিক প্রশ্নের উদ্রেক করে। 'জার্নি অফ্ দি মেজাই'-এর বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদটিতে প্রকৃতই কি 'পুনশ্চ'-এর পদ্যছন্দ বা সামগ্রিক রূপকল্পের হুবহু অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়? আর আমরা কি তাহলে ধরে নেব 'পুনশ্চ'-তেও গদ্যের ঘাড়ে পদ্য কামড়ে ধরেছে? সর্বোপরি, সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথের শোধিত ও পুনর্জন্ম-লব্ধ অনুবাদটি, অনুবাদ হিসেবে সার্থকতার বিচারে, বিষ্ণু দের প্রাথমিক অনুবাদটিকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে? আর বিষ্ণু দে পরবর্তীকালে কি তাঁর সেই প্রাথমিক অনুবাদটির শোধন ও রূপান্তর করেছেন? এবং তা করে থাকলে তার পরিমাণ কতখানি?

'জার্নি অফ্ দি মেজাই'-এর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী' এবং বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ 'রাজর্ষিদের যাত্রা' (এলিঅটের কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩২-৩৩) পাশাপাশি রেখে মূলের সঙ্গে যদি আমরা মিলিয়ে পড়ি তাহলে দেখব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষ্ণু দে-র তুলনায় অনুবাদের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে, শব্দের বিন্যাসগত পরিবর্তনে, সংযোজনে ও বর্জনে, শব্দের ভাবান্তরে অনেক বেশী স্বাধীনতা নিয়েছেন। বিষ্ণু দে মূলের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটাননি। মূলের প্রায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, প্রতিটি শব্দ, তাঁর অনুবাদে তিনি অনুসরণ করে চলেছেন, ভাষান্তরে তাদের যথাসম্ভব নিকট সাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলায় নিবিষ্ট থেকেছেন। দুটি অনুবাদের মধ্যে অনুবাদ হিসেবে 'রাজর্ষিদের যাত্রা' অধিকতর উত্তীর্ণ হয়েছে নিঃসংশয়ে, তাতে ধরা পড়েছে মূলের অধিকতর বিশ্বস্ত প্রতিরূপ। এলিঅটের বিশিষ্ট কবি-মানসিকতা, স্বরভঙ্গি, তাঁর কবিতার স্বকীয় মেজাজ ও রূপকল্প 'তীর্থযাত্রী'র চেয়ে 'রাজর্ষিদের যাত্রা'তেই বেশী আভাসিত হয়েছে—আর তা ('তীর্থযাত্রী'র মতোই) একটি স্বতন্ত্র বাংলা কবিতা হিসেবেও আমাদের সংবেদকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে যায়। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ প্রায় গদ্যেরই নিজস্ব স্বভাবও প্রবাহ-সম্পন্ন, কিন্তু বিষ্ণু দে-র অনুবাদের গদ্যে পদ্যের সুর দোলা দিয়ে গেছে। মূলের কিছু অংশের পাশাপাশি তাদের দুই রূপান্তর উদ্ধৃত করলেই এই বৈষম্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে:

Then at dawn we came down to a temperate valley,
Wet, below the snow line, smelling of vegetation ;
With a running stream and a water-mill beating the darkness,
And three trees on the low sky,
And an old white horse galloped away in the meadow.
Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel,
Six hands at an open door dicing for pieces of silver,
And feet kicking the empty wine-skins.
But there was no information, and so we continued
And arrived at evening, not a moment too soon
Finding the place ; it was (you may say) satisfactory,

CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ :

ভোরের দিকে এলেম, যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খাদে ;
সেখানে বরফ-সীমার নিচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল ;
সময় পেরিয়ে যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা—
বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।

বিষ্ণু দের অনুবাদ :

তারপরে ভোরবেলা এলুম কবোষ্ণ উপত্যকায়,
সোঁদা সোঁদা, তুষাররেখার নিচে, আবাদের গন্ধ ভাসে,
খরস্রোত নদী এক আর এক জলযন্ত্র আঁধারকে মারে
আর তিনটি গাছ খাটো আকাশের গায়ে
আর একটা শাদা ঘোড়া মাঠে ছুটে যায়।
তারপরে পৌঁছলম এক সরাইখানায়, চৌকাঠ আঙুরলতায় ঢাকা,
খোলা দরজার মুখে ছটা হাত রূপোর টুকরোর লোভে পাশা খেলে,
আর লাথি ছোঁড়ে খালি মদের মশকে।
কিন্তু সংবাদ মিলল না কিছু, আবার চললুম।
পৌঁছলুম শেষটা সন্ধ্যায়, লগ্নের এক পলক আগে নয়
সেই স্থান খুঁজে পেয়ে, (বলতে পারো) স্বস্তিকর বটে।

মূলের **'to a temperate valley'** রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে হয়েছে, 'যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খাদে' বিষ্ণু দে ভাষান্তর করেছেন 'কবোষ্ণ উপত্যকায়'। **'On the low sky'** এর ভাষান্তরে **'low'** বিশেষণটি উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দিগন্তের গায়ে' কিন্তু বিষ্ণু দে অনুবাদ করেছেন 'খাটো আকাশের গায়ে।' **'tavern'**এর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠিকই করেছেন 'শরাবখানা', বিষ্ণু দের অনুবাদ 'সরাইখানা' ঐরকম লক্ষ্যভেদী হয় নি। **'Six hands'** রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে কেন জানি না 'দুজন মানুষ' হয়ে গেছে' বিষ্ণু দে একেবারে আক্ষরিক ভাষান্তর করেছেন 'ছটা হাত'। **'And feet kicking the empty wine-skins'**এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো'। **'feet kicking'** অনুবাদে কি করে হয় নির্দোষ, নিরীহ 'পা দিয়ে ঠেলছে'?

CENTRAL LIBRARY

'wine-skins' এর ভাষান্তর 'মদের কুপো' ঠিকই হয়েছে। বিষ্ণুদের অনুবাদ মূলের অনেক কাছাকাছি—'আর লাথি ছোঁড়ে খালি মদের মশকে।' অবশ্য 'মশক' শব্দটি সুপ্রযুক্ত হয় নি, যেহেতু তা নিশ্চিতভাবেই জলের অনুষঙ্গবাহী। 'And arrived at evening, not a moment too soon/Finding the place, it was (you may say) satisfactory'—মূলের এই অংশের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বেশ স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূলের দুটি পঙ্‌ক্তিকে অনুবাদে তিনি তিনটি পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়েছেন, মূলের ইঙ্গিত অবলম্বন করে যেন নতুন করে এখানে তিনি শব্দ ও বাক্য বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। বিষ্ণু দের অনুবাদ এখানে মূলানুগ, যথাযথ। 'জানি অফ দি মেজাই'-এর শেষ পঙ্‌ক্তিটি 'I should be glad of another death', রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এরকম সাদাসিধে গদ্যরূপ পেয়েছে—'আর একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি'। বিষ্ণু দের তাঁর রূপান্তরে সঞ্চারিত করেছেন, কবিতার আবেগ ও ছন্দেরস্পন্দন—'খুশী হব আরেক মরণে।

এলিয়টের কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে অবশ্য সময়ে সময়ে এমন স্বাধীনতা নিয়েও ফেলেছেন যা কোনো যুক্তিতেই অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া যায় না, অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার দৃষ্টিকোণ থেকে যার ঔচিত্য কোনোভাবেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। এলিয়টের 'গেরোন্‌শন্‌' কবিতাটির ভাষান্তর বিষ্ণু দে করেছেন 'জরায়ণ' নামে। মূলে রয়েছে—

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.
I was neither at the hat gates
Nor fought in the warm rain
Nor knee deep in the salt marsh, having a cutlass,
Bitten by flies, fought.

বিষ্ণু দে-এর অনুবাদ করেছেন—

এই তো রয়েছি এক বুড়ো, ভিজে ভাদুরে বাদলে,
নাতি প'ড়ে খবর শোনায়, রৌদ্রের আশায়।
আশ্রমে আমি তো কোনো গাদির খামারে হাঁকিনিকো দর,
লড়িনি পশ্চিমা রৌদ্রে,
কিম্বা চেনাবের স্রোতে, উঁচিয়ে কৃপাণ
রক্তচোষা মাছির ভনভনে।

গোরোন্‌শন্‌' শেষ হয়েছে এইভাবে—

Tenants of the house
Thoughts of a dry brain in a dry season.

যা বিষ্ণু দে-র রূপান্তরে দাঁড়িয়েছে—

ঘরে ঘরে ভাড়াটেরা,
এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায় চিন্তারা
আমারও হৃদয়।

CENTRAL LIBRARY

মূলের চিত্র ও আবহকে অনুবাদক এখানে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে। 'in a dry month' হয়েছে তাই 'ভিজে ভাদুরে বাদলে', 'waiting for rain' হয়েছে 'রৌদ্রের আশায়', 'in the warm rain' হয়েছে 'পশ্চিমা রৌদ্রে', 'dry brain in a day season' হয়েছে 'এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায়'। মূলের এ হেন বৈপরীত্য সাধনে মূল কবিতাটির ভাববস্তু, আবহ ও মেজাজ এবং তার রচয়িতা কবি এলিঅটের কবিমানসিকতা ও সৃষ্টিভাবনার অনন্য বিশিষ্টতা যে বিশেষভাবেই বিপর্যস্ত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

অনুবাদকার্যে সফল হতে হলে অনুবাদকের থাকা চাই সৃষ্টিশীল মন, মূল কবিতার ভাষায় সমুচিত ব্যুৎপত্তি, তার শব্দার্থ, বাগ্‌ভঙ্গি, ও সঙ্গীতধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা, সংবেদনশীল, তন্নিষ্ঠ, শ্রদ্ধান্বিত মন নিয়ে মূল কবির ও তাঁর কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে দীর্ঘ আত্মিক ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের, তাঁর কবিতার মর্মলোকে প্রবেশের সামর্থ্য এবং অনুবাদের ভাষায় গভীর বোধ ও প্রকাশনৈপুণ্য। মূল কবিতার ভাষায় সাধারণভাবে অধিকার অর্জন করলেই অনেক সময়ে কার্যসিদ্ধি হয় না, যে কবির কবিতা অনূদিত হচ্ছে তাঁর বিশিষ্ট ভাষাপ্রয়োগপদ্ধতি, এমন কি অনেক সময়ে তাঁর কোনো একটি সৃষ্টিপর্যায়ে বা কাব্যগ্রন্থে তাঁর ভাষা ব্যবহারের বিশেষ সূক্ষ্মতা বা জটিলতা অনুধাবন করারও প্রয়োজন দেখা দেয়। এক-একজন কবির রচনার অনন্যতা, প্রকরণ বা রূপকল্পের এক বা একাধিক উপাদানের মধ্যে প্রায়শই নিহিত থাকে। অনুবাদককে সে বিষয়ে অবহিত হতে হয়। রিলকের কবিতার ইংরেজী অনুবাদক জে. বি. লীলম্যানের ভাবনায়, রিলকের কবিতার গহনতম রহস্য নিহিত নেই। তাঁর 'ইমেজারি' বা 'চিত্রকল্পে' নিহিত রয়েছে তাঁর 'সিনট্যাক্স' বা 'অন্বয়ে' এবং 'রিদ্‌ম' বা 'ছন্দঃস্পন্দে'। (দ্রষ্টব্য, পেংগুইন বুক্‌স প্রকাশিত রিলকের 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স-এর ভূমিকা)

কাব্যানুবাদে সার্থকভাবে ব্রতী শুধু কবিই হতে পারেন—এ কথা বললে নিশ্চয়ই কোনো ভ্রান্ত সরলীকরণ বা হঠকারী মন্তব্য প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে না। অনুবাদ্য কবিতা ও তার কবির সঙ্গে একজন কবিই সবচেয়ে গভীরভাবে আত্মীয়তা পাতাতে পারেন—মূল কবিতার সংক্রম তাঁর হৃদয়েই সবচেয়ে অমোঘ হতে পারে। আর অনূদিত কবিতাটিকে স্বকীয় সামর্থ্যে পরাক্রান্ত করার কাজে তিনিই সর্বাগ্রে সফল হতে পারেন। তিনজন সাহিত্যানুসন্ধিৎসুর র‍্যাঁবোর কাব্যানুবাদ সম্বন্ধীয় চিঠির উত্তরে 'এনকাউন্টারে'র পাতায় রবার্ট লোয়েল যা লিখেছিলেন তার সত্যতা, তাঁর অনুবাদের আদর্শ অনুমোদন করি আর না করি, স্বীকার করে নিতেই হবে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—"কেউ নিজে কবি না হলে তার পক্ষে অপর ভাষার কবিতাকে নিজের ভাষায় কবিতা করে তোলা সম্ভব নয়।"

মূল কবির দীর্ঘ সাহচর্যে তাঁর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন অনুবাদের সার্থকতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী বলেই বহু কবির বহু কবিতার অনুবাদপ্রয়াসের চেয়ে স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত কবির—যাঁদের সঙ্গে অনুবাদকের মানস-সাধর্ম্য রয়েছে—কবিতা অনুবাদ করাই সাধারণভাবে কাঙ্ক্ষণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অসংখ্য কবির অজস্র কবিতার অনুবাদপ্রয়াস করেছেন, অনেক সময়ই সে প্রয়াসে কোনো একাগ্র, স্থির লক্ষ্য গভীরতা সন্ধানের বদলে নির্বিচার অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যলোলুপতাই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। সম্প্রতিকালেও দেখি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্য দেশের কবিতা'য় নানান্ দেশের বিভিন্ন কবির দু একটি করে কবিতার নমুনা যে ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে এক-ধরনের সস্তা সাংবাদিক চমকপ্রবণতা বা প্রদর্শন স্পৃহাই যেন প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করলাম বলে একথা কিন্তু কেউ যেন ভেবে না বসেন যে অনুবাদে সাফল্য-অসাফল্যের দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি একই পর্যায়ে ফেলছি। যাই হোক, এরই উল্টোপিঠে রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর সম্প্রতিকালের

CENTRAL LIBRARY

আন্তরিক, শ্রদ্ধান্বিত, নৈষ্ঠিক ও শ্রমশীল অনুবাদ প্রচেষ্টা। বদলার, হেল্ডার্লিন, রিলকে কমবেশী স্ব-স্বভাবী এই তিন-জন অগ্রনায়ক কবির কবিতার রূপান্তরীকরণেই তিনি কিছুকাল ধরে ব্যাপৃত থেকেছেন। অবশ্য এলিঅটের বেশ কিছু নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ ছাড়াও আরও বহু কবির কবিতাই অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তর্কাতীত সিদ্ধিলাভ করেছেন। তবে, মানসধর্মের দুস্তর পার্থক্য থাকলে অসামান্য কুশলী কাব্যশিল্পীর হাতেও অনুবাদ কেমন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে তার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কৃত ডি এইচ. লরেন্সের 'অন্ দি ব্যালকনি'র অনুবাদ 'কালতরী'তে।

ভিনদেশী ভিনভাষার কবিতে কবি-অনুবাদকের নিজস্ব ভাবনা, অন্বীক্ষার ইঙ্গিত আবিষ্কার, ঐ মূল ভাষার কবির মানসিকতা ও সৃষ্টিকে অনুবাদকের আপন সত্তার গভীরে আত্মীকরণ – এই ব্যাপারটির ওপর অত্যধিক জোর দিলে কাব্যানুবাদের অনুবাদ হিশেবে মূল্যহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মূল ভাষার কবির সঙ্গে অনুবাদক যতই মানস-সাযুজ্য উপলব্ধি করুন, তিনি যদি অনুবাদ্য কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, সামগ্রিক আবহ ও মেজাজ আপন অনুবাদে বিম্বিত করার কাজে অমনোযোগী হয়ে তার ওপরে চাপিয়ে দেন নিজের ব্যক্তিমানসিকতা, প্রসঙ্গভাবনা ও প্রকরণস্বাতন্ত্র্য, তাহলে তাঁর অনুবাদকে অনুবাদরূপে অন্তত অনুত্তীর্ণ গণ্য করতে হবে। তাই এই ধরনের উক্তি যুক্তিহীন, অবিবেচক, নিছক গা জোরি মন্তব্য বলেই মনে হয় যে "অরুণ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন জানা অনুবাদকের চেয়েও বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ যে অধিকতর সার্থক, তার কারণ বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারে দেখেছেন নিজেরই ভাবনার নিজেরই সন্ধানের প্রকাশ—তার ফলে বোদলেয়ারকে আত্মসাৎ বা স্বীকরণ করা, অনুবাদ কবিতাকেও বাংলা ভাষার ভালো কবিতায় রূপান্তরিত করা, তাঁর পক্ষে অনেকের চেয়ে বেশি সম্ভব হয়েছে।" (বাংলা কবিতা ও শার্ল বোদলেয়ার, বোদলেয়ার নাম্বার, যাদবপুর জার্নাল অফ্ কম্প্যারেটিভ লিটারেচার, ভল্যুম সেভন ১৯৬৭) বলাবাহুল্য, বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের কবিতা-অনুবাদের সার্থকতা নিয়ে এখানে আমি কোনোই প্রশ্ন তুলছি না, শুধু উপর্যুক্ত মন্তব্যে অনুবাদের সার্থকতার যে একটি শর্ত সংকেতিত হয়েছে, তার সাধারণ প্রযোজ্যতা বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছি মাত্র।

অনুবাদে অন্য ভাষার কবিতার চিত্রকল্প, উল্লেখ ইত্যাদির স্বদেশীকরণের কথা কেউ কেউ বলেছেন। একালের একাধিক অগ্রণী বাঙালী অনুবাদকের বাংলা অনুবাদে তার উল্লেখ্য নিদর্শনও পাই। এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়: "..... বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপার্বিকের একাক্ষর ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয়: আমাদের কানে ভালো না লাগলে, তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক; এবং চিত্রকলার বেলাতেও মাছিমারা কেরাণী রসাভাস ঘটায়, অভীষ্ট আবেগ জাগিয়ে, দর্শকের সাধুবাদ পায় না।" (প্রতিধ্বনি: ভূমিকা) কিন্তু এই বঙ্গীয়করণ যে অনেক সময়ই ঠিক সুফল হয় না, তার অনেক উজ্জ্বল উদাহরণই উদ্ধার করা যেতে পারে। এলিঅটের 'গেরোন্‌শন' কবিতার বিষ্ণু দে কৃত অনুবাদ 'জরায়ণ'-এর প্রসঙ্গ আগেই এনেছি। এখানে আবার তা থেকে একাধিক নিদর্শন উপস্থিত করি। মূলে আছে:

In depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas,
To be eaten, to be divided, to be drunk
Among whishpers ; by Mr. Silvero
With caressing hands, at Limoges

CENTRAL LIBRARY

Who walked all night in the next room ;
By Hakagawa, bowing among the Titians ;
By Madame de Tornquist, in the dark room
Shifting the candles ; Fraulein von Kulp
Who turned in the hall, one hand on the door.

বিষ্ণু দে এর অনুবাদ করেছেন—

পচা ভাদ্রে, কচুশাক, কালোজাম, মোহিনী ধুতুরা
চর্বা, চোষ্য, বিভাজ্য ও প্রেয়
গোপন ফিসফাসে, তাই জোটে হাতিলাল মেহতা
কোমল পেলব হাতে, আহমেদাবাদে যেবা
পায়চারি করেছিল সারারাত পাশের কামরায় ;
জোটে তাই কালচাঁদ প্রাণোলিয়া বেলোয়ারি ঝাড়ের তলায় ;
মুখুয্যে গৃহিণী জোটে অন্ধকার ঘরে
বাতি নাড়ি আগে পরে পরে আর আগে ; জোটে
মিস্টার তরফদার বেলেঘাটা হলের চৌকাঠে ; একহাত দ্বারে।

এখানে স্বদেশীকরণ সীমায়িত শুধু নাম, ব্যক্তি, স্থান ও খাদ্যের নাম বদলে। এতে মূলের অর্থ, অনুভূতি, অভিপ্রায় বা মেজাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, তাই এতে আপত্তি করার কারণ দেখি না। বিষ্ণু দে যেখানে এলিয়টের মূল কবিতার ধর্মীয় বা পৌরাণিক প্রসঙ্গ-উল্লেখের স্বদেশীয় সমান্তর প্রয়োগ করেন ভাষান্তরে, সেখানেই মূলের ভাব, অভিপ্রায় এবং আবহ নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে কবিতার বোদ্ধা ও রসিকের প্রতিবাদ উদ্রিক্ত করে। একই কবিতার মূলে যেখানে রয়েছে—

Signs are taken for wonders, 'We would see a sign !,
The word within a word, unable to speak a word,
Swaddled with darkness. In the juvescence of the year
Came Christ the tiger.

বিষ্ণু দের রূপান্তরে সেখানে হয়েছে—

আবির্ভাব শেষটা দাঁড়ায় আশ্চর্য ঘটনা।
আমরা সবাই চাই আবির্ভাব
দর্শন, দর্শন, জন্মাষ্টমী !
শব্দের মাঝারে শব্দ, রুদ্ধবাক্, অপারগ শব্দ উচ্চারিতে,
কাংস্য অন্ধকারে কাথায় জড়ানো ; স্বাধীন পরবে নবযুগের উদ্গমে
এল কৃষ্ণ নরসিংহ
পাঞ্চজন্যে কেশরীহুঙ্কারে, বংশীরবে

অনুবাদে চলে এল জন্মাষ্টমীর উল্লেখ, 'ক্রাইষ্ট' বদলে এলেন কৃষ্ণ, 'টাইগার'-এর চিত্রকল্প পালটে 'নরসিংহ'কে নিয়ে

CENTRAL LIBRARY

আসা হল। সেইসঙ্গে পাল্টে গেল মূলের অভিপ্রায়, আবহ ও মেজাজ। এলিঅটের 'অ্যাশ-ওয়েড্‌নেস্‌ডে'র ভাষান্তর বিষ্ণু দে করেছেন 'চড়কের গান'। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কি কারণে তুল্যতা সন্ধান করলেন অনুবাদক? কোন্ সাযুজ্যের সূত্রে বাঁধা পড়তে পারে একটি রোমান ক্যাথলিক অনুষ্ঠান-চিহ্নিত পবিত্র দিন ও বাঙালী হিন্দুর একটি শৈব-পার্বণ? 'অ্যাশ-ওয়েড্‌নেস্‌ডে'র প্রথম কবিতাটির অনুবাদের একস্থানে, মূলে যেখানে কোনো পৌরাণিক প্রসঙ্গ নেই, সেখানেও বিষ্ণু দে আরোপ করেছেন রামায়ণ-মহাভারতীয় উল্লেখ: মূলের

Desiring this man's gift and that man's scope
I no longer strive to strive towards such things
(Why should the aged eagle stretch its wings ?)

তাই রূপান্তরে হয়ে দাঁড়ায়:

এর ইন্দ্রপ্রস্থ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা
সাধ্যের সাধনে সব করিনাকো সাধ
(বৃদ্ধ জটায়ুর পাখা আর কেন উড়বে অবাধ?)

'অ্যাশ-ওয়েডনেস্‌ডে'র ৪ সংখ্যক কবিতার মূলে এক জায়গায় আছে:

Made cool the dry rock and made firm the sand
In blue of larkspur, blue of Mary's colour
Sovegna vos

Here are the years that walk between, bearing
Away the fiddles and the flutes, restoring
One who moves in the time between sleep and waking, wearing
White light folded, sheathed about her folded.

মূলের চিত্রকল্পটি অনুবাদে পরিবর্তিত হল, মেরীর স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন রাধা। বিষ্ণু দের ভাষান্তর তাই এইরকম দাঁড়াল

শীতল কে করে ঐ দগ্ধ গিরি, কালিন্দীর বালুতীর কে করে সংহত
অপরাজিতার নীলে যেই নীল রাধার অম্বরে
শুন বন্ধু কহে স্মরিও আষাঢ়ে
এখানে সে মধ্যবর্তী বর্ষগুলি নিয়ে যায় ধ'রে
মুরজ মুরলী সব, তুলে ধ'রে পুনর্প্রতিষ্ঠায়
সে একজনাকে যার আনাগোনা সুপ্তি আর জাগরের মধ্যকালে, প'রে
শুভ্র আলো পাটে পাটে, খাপে খাপে ঘিরে পাটে পাটে।

পাঠক তো জেনেশুনেই একটি কবিতার অনুবাদ পড়েন। সুতরাং ভিনদেশী মেজাজ বা আবহের সাক্ষাৎলাভই তো তাঁর কাছে প্রত্যাশিত। অতএব, ঈদৃশ বঙ্গীয়করণে যেভাবে মূলের চিত্রকল্প, মানসিকতা ও পুরাণ-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন তথা বিলোপ ঘটেছে তাতে অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। এ ধরণের রূপান্তর স্বতন্ত্র কবিতারূপে আস্বাদ্য হতে পারে, আদর্শ অনুবাদ হিসেবে কখনই বিবেচিত হতে পারে না। 'এরিয়েল পোয়েম্‌স'র 'এ সং ফর

CENTRAL LIBRARY

সিমেঅন'-এর অনুবাদ 'সিমেঅনের গান'-এ বিষ্ণু দে কিন্তু মূলের ভিনদেশী মেজাজ, নিসর্গ-পরিবেষ্টন ও পৌরাণিক উল্লেখকে প্রায় অটুট, অপরিবর্তিতই রেখে দেন, 'Lord, the Roman hyacinths are blooming in bowls...' এর অনুবাদ করেন 'প্রভু! আজ রোমান হ্যাসিন্থ টবে ফুটেছে ·····' এবং 'Let the infant, the still unspeaking and unspoken Word,/Grant Israel's consolation' এর ভাষান্তরে লেখেন 'এই শিশু অবতার তোমার বাণী অভাষিত আজও ভাষাহীন/দিয়ে যাক্ ইসরেয়েলের আশ্বাস।' মূল কবিতার ভাব ও ভাবনা, চিত্র, আবহ এবং মূল কবির মানসিকতা এখানে রূপান্তরে, অবিকৃতভাবে সঞ্চালিত হয়ে অনুবাদ কর্মটির চরিতার্থতা নির্দেশ করে।

কবিতার অনুবাদে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়, যখন মূল কবিতাটিতে থাকে ছন্দের বিচিত্র স্পন্দন, মিলের অনুপম বিন্যাসমাধুরী। এক ভাষার কবিতার ছন্দ ও মিলকে অপর ভাষার কবিতায় অবিকল রক্ষা করা ভাষাগত বৈষম্যের মূলগত কারণেই অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে অনুবাদে, মূলের ছন্দ ও মিলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি একটা আদল ধরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অনুবাদক এবং তাতে তাঁর উদ্ভাবনশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকরণদক্ষতার একটা কঠিন পরীক্ষা হবে। এই প্রসঙ্গে 'পরিচয়' পত্রে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের কবিতা-অনুবাদের আলোচনাসূত্রে ফরাসী ভাষা জ্ঞানী কবি ও অনুবাদক অরুণ মিত্রের একটি অনুধাবন মনে পড়ে—সনাতন ফরাসী ছন্দ 'আলেক্সান্দ্র্যা'কে, যা মোট বারোটি স্বরধ্বনির এক একটি ছত্র—বাংলায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছত্রের অক্ষরবৃত্তে রূপান্তরিত করাই বাঞ্ছনীয়—হ্রস্ব ছত্রের মাত্রাবৃত্তে মূলের চলন মেলে না।

ছন্দ ও মিলে সমৃদ্ধ কবিতার অনুবাদের দুরূহতা ও তাতে অসাফল্যের সমূহ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে কেউ কেউ প্রস্তাব করেন, যে মূল কবিতার ভাববস্তু ও অভিপ্রায়কে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে হলে অনুবাদে পদ্য নয় গদ্য ব্যবহারই যুক্তিসংগত। এমন কি কেউ কেউ এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, মূল কবিতার শব্দ-অবলম্বী বক্তব্যটিকে উপযুক্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ধরে দিতে হলে মূল কবিতার আক্ষরিক গদ্য-ভাষান্তর বা প্যারাফ্রেজই সমীচীন। মূল লাতিন থেকে হৃষীকেশ বসু ও রবের আঁতোয়ান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ভার্জিলের 'ঈনীড'-এর মুখবন্ধে, অনুবাদকদ্বয়, কাব্যের অনুবাদে গদ্য কেন তাঁরা প্রয়োগ করলেন সে সম্বন্ধে বলেছেন যে—অনুবাদ পদ্যে করলে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য থাকতো ছন্দের দিকে। তার ফলে অনুবাদ্য মহাকাব্যের চিন্তা ও ভাব এক কৃত্রিম কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশের পথ পেতো না। ঈনীডের অনুবাদে তাঁদের লক্ষ্য হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সাধ্যমতো এড়িয়ে না যাওয়া এবং নূতন কিছু সংযোজন না করা। এইজন্য তাঁরা ছন্দের চেয়ে ঈনীড-এর পুনর্বিন্যাসে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।—উক্ত অনুবাদকদের যুক্তি কিন্তু গ্রহণীয় মনে হয় না। কারণ আমরা তো জানি সার্থক কাব্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত—ছন্দ সেখানে চিন্তা ও ভাবের একটি কৃত্রিম কাঠামো অর্থাৎ নিছক একটা বহিরঙ্গ কৌশলমাত্র কখনই নয়, প্রসঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার অত্যাজ্য সহচরে পরিণত। বুদ্ধদেব বসু অনূদিত 'রাইনের মারিয়া রিলকে-র কবিতা'য় দেখি—'অর্ফিয়ুস। ইউরিদিকে। হের্মিস' ও 'ভেনাসের জন্ম' কবিতা দুটি বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের 'টীকা'য় অনুবাদক এই স্বাধীনতাগ্রহণের কৈফিয়ত দিয়েছেন। 'অর্ফিয়ুস। ইউরিদিকে। হের্মিস', 'ভেনাসের জন্ম' ও 'বারাঙ্গনাদের কবর'—এই তিনটি কবিতার প্রথম লেখন ছিল গদ্যে, পরে রিলকে সেগুলিকে অমিত্রাক্ষরে ছন্দোবদ্ধ করেন। আর আদিতে গদ্যকবিতা ছিলো ব'লে 'অর্ফিয়ুস ইউরিদিকে হের্মিস' ও 'ভেনাসের জন্ম'-এর গদ্য অনুবাদ করতে অনুবাদকের বিবেকে বাধেনি। (পৃ. ১৮৫) প্রশ্ন জাগে, পূর্বোক্ত তিনটি গদ্যলেখনকে পরবর্তীকালে রিলকে অমিত্রাক্ষরে ছন্দোবদ্ধ করলেন কেন? নিশ্চয়ই

CENTRAL LIBRARY

রিলকের মতো তন্ময়, অবিরল উৎকর্ষপ্রয়াসী, সচেতন কবি, তাৎপর্যহীন অগভীর কোনো খেয়ালে মজে নয়, সৃজন-প্রেরণার কোনো অন্তর্লীন তাগিদেই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন, অনুভব করেছিলেন যে ঐ কবিতা তিনটির ভাববস্তুর উপযুক্ত বাহন অমিত্রাক্ষর পদ্য ছন্দই, গদ্য ছন্দ নয়। সুতরাং ঐ কবিতাগুলির গদ্য-রূপান্তরে পরবর্তী লেখনের মূলগত অভিপ্রায় ও তাৎপর্য তথা রসাবেদন যে কিছুটা অন্ততঃ ক্ষুণ্ণ হবে সেটাই স্বাভাবিক। পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যরচয়িতাদের প্রবল আগ্রহের যে দ্রুত ক্ষয় আমরা বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছি তার একটা প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর অসামান্য ছন্দ ও মিলের গৌরবচ্যুত হয়ে গদ্যে আশ্রিত হয়েছিল। ক্ষুব্ধ, শ্রান্ত, দ্বন্দ্ব-মথিত প্রতীচী কিছুকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ভাববস্তুর নতুনত্বে বুঁদ হয়ে শান্তি খুঁজেছিল (নীরদ সি. চৌধুরীর নাটকে ও চড়ারডের কথনভঙ্গিতে এবং ঝাঁজালো ভাষায়—'...হোয়াট দি ওয়েস্ট লাউড ইন্ হিজ রাইটিংস ওয়াজ, ইন্ এ ম্যানার অফ স্পিকিং, এ সুইটলি সেটেড রুম-ফ্রেশনার, ফর দি ষ্টাফি অ্যাটমোসফিয়ার অফ্ ইটস মেটাল লাইফ বিফোর্ দি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার' – টেগোর অ্যাণ্ড দি নোবেল প্রাইজ—দি ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি অফ ইণ্ডিয়া—১১ই মার্চ, ১৯৭৩) শ্রান্তিহারক অভিনবত্বের সে মোহ টুটে যাবার পর নিছক কাব্যসৃষ্টি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতাকে বিচার করে, তাতে আপন সৌন্দর্যচেতনা ও বিস্ময়বোধ পরিতৃপ্ত হবার মতো বিশেষ কিছু, প্রতীচীর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যগ্রহীরা খুঁজে পেলেন না।

সাধারণভাবে, স্বভাবধর্মের দিক দিয়ে, গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য স্বীকার করতেই হবে। আমাদের প্রাত্যহিক দিনযাপন, তার তুচ্ছ গতানুগতিক অনেক কৃত্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িয়ে আছে গদ্য। পদ্যে রচিত কবিতার সাধারণ গদ্য-ভাষান্তরে তাই সম্যক্ সম্ভাবনা রয়েছে মূল কবিতার ঐশী উদ্ভাসন ম্লান হয়ে যাওয়ার, বচনাতীতের ইশারা হারিয়ে যাওয়ার—পদ্য কবিতার অনুবাদে পদ্য রক্ষা করলে যার কিছুটা ধরে রাখাও অন্তত অনেকটা সহজ হয়। অবশ্য সব শ্রেণীর কবিতাই এ-ধরণের গদ্যরূপান্তরে সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 'হোমার-এর 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'র মতো মৌখিক মহাকাব্য—যার প্রধান লক্ষ্য বিশাল স্মরণীয় ঘটনাবলীর দ্রুত আকর্ষক বিবরণ প্রদান, তারই ক্ষতি হয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। ভার্জিলের ঈনীডের মতো লিখিত মহাকাব্য যাতে ভাষা বা প্রকরণের সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রতিও কবির মনোযোগ থাকে তার গদ্যরূপান্তরে ক্ষতি হয় স্বভাবতই এর চেয়ে বেশী। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিমুখ্য গীতিকবিতার। এবং 'গীতিকবিতা' এই ব্যাপক অভিধার উদার আশ্রয়ে অবশ্যই ঠাঁই পাবে দ্যোতনাজটিল আধুনিক কাব্যের এক বিপুল সৃষ্টিসম্ভার। যাই হোক, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে পদ্যরচিত কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে অনূদিত কবিতার পাশাপাশি গদ্য ভাষান্তর থাকলে অবশ্যই সুবিধা হয়, কিন্তু তা বলে ঐ কবিতার অনুবাদ একেবারেই পদ্যে না করে তার স্থানে নিছক গদ্য-রূপান্তরকে হাজির করলে মূলের রসগৌরবের বিশেষ হানি হয়।

কবিতার অনুবাদে আরও সমস্যা দেখা দেয়, যখন অনুবাদক মূল ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ না করে প্রধানতঃ অন্য একটি ভাষার অনুবাদের মধ্যস্থতাতেই তার সম্মুখীন হন। বাংলা ভাষায় ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় বা হিস্পানি ভাষার কবিতা-অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজী অনুবাদকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিছক একটি অনুবাদের অনুবাদ করলে বিকলতারই সম্ভাবনা সমধিক। কারণ তখন মূল ও অনুবাদে এমনিতেই বেশ কিছুটা ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। তদুপরি ইংরেজী অনুবাদটিতে মূলের বহুল বিকৃত উপস্থাপন থাকলে, অকারণ অযৌক্তিক হানিকর স্বাধীনতা নেওয়া হলে, বাংলা অনুবাদটি ইংরেজি অনুবাদের প্রতি যতই 'বিশ্বস্ত' হোক

CENTRAL LIBRARY

ও অনির্ভরযোগ্য অনুবাদ বলেই গণ্য হবে। এক্ষেত্রে যদি অনুবাদ করার সময় মূল ভাষার অভিধান (যাতে মূল ভাষার ইংরেজী অর্থ দেওয়া আছে), মূল রচনার একাধিক ইংরেজী আক্ষরিক গদ্য-রূপান্তর, একাধিক ইংরেজী কাব্যানুবাদ, সমালোচকদের ব্যাখ্যা—এসব পর্যালোচনা করে, সম্ভব হলে মূল-ভাষাবিদ এক বা একাধিক ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে, সতর্ক পদক্ষেপে এগোনো যায়, তাহলে মূল রচনার সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয়ের অসুবিধা বোধহয় বেশ কিছুটা কাটানো সম্ভব হতে পারে। প্রায় এইভাবেই বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ার, হেল্ডারলিন ও রিলকের কবিতা অনুবাদ করেছেন। প্রায় এইভাবেই সম্প্রতি দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'শিকড়ের ডানা' বইটিতে হিস্পানি কবি হুয়ান রামোন হিমেনেথ-এর কবিতার রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

CENTRAL LIBRARY

বলাকা-কাব্য-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

বড়ো কবি শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতে পারেন কিনা এই তর্ক সব দেশে সব কালেই উঠেছে আবার সৃষ্টিশক্তি ও সমালোচনী-প্রতিভা যে যুগপৎ একই ব্যক্তিতে অবিরোধে অবস্থান করতে পারে তারও প্রমাণ আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ইতিহাসে কালে কালেই পাওয়া গেছে। দান্তে, গ্যেটে, পোপ, ড্রাইডেন, বেন জনসন, ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরিজ, ম্যাথু আর্নল্ড, টি. এস. এলিয়ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবি-সমালোচকদের নাম যেমন এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে তেমনি যাযাবরীয় রাজশেখর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রাচ্য কবি-সমালোচকদের কথাও মনে পড়বে বড়ো কবি হলেই যে কাঁচা ক্রিটিক হতে হবে কিংবা ভালো সমালোচক হলেই হতে হবে ব্যর্থ কবি এমন কথা আমাদের গ্রহণীয় নয় বলেই মনে হয়। বরং অস্কার ওয়াইল্ডের মতো আমাদেরও ধারণা বিচারবুদ্ধি না থাকলে কোনও রকম শিল্পসৃষ্টিই সম্ভব নয়। সমালোচনা কাজটি সৃষ্টি কর্মেরই আনুষঙ্গিক। কাব্যসৃষ্টিকালে কবির অন্তরে একজন ক্রিটিক বিরাজ করেন, তাঁরই নির্দেশে কবি নিজের লেখা নিজে কাটাকুটি করেন, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্জন, পরিবর্তন করেন। কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট এই কারণেই সৃষ্টিকর্মের বেশীর ভাগ শ্রমকেই সমালোচনামূলক শ্রম বলেছেন। বস্তুত, অতি প্রখর অনুভূতির সঙ্গে মানসক্রিয়ার সহযোগিতাই কবির কাব্যকে সার্থক করে তোলে, সমালোচনাবৃত্তিকে তাই সৃষ্টিকর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলা চলে।

যিনি বড়ো কবি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা লেখা তাঁর পক্ষে যদি অসম্ভব না-ও হয় কিংবা যিনি সমালোচক তাঁর পক্ষে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সম্ভব হয়-ও তবু কোন কবির পক্ষে তাঁর নিজের কাব্যের সমালোচনা – তাঁর কবিতা সৃষ্টির মানস-রসায়ন-প্রক্রিয়া যুক্তিসিদ্ধভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। সংশয়ের প্রথম কারণ, সমালোচনা কথাটি যে বিশিষ্ট অর্থে আমরা প্রয়োগ করে থাকি কোন কবির পক্ষে সেই বিশিষ্ট অর্থে নিজের কাব্য সমালোচনা সম্ভব নয়। ইংরেজী যে 'ক্রিটিসিজ্‌ম' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সমালোচনা কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার মধ্যে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পরিচয় প্রদান ছাড়াও বিচার বা মূল্যায়নের প্রশ্ন জড়িত আছে, এমন কি ক্রিটিসিজ্‌মের মধ্যে বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটাই প্রধান একথা বললে ভুল হবে না। কবির পক্ষে নিজের কাব্যের সেইরকম বিচার আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। কারণ এইরকম মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন নিজ কাব্য সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। সমালোচনাকালে নিজের কাব্যকেও দেখতে হবে পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে। নিজের রচনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিতে না পারলে, ম্যাথু আর্নল্ড যাকে বলেছেন Indian virtue of detachment, সেই নিষ্কামতা না আনতে পারলে নিজের লেখার ঠিক সমালোচনা করা সম্ভব নয়। স্রষ্টা, বিশেষ করে যিনি গীতিকবি তাঁর পক্ষে নিজের লেখার সেইরকম নিষ্কাম বিচার সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ হয়।

আবার টি. এস. এলিয়টের অনুসরণে বলা যায়, কাব্যের ব্যাখ্যা সমঝ্‌দার সমালোচককে তার সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, কবি নিজে সেই সীমা প্রায়শই লঙ্ঘন করেন না বা সে সীমার বাইরে গিয়ে তিনি হয়তো স্বস্তি বোধ করেন না। ফলে কবির কাছে তাঁর নিজের কবিতা অনেক সময় একটি বিশেষ অর্থের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে –এটা কোন কবিতার রসাস্বাদনের পক্ষে হানিজনক। এ ছাড়া কবি যে দৈব অনুপ্রেরণা বা Inspiration

CENTRAL LIBRARY

বশে কাব্যসৃষ্টি করেন কাব্যসৃষ্টির পরে সেই দিব্য আবেশ যখন আর থাকে না তখন রহস্যকুহেলি ঢাকা কবিতার সৃষ্টিপ্রেরণার কথা তিনি নিজে বাইরের কোন সমালোচক অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম না-ও হতে পারেন। বিশেষ করে কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যসমালোচনার মধ্যে কাল ত ব্যবধান যদি যথেষ্ট বেশী হয় তবে সৃষ্টির পরমুহূর্তে কাব্যের যে অর্থ তাঁর নিজের কাছে স্পষ্ট ছিল—যদি আদৌ সেরকম কিছু থাকে—তবে সেই অর্থ পরবর্তী সময়ে কাব্য ব্যাখ্যাকালে পরিবর্তিত হতে পারে অথবা সৃষ্টিকালীন অর্থ ও তাৎপর্য কবি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারেন।

এ ছাড়া আছে ভদ্রতা বা সৌজন্যবোধের প্রশ্ন, নিজের কাব্য সম্পর্কে স্বাধীন মতামত প্রকাশ বা বাধামুক্ত রসবিচারকে যা প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত করে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই প্রমাণ—

> 'পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এই জন্যে যে নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে একাজ করা যায় না।[১]'

অথচ কবির কাছ থেকে কবিতার জন্ম ইতিহাস—রচনার উপাদানগত পরিচয়—ভাব, উৎস ও প্রেরণা সম্পর্কে যে রকম নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়, যদি অবশ্য সে বিষয়ে কবি স্বয়ং কিছু বলার চেষ্টা করেন,—এমন আর কারও কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব নয়। রচনার ইতিহাস তথা জন্মগত পরিচয় কবির নিজের পক্ষেই একমাত্র জানা সম্ভব, আর সেই কারণেই সীমিত অর্থে হলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য বাইরের সমালোচক অপেক্ষা কবি নিজের কাব্যের যোগ্যতর বোদ্ধা - কবিমানসের যথাযথ পরিচয় দানে কবিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক। প্রত্যেক শিল্পকর্মেই শিল্পকলার গোড়াকার অনুবেদন হয় সেই শিল্পীরই মনে। অতএব কবির নিজের কাব্যসম্পর্কে তাঁর বিচারটাই সবচেয়ে দরকারী, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে মূল্যবান। এ বিষয়ে এলিয়টের আপোষহীন দাবীর কথা স্মরণযোগ্য—

> I maintain even that the criticism employed by a trained and skilled writer on his own work is the most vital, the highest kind of criticism ; and that some creative writers are superior to others solely because their critical faculty is superior.[২]

অবশ্য মহৎ কবিরা তাঁদের নিজের নিজের কবিতা সম্পর্কে সাধারণতঃ নীরব থাকেন। 'নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজে বিচারক হওয়া বে-দস্তুর' বিবেচনায় কবি-শিরোমণি রবীন্দ্রনাথও 'নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ' থেকে বিরত থাকতেই চেয়েছেন, কিন্তু দায়ে-পড়ে নিজের লেখার সপক্ষে ওকালতি তাঁকে বারবারই করতে হয়েছে। রবীন্দ্রকবিতা বোঝা যায় না—তা অস্পষ্ট, অবাস্তব এই ধরণের অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অপটু হাতের রচনা থেকে শুরু করে শেষজীবনের উৎকৃষ্ট কবিতা পর্যন্ত বারবারই কবিকে শুনতে হয়েছে। সেই বদনাম রবীন্দ্রকাব্য বোঝার পক্ষে বাধা-সৃষ্টি করবে এই আশঙ্কায় কাব্য বোঝাবার কাজেও কবিকে হাত দিতে হয়েছে। শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরেই নয়, ভক্ত অনুরাগী শ্রোতা ও পাঠকের অনুরোধে কিংবা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপনাকালে সমঝদার পাঠকরূপেই নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর নানা মূল্যবান প্রবন্ধ ও ভাষণ আমরা যেমন পাই, সেইসব রচনায় প্রসঙ্গক্রমে নিজের লেখার বিষয়েও লেখককে অনেক কথাই বলতে শোনা যায়। এইভাবে বাইরের ও ভিতরের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে নিজের লেখা সমালোচন এত বেশী পরিমাণে

১. সূচনা, নৌকাডুবি, রবীন্দ্ররচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ১৬৫

২. The Function of Criticism—*Selected Essays*, T. S. Eliot (1951), p. 30.

CENTRAL LIBRARY

করতে হয়েছে যে পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক নিজের লেখা সম্পর্কে এত কথা বলেন নি। সমগ্র রবীন্দ্র রচনা অনুসন্ধান করলে এ জাতীয় লেখা এত প্রচুর পরিমাণে আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর কবি শিরোমণিদের মধ্যে প্রথম স্থান দিতে হবে। আপাতভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বসাহিত্য সমালোচনা বিক্ষিপ্ত-ও পরিমাণে খুব অল্প বলে মনে হয় কিন্তু সন্ধান নিলে দেখা যাবে তা পরিমাণে যথেষ্ট ব্যাপক। আবার শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, বক্তব্যের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ-কৃত রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার গুরুত্ব অসাধারণ বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

স্বসাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়, আমরা সে চেষ্টাও করব না। রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যখানি সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং ঐ কাব্যের কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতার কবিকৃত আলোচনা আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বকাব্য সমালোচনার রীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করব, সেই সঙ্গে কবির নিজের কাব্যের আলোচনার জাতিচরিত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করারও ইচ্ছা আছে।

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলী থেকে 'বলাকা' কাব্যখানিকে বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—'কবিকাহিনী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সমস্ত কাব্যের কবিকৃত আলোচনা অনুসন্ধান করে আমরা দেখেছি 'বলাকা' সম্পর্কেই কবির নিজের আলোচনার পরিমাণ সবচেয়ে-বেশী। আলোচনার পরিধিই যে শুধুমাত্র বিস্তৃত তা নয়, তার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকালে কবি সমালোচক হয়তো তাঁর আরও অনেক কাব্যকবিতার আলোচনা করেছিলেন কিন্তু 'বলাকা' কাব্য ছাড়া তাঁর কোনও একখানি মাত্র কাব্যসম্পর্কে এইরূপ ধারাবাহিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের হাতে আসেনি। কবিতা রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালে কবি বলাকার অনেকগুলি কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছিলেন ফলে কবির কাব্যের সৃষ্টি-রহস্য, কবিতার জন্মকথা অনেক বেশী সার্থকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবিতাগুলি রচনার প্রায় সমকালেই কবি যে এই কাব্য আলোচনা করেছিলেন তাতেই প্রমাণিত হয় বলাকা কাব্যখানি তিনি তাঁর অন্যান্য বইয়ের মত দেখেন নি—এই কাব্যের প্রতি কবির বিশেষ একটু প্রীতি-পক্ষপাত ছিল। রবীন্দ্র কাব্যধারার মধ্যসীমায় স্থাপিত এই কাব্যখানিতে শুধু রবীন্দ্রকবিতার পালাবদলই নয়, বাংলা কাব্যেরও নতুন সূচনা লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের ভাষা-ছন্দ ও ভাব-কল্পনা প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে এই কাব্যের রসগ্রহণে কবির নিজের টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজনীয়তার কথা কবি স্বয়ং হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত কবিতাগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল - 'ঝড়ের খেয়া' প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তি সে যুগে যুবজনের কণ্ঠে কণ্ঠে শোনা যেত (তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' দ্রষ্টব্য)। বলাকার বাণী যে যৌবনেরই বাণী সে কথা কবিতায় প্রকাশ করেই কবি খুশি ছিলেন না, তিনি 'পৌষের পাতাঝরা তপোবনে' বসে নবতর যৌবনের বাণী আমাদের বুঝিয়ে দিতেও হয় তো উৎসাহিত ছিলেন। তাই কিছুটা অপরের তাগিদে, কিছুটা স্বেচ্ছায় কবি এই কাব্যের আলোচনা করেছিলেন বলেই আমাদের অনুমান।

বলাকা কাব্য আলোচনার আরো বিশেষ একটি কারণ আছে। এই কাব্যের কোনও কোনও কবিতার এবং কবিতা আলোচনারও খসড়া রূপটি দেখার সুযোগ আমাদের ঘটেছে, তার ফলে কবিতার পাঠান্তর ও আলোচনার রূপান্তরের তুলনামূলক সমালোচনায় কবিচিত্তের ও সমালোচক-মানসের ক্রমবিকাশের রূপটি বুঝে নেওয়ারও সুবিধা পাওয়া গেছে। পাঠান্তর বিচার কবিতার রসবিচারেরই অঙ্গ, আর এই রসবিচারে কবি-সমালোচকের সহায়তা পাওয়া গেলে কবিতা বোঝবার অনেক সুবিধা হয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

CENTRAL LIBRARY

ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, রবীন্দ্র কবিজীবনে যেমন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ কৃত রবীন্দ্র কাব্য আলোচনায় 'বলাকা' কাব্যখানির গুরুত্ব সমধিক। এই বিশেষ গুরুত্বের জন্যই আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বলাকা কাব্যখানিকে নির্বাচন করেছি এবং এই কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-বক্তব্য—কাব্য রচনার সমকালীন ও পরবর্তী—একত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা স্বকাব্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছি।

কবি অবশ্য এই কাব্য তথা সাধারণভাবে তাঁর নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা পূর্বাহ্নেই আমাদের জানিয়ে রেখেছেন—

> "কবি নিজের কবিতা যখন ব্যাখ্যা করে তখন তার কথারই যে প্রামাণ্য আছে তা নয়, কবিতা লেখা হয়ে গেলে সে অন্য পাঠকদের সমশ্রেণীয়। সে কেবল তার হৃদয়াবেগের ইতিহাসের কথা বলতে পারে, কারণ রচনাকালের সমস্ত আনুষঙ্গিকতার সেই সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী। কিন্তু কবিতার মর্মগত অর্থ অপরেরও আবিষ্কার করবার ও ব্যাখ্যা করবার অধিকার আছে।"[৩]

যিনি স্বয়ং স্রষ্টা তার পক্ষে লেখা হয়ে যাওয়ার পর কবিরূপে তাঁর নিজের লেখার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়, যদি তা সম্ভব হয়ও তবু সেই ব্যাখ্যাই তার কবিতা সম্পর্কে একমাত্র অথবা প্রামাণ্য এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। কিন্তু কবিতার জন্মকথা, রচনাকালের আনুষঙ্গিকতার ইতিহাস বিবৃত করে তিনি তাঁর কাব্যের সমালোচনায় ক্রিটিককে সহায়তা করতে পারেন, আর তিনি নিজে যদি হন রসজ্ঞ পাঠক তবে পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের কবিতার রসবিচার করতেও তাঁর বাধা নেই। এই কারণেই রবীন্দ্র কাব্যরসিক ও ভক্ত পাঠকদের নির্বন্ধাতিশয্যে কবিকে শান্তিনিকেতনে 'বলাকা' অধ্যাপনা কালে নিজের কাব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে হয়েছিল। সেই ইতিহাস বলতে গিয়ে কবি প্রথমেই বলেছিলেন এই কাব্যরচনার প্রেরণার কথা।

'বলাকা'র কবিতাগুলি রচনার সাক্ষাৎ প্রেরণা হিসাবে কবি নিজে 'সবুজপত্রে'র তাগিদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে সবুজপত্র' বলে যে অভিনব পত্রিকাখানি আত্ম-প্রকাশ করে সেই উপলক্ষেই বলাকার প্রথম কবিতা "সবুজের আহ্বান" রচিত হয়। এই কবিতার বক্তব্য গদ্যে "বিবেচনা ও অবিবেচনা" নামক 'কালান্তরে'র এক প্রবন্ধে কবি বিশদ করেন—তাও একই সঙ্গে 'সবুজপত্রে'র পাতায় ছাপা হয়। 'গীতাঞ্জলি' পর্ব থেকে 'বলাকা'র পর্বে কবির যাত্রা তথা তাঁর অন্তর্জীবনের ভাব পরিবর্তনের বাইরের কারণরূপে সবুজপত্র প্রকাশ ও বলাকার কবিতা রচনায় প্রমথ চৌধুরীর তাগিদের কথা হয়তো উল্লেখ করা যায় কিন্তু আমরা জানি ফরমাশী কবিতা লেখা কোনও দিনই কবির প্রকৃতিগত নয়। তাঁর নিজের কথাই এ ব্যাপারে স্মরণ করা চলে। কবি লিখেছেন,—

> "ফরমাশ ব্যাপারটা মোটর গাড়ির স্টার্টারের মতো। চালনাটা শুরু করে দেয়। কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। কবিতা-গুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল-ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখকের আনন্দই সারথি হয়ে বসে।"[৪]

---

৩. গ্রন্থ পরিচয়, বলাকা (১৩৭১), পৃ. ১১৯

৪. গ্রন্থ পরিচয়, মহুয়া, রবীন্দ্ররচনাবলী (১৭শ খণ্ড), পৃঃ ৪২৭

CENTRAL LIBRARY

বলাকার কবিতা রচনায় সবুজপত্র তথা প্রমথ চৌধুরীর ফরমাশের তাগিদ এই কাব্য রচনার ব্যাপারে নিতান্তই বহিরঙ্গ কারণ, আসল কারণ এই সময় কবির মনে কাব্যের পালা বদলের একটা আন্তরিক প্রেরণা এসেছিল। পূর্ববর্তী গীতাঞ্জলি পর্বের সঙ্গে বলাকা পর্বের ভাব পার্থক্য কবি নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন বলাকা ব্যাখ্যা-কালে। কবি বলেছেন —

> "পূজাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবি এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গণ্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় তো ডাকতে হবে।"[৭]

বিধাতার সেই আহ্বান শঙ্খকে ধূলায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে তুলে নিতে হল কবিকে, পূজার ঘর থেকে তাঁকে বাইরে আসতে হল—বৃহত্তর ও মহত্তর কাজের প্রয়োজনে। নিজের আন্তরিক প্রেরণা বশে, জীবনদেবতার অমোঘ নির্দেশে, লেখবার অলৌকিক আনন্দেই কবি বলাকার কবিতাগুলি লিখে গেছেন। আর বলাকা রচনার এই আন্তরিক প্রেরণার কথা কবি নিজেই বলেছেন এই কাব্য রচনার পাঁচ বছর পরে বিশ্বভারতীর সাহিত্যালোচনার ক্লাসে বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনাকালে। ১৯২১ সালে কবি ধারাবাহিকভাবে বলাকার মোট ৪৫টি কবিতার মধ্যে ২৬টি কবিতার যে মুখে মুখে আলোচনা করেন শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত তার অনুলিখন ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩৩০ মাঘ মাসের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। বলাকার রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণের গ্রন্থ পরিচয় অংশে তা আনুপূর্বিক সংকলিত হয়ে বর্তমানে আমাদের সহজলভ্য হওয়ায় বর্তমান প্রবন্ধে কবির বক্তব্যের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কবির সেই মূল্যবান বক্তব্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও সেই বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকলে আমরা তাই বলতে চেষ্টা করব। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের সৌজন্যে বলাকার সেই অনুলিখনের মূল পাণ্ডুলিপির যে অংশ মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় কবি সেই পাণ্ডুলিপিতে স্থানে স্থানে যোগ বিয়োগ করে তা সম্পাদন করতেও ত্রুটি করেন নি। সম্পাদনাকালে অনেক অংশ পরিবর্জিতও হয়েছে। কবি কর্তৃক বলাকা আলোচনার এইরূপ পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত পাঠের এক পৃষ্ঠার 'ফটোস্টাট' এই সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

'দুইনারী' কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কৃত অনুলিপির যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে তাতে বামদিকে শ্রীসেনগুপ্তের অনুলিপি দক্ষিণ দিকে কবির হস্তাক্ষরে উক্ত আলোচনায় সংশোধিত রূপটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্জন চিহ্ন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে পরবর্তী পৃষ্ঠায় 'রঘুবংশ', ঋতুসংহার', 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-কালিদাসের এই তিন কাব্যের যে আলোচনা কবি বক্তৃতা দান কালে করেছিলেন অনুলিপি সংশোধনকালে তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন দেখা যায়।

যে দুই শ্রেণীর নারী শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বরাবর আকর্ষণ করে এসেছে সেই দুই জাতের মেয়ের কথাই কবি বলাকার ২৩ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন —

কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।

---

৭. গ্রন্থ পরিচয়, বলাকা (১৩৭১), পৃঃ ১১৭

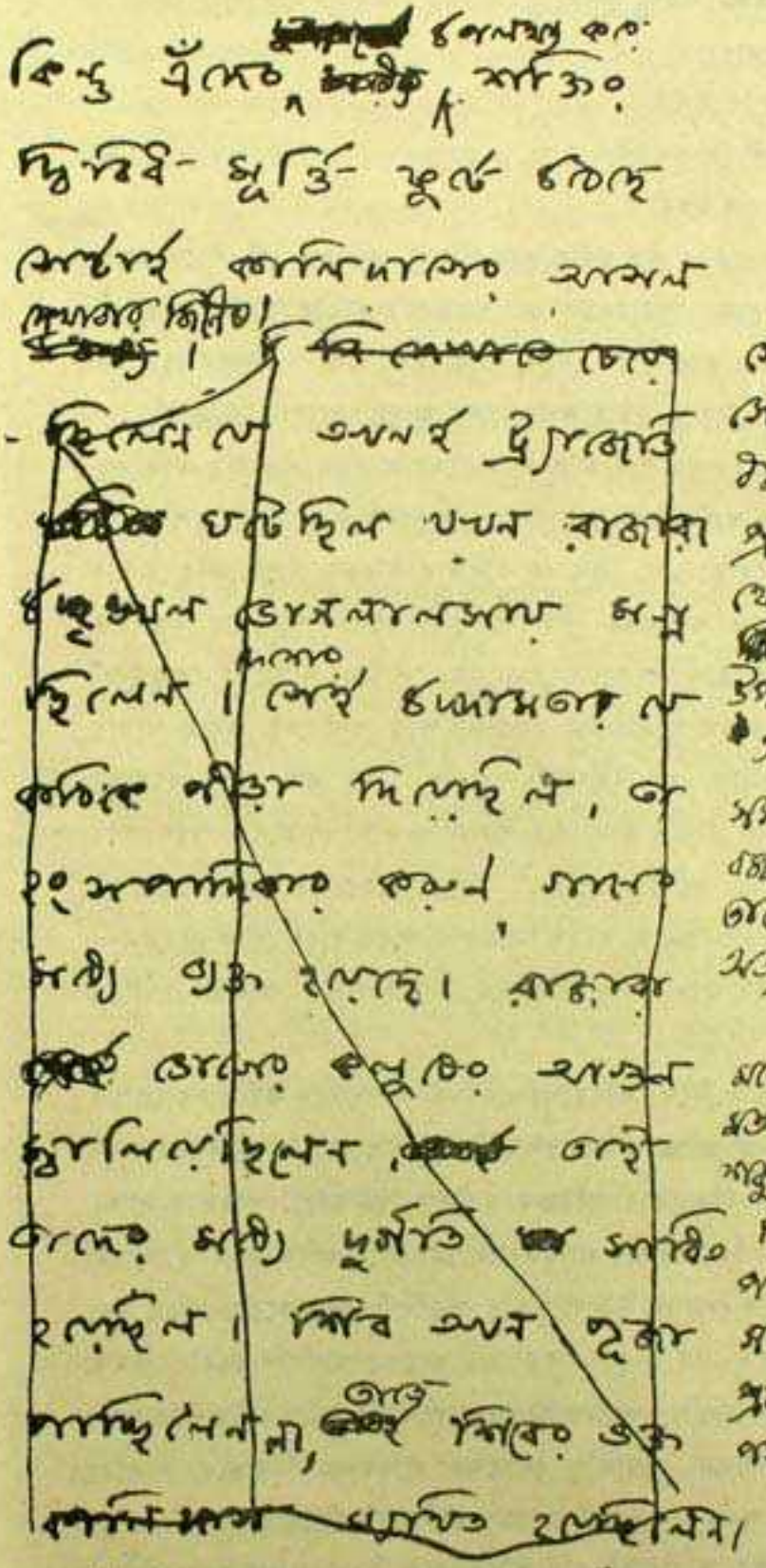

বলাকার ২৩ সংখ্যক কবিতার কবিকৃত আলোচনার মূল পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।
প্রতিলিপি অনুলেখক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেনগুপ্তের বিশেষ সৌজন্যে প্রাপ্ত।

CENTRAL LIBRARY

একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই দুই নারী তত্ত্বে কবির উপর কালিদাসের প্রভাব যে কত গভীর তার পরিচয় কবিকৃত এই আলোচনার মধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে। কবি কালিদাসের দুই বিখ্যাত রচনা 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'য় নারীর মধ্যেকার এই দুই মূর্তি কেমন উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে তার আলোচনা করে কবি বলতে চেয়েছেন গৌরী ও শকুন্তলা দুজনেই নারী 'কিন্তু এঁদের উপলক্ষ করে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিষ।'

আলোচনার অনুলিপির মূল পাণ্ডুলিপিতে আমরা দেখতে পাই কবি কালিদাসের কাব্য আশ্রয়ে তাঁর অতিপ্রিয় দুই নারী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' 'শকুন্তলা' ছাড়াও রঘুবংশ' 'ঋতু-সংহার' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' – এই তিন কাব্যের উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই কবিতার কবিকৃত আলোচনার যে পাঠ মুদ্রিত হয়েছে তাতে দেখা যায় শেষোক্ত তিনখানি কাব্যের আলোচনা বাদ দিয়ে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার বিস্তারিত আলোচনার উপরেই কবি-সমালোচক অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এমন কি 'প্রাচীন সাহিত্যে' "শকুন্তলা" সমালোচনায় কবি দীর্ঘকাল আগে (১৩০৯ আশ্বিন) যে কথা বলেছিলেন বিশবছর পরে কবি সেই কথাই আবার উল্লেখ করেছেন। কবিগুরু গ্যেটের শকুন্তলা সমালোচনার সেই বিখ্যাত চারপংক্তি 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে' স্মরণ করে কবি এখানে গ্যেটের ফাউস্ট কাব্যেই তাঁর সেই সমালোচনা প্রয়োগ করেছেন। কবির নিজের কাব্য আলোচনায় এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কবিরা কা বার সমালোচনায়, তা সে নিজের বা পরের যারই হোক না কেন— যে উক্তি করেন তা যে নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়, তার মধ্যেও যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে কবিগুরু গ্যেটের কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইভাবে কাব্য ব্যাখ্যাকালে কবিকথিত ও অনুলিপিতে কবির স্বহস্তলিখিত সংশোধনে কবির সমালোচক মানসের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে কবির স্বকাব্য সমালোচনার স্তরপরম্পরাটি সুস্পষ্ট হয়েছে আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গেই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন রচিত 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'য় বিধৃত 'দুই নারী' কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনার কথা উল্লেখ করা চলে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সাহিত্যালোচনা ক্লাসে বলাকার যে আলোচনা কবি করেছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন ও শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত সেনগুপ্ত উভয়েই তার অনুলিপি গ্রহণ করেন, কিন্তু উভয় অনুলেখকের বিধৃত পাঠে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য দুজন অনুলেখকের অনুলিপি রচনার ক্ষমতা পার্থক্যেরই পরিচায়ক নয়, দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী তথা অনুলিপি লিখনের উদ্দেশ্য-পার্থক্যেরও পরিচায়ক। একজনের উদ্দেশ্য যেখানে বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, অপরজন সেখানে অনুলিপি লেখকের দায়িত্বটুকু নিষ্ঠাভরে পালনের মধ্যেই নিজের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অবশ্য বলাকাকাব্য আলোচনায় ক্ষিতিমোহন সেন রচিত গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ ঐ গ্রন্থে বলাকার সব কবিতারই কবি-কথিত বলে বিবৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা পাওয়া যায়, এ ছাড়াও বলাকার নানা কবিতার ভূমিকারূপে কবি নানাসময়ে যে-সব কথা বলেছিলেন কবির কথামতো সেগুলি একত্র করে সাজিয়ে আচার্য সেন বলাকার যে গ্রন্থভূমিকা রচনা করেছেন সেটিও এই কাব্যগ্রন্থ

CENTRAL LIBRARY

আলোচনায় বিশেষ সহায়ক ; বলাকার ছন্দ নিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনের আলোচনাটিও মূল্যবান। কিন্তু বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত সেনগুপ্তের অনুলিপিকে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে অধিকতর প্রামাণ্য মনে করেছি, তার কারণ রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্র বক্তব্যই আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধান আলোচ্য, আর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অনুলিপি আদ্যন্ত কবিরই কথা—কবি কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত লেখা। পক্ষান্তরে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ব্যাখ্যা ও আলোচনা বিভিন্ন সময়ে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ধরে নানাজনের সঙ্গে বলাকা সম্বন্ধে কবির আলোচনার অনুলিখনের সংকলন এবং এইসব অনুলিখন কবি স্বয়ং দেখে দিয়েছিলেন কিনা লেখক সেকথা বলেন নি বরং এই আলোচনা যে লেখক কর্তৃক বিশেষভাবে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রমাণ প্রতিটি আলোচনার অঙ্গে অঙ্গে আছে। ফলে কবির নিজের কাব্য সম্পর্কে তাঁর নিজের খাঁটি কথাটুকু এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য নয়। সেই খাঁটি কথা আছে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অনুলিখনের মূল পাণ্ডুলিপিতে। আমরা তাই ঐ পাণ্ডুলিপি লিখনের উপরে এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছি—পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত অংশের উপরেই নয় কবিকর্তৃক পূর্বে কথিত কিন্তু পরে বর্জিত অংশের দিকেও আমরা দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অনুলিপির মূল পাণ্ডুলিপিতে কবিকর্তৃক সংশোধন পরিবর্জন ও পরিমার্জনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে আমরা নমুনা স্বরূপ এক পৃষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছি মাত্র—আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আরও দু-একটি কবিতার আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে। বলাবাহুল্য সর্বক্ষেত্রেই প্রতিলিপি দেওয়া সম্ভব হয়নি, আমরা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করে দিয়েছি মাত্র।

বলাকার ছয় নম্বর কবিতার (ছবি) আলোচনা অজস্র বর্জন চিহ্নযুক্ত। এই কবিতায় কবির ব্যক্তিগত একটা বেদনার কথা আছে। কবি সেই বেদনার কথা না বলে, এমন কি কার ছবি দেখে ঐ কবিতাটি লেখা সে কথারও উল্লেখ না করে ব্যক্তিগত বেদনার কথা ছাড়িয়ে কবি উক্ত কবিতায় যে ভাবটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তারই কথা বলেছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে 'ছবি' কবিতার আলোচনার সূচনাতেই যে বর্জিত অংশটুকু আছে তা এইপ্রসঙ্গে মূল্যবান জ্ঞানে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করা হল। কবি বলেছিলেন—

> 'যাঁকে অবলম্বন করে ছবি আঁকা হয়েছে সেই চিত্রিত মূর্তি দেখে আমার মনে সুখ দুঃখের তরঙ্গ উঠেছে। এখানে প্রশ্ন এই যে, পটের ছবির সঙ্গে আমার চিত্তের যে বেদনার যোগ আছে এই সত্য ছাড়া কি কবির মধ্যে আর কোনো সত্য নেই? কেবল কি পটের বর্ণ ও রেখাই এর শেষ কথা। এর অন্য কোনো অবলম্বন নেই।'

কবিতাটি কার ছবি দেখে লেখা কবি নিজে সে বিষয়ে এখানেও কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি অথচ তিনিই তা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারতেন আর তাহলে ছবিটি সম্পর্কে সমালোচকদের মতবিরোধের অবকাশ থাকতো না— ছবিটি কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী বা কবির ভ্রাতৃজায়া কাদম্বরী দেবীর সে বিষয়ে কবি কোন কথা না বললেও ছবিটি কবির কোনও এক বিগত প্রিয়জনের তথা হিসেবে এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে বলে কবি হয়তো বিবেচনা করেছেন। তবে আলোচনার বর্জিত অংশে ঐ ছবির সঙ্গে কবির মনের বেদনার ক্ষীণ যোগটুকু সহজেই লক্ষ্যগোচর হয় মুদ্রিত পাঠে এই ব্যক্তিগত কথাটুকুও কবি বাদ দিয়েছেন দেখা যায়।

কবিতার প্রথম শ্লোক (স্তবক) ব্যাখ্যার শেষাংশে যে পাঠ বর্জিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ছিল—

> 'ছবি দেখে অন্তরে এই প্রশ্ন উদিত হচ্ছে যে, ঐ যে আকাশে নীহারিকা যুগযুগান্তর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে,

CENTRAL LIBRARY

নক্ষত্রের সারি অন্ধকারে চলেছে, তুমি কি তাদের মত সত্য নও। এই প্রশ্নে মন জবাব দিতে চাচ্ছে যে, তুমি ছবি ছাড়া আর কিছু নও।'[৬]

প্রথম স্তবক ব্যাখ্যায় এই অংশ যুক্ত থাকলে আলোচনা আরও প্রাঞ্জল হতো, কবি অতখানি সরলীকরণ হয়তো নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করেছেন।

কবির দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের ব্যাখ্যারও অনেক অংশ মুদ্রিত আলোচনায় বর্জিত হয়েছে। কবির মুখের কথায় তাঁর কবিতা আলোচনা কিন্তু অনেক বেশী প্রাঞ্জল হয়েছিল। ছবির স্থাবরত্বের কথা কবির মৌখিক আলোচনায় বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে -'ছবি যে শুধু পটে লিখা।' কবিতার প্রথম তিন স্তবকে কবি সে কথাটিই বলতে চেয়েছেন। তৃতীয় স্তবক ব্যাখ্যার এক স্থানে—'নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে'—এর পরে ছিল—

'তার রূপ আর রসকে তুমি আমার মনে বিশেষ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলে। তোমার মত প্রিয়জনের কাছ থেকেই আমি পৃথিবীকে ভালবাসতে শিখেছিলাম।'[৬]

ছবিটি কবির কোন প্রিয়জনের সে কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন এবং প্রিয়জনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম যে ভালবাসা সে কথাটিও কবির এই বর্জিত আলোচনাংশেই প্রমাণিত হয়েছে।

চতুর্থ স্তবকের ব্যাখ্যায় আছে—

'আমরা দুজনে এক সঙ্গে চলেছিলাম, হঠাৎ অনন্ত রাত্রি তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চলতে লাগলাম, তুমি নিশ্চল হয়ে গেলে।'[৬]

বর্জিত ব্যাখ্যায় 'অনন্তরাত্রি' কথার আগে 'রাত্রির ব্যবধান এসে প্রাচীরের মত দাঁড়াল', এই অংশ ছিল। কবি নিজে রাত্রি কথাটা সংশোধন করে কালরাত্রি কথাটি ব্যবহার করে পরে সম্পূর্ণ অংশ কেটে দিয়েছেন। কালরাত্রি কথার মধ্যে মৃত্যুর যে ভীষণতার আভাস আছে কবি-সমালোচকের কাণে তা হয়তো বেজেছে তাই কালরাত্রির স্থানে অনন্তরাত্রি বসিয়ে সেই ভীষণতাকে দূর করে কবি অসীমত্বের ব্যঞ্জনা এনেছেন কাব্যব্যাখ্যায়। মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর কিছু নয়, সে যে জীবনেরই পরিপূরক-জীবনের গতিবেগকেই সে অব্যাহত রাখে তার কথা কবি এর পরেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। বর্জিত পাঠে—

'অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত ধ্বংস হতে হতেই প্রাণের পথ তারা কেটে দিচ্ছে' এই অংশের পরে কবির স্বহস্ত লিখিত আরও একটু কথা ছিল—

"জীবনের যে গতিবেগ তার একটা অঙ্গ হচ্ছে মৃত্যু, মৃত্যুর ভিতর দিয়েই সে সচলতা লাভ করেছে।" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে স্থির হয়ে যান না, জীবনের গতিবেগের সঙ্গে তাঁরও যোগ আছে। কবিতার শেষ স্তবকে কবি ছবির সেই গতিচঞ্চলতার কথাই বুঝিয়ে বলেছেন, ব্যাখ্যাকালে সেই দিকেই কবির নজর আছে দেখা যায়।

এইভাবে নিজের সৃষ্টিকর্মের 'বিচার' না হোক 'আলোচনার' মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকাব্য সমালোচনার সুন্দর নজীর রেখে গেছেন। শুধু ভাব বিশ্লেষণই নয় স্থানে স্থানে শব্দার্থেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ছবি কবিতার দ্বিতীয় শ্লোকে একস্থানে 'পত্রলেখা' শব্দটি আছে—কবিতাটির কবিকৃত আলোচনার বর্জিত পাঠে এই শব্দের অর্থ

---

৬. শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্তের, অনুলিপি থেকে উদ্ধৃত, মুদ্রিত পাঠে বর্জিত।

CENTRAL LIBRARY

বিশ্লেষণ করে কবি বলেছিলেন—'পত্রলেখা-পত্রসজ্জা, প্রাচীনকালে মেয়েদের কুসুমাভরণ।' তৃতীয় স্তবকের বর্জিত ব্যাখ্যায় কবি দু একটি ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করেছেন দেখা যায় 'তুমি breathe করতে' বা 'personality-র জগৎ' ইত্যাদি। এর কারণ শ্রোতাদের মধ্যে দু'একজন অবাঙালীও উপস্থিত থাকতেন তাঁদের বোঝবার সুবিধার জন্যই কখনও কবি এটা করতেন, আবার কখনও তা অপ্রয়োজনীয় বোধে কেটেও দিয়েছেন। নিজের লেখার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যাঁর দৃষ্টি এতদূর পর্যন্ত সজাগ তিনি নিজের কাব্যের সমালোচক না হলেও একজন সমঝদার পাঠক তাতে সন্দেহ নেই।

আসলে কবি মাত্রেই রসসৃষ্টিকালেই কিছু পরিমাণে সমালোচক হয়ে উঠেন। যদিও সেই স্বকাব্য সমালোচনার অনেকখানিই থাকে পাঠান্তরের অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ। রবীন্দ্রকাব্যের অজস্র পাঠান্তরের কথা এই প্রসঙ্গেই মনে পড়বে। সূক্ষ্ম বিচারে আত্মকাব্য সমীক্ষায় কবিদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় কবিতার পাঠান্তর আলোচনায়। কীট্‌সের কবিতার পাঠান্তর নিয়ে এই কারণেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে[৭], ইয়েটস এর কবিতার খসড়ারূপ ও পরিণত রূপের মনোজ্ঞ আলোচনাও আমরা পেয়েছি[৮]। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠভেদ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রটি যেমন বিস্তৃত ও ব্যাপক, তেমনি তা গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলাকার সপ্তম সংখ্যক কবিতার খসড়ারূপ ও পরিণত রূপের তুলনামূলক আলোচনায় কবিচিত্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কবি মানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

বলাকার 'শাজাহান' কবিতার নাম গোড়ায় ছিল 'তাজমহল'। পাঠান্তরের মতো নামান্তরের মধ্যেও কবির সমালোচক মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ছবি' কবিতায় কবি নিজের মনের বেদনার কথা প্রকাশ করে পরবর্তী 'তাজমহল' কবিতায় শাজাহানের প্রিয় বিয়োগ বেদনার কথাই বলতে চেয়েছেন। প্রথমে কবির হয়তো মনে হয়েছে ছবির মতো তাজমহলও নিছক শিল্পসৌন্দর্যের নিদর্শন মাত্র নয়—এই অপূর্ব ভাস্কর্য শাজাহানের অমর-প্রেমের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করছে যুগে যুগান্তরে। কবির নিজের জীবনে ছবি যেমন চৈতন্যলোক থেকে মহা চৈতন্যের স্তরে চলে গিয়ে কবির অন্তরে কবি হয়ে তাঁর কাব্য সংগীত রচনায় প্রেরণারূপে চিরবিরাজমান, তাজমহলও তেমনি বিরহী সম্রাটের অন্তরের অন্তহীন অশ্রুজলেরই বাণীরূপ রচনা করে তাঁর অন্তরের বার্তাকে বন্দী করে রেখেছে—তাঁর ক্ষণিকের অশ্রুকণাকে করেছে চিরন্তন। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত বলাকার পাণ্ডুলিপিতে[৯] দেখা যায় প্রথম ঝোঁকে কবি ৬৭ পংক্তিতে কবিতাটি শেষ করেছিলেন—কবিতাটির শেষ হয়েছিল

হে মানব, কাল সাথে ক'রে সন্ধী
আপন বাণীরে তুমি করি গেলে বন্দী
আপনি বন্ধনহীন।

সমাপ্তি সূচক তারিখ ও স্থানকালের নির্দেশ আছে এরই পরে। কিন্তু কবিতাটি এখানেই পরিসমাপ্ত করে কবি-মানস তৃপ্ত হয়নি, তাই পরবর্তী কোনও সময়ে আরো ৩২ পংক্তি যুক্ত করে কবি কবিতাটি শেষ করেছেন এই বলে,

---

৭. *Keat's Craftmanship*—M. R. Ridley

৮. *Between the lines*—Stalworthy

৯. কবি ও কবিতা পত্রিকা, শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৬ সংখ্যায় মুদ্রিত পাঠ থেকে বর্তমান আলোচনায় সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে আমরা ঋণী।

CENTRAL LIBRARY

স্মরণের বোঝা নিয়ে
আমি হেথা পড়ে আছি, সে এখানে নাই।

কিন্তু এখানেও কবি-সমালোচকের মন অতৃপ্ত রয়ে গেছে, তাই তৃতীয় পর্যায়ে কবিতার আরও ২৯ পংক্তি রচনা করে কবি মন শান্ত হয়েছে। এর পর সবুজ পত্রে প্রকাশের জন্য কবি এই কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে বসে কবিতাটির অংশসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করেছেন মোট ৬৮ পংক্তির ১৬ পংক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, প্রথম অংশ পুনর্লিখিত হয়েছে আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ নিজেদের মধ্যে স্থান বদল করেছে। এ ছাড়া কিছু কিছু শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও কোথাও ক্রিয়াপদের কাল বদলও হয়েছে। কবিতার বাণীরূপের মণ্ডন-কলার উৎকর্ষ বিধান তথা শ্রুতিমাধুর্য আনার জন্য এই সব পরিবর্তন করা হলেও কবিতাটির ভাব ও বক্তব্য এতে আরও সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে। কবিতাটি যখন কবির মনে আকার ধারণ করছিল তখন তা কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাকে অনুসরণ না করলেও, অনেকদিন আগে দেখা তাজমহল সম্পর্কে কবির মনোভাব যখন আপনা হতে অঙ্কুরিত মুকুলিত হয়ে উঠেছে তখন তাতে কবির পরিণত চিন্তা ভাবনা—তাঁর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত হয়ে যা মূলে ছিল স্তুতিকাব্য তাকেই করে তুলেছে দীপ্তিকাব্য। বিষয়বস্তু হিসাবে ছবি ও তাজমহল কবিতার মূলে ঐক্য থাকলেও পরিণতিতে উভয় কবিতার ভাব পার্থক্য ঘটেছে যথেষ্ট। প্রায় সমকালে (ছবি কবিতা লেখা এলাহাবাদে ৩রা কার্তিক ১৩২১; তাজমহলের সূচনা ১১ দিন পরে ১৪ কার্তিক ঐ স্থানেই—শেষ হয়েছিল কয়েক দিনের ভেতরেই) এবং প্রায় একই ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত দুটি কবিতার এই ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। শাজাহান কবিতার পাঠান্তরের মধ্যেও সেই ভাব পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। মূলে যা কবির শিল্পচেতনার বাণীরূপ ছিল, ক্রমে তা কবির জীবনচেতনা, প্রেমচেতনার মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে এবং পরিণতিতে জীবনমৃত্যুর গতিচেতনায় তার রূপ সম্পূর্ণতা ঘটেছে। কি বক্তব্যের দিক থেকে আর কি কাব্য সৌন্দর্যের দিক থেকে কবিতাটির প্রাক্‌রূপ থেকে তার পরিমার্জিত পুনর্বিন্যস্ত রূপ যে অনেক বেশী উৎকর্ষ মণ্ডিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আর এই উৎকর্ষের মূলে আছে কবির অতৃপ্ত কবিমানসের সমালোচনী দৃষ্টিভঙ্গী। কাব্যসৃষ্টির পরমলগ্নে কবিই যে তাঁর নিজের কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই কবিতার পাঠান্তর আলোচনায়।

'শাজাহান' কবিতায় কবি ব্যক্তিসত্তার চিরচঞ্চল গতিময়তার কথা বলে 'চঞ্চলা' কবিতায় বিশ্বজাগতিক গতির তত্ত্বকথাকে কাব্যিক রূপদান করেছেন। বলাকায় গতিবাদের যে বিস্ময়কর প্রকাশ অনেকে লক্ষ্য করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, এবিষয়ে প্রসঙ্গত দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। বলাবাহুল্য আমরা কবির কথাকেই প্রামাণ্যরূপে এখানে উপস্থাপিত করব।

বলাকার গতিবাদের মূলে ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর চিন্তার প্রভাবের কথা অনেকে অনুমান করেন। এ বিষয়ে বলাকার কাব্য আলোচনাকালে কবিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হলে কবি বলেন—

> 'আমার চিন্তার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন করে বলবো? সর্বযুগের সর্বদেশের তপস্বীকে আমি শ্রদ্ধা করে, তাঁদের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপর প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, নির্জীব, সে পাথর। কিন্তু দেখতে হবে, যে কথাটা বলছি তার কোনো মূল কি ভারতে পূর্বে কোথাও ছিল না?
>
> 'আমাদের দেশের মতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলছে। হংসের মতোই সে লোক হতে লোকান্তরে যাত্রা করে চলেছে। তার মন্ত্র 'চরৈবেতি'।...এই তত্ত্ববাদ তো এই দেশে ছিল! অন্তত

CENTRAL LIBRARY

আমার প্রাণের মধ্যে যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার ছেলেবেলায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে আমার কবিতায় গানে নাটকে সর্বত্রই এই গতি ব্যাকুলতা। তবু য়ুরোপের মনীষীদের গতির কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত সায় ও আনন্দ পেয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা কি? মোট কথা, গতি আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা। বলাকাতে সেই গতিরই জয়গান করা হয়েছে। এখানে দেশী বিদেশী প্রভাবের বিচারে কোন লাভ নেই।'[১০]

বস্তুতঃ বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের কাব্যময় কল্পনাটুকুকে ভারতীয় অধ্যাত্মরসে রাঙিয়ে নিয়ে 'বলাকা' কাব্যমধ্যে গতিতত্ত্বকে কবি যে অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাতে এই গতিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধির ক্রমবিকাশেরই এক বিস্ময়কর চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে বলা যায়। পাশ্চাত্ত্য গতিবাদ অথবা প্রাচ্য 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে প্রভাবিত হলেও কবির আন্তরিক বিশ্বাস যে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা কবি নিজেই বলেছেন। বলাকা কাব্য প্রকাশের সমকালীন এক প্রবন্ধে কবি সুন্দরভাবে গতি ও স্থিতির সমন্বয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। ১৩২১ সালে লেখা 'সঞ্চয়' গ্রন্থের "আমার জগৎ" প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—

"এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা ব'লে জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন - ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই। চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ একপক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরল বুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী সেটা চলেছে; সমগ্র যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।'[১১]

এই সহজ বুদ্ধিতেই বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনের তত্ত্বটি বুঝে নিয়ে কবি সে সম্পর্কে লণ্ডন থেকে অজিত চক্রবর্তীকে একপত্রে লিখেছিলেন—

'**Bergson** সম্বন্ধে একটা চটি বই তোমাকে শীঘ্র পাঠাব। সেটা ভারি চমৎকার, সহজে ওঁর মতটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। উনি যে দিকটা দেখিয়েছেন সেটা খুব চমৎকার—কিন্তু অন্য দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করবার কোনো মানেই নেই। গতিতত্ত্বও যেমন সত্য, স্থিতিতত্ত্বও তেমনি সত্য—এবং সেইজন্যই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারিনে—সেটা কেবলমাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মায়া নয়—সেটা সত্য বলেই তার হাত আমরা এড়াতে পারিনে।'[১২]

এই উদ্ধৃতিতে বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে। গতি বা উদ্দেশ্যহীন ক্রমবিবর্তনকে কবি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন নি, তিনি তাকে জীবনসত্যের অর্ধেক বলে মনে করেছেন, বাকি অর্ধেক আছে স্থিতিতে। বলাকার অনেকগুলি কবিতায় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় দোলা লাগা

১০. গ্রন্থভূমিকা, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেন (১৩৬৮), পৃঃ ৭৬-৭৭

১১. আমার জগৎ, সঞ্চয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (১২ খণ্ড), পৃঃ ৫৬১ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)।

১২. অজিত চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র, প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত।

CENTRAL LIBRARY

তত্ত্বের, কবির সম্মপঠিত বের্গসঁর Elan Vital এর প্রেরণার প্রভাব থাকলেও বের্গসঁর ফিলজফির অকারণ অবারণ লক্ষ্যহীন চলাকে যে কবি কখনও আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নি তার পরিচয় পাই 'যাত্রী' গ্রন্থের ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ তারিখের ডায়ারীতে। কবি লিখছেন—

'মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে ; সেই চলাতে হওয়াতে মিল করে চলাই মানুষের চলা।'

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে পরিভ্রমণকালে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার অফুরন্ত প্রাণাবেগের লক্ষ্যহীন গতি কবিকে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করেছিল, তারই ফলে বলাকার গতিবাদ-প্রধান কবিতাগুলির সৃষ্টি। কিন্তু 'পূরবী' রচনাকালে কবির সেই মোহ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল, লক্ষ্যশূন্য চলা কবিকে যেন ভীত করে তুলেছিল, কবির অন্তরাত্মা তখন যেন বলে উঠেছে —'এ যাত্রা মোর থামাও'। সেই কারণেই ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ এর উপরোক্ত ডায়ারীর উপসংহারে কবি 'লক্ষ্যশূন্য' নামে এই কবিতাটি লিখেছেন দেখা যায়—

'রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উচ্চস্বরে ডাকি, –
'থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্র বেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।' রথী কহে, 'ওই মোর পথ
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে নিয়া যাবে রথ।'
গৃহী কহে, 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।' রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'
'কোনখানে' শুধাইল। রথী বলে, 'কোনখানে নহে,—
শুধু আগে।' 'কোন তীর্থে কোন্ সে মন্দিরে' গৃহী কহে।
কোথাও না শুধু আগে।' 'কোন বন্ধু সাথে হবে দেখা।'
'কারো সাথে নহে, যাব সব আগে আমি মাত্র একা।'
ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করে দিল গ্রাস ;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে—
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

[লক্ষ্যশূন্য, – 'পরিশেষ' সংযোজন]

লক্ষ্যহীন গতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ পরিচয় আছে এই কবিতায়।

'জীবন-নদীর তীরে দাঁড়াইয়া কবি আজ আর একথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না যে, এ জীবন অনন্তকাল ধরিয়া কেবল চলিতেই থাকিবে। আজ শুধু কেবল গতির আনন্দই কবিকে মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না,—কবি আজ গতির বাহিরে একটি স্বতন্ত্র সার্থকতার অনুসন্ধান করিতেছেন।·····এই গতির বাহিরে তিনি আজ একটি লক্ষ্যের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কোন লক্ষ্য যদি না থাকে তাহা হইলে এই গতির যে কোন সার্থকতাই থাকে না।'[১৩]

এইজন্য বলাকার নাম-কবিতায় যেখানে গতিতত্ত্বের চরম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, সেখানেই কবির কথা

১৩. কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বপতি চৌধুরী পৃঃ ১৮৫-১৮৬ (৩য় সংস্করণ)

CENTRAL LIBRARY

'হেথা নয়, হেথা নয়' বলে শেষ হয়নি, বাক্যের শেষাংশে 'অন্য কোথা অন্য কোনখানে' বলে যে অংশটুকু জুড়ে দিয়েছেন তাতেই কবির বক্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিস্ফুট হয়েছে। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় বিশ্বমানবের যাত্রার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানেও একটি স্থির লক্ষ্যের কথা না বলা পর্যন্ত কবির বক্তব্য পরিসমাপ্ত হয়নি। এ বিষয়ে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষাংশের পাঠান্তর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পেন্সিলে লেখা যে পাঠ আমরা পাই তার সঙ্গে প্রবাসীতে পাঠানোর সময় কবির স্বহস্তলিখিত পাঠ ও তার পরিমার্জনার [১৪] তুলনা করলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচক মনটির পরিচয় পাব। প্রবাসীর জন্য লিখিত 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার উপসংহার ভাগ কবি ও কবিতা পত্রিকার ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪-২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত পাঠের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় কবি 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'—ঔপনিষদিক এই 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' এর বাণীতেই কবিতাটি শেষ করেছেন। মূল পাঠেও কবিতাটি শেষ হয়েছিল এখানেই। কারণ উভয় পাণ্ডুলিপিতেই এর পরেই কবি স্থানকাল নির্দেশ করেছেন—কলিকাতা, ২৩শে কার্তিক, ১৩২২। প্রবাসীর জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে বসে কবি শেষে নিজের নাম পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক কবির সমালোচক মনটি সহসা সজাগ হয়ে উঠেছে। কবিতার শুরুতে কবি যাত্রীদলকে বন্দর ছেড়ে যাত্রা করতে বলেছেন, কিন্তু পরিসমাপ্তিতে নতুন কোনও সমুদ্রতীরে পৌঁছে দিতে পারেন নি—কেবল চিরন্তন সত্য বাক্যটি উচ্চারণ করে ভারতীয় দর্শনের এই চির পুরাতন বাক্যে তাঁর বিশ্বাসের কথাই ঘোষণা করেছেন। বলাকায় কবির গতি-অভিমুখী মন বারবার পথে বার হয়েছে কিন্তু কোথাও একটা পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত কবির বক্তব্য যেন শেষ হয়নি। লক্ষ্যহীন গতি কবির উদ্দিষ্ট নয়, ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর দিকেই কবির আগ্রহ যে সমধিক তার পরিচয় 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাতেও আছে। প্রবাসীর পাণ্ডুলিপিতে কবি দ্বিতীয় ঝোঁকে কবিতাটি শেষ করেছিলেন 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন'—এই প্রশ্ন বাক্য দিয়ে। উত্তর যদিও অস্তিবাচক কিন্তু এতেও কবিমন অতৃপ্ত ছিল তাই উক্ত পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয়বার নাম স্বাক্ষর করার পর আবার সেই স্থানে কবিতার অন্তিম চার পংক্তি যোগ করেছেন—এই চার পংক্তিতে বিশ্ব মানবের মৃত্যুঞ্জয় যাত্রার বিজয়বার্তা বিঘোষিত হয়েছে—মৃত্যুকে জয় করে অমৃতের অধিকার লাভ করার মধ্যে মানবজীবনের চরম সার্থকতা সূচিত হয়েছে—তাতেই মানুষ আপনার মর্ত্য সীমা অতিক্রম করে দেবতার অমর মহিমার অধিকারী হয়।

কবির আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের যে প্রবল শক্তির প্রকাশ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষাংশে উপসংহারের পুনঃপুনঃ সংশোধনে তা আরও বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি সারা বিশ্বের দুঃখ ও পাপের ভারে নিপীড়িত হয়েছেন। মহাযুদ্ধের বীভৎসতা 'উদাসীন' কবির চিত্তেও যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাতে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে ক্ষণিকের জন্য হলেও কবিমনে একটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধে কবি নিজেই সেকথা আমাদের জানিয়েছেন—

> "আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু আধটু খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি? যে হানাহানি হচ্ছে, তার বেদনা কোনখানে গিয়ে লাগছে? ভেবে দেখো কতো পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে।

---

১৪. কবি ও কবিতা পত্রিকা, পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭৪ সংখ্যায় মুদ্রিত পাঠ থেকে বর্তমান আলোচনায় সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

CENTRAL LIBRARY

"এক-এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে—যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্ব কেন পাপের বেদনা-কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক।...মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ, অতীত ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।"[১৫]

'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষাংশে কবি এই কথাই কতকটা উপদেশের সুরে বলেছেন—

'হে নির্ভীক, দুঃখ অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।...
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়-ধ্বজা তুলে।'

কিন্তু কবির এই বক্তব্যকে শুধুমাত্র উপদেশবাণী মনে করলে ভুল হবে; কবির কথা মুখের কথা মাত্র নয়, তা তাঁর অন্তরের অন্তরতম বাণী। কবির আশৈশবের ঈশ্বর-বিশ্বাস আজীবন অটুট—বিধাতার মঙ্গলময় বিধান সম্পর্কে সচেতন মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগলেও অবচেতন মন সহজেই সেই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। পাপের শাস্তি - ঐহিক দুঃখ ভোগ সম্পর্কে কবি যে অভিনব স্বকীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ এক। সেজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয় ও বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়।' সেই ব্যাখ্যানুসারে কবির উপদেশ—

"তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখ দগ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে? প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে, সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্‌ভদ্রং তৎ— যা ভদ্র তাই আসবে।"[১৬]

'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় এই বিশ্বাসেরই পরিচয় পাই। কবি বিশ্বাস করেন—দুঃখ ও পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ যদি অকম্পিত বুকে বলতে পারে -'তোরে নাহি করি ভয়', যদি অকুণ্ঠিত চিত্তে সে ঘোষণা করতে পারে—

'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক' তবে সত্য-স্বরূপ অবশ্যই ঝলসে উঠবে। কবিতার শেষ স্তবকে মানব দেবতার সেই অমর মহিমা সম্পর্কে কবির দৃঢ় প্রত্যয়ই ঘোষিত হয়েছে—

---

১৫. পাপের মার্জনা, শান্তিনিকেতন (২য় খণ্ড), পৃঃ ৪০৫-৪০৬ (১৩২৬)

১৬. পাপের মার্জনা, শান্তিনিকেতন (২য় খণ্ড) পৃঃ ৪০৭ (১৩২৬)

CENTRAL LIBRARY

'নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যু ঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই ইতিবাচক।

স্বকাব্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় লাভের জন্য আমরা বলাকা কাব্যখানিকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য আলোচনার প্রধান কয়েকটি শ্রেণীর রচনাই আমরা এখানে পেয়েছি। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বকাব্য সমালোচনার মধ্যে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীর রচনা আমরা দেখতে পাই—

এক, কাব্য কবিতার প্রেরণা ও উৎস কথন—কবিতার পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ। বিশেষ কবিতার জন্মকথা ও কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় দানই এখানে কবি সমালোচকের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা কালে কবি এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন দেখা যায়।

দুই, কবিতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কবিতার দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় দানই কবি-সমালোচকের এখানে উদ্দিষ্ট। বলাকার সঙ্গে বের্গসনী তত্ত্বের সামঞ্জস্য সাধনের কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে।

তিন, কবিতা বিশেষের অর্থ ও ভাবের ব্যাখ্যা ও আলোচনা। বিশ্বভারতী সাহিত্যালোচনার ক্লাসে বলাকার ধারাবাহিক আলোচনায় এই শ্রেণীর রচনার অজস্র নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকের প্রশ্নের উত্তরেও কবি বলাকার অনেক কবিতার আলোচনা করেছেন, যথা—শাজাহান কবিতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা কবির পত্র।

চার, কাব্যের নূতন রীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে ঐ রীতির সমর্থনে কবিতার টেকনিক নিয়ে আলোচনা। বলাকার 'মুক্তবন্ধ' ছন্দ নিয়ে কবির আলোচনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়

এছাড়া বিরূপ সমালোচনার উত্তরে কবির নিজ কাব্য-কবিতার আলোচনাও কবিকে করতে হয়েছে বিরুদ্ধ সমালোচনার ভ্রান্তি নিরসন ও কবিতার যথার্থ তাৎপর্যগ্রহণে পাঠককে সহায়তা করার জন্য। বলাকায় কবির এই জাতীয় আলোচনারও নিদর্শন আছে।

কবিতার বিশ্লেষণাত্মক বিচার অপেক্ষা সংশ্লেষণাত্মক বিচার, খণ্ড তাৎপর্য অপেক্ষা সামগ্রিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার উপরেই সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলাকার কবিতাগুলির খণ্ড তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেও কবি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির অখণ্ড তাৎপর্য উপলব্ধির কথা কাব্যগ্রন্থের নামকরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাব্যসৃষ্টির পিছনে এক বুদ্ধি-অতীত রহস্যময় শক্তির—বিশ্বজগতের প্রকাশ-শক্তির লীলা কবি আপনি উপলব্ধি করেছেন এবং অপরকেও তা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। আর এইভাবে নিজ কাব্য ব্যাখ্যাকালে বারবার জীবন-দেবতার কথা কবি উল্লেখ করেছেন—বলাকাতেও জীবনদেবতার প্রসঙ্গ কবি উল্লেখ করেছেন দেখা যায়।

বলাকার কবিকথিত আলোচনার অনুলেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের মুখে আমরা রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় কবির রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তিনি বলেন, কোন কবিতা আলোচনার আগে কবি সম্পূর্ণ কবিতাটি একবার আবৃত্তি করে নিতেন, পরে এক একটি স্তবক পাঠ করে তাহা পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দিতেন। কবির কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে ও কবিতা পাঠের বৈশিষ্ট্যে কবিতাটি শ্রোতার মনে

CENTRAL LIBRARY

সহজেই একটি রসাবেশ সৃষ্টি করত। কবি হয়তো একথা বিশ্বাস করতেন কবিতার আবেদন অংশতঃ সাঙ্গীতিক—কবিতা শুধু বুঝলেই হয় না, কানে শুনতেও হয়; এ ব্যাপারে আমাদের দেশের প্রাজ্ঞোক্তিটি স্মরণীয় 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।'

এইভাবে সমঝদার পাঠকহিসেবে নিজের কবিতার নিজে রসাস্বাদন ও রসবিশ্লেষণ করে কবি অপরকেও তাঁর কবিতার রসাপভোগে সহায়তা করতেন। কবিতাবিশেষ কি হয়েছে বা কি হয়নি এই জাতীয় কোন রায় তিনি প্রায়শই দিতেন না, অর্থাৎ কবিতা সমালোচনায় রসোপভোগ ও রসবিশ্লেষণের উপরেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, নিজের কবিতা বলেই হয়তো মূল্যায়ন-এর উপর তেমন গুরুত্ব দিতেন না। কবি-সমালোচকের হয়তো বিশ্বাস ছিল রচনাবিশেষের পরিচয় দেওয়া তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই সাহিত্য বিচারের লক্ষ্য—বলাকার কবিতা তথা কবির নিজকাব্য আলোচনায় অন্তত এই বিশ্বাসেরই পরিচয় মেলে। কবির এই আলোচনা প্রকৃত অর্থে কবিতার সমালোচনা না হতে পারে কিন্তু কবিতা সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ সংবাদ যে এই আলোচনায় আছে তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্য সমালোচনায় বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটিই প্রধান কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচার প্রবন্ধে সাহিত্য সমালোচনার আর দুটি দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন—পরিচয় ও ব্যাখ্যা। কবির নিজের কথায়—'বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্য বিচারের লক্ষ্য', 'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা।' অবশ্য সাহিত্যবিশেষের পরিচয় নানা প্রকারের ভাবগত ও রূপগত, রচনার জন্মগত অর্থাৎ তার প্রেরণা উৎসের পরিচয়, রচয়িতার অন্তর্জীবনের পরিচয় প্রভৃতি। নিজকাব্য আলোচনায় এই পরিচয়মূলক সাহিত্যবিচারে কবির কৃতিত্ব সমধিক। তবে সাহিত্য সমালোচনায় বিচারের গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাই—সাহিত্য-সমালোচনা শব্দটির পরিবর্তে 'সাহিত্য বিচার' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতিত্বের মধ্যে। নিজের কাব্য আলোচনায় বিচার তথা মূল্যায়নের দিকে কবি বিশেষ গুরুত্ব দেননি, কারণ দেওয়া সম্ভব নয়, তবু রবীন্দ্রনাথের নিজকাব্য আলোচনা আদৌ সমালোচনা নয়, একথা বললেও ভুল হবে। এই আলোচনা আরো একটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যিনি স্বয়ং স্রষ্টা, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছাটা তাঁর যেমন স্বাভাবিক তেমনি সেইরকম ব্যাখ্যা করার তাঁর বিশেষ অধিকারও আছে—তিনি ছাড়া এই রহস্য উদ্ঘাটন অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। সমালোচকের পক্ষে বাইরে থেকে এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁর কাব্যের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আমরা পেয়েছি, সেই সব তথ্যের আলোকে তাঁর কাব্য ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়েছে। কবির নিজের কাছে তাঁর কাব্যের সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়ায় আমাদের আরো লাভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির প্রতিভা যার বিশালতা ও গভীরতার সীমা নেই এবং কোনও স্থির নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে যাকে ধরা যায় না, তেমন প্রতিভার পরিমাপ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। এই কারণেই রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমায়—রবীন্দ্রপ্রতিভার উৎস ও নিয়ন্ত্রী শক্তির সন্ধানে রবীন্দ্রনাথকেই অন্যতম পথপ্রদর্শক গুরুরূপে বরণ করতে হয়। কবির আত্মপ্রকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার যে যাত্রা কবি স্বয়ং শুরু করেছেন তাকে পূর্বাহ্নে বুঝে নিতে পারলে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপলব্ধি সহজ হবে। কবির অনুভূতিকে জানলে তাই দিয়ে তাঁর কাব্যকে বুঝতে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এই দিক থেকে বলা যায় কবিতা কবির অন্তর্জীবনের রেকর্ড। কাব্য দিয়ে কবিকে বুঝতে এইসব ক্ষেত্রেই বিশেষ সুবিধা হয়, আর এইভাবেই আসল কবিজীবনী জানা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত চিন্তা ও ভাবনাসূত্র নিয়ে রবীন্দ্র কাব্যজগতে প্রবেশ করতে পারলে রবিন্দ্রকাব্য বুঝবার কাজ অনেক সহজ হবে—কবির নিজস্ব অভিমতগুলি আমরা মানি বা নাই মানি তাঁর কাব্য

CENTRAL LIBRARY

সম্পর্কে তাঁর নিজের সাক্ষ্য এমন অপূর্ব কিছু উপাদানের সন্ধান আমাদের দিয়েছে যা রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কালিদাস অথবা চণ্ডীদাসের কাব্য বিচারে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন, আধুনিক সাহিত্য কিংবা লোকসাহিত্য বিচারে কবি যে অসাধারণ বিচারবুদ্ধি রসবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন নিজের লেখার সমালোচনাকালে সেইরূপ উৎকর্ষের পরিচয় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না হলেও, পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবি-সমালোচকদের মতোই স্রষ্টা হিসাবে নিজের সাহিত্যকে সৃষ্টিভূমিতে স্থাপিত করে প্রধানতঃ স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকেই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কবি তাকে অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পেরেছেন। রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনায় রবীন্দ্র-সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের কাছেই বারবার এসেছেন তাঁর কাব্য সমালোচনার সূত্র সন্ধানে এবং কবিপ্রদত্ত সূত্র যে অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে তাতে আমরা নিঃসন্দেহ। বলাকা কাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রকথাকেই একমাত্র অবলম্বন করে আমরা হয়তো সমালোচনা কী, সমালোচকের কাজ কী, বলাকা কাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের কোন বিশেষ কথাটি আমাদের বলতে চেয়েছেন—এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবো না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে কেন বলেছেন ব্যাখ্যা বা পরিচয় তা হয়তো বুঝতে পারবো। রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন সমালোচনা-চিন্তা যে অনেকখানিই তাঁর নিজের সৃষ্টি থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের অনেক আলোচনা আমরা পড়েছি তার থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বের বিষয়ে আমাদের একটা ধারণা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের যে স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তা সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক মানসের পরিচয় উদ্ঘাটনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই আমাদের মনে হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সাহিত্য সমালোচনার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্য আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরী বলে আমরা মনে করি। আমরা এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্যের কয়েকটি কবিতা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা করেছি মাত্র এই আলোচনার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন, তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে কবি-কুলগুরু প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশের ব্রত গ্রহণ করছি।

CENTRAL LIBRARY

রামায়ণ : ইন্দোনেশিয়ায়

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

[প্রাক্-কথন : বহির্ভারতে রামায়ণ চর্চা ভারতবিদ্যার এক প্রধানতম অঙ্গ ; অথচ এ বিষয়ে এখনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা সুরু হয় নি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখক প্রবন্ধের শীর্ষনামকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুতে অনুসন্ধানকার্যে লিপ্ত আছেন। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্বের অভাব—সর্বোপরি ইন্দোনেশিয়ায় বাহ্‌সা [Bhasa Indonesia] না জানা অনুসন্ধানকার্যে প্রধান অন্তরায়। এ বিষয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার, ডঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অতি সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বহির্ভারতে রামায়ণ' সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে ভারতের রামায়ণ সংস্কৃতির এক উল্লেখ্য অধ্যায় আলোকিত করেছেন। বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ মূলতঃ যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তা পুনরায় প্রমাণিত হ'ল। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনাও সূত্রাকারে কয়েকটি তথ্যগত জিজ্ঞাসা মাত্র ; কারণ সিদ্ধান্ত অনুপস্থিত। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ যে রূপে ও ভাবে প্রসারিত হয়েছিল তার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা ভারতবিদ্যার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সর্ত। এ প্রবন্ধে বিষয় ও বক্তব্যগত মতপার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ; কেন না গবেষণালব্ধ আলোচনার জন্য যে বাস্তব সর্ত দরকার তা ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে এখনও অনুপস্থিত। ইন্দোনেশিয়ায় কোন রামকেন্দ্রিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল তা' গবেষণাসাপেক্ষ ; আর এই গবেষণা সম্পূর্ণ হলে ভারত ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতির নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হবে। শুধু ইন্দোনেশিয়ায় নয়, সমগ্র দঃ পূঃ এশিয়ায়, আরো বিস্তৃতভাবে সমগ্র বহির্ভারতে রামায়ণ চর্চার গবেষণাসমৃদ্ধ আলোচনার দ্বারা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও অধ্যায়ের দিগন্ত উন্মোচিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।]

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, প্রায় সমগ্র প্রাচ্য জীবনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে রামায়ণের ভূমিকা অসামান্য। শুধু রামায়ণ নয়, রামায়ণ-মহাভারত দুটি মহাকাব্য প্রাচ্য জীবনের বিকাশে অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সামগ্রিক জীবনবোধের কাহিনী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের রূপরেখাও আলোচ্য মহাকাব্য দুটিতে উপস্থিত। রামায়ণ-মহাভারত শুধুমাত্র মহাকাব্য নয়, ভারতবর্ষের সমাজ-মানস সমাজ-বিজ্ঞানের যে বিকাশমান সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে, তার রূপরেখাও রামায়ণে আছে। 'রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে'।[১] '...জনপদজীবন ও আরণ্যজীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এই মিলন ও মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে'।[২]

---

১. প্রচলিত রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকি।

২. প্রচলিত রামায়ণ মোট সাত কাণ্ডে বিভক্ত।

CENTRAL LIBRARY

রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি একথা প্রচলিত থাকলেও বাল্মীকি একক রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত রামকাহিনী একক না যৌথপ্রতিভার সৃষ্টি তা' গবেষণাসাপেক্ষ।[৩] রামায়ণ মহাকাব্য সম্পর্কে এই জাতীয় সংশয়ের কারণ তার কাব্যগঠন লিখনরীতি ও ব্যাকরণ-সম্পর্কিত ভিন্নতা। ফলে একথা মনে করা বোধহয় অসঙ্গত নয় যে, মৌখিকভাবে প্রচলিত বীরকেন্দ্রিক ঘটনাকে বাল্মীকি লেখ্যরূপ দান করেছিলেন।[৪] অথবা তা' না হলেও অর্থাৎ বাল্মীকি এককভাবে এই বিশাল মহাকাব্য রচনা না করলেও ঐতিহাসিক কালব্যবধানে পরিবর্তিত অবস্থার ছায়াপাত এ কাব্যে ঘটেছে; কিছু নতুন অংশও এতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।[৫] ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন রামকেন্দ্রিক কাহিনীর সম্পূর্ণ রূপাবয়ব সম্ভবতঃ বাল্মীকি রামায়ণ। তবে এই রূপাবয়ব লাভের কাল বিতর্কিত। ভারততত্ত্ববিদ্ সিলভ্যা লেভি মনে করেন যে, প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ খ্রীঃ ২য় শতাব্দীতে বর্তমান রূপাবয়ব লাভ করে। রামায়ণ মহাকাব্যের রচনাকার ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য :

১। প্রচলিত রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকি।

২। প্রচলিত রামায়ণ মোট সাত কাণ্ডে বিভক্ত।

৩। সাতকাণ্ডে পাঁচশ সর্গ ও ২৪০০০ শ্লোক আছে।

['চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতানপঞ্চষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্'—॥ আদিকাণ্ড ৪/২]

সমগ্র ভারতবর্ষে রামায়ণ কাহিনীর ত্রিবিধ সংস্করণ প্রচলিত আছে। (১) গৌড়ীয় পুঁথি, (২) দাক্ষিণাত্যের পুঁথি, (৩) উত্তরাপথের পুঁথি। আবার কেউ মনে করেন, রামায়ণ মহাকাব্যের মূলতঃ দুটি সংস্করণ—(১) দক্ষিণাপথ ও (২) উত্তরাপথ। এই সংস্করণ দুটি আবার নানা পর্যায়ে বিভক্ত।[৬] এ ছাড়াও রামায়ণ থেকে উপাদান গ্রহণ করে বহু রামকেন্দ্রিক কাহিনী গড়ে উঠেছে।[৭] কিন্তু সেই রামকেন্দ্রিক কাহিনীসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলে এবং সংস্কৃত ভাষা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর নিকট দুর্বোধ্য কাব্যভাষা ছিল বলে, আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাতেও রামকাহিনীর সৃষ্টি হতে থাকে। অবশ্য এগুলো মূল বাল্মীকি রামায়ণকেন্দ্রিক বা অনুবাদ হলেও, মূল কাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত বা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাগাধুনিক যুগে ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত রামায়ণ মহাকাব্যের দিকে তাকালে বোঝা যাবে কীভাবে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রামায়ণ মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৮]

কেবলমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানেও রামায়ণ কাহিনী প্রচলিত

৩। The Rāmāyana : its history and character : A. D. Pusalkar. —The Cultural Heritage of India. Vol. II.

৪। The Hsitory of Indian Literature : A. Webber.

৫। A Classical Dictionary of Hindu Mythology : J. Dawson.

৬। The Rāmāyana : its history and character : A. D. Pusalkar. —The Cultural Heritage of India, vol. II.

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড ; ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। দ্রঃ বিশ্বকোষ

CENTRAL LIBRARY

আছে। সেই সকল স্থানের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় তাদের মূল রচনা হয়েছে অথবা অনুবাদ হয়েছে। অবশ্য মূলে রূপান্তরিত করবার কালে বা রূপান্তরের সময়ে, গ্রহণ বা বর্জনের সময়ে মূলের বিশুদ্ধতা সর্বাংশে ও সর্বকালে রক্ষিত হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রামায়ণ কাহিনী সেই দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের, বিশেষভাবে থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার নাম করতে হয়। তিব্বত, মধ্য এশিয়া, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভিয়েৎনাম, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি প্রায় সর্বত্রই রামায়ণ গড়ে উঠেছে। দঃ পূঃ এশিয়ায় অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ আলোচনার প্রাক্‌মুহূর্তে দঃ পূঃ এশিয়ার রামকেন্দ্রিক কাহিনীকাব্যের তালিকা উপস্থিত করা যেতে পারে। তালিকাটি নিম্নরূপ—যোগীশ্বরের রামায়ণ কাকাবিন বা ককবিন, রামকিয়েন, হেকায়ৎ সো রাম, সেরৎরাম, উত্তরকাণ্ড, রামায়ণ শশক, রামক্রিং, রাম কিন্দুহ্ বালি, রাম তম্বক প্রভৃতি।

ইন্দোনেশিয়ায় রাম-কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে যে রামায়ণ মহাকাব্য ইন্দোনেশিয় সামগ্রিক জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যা অন্যত্র দুর্লভ। সাহিত্য তো বটেই, স্থাপত্য-ভাস্কর্য পর্যন্ত রামায়ণ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। 'স্বাঙ্গীকরণ' ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য; ফলে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই রামায়ণ ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতি কর্তৃক স্বাঙ্গীকৃত হয়। অবশ্য এর অর্থ কিন্তু 'সাংস্কৃতিক-অনুকরণপ্রিয়তা' নয়; ভারত ও ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারা এক বৃহত্তর সমজাতীয় সংস্কৃতির সূত্রপাত করেছিল।[৯] রামায়ণ, অন্যান্য মহাকাব্য বা কাব্য ঐ অঞ্চলের লোকতান্ত্রিক জীবনধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অর্থাৎ, ভারতীয় মহাকাব্য ভারতে প্রচলিত যথানির্দিষ্ট আকারে-প্রকারে ইন্দোনেশিয় জনজীবন কর্তৃক গৃহীত হয় নি। ভারতবর্ষ থেকে নীত বা আনীত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতি প্রভাবিত হয় এবং ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতি তার আদি লোকায়ত প্রবাহকে যথাযথ রক্ষা করে। ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতির এই স্থিতিস্থাপকতা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমগ্র দঃ পূঃ এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ১ম দশকেই রামায়ণ কাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় নীত হয়।[১০] ভারতবর্ষে রাম-কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল বলে, ইন্দোনেশিয়ায় আনীত কাহিনীসমূহও নানা আকারে প্রচারিত ও প্রসারিত হতে শুরু করে। কিন্তু সমগ্রভাবে 'বাল্মীকি-রামায়ণ' ইন্দোনেশিয়ায় প্রচারিত বা প্রসারিত হয় নি। প্রক্ষিপ্তভাবে বাল্মীকি রামায়ণের যে প্রচার হয়েছিল তার প্রমাণ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় 'উত্তরকাণ্ডের' পৃথক অস্তিত্ব। বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের অংশ উত্তরকাণ্ড কিনা তা বিতর্কিত হলেও, বাল্মীকি রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। অথবা, বাল্মীকি-রামায়ণ কেন্দ্রিক কোনো মহাকাব্য বা কাব্য 'উত্তরকাণ্ড' নামে পরিচিত নয়। দঃ পূঃ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে যেমন থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রাম-কাহিনীর সঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য; এমনকি ভর্তৃহরি বিরচিত 'ভট্টিকাব্য' বা 'রাবণবধের' সঙ্গে সাদৃশ্য অনুপস্থিত। 'রাবণবধ' মহাকাব্যের উল্লেখের যৌক্তিকতা এই যে, ইন্দোনেশিয় ভাষায় প্রচলিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত যোগীশ্বরের রাম-কাকাবিনের বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের সঙ্গে ভর্তৃহরির 'রাবণবধ' মহাকাব্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। **'The first 56 % of OJR and the first 65% of Rāvanabadha by Bhatri-hari are closely parallel'.**[১১] ভারতবর্ষে বহুতর রাম-কাহিনী প্রচলিত

৯। **South East Asia : A short history : Brain Harrison.**

১০। **South East Asia : A short history : Do.**

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের ভূমিকা : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১১। **The Old Jāvānese Rāmāyna : C. Hooykaas.**

CENTRAL LIBRARY

থাকার ফলেই বোধ হয় ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন প্রকারের রাম-কাহিনী প্রচারিত হয়। খ্রীস্টীয় শতকের ১ম পর্যায়ে রাম-কেন্দ্রিক কাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত হওয়ার কালে বিভিন্ন প্রকারের রাম কাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রচারিত হতে শুরু করে। ঘটনাবস্তুর বিভিন্নতা অনেক সময় বিভিন্ন রাম-কাহিনীর বিমিশ্রণ ঘটিয়ে এক ভিন্নতর কাহিনীর সূচনা করেছিল। এ ছাড়া প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা থেকে নবা যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ বা রচনার কালেও অনেক পাঠান্তর ঘটেছে। উদ্ধৃত সূত্র ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ায় রাম-কাহিনীর পরিবর্তনের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। সম্ভবতঃ আদি ইন্দোনেশিয় সংস্কৃতি বহিরাগত সংস্কৃতিকে তার বৈশিষ্ট্য গ্রহণে বাধ্য করেছিল।[১২] সংস্কৃতির ইতিহাসে এর নাম 'পুর্ণকরণ পদ্ধতি'। আর ভারতাগত রামায়ণকে যে এই 'পুনর্করণ পদ্ধতির' মাধ্যমে যেতে হয়েছিল তা' প্রমাণিত হয়েছে।[১৩] ভারতাগত মহাকাব্য বা কাব্যের সঙ্গে অনেক সময় লৌকিক গল্প-কাহিনী মিশ্রিত হয়েছে ; লৌকিক ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা মহাকাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করেছে ; অনেক সময় আবার ইন্দোনেশিয় লোকসংস্কৃতি ও লোকনৃত্য ভারতীয় মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।[১৪]

ইন্দোনেশিয়ায় প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর প্রাচীনতম কাব্যরূপ পাওয়া যায় প্রাচীন ইন্দোনেশিয় ভাষায় রাম-কাকাবিন্ বা ককবিন্ নামে। ডঃ কেন্দ্রিক কার্নের মতে, ইহা খ্রীঃ ১৩শ শতকে পূর্বজাভায় কাদিরি রাজবংশের গৌরবময় কালে লিখিত। ডঃ পূর্বচরক তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রামায়ণ কাকাবিনের সঙ্গে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার সাদৃশ্য আলোচনা করে প্রমাণ করেন যে, রামায়ণ কাকাবিনের রচনাকাল খ্রীঃ ১০ম শতক। পরবর্তীকালে ডঃ জে. জি. ডি. ক্যাসপারিস কর্তৃক প্রাচীন অনুশাসনের পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়ার ফলে প্রমাণিত হয় যে, অনুশাসনলিপিতে ব্যবহৃত শব্দ ও ছন্দতত্ত্বের সঙ্গে রামায়ণ-কাকাবিনে ব্যবহৃত শব্দ ও ছন্দতত্ত্বের সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং, প্রাচীন রামায়ণ কাকাবিন্ বা ককবিন্ ৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে (নাম শতকে) রচিত এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হতে পারে।[১৫-১৬]

ইন্দোনেশিয় রাম-কাহিনীর অন্যান্য সংস্করণ প্রচলিত থাকলেও যোগীশ্বরের রামায়ণ-কাকাবিনের আলোচনায় বক্ষ্যমাণ অংশ কেন্দ্রায়িত হবে। প্রাচীন যবদ্বীপের ভাষায় রচিত ইহাই প্রধান রাম-কাহিনী ; অন্যান্যগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন। ইহা ব্যতীত যোগীশ্বরের রামায়ণ বিষয়বস্তুর সাধর্ম্যে বাল্মীকি রামায়ণের অধিকতর নিকটবর্তী। প্রাচীন যবদ্বীপীয় 'রামায়ণের কবি-পরিচিতি প্রসঙ্গে জানা যায় যে, 'যোগীশ্বরের গভীর সংস্কৃত জ্ঞান এবং বিভিন্ন রামায়ণের সহিত পরিচয় হয়তো সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষেই ঘটিয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে যে, যোগীশ্বর একদা সংস্কৃত শিখিবার তাগিদে আমাদের মতই ভট্টিকাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কাব্যের শৈব পরিমণ্ডল তাঁহার রুচি অনুযায়ী হওয়ায় তিনি 'ভট্টিকাব্যকে' আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যবদ্বীপীয় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, 'ভট্টিকাব্য' যেমন ব্যাকরণ শিখাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল, তিনি তেমনি রামায়ণ রচনা করিয়া যবদ্বীপায় শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ছন্দ শিখাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।'[১৭]

১২। Glimpses of Cultural History of Indonesia : R. M. Sutjipto Wirjoswparto.

১৩। The Naking of Greater India : H. G. Q. Wales.

১৪। Paüji, the Cultural Hero : W. H. Rassers.

১৫। দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য : হিমাংশুভূষণ সরকার।

১৬। Rāma stories in Indonesia : R. M. Sutjipto Wirjoswparto.

১৭। দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য : হিমাংশুভূষণ সরকার।

CENTRAL LIBRARY

প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণে কাণ্ডের উল্লেখ নেই, সর্গসংখ্যা ২৬; মোট শ্লোক ২৪৬৮। সর্বাপেক্ষা অল্প-সংখ্যক শ্লোক (৫২) ১৮ ও ২৬ সর্গে; সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক শ্লোক (১৬০) ২৪ সর্গে। এতে মঙ্গলাচরণ নেই। কবি প্রত্যেক সর্গে সংস্কৃত ছন্দ অনুসরণ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালিনী, রুচিরা, বসন্ততিলক, শিখরিণী, অনুষ্টুপ, শার্দুলবিক্রীড়িত, ইন্দ্রবজ্র, উপেন্দ্রবজ্র, তোটক, প্রহাসিনী, স্রগ্ধরা প্রভৃতি। ২৬ সর্গে বিভক্ত সর্গসমূহের কাহিনী-সংকেত নিম্নরূপ—

১ম সর্গ—দশরথের কাহিনী, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আমন্ত্রণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার পুত্রলাভ, বশিষ্ঠ কর্তৃক দশরথ-পুত্রগণকে শিক্ষাদান, বিশ্বামিত্রের আগমন ও যজ্ঞবিঘ্ন দূরীকরণের জন্য রামলক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্রের গমন।

২য় সর্গ—যাত্রাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা, রাম ও লক্ষ্মণের আশ্রমে উপনীত হওয়া, দিব্যাস্ত্র প্রদান, তাড়কার প্রতি শরনিক্ষেপ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, শিবের ধনুর্ভঙ্গ, রাম-সীতার বিবাহ এবং অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

৩য় সর্গ—রামকে উত্তরাধিকারী করার জন্য দশরথের চিন্তা, কৈকেয়ী কর্তৃক ভরতকে রাজা করার মনোবাসনা, রামকে বনবাসে প্রেরণের প্রস্তাব, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার অযোধ্যা ত্যাগ, দশরথের মৃত্যু, ভরত কর্তৃক মাতাকে ভর্ৎসনা, ভরতের চিত্রকূটে গমন ও রামচন্দ্রকে প্রত্যাগমন করানোর প্রচেষ্টা, রাম কর্তৃক ভরতকে অনুশাসনাবলী প্রদান।

৪র্থ সর্গ—রাম-সীতা-লক্ষ্মণের দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাত্রা, শূর্পণখার আবির্ভাব, লক্ষ্মণকে প্রেমনিবেদন, লক্ষ্মণের প্রত্যাখ্যান ও শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, শূর্পণখা কর্তৃক রাবণ, খর, দূষণ প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা।

৫ম সর্গ—শূর্পণখা কর্তৃক রাবণকে সীতার সৌন্দর্য নিবেদন, স্বর্ণমৃগরূপী মারীচ প্রেরণ, সীতার লোভ, রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন, লক্ষ্মণের সাহায্য প্রার্থনা, সীতার তিরস্কার, লক্ষ্মণের আশ্রমত্যাগ এবং মুনির ছদ্মবেশে রাবণের আবির্ভাব।

৬ষ্ঠ সর্গ—রাবণের বিবাহ প্রস্তাব, সীতার প্রত্যাখ্যান ও রাবণ কর্তৃক অপহরণ, সীতা বিলাপ, জটায়ুর সঙ্গে সংগ্রাম, রাম ও লক্ষ্মণের অন্বেষণ, জটায়ু কর্তৃক সমস্ত বৃত্তান্ত কথন, পথে দীর্ঘবাহু ও শবরীর শাপমোচন, ঋষ্যমূকে গমন, সুগ্রীবের দৌত্য, রাম ও সুগ্রীবের বন্ধুত্ব, সুগ্রীব-বালির যুদ্ধ, বালির পতন ও সুগ্রীবের সিংহাসনারোহণ।

৭ম সর্গ—মাল্যবান পর্বতে রামের সীতার জন্য বিলাপ, সুগ্রীবের নেতৃত্বে বানরসৈন্যের সমাবেশ, রামের অঙ্গুরী-সহ হনুমান, নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববানের লঙ্ফপ্রদান, পথে সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ, লঙ্কার বর্ণনা ও পথের সন্ধান প্রদান।

৮ম সর্গ—পবননন্দনের বিবরণ, সীতার অনুসন্ধানরত হনুমানের অশোকবনে উপস্থিতি, সীতা-ত্রিজটার কথোপকথন, হনুমান কর্তৃক সীতাকে আত্মপরিচয় প্রদান, হনুমান কর্তৃক অশোকবনের সৌন্দর্য-বর্ণন।

৯ম সর্গ—অব্যাহতগতিতে হনুমানের দৌরাত্ম্য চলতে থাকলে রাবণ কর্তৃক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ, ইন্দ্রজিৎ ও হনুমানের শক্তিপরীক্ষা, হনুমানের পরাজয়, রাবণ হনুমানকে হত্যায় উদ্যত; বিভীষণের বাধাপ্রদান।

১০ম সর্গ—হনুমান কর্তৃক রামের জয়লাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, সীতার অন্বেষণ বার্তা জ্ঞাপন, হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ।

১১শ সর্গ—হনুমানের বন্ধন মোচন, সমুদ্র লঙ্ঘন, জাম্ববান, নীল, অঙ্গদের সহিত সাক্ষাৎ, দৌত্য কাহিনী বর্ণনা, মাল্যবান পর্বতে রাম-লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ, সীতার অঙ্গুরীয় ও সংবাদ প্রদান।

CENTRAL LIBRARY

১২শ সর্গ—প্রকৃতির আদিরসাত্মক বর্ণনা ॥

১৩শ সর্গ—বিভীষণ কর্তৃক শংকরের উপাসনা ; রাবণকে নীতি ও অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদানের পর রামের নিকট সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ ॥

১৪শ সর্গ—রাবণের মাতামহ সুমালীর উপদেশ ও বিভীষণকে সমর্থন, বিভীষণ কর্তৃক পুনরায় উপদেশ প্রদান ; রাবণ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকরূপে তিরস্কৃত হওয়ায় রাবণের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ ॥

১৫শ সর্গ—বিভীষণ কর্তৃক শূন্যমার্গে মহেন্দ্রপর্বতের দিকে গমন, হনুমান কর্তৃক রামের কাছে বিভীষণের পরিচয় প্রদান ॥

১৬শ সর্গ—বিশ্বকর্মার পুত্র কর্তৃক সমুদ্র বন্ধন, বানরসৈন্যগণের লঙ্কা অভিযান, সুবেল পর্বত দর্শন ও সৌন্দর্য বর্ণনা ॥

১৭শ সর্গ—রাবণ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের নকলমস্তক নির্মাণ, সীতার নিকট পুনরায় বিবাহ প্রস্তাব, রাম-লক্ষ্মণের জন্য সীতার ক্রন্দন ও অগ্নিতে প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ঘোষণা। ত্রিজটার পিতা কর্তৃক আনীত সংকেতে রাম-লক্ষ্মণের কুশল প্রমাণ, সীতার অগ্নিস্থিতি, অশোকবনের সৌন্দর্য-বর্ণনা ॥

১৮শ সর্গ - রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রস্তুতি, ছদ্মবেশে শুকসারণ রাক্ষস কর্তৃক রামপক্ষীয় সৈন্যের সংবাদ সংগ্রহ, শত্রু বাহিনীর বীরত্বের পরিচয় প্রদান, রাবণকে রামের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের জন্য অনুরোধ, যুবরাজ অঙ্গদের লঙ্কায় গমন, দশাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ, রাবণ কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ॥

১৯শ সর্গ - রাবণের মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিবরণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণের বিবরণ, নীল ও হনুমানের যুদ্ধযাত্রা, কবি কর্তৃক রণক্ষেত্রের বীভৎসতা বর্ণনা ॥

২০শ সর্গ—সম্পাতি, নীল, হনুমান, বিভীষণ এবং সুগ্রীব কর্তৃক যথাক্রমে প্রজঙ্ঘ, স্ফূর্তদাক্ষি, জম্বুমালি, মিত্রঘ্ন, প্রবস হত্যা ; ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক সর্পাস্ত্র পাশ প্রয়োগ, রাম-লক্ষ্মণের বন্দিত্ববরণ, রাবণকে সংবাদ প্রদান, রাম-লক্ষ্মণ নিহত মনে করে লঙ্কায় বিজয়োৎসব ॥

২১শ সর্গ– রণক্ষেত্রে সীতা কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা দর্শন ও ক্রন্দন, অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প ঘোষণা, রামের চেতনা প্রাপ্তি, ঋষিগণের প্রার্থনায় রাম-লক্ষ্মণের মুক্তি, বানরদিগের উল্লাসে রাবণের শংকা, রণক্ষেত্রে মহাপরাক্রমশালী রাক্ষস প্রেরণ ও বানরসৈন্যের হাতে তাদের মৃত্যু ॥

২২শ সর্গ– কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, অসৎচরিত্রের জন্য রাবণকে তিরস্কার, রণক্ষেত্রে গমন ও কুম্ভকর্ণের সহিত সুগ্রীবের প্রচণ্ড যুদ্ধ ॥

২৩শ সর্গ—কুম্ভকর্ণকে হত্যা করবার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে বিভীষণের উৎসাহ প্রদান, কুম্ভকর্ণের পতন, মুণ্ডচ্ছেদন ও মৃত্যু, রাবণের সম্মোহনাস্ত্র প্রয়োগ। বিভীষণের পরামর্শে হনুমান কর্তৃক হিমালয় থেকে ঔষধ আনয়ন ; লক্ষ্মণ কর্তৃক শিবমন্দিরে উপাসনা ও চূড়ান্ত সংগ্রাম প্রস্তুতি ॥

২৪শ সর্গ—রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন, রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রাবণের সম্মুখীন হলেন, রাবণের সারথি, অশ্ব ও রথ বিধ্বস্ত ; ইন্দ্র কর্তৃক রামকে গুহ্যবিজয় মন্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান, স্বীয় সারথি মাতলিকে রাম সমীপে প্রেরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি ও রাম কর্তৃক রাবণের দশ মুণ্ডচ্ছেদন, রাবণের মৃত্যু, বিভীষণের শোক, রাম কর্তৃক বিভীষণকে নীতি উপদেশ প্রদান, রাবণের মৃতদেহ সংকার, বিভীষণের সিংহাসনারোহণ, লঙ্কার সংস্কার কার্য, সীতার নিকট হনুমানের গমন ও সীতা কর্তৃক রাম সমীপে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ, রামের আদেশানুযায়ী সীতা

CENTRAL LIBRARY

নিজেকে পবিত্রা বললেও, রাম তাঁকে মিথিলায়, বিভীষণ, লক্ষ্মণ বা ভরত সমীপে গমনের নিমিত্ত বললে সীতা কর্তৃক আকাশ-পৃথিবী ও জলকে সাক্ষী রেখে অগ্নি প্রবেশ; অগ্নিদেব কর্তৃক সীতার পবিত্রতা ঘোষণা এবং রামের সন্দেহ মোচন।

২৫শ সর্গ—অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে সীতার নিকট রাম কর্তৃক মালাবান, ঋষ্যমূক প্রভৃতি পর্বতের, দণ্ডক অরণ্যের, পম্পা সরোবরের এবং গঙ্গা, যমুনা, তমসা, সরযূ প্রভৃতি নদীর বর্ণনা ও ভরদ্বাজের বিবরণ প্রদান।

২৬শ সর্গ—প্রাচীন অযোধ্যার বর্ণনা, কৌশল্যার পদবন্দনা, রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন, সকলের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন; শেষাংশে কবি কর্তৃক পরমেশ্বর বন্দনা ও রামায়ণের স্তুতি।[১৮]

প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ ৩য় সর্গে রাম কর্তৃক ভরতকে অনুশাসন প্রদান। মনে হয় কবি এখানে প্রায় বাল্মীকি রামায়ণকে অনুসরণ করেছেন। 'রাম-কাকাবিনের' ৮৫টি শ্লোকের মধ্যে ৪১টি শ্লোকে রাম ভরতকে রাজ্য শাসন সম্পর্কিত অনুশাসন প্রদান করেছেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ বা 'রাম-কাকাবিনে' রাম কর্তৃক ভরতকে প্রদত্ত অনুশাসন 'অষ্টব্রত' নামে অভিহিত। 'রাম-কাকাবিনে'র কবি কর্তৃক রচিত আলোচ্য অনুশাসনাবলীর মধ্যে মনুর 'ধর্মশাস্ত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও কামন্দকীয় 'নীতিশাস্ত্রে'র প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। অনেক সময় কোনো কোনো শ্লোক আক্ষরিক অনুবাদ বলে মনে হয়। খ্রীঃ ৮ম ও ১১শ শতকে মনুর 'ধর্মশাস্ত্র' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ইন্দোনেশিয়ায় আংশিক আকারে প্রচলিত ও প্রচারিত ছিল। অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের 'শততম' সর্গে রাম-ভরতের কথোপকথনেও রাজার কর্তব্য, রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, ধর্ম পালন প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণে 'অষ্টব্রত' সাংস্কৃতিক উপাদানের ইঙ্গিত বহন করে। আর এই সাংস্কৃতিক উপাদান ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে ক্রমপ্রসারিত হচ্ছিল। অবশ্য একথা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, ইন্দোনেশিয়া যথাযথভাবে ভারতবর্ষের রীতি-নীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করছিল; ইন্দোনেশিয় সমাজব্যবস্থা স্বীয় প্রয়োজনানুযায়ী এর পরিবর্তন ঘটিয়ে আপন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল।[১৯]

প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ শুধু মহাকাব্য রূপেই নয়, ইন্দোনেশিয় সাংস্কৃতিক ও সমাজ জীবনের দর্পণ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ থেকে নবা-যবদ্বীপীয় রামায়ণ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয় জীবনের বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা ধর্ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধবিদ্যা, সমাজনীতি প্রভৃতির এক সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনানুগ চিত্র প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণে সংলক্ষ্য বলে, ইন্দোনেশিয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে রাম-কাহিনী এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৮। দ্রঃ পূর্বোক্ত।

১৯। Rāma stories in Indonesia : R. M. Sutjipto Wirjosuparto.

CENTRAL LIBRARY

উর্দু কবিতার মোশায়েরা

(বাংলা অনুবাদসহ)

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত উর্দু কবিতার মোশায়েরা সম্পর্কে দু'একটি কথা নিবেদন করা যাইতেছে। এই সুবর্ণজয়ন্তী সঙ্কলনের (সুবর্ণলেখা') প্রথমে সংযোজিত 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রথম পঁচিশ বৎসর' শীর্ষক নিবন্ধে দেখা যাইতেছে যে, ১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ **Indian Vernacular Department** নামে পরিচিত ছিল ; ঐ বৎসর এপ্রিল মাস হইতে এই বিভাগের নূতন নামকরণ হয় — **Modern Indian Languages Department**—এই নাম এখনও বলবৎ আছে। এই বিভাগের অধীনে বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও এম. এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বাংলা বিভাগের প্রধানই সমগ্র আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষরূপে বিভাগ পরিচালনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্তৎ প্রদেশের ভাষায় উচ্চতম পরীক্ষার শিক্ষাক্রম অনুসৃত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সমস্ত ভাষায় এম. এ. পাঠক্রম ও পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। শুধু হিন্দী ও উর্দু আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অন্য দুই শরিক রূপে (প্রধান শরিক—বাংলা) রহিয়া গেল। ১৯৬১ সালের মে মাস হইতে হিন্দীও এই বিভাগ হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র বিভাগরূপে কার্য নির্বাহ করিতে লাগিল। কিন্তু উর্দু বিভাগ এখনও আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অঙ্গে যুক্ত আছে, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষই উর্দু বিভাগ পরিচালনা করেন। সেই জন্য গত সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক-ছাত্রদের সহযোগিতায় উর্দু কবিতার মোশায়েরা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষকগণ স্বরচিত উর্দু কবিতা পাঠ করেন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ কবিতাগুলির বাংলা অনুবাদ পাঠ করিয়া শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করেন। এখানে মূল উর্দু কবিতা ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জাফর উগানবি এই সম্পর্কে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।—সম্পাদক]

CENTRAL LIBRARY

এবদুল্ ওয়াক্

ইব্রাহিম 'হোশ্'

চড়্হ্তে স্বরাজ কা পূজারী
এ্যাফিডিফিট্ কে লিএ কাল
কোর্টে মে দেখা গিয়া
আওর যব্ উস্কে
হলফ্ লেনে কে বায়াদ্
ওল্দিয়াত্ বদ্লি গয়ি উসকী
আওর উসকা নাম ভী
তো উহ্ এক্ কাগজকা টোক্ড়া
লে কর্ বাহার আ গিয়া
আওর ফের এক শাখ্সসে
যো মোয়াম্মার্ ভী থা আওর বারিশ ভী
আওর আদালত্কে এহাতে মে
খাড়া থা দম্বা যোদ্
জিস্কী পেশানীকী শেক্নী
উস্কে দিল্ কে কার্ব্কি
আএনাদারী কর্তি থি
(আওর যো দর্আসল
উস্কা বাপ থা)
তুর্শ্-কইসে ইয়ে বোলা
আপ্কা ইস্ম্ শরীফ ?

এক সুবিধেবাদীর পিতৃপরিচয়

(সে ব্যক্তি জীবনের ভাগ্যাকাশে)
উঠন্ত সূর্য্যের পূজারী ;
তাই গেল কাল তাকে কোর্টে দেখা গিয়েছিল
এফিডেভিট্ করে নাম বদল করতে।
এবং শপথ নেবার পর
এক টুকরো কাগজ নিয়ে সে যখন বাইরে এল,
তখন তার পিতৃপরিচয় গেছে বদলে,
সঙ্গে নিজের নামটাও।

CENTRAL LIBRARY

আদালতের হাতার বাইরে
স্তব্ধ নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল
এক থুত্থুড়ে বুড়ো, দাড়ীঅলা—
যার অন্তরের যন্ত্রণার আয়না
তার কপালের ক্লান্ত বলীরেখাগুলি,
(আসলে এ বুড়ো সে ব্যক্তির বাপ)
পরম বিরক্তিভরে তাকে সে ব্যক্তি শুধাল—
'আপনার নামটা কি, শুনি ?'

অনুবাদ : আশুতোষ ভট্টাচার্য

সফর দোশ্‌ওয়ার

সালেক্ 'লখানবী'

এক্ আজব্ বেবশিকা আলম্ হ্যায়
কুচ্ কর্ত্ তো কাহা নেহি যাতা !
বেকাহে ভী রাহা নেহি যাতা !
দিল্ মে হ্যায় আগ্ আঁখ মে পানি
দোনোঁ এক্ দুস্‌রেসে কেত্‌নে দূর !
ইয়ে খেয়ালাত্ অফিক্‌র্ কে জঙ্গল
ঢুঁণ্ডতাহুঁ, সেরা নাহি মিল্‌তা
আজ আপ্‌না পাতা নেহি মিলতা !
এক মন্‌জিল্ হ্যায়, কেত্‌নি রাহেঁ হ্যায়
কেত্‌না দোশ্‌ওয়ার হ্যায় সফর সালিক !

কঠিন ভ্রমণ

আজব অবশ এক পরিস্থিতি এই।
কিছু তো বলতে চাই, কিছুই যায় না বলা—তবু
না বলেও শান্তি নেই।
অন্তরে আগুন, চোখে জল—
দুয়ের দূরত্ব বহুদূর।

CENTRAL LIBRARY

এ সব চিন্তা আর বোধের অরণ্যে ভ্রাম্যমাণ ;
মেলে না তো শেষ।
নিজের ঠিকানা পাই না। লক্ষ্য এক,—পথ যে অনেক।
কঠিন ভ্রমণ বটে, ভাবছেন ভ্রমন্ত সালিক।

অনুবাদ : হরপ্রসাদ মিত্র

নারিয়াল কা জায়েকা

মুজতাবা হাইদ্রি

লোহু মে ডুবি জমি পর্ ইয়ে নারিয়াল্ দারাখ্ত্
জড়উমে জিন্‌কি হায় পাইওয়াণ্ড্
রং রং লোহু
সুনা হায় আজ্ হর্ এক্ নারিয়াল্‌কে পানি কা
আজব্ মজা হায়, আজব্ জায়েকা
আজব্ লজ্জত্
কে জেইসে কোই লোহু মে
শক্‌র্ মিলা কে পিয়ে।

ডাবের সোয়াদ

রক্ত-ডোবা এই জমিতে নারিকেল তরু,
শেকড় তার পৌঁছে গেছে
নানা স্তরের রক্ত ভেদ করে।
শুনেছি, সেই সব নারিকেলের
প্রতিটির জলের আজ
আশ্চর্য তৃপ্তি, আশ্চর্য স্বাদ
উপভোগে তা আশ্চর্য :
যেন কেউ সেই জল-রক্তে
চিনি মিশিয়ে পান করছে!

অনুবাদ : নির্মলেন্দু ভৌমিক

বাংলা দেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বর অত্যাচারের পটভূমিকায় কবিতাটি পঠিতব্য।—সম্পাদক

CENTRAL LIBRARY

গজল্

কাইসার শামিম্

এক সমন্দর য়ে নেক্‌লে হাম, এক সমন্দর মে ডুবে
দিন্‌ভর্ বাহার তায়ের রাহে থে, শাম হুয়ি তো ঘর মে ডুবে
শাহ্‌র্ সে ঘাব্‌রা কর্ ভাগে তো এক খাঁডর্ মে ঠাহ্‌রে হাম
কৌন্ সে মান্‌জার্ সে উভরে থে, কৌন্ সে মান্‌জার মেঁ ডুবে
যাদুঘর কি চীজ্ বানা কর্ ছোড়া সাঙ্গ্‌তারাশোঁ নে
পানি সে তো বাচ্ নিক্‌লে হম্ লেকিন্ পাথর্ মে ডুবে
কৌয়ি ঝালাক মিল্‌তিথি শায়েদ্ আপ্‌নে শেকাস্তা চাঁচে কি
যো পাইকর্ ভি সামনে আয়া হাম্ উস্ পাইকর্‌মে ডুবে
কেয়সে লাম্‌হুঁ কি আওয়াজে চারেঁ। যানেব্ পৌজ্ উঠি
হাম্ মোর্‌দে, উঠ্‌নে সে পাহ্‌লে, শোরে মাহ্‌শার্ মেঁ ডুবে
ঘাট্‌তি বাড়্‌হ্‌তি মৌজুঁ হি কে রাহ্‌ম্ ও কারম্ পর্ সব্ কুছ থা
কেত্‌নি বার্ ন জানে "কাইসার", হাম তো দিন্‌ভর্ মে ডুবে।

দিনে শতবার, সমুদ্রে আমি

আমি সমুদ্র থেকে এসে ফের সমুদ্রে ফিরে যাই।
দিনভর বাহির বাতাসে সাঁতার কেটে
সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যাই।
শহুরে জীবনে অরুচি ধরে
পালিয়ে চলে যাই এক ভগ্ন-জীর্ণ কক্ষে।
এ কী বিস্ময়াবহ দৃশ্যান্তর সে
আমি যে লীন হয়ে যাই অপর এক দৃশ্যে।
কখনো এগিয়ে আসে যেন এক ভাস্কর
জীবন্ত আমাকে করে সে নিথর পাথর-প্রতিমা।
জীবনকে অতিক্রম করে
তখন আমি হয়ে যাই শিলীভূত যাদুঘর।
কখনো বা, সম্ভবতঃ, শিলীভূত আমার
অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত চূর্ণবিচূর্ণ আলোকে দেখি—
দেখি : আমারই শরীর থেকে বেরিয়ে আসে
এক মূর্তি, এসে দাঁড়ায় আমারই সম্মুখে ;

CENTRAL LIBRARY

আমি সেই অশরীরী মূর্তির মধ্যে ডুব দিই।
বুঝে নিই, এই এল জীবনের পরম লগ্ন
সে লগ্ন গুঞ্জরিত হয় আমার অস্তিত্বের চারিভিতে।
আমার ভেতর আমি যখন প্রতিদিন মৃত, সমাহিত—
পুনরুত্থানের যখনো বাকী,
তখন শেষ বিচারের শোরগোলে ডুবে যাই।
তখন আমার ভোবা-ভাসা সবকিছু
তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যের 'পরে ভেসে থাকে।
দিনমানে কতোবার যে এই নানা সমুদ্রে
আমি উঠি ডুবি—
আমি কবি 'কাইসার'
আমি তা জানি না॥

অনুবাদ : নির্মলেন্দু ভৌমিক

গজল

এজাজ্ আফ্জল্

কীরূচে বন্ কর জো বিখার্ জায়ে ওহ্ ঘর্বার্ উঠা
সর্হদে সঙ্গ্পে শীশে কী ন দীওয়ার্ উঠা
জাকে সহ্রা মে গিরে লালাও গুল্কে খ্মে
ইস্তরহ বাগ্মে তুফানে খশো খার্ উঠা
বাগ্ বানো পে ন ছোড়্ আপ্নী মাতায়ে পর্ওয়াজ্
হায়্ আগর্ কাস্ দে সফ্র্ দোশ্ পে গুল্জার্ উঠা
দিল্কী আওয়াজ্ পে হম্ জানে কহাঁ জা পহুচে
ইস্সে পহ্লে কে কোঈ কাফ্লায়ে সালার্ উঠা
ন সহী রাহ্জানী রাহ্নুমায়ী হী সহী
পহ্লী দীওয়ার্ গিরা দুস্রী দীওয়ার্ উঠা
মস্লেহত্ কোশী আলামত্ হুয়্ শিকস্তে দিল্কী
আকল্কী ঢাল্ নহী, ইশ্ক্কী তলওয়ার্ উঠা।

CENTRAL LIBRARY

ভালোবাসার তলোয়ার

এমন ঘর তৈরি করো
যা টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙবে না।
পাথরের সীমানায় কাচের দেওয়াল
তৈরি করো না।
বাগানের ভেতর কাঁটা আর ঘাসের
এমন ঝড় উঠলো
যে
ফুলের তাঁবুগুলো গিয়ে পড়লো বনে।
যদি তোমার অভিযানের সংকল্প থাকে
তাহলে তুমি
আকাশে ওড়ার মূলধন মালীকে সঁপে দিও না।
তোমার কাঁধেই সমস্ত উদ্যান তুলে নাও।
সার্থবাহের কোনো নায়ক হবার আগেই
হৃদয়ের আহ্বানে
না জানি আমি কতদূরে চলে এসেছি।
হতে পারে কোনো রাহাজানির জন্যে নয়,
হয়তো নেতৃত্বের জন্যেই,
আগেকার দেওয়াল ছিল।
তবু, সে দেওয়াল ভেঙে দাও।
নতুন দেওয়াল তোলো।
সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি ভগ্নহৃদয়ের লক্ষণ।
তাই,
বুদ্ধির ঢাল নয়, ভালোবাসার তলোয়ার তোলো।

অনুবাদ : উজ্জ্বল মজুমদার

বেটিয়াঁ

আবদুর রউফ্

সরহদে নদীয়োঁ পাহাড়োঁ কি
ফাস্‌লে দস্‌ত ঔর্ সমুন্দরকে
জার্দ্ কালী সফেদ রঙ্গত্ কি
সংলাখ্‌হ্ উঁচী উঁচি দীবারেঁ

CENTRAL LIBRARY

বেড়িয়া হুত্‌গ্‌কি জর্‌রা কি ফাসিল
আপ্‌নী আওয়াজে বাজ্‌ গশ্‌ত্‌কা শোর্‌
আদমী ঘির্‌ গয়া হেসারোঁমে
জিস্‌কী হর্‌ সাঁস্‌ মে এক্‌ আলম্‌ গুম্‌।

বেড়া

নদী আর পাহাড়ের বেড়া
সমুদ্র আর মরুভূমির দূরত্ব
হলুদ কালো শাদা
বিচিত্র রঙের
উঁচু পাথুরে দেওয়াল
বিচিত্র বুলির বাঁধন
বিচিত্র ভাষার প্রাচীর
স্বকণ্ঠের প্রতিধ্বনির বিচিত্র আওয়াজ।
বিচিত্র দেওয়ালে ঘেরা মানুষ।
যে মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাসে
এক-একটি বিশ্ব
স্তব্ধ হয়ে থাকে!

অনুবাদ : আশুতোষ ভট্টাচার্য

খুর্‌শিদে এল্‌ম্‌ ও দানেশ

আল্‌কিমা শিবলী

গর্‌দেশে সাল নে ছেড়ি হায় তরব খেজ্‌ গজল
ওয়াক্‌ কে হোঁট্‌ পে খেল্‌তে হ্যায় মোসার্‌রাত কে কঁওল
"শোবায়ে আলসেনায়ে নও"* হায় গুলিস্তাঁ বকেনার্‌
আজ হায় রাশ্‌কে জর্‌রা এল্‌ম্‌কা ইয়ে তাজমহল
তাজ হায় ইয়া ইসে তহ্‌জিব কা দর্পণ কহিয়ে
এল্‌ম অ ফন্‌' দানেশ ও ফর্‌হঙ্গ কা মখ্‌জন্‌ কহিয়ে
মাইকাদা নজরুল ও টেগর কা কহিয়ে ইসকো
সহর্‌ওয়ার্দি ও আশুতোষকা গুল্‌শন্‌ কহিয়ে

* আধুনিক ভারতীয় ভাষা

CENTRAL LIBRARY

জিন্দাগি জিস্‌সে সঁওবৃতি হ্যায়, উহ্‌ গাজা হ্যায় এহি
ফিক্‌র ও ফন্‌, হেক্‌মত্‌ ও এদ্‌রাক্‌ কা কেব্‌লা হ্যায় এহি
ওয়াক্ত্‌ উহ্‌ হ্যায়কে গলে মিল্‌তে হ্যায় কুফ্‌র্‌ ও ইমাঁ।
হম্‌কদম্‌ আজ্‌ নজর্‌ আতে হ্যায় এল্‌ম্‌ ও ইরফাঁ
দহর মে হ্যায় ইহাঁ সহবায়ে সোগনে কে সাগর
সাজ পর এল্‌ম্‌ আদ্‌ব কে হ্যায় হরেক দিল্‌ রক্‌সাঁ।
এল্‌ম্‌ ও দানেশকা ইয়ে খুরশিদ্‌ দরগশিন্দা রহে
তা আবদ্‌ চর্‌খ পে আজমত কে ইয়ে তাবিন্দা রহে
ইস্‌কি কিরনোঁ সে ফরোজাঁ রহে দিল্‌ কি দুনিয়া
রওশনি উস্‌কি নেগাহ মে ভি পায়েন্দা রহে।

চিরজ্যোতির্ময়

যুগের হাওয়াবদলের গজল ঐ শোনা যায়,
চেয়ে দেখো, যুগের অধরে আজ বিকশিত আনন্দ-কমল।
বিচিত্র পুষ্পশোভায় সুন্দর আজকের ভাষা-ভারতী,
জ্ঞানের এই তাজমহলকে বুঝি-বা স্বর্গও আজ ঈর্ষা করে।
একাধারে মুকুট ও দর্পণ আমাদের এ বিভাগ,
জ্ঞান ও শিক্ষার পীঠভূমি,
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধুসঞ্চয়,
আশুতোষ ও সুরাবর্দির মিলিত গুল্‌বাগ।
এর লাবণ্য বাড়িয়ে তোলে জীবনের শোভা,
জ্ঞান ও বিদ্যার এ কাবা-মন্দির,
চোখের ও মনের আলোয় এ আমাদের দিশারী,
শব্দ ও শব্দার্থের যুগলমিলনে প্রিয়তমার মুখচ্ছবি।
আজকের এই শুভদিনে একসঙ্গে এসে মিলেছে স্বর্গ ও মর্ত্য,
জ্ঞানের সঙ্গে মিশেছে এসে জ্ঞানের পিপাসা,
আজকের মজলিসে তো কাব্যসুরার ছড়াছড়ি,
প্রতিটি হৃদয়ের নৃত্যছন্দে শিহরিত সাহিত্যের বীণা।
জ্ঞান ও মননের এই স্বর্গ হোক চিরজ্যোতির্ময়,
মহত্ত্বের গগনে চিরভাস্বর হোক এই সূর্যের আবির্ভাব,
হৃদয় আলোকিত হোক এই সূর্যের কিরণে,
নয়ন জ্যোতির্ময় হোক হিরন্ময় উদ্ভাসনে।

অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ

CENTRAL LIBRARY

গজল্

ইউসুফ তন্তী

দর্দ্ কি খুশ্‌বু সে ইয়ে মহ্‌কা রাহা
যব্ কভী কম্‌রেমে মায় তন্‌হা রাহা
উম্‌র্ কী নদী চড়্‌হী, উতরী, গয়ী
জিস্‌মকা শহরা মগর্ জল্‌তা রাহা
দিন্‌কো তপতী ফাইলোঁ কি রেত পর্
মায় তো অবর্‌ক্ কী তরহ বিখরা রাহা
রাত ভর্ এক্ জিস্‌মকী দীওয়ার সে
মায় ক্যালেন্‌ডারকী তর্‌হা চিপকা রাহা
শব্, পালঙ্‌পর হাঁপতে সায়ে রহে
থাব্ দরওয়াজে খড়া তক্‌তা রাহা
ইয়াদ্ কী ডিব্‌বি মে কিউঁ রখ্‌খো মুঝে
মায়্ জলী তীলী হুঁ মুঝ্‌মে কেয়া রাহা।

গজল্

(দগ্ধ কাঠি)

যখনই আমি আমার ঘরে একা—
তখনই ঘর ব্যথার গন্ধে ভরে যায়।
বয়সের নদীতে বন্যা আসে,
ভাটা পড়ে, চলে যায়।
কিন্তু শরীরের এই বন শুধু জলে-পুড়েই মরে।
সারাদিন ফাইলগুলির উত্তপ্ত বালিতে
অভ্রের মত ছড়িয়ে থাকি।
সারারাত এক শরীরের দেওয়ালকে ধ'রে
ক্যালেণ্ডারের মতো আঁকড়ে থাকি।
রাতের পালঙ্কে ছায়াগুলো হাঁপাতে থাকে।
দরোজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন শুধু দেখে।
স্মৃতির কৌটোয় আমাকে কেন তুমি ভরে রাখবে?
আমি তো দগ্ধ কাঠি।
আমার মধ্যে তার বাকি কী আছে?

অনুবাদ : উজ্জ্বল মজুমদার

CENTRAL LIBRARY

জিন্দা নামা

হাশান "আসর্"

বন্দ কর্ দিয়া গিয়া হ্যায়
কিসি বেগোনাহ কো
মেরে আন্দার
দেখতাহুঁ মাই উসে
লাগাতার সারমারতা হুয়া
আহনি সালাখোঁ পর্।
না হি মাইনে উসে কাইদ্ কিয়া হ্যায়
না হি ম্যায় উসে আজাদ কর্ সাকতাহুঁ
উসকী বেগোনাহি
সোফায়েদ কাগজোঁ পর।

কারাগারের অন্তরালে

ওরা বন্দী কোরে রেখেছে
এক নিরপরাধ অসহায় মানুষকে
আমার অন্তরাত্মা শুনেছে তার
নিভৃত হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনধ্বনি।
সে নালিশ জানায় তার
ভাগ্যের কাছে, আর
নিষ্ফলে মাথা কুটে গারদখানার
লোহার গরাদের ওপর।
সে তো জানে :
ওকে আমি কয়েদ করিনি,
আর, আমারই বা কতটুকু সাধ্য
ওকে মুক্তি দেবার!
আমি যে এক নগণ্য কবি,
শুধু পেশ করতে পারি
বিশ্ববিবেকের দরবারে,
এক নিষ্পাপ বন্দীপ্রাণের
আকুল বেদনা—
কতকগুলো সাদা কাগজের ওপর।

অনুবাদ : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

"এ্যাইট্ টু"[১]

ওহিদ্ আর্‌শি

উস্‌কে চারো তরফ্
দোস্ত খঞ্জর বকাফ্
ওয়ার্ হর্ সিম্‌ত সে
জখম্ খাতা রাহা
দোস্ত কি সিম্‌ত বড়হ্‌তা রাহা
আওর ফের্
দেখ কর এক্ বারহনা ছুরি দোস্ত্‌কে হাত মে
মোদাফেয়াত্ মে জো মশগুল্ থে হাথ্, শল্‌হো গয়ে
চিখ্ কর্ এতনা উহ্ কহ সাকা "এ্যাইট্ টু—"
ইস্ তরেহ্ হো গিয়া উহ্ শহিদে অফা
দোস্তি কে ভরম্ কো অমর্ কর্ গয়া।
আজ্ ভি হর্ তরফ্
দোস্ত্ খঞ্জর বকফ্
নর্‌গে মে খঞ্জর্‌কে খড়া আদ্‌মি
জখম খাতা হ্যায়
গিরতা হ্যায় মর্ যাতা হ্যায়
কেও কোই চিখ্ কর আজ কাহ্‌তা নেহি
"এ্যাইট্ টু—"
কিয়া কিসিকো কিসি পর ভরসা নেহি ?

তুমিও

বন্ধুরা তার ছুটে এলো কাছে হাতে নিয়ে তলোয়ার।
বাঁকা তলোয়ারে অশনি ঝলকে, আঘাতে আঘাতে দেহ তার হল রক্তিম শতদল।
বন্ধুর দিকে ভরামন নিয়ে চলেছিল আর ভেবেছিল,
ওরা যে তাহার মিতা।
চেয়ে দেখে আর পায়ে পায়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে চমকায়।
বন্ধুর হাতে সর্পজিহ্ব খাপখোলা ছুরি খরতর ক্ষুরধার।
থমকি দাঁড়াল হায় রে ভাগ্যহত।
বন্ধুর হাতে রক্তপিপাসু নির্মম খঞ্জর,
নিজেরে বাঁচাতে আর তো ইচ্ছা নেই।
উদ্যত বাহু স্থির হয়ে আসে, চোখমুখ নিশ্চল।

---

[১] et tu

CENTRAL LIBRARY

রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে শুধু, 'তুমিও বন্ধু, তুমিও।'
বন্ধুত্বের মূল্য বোঝাতে সে হল শহীদ মৃত্যুর আঙিনায়।
আজ দিকে দিকে কারা এলো ঘিরে, ওরা কি বন্ধু মিতা?
হাতে কেন খঞ্জর?
সেই তলোয়ারে আজিও মানুষ ডালি দেয় প্রাণ, পড়ে যায়, মরে যায়,—
তবুও কেন যে ডাকে নাকো কেউ—তুমিও বন্ধু, তুমিও?

অনুবাদ: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক নজ্‌ম্‌

শামিম্‌ আনোয়ার

সব্‌দ্‌ বর্‌ফিলি সি রাত্‌ থি
এক্‌ মোসাফির থা ভটকা হুয়া—মুজ্‌মহেল, মুজ্‌মহেল্‌
জিস্‌কি নজরুঁ কা মার্‌বাজ্‌ বনা—চমচমাতা হুঁয়া এক্‌ মাকাঁ
দূর কেত্‌নে হি কিলোমিটার্‌ দূর পর্‌ থা খাড়া
ইস্‌কে কাদমুঁ কি বে চাইন পেয়াসি জবাঁ
হাঁপ্‌তি, কাঁপ্‌তি, চাটতি যারাই থি
ফাস্‌লুঁ কি তেওয়াল্‌ত্‌ কা জহ্‌রিলাতন
দিলকি ধড়কন্‌ মে পুশিদা, খাবিদাহ্‌ এক্‌ আর্‌জু
আপনে সারে খাজাহুঁ কা মুহ্‌ খোল্‌ কর্‌
ফের হারারাত্‌ কি শিরিনি তক্‌সিম করনে লগি
জহ্‌র্‌ জব্‌ ফাস্‌লুঁ কা হুয়া খত্‌ম্‌ তো
উহ্‌—ওয়াহাঁ—এক্‌ খঁড়র্‌ কি পানাহোঁমে থা
সব্‌দ্‌ চুব্‌হ্‌তি হাওয়াওঁ কি বাহোঁ মে থা
গো কে কাদমোঁ মেঁ উস্‌কি ন থি তাব পর্‌
কেত্‌নে হি কিলোমিটার দূর পর এক মাকাঁ—
কে যহাঁ কুছ্‌ মাকিঁ
মুজতারেব্‌—মুজতারেব্‌ উসকাহি রাস্তা তক্‌ রহে থে
কুছ্‌ সদি বাদ্‌ যব্‌—উস্‌ খঁড়র্‌ কি খোদাযি হুয়ি
এক ইন্‌সানি পঞ্জর ভি পায়া গয়া
ফের্‌ তুমায়েশ্‌ মে উসকো লাগায়া গিয়া
খাস কর্‌ উস্‌কি আঁখি তামাশা বনি
সাল খোর্‌দাসে পঞ্জর্‌ কি আঁখোমেঁ থি জিন্দেগি কি রমক
উস্‌ সে জিয়াদা পুর্‌ ইসবার তো উস্‌কি কালি সিয়াহ্‌ পুত্‌লিওঁ পর্‌টঙ্গি
এক মকাঁ, কুছ্‌ মাকিনোঁ কি তস্‌বির থি

CENTRAL LIBRARY

একটি কবিতা

কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাত ;
যেন বরফ গ'লে পড়ছে চারিদিকে।
তারি মাঝে চ'লেছে এক
দুর্বল দিশাহারা পথিক।
দৃষ্টি তার নিবদ্ধ
এক উজ্জ্বল প্রাসাদের চূড়ায়।
দূরে,—বহু দূরে—দেখা যায়
প্রাসাদের সীমা,
শ্রান্তিতে অবশ হ'য়ে আসে
পথিকের পা দু'খানি।
বিহ্বল পথিক—
তৃষ্ণায় শুকিয়ে ওঠে জিভ ;
নিঃশ্বাসের কষ্টে
হাঁপাতে থাকে, কাঁপতে থাকে
আর চাটতে থাকে শুক্‌নো ঠোঁট।
সুদীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি-বিষে
জর্জর শরীর—
কিন্তু বুকের মধ্যে—
গোপন মৃদু কম্পন,
এক স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষার।
সেই মোহ মদির কামনা
খুলে দেয়
কল্পনার রত্নভাণ্ডারের দ্বার।
ঠাণ্ডা কাঁটার মত
শুক্‌নো আঙুলগুলিতে
ছড়িয়ে দেয় মৃদু মধুর তাপ।
ফুরিয়ে এল, দূরত্বের বিষ ;
পথিক পৌঁছল আপন লক্ষ্যে
একটী ভগ্ন, জীর্ণ গৃহচ্ছায়।
বাতাসের বাহুপাশে—
তখনো কন্‌কনে ঠাণ্ডা ;

CENTRAL LIBRARY

কিন্তু পথিকের পায়ে
আর মোটেই নেই শক্তি ;
শুধু খোলা দুটী চোখে—
একটী প্রাসাদের ছবি,
যেখানে কয়েকটী লোক
প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন ॥

* * *

কেটে গেল কয়েক শতাব্দী,—
শেষ হ'ল খননের কাজ,
সেই ভগ্ন, জীর্ণ প্রাসাদের ॥
পাওয়া গেল—
মানুষের একটী কঙ্কাল,—
রাখা হ'ল প্রদর্শনীতে।
বিশেষ কৌতূহলের বিষয়
তার দুটী চোখ ॥
ওই জীর্ণ কঙ্কালের চোখ
জীবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।
তার চাইতেও রহস্যময়—
চোখের কালো মণিতে আঁকা
এক প্রাসাদের ছবি ;
আর সেই প্রাসাদের
কয়েকজন অধিবাসী—
কারুর আসার অপেক্ষায়—
উৎকণ্ঠ ॥

অনুবাদ : সতী ঘোষ

CENTRAL LIBRARY

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

সম্পাদকীয়

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রবর্তনের পর হইতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহাতে বিভিন্ন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিষয় পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাকেও ইহার পাঠ্য রূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না অর্থাৎ তিনি যে সেদিন কেবলমাত্র বাংলা ভাষাকেই এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে—ভারতীয় সকল প্রাদেশিক ভাষাই এই মর্যাদা লাভের অধিকারী হউক, ইহাই তাঁহার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯১৯ সন হইতেই তাঁহার প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষায় ভারতীয় ভাষা বা Indian Vernacular বিভাগের প্রবর্তন হয়।

যদিও ইহা স্বাভাবিক যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই প্রাধান্য লাভ করিবে, তথাপি তিনি এই বিভাগটিকে কেবলমাত্র বাংলা পঠন-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং তাহার পরিবর্তে আজ ভারতীয় সংবিধানে যে প্রাদেশিক ভাষাগুলি প্রধান ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই সেদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বা Indian Vernacular বিভাগে পঠন-পাঠনের এবং পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম ভারতের প্রাদেশিক ভাষাকে স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন। এমন কি, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক কালে স্থাপিত হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পরবর্তী-কালে সেই সকল প্রদেশের ভাষা তাহাদের স্নাতকোত্তর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রাদেশিক ভাষা আজ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে মর্যাদালাভের অধিকারী হইয়াছে, তাহার মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১ সালের সমাবর্তন উৎসবে তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন—

> **In 1969-70 the Department of Modern Indian languages completed 50 years of its most eventful life. It has the unique claim of being the first among such departments among the Indian Universities and to-day we are proud to say that as early as 1919 this university under the inspiring guidance of Sir Asutosh Mookerjee was the first to set up, not a purely Bengali Department, but a Department of Modern Indian Languages and planned to teach a large number of Indian languages.**

এই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া আজও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটি আধুনিক ভারতীয়

CENTRAL LIBRARY

ভাষা বিভাগ বা Modern Indian Languages Department নামেই পরিচিত; অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কেবলমাত্র বিশেষ কোনও প্রাদেশিক ভাষার নামে তাহা চিহ্নিত নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ঐতিহ্যমণ্ডিত পঞ্চাশ বৎসর ১৯৬৯ সনেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কারণ, ১৯১৯ সনে এই বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটি কেবলমাত্র বাংলাভাষা শিক্ষা এবং গবেষণা কিংবা বাংলা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রেই নহে, ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্যের উপরও কি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা সাধারণ ভাবে অনুমানেরও অতীত।

সেইজন্য স্থির করা হইয়াছিল যে, এই বিভাগের একটি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করিয়া তাহার মাধ্যমে ইহার বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জীবনের বহুমুখী কর্মধারার বিচিত্র পরিচয় যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার সুযোগ গ্রহণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সন হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সন পর্যন্ত এই প্রস্তাবিত উৎসবের সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল, পরে তাহা পরিবর্তিত করিয়া ১৯শে এপ্রিল হইতে ২৫শে এপ্রিল ১৯৭২ উৎসবের তারিখ গৃহীত হয়।

কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রকৃত পক্ষে তিনটি পর্যায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল, ইহার অনুষ্ঠানকাল ১৯৭২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৭৩ সনেরও মার্চ মাস পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের অনুষ্ঠানের বিবরণ ক্রমে প্রদত্ত হইল।

'বাংলাদেশ দিবস'

যখন ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে স্থির হইয়াছিল তখন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের একটি দিবস 'বাংলাদেশ দিবস' রূপে চিহ্নিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। কারণ, 'বাংলাদেশ দিবস' উদ্‌যাপনের তারিখটি সেই সময়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইহা ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়া আসিতেছে। এমন কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন নিজস্ব অধ্যাপকদিগকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবার সুযোগ দিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন আচার্য সুনীলকুমার দে, ভাষাচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অধ্যাপকগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন ক্রমান্বয়ে বাংলা বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই সেখানে বাংলা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁহাদেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র ও পরে অধ্যাপক কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের কর্মতৎপরতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ হইতে 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রমুখ বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অমূল্য সম্পদগুলি সংগ্রহ এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের সকলেই মুক্ত মন লইয়া এই সকল বিষয় আজ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন।

CENTRAL LIBRARY

স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবের তারিখ পরিবর্তিত হইয়া গেলেও এই অনুষ্ঠানটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলের সম্মুখের চত্বরে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিভাগীয় অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি এবং নির্বাচিত অংশ পাঠ করিবার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যায় বাংলাদেশের নাট্যকার মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকটির অভিনয় হয়। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পিগণ কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেষণ করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

১৯শে এপ্রিল ১৯৭২ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভিন্যুস্থিত মহাজাতি সদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষাবিভাগের স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বাংলাভাষার অপূর্ব সম্পদ ও গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সাধনায় ব্রতী হইবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উভয় বাংলার দশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন, এই হিসাবে বিশ্বের ভাষাগুলির তালিকায় বাংলার স্থান অষ্টম। ভারতীয় ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক যুগান্তর আনিয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঐ বিভাগীয় প্রধান ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ তার প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তার হীনমন্যতা ও সঙ্কোচের ভাব কাটাইয়া উঠিয়া কেবলমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া এ যাবৎ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। এই বিভাগ এই পর্যন্ত প্রায় আট হাজার প্রাচীন পুঁথি গ্রামাঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাদের মধ্যে প্রায় দুই শত পুথি ইতিমধ্যে মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বহু অমূল্য তথ্য বিস্মৃতির গর্ভ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা ভাষা আজ আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে পরিপূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের দান তাহাতে অপরিসীম। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ড. সুকুমার সেন তাঁহার ভাষণে বাংলাবিভাগের প্রতিষ্ঠা ও তার গৌরবের জন্য স্যর আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ড. দীনেশচন্দ্র সেনের দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রথম সিলেবাস (পাঠ্যতালিকা) রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথম 'ব্যাচ' পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তিনি পরলোকগমন করেন।

বিভাগের প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসান মুর্শিদও বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানের সম্পাদক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। অনুষ্ঠান শেষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাগান এবং ছাত্রছাত্রীদের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের সেই ভাষণ বক্ষ্যমান সঙ্কলনে মুদ্রিত (পৃঃ৩৪৪-৩৫০) হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

আলোচনা-বাসর

স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কয়দিন বিভিন্ন দিবসে যে সকল আলোচনা-বাসর কিংবা বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তারিখ	বিষয়	বক্তা
২০.৪.৭২	হিন্দী সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব	অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়
২১.৪.৭২	মৈথিল সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের এবং বাংলা সাহিত্যের উপর মৈথিল সাহিত্যের পারস্পরিক প্রভাব (অনুষ্ঠান হয় নাই), কবি সম্মেলন ও উর্দু কবিতার মোশায়েরা	অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিং
২৪.৪.৭২	(১) পাঁচালী গান	ড. সুকুমার সেন
	(২) উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত	ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক
২৫.৪.৭২	বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ	ড. অজিতকুমার ঘোষ মন্মথ রায় বাদল সরকার

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এই উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহের প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রধানতঃ বাংলার লোক-সঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং লোকনাট্যের আয়োজন করা হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদিগের মিলিত অভিনয়, ছাত্রছাত্রীদিগের লোকসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়াও যে সকল শিল্পী বাংলা লোকসঙ্গীত পরিবেশনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বাংলাদেশের পল্লীর গায়ক এবং লোকনৃত্যের গোষ্ঠীর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল। বিভিন্ন দিনে তাঁহাদেরও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হইত। যাহাতে দিনের আলোচনা চক্রে, বক্তৃতায় কিংবা অন্যান্য কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে কাহারও কোন অসুবিধা না হয়, সেইজন্যই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির রাত্রেই আয়োজন করা হইয়াছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

১৯. ৪. ৭২—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গানের আসর ; রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের গান। ছাত্রীদের নৃত্যনাট্য : শাপমোচন।

২০. ৪. ৭২—ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যাভিনয়—বনফুলের 'কবয়ঃ', গীতিনাট্য : মহুয়া (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক-রঞ্জন শাখা নিবেদিত)

২১. ৪, ৭২—পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য

CENTRAL LIBRARY

বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী সভায় সহ-উপাচার্য ডক্টর শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে পরলোকগত অধ্যাপকদিগের তৈলচিত্র, তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ, চিঠিপত্র, প্রাচীন পুঁথি, দুর্লভ প্রাচীন পুঁথির আলোকচিত্র ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের ক্রমবিকাশ বিষয়ে নানা তথ্য ইহাতে হস্তলিখিত প্রাচীর-পত্র দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া সময়োচিত ভাষণ দান করেন এবং ইহাতে সহ-উপাচার্য ডক্টর শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু প্রধান অতিথিরূপেও এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই বিভাগ হইতে এ যাবৎ প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ যে সকল গ্রন্থ—তাহা গবেষণামূলক হউক কিংবা উপন্যাস নাটক কিংবা কাব্যগ্রন্থ হউক, যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও যথাসম্ভব ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বাংলার লোকশিল্পের নানা উপকরণ দিয়া প্রদর্শনীর কক্ষটি সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগটির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছিল।

আলোচনা-চক্র

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থ সাহায্যে তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন হইয়া থাকে, সাধারণতঃ তাহাদেরই সকল শ্রেণীর বাংলা অধ্যাপকগণকে এই আলোচনা-চক্রে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সকল শ্রেণীর অধ্যাপকও ইহাতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর ১৯৭২, কলিকাতা, গোলপার্ক, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচারের শিবানন্দ হলে প্রতিদিন দ্বিপ্রহর ১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এই আলোচনা চক্রের অধিবেশন হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, **'The contribution of the University of Calcutta to Advancement of the Study and Research in Modern Indian Languages particularly Bengali.'**

বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃকই স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই আলোচনা-চক্রে ভারতবর্ষের যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশেরও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকজন বাংলার অধ্যাপক এবং গবেষক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।—

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (দিল্লী), শুকদেব সিংহ (বারাণসী), সুধাংশু তুঙ্গ (গৌহাটী), শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় (পাটনা), সত্যেন্দ্রনাথ রায় (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন), খোন্দকার সিরাজুল হক (রাজসাহী—বাংলাদেশ), গোলাম সাকলায়েন (রাজসাহী - ঐ), এ. কে. এম্ আতাউর রহমান (রাজসাহী ঐ), প্রণয়কুমার কুণ্ডু (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), পুলিনবিহারী দাশ (উত্তরবঙ্গ), শিবচন্দ্র লাহিড়ী (উত্তরবঙ্গ), কুমারেশ চক্রবর্তী (দিল্লী), জীবেন্দ্র বিনোদ সিংহ রায় (বর্ধমান), বিজিতকুমার দত্ত (বর্ধমান), নন্দদুলাল রায় (বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজফরপুর), সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (বর্ধমান), তুষার চট্টোপাধ্যায় (কল্যাণী), সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (নৃতত্ত্ব সমীক্ষা, নাগপুর), সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল (বারাণসী), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (ভূতপূর্ব অধ্যাপক, গৌহাটী), নীলরতন সেন (কল্যাণী),

CENTRAL LIBRARY

হরিপদ চক্রবর্তী (উত্তর বঙ্গ), অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন), অজিতকুমার ঘোষ (রবীন্দ্র ভারতী), দর্শন চৌধুরী (কল্যাণী), দেবীপদ ভট্টাচার্য (যাদবপুর), সুধাংশুভূষণ দে (গৌহাটী)।

১৩ই অক্টোবর ১৯৭২ সন বেলা ১টার সময় কলিকাতা গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচারের শিবানন্দ হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। ইহাতে উৎসব সমিতির সভাপতি এবং বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তিন দিনই সভাপতিত্ব করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন,—'বাংলা বিভাগ গঠনে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এক মহান উদ্দেশ্য ছিল। তাহাতে কেবলমাত্র বাংলা পঠন পাঠন নয়, বরং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগ স্থাপন করাও তাঁহার স্বপ্ন ছিল। তাঁহার সেই স্বপ্ন যাহাতে আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহারা বিভিন্ন কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহারা এখনও প্রায় সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহাদের সঙ্গেও যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যোগরক্ষা পায়, তাহা আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাঁহারা এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনা ও গবেষণার নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারিব।' আলোচনা-চক্রের সাফল্য কামনা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক চেতনা, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল এক, তাহার চাবিকাঠি এক সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা। সারা ভারতে এই সমন্বয়ের সূত্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহার ভাষা ও সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দান এই বিষয়ে অপরিসীম।'

ইহার পর উৎসব সমিতির সম্পাদক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদকীয় ভাষণ দান করেন, ইহাতে নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কি ভাবে উদ্‌যাপিত করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা বিস্তৃত উল্লেখ করেন। সর্বশেষে সভাপতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে কি ভাবে জাতীয় শিক্ষাকে সার্থকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনীর পরই আলোচনা-চক্রের সূচনা হয় এবং যথারীতি প্রবন্ধ পাঠ এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধের উপর আলোচনা আরম্ভ হয়।

প্রথমই ডক্টর শ্রীশুকদেব সিংহ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুশীলন' বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইহা পঠিত হইবার পর (প্রবন্ধটি 'সুবর্ণলেখা'য় আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইয়াছে) যথাক্রমে নিম্নলিখিত আলোচনাকারিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—১) ডঃ সতী ঘোষ, ২) ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩) ডঃ সরোজকুমার মিত্র, ৪) ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ৫) ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ৬) ডঃ বিজিতকুমার দত্ত, ৭) ডঃ নন্দদুলাল রায়। বিভিন্ন সমালোচক তাঁহাদের মত অনুযায়ী প্রবন্ধটির কিছু কিছু ত্রুটি নির্দেশ করেন। প্রবন্ধ-পাঠক ডঃ শুকদেব সিংহ সর্বশেষে তাহাদের উত্তর দেন। তিনি কিছু কিছু ত্রুটি স্বীকার করিয়া আলোচনা অনুযায়ী প্রবন্ধটি সংশোধন করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। 'সুবর্ণলেখা'য় প্রকাশিত হইবার পূর্বে তিনি তাঁহার প্রবন্ধটি আলোচনা অনুযায়ী সংশোধন করিয়া দেন।

CENTRAL LIBRARY

প্রথম দিনের অধিবেশনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর একটি মাত্র প্রবন্ধই পঠিত এবং আলোচিত হয়।

৪ঠা অক্টোবর ১৯৭২ সন, বেলা ১২টার সময় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সে দিন প্রথমই ডক্টর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ) 'বাংলা ভাষা বিষয়ক গবেষণা' শীর্ষক ভাষাতত্ত্বের আলোচনামূলক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। নিম্নলিখিত আলোচনাকারিগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন— ১) শ্রীসুধাংশুভূষণ তুঙ্গ, ২) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, ৩) ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ৪) ডঃ প্রণয়কুমার কুণ্ডু, ৫) ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ৬) ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, ৭) ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ৮) ডঃ সতী ঘোষ। প্রবন্ধ-পাঠক ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচকদিগের সমালোচনার জবাব দেন।

সেই অধিবেশনেই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী দাশ। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'বাংলা স্নাতকোত্তর বিষয়ের পাঠক্রম চিন্তা।' ইহার আলোচনায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম যথাক্রমে ১) রাজসাহী (বাংলাদেশ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, ২) ডঃ নীলরতন সেন, ৩) ডঃ কুমারেশ চক্রবর্তী।

এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হইবার পর কলিকাতার আকাশবাণীর ভাষ্যকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীতরুণ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের 'বিস্ময়' ও 'বাঁশী' কবিতা দুইটি আবৃত্তি করিয়া শোনান।

ইহার পর এই অধিবেশনের তৃতীয় প্রবন্ধটি পঠিত হয়। ইহার বিষয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলকাব্য চর্চা।' প্রবন্ধ পাঠক ডক্টর শ্রীআশুতোষ দাস। ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি লইয়া আলোচনা করেন। সভাপতির মন্তব্যের পর সেই দিনকার অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

৫ই অক্টোবর ১৯৭২ বেলা ১২টায় যথানির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা-চক্রের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইহাতে প্রথমেই ডক্টর শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায় 'লোক-সংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবদান' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিম্নলিখিত আলোচনাকারিগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন,—১) ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ২) ডঃ নীলরতন সেন, ৩) গোন্দকার সিরাজুল হক (রাজসাহী—বাংলাদেশ)।

ডক্টর শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনার জবাব দেন। সভাপতির সমাপ্তি বক্তৃতার পর সেদিনকার প্রাথমিক অধিবেশন শেষ হয়।

বেলা ২টার সময় সেইদিনকার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইহার প্রথমেই ডক্টর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরের নাট্যচর্চা' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর ডক্টর শ্রীশুকদেব সিংহ ও সভাপতি ইহার বিষয়ে আলোচনা করেন।

সেই অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয় 'বিগত ৫০ বৎসরে ছন্দ চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান'। প্রবন্ধের পাঠক ডক্টর শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁহার প্রবন্ধের উপর কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই।

অতঃপর অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পাঠের প্রস্তাব' বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অধ্যাপক সুধাংশুভূষণ তুঙ্গ প্রবন্ধটি লইয়া আলোচনা করেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ এই আলোচনার জবাব দেন। ইহার পর ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার 'গল্প-উপন্যাস চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দান' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি লইয়া উল্লেখযোগ্য কোনও আলোচনা হয় নাই।

CENTRAL LIBRARY

ইহার পর ডঃ নীলরতন সেন স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের কতকগুলি সমস্যা লইয়া কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবগুলি লইয়া সাধারণ ভাবে আলোচনার পর আলোচনা-চক্রের তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবার্ষিকী বক্তৃতামালা

যে বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরই বাঙ্গালীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেইজন্য স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষেও বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা এই বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বক্তা	তারিখ	বিষয়
মন্মথ রায়	১৩. ৩. ৭৩	বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ	২০. ৩. ৭৩	"
দেবনারায়ণ গুপ্ত	২৭. ৩. ৭৩	"
শম্ভু মিত্র	৩০. ৩. ৭৩	"
সলিল সেন	৬. ৪. ৭৩	"

১৯১৯ সালে যে বিভাগের প্রবর্তনা হইয়াছিল তাহা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রমের পর একটি বিশাল বিভাগে পরিণত হইয়াছে। বাংলা পঠন-পাঠন ও গবেষণার যে মান এই বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, আনন্দের কথা, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই আদর্শ অল্পাধিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহ অনুসৃত হইতেছে। বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ শুধু পাঠনা পরীক্ষা ও গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত নহে,—সমগ্র দেশ, সংস্কৃতি ও সমাজের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিবিড় যোগস্থাপনে এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চয়ই সুধীজনের নিকট স্বীকৃতি লাভ করিবে। এই বৃহৎ সঙ্কলন হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বাংলা বিভাগের দায়-দায়িত্ব ও গুরুত্ব কত ব্যাপক ও গভীর।

আ. ভ.

অ. কু. ব.

CENTRAL LIBRARY

পরিশিষ্ট

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসূচী

১৯১৯-১৯৪৪

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা ইংরাজী উভয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থসূচী। [মুদ্রণ কালানুক্রমিক]

মুদ্রণকাল, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, কোন ভাষায় রচিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা, মূল্য, মন্তব্য :

১৯১১ ইং, History of Bengali Language and Literature, Dinesh Chandra Sen B.A., ইংরাজী, পৃ ১০৬৭, সচিত্র, মূল্য ১১·৫০, [স্যার আশুতোষ]

১৯১৪ ইং, Banga Sahitya Parichaya (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়) Or Typical Selections from Old Bengali Literature, Dinesh Chandra Sen B.A., ১ম খণ্ড, বাংলা, পৃ ১১০ + ৯৫৯ = ১০৬৯, [স্যার আশুতোষ]

ঐ ঐ ২য় খণ্ড, বাংলা, পৃ ৯৬০ – ১৯৭৪ = ১০১৫, মূল্য ১৬·৭৫

ঐ Bengali in the 16th Century (ষোড়শ শতকের বাংলা), J. N. Dasgupta, ইংরাজী, পৃ ১৮৪

ঐ An Elementary Sanskrit Grammar by G. Thibut, Translated by Pandit Bahuballabha Shastri, বাংলা

১৯১৬ ইং, ভারতে ইংরাজ, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাংলা, পৃ ২০২

১৯১৭ ইং, Chaitanya and His Companion, Dinesh Chandra Sen B.A., ইংরাজী, পৃ ৩৪১, সচিত্র, মূল্য ২·০০, [রামতনু লাহিড়ী]

ঐ The Vaishnava literature of Mediavel Bengal, Dinesh Chandra Sen B.A., ইংরাজী, পৃ ৩১২, মূল্য ১·৩৭, [স্যার আশুতোষ]

১৯১৯ ইং, The Origin of the Bengali Script, Rakhaldas Banerjee M.A., ইংরাজী, পৃ ১২২, সচিত্র, মূল্য ৩·০০, [Dr. Theodor Bloch and M. M. Haraprasad Sastri]

ঐ History of Bengali Literature in the 15th Century, 1800—1825, Sushil Kumar De M. A., ইংরাজী, পৃ ৬৩০, মূল্য ৮·৩৭

১৯২০ ইং, The Folk Literature of Bengal, Dinesh Chandra Sen B.A., ইংরাজী, পৃ ৪০৪, মূল্য ৪·২৫, [স্যার আশুতোষ]

ঐ The Bengali Ramayana, Dinesh Chandra Sen B.A., ইংরাজী, পৃ ৩৩৮, মূল্য ৭·৫০, [স্যার আশুতোষ]

CENTRAL LIBRARY

১৯২০ ইং, The History of the Bengali Language, Bijoychandra Mazumdar, ইংরাজী, পৃ ৩১৬

ঐ শিব ছত্রপতি, সুরেন্দ্রনাথ সেন, বাংলা, পৃ ২৮৪

১৯২১ ইং, Bengali Prose Style 1800 – 1857, Dineshchandra Sen B.A., ইংরাজী, পৃ ১৯৮, [স্যার আশুতোষ]

১৯২২ ইং, Chaitanya and His Age, Dineshchandra Sen B, A., D. Litt., ইংরাজী, পৃ ৪৫৩, মূল্য ৬'০০

ঐ Types of Early Bengali Prose, প্রাচীন গদ্য সন্দর্ভ, Sivaratan Mitra, বাংলা, পৃ২০৫, মূল্য৩'০০

ঐ গোপীচন্দ্রের গান, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায়, বাংলা, পৃ ৩১১, মূল্য ৪'৫০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ অদ্বৈতবাদ, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বাংলা, পৃ ২৫৫

ঐ সক্রেটীস, ১ম খণ্ড, রজনীকান্ত গুপ্ত এম. এ., বাংলা, পৃ ৫৮৪, মূল্য ৫'০০

১৯২৩ ইং, Eastern Bengal Ballads, Mymensing, Vol. I. Part I. Dineshchandra Sen B.A., D. Litt., ইংরাজী, পৃ ৪৩০, সচিত্র, মূল্য ৭'৫০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট., বাংলা, পৃ ৪১২, সচিত্র, মূল্য ৫'০০, [স্যার আশুতোষ]

১৯২৪ ইং, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বসু, বাংলা, পৃ ৮৫০, মূল্য ৬'০০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ গোপীচন্দ্রের গান, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায়, বাংলা, পৃ ৪৩৪, মূল্য ৬'০০

ঐ Intermediate Bengali Selections. 1st Ed., বাংলা, পৃ ৪৭৯

১৯২৫ ইং, Intermediate Bengali Selections, 2d Ed., বাংলা, পৃ ৫১০

ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, প্রথম ভাগ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ৬৭২, মূল্য ৬'০০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ Glimpses of Bengali life, Dineshchandra Sen B. A., D. Litt., ইংরাজী, পৃ ৩২১, মূল্য ৪'০০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ সক্রেটীস, ২য় খণ্ড, রজনীকান্ত গুপ্ত এম.এ., বাংলা, পৃ ৮৬১, মূল্য ৮'০০, [স্যার আশুতোষ]

১৯২৬ ইং, Eastern Bengal Ballads. Vol. II. Part I, Dineshchandra Sen B. A., D. Litt., ইংরাজী, পৃ ৫৪৬, সচিত্র, মূল্য ৭'৫০

ঐ The Origin and Development of the Bengali Language, S. K. Chatterjee, Vol. I. ইংরাজী, পৃ xci + I – 648.

ঐ The Origin and Development of the Bengali Language, S. K. Chatterjee, Vol. II, ইংরাজী, পৃ 649—1179=531 ; দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ২০'০০

ঐ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট, বাংলা, পৃ ৫৮৫, সচিত্র, মূল্য ৫'০০, [যাঁহারা বাংলাদেশকে ভালবাসেন তাঁহাদের করকমলে]

CENTRAL LIBRARY

১৯২৬ ইং, গোবিন্দদাসের কড়চা, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট., বনোয়ারীলাল গোস্বামী, বাংলা, পৃ ১৭৭, মূল্য ১'৫০

ঐ Descriptive Catalogue of B ngali Manuscripts, Vol. I, Basanta Ranjan Ray Vidvadvallab, Basanta Kumar Chatterjee M. A., ইংরাজী-বাংলা, পৃ ২৯১, মূল্য ৩'০০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ২য় ভাগ, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বসু, বাংলা, পৃ ৬৮৫, মূল্য ৬'০০

ঐ অদ্বৈতবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম. এ., বাংলা, পৃ ২৫৬, মূল্য ৩'৫০

১৯২৭ ইং, The History of the Bengali Language, 2nd Ed., Bijay Chandra Mazumdar B. L., ইংরাজী, পৃ ৩৪৫, মূল্য ৭'০০

ঐ ভারতে ইংরেজ শাসন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ., বাংলা, পৃ ২৬০

১৯২৮ ইং, হরিলীলা—লালা জয়নারায়ণ সেন প্রণীত, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বাংলা, পৃ ১৮৬, মূল্য ১'৮৭

ঐ বাণীমন্দির, শশাঙ্কমোহন সেন বি. এল., বিদ্যাভূষণ, বাংলা, পৃ ৮৬৮, মূল্য ৬'০০

ঐ Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts. Vol II, Basanta Ranjan Ray Vidvadvallabha, Manindramohan Bose M. A. Basanta Kumar Chatterjee M. A., ইংরাজী-বাংলা, পৃ ৫১৯, মূল্য ৩'০০

ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—চণ্ডীমঙ্গল রোহিনী, ২য় ভাগ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ৪২৫, মূল্য ৪'৫০

ঐ Eastern Bengal Ballads. Vol III. Part I, Dineshchandra Sen B. A., D. Litt., Raibahadur, ইংরাজী, পৃ ৫১০, মূল্য ৬'০০

ঐ পাণিনি, রজনীকান্ত গুপ্ত, সংশোধিত সংস্করণ, বাংলা, পৃ ১৫০, মূল্য ১'৫০

১৯২৯ ইং, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ৯৩

ঐ সংস্কৃত ব্যাকরণ, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ., বাংলা, পৃ ৩০৮

ঐ কৃষিবিজ্ঞান, রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর, বাংলা, পৃ ২৪৮

১৯৩০ ইং, সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, বাংলা, পৃ ৭৫, মূল্য '৫০

ঐ The Post-Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal, Manindra Mohan Bose M.A., ইংরাজী, পৃ ৩৩৯, মূল্য ৪'০০

ঐ The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. III. Manindra Mohan Bose M.A., ইংরাজী-বাংলা, পৃ ৩০৯, মূল্য ৩'০০

ঐ বৈষ্ণব পদাবলী-চয়ন, দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাংলা, পৃ ২৮১

ঐ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট., রায়বাহাদুর, বাংলা, পৃ ৫৭৯, মূল্য ৫'০০, [যাঁহারা বাঙ্গালাদেশকে ভালবাসেন তাঁহাদের করকমলে]

CENTRAL LIBRARY

১৯৩০ ইং, Intermediate Bengali Selections, 3rd Ed., বাংলা

ঐ ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা, ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলা, পৃ, ১৫১, মূল্য ১'৫০

ঐ স্মৃত্যানুমোদিত সাক্ষ্যবিধির সহিত বর্তমান ভারতীয় সাক্ষ্যবিধির তুলনা, কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, বাংলা

১৯৩১ ইং, Catalogue No. 12. Sanskrit, Pali, Arabic, Persian, Bengali, Urdu, Philology, ইংরাজী-বাংলা, পৃ ২৯০, মূল্য ১'২৫

ঐ Manoel da Assumpcam's, Bengali Grammar, Sunitikumar Chatterjee M.A (Cal) D. Litt. (London), Priyaranjan Sen M. A, ইংরাজী, পৃ ১৮৬, সচিত্র, মূল্য ৪'০০

১৯৩২ ইং, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট., রায়বাহাদুর, বাংলা, পৃ ৫৭৯, মূল্য ৫'০০

ঐ Eastern Bengal Ballads. Vol IV. Part I, Dinesh Chandra Sen B.A., D. Litt, Raibahadur, ইংরাজী, পৃ ৪৮৭, মূল্য ৬'০০

ঐ Western Influence in Bengali Literature, Priyaranjan Sen M A, ইংরাজী, পৃ ৪৩০, মূল্য ৫'০০, [স্যার আশুতোষ]

ঐ সহজিয়া সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ., বাংলা, পৃ ২০৬, মূল্য ২'০০, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ সংস্কৃত ব্যাকরণ, ২য় সংস্করণ, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ৩০৮

১৯৩৩ ইং, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা, পৃ ১২, [অভিভাষণ ১], মূল্য '৬২

ঐ শিক্ষার বিকিরণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা, পৃ ২৩, [অভিভাষণ-২], মূল্য '৬২

ঐ Intermediate Bengali Selections, 4th Ed., বাংলা, পৃ ৫৭২, মূল্য ৩'০০

ঐ Matriculation Bengali Selections, 2nd Reprint, বাংলা, মূল্য ২'৫০

ঐ মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা, পৃ ১২৪, সচিত্র, মূল্য ১'৫০

ঐ ভারতে ইংরেজ শাসন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪র্থ সংস্করণ, বাংলা, পৃ ২৬৬

১৯৩৪ ইং, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ২য় সংস্করণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ১৯৯

ঐ বাংলা পরিভাষা, রাজশেখর বসু, বাংলা, পৃ ১০

ঐ জাতক-মঞ্জরী, রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম. এ., বাংলা, পৃ ৩৪০, মূল্য ২'৫০

ঐ ন্যায়মঞ্জরী, ১ম খণ্ড, পঞ্চানন তর্কবাগীশ, বাংলা, পৃ ৪৮৯, মূল্য ৬'২৫

১৯৩৫ ইং, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—প্রথম খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ., বাংলা, পৃ ৩৮৬, মূল্য ৫'০০, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ A History of Brajabuli Literature, Sukumar Sen, ইংরাজী, পৃ ৬১৮, সচিত্র, মূল্য ৬'৫০

ঐ Aspects of Bengali Society From Old Bengali Literature, Tamonash Chandra Das Gupta M. A., Ph. D., ইংরাজী, পৃ ৪০৯, মূল্য ৫'৬২, [স্যার আশুতোষ]

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিত, বাংলা, পৃ ২৩

ঐ বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট., রায় বাহাদুর, বাংলা, পৃ ৬৮৫, সচিত্র, [বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য]

CENTRAL LIBRARY

১৯৩৫ ইং, বৃহৎবঙ্গ ২য় খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট., রায় বাহাদুর, বাংলা, পৃ ৬০৬, সচিত্র, মূল্য দুই খণ্ড ১২'০০

১৯৩৬ ইং, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিতের পরিভাষা, বাংলা, মূল্য '৩১

ঐ বাংলা বানানের নিয়ম, [৭ মে ১৯৩৬], ১ম সংস্করণ, বাংলা, পৃ ৯, মূল্য '১৩

ঐ বাংলা বানানের নিয়ম, [২ অক্টোবর ১৯৩৬], ২য় সংস্করণ, বাংলা

ঐ গিরিশচন্দ্র, কুমুদবন্ধু সেন, বাংলা, পৃ ২৪৯, মূল্য ২'০০

ঐ বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—৩য় সংস্করণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ২৩৩, মূল্য ২'০০

ঐ দুর্গাপূজা চিত্রাবলী, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী, বাংলা, পৃ ৮০, সচিত্র, মূল্য ১'২৫

ঐ প্রবেশিকা বীজগণিত, S. M. Ganguli, S. Ghosh, বাংলা

ঐ প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, বাংলা, পৃ ১৮২, [শ্যামাপ্রসাদ]

১৯৩৭ ইং, A Critical Study of the Life and Novels of Bankimchandra, Jayanta Kumar Das Gupta M. A., Ph. D., ইংরাজী, পৃ ২০১, মূল্য ২'৫০

ঐ গণিতের পরিভাষা, বাংলা, পৃ ২১, মূল্য '৩১

ঐ ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ, সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, বাংলা, পৃ ১৪৪, মূল্য ২'০০, [আশুতোষাত্মজকে]

ঐ বাংলার বানানের নিয়ম—৩য় সংস্করণ, বাংলা, পৃ ১০, মূল্য '১২

ঐ বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন, দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ২য় সংস্করণ, বাংলা, পৃ ১৯৫, মূল্য ২'২৫

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—পদার্থবিদ্যা, বাংলা, পৃ ২৬, মূল্য '২৫

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—ভূগোল, বাংলা, মূল্য '৩১

ঐ সমালোচনা সংগ্রহ, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা, পৃ ৩৬০, মূল্য ২'০০

ঐ বাংলার গণিত শিক্ষা, জ্যোতির্ময় ঘোষ এম. এ., পি-এইচ. ডি., বাংলা, পৃ ২০

১৯৩৮ ইং, গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা, পৃ ১১৭, মূল্য ১'৫০

ঐ দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ., বাংলা, পৃ ৫২২, মূল্য ৬'০০, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—উদ্ভিদ বিদ্যা, বাংলা, পৃ ৩৪, মূল্য '২৫

ঐ গিরিশচন্দ্র, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বাংলা, পৃ ২৬৪, মূল্য ২'৮১, [রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর]

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অর্থবিদ্যা, বাংলা, মূল্য '১২

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-শরীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা, বাংলা, পৃ ১১

ঐ কৃষিবিজ্ঞান, ২য় সংস্করণ, রাজেশ্বর দাশগুপ্ত, বাংলা, মূল্য ৩'০০

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রসায়ন, বাংলা, মূল্য '৩১

ঐ রবিরশ্মি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ৪৪৭, মূল্য ৩'০০

ঐ বঙ্কিমপরিচয়, বাংলা, পৃ ২১২, মূল্য '৫০

ঐ বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা, পৃ ১৮৭

CENTRAL LIBRARY

১৯৩৮ ইং, উপনিষদের আলো, মহেন্দ্রনাথ সরকার, বাংলা, পৃ ১৪৩, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্য, বাংলা, পৃ ৭৫৬, মূল্য ৫'০০

ঐ কালীপূজা চিত্রাবলী, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী, বাংলা, সচিত্র, পৃ ৭০, মূল্য ১'৫৬

ঐ কৃষিবিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর, বাংলা, পৃ ২'৯৬

ঐ সাঙ্গীতিকী, দিলীপকুমার রায়, বাংলা, পৃ ২৮৫, মূল্য ২'৫০

ঐ বীজগণিত প্রবেশিকা, সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ডি. এস. সি., বাংলা, পৃ ৭৫৫

১৯৩৯ ইং, শ্রী চৈতন্যচরিতের উপাদান, বিমানবিহারী মজুমদার এম. এ., পি. এইচ. ডি., ভাগবতরত্ন, বাংলা, পৃ ৮১১, [প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঐ বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম সংস্করণ, সুকুমার সেন, বাংলা

ঐ রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী বাংলা, পৃ ২৮৮, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ পটুয়া সঙ্গীত, গুরুসদয় দত্ত আই. সি এস., বাংলা, পৃ ১৪৬, মূল্য ১'৮৭

ঐ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি-এইচ. ডি. বাংলা, পৃ ৬৬৩

ঐ সমালোচনা সংগ্রহ, ২য় সংস্করণ, অমরেন্দ্রনাথ রায় বাংলা

ঐ বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ, বাংলা

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—পদার্থবিদ্যা, বাংলা, পৃ ২৬, মূল্য '২৫

ঐ গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ বসু, বাংলা, পৃ ১০৯, মূল্য ১'২৫

ঐ ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ৫৬৬, [স্যার আশুতোষ]

ঐ ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ, কমলাদেবী এম. এ., বাংলা, পৃ ৮৭, মূল্য '৭৫

ঐ মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ, সুশোভন চন্দ্র সরকার, বাংলা, পৃ ১৮৯, মানচিত্র সহ

ঐ বাংলার ব্যাঙ্কিং, হরিশচন্দ্র সিংহ এম এস. সি., পি. এইচ ডি., এফ. এস. এস., বাংলা, পৃ ২২৪ মূল্য ১'৭৫

ঐ বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলা, পৃ ১৩৬, মূল্য '৭৫

ঐ ভারতের শিল্পকথা, অসিতকুমার হালদার, বাংলা, পৃ ২৬২, মূল্য ১'৭৫, [স্যার আশুতোষ]

ঐ ইমানুএল কান্ট, হুমায়ুন কবীর, বাংলা, পৃ ১০৪, মূল্য ১'২৫, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ ভারতের কারুশিল্প, অসিতকুমার হালদার, বাংলা, সচিত্র, পৃ ৮০, মূল্য ১'০০, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ হিন্দুস্ত্রীধনাধিকার, পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টাচার্য, বাংলা, পৃ ২৪৮

ঐ জয়ন্ত ভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী, ১ম খণ্ড, পঞ্চানন তর্কবাগীশ, বাংলা, পৃ ৪৯৩, [শ্যামাপ্রসাদ]

১৯৪০ ইং A General Catalogue of Bengali Manuscripts Vol. I, Manindra Mohan Bose M. A., ইংরাজী-বাংলা পৃ ১৮৭, মূল্য ৮'০০

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অর্থবিদ্যা, বাংলা, পৃ ৮

ঐ বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় সংস্করণ, সুকুমার সেন, বাংলা,

ঐ বাংলা ছন্দের মূল সূত্র, ২য় সংস্করণ, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম. এ., বাংলা, পৃ ১৮৭

ঐ গীতার বাণী, অনিলবরণ রায়, বাংলা, পৃ ১৯৯

CENTRAL LIBRARY

১৯৪০ ইং, বুদ্ধি ও বোধি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., বি. এল., বেদান্তরত্ন, বাংলা, পৃ ৭৬, মূল্য '৫০

ঐ অশোক, সুরেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., পি. এইচ. ডি., বি. লিট., বাংলা, পৃ ৭৫, মূল্য ১'০০

ঐ ইউরোপের শিল্পকথা, অসিতকুমার হালদার, বাংলা, পৃ ১৫৬, মূল্য ১'২৫

১৯৪১ ইং, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, বাংলা, পৃ ৫০৩, [শ্রীমতী মণিকা দেবী]

ঐ **Matriculation Bengali Selections**, বাংলা, মূল্য ২'৫০

ঐ কৃষ্ণকান্তের উইল, চরিত্রালোচনা, মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ., বাংলা, পৃ ২৪০, মূল্য ১'২৫, [বঙ্কিমচন্দ্র]

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, প্রাণিবিদ্যা, বাংলা, পৃ ১৯, মূল্য '২৫

ঐ ভারতের দেব দেউল, জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, বাংলা, সচিত্র, পৃ ২৫৭, মূল্য ৩'০০, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ ন্যায়মঞ্জরী ২য় খণ্ড, পঞ্চানন তর্কবাগীশ, বাংলা, পৃ ২০৩, মূল্য ২'৫০

ঐ মনোবিজ্ঞান, চারুচন্দ্র সিংহ, বাংলা, পৃ ৩৯৬, মূল্য ২'০০

ঐ ধর্মসাধনা, স্বর্ণপ্রভা সেন বি. টি., পৃ ১২৪, মূল্য ১'২৫

ঐ দক্ষিণাত্যে, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা, পৃ ১৭১, সচিত্র, মূল্য '৭৫

ঐ রামদাস ও শিবাজী, চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস., বাংলা, পৃ ৩৭৪

ঐ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা, পৃ ৩৯৬

ঐ উপনিষদের আলো, মহেন্দ্রনাথ সরকার, বাংলা, পৃ ১১৭, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ হেগেলের দার্শনিক মতবাদ, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম. এ., বাংলা, পৃ ১১৩

১৯৪২ ইং, বাংলা সাহিত্যের কথা, সুকুমার সেন এম. এ., পি. এইচ. ডি., বাংলা, পৃ ২৪৬

ঐ প্রাচীন বাঙ্গলাপত্র সঙ্কলন, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ., বি. লিট., পি. এইচ. ডি., বাংলা, পৃ ৪৯৬, সচিত্র, দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৫'০০

ঐ শাক্তপদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা

ঐ গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, বাংলা, পৃ ১৮৭, মূল্য ১'৫০

ঐ বিহারীলালের কাব্য সংগ্রহ, বাংলা, সচিত্র, পৃ ৬১৫

ঐ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নীহার দাশগুপ্তা, বাংলা, পৃ ৮৪

ঐ সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বাংলা, পৃ ৩৯৮

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—মনোবিদ্যা, বাংলা, মূল্য '২৫

ঐ হারামণি, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম.এ., বাংলা, পৃ ৩৩৪, মূল্য ২'৫০

ঐ বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ২৩৮

ঐ ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, পৃ ৫৬৬, [স্যার আশুতোষ]

ঐ বেদান্ত দর্শন -অদ্বৈতবাদ, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, বাংলা, পৃ ৫৩৮

ঐ গণিতের ভিত্তি, জ্যোতির্ময় ঘোষ এম. এ., বাংলা, পৃ ৬১

১৯৪৩ ইং, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ., তত্ত্ব রত্নাকর, বাংলা, পৃ ৫৬৩, [শ্যামাপ্রসাদ]

CENTRAL LIBRARY

১৯৪৩ ইং, বাংলাভাষার শিক্ষাপদ্ধতি, কল্যাণী সেন এম. এ., বি. টি., বাংলা. পৃ ১৫২, [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী]

ঐ সমালোচনা সংগ্রহ, তৃতীয় সংস্করণ, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা, পৃ ২৬০

ঐ চর্যাপদ, মণীন্দ্রমোহন বসু এম. এ., বাংলা, পৃ ২৯৫

১৯৪৪ ইং, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ., বাংলা, পৃ ৮১১, মূল্য ১০'০০, [শ্যামাপ্রসাদ]

ঐ বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা, প্রমথ চৌধুরী এম. এ., বাংলা, পৃ ১৭, মূল্য '৫০

ঐ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ভূবিদ্যা, বা লা, মূল্য '২৫ *

---

* ১৯১১ হইতে ১৯৪৪ ইং পর্যন্ত কাল-সীমার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ইংরাজী বাংলা উভয় ভাষায় রচিত মোট ১৭৩ খণ্ড পুস্তকের এক তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকা অসম্পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং হাজরা রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে অনুসন্ধান করিয়া সকল গ্রন্থ পাই নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রত্যেকখানি গ্রন্থের অন্ততঃ একখানি করিয়া কপি পৃথকভাবে রাখা শ্রেয়। এই বিষয়ে যাঁহারা ভবিষ্যতে গবেষণা করিবেন তাঁহারা যাহাতে প্রত্যেকখানি প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা দেখিবার সুযোগ পান তাহার ব্যবস্থা এখনই করিতে হইবে। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি, বিশেষভাবে গ্রন্থাগার পরিচালন-সমিতির দৃষ্টি, সবিনয়ে আকর্ষণ করি। উপরে উদ্ধৃত তালিকায় গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ও মূল্য অনেকক্ষেত্রে নির্দেশ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে অনেক ক্ষেত্রে মূল্যের উল্লেখ থাকিত না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। যে গ্রন্থ যাঁহার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে তাঁহার নাম, সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মোট ৪৩ খানি গ্রন্থ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে উৎসর্গীকৃত। তন্মধ্যে ১৯ খানি গ্রন্থ (অর্থাৎ ৪৪%) স্যার আশুতোষের নামে, ১৪ খানি গ্রন্থ (অর্থাৎ ৩২%) শ্যামাপ্রসাদের নামে এবং ১০ খানি গ্রন্থ (অর্থাৎ ২৩%) অন্যান্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থরচয়িতারা আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ এই পিতাপুত্রের নিকট কতখানি উৎসাহ পাইয়াছিলেন তাহার এক পরোক্ষ নিদর্শন হিসাবে ইহার উল্লেখ করা হইল।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসূচী

১৯৪৫-১৯৭০

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সঙ্কলিত

১৯৪৫ মৌর্য যুগের ভারতীয় সমাজ—এন. সি. বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈষ্ণব দর্শনে জীববাদ—শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ
১৯৪৬ ভারতীয় সভ্যতা—ব্রজসুন্দর রায়
১৯৪৭ বাংলার ভাস্কর্য—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
পদ্মাপুরাণ (নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল)—তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত
১৯৪৮ গীতার বাণী—অনিলবরণ রায়
১৯৪৯ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা—তমোনাশ দাশগুপ্ত
সাহিত্যে নারী, স্রষ্টা ও সৃষ্টি—অনুরূপা দেবী
বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা—অজরচন্দ্র সরকার
উপনিষদের আলো (তৃতীয় সং)—মহেন্দ্রনাথ সরকার
গোপীচন্দ্রের গান (সম্পাদিত)—আশুতোষ ভট্টাচার্য
১৯৫০ মনসামঙ্গল—কেতকা দাস (দ্বিতীয় সং)—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
বাংলা বচনাভিধান—অমরেন্দ্রনাথ রায়
শারীরবিদ্যা—রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
বাঙালীর পূজাপার্বণ—অমরেন্দ্রনাথ রায়
নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস—কল্যাণী মল্লিক
বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড)—আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী
১৯৫১ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—তমোনাশ দাশগুপ্ত
ভারতের বনৌষধি (সচিত্র) প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড—কালীপদ বিশ্বাস
রামদাস ও শিবাজী—চারুচন্দ্র দত্ত
১৯৫২ পূর্ববঙ্গ গীতিকা বা ময়মনসিংহ গীতিকা (নতুন সং), চার খণ্ড—দীনেশচন্দ্র সেন
জীবন কথা (আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমীর জীবনী)—ভূমিকা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি—অমরেন্দ্রনাথ রায়

CENTRAL LIBRARY

১৯৫২ বাংলা নাটক—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ভারতের বনৌষধি (তৃতীয় খণ্ড)—কালীপদ বিশ্বাস
ভারতের দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়—যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য বেদান্ততীর্থ
মঙ্গলচণ্ডীর গীত – সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৯৫৩ নিরুক্ত (প্রথম খণ্ড)—অমরেশ্বর ঠাকুর
কল্পসূত্র ; ভদ্রবাহু—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
কৃষি-বিজ্ঞান (দ্বিতীয় খণ্ড)—রাজেশ্বর দাশগুপ্ত
১৯৫৪ বাউলার বাউল—ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
১৯৫৫ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—মোহিতলাল মজুমদার
জ্ঞান ও কর্ম (নতুন সং)—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরুক্ত (দ্বিতীয় খণ্ড)—অমরেশ্বর ঠাকুর
১৯৫৬ গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং)—অমরেন্দ্রনাথ রায়
জ্ঞানদাসের পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—তারকচন্দ্র রায়
স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র—মাখনলাল সেন
রায়শেখরের পদাবলী—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৯৫৭ অভয়ামঙ্গল : দ্বিজ রামদেব—আশুতোষ দাস
বিচিত্র চিত্রসংগ্রহ—সংগ্রাহক অমরেন্দ্রনাথ রায়
দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত
শিবসংকীর্তন বা শিবায়ন (রামেশ্বর)—যোগীলাল হালদার সম্পাদিত
চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
১৯৫৮ কাঞ্চী কাবেরী : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সুকুমার সেন ও সুনন্দা সেন সম্পাদিত
প্রাচীন কবিওয়ালার গান—প্রফুল্লকুমার পাল সম্পাদিত
লালন-গীতিকা : ফকির লালন শাহ্—মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত
বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য—প্রভামণী দেবী
এগারটি বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য-নিদর্শন অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী—সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৯৫৯ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় সং)—মন্মথমোহন বসু
শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (দ্বিতীয় সং) – বিমানবিহারী মজুমদার
১৯৬০ উত্তরাধ্যয়ন-সূত্র (প্রথম খণ্ড)—পুরণচাঁদ শ্যামসুখ ও অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য
সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লকুমার পাল সম্পাদিত
নিরুক্ত (তৃতীয় খণ্ড)—অমরেশ্বর ঠাকুর

CENTRAL LIBRARY

১৯৬০ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—[পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ইত্যাদি]
ধর্মমঙ্গল : মাণিকরাম গাঙুলি—বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত
গিরিশচন্দ্র কিরণচন্দ্র দত্ত
মনসামঙ্গল : কবি জগজ্জীবন কৃত—সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৯৬১ প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো—কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী
বেদান্ত দর্শন অদ্বৈতবাদ (তৃতীয় খণ্ড)—আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী
১৯৬২ ভক্তি সন্দর্ভ : শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত : মূল, অনুবাদ, তাৎপর্যসহ—রাধারমণ গোস্বামী ও কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত
বিদ্যাপতির শিবগীত—সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত
বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (সপ্তম সং)—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (ষষ্ঠ সং)—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
দাশরথি রায়ের পাঁচালি—হরিপদ চক্রবর্তী
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—পীযূষকান্তি মহাপাত্র
কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ—জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ—বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত
কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম ভাগ)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
কৃষি-বিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড—কৃষির মূলনীতি)—রাজেশ্বর দাশগুপ্ত
পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ—সুকুমার সেন
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—তারকচন্দ্র রায়
বৈষ্ণব পদাবলী (অষ্টম সং)—খগেন্দ্র নাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত
বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা—আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৯৬৩ বাংলা সাহিত্যের কথা (সপ্তম সং)—সুকুমার সেন
ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্য-সাহিত্যে অবদান—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রসকল্পবল্লী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত
শাক্ত পদাবলী (চতুর্থ সং) - অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত
বেদান্ত দর্শন : অদ্বৈতবাদ (দ্বিতীয় সং)—আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী
১৯৬৪ বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ (চতুর্থ সং)
প্রাচীন পুঁথির পরিচয়—মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত
১৯৬৫ মঙ্গলচণ্ডীর গীত : দ্বিজ মাধবকৃত—আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৯৬৬ চণ্ডীমঙ্গল (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত

CENTRAL LIBRARY

১৯৬৬ মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায়
শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত—গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত
১৯৬৭ ফাউস্ত—অনুবাদ : কানাই গাঙুলি
পাতঞ্জল যোগদর্শন (পঞ্চম সং)—স্বামী হরিহরানন্দ অরণ্য
১৯৬৮ ছান্দসিকী—দিলীপকুমার রায়
১৯৬৯ চণ্ডীমঙ্গল : রামানন্দ যতি বিরচিত—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত
গোবিন্দবিজয়—পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত
১৯৭০ বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী—নরেশচন্দ্র জানা
গোপীচন্দ্র নাটক (ইংরেজীতে সম্পাদিত)—তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
মহাভারত : কবি সঞ্জয় রচিত—মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসূচী

১৯৪৫-৭০

১৯৪৬ Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature
—Shashibhusan Dasgupta
১৯৫০ An Introduction to Tantric Buddhism—Shashibhusan Dasgupta
১৯৫৪ History of Bengali Language and Literature (2nd ed.)—Dineschandra Sen
১৯৬৩ Bengali Folk-ballads from Mymensingh—Dusan Zbavitel
The Old Bengali Language and Text—Tarapada Mukherjee
১৯৬৪ Sri Radha and Sri Krishna of Brindavana—Gokuldas De

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলী

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত (সংগৃহীত এবং সম্পাদিত)—নির্মলেন্দু ভৌমিক
পদামৃতসমুদ্র—উমা রায় সম্পাদিত
নবাবিষ্কৃত চর্যাপদ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত
নরোত্তম দাস ও তাঁহার রচনাবলী—নীরদপ্রসাদ নাথ সম্পাদিত

CENTRAL LIBRARY

[গ]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যে পি-এইচ. ডি. ও ডি. লিট. উপাধি

১৯১৯-১৯৭৪

প্রফুল্লচন্দ্র পাল সঙ্কলিত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ সাল থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি দানের ব্যবস্থা হলেও দীনেশচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা (১৯১৯-২০) প্রবর্তনের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ডক্টর ডিগ্রী সংক্রান্ত কোন গবেষণা গ্রন্থ দাখিল এবং প্রদানের সংবাদ পাওয়া যায় না। অবশ্য বাংলা বিভাগ কার্যকরী হবার পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে শুরু হয়েছিল, অনেক গবেষক ও অধ্যাপক পি. আর. এস. ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভের জন্য যে সমস্ত গবেষণা দাখিল করেছেন পরবর্তীকালে তাঁরাই বাংলা সাহিত্য ও ভাষার গবেষণা ও অধ্যাপনার নেতৃত্ব করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ডক্টর এনামুল হক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের *Aspects of Bengali Society* (1932) বাংলা সাহিত্যের প্রথম পি-এইচ. ডি. উপাধি গ্রন্থ—অবশ্য ইংরেজী ভাষায় রচিত। ডঃ এনামুল হক বাংলাভাষায় 'বঙ্গে সুফী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচনা করে ১৯৩৪ সালে পি-এইচ. ডি. লাভ করেন। তৎপরে ডঃ বিমান মজুমদারের সুবৃহৎ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' ১৯৩৭ সালে পি-এইচ. ডি.র জন্য স্বীকৃতি লাভ করে। অবশ্য এঁরা ছাড়াও গবেষকরূপে বাংলা বিভাগের গবেষণায় যুক্ত ছিলেন শশাঙ্কমোহন সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মণীন্দ্রমোহন বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি উত্তরকালের বিখ্যাত গবেষকগণ। ১৯৪১ সালে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature* পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীরূপে মনোনীত হয় এবং ১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' ১৯৪৬ সালে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করে। এর পর পি-এইচ. ডি. র নিয়মকানুন পরিবর্তিত হয় এবং অতঃপর এই ডিগ্রী ডি. ফিল. নামে পরিচিত হয়। অবশ্য ১৯৭১ সাল থেকে আবার পূর্বতন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ ডি. ফিল.-এর স্থলে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী আবার প্রবর্তিত হয়। ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'রসসাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান' (১৯৪৮) প্রথম ডি. ফিল. নিবন্ধ। ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' (১৯৬২) বাংলা গবেষণার প্রথম ডি. লিট. গ্রন্থ। এর পর একাধিক নিবন্ধ ডি. লিট. উপাধি লাভ করেছে।

CENTRAL LIBRARY

গবেষকদের নাম	বিষয়
৩৯। চট্টোপাধ্যায়, হরপদ	রবীন্দ্র নাটকের ভূমিকা ও স্বরূপ (১৯৬৬)
৪০। চন্দ রায়, শঙ্করবিজয়	কৃত্তিবাসী ও তুলসীদাসী রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা (১৯৬১)
৪১। চৌধুরী, জীবনবল্লভ	পদাবলী সঙ্কলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৭১)
৪২। „ দুলালকান্তি	লোকসংস্কৃতি ও বাংলার লোক উৎসব (১৯৬৯)
৪৩। „ প্রিয়ব্রত	রবীন্দ্র সঙ্গীতে মার্গ ও লৌকিক সুরের প্রভাব (১৯৬৭)
৪৪। „ ভূদেব	বাংলাসাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার (১৯৬৩)
৪৫। জানা, নরেশচন্দ্র	বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী (১৯৬৬)
৪৬। „ মনোরঞ্জন	রবীন্দ্রকাব্যে শাশ্বত দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা (১৯৫৯)
৪৭। „ শ্রীমন্তকুমার	রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা (১৯৭০)
৪৮। তিওয়ারী, রামবহাল	আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দের তুলনামূলক আলোচনা (১৯৭৩)
৪৯। ত্রিপাঠী, দীপ্তি	সমকালীন পাঁচজন কবির আলোকে আধুনিক বাংলা কাব্যের কয়েকটি প্রবণতা (১৯৫৮)
৫০। দত্ত, কমলা	উনবিংশ শতাব্দীর মসীযুদ্ধ (১৯৭১)
৫১। দত্ত, গোপেশচন্দ্র	নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও গ্রন্থাবলী (১৯৬৪)
৫২। „ চারুচন্দ্র	কীর্তন গানের ক্রমবিবর্তন (১৯৭২)
৫৩। „ বিজিতকুমার	বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৯৬২)
৫৪। দাশ, আশুতোষ	দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল (১৯৫৫)
৫৫। „ উত্তম	বাংলা সাহিত্যে সনেট (১৯৭১)
৫৬। „ গিরীন্দ্রনাথ	বারাসাত ও বসিরহাট মহকুমার পীরবর্গ ও সাহিত্য (১৯৭১)
৫৭। „ নির্মল	বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (১৯৭০)
৫৮। „ শিশিরকুমার	বাংলা ছোট গল্প [আদি থেকে ১৯২৫ খৃঃ পর্যন্ত] (১৯৬৩)
৫৯। „ সবিতা	বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখকবর্গ [উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ] (১৯৬৮)
৬০। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন	সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গীতিকবিতার রূপবৈচিত্র্য (১৯৬৬)
৬১। „ তমোনাশ	বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালী সমাজ (১৯৩২)
৬২। „ রবীন্দ্রকুমার	উনিশ শতকের বাংলা সমালোচনা সাহিত্য (১৯৫০)
৬৩। „ শশিভূষণ	বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় অপ্রচলিত ধর্ম সম্প্রদায় (১৯৪১)
৬৪। „ শান্তিকুমার	রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য (১৯৬২)
৬৫। „ সুধীরকুমার	কাব্যালোক (১৯৪৬)
৬৬। দে, অধীরকুমার	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (১৯৬১)

CENTRAL LIBRARY

গবেষকদের নাম	বিষয়
৬৭। দে, সাবিত্রী	উনবিংশ শতকের শেষার্ধকালে সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ধারা [১৮৫০-১৯০০] (১৯৭০)
৬৮। দেব, রণেন্দ্রনাথ	বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায় (১৯৬২)
৬৯। দেবী, (রায়) প্রভাময়ী	বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য (১৯৫৫)
৭০। নাথ, নীরদপ্রসাদ	নরোত্তম ও তাঁহার রচনাবলীর সামগ্রিক বিচার (১৯৬৬)
৭১। নিয়োগী, তুষারকান্তি	বাংলা মঙ্গলকাব্যের লোকসাহিত্যগত ভিত্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন (১৯৭২)
৭২। পাল, অনিমেষকান্তি	পূর্ববঙ্গের একটি কথ্যভাষা : "ঢাকাই" (১৯৭০)
৭৩। পাল (কোলে) অশ্রু	রাজনারায়ণ বসুর জীবনী ও রচনা (১৯৬৮)
৭৪। „ প্রফুল্লচন্দ্র	প্রাচীন কবিওয়ালার গান (১৯৬৭)
৭৫। „ রামেশ্বর	বাংলা সাহিত্যে শূন্যবাদ (১৯৭৩)
৭৬। পালিত (ঘোষ), রীণা	বাংলায় সেক্সপীয়রের অনুবাদ-সমীক্ষা [উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত] (১৯৬৯)
৭৭। পুরকাইত, নিখিলেশ	গোয়ালপাড়িয়া লোকসাহিত্য (১৯৬৯)
৭৮। পোদ্দার, অরবিন্দ	বঙ্কিমমানস (১৯৫১)
৭৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত	বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব (১৯৭২)
৮০। „ অলকা	উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কবিতা (১৯৬৮)
৮১। „ অসিতকৃষ্ণ	উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য [১৮০০-১৮৫৭] (১৯৫৮)
৮২। „ দেবনাথ	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব-প্রভাব (১৯৭০)
৮৩। „ ধীরেন্দ্রনাথ	বাংলার জাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৭২)
৮৪। „ রিক্তা	সাধনা-পত্রিকাযুগে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮)
৮৫। „ সুনীলকুমার	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনকৌশল (১৯৬১)
৮৬। „ সুনীলবরণ	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও গিরিশচন্দ্রের নাটক (১৯৬৩)
৮৭। „ সুবর্ণশশী	নবীনচন্দ্র : মনন ও শিল্প (১৯৬৩)
৮৮। „ সুভাষ	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লৌকিক ঐতিহ্য (১৯৭২)
৮৯। বসু, দেবতোষ	রবীন্দ্র নাটক ও পাশ্চাত্ত্য নাট্যজিজ্ঞাসা (১৯৭২)
৯০। „ অরুণকুমার	বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৭০)
৯১। „ নিতাইচন্দ্র	শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের তুলনামূলক বিচার (১৯৭৩)
৯২। „ আনন্দমোহন	বাংলা পদাবলীর ছন্দ (১৯৬৮)
৯৩। „ রামদুলাল	বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ (১৯৬৭)

CENTRAL LIBRARY

	গবেষকদের নাম	বিষয়
৯৪।	বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল	রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি (১৯৬৪)
৯৫।	বিশ্বাস, দিলীপ	ভারতচন্দ্রের কাব্যে যুগচেতনা ও আগামী যুগের সম্ভাবনা (১৯৭২)
৯৬।	বিশী, চিরশ্রী	রবীন্দ্র-গদ্যভাষার বিবর্তন [১৮৮৭-১৯০০] (১৯৭০)
৯৭।	ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ	বাংলার বাউল ও বাউল গান (১৯৫৮)
৯৮।	" গুরুদাস	বাংলা কাব্যে শিব (১৯৫৭)
৯৯।	" দেবীপদ	বাংলা চরিত সাহিত্য (১৯৬৫)
১০০।	" নিরঞ্জনকুমার	বৈষ্ণব গীতিসাহিত্য (১৯৬২)
১০১।	" প্রভাতকুমার	বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব [১৮০০-১৯১৪] (১৯৭০)
১০২।	" বন্দিতা	রামাইকৃত অনিলপুরাণ (১৯৬৭)
১০৩।	" বাণী	গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য (১৯৭৩)
১০৪।	" বিজনবিহারী	রস-সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান (১৯৪৮)
১০৫।	" বিষ্ণুপদ	দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি সাহিত্য (১৯৬৫)
১০৬।	" বুদ্ধদেব	বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান (১৯৫৯)
১০৭।	" শিবপ্রসাদ	ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১৯৫৩)
১০৮।	" সত্যনারায়ণ	কৃষ্ণরাম দাস : সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি (১৯৫৫)
১০৯।	" সাধনকুমার	এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৫৮)
১১০।	" হংসনারায়ণ	যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায় (১৯৬৬)
১১১।	ভৌমিক, নির্মলেন্দু	প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত (১৯৬১)
১১২।	মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ	রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনবাদ [তুলনামূলক আলোচনা] (১৯৬৯)
১১৩।	মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার	বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব (১৯৬৭)
১১৪।	" বিমানবিহারী	চৈতন্য-চরিতের উপাদান (১৯৩৭)
১১৫।	" সাধুচরণ	মহাভারতের ধর্ম (১৯৭১)
১১৬।	মণ্ডল, পঞ্চানন	বাংলার দুই লোকদেবতা ও তৎসংক্রান্ত হরিদেবের সাহিত্যকৃতি (১৯৬১)
১১৭।	মহাপাত্র, পীযূষকান্তি	অভিরাম ও তাঁহার গোবিন্দবিজয় (১৯৬৩)
১১৮।	মাইতি, রবীন্দ্রনাথ	ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব জীবন (১৯৬০)
১১৯।	" সুকুমার	ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের প্রবক্তা নরসিংহ ও তাঁহার কাব্য (১৯৭২)
১২০।	মান্না, গুণময়	রবীন্দ্র-কাব্যের আঙ্গিক (১৯৬৪)
১২১।	মিত্র, অমলেন্দু	ধর্মঠাকুর ও ধর্মসাহিত্যের বিবর্তন (১৯৬৭)

CENTRAL LIBRARY

গবেষকদের নাম	বিষয়
১২২। মিত্র, অরুণকুমার	অমৃতলাল বসু ও তাঁহার রচনাবলী (১৯৬৪)
১২৩। " মিনতি	বাংলায় খ্রীষ্টীয় চিন্তা ও অন্যান্য সাহিত্য (১৯৬৭)
১২৪। " হরপ্রসাদ	কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ (১৯৫৪)
১২৫। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য (১৯৫৭)
১২৬। " আনন্দময়	রবীন্দ্ররচনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের কাব্য রূপায়ন (১৯৭০)
১২৭। " উত্তরা	উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাহিত্যিক [১৮৫০—১৯০০] (১৯৬৯)
১২৮। " কৃষ্ণলাল	রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প (১৯৭১)
১২৯। " দুর্গাশঙ্কর	কবি মোহিতলাল (১৯৬৯)
১৩০। " ডলি	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ব্যঙ্গ সাহিত্য (১৯৭৩)
১৩১। " নীহারকণা	ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র এবং বাংলা সাহিত্যে উহার প্রভাব ও প্রয়োগ (১৯৫৯)
১৩২। " বিভূতিভূষণ	বাংলা নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব (১৯৬৫)
১৩৩। " বিমলকুমার	রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব-চিন্তার বিবর্তন (১৯৭২)
১৩৪। " সোমেন্দ্র নারায়ণ	রাগানুগা ভক্তিসাধনায় মধুর রসের বিশ্লেষণ (১৯৬৩)
১৩৫। মৈত্র, অপর্ণা	বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী ও রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী (১৯৭০)
১৩৬। " শীতাংশু	যুগন্ধর মধুসূদন (১৯৫৮)
১৩৭। " সুরেশচন্দ্র	বাংলা কাব্যের নবজন্ম (১৯৬৩)
১৩৮। রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ	অসমীয়া ছন্দের উৎস (১৯৭৩)
১৩৯। রায়, অলোককুমার	রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৯৭০)
১৪০। " উমারাণী	গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকতত্ত্ব (১৯৫২)
১৪১। " কার্তিকচন্দ্র	পাগল হরনাথের জীবনী ও উপদেশ বাণী (১৯৬৫)
১৪২। " কামিনীকুমার	লৌকিক শব্দকোষ (১৯৭১)
১৪৩। " তপতী	রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প (১৯৭২)
১৪৪। " মঞ্জুলা	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৯)
১৪৫। " রথীন্দ্রনাথ	দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার (১৯৫৯)
১৪৬। " শান্তিলতা	বৈষ্ণব সাহিত্যে যদুনন্দন (১৯৭৩)
১৪৭। " সুবোধরঞ্জন	কবি নবীনচন্দ্র সেনের সমগ্র কাব্য মূল্যায়ন (১৯৬২)
১৪৮। " সুশীল	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৯৬২)
১৪৯। রায়চৌধুরী, অমিয়কৃষ্ণ	বাংলা মঙ্গলকাব্যের রূপ ও রীতি (১৯৬৪)
১৫০। " গোপিকানাথ	বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের বিভিন্ন প্রবণতা ও উহার সমীক্ষা [১৯১৪-১৯৩৯] (১৯৬৯)

CENTRAL LIBRARY

গবেষকদের নাম	বিষয়
১৫১। লাহিড়ী, কার্তিকচন্দ্র	বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি (১৯৬৫)
১৫২। " শিবচন্দ্র	আদি ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপকল্প (১৯৬২)
১৫৩। শাসমল, পশুপতি	স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৭)
১৫৪। " সুধাংশু	রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাক্‌শিল্প (১৯৭২)
১৫৫। শীল, বৈদ্যনাথ	বাংলা লঘু নাট্য সাহিত্যের বিবর্তন (১৯৬২)
১৫৬। সমাদ্দার, বিমলকান্তি	রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব
১৫৭। সরকার, সাধনা	হেমচন্দ্রের কবিমানস ও উনবিংশ শতাব্দীর যুগচেতনা (১৯৬৫)
১৫৮। সান্যাল, অমরেন্দ্র	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জীবনী ও গ্রন্থাবলী (১৯৭১)
১৫৯। " (গঙ্গোপাধ্যায়), আশা	বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ [১৮০০-১৯০০] (১৯৬১)
১৬০। " ভবানীগোপাল	এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স : ব্যাখ্যা ও সমালোচনা (১৯৭০)
১৬১। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্র কাব্যের নৈসর্গিক উপাদান (১৯৭১)
১৬২। সাহা, জয়ন্তী	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান (১৯৬৯)
১৬৩। সিংহ, শুকদেব	পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরূপের প্রভাব (১৯৬৪)
১৬৪। সিংহরায়, জীবেন্দ্রবিনোদ	প্রমথনাথ চৌধুরী (১৯৫৭)
১৬৫। সেন, অনিমা	বাংলা শিশু রম্য সাহিত্যের ধারা (১৯৬৪)
১৬৬। " অমিতকুমার	প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৭)
১৬৭। " ধীরেন্দ্রনাথ	কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যপ্রসঙ্গে বাংলা হরিবংশ (১৯৬১)
১৬৮। " নমিতা	মহিলা রচিত অর্ধশতকের বাংলা কথাসাহিত্য [১৯০০-৫০] (১৯৬৫)
১৬৯। " নীলরতন	আধুনিক বাংলা ছন্দ (১৯৬২)
১৭০। " প্রদ্যোতকুমার	বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য (১৯৭৩)
১৭১। " (দত্ত), সুনন্দা	রবীন্দ্র কাব্য ভাষা (১৯৬:)
১৭২। সেনশর্মা, স্বরাজব্রত	রূপকের দার্শনিক ভূমিকা (১৯৭২)
১৭৩। হক, এনামুল	বাংলা সুফী সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত (১৯৩৪)
১৭৪। হালদার, পরমানন্দ	পরবর্তী বাংলা কবিওয়ালার গান (১৯৭১)
১৭৫। " শিবপ্রসাদ	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রভাব (১৯৬৬)
১৭৬। গুহ, রঞ্জিতকুমার	স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালী সমাজের বিবর্তন ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন (১৯৭৩)
১৭৭। মহাপাত্র, তুষারকান্তি	রবীন্দ্রকাব্যে চিত্রকল্প (১৯৭৪) *

* বন্ধনীর মধ্যে উপাধি প্রাপ্তির বৎসর উল্লিখিত হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

লেখক-পরিচিতি

অজিতকুমার ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট., বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব আর্টস

অজিতকুমার দে, বি. এ., করণিক, হিসাব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অমিতাভ মিত্র, এম. এ., ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অরুণকুমার ঘোষ, এম. এ., অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হুগলী মহাসীন কলেজ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অরূপকুমার ভট্টাচার্য, এম. এ., অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড মিউজিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আশা দাশ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও পার্টটাইম লেকচারার, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আশা দেবী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা

আশুতোষ দাস, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি., প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উমা রায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., সহাধ্যাপক, বেথুন কলেজ, কলিকাতা

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলিকাতা

কল্যাণী কার্লেকর, এম. এ., প্রাক্তন অধ্যক্ষা, শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হেস্টিংস, কলিকাতা

কৃষ্ণপদ গোস্বামী, এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি., রীডার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা

ক্ষুদিরাম দাশ, এম. এ., ডি. লিট., রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জনার্দন চক্রবর্তী, এম. এ., প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, এম. এ., অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা ও পার্টটাইম লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনকৃষ্ণ শেঠ, এম. এ., প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

জ্যোতির্ময় ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

তরণীকান্ত ভট্টাচার্য, এম. এ., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

তারাপদ ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. লিট., প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা

তুষার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

তুষারকান্তি নিয়োগী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., গবেষণা সহায়ক, নৃতত্ত্ব সমীক্ষা, ভারত সরকার

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দীপ্তি ত্রিপাঠী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

নন্দদুলাল রায়, এম. এ. অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়

নরেশচন্দ্র জানা, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নির্মলেন্দু ভৌমিক, এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিলীনা আব্রাহাম, এম. এ., অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, মহারাজা কলেজ, কোচিন

নীলরতন সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্চানন মণ্ডল, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ., পি-এইচ. ডি., মুখ্য আধিকারিক, পুরাতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রণবরঞ্জন ঘোষ, এম. এ., ডি. লিট., রীডার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রণয়কুমার কুণ্ডু, এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফুল্লচন্দ্র পাল, এম. এ., পি-এইচ. ডি., পুঁথিশালাধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., প্রাক্তন সম্পাদক, ভারতবর্ষ

ফুলরেণু গুহ, এম. এ., প্রাক্তন এম. পি.

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি., প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ., প্রাক্তন লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

বেলা সেনগুপ্ত, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

ভবানীগোপাল সান্যাল, এম. এ., পি-এইচ. ডি., সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ ও পার্টটাইম লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মহেশ্বর দাস, এম. এ., প্রাক্তন রীডার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ., প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ সরকারী কলেজ

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ., প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

রমেন্দ্র বর্মণ, এম. এ., বি. টি., অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আগরতলা বি. টি. কলেজ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, এম. এ., রীডার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, ডি. লিট., অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ, হুগলী

শুকদেব সিংহ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., রীডার ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

শোভা রায়, বি. এ, মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদকপ্রাপ্তা

সতী ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., আই. এ. এস.

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম. এ., পি-এইচ. ডি., প্রাক্তন রীডার ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, এম. এ., রবীন্দ্র অধ্যাপক, অসমীয়া বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ, হাওড়া

সুধাংশু তুঙ্গ, এম. এ., লেকচারার, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, এম. এ., প্রাক্তন ভাষাতত্ত্ববিদ্ নৃতত্ত্ব সমীক্ষা, ভারত সরকার

সুধীর গুপ্ত, এম. এ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুরলীধর গার্লস কলেজ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ, হাওড়া

হরপ্রসাদ মিত্র, এম. এ, পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও পার্টটাইম লেকচারার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হরিপদ চক্রবর্তী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

হারাধন দত্ত, এম. এ., সহকারী সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়